[উপন্যাস]

৩৬

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 'বশেন 'বন্ধু ব সব ও মা হইয়া কণা পাবে যাহা বুঝি • পারে নাই, তাহা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছিল। রেণু তাহাদিগের জননী না হইয়াও তাহাদিগকে যে ভাবে, মা'র সব কর্তব্য লইয়া পালন করিয়াছে এবং এখন তাহাকে যে ভাবে মাতার সব কর্তব্যপালনের উপদেশ দেয়, তাহাতে সে যে কেন ও কিরূপে দেবদত্তকে তাহার মাসীমা'কে দিয়া আসিয়াছে, তাহা সে কিছুতেই বুঝিতে পারিত না। সে কিছুতেই রেণুর কার্য্যের কারণ-সন্ধান পাইত না।

একাধিক বার কণার মনে হইয়াছে, সে মা'কে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু সে তাহা পারে নাই। তাহার কারণ, রেণুর যে গাম্ভীর্য্য তাহার স্নেহের পশ্চাতে সে লক্ষ্য করিয়াছে, তাহাতে রেণু যে কথার উল্লেখ কোন দিন কোনরূপে করে নাই, তাহা জিজ্ঞাসা করিতে সে সাহস পাইত না। সাহস না পাইবার প্রধান কারণ—পাছে রেণু তাহার প্রশ্নে ব্যথা পায়। বাস্তবিক যদি কোন অসতর্ক মুহূর্ত্তে কণা সেই কথা জিজ্ঞাসা করিত, তবে কি হইত, বলা যায় না; কারণ, পাছে কেহ কোন দিন তাহাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে—সে আশঙ্কা রেণু অতিক্রম করিতে পারে নাই। ভবিষ্যতে কখন কি হইবে, তাহাও সে অনেক সময় ভাবিত।

রেণু প্রথমে মনে করিয়াছিল, সে দেবদত্তকে জানিতেই দিবে না, সে তাহার মাতা। কিন্তু সে বিষয়ে তাহার আশা যে সর্ব্বতোভাবে পূর্ণ হয় নাই, তাহাও সে বুঝিতেছিল। তবে সে বিষয়ে সে আপনাকে একান্তই অসহায় বলিয়া আর কোনরূপ বিরুদ্ধ চেষ্টা করে নাই।

কণা পূর্ব্বে যাহা লক্ষ্য করিতে পারে নাই, এখন তাহা লক্ষ্য করিতেছিল। রেণুর সর্ব্ববিধ কর্ত্তব্যপালনে কোথাও বিন্দুমাত্র ত্রুটি দেখা না যাইলেও তাহার ও নীরেন্দ্রের ব্যবহারে কেমন একটু বৈশিষ্ট্য ছিল—যেন কোথাও কিছু অভাব ছিল। তাহা সে তাহার বিবাহের পূর্ব্বে, নূতন জীবনে প্রবেশলাভের পূর্ব্বে বুঝিতে পারে নাই।

কণার শাশুড়ী যখন তাহাকে দেবদত্তের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তখন কণা বলিয়াছিল, সে তাহার কিছুই জানে না। পূর্ণিমার আশঙ্কা ছিল, কণার শ্বশুরালয় হইতে সে কথা হয়ত কোন দিন উঠিবে। সেই জন্য তিনিই কণার শাশুড়ীকে কিরূপ অবস্থায়—মাতার রোগশয্যায় দেবদত্ত প্রসূত হইয়াছিল এবং কিরূপ অসাধারণ যত্নে মৃণালিনী তাহাকে বাঁচাইয়াছেন, সে সব বিবৃত করিয়া বলিয়াছিলেন, "যদি নিজে না দেখতাম, তবে বিশ্বাস করতে পারতাম না, কেউ ঐ ভাবে শিশুকে 'মানুষ' করতে পারে।" তিনি স্পষ্ট করিয়া যাহা বলেন নাই, ইঙ্গিতে সেই কথা জানাইয়াছিলেন—

[মৃ]ণালিনী ব্যতীত দেবদত্তকে কেহ বাঁচাইতে পারিত না।

কণার শাশুড়ী মনে করিয়াছিলেন, নিঃসন্তান মৃণালিনী শিশুকে সত্য সত্যই দেবতার দানরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। আর কণার শ্বশুর বিষয়ী লোক; তিনি স্ত্রীকে বলিয়াছিলেন—মাসীমা'র সম্পত্তিও সামান্য নহে, তিনি তাহা দেবদত্তকে দিতে চাহিলে তাহা গ্রহণ না করা কখনই সুবুদ্ধির কায হইত না।

এইরূপে যে সব আলোচনা হইয়াছিল, তাহাতেই কণার স্বামিগৃহ হইতে কোন অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন কোন দিন হয় নাই।

কণা জানিত, সে আসিবার পর রেণু নিশ্চয়ই বড় "একা এক[illegible] হয়। [illegible] কথা [illegible] ব[illegible]য়াছিল। তাই তাহার শাশুড়ীর নির্দ্দেশে কণা প্রায় প্রতিদিনই একবার মা'র কাছে যাইত। সে তাহার কন্যাকে লইয়া যাইত। কোন দিন সুনীল, কোন দিন কণার শ্বশুর বেড়াইয়া ফিরিবার সময় তাহাদিগকে লইয়া আসিতেন। কোন কোন দিন কণাই জিদ করিয়া রেণুকে লইয়া মৃণালিনীর কাছে যাইত। এক এক দিন সে রেণুকে লইয়া পিসীমা'র ঠাকুর-বাড়ী দেখিতে যাইত; সে বলিলে নীরেন্দ্রও সঙ্গে যাইত। ঠাকুর-বাড়ীর সব ভার নীরেন্দ্রকেই লইতে হইয়াছিল; সেই জন্য তাহাকে মধ্যে মধ্যে কার্য্যব্যপদেশেও তথায় যাইতে হইত। স্থানটি মনোরম—সম্মুখে গঙ্গা, উদ্যানে কুসুমের শোভা—যেন শান্তির সাধনক্ষেত্র।

এইরূপে মাসের পর মাস অতিবাহিত হইতে লাগিল—কোন অতর্কিত ঘটনায় সংসারের স্থৈর্য্য নষ্ট হইল না।

কণার বিবাহের পরবৎসর অশোক প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলেজে অধ্যয়ন করিতেছিল।

মৃণালিনী এক দিন রেণুকে বলিলেন, "মেয়ের বিয়ে ত দিলে—এ বার ছেলের বিয়ে দিয়ে আমাদের বৌ দেখাবে না?"

কথাটা রেণু যে মনে করে নাই, তাহা নহে; তবে সে অন্য কারণে। তাহার পিতৃবন্ধুর সেই কথা সর্ব্বদাই সে স্মরণ করিত—কণার ও অশোকের বিবাহ দিলে, তাহারা সংসারী হইলে, তাহার কর্ত্তব্যভার অনেকটা লঘু হইবে। কিন্তু এখনই অশোকের বিবাহ দেওয়া যাইবে কি না, তাহা সে ভাবিয়া দেখে নাই।

আজ সে মাসীমা'র কথায় আগ্রহ অনুভব করিলেও বিয়ের কথাও তাহার মনে পড়িল। এখন আর পূর্ণিমা নাই। কে উদ্যোগী হইয়া প্রস্তাব করিবে? সে কখন অগ্রসর হইয়া কোন গুরুত্বপূর্ণ কার্য্যের প্রস্তাব নীরেন্দ্রের নিকট করে নাই; সংসারের যে কায স্বাভাবিক নিয়মে তাহার কাছে আসিয়া পড়িয়াছে, সে তাহাই যথাসাধ্য সুসম্পন্ন করিয়াছে। কাযেই সে মাসীমা'র কথার কোন উত্তর দিতে পারিল না।

মৃণালিনীও আর সে কথা বলিলেন না।

রেণু যখন মাসীমা'র নিকট হইতে ফিরিয়া গেল, তখন কণা পিত্রালয়ে আসিয়াছে। কণা মা'কে দেখিয়া প্রথমেই অভিমানের সুরে বলিল, "বেশ লোক! দিদিমা'র কাছে যাবে, তা' আমাকে জানালে না কেন?

রেণু বলিল, "[illegible]—তা' হ'লে বুঝি আজ আর এ বাড়ী মাড়াতে না?"

"না—আমিও তাঁ'র কাছে যেতাম। মা, দিদিমা'কে দেখলে যেন ঠাকুর দেখা হয়।"

রেণু হাসিয়া বলিল, "তা আমি মাসীমা'কে বলে দেব—তিনি এক দিন তোমাকে প্রসাদ পেতে বলবেন।"

"ঠাকুর বুঝি কাউকে প্রসাদ পেতে যেতে বলেন? যে প্রসাদ পেতে চায়, তা'কেই ত যেতে হয়। আমি আজই তাঁকে বলে দিচ্ছি, আমরা প্রসাদ পেতে এক দিন যা'ব।"

ততক্ষণে অশোক আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। সে বলিল, "দিদি, 'আমরা' মানে কি তুমি আর জামাই বাবু?"

কণার মুখে লজ্জার ভাব ফুটিয়া উঠিল।

অশোক বলিল, "আমিই টেলিফোন ক'রে দিচ্ছি, রবিবারে মা, তুমি, জামাই বাবু, আমি—আমরা সব যা'ব।"

রেণু বলিল, "জামাই বাবু বিনা নিমন্ত্রণে যা'বেন কেন?"

"আমি নিমন্ত্রণ ক'রে আসব।"

কণা বলিল, "দিদিমা যেতে বলেছেন, বললেই হ'বে; শুনলে হয়ত আমার শাশুড়ীও যেতে চাইবেন। তিনিও দিদিমা'কে যে ভক্তি করেন!"

রেণু বলিল, "অশোক, মাসীমা আজ কি বল্‌ছিলেন জান ?"

অশোক বলিল, "কি, মা ?"

তিনি বলছিলেন, "তোমার বিয়ে দিতে হ'বে ।"

"কখ্‌খন দিদিমা তা' বলেন নি ।"

"সত্যই বলেছেন ।"

"আচ্ছা সে ঝগড়া আমি দিদিমা'র সঙ্গে করব ।"

কণা বলিল, "মা, তুমি দিদিমা'র কথাই শুন না কেন ?"

রেণু বলিল, "আমিই কি অশোকের বিয়ে দিবার কর্ত্তা ?"

"নিশ্চয়! দিদ, ত আর"—বলিতে বলিতে কণার গলাটা ধরিয়া আসিল—"আর নাই। এখন তোমাকেই সব করতে হ'বে। আমি আজই বাবাকে দিদিমা'র কথা বল্‌ছি।"

অশোক বলিল, "দিদি, তোমার কি আর কোন কায নাই ?"

"সে ভাবনা, তোমাকে ভাবতে হ'বে না ।"

বাস্তবিক সেই দিনই কণা নীরেন্দ্রকে বলিল, "বাবা, দিদিমা মা'কে অশোকের বিয়ে দিতে বলেছেন ।"

নীরেন্দ্র বলিল, "তোমার মা'কে বল—তিনি যা' ভাল বুঝবেন, করবেন ।"

"সেই কথাই আমি মা'কে বলেছি ।"

পরবর্ত্তী রবিবারে সকলে মৃণালিনীর গৃহে "প্রসাদ পাইতে" সমবেত হইলে কণাই অশোকের বিবাহের কথা তুলিল।

মৃণালিনী বলিলেন, "আজকাল ছেলেমেয়েদের বিয়ের বয়স বাড়ছে বটে, কিন্তু তা' ভাল হচ্ছে কি না, তা' কে বল্‌বে ?"

কণার শাশুড়ী বিনা নিমন্ত্রণেই মৃণালিনীর গৃহে আসিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন, "বৌমা ঠিকই বলেছে—প্রসাদ পেতে হ'লে নিমন্ত্রণের অপেক্ষা রাখতে নাই।" তিনি বলিলেন, "মাসীমা, আমি আপনার সঙ্গে একমত। কিন্তু দিনকাল যা' পড়েছে, তা'তে খুঁজতে খুঁজতেই দেরী হয়ে যায়।"

মৃণালিনী বলিলেন, "তা'র মানে এই যে, আমরা মনে করি, আমরাই সব করবার কর্ত্তা; উপরে থেকে যিনি আমাদের সব কায নিয়ন্ত্রিত করেন, তাঁ'র উপর একটুও নির্ভর করতে চাহি না।"

"সে কথা সত্য! কিন্তু—"

কণা বলিল, "তবে কি লোক খুঁজবে না ?"

"খুঁজবে, দিদি; কিন্তু সে খোঁজার সময় যদি তাঁ'কে স্মরণ না করি, তবে খোঁজা বৃথা হয়। এখন যে বাছ্‌তে বাছ্‌তে গাঁ উজড় হয়ে যায়।"

যখন এই সব কথা হইতেছিল, তখন অশোক তথা হইতে সরিয়া দেবদত্তের পাঠকক্ষে যাইয়া তাহার পুস্তকগুলি দেখিতেছিল। যে কক্ষে মৃণালিনীর স্বামীর সংগৃহীত পুস্তকগুলি সজ্জিত ছিল, সেই কক্ষেই দেবদত্তের পাঠের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

দেবদত্ত তাহার সঙ্গে আসিয়াছিল। উভয়ে সেই কক্ষে বসিয়া পুস্তকের বিষয় আলোচনা করিতে লাগিল।

ওদিকে আলোচনার পর স্থির হইল, এক বৎসর পরে—অশোকের পরীক্ষা হইয়া যাইবে—তাহার বিবাহ দেওয়া হইবে।

কণার শাশুড়ী হাসিয়া বলিলেন, "এই বার বেহানের স্বরূপ ধরা পড়বে। এক ঘরের এক সন্তান—এক ঘরের এক বধূ—বধূ নিয়ে 'ঘর করতে' গেলে বুঝা যা'বে—কেমন।"

কণা বলিল, "সে আপনি দেখে নেবেন, আমার মা'র নিন্দা করতে পারে এমন লোক হয় নি।"

শাশুড়ী হাসিয়া মৃণালিনীকে বলিলেন, "দেখ্‌লেন—মা'কে কেউ কিছু বল্‌লে মেয়ের সহ্য হয় না।" তিনি কণার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "এই আমিই ত তোমার মা'র নিন্দা করছি—তিনি আমাদের মেয়েকে এমন যাদু করেছেন যে, সে তাঁ'কেই চাহে।"

এই কথার পর মৃণালিনী উঠিয়া যাইলেন—আহারের আয়োজন কতদূর অগ্রসর হইয়াছে, তাহা দেখিতে গমন করিলেন।

আহারের আয়োজন দেখিয়া সুনীল বলিল, "দিদিমা, এই কি প্রসাদ ?"

মৃণালিনী বলিলেন, "প্রসাদ আছে, তবে সঙ্গে আরও কিছু আছে; প্রসাদ ভক্তিসহকারে খেতে হয়, আর অবশিষ্ট অমনই।"

"না, দিদিমা, অবশিষ্টও প্রসাদ—তবে সে স্নেহের দান হ'লে ভালবাসার সঙ্গে খেতে হয়।"

রেণু তথায় ছিল। সে বলিল, "মাসীমা, এইবার আপনি হবিষ্যান্নের যোগাড় করুন।"

"এই সব সোণার চাঁদের আহার দেখে যে আনন্দেই পেট ভরে যায়, মা!"

সুনীল বলিল, "আপনি কি তবে আজ খাবেন না?"

"খাব, দাদা, কিন্তু ভাত না খেলে কি খাওয়া হয় না?"

রেণু বলিল, "ও ত মাসিম'র আছেই।"

"সে কি?"

"বার মাস ত্রিশ দিন কি কেবল খাবার ভাবনাই ভাবতে হয়?"

রেণু বলিল, "তবে চলুন, আমাকে ঠাকুরঘর থেকে ফল দিবেন—আমি ছাড়িয়ে রাখি।"

মৃণালিনী বলিলেন, "সে ভাবনা তোমাকে ভাবতে হ'বে না। তুমি চল—বসবে; তোমার জন্য আর সকলে ব'সে আছেন।"

তিনি অন্য কক্ষে—যে কক্ষে স্ত্রীলোকরা আহারে বসিবেন, তথায় গমন করিলেন। রেণু সঙ্গে গেল।

সকলের আহার শেষ হইলে সুনীল বলিল, "দিদিমা, আপনি যদি স্থির ক'রে থাকেন, আমরা না গেলে খাবেন না, তবে আমরা এখনই বিদায় নিচ্ছি।"

মৃণালিনী বলিলেন, "না, দাদা, আর একটু দেরী করতে হ'বে। তোমাদের ড্রাইভাররা খেতে বসেছে—তা'দের হ'ক।"

"আমরা যে যেতে ব্যস্ত, তা' নয়; কিন্তু আপনি যদি আমরা থাকতে জলগ্রহণ না করেন, তবে তাড়ানই হয়, দিদিমা।"

"তোমাদের তাড়া'ব! আমার ভাগ্য যে, এক দিন সব এসেছ।"

"যদি বলেন, তবে 'ভাগ্য' এত বেশী হ'তে পারে যে, মনে করবেন 'দুর্ভাগ্যই' ছিল ভাল।"

"সে তোমাদের ইচ্ছা। তবে এক দিন আসতে হ'বে—নিয়ে যেতে।"

"তা'র এখনও অনেক বিলম্ব আছে।"

"সে কামনা আর ক'র না, দাদা।"

তিনি ড্রাইভারদিগের আহারের স্থানে গমন করিলেন।

রেণু বলিল, "বাড়ীতে কেউ অভুক্ত থাকতে ত মাসীমা আহার করবেন না।"

রেণুর শাশুড়ী বলিলেন, "অনেক ভাগ্যে মাসীমা পেয়েছিলেন, বেয়ান; আমরা ওঁর পায়ের ধূলা নেবার যোগ্য নই।"

কণার কন্যা ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল; উঠিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সেই ক্রন্দনশব্দ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিলেই মৃণালিনী আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

রেণু হাসিয়া বৈবাহিকাকে বলিল, "ঐটি মাসীমা'র দৌর্ব্বল্য—ছেলের কান্না সহিতে পারে না।"

মৃণালিনী বলিলেন, "ওটি আমার উত্তরাধিকার। আমার ঠাকুরমা'র যখন শেষ অবস্থা—তাঁকে উঠানে তুলসীতলায় লওয়া হয়েছে, তখন তিনি সকলকে বল্লেন—'যা' সব খেয়ে নে; তার পর আমায় গঙ্গাযাত্রা করাবি।' তিনি আর কোন কথা না ব'লে—তুলসীতলায় শেষ শয়নে মালা জপ করতে লাগলেন। সেই সময় আমরা কেউ এক জন কেঁদে উঠেছিলাম। শুনে তিনি বলেছিলেন—"কোন্ বৌয়ের ছেলে কাঁদে রে? এর মধ্যেই কি সব ভুলে গেল, আমি ছেলের কান্না সইতে পারি না?' আমার পিতৃকুলে তাঁ'র সে কথা অনেক দিন কেউ ভুলে নি। আর সে সব দিন নাই।" তিনি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

ততক্ষণে রেণুর ক্রোড়ে শিশু শান্ত হইয়াছে।

মৃণালিনী হাত বাড়াইলে শিশু এক বার তাঁহার মুখের দিকে চাহিল—তাহার পর তাঁহার কাছে যাইবার জন্য ঝুঁকিয়া পড়িল। মৃণালিনী তাহাকে লইলেন। কণার শাশুড়ী বধূকে বলিলেন, "চল, ওকে তোমার দিদিমা'র কাছে রেখে যাই—ওর দিদিমা আর তোমার দিদিমা মেয়ে 'মানুষ' করুন।"

মৃণালিনী বলিলেন, "না, মা। মায়াতেই বন্ধন।"

"হ'লই বা।"

"এখন ছুটী হ'লেই ভাল; কেবল মনে হয়—

'গতাগতেন শ্রান্তোঽস্মি দীর্ঘসংসারবর্ত্মসু।
যেন ভূয়ো নাগচ্ছামি ত্রাহি মাং মধুসূদন॥'"

সকলে যাইবার আয়োজন করিলে রেণু রহিল। তাঁহারা যাইবার পর মৃণালিনী যাইয়া আবার স্নান করিলেন এবং

তাহার পর রেণুর নির্ব্বন্ধাতিশয়ে সামান্য কিছু আহার করিলেন।

তিনি আহার করিতে উপবিষ্ট হইলে, রেণু তাঁহার কাছে বসিল।

মৃণালিনী বলিলেন, "কেমন যেন ভাবিত দেখছি কেন, রেণু?"

রেণু বলিল, "সেই জন্যই ত তোমার কাছে রইলাম; অশোককেও পাঠিয়ে দিলাম।"

"কি বল্ ত?"

"সত্যই কি অশোকের বিয়ে দেওয়া হ'বে?"

"তুমি ত, মা, কর্ত্তব্যপালনই করছ। তবে অশোকের সম্বন্ধে তোমার কর্ত্তব্য পালন করবে না কেন?"

রেণু কিছু বলিল না—একটু ভাবিয়া বলিল, "তা'ই হ'বে।"

তাহার পর সে বলিল, "মাসীমা, যা' করবার, আর যা' ভাববার সে তুমি করবে।"

মৃণালিনী হাসিয়া বলিলেন, "এ বুড়ো আর কত দিন?"

৩৬

অশোকের পরীক্ষার পর তাহার বিবাহ হইয়া গেল। পাত্রীর সন্ধান প্রথমে কণার শাশুড়ী দিয়াছিলেন; তাহার পর মৃণালিনী যখন বিবেচনা করিয়া সম্বন্ধ অনুমোদন করেন, তখনই কথা 'পাকা' করা হইয়াছিল।

মৃণালিনী রেণুকে উপদেশ দিয়াছিলেন—"ভাল ঘরের মেয়ে আনবে; সহজেই মনের মত ক'রে গ'ড়ে নিতে পারবে।"

রেণু মনে মনে হাসিয়াছিল, মুখে কিছু বলে নাই। তাহার হাসির কারণ, সে স্থির করিয়াছিল, অশোকের বিবাহ দিয়া বধূকে সংসারের ভার দিয়া সে অবসর লইবে। কিন্তু সে কথা সে কাহাকেও বলে নাই; সে কথা বলিবারও নহে।

অশোকের বিবাহের সময় যে কণা পিত্রালয়ে আসিল, তাহাতে রেণু যেন স্বস্তির শ্বাস ফেলিতে পারিল। যে সব বিষয়ে নীরেন্দ্রের মত গ্রহণ প্রয়োজন—সে সব কণাকে বলিলে, কণাই যাইয়া মত গ্রহণ করিত। তবে মত গ্রহণে কখন কোন অসুবিধা ঘটিত না; কারণ, নীরেন্দ্র সব ভার রেণুকে দিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিত।

বিবাহের পর বধূ অমলা এক দিন কণাকে বলি[illegible] "দিদি, আপনি আর আপনার ভাই কেবলই আমা[illegible] উপদেশ দেন—মা'র কাছে থাকতে, মা'র কথা সকল বিষ[illegible] শুনতে, আর মা কেবলই উপদেশ দেন,বাবার কাছে থাক[illegible] আর সকল বিষয়ে বাবার কথা শুনতে। কেন, বলুন ত?"

কণা হাসিয়া বলিল, "আমরা জানি, মা তোমাকে য[illegible] বলবেন, তা' কখন ভুল হ'বে না; কারণ, তিনি কখ[illegible] কোন কাযে কোন ভুল করতে পারেন, এ বিশ্বাস আমাদে[illegible] নাই। বাবা বরাবরই অপরের উপর নির্ভর করেন। য[illegible] দিন ঠাকুরমা ছিলেন, তত দিন সব ভার তাঁ'র উপর ছিল— তবে তিনি সে ভার মা'কে দিতে চাহিতেন। মা'র এখ[illegible] আমাদের নিয়ে—বিশেষ তাঁ'র নাতিনীকে নিয়ে ব্য[illegible] থাকতে হয়, তাই তিনি বাবার ভার কতকটা তোমা[illegible] দিতে চা'ন।"   [illegible]ছেন, তাহ

অমলা দিদির কথা সঙ্গত বলিয়া মনে [illegible]রে নাই— কিন্তু—তাহার মনের মধ্যে একটু সন্দেহ—[illegible]। তাহা রেণু[illegible] লঘু মেঘের প্রতিবিম্বের মত রহিয়া

পালিতা হইয়াছে, তাহাতে সে রেতে পারে নাই—সে যেম[illegible] স্বাভাবিক বলিয়া মনে করিতে বিবাহ হইয়া গিয়াছে— তাহার পিত্রালয়ে যে পরিবেষ্টকোর্য্যভার দিয়াছে, সংসারে[illegible] সে ভাব সে স্বাভাবিক বলিয়া সে মুক্তির সন্ধান করিবে[illegible] না। যে জল পরিস্রুত হইয়া ছিলেন, দেবদত্তের বিবা[illegible] দোষ কোথায় জিজ্ঞাসা করিলে, সে [illegible]করিয়া তিনি কো[illegible] যায় না; বরং বলা যায়, তাহাতে কোন মাল[illegible] প্রতিষ্ঠি[illegible] কিন্তু তবুও তাহাতে সব থাকিলেও একটি গুণের অভা[illegible] অনিবার্য্য হয়, তাহাতে সুস্বাদ থাকে না। তেমনই কাহারও কাহারও ব্যবহারে কোনরূপ ত্রুটি থাকে না বটে, কিন্তু ব্যবহারে যে একটা আগ্রহ স্বভাবতঃ দেখা যায়, এ ক্ষেত্রে সে তাহারই অভাব লক্ষ্য করিত। সে তাহার পিত্রালয়ে ও মাতুলালয়ে গৃহিণীদিগের স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে যে ভাব তাঁহাদিগের ব্যবহারে লক্ষ্য করিয়াছে এবং যাহা সে স্বাভাবিক বলিয়া মনে করিতেই অভ্যস্ত হইয়াছে—নীরেন্দ্রের ও রেণুর ব্যবহারে তাহারই অভাব দেখিত। অথচ সে অভাব কি, তাহা কাহাকেও বুঝান যায় না এবং সে বিষয়ে তাহার সন্দেহ সে কাহাকেও বলিয়া, সে সম্বন্ধে কিছু [illegible] করিতে পারে না।

কণা সেই ভাবেই অভ্যস্তা বলিয়া তাহা যেমন সে ক্য করিতে পারে নাই, তেমনই তাহাকে সে কথা জিজ্ঞাসা রিলে নিষ্ফল হইত, সন্দেহ নাই। অশোকের সম্বন্ধেও াহাই বলিতে হয়।

রেণু তাহার স্নেহে অমলাকে আকৃষ্ট করিয়া, কুম্ভকার মন মৃত্তিকা কর্দ্দমে পরিণত করিয়া তাহা ইচ্ছামত গঠন রিতে পারে, তেমনই অমলাকে তাহার ইচ্ছামত ড়িয়া তুলিতে লাগিল। পূর্ণিমার মৃত্যুর পর—তিনি াগকাতর হইবার পর হইতেই—নীরেন্দ্রের যে সব কাযের ার বাধ্য হইয়াই তাহাকে লইতে হইয়াছিল, সে প্রথমে ই সব অমলাকে বুঝাইয়া দিতে লাগিল। অমলা অল্প নের মধ্যেই সে সব ভার গ্রহণের যোগ্যতা অর্জ্জন করিল শ্বশুরের পক্ষে সে অপরিহার্য্য হইয়াই উঠিল।

দিবেন—

নীরেন্দ্রও স্নেহের নূতন অবলম্বন পাইয়া প্রীতি

মৃণালিনী

কণা শ্বশুরালয়ে যাইবার পূর্ব্বে হইতেই অশোক

না। তুমি চল

াহার অধ্যয়ন লইয়া ব্যাপৃত থাকিত।

আছেন।"

নিঃসঙ্গতা অনুভব করি সেই

তিনি অন্য কক্ষে—

ব অনেকটা পূর্ণ হইল। যে দিন

বসিবেন, তথায় গমন করিবে

রেন্দ্র যখন বেড়াইতে যাইত,

সকলের আহার শেষ হ

যাইত। অশোক সকল দিন

আপনি যদি স্থির ক'রে থাকে

টে, কিন্তু যে দিন সে যাইত,

না, তবে আমরা এখনই

া যাইত না। রেণু না যাইবার

মৃণালিনী বলিলেন

দেখাইত, তাহাই সে অবজ্ঞা করিত—

হ'বে। তোমা

ামার হাজার কারণ ত, মা, থাকৃতেই পারে!

হ'ক।"

কিন্তু সব চেয়ে যেটা বড় কারণ—সেটা তুমি উপেক্ষা করতে ারবে না। সেটা—তোমার ছেলের আবদার।" ইহার পর আর কিছু বলা যায় না—স্নেহের অত্যাচার সকল ত্যাচার অপেক্ষা ভীষণ হইলেও তাহা হইতে মানুষ ব্যাহতি পায় না—বুঝি অব্যাহতি লাভ করিতেও চাহে ।। বিশেষ সে যাইবে না বলিলে, অশোক যখন সেও াইবে না বলিয়া অভিমানভরে যাইয়া মা'র শয্যায় শুইয়া ড়িত, তখন রেণুকে বলিতেই হইত—"আচ্ছা, চল যাই।"

অশোক যে দিন সঙ্গে থাকিত, সে দিন প্রায়ই যাইবার ফিরিবার পথে হয় কণার গৃহে, নহে ত মৃণালিনীর যাওয়া হইত; সেই সে ব্যবস্থা করিত।

অশোক অমলাকেও শিখাইয়া দিয়াছিল, মা যাইবেন না বলিলেই সে যেন তাঁহাকে না ছাড়ে। "বার মাস ত্রিশ দিন ঘরে বন্ধ—একটু বার হ'বেন না। কেন? আমাদের সম্বন্ধে মা'র কর্ত্তব্য আছে, মা'র সম্বন্ধে বুঝি আমাদের কোন কর্ত্তব্য নাই?" সে স্ত্রীকে বলিত—"তুমি জিদ করলে মা'কে যেতে হ'বেই। আমি জিদ করলে ত মা কখন না বলতে পারেন না! নিশ্চয়ই আমি মা'কে যেমন ভালবাসি, তুমি তেমন ভালবাস না।"

সে কথা কিন্তু অমলা স্বীকার করিত না। রেণুকে কি ভাল না বাসিয়া থাকা যায়? পিত্রালয় হইতে আসিয়া সে যে কখন মা'র অভাব অনুভব করিতে পারে নাই, সে যে রেণুর অসাধারণ স্নেহে। তবে অশোকের মত অভিমান সে করিতে পারিত না। অশোকের ব্যবহারে মনে হইত, সেই মা'র সব স্নেহ আত্মসাৎ করিতে চাহে। তাহার সব পরামর্শ মা'র সঙ্গে—যেন সে এখনও মা'র ছোট্ট ছেলেটি। সে কথা কেহ বলিলে সে বলিত, "আমি ত মা'র ছেলে—ছোটই হই, আর বড়ই হই, মা'র ছেলে। মা কি কখন আমার উপর রাগ কর্‌তে পারেন? তিনি কি আমার ব্যবহারে বিরক্ত হ'তে পারেন? আমি যখন বঙ্কিম বাবুর 'কমলাকান্তের দপ্তর' পড়ি, তখন একটা কথা শিখেছিলাম—'মাতৃহীনের জীবনে কাজ কি'?"

অমলার কোন দ্রব্যের প্রয়োজন হইলে রেণু যখন সে কথা নীরেন্দ্রকে জানাইতে বলিত, তখন তাহা শুনিলে অশোক বলিত, "কেন? আমি ত কখন কোন জিনিষের জন্য বাবাকে বলি নি!"

অমলা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "মা'কেই বল্‌তে?"

"বল্‌তাম! এখনও বলি। বিয়ের পর মা বল্‌লেন, 'তুমি মাসে মাসে কিছু টাকা নিও—ইচ্ছামত খরচ কর্‌বে।' আমি ত প্রথমে কারণ বুঝতে পার্‌লাম না; তা'র পর বুঝলাম, যদি তোমার জন্য কিছু খরচ করি। আমি মা'কে বলেছিলাম, 'যা দরকার হ'বে, তোমাকে বল্‌ব—আমি টাকা নেব কেন? তাই মা তোমাকে টাকা দেন।"

"কিন্তু কোন জিনিষ বাবার কাছে চাইলে তিনি যে কত আনন্দ করেন!"

"বেশ ত—বাবাকে বল্‌বে, মা তাঁ'কে ঐ কথা বল্‌তে বলেছেন।"

অমলা লক্ষ্য করিত, কণা স্বয়ং মা হইলেও রেণুর কাছে

ছোট মেয়েটির মতই আব্দার করিত; আর রেণু হাসি-মুখে তাহার ও অশোকের সব আব্দার পূর্ণ করিত। অশোক এক দিন তাহাকে বলিয়াছিল, "দিদির আর আমার মা'র কাছে আব্দার দেখে তোমার হিংসা হয় না?"

অমলা স্বীকার করিয়াছিল, হিংসা হয়।

এই ভাবে দিন কাটিতেছিল। অনেকেই মনে করিত, নীরেন্দ্রের সংসারে সুখের সীমা নাই—রেণু সর্ব্বতোভাবে সুখী। কিন্তু তিন জন জানিতেন, তাহা নহে। নীরেন্দ্র সর্ব্বদাই অনুভব করিত—তাহার এক মুহূর্ত্তের ভুলে সে যে জীবনব্যাপী দুঃখ ভোগ করিতেছে, তাহা হইতে তাহার অব্যাহতি নাই। যে তাহাকে ক্ষমা করিলে সে অব্যাহতি লাভ করিত—সে তাহাকে ক্ষমা করে নাই। সে যৌবনে ইংরেজীতে পাঠ করিয়াছিল—সমুদ্র হইতে মানুষের হস্তের মত ক্ষুদ্র যে মেঘ উঠে, তাহা আকাশ আচ্ছন্ন করিতে পারে। সে সর্ব্বদা ভয় করিত, কবে তাহার ভাগ্যে সেই-রূপ মেঘ দেখা দেয়। সেই মেঘের বক্ষে বজ্রানল থাকিতে পারে—তাহা যে কোন মুহূর্ত্তে সব ধ্বংস করিয়া দিতে পারে। রেণু জানিত, সে সুখী নহে—সে জীবনে সুখী হইতে পারিবে না। তাহার জীবনে সুখী হইবার সুযোগ বহুবার আসিয়াছে,কিন্তু সে-ই সুযোগ প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। সে যদি ভুলিতে পারিত, তবেই সে সব সুযোগ গ্রহণ করা তাহার পক্ষে সম্ভব হইত। কিন্তু সকলে ভুলিতে পারে না; তাই যে বিস্মৃতিতে সুখ, তাহারই অভাবে তাহারা দুঃখ ভোগ করে। যাহারা আপনাদিগের দুঃখের কারণ দৃঢ়হস্তে পাষাণকঠিন হৃদয়ে ক্ষোদিত করে, তাহারা আর তাহা মুছিয়া ফেলিতে পারে না। রেণুর তাহাই হইয়াছিল। সে সেই জন্যই আপনার সমগ্র জীবন স্বতন্ত্রভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল। কর্ত্তব্যে মানুষ আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারে—সুখলাভ করিতে পারে না। আর এক জন তাহা জানিতেন। তিনি মৃণালিনী। মৃণালিনী জানিতেন, যে ভুল হইয়াছে, তাহার আর সংশোধনোপায় নাই। যাহা অনিবার্য্য, তাহা সহ্য করা ব্যতীত উপায় নাই, কিন্তু তাহাতে অসুখের নিবৃত্তি হয় না। যে দৃঢ়তায় রেণু তাহার পুত্রকে তাঁহাকে দিয়াছে, যে সেই দৃঢ়তার অধিকারী, তাহাকে বুঝাইয়া কিছু করা যায় না। কিন্তু রেণু যে সুখী হয় নাই, এ দুঃখ সর্ব্বদাই তাঁহাকে পীড়িত করিত। কণা, অশোক, কণার কন্যা—এ সবই বন্ধন এবং তাহারা রেণুকে [illegible] করিতে চেষ্টা করিত। কিন্তু মৃণালিনী জানিতেন, [illegible] দেবদত্তকে পর করিয়া দিয়াছে, এ সব বন্ধন কখনই তাহা[illegible] বদ্ধ করিতে পারিবে না। দেবদত্তকে সে কত ভালবাসি[illegible] তাহা তিনি দেবদত্ত নিকটে আসিলে রেণুর মুখভা[illegible] বুঝিতে পারিতেন।

দেবদত্ত সর্ব্ববিষয়ে যেরূপ হইয়াছিল, তাহাতে [illegible] যে তাহাকে পুত্র বলিয়া বক্ষে লইতে চাহিল না, ই[illegible] মৃণালিনীর পক্ষে দুঃখের কারণ হইয়াছিল। রেণু [illegible] তাঁহাকেই উপযুক্ত পাত্র মনে করিয়া তাহার পুত্রকে দিয়[illegible] ছিল, তাহা মৃণালিনী সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিতেন এবং তা[illegible] স্মরণ করিয়াই যেন দ্বিগুণ সতর্কতা ও যত্ন-সহকারে তাহা[illegible] "মানুষ" করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেন। তিনি যে তাহা[illegible] শিক্ষা দিবার জন্য আপনিও শিক্ষা করিয়াছেন তা[illegible] রেণুও দেখিয়াছে। কিন্তু রেণুও বুঝিতে পারে নাই—কাহার প্রতি স্নেহহেতু তিনি তাহা করিতেন। তাহা রেণু[illegible] জানিতে পারে নাই।

রেণু আরও একটি কথা জানিতে পারে নাই—সে যেম[illegible] মনে করিতেছিল, অশোকের বিবাহ হইয়া গিয়াছে—বধূকে সে তাহার শ্বশুরের কার্য্যভার দিয়াছে, সংসারে[illegible] কাযও শিখাইয়াছে—এই বার সে মুক্তির সন্ধান করিবে মৃণালিনীও তেমনই মনে করিতেছিলেন, দেবদত্তের বিবা[illegible] দিয়া, বধূকে দেবসেবার ভার প্রদান করিয়া তিনি কোন তীর্থস্থানে বাস করিবেন—তাঁহার মাতামহীর প্রতিষ্ঠি[illegible] যে দেবালয় জগন্নাথক্ষেত্রে ছিল, হয়ত তথায় যাইবেন তিনি মনে করিয়াছিলেন, তিনি যখন সর্ব্বতোভাবে ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করিতে যাইবেন, তখন রেণুই প্রয়োজনে দেবদত্তকে দেখিবে—সে তাহার জননী।

এই সময় কণা এক দিন বলিল, "দিদিমা, তোমার উদ্যোগেই ত অশোকের বিয়ে হ'ল—এই বার দেবুর বিয়ে দাও।"

মৃণালিনী বলিলেন, "মনের কথা টেনে বলেছ, দিদি! আমি কেবলই ঐ কথা ভাবছি; কিন্তু কোন দিকে কেউ বলছে না ব'লে সাহস পাচ্ছি না।"

কণা হাসিয়া বলিল, "দিদিমা, তা' হ'লে আপনার ভয় আছে?"

"তা' আবার নেই! এই দেখ না, তোমাদের কত ভয় রি—পাছে রাগ কর।"

তাহার পর তিনি বলিলেন, "মা কি বলে?"

"আপনি মা'র মা—আপনার উপর কি আর কা'রও থা থাক্‌তে পারে?"

"লুচি খাবার জন্য বুঝি আমাকে এত তোষামোদ!"

"না, দিদিমা, দেবুর বিয়ে দাও।"

"আমি একা দেব—না তোমরা সকলে দিবে?"

"তাই হ'বে—আপনার মত হ'লেই হয়।"

"আমার ত 'সেধো, ভাত খাবি? হাত ধুয়ে বসে াছি।' এখন ক'নে খোঁজ।"

"ক'নে আমি খোঁজ করব। সে এক রকম ঠিক ক'রেই রেখেছি।"

"কে?"

"অমলার ভগিনী হ'লে হ'বে না?"

"বোধ হয় ভালই হ'বে।"

"অমলা যেমন হয়েছে, তা'তেই ত আমার ইচ্ছা আর কটিকেও আনি।"

"হাঁ, প্রথমে ভাবনা থাকে—কি রকম হ'বে। তোমরা 'বার আগে যখন মোটর গাড়ী চল হয় নি, তখন রেণুর াবার একটা ঘোড়া কিনে আন্‌বার পর দেখা গেল দুষ্ট— ধ্যে মধ্যে 'জমে' যায়—দাঁড়ালে চল্‌তে চায় না। তাই তামার বড় দাদা বাবু ঠাট্টা ক'রে বলেছিলেন,

'ঘড়ী আর ঘোড়া
বরাতে হয় খোঁড়া'

—এক একটা ঘড়ী যেমন এক একটা ঘোড়াও তেমনই উৎরে' যায়; বধূ সম্বন্ধেও তা'ই।"

কণা হাসিল, বলিল, "কিন্তু বধূর সম্বন্ধে একটা কথা বল্‌তে হয়—'গাধা পিটিয়ে যেমন ঘোড়া করা চলে, তেমনই শাশুড়ীর গুণ থাক্‌লে বধূ মনের মত ক'রে গড়তে পারেন। সে গুণ আমার মা'র আছে—আর তাঁ'র শুরুমশায়ের ত কথাই নাই।"

"আমি ত তোমার কথায় সম্মতিই দিয়েছি—তবে নার আমায় এত তোষামোদ করা কেন?"

"নাঃ—আর আপনার তোষামোদ করব না; যাই, মা'র তোষামোদ করি।"

"এখনই কি মা'র কাছে যা'বে?"

"যা'ব।"

"নীরেনকে ব'লে দেখ।"

"কেন, আপনি কি আপনার জামাইকে জানেন না? তিনি কি আবার আপত্তি করবেন?"

"ছেলে মেয়ে বল্‌লে সে কিছুতেই 'না' বল্‌তে পারে না, বটে।"

মৃণালিনীর গৃহ হইতে কণা পিতৃগৃহে গেল এবং যাইয়াই রেণুকে বলিল, "মা, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।"

রেণু বিস্মিতভাবে কণার দিকে চাহিল, যে সদানন্দ সে এমন গম্ভীরভাবে কি বলিবে? সে জিজ্ঞাসা করিল, "কি কণা?"

"আমি দিদিমা'র কাছ থেকে আসছি, তাঁ'কে সম্মত করিয়ে এসেছি—এখন তোমাকে মত দিতেই হ'বে।"

"ব্যাপারটা কি?"

"দেবুর বিয়ে দিতে হ'বে।"

ক্ষণেকের জন্য রেণু যেন নির্ব্বাক্—স্তম্ভিত হইয়া রহিল। তাহার মনের মধ্য দিয়া কত কথা, কত ভাব অতি দ্রুত চলিয়া গেল, তাহার পর কত আশঙ্কা! তাহার মুখ যেন রক্তশূন্য হইয়া গেল।

দেখিয়া কণা শঙ্কানুভব করিল।

কিন্তু প্রবল চেষ্টায় সে ভাব দমিত করিয়া রেণু বলিল, "সে কথা আমাকে বলা কেন, কণা।"

"দিদিমা বল্‌লেন।"

রেণু ততক্ষণে আপনাকে সংযত করিয়া লইয়াছে, সে হাসিয়া বলিল, "বিয়ে ক'বে?

"কেন, সেই গল্প ত জান। রাজপুত্র এক মেয়ে দেখে এসে মন্ত্রীকে বল্‌লেন, 'আপনি বাবাকে জিজ্ঞাসা করুন, তিনি আমার বিয়ে দিবেন কি দিবেন না; যদি দেন, তবে আজ দিবেন, কি কাল দিবেন।"

তাহার কথা বলিয়া কণা যখন চলিয়া গেল, তখন রেণু ভাবিতে লাগিল—সে ভাবনার যেন অন্ত নাই।

[ক্রমশঃ।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

বৈষ্ণবমত-বিবেক

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

শ্রীল সনাতনের শিষ্য-সম্পদ

শ্রীল সনাতনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিষ্য শ্রীরূপ গোস্বামী। কিন্তু শ্রীরূপকে শ্রীল সনাতন নিজের কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবোধে স্নেহ করিতেন এবং শ্রীচৈতন্যদেবের অসীম কৃপাপাত্র বোধে তাঁহাকে শ্রীচৈতন্যদেবের অভিন্ন-তনু বলিয়া মনে করিতেন। তিনি নিজকেও শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপাভাজন বলিয়া জানিতেন এবং এইজন্য দুই ভ্রাতাই যেন একাত্মা ছিলেন। অথচ শ্রীরূপও শ্রীসনাতনকে শ্রীচৈতন্যদেবের অভিন্নবপু বলিয়া মনে করিতেন। এই দুই জনের মধ্যে যে কি অলৌকিক প্রীতি ছিল, তাহা উপলব্ধি করা ক্ষুদ্র জীবের পক্ষে অসম্ভব। শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী, শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর সহিতও শ্রীল সনাতন গোস্বামীর এই সম্বন্ধ ছিল। ইঁহারা সকলেই শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীকে গুরুর ন্যায় ভক্তি করিতেন এবং সনাতন গোস্বামী ইঁহাদিগকে কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় স্নেহ করিতেন। এই ছয় গোস্বামী ছয় জন ভগবৎপার্ষদ যেন এক বৃন্তে ছয়টি সুগন্ধি স্বর্গীয় কুসুম। ইঁহাদের মধ্যে শ্রীসনাতন যে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক উভয় রূপেই তুল্য ভাবে দক্ষ ছিলেন তাহা আমরা বলিয়াছি ; কিন্তু শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া তাঁহার ব্যবহারিক ও পারমার্থিক এক হইয়া গিয়াছিল। 'ভক্তমালে' একটি উপাখ্যানে দেখিতে পাওয়া যায় যে, একদা বর্দ্ধমান জিলার মানকর গ্রামের জীবন নামক একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ অর্থপ্রাপ্তি কামনায় ৺কাশীধামে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে ধর্ণা দিয়া পড়িয়া থাকেন। বিশ্বেশ্বর কৃপা করিয়া স্বপ্নে তাঁহাকে আদেশ করিলেন যে, 'শ্রীবৃন্দাবন ধামে সনাতন নামে এক সাধু আছেন, তুমি তাঁহার নিকট গমন কর, তাঁহার নিকট স্পর্শমণি আছে, তিনি কৃপা করিলে তোমার দারিদ্র্য-দুঃখ দূর হইবে।' তিনি ৺কাশীধাম হইতে শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিয়া সনাতন গোস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিলে এবং তাঁহাকে বিশ্বেশ্বরের স্বপ্নাদেশের কথা জ্ঞাপন করিলেন। সনাতন একদিন যমুনা স্নান করিবার সময় যমুনাতীরে একটি স্পর্শমণি পাইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি উহা না আনিয়া যমুনাতীরেই একস্থানে প্রোথিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। পরে অনেকদিন চলিয়া যাওয়ায় সে কথা তাঁহার মনে ছিল না। ব্রাহ্মণ বিশ্বেশ্বরের স্বপ্নাদেশের কথা বলিলে স্পর্শমণির কথা তাঁহার মনে পড়িল। তিনি ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়া যমুনাতীরে যাইয়া দূর হইতে ঐ স্থানটি দেখাইয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ ঐস্থানে খনন করিয়া স্পর্শমণিটি পাইয়া উহা লৌহে স্পর্শ করাইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, উহা বাস্তবিকই স্পর্শমণি। অনন্তর ব্রাহ্মণ পরমানন্দে ঐ স্পর্শমণি গ্রহণ করিলেন এবং সনাতনকে প্রণাম করিয়া গৃহের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করিলেন।

পথ চলিতে আরম্ভ করিয়াই ব্রাহ্মণ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, "এই ব্যক্তি আমাকে স্পর্শমণিটি দিবার সময় উহা স্পর্শও করিলেন না। অতএব ইনি নিশ্চয়ই স্পর্শমণি অপেক্ষা অধিকতর সম্পদের অধিকারী। ইনি যে ধন পাইয়া এই সর্ব্বরত্ন-শ্রেষ্ঠ স্পর্শমণিকেও তুচ্ছ করিতে পারিয়াছেন আমি তাঁহার নিকট সেই ধন না চাহিয়া এই স্পর্শমণি পাইয়া সন্তুষ্ট হইলাম! আমাকে ধিক্!" এই ভাবিয়া ভাগ্যবান-জীবন পুনরায় সনাতনের নিকট সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধন-প্রাপ্তির আশায় তাঁহার নিকট ফিরিয়া চলিলেন। একমাত্র সাধুসঙ্গের অচিন্ত্য প্রভাবে তিনি যাহা পাইলে অন্য কোন ধনের কামনা থাকে না, সেই পরমার্থের মহিমাও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন। তিনি সনাতনের নিকট আসিয়া বলিলেন—"ঠাকুর! তোমার স্পর্শমণি নিয়া আমার কায নাই, তুমি যে ধন পাইয়া স্পর্শমণিকেও তুচ্ছ করিতে পারিয়াছ আমাকেও সেই ধনে ধনী কর।" ব্রাহ্মণ এই বলিয়া সনাতনের চরণে শরণাগত

হইলেন। সনাতন বলিলেন—"তুমি যদি সে ধন চাও, তবে তোমাকে এ স্পর্শমণি যমুনায় ফেলিয়া দিয়া আসিতে হইবে।" ব্রাহ্মণ সনাতনের কথা শুনিয়া স্পর্শমণি যমুনাতে ফেলিয়া দিলেন। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "স্পর্শমণি" কবিতায় এই কাহিনীর যে মাধুর্য্য পরিস্ফুট করিয়াছেন, তাহার সমাপ্তির চারি ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি :—

"যে ধনে হইয়া ধনী, মণিরে মান না মণি
তাহারি খানিক
মাগি আমি নত শিরে, এত বলি নদীনীরে
ফেলিলা মাণিক ॥"

সনাতন বুঝিলেন যে, তাঁহার প্রাণের ধনে ধনী হইবার অধিকার এই ব্রাহ্মণের হইয়াছে। সনাতন অবশেষে ব্রাহ্মণকে দীক্ষাদান করিয়া মহামন্ত্রের অধিকারী করিলেন। শুনিতে পাওয়া যায় যে, এখনও এই জীবনের বংশ কাস-মাগুরা গ্রামে গোস্বামী পরিবার-পরিচয়ে সমাজে প্রভুত্ব বংশের অধিকারী হইয়া বিদ্যমান। * এই বংশের এখনও যথেষ্ট বৈষ্ণব শিষ্য আছে।

শ্রীল সনাতন গোস্বামীর পূর্ব্বাশ্রমের পুরোহিতপুত্র পরমভক্ত গোপাল মিশ্র সংসার ত্যাগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে আগমনানন্তর সনাতনের আশ্রয় গ্রহণ করেন। বোধ হয়, গৃহে থাকিতেই তিনি সনাতনের চরিত্রের মহিমায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন। দীনতার অবতার সনাতন তাঁহার নির্ব্বন্ধাতিশয়ে তাঁহাকে দীক্ষা দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। ভক্তিরত্নাকর বলিতেছেন—

"তথা বিপ্র শ্রীগোপাল মিশ্র সুচরিত্র।
সনাতন গোস্বামীর পুরোহিতপুত্র ॥
শ্রীসনাতনের শিষ্য সর্ব্বাংশে সুন্দর।" ৫ম তরঙ্গ

শ্রীনিবাস আচার্য্য ও নরোত্তম ঠাকুর যখন রাঘব গোস্বামীর সহিত শ্রীব্রজমণ্ডলের তীর্থদর্শনে বহির্গত হন, তখন ইনি সনাতনের নন্দীশ্বরে যে ভজন-কুটীর ছিল, সেইস্থানে অবস্থান করিয়া ভজনে নিরত ছিলেন। নন্দীশ্বরে সুপবিত্র পাবন-সরোবরের পার্শ্বস্থ এই কুটীরে শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীরাধিকাজীর দর্শন ও কৃপালাভ করিয়াছিলেন; বোধ হয়, এই জন্যই শ্রীল সনাতন গোস্বামীর নির্দেশ মত তাঁহাদের তিরোভাবের পরেও গোপাল মিশ্র এই স্থানে থাকিয়া ভজনে কালাতিবাহিত করিতেন। এইরূপ নিষ্কিঞ্চন শিষ্যই গুরুদেবের সমগ্র কৃপার অধিকারী হইয়া থাকেন।

শ্রীশ্রীমদনমোহনের কৃপায় তাঁহার সেবাভার পাইয়া যিনি সর্ব্বপ্রথমে মদনমোহনের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেই কৃষ্ণদাস কপূর সনাতনের শিষ্য। তিনি স্বগৃহে মদনমোহন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার সেবায় জীবনের শেষভাগ যাপন করিয়াছিলেন।

শ্রীবৃন্দাবনে কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী নামে আর এক জন ভাগ্যবান্ মহাপুরুষ সনাতনের শিষ্য হইয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমদনমোহনের প্রতিষ্ঠা হইলে ইনিই তাঁহার সেবাভার গ্রহণ করেন। ইঁহার উপর সেবাভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া শ্রীসনাতন গোস্বামী ব্রজমণ্ডলের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশ পালন করিতেন। পুরুষানুক্রমে কৃষ্ণদাসের শিষ্যবংশধরেরা এখনও করৌলীতে ও শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীশ্রীমদনমোহনের সেবা করিয়া আসিতেছেন। শ্রীমন্মদনমোহন যতদিন পর্য্যন্ত শ্রীবৃন্দাবন ত্যাগ না করিয়াছিলেন, ততদিন বিরক্ত বৈষ্ণবগণের দ্বারাই সেবিত হইতেন। * শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ যখন লিখিত হয়, তখন গোসাঞিদাস বা গোস্বামিদাস মদনমোহনের সেবা করিতেন। †

উড়িষ্যাভাষায় লিখিত "নিরাকার সারস্বত" প্রচুর গ্রন্থকার অচ্যুতদাস লিখিতেছেন যে, শ্রীচৈতন্যদেবের আদেশে ৺পুরীধামে অবস্থান কালে শ্রীল সনাতন গোস্বামী তাঁহার কর্ণে মন্ত্র দিয়াছিলেন। কিন্তু নিরাকার সারস্বত গ্রন্থে যে ধর্ম্মমতের অভিব্যক্তি দেখিতে পাই, তাহার সহিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতের কোনও সামঞ্জস্য নাই।

---

* শ্রীমদনমোহনের সেবাই এই ত্যাগী বৈষ্ণবগণের নাম শিষ্যানুক্রমে এইরূপ :—১। সনাতন গোস্বামী ২। কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী ৩। পূজারী গোপাল দাস ৪। চন্দ্রগোস্বামী ৫। গোস্বামী দাস ৬। বংশীদাস ৭। কিশোরী দাস ও ৮। সুবলানন্দ; সুবলানন্দই আওরঙ্গজেবের অত্যাচার ভয়ে ঠাকুরকে লইয়া শ্রীবৃন্দাবন হইতে পলায়ন করেন।

† "মদনগোপালে গেলাও, আজ্ঞামাগি করে। দর্শন করিয়া কৈলুঁ চরণবন্দন। গোসাঞি দাস পূজারী করেন চরণ-সেবন।" —আদি ৮ম

শ্রীশ্রীবৃন্দাবনরহস্য—শ্রীরামযাদব বাগচি প্রণীত (৫৬ পৃঃ)

কেহ কেহ প্রকাশ করিয়াছেন, শ্রীল সনাতন গোস্বামীর রঘুনন্দন নামে একজন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। সেই রঘুনন্দনের পুত্রও সনাতনের শিষ্য বলিয়া ইঁহারা দাবী করেন। রঘুনন্দনের বংশধররা গোস্বামী উপাধি ধারণ করেন এবং সনাতন গোস্বামীর পরিবারভুক্ত বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। কিন্তু কোনও বৈষ্ণবগ্রন্থে ইঁহাদের দাবীর সমর্থক কোনও প্রমাণ এ পর্য্যন্ত মিলে নাই।

শ্রীরূপকে ছাড়িয়া দিলে সনাতনের সর্ব্বাপেক্ষা স্নেহপাত্র তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র শ্রীজীব। যদিও শ্রীজীবকে ইনি শ্রীরূপের দ্বারা দীক্ষা দিয়াছিলেন, তথাপি শিক্ষা ব্যাপারে শ্রীজীব যে কি পরিমাণে ইঁহার স্নেহের ভাগী হইয়াছিলেন "লঘুতোষণী"তেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্রীসনাতন শ্রীভাগবতের দশমের যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ টীকা রচনা করেন, এই "লঘুতোষণী" সেই বৃহত্তোষণীরই বিকৃতস্বরূপ। লঘুতোষণী নামে "লঘু" হইলেও আকৃতিতে লঘু নহে বরং বহুস্থানে বৃহত্তোষণী হইতেও গুরুতরা। ইঁহার জীবন শ্রীপাদ সনাতন সংক্ষেপে স্থানে স্থানে যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, শ্রীজীবকে তাহার মর্ম্ম উদ্ঘাটন করিবার জন্য অনেক স্থানে বিস্তৃত করিতে হইয়াছে। সনাতনের গ্রন্থাবলীর অনেকাংশ শ্রীজীবকে লিখিতে হইয়াছে। এইরূপে শ্রীজীব তাঁহার জ্যেষ্ঠতাতের যে প্রসাদলাভ করিয়াছিলেন, তাহার তুলনা নাই। আমরা শ্রীজীবের জীবনী প্রসঙ্গে এই সকল কথার আলোচনা করিব।

শ্রীল সনাতন গোস্বামীর আর একজন শিষ্য ছিলেন। তাঁহার নাম রাজেন্দ্র। অনেকে ইঁহাকে সনাতনের পুত্র বলিয়া মনে করেন। কিন্তু কোনও বৈষ্ণবগ্রন্থে তাঁহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ইঁহাকে উপশাখা আখ্যায় অভিহিত করা হইয়াছে। সম্ভবতঃ ইনি সনাতন গোস্বামীর নিজের ভ্রাতুষ্পুত্র বা জ্ঞাতিভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। একদা শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীমতীর বিরহ বা মাথুর লীলাগান হইতেছিল। ইনি ভাবাবেশে উন্মত্ত হইয়া মথুরা হইতে শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া আসিতেছি বলিয়া ধাবিত হন। কিছুদূর যাইয়া ভূমিতে পতিত হইয়া স্বধামে গমন করেন। শ্রীরাধাকুণ্ড হইতে শ্রীল গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে যাইবার পথে ইঁহার সমাধি বিদ্যমান। ভক্তিরত্নাকরে রাজেন্দ্র গোস্বামীকে শ্রীসনাতন গোস্বামীরই শিষ্য বলা হইয়াছে, ঐ গ্রন্থে কৃষ্ণমিশ্র গোস্বামী, শ্রীভগবন্ত দাস গোস্বামীকেও শ্রীপাদ সনাতনের শিষ্য বলা হইয়াছে। ইঁহারা নিশ্চয়ই শ্রীবৃন্দাবনবাসী সাধনপরায়ণ বৈষ্ণব ছিলেন। *

ব্রজবাসিগণের প্রতি সনাতনের যে প্রকার সগৌরব স্নেহ ছিল, তাহাতে ব্রজবাসিগণের মধ্যে তাঁহার বহু শিষ্য ছিল বলিয়া অনুমান হয়। ভক্তিরত্নাকরে কানাইয়া নামে এক ব্রজবাসী বিপ্রের পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীরূপ সনাতনের প্রতি তাঁহার নিরতিশয় ভক্তি ছিল। তিনি নিরন্তর এই দুই ভাইয়ের নিকট অবস্থান করিতেন এবং পরম ভক্তিভরে যে দিন ফলমূল শাকাদি যাহা মিলিত, এই দুই ভ্রাতার বাসায় পৌঁছিয়া দিতেন। একদিন নিজে শ্রীকৃষ্ণ কানাইয়ের রূপ ধরিয়া শ্রীল সনাতনকে মাধুকরী ভিক্ষা দিয়াছিলেন। শ্রীসনাতন গোস্বামীর তিরোভাবে ইনি এতই দুঃখিত হইয়াছিলেন যে, ইনি জীবন ত্যাগের পর্য্যন্ত সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীরূপ সনাতনের কৃপায় ইঁহার প্রাণবিয়োগ হয় নাই। যতদূর বুঝিতে পারা যায় তাহাতে এই ব্রাহ্মণটিও সনাতনের কৃপাপাত্র বলিয়া মনে হয়। ব্রজবাসিগণের মধ্যে শ্রীসনাতন গোস্বামীর এতাদৃশ বহু কৃপাভাজন ছিলেন। মহাপ্রভুর আদেশ ছিল যে, পশ্চিমের মূঢ় অনাচার লোকের মধ্যেই ধর্ম্ম ও সদাচার প্রচার করিতে হইবে, সনাতন গোস্বামী ব্রজবাসিগণের সেবাবুদ্ধিতে সর্ব্বপ্রযত্নে শ্রীচৈতন্যদেবের এই আদেশ পালন করিয়াছিলেন।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু (এম, এ, বি, এল)

---

* তাঁর শাখা শ্রীরূপ গোস্বামী সর্ব্বোপরি।
শ্রীরাজেন্দ্র গোস্বামী কৃষ্ণাখ্য ব্রহ্মচারী॥
কৃষ্ণমিশ্র গোস্বামী অদ্ভুত ক্রিয়া যাঁর।
গোস্বামী শ্রীভগবৎ দাসাদি প্রচার।

ভক্তিরত্নাকর ষষ্ঠ তরঙ্গ।

[উপন্যাস]

২৫

সুকুমার পিতার পানে চাহিয়া কহিল, "বাবা আমি বিলেতে থাকতে যা জানতে পারতুম, এখানে দেখছি তার সব বিপরীত।"

মিত্র সাহেব কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তার পর কহিলেন, "তখন যা জেনেছিলে তাও সত্যি, এখন যা জানছ এও সত্যি।"

অসহিষ্ণু কণ্ঠে সুকুমার কহিল, "মিঃ রায়ের সঙ্গে তা হ'লে লেখার বিয়ে হবে না?"

মিত্র সাহেব কহিলেন, "না।"

পিতার এই সংক্ষিপ্ত উত্তরটা সুকুমারের সমস্ত অন্তরকে ভয়ানক বিরক্ত করিয়া তুলিল। উত্তাপের সহিত সে কহিল, "যতদূর ব্যাপারটা এগিয়েছিল তার পর এমনি করে হঠাৎ বিয়েটা বন্ধ হ'লে, লোকের চোখে কি সেটা বিশ্রী ঠেকবে না? আপনি লেখাকে বুঝিয়ে বলুন। মিঃ রায়ের সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় না থাকলেও তিনি যখন শুনছি পাটনায় এসেছেন, তখন তাঁর সঙ্গে দেখা করে আমি এ বিষয়ে কথা কইব। কথা কইবার আমার একটা দাবী ত আছে।"

মিত্র সাহেব শুধু একটুখানি হাসিলেন। পুত্রের চেষ্টা যত প্রবলতরই হউক, সবই যে নিষ্ফল, সে নিরাশার বাণীটা আর তিনি সুকুমারকে বলিলেন না।

বয় কার্ড আনিল; মিঃ রায়, বার-এট-ল।

মিত্র সাহেব আশ্চর্য্য হইলেন। তাঁহার গৃহে শৈলর আগমনের এ প্রথা তো বহুদিন উঠিয়া গিয়াছে। ইচ্ছা করিয়া শৈল এ দূরত্বটুকু টানিল, তাহা তিনি বুঝিয়াছিলেন। সাক্ষাতের সম্মতি দিয়া পুত্রের পানে চাহিয়া তিনি কহিলেন, "শৈল এসেছে।"

শৈল কক্ষে প্রবেশ করিল। স্বাগত সম্ভাষণের পূর্ব্বেই মিত্র সাহেব ব্যগ্রকণ্ঠে কহিলেন, "শৈল, তোমার এত খারাপ দেখাচ্ছে কেন, অসুখ করেছিল?"

"হাঁ, পাটনায় এসেই আমার জ্বর হয়েছিল। সেটা ছাড়তে তবে বার হতে পেরেছি।"

মিত্র সাহেব বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "কই, আমি তো কিছু জানতুম না। তুমি এসেছ শুনেছি, সুকু এসেছে, আমি একটু ব্যস্ত ছিলুম।"

সুকুমারের পানে চাহিয়া একটা অভিবাদন করিয়া শৈল একটুখানি হাসিল। কহিল, "আমরা যখন ইংলণ্ডে ছিলুম, তখন পরস্পরে পরিচিত হলেও বন্ধুত্বটা এমন নিকট হবে তা জানতুম না।"

প্রত্যভিবাদন করিয়া সুকুমারও হাসিল। শৈল তাহার বিলাতের অনেক কীর্ত্তি জানিত, চোখের ইঙ্গিতে সব নিষেধ করিয়া ভাল মানুষটির মত সুকুমার গল্প জুড়িয়া দিল।

মিত্র সাহেব অন্যমনে কি চিন্তা করিতেছিলেন, হঠাৎ মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করিলেন, "শৈল, ব্রজর বিষয় সম্বন্ধে সব বন্দোবস্ত তো শেষ হয়ে গেছে?"

শৈল কহিল, "এক রকম প্রায়। বাড়ীখানা যাতে না যায়, সেই চেষ্টা কচ্ছি। বিশ্বাস, যাবেও না।"

"ব্রজর মেয়ের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা কল্লে?"

মিত্র সাহেব রুদ্ধনিশ্বাসে শৈলর মুখের পানে চাহিলেন।

বিলীনপ্রায় দিবালোকের পশ্চাতে অন্ধকার-যবনিকা নামিয়া আসিলে. তাহার উপর অকস্মাৎ যে রক্তাভা দেখা

দেয়, শৈলর সুগৌর মুখখানির উপর তেমনই একটা ম্লান আভা ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল, "তাঁর সম্বন্ধে আমি কিছু করি, এ তিনি পছন্দ করেন না।"

অন্তরের বিস্ময়টা ভব্যতার দুর্গমধ্যে বন্দী রহিল। মিত্র সাহেব কহিলেন, "ছেলে-মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে, তাকে তুমি নিশ্চিত ভাল করে বোঝাতে চেষ্টা পেয়েছিলে?"

শৈল একটু থামিল। একবার ইতস্ততঃ করিল। তার পর কহিল, "না, তিনি বেশ বুদ্ধিমতী, বিষয় সংক্রান্ত জটিল কথাগুলি আমার সঙ্গে বেশ সুন্দর ভাবে আলোচনা মীমাংসা করেছেন। কোথায়ও একটু কুণ্ঠা প্রকাশ করেন নি।"

মিত্র সাহেব নিবদ্ধ দৃষ্টিতে শৈলর প্রতি চাহিলেন।

শৈল কহিল, "আট হাজার টাকায় বাড়ীটা বাঁধা আছে। কতকগুলো জমি-টমী বিক্রী করে কতক টাকা শোধ দিয়েছি। বাড়ীর যত কিছু সাজ-সরঞ্জাম ছিল, সব নিলামে বিক্রী করে, খুচরা দেনা, লোকজনের মাহিনা যা কিছু ছিল, মিটিয়ে দিয়েছি। তেতালাটা বাদ দিয়ে বাড়ীটা আগাগোড়া ভাড়া দিলুম। অত বড় বাড়ী মোটা রকম আয় হয়েছে। সব টাকা যাবে দেনায়। খালি তা হতে পঞ্চাশটি করে টাকা তিনি নিজের খরচের জন্য নেবেন।"

মিত্র সাহেব কহিলেন, "শ্রাদ্ধের খরচা তো তুমি কল্লে?"

শৈল ক্লান্ত-কণ্ঠে কহিল, "না তাঁর গহনা বিক্রী করে সামান্য ভাবেই তিনি করেছেন।"

"তা হলে টাকা-কড়ির সম্বন্ধে সে তোমার কোন—"

মিত্র সাহেব থামিলেন,—তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে শৈলর মুখের দিকে চাহিলেন, সবিস্ময়ে দেখিলেন, শৈলর আয়ত নেত্রে বুদ্ধির সে তীক্ষ্ণতা নাই। তাহার কণ্ঠস্বর যেমন ক্লান্ত, দৃষ্টিও তেমনই শ্রান্ত। বহির্জগতের সবটুকু যেন দেখিয়া লইতে চাহিতেছে না, অন্তর্মুখী হইয়া সে যেন নিজের ভিতর কি একটা খুঁজিতেছে।

শৈলর ঘুমন্ত মনটা হঠাৎ যেন গা-ঝাড়া দিয়া উঠিল। সহসা চমক্‌ভাঙ্গার মত কহিল, "না, তিনি আমার কোন সাহায্য নিলেন না। খালি খানিকটা খাটুনী ছাড়া। আমি তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব করেছিলুম—"

রুদ্ধনিশ্বাসে সপুত্র মিত্র-সাহেব শৈলর মুখের পানে চাহিয়াছিলেন। শৈল কহিল, "অনিলা সম্মতি দিলেন না।"

মিত্র-সাহেবের মনে হইল, কোন রহস্যময় দেবতা তাঁহার সহিত কৌতুক করিতেছেন। তাঁহার মুখ দিয়া বাঙ্-নিষ্পত্তি হইল না। নিষ্পলকনেত্রে তিনি শৈলর মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। শৈল সত্যই তাঁহার সম্মুখে, না তিনি স্বপ্ন দেখিতেছিলেন?

জিনিষের ভিতরটা যে দেখিতে পায় না; ভাবনার বালাই তাহার থাকে না এবং জিজ্ঞাস্যটা হয় যেমনই নিঃসঙ্কোচ, বক্তব্যটা হয় তেমনই স্পষ্ট।

সুকুমার কহিল, "মিস বোস্ কি অন্য কোথাও বাক্‌দত্তা হয়েছেন?"

শৈল সুকুমারের মুখের পানে একবার চাহিল। তার পর একটুখানি হাসিল। এবং তাহাতে সুকুমার যতখানি অপ্রতিভ হইয়া পড়িল, তাহার চেয়ে অনেক বেশী ভিতরে ভিতরে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন মিত্র-সাহেব। তিনি কহিলেন, "তা হ'লে তুমি এখন কি স্থির কচ্ছ?"

"কোন্ বিষয়ে?" বলিয়া মুখ তুলিয়া শৈল সবিস্ময়ে দেখিল, একখানি খদ্দরের সাড়ীতে সাজিয়া একটি খদ্দর-ধারী যুবকের সহিত কথা কহিতে কহিতে সুলেখা অন্য এক কক্ষ হইতে বাহির হইল। সাশ্চর্য্যে শৈল কহিল, "সন্তোষ!"

সন্তোষ কক্ষে প্রবেশ করিয়া হাসিমুখে সকলকে অভিবাদন করিয়া শৈলকে কহিল, "হ্যাঁ আমি, সন্তোষ। আমি মিস্ মিত্রকে নিতে এসেছি। আমাদের সমিতির মিটিংএর উনি আজ প্রেসিডেণ্ট হবেন। তোমার সব খবর ভাল ত? সব হাঙ্গামা সেরেছ?"

"হাঁ, এক রকম মিটেছে।" শৈল আর কোন প্রশ্ন করিল না। অদূরে অবস্থিত সুলেখার পানেও চাহিল না।

মিত্র-সাহেব কন্যার পানে চাহিয়া কহিলেন, "কোন নিষেধই তো শুনবিনি, মা। শুধু এইটুকু ভুলিস নি, তোর সেবা না পেলে বুড় বয়েসে এ প্রাণটুকু বাঁচবে না।"

সুলেখার গম্ভীর মুখখানা মৃদু হাসির আলোয় ঈষৎ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। অভ্যাগতের পানে চাহিয়া একটা ক্ষুদ্র নমস্কার দিয়া সন্তোষের সহিত সে কক্ষ ছাড়িয়া গেল

ভগিনী যখন দৃষ্টির আড়ালে চলিয়া গেল, পায়ের

লাইয়া গেল, সুকুমার তখন ঘুরিয়া পিতার মুখের পানে ছিল। আগুনে পোড়া লোহার মত ভিতরের ক্রোধ হার সুগৌর মুখখানাকে আরক্ত করিয়া তুলিয়াছিল। ক্ত-কণ্ঠে সে কহিল, "এইগুলা কি সব ঠিক হচ্ছে, বাবা?"

"কোন্‌গুলা, সুক?"

সুকুমার মনের দুর্জ্জয় ক্রোধটা নিমেষে যেন বোমার মত ধা হইয়া পড়িল। উত্তেজিত-কণ্ঠে সে কহিল, "যার তার ঙ্গ মিশে লেখার এই ধেই-ধেই করে বেড়ান?"

মিত্র-সাহেব কহিলেন, "যার তার সঙ্গে তো ও মেশেনি। স্বাম শিক্ষিত। তিনবার জেল খেটেছে।"

মুখ বাঁকাইয়া পুত্র কহিল, "ভয়ানক জোর সার্টি-ফিকেট! পরণে খদ্দর, আর জেলের ফটকে বার-দুই মাথা লাইলেই মানুষ চেনা হয়ে গেল! তার চেয়ে সৎ ব্যক্তি র পৃথিবীতে নেই, বিশেষতঃ মেয়েদের চোখে!"

পিতা-পুত্রের আলোচনার মাঝে শৈল কোন কথাই হিল না। চেয়ার ছাড়িয়া কহিল, "আমাকে এইবার তে হবে।"

মিত্র-সাহেব ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। কহিলেন, "বিলক্ষণ, মি চা খাবে না?"

শৈল কহিল, "না, ডাক্তার ওটা আমায় দিনকতক বন্ধ খতে বলেছেন।"

সুকুমার কহিল, "মিঃ রায়, আপনার বাড়ীতে গেলে ন্ সময়ে আপনার দেখা পাব?"

"কোর্টের টাইম ছাড়া যখন আপনার সুবিধা হবে।" লয়া অভিবাদনের পর শৈল কক্ষ হইতে বাহির হইয়া ল।

২৬

স্ত দেহ-মন লইয়া, শৈল মিত্র-সাহেবের গৃহে গিয়াছিল, টাকে একটু হাল্কা করিবে, চিত্তে আনন্দ পাইবে ভাবিয়া। তা না হইলে, সাত দিন জ্বর ভোগ করার পর, প্রথম য্য পাইয়া দুর্ব্বল দেহখানাকে লইয়া যখন সে মোটরে য়াছিল, তখন সেই বিশুষ্ক দেহটা গৃহাভ্যন্তরের বিছানা- র জন্যই আকুল হইয়াছিল।

কিন্তু নিজের ভাণ্ডার যখন প্রকৃতই শূন্য থাকে, ধার করে পাওয়া তখন দুঃসাধ্য। মনের পাথরখানা নামাইবার জন্য, শরীরের কষ্টটাকে অবহেলা করিতে সে দ্বিধা-বোধ করে নাই। কিন্তু যখন নিজের গৃহে সে ফিরিয়া আসিল, তখন দেখিল, সেই পাথরখানা যেন দশগুণ ভারী হইয়া উঠিয়াছে। তাহা বহনের অসহনীয় ক্লান্তিটা শুধু মনে নহে, দেহেও যেন একটা যন্ত্রণার সূচ ফুটাইতেছে। কঠিন শাসন-শৃঙ্খলে আবদ্ধ দুঃখের বিশীর্ণ নদীটাতে হঠাৎ বন্যার বিদ্রোহী সলিলরাশি ক্ষিপ্ত হইয়া বাঁধন-কষণকে দু'পায়ে দলিয়া দিতে চাহিল। সুলেখার এরূপ আচরণ, শৈলর পক্ষে শুধু অভাবনীয় অপ্রত্যাশিত নহে, এ যেন তাহার স্বপ্নের অতীত। তথাপি, এ বিষয় লইয়া অভিযোগেরও কিছু নাই। কিন্তু নাই বলিলেই দুনিয়ার অনেক গোল মিটিয়া যায় না। অবাধ্য মন অকস্মাৎ এমনই অদ্ভুত কিছু একটা করিতে উদ্যত হইল যে, তাহা যেমন আকস্মিক, তেমনই হাস্যাস্পদ।

বিছানাটার উপর পড়িয়া শৈল ছটফট করিতে লাগিল। শ্রমের ক্লান্তি তাহার দুই চোখে ঘুমের স্নেহস্পর্শ না দিয়া যেন নিষ্ঠুর-হস্তে ঘুমের তন্দ্রাটুকুকে অবধি মুছিয়া দিল। ক্ষুব্ধ অন্তর থাকিয়া থাকিয়া দু'খানি সেবাভরা কোমল হাতের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিতে লাগিল। গভীর রাত্রিতে নির্জ্জন কক্ষে একাকী বিছানার উপর শুইয়া শৈলর সহসা দীর্ঘকাল-বিস্মৃত পত্নীকে মনে পড়িল। সেই স্বল্পদিনের সঙ্গিনী সুনীলার জন্য আকস্মিক তাহার দুই চোখে জলধারা গড়াইয়া পড়িল। যে দিন পত্নীবিয়োগ ঘটিয়াছিল, সে দিন সে এমন করিয়া কাঁদিতে পারে নাই; আজ যতখানি চোখের জলে উপাধান সিক্ত করিল।

দেশমাতৃকার সেবায় সুলেখা যে যথার্থ আত্মনিয়োগ করিয়াছে, সংবাদপত্রের মারফত ও মানুষের মুখে শৈল তাহা জানিতে পারিত। ইহাতে তাহার মনটা এক একবার বিকল হইয়া উঠিত।

ছাত্র-জীবনে দেশকে সেও হৃদয় দিয়া ভালবাসিত। অনেক কিছু বিরাট কল্পনা সেদিন মনের মাঝে কত না আকাশকুসুম রচনা করিয়া গিয়াছে। বাস্তবের কঠিন সংঘাতে সে তাসের ঘর ধূলিসাৎ হইয়াছে। তথাপি সে স্মৃতি মনে পড়িবামাত্র গঙ্গা-যমুনার পাশাপাশি ছুটিয়া চলিবার মত হর্ষ-বিষাদ এক সঙ্গেই মনের মাঝে উথলিয়া উঠে।

অতীতে একদিন সুলেখাকে মনের রুদ্ধ দুয়ার খুলিয়া প্রাণের অনেক গোপন কথাই শৈল বলিয়াছিল। নিজের জীবনের আশা, আনন্দ, আকাঙ্ক্ষা কোন্ হিমাদ্রির শীর্ষদেশে উঠিয়া সাফল্য ও জয়ের আনন্দ উপভোগ করিতে চাহে, দয়িতা বলিয়া তাহারই কাণে সে তাহা ঢালিয়া দিয়াছিল। মনোনীতাকে মানসী প্রতিমারূপে জ্ঞান করিয়া তাহার কাছে প্রাণের কথা ব্যক্ত করিতে, তাহার কত উৎসাহ, কত উদ্দীপনা ছিল। আজ যথার্থই সুলেখা তাহারই পরিকল্পিত আদর্শ স্থানটিতে পা ফেলিয়া দাঁড়াইয়াছে। পাশে নাই শুধু শৈল। শৈলর পশ্চাতের শত বাধন যেন সহস্র বাহু মেলিয়া যাত্রার গতি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতেছে।

ব্রজমোহনের বন্ধকী বাড়ীখানাকে ঋণের কবল হইতে মুক্ত করিয়া অনিলাকে ফিরাইয়া দিতে হইবে। তাহা না হইলে শৈল যেন নিজের কাছে নিজেই মাথা তুলিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেছে না। কিন্তু মনের মাঝে ঋণ পরিশোধের তীব্র সঙ্কল্প শৈলর অভিমানাহত অন্তর অনিলার নিকট হইতে সম্পূর্ণ গোপন করিয়া রাখিয়াছিল।

নিজকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া সে অনিলার শুধু উপকার করিয়া যাইবে। এবং চিরদিন কিছু গোপন থাকে না, তাহাই প্রতিপন্ন করিতে যে দিন তাহার শুভ উদ্দেশ্য ও কর্ম্মগুলা অনিলার চোখের সম্মুখে সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইবে, সে দিন এই অদ্ভুত মেয়েটি কোন্ অহঙ্কার দিয়া তাহাকে প্রতিহত করিবে, তাহাই শুধু সে নিরীক্ষণ করিতে চাহে। শৈল ব্যবস্থা করিয়াছিল, বিরজামোহনকে কিছু মোটা রকম আর্থিক সাহায্য করিয়া তাঁহাকে পরিবারসহ অনিলার কাছে রাখিবে।

শৈলর এই সদিচ্ছাকে জয়ন্তী আন্তরিক ও বাহ্য উভয় দিক্ দিয়াই পূর্ণভাবে সমর্থন করিলেন। বিরজামোহন শুধু মাথা চুলকাইয়া বলিয়াছিলেন, "বাবা, তোমার কাছ হ'তে নেওয়া— অনিলা কি ?"

স্বামীর নির্ব্বুদ্ধিতায় জয়ন্তী বিচালি-স্তূপে অগ্নি নিক্ষেপের মত দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া তেমনই ক্রোধভরা-কণ্ঠে কহিয়াছিলেন, "সে অবুঝ বলে আমাদের তো চল্‌বে না। দেশ-ভুঁই ছেড়ে এই যে আমরা থাকব, আমাদের তো চলা চাই। তোমার লাট সাহেব ভাইঝির আমীরী মেজাজের কথা ছেড়ে দাও।"

পত্নীর রক্তোচ্ছ্বাস-মাখা ক্রুদ্ধ মুখখানার পানে চাহিয়া বিরজামোহন কহিলেন, "কথাটা সত্যই তুমি বলেছ। রক্ত সম্পর্কে পাওয়া মর্য্যাদাটাকে মানুষ কোন দিনই ছাড়তে পারে না। রাজার ছেলের দুর্ভাগ্য তাকে ভিখারী করলে পথের ভিখারীর সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে তুলতে কোন দিন সে পারে না। এই দুয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধানটা থেকেই যাবে।"

স্বামি-স্ত্রীর মাঝে যে বাদানুবাদটা কলহের রাস্তাটা ধরিতে উদ্যত হইয়াছিল, শৈল তাহার মোড় ঘুরাইয়া দিল। কহিল, —"বেশ তো, অনিলা জানবে কি করে ? টাকা আমি পোষ্ট আফিসে পাঠাব, আপনি সেখান থেকে নেবেন।"

সমস্যাটার অতি সুন্দর মীমাংসা হইয়া গেল। বিরজামোহন অকৃত্রিম উচ্ছ্বাসে শৈলর হাতটি চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন, "বাবা তুমি দেবতার চেয়ে বড়। তাহাদের রাগ আছে, শাপ আছে, তোমার মত নিঃস্বার্থ তারা নয়। অনিলা যে ওই কথা শুনলে না, সে আমাদের কপাল।"

বর্ষার মেঘাচ্ছন্ন আকাশের বুক চিরিয়া মলিন রৌদ্র যেমন নিমেষের জন্য উঁকি মারে, সেইরূপ শৈলর মুখে ম্লান হাসি মুহূর্ত্তের জন্য খেলিয়া গেল। শৈল কহিল, "তাতে আমার নিজের কোন ক্ষোভ নেই। আমি আমার স্বর্গগত শ্বশুরের ইচ্ছাই প্রতিপালন করতে চেয়েছিলুম মাত্র।"

জয়ন্তী তাড়াতাড়ি কহিয়া উঠিলেন, "নিশ্চয় ! নিশ্চয় ! জন্মান্তরের তপস্যা না থাকলে তোমাকে পাওয়া যায় না। আমি তাই শুভাকে বলি, ঠাকুরের পায়ে নমস্কার করবি, "শৈলকে যেন তুই পেতে পারিস।"

দিনের আলোর মত নির্ম্মল হাসিতে শৈলর মুখ ভরিয়া উঠিল। কুণ্ঠাহীন কণ্ঠে সে কহিল, "সেটা শুভার মত মেয়ের পক্ষে দুর্ভাগ্য। তার কপালে বুড় বর বিধাতা লেখেন নি।"

জয়ন্তী আনন্দে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন। কহিলেন, "বুড় !— তোমাকে যে বুড়ো বলবে, তার চোখের চিকিৎসা আগে করাতে হবে। ছাব্বিশ সাতাশ বছরের সোমত্ত ছেলেকে বুড় বলা ?"

শৈল কহিল, "না জ্যাঠাই মা—অতিস্নেহে আমার বয়স আপনার কমাবার দরকার নেই। আর অতিবৈরাগ্যে —আমার বুড় সাজবারও দরকার নেই। বয়স আমার এই বত্রিশ বছর।"

জ্যাঠাইমা তৎক্ষণাৎ কহিলেন, "শুভা ত আমার এই সাল পার হয়ে গেল।"

সে কথায় শৈল কোন সাড়া না দিয়া বিরজামোহনের পানে চাহিয়া কহিল, "তা হলে এই কথাই রইল, জ্যাঠা মশাই ?"

বিরজামোহন কহিলেন, "তা তোমার যেমন ইচ্ছা, বাবাজি। তাই বলি, সন্তোষ সে-ও তো এম-এ পাশ করেছে। বুড় মা-বাপের চলে কিসে, এত বড় বোনটার বিয়ে হয় কি করে, না ভেবে, সে গেল দেশের কায করতে জেলে। আর যে কোন দিন একটা ভাল চাকরী জুটবে, সে আশা অবধি রইল না।"

বিরজামোহনের জীর্ণ বুকখানা ভেদ করিয়া একটা গভীর নিশ্বাস পড়িল।

বিহ্বলের মত শৈল কয়েক মুহূর্ত্ত বিরজামোহনের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। তার পর কহিল, "জ্যাঠামণি, শুভ ইচ্ছা, কল্যাণ চিন্তা কখন ব্যর্থ হয় না। যদি আমরা ঠিক ঠিক পথ ধরে খুঁজি তো ভগবান তা আমাদের এনে দিতে বাধ্য হন। কিন্তু আমরা তা কি পারি ? শুভ এবং কল্যাণের নাম বজায় করতে চাই নিজের স্বার্থ। কিন্তু অন্তর্যামীর চোখে ধুলা দেওয়া যায় না। তাই কাম্যকেও খুঁজে পাই না। সত্য ধর্ম্মের অনুসরণ করা বড় শক্ত, জ্যাঠামণি, তাতে যদি পদস্খলন না হয়, তবে আমাদের কল্যাণ মূর্ত্তি ধরে সে আমাদের সামনে দাঁড়াবে। কিন্তু কর্ত্তব্যের অনেক অগ্নিপরীক্ষা দিতে হবে। তবেই জয়ের উচ্চ সিংহাসন আমরা পাব।"

শৈলর কণ্ঠস্বর অকস্মাৎ গাঢ় হইয়া আসিল। সে থামিল। বেশী কথা বলার স্বভাব কোন দিন তাহার ছিল না। কিন্তু ব্রজমোহনের মৃত্যুর পর হইতে সে সম্ভব অসম্ভব যত রকম ঘটনার মধ্যে পতিত হইতেছিল; অনিলা যতই তাহার কাছে হেঁয়ালী হইয়া উঠিতেছিল, এবং ধৈর্য্যের পরীক্ষাগুলা অসহনীয় মূর্ত্তিতে যত রকমে তাহাকে আঘাত দিতেছিল, তাহারই হাত হইতে নিজেকে অবিচলিত রাখিবার প্রচেষ্টায় কথাগুলা এমন উচ্ছ্বাসের মত বাহির হইল কি না, কে জানে ?

পাটনায় বসিয়া শৈল ভাবিত, বিরজামোহন, জয়ন্তী, অনিলা; এবং এক সময়ে হঠাৎ চমকিয়া উঠিত। সব চিন্তা ভুলিয়া গিয়া, সমস্ত হৃদয় জুড়িয়া বসিয়াছে শুধু সুলেখার চিন্তা।

২৭

সে দিন সকালে মিত্রসাহেবের পত্রে শৈল জানিতে পারিল, দীর্ঘদিনের পরিত্যক্ত পল্লীমায়ের বিস্মৃতপ্রায় স্নেহচ্ছায়ানীড়ে পশ্চিমের জল-বাতাস ছাড়িয়া স-কন্যা তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন এবং দৈব প্রতিকূল না হইলে, জীবনের অবশিষ্ট কালটা নিরবচ্ছিন্নভাবে সেইখানেই কাটাইয়া দিবার ইচ্ছা করিয়াছেন।

তড়িৎলেখার মত দপ্ করিয়া শৈলর মনে পড়িয়া গেল, অতীতে এক দিন মিত্রসাহেব বলিয়াছিলেন, "আমার ভয় করে, লেখা বলে বসে, বাবা তুমি প্র্যাক্টীস্ ছাড়।" এই কথাটা মনে পড়ার সঙ্গে বিদ্যুতের আলোকে এক নিমিষে দেখিয়া লওয়ার মত অতীতের অনেকগুলা কথা এক সঙ্গে সারি বাঁধিয়া চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। এক দিন সে কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিল, "সেই মনুষ্যত্বের বড়াই করতে পারে লেখা, যে নিজে উঁচু হওয়ার সঙ্গে নিজের চার পাশকেও উঁচু করে তুলতে পারে। নিজে উঁচুতে উঠেছে বলে, নীচুর সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করে না। ছোট হোক্, বড় হোক, আমার বলেই সে আমার শ্রদ্ধার ভালবাসা পাবে।"

পত্রখানা খামের মধ্যে পূরিয়া, শৈল মামলার নথিপত্র-গুলা টানিয়া লইল। মনটা যখন সম্পূর্ণ তাহার মধ্যেই আবিষ্ট হইয়া পড়িল, ঠিক সেই সময়ে সুকুমার ঝড়ের মত কক্ষে প্রবেশ করিয়া কহিল, "শুনেছেন মিঃ রায়, বাবার ব্যবস্থা ?"

পিতাপুত্রে যে অচিরেই একটা তুমুল বিরোধ ঘটিবে, সেটা শৈল পূর্ব্বাহ্লেই কতকটা আন্দাজ করিয়াছিল। কিন্তু সেটা যে এত শীঘ্র ঘটিবে, ইহা সে বুঝিতে পারে নাই। মনটা একবার তাহার ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

সুকুমার কহিল, "বাবা যে হঠাৎ প্রাক্টীস্ ছেড়ে দেশের বাড়ীতে চলে গেলেন, এটা কি তাঁর ঠিক হল ? আর চির-কালটা স্বাস্থ্যকর স্থানে কাটিয়ে আজ বুড়ো বয়সে হঠাৎ সেই পচা পাড়াগাঁয়ে থাকলে তাঁর শরীর টিকবেই বা ক'দিন ? আর আমার ভবিষ্যৎ—"

সাশ্চর্য্যে শৈল কহিল, "আপনার ভবিষ্যতে আবার কি হলো ?"

"সব দিক্ দিয়ে ক্ষতি। যার পরিমাপ হয় না। বাবার সাহায্য না পেলে দাঁড়াব আমি কিসের জোরে? ইংলণ্ডে যখন আমি ছিলুম, বাবার কাছ হতে কত আশা প্রতিপত্রে পেতুম, কিন্তু আজ দেখ্‌ছি সবই আকাশকুসুম!"

"বেশ তো, আপনি মিঃ মিত্রকে এ বিষয়ে একটু বুঝান নি কেন?"

"বুঝাব? কি বল্‌ছেন, মিঃ রায়? দস্তুরমত রাগারাগি হয়ে গেল। তিনি দেশেরই সব, আমার বিষয়ে তিনি কিছু চিন্তা করেন না।" সুকুমার থামিল। একটা রুদ্ধ অভিমান অকস্মাৎ সমুদ্রতরঙ্গের মত ফুলিয়া ফুলিয়া নিজকে আছড়াইয়া শতধা করিতে চাহিল।

কয়েক মুহূর্ত্ত পরে সুকুমার কহিল,—"দেশের বাড়ীটার সংস্কার আরম্ভ হয়েছে শুনেছিলুম। কিন্তু তার অর্থ যে সমস্ত দেশের সংস্কার, তা বুঝতে পারি নি। ভাবতেও পারি নি, বাবা কোন দিন সেই জংলো পাড়াগাঁয়ে গিয়ে বাস করবেন। কিন্তু এ ত বাবার ইচ্ছা নয়। বাবা শুধু যন্ত্র—" সুকুমার শৈলর মুখের পানে চাহিল। বোধ করি একটা উত্তর পাইবার আশা তাহার ছিল।

একটা জমাট নিস্তব্ধতা পাথরের মত কঠিন হইয়া কয়েক মুহূর্ত্ত দাঁড়াইয়া রহিল। শৈল ভাবিতেছিল, কেন এমন হইল? ইহার জন্য দায়ী কে? এই যে পিতা-পুত্রে ভ্রাতা-ভগিনীতে একটা অভিমান, অভিযোগ, বিরোধ সৃষ্টি হইতেছে, ইহার জন্য প্রকৃত দোষী কে? অগ্নির একটা সামান্য স্ফুলিঙ্গ যে ফেলিয়া দেয়, সমগ্র দেশ ধ্বংসের জন্য অপরাধী তাহাকেই করা হয়। অগ্নি তো নিজের ইন্ধন নিজেই সংগ্রহ করিবে।

সুকুমার আরম্ভ করিল, "সে যেন একটা রাজসূয়ের অনুষ্ঠান হচ্ছে। দেশের ম্যালেরিয়া তাড়াবার জন্য জঙ্গল সাফ হতে আরম্ভ করে টিউব ওয়েল বসান, পুকুর কাটান, স্কুল বসান, দাতব্য চিকিৎসালয়, মাতৃশিক্ষা-নিকেতন—কত কি সব নাম বেরিয়েছে। আর এ সব কায দূরে বসে হয় না বলেই লেখা আর বাবা সেখানে স্থায়ী হলেন। আর ব্যাঙ্কের বইটাও সেখানে যেতে বাদ যায় নি। শেষকালে চাঁদার খাতা-হাতে লেখা ভিখারীর মত বাড়ী বাড়ী ঘুরছে।"

শৈলর মুখ দিয়া একটা কথাও বাহির হইল না। যে আলেখ্যখানাকে উৎসাহের সহস্র বাতি জ্বালিয়া শৈল শুধু এক দিন আরতি করিয়া আসিয়াছে, আজ তাহাতেই প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া সেই জীবন্ত প্রতিমার পদতলে সুলেখা লক্ষ বাহুতে অঞ্জলি দিতেছে, ইহার চেয়ে বড় বার্ত্তা আর কি আছে? তথাপি শৈলর মুখের চেহারাটার দিকে চাহিলে অত্যন্ত অনভিজ্ঞ অবধি বোধ করি ভাবিতে পারিবে না, তাহাতে একটুখানি আনন্দের চিহ্ন আছে।

সুকুমারের সহসা যেন মনে হইল, শৈলর রহস্যাবৃত অন্তরের তলাটা সে দেখিতে পাইয়াছে। হঠাৎ সে চেয়ারে সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়া শৈলর পানে চাহিয়া কহিল, "মিঃ রায়, আমি একটুখানি আপনার সাহায্য চাইছি। আশা করি, আমি তা পাব।"

শৈল চকিত হইয়া উঠিল। কহিল, "আপনি কি চাইছেন, যতক্ষণ না সেটা জান্‌তে পাচ্ছি, ততক্ষণ কোন বিষয়ে কিছু আশা দিতে পাচ্ছি না।"

—"আপনি এই পাশার ছকটা উল্টে দিন। আমরা ত জানি, লেখার উপর আপনার ক্ষমতা কতখান।"

শৈলর মুখে একটা রক্তের উচ্ছ্বাস বহিয়া গেল। সে কহিল, "আমি গিয়ে তাঁকে কি এ সব করতে মানা করে আসব?" অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহার কণ্ঠস্বরটা অনেকটা বিদ্রূপের মত শুনাইল।

সুকুমার রাগিল না। সহজ কণ্ঠে কহিল, "এর মাঝে তো অন্যায় কিছু নেই। আমি জানি, আপনি এক জন দেশভক্ত—যেমন একদল লোক ভালবাসে; আত্ম-বন্ধু, ঘর-দুয়ার; সঙ্গে সঙ্গে দেশকেও তারা ভালবাসে। নিজেদের পরাধীন ভাবতে লজ্জা বোধ করে। তাদের মাঝে কোন দিন সর্ব্ব-হারা ভালবাসার নেশা থাকে না। নিজের ভাল মন্দ, দেশের ভাল মন্দ সেখানে নিক্তির ওজনে মাপা হয়। আর মিস্ বোস, তিনি তো আপনাকে স্পষ্ট জবাব দিয়েছেন, লেখার কাছে আপনি বাক্‌দত্ত হয়েছিলেন। বাবার মুখে ঘটনাটা আমি শুনেছি।"

শৈল কহিল, "শোনা কিছু অসম্ভব নয়। কিন্তু এতে আপনার কি বিশেষ সুবিধা আছে, আমি ত বুঝতে পাচ্ছি না।"

সুকুমার হাসিল। শৈল যে একটা গোলক-ধাঁধার মধ্যে ঘুরিতেছে, অন্তরের ভালবাসাটা বুদ্ধির ধারকে রুদ্ধ

করিতেছে মনে করিয়া ভিতরে ভিতরে সে আমোদ বোধ করিল। কহিল, "সোজা গিয়ে আপনি লেখাকে বিবাহের প্রস্তাব করুন। তার পর আমার ভাল-মন্দ আমি বুঝে নেব।"

গ্রীষ্মের দিনে গুমোট রাত্রির মত, শৈলর মুখখানা অসম্ভব গম্ভীর হইয়া উঠিল। কহিল, "ধন্যবাদ, আপনি উত্তম প্রস্তাব করেছেন। কিন্তু আপনার ভাল মন্দটা আমায় দয়া করে বুঝিয়ে দিন।"

সুকুমার চকিত হইল। শৈলর কণ্ঠস্বর সোজা না বাঁকা; উক্তিগুলা পরিহাস না তিরস্কার, তাহা বুঝিয়া উঠিতে না পারিয়া শৈলর মুখের পানে সে একবার চাহিল। কহিল, "বাবার এই দেশসেবার প্রেরণা শুধু সুলেখা। সে যদি ভাগ্যবন্ত মেয়েদের মত গৃহিণী হবার, মা হবার আকাঙ্ক্ষায় শান্ত হয়, বাবার মন সেই মুহূর্ত্তে ঘুরে যাবে সঙ্গে সঙ্গে আমার অদৃষ্টের চাকাও ঘুরবে।"

শৈল কহিল, "আমাকে বিয়ে করলে সুলেখা যে দেশের কায করবে না, এর কিছু নিশ্চিত প্রমাণ পেয়েছেন?"

সুকুমার দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, "হাঁ, নিশ্চিত পেয়েছি, স্ত্রী স্বামীর অনুগামিনী হবে, এ সংস্কার আমাদের দেশের মেয়েদের অস্থি-মজ্জায় জড়িত আছে। হাজার, হাজার, বছর ধরে নিজেদের যে বাঁধন তারা দিয়েছে, তা হতে মুক্তি তারা কোন দিন পাবে না।"

শৈল হাসিয়া কহিল, "এটা শুধু বক্তৃতার উচ্ছ্বাস, বর্ত্তমানের দিকে চেয়ে আপনি কথা কইবেন আশা করি।"

সুকুমার উত্তেজিতকণ্ঠে কহিল, "আমি বর্ত্তমানের দিকেই চোখ রেখে কথা বলছি।—আমি অনেক মহিলাকে জানি, যাঁরা একদিন অসূর্য্যম্পশ্যার মত অন্তঃপুরে আবদ্ধ থাকতেন, এখন তাঁরা ইউরোপে গিয়ে পর্দ্দার বাইরে গিয়েছেন। আপনি বলবেন, এটা স্বাধীনতার হাওয়া, আমি বলি তা নয়—স্বামীর রুচি অনুযায়ী নিজকে খাপিয়া তোলা। সেই যে কবে আদি যুগে এঁরা আদিষ্ট হয়েছিলেন, ঋষি মুখে—স্বামীর অনুগামী হও; সে মন্ত্র সজীব হয়ে আজিও এদের মাঝে জেগে আছে। এ আমার নিজের দুই চোখ দিয়ে প্রত্যক্ষ করা, অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করা, আমার মা পাড়াগেঁয়ের সংসারে জন্মেছিলেন, বাবার এতখানি সাহেবীয়ানার মাঝে কোথায়ও তাঁর এতটুকু বাধেনি।"

সুকুমারের কণ্ঠস্বর গাঢ় হইয়া আসিল। সে থামিল, স্বর্গগতা জননীর কথা স্মরণ হইতে বুকের মাঝে স্মৃতি-সমুদ্র যেন উথলিয়া উঠিল।

ক্ষণ পরে সুকুমার কহিল, "মিঃ রায়, আমার মা চলা-ফেরা সব ব্যাপারেই য়ুরোপীয় মহিলার মত আচরণ করতেন, আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি—তাঁদের মতই হয়েছিল। পিতৃগৃহের সঙ্গে সম্পর্ক তাঁর নিঃশেষে মুছে গিছল—আমার দিদিমার শেষ সময়ে মা তাঁর মুখে জল দিতে পাননি শুধু স্বেচ্ছাচারিতার অপরাধে। সেই মা যখন মারা গেলেন, তখন আমি তাঁর পাশে, বাবা মাথার কাছে বসে।" সুকুমার চোখ মুছিয়া কহিল, "মা সজ্ঞানে মারা গেলেন। বাবাকে বললেন, তোমার পা দাও, আমি পায়ের ধূলা নেব। এর আগে কেউ আমরা মাকে বাবার পায়ে প্রণাম করতে দেখিনি।"

রুদ্ধনিশ্বাসে শৈল সুকুমারের মুখের পানে চাহিয়াছিল। অজানা এক মহিলার অশ্রুত জীবন-কথা শুনিবার প্রবল ইচ্ছা তাহার দুই চোখে ফুটিয়া উঠিল।

সুকুমার কহিল, "বাবার পায়ের ধূলা নিয়ে মা একটু হাসলেন, বল্লেন,—'মার মুখে জল দিতে পাইনি, বড্ড দুঃখ হয়েছিল। কিন্তু মনকে বুঝিয়েছিলুম তুমি যা চাও, যা ভালবাস, আমি তো তাই শুধু পালন করেছি। মা আমাকে আশীর্ব্বাদই করেছিলেন, তুমি সীতা সাবিত্রী হয়ো। তাই আমার খালি মনে হ'ত—তারা সবই ত্যাগ করেছিল স্বামীর জন্যে। আর আমি এটুকু পারব না? আমার ভক্তি সার্থক হয়েছে। স্বর্গে মা আমায় ভাগ্যিমানি মেয়ে বলে জড়িয়ে ধরবেন। এইবার বলুন দিকি মিঃ রায়, আমার মার স্বেচ্ছাচারিতার মাঝে হিন্দু নারীর শিক্ষার এতটুকু শৈথিল্য ঘটেছিল কি? তেমনি সুলেখাকেও আপনি জানবেন, ও যে মুহূর্ত্ত থেকে আপনার হবে, সূর্য্যমুখী ফুলের মত সেই নিমেষ হতে আপনার পানেই চেয়ে থাকবে। এটা তো নিশ্চিত, দেশকে আপনি ভালবাসলেও এমন ভিখারী হবার খেয়াল আপনার নাই। সে অবস্থা আপনার নয়। এ সব আপনার তো চলবে না।"

শৈল কহিল, "আমার কি চলবে, না চলবে, সে বিচার আমি এখুনি করছি না। আপাততঃ এইটুকু শুধু জেনে রাখুন, সুলেখাকে বিয়ের প্রস্তাব করলেই আমি তার সম্মতি

পাব না। আর আমি তাকে বিয়ের প্রস্তাবও করতে পারব না। কেন যে পারব না, এটুকু আর দয়া করে আপনি জিজ্ঞেস্ করবেন না।"

শৈল চেয়ারের পিঠে নিজের দেহটা এলাইয়া দিল। আর ঠিক তাহারই সম্মুখে টেবলের অপর প্রান্তে বসিয়া সুকুমার বিস্ময়াহত দৃষ্টিতে নিঃশব্দে শৈলর মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

২৮

"তার আয়া সাব্।"

একটা সই দিয়া শৈল টেলিগ্রামখানি তুলিয়া লইল।

বিরজামোহন সপরিবার কাল প্রভাতে শৈলর বাড়ীতে পদার্পণ করিবেন, আজ রওনা হইয়াছেন।

দপ্ করিয়া শৈলর মনে পড়িয়া গেল, বেশী দিন নহে, মাত্র কয়েক মাস পূর্ব্বে এমনই সন্ধ্যায় বার্ত্তা আসিয়াছিল, ব্রজমোহন আসিতেছেন। আজ তাঁহারই আত্মীয় আসিতেছেন, কিন্তু সেদিনে এদিনে যেন শত যুগের ব্যবধান। এমন করিয়া অনেক নিকটতম, দূরতম, আত্মীয়, অনাত্মীয় আকস্মিক বার্ত্তা দিয়া অথবা কেহ না দিয়া তাহার গৃহে পদার্পণ করিয়া শৈলকে ধন্য করিয়াছেন। এই অভাবনীয় অচিন্তনীয়দের সহ্য করা তাহার বেশ অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। তথাপি সমস্ত বুক জুড়িয়া একটা ব্যথা যেন বর্ষার দিনের আকাশের মত সমস্ত মনটাকে ক্ষণে ক্ষণে বিবশ, বিষণ্ণ করিতে লাগিল।

রাত্রিকালে শৈল বিছানায় শুইল, কিন্তু চোখে ঘুম আসিল না। সমস্ত বিছানাটা তাহার কণ্টক হইয়া উঠিল। একটা অত্যন্ত অপরিচিত দুঃখ যেন তাহার সারা অঙ্গে কাঁটার মত বিঁধিতে লাগিল। সুকুমারের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিতে পারিয়াছে ভাবিয়া চিত্তে যতই সে আনন্দ দিতে চেষ্টা করিল, বুঝাইতে চাহিল, একটা কঠোরতম পরীক্ষায় সে উত্তীর্ণ হইয়াছে, ততই অবুঝ অন্তরটা ব্যথার কান্নায় যেন গুমরিয়া মরিতে লাগিল।

ঘুম ভাঙ্গিতে শৈলর ঈষৎ বেলা হইল। উষার প্রথম আলোককণা বিশ্ব-বুকে পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে বিছানা ত্যাগ করা তাহার অভ্যাস; চাহিয়া দেখিল, রুদ্ধ শার্সিগাত্রে রৌদ্র পড়িয়াছে, কিন্তু নিজের কাছে নিজে সে ত্রস্ত হইয়া পড়িল না বা দিনের এই প্রথম অতিথিকে সম্বর্দ্ধনা জানাইতে অন্তরে তাহার এতটুকু উৎসাহ অবধি জাগিল না। শোকাতুর যেমন ব্যথার সহিত ঘুমাইয়া পড়ে, আবার সেই ব্যথাটা লইয়াই জাগে, তেমনই একটা নিরানন্দ লইয়াই সে হাত-মুখ ধুইতে চলিয়া গেল।

ষ্টেশনে মোটর পাঠাইবার মুহূর্ত্তে শৈল একবার ভাবিল, তাহার নিজের যাওয়া উচিত। বিরজামোহনের সহিত নিশ্চয় অনিলা আসিতেছে। তাহাকে অভ্যর্থনা করিতে শৈল না গেলে তাহার একটা ভয়ানক ত্রুটি ঘটিবে। কিন্তু সারা রজনীর অনিদ্রা হেতু ক্লান্তি দেহটাকে অকস্মাৎ ভয়ানক বিমুখ করিয়া তুলিল।—সে আজ হাসিমুখে কাহাকেও সাদর সম্ভাষণ দিতে পারিবে না।

চা খাইয়া শৈল পড়িবার ঘরে আসিল। দুষ্ট ঘোড়াকে কাঁটা-কাজাই মুখে দিয়া বশীভূত রাখার মত মামলার কাগজপত্রের মাঝে উৎক্ষিপ্ত মনটাকে সে আবদ্ধ করিতে চাহিল। তাহা হইলেই উদ্ভ্রান্ত চিত্তের শত জঞ্জাল সৃষ্টির সাময়িক বিরতি ঘটিবে। বহু পৃষ্ঠাব্যাপী একখানা ব্রীফ্ সে খুলিয়া আইনের পুস্তকগুলা টানিয়া লইল, দৃষ্টি সংযোগ করিল, কিন্তু মনঃসংযোগ হইল না—তাহারই চেষ্টা চলিতে লাগিল।

এমনই গোলমালের মাঝে খানিকটা সময় অতিবাহিত করিতে করিতে চমকিয়া শৈল মুখ তুলিয়া মোটরের হর্ণ শব্দে বুঝিল, মাননীয় অতিথির দল আগমন করিলেন। ক্ষণ পরেই জুতার শব্দ তাহার কক্ষের বারান্দায় শ্রুত হইল। এখনই গিয়া অভ্যাগতদিগকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইতে হইবে। বর্ত্তমানে তাহা সর্ব্বপ্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য। শৈল চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু তাহার অবাধ্য চিত্ত ক্ষিপ্ত ঘোড়ার মত ভয়ানক বিদ্রোহ জুড়িয়া দিল। শাসনের চাবুক সে কিছুতেই মানিতে চাহিল না। ক্লান্তভাবে শৈল চেয়ারখানার উপর বসিয়া পড়িল।

মানুষের মন যখন বিরোধ করে, কথা শুনে না,—তখন দুঃখের মাপকাঠী হারাইয়া যায়। তাহার পানে চাহিয়া অন্তর্যামী বোধ করি ব্যথিত হন। শৈল দুই হাতে মুখ চাপা দিয়া চেয়ারখানার উপর নিশ্চল হইয়া রহিল।

দুয়ারের পর্দ্দা সরিয়া গেল। জুতার শব্দ কক্ষতলের কার্পেটে ধ্বনিত হইল না। শৈল ভীষণভাবে চমকিয়া উঠিল। উচ্চ হাস্যে শুভা কহিল,—"জামাইবাবু চোখে হাত দিয়ে ধ্যান করা অভ্যাস কচ্ছেন না কি?"

শৈল কথা কহিতে গেল। কিন্তু কণ্ঠ দিয়া শব্দ বাহির হইল না। শুভা বিস্মিত কণ্ঠে কহিল, "আপনার চোখ অত লাল কেন, জামাই বাবু?"

প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া শৈল আপনাকে কতকটা সম্বরণ করিয়া লইল। ফাঁসীর আদেশটা প্রথম গোচরীভূত হইলে যতখানি আঘাত মনে বাজে, অন্তরকে বিহ্বল করিয়া তুলে, দড়িটার নিকটবর্ত্তী হইবার সময়ে ততখানি কাতরতা আসে না। দুঃখের প্রথম আঘাতটাই ভূমিতে লুটাইয়া দেয়, তার পর সেইটাই সহনীয় হইয়া মানুষকে তুলিয়া দাঁড় করায়।

শৈল কহিল—"মাথাটা বড্ড ধরেছে। তোমাদের পথে তো কোন কষ্ট হয়নি, শুভা? চল, জ্যাঠামশাই-জ্যাঠাইমার নিকট যাই।"

জয়ন্তীকে শৈল প্রণাম করিতেই তিনি অঙ্গুলির প্রান্ত শৈলর চিবুকে ছোঁয়াইয়া স্নেহ-চুম্বন দিয়া কহিলেন, "আমরা আশা করেছিলুম তোমায় ষ্টেশনে পাব।"

অতি সামান্য একটা ঘটনা বা তুচ্ছ দুই একটা কথা অনেক সময়ে বড় বড় জবাবদিহির হাত হইতে মানুষকে অতি সহজভাবেই অব্যাহতি দেয়। শৈল কোন কিছু উত্তর দিবার পূর্ব্বেই শুভা তাহা সারিয়া দিল। কহিল, "জামাই বাবু যাবেন কি করে? ওঁর কি রকম মাথা ধরেছে, চোখ দেখে বুঝতে পাচ্ছ না?"

জয়ন্তী গায়ে হাত দিলেন। কহিলেন,—"ওমা, তাই! দেখ্ছ শৈল, শুভার দৃষ্টি তোমার উপর কি রকম। এই তোমাকে যথার্থ ভালবাসে।"

অতিতুচ্ছর মাঝে বৃহত্তরের ইঙ্গিত থাকা কিছু নূতন নহে, খুঁজিলেই পাওয়া যায়। এই তড়িৎ শক্তি যাহা বিশ্বমানবের সম্পদের একটা ভিত্তি, সেও এক দিন অতি সামান্যর মাঝেই অকস্মাৎ ধরা পড়িয়াছিল। জয়ন্তী রহস্য-চ্ছলে অতি সামান্য হাস্য-পরিহাসের মাঝে যে প্রকাণ্ড অর্থটাকে সমাচ্ছন্ন করিয়া শুধু একটা ইঙ্গিত দিলেন, সেটা ঠিক তেমনই রহস্যের পরিচ্ছদে আবৃত করিয়া অতি সরল উত্তরের মাঝে শৈল খান্-খান্ করিয়া দিল।

হাসিমুখে শৈল কহিল, "ভালবাসাই তো আমাকে উচিত। দাদাকে ভাল কে না বাসে? কি বল, শুভা? সন্তোষের মত আমি নই কি?"

মুহূর্ত্তে জয়ন্তীর মুখ আঁধার হইয়া গেল। বিরজামোহন কহিলেন, "নিশ্চয়! নিশ্চয়! আমরা তো তাই অসঙ্কোচে তোমার কাছে ছুটে আসতে পেরেছি! কিন্তু অনিলা পারলে না।" বিরজামোহন একটা নিশ্বাস ফেলিলেন।

ক্ষিপ্ত জন্তু প্রবলবেগে সম্মুখে ছুটিয়া আসিতে আসিতে হঠাৎ যদি সে মুখ ফিরাইয়া অন্য দিকে ছুটিয়া যায় তো সর্ব্বাগ্রে মানুষের মুখ দিয়া খপ্ করিয়া একটা নিশ্বাস বাহির হইয়া পড়ে। বিপদ-মুক্তির প্রথম তৃপ্তিটা এক সঙ্গে সেই নিশ্বাসের মাঝেই ঝরিয়া পড়ে।

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বিরজামোহনের পানে চাহিয়া শৈল কহিল, "তিনি এলেন না?"

"না, কিছুতেই এল না।"

জয়ন্তী কহিলেন, "এত বোঝালুম, বল্লুম, একলা থাকতে পারবি? একটু হাসলে—বল্লে, আমি সব পারি।"

কথাটার মোড় ঘুরাইয়া দিতে শৈল জয়ন্তীকে কহিল, "আপনি তবে আসুন এ দিকের ঘর-দরজা দেখতে। আমি আপনাদের আলাদা বামুন-চাকর ঠিক করেছি। আমার এ সব তো আপনাদের চল্বে না।" শৈল একটু হাসিল।

সানন্দে জয়ন্তী কহিলেন, "না বাবা, বুড়ো বয়সে তো ও সব আমাদের আর চল্বে না। তা তোমার অসুবিধা হবে—"

বাধা দিয়া শৈল কহিল, "না, না, কিছু নয়। আমার বৌদিদিরা যখন তখন এসে এসে এ সব আমাকে অভ্যস্ত করে দিয়ে গেছেন। আর আপনাদেরও বিশেষ অসুবিধা হবে না। কারণ, বৌদিদিরা নিজেদের ব্যবস্থা সব ভাল করেই রেখে গেছেন।

সায় দিয়া উৎসাহসহকারে জয়ন্তী কহিলেন, "তা আর করবে না, বাবা। বিদেশে একটা আপনার জন থাকলেই সবাই সেখানে মাঝে মাঝে আস্তানা গাড়তে ছুটে আসে, এ সর্ব্বত্র। তা হ্যাঁ শৈল, তোমাদের মিত্তিরসাহেব তো আমাদের এই দেশের লোক বাছা, তা কক্ষনো দেশের মুখ দেখতেন না, একেবারে সাহেব হয়ে গেছ্লেন। এখন তেমনি সন্তোষের পাল্লায় পড়েছেন। পাল্টা শোধ দিতে হচ্ছে।"

বিরজামোহন কহিলেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ। মিত্তির পাড়ারই ছেলে ছিল। তবে কলকাতায় পিসীর বাড়ীতেই মানুষ।

ছোট বেলা হতে ম্যালেরিয়া বলে দেশে যেত না। দেশে প্রকাণ্ড বাড়ী, হানাবাড়ীর মত যেন খাঁ-খাঁ করত। তা সন্তোষ কাযের ছেলে আছে। ওর সেই মেয়েকে বাগিয়ে —বুঝেছ—হাঃ হাঃ—কি আর বলব, জন্মভূমি দীর্ঘ দিনের অবহেলার শোধ নিচ্ছেন, কি বল, বাবা?"

নদী জন্মস্থানেই শীর্ণা থাকে। কিন্তু যত দূরে সে ছুটিয়া যায়, ততই সে নিজেকে বিস্তার করিয়া, স্ফীত করিয়া তোলে। সুলেখার স্বদেশপ্রীতির মূল উৎসটা অতি ক্ষুদ্র হইলেও দূরান্তে তাহার কর্ম্মধারাটা যে বহুল হইয়া পড়িবে, ইহা স্বাভাবিক; কিন্তু এ প্রসঙ্গ যেন শৈলকে হাঁপাইয়া তুলিল। নিস্পৃহকণ্ঠে সে কহিল, "এ সব কথা পরে হবে এখন, এ দিক্‌টায় আসুন!" বলিয়া সে অগ্রসর হইল।

যাইতে যাইতে জয়ন্তী কহিলেন—"আহা, বাড়ী যেন ইন্দ্রভবন। এমন বাড়ী ভোগ করবার লোক নেই। শৈল, তুমি সংসার পাত, এমন একা একা থেকে আর আমাদের মনে দুঃখ দিও না। পুরুষ মানুষ তুমি, সাধ-আহ্লাদ—"

কথাটা শেষ করিতে না দিয়া একটা সজ্জিত কক্ষ দেখাইয়া শৈল কহিল, "জ্যাঠামশাই, এটা আপনার শোবার ঘর হলে কিছু অসুবিধা হবে না বোধ হয়। আর পাশের এই ছোট ঘরটিতে শুভা শোবে। আমি একটা নেয়ারের খাটিয়া ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।"

জয়ন্তী কপালে হাত দিয়া কহিলেন, "হা অদৃষ্ট, শুভাকে আমি একা আলাদা শুতে দিই না কি! না বাবা, সে সব পাট আমার নেই। এই মেঝেতে আমরা মায়ে-ঝিয়ে বিছানা পেতে শোব। আর এই লোহার খাটে উনি শোবেন, সেই ভাল। আমরা গেরস্থ, এই সোজা বুঝি। ঠাকুরপোর ছিল বটে এই সব বড়মানুষী কায়দা। অনিলার এটা শোবার ঘর, এটা পড়াশুনা করবার ঘর, কিন্তু শেষ রইল কি?—তাও বলি, সে সব ছিল সুনীলার ভাগ্যে—সেই লক্ষ্মী। এই যে দুটি বোনে জোড়ের পায়রার মত ভাব ছিল, কিন্তু বরাত দেখ দু'জনের?"

বাধা দিয়া শৈল কহিল, "থাক, জ্যাঠাইমা, এ সব কথা। আমাকে একটু সকাল সকাল বেরুতে হবে। তার আগে আপনাদের সব ব্যবস্থা করে দিই।"

কি একটা প্রয়োজনে নিজের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া হঠাৎ ব্রজমোহনের সুবৃহৎ তৈলচিত্রের উপর তাহার দৃষ্টি পতিত হইল। শৈল স্তব্ধ হইয়া কয়েক মুহূর্ত্ত তাহা[র] পানে চাহিয়া রহিল। আজিকার সকালটা বড় বিষণ্ণ[?] মূর্ত্তিতে চোখে দেখা দিয়াছিল। পূর্ব্বদিনের সঞ্চিত বেদ[না-] রাশির যোগসূত্র লইয়া সে যেন আজিকে অনেক দুঃখ দিব[ার] ইঙ্গিত করিয়াছিল। কিন্তু বাতাসে-ওড়া মেঘের ম[ত] অকস্মাৎ সে সব কোন্ পথে অন্তর্দ্ধান হইয়া গেল—অন্তরে[র] মাঝে জাগিয়া উঠিল, ব্রজমোহনের একান্ত ইচ্ছাটা এ[বং] নিজের ইচ্ছাটা জোর করিয়া পরের স্কন্ধে চাপাইবার [যে] তিক্ততা, তাহা সেই নির্ব্বাক্ আলেখ্যখানা যেন অদৃশ্য হা[তে] যাদুকরের মত শৈলর চিত্ত হইতে মুছিয়া দিয়া স্নেহের দাবী[র] কথাটাই স্মরণ করাইয়া দিল।

২৯

মাস কয়েক কাটিয়া গিয়াছে। স্বামী, কন্যা লইয়া [এই] অভিযান গঠিত করিয়া জয়ন্তী শৈলকে জয় করিতে আসি[য়া]ছিলেন, তাহা যে শুধু ব্যর্থ নহে, একটা বাতুলতা, জয়ন্তী নিজের কাছেই বোধ হয় তাহা এইবার ধরা পড়িয়াছিল।

কিন্তু উৎকট স্বার্থপরতা উগ্র নেশার মত মানুষকে উন্মত্ত করিয়া তোলে। হিতাহিত জ্ঞানটা ক্রমেই লুপ্ত হয়। স্বল্পভাষী, সংযত-স্বভাব বিপত্নীকের চিত্ত-দুয়ার যে কো[ন] দিন তাঁহার সুন্দরী দুহিতা খুলিতে সমর্থ হইবে না, তা[হা] সূর্য্যালোকের মতই দীপ্ত হইয়া জয়ন্তীর চোখে যতই ধ[রা] পড়িতে লাগিল, ততই রৌদ্রদগ্ধ বালীর মত তাঁহার ভিতর[টা] অনিলার উপর উত্তপ্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। এবং রূ[প]হীনা, অঙ্গহীনা, অভাগী মেয়েটাই যে অদৃশ্য প্রভাবে শৈলে[কে] মোহগ্রস্ত করিয়া রাখিয়াছে, তাহা বুঝিয়া অনিলার উপ[র] একটা উৎকট ক্রোধ ও দুর্নিবার প্রতিশোধস্পৃহা ধীরে ধী[রে] বুকের মাঝে জাগিয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু ছিদ্র না পাই[লে] শনি যে প্রবেশ করিতে পারে না।

শুভা আসিয়া অনিলাকে প্রণাম করিল। হাতে[র] সেলাইটা নামাইয়া অনিলা কহিল, "বেশ তো সেরেছি[স] শুভা। জ্যাঠামশাইও বেশ সেরেছেন।"

"কেন সারবেন না, অনিলা দি। ও দেশের জল-বা[তাস] খুব ভাল। তুমি যদি যেতে, তুমিও সারতে। ইস্, ক[ত] রোগা তুমি হয়ে গেছ!"

শীতের দিনের সূর্য্যাস্তের মত একটা দীপ্তিহারা হাসি[তে]

নিলা কহিল, "দূর! আমার বাপু কোথাও যাওয়া পোষায় না।"

—"কেন পোষায় না? কাকাবাবুর সঙ্গে তো কত দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়িয়েছ। আর এই দেড়টা বছরের মধ্যে বাড়ীর বাইরে পা দিলে না। হাঁ অনিলা দি, তুমি জামাইবাবুর পাটনার বাড়ী কখন দেখেছ?"

শুভা উৎসুক নেত্রে অনিলার মুখের পানে তাকাইল, যেন সে অনেক কিছু শুনিতে পাইবে।

নির্লিপ্তের মত ঔদাস্যসহকারে অনিলা কহিল,—"না, আমি কোথা থেকে দেখ্‌ব?"

"তবে তোমার চোখদুটো বৃথা," বলিয়া শুভা হাসিল। অনিলাও হাসিল। রহস্যভরা কণ্ঠে কহিল,—"দুটো কই রে? একটা তো? দুটো থাক্‌লে দেখতে যেতুম।"

রহস্যের মাঝে সত্যের খোঁচাটা মানুষকে বড়ই বেশী অপ্রতিভ করিয়া তোলে। নিমেষে শুভার সমস্ত মুখখানা অন্ধকার হইয়া গেল। লজ্জিত-কণ্ঠে সে কহিল, "ছিঃ অনিলা-দি, কি যে বল তুমি। সত্য বলছি, জামাইবাবুর পাটনার ঘরখানা চমৎকার। বাগানের ভিতরটা সব দেখা যায়। আর তেমনই সাজান।"

নিজের দীনতার ইঙ্গিত অকস্মাৎ অপরকে অপ্রতিভ করিয়া ফেলিয়া অনিলা নিজেও ভিতরে ভিতরে কম অপ্রতিভ হইয়া পড়ে নাই। কিন্তু ক্ষুব্ধতার যে অতল সমুদ্র বুকের মাঝে অনুক্ষণ জাগিয়া আছে, প্রকৃতির ঝটিকাঘাতের বিক্ষোভে সে উদ্বেলিত হইয়া উঠিবেই।

নিজের চোখে নিজের অপরাধ যখন সুস্পষ্ট হইয়া উঠে, গ্লানিটা তখন ত্রুটিকে ক্ষালন করিবার জন্য চিত্তকে পীড়িত করে। বিস্ময়ের ভঙ্গীতে অনিলা কহিল, "তাই না কি রে? তুই কেন অমন ঘরের ভাগ নিলিনি?"

অনিলা শুভার মুখের পানে তাকাইল।

বন্ধ জানালা খুলিয়া দিলে এক সঙ্গে আলো ও বাতাস কক্ষের মধ্যে ঢুকিয়া পড়ার মত আনন্দ ও উত্তেজনা শুভার আঁধার মুখখানাকে মুহূর্তে প্রদীপ্ত করিয়া তুলিল। প্রফুল্ল-কণ্ঠে শুভা কহিল,—"ইস্, তা বই কি? ভাগ পাওয়া এত সহজ না কি? জামাইবাবুকে তো চেন না। এক জন ছাড়া সব গলাধাক্কা!" শুভা খিল্‌খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

ভূমিকম্পে সমুদ্র দোলার মত মুহূর্তে অনিলার বুকের মাঝটা কাঁপিয়া উঠিল। আপনা হইতে মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল, "সে এক জন কে রে, শুভা? সুলেখা মিত্তির?"

সোণালী কিরণ-মাখা তরুপল্লবের মত কৌতুকের দীপ্তিতে শুভার চোখ-মুখ ঝলমল করিয়া উঠিল। মাথা নাড়িয়া বিজ্ঞের ভঙ্গীতে কহিল, "না গো মশাই, না। সুলেখা মিত্তিরের সাধ্য কি? বাপ্ রে। সে এক জন মস্ত লোক।"

অকস্মাৎ অনিলা যেন কেমন বদলাইয়া গেল। নদীতে বন্যা আসার মত একটা দুর্নিবার কৌতূহল দীর্ঘ দিনের অভ্যস্ত ধৈর্য্যটাকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। লোভাকুল নেত্র মেলিয়া শুভার পানে চাহিয়া অনিলা কহিল, "সে মস্ত লোক কে, বল্‌বি নি, ভাই?"

শুভা অনিলার পাশে কার্পেটের উপর শুইয়াছিল। তাহার কোলের উপর মাথাটা রাখিয়া কহিল, "সে এক জনের নাম হচ্চে 'শ্রীমতী অনিলা বসু'।"

ধাঁ করিয়া শুভার গালে একটা চড় বসাইয়া দিয়া অনিলা নিজের পাটা টানিয়া লইল।

শুভা হাসিয়া কহিল, "সত্যি কথা বললেই তুমি মারবে।"

অনিলা রাগিয়া উঠিল। পড়ন্ত বেলার রক্তালোক মাখা আকাশের মত মুখখানা তাহার রাঙ্গা হইয়া উঠিল। উদ্দীপ্ত-কণ্ঠে সে কহিল, "আমি না তোর বড় বোন? আমার সঙ্গে যা-তা ঠাট্টা করতে তোর লজ্জাবোধ করে না?"

নিজের নির্দোষিতা প্রমাণের অকাট্য যুক্তি হাতে থাকিলে, অভিযোগ যত নিদারুণ হউক না কেন, মানুষ সহজে ভয় পায় না।

অবিচলিতকণ্ঠে শুভা কহিল, "আমি ঠাট্টা করলুম? জামাই বাবুর বলতে লজ্জা করে নি?"

স্বপ্নের অগোচর সত্যটা হঠাৎ সম্মুখে আবির্ভূত হইলে, বড় জোর সে ধাক্কা দেয়। হাজার শান্ত চিত্তও চঞ্চল হইয়া পড়ে।

প্রতিবাদের কণ্ঠে অনিলা কহিল, "সে তোকে কিছু বলে নি। তোর মিছে কথা।"

সতেজে শুভা কহিল, "ইস্! মিছে কথা বই কি? মুকাবেলা করাতে পারি।"

ভূত দেখিয়া চমকিয়া উঠার মত ভীতকণ্ঠে অনিলা কহিল, "কি মুকাবেলা করাবি?"

"জামাই বাবু এ কথা বলেছেন কি না।"

অনিলা যেন নিজের মাঝে সমস্ত শক্তিকে হারাইয়া ফেলিতেছিল। এক দিন যে মানুষ শৈলর সমস্ত যুক্তিতর্ক প্রার্থনাকে কঠোরতম অবহেলায় নিস্পৃহের মত দূরে ঠেলিয়া দিয়াছিল, এতটুকু বাধে নাই, আজ সে তেজ, দর্প, অহঙ্কার কোথায় সব অন্তর্হিত হইয়া পরমুখাপেক্ষী ভীরু নারীপ্রকৃতি অত্যন্ত অচেনা মূর্ত্তিতে অকস্মাৎ কোথা হইতে বুকের মাঝে আবির্ভূত হইল? অতি সামান্য মানবীর মত তুচ্ছ ঘরকণা, স্বামি-পুত্র, আজ সব চেয়ে কেমন বড় লোভনীয় হইয়া উঠিল!

দীর্ঘকালের রণশ্রান্ত পীড়িত অন্তর একটুখানি স্নেহ-চ্ছায়ায় জুড়াইতে চাহে। বিচারের আজ প্রয়োজন নাই, প্রবৃত্তিও নাই।

তাই যে রহস্যের আঁচ অবধি অনিলা কোন দিন সহিতে পারিত না, আজ সেই কথাটাই সে যাচিয়া জিজ্ঞাসা করিল।

অনিলা কহিল, "কি বলেছেন তোকে, শুনি?"

শুভা হাসিয়া উঠিল, কহিল, "সেইটাই বললে তো হতো। এক দিন ঠাট্টা করে জামাই বাবুকে বলেছিলুম। আপনার এ ঘরের ভাগ নেবে কে? তিনি অমনি জবাব দিলেন তোমার অনিলা দি। আমি বললুম, তিনি তো আপনাকে বিয়ে করবেন না।"

অনিলা বিস্ফারিতনেত্রে চাহিয়াছিল, কহিল, "তুই এই কথা বলতে পেরেছিলি?"

শুভা কহিল, "কি করব। মা যে শিখিয়ে দিত, জানো অনিলা দি। আমি এই কথা বলতেই জামাই বাবু বললেন তা হলে আমার আর বিয়ে করা হবে না। আমি বললুম এ ভারী মজার কথা। তিনি বাধা দিয়া বললেন, এ আমার ভাগ্যচক্র। এ ঘর আমি ছাড়তে পারব না। তা হলে স্বর্গে বসে এক জন দুঃখ পাবেন। আর তাঁর দেওয়া ঘরে তাঁর মেয়ে ছাড়া অপরকে আমি ঢুকতে দেব কেমন করে। শুভা, তোমার অনিলাদির দয়ার জন্যই আমাকে বসে থাকতে হবে।"

অনিলা উঠিয়া দাঁড়াইল। শুভা কহিল, "যাচ্ছ কোথা?"

কোন উত্তর না দিয়া অনিলা কক্ষ ছাড়িয়া গেল। অনিলার সমগ্র চিত্ত যেন বহু দূরস্থিত এক জনের পদপ্রান্তে উপুড় হইয়া পড়িয়া তাহার দুই চরণতল অশ্রুতে অভিষিক্ত করিতে লাগিল। অনিলার চোখের জল কপোল, গণ্ড, বক্ষঃকে প্লাবিত করিয়া দিতে লাগিল—ত্যাগ ও কৃতজ্ঞতার মূর্ত্তি লইয়া শৈল যেন অনিলার চোখে দেবতার আসন গ্রহণ করিয়াছিল। উচ্ছ্বসিত আবেগে বুকের মাঝে শুধু সেই একই কথা জাগিতে লাগিল। নিজের সমস্ত ভালবাসা নিঃশেষে উজাড় করিয়া শ্রীহীন মূর্ত্তিখানাকে শৈলর কাছে ব্যবধান রাখিবার জন্য এই কঠোর মূর্ত্তি সে ধরিয়াছিল,—এতটা অহঙ্কারের পরিচয় দিয়াছিল। কিন্তু দেবতার কাছে উঁচু-নীচু, আত্ম-পর, ভাল-মন্দ কিছুই নাই। নিঃশেষে নিজেকে সমর্পণ করাই প্রকৃত পূজা।

[ক্রমশঃ

শ্রীমতী পুষ্পলতা দেবী।

ভাগ্য-বিপর্য্যয়

একই উপাদানে তৈয়ারী লৌহ, একই ইস্পাতে পাকা
অর্দ্ধেক কেটে হলো রেলপথ, বাকী অর্দ্ধেকে চাকা।
ধরাশায়ী পথ,—নিতি উৎপাত সহি কঙ্কালসার,
ছুটিয়াছে গাড়ী চাকার চরণে দলিয়া বক্ষ তার।

শ্রীঅদ্বৈতকুমার সরকার।

শ্রীকৃষ্ণ কি লম্পট?

আমাদের আধুনিক উচ্চশিক্ষিত যুবকদিগের মধ্যে অনেকেই গীতা পাঠ করিয়াছেন, এবং গীতার শ্রীকৃষ্ণের সমরস্পৃহা ও জ্ঞানভক্তির উপদেশ তাঁহাদের খুব ভালই লাগে। কিন্তু শ্রীমদ্‌ভাগবত বা শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলাসংক্রান্ত কোন পুরাণাদি আংশিকভাবেও পাঠ করিয়াছেন, এরূপ শিক্ষিত যুবকের সংখ্যা খুবই কম। অথচ এ কথা অনেকের শোনা আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ মুরলীস্বরে ব্রজগোপীগণকে আকৃষ্ট করিয়া বিজন নিশীথে তাঁহাদের সহিত বিহার করিয়াছিলেন। কাযেই শ্রীকৃষ্ণের এই ব্রজলীলা লইয়া নানারূপ মতভেদ দৃষ্ট হয়। কেহ বলেন, শ্রীকৃষ্ণ আদর্শ-মানব, এরূপ নীতিবিগর্হিত কার্য্য তিনি করিতে পারেন না,—রাসলীলা ভাগবতের প্রক্ষিপ্ত অংশমাত্র। কেহ বলেন, সমগ্র জিনিষটাই একটা metaphor বা রূপক, শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীরাধা বলিয়া বাস্তবিক কোনও মানুষ ছিলেন না। আবার অন্যান্য অনেকে ব্রজের শ্রীকৃষ্ণকে লম্পট বলিতেও দ্বিধা বোধ করেন না। এক জন প্রবীণ উচ্চশিক্ষিত ব্রাহ্মভক্ত একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন, "Srikrishna was a pure man, there was no Rashlila," অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ এক জন পূতচরিত্র মানব ছিলেন, রাসলীলাটা হয়ই নাই, ওটা পরবর্ত্তী কবিকল্পিত ব্যাপার। বাঙ্গালাদেশের দুই এক জন প্রতিভাশালী সাহিত্যিকেরও এই মনোবৃত্তিটি বেশ সুপরিস্ফুট যে, তাঁহারা শ্রীভগবদবতারদিগের অলৌকিকত্ব বা ঈশ্বরত্ব মানিতে প্রস্তুত নহেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার "কৃষ্ণচরিতে" শ্রীকৃষ্ণের আদর্শমানবত্ব স্থাপন করিতে গিয়া তাঁহার ভগবত্তাকে খণ্ডন করিয়াছেন। ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেনের রচনাবলী পাঠে মনে হয়, তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের কোনও অলৌকিকত্ব স্বীকার করিতে চাহেন না। আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যাহা আমরা বুঝি নাই বা উপলব্ধি করি নাই, তাহাই স্বীকার করিব না, ইহা কিরূপ মনোভাব, তাহা বুঝা কঠিন। যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণের ব্রজমাধুর্য্যলীলা লৌকিক-দৃষ্টিতে সত্যই দোষের কি না এবং শাস্ত্রসিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্রজলীলার তত্ত্ব কি, এখানে আমরা তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনার প্রয়াস পাইতেছি।

শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা বুঝিতে হইলে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও গোপীতত্ত্ব কিঞ্চিৎ আলোচনা করা প্রয়োজন। কারণ, ইহা হৃদয়ঙ্গম হইলে লীলার তাৎপর্য্য অবধারণ করা সহজ হইয়া আসিবে।

পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদি পরিদৃশ্যমান বিশ্ব, এবং তাহার অতীত যাহা কিছু আছে বা থাকিতে পারে, তৎসমস্তের মূল যিনি এবং তৎসমস্ত যাঁহাতে অবস্থিত এবং যিনি তৎসমস্তের নিয়ন্তা, সমগ্র জীবজগৎ যাঁহা হইতে আসিয়াছে এবং যাঁহাতে ফিরিয়া যাইবে, যাঁহার প্রাপ্তি বা উপলব্ধি ভিন্ন মানুষের আত্যন্তিক দুঃখের নিবৃত্তি ও পরিপূর্ণ আনন্দের অধিকার লাভ হয় না,—যিনি, অনন্ত, অনাদি, শাশ্বত, সেই পূর্ণতম বস্তুকে ঋষিগণ ব্রহ্ম নামে অভিহিত করিয়াছেন। শ্রুতি বলেন—"পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে" ব্রহ্মের অনন্তবিধ শক্তি। অনন্তস্বরূপ শক্তির বৈচিত্র্য বশতঃ ব্রহ্ম অনাদিকাল হইতে অনন্তস্বরূপে আত্মপ্রকট করিয়া বিরাজিত। "একোঽপি সন্ বহুধা যো বিভাতি" তিনি অদ্বিতীয়, এক হইয়া বহুরূপে প্রতিভাত হয়েন।

তৈত্তিরীয় উপনিষৎ বলেন, "রসো বৈ সঃ"—তিনি রসস্বরূপ। রস শব্দের দুই অর্থ, রস্যতে ইতি রসঃ, এবং রসয়তি ইতি রসঃ। আস্বাদ্য বস্তুও রস এবং আস্বাদক যে, সে-ও রস। ব্রহ্ম এক হইয়াও অনন্তস্বরূপে বিদ্যমান্ এবং ভগবৎ শক্তিও সমস্ত স্বরূপে সমান বা সমজাতীয় নহে। যে স্বরূপে গুণের বা শক্তির পূর্ণতম বিকাশ, তাহাই পূর্ণব্রহ্মস্বরূপ এবং রসস্বরূপত্বের পূর্ণতম অভিব্যক্তি তাঁহাতেই। এই পূর্ণতম স্বরূপ রস-আস্বাদক হিসাবে রসিকেন্দ্র-চূড়ামণি, আবার স্বীয় অসমোর্দ্ধ রসমাধুর্য্যে নিখিল ব্রহ্মাণ্ড আকর্ষণ করেন বলিয়া তিনি রসনিধি। এই পরতত্ত্বকে ঋষিগণ শ্রীকৃষ্ণ নামে আখ্যাত করিয়াছেন। সমস্ত অংশস্বরূপের ইনিই অংশী। ইনি পরব্রহ্ম বা স্বয়ং ভগবান্।

শ্রীভগবান্ সচ্চিদানন্দময়। তাঁহার স্বরূপে সৎ, চিৎ ও আনন্দ, এই তিনটি বস্তু আছে। সৎস্বরূপে তিনি পরিপূর্ণ সত্তা, অনাদিকাল হইতে তিনি স্বয়ং সিদ্ধরূপে বিরাজিত, তিনি চিরকাল ছিলেন ও চিরকালই থাকিবেন; আবার যেখানে যত কিছু বস্তু আছে, সমস্তেরই সত্তার নিদান এক মাত্র তিনিই। চিৎস্বরূপে তিনি পরিপূর্ণ চৈতন্য, পূর্ণ চৈতন্য বলিয়াই তিনি জড়াতীত, জ্ঞানরূপী, স্বপ্রকাশ। আনন্দাংশের শক্তিকে বলে হ্লাদিনী। ইহা দ্বারা ভগবান নিজেও আনন্দ অনুভব করেন, এবং অপরকেও আনন্দদান করেন। জগৎ-প্রপঞ্চ এই আনন্দের আভাসেই পরিপূর্ণ।

পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে প্রকট লীলায় নরবপুতে অবতীর্ণ; তবে নরবপু হইলেও তাঁহার লীলা ঠিক নরলীলা নয়, "নরলীলার হয় অনুরূপ", প্রাকৃত নরের ন্যায় তাঁহার দেহ ও মনে সসীমতা বা Limitations নাই। শিশু কৃষ্ণের মুখমধ্যে যশোদা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দেখিয়াছিলেন,—সাকার নরদেহেই ইহা তাঁহার বিভুত্বের পরিচায়ক। সপ্তমবর্ষ বয়সে তিনি বাম করে গিরি ধারণ করিয়াছিলেন—প্রাকৃত নরদেহে ইহা সম্ভব হয় না। পুলিন-ভোজন কালে শ্রীকৃষ্ণ মধ্যস্থলে উপবিষ্ট, কিন্তু সব সখাই মনে করিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহারই দিকে চাহিয়া আছেন; রাসনৃত্যকালে প্রত্যেক গোপীর কাছে কৃষ্ণমূর্ত্তি। চিন্ময় দেহ না হইলে এরূপ অপ্রাকৃত ব্যাপার কি সম্ভব হয়? সুতরাং বুঝিতে হইবে, শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে নররূপে অবতীর্ণ হইলেও তিনি তোমার আমার ন্যায় মানুষ ছিলেন না, তাঁহার দেহও চিন্ময়, তাঁহার লীলাও চিন্ময়। তবে নরলীলার অনুরূপ হইলেই মাধুর্য্য আস্বাদনের পরিপাটি হয় বলিয়াই তিনি ব্রজে "গোপবেশ, বেণুকর, নবকিশোর, নটবর" হইয়াই আসিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীগৌরাঙ্গ একেবারেই একজন সাধারণ মানুষ, ইহা মনে করিয়াই আমরা গোড়ায় গলদ করিয়া বসি।

ব্রজের মাধুর্য্যরস শ্রীকৃষ্ণ ব্রজগোপীদিগকে লইয়াই আস্বাদন ও বিস্তার করিয়াছিলেন, এজন্য শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের ন্যায় গোপীতত্ত্ব না বুঝিলে ব্রজলীলা বুঝা যায় না। গোপীদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা শ্রীরাধিকা। এই শ্রীরাধিকা তত্ত্বতঃ কে?

সচ্চিদানন্দময় পরব্রহ্ম যদিও আত্মারাম, আপনাতে আপনি পূর্ণ, আপনার আনন্দশক্তিতেই আপনি বিভোর, তবুও লীলারস আস্বাদনের জন্য তিনি তাঁহার হ্লাদিনী শক্তিকে পৃথক্ করিয়াছেন। শ্রীরাধিকা মূর্ত্তিমতী হ্লাদিনী শক্তি, প্রেমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যময়ী সেবা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানই তাঁহার কার্য্য। রাধা পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান্। শক্তি ও শক্তিমানের ভেদ ও অভেদ, উভয়ই স্বীকৃত। অভেদরূপে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ একই স্বরূপ, কেবল লীলারস পুষ্টির জন্য তাঁহারা অনাদিকাল হইতে দুই স্বরূপে বিরাজিত। শ্রীযুক্ত কবিরাজ গোস্বামী মহোদয় সুন্দর তুলনা দিয়া বলিয়াছেন,—

> "রাধা পূর্ণ শক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান্।
> দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র পরমাণ ॥
> মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।
> অগ্নি-জ্বালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ ॥
> রাধা-কৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
> লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ ॥"

কস্তুরী ও তাহার সৌরভ যেমন অভিন্ন, কস্তুরীকে বাদ দিয়া তাহার সৌরভের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না, অথচ কস্তুরী ও সৌরভ ভিন্ন বস্তু। যেমন অগ্নি ও তাহার দাহিকা-শক্তি অভিন্ন, অগ্নি থাকিলেই তাহার দাহিকাশক্তি থাকিবে এবং দাহিকাশক্তি থাকিলেই সেখানে অগ্নির অস্তিত্ব বুঝিতে হইবে, পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার হ্লাদিনী শক্তি শ্রীরাধিকা সেইরূপ ওতপ্রোতভাবে সন্নিবদ্ধ একই বস্তু। শুধু আস্বাদন-বৈচিত্র্যের উদ্দেশ্যে দুই স্বরূপে অনাদিকাল হইতে বিরাজিত।

শ্রীভগবদুদ্দিষ্ট প্রেম কি বস্তু, প্রাকৃত মন দিয়া তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করা যায় না। হ্লাদিনীর সার হইল প্রেম। প্রেমের গাঢ় হইতে গাঢ়তর অবস্থা ক্রমে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাবে উন্নীত হয়। প্রেম-বিকাশের এই সমস্ত বিভিন্ন স্তরের অনেক বৈচিত্র্য আছে। যে অবস্থায় সমস্ত প্রকার প্রেমবৈচিত্র্যের যুগপৎ অনুভূত হয়, তাহা মাদনাখ্য মহাভাব নামে অভিহিত। অনন্ত গোপীযূথের মধ্যে একমাত্র শ্রীরাধিকা ভিন্ন অন্য কেহ এই অবস্থার অধিকারী নহেন; তাই তিনি কান্তা-শিরোমণি। সমস্ত ভগবৎস্বরূপের কান্তাগণের তিনিই অংশিনী। দ্বারকায় মহিষীগণের, বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীগণের, ব্রজে মাতৃগণের ও সখাগণের প্রীতিধারার মূল উৎস শ্রীরাধিকা, অন্য কেহ নহেন।

যদিও শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত শক্তির, ঐশ্বর্য্যের ও মাধুর্য্যের আধার, তবুও প্রেমের সর্ব্বাতিশায়িনী অভিব্যক্তিতে শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যন্ত শ্রীরাধিকার নিকট পরাভূত। শ্রীমতীর প্রেম এইজন্য ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণকে ক্রীড়নকের মতই নাচাইয়াছে :—

"কৃষ্ণ কহে আমি হই চিন্ময় পূর্ণতত্ত্ব।
রাধিকার প্রেমে আমায় করায় উন্মত্ত॥
না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল।
যে বলে আমারে করে সর্ব্বদা বিহ্বল॥
রাধিকার প্রেম গুরু, আমি শিষ্য, নট।
সদা আমার নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট॥"—চৈঃ চঃ।

শ্রীকৃষ্ণ পরম স্বতন্ত্র পুরুষ হইয়াও প্রেমের বশীভূত। ইহা তাঁহার ঐশী প্রকৃতি। যে ভক্তে প্রেমের বিকাশ যত বেশী, তাঁহার নিকট কৃষ্ণচন্দ্রের বশ্যতাও তত বেশী। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণ মানভঞ্জনের জন্য যদি শ্রীরাধার "পদপল্লবমুদারম্" ধারণ করিয়াই থাকেন, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-মর্য্যাদার কোন হানিই হয় নাই, বরং তাহাতে তিনি পূর্ণ হ্লাদিনী শক্তির মর্য্যাদা বাড়াইয়া নিজেরই ভক্তবাৎসল্য প্রকৃতির মর্য্যাদা বাড়াইয়াছেন। অধিক কি, শ্রীরাধার প্রেমবৈচিত্র্য দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ নিজেই স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন, এবং শ্রীরাধার প্রণয়-বৈদগ্ধ্যই বা কিরূপ এবং যে মাধুর্য্য শ্রীরাধাকে এমন পাগল করিয়া তোলে, সেই নিজ মাধুর্য্যই বা কিরূপ, শ্রীকৃষ্ণ নিজেই তাহা একবার আস্বাদন করিবার জন্য লুব্ধ হইয়া উঠিলেন।

"শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুত-মধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভাৎ
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥"

অর্থাৎ—

কৈছন তুয়া প্রেমা, কৈছন মধুরিমা
কৈছন ভাবে তুঁহু ভোর।
এ তিন বাঞ্ছিত ধন ব্রজে নহিল পূরণ,
না পাইয়া ভাবের ওর॥

এই লোভে পড়িয়াই ত নূতন মূর্ত্তিতে তাঁহাকে আবার আসিতে হইয়াছিল।

প্রশ্ন হইতে পারে, যদি শ্রীরাধিকাই স্বয়ং পূর্ণ হ্লাদিনী শক্তি হয়েন, তাহা হইলে লীলাস্থলে অগণিত গোপীবৃন্দের আবশ্যকতা কি? আবশ্যকতা এই যে, বহু কান্তা ব্যতীত কান্তারস-বৈচিত্র্যের উল্লাস হয় না। এই নিমিত্ত মূল হ্লাদিনী শক্তি অসংখ্য গোপীরূপে প্রকট হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণকান্তা গোপীগণ সকলেই শ্রীরাধিকার কায়ব্যূহরূপা। শ্রীরাধা প্রেমকল্পলতা সদৃশ, ব্রজদেবীগণ তাহার শাখাপত্র তুল্য। 'গুপ্' ধাতু হইতে গোপী শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। "গুপ্" ধাতু রক্ষণ অর্থে প্রসিদ্ধ। যে সমস্ত রমণী শ্রীকৃষ্ণ-বশীকরণযোগ্য প্রেম বা মহাভাব গোপনে রক্ষা করেন, তাঁহারাই গোপী।

গোপীগণের প্রেমের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, এই প্রেমে তাঁহাদের আত্মসুখের লেশমাত্রেরও অভিসন্ধি নাই। শ্রীকৃষ্ণকে সুখদান ভিন্ন অন্য কিছু তাঁহাদের মনেই আসে না। "আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম। কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম॥" শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমের এই সংজ্ঞাটি বড়ই সুন্দর। প্রাকৃত প্রেমে ও ভগবৎ-প্রেমে এইখানেই মূলগত পার্থক্য। প্রাকৃতপ্রেম যতই স্বার্থশূন্য হউক, তবুও কিঞ্চিৎ স্বসুখবাসনা তন্মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকিবেই। শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান ও শ্রীকৃষ্ণ-সেবা ভিন্ন গোপীদের অন্য কোন কার্য্যই নাই। কৃষ্ণসেবাই তাঁহাদের পরম পুরুষার্থ। স্বসুখার্থ তাঁহারা কৃষ্ণের সহিত সঙ্গম ইচ্ছা করেন না। তবে যে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে দেহ দান করেন, তাহার হেতু—"মোর সুখ সেবনে কৃষ্ণের সুখ সঙ্গমে, অতএব দেহ দেই দান। কৃষ্ণ মোরে কান্তা করি কহে তুমি প্রাণেশ্বরী, মোর হয় দাসী-অভিমান।" গোপীগণ যে স্বীয় দেহে মার্জ্জন ভূষণ করেন, তাহাও কৃষ্ণপ্রীতির নিমিত্ত। গোপীদিগের-কৃষ্ণ-সেবা-লালসা এত প্রবল যে, তজ্জন্য তাঁহারা লোকধর্ম্ম, বিধিধর্ম্ম, স্বজন, আর্য্যপথাদি সমস্তই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এমন কি, নারীর প্রকৃতিগত দুর্ব্বলতা লজ্জা পর্য্যন্তও তাঁহারা বিসর্জ্জন দিয়াছেন। দ্বারকার মহিষীগণ ও বৈকুণ্ঠ-অধীশ্বরী লক্ষ্মীও শ্রীকৃষ্ণসেবায় তন্ময় ছিলেন বটে, কিন্তু এতখানি উন্মাদনা কোথাও দেখা যায় নাই। তাঁহারাও বিরহে কাতর হইতেন, কিন্তু বিহনে গোপীগণের সত্তা ধারণ করাই অসম্ভব ছিল। মীনের নিকট যেমন জল, কৃষ্ণ গোপীদিগের নিকট তদ্রূপই ছিলেন। তাই শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদের এত বশীভূত এবং শ্রীকৃষ্ণের

মদনমোহন মাধুর্য্য তাঁহারা এত বিচিত্র ও ব্যাপকভাবে আস্বাদন করিতে পারিয়াছিলেন যে, তপস্বী সাধকগণের পক্ষেও এমন অনন্যচিত্ত ভাবে শ্রীভগবানের ধ্যানে তন্ময় হওয়া সম্ভবপর হয় নাই।

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকা বা গোপীগণ স্বরূপতঃ কি বস্তু, এবং তাঁহাদের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধই বা কি, তাহা নির্ণয় হইয়া গেলে ব্রজপ্রেমের স্বরূপ বুঝিতে বিলম্ব হইবে না। আনন্দস্বরূপ স্বীয় আনন্দ শক্তিকে পৃথক্ করিয়া আনন্দ-লীলাবৈচিত্র্য আস্বাদন করিয়াছিলেন, মায়ার প্রবেশ এখানে নিষিদ্ধ, সুতরাং প্রাকৃত বুদ্ধি প্রাকৃত বাসনার নামগন্ধও এখানে নাই। ইহা ভগবল্লীলা মাত্র। শ্রীভগবানে কোনও অপূর্ণতা নাই। সুতরাং এই লীলায় কোনও দোষ বা অপূর্ণতা আসিতে পারে না।

শ্রীভগবানের লীলা দ্বিবিধ, প্রকট ও অপ্রকট। উভয় লীলাই নিত্য হইলেও বৈচিত্র্যের তারতম্য আছে। শ্রীকৃষ্ণের প্রকট ব্রজলীলায় যোগমায়ার একটি প্রধান স্থান আছে। দুই ব্যক্তির ভিতরে যদি কোনও সত্যকারের রহস্য করিতে হয়, তাহা হইলে তৃতীয় কোনও ব্যক্তির ঐ রহস্য-পরিপোষক অবস্থার সৃষ্টি উভয়ের অজ্ঞাতসারেই করিতে হয়। ব্রজ লীলায় যোগমায়া কতকটা সেই প্রকারের কার্য্য করিয়াছিলেন, যোগমায়া শ্রীভগবানের অঘটন ঘটন-পটিয়সী অন্তরঙ্গা শক্তি। যদিও শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাপ্রভাবেই ইহার শক্তি ও কার্য্যকারিতা, তবুও ইনি লীলার সহায়কারিণী না হইলে ব্রজলীলা এত রসবৈচিত্র্য পূর্ণ হইতে পারিত না।

শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তিরূপে স্বকীয়া শক্তি হইলেও ব্রজে শ্রীরাধা ও অন্যান্য গোপীগণের পরপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের নিকট পরকীয়া নারী সাজাইবার কি প্রয়োজন ছিল, সামান্য একটু চিন্তা করিলেই তাহা বুঝা যাইবে।

যে বস্তু যত সহজলভ্য, তাহার চমৎকারিত্ব ততই কম। ভালবাসা এবং ভালবাসার মিলন যদি একান্ত স্বাভাবিক ও স্বতঃপ্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে ভালবাসার আনন্দ ও মিলনের চমৎকারিত্ব সবিশেষ থাকে না। হৃদয় যদি কাহারও প্রতি ছুটিয়া যায়, তাহা হইলে বিধিনিয়ম যতই তাহাকে বাধা দিতে থাকে, ততই তাহার শক্তি বাড়ে এবং মিলনপথে যতই বিঘ্নের সৃষ্টি হয়, মিলনের নিমিত্ত ব্যাকুলতা ও উৎকণ্ঠা ততই বাড়িয়া উঠে। স্বকীয়া কান্তা বা স্বকীয় পতির এইরূপ প্রেমের আদান-প্রদানে গুরুতর বাধা-বিঘ্ন কিছুই না থাকায় উৎকণ্ঠা বৃদ্ধির আদৌ অবকাশ থাকে না; কাযেই মিলনে চমৎকারিত্বেও অভাব ঘটে। কিন্তু পরকীয় নায়ক-নায়িকার মিলনে ধর্ম্ম ও সমাজ যতই বাধা-বিঘ্ন উপস্থিত করে, ততই প্রেমের শক্তি ও মিলনেও আগ্রহ বর্দ্ধিত হইয়া অদ্ভুত বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করে। কবিরাজ গোস্বামী তাই বলিয়াছেন, "পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস। ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস।" এই রসের উল্লাস ঘটাইবার জন্য যোগমায়া এক অদ্ভুত কৌশল করিলেন। ব্রজে প্রকট লীলায় শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা প্রভৃতির প্রাকৃতবৎ জন্মের সুযোগ লইয়া তাঁহাদের স্বকীয় সম্বন্ধের জ্ঞান আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু তাঁহাদের স্বরূপসিদ্ধ প্রীতি ও আকর্ষণ ঠিকই রহিল, ফলে তাহা পরস্পরের রূপগুণাদিকে আশ্রয় করিয়া উত্তরোত্তর বিকশিত হইতে লাগিল। নিরতিশয় রসবৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য উৎকণ্ঠার প্রাবল্য আবশ্যক, সেই কারণে যোগমায়া তাঁহাদের মিলনে এক গুরুতর বিঘ্ন জন্মাইলেন—গোপকুমারীগণের শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্যান্য গোপগণের সহিত বিবাহ-বন্ধন স্থির করিলেন, এবং ঠিক লৌকিক ব্যবহারে বিবাহ-অনুষ্ঠান না করিয়াও যোগমায়া নিজ শক্তি-বলে স্বপ্ন-ব্যপদেশে সকলের মনে বিবাহ-সিদ্ধির প্রতীতি জন্মাইলেন। এইরূপে রসোদ্গার-সৌকর্য্যার্থে যোগমায়া কৌশলপূর্ব্বক গোপসুন্দরীগণকে তাঁহাদের রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণের নিকট লৌকিক দৃষ্টিতে পরপত্নীরূপে প্রতিপন্ন করিলেন। ব্রজাঙ্গনাগণ পরপত্নী হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনে যতই বাধা পাইতে লাগিলেন, ততই তাঁহাদের অনুরাগ-উৎকণ্ঠা প্রবলতর হইতে লাগিল এবং অবশেষে এক দিন তাহা জাতি-কুলমানের বাঁধ ভাঙ্গিয়া ফেলিল। কিন্তু পর-পত্নীত্বের অপবাদহেতু গোপললনাগণকে সর্ব্বদাই গোপনতার আশ্রয় লইতে হইত; তাহার ফলে হইল এই যে, "কভু মিলে, কভু না মিলে, দৈবের ঘটন।" কাযেই উভয় পক্ষের মিলনোৎকণ্ঠা বর্দ্ধনের অবকাশ সর্ব্বদাই থাকিত এবং প্রেমা-স্বাদনের চমৎকারিতা চিরদিন নব নব রূপে উছল হইত।

পরকীয়াত্ব কল্পনার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ইহাই। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিকট কোন দিনই পরপত্নী নহেন, সুতরাং লাম্পট্যের প্রশ্নই উঠিতে পারে না। তবুও একটি জিজ্ঞাস্য এই হইতে পারে যে, গোপগণ ত জানিতেন না যে, তাঁহা

পত্নীগণ শ্রীকৃষ্ণেরই শক্তিস্বরূপা ; সুতরাং যখন গোপিনীগণ গৃহত্যাগ পূর্ব্বক নিশীথে শ্রীকৃষ্ণ-সন্নিধানে গিয়া তাঁহার সহিত বিহার করিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা নিন্দনীয়া হইবেন না কেন? এই সন্দেহ-নিরসনার্থে শ্রীমদ্ভাগবতকার লিখিতেছেন :—

"নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায় মোহিতাস্তস্য মায়য়া।
মন্যমানাঃ স্বপার্শ্বস্থান স্বান স্বান দারান ব্রজৌকসঃ॥"

শ্রীকৃষ্ণের মায়ায় মোহিত হইয়া গোপগণ স্ব স্ব পত্নীকে নিজ পার্শ্বে শায়িতা বলিয়াই মনে করিতেন, সেই জন্য শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কোনও অসূয়া প্রকাশ করিতেন না। স্বতঃই বুঝা যাইতেছে যে, গোপীগণ যখন নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া আসিতেন, তখন যোগমায়া মায়াসৃষ্ট গোপীগণকে লুকাইয়া ফেলিতেন।

যদি তর্ক করা যায় যে, গোপীগণ যখন নিজদিগকে পরপত্নী বলিয়াই জানিতেন এবং যোগমায়া কর্ত্তৃক তাঁহাদের প্রতিনিধি-মূর্ত্তি সৃষ্টি প্রভৃতি রহস্য যখন তাঁহারা সাক্ষাৎভাবে অবগত ছিলেন না, তখন ব্রজের সমাজ তাঁহাদের গতিবিধির খবর না রাখিলেও, তাঁহারা নিজেদের কাছে নিজেরা ভ্রষ্টা হইবেন না কেন? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, ব্রজগোপীদিগের শ্রীকৃষ্ণে যদি পরপুরুষ জ্ঞান থাকে, তবেই ত নিন্দার প্রশ্ন উঠিতে পারে. কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত বা অন্য যে কোনও পুরাণ পাঠ করা যায়, তাহাতেই দেখা যায় যে, ব্রজগোপীদিগের শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ভগবদ্‌জ্ঞান ছিল, কিন্তু এই যে ভগবদ্‌জ্ঞান বা ঐশ্বর্য্যবুদ্ধি, ইহা তাঁহাদের প্রবল মাধুর্য্যানুভূতির মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবেই নিহিত থাকিত। সাধারণতঃ উহা বাহিরে প্রকাশ পাইত না ; কদাচিৎ কোনও অবস্থাবিপর্য্যয়ে অভিব্যক্ত হইত। যেমন কটাহপূর্ণ ফুটন্ত দুগ্ধের মধ্যে তৃণখণ্ড পড়িলে উহা কখনও একবার দেখা যায়, আবার ডুবিয়া যায়, তেমনি ব্রজদেবীগণের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভগবদ্‌বুদ্ধি ঘটনাপ্রসঙ্গে কদাচিৎ প্রকাশিত হইত, কান্তারসপ্রাচুর্য্যে আবার উহা ডুবিয়া যাইত। যখন শ্রীকৃষ্ণ রাসক্ষেত্রে সমাগতা ব্রজাঙ্গনাগণকে সদুপদেশ প্রদান করিয়া গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইতে বলিয়াছিলেন, তখন অশ্রুপ্লুত-নয়নে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন :—

"শ্রীর্যৎপদাম্বুজরজশ্চকমে তুলস্যা
লব্ধাপি বক্ষসি পদং কিল ভৃত্যজুষ্টম্।
যস্যাঃ স্ববীক্ষণ উতান্যসুরপ্রয়াস
স্তদ্বদ বয়ঞ্চ তব পাদরজঃ প্রপন্নাঃ॥"

অর্থাৎ, যে কমলার প্রসন্নদৃষ্টি লাভ করিবার জন্য যাবতীয় দেবতাগণের প্রয়াস, সেই লক্ষ্মী তোমার বক্ষস্থলে স্থানলাভ করিয়াও তুলসীর সহিত একত্রে তোমারই ভক্তগণ-সেবিত চরণ-রেণু প্রার্থনা করিয়াছিলেন, আমরাও তাঁহার ন্যায় তোমার চরণধূলির শরণাপন্ন হইয়াছি। পুনরায় যখন শ্রীকৃষ্ণ কিছুক্ষণ গোপিকাগণের সহিত নৃত্যগীতাদি করিয়া তাঁহাদের সৌভাগ্যমদ দূর করিবার জন্য সহসা অন্তর্হিত হইলেন, তখন বিরহার্ত্ত গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের স্তবস্তুতি ও মহিমাকীর্ত্তনচ্ছলে বলিয়াছিলেন :

"ন খলু গোপিকানন্দনো ভবানখিলদেহিনামন্তরাত্মদৃক্।
বিখনসার্থিত বিশ্বগুপ্তয়ে সখ উদেয়িবান সাত্বতাং কুলে॥"

অর্থাৎ, হে সখে তুমি কখনই যশোদা-গোপীর তনয় নহ, কেন না, তাহা হইলে তোমার এত প্রভাব হইত না। তুমি নিখিল প্রাণীর অন্তর্যামী সাক্ষীস্বরূপ। শুধু ব্রহ্মার প্রার্থনায় নিখিল বিশ্বের রক্ষার নিমিত্ত যদুকুলে অবতীর্ণ হইয়াছ।

শ্রীগোপিকাদিগের এইরূপ উক্তি আরও বহু স্থলে প্রকাশ পাইয়াছে। ইহা দ্বারা কি বুঝা যায় না যে, নন্দনন্দন শ্রীগোবিন্দকে তাঁহারা পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্ বলিয়া পূর্ণরূপেই জানিতে পারিয়াছিলেন? জ্ঞান ও কর্ম্ম ভক্তির অনুচর। হৃদয়-সরসী-নীরে যখন প্রেমারুণের আলোক-সম্পাত হয়, তখন জ্ঞান ও কর্ম্মযোগের যুগল কমল আপনিই ফুটিয়া উঠে। তাই আমরা দেখিতে পাই, ব্রজগোপীদের পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মে অখিল কর্ম্ম সমর্পণ হইয়াছিল। সেই জ্ঞান ও সেই আত্মসমর্পণে সম্পূর্ণ সিদ্ধি যাহারা লাভ করেন নাই, তাঁহারা ত রাসে যাইতে পারেন নাই। তাই যজ্ঞপত্নীগণ কৃষ্ণপ্রেমিকা হইয়াও গৃহে রহিয়া গেলেন, ব্রজগোপীদের মধ্যেও সকলেই গৃহত্যাগ করিতে পারেন নাই, অনেকে মানসদেহে কৃষ্ণকে পাইয়াছিলেন। গৃহত্যাগিনী উন্মাদিনীগণ কি ব্রজেন্দ্রনন্দনকে উপপতি বলিয়া জানিতেন? সেই উপপতিকে পাইবার জন্য কে কবে ব্রতচারিণী হইয়া কাত্যায়নী পূজা করিয়াছে? ইন্দ্রিয়োৎসব করিবার জন্য কে কবে ডাকিয়া হাঁকিয়া হাজার হাজার দল বাঁধিয়া ছুটিয়াছে? "শ্যামের বাঁশরী বাজিল যমুনায়, তোরা কে কে যাবি আয়।"

প্রকৃত জগতে ইহা কি কভু সম্ভব, না কল্পনার যোগ্য ? শ্রীকৃষ্ণ যদি ব্রজদেবীগণের নিকট সুপরিজ্ঞাত পরমাত্মা স্বরূপই হয়েন, তাহা হইলে পরপুরুষত্বের অবসান সেখানেই হইয়া যায়। কারণ, পরমাত্মা নিখিল জীবাত্মার উৎপত্তি ও নিলয়স্থল স্বরূপ একই বস্তু, সুতরাং তাহাতে গোপীদিগের পতিপুত্র সবই সন্নিহিত আছে। তত্ত্বতঃ যখন শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের পতি হইতে অভিন্ন এবং সেই তত্ত্বজ্ঞান যখন গোপীদিগের ছিল, তখন শ্রীকৃষ্ণে গোপীদিগের পরপতিত্ব আরোপ করা সম্পূর্ণ ভ্রম। নিখিল জীবের বন্ধু তিনি, পিতা তিনি, পতি তিনি। মাধুর্যভাবের অধিকারী যে, সে শ্রীভগবানকে পতিরূপে ভজনা করিয়া ধন্য হয়।

কুটতার্কিক হয় ত বলিতে পারেন যে, গৃহত্যাগিনী গোপীগণ নিশ্চয়ই তাঁহাদের পতি পুত্র ও মাতাপিতার প্রতি কর্ত্তব্যহানি করিয়া আশ্রমধর্ম্মে পতিত হইয়াছিলেন। কারণ, যোগমায়াসৃষ্ট তাঁহাদের দ্বিতীয়কল্প মূর্ত্তির সংবাদই তাঁহারা জ্ঞাত ছিলেন না। এই অভিযোগের উত্তরে ইহাই বক্তব্য যে, যদিও লোকধর্ম্মানুসারে পতিপুত্রাদির সেবা করা ও কুলশীল রক্ষা করা স্ত্রীলোকমাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য, কিন্তু লোকধর্ম্মের উপরেও ধর্ম্ম আছে, উহা অধ্যাত্মধর্ম্ম। প্রাণ যখন ভগবানের জন্য কাঁদিয়া উঠে, তখন সকল বাঁধন আপনা হইতেই ছুটিয়া যায়, দেহ-গেহ-স্বজন-পরিজন মন হইতে সবই খসিয়া পড়ে। ইহাতে ধর্ম্মচ্যুত হইতে হয় না, শাস্ত্রসম্মত ইহাই সাধন-জীবনের এক অতি বাঞ্ছনীয় অবস্থা। এই অবস্থা লাভ করিবার পর যোগী ঋষিগণ সমগ্র জীবন কৃচ্ছ্র তপস্যা করেন। ব্রজগোপীগণ অতি সহজেই সেই অবস্থার অধিকারী হইয়াছিলেন, জন্ম-জন্মান্তরের হৃদয়গ্রন্থি হেলায় ছিন্ন করিয়াছিলেন, তাঁহারা আমাদের চির-নমস্য, চির-আদর্শ ও আশ্রয়।

চিন্ময় ব্রহ্মের এই পরকীয়া-লীলা জীবজগতে এক অপূর্ব্ব আদর্শ। শ্রীভগবানকে একান্ত প্রিয়তমরূপে পাইতে হইলে সর্ব্বহারা গোপীদের ন্যায়ই প্রেমে পাগল হইতে হইবে। আমরাও ত মূলতঃ তাঁহার নিতান্ত আপন, অমৃতের সন্তান। জন্মজন্মান্তর ধরিয়া আমরা সেই অমৃতের সন্ধানেই ঘুরি। যে চিরন্তন সুখ-পিপাসা আমাদের অন্তঃসত্তায় বিরাজমান, তাহা আমাদের স্বভাবসিদ্ধ ও নিত্য-সত্য। "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।" সমস্ত প্রাণী আনন্দ হইতে জন্মিয়াছে এবং আনন্দ লইয়াই বাঁচিয়া আছে। কি সংসারে আমরা সুখ-মরীচিকার আশায় এত ছুটিয়াও সুখ পাই না কেন ? "ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি," আমরা অ লইয়া থাকি, তাই আনন্দের আভাস এই আসে এই যায় ভূমাস্বরূপ শ্রীভগবানই আনন্দের খনি, তাঁহাকে না পাইলে বিশ্ব-জগতের কিছুতেই আমাদের তৃপ্তি আসিবে না। "রস হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি," তাঁহাকে পাইলে তবেই আনন্দে তৃষ্ণা মিটিবে।

স্বকীয়া পরকীয়ার প্রশ্ন বাদ দিলেও এই সন্দেহ আসিতে পারে যে, ব্রজবালাগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের যে কান্তভাবে লীলা, তাহাতে আসঙ্গলিপ্সার আভাস আছে কি না ? ব্রজ প্রেম চিন্ময় বস্তু, তবুও নরলীলার অনুরূপ বলিয়া নরানুরূপ কতকগুলি ক্রিয়া ঘটিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রজগোপীগণ পরস্পরের প্রীতি আস্বাদন করিবার নিমিত্তই মিলনেচ্ছু করিতেন। আত্মসুখ-সম্ভোগের জন্য—তাঁহাদের মিলন নহে বাহ্য ক্রিয়াগুলি তাঁহাদের প্রীতি-প্রকাশের অনুভূতি। মাতা বা পিতা কিংবা পিতামহ ক্ষুদ্র শিশুকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া কতই চুমা দেন, উহাতে তাঁহাদের নিজ তৃপ্তি থাকিলেও উহাকে কেহ কামাচার মনে করে না। উহা তাঁহাদের স্বতঃস্ফূর্ত্ত স্নেহের উচ্ছ্বাসমাত্র ; তেমনই শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রজনারী গণের চুম্বন-আলিঙ্গনাদি তাঁহাদের প্রীতির অনুভূতির বাহ্যিক বিকাশ মাত্র। যে আনন্দের কণামাত্রের আস্বাদ পাইলে জীব বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া হাসে, কাঁদে, নাচে, গায়, সে আনন্দানুভূতি প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। ব্রজগোপীগণ সেই অনুপম মাধুর্য্য-উচ্ছ্বসিত অসীম আনন্দের অতল সাগরে হাবুডুবু খাইতেন। দেহ, গেহ প্রভৃতির জ্ঞানই তাঁহাদের ছিল না, তুচ্ছ কাম ত দূরের কথা।

সন্দেহ হইতে পারে, শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া গোপীগণ যখন আনন্দে উৎফুল্ল হইতেন, তখন নিশ্চয়ই তাঁহাদের অন্তরের অন্তঃস্থলে আত্মসুখের কামনা ছিল। কৃষ্ণদর্শনে গোপীগণের সেই আনন্দ যে কৃষ্ণকে অধিকতর সুখী করিবার একমাত্র অভিলাষ, কবিরাজ গোস্বামী পয়ারে তাহা সুন্দররূপে ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন :—

"আত্মসুখ-দুঃখ গোপীর নাহিক বিচার।
কৃষ্ণসুখ হেতু চেষ্টা মনোব্যবহার ॥

"কৃষ্ণ লাগি আর সব করি পরিত্যাগ।
কৃষ্ণসুখ হেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ॥
* * *
গোপীগণ করে যবে কৃষ্ণ দরশন।
সুখবাঞ্ছা নাহি, সুখ হয় কোটি গুণ॥
গোপিকা-দর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়।
তাহা হৈতে কোটিগুণ গোপী আস্বাদয়॥
তাঁ সভার নাহি নিজ সুখ অনুরোধ।
তথাপি বাড়য়ে সুখ পড়িল বিরোধ॥
এ বিরোধের এই এক দেখি সমাধান।
গোপিকার সুখ কৃষ্ণ সুখে পর্য্যবসান॥
গোপিকা দর্শনে কৃষ্ণের বাড়ে প্রফুল্লতা।
সে মাধুর্য্য বাড়ে যার নাহিক সমতা॥
আমার দর্শনে কৃষ্ণ পাইল এত সুখ।
এই সুখে গোপীর প্রফুল্ল অঙ্গ মুখ॥
গোপীশোভা দেখি কৃষ্ণের শোভা বাড়ে যত।
কৃষ্ণশোভা দেখি গোপীর শোভা বাড়ে তত॥
এই মত পরস্পরে পড়ে হুড়াহুড়ি।
পরস্পর বাড়ে কেহ মুখ নাহি মুড়ি॥
কিন্তু কৃষ্ণের সুখ হয় গোপীরূপগুণে।
তার সুখে সুখবৃদ্ধি হয় গোপীগণে॥
অতএব সেই সুখে কৃষ্ণসুখ পোষে।
এই হেতু গোপীপ্রেমে নাহি কামদোষে॥"

চৈঃ চঃ। আদি, ৪র্থ পঃ।

দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্যে ভালবাসার পরাকাষ্ঠা থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণকে দেহদান করা সম্ভব হয় না। একমাত্র মাধুর্য্যেই ইহা সম্ভব, অথচ মাধুর্য্যে পূর্ব্বোক্ত তিন রসেরই সমাবেশ আছে। সন্দেহ হইতে পারে—গোপীগণের যখন দেহাসক্তি বা দেহজ্ঞানই ছিল না, তখন তাঁহারা নিজদেহের সাজ-সজ্জা করিতেন কেন?

"এ দেহ দর্শন স্পর্শে কৃষ্ণ-সন্তোষণ।
এই লাগি করে দেহের মার্জ্জন ভূষণ॥"

প্রাকৃত জগতের নায়ক-নায়িকার প্রেমে কি এইরূপ ভাব সম্ভাব্য? গোপীগণ নিজাঙ্গ দান দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সেবা র সময়েও স্বসুখ-বাসনার স্ফূর্তিমাত্রও তাঁহাদের মনে

"যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিং স্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ॥"

প্রাকৃত কামের লেশমাত্রও যদি গোপীদিগের থাকিত, তাহা হইলে, এই অবস্থায়, তাঁহারা 'ভীতা' ও 'ধীরা' হইতেন না। শ্রীকৃষ্ণতন্ময়তায় আত্মবিলোপের ইহা অপেক্ষা অধিকতর প্রমাণ আর কি হইতে পারে?

তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে, ব্রজলীলার মাধুর্য্যবৈচিত্র্যে কামের নামগন্ধও নাই। উহা কামরাজ্যের পরপারে অবস্থিত। কামই যেখানে নাই, সেখানে ব্যভিচার বা লাম্পট্যের প্রশ্নই আসে না।

ব্রজলীলা প্রাকৃত নরলীলা নহে, সুতরাং প্রাকৃত দৃষ্টি দ্বারা ইহার বিচার হইতে পারে না। তবুও যদি প্রাকৃত ভাবে ধরা যায়, তাহা হইলেও ব্রজলীলায় দৈহিক মিলন কল্পনার পূর্ব্বে দুইটি বিষয় চিন্তা করা আবশ্যক। প্রথমতঃ ষোড়শ সহস্র এক শত ব্রজনারী রাসে গিয়াছিলেন, শ্রীরাধিকাও কৃষ্ণমিলনে বহু সখীজন পরিবৃত হইয়া থাকিতেন। বাস্তব ব্যভিচার কি এইরূপ সঙ্ঘবদ্ধ (organised বা corporate) ভাবে হয়? দ্বিতীয়তঃ—ব্রজলীলা শ্রীকৃষ্ণ অষ্টম বর্ষ বয়সেই সমাপ্ত করেন। আট বৎসরের কিশোর বালকের নিকট ষোল হাজার কুমারী, বিবাহিতা ও সন্তানবতী রমণী দৈহিক সুখসম্ভোগের প্রার্থিনী হইয়া গিয়াছিলেন, এ কথা যুক্তিসহ কি?

মহারাজ পরীক্ষিতের সভাতেও এই প্রশ্ন উঠিয়াছিল। মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, ধর্ম্মের সংস্থাপক ও অধর্ম্ম-বিনাশক আপ্তকাম শ্রীকৃষ্ণ পরদারাভিমর্ষণরূপ জুগুপ্সিত কার্য্য কেন করিলেন? শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বলিতেছেন—

"ধর্ম্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্।
তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা॥
নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্ মৌঢ্যাদ্ যথাহরুদ্রোহব্ধিজং বিষম্॥
ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরিতং ক্বচিৎ।
তেষাং যৎ স্ববচোযুক্তং বুদ্ধিমাংস্তৎ সমাচরেৎ॥
কুশলাচরিতেনৈষামিহ স্বার্থো ন বিদ্যতে।
[illegible]॥"

প্রশ্নটি যে পরীক্ষিতের নিজস্ব নহে, শ্রীল শুকদেব তাহা জানিতেন। কারণ, আজন্মভক্ত মহারাজ পরীক্ষিত ব্রজলীলার অন্তর্নিহিত সত্য সম্যগ্‌ভাবেই অবগত ছিলেন। প্রকৃত-পক্ষে প্রশ্নটি পরীক্ষিত মহারাজের সভাস্থিত সাধারণ ব্যক্তি-বর্গের, তাহাদের মনোগত সন্দেহ বুঝিয়াই উহা নিরসনার্থে মহারাজ স্বয়ং প্রশ্নটি করিয়াছিলেন। সূক্ষ্মদর্শী শুকদেব উহা বুঝিতে পারিয়া সাধারণ জনগণের উপযুক্ত উত্তরই দিয়াছিলেন। সেই উত্তরের সার মর্ম্ম এইরূপ:-- ধর্ম্ম বলিতে সাধারণতঃ আমরা যাহা বুঝি, উহা মানবীয় ধর্ম্ম এবং মানবের পক্ষেই উহা প্রযোজ্য। দেবতাগণের পক্ষে উহা প্রযোজ্য হয় না। ইন্দ্র, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতা-গণও কখনও কখনও শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন করিয়াছেন, কিন্তু পতিত হয়েন নাই অথবা কঠোর প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাপ ক্ষালন করিয়াছেন। যেমন অগ্নি সর্ব্বভুক্, সুতরাং তাঁহাকে অভক্ষ্যভোজন ও জীববধাদি করিতে হয়, তবুও তিনি অপবিত্র হয়েন না, তদ্রূপ মানব-দেহমনের শক্তি-সীমার বহু উর্দ্ধে অবস্থিত, অতি তেজস্বী দেবগণ আপাত-প্রতীয়মান ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্য করিয়াও সর্ব্বত্র দোষভাগী হয়েন না। দেবগণের পক্ষেই যদি এই কথা সত্য হয়, তাহা হইলে দেবতাদিগের আরাধ্য শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে ইহা যে আরও সত্য, তাহা সহজেই অনুমেয়।

শ্রীভগবৎ-তত্ত্ব বিষয়ে যাহারা অজ্ঞ, শ্রীকৃষ্ণকে তাহারা একজন সাধারণ শক্তিশালী মানব মনে করিয়া মোহবশতঃ তাঁহার ক্রিয়াদির পাছে অনুকরণ করে, এই জন্য শুকদেব তাহাদিগকে সাবধান করিবার জন্য বলিতেছেন---"নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু" ইত্যাদি। যাহারা অনীশ্বর অর্থাৎ দেহাদি-পরতন্ত্র বদ্ধজীব, তাহারা দেবতাদিগের এইরূপ আচরণ, বাক্য বা কর্ম্ম দ্বারা ত দূরে থাকুক, মনের দ্বারাও কখনও অনুষ্ঠান করিবে না। রুদ্র কালকূট বিষ পান করিয়া নীল-কণ্ঠরূপে শোভা পাইয়াছিলেন, কিন্তু মূঢ়তাবশতঃ অন্য কেহ তাহা পান করিলে তৎক্ষণাৎ বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। দেবতা-দিগের বাক্য লোকশিক্ষার নিমিত্ত শাস্ত্রাদিরূপে বিরাজমান, তাহা অভ্রান্ত ও প্রতিপালনীয়, কিন্তু দেবলোকের সকল কর্ম্ম বা লীলা মানুষের অনুকরণীয় নহে। কারণ, অধিকারি-ভেদে একবস্তু যাহার পক্ষে শোভনীয় ও হিতকর, অন্যের পক্ষে তাহাই অধর্ম্ম ও অহিতকর। হে মহারাজ! তুমি যে মনে করিতেছ যে, শ্রীকৃষ্ণ অধর্ম্ম করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহা ভুলিয়া যাও কেন যে, ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপপুণ্য শুধু আমিত্ব-জ্ঞানময় জীবের জন্য, আমিত্বজ্ঞানশূন্য ঈশ্বরের ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপপুণ্যে কোনও ভেদাভেদ নাই। অহংবুদ্ধি যেখানে নাই, মায়া ও বাসনা এবং তদনুচর পাপপুণ্যও সেখানে নাই। সুতরাং দেবতা বা ঈশ্বরের বিচার মানুষের পর্য্যায়ে কখনই হইতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ-লীলাবিচারে যে সন্দেহ বা অভিযোগ আসে, ঐ মূলগত ভ্রমের উপরেই তাহার ভিত্তি। অধিক কি, শ্রীনন্দনন্দন নিখিল জীবের অন্তর্যামী পরমাত্মস্বরূপ। সুতরাং তাঁহার পক্ষে কেই বা আপন, কেই বা পর? কাযেই তাঁহার পক্ষে পরদারই বা কে? "যথার্ভকঃ স্বপ্রতিবিম্ববিভ্রমঃ"—বালক যেরূপ নিজ প্রতিবিম্ব দেখিয়া তাহার সহিত ক্রীড়া করে, শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের সহিত নানাপ্রকার হাস্য-আলিঙ্গনাদি দ্বারা তদ্রূপ ক্রীড়াই করিয়াছিলেন। শ্রীপাদ শুকদেব এই প্রসঙ্গে তাহার সিদ্ধান্ত প্রচার করিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের এই প্রেমলীলা ভোগমূলক ত নহেই, অধিকন্তু ইহা নিবৃত্তির চরম নিদর্শন এবং ইহার প্রকৃত তত্ত্ব উপলব্ধি করিলে মানব হৃদ্‌রোগ কাম পরিত্যাগ করিয়া ভগবৎপরায়ণ হইতে পারিবে।

শ্রীকৃষ্ণ লম্পট, তিনি গোপিকাবল্লভ, সত্যই তিনি গোপিকাগণকে অতুল্য আনন্দ প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা প্রাকৃত দেহের স্থূল ইন্দ্রিয়তৃপ্তি নহে, হ্লাদিনী শক্তির অতি সূক্ষ্মবৃত্তিবিশেষের স্ফুরণানন্দের অনুভূতি। শ্রীকৃষ্ণ লম্পটও বটেন, যেহেতু তিনি বহু নায়িকার নায়ক, বহু ভক্তের প্রাণাপেক্ষা প্রিয় চির আরাধ্য। জন্ম জন্ম ধরিয়া জীবগণ তাঁহাকেই বরণ করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে, আর তিনিও জন্ম জন্ম ধরিয়া জীবের প্রতি প্রেমাসক্ত হইয়াই আছেন। সেই লম্পটচূড়ামণির প্রেমে মজিয়া আমরাও যেন তদ্গত-চিত্তে বলিতে পারি :---

"আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মাম্
অদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা স বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥"

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বসু।

দুই দিক্

[গল্প]

লিলি রায়ের জীবনেতিহাস সম্বন্ধে অনেকেরই কৌতূহল আছে, এবং থাকাও উচিত ; কিন্তু সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। লিলি ভাল ভাবে এম-এ পাশ করিয়া বর্ত্তমানে কোনও স্কুলের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী। শোনা যায়, তাহার দাপটে পুরুষ-মাষ্টারগণ রুদ্ধনিশ্বাসে কায করিয়া যান —কোন্ মুহূর্ত্তে একটা অতি অপ্রিয় ও রুক্ষ তিরস্কার শুনিতে হয় তাহার স্থিরতা নাই। স্কুলের মেয়েরা বড় দিদি-মণিকে দেখিলে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে।

লিলিকে ঠিক সুন্দরী বলা যায় না,—বর্ণটা ঘনশ্যাম বা পক্ষান্তরে উজ্জ্বলশ্যাম, শরীর শীর্ণ। বিগতপ্রায় যৌবনের শেষ আভাটুকু অস্তায়মান সূর্য্যকিরণের মত এখনও স্নো-পাউডার অবলুপ্ত মুখাবয়বের প্রান্তে উঁকিঝুঁকি দেয়।

টালিগঞ্জের একখানা ছোট দ্বিতল বাড়ীতে লিলি ও তাহার বৃদ্ধা মাতা বাস করে ; পাশে একটা নূতন বাড়ী হইতেছে, সেখানে কুলীর কোলাহল তাহাকে দিবারাত্রি উত্যক্ত করে। বাড়ীর মধ্যে আর একটি ভাড়াটে আছে, সেও স্কুলমাষ্টার নাম অজয়। লিলির মতই সে-ও স্কুলে যায়, ফিরিয়া আসে, মা ও স্ত্রীকে লইয়া বাড়ীর অপরার্দ্ধে বাস করে। অজয়ের স্ত্রীর বয়স মাত্র সতর কি আঠার হইবে। গ্রামের মেয়ে লেখাপড়া বিশেষ জানে না, তবে গৃহকর্ম্মে সুনিপুণা অজয় তাহার সঙ্গে মাঝে মাঝে ঝগড়া বা পরিহাস করে,—অবসর সময়ে লিলি বসিয়া বসিয়া তাহাই দেখে, কখনও হাসে, কখনও বিরক্ত হইয়া ভাবে, ইনডিসেণ্ট।

লিলি হিন্দু নয়, খৃষ্টান। একটি চাকর আছে, সেই কম্বাইণ্ড হ্যাণ্ড। অজয়ের বৃদ্ধ মাতা সেকেলে, সকাল-সন্ধ্যা ঠাকুরের পাশে বসিয়া জপ করেন—আর খৃষ্টানের বাড়ীর এই অনাচারের মধ্যে থাকিতে হয় বলিয়া মাঝে মাঝে খুঁত-খুঁত করেন। অজয় বুঝাইয়া বলে,—"ওরা ত আর পেঁয়াজ মুরগী খাচ্ছে না, আর তা ছাড়া ওদের সঙ্গে সম্পর্ক কি ? একটা ভাল বাড়ী পেলেই উঠে যাবো, এত কম টাকায় এমন বাড়ী মেলে না। যদি মেলে অবশ্যই যাবো—"

সে দিন শনিবার।

লিলি স্কুল হইতে আসিয়া চাকর ডেবলকে ডাকিয়া বলিল "হার, তাড়াতাড়ি আজ চা, খাবার ক'রে দে, সন্ধ্যার আগেই বেরুতে হবে।"

তাহার মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় যাবি ?"

লিলি বলিল, "তা দিয়ে তোমার দরকার ? কত কায থাকতে পারে। স্কুলের কায ত একটা নয়। রোজ রোজ খেটে খেটে আর পারিনে, আজ একটু সিনেমায় যাবো।"

"তা হ'লে আজ ফিরতে রাত্তির হবে।"

"সাড়ে ন'টা দশটা হতে পারে, ওকে খাবার টেবলে রেখে চ'লে যেতে বলো খাবো'খন যখন আসি।"

সাড়ে পাঁচটার সময়ই লিলি কাপড় ছাড়িয়া প্রস্তুত হইয়াছিল। বাহির হইবার সময় অজয়কে বলিল, "অজয় বাবু, ফিরতে একটু দেরী হবে, দরজাটা খুলে দেবেন দয়া ক'রে। আপনারা ত দশটা এগারটা পর্য্যন্ত জেগেই থাকেন।"

অজয় হাসিয়া বলিল, "হাঁ, তার জন্যে কি ?"

লিলিও একটু হাসিয়া বলিল, "অসুবিধে হবে না ত ?"

"না, অসুবিধে কিসের ?"

এই হাসির একটু অর্থ আছে। লিলির শয়ন-কক্ষ ও অজয়ের শয়ন-কক্ষের মধ্যে যে পর্দার ও বারান্দার ব্যবধান

আছে, তা অতি অকিঞ্চিৎকর। বহু দিন অজস্র অত্যন্ত প্রগল্‌ভ মুহূর্তে, স্ত্রীর সহিত খুনসুড়ি করিবার সময় লিলির নিকট ধরা পড়িয়া গিয়াছে!

সিনেমায় সে দিন একটা ইংরেজী বই ছিল। লিলি আলোকোজ্জ্বল সিনেমার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল। বন্ধু কল্যাণের আসিবার কথা, কিন্তু এখনও সে পৌঁছায় নাই। লিলি দাঁড়াইয়া ভাবিতেছিল, এত আগে আসাটা অশোভনই হইয়াছে!

কল্যাণ আসিয়া স্মিতহাস্যে বলিল, "এই যে মিস্ লিলি, নমস্কার, আপনি আগেই এসেছেন, কষ্ট হয় নি ত?"

"এই মিনিটখানেক হবে।"

দুই জনে প্রেক্ষাগৃহে ঢুকিয়া কোণের দিকের দুইটি চেয়ার দখল করিয়া বসিল। তখনও মিনিট পাঁচেক দেরী আছে, বাহিরে সবে বৈদ্যুতিক ঘণ্টাটা একবার বাজিয়া থামিয়াছে।

মঞ্চের পাশে একটা বড় ফ্রেস্কো ছবি ছিল, লিলি অপলক দৃষ্টিতে তাহাই দেখিতেছিল।

হঠাৎ চাহিয়া দেখে, কল্যাণ তাহারই মুখের দিকে সাগ্রহে তাকাইয়া আছে। লিলি হাসিয়া বলিল, "কি দেখ্‌ছেন?"

"দেখ্‌ছি, মানে আপনার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম সত্যি, কিন্তু ভাবছিলুম আর একটা কথা—"

"কি?"

"তা শুন্‌লে, আপনি বিরক্ত হবেন বোধ হয়।"

"না, বলুন না, বিরক্ত যদি হই-ই, তাতে আপনার ক্ষতি-বৃদ্ধি কি আছে—"

কল্যাণ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ছোট্ট একটু দীর্ঘশ্বাস মুক্ত করিয়া দিয়া বলিল, "আমার ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই মনে করেন ব'লেই তা আর বলা চলে না। দেখুন,—মানুষ যে মানুষকে আপনার ক'রে, তা কতখানি পায়, তা বিবেচনা ক'রে নয়; সে কতখানি চায় তাই ভেবে—"

লিলি অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "আপনি—"

কল্যাণ বাধা দিয়া বলিল, "যাক, আপনি তা বুঝ্‌বেন না—"

বাহিরের ঘণ্টার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের আলোগুলি নিষ্প্রভ হইয়া নিভিয়া গেল। আগে একটা হাসির ছবি ছিল, দুই জনেই পর্দার দিকে চাহিল।

লিলি চেয়ারের হাতলে হাত দিয়া পিছনের দিকে ঠেস দিয়া একটু আরামে বসিয়া দেখিতেছিল। সহসা তাহার হাতের উপরে একটা উষ্ণ হাতের স্পর্শ পাইয়া সে চমকিয়া উঠিল, কিন্তু হাতখানা টানিয়া লইল না, সে জানিত, এ কল্যাণের কম্পমান উষ্ণ হাতের স্পর্শ!

সম্মুখে পর্দার উপরে আলো ও অন্ধকারের খেলা চলিয়াছে,—লিলি ভাবিল, তাহার অন্তরের পর্দায় অমনি কত আলো-অন্ধকারের খেলা হইয়া গিয়াছে, কত বন্ধু সেখানে অভিনয় করিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার মধ্যে আপনার অন্তরের মানুষটিকে সে পায় নাই। এই কল্যাণ আজ আসিয়াছে, সে যদি তাহাকে চায়ই, তবে প্রত্যাখ্যান করিয়া লাভ কি?

ছবির গল্পাংশ ছিল এই—

জনৈকা কুমারী নীরবে নিভৃতে একটি যুবককে ভালবাসিয়াছিল, কিন্তু সেই অহঙ্কারী ধনিপুত্র তাহা কোনদিন জানে নাই! মেয়েটি ছোট ছোট দুঃখ, প্রত্যাখ্যানকে অতি সঙ্গোপনে সহিয়া গিয়াছে, পরে একদিন ধনিপুত্রকে কোন একটি গুরুতর অভিযোগের আসামীরূপে রাজদ্বারে উপস্থিত করা হয়। মেয়েটি নিজে অভিযোগ স্বীকার করিয়া কারাবরণ করে ও পরে কারাকক্ষের অন্ধকারে বিষপ্রয়োগে নিজেকে হত্যা করে।

ছবি শেষ হইয়া গেল। বেদনাতুর দর্শকমণ্ডলী শ্লথ পদক্ষেপে বাহির হইয়া আসিতেছিল, কল্যাণও লিলির হাত ধরিয়া মৃদু অসংযত পদক্ষেপে ফুটপাতে আসিয়া দাঁড়াইল। ভীড় ছাড়াইয়া রসা রোড দিয়া চলিতে চলিতে রাসবিহারী এভেনিউএর মোড়ে আসিয়া লিলি শুধাইল, "কল্যাণ বাবু! এ ছবিটা কেমন লাগ্‌লো—"

"ভালই লেগেছে, তবে বিশ্বাস হয়নি—"

"কি বিশ্বাস হয় নি?"

"মেয়েরা ঠিক এমনি ভাবে ভালবাসতে পারে, এ যেন বিশ্বাস হয় না। ওটি ছেলে হ'লেই স্বাভাবিক হ'ত!"

লিলি একটু হাসিয়া বলিল, "বিশ্বাস করা না করা অবশ্য আপনার ইচ্ছা, তবে মেয়েরাও ভালবাসে এবং এমনি ক'রে সঙ্গোপনেই বাসে—"

"এমনি ক'রে বাসে?"

"ঠিক এমনি ক'রেই বাসে।"

ছোট ছোট দেবদারু গাছের পাশ দিয়া তাহারা চলিয়াছে, পাশেই সবুজ ঘাসে মোড়া ট্রাম লাইন—লিলি অকস্মাৎ থামিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কল্যাণবাবু? আজ হঠাৎ এ প্রশ্ন ক'রলেন কেন?"

কল্যাণ ব্যথিত-কণ্ঠে উত্তর দিল, "আপনি কি কিছুই বোঝেন না?"

লিলি চুপ করিয়া পাশে পাশে চলিয়াছে, কল্যাণ তাহার হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে লইয়া বলিল, "সে কথা কি আপনাকেও বুঝিয়ে ব'ল্‌তে হবে? নিজের অন্তরের কথাকে ব্যক্ত ক'রবার সাহস আমার নেই—"

কল্যাণ কি বলিতে চেষ্টা করিতেছে, লিলি তাহা জানিত, তবুও সে বলিল, "আপনার কথা স্পষ্ট করে বলুন, আমি ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না—"

কল্যাণ সহসা নমস্কার জানাইয়া বলিল, "আর একদিন ব'ল্‌বো, আজকের মানসিক অবস্থায় সে ব'ল্‌তে গেলে ঠিক যেমন ভাবে ব'ল্‌তে চাই, তেমন ভাবে বলা হবে না।"

লিলি প্রতি-নমস্কার করিয়া বলিল, "আচ্ছা, তাই ব'ল্‌বেন, এখন আসি।"

অদূরেই বাসা।

লিলি হাঁটিতে হাঁটিতে তাহাদের বাসার সম্মুখে রাস্তার আলোর নীচে আসিয়া দাঁড়াইল।

অজয়ের প্রাণখোলা হাসির শব্দ মাঝে মাঝে শোনা যাইতেছে। লিলি চিন্তা করিতে করিতে অন্যমনে দুই একবার কড়া নাড়িয়া দিল।

অজয় দরজা খুলিয়া দিয়া বলিল,—"ও আপনি! আসুন, কি বই দেখ্‌লেন?"

লিলি সে কথার উত্তর না দিয়া বলিল,—"আপনি ঘুমোন নি এখনও, আপনাকে এতক্ষণ জাগিয়ে রেখেছি সে জন্যে—"

অজয় তাড়াতাড়ি বলিল—"আনন্দিত, না?"

লিলি হাসিয়া ফেলিয়া অজয়ের পিছন পিছন উপরে উঠিয়া আসিল।

সে দিন ফাল্গুনের শেষ—

বেশ একটু গরম পড়িয়াছে, লিলি জানালা ক'টা খুলিয়া দিয়া ইজিচেয়ারে বসিয়া কল্যাণের কথাই ভাবিতেছিল, পর্দাটা ঝিরি-ঝিরি বাতাসে দুলিতেছে—তাহার ফাঁকে উন্মুক্ত দরজা দিয়া অজয়ের ঘরের প্রায় সবটাই দেখা যায়। চেয়ার-টেবলে বসিয়া অজয় ও বিভা যেন কি করিতেছে।

লিলি ভাবিতেছিল—কল্যাণ যাহা বলিতে চায়, অথচ বলিতে পারে না, তাহা সে ত স্পষ্ট জানে। ও-ও ত চাকুরী করিতেছে, কতদিন ধরিয়া তাহাকে পাইবে এই আশা করিয়াই হয় ত বসিয়া আছে। আজ তাহারও বয়স বাঙ্গালীর অতি ক্ষণস্থায়ী যৌবনের শেষ প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে! আজ যদি সে কল্যাণের সঙ্গেই অজয়ের মত নীড় রচনা করিয়া নিশ্চিন্ত হয় ক্ষতি কি? অজয়, ওর মাহিনা ত খুব বেশী হইলে ষাট হইবে—

লিলি চাহিয়া দেখিল—

অজয় বলিতেছে,—"এই ত্থাখো, বিভা। এ স্কয়ার মাইনাস বি স্কয়ার ইজ ইকোয়াল টু এ প্লাস বি ইনটু এ মাইনাস বি, মানে এই ফরমূলাটা হচ্ছে ফ্যাক্টর করবার সব চেয়ে ইমপরট্যাণ্ট ফরমূলা—"

বিভা অজয়ের মুখের পানে চাহিয়া আছে, খাতার সাদা পৃষ্ঠায় কি লেখা হইতেছে, সে দিকে তাহার মন ও চোখের কোনটাই নাই।

অজয় বুঝাইতেছে,—"অর্থাৎ কি না, এ প্লাস বিকে—"

বিভা অজয়ের চুলের ভিতর আঙ্গুল পুরিয়া দিয়া সহসা বলিয়া উঠিল,—"এ: তোমার চুল পেকে গেল যে! এই যে পাকাচুল—"

অজয় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "রাখো তোমার পাকাচুল, এ ফরমূলাটা বুঝ্‌লে?"

বিভা সংযত হইয়া বলিল, "কিছুই বুঝিনি—"

"যা ব'ল্‌ছি শুন্‌ছো—"

"কাণে ত তুলো দিয়ে নেই যে শুন্‌বো না—"

"তবে বুঝ্‌লে না কেন!"

"বা রে! তুমি বুঝোতে পার্‌লে না তার আমি কি কর্‌বো?"

বিভা মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতেছে দেখিয়া অজয় আরও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "এত ছেলেকে বুঝোতে পারি, আর তোমাকে পার্‌লুম না?"

"ঐলিলি বিভার হাত ধরিয়া বলিল, "বিভা, আমিও ত ধমক্ আমুষ, আমার চোখে ধূলো দিতে পারবে না।"

অজয় কে সাধাসাধির পর বিভা ব্যথিত-স্বরে বলিল, "আমি চুপ করিয়া জানিনে বলে আমাকে পছন্দ করে না।"

হইয়াছে। ত শিখ্‌লেই পারো—"

পড়ি, কেমন ?"ছে কি লেখাপড়া শেখা যায়!"

অজয় বলিল,' থামিয়া গেল, ক্ষণিক চুপ করিয়া থাকিয়া, —বল ত কলম্বস কে! মেলিয়া ধরিয়া বলিল, "আমি যে

বিভা গম্ভীর ভাবে ক্ষণিক চিন্তা করিয়া বলিল, ক'রেছিদ তোগলকের বেয়াই—"

অজয় রাগে ক্ষোভে বই ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল, "যাও, তোমার লেখাপড়া হবে না। আমি আর কিছু বলব না, তোমার যা ইচ্ছা হয় কর—"

লিলি দেখিল, বিভা অজয়ের দিকে পিছন ফিরিয়া কেবল হাসিতেছে, আর অজয় ক্রোধে গাম্ভীর্য্যে মুখ মলিন করিয়া বসিয়া আছে। লিলিও আনমনে হাসিতে লাগিল,—বিভাকে বাহিরে শান্ত, নির্ব্বিকার বলিয়া মনে হয়, কিন্তু তাহার মধ্যে এতখানি দুষ্টামি রহিয়াছে! অজয়ের এই দুরবস্থা লিলি উপভোগ করিতেছিল—

বিভা ফিরিয়া গম্ভীর স্বরে বলিল, "আচ্ছা, তুমি রাগ কর্‌লে?"

"না, রাগ করবে না, এতে রাগ না হয় কার?"

"আচ্ছা, কলম্বসের মেয়ের সঙ্গে তোগলকের ছেলের বিয়ে কি কিছুতেই হতে পারে না?"

অজয় চুপ করিয়া রহিল।

বিভা অপ্রাকৃত গাম্ভীর্য্যে মুখখানা বিরস করিয়া বলিল, "আচ্ছা এমনও ত হ'তে পারে যে, তাদের বিয়ে গোপনে হ'য়েছিল, ওই ইতিহাস যাঁর লেখা, তিনি জানেন না।"

অজয়ের ক্রোধ উড়িয়া গিয়াছিল, সে বলিল, "তোমার লেখাপড়া হবে না।"

"লেখাপড়া আমার দরকার নেই।"

"দরকার নেই? ব'ল কি! এই বিরাট পৃথিবীতে কত কি আছে, সভ্যতার কি ক'রে উন্নতি হ'ল, এ সমস্ত জানবারও কি ইচ্ছে হয় না তোমার!"

"তুমি জানো, ওই ত আমার হ'ল। ধোপার খাতা

কিন্তু কল্যাণ তখনও ফিরে নাই, আজকাল শনিবার শনিবার তাহার রাত্রিই হয়। লিলি আলো জ্বালিয়া অমনোযোগের সহিত বইয়ের পৃষ্ঠা উল্টাইতেছিল, কখন কড়া নাড়ার শব্দ হইবে সেই প্রতীক্ষায়।

অজয়ের ঘরে আলো জ্বলিতেছিল। লিলি নিজের ঘরের আলো নিভাইয়া দিয়া সেই দিকেই চাহিল। অজয় পরীক্ষার খাতা দেখিতেছে, বিভা কাছে বসিয়া কি একখানা উপন্যাস পড়িতেছে। অজয় বিরক্ত হইয়া বলিল, "না, আর পারি ... ানী হ'ল, তুমি যেমন ... যাস না ... আমি ঠিক তেমনটি করবো, তা হলেই ত হবে—"

"আর আমি যদি ম'রে যাই, তখন?"

বিভা চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—"ছিঃ, তুমি অমন কথা ব'ললে,—যাও, তোমার সঙ্গে আর আমার কথা বলার দরকার নেই, খুব হয়েছে—হাসি-ঠাট্টার মধ্যে—"

অজয় অপ্রস্তুত হইয়া বলিল,—"আহা, ওটা ত কথার কথা ব'ললুম, আচ্ছা, ব'সো, হ্যাঁ ব'সো তুমি, আর একটা কথা বলি শোনো, খুব মজার কথা—"

বিভা গম্ভীর ভাবে চেয়ারে বসিলে অজয় বলিল,—"আচ্ছা, এমন দেশ আছে জানো, যেখানে মানুষে মানুষ খায়, মানুষের মাংস খেয়ে থাকে—"

"ও সব গাল-গল্প আমি বিশ্বেস করিনে।"

"বিশ্বাস ক'র আর নাই ক'র, আছে,—এ জানতে তোমার কৌতূহল হয় না?"

"খুব।"

"তবে না প'ড়লে জানবে কেমন ক'রে—"

"তুমি গল্প কর, আমি শুনি, তা হ'লেই জানা হবে।"

অজয় পরাজিত হইয়া বিষয়ান্তরে মন-সংযোগ করিল,—"আচ্ছা, এমন দেশ আছে জানো, যেখানে বিয়ে নেই, মেয়ে-পুরুষ সব স্বেচ্ছাচারী—"

বিভা ডাগর চোখ দুটি মেলিয়া ধরিয়া বলিল, "ও, তুমি সেই দেশে যাবে বুঝি? ওই জন্যে ওই সব খুঁজে খুঁজে বের ক'রছো—"

অজয় হাসিয়া বলিল, "তোমার সেই উচিত শাস্তি, আমাকে তুমি অবহেলা কর। হিন্দুর যদি তালাক দেওয়া থাকতো, তবে তোমাকে এমন জব্দ ক'রতুম।"

বিভা হাসিয়া বলিল, "আবার বিয়ে ক'রতে"?

"ক'রতুম বৈ কি।"

ছোট ছোট দেবদারু গাছের পাশ দিয়া তাহারা চলিয়াছে, পাশেই সবুজ ঘাসে মোড়া ট্রাম লাইন—লিলি অকস্মাৎ থামিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কল্যাণবাবু ? আজ হঠাৎ এ প্রশ্ন ক'রলেন কেন ?"

কল্যাণ ব্যথিত-কণ্ঠে উত্তর দিল, "আপনি কি কিছুই বোঝেন না ?"

লিলি চুপ করিয়া পাশে পাশে চলিয়াছে, কল্যাণ তাহার হাতখানা নিজের [illegible] মধ্যে লইয়া বলিল, "সে কথা কি [illegible] পর্দায়ও তেমনই [illegible] ঘরের অন্ধকার তাহাকে বিদায়-নমস্কার জানাইয়া দিল।

লিলি চেয়ার ছাড়িয়া শয্যা গ্রহণ করিয়া নূতন করিয়া পুরাতনকে ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িল।

পরদিন রবিবার। সকালে উঠিয়া লিলি হাবুলের দেওয়া চা পান করিতে করিতে গতরাত্রির কথাই ভাবিতেছিল। কল্যাণকে সে স্বামিরূপে গ্রহণ করিতে পারে কি না ? কল্যাণের মধ্যে এমন কোন দৈন্য ত সে দেখে নাই, যাহাতে সে তাহাকে অযোগ্য বিবেচনা করিতে পারে অজয় ও বিভা, উহাদের দরিদ্র সংসারের মধ্যেও ত পরিতৃপ্তির অভাব নাই। যদি দুর্ল্লভ ভালবাসাকেই পাওয়া যায়, তবে সুলভ অর্থের এত কি প্রয়োজন

হাবুল আসিয়া জানাইল,- কল্যাণ বাবু আসিয়াছেন।

পুনরায় চা আসিল, কল্যাণ চা পান করিতে করিতে বলিল, "কাল আপনাকে যা ব'লেছি, তাতে অসন্তুষ্ট হ'য়েছেন কি ?"

লিলি গম্ভীর স্বরেই জবাব দিল, "সন্তুষ্ট কি অসন্তুষ্ট হ'য়েছি, সেই কথাটাই ভাবছিলুম, তা ছাড়া যা ব'লতে চেয়েছিলেন, তা ত এখনও বলেন নি।"

কল্যাণ বিনাভূমিকায়ই বলিল, "আমার ব'লতে আপত্তি নেই, বহুবার চেষ্টাও ক'রেছি। কিন্তু আপনি কি মনে ক'রবেন, তাই ভেবে সাহস পাইনি।"

লিলি হাসিয়া বলিল, "আজ সে সাহস না হয় সঞ্চয়ই ক'রে ফেলুন।"

কল্যাণ শূন্য চা'র কাপটা নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "আপনি কি আমার মত অযোগ্য ব্যক্তিকে জীবনের [illegible] গ্রহণ ক'রতে পারেন না ?"

দিয়া ইজিচেয়ারে বসিয়া কল্যাণের কথাই ভাবিতেছিল [illegible] পর্দ্দাটা ঝিরি-ঝিরি বাতাসে দুলিতেছে—তাহার উন্মুক্ত দরজা দিয়া অজয়ের ঘরের প্রায় সবটাই লিলি [illegible] যায়। চেয়ার টেবলে বসিয়া অজয় ও বিভা কোনদিন [illegible] করিতেছে।

লিলি ভাবিতেছিল কল্যাণ যাহা বলিতে বলিতে পারে না, তাহা সে ত স্পষ্ট জানে। বেলা প্রায় [illegible] চাকুরী করিতেছে, কতদিন ধরিয়া [illegible] বলিল, "আচ্ছা নমস্কার, [illegible] আসি।"

কল্যাণকে সিঁড়ি পর্য্যন্ত আগাইয়া দিয়া আসিবার সময় লিলি অলক্ষ্যে বিভার ঘরের দিকে একবার চাহিল। লিলি আশ্চর্য্য হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইল বিভা জানালার পাশে দাঁড়াইয়া ঘন ঘন আঁচলের খুঁটে চোখ মুছিতেছে। [illegible] তাদের জীবনের একটি আনন্দ মুখর দৃশ্য তাহার অন্তরকে লুব্ধ করিয়া তুলিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে চোখের জল ফেলিবার কি কোন দুর্য্যোগ উপস্থিত হইতে পারে ?

লিলি দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া বলিল, 'আস্‌বো ভাই, বিভা ?"

বিভা তাড়াতাড়ি চোখ মুখ মুছিয়া একটু হাসিতে চেষ্টা করিয়া বলিল, "আসুন, লিলিদি "

লিলি জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার রান্না খাওয়া হয়েছে ?"

"না।"

একটা চেয়ারে বসিয়া লিলি বিভাকে হাসাইবার চেষ্টায় বলিল,—"তোমার কিন্তু ভাই ইতিহাসে খুব ব্যুৎপত্তি।"

বিভা হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, "আপনি সব শুনেছেন বুঝি ? উনি ব'লেছেন ?"

"না, নিজের কাণেই শুনেছি— "

"ইস্, আপনি ত ভারি দুষ্টু—"

—"তা যাই বল, তোমাদের ওই হাসি-তামাসা দেখ্‌তে আমার ভারি ভাল লাগে অজয় বাবু কোথায় ?"

"জানি না।"

"আচ্ছা বিভা, আমাকে একটা সত্য কথা ব'ল্‌বে ? যদি বল ত জিজ্ঞাসা করি—"

"বলুন।"

"তুমি কাঁদিতেছিলে কেন, ব'ল্‌বে ?"

—বিভা অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, "কৈ, না। চোখে একটা বালি গেছ্‌ল—"

লিলি বিভার হাত ধরিয়া বলিল, "বিভা, আমিও ত মেয়েমানুষ, আমার চোখে ধূলো দিতে পার্‌বে না।"

অনেক সাধাসাধির পর বিভা ব্যথিত-স্বরে বলিল, "আমি লেখাপড়া জানিনে বলে আমাকে পছন্দ করে না।"

"তুমি ত শিখ্‌লেই পারো—"

"তাঁর কাছে কি লেখাপড়া শেখা যায়!"

বিভা সহসা থামিয়া গেল, ক্ষণিক চুপ করিয়া থাকিয়া, অশ্রুপূর্ণ চোখদুইটি মেলিয়া ধরিয়া বলিল, "আমি যে অশিক্ষিতা, তা জেনেই ত আমাকে বিয়ে ক'রেছিল, তখন—"

বিভার কণ্ঠ বন্ধ হইয়া আসিতেছিল, অৰ্দ্ধরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "এই ত এগারটা বাজে, কোথায় গেছেন—"

লিলি হাসিয়া বলিল, "এগারটা কি, ছুটির দিন একটু ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছেন তাতে ব্যস্ত হবার কি আছে, সেই জন্যে তোমার এত!"

বিভা হয় ত কোন সান্ত্বনাই পাইল না, লিলি হাসিতে হাসিতে ফিরিয়া আসিল

বৎসরাধিক পরের কথা।

উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনাই ঘটে নাই। অজয় না পারিয়া বিভাকে পড়াইবার দুরাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু খুঁটিনাটি ব্যাপারে স্বামিস্ত্রীর মধ্যে যেমন একটু অভিমান জাগিয়াই থাকে, তেমনই মাঝে মাঝে একটু আধটু মেঘ-রৌদ্রের খেলা চলে। অজয়ের মা'র সন্ধ্যা-আহ্নিকের কোন বাধা হয় না এবং লিলিকে তিনি প্রায় হিন্দুঘরের মত দেখিয়াই বাড়ী বদল সম্বন্ধে আর অভিযোগ করেন না। অজয় এখন মাঝে মাঝে গল্পচ্ছলে ইতিহাস ভূগোল কাব্য প্রভৃতি শিক্ষা দিতে চেষ্টা করে, বিভা গল্প শোনে এবং মাঝে মাঝে কলম্বসের সহিত মহম্মদ তোগলকের বৈবাহিক সম্বন্ধস্থাপনের মত মৌলিক গবেষণা করিতে চেষ্টা করে।

লিলি ধীরে ধীরে কল্যাণের অল্প মাহিনা, ক্ষুদ্র চক্ষু, অনুজ্জ্বল শ্যামবর্ণ প্রভৃতি সব কিছুকেই ক্ষমা করিয়া তাহাকে স্বামিরূপে বরণ করিয়া লইয়াছে। আজ লিলি গৃহবধূ এবং সর্ব্বোপরি মা। আজ দুই মাস হইল, তাহার একটি ছেলে হইয়াছে, সে এই ছয় মাস ছুটিতে আছে।

সে দিন ছিল শনিবার। রাত্রি প্রায় বারটা বাজে, কিন্তু কল্যাণ তখনও ফিরে নাই, আজকাল শনিবার শনিবার তাহার রাত্রিই হয়। লিলি আলো জ্বালিয়া অমনোযোগের সহিত বইয়ের পৃষ্ঠা উল্টাইতেছিল, কখন কড়া নাড়ার শব্দ হইবে সেই প্রতীক্ষায়।

অজয়ের ঘরে আলো জ্বলিতেছিল। লিলি নিজের ঘরের আলো নিভাইয়া দিয়া সেই দিকেই চাহিল। অজয় পরীক্ষার খাতা দেখিতেছে, বিভা কাছে বসিয়া কি একখানা উপন্যাস পড়িতেছে। অজয় বিরক্ত হইয়া বলিল, "না, আর পার যায় না, এত খাতা কি এক রাত্রে দেখা যায়!"

"রোজ কিছু কিছু ক'রে দেখ্‌লে ত হ'ত, তা না, রোজ কেবল বল্‌বে, পৃথিবীটা কমলালেবু, উত্তর-দক্ষিণ কিঞ্চিৎ চাপা—কমলাই যদি হ'ত, তবে ক্ষীর-কমলা ক'রে এত দিন কবে পৃথিবীটাকে খেয়ে ফেল্‌তো।"

অজয় হাসিয়া বলিল, "তোমার জন্যেই ত হয় না। তুমি যদি নম্বর যোগ ক'রে দিতে, কত তাড়াতাড়ি হ'ত—"

"বা রে! আমার বাটনা বেটে দাও কোনদিন তুমি! এদিকে একটু দেরী হ'লে ত না খেয়ে উঠে যাও—"

"রক্ষে কর, আমি আর বল্‌বো না। আচ্ছা, ওই বাড়ীর লিলি যে কেমন ঘুরে বেড়ায়, একা একা সিনেমায় যায়, তোমার ও-রকম স্বাধীন ভাবে ঘুর্‌তে ইচ্ছে হয় না?"

"একা যাবো কেন? তোমার সঙ্গে যাবো, একা একা বেড়াতে বুঝি ভাল লাগে—"

"শিক্ষার গৌরব ত একটা আছে"—

"ও, আমাকে তোমার পছন্দ হয় নি বল! এতদিন ত বুঝিনি! লিলিকে বিয়ে কর্‌বে বুঝি! কাল তাকে আমি বল্‌বো—ঠিক্ বল্‌বো—"

"যাও" বলিয়া অজয় আবার লাল-নীল পেন্‌সিলটা তুলিয়া লইয়া খাতা দেখিতে লাগিল।

ক্ষণিক পরে খাতার প্রথম পৃষ্ঠাটা দেখিয়া বলিল, "এই হরিহর মজুমদার তোমার কে গো!"

"কেন? পোড়াকপাল—"

"এই ত্থাখো, তোমার জুড়িদার, লিখেছে শোনো,—কলম্বস প্রথমে মুসোলিনীর বিরুদ্ধে আবিসিনিয়ার যুদ্ধে লড়িয়া পরে সেপাহী বিদ্রোহে যোগদান করেন—"

বিভা হাসিয়া বলিল, "ঠিকই লিখেছে ত? কত নম্বর

়লে দেখি! ও গোল্লা দিয়েছ? কেন এতখানি লিখেছে ন্ততঃ পাঁচ ত পাবেই—"

অজয় হাসিয়া আবার খাতায় মন সংযোগ করিল। বিভা লিল, "ঘুম পেয়েছে, আমি শুলাম।"

"না, তা হ'লে আমার খাতা দেখা হবে না।"

"রাত্রি বারটা বেজে গেছে, তুমিও শোও।"

"ভোরে তুলে দেবে ত?"

"না, তোমাকে তুলবো এমন সাধ্য আমার নেই—"

"কেন? ওই যেমন বলেছিলাম, তেমন ক'রে চুম্—"

"ধ্যেৎ, অসভ্য—"

নীচে কড়া নাড়ার শব্দ হইল, লিলি তাড়াতাড়ি দরজা লিয়া দিল!"

কল্যাণ হাত-পা ধুইয়া শয্যা গ্রহণ করিলে লিলি বলিল, ত রাত্রি কোথায় ছিলে?"

"সিনেমায়;—কেন?"

"শরীর খারাপ তা ত জানোই, এত রাত্রি আমি জেগে সে থাকি, তোমার কি একটু মায়াও হয় না?"

কল্যাণের মেজাজ ভাল ছিল না, সে জবাব দিল, "তুমি ঘুমোলেই পারো, একটা রিক্রিয়েশন ত চাই।"

"বাড়ীতে থাকলে কি রিক্রিয়েশন হয় না?"

কল্যাণ জবাব দিল না। লিলির মনে পড়িল সেই দিনের কথা, যেদিন কল্যাণ তাহার সঙ্গ পাইবার জন্যে ব্যাকুল-ভাবে তাহার কাছে মিনতি করিত, এই কল্যাণের মধ্যে যে এই কল্যাণ অদৃশ্যভাবে বিরাজ করিত, সে কথা বুঝিবার সুযোগ ত লিলি পায় নাই। কল্যাণ প্রশ্ন করিল, "কাল কিছু টাকা দিতে পার?"

"না, এ মাস ত হাফ-পে দিয়েছে; টাকা ত তোমাকেই দিতে হবে।"

কল্যাণ আবার চুপ করিল। লিলি বলিল, "আমি ত চাকুরী ছেড়ে দেব ভাবছি।"

"কারণ জানতে পারি?"

লিলি দুঃখিত হইয়াছিল, তবুও উত্তর দিল, "খোকাকে ছেড়ে আমি থাকবো কেমন ক'রে?"

কল্যাণ 'হু' বলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল। লিলি জিজ্ঞাসা করিল, "কিছু বললে না যে?"

"বলবো কি, তোমাদের জাতটাই এমনি, পরের ঘাড়ে চাপলেই নিশ্চিন্ত।"

লিলি এতক্ষণে ক্রুদ্ধ হইয়াছিল, সে বলিল, "ভার বইতে পারো না, তবে বিয়ে ক'রেছিলে কেন?"

কল্যাণ কঠিন কণ্ঠে উত্তর দিল, "তোমার চাকুরী দেখে, নইলে তোমার চেয়ে অনেক ভাল মেয়ে বিয়ে ক'রতে

লিলির সমস্ত পঞ্জর যেন সহসা গুরু আঘাতে বিদ্ধস্ত হইয়া যাইতে লাগিল,—রুদ্ধ-ক্রন্দনে কণ্ঠ বাক্‌হীন হইয়া নিস্তব্ধ হইল। পাশ ফিরিয়া সে চোখের জল ছাড়িয়া দিয়া ভাবিল, নারী হিসাবে কি তাহার কোন মূল্য নাই? তাহার মূল্য কি তাহার ওই মাহিনার টাকা কয়টি?

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার ঘুম আসিল না; অন্ধকারাচ্ছন্ন অজয়ের ঘর হইতে তখনও হাসির শব্দ মাঝে মাঝে ভাসিয়া আসিতেছে।

পরদিন সকালে কল্যাণ কোথায় গিয়াছিল—

লিলি খোকার কাপড় গুছাইয়া দিতে দিতে কল্যাণের আফিসের কোটটা পাড়িয়া দেখিল সেটা ময়লা হয় নাই এবং সেটা ড্রাইং ক্লিনিং-এ দিতে হয়। ধোপাকে বিদায় করিয়া কোটটার পকেট দেখিতে দেখিতে দু'খানা কাগজ বাহির হইয়া পড়িল—ম্যাডান থিয়েটারের দুইখানা দুই টাকা চারি আনার টিকেট—সাড়ে ন'টার শোর।

লিলি জানিত, কল্যাণ বড় বে-হিসাবী। কাল রাত্রির কটূক্তির জন্য মনে মনে দুঃখিত হইল। তাহাকে লইয়া বায়স্কোপে যাইবে বলিয়াই এই টাকা খরচ করিয়াছে, মাসের শেষে টাকা হাতে নাই। টাকা নাই—সে কথাটা সে ত মধুর করিয়াও বলিতে পারিত। মানুষের মন কত সময় কত কারণে খারাপ থাকিতে পারে—নানা দিক্ চিন্তা করিয়া লিলি মনে মনে কল্যাণকে ক্ষমা করিয়াছিল।

সারাটা দিন চলিয়া গেল, কিন্তু লিলি সুযোগ বুঝিয়া কল্যাণের নিকট কথাটা বলিবার সুবিধা পাইল না। সন্ধ্যার পরে কল্যাণ কিছু না বলিয়াই বাহির হইয়া গেল।

সাড়ে আটটা পর্য্যন্তও কল্যাণ তাহাকে লইয়া যাইতে আসিল না দেখিয়া লিলি মনে মনে সন্দিহান হইয়া উঠিল—তবে কি এ টিকেট অন্য কাহারও জন্য? লিলি ন'টা পর্য্যন্ত

অপেক্ষা করিয়া নিজেই বাহির হইয়া পড়িল। সন্দেহে, উৎকণ্ঠায় সে অস্থির হইয়া উঠিয়াছে।

করপোরেশন অফিসের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সে থিয়েটারের রাস্তাটা দেখিতেছিল। হ্যাঁ, সন্দেহের অবকাশ নাই, কল্যাণই এবং তাহার সঙ্গে একটি ফিরিঙ্গি মেয়ে, দুই জনে হাসিতে হাসিতে প্রেক্ষাগৃহাভিমুখে গেল। লিলির অন্তরে সহসা যেন অগ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠিল। এই কল্যাণের হাতে সে তাহার সমস্ত জীবনটা নির্ভয়ে তুলিয়া দিয়াছে! বুক ছাপাইয়া অশ্রুর বন্যা চোখের প্রান্ত বহিয়া পড়িতে চাহিল।

লিলি অধীর পাদক্ষেপে একটা ট্রামে আসিয়া উঠিল—চারিপাশের সমস্ত জগৎ তাহার দৃষ্টির সম্মুখে অবলুপ্ত হইয়া গিয়াছে—ডাহিনে ময়দান, সেখানে অন্ধকারের বুকে জোনাকি সাঁতরাইয়া বেড়াইতেছে। সেখানে জগতের সমস্ত প্রত্যাখ্যাত অন্তরের অশ্রু যেন জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে।

কল্যাণ মিথ্যা বলে নাই—তাহার চাকুরীর জন্যই সে তাহাকে বিবাহ করিয়াছে, তাহার জন্য নহে। কিন্তু কল্যাণ তাহারই শিশুর পিতা, আজ তাহাকে কেমন করিয়া সে ত্যাগ করিবে! দুঃখে ক্ষোভে বেদনায় লিলির অন্তর দীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল।

আরও একটি দিন চলিয়া গেল।

লিলি কল্যাণের নিকটে কোন কথাই বলে নাই, বলিবারই বা কি আছে। যে এত বড় প্রবঞ্চনা করিতে পারিয়াছে, সে মিথ্যা কথা বলিবে, এ দোষ ক্ষালনের চেষ্টা করিবে, তাহা আর বিচিত্র কি?

অফিস হইতে ফিরিয়া কল্যাণ বলিল, "গোটা পাঁচেক টাকা দাও ত, লিলি!"

"টাকা নেই।"

"তোমার মাইনে ক'রলে কি?"

"তোমার মাইনেই বা খরচ ক'রেছ কি ক'রে?"

কল্যাণ অকস্মাৎ এই প্রশ্নে এবং লিলির গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া বিরক্ত হইয়া বলিল, "খরচ হ'য়ে গেছে, আর তার জবাবদিহি তোমার কাছে ক'রতে হবে?"

"হবে, নিশ্চয়ই হবে, তোমার টাকা কি হয়, তা আমি জানি—"

"মদ খেয়ে উড়োচ্ছি, না?"

"তার চেয়েও খারাপ কাযে, সেদিন কার সঙ্গে ম্যাডানে গিয়েছিলে তা জানতে আমার বাকী নেই! তুমি আমার সঙ্গে এত বড় প্রতারণা করেছ কেন? আর তোমাকে আমি টাকা দেব—"

লিলি উদ্গত অশ্রু দমন করিতে চুপ করিয়া গেল

কল্যাণ বলিল, "আমি যাই করি না কেন, তার জন্যে জবাব দিহি করিনে কারো কাছে আর তোমার মত স্ত্রীতে সন্তুষ্ট থাকা পুরুষের পক্ষে সম্ভবও নয়—"

লিলি কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, "তবে বিয়ে ক'রেছিলে কেন? আর তোমার মত লম্পটের স্ত্রী হওয়াও কোন ভদ্রমহিলার আনন্দের কথা নয়।"

কল্যাণ হাসিয়া বলিল, "দরজা ত খোলাই আছে অকারণ ঝগড়া ক'রে লাভ নেই, এখান থেকে বিদায় নেওয়াই ভাল হবে। আচ্ছা তবে আসি, প্রয়োজন হয় তুমি ডিভোর্স-মামলা করো, আমি আমার লাম্পট্য স্বীকার ক'রবো আনন্দের সঙ্গেই—"

কল্যাণ লিলির উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই ঝড়ের বেগে বাহির হইয়া গেল। দরজার অন্তরাল হইতে বলিল, "তবে এই শেষ দেখা—"

লিলি নির্ব্বাক্ নিস্পন্দভাবে কাঠের পুতুলের মত বসিয়া রহিল—অপমানের গ্লানি, ক্ষোভ, দুঃখ আজ তাহাকে জগতের নিকটে মূক করিয়া দিয়াছে।

লিলির চিবুক বাহিয়া কয়েক ফোঁটা অশ্রু নিঃশব্দে গড়াইয়া পড়িল।

আজ ছয় দিন কল্যাণ চলিয়া গিয়াছে, আর ফিরে নাই

লিলি প্রতীক্ষা করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সে খৃষ্টান হইলেও বাঙ্গালী, বাঙ্গালীর স্নেহপ্রবণতা, ক্ষমাশীলতা সংস্কার, সংস্কৃতি, কৃষ্টি তাহার অন্তরকে আরও অস্থির করিয়া তুলিল।

কল্যাণের সঙ্গে এই বৎসরাধিক বাসের মধ্যে তাহার স্নেহপূর্ণ অন্তরের প্রমাণ ত সে যথেষ্ট পাইয়াছে। পুরুষ চিরদিনই স্বার্থপর, বহুবিলাসী, তাহার প্রলোভনের অন্ত নাই যদি তাহার পদস্খলন হইয়াই থাকে,—তবে তাহার মধ্যে তাহার অপেক্ষা তাহার নিজের অক্ষমতাই বেশী। সে

মমতা দিয়া কল্যাণকে এমন করিয়া বাঁধিতে পারে নাই, যাহাতে বাহিরের সমস্ত প্রলোভন সে ত্যাগ করিতে পারে। তাহার সেবা-যত্ন-স্নেহ দিয়া সে তাহাকে পূত পবিত্র করিয়া লইল না কেন? এমন করিয়া বিদায় দিল কেন?

শিশুপুত্রটি কাঁদিয়া উঠিল।

লিলি তাহাকে কোলে করিয়া লইয়া চোখের জল ছাড়িয়া দিল! এই শিশুকে লইয়া নূতন করিয়া জীবনারম্ভ করা, তা কি সম্ভব! সে মন ত তাহার আর নাই—কল্যাণকেই আজ তাহার বড় প্রয়োজন!

সকালের রৌদ্র ঘরের মেঝেয় পড়িয়া চিক্‌মিক্ করিতেছে,—তাহাই দেখাইয়া সে ক্রন্দনরত শিশুপুত্রকে ভুলাইল।

অজয়ের উচ্চ কণ্ঠস্বর শুনিয়া লিলি ফিরিয়া চাহিল।

অজয় বলিতেছে,—"আজ যাবে না?"

বিভা ক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধস্বরে বলিল,—"ব'ললুম না, তুমি কিছু বোঝো না।"

"আমি যা ব'লবো, তাতেই না। কেন, আজ বায়স্কোপে গেলে কি?"

"আর একদিন যাবো।"

"আমার কথা শুনবে না?"

বিভা রাগিয়া উঠিয়া বলিল, "না, যাবো না। তুমি যা ব'লবে তাই, আমার কথা একটাও শুনতে নেই।"

অজয় বলিল, "আচ্ছা, এর প্রতিশোধ আমি দেব—দেব—দেব। আর একটা বিয়ে যদি না ক'রেছি কি ব'লেছি। তোমার এ দম্ভ অহঙ্কার ভাঙ্গবো—তবে ছাড়্‌বো।"

"বেশ তাই ক'রো, ভারি ভয় দেখাচ্ছ--"

"হ্যাঁ, তাই, আমাকে যে অবহেলা ক'রেছ, তার শতগুণ অবহেলা যাতে সমস্ত জীবন ধ'রে পেতে হয়, তার ব্যবস্থা না ক'রে বাড়ী ফিরছি না।"

অজয় ছাতা লইয়া দুম্‌দাম করিয়া সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল।

লিলি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া চাহিয়া দেখিল মাত্র

•

সকালে না খাইয়া অজয় বাহির হইয়া গিয়াছে, সন্ধ্যা পর্য্যন্তও ফিরিল না।

বিভা না খাইয়া শুইয়াছিল। সন্ধ্যার গৃহকর্ম্ম সারিয়া [illegible] বসিল, রাত্রি হইয়াছে, ঘরে বাতি [illegible] বিছানা টেবল ঝাড়িয়া বার বার পথের দিকে চাহিল, কিন্তু অজয় আসিল না। জানালার কাছে চেয়ারটা টানিয়া লইয়া বসিল।

তাহার মনে হইল, অজয় সারাদিন না খাইয়া স্কুল করিয়াছে, এতক্ষণ কত পরিশ্রান্তই না হইয়াছে! সে যে রাগী, কখনও বাজার হইতে কিছু কিনিয়া খায় নাই। কেন সে রাগ করিল। সেও ত বুঝাইয়া বলিতে পারিত। হঠাৎ তাহার মনে হইল, সেদিন কাগজে পড়িয়াছিল,—একটি যুবক রেললাইনে পড়িয়া আত্মহত্যা করিয়াছে! অজয় রাগের মাথায় তাহাই করে নাই ত?

বিভার সমস্ত শরীর কাঁপিয়া উঠিল। বন্যার মত অঝোর ধারায় অশ্রু গণ্ডের উপরে আসিয়া পড়িল, ঘন ঘন অঞ্চলের প্রান্তে মুছিয়াও সে অশ্রুধারাকে অবরুদ্ধ করিতে পারিল না। সে রান্নার কথা ভুলিয়া কেবল অসহায়ের মত কাঁদিতে লাগিল।

কর্ম্মহীন লিলি সমস্তই দেখিয়াছিল, বিভা খায় নাই, তাহাও সে জানিত। সে বিভার মাথায় হাত দিয়া সান্ত্বনার সুরে বলিল, "কেঁদো না, বিভা। অজয় বাবু এক্ষুণি আস্‌বেন, তিনি কি তোমায় ছেড়ে যেতে পারেন?"

অর্দ্ধসংযত অশ্রুধারা সান্ত্বনায় দ্বিগুণ বেগে প্রবাহিত হইল, অনেকক্ষণ কাঁদিয়া সে মাথা তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেমন করে জান্‌লেন?"

লিলি হাসিয়া বলিল, "আমি জানি, তোমাকে ছেড়ে তিনি যেতে পারেন না। তোমাকে ভালবাসেন বলেই আজ তাঁর অত রাগ। তুমিই বা আজ গেলে না কেন?"

"সে ত বোঝে না, আজ যদি আমরা দু'জনে যেতুম, আপনি কি মনে ক'র্‌তেন? কল্যাণ বাবু ফির্‌লে এক দিন যাবো।"

লিলি অকস্মাৎ চুপ করিয়া গেল। যে অন্তর আজ তাহার জন্য—একান্ত পরের জন্যও বেদনার্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে, সে অন্তর অশিক্ষিত হউক, তাহাকে ত অসম্মান বা অবহেলা করা যায় না। লিলি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "সেই জন্যে? তিনি যদি না আসেন?"

"কেন আস্‌বেন না? আপনার মত মেয়েকে ছেড়ে—"

"তুমি বুঝ্‌বে না, বিভা। তোমাদের এই বন্ধন সমগ্র তবে কি এ টিকেট অন্য কাৎরামি মুক্তি পেয়েছে। আর আমার

স্বাধীনতাই আজ আমার সবচেয়ে বড় শৃঙ্খল হয়ে দাঁড়া'ল — আমি স্বাধীন ব'লেই সে আর ফির্‌বে না।"

লিলি উদ্গত অশ্রু দমন করিতে তাড়াতাড়ি বাহিরে চলিয়া গেল।

বিভা আবার নানা অসম্ভব দুশ্চিন্তা করিয়া কাঁদিতে লাগিল। লিলির কথায় বিশেষ কিছু সে বোঝে নাই, সান্ত্বনাও কিছু পায় নাই।

ঘড়ীর দিকে সে চাহিয়া দেখিল, আটটা বাজিয়াছে।

অজয় তবুও ফিরে নাই।

জানালার গরাদে মাথা রাখিয়া সে বাহিরের রাস্তার দিকে চাহিল। সেখানে কিছুই দেখা যায় না, দৃষ্টি বার বার ঝাপ্‌সা হইয়া আসিল।

লিলি ছেলেটিকে কোলে করিয়া অন্ধকারে বারান্দা দিয়া পায়চারি করিতেছিল, বিভাকে ডাকিয়া বলিল, —"বিভা, ওই ত অজয়বাবু এসেছেন।"

বিভা চোখের জল মুছিতে ভুলিয়া গিয়া হাসিতে চেষ্টা করিয়া বলিল—"সত্যি?"

—"হ্যাঁ।"

বিভা পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখে, অজয় ছাতা রাখিতেছে।

শুষ্কমুখে অজয় ফিরিয়া বিভার মুখের দিকে চাহিল— তাহার চুল রুক্ষ, রক্তিম গণ্ডে তখনও অশ্রুবিন্দু জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে, মুখে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে। হাসি-কান্নার সংমিশ্রণে মুখশ্রী সুন্দরতর হইয়া উঠিয়াছে। বিভা কৌতুক-কণ্ঠে কহিল,—"কই, নতুন বউ আন্‌লে না—"

এত কষ্টেও অজয় হাসিয়া ফেলিল।

—"দাঁড়াও, তোমাকে আর নীচে যেতে হবে না। এখানেই হাত-মুখ ধোও—"

বিভা তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া গেল।

লিলি ক্ষণপরে চাহিয়া দেখিল,

অজয়কে জলখাবার দিয়া বিভা পাশে বসিয়া কহিতেছে, —"সারাটা দিন কেন নিজে কষ্ট পেলে, আমাকেও দিলে, একেবারে শুধু শুধু—"

"তোমার জন্যেই ত।"

"আমার জন্যে,— কেন দুদিন পরে গেলে ক্ষতি কি?"

অজয় তোয়ালে দিয়া হাত-মুখ মুছিয়া বিভার মুখের দিকে চাহিল।

বিভা বলিল, "আচ্ছা, বিয়ে যে ক'রতে চাও, তুমি বিয়ে ক'র্‌লে আমি কি ক'র্‌বো? আমি কি লিলিদির মত লেখাপড়া জানি যে, চাকুরী ক'র্‌বো— আমি যে অসহায়—"

অজয় নিজের সবল বাহুবেষ্টনীর মধ্যে বিভাকে লইয়া বলিল, "তোমাকে ছেড়ে কি আমি থাক্‌তে পারি? তোমার সঙ্গে আমার ইহ-পরকালের সম্বন্ধ। যে যাকে ভালবাসে, তাকে কি ছেড়ে থাক্‌তে পারে?"

বিভা আবার বলিল,—"কই, নতুন বউ আন্‌লে না?"

অজয় হাসিয়া জবাব দিল, "বিয়ে আর একটা আমি কর্‌বই—"

"আমিও কর্‌বো।"

"কা'কে?"

"তুমি কাকে ক'র্‌বে বল, আগে—"

"তুমি বলো—"

"বল্‌বো?"

"বল—"

"তোমাকে—"

অজয় হাসিয়া ধীরে ধীরে বিভার মাথা নত করিয়া আনিল—

বিভা নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া বলিল,—"আগে খেয়ে নাও—"

যে অজয় ও বিভার দাম্পত্য-জীবনের খুঁটিনাটি এত দিন লিলিকে আনন্দ দিয়াছে, তাহাই আজ তাহাকে বেদনার্ত্ত করিয়া দিল। বারান্দায় ছেলে কোলে করিয়া, লিলি নিজের অঞ্চলে চোখদুইটি মুছিয়া লইয়া ভাবিল,—আজ যদি সেও এমনই অসহায় হইত? যদি এমনই ভালবাসা থাকিত, কল্যাণ কি না ফিরিয়া থাকিতে পারিত? তখন এমনই করিয়া পুরাতনের মধ্যে আবার নূতনকে পাইতাম না?

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (এম-এ)।

ভারতে রবর-শিল্প

মানব সভ্যতার বর্ত্তমান যন্ত্রযুগে কতকগুলি দ্রব্য অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। এই সকল দ্রব্য পূর্ব্বে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত বা স্বল্পজ্ঞাত ছিল। এই অপরিহার্য্য দ্রব্যগুলির মধ্যে রবর অন্যতম। রবর-উৎপাদক বৃক্ষসমূহ পৃথিবীর গ্রীষ্মমণ্ডলের অধিবাসী। প্রাচ্যে কত পূর্ব্ব হইতে যে রবরের ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে, তাহা বলা যায় না; কিন্তু প্রতীচ্যে অন্ততঃ গত চারি শত বৎসর হইতে রবর-বিষয়ক জ্ঞান প্রসার লাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কলম্বস যখন দ্বিতীয়বার আমেরিকা আবিষ্কারে গমন করেন, তখন হেইটীবাসিগণকে রবরগোলক বা বল লইয়া ক্রীড়া করিতে দেখেন। আমেরিকায় রবর ব্যবহারের আরও প্রাচীন প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। একাদশ শতাব্দীতে মায়া সভ্যতার যুগে বৃষ্টি-দেবতার পূজায় নৈবেদ্যরূপে বার্ণিসের আঠামণ্ডিত রবরগোলক পবিত্র কূপে নিক্ষিপ্ত হইত। হন্দুরাস অঞ্চলে এরূপ গোলকের নিদর্শন প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ১৫২৫ খৃঃ Anghiera সর্ব্বপ্রথমে প্রকাশ করেন যে, মেক্সিকোবাসিগণ যে রবরবল লইয়া ক্রীড়া করে, তাহা বৃক্ষবিশেষের শুষ্ক নির্য্যাস। তৎপরে অনেক দিন এ বিষয়ে কোন অনুসন্ধান হয় নাই। অবশেষে প্যারী নগরের প্রসিদ্ধ বিজ্ঞান-পরিষদ (Academie do Science) ১৭৩৫ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ আমেরিকায় একটি অভিযান প্রেরণ করেন; তাহার নায়ক নির্দ্ধারণ করেন যে, Condamine Heve নামক কোন বৃক্ষ হইতে রবর প্রস্তুত হয়। এই সময়ে ফরাসী বৈজ্ঞানিক Fresnean রবরের গঠন ও উপাদানাদি সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ করেন এবং ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে তিনি ব্রেজিলীয় প্রথায় পাদুকা, বোতল প্রভৃতি রবরজাত দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া পূর্ব্বোক্ত বিজ্ঞান-পরিষদের সম্মুখে উপস্থিত করেন। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক Priestley রবরের নাম রাখেন India Rubber। তিনিই ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে প্রথম দেখাইয়া দেন যে, এই নির্য্যাস ঘর্ষণ দ্বারা পেনসিলের দাগ কাগজ হইতে তুলা যায়। তাহা হইতে ইহার নাম হয় রবার; এস্থলে ইণ্ডিয়া অর্থে "ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ" বুঝায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত স্বাভাবিক রবরনির্য্যাসের ব্যবহার খুবই সীমাবদ্ধ ছিল; কারণ, তখন দুগ্ধবৎ আঠা হইতে দুই চারি প্রকার দ্রব্য প্রস্তুত হইত। রবরকে গলাইবার প্রথা উদ্ভাবিত হওয়ার পরই উহা ব্যাপকভাবে ব্যবসায়ে প্রযুক্ত হয়। বস্তুতঃ রবরশিল্প অত্যন্ত আধুনিক, ঊনবিংশ শতাব্দীতেই ইহা গড়িয়া উঠিয়াছে।

গুণাগুণ ও ব্যবহার

রবর বৃক্ষের গায়ে দাগ দিয়া আঠা বাহির করা হয়। কখন কখন গাছেই আঠা শুকাইবার অবকাশ দেওয়া হয়। অথবা উহা কৃত্রিম উপায়ে শুষ্ক করা হয়। আঠা জমাইবার ও পরিষ্কার করিবার বিভিন্ন প্রথা আছে। বিশুদ্ধ রবরের পাতলা চাদর প্রায় স্বচ্ছ; তদপেক্ষা মোটা চাদর পীতাভ কিম্বা পীতাভ-পিঙ্গলবর্ণ। বর্ত্তমান সময়ে নানা কার্য্যে রবরের ব্যবহার দ্রুত প্রসারলাভ করিতেছে। তাহার কারণ উপলব্ধি করিতে হইলে, রবরের কয়েকটি বিশেষ গুণ জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। অনেক লতা, গুল্ম ও বৃক্ষাদির ত্বক্ হইতে নির্য্যাস নির্গত হয়। উপাদানের পার্থক্যে এই সমুদয় নির্য্যাসের গুণের পার্থক্য হইয়া থাকে। রবর বা Caotehone এবং গটাপার্চা (Gutta percha) উভয়ই গাছের শুষ্ক দুগ্ধবৎ আঠা এবং উভয়ই হাইড্রোকার্ব্বন (Hydro Carbon) যৌগিক শ্রেণীর। গরম জলে ফেলিলে রবরের কোন পরিবর্ত্তন হয় না, কিন্তু গটাপার্চা নরম হইয়া যায়। রবর জল অপেক্ষা লঘু, স্থিতিস্থাপক; জল, সুরাসার, অধিকাংশ অম্ল ও বাষ্পের প্রবেশরোধক এবং কার্ব্বন ডাইসলফাইডে দ্রবণীয়। রবরের প্রকৃত ভিত্তি হাইড্রোকার্ব্বন; কিন্তু স্বভাবতঃ যে অবস্থায় রবর পাওয়া যায়, তাহাতে উক্ত হাইড্রোকার্ব্বনের সহিত অল্পবিস্তর

মাত্রায় রজন ও অন্যান্য দ্রব্যাদি মিশ্রিত থাকে। রজনের মাত্রাধিক্য হইলেই রবরের উৎকর্ষতা কমিয়া যায়। বস্তুতঃ এই রজনের অনুপাতের তারতম্য লইয়াই বাজারে কাঁচা রবরের মূল্য নির্দ্ধারিত হয়। বিশুদ্ধ রবরের আপেক্ষিক গুরুত্ব ০·৯২৫ হইতে ০·৯৭০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত এবং ইহা বিদ্যুত্তরঙ্গ ও তাপ পরিচালনা করে না।

গটাপার্চার স্থিতিস্থাপকতা অপেক্ষা নমনীয়তা গুণই শ্রেষ্ঠতর। কিন্তু ইহাও জলপ্রবেশ-রোধক; সেইজন্য জল-মধ্যে তাড়িদ্বার্ত্তা বহনের জন্য যে রজ্জু বা Cable পাতা হয়, তাহা আচ্ছাদন করিতে গটাপার্চা সমধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন অন্যান্য শিল্পেও ইহার প্রয়োগ আছে; কিন্তু রবরের তুলনায় গটাপার্চার ব্যাবহারিক ক্ষেত্র স্বল্প-পরিসর। পক্ষান্তরে, নানাবিধ কার্য্যে রবরের প্রয়োগ দিনে দিনে বাড়িয়া চলিয়াছে। মোটরযান ও উড়ো-জাহাজনির্ম্মাণ, বিদ্যুৎশক্তিসংশ্লিষ্ট বহুবিধ বৃহৎ শিল্প, টায়ার, পাদুকা, জলরোধক পরিচ্ছদ, ক্রীড়ার দ্রব্য ও খেলনা, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, বিশেষ প্রকার গৃহনির্ম্মাণ ও পূর্ত্তকর্ম্ম প্রভৃতি অশেষ প্রকার ব্যাপারে রবর প্রচুর পরিমাণে আবশ্যক হইতেছে। যুদ্ধোপকরণের জন্য ইহার অপরিহার্য্য প্রয়োজন আছে বলিয়া, সকল পরাক্রান্ত জাতিই যথেষ্ট পরিমাণ রবর করায়ত্ত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে।

উৎপাদনের উৎস

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, রবর যে সকল বৃক্ষের নির্য্যাসে প্রস্তুত হয়, তাহা পৃথিবীর গ্রীষ্মমণ্ডলেই দৃষ্ট হইয়া থাকে, এই প্রকার নানা জাতীয় বৃক্ষের সমাবেশ আমেরিকা, আফ্রিকা ও এসিয়া মহাদেশে রহিয়াছে এবং ব্যবসায়ের রবর এই তিন মহাদেশের নানা স্থান হইতে আসে। সংক্ষেপে বলা যায়, নিম্নলিখিত কয়েকটি দেশ হইতে বিশেষ-ভাবে রবর উৎপাদিত হয়। যথা:—দক্ষিণ আমেরিকায় ব্রেজিল ও ভেনেজুয়েলা; মধ্য-আমেরিকায় মেক্সিকো, পেরু ও হন্দুরাস; ওয়েষ্ট-ইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জ; আফ্রিকায় কঙ্গো, কেমেরুণ, সাইবিরিয়া, মোজাম্বিক ইত্যাদি। এশিয়ার যব ও মালয় দ্বীপপুঞ্জ, সিংহল, দক্ষিণভারত, আসাম ও ব্রহ্মদেশ। এস্থলে বলা আবশ্যক যে, আমেজন নদের তটসন্নিকটস্থ দেশসমূহই জগতের রবর বাজারের চাহিদা প্রায় অর্দ্ধেক পরিমাণে পূরণ করিয়া থাকে। এই সকল দেশের অন্তর্জ্জাত রবর-উৎপাদক বৃক্ষজাতি সমূহ পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে ও হইতেছে। যে সমুদয় বন্য বা কর্ষিত বৃক্ষজাতির নির্য্যাস-সংগ্রহের উপর রবর ব্যবসায় প্রধানতঃ নির্ভর করে, নিম্নে তাহাদিগের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল:—

প্যারা রবর:—প্যারা ও ব্রেজিল দেশের আদিম অধিবাসী Hevea-গণীয় **brasiliensis** ও অন্যান্য জাতি হইতে ইহা পাওয়া যায়। রবর-নির্য্যাস সমূহের মধ্যে ইহার খ্যাতিই সমধিক। প্যারা রবরের গাছ দ্রুত বৃদ্ধিশীল; দুই তিন বৎসরের মধ্যেই ২৫।৩০ ফুট বড় হইয়া উঠে। আঠা ছয় বৎসর বয়স্ক গাছ হইতে পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু গাছের ১০ বৎসর বয়স হইতে আঠা সংগ্রহ আরম্ভ করাই শ্রেয়ঃ বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ বিবেচনা করেন।

সিয়ারা রবর:—ইহাও ব্রেজিল দেশে পাওয়া যায় এবং **Manihof Glaziovii** নামক বৃক্ষজাত। জল, বায়ু, মৃত্তিকা বিষয়ে ইহা খুব কষ্টসহ; অনুর্ব্বর ও রসহীন জমিতেও ইহা জন্মিতে পারে। ইহার স্ফীত মূল সমূহে প্রচুর পরিমাণ ভক্ষ্য শ্বেতসার সঞ্চিত থাকে। রবর-উৎপাদনের মাত্রা কম হইলেও বৎসরে দুইবার ইহার রস সংগ্রহ করিতে পারা যায়। স্বল্প আয়াসেই সিয়ারা চাষ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

ক্যাষ্টিলোয়া রবর:—এই নির্য্যাস মধ্য আমেরিকার Castilloa elastica বৃক্ষজাত। ক্যাষ্টিলোয়া বৃক্ষের জন্য খুব ভাল জমি বা অধিক বারিপাত আবশ্যক হয় না। ভারতের অনেক স্থলে পার্ব্বত্য অঞ্চলে ইহার চাষবিস্তার সম্ভবপর।

এতদ্দেশে নানাজাতীয় উদ্ভিদ হইতে রবরশ্রেণীয় নির্য্যাস পাওয়া যায়, কিন্তু অনেক স্থলে সেগুলি উৎপাদন-মাত্রার স্বল্পতা, গুণের অপকর্ষতা বা অন্যবিধ কারণে ব্যবসায়ের উপযোগী নহে। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে ভারতে রবরবিষয়ক অনুসন্ধান অল্পবিস্তর চলিতেছে। **Cryptolepis grandiflora, Ecdysanthera micrantha** প্রভৃতি কয়েকটি জাতি লইয়া রবর-উৎপাদনের

পরীক্ষা কতক পরিমাণে হইয়াছে বটে, কিন্তু তদ্রূপ পরীক্ষায় কোন নিশ্চিত ফল পাওয়া যায় নাই। ফলতঃ এতাবৎ যতদূর অনুসন্ধান হইয়াছে, তাহাতে প্রতীয়মান হয় যে, ব্যাবসায়িক হিসাবে ভারতের অন্যতম রবর-উৎপাদক বৃক্ষ হইতেছে আঠাবট বা Ficus elastica।

আঠাবট সাধারণ বটের ন্যায় বৃহদাকার তরু; ইহা ২০০ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চতা লাভ করিতে পারে। বায়ব্য মূল বা ঝুরি নামিয়া বৃক্ষের বিস্তৃতিসাধন করে এবং পুরাতন বট বহু বৃক্ষসমন্বিত কুঞ্জের মত দেখায়। মধ্য-হিমালয়ের নেপাল প্রভৃতি অঞ্চল হইতে এই বটজাতি উত্তরবঙ্গ ও আসাম দিয়া ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে। পূর্ব্ব-হিমালয়ের স্থানে স্থানে দেখা যায় যে, পার্ব্বত্য স্রোতস্বিনীর উভয় পার্শ্বস্থ আঠাবট ও সমগণীয় অন্যান্য গাছ পরস্পর জড়িত হইয়া ও ঝুরির ঠেকা দিয়া অপূর্ব্ব জীবন্ত সেতু প্রস্তুত করিয়াছে। আরণ্য জাতিরা ইহার আঠা সংগ্রহ করিয়া নিকটস্থ বাজারে বিক্রয়ার্থ লইয়া আসে। তাহার পরিমাণ কিন্তু অল্প ও অনিশ্চিত। ব্যাবসায়িক হিসাবে রবর-উৎপাদনের জন্য আসামে চার দুয়ার (তেজপুর) ও গৌহাটি জেলায় কলনীতে ইহার সরকারী বাগিচা স্থাপন করা হইয়াছে। তদ্ভিন্ন মান্দ্রাজ ও মহীশূর অঞ্চলেও আঠাবটের ছোট ছোট বাগিচা আছে। এক একর (প্রায় সাড়ে ৩ বিঘা) জমিতে ১০টি আঠাবট বৃক্ষ জন্মিতে পারে। প্রতি পূর্ণবয়স্ক গাছ হইতে বৎসরে প্রায় ৫ সের শুষ্ক রবর পাওয়া যায়।

ভারতে বিদেশীয় রবর প্রবর্ত্তন

বর্ত্তমান সময়ে ভারতে যে রবর উৎপাদিত হইতেছে, তাহার অধিকাংশই প্রবর্ত্তিত জাতি হইতে। পূর্ব্বে যে সকল প্রবর্ত্তিত জাতির উল্লেখ করা হইয়াছে, সেগুলি অল্প-বিস্তর মাত্রায় ভারতে প্রবর্ত্তনের চেষ্টা হইয়াছে; সর্ব্বাপেক্ষা সফলতা লাভ হইয়াছে কিন্তু প্যারা রবর প্রবর্ত্তনে। ইহার অন্যতম কারণ এই যে, মালাবার উপকূলে মাঙ্গালোর হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত দেশাংশে জলবায়ুর সাধারণ অবস্থা মালয়ের উৎকৃষ্ট রবর অঞ্চলের অনুরূপ। Hevea brasiliensis জাতি এখন মালাবার, মহীশূর, কুর্গ, কোচিন, ত্রিবাঙ্কুর ইত্যাদি অঞ্চলে মোট ১১৯৪৭১ একর জমিতে জন্মিতেছে। ভারতীয় কর্ষিত রবরের মধ্যে ইহাই প্রধান। সিয়ারা ও আঠাবট জাতির সামান্য পরিমাণ চাষ আছে বটে, কিন্তু প্যারা রবরের তুলনায় তাহা নগণ্য। ব্রহ্মদেশ সমেত ভারতে মোট রবর-উৎপাদক ভূমির পরিমাণ ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে ২২৭৬৫৮ একর ছিল এবং তন্মধ্যে ১৭৫৪১৯ একর জমি হইতে নির্য্যাস সংগৃহীত হইয়াছিল। এস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যেই অন্য স্থানাপেক্ষা অধিক রবর উৎপাদিত হইয়া থাকে।

ভারতে রবর-চাষের পরিসরবৃদ্ধির যথেষ্ট অবসর আছে। অনেক স্থানেই বিভিন্ন জাতীয় রবর বৃক্ষের উপযোগী জল, বায়ু ও মৃত্তিকা পাওয়া যায়। উত্তর-বঙ্গে কার্সিয়ং, বক্সা ও জলপাইগুড়ি অঞ্চলে প্যারা রবর চাষ সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যের নীলগিরি, মালাবার প্রভৃতি স্থানে খাদ্যশস্য উৎপাদনের অযোগ্য জমিতে সিয়ারা রবর রোপণ করিয়া লাভবান হইতে পারা যায়। অল্পাদ্র পার্ব্বত্য অঞ্চলের পক্ষে ক্যাষ্টিলোয়া বেশ উপযুক্ত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। এগুলি লইয়া আপাততঃ রবর-চাষ বিস্তারকার্য্য চলিতে পারে। কিন্তু দেশীয় ও বিদেশীয় রবর বৃক্ষসমূহের বিভিন্ন অঞ্চলের পক্ষে উপযোগিতা সম্বন্ধে আরও অনেক বেশী অনুসন্ধান ও পরীক্ষা প্রয়োজন। এ পর্য্যন্ত সে বিষয়ে কোন বিশেষ ব্যবস্থা হয় নাই।

রবর-শিল্প ও ব্যবসায়

রবর গলাইবার ও উহাকে দৃঢ় (Vulcanisation) করার প্রক্রিয়া জ্ঞাত না থাকায় অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রকৃত পক্ষে কোন রবর-শিল্প গঠিত হইয়া উঠিতে পারে নাই। ফলতঃ রবরশিল্পসৃষ্টির সূত্রপাত হয় ১৮২০ খৃষ্টাব্দ হইতে। এই সময়ে Mackintosh ও তাঁহার সহকর্ম্মী Hancock আবিষ্কার করেন যে, রবর গলাইবার পক্ষে Napthaই সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ ও উৎকৃষ্ট দ্রব্য। এই প্রথা পেটেণ্ট করিয়াই ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে জলরোধক বস্ত্রাদি প্রস্তুত শিল্পের (Waterproofing) প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়; কিন্তু এইরূপ রবর-রচিত দ্রব্যাদির দোষও ছিল। গরমের সময় এগুলি ফাটিয়া যাইত এবং বর্ষায় চট্‌চটে হইয়া উঠিত। এই গুরুতর দোষ সংশোধনের উপায় উদ্ভাবন করেন আমেরিকাবাসী

Charles Goodyear। তাঁহার গবেষণায় প্রকাশ পায় যে, গন্ধক সহযোগে রবর উত্তপ্ত করিলে একদিকে উহা যেমন তাপবৈষম্য সহনক্ষম হয়, অন্যদিকে তেমনই উহার স্থিতিস্থাপকতা গুণ বৃদ্ধি পায়। এই প্রথাই এখন Vulcanisation নামে পরিচিত। আরও একটি প্রথার আবিষ্ক্রিয়া রবর-শিল্পের দ্রুত অগ্রগতির মূলে নিহিত রহিয়াছে; উহা পরবর্ত্তী কালে Hancock দ্বারা সাধিত হয় এবং উহা Mastication নামে অভিহিত। এই প্রথায় রবরখণ্ডকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া গরম roller-এর চাপে পেষণ করা হয়। তাহাতে রবর অনেক বেশী নমনীয় ও দ্রবণীয় হইয়া থাকে। এই উপায়ে রবরের সহিত বিভিন্ন শিল্পের উদ্দেশ্যে অন্যান্য দ্রব্য পূরক (filling material) রূপে ব্যবহার করাও চলে। আজ-কাল Vulcanite বা Ebonite নামে দৃঢ় রবরের যে নানা প্রকার দ্রব্য বাজারে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের উৎপত্তি এই প্রথা হইতে সম্ভবপর হইয়াছে। Pneumatic tyre উদ্ভাবনের পর যান-বাহনে রবর ব্যবহারের পরিসর বহুল পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। John Boyd Dunlop নামক জনৈক পশুচিকিৎসক ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে রবরের চাদরের ভিতর বায়ুপূর্ণ নল সন্নিবেশ করিয়া এইরূপ টায়ার প্রস্তুত করেন এবং ইহারই প্রভাবে মোটর গাড়ী, বাইসিকেল ও সমপ্রকার যানে ব্যবহার উদ্দেশ্যে টায়ার প্রস্তুত শিল্প শনৈঃ শনৈঃ প্রসার লাভ করিতে আরম্ভ করে।

পূর্ব্বোক্ত কয়েকটি আবিষ্ক্রিয়ার জন্য এবং রবরপ্রস্তুত প্রকরণের আরও অনেক ক্ষুদ্র বৃহৎ উন্নতি সাধিত হওয়ায়, নানা শিল্পে রবর প্রয়োগের ক্ষেত্র বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। সেই সঙ্গে কাঁচা রবরের চাহিদাও বাড়িয়া চলিয়াছে। আমেরিকাজাত রবর যে পৃথিবীর অভাব মোচন করিতে পারিবে না, তাহা বহু পূর্ব্বেই অনুভূত হইয়াছিল। সেই জন্য বৃটিশ সরকার ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে স্যার হেনরী উইকহ্যাম নামক আমেজন অঞ্চলের জনৈক বাগিচাওয়ালার সাহায্যে বিলাতের সুপ্রসিদ্ধ কিউ (Kew) উদ্ভিদ-তাত্ত্বিক উদ্যানে ৭০ হাজার রবরবৃক্ষবীজ আমদানি করিয়া রোপণ করেন। তন্মধ্যে মাত্র ৩০০০ বীজের চারা সম্যক্ পুষ্টিলাভ করে। এই সমুদয় চারা হইতেই সিঙ্গাপুর, মালয় দ্বীপপুঞ্জ ও সিংহলের বিশাল রবর-চাষের সূত্রপাত হয়। কিন্তু শুধু বৃটিশ গভর্ণমেণ্টই এই বিষয়ে অগ্রণী হন নাই। অন্যান্য দেশের গভর্ণমেণ্টও রবরের ব্যবহারিক প্রাধান্য উপলব্ধি করিয়া রবর-উৎপাদনে মনোনিবেশ করেন। তাহার ফলে বর্ত্তমান সময়ে বন্য রবর ব্যতীত চাষ হইতে প্রতি বৎসর প্রায় নয় লক্ষ টন শুদ্ধ নির্য্যাস জগতে উৎপাদিত হইতেছে। এই কর্ষিত রবর-উৎপাদনে বিভিন্ন দেশের শতকরা অংশ কিরূপ, তাহা নিম্নোদ্ধৃত তালিকায় প্রদর্শিত হইল :—

বৃটিশ মালয়	৪১·৩৬ ভাগ	ফরাসীইন্দোচীন	৪·৭ ভাগ
ওলন্দাজ ইষ্টইণ্ডিজ্	৩৬·২ "	শ্যাম ···	৪·২ "
সিংহল	৫·৭ "	ভারত ···	১·৭ "

উক্ত তালিকায় ভারতের অংশ অতি সামান্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কিন্তু তাহা হইলেও ভারতে রবর-চাষের অবস্থা আশাপ্রদ। ১৯১৩-১৪ খৃষ্টাব্দে এতদ্দেশে রবর উৎপাদিত হইত মাত্র কিঞ্চিদধিক ২৬ লক্ষ পাউণ্ড ১৯৩৪-৩৫ খৃষ্টাব্দে উহা প্রায় অষ্টাদশ গুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ৩,৬৭,১৮,৩০৭ পাউণ্ডে দাঁড়াইয়াছিল; তাহার পরও বৃদ্ধির হার প্রায় সমান আছে। ভারতে রবর-ক্ষেত্র সমূহের সংখ্যা ১৫৬৫০। উক্ত বাগিচা সমূহে প্রত্যহ গড়ে ৩০,২৭৫ ব্যক্তি কার্য্য করিয়া থাকে। কারখানাগুলিতে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা প্রায় ছয় হাজার। ইহা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যাইবে যে, রবর-ক্ষেত্রগুলি বহু ব্যক্তির জীবিকার্জ্জনে সহায়তা করিতেছে।

উৎপাদন বৃদ্ধির সহিত ভারত হইতে রবর রপ্তানির মাত্রাও যে বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য। বিগত ২৫ বৎসরের মধ্যে এ বিষয়ে কিরূপ ক্রমোন্নতি সাধিত হইয়াছে, তাহা নিম্নোদ্ধৃত তালিকায় রপ্তানির পরিমাণ হইতে বুঝিতে পারা যাইবে :—

১৯১৩-১৪	২৬,০৫,০০০	পাঃ
১৯২২-২৩	১,২৫,০০,০০০	"
১৯৩৫-৩৬	৩,০৬,৪৭,০০০	"

এখন প্রতি বৎসর এক কোটি টাকার অধিক রবর বিদেশে চালান যায়। রপ্তানির মাত্রা আরও অধিক হইতে পারিত; কিন্তু India Rubber Control Act দ্বারা ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দ হইতে রপ্তানি সীমাবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

রিতীয় রবর প্রধানতঃ ইংলণ্ড, ষ্ট্রেট সেটেলমেণ্ট ও সিংহলে লান যায়।

উদীয়মান ভারতীয় শিল্প

দুঃখের বিষয় যে, ভারতে রবর উৎপাদন ক্রমশঃ বৃদ্ধি াইতে থাকিলেও সেই অনুপাতে রবর-শিল্পের পরিধি স্তার পায় নাই। বিগত ৮।১০ বৎসরের মধ্যে বঙ্গ, াম্বাই ও যুক্তপ্রদেশে রবরজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুতের য়েকটি কারখানা স্থাপিত হইয়াছে; বিশেষতঃ দু'চারিটি শীয় ও বিদেশীয় কোম্পানীর উদ্যমে বঙ্গদেশ পাদুকা, য়ার, ওয়াটার-প্রুফ ও অন্যান্য কতিপয় বাজার-প্রচলিত ব্য-প্রস্তুতের প্রধান কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু বরজাত দ্রব্যাদির ক্ষেত্র এখন বহু বিস্তীর্ণ; এইরূপ গেণিত দ্রব্যের মধ্যে অনেকগুলি এতদ্দেশে তৈয়ারী হওয়া ম্ভবপর। যদিও রবরের রপ্তানি সীমাবদ্ধ করিবার ফলে ম্রমশঃ অধিক পরিমাণ রবর দেশমধ্যে শিল্পে প্রযুক্ত হইতেছে, তথাপি ইহা বলা যায় না যে, দেশোৎপাদিত রবরের সুবিধা গ্রহণ করিয়া এই প্রকার দ্রব্যপ্রস্তুতের উদ্যোগ যথেষ্ট মাত্রায় হইয়াছে। তাহার সমর্থনে ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, এখনও ভারতে প্রতি বৎসর দুই কোটি টাকা মূল্যেরও অধিক রবর ও রবরজাত দ্রব্য বিদেশ হইতে আমদানী হইতেছে।

জাপানে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কারখানার সম্মিলন ও সহযোগিতায় রবরশিল্প এরূপ ভাবে গঠিত হইয়া উঠিয়াছে যে, তদ্দ্বারা বড় বড় কারখানাওয়ালাগণ ও কুটীরশিল্পীরা উভয় পক্ষই উপকৃত হইয়া থাকে। ছোট ছোট ও অল্প মূল্যের রবরজাত দ্রব্য প্রস্তুত উক্ত দেশে কুটীরশিল্প-শ্রেণীভুক্ত। সমপ্রকারে এতদ্দেশে রবর-শিল্প সংগঠন করিলে অনেক লোকের অন্ন সংস্থান হইতে পারে। পল্লী-উন্নয়ন ব্যাপারে উৎসাহী ব্যক্তিবর্গের পক্ষে এই বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত।

নব-বর্ষে

নব-বর্ষে কি বার্ত্তা এসেছে, শুধাইছ আজি বন্ধু তুমি?
হয় ত সোণার কমল ফুটিবে মোদের হৃদয়-বৃন্ত চুমি।
তবে শুন, এবে 'বিশ্বামিত্র' আসিছেন হেথা রাঘবে লয়ে,
বনের 'তাড়কা' তাইত' কাঁপিছে, মারীচ পলায় প্রাণের ভয়ে।

কোথা 'অহল্যা' কোথায় শবরী? মুক্তি-লগন এসেছে আজি,
ভক্তি-সাধনা ফুল হয়ে ফোটে, হেরি অপরূপ সুষমারাজি।
'ভাণ্ডীর' বন আজি উচাটন আসিছেন সেথা 'চক্রপাণি',
'বৈশাখ ডাকে 'মৈনাকে', কভু ত্র্যম্বকে স্মরি পাঠায় বাণী।

'শমী'শাখা হ'তে তূণীর পাড়িয়া বৃহন্নলাও আসিছে হেথায়,
অলকনন্দা, মধুচ্ছন্দা, কলতানে সারা বাংলা মাতায়।
'কালিদহে' দেখি 'কমলে-কামিনী' উচ্চৈঃশ্রবা কাননে হেরি,
দূতমুখে শুনি, 'অশ্বিনী' আর 'জিষ্ণু' আসিতে নাই যে দেরী।

চক্রবাকের বক্র-সারি সে নভোনীলে ঐ উড়িয়া চলে,
'জটায়ু' আসিবে তাহাদেরি সাথে, নববর্ষের দূত সে বলে।
হারায়ে গে'ছিল অঙ্গুরী, যাহা পুষ্করারি তীর্থেতে হায়!
নববর্ষেতে মিলিবেই তাহা চিনিবেন রাজা, 'শকুন্তলায়'।

এ নব বরষে 'চিন্তামণি'র খনির খবর মিলিবে জানি,
অন্নপূর্ণা সোণার থালায় অন্ন দিবেন মোদের আনি,
মন্দাকিনীর স্বর্ণ-সরোজ ফুটিবে মোদের মানস-সরে;
অর্দ্ধমৃতেরে বাঁচাবে নারদ, মধুর তাহার বীণার স্বরে।

বাসব দিবেন মধুর আসব, পান করি দুঃখ-দৈন্য যাবে,
ভারতী দিবেন আরতির সুধা, পান করি প্রাণ গান যে গাবে;
শঙ্খ চক্র গদা ও পদ্ম, এ নব-বর্ষে রয়েছে পাতা,
গড়িব আমরা নূতন জগৎ, খুলিব আবার নূতন খাতা।

কাদের নওয়াজ।

ভুতুড়ে বাড়ী

[গল্প]

১
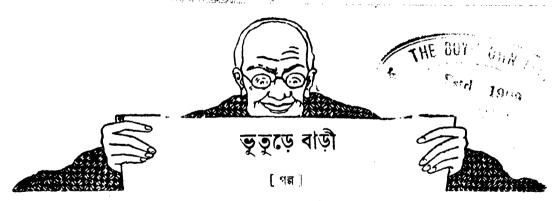
শরতের পীতাভ রৌদ্রসমুজ্জ্বল মেঘমুক্ত আকাশ যেন অচঞ্চল দৃষ্টিতে দিগন্ত-প্রসারিত ধরণীর দিকে চাহিয়া এক একবার দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে, মনে হইতেছে, তাহা প্রস্ফুটিত সেফালীর মৃদুগন্ধামোদিত। আশ্বিন মাস, 'পূজার ছুটী' উপলক্ষে স্কুলকলেজ, আফিস, আদালত বন্ধ। আমরা দুই বন্ধু পূজার ছুটী উপভোগের জন্য গ্রাণ্ডকর্ড লাইনের গোমো ভ্রমণে আসিয়াছি। পূর্ব্বে দুই একবার এই রেলপথ অতিক্রম করিবার সময় পরেশনাথ পাহাড়ের মনোহর দৃশ্যে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়ায় গোমোয় কয়েক দিন অবস্থিতি করিবার জন্য আমাদের কৌতূহলী তরুণ-চিত্ত ব্যাকুল হইয়াছিল।

এই স্থানটির প্রাকৃতিক দৃশ্য অতীব চিত্তাকর্ষক। বিশেষতঃ, আমরা রেল-ষ্টেশনের কিছু দূরে যে স্থানে বাসা লইয়াছিলাম, তাহার চতুর্দ্দিকের দৃশ্য সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম বলিয়াই আমাদের ধারণা হইয়াছিল। আমাদের সুদৃশ্য ক্ষুদ্র বাঙ্গলোটির চতুর্দ্দিকে শ্যামল তরুরাজি-সমাচ্ছন্ন সমুচ্চ গিরি-প্রাচীর। সেই প্রাচীরের এক দিকে প্রকৃতি দেবী যে ব্যবধান রচনা করিয়াছিলেন, সেই পথে দিগন্ত-প্রসারিত প্রান্তর নয়ন-গোচর হইতেছিল। প্রান্তর-বক্ষে দুই চারিটি পার্ব্বত্য তরু বিক্ষিপ্ত ভাবে দণ্ডায়মান। প্রত্যেক বৃক্ষের পাদমূলে ক্ষুদ্র, বৃহৎ নানা আকারের শিলাখণ্ড নিপতিত। পর্য্যটকগণের উপবেশনের জন্য তাহা প্রকৃতি দেবীর চারুহস্ত-রচিত বিচিত্র আসন।

একটি সঙ্কীর্ণকায়া গিরি-তরঙ্গিণী সেই পাহাড়ের পাদভূমি ধৌত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। নদীবক্ষে নানা আকারের উপলখণ্ড; স্বচ্ছসলিলা, সঙ্গীতমুখরা গিরি-নদী তাহাদিগকে উল্লঙ্ঘন করিয়া পূর্ণবেগে প্রধাবিতা; লম্ফন-নিরত তরঙ্গগুলি তাহার তটনিম্নে পড়িয়া চূর্ণ হইতেছে; শুভ্র শীকরগুলি দ্রব রজতবিন্দুর ন্যায় তীরস্থ তৃণরাশি উপর ক্ষণে ক্ষণে বিক্ষিপ্ত হইতেছে।

মেঘাচ্ছন্ন ধূসরবর্ণ দূরস্থ পাহাড়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয় সঙ্গী বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "দেখ ধীরেশ, ঐ পরেশনাথ পাহাড় এখান থেকে কত দূর বল্‌তে পার?"

ধীরেশ অত্যন্ত গম্ভীরভাবে কিছু কাল চিন্তা করিয় অবশেষে যেন উপেক্ষাভরেই বলিল, "ও আর কত দূর এই মাইল দু'য়েক হবে বোধ করি।"

আমি অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে মাথা নাড়িয়া হাসিয় বলিলাম, "এ একটা কথাই নয়! পাঁচ মাইলের কম হবেই না।"

পাঁচ মাইল! বন্ধু ঈষৎ বিদ্রূপের স্বরে বলিলেন "তোমার মাইলের জ্ঞান বিলক্ষণ টন্‌টনে দেখ্‌ছি!—ঐ যায়গাটার দূরত্ব দু' মাইলের বেশী হতেই পারে না।"

বন্ধুর এই মতবিরোধের পর দূরত্ব সম্বন্ধে আর বাক্‌ বিতণ্ডা না করিয়া তাঁহার নিকট প্রস্তাব করিলাম, "কালই চলো পরীক্ষা করা যাক্‌।" কাহার অনুমান সত্য হইতে পারে—এ বিষয়ে আমরা উভয়েই বাজি রাখিয়াছিলাম; কিন্তু দুইটি তরুণ বন্ধুর জিদের উপর যে বাজি নির্ভর করে, উদরের সহিতই তাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ 'বিদিত ভুবনে।'— গম্ভীর-প্রকৃতি প্রবীণ পাঠকগণকে তাহা জানাইয়া আর তরুণসুলভ ধৃষ্টতা প্রকাশ করিলাম না।

যাহা হউক, বন্ধু-বিচ্ছেদের আশঙ্কায় তর্কে পরাঙ্মুখ হইয়া যখন হাল ছাড়িয়া দিলাম, তখন বন্ধু স্বয়ং হাল ধরিলেন: বলিলেন, "রণেন, তা হ'লে কালই যাওয়া যাক চলো, কি বলো?"—সহসা বন্ধুর করপল্লব গদার ন্যায় আমার স্কন্ধে স্থাপিত হইল।

সেই দিন হইতেই আমাদের যাত্রার আয়োজন আরম্ভ হইল। দেখিলাম, বন্ধুর উৎসাহ আমার আগ্রহের অপেক্ষা

অনেক অধিক। সেই রাত্রির অর্দ্ধাংশ আমরা গল্প করিয়াই কাটাইয়া দিলাম, সে গল্প পরেশনাথ দর্শন-সংক্রান্ত। আমরা তীর্থযাত্রী; কিন্তু তরুণ হিন্দুর তীর্থযাত্রার আগ্রহ যে দেবচরণ দর্শনের চিন্তাতেই নিবিড় হইয়া উঠে, এরূপ অনুমান করা আমার অসাধ্য।

ক্ষুধা স্থান-কাল বিচার করে না; প্রভাতেই রন্ধন আরম্ভ করিলাম। বন্ধুবর ধীরেশ যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন। প্রথমেই তিনি দুইটি বিজলী-বাতি ও দুইখানি মোটা বাঁশের লাঠী বাহির করিলেন, এবং দুইখানি বড় ছোরা বাহির করিয়া বালীর সাহায্যে তাহাদের প্রশস্ত ফলায় শাণ দিতে বসিলেন; কয়েক মিনিট পরে তাহার শাণিত ফলা প্রভাত-রৌদ্রে ঝক্-মক্ করিতে লাগিল।

এই সকল আয়োজন শেষ হইলে বন্ধু আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তোমার বাক্সের ভিতর তুলোর একটা মোড়ক দেখেছিলাম না? সেটা আমায় বের ক'রে দেবে?"

উনানের উপর গুঞ্জনমুখর ভাতের হাঁড়ীর পরিচর্য্যা করিতে করিতে বলিলাম, "তুলো কি কাযে লাগবে? হাঁ, এখন আমার মনে হচ্ছে বটে, আমার ভাই-ঝির ফোঁড়া কাটাবার সময় খানিক 'এব্‌জরব কটন' আনা হয়েছিল, কাযে লাগিয়ে তার যে টুকু উদ্‌বৃত্ত ছিল, আমার সুটকেশেই তা প'ড়ে ছিল। সেটা আমার সঙ্গে এই প্রবাসেই এসে পড়েছে বটে; কিন্তু পথপর্য্যটনে সেই তুলো আমাদের কি কি ইষ্টসিদ্ধি করবে?"

বন্ধু আমার বুদ্ধির স্থূলতায় কিঞ্চিৎ হতাশ হইয়া বলিল, "এই সোজা কথাটা বুঝে উঠ্‌তে পারলে না? দুর্গম পাহাড়ে' পথে চল্‌তে চল্‌তে জুতোর মধ্যে শ্রীচরণ যখন বেজুৎ হয়ে পড়বে, এবং পায়ে ফোস্কা উঠ্‌বে, তখন এই তুলোই 'ভবতি ভবার্ণব-তরণে নৌকা';—তুলোর ব্যাণ্ডেজ বেঁধে আবার 'শনৈঃ পর্ব্বতলঙ্ঘনম্'!"

সে দিন প্রভাতে আকাশের কোন দিকে বিন্দুমাত্র মেঘ ছিল না, স্বচ্ছ নীলাকাশ; আশা হইল, ভ্রমণের আনন্দ পূর্ণ মাত্রা উপভোগ করিতে পারিব। আমরা তাড়াতাড়ি স্নানান্তে ভোজন শেষ করিলাম।

অতঃপর আমি কয়েক মিনিটের জন্য বাহিরে গিয়াছিলাম; বাসায় ফিরিয়া দেখি ধীরেশ একটি বিষধর সর্পশাবক (গোখ্‌রো) হত্যা করিয়া আমার শয্যাপ্রান্তে ফেলিয়া রাখিয়াছে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম, সর্প-শিশুটি আমার শয্যার নীচে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। তিনি যথাসময়ে সতর্কতাবলম্বন না করিলে আমার ভ্রমণের সখ জীবনের মত মিটিয়া যাইত, আর বাড়ী ফিরিতে হইত না। স্মরণ হইল, গৃহত্যাগের পূর্ব্বে স্নেহময়ী মা আমাকে সতর্ক করিবার জন্য বলিয়াছিলেন, "বাবা, পাহাড়ে' অঞ্চলে বেড়াতে যাচ্ছ, ও সব যায়গায় পোকা-মাকড়ের ভয়, হুঁসিয়ার থেকো।" তিনি আমার সঙ্গে একটি পাচক পাঠাইতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু আমরা রাঁধিতে জানি—এই ধারণায় 'ঠাকুর' সঙ্গে লওয়া নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়াছিলাম। প্রবাসে আসিয়া আমরাই এই ভার গ্রহণ করিয়াছিলাম, কোন অসুবিধা সহ্য করিতে হয় নাই। 'সর্ব্বমাত্মবশং সুখম্' এই সত্যও আমরা উপলব্ধি করিয়াছিলাম। এখানে খাদ্যসামগ্রী অত্যন্ত সুলভ। কোন দিন কোন দ্রব্যের অভাব অনুভব করি নাই। স্থানটি এখনও সহরে পরিণত হয় নাই। তবে বড় 'রেলওয়ে জংসন" বলিয়া এখানে অনেক প্রবাসীর বাস। ছোট ছোট পাহাড়গুলির নীচে ও তাহাদের ব্যবধানে নিবিড় অরণ্য। শুনিলাম, আমাদের বাসার চতুর্দ্দিকে যে সকল মহুয়া গাছ আছে, সেই সকল গাছের তলায় এখনও শীতকালের প্রভাতে ভল্লুকের দল শয়ন করিয়া রৌদ্র উপভোগ করে। বেলা অধিক হইলেও তাহারা সেই স্থান ত্যাগ করে না; সুতরাং আমাদিগকে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হয়।

২

যোগাড়-যন্ত্র শেষ করিয়া বাসা ত্যাগ করিতে বেলা এগারটা বাজিয়া গেল। তখনও আকাশ পরিষ্কার। আমরা মেঠোপথ ধরিয়া চলিতে আরম্ভ করিলাম। আমাদের পথের দুই পাশে ধান্য-ক্ষেত্র; ধানের কচি চারাগুলি বায়ুপ্রবাহে আন্দোলিত হইতেছিল। ধান্য-ক্ষেত্রের পার্শ্বস্থ উচ্চ আলের উপর মধ্যে মধ্যে প্রস্তরখণ্ডগুলিতে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। সেই সকল প্রস্তর ও আলের পাশ দিয়া বর্ষাকালের সঞ্চিত জলরাশি নির্ঝর-সলিলের ন্যায় সবেগে প্রবাহিত হইতেছিল। ধান্যক্ষেত্রগুলিতেও প্রচুর জল সঞ্চিত ছিল। মেঘান্তরিত সূর্য্যের উজ্জ্বল কিরণধারা সেই জলে প্রতিবিম্বিত হইয়া ঝল্-মল্ করিতেছিল। সেই শোভা দর্শনে আমরা মুগ্ধ হইলাম। পথশ্রমে আমরা কষ্টবোধ করিলাম না।

কিন্তু আমাদের গন্তব্য পথ অসীম বলিয়া মনে হইতে লাগিল, যতই চলি—পথের যেন শেষ নাই! মনে হইতেছিল, পরেশনাথ পাহাড়ের নিকটে আসিয়াছি, অবিলম্বেই পাহাড়ের পাদদেশে উপস্থিত হইব; কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, আমরা যতই অগ্রসর হই, পাহাড় যেন ততই দূরে সরিয়া যাইতে থাকে! মনে হইল, যেন মরুচর মরীচিকার অনুসরণে ধাবিত হইয়াছি! ইহা কি আমাদের দৃষ্টিবিভ্রম? আমাদের গতির বিরাম নাই, কিন্তু পাহাড় প্রথমে যে স্থানে দেখিয়াছিলাম, সেই স্থানেই তাহা অচল ভাবে দণ্ডায়মান।

পরেশনাথের অর্দ্ধাংশ তখন নিবিড় কুজ্ঝটিকাবং মেঘে আচ্ছন্ন বলিয়া প্রতীতি হইতেছিল। তাহার পাদদেশ পার্ব্বত্য বৃক্ষরাজি পরিবৃত হইয়া নয়ন সমক্ষে নয়নাভিরাম শ্যামল শোভা বিকাশ করিতেছিল। সেই পার্ব্বত্য-অরণ্য দূরে থাকিলেও সুস্পষ্টরূপে আমাদের নয়নগোচর হইল।

আরও কিছু দূর অগ্রসর হইয়াছি—সেই সময় একটি নিটোল দেহ, যেন কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর-ক্ষোদিত মূর্ত্তি,—বলিষ্ঠ সাঁওতাল সহসা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত। আমিই তাহাকে প্রথমে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ঐ বড় পাহাড়টা আর কত দূরে আছে?" আমার প্রশ্ন শুনিয়া যুবক বলিল, "যে পথে তুরা চল্‌তে নেগেচিস্, সেই পথে যদি যাচ্চিস্, তবে ত ঢের দেরী হয়ে যাবে। আমার সাথে চল, আমি জলদী পাহাড়ে যাবার পথ দেখিয়ে দিচ্চি।"

সাঁওতাল যুবকটির কথায় আশ্বস্ত হইয়া আমরা তাহার অনুসরণ করিলাম। ঘুরিতে ঘুরিতে আমরা তাহার সহিত প্রায় এক মাইল পথ অতিক্রম করিলাম; অবশেষে সে আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া একটি নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিল; আমাদের চতুর্দ্দিকে দুষ্প্রবেশ্য গভীর জঙ্গল। চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আমি থমকিয়া দাঁড়াইলাম এবং তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলাম, "এই জঙ্গলের ভিতর দিয়ে কি-ক'রে পাহাড়ে যাওয়া যাবে? পাহাড়ও ত আর দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে না। যদিই বা যাওয়া যায়, তা'হলেও পাহাড়ে পৌছোতেই ত আমাদের সন্ধ্যে হ'য়ে যাবে! এ কোথায় আমাদের এনে ফেল্‌লি?"

আমার কথা শুনিয়া সাঁওতালটা যেন হতবুদ্ধি হইল; তাহার পর কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল, "চল্ না বাবু, ভয় কি তোর? আমি ঠিক পথেই তোদের নিয়ে যাব।"

সে পুনর্ব্বার তাহার গন্তব্যপথে অগ্রসর হইল। আমরা নিরুপায় হইয়া অনিচ্ছার সহিত অগত্যা তাহার অনুসরণ করিলাম। আরও কিছু দূর অগ্রসর হইয়া সে সহসা থমকিয়া দাঁড়াইল, এবং আমাকে বলিল, "তোরা এখানে একটু দাঁড়া বাবু, আমি এখুনই আস্‌চি।"—সে মুহূর্ত্তমধ্যে সেই নিবিড় অরণ্যের অন্তরালে অদৃশ্য হইল।

আমার মন তখন নানা দুশ্চিন্তায় পূর্ণ। আমি ধীরেশের স্কন্ধ স্পর্শ করিয়া মৃদুস্বরে বলিলাম, "যদি প্রাণের মায়া থাকে, চল ঐ ঝোপ্‌টার ভিতর প্রবেশ করি। সাঁওতালটা নিশ্চিতই ডাকাত; ও বেটা বোধ হয় দলের অন্যান্য ডাকাতদের খবর দিতে গিয়েছে। ও জানে, আমরা এই জঙ্গল থেকে হঠাৎ বেরিয়ে যেতে পারব না। আর এদিকে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আস্‌বারও ত আধ ঘণ্টার বেশী বিলম্ব নাই।"

আমরা উভয়ে এই সকল কথার আলোচনা করিতে-ছিলাম, সহসা কিছু দূরে দৃষ্টিপাত করিয়া সেই সাঁওতালটার মত আরও সাত আটটা জোয়ানকে দেখিতে পাইলাম! তাহাদের প্রত্যেকের হাতে সুদীর্ঘ ও স্থূল লাঠী। মনে হইল, তাহারা আমাদের সন্ধানেই আসিতেছিল!

সেই স্থানে আর অধিককাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া জীবন বিপন্ন করা সঙ্গত মনে করিলাম না, তৎক্ষণাৎ বসিয়া-পড়িয়া উভয় করতল ও জানুতে ভর দিয়া যত শীঘ্র সম্ভব সম্মুখে অগ্রসর হইলাম; তাহার পর যে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিলাম, তাহার ভিতর দুই-পাঁচটা হাতী লুকাইয়া থাকিলেও কেহ তাহাদের সন্ধান পায় না। সেই অরণ্যে সাপ, বাঘ, ভালুক—সকল প্রকার হিংস্র প্রাণী সহসা আমাদিগকে আক্রমণ করিতে পারিত; কিন্তু সেই সাঁওতালগুলাকে আমরা সাপ-বাঘ অপেক্ষাও অধিক হিংস্র মনে করায় বিষধর সর্প বা ব্যাঘ্র ভল্লুকের ভয়ও তুচ্ছ মনে করিলাম।

আমরা সেই অরণ্যে প্রবেশ করিয়াও বুঝিতে পারিলাম, দস্যুরা আমাদের অনুসরণ করিয়াছে। কিছুকাল পরে একটা ঝোপের ফাঁক দিয়া দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দেখিলাম, আমাদের পথিপ্রদর্শক সেই সাঁওতাল যুবক সেই দস্যুদলের পুরোবর্ত্তী হইয়া বিভিন্ন ঝোপের ভিতর আমাদের অনুসন্ধান করিতেছিল।

কিছুকাল পরে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হওয়ায় নৈশ অন্ধকারে সমগ্র বনভূমি সমাচ্ছন্ন হইল। আমরা কিছু দূরে আলোক

স্ফুলিঙ্গ লক্ষ্য করিয়া তাহার কারণানুসন্ধানে জানিতে পারিলাম, সাঁওতালগুলা একটি বৃক্ষমূলে বসিয়া চকমকী ঠুকিয়া যে অগ্নি উৎপাদন করিয়াছিল, তাহার সাহায্যে কয়েকটি মশাল জ্বালিয়াছিল। তাহারা সেই মশালের আলোকে বিভিন্ন ঝোপে পুনর্ব্বার আমাদিগকে খুঁজিতে আরম্ভ করিল। আমরা দূরে তাহাদের মশালের আলোক-প্রভা দেখিতে পাইলেও তাহারা বহু চেষ্টাতেও আমাদিগকে আবিষ্কার করিতে পারিল না। নিবিড় অন্ধকারাচ্ছন্ন অরণ্য লতাপত্রের অঞ্চলচ্ছায়ায় আমাদিগকে আশ্রয়দান করিয়াছিল।

সেই গহন কাননে আশ্রয় গ্রহণের কিছুকাল পরে মনে হইল, কোন প্রকার আরণ্য কীট কর্ত্তৃক আমি আক্রান্ত হইয়াছি; অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাইলাম না, কিন্তু আমার হস্ত ও পদদ্বয়ে হঠাৎ জ্বালা অনুভব করিলাম, এবং ক্রমশঃ সেই যন্ত্রণা অসহ্য হইয়া উঠিল। ধীরেশও বলিল, "কিসে যেন কাম্‌ড়াচ্ছে ভাই!" সঙ্গে সঙ্গে সে যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। অন্ধকারে দেহের বিভিন্ন অংশ স্পর্শ করিয়া বুঝিতে পারিলাম, আমরা একজাতীয় কীট কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছি—তাহাদের আকার কাট-পিপ্‌ড়ে অপেক্ষা কিঞ্চিৎ দীর্ঘ ও স্থূল। তাহাদের দংশনে সর্ব্বাঙ্গ বিষ-জর্জ্জরিত হওয়ায় আমরা আর সেই স্থানে থাকিতে পারিলাম না। আমরা অরণ্যের অন্য অংশে গমনোদ্যত হইলাম। সেই সময় এক জন সাঁওতাল আমাদের অদূরে আসিয়া তাহার সঙ্গিগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "শালা-লোক এই বনে লুকিয়ে নেই ত? তোরা এদিকে আয়, এই বনটা লাঠী দিয়ে খুঁচিয়ে দেখি।"

আমরা ধরা পড়িবার ভয়ে অসহ্য দংশন-যন্ত্রণা নিঃশব্দে সহ্য করিয়া, বুকে ভর দিয়া চলিয়া সেই অরণ্যের অন্য অংশে পলায়ন করিলাম। তাহার পর ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। কীট-দংশনে একে সর্ব্বাঙ্গ জর্জ্জরিত, তাহার উপর জানুতে ভর দিয়া চলিবার সময় কঙ্কর-রাশির সংঘর্ষণে জানুর ত্বক্ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া রক্ত ঝরিতেছিল; আমাদের পরিধেয় বস্ত্র রক্তপ্লাবিত হইল।

সাঁওতাল-দস্যুরা তখন পর্য্যন্ত আমাদের অনুসন্ধানে বিরত হয় নাই, লতাগুল্মরাশির উপর তাহাদের লাঠীর আঘাতের শব্দেই তাহা বুঝিতে পারিলাম। তাহারা দুই তিন দলে বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন ঝোপ পরীক্ষা করিতেছিল।

কয়েক মিনিট পরে আমাদের অদূরবর্ত্তী বৃক্ষমূলে কাহারও পদশব্দ হইল; সুতরাং আমরা ধরা পড়িবার ভয়ে বিপরীত দিকে দৌড়াইতে আরম্ভ করিলাম। সম্মুখে অগ্রসর হইতে পদে পদে বাধা, কোথাও কণ্টকলতা, কোথাও স্থূল বৃক্ষকাণ্ড; তাহাদের সংঘর্ষণে সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হইল; কিন্তু প্রাণের মায়া ত্যাগ করিতে পারিলাম না, পুনঃ পুনঃ আহত হইয়াও দৌড়াইতে লাগিলাম। দস্যুরা আমাদিগকে দেখিতে না পাইলেও পদশব্দ শুনিয়া তখনও আমাদিগের অনুসরণ করিতেছিল, তাহা বুঝিতে পারিলাম।

কিছুকাল পরে আমরা আর একটি ঝোপের ভিতর প্রবেশ করিলে সাঁওতালগুলা আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইল।

আমরা সেই ঝোপের ভিতর কিছুকাল অপেক্ষা করিয়া যখন আর তাহাদের সাড়াশব্দ পাইলাম না, তখন উঠিয়া সেই ঝোপ হইতে বাহির হইয়া সম্মুখে চলিতে লাগিলাম। সেই সময় বন্ধুকে মৃদু স্বরে বলিলাম, "ধীরেশ, এ বনের শেষ কোথায়, তা অনুমান করা অসাধ্য; এই রাত্রে যে বাসায় ফির্‌তে পার্‌বো, সে আশা নেই। যদি এই বনে কারও বাড়ী থাকে, তবে বাকি রাতটুকু সেখানে আশ্রয় পাওয়া যায় কি না, সে জন্য চেষ্টা করা উচিত।" ধীরেশ আমার এই প্রস্তাবের সমর্থন করিল।

রাত্রি ক্রমশঃ গভীর হইয়া আসিতেছিল। আমাদের দুই পার্শ্বে নিবিড় অরণ্য। মধ্যে মধ্যে পত্রবহুল অনুচ্চ বাবলা গাছ, তাহাদের সবুজ পত্রে অসংখ্য খদ্যোৎ; জোনাকী-গুলি মৃদু আলোকপ্রভা বিকীর্ণ করিতেছিল। আমরা সেই দৃশ্য দেখিতে দেখিতে আরও কিছু দূর অগ্রসর হইলাম। শুক্লাপঞ্চমীর চন্দ্রকলা পশ্চিমাকাশ হইতে ক্ষীণ প্রভা বিকীর্ণ করিতেছিল। আমরা অরণ্য-প্রান্তে উপস্থিত হইয়া সেই মৃদু চন্দ্রালোকে কিছু দূরে একটি ছায়াবৎ পদার্থ দেখিতে পাইলাম। দুই তিন মিনিট স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া বুঝিতে পারিলাম—তাহা অট্টালিকা। জনবসতি-বিহীন এই অরণ্যের প্রান্তে অট্টালিকা! আমাদের দৃষ্টিবিভ্রম নহে ত? আমরা আশ্বস্ত হৃদয়ে উৎসাহভরে সেই অট্টালিকা লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইলাম।

৩

প্রায় দশ মিনিট দ্রুতবেগে চলিয়া আমরা একটি বৃহৎ অট্টালিকার সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। প্রথম দৃষ্টিতেই মনে হইল, নিবিড় অরণ্য-প্রান্তে সংস্থাপিত এই অট্টালিকা 'পরিত্যক্ত ভবন।' বাড়ীখানি নিস্তব্ধ, কোন দিকে জন-মানবের সাড়া-শব্দ পাইলাম না। এই সুবৃহৎ অট্টালিকার কোন অংশে একটিও আলোকের চিহ্নমাত্র নাই। পশ্চিম গগন-প্রান্তে বিলীনপ্রায় শুক্লা-পঞ্চমীর ক্ষীণ চন্দ্রকলার অস্ফুট আলোকে সেই ভগ্নপ্রায় জীর্ণ অট্টালিকা যেন কোন অলৌকিক রহস্যের আধার বলিয়াই প্রতীয়মান হইল।

অট্টালিকার সম্মুখে অনুচ্চ ফটক; তাহার উভয় পার্শ্বে নানা জাতীয় লতা-গুল্ম। ভগ্ন প্রাচীরের উপর কোন্ কালে যে অশ্বত্থ-বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল, দীর্ঘকালে তাহা স্থূল বৃক্ষে পরিণত হইয়া চতুর্দ্দিকে শাখা-বাহু প্রসারিত করিয়াছে। অট্টালিকার দেওয়ালের স্থানে স্থানে চূণ বালি খসিয়া পড়ায় বিবর্ণ, জীর্ণ ইটগুলি বাহির হইয়া পড়িয়াছে। সমগ্র অট্টালিকা নির্জ্জন শ্মশানের ন্যায় নিস্তব্ধ। কত শতাব্দী পূর্ব্বে এই অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া তাহা অনুমান করা আমাদের অসাধ্য হইল। প্রত্নতত্ত্বের আলোচনা করিব, এরূপ মনোভাবও তখন আমাদের ছিল না।

অট্টালিকার দ্বার রুদ্ধ ছিল; আমরা ধীর পদবিক্ষেপে দ্বারের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দ্বার-সংলগ্ন বিবর্ণ কড়া ধরিয়া সজোরে নাড়িতে লাগিলাম। সেই নিস্তব্ধ নিশায় সেই খটাখট্ ঝন্-ঝন্ শব্দ দিকে দিকে প্রতিধ্বনিত হইল। অল্পকাল পরে কেহ নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল।

যিনি দ্বার খুলিলেন, প্রথমেই তাঁহার মুখমণ্ডলে আমার বিজলি-বাতির আলোক প্রতিফলিত হইল। সেই শুভ্র বৈদ্যুতিক আলোকে তাঁহার মুখ দেখিয়া আমার বুকের ভিতর যেন বিদ্যুৎ-স্পন্দন অনুভব করিলাম। তাঁহার শীর্ণ-দেহ কঙ্কালসার, অস্থিসর্ব্বস্ব; মুখ বিবর্ণ, যেন তাহা ভাব-সম্পর্কবিরহিত মৃত ব্যক্তির মুখ! কোটরপ্রবিষ্ট চক্ষুর ক্ষীণ দৃষ্টি যেন কোন্ যুগান্তরের রহস্যপূর্ণ বার্ত্তা বহন করিয়া আনিতেছিল।

আগন্তুক আমার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় জড়িত-স্বরে বলিলেন, "কি দরকার এখানে আপনার?"—সেই স্বরে হিন্দুস্থানীয় টান লক্ষ্য করিলাম।

আমি আতঙ্কাভিভূত হইয়া স্খলিত স্বরে বলিলাম, "আমরা বড়ই বিপন্ন হ'য়ে এখানে হঠাৎ এসে পড়েছি; আজ রাত্রির মত একটু আশ্রয় চাই।"

আগন্তুক আমাদের মুখের উপর অন্তর্ভেদী দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া চাপা গলায় বলিলেন, "আমার সঙ্গে আসুন।"

আমরা দোতালায় তাঁহার অনুসরণ করিলাম। আমাদের প্রতি পদক্ষেপে সিঁড়ি ভীষণ দুলিতে লাগিল; সিঁড়ির রেলিং ভাঙ্গিয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। আমাদের সন্দেহ হইল, আমাদের পদভরে সিঁড়ি হয় ত ভাঙ্গিয়া পড়িবে, এবং তাহার নীচে আমরা চিরবিশ্রাম লাভ করিব।

কোন রকমে দোতালায় উঠিলাম। জীর্ণ দোতালার পড়' পড়' অবস্থা। কে জানে, কতকাল পূর্ব্বে এই সুপ্রশস্ত বিলাস-ভবন নির্ম্মিত হইয়াছিল? কিন্তু এখন তাহার অবস্থা অতি শোচনীয়—"সিঁড়ি আগে ভাঙ্গে, কিম্বা কড়ি আগে খসে!"

অতীত যুগের এই প্রমোদ-ভবনের অবস্থা দেখিয়া আমি সেই সজীব নরকঙ্কালকে বলিলাম, "দোতালায় আমাদের থাক্‌বার ইচ্ছা নাই; আপনি দয়া ক'রে নীচের তালায় আমাদের একটু আশ্রয় দিলে উপকৃত হবো!"

তিনি যেন আমার প্রার্থনায় কিঞ্চিৎ প্রসন্ন ভাবে বলিলেন, "বেশ, তাই হবে; আমার শোবার ঘরের পাশের কামরায় তোমরা রাত্রিযাপন করতে পার।"

আমরা তরুণ যুবক, এই জন্যই বোধ হয় তিনি আমাদিগকে এবার 'তোমরা' বলিলেন।

পুনর্ব্বার আমরা নীচে নামিয়া আসিলাম। গৃহস্বামী আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া একটি প্রশস্ত হল-ঘরে প্রবেশ করিলেন। সেই কক্ষে একটি ক্ষুদ্র দীপ মিট্-মিট্ করিয়া জ্বলিতেছিল, তাহাতে সেই কক্ষের সকল অংশের অন্ধকার অপসারিত হয় নাই। দরজা-জানালাগুলি উদ্ঘাটিত দেখিলাম। মেঝের উপর যে বহু পুরাতন গালিচা প্রসারিত ছিল, তাহার উপর বোধ হয় এক শতাব্দীর ধূলি সঞ্চিত হইয়াছিল। প্রত্যেক দেওয়ালের পার্শ্বে সেকেলে আলমারি, জীর্ণ, ধূলিধূসরিত। মেঝের মধ্যস্থলে সেকেলে খাট; অন্যান্য পুরাতন আসবাবপত্রও সেই কক্ষে সংরক্ষিত

দেখিলাম। সকলই অব্যবহৃত অবস্থায় উপেক্ষিত ভাবে পড়িয়া ছিল। খাটের গদীটি অত্যন্ত জীর্ণ, বহু স্থানে ছিন্ন।

সেই ব্যক্তিই গৃহস্বামী কি না, তাহা তখনও জানিতে পারি নাই; তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেও আমার সাহস হয় নাই। তিনি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমাদের মুখের দিকে চাহিয়া যেন আমাদের মনের প্রত্যেক ভাব বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহার সেই অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে আমরা অভিভূত, আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলাম।

কয়েক মিনিট পরে তিনি কিঞ্চিৎ উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "তোমরা আমার এই ঘরের অবস্থা দেখে বোধ হয় বিস্ময় বোধ ক'রছো। বিস্ময়ের কোন কারণ নাই। আমার সংসারে পরিবার-সংখ্যা অল্প ছিল না; কিন্তু সাংঘাতিক প্লেগের আক্রমণে কয়েক দিনের মধ্যেই পরিবারস্থ সকলেই প্রাণ বিসর্জ্জন করেছে। আমার এই অট্টালিকা নিরানন্দময় শ্মশানে পরিণত হ'য়েছে। সেই বেদনার কাহিনী বড় মর্ম্মভেদী। তোমরা সে সকল কথা না শুন্‌লেও ক্ষতি নাই; তোমরা ঐ খাটে শুয়ে পড়। আমি পাশের ঘরেই থাক্‌ব। তোমাদের ইচ্ছা হয় দ্বার বন্ধ করতে পার। চোরের ভয় এখানে নাই। চোর একবার অর্থলোভে চুরি করতে এসেছিল, কিন্তু উপযুক্ত শাস্তি পেয়েছিল। তোমাদের ভয়ের কারণ নাই।"

এই কথা বলিয়া তিনি হাসিলেন, তাঁহার হাসির ভিতর কি বিভীষিকা সংগুপ্ত ছিল; আমার মন আতঙ্কে পূর্ণ হইল। লোকটির কথাবার্ত্তা, ব্যবহার সকলই রহস্যপূর্ণ; মনে হইল, বিজন অরণ্যে সাঁওতাল-দস্যুগণের আক্রমণের ভয়েই আমাকে এরূপ আড়ষ্ট অভিভূত হইতে হয় নাই। আমি ধীরেশকে লক্ষ্য করিয়া বলিলাম, "এসো ধীরেশ, আমরা শুয়ে একটু বিশ্রাম করি; এরূপ অদ্ভুত স্থানে, এ অবস্থায় ঘুমের ত আশা নাই।"

আমার মন্তব্য শুনিয়া লোকটি সেই কক্ষ ত্যাগ করিলেন। আমরা কক্ষদ্বার অর্গলরুদ্ধ করিয়া সেই ধূলি-সমাচ্ছন্ন খট্টায় অবসন্ন দেহভার প্রসারিত করিলাম। সেই স্থানে সেইরূপ অবস্থায় যদিও নিদ্রার আশা ছিল না, তথাপি দেহ অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হওয়ায় কয়েক মিনিটের মধ্যে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলাম।

কি একটা শব্দ শুনিয়া কতক্ষণ পরে নিদ্রাভঙ্গ হইল, তাহা অনুমান করিতে পারিলাম না। মনে হইল, কেহ আমাদের শয়ন-কক্ষে খট্‌-খট্‌ শব্দে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল! শয়ন-কক্ষ অন্ধকারাচ্ছন্ন, আমরা দ্বার অর্গলরুদ্ধ করিয়া শয়ন করিয়াছিলাম। কে কি কৌশলে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল? তাহার উদ্দেশ্য কি? আমাদের আশ্রয়দাতা বলিয়াছিলেন, দস্যুতস্কর এই অট্টালিকায় প্রবেশ করিতে সাহস করে না, তবে ঐ পদশব্দ কাহার?

কিছুই বুঝিতে না পারায় ধীরেশকে জাগাইলাম, এবং আমার অস্বস্তি ও ভয়ের কারণ তাহার গোচর করিলাম। আমাদের আশ্রয়দাতা পার্শ্বস্থ কক্ষে ছিলেন, সকল কথা তাঁহাকে জানাইবার জন্য আগ্রহ হইল।

ধীরেশ আমার প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া শয্যাত্যাগ করিল, এবং মুহূর্ত্তমধ্যে টর্চ্চ জ্বালিয়া সেই কক্ষ আলোকিত করিল। আমরা সেই কক্ষের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া জন-প্রাণীকেও দেখিতে পাইলাম না। কে তবে কিছুকাল পূর্ব্বে সেই কক্ষে খট্‌-খট্‌ শব্দে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল? তবে কি আমি নিদ্রাঘোরে স্বপ্ন দেখিতেছিলাম? না ইহা ভুতুড়ে বাড়ী, ভূতের আড্ডা?

অতঃপর আমরা উভয়ে নিঃশব্দে আমাদের আশ্রয়দাতার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, তিনি একখানি ক্ষুদ্র খাটিয়ায় দেহ প্রসারিত করিয়া নিদ্রাভিভূত; একখানি পুরু চাদরে তাঁহার আপাদমস্তক আবৃত। সেই কক্ষ এরূপ নিস্তব্ধ যে, আমরা তাঁহার শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দও শুনিতে পাইলাম না! সেই কক্ষের একপ্রান্তে সংরক্ষিত একখান বহু পুরাতন টেবলের উপর কতকগুলি খাতা-পত্র সংস্থাপিত; তাহাদের উপর প্রায় এক ইঞ্চি পুরু ধূলিরাশি সঞ্চিত। মনে হইল, বহুকাল তাহাতে মনুষ্যের করস্পর্শ হয় নাই।

সেই কক্ষের দেওয়ালে একটি বহু পুরাতন ঘড়ি সংরক্ষিত দেখিলাম। পাঁচটা বাজিবার পর ঘড়িটি বন্ধ হইয়াছিল। ঘড়ির 'ডায়েলে' সময়জ্ঞাপক যে রেখাগুলি দেখিলাম, সেগুলি ইংরেজী, বাঙ্গালা বা রোমান হরফ নহে, কোন্ ভাষা, তাহা বুঝিতে পারিলাম না! ইংরেজের আমলে ঐ প্রকার ঘড়ি পূর্ব্বে কোন দিন দেখিতে পাই নাই।

আমি নিদ্রিত লোকটির প্রসারিত অসাড় দেহের দিকে চাহিয়া কি চিন্তা করিতেছিলাম, সেই সময় ঘড়িতে দম দেওয়ার শব্দ আমার কর্ণগোচর হইল, এবং মুহূর্ত্ত

পরে ঘড়িতে ঠং-ঠং শব্দে তিনটা বাজিয়া গেল। আমি ঘড়ির দিকে চাহিতেই আমার বিস্ময়-বিহ্বল নেত্রের দৃষ্টি ধীরেশের উপর নিক্ষিপ্ত হইল। দেখিলাম, ধীরেশের সর্ব্বাঙ্গ ভয়ে ঠক্-ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল! তাহার মূর্চ্ছার উপক্রম দেখিয়া তাড়াতাড়ি তাহাকে ধরিয়া ফেলিলাম। সে আতঙ্ক-কম্পিত বিহ্বল স্বরে বলিল, "উঃ কি ভয়ানক! আমি স্পষ্ট দেখ্‌লাম, কার একখানা লম্বা হাত ঐ ঘড়িতে দম দিচ্ছিল! সেই একখানা হাত ভিন্ন দেহের অন্য কোন অংশ ওখানে ছিল না।"

ধীরেশের কথা শুনিয়া আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না, আমাদের আশ্রয়দাতার মস্তকের উপর ঝুঁকিয়া-পড়িয়া, ব্যাকুল স্বরে তাঁহাকে আহ্বান করিলাম। কিন্তু পুনঃ পুনঃ আহ্বানেও তাঁহার সাড়াশব্দ পাইলাম না; তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল না। তখন অগত্যা তাঁহার দেহের আবরণ-বস্ত্রখানি অপসারিত করিলাম, কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে যে ভীষণ দৃশ্য সন্দর্শন করিলাম, তাহা দেখিয়া আমরা উভয়েই আর্ত্তনাদ করিয়া খাটিয়া হইতে কয়েক ফুট দূরে লাফাইয়া পড়িলাম। আমার হাতের টর্চ্চের আলোক সেই খাটিয়ায় নিক্ষেপ করিয়া সেখানে সেই লোকটিকে দেখিতে পাইলাম না। তিনি কোথায় কিরূপে অদৃশ্য হইলেন, তাহাও বুঝিতে পারিলাম না। যেন ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার, মানব-বুদ্ধির অগোচর! কারণ, জীবিত মনুষ্যদেহের পরিবর্ত্তে সেই খাটিয়ায় একটি সুদীর্ঘ নরকঙ্কাল প্রসারিত দেখিলাম! ঐ প্রকার নর-কঙ্কাল চিকিৎসাবিদ্যার্থিগণ কেবল হাসপাতালেই সজ্জিত দেখিয়া থাকেন।

ধীরেশ তখনও মেঝের উপর বসিয়া ভয়ে কাঁপিতেছিল। আমি তাহাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য দৃঢ়স্বরে বলিলাম, "এখন এ রকম ভয় পেলে ত চল্‌বে না, ভাই! ওঠ।" সঙ্গে সঙ্গে তাহার হাত ধরিয়া একটা ঝাঁকুনী দিলাম।

কিন্তু ধীরেশ আশ্বস্ত হওয়া দূরের কথা, আতঙ্ক-বিস্ফারিত নেত্রে সেই খাটিয়ার দিকে চাহিয়া ব্যাকুল স্বরে আর্ত্তনাদ করিল। তাহার আর্ত্তনাদের কারণ বুঝিতে না পারায় আমি সেই খাটিয়ার দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করিলাম। দেখিলাম, নরকঙ্কালটি খাটিয়া ত্যাগ করিয়া সেই কক্ষের দ্বারের নিকট উপস্থিত হইল, এবং চক্ষুর নিমেষে সেই সুদীর্ঘ কঙ্কাল মাংস ও ত্বক-সংযোগে জীবিত মনুষ্যের দেহবৎ প্রতীয়মান হইল! দেখিলাম, আমাদের পূর্ব্বোক্ত আশ্রয়দাতা সেই কক্ষের দ্বারপ্রান্তে দণ্ডায়মান!

আমাদের আশ্রয়দাতা আমাদের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া আমাদিগকে সম্বোধন করিয়া ভগ্নস্বরে যে অদ্ভুত কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিলেন, তাহা যেমন বিস্ময়কর, সেইরূপ বৈচিত্র্যপূর্ণ; যেন অতীত যুগের ঐতিহাসিক দৃশ্য রঙ্গালয়ের দৃশ্যপটের ন্যায় আমাদের নয়ন-সমক্ষে উদ্ভাসিত হইল।

আমাদের আশ্রয়দাতা যেন অতীত যুগের কি এক দুঃস্বপ্ন হইতে হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়া আবেগ-কম্পিত স্বরে বলিতে লাগিলেন,—

"তোমরা আমার দুঃখময় জীবনের শোচনীয় ইতিহাস শ্রবণ কর। আমি যাহা বলিতেছি, তাহার একটি কথাও অতিরঞ্জিত নহে। এ বহু দিনের—বোধ হয়, দুই শতাব্দী পূর্ব্বের ঘটনা। ইংরেজ তখন এ দেশে তুলাদণ্ড ত্যাগ করিয়া রাজদণ্ড হস্তগত করিতে পারে নাই। এ কালের মত এই রেলগাড়ী, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, মোটর-গাড়ী, এরোপ্লেন এ সকলের নাম তখন এ দেশবাসীর স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

সেই সময় সুবে বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার মসনদে বসিয়া এই বিশাল রাজ্য শাসন করিতেছিলেন—জনপ্রিয় প্রবীণ নবাব আলিবর্দ্দী খান। আর তিনি তাঁহার জামাতা জয়েন আব্‌দীনকে আমাদের এই বিহারের ভাগ্যবিধাতার পদে স্থাপিত করিয়াছিলেন; কিন্তু জয়েন আব্‌দীন শান্তির সহিত রাজ্যশাসন করিবেন—বিধাতা তাঁহাকে সেই সৌভাগ্যের অধিকারী করেন নাই। মানুষ আত্মশক্তিতে নির্ভর করিয়া যাহা গঠন করে, বিধাতা অনেক সময় এক ফুৎকারে তাহা চূর্ণ করেন; তথাপি অদূরদর্শী মানব ক্ষমতা-দর্পে অন্ধ হইয়া মনে করে সে 'মুলুকে মালিক।'

নবাবের এক দাম্ভিক বিদ্রোহী সেনানায়ক মোস্তফা খান বঙ্গদেশ হইতে বিস্তর সৈন্য ও অর্থ সংগ্রহ করিয়া বিহারে উপস্থিত হইলেন, এবং আমাদের এই শান্তিপ্রিয় নিরীহ শাসনকর্ত্তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। এই যুদ্ধে আমাদের—প্রজা-সাধারণের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়

হইয়া উঠিল; কারণ, রাজায় রাজায় যুদ্ধে প্রজার অবস্থা সাধারণতঃ এইরূপই হইয়া থাকে। যাহা হউক, যুদ্ধের অবসানে কোন প্রকারে আমাদের প্রাণরক্ষা হইলেও আমার পিতৃ-পিতামহগণের সঞ্চিত অর্থরাশির অর্দ্ধেকেরও অধিক আমার হস্তচ্যুত হইয়াছিল।

এই ঘটনার কয়েক বৎসর পরেই বৃদ্ধ নবাব আলিবর্দ্দী খান তাঁহার তরুণ ও উদ্ধত দৌহিত্র মির্জ্জা মাহমুদের (সিরাজউদ্দৌলা) জন্য বিহারের সুবেদারী পদ প্রতিষ্ঠিত করিলেন, এবং রাজকার্য্যে বহুদর্শী প্রবীণ রাজা জানকীরামকে ক্ষমতাপ্রিয় অদূরদর্শী দৌহিত্রের রাজ্যরক্ষকের পদে নিযুক্ত করিলেন; কিন্তু অত্যল্পকাল মধ্যেই এই অবিমৃষ্যকারী তরুণ যুবক—তাঁহার দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলা স্বকীয় স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার অভিপ্রায়ে মাতামহ-নিযুক্ত বিচক্ষণ অভিভাবক রাজা জানকীরামকে অপমানিত করিয়া বিতাড়িত করিবার অভিসন্ধিতে অত্যন্ত বিচলিত হইয়া সৈন্যসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন; তাহার ফলে যুদ্ধ অপরিহার্য্য হইয়া উঠিল।

আমি বুঝিতে পারিলাম, এই যুদ্ধ আরম্ভ হইলে এবার আমাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইবে। কেবল সঞ্চিত অর্থরাশি নহে, জীবন পর্য্যন্ত নষ্ট হইবার সম্ভাবনা ছিল। সুতরাং অর্থরাশি ও জীবনরক্ষার আশায় পৈতৃক বাসস্থান পাটনার অদূরবর্ত্তী বাড় হইতে সর্ব্বস্ব তুলিয়া আনিয়া এই অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। এই পর্ব্বতসঙ্কুল নির্জ্জন ও দুর্গম অরণ্যপূর্ণ স্থানে বাসভবন নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিলাম। দুর্গম অরণ্যের বৃক্ষাদি অপসারিত করিয়া নগর স্থাপন করা আমার পক্ষে কঠিন হইলেও অসম্ভব হয় নাই।

আমি তখন বৃহৎ সংসারের অভিভাবক। আমার পরিবারবর্গের মধ্যে যাহারা নিতান্ত আপনার—তাহাদেরই সংখ্যা অন্যূন ২৫ জন। তাহার উপর আত্মীয়, আত্মীয়া এবং দাসদাসীও অল্প ছিল না। স্থানীয় অধিবাসীরা আমাদের ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া আমাদের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিল; সুতরাং এখানে বাস করিতে আরম্ভ করিয়া আমাদিগকে কোনপ্রকার অসুবিধা সহ্য করিতে হয় নাই। আমাদের দিনগুলি সুখেই অতিবাহিত হইতে লাগিল।

আমাদের সঙ্গে অনেকগুলি বন্দুক, পিস্তল ছিল। আমরা সেইগুলি লইয়া প্রায়ই ব্যাঘ্র ভল্লুক প্রভৃতি শিকার করিতাম। এজন্য হিংস্রজন্তুগুলা আমাদের বাসস্থানের নিকট আসিত না, দস্যু-তস্করগুলাও কোন দিন অর্থলোভে আমাদিগকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা করে নাই। ক্রমশঃ ইট-পাথর সংগ্রহ করিয়া এই বিশাল সৌধ নির্ম্মাণ করাইলাম, এবং চতুর্দ্দিকে চাষ-আবাদ আরম্ভ করিলাম।

এখানে আমরা কোন দিন সুখ-শান্তির অভাব অনুভব করি নাই; কিন্তু আমরা ভাগ্যদোষে ভগবানের প্রসন্নতায় বঞ্চিত হইলাম; সহসা এই অঞ্চলে মহামারী সংহার-মূর্ত্তিতে দেখা দিল, এবং তাহার আক্রমণে আমার সোনার সংসার ছারখার হইয়া গেল। আমার পরিজনবর্গের সকলেই অতি অল্পদিনের মধ্যে আমাকে পরিত্যাগ করিল; অবশেষে সেই মহামারী চতুর্দ্দিকের সাঁওতাল-পল্লীতে প্রবেশ করিয়া সাঁওতাল অধিবাসিগণকেও বিধ্বস্ত করিল। মহামারী সংক্রামক হইলে বহু দূরবর্ত্তী স্থান অল্প দিনেই শ্মশানে পরিণত হয়, ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। তোমাদেরও তাহা জানা থাকিতে পারে।

আমার পরিজনবর্গের সকলেই অল্প দিনের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হইবার পর এই কালব্যাধি আমাকেও আক্রমণ করিয়া গ্রাস করিল; আমিও ইহলোক হইতে অপসৃত হইলাম।

কিন্তু মৃত্যুর পরও আমি শান্তিলাভ করিতে পারিলাম না। আমার বিপুল অর্থরাশি আমার এই ঘরের মেঝের নীচে প্রোথিত করিয়া, সেই দিন হইতে তাহার পাহারায় নিযুক্ত আছি। আমার পূর্ব্বপুরুষগণের বহু কষ্টে অর্জ্জিত এবং আমার বিপুল চেষ্টায় সংরক্ষিত এই অর্থরাশি যে পরের ভোগে লাগিবে—এ চিন্তা আমার অসহ্য।"—এই পর্য্যন্ত বলিয়া সেই মূর্ত্তি ক্রমশঃ অস্পষ্ট ছায়ার আকার ধারণ করিয়া কয়েক মিনিটের মধ্যে অদৃশ্য হইল। আমরা সেই ভূতুড়ে বাড়ীতে আর মুহূর্ত্তকালও থাকিতে সাহস করিলাম না, সেই অট্টালিকা ত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার অরণ্যে প্রবেশ করিলাম। মনে হইল, এই ভূতের বাড়ী অপেক্ষা হিংস্র-শ্বাপদ জন্তু-সঙ্কুল অরণ্য নিরাপদ স্থান।

আমরা রাত্রিশেষে দ্রুতপদে সেই অরণ্য অতিক্রম করিতে লাগিলাম বটে, কিন্তু ভয়ের সহিত এক নূতন চিন্তা আমাদের মস্তিষ্কে ভীষণ আলোড়ন আরম্ভ করিয়াছিল।

সেই ভুতুড়ে বাড়ীর মেঝের নীচে বিপুল অর্থ প্রোথিত আছে। এই গুপ্তধন যদি কেহ কোন উপায়ে হস্তগত করিতে পারে, তাহা হইলে এই ভীষণ অর্থ-সঙ্কটকালে সে কি বিপুল শক্তির অধিকারী হইবে, এবং সেই ব্যক্তি বংশ-পরম্পরায় অভাবের দংশনে কষ্ট পাইবে না—এই চিন্তা আমার মনকে অধীর করিয়া তুলিল। কেবলই মনে পড়িতে লাগিল, এক তালার মেঝের নীচে সেই বিপুল ঐশ্বর্য্য। নিশ্চিতই সেখানে লক্ষ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা সঞ্চিত আছে। সেগুলি হস্তগত করিবার কি কোন উপায় স্থির করিতে পারিব না?

আমরা সেই বন অতিক্রম করিবার জন্য দ্রুতবেগে ধাবিত হইয়া যখন অরণ্য-প্রান্তবর্ত্তী প্রান্তর-সীমায় উপনীত হইলাম, তখন উষার রক্তিম আভায় পূর্ব্বাকাশ সুরঞ্জিত হইয়াছিল; সূর্য্যোদয়ের আর অধিক বিলম্ব ছিল না।

অতঃপর বেলা প্রায় আটটার সময় আমরা আমাদের বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। গত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আমাদের মানসিক অবস্থার কি পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, তাহা ভাবিয়া বিস্মিত হইলাম। কালের গজে কি মানুষের মনের অবস্থার পরিমাণ হইতে পারে?

আমাদের বাসাটি স্থানীয় বাজার হইতে প্রায় এক মাইল দূরে অবস্থিত, এক মাইলের কিছু অধিকও হইতে পারে। সে দিন হাটবার। কিছুকাল বিশ্রামের পর ধীরেশকে সঙ্গে লইয়া, একটা সঙ্কল্প করিয়া হাটে চলিলাম।

৫

হাটের যে অংশে মৎস্য বিক্রয় হইতেছিল সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া একটি বাঙ্গালী যুবককে দেখিতে পাইলাম, তিনি মাছ কিনিবার চেষ্টা করিতেছিলেন; তাঁহার সহিত আমার দৃষ্টি-বিনিময় হইল। অবাঙ্গালীর দেশে বাঙ্গালীদের পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে তাঁহাদের আলাপ-পরিচয় হইতে বিলম্ব হয় না। আমি সেই স্বদেশীয় যুবকের নিকট অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—তিনি সেখানে আসিয়া কোথায় উঠিয়াছেন?—তিনি বলিলেন, তখনও তিনি বাসা ঠিক করিতে পারেন নাই। একটা কুলী কিঞ্চিৎ বকশিসের আশায় তাঁহার জন্য একটি বাসা দেখিতে গিয়াছিল।

আমি বলিলাম, "এই অল্প সময়ের মধ্যেই আপনি কুলীকে বশীভূত করতে পেরেছেন, আপনি ত বাহাদুর লোক দেখ্‌ছি!"

যুবকটি বলিলেন, তিনি পূর্ব্বেও এখানে আসিয়াছিলেন। এ অঞ্চলের কুলীদের রীতি-প্রকৃতি তাঁহার সুবিদিত; এ অঞ্চলের লোক টাকার লোভে না পারে এরূপ কার্য্য কিছুই নাই।

তাঁহার কথা শুনিয়া আমার মন আশায় ও উৎসাহে পূর্ণ হইল। আমি সেই যুবকটিকে সেই বেলার জন্য আমার আতিথ্য গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলে তিনি সহজেই আমার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

পরিচয় হইলে জানিতে পারিলাম, যুবকটির নাম সৈকত বাবু। কথায় কথায় তাঁহার সাহসেরও পরিচয় পাইলাম। তিনি এখানে একাকী বাস করিবার সময় এক দিন রাত্রিকালে দুই জন চোরের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, এবং বাহুবলে তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়াছিলেন; সুতরাং তিনি যে অসমসাহসী—সে বিষয়ে আমার সন্দেহ রহিল না।

আমি সৈকত বাবুকে সেই 'ভুতুড়ে বাড়ী' সম্বন্ধে সকল কথা জানাইলাম। তাহার পর বলিলাম, "আপনি দশ বার জন কুলী সংগ্রহ করুন, এই বিদেশে একবার আমাদের ভাগ্য-পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক। কথায় বলে, 'মারি ত হাতী, লুঠি ত ভাণ্ডার!' এই গুপ্ত ধন-ভাণ্ডার লুণ্ঠনের যোগ্য বটে!"

সৈকত বাবুর উৎসাহ আমার উৎসাহ অপেক্ষাও প্রবল হইয়া উঠিল।

সেই দিন অপরাহ্ণেই বার জন সাঁওতাল কুলী সংগৃহীত হইল। কুলীদের সহিত চুক্তি হইল, তাহাদের প্রত্যেকে দুই টাকা মজুরী পাইবে। তাহারা তাহাদের গাঁতি, সাবল, কোদাল, প্রভৃতি অস্ত্রসহ পরদিন প্রত্যূষে আমাদের বাসায় উপস্থিত হইবে।

প্রত্যূষে আমরা প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া সূর্য্যোদয় কালে কুলীগুলিকে সঙ্গে লইয়া ভাগ্য-পরীক্ষায় বাহির হইয়া পড়িলাম।

আমরা যখন সেই "ভুতুড়ে" বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইলাম, তখন বেলা প্রায় নয়টা। সৈকত বাবু আমাদের সকলের অগ্রগামী হইয়া যে ঘরের মেঝের নীচে গুপ্তধন

প্রোথিত ছিল, সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। আমরা দুই বন্ধু সভয়ে তাঁহার অনুসরণ করিলাম। কুলীর দল সৈকতবাবুর নির্দ্দেশক্রমে সেই কক্ষের মেঝে খুঁড়িতে আরম্ভ করিল।

পূর্ব্ব-রাত্রিতে আমাদের আশ্রয়দাতা যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ হওয়ায় ভয়ে আমার বুকের ভিতর যেন হাতুড়ী পড়িতে লাগিল! সেই কক্ষে থাকিতে আর আমার সাহস হইল না; আমি ধীরেশের হাত ধরিয়া অট্টালিকার বাহিরে আসিলাম। আমরা একটি বৃহৎ বৃক্ষ-মূলে সংস্থাপিত একখানি পাথরের উপর বসিয়া শ্রান্তি দূর করিতে লাগিলাম। কয়েক মিনিট পরে সৈকত বাবুও বাহিরে আসিয়া আমাদের দলে যোগদান করিলেন।

কুলীরা তখন গাঁতির সাহায্যে ঘরের মেঝে খুঁড়িতে-ছিল। কিছুকাল পরে দুই জন কুলী বাহিরে আসিয়া জানাইল, যখন তাহারা কাজ করিতেছিল, সেই সময় কতক-গুলি ছাই উড়িয়া আসিয়া তাহাদের দেহ আচ্ছন্ন করিয়া-ছিল, এবং তাহাদের সর্ব্বাঙ্গে বিষ্ঠা বর্ষিত হইয়াছিল। আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, দুর্গন্ধময় বিষ্ঠাই বটে! সত্যই কি ইহা ভূতের অত্যাচার?

ভয়ে আমার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু তখন আর ফিরিবার ইচ্ছা ছিল না; কার্য্যোদ্ধার হইলে আমা-দের ভবিষ্যৎ কিরূপ উজ্জ্বল, তাহা চিন্তা করিয়া আমরা ভয় ত্যাগ করিলাম।

কিছুকাল পরে দেখিলাম, অট্টালিকার চূণ বালি খসিয়া কুলীদের সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছন্ন করিতেছিল, কিন্তু অর্থলোভে কুলীরা সেই সকল অসুবিধা গ্রাহ্য করিল না।

অবশেষে কুলীদের মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হইল, কেহ বলিল, অন্যে তাহার গাঁতি কাড়িয়া লইয়াছে, কেহ বলিল, কে তাহাকে ধাক্কা দিয়া গর্ত্তে ফেলিয়া দিয়াছে। তাহারা পরস্পরের উপর দোষারোপ করিতে লাগিল। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার কি, তাহা বুঝিতে পারিয়া আমি ভয়ে আড়ষ্ট হইলাম। এই অভিযানের শেষ ফল কি, তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

যাহা হউক, কুলীরা বিরোধে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া পুনর্ব্বার কায আরম্ভ করিল। এই সময় তাহারা গর্ত্তের ভিতর কয়েকখানি অস্থি দেখিয়া তাহা তুলিবার চেষ্টা করিল। [illegible] জলন্ত অগ্নিবৎ অস্থিরাশি তাহাদের হাত ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল! কোন কোন কুলীর হাত পুড়িয়া ফোস্কা উঠিল। যাহা হউক, আমার আদেশে তাহারা হাড়গুলি কোদালীর সাহায্যে তুলিয়া দূরে নিক্ষেপ করিল।

কিছুকাল পরে দেখিলাম, দুইখানি হাত সেই কক্ষে নামিয়া আসিয়া একজন কুলীর হাত হইতে তাহার কোদালী কাড়িয়া লইয়া দূরে নিক্ষেপ করিল। সঙ্গে সঙ্গে হাত দুইখানি অদৃশ্য হইল। সেই কুলীর সঙ্গীরা সেই হাত দুইখানি দেখিতে পায় নাই, ইহাও বিস্ময়ের বিষয়!

কুলীরা পুরস্কারের লোভে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে মেঝে খুঁড়িতে লাগিল। কিছুকাল পরে মাটীর নীচে একটি বৃহৎ সিন্দুকের ডালা আবিষ্কৃত হইল। কুলীরা সমস্বরে চীৎকার করিয়া বলিল, "বাবু, লোহার সিন্দুক আছে, তোরা এসে দেখে যা।"

লোহার সিন্দুক আবিষ্কৃত হইয়াছে শুনিয়া সৈকত বাবু আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি আমাদের বাধা গ্রাহ্য না করিয়া মহা উৎসাহে দ্রুতবেগে সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

ঠিক সেই সময় দোতালার ভাঙ্গা বারান্দায় আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। সেখানে যে দৃশ্য দেখিলাম, তাহা দেখিয়া আমার দেহের রক্ত ভয়ে যেন হিম হইয়া গেল! আমি একটি সম্পূর্ণ নরকঙ্কাল পূর্ব্বরাত্রির ন্যায় সেই স্থানে ঠক্-ঠক্ শব্দে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিলাম। তাহার অক্ষিকোটর হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বর্ষিত হইতেছিল। তাহার পদশব্দ শুনিয়া আমার ধারণা হইল, সে সেই বারান্দায় সবেগে দুরমুস ঠুকিতেছিল। জীর্ণ বারান্দা যেন সেই শব্দে কাঁপিতে ও দুলিতে লাগিল।

আমি এই ভীষণ দৃশ্য আর দেখিতে না পারিয়া ধীরেশের হাত ধরিয়া অট্টালিকার সম্মুখবর্ত্তী সেই বৃক্ষমূলে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। সৈকত বাবু তখনও কক্ষমধ্যে কুলীদের কায দেখিতেছিলেন, আমি পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে আহ্বান করিলাম, কিন্তু তিনি আমার অনুরোধে কর্ণপাত করিলেন না।

কুলীরা সিন্দুকটা গর্ত্ত হইতে মেঝের উপর তুলিয়া তাহার ডালা খুলিতেই রাশিকৃত উজ্জ্বল মোহর সৈকত বাবুর দৃষ্টিগোচর হইল। তিনি মহানন্দে চীৎকার করিয়া

বলিলেন, "বেরিয়েছে, বেরিয়েছে, গুপ্তধন আমাদের হাতে এসেছে।"

তিনি আমাদিগকে সেই কক্ষে প্রবেশ করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতে লাগিলেন।

কিন্তু আমার দৃষ্টি তখন সেই দ্বিতলের ভাঙ্গা বারান্দায় নিক্ষিপ্ত। আমি দেখিলাম, সেই কঙ্কালটার সর্ব্বাঙ্গ মাংসে আবৃত হইয়াছে। সে অগ্নিময় চক্ষুর তীব্রদৃষ্টি আমাদের দিকে প্রসারিত করিয়া অস্বাভাবিক কর্কশ স্বরে গর্জ্জন করিয়া বলিল, "ওরে বিশ্বাসঘাতক, এখনও তোদের সতর্ক ক'রছি, আর খুঁড়িস্ নে। ঐ অর্থের লোভ ত্যাগ কর, নতুবা তোদের মৃত্যু সুনিশ্চিত। আজ পর্য্যন্ত কোন দস্যু আমার ঐ গুপ্তধন স্পর্শ করতে পারে নি। আমি বিশ্বাস করে যে গুপ্তকথা বলেছিলাম, সেই বিশ্বাসের এই প্রতিদান!"

সেই সময় কুলীরা উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, "এই যে বাবু, আরও একটা সিন্দুক!"

আমি তাহাদিগকে সিন্দুক খুলিয়া মোহরগুলি বাহিরে আনিতে আদেশ করিলাম। অনন্তর কিছুদূর অগ্রসর হইয়া জানালার ফাঁক দিয়া দেখিলাম, সৈকত বাবু একটা সিন্দুকের পাশে তাঁহার চাদরখানি প্রসারিত করিয়া আঁজল আঁজল মোহর সেই সিন্দুক হইতে বাহির করিয়া চাদরের উপর স্তূপাকার করিতেছিলেন।

সহসা দোতালার বারান্দায় আমার দৃষ্টি পড়িল। দেখিলাম,

[illegible] শম্ভুচন্দ্র

[illegible] তিনি আশা করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার মাতার একমাত্র পুত্র বলিয়া পিতার সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ পাইবেন। তাঁহার সে আশা পূর্ণ না হওয়ায় তিনি বিষণ্ণচিত্তে ছিলেন।

মির কাশিম যখন ইংরেজের নিকট বার বার পরাজয়ে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া মুঙ্গের দুর্গে বন্দীদিগকে নিহত করিতে আদেশ করেন, তখন কৃষ্ণচন্দ্র ও শিবচন্দ্র সেই দুর্গে বন্দী ছিলেন। মুঙ্গের দুর্গে বন্দীদিগকে নবাবের আদেশে হত্যা করা হইয়াছে, এইরূপ সংবাদ প্রচারিত হইতে না হইতে শম্ভুচন্দ্র পিতার ধনাগার অধিকার করিয়া আপনাকে উত্তরাধিকারী ঘোষণা করেন। "রস-সাগর" কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ীর একটি সমস্যা পূরণ-পদে উহার উল্লেখ আছে :—

সেই বিকট মূর্ত্তিটা অদ্ভুত কর্কশস্বরে হাসিয়া বলিল, "ওরে মূর্খ, তোরা আমার গুপ্তধন ভোগ করবার আশা করেছিস্? তবে যত পারিস নে, ভোগ কর।"—তাহার কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে সেই স্থান হইতে ভীষণ শব্দ উত্থিত হইল, যেন শত কামান একসঙ্গে গর্জ্জন করিয়া উঠিল! আমরা তৎক্ষণাৎ দ্রুতবেগে পূর্ব্বোক্ত বৃক্ষমূলে উপস্থিত হইয়া হাঁপাইতে লাগিলাম।

সেই মুহূর্ত্তে হুড়মুড় শব্দে সেই জীর্ণ অট্টালিকা ভাঙ্গিয়া পড়িল, এবং সৈকতবাবু ও কুলীর দল তাহার নীচে জীবন্ত সমাহিত হইল।

আমরা দুই বন্ধু মাতালের মত টলিতে টলিতে কম্পিত পদে অবসন্ন দেহে সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমাদের বাসায় প্রত্যাগমন করিলাম, এবং বিশ্রাম না করিয়া জিনিসপত্র গুছাইয়া লইয়া রেল-ষ্টেশনে যাত্রা করিলাম। কিছুকাল পরে একখানি ট্রেণ আসিতেই তাহার একটা কামরায় উঠিয়া পড়িলাম। তখন সময়ের দিকে আমাদের লক্ষ্য ছিল না, সকল চিন্তা মাথার ভিতর বাষ্পাকার ধারণ করিয়াছিল। হায়, আমরাই সৈকতবাবুর এই শোচনীয় মৃত্যুর উপলক্ষ!

আমাদের এই লোমহর্ষণ অভিযান-কাহিনী অনেকেই শুনিয়াছেন, কেহ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন, কেহ আষাঢ়ে গল্প বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন; এই বৈজ্ঞানিক যুগে হয়ত ইহা বিশ্বাসের অযোগ্য।

—কামরুন্নেছা খাতুন।

[illegible] তাহার [illegible]

আনাইয়া তাঁহাদিগের সমক্ষে বাঙ্গালায় এক দান-পত্র ও ফারসীতে এক "তকবীজ নামা" লিখাইয়া তাহাতে প্রতিনিধির ও মুন্সীর স্বাক্ষর ও মোহর করাইয়া লয়েন। তাহার পূর্ব্বে বাঙ্গালায় আর কাহারও এইরূপ "উইল" করার বিষয় অবগত হওয়া যায় না। দায়ভাগ-শাসিত বাঙ্গালায় সম্পত্তির অধিকারী উহার যথেচ্ছ ব্যবস্থা করিতে পারেন। পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থার দ্বারা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার সমগ্র সম্পত্তি জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবচন্দ্রকে দিয়া অন্য পুত্রগণকে বার্ষিক ৪০ হাজার টাকা দিবার ব্যবস্থা করেন। এই ব্যবস্থা করিয়া তিনি সস্ত্রীক শিবচন্দ্রকে "রাজ্যাভিষিক্ত" করিয়া "গঙ্গাবাস" ভবনে যাইয়া বাস করিতে থাকেন। এ দিকে শম্ভুচন্দ্র হেষ্টিংশের দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহকে তুষ্ট করিয়া নিজনামে কোম্পানীর নিকট হইতে সনন্দ বাহির

শিব-নিবাস—শিব

কলিকাতা হইতে প্রায় ৬৫ মাইল দূরে পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের মাজদিয়া ষ্টেশনের সান্নিধ্যে শিব-নিবাস এক সময় অতি সমৃদ্ধ গ্রাম ছিল। বর্ত্তমানে তাহার সেই সমৃদ্ধি কালের কুক্ষিগত হইয়াছে; কেবল ৩টি সুদৃশ্য ও সমুচ্চ মন্দির সেই অতীত কালের সাক্ষ্য দিতেছে।

দীনবন্ধু মিত্র, তাঁহার "সুরধুনী কাব্যের" অষ্টম সর্গে এই শিব-নিবাসের উল্লেখ করিয়াছেন। চূর্ণী (মাথাভাঙ্গা) সঙ্কাগড়ে গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়া গঙ্গার প্রশ্নের উত্তরে বলিল—পদ্মা হইতে বহির্গত হইয়া যে প্রবাহ আসিতেছিল, তাহার মধ্যে কুমার ভিন্ন হইয়া যাইবার পর কৃষ্ণগঞ্জ হইতে ইচ্ছামতী বাম দিকে প্রবাহিতা হইলে চূর্ণী

"সঙ্গিনী বিচ্ছেদে ভাসি' নয়নের জলে,
একা আইলাম শিব-নিবাসের তলে,
যথায় বিরাজে আদি রাজ-নিকেতন,
পতিত করেছে কিন্তু কাল-পরশন।
এক্ষণে গিরীশচন্দ্র রাজা তথাকার,
কৃষ্ণচন্দ্র অংশ তাঁর করিছে বিহার।
কঙ্কণের মত আমি এসেছি ঘুরিয়ে,
তাই সেথা ডাকে মোরে 'কঙ্কণা' বলিয়ে।
ছাড়াইয়ে রাজধানী মন্দির উদ্যান

কুলীদের সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছন্ন করিতেছিল, কিন্তু অর্থলোভে কুলীরা সেই সকল অসুবিধা গ্রাহ্য করিল না।

অবশেষে কুলীদের মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হইল, কেহ বলিল, অন্যে তাহার গাঁতি কাড়িয়া লইয়াছে, কেহ বলিল, কে তাহাকে ধাক্কা দিয়া গর্ত্তে ফেলিয়া দিয়াছে। তাহারা পরস্পরের উপর দোষারোপ করিতে লাগিল। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার কি, তাহা বুঝিতে পারিয়া আমি ভয়ে আড়ষ্ট হইলাম। এই অভিযানের শেষ ফল কি, তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

যাহা হউক, কুলীরা বিরোধে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া পুনর্ব্বার কায আরম্ভ করিল। এই সময় তাহারা গর্ত্তের ভিতর কয়েকখানি অস্থি দেখিয়া তাহা তুলিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু জ্বলন্ত অগ্নিবৎ অস্থিরাশি তাহাদের হাত ধরিয়া

ইতিহাসে দেখা যায়, কোন কোন লোকের গৃহ নির্ম্মাণানুরাগ প্রবল হয়। এ দেশে যিনি ইংরেজ শাসনের ভিত্তি দৃঢ় করেন, সেই ওয়ারেণ হেষ্টিংসের এই অনুরাগ ছিল। কলিকাতায় হেষ্টিংস হাউস, বেলভেডিয়ার এবং সুখসাগরে—গঙ্গাতীরে গৃহ তাহার প্রমাণ। কৃষ্ণচন্দ্র কেবল সেই অনুরাগহেতু নানা স্থানে গৃহ নিৰ্ম্মাণ করাইয়াছিলেন কি না, তাহা বলা যায় না। তাঁহার এইরূপ কার্য্যের অন্য উদ্দেশ্য থাকাও সম্ভব। আমরা সেই সকলের আলোচনা করিতেছি;—

(১) যে সময় তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, সে সময় বাঙ্গালার ইতিহাসে সঙ্কটকাল। বাঙ্গালার নবাব-নাজিমদিগের কাহারও কাহারও ব্যবহার-দোষে জমিদারদিগকে সময় সময় আত্মগোপন করিতে হইত। জমিদারের একাধিক স্থানে বাসগৃহ নিৰ্ম্মাণের তাহা উদ্দেশ্য হইতে পারে।

(২) তৎকালে বাঙ্গালা মহারাষ্ট্রীয় লুণ্ঠনকারীদিগের দ্বারা উপদ্রুত। আলীবর্দ্দী খাঁকে তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। বর্গীরা তাঁহার রাজধানী মুর্শিদাবাদও লুণ্ঠন করিয়াছিল এবং তিনি শেষে তাহাদিগকে "চৌথ" দিতে স্বীকৃত হইয়া অর্থে ও হীনতায় শান্তি ক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যখন বাঙ্গালার নবাব-নাজিমের এইরূপ অবস্থা, তখন জমিদারদিগের যে ভীতির বিশেষ কারণ ছিল, সহজেই বলা যায়।

অক্ষিকে...

বহু পুত্র ছিলেন। প্রথমা পত্নীর

তাহার পদশব্দ শুনিয়া আমার ধারণা ...

বারান্দায় সবেগে দুরমুস ঠুকিতেছিল। জীর্ণ বারান্দা যেন সেই শব্দে কাঁপিতে ও দুলিতে লাগিল।

আমি এই ভীষণ দৃশ্য আর দেখিতে না পারিয়া দীরেশের হাত ধরিয়া অট্টালিকার সম্মুখবর্ত্তী সেই বৃক্ষমূলে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। সৈকত বাবু তখনও কক্ষমধ্যে কুলীদের কায দেখিতেছিলেন, আমি পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে আহ্বান করিলাম, কিন্তু তিনি আমার অনুরোধে কর্ণপাত করিলেন না।

কুলীরা সিন্দুকটা গর্ত্ত হইতে মেঝের উপর তুলিয়া তাহার ডালা খুলিতেই রাশিকৃত উজ্জ্বল মোহর সৈকত বাবুর দৃষ্টিগোচর হইল। তিনি মহানন্দে চীৎকার করিয়া

আলোচনা করিব। সেই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়াও কৃষ্ণচন্দ্রের পক্ষে পুত্রদিগের জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গৃহ নির্ম্মাণ করান সম্ভব হইয়া থাকিতে পারে।

রাণাঘাটের এক মাইল উত্তরে চূর্ণীর এক শাখার তীরে নৌকাড়ী গ্রাম। এক দিন কৃষ্ণচন্দ্র জলপথে ঐ শাখা নদীপথে যাইবার সময় গ্রামের ঘাটে এক অনিন্দ্যসুন্দরী তরুণীকে দেখিয়া মুগ্ধ হন। তরুণী ব্রাহ্মণ কন্যা ও অনূঢ়া জানিয়া তিনি যখন তাঁহাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তখন তরুণীর পিতা বলেন—মহারাজ তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিবেন, ইহা সৌভাগ্যের বিষয় হইলেও "কেশরকুণী" শ্রেণীর ব্রাহ্মণকে কন্যা দান করিলে তাঁহাকে সমাজে হেয় হইতে হইবে, সুতরাং তিনি সে প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারেন না। শেষে লোভহেতু তিনি মত পরিবর্ত্তন করেন এবং মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে কন্যা সম্প্রদান করেন। বিবাহের পর কৃষ্ণচন্দ্র পত্নীকে তাঁহার পিতার আপত্তির কথার উল্লেখ করিয়া বলেন তাঁহার সহিত বিবাহ হওয়ায় মহারাণী (দরিদ্রের কন্যা হইয়াও) রৌপ্যের পালঙ্কে শয়ন করিলেন। পিতা যে অর্থলোভে কুলমর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন, ইহা স্মরণ করিয়া কন্যা স্বামীর এই গর্ব্ব-প্রকাশে বিরক্ত হইয়া বলেন—"আর একটু উত্তরে যাইলে সোণার পালঙ্কে শয়ন করিতে পারিতাম।" অর্থাৎ পিতা যদি কুলমর্য্যাদার সঙ্গে সঙ্গে জাতি পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে মুর্শিদাবাদে নবাবের পত্নী করিতেন, তবে তিনি আরও ধনীর বিলাস সম্ভোগ করিতে পারিতেন। শম্ভুচন্দ্র এইরূপ মাতার সন্তান। তিনি আশা করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার মাতার একমাত্র পুত্র বলিয়া পিতার সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ পাইবেন। তাঁহার সে আশা পূর্ণ না হওয়ায় তিনি বিষণ্ণচিত্তে ছিলেন।

মির কাশিম যখন ইংরেজের নিকট বার বার পরাজয়ে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া মুঙ্গের দুর্গে বন্দীদিগকে নিহত করিতে আদেশ করেন, তখন কৃষ্ণচন্দ্র ও শিবচন্দ্র সেই দুর্গে বন্দী ছিলেন। মুঙ্গের দুর্গে বন্দীদিগকে নবাবের আদেশে হত্যা করা হইয়াছে, এইরূপ সংবাদ প্রচারিত হইতে না হইতে শম্ভুচন্দ্র পিতার ধনাগার অধিকার করিয়া আপনাকে উত্তরাধিকারী ঘোষণা করেন। "রস-সাগর" কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ীর একটি সমস্যা পূরণ-পদে উহার উল্লেখ আছে:—

"রাজপুত্র শম্ভুনাথ ভাবিলেন মনে—
দু'জনাই গিয়াছেন শমন-সদনে।
আজ হ'তে আমি রাজা—রাজ্যই আমার,—
ইহা বলি' সাধারণে করেন প্রচার।
পিতার ভ্রাতার মৃত্যু শুনিয়া উল্লাস,
কার (ও) ভাগ্যে পৌষ মাস, কার (ও) সর্ব্বনাশ।"

কিন্তু ভাগ্যক্রমে কৃষ্ণচন্দ্র পুত্রসহ অব্যাহতি লাভ করেন। উভয়ে মুর্শিদাবাদে উপনীত হইলে সেই সংবাদ পাইয়া শম্ভুচন্দ্র লজ্জা ও অনুতাপ প্রকাশ করিয়া পিতাকে এক পত্র লিখেন। কৃষ্ণচন্দ্র আপনার লেখকের (মুন্সী) দ্বারা ঐ পত্রের যথোচিত উত্তর লিখাইয়া স্বাক্ষরের নিম্নে নিজ হস্তে লিখিয়া দেন:—

"হস্তি-শুণ্ডে লকড়ি দিলে ছাড়ান মুস্কিল,
কুশার ভূমিতে বীজ কাড়ান মুস্কিল।
মনঃশিলা ভাঙ্গিলে যোড়া লাগান মুস্কিল,
জাঁহাদিয়া আদিমেরে ভুলান মুস্কিল।"

বাস্তবিক তদবধি পিতাপুত্রে আর কখন স্বাভাবিক স্নেহ-ভক্তির সম্বন্ধ থাকে নাই। পুত্র শম্ভুচন্দ্র তাঁহার জীবদ্দশাতেই যখন এইরূপ আচরণ করিলেন, তখন তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে তিনি ভ্রাতৃগণের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে পারেন, তাহা বিবেচনা করিয়া কৃষ্ণচন্দ্র মৃত্যুর তিন বৎসর পূর্ব্বে—১৭৮০ খৃষ্টাব্দে ওয়ারেন হেষ্টিংশের নিকট আবেদন করিয়া তাঁহার এক জন প্রতিনিধি ও এক জন মুন্সীকে আনাইয়া তাঁহাদিগের সমক্ষে বাঙ্গালায় এক দান-পত্র ও ফারসীতে এক "তকবীজ নামা" লিখাইয়া তাহাতে প্রতিনিধির ও মুন্সীর স্বাক্ষর ও মোহর করাইয়া লয়েন। তাহার পূর্ব্বে বাঙ্গালায় আর কাহারও এইরূপ "উইল" করার বিষয় অবগত হওয়া যায় না। দায়ভাগ-শাসিত বাঙ্গালায় সম্পত্তির অধিকারী উহার যথেচ্ছ ব্যবস্থা করিতে পারেন। পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থার দ্বারা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার সমগ্র সম্পত্তি জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবচন্দ্রকে দিয়া অন্য পুত্রগণকে বার্ষিক ৪০ হাজার টাকা দিবার ব্যবস্থা করেন। এই ব্যবস্থা করিয়া তিনি সস্ত্রীক শিবচন্দ্রকে "রাজ্যাভিষিক্ত" করিয়া "গঙ্গাবাস" ভবনে যাইয়া বাস করিতে থাকেন। এ দিকে শম্ভুচন্দ্র হেষ্টিংশের দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহকে তুষ্ট করিয়া নিজনামে কোম্পানীর নিকট হইতে সনন্দ বাহির

করিয়া লইবার চেষ্টা করেন। সেই সংবাদ অবগত হইয়া কৃষ্ণচন্দ্র গঙ্গাগোবিন্দকে লিখিয়া পাঠান—"পুত্র অবাধ্য, মরিবার অসাধ্য, ভরসা গঙ্গাগোবিন্দ।" এই সময় সিংহ মহাশয়ের মাতৃশ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হইয়া তাঁহার প্রীতিলাভের আশায়—কৃষ্ণচন্দ্র নিমন্ত্রণ-রক্ষার্থ পুত্র শিবচন্দ্রকে প্রেরণ করেন। শিবচন্দ্রের একটি অসতর্ক কথায় গঙ্গাগোবিন্দ দুঃখিত হয়েন। তিনি সিংহ মহাশয়কে বলেন—"দেওয়ান বাহাদুর, আপনার মাতৃশ্রাদ্ধ যেন দক্ষযজ্ঞ।" সিংহ মহাশয় বিনয় দেখাইয়া বলিয়াছিলেন বটে, "ইহা দক্ষযজ্ঞ অপেক্ষা বড়—কারণ (আপনি) শিব ইহাতে উপস্থিত"—

"আমার এ মাতৃশ্রাদ্ধ দক্ষ-যজ্ঞ হ'তে হদ্দ
না ছিলা স্বয়ং শিব তথা বিদ্যমান।"

কিন্তু দক্ষযজ্ঞ পণ্ড হইয়া গিয়াছিল—সেই জন্য শিবচন্দ্রের কথা সিংহ মহাশয়ের প্রীতিপ্রদ হয় নাই। সে যাহাই হউক, কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার দেওয়ান কালীপ্রসন্ন সিংহের বুদ্ধিবলে—হেষ্টিংশের পত্নীকে—মুক্তাহার উপহার দিয়া কার্য্যসিদ্ধি করেন। "রস-সাগরের" একটি সমস্যা-পূরণে এই ঘটনার উল্লেখও দেখা যায় :—

"কিবা শোভে মুক্তাহার শ্বেতাঙ্গীর গলে!"

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কর্তৃক শিবনিবাস স্থাপনের ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ পাওয়া যায়। 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধে ও সেই প্রবন্ধ অবলম্বন করিয়া নদীয়া রাজবংশের যে বিবরণ হাণ্টারের বাঙ্গালার বিবরণে প্রকাশিত হয়, তাহাতে দেখা যায়—কৃষ্ণচন্দ্রের শিকারে বিশেষ অনুরাগ ছিল এবং তিনি অব্যর্থলক্ষ্য ছিলেন। এক বার পশুর সন্ধানে যাইয়া তিনি এই স্থানে উপনীত হয়েন এবং ইহার অবস্থান ও নদীতীরের সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া এই স্থানের শিব-নিবাস ও নদীর কঙ্কণা নামকরণ করেন। তিনি এই স্থানে বৃদ্ধ ও আতুরদিগের জন্য একটি আশ্রম এবং সংস্কৃত শিক্ষার বিস্তারকল্পে কয়টি পাঠশালা ও টোল প্রতিষ্ঠিত করেন।

'নদীয়া-কাহিনীর' লেখক প্রধানতঃ স্থানীয় কিম্বদন্তীর মূল্যবান প্রমাণে নির্ভর করিয়া লিখিয়াছেন :—

"মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নসরত খাঁ নামক এক জন দুর্দ্দান্ত দস্যুকে তাঁহার রাজ্যমধ্যে উৎপাত করিতে দেখিয়া চূর্ণীনদীর পূর্ব্বকূলে এক গভীর অরণ্যে তাহার আড্ডার সন্ধান পাইয়া তাহাকে শাসনার্থ উপযুক্ত সজ্জায় আসিয়া তথায় শিবির সন্নিবেশ করেন। দস্যু দমন করিয়া তিনি একরাত্রি তথায় বাস করেন। পরদিন প্রাতঃকালে তিনি যখন নদীকূলে বসিয়া মুখ প্রক্ষালন করিতেছিলেন, তখন একটি রোহিৎ মৎস্য জল হইতে লাফাইয়া তাঁহার সম্মুখে পতিত হয়। আনুলিয়া-নিবাসী কৃপারাম রায় নামক জনৈক রাজজ্ঞাতি এই ব্যাপার অবলোকন করিয়া কহিলেন, 'মহারাজ, এ স্থান অতি রমণীয়; রাজভোগ্য সামগ্রী আপনা হইতে আসিয়া আপনার নজররূপে উপস্থিত হইল। এখানে বাস করিলে আপনি সুখী হইবেন।' রাজাও তখন বর্গীর উৎপাত হইতে আত্মরক্ষার্থ এইরূপ একটি নিরাপদ স্থান অনুসন্ধান করিতেছিলেন। এক্ষণে এই স্থানটি সকলে মনোনীত করিলে তিনি উক্ত স্থানটিকে কঙ্কণাকারে নদীবেষ্টিত করিয়া স্বীয় দেওয়ান রঘুনন্দনের মতানুযায়ী এক সুন্দর পুরী নির্ম্মাণ করিলেন ও আপনার বাস-ভবন ও দুইটি বৃহৎ শিবমন্দির স্থাপনা করিয়া দুইটি দুর্ল্লভ শিবলিঙ্গ ও অপর মন্দিরে রামসীতা স্থাপনা করিলেন এবং শিবের নামে গ্রামের শিব-নিবাস নামকরণ করিলেন। এই কঙ্কণাবেষ্টিত শিব-নিবাসেই তিনি মহাসমারোহে অগ্নিহোত্র বাজপেয় যজ্ঞ সম্পন্ন করেন।"

তৎকালপ্রচলিত একটি প্রবাদবাক্যে ছিল—

"শিবনিবাসী তুল্য কাশী ধন্য নদী কঙ্কণা।"

নদীবেষ্টিত হওয়া যে শিব-নিবাসে কৃষ্ণচন্দ্রের গ্রামস্থাপনের অন্যতম এবং হয়ত সর্ব্বপ্রধান কারণ, তাহা বাঙ্গালার তৎকালীন ইতিহাসের আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। 'নদীয়া-কাহিনীর' লেখক বলিয়াছেন, কৃষ্ণচন্দ্র ঐ স্থান "কঙ্কণাকারে নদীবেষ্টিত" করিয়াছিলেন। নদীর ঐ প্রবাহখাত যে স্বাভাবিক নহে, তাহার কিন্তু কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ এখনও পাওয়া যাই নাই। তবে কৃষ্ণচন্দ্র স্বাভাবিক কোন সঙ্কীর্ণ খাতের বিস্তৃতিসাধন করিয়াছিলেন, ইহা অসম্ভব নহে। হয়ত তিনি নদী পরিখারূপে ব্যবহার জন্য উহার আবশ্যক পরিবর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

তাহার পর যে নদীর প্রবাহপথ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, তাহা রেণেলের মানচিত্র পরীক্ষা করিলে বুঝিতে বিলম্ব হয় না। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে বিশপ হেবর যখন নদীপথে এই দিকে যাইতেছিলেন, তখন তিনি শিব-নিবাসে

গিয়াছিলেন। রেণেলের মানচিত্রে শিব-নিবাসের যে স্থান দেখা যায়, তাহা নদীর অপরপারে এবং কতকটা উত্তরে "being further to the south, and on a different side of the river."—সেই জন্য ইহাই শিব-নিবাস কি না, সে বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ হইয়াছিল।

কৃষ্ণচন্দ্রের সময়েই বাঙ্গালা দেশে নানারূপ বিশৃঙ্খলা ঘটিতে থাকে। হাণ্টার বলিয়াছেন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সময়ে বাঙ্গালার রাজনীতিক অবস্থা সঙ্কটজনক ও শোচনীয় হইয়াছিল। সুবাদার ও প্রধান কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে বিবাদে অবস্থা আরও জটিল হয় এবং সুবাদারদিগের অনাচারে সময় সময় অন্তর্বিপ্লব ঘটে। মার্হাট্টাদিগের আক্রমণে অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া দাঁড়ায়। এই অবস্থায় শস্যহানি ঘটে এবং অন্নকষ্ট দেখা দেয়—বৈদেশিক বাণিজ্য ক্ষুণ্ন হয় এবং চারি দিকে অনাচার ও অত্যাচার আত্মপ্রকাশ করে।

কৃষ্ণচন্দ্রের বহু পুত্র থাকায়ও তাঁহার পক্ষে অধিক অর্থ সঞ্চয় করা সম্ভব হয় নাই। নবাব-দরবারের রাজস্ব দিতে না পারায় তাঁহাকে বার বার লাঞ্ছিত হইতেও হইয়াছিল।

কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যুর পর শিবচন্দ্র ইংরেজের নব-প্রবর্ত্তিত বন্দোবস্তে পৈতৃক জমিদারী অধিকার করেন। তাঁহার ভ্রাতারা ভগ্নমনোরথ হইয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যাইয়া বাস করিতে থাকেন। শিবচন্দ্র কখন কৃষ্ণনগরে কখন শিব-নিবাসে বাস করিতেন। কিন্তু যথাকালে রাজস্ব প্রদানে অক্ষমতাহেতু তাঁহার জমিদারীর কুবেজপুর পরগণা নিলাম হইয়া যায়। এই অবস্থায় যে শিব-নিবাস প্রভৃতি স্থানে গৃহগুলি আর পূর্ব্ববৎ মনোযোগ লাভ করে নাই, তাহা বলা বাহুল্য। শিবচন্দ্রের একমাত্র পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র আবার কৃষ্ণনগরের নিকটে অঞ্জনা তীরে "শ্রীবন" নামক এক প্রমোদ-ভবন নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় বিলাসে ব্যাপৃত থাকিতেন। তাহাতে যে শিব-নিবাসের প্রতি তাঁহার মনোযোগ হ্রাস হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়। কেবল তাহাই নহে, কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্র ঈশানচন্দ্র পৈতৃক সম্পত্তির একাংশ পাইবার জন্য নালিশ করায়, তাঁহাকে বহু অর্থ ব্যয় করিতে হয় এবং তাঁহার বহু সম্পত্তি রাজস্ব দিতে না পারায়, বিক্রয় হইয়া যায়। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে, তাঁহার পুত্র গিরীশচন্দ্র সম্পত্তির অধিকারী হয়েন এবং তাঁহার বহু সম্পত্তি হস্তান্তরিত হয়। যে সম্পত্তি এক দিন ৮৪ পরগণায় বিভক্ত ছিল, তাহা লক্ষ টাকা আয়ের "দেবোত্তর" সম্পত্তিতে ও ঋণ-জড়িত কয়খানি জমিদারীতে পর্য্যবসিত হয়।

যখন গিরীশচন্দ্র কৃষ্ণনগরের জমিদার, সেই সময় হেবর শিব-নিবাসে গমন করেন এবং তাহার ভগ্নদশার বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি তাঁহার জলযান হইতে শিব-নিবাসের মন্দিরগুলির উপরিভাগ ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষরাজির উপরে দেখিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, মন্দিরগুলিতে যাইবার সময় তিনি দেখিতে পায়েন, ঘনবন ভগ্ন-গৃহাদির স্তূপে পূর্ণ ("Full of ruin, apparently of an interesting description") তিনি বলিয়াছেন, তিনি তথায় চারিটি মন্দির দেখিতে পাইয়াছিলেন; সেগুলি আকারে অত্যন্ত বৃহৎ না হইলেও তাহাদিগের স্থাপত্য ও সৌন্দর্য্য নয়নানন্দদায়ক। প্রথম মন্দিরটি সর্ব্বশেষে নির্ম্মিত—তাহার উপরিভাগ চতুষ্কোণ উপরে পীরামিডের মত চূড়া উঠিয়াছে। ইহাতে রাম-সীতার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। অপর দুইটি মন্দিরে শিব-লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। তিনি যে চারিটি মন্দিরের উল্লেখ করিয়াছেন তন্মধ্যে চতুর্থটির বিষয় তিনি লিপিবদ্ধ করেন নাই।

ভগ্ন গৃহ ও বনের মধ্য দিয়া তাঁহারা "রাজার" ভগ্নপ্রায় গৃহে উপনীত হয়েন এবং তথায় যাহা দেখেন, তাহা দারিদ্র্য-মসিমলিন চিত্র ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না। গ্রাম ভগ্নস্তূপ—জনবিরল—শৃগালের চীৎকারে স্থানটি মুখরিত।

হেবরও দীনবন্ধুর মত বলিয়াছেন, "রাজা" কৃষ্ণচন্দ্রের বংশীয়।

মন্দির তিনটির মধ্যে দুইটি শিব-মন্দির। একটির শিবলিঙ্গ "বুড়া শিব" নামে কথিত এবং ঐ শিবলিঙ্গ ১৬ হাত উচ্চ।

'নদীয়া-কাহিনী'-লেখক মন্দিরত্রয়ের লিপি পাঠ করিয়া সেগুলি তাঁহার গ্রন্থে প্রদান করিয়াছেন। ঐ সকলে জানা যায়:—

প্রথম শিব-মন্দির ১৬৭৬ শকাব্দে (অর্থাৎ ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত।) উহার লিপি অবিকল এইরূপ—

"যো জাতঃ খলু ভারতে সুরতরুর্জ্জৈষ্ঠাদিসী শাংশকে।
সেনানীমুখবাজিরাজবিলসৎ সংখ্যাবতীদম্পুরে॥
কৃত্বা মন্দিরমিন্দুচুম্বিশিখরং ভূপালচূড়ামণিঃ।
পৌত্র-শ্রীযুত কৃষ্ণচন্দ্র নৃপতি শম্ভুং সমস্থাপয়ৎ॥"

রাজাধিরাজ মহারাজ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ১৬৭৬ শকে তাঁহার প্রধান প্রধান সেনায় ও উৎকৃষ্ট অশ্বে এবং পণ্ডিতগণে শোভিত এই নগরে ইন্দ্রচুম্বিশিখর (অত্যুচ্চ) মন্দিরে শিব স্থাপন করিলেন।

দ্বিতীয় শিব তাহার দ্বিতীয়া পত্নীর দ্বারা ১৬৮৪ শকে (অর্থাৎ ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে) প্রতিষ্ঠিত। উহার লিপি এইরূপ :—

রাজেশ্বর শিবমন্দির

"যঃ সাক্ষাৎকৃতশৈবমূর্ত্তি বসুধে শাংসকে সম্ভবাৎ সংখ্যাতঃ।
ক্ষিতিদেবরাজপদভাক্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র প্রভুঃ॥
তস্য ক্ষৌণিপতে র্দ্বিতীয়মহিষী মূর্ত্তেব লক্ষ্মী স্বয়ম্।
প্রাসাদপ্রবরে প্রাসাদসম্মুখং শম্ভুং সমস্থাপয়ৎ॥"

যিনি ভূমহেন্দ্র বলিয়া বিদিত এবং যিনি শিবমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, সেই পৃথিবীপতি রাজা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী দ্বিতীয়া মহিষী প্রাসাদ-সম্মুখে বৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে শিব প্রতিষ্ঠা করিলেন।

তৃতীয় মন্দিরটি মহারাণীর পরিতৃপ্তিসাধনজন্য ক্ষিতিপতি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কর্তৃক ১৬৮৪ শকে (অর্থাৎ ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে) স্থাপিত হয়। উহার লিপি—

"দেব শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রঃ ক্ষিতিপতিতিলকো ব্রহ্মরাজর্ষিবংশে।
যোঽসৌ ভূকল্পশাখী শ্রুতিবসুবসুধে শাংশকে তুল্যসংখ্যে॥
প্রেয়স্যাস্তস্মহিষ্যাঃ পরমকৃতিকৃতে জানকীলক্ষণাভ্যাং।
প্রাসাদে প্রাতরাসীৎ ত্রিজগদধিপতি শ্রীযুত রামচন্দ্রঃ॥"

ব্রাহ্মণকুলে অথচ রাজর্ষিবংশে লব্ধজন্মা রাজকুলতিলক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার প্রেয়সী দ্বিতীয়া মহিষীর পরিতৃপ্তি

রাজেশ্বর শিবমন্দির (অপর দৃশ্য—পার্শ্বে রাম-সীতা মন্দির)
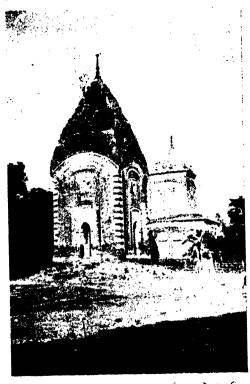
সাধনজন্য জানকী ও লক্ষ্মণসহ ত্রিজগতের অধিপতি শ্রীরামচন্দ্রের মূর্ত্তি স্থাপন করিলেন।

শিব-মন্দিরের পার্শ্বে সীতা-শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির হিন্দু ধর্ম্মের উদারতার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। যে ইসলামকে জনগণের ধর্ম্ম বলা হয়, তাহার সেবকদিগের মধ্যে সিয়া ও সুন্নী দুই সম্প্রদায়ের বিরোধ বহু বার রক্তপাতে পরিণতি লাভ করিয়াছে। কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র যেমন শিব-মন্দিরের সঙ্গে রাম-সীতার মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তেমনই "গঙ্গাবাসে" হরিহরের মন্দিরপ্রতিষ্ঠা করেন। ঐ মন্দির-গাত্রে পরপৃষ্ঠায় লিখিত শ্লোকটি ক্ষোদিত হয়—

"গঙ্গাবাসে বিধিকৃত্যনুগত সুকৃতক্ষৌণীপালঃ শকেঽস্মিন্।
শ্রীযুক্ত বাজপেয়ী ভুবি বিজিত মহারাজ রাজেন্দ্র দেবঃ ॥
ভেত্তুং ভ্রান্তিং মুরারি ত্রিপুরহরভিদাসঞ্জাতাং পামরানাং।
অদ্বৈতং ব্রহ্মরূপং হরিহরমুময়া স্থাপয়ল্লোময়ায় চ ॥

যে সকল মানব শিব ও বিষ্ণুকে পৃথক জ্ঞানে একের বিদ্বেষ করে, সেই সকল নিরয়গামী ব্যক্তির ভ্রান্তিবিনোদনার্থ

রাজ্ঞীশ্বর শিব-মন্দির

ভুবন-বিদিত বাজপেয়ী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কর্তৃক ১৬৯৮ শকে (অর্থাৎ ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে) গঙ্গাবাসে এই মন্দির ও তন্মধ্যে হরিহরের অদ্বৈত মূর্তি লক্ষ্মী ও উমার সহিত স্থাপিত হইল।

কথিত আছে, সাধক রামপ্রসাদ সেন মহাশয় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে বলেন, কৃষ্ণনগরের অধিকাংশ লোক বলেন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও তাঁহার সভাসদ রামপ্রসাদ সেন উভয়েই ঘোর শাক্ত, উভয়েই বিষ্ণুদ্বেষী। ইহা শুনিয়া ব্যথিত হইয়া কৃষ্ণচন্দ্র জ্যেষ্ঠপুত্রকে "গঙ্গাবাসে" যাইয়া উপযুক্ত স্থান নির্ব্বাচন করিতে আদেশ দেন—তিনি তথায় হরিহর মূর্তি স্থাপিত করিবেন।

কৃষ্ণচন্দ্রের বংশধর গিরীশচন্দ্রের সভায় "রস-সাগর" একটি সমস্যা-পূরণে রচনা করেন :—

"কৃষ্ণচন্দ্র ঘোর শাক্ত,—এই সবে বলে,
তাঁর মত বিষ্ণুদ্বেষী নাই ভূমণ্ডলে।
কৃষ্ণচন্দ্র শুনিয়াছি কাণে এই কথা
মনে মনে পাইলেন নিদারুণ ব্যথা।
শিবচন্দ্রে ডাকি' কৃষ্ণচন্দ্র মহামতি
কহিলেন—'গঙ্গাবাসে যাও শীঘ্র গতি।
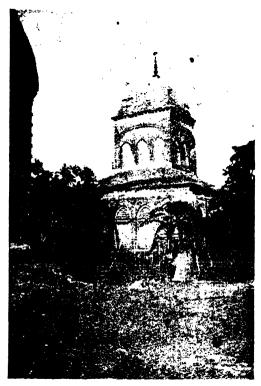
রাম-সীতা-মন্দির

বন্দোবস্ত কর গিয়া তুমিই এখন—
হরি-হর-মূর্তি তথা করিব স্থাপন।
হরি হরে ভেদ নাই দেখাতে সকলে,
এই মূর্তিখানি আমি রচিব কৌশলে।'
ইহা হ'তে নাহি আর বিষম সুষমা—
হরি-ক্রোড়ে উমা, আর হর-ক্রোড়ে রমা॥"

হিন্দুর এই হরি-হর-ভক্তি "রায় গুণাকর" ভারতচন্দ্র তাঁহার 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে দেখাইয়াছেন। ঐ কাব্যে 'ব্যাসের ভিক্ষা বারণ' অংশে মহাদেব নন্দীকে বলিয়াছেন :—

"মোর ভক্ত হয়ে যেবা নাহি মানে হরি।
আমি ত তাহার পূজা গ্রহণ না করি॥

হরি ভক্ত হয়ে যেবা না মানে আমারে।
কদাচ কমলাকান্ত না চাহেন তারে॥
হরি হর দুই মোরা অভেদ শরীর।
অভেদে যে জন ভজে সেই ভক্ত ধীর॥"

আজ ভাগ্যচক্রের আবর্ত্তনে শিব-নিবাস শোচনীয় অবস্থা লাভ করিয়াছে। শিব-নিবাসের অধিকার কৃষ্ণচন্দ্রের বংশধরদিগের হস্তচ্যুত হয়। এখন তথায় কেবল ভগ্নস্তূপ; আর সেই ভগ্নস্তূপমধ্যে কৃষ্ণচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত কারুকার্য্য-সুন্দর মন্দিরত্রয় সংস্কারাভাবে জীর্ণ অবস্থায় ধ্বংসের অপেক্ষা করিতেছে। নদীর আর পূর্ব্বের অবস্থা নাই; গ্রাম স্বচ্ছন্দজাত লতাগুল্মবৃক্ষে আচ্ছন্ন—শ্বাপদ-সর্পের লীলাস্থল। এক্ষণে এই পূর্ব্বসমৃদ্ধির স্মৃতিচিহ্ন কালিদাসের বর্ণিত কুশত্যক্ত অযোধ্যার কথা স্মরণ করায়। প্রচণ্ড সমীরণে মেঘসমূহ ছিন্নবিচ্ছিন্ন ও দিবাকর অস্তমিত হইলে দিবাবসানকালের যে প্রকার হৃদয়-বিদারিণী দশা ঘটে, কৃষ্ণচন্দ্রের গৌরবের আবাসস্থলের আজ সেই দশা ঘটিয়াছে।
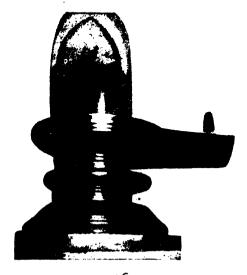
বুড়া-শিব

"নিশাসু ভাস্বৎ-কলনূপুরাণাং
যঃ সঞ্চরোঽভূদভিসারিকাণাম্।
নদন্মুখোল্কাবিচিতামিষাভিঃ
সো বাহ্যতে রাজ-পথঃ শিবাভিঃ॥"

যে পথে প্রমদাকুল চলিত নিশায়
মুখর নূপুর চারু বাজিত চরণে,
আপনার পথ হেরি' মুখের উল্কায়
সে পথে শৃগাল ঘুরে আমিষান্বেষণে।

পরিত্যক্তপ্রায় গ্রামে আজ কেবল পবন দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া অতীতের জন্য বেদনা প্রকাশ করিতেছে।

বাঙ্গালার মন্দির-শিল্পের মনোরম নিদর্শন এবং বাঙ্গালার ইতিহাসের মূল্যবান উপকরণ এই মন্দির কয়টির সংস্কার করিয়া এইগুলি রক্ষা করিবার কোন উপায় কি হয় না? নানা স্থানে সরকার পুরাকীর্ত্তি রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছেন—বাঙ্গালায়ও যে তাহা হয় নাই, এমন নহে। এই মন্দিরগুলি যদি সেইরূপ রক্ষার ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে এগুলি ধ্বংস হইতে রক্ষা পাইতে পারে। যে বংশের বংশপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও তাঁহার পত্নীর দ্বারা এই সকল মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সেই বংশের বর্ত্তমান অধিকারীর পক্ষ হইতে যদি বংশের এই সকল কীর্ত্তি রক্ষার চেষ্টা হয়, তবে তাহা যেমন শোভন ও সঙ্গত হইবে, তেমনই তাহা সাফল্যমণ্ডিত হইবার সম্ভাবনা। এই কার্য্যে কেবল যে বংশপতির ও তাঁহার পত্নীর স্মৃতিতর্পণ করা হইবে তাহাই নহে, ইহার দ্বারা বাঙ্গালার সমগ্র হিন্দুসমাজের কৃতজ্ঞতাও অর্জ্জিত হইবে। *

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

* আমার বাল্যকালে এক বার নদীপথে যাইবার সময় আমি শিব-নিবাস দেখিয়াছিলাম। অর্দ্ধ শতাব্দীরও পূর্ব্বে সেই মন্দিরগুলি দর্শনের স্মৃতি আমার মন হইতে অপনীত হয় নাই। তাহার পূর্ব্বে আমি কখন সেরূপ বৃহৎ শিবলিঙ্গ দেখি নাই। বহু দিন পরে শিব-নিবাসের মন্দিরগুলির ফটোগ্রাফ পাইয়া সেই অতীতের কথা স্মরণ করিয়া এই প্রবন্ধ লিখিলাম। চিত্রগুলি কল্যাণভাজন শ্রীমান্ সুধাংশুকুমার ঘোষ দিয়াছেন।

নিম্নলিখিত পুস্তক অবলম্বন করিয়া প্রবন্ধটি রচিত হইয়াছে;—

(১) 'নদীয়া কাহিনী'—কুমুদনাথ মল্লিক
(২) The Calcutta Review (1872)
(৩) A Statistical Account of Bengal—Hunter
(৪) Narrative of a Journey—Heber
(৫) 'বিশ্বকোষ'—(চতুর্থ খণ্ড)
(৬) 'রস-সাগর কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী'—শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র দে (লেখক)

নব বৈশাখের পল্লী

বর্ষ-শেষে নব-বর্ষের প্রত্যূষে আমরা বন্ধু-চতুষ্টয় এক যোগে পল্লী-ভ্রমণে বাহির হইলাম। বহুদিন প্রবাসে ছিলাম ; দীর্ঘকাল পরে আমাদের শৈশবের সুখকুঞ্জ শান্তিপূর্ণ পল্লীভবনে ফিরিয়া পল্লী-জননীর শোভা ও বৈচিত্র্য সন্দর্শনের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছিল। নববর্ষের পল্লীদৃশ্য পল্লীবাসীর হৃদয় মুগ্ধ করে ; সেই সৌন্দর্য্য বর্ণনার অযোগ্য নহে।

গোবিন্দপুর পল্লীগ্রাম হইলেও সমৃদ্ধ পল্লী। নিকটে রেলপথ নাই ; রেল-ষ্টেশন প্রায় দশ ক্রোশ দূরে অবস্থিত গ্রামের পশ্চিমপ্রান্তে স্বচ্ছসলিলা সঙ্কীর্ণকায়া চূর্ণি নদী প্রবাহিত ; গ্রীষ্মকালে কোন কোন স্থানে নদী-বক্ষে জল এতই অল্প থাকে যে, বড় বড় মহাজনী নৌকা গোবিন্দপুরের ঘাটে আসিতে পারে না। রেলপথও বহুদূরে অবস্থিত বলিয়া বহির্জ্জগতের সহিত গোবিন্দপুরের বিশেষ সংস্রব নাই। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেই সময় গরুর গাড়ী এই অঞ্চলের একমাত্র যান ছিল। জিলা বোর্ডের পথে তখনও মোটর-গাড়ী বা বাস চলিতে আরম্ভ হয় নাই। এই জন্য কলিকাতা বা কোন দূরবর্ত্তী স্থান হইতে কোন ভদ্রলোক বিশেষ প্রয়োজন ভিন্ন গোবিন্দপুরে আসিতে চাহিতেন না। তথাপি আমাদের জন্মভূমি গোবিন্দপুর আমাদের পরম প্রীতিকর মনে হইত। বহির্জ্জগতে সভ্যতার কোলাহল বহু দিন ইহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই ; কিন্তু গ্রামবাসিগণের সুখ ও শান্তির অভাব ছিল না। পরস্পরের প্রীতির বন্ধনও নিবিড় ছিল।

গোবিন্দপুর বহু পুরাতন গ্রাম। গ্রামের প্রাচীন জমিদারগণের প্রতিষ্ঠিত গ্রাম্য বিগ্রহ গোবিন্দ দেবের নামানুসারে গ্রামের নাম গোবিন্দপুর। গ্রামের জমিদার-বংশ বহু সরিকে বিভক্ত হইয়া এখন হীনবল, অনেক সরিকের ভূসম্পত্তি নানা কারণে বিক্রয় হইয়া গিয়াছে ; অনেকের উদরান্নের সংস্থান নাই। কেহ কেহ জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য ইতর-বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে ; কেহ নিরুপায় হইয়া স্থান ত্যাগ করিয়াছে। জমিদারগণের বিশাল অট্টালিকা জীর্ণ হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। বিধ্বস্তপ্রায় ছাদের উপর অঙ্কুরিত অশ্বত্থ বৃক্ষ দীর্ঘকালে বিশাল মহীরুহে পরিণত হইয়াছে। তাহার শাখাবাহু বহু দূর পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়া অট্টালিকার ধ্বংস-স্তূপ আচ্ছাদিত করিয়াছে। গোবিন্দ দেব জীর্ণ মন্দিরে এখনও বর্ত্তমান। তাঁহার সেবার জন্য কিঞ্চিৎ দেবোত্তর সম্পত্তি আছে ; তাহাতেই তাঁহার পূজার্চ্চনা ও সেবার ব্যয় নির্ব্বাহ হয়। গোবিন্দ দেবের প্রচুর স্বর্ণালঙ্কার ছিল, কিন্তু এখন আর প্রায় কিছুই অবশিষ্ট নাই ; ক্রমশঃ তাহা সেবাইতগণের ক্ষুধা নিবৃত্তি করিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, দেবমন্দিরে চোর প্রবেশ করিয়া তাহা চুরি করিয়াছে। ঘরের ও বাহিরের চোর তাঁহাকে প্রায় সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছে।

গ্রামের মধ্যস্থলে বাজার ; বাজারের এক প্রান্তে কালী-মন্দির। দেবীর নামানুসারে বাজারের নাম কালীবাজার। গ্রামের ইজারাদার ইংরেজ কোম্পানী বাজারের মালিক ; বাজার হইতে মা কালীর জন্য প্রত্যহ যে তোলা উঠে, তাহাতেই তাঁহার দৈনিক ব্যয় নির্ব্বাহ হয়। প্রতি সপ্তাহে শনি মঙ্গলবারে গোবিন্দপুরের সন্নিহিত বহু গ্রাম হইতে বিস্তর হিন্দু নর-নারী মা কালীর নিকট পূজা দিতে আসে। অনেকে দেবীর নিকট মানত করে ; তাহারা ঢাক বাজাইয়া জোড়া পাঁঠা সহ মানত শোধ করিতে আসে। বাজারের মাড়োয়ারী দোকানদারগণ দেবীর আশীর্ব্বাদে কারবারের উন্নতি করিতে সমর্থ হওয়ায় দেবীর সকল অভাব মোচন করে। একালে এই মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ই বাজারের কর্ত্তৃত্ব হস্তগত করিয়াছে। ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে গোবিন্দ-পুরের বাজারে মাড়োয়ারীর দোকান একখানিও ছিল না। গ্রামের হিন্দু অধিবাসীরা—হারাধন কুণ্ডু, নটবর পাল, নরহরি প্রামাণিক, ক্ষুদিরাম বসাক, নিতাই দফাদার প্রভৃতি গ্রামের প্রধান দোকানদার ছিল। তাহাদের দোকান-গুলি প্রায়ই বন্ধ হইয়াছে ; কোন কোন দোকান মাড়ো-য়ারী ব্যবসায়ী কৌশলে হস্তগত করিয়াছে ; কোন কোন

বাঙ্গালী দোকানদারের পুত্র, পৌত্র তাহাদের পিতা-পিতামহেরই আশ্রিত মাড়োয়ারীর দোকানে এখন দশ বার টাকা বেতনে গোমস্তাগিরি করিতেছে।

যৌবনকালেও দেখিয়াছি, গ্রামে ব্রাহ্মণ-কায়স্থগণের মুদীখানার, মিষ্টান্নের, বাসনের দোকান ছিল। মাধব চট্টোপাধ্যায়ের চাল ডালের দোকান, শরৎ ভট্টাচার্য্যের বাসনের দোকান বিখ্যাত ছিল। কেনারাম চট্টোপাধ্যায় বর্দ্ধমান হইতে আসিয়া সীতাভোগ মিহিদানার সহিত লুচি, সন্দেশ, ছানাবড়া প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিতেন। সেই সকল দোকান উঠিয়া গিয়া সেখানে ডাকুরাম বাটপাড়িয়া, এবং চোট্টারাম গাঁটকাটিয়া প্রভৃতির বড় বড় দোতালা দোকান মাথা তুলিয়া সগর্ব্বে দাঁড়াইয়া আছে। ভজহরি দত্তর সুবিস্তীর্ণ আড়তে পাটের সময় প্রত্যহ বহুদূরবর্ত্তী পল্লীগ্রাম হইতে ত্রিশ চল্লিশ খান গরুর গাড়ী বোঝাই হইয়া পাট আসিত ; এতদ্ভিন্ন, শীত কাল হইতে চৈত্র মাসের শেষ পর্য্যন্ত মুগ, কলাই, মটর ছোলা, গম গুড় প্রভৃতি পণ্যদ্রব্য প্রত্যহ কত গাড়ী আমদানী হইত, তাহার সংখ্যা হয় না। গোবিন্দপুরের চতুর্দ্দিকস্থ পঁচিশ ত্রিশখানি গ্রামের মাঠে মাঠে ভজহরির দালাল ও আড়তের কর্ম্মচারীরা ঘুরিয়া কৃষকগণকে বায়না দিয়া ঐ সকল দ্রব্য ক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া আসিত ; কিন্তু কিরূপে কয়েক বৎসরে এই বিস্তীর্ণ কারবার চোট্টারাম গাঁটকাটিয়াদের হস্তগত হইল, তাহা চিন্তা করিলে যেন ইন্দ্রজাল বলিয়া মনে হয় ! ভজহরি দত্তর পৌত্র এখন গ্রামস্থ মোক্তার রমাকান্ত সরকারের মুহুরী : ক্ষুদ্র পর্ণকুটীরে তাহার বাস।

কয়েক বৎসর মধ্যে গ্রামের এই অদ্ভুত পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে আমরা নিভৃত পল্লীপথে দ্রুত চলিতে লাগিলাম। আমাদের বাড়ীর অদূরে পথের ধারে একটি বৃহৎ বকুল গাছ। বৃক্ষমূলে অসংখ্য প্রস্ফুটিত বকুল ফুল তখনও ঝরিয়া পড়িতেছিল ; তাহার মিষ্টগন্ধে চতুর্দ্দিকের বায়ুস্তর সৌরভাকুল। অসংখ্য মধুমক্ষিকার গুঞ্জন-ধ্বনিতে সেই বিশাল বৃক্ষের শাখাপত্রে যেন প্রাণ-সঞ্চার হইয়াছিল। দেখিলাম, সেই উষাকালে পল্লীবাসিনী তিন চারিটি বালিকা বকুল-বৃক্ষমূলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহাদের সাড়ীর অঞ্চলে পুষ্প সঞ্চয় করিতেছিল। তাহারা মালা গাঁথিয়া খোঁপায় জড়াইত, অথবা কাহাকেও উপহার দিত তাহা তাহারাই জানিত। একটি সঙ্গীর প্রশ্নে হরিপ্রিয়া বলিল, "ঘরের কলুঙ্গীতে আমার নাড়ুগোপাল আছে ; মালা গেঁথে ঠাকুরের গলায় পরাব।"

পল্লী-বালিকাগণের এই সংস্কার জুগিন্দা-মিশনের শিক্ষয়িত্রীগণের শিক্ষার গুণে কয়েক বৎসরের মধ্যে অন্তর্হিত হইয়াছিল। উহারা মধ্যে মধ্যে গ্রামস্থ গৃহস্থগণের অন্ধকারাচ্ছন্ন অবরোধে আলোকবিস্তার করিতে আসিত।

আমরা চলিতে লাগিলাম। পথের দুই পাশে আম কাঁঠালের বাগান, বাঁশের ঝাড়, অদূরে শাখা-পত্র-বহুল নিম্ব-বৃক্ষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিম্বমঞ্জরীতে বৃক্ষ পূর্ণ, প্রাতঃসমীরণের সুশীতল হিল্লোল শুভ্র নিম্বকুসুমের সৌরভ বহন করিয়া পল্লীপথ আমোদিত করিতেছিল। পথ প্রান্তে দত্তদের বাগানে যে চাঁপা ফুলের গাছ ছিল, এই নব বৈশাখের প্রভাতে তাহাতে অজস্র চাঁপাফুল ফুটিয়া তাহার তীব্রগন্ধ যেন পল্লীজননীকে নববর্ষের উপহার প্রদান করিতেছিল। পথের ধারে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষ, তিন দিন পূর্ব্বেও তাহা নিষ্পত্র ছিল : কিন্তু প্রকৃতি দেবী যেন তাঁহার ঐন্দ্রজালিক দণ্ডস্পর্শে দুই দিনের মধ্যেই তাহা নবকিশলয়দলে আচ্ছাদিত করিয়াছেন : লোহিতের আভাযুক্ত তাম্রবর্ণ পল্লবদল প্রভাত-বায়ু-প্রবাহে আন্দোলিত হইয়া যেন প্রভাতারুণের কিরণ-ধারা স্পর্শের আশায় ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেছিল। সেই অশ্বত্থতরুর নিবিড় পত্ররাশির অন্তরালে বসিয়া একটা কোকিল কুহুস্বরে সুমধুর বৈশাখী-প্রভাতের বন্দনাগীতি আরম্ভ করিল।

ক্রমশঃ আমরা পল্লীর সেই ছায়াচ্ছন্ন বিহঙ্গ-কলকাকলি-মুখরিত সঙ্কীর্ণ পথ অতিক্রম করিয়া জিলাবোর্ডের প্রশস্ত পথে উপস্থিত হইলাম। এই পথই পূর্ব্বদিকে দশ ক্রোশ দূরবর্ত্তী রেল-ষ্টেশন পর্য্যন্ত প্রসারিত। গ্রামপ্রান্তে এই পথের ধারে গ্রামস্থ মুসলমানগণের উপাসনালয় নূতন মসজেদটি অবস্থিত। দুই একজন পল্লীবাসী নিদ্রাভঙ্গে পথে বাহির হইয়াছে। মসজেদের বারান্দায় কয়েকজন উপাসকের সমাগম হইয়াছে ; তাহাদের কণ্ঠনিঃসৃত আজান-ধ্বনি গ্রামের বহুদূর পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হইয়া ভক্তবৃন্দকে উপাসনায় যোগদানের জন্য আহ্বান করিতেছিল।

এই পথেরও দুই ধারে বহুদূর-বিস্তৃত আম-কাঁঠালের বাগান। শ্রেণীবদ্ধ আম গাছগুলিতে সুদীর্ঘ বৃন্তে থোকা থোকা ছোট বড় আম ঝুলিতেছে ; কাঁঠাল গাছে অসংখ্য

কাঁঠাল। গুঁড়ির নিকট স্থূল গোঁটায় বড় বড় কাঁঠাল। পাছে রাত্রিকালে চোর আসিয়া সেই সকল কাঁঠাল চুরি করে এই ভয়ে বাগানের রাখালী গাছগুলির চারি দিকে শিয়াকুল, ময়না, বঁইচি প্রভৃতি কণ্টকাবৃত গুল্মরাশির কণ্টকাকীর্ণ শাখা সংগ্রহ করিয়া ওম্ বাঁধিয়া দিয়াছে। অধিকাংশ কাঁঠাল গাছের গুঁড়িই এই ভাবে আচ্ছাদিত ; তথাপি বাগানের রাখালীরা রাত্রিকালে তাহাদের বাগান অরক্ষিত ভাবে ফেলিয়া রাখিয়া ঘরে থাকিতে পারে নাই। প্রত্যেক বাগানেই এক একখানি 'টোঙ', অর্থাৎ বংশনির্ম্মিত ক্ষুদ্র পর্ণ-কুটীর। রাত্রিকালে বাঘের ভয়ে কুটীরগুলি পাঁচ ছয় হাত উচ্চ বংশদণ্ড-নির্ম্মিত মঞ্চের উপর সংস্থাপিত। রাত্রিকালে তাহারা এই কুটীরে শয়ন করিয়া বাগান পাহারা দিয়া থাকে। কোন কোন বাগানের ভিতর সারি সারি লিচুগাছ। গাছে অসংখ্য লিচু ফলিয়াছে। লিচুগুলি পুষ্ট হইয়াছে কিন্তু বৈশাখের প্রথমে তাহাতে রঙ ধরে নাই : আর দুই সপ্তাহেই তাহা পাকিতে আরম্ভ করিবে। তথাপি রাত্রিকালে বাদুড়ের দল লিচুগাছে পড়িয়া অপক্ক ফলগুলিই চর্ব্বণ করিবে—এই ভয়ে প্রত্যেক গাছে তাহারা বাঁশের সুদীর্ঘ 'ফাড়টা' বাঁধিয়া দিয়াছে। রাত্রিকালে গাছে বাদুড়ের দল বসিবামাত্র রাখালীরা সেই সকল 'ফাড়টা'র গোড়া ধরিয়া ঝাঁকাইতে আরম্ভ করে ; সেই আকর্ষণে বৃক্ষাগ্রসংলগ্ন ফাড়টার মাথার দুই অংশের পরস্পরের সংঘর্ষণে খটাখট্ শব্দ হয়। স্তব্ধ রাত্রিতে সেই শব্দ বহুদূর হইতে শুনিতে পাওয়া যায়। সেই শব্দে ভয় পাইয়া বাদুড়ের দল উড়িয়া যায়, এবং বৃক্ষান্তরে আশ্রয় গ্রহণ করে। ফল পাকিবার সময় বাদুড়ের পাল বাগান আচ্ছন্ন করে। তাহাদিগকে বিতাড়িত করিবার জন্য বাগানের রাখালীরা আরও নানা উপায় অবলম্বন করে, ক্যানেস্তা বাজায়, ধনুকে মাটীর বাঁটুল নিক্ষেপ করে।

এই সকল বাগানের পাশ দিয়া যাইতে যাইতে দেখিলাম, রাখালীরা তাহাদের সঙ্কীর্ণ 'টোঙ' হইতে বাহির হইয়া টোঙের নীচে নামিয়াছে, এবং রাত্রিকালে যে বিচালী-নির্ম্মিত 'বুঁদী'র আগুনে প্রয়োজন বোধে টোঙ আলোকিত করে, সেই বুঁদী জ্বালিয়া ধূমপানের আয়োজন করিতেছে। পূর্ব্বে ইহারা 'বুঁদী'তে আগুন ধরাইবার জন্য চকমকির পাথর, ঠুকনী ও শোলা রাখিত। চকমকির প্রস্তরখণ্ডে ইস্পাতনির্ম্মিত কনী ঠুকিয়া ঘর্ষণোৎপাদিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গে শোলা ধরাইয়া লইত। ইহাতে ব্যয়বাহুল্য ছিল না। একখানি ঠুকনী ও একখণ্ড পাথর ঘরে থাকিলে তাহাতে পাঁচ বৎসর অগ্নি উৎপাদনের কার্য্য চলিত : কিন্তু পল্লীগ্রামে দিয়াশলাইএর বাক্স আমদানী হওয়ায় এই সকল দরিদ্র গ্রামবাসীও ঠুকনী চকমকির ঝঞ্ঝাট হইতে মুক্তিলাভের আশায় দিয়াশলাইএর বাক্স ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। অবশেষে যখন দিয়াশলাইএর কাটির উপর সরকার ট্যাক্স বসাইয়া এই দরিদ্রের দেশ হইতে লক্ষ লক্ষ টাকা আয়ের সংস্থান করিলেন, তখন এই সকল দরিদ্র পল্লীবাসীকে বলা হইয়াছিল—তাহারা এক পয়সায় চল্লিশ কাটি দিয়াশলাই না কিনিয়া চকমকির পাথর ও ঠুকনী ব্যবহার আরম্ভ করুক। এ কথা শুনিয়া পল্লীবাসী কোন কোন কৃষক বলিয়াছিল, সরকার চকমকির পাথর ও ঠুকনীর উপর ট্যাক্স বসাইতে পারিবে না, এ রকম কোন আইন আছে কি? প্রকৃত কথা এই যে, যখন এক পয়সায় তিন বাক্স দিয়াশলাই পাওয়া যাইত, পল্লীগ্রামের এই সকল দরিদ্র গৃহস্থ, যাহারা দুই বেলা প্রয়োজনানুযায়ী লবণ পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিতে পারে না, তাহারাও তখন তাহার ব্যবহারে অভ্যস্ত হওয়ায় এখন আর চল্লিশ কাটির 'বাণ্ডিলের' (দিয়াশলাই-এর বাক্সকে তাহারা এই নামে অভিহিত করে) মোহ ত্যাগ করিতে পারিতেছে না! আমি সন্ধান লইয়া জানিতে পারিয়াছি, এই সকল দরিদ্র পরিবারে মাসে গড়ে ঐরূপ চারি বাক্স দিয়াশলাইএর প্রয়োজন হয় : অর্থাৎ তাহাদিগকে এখন আগুন জ্বালিবার জন্য বার্ষিক বার আনা ব্যয় করিতে হয়। অথচ চকমকি, ঠুকনী ও শোলা রাখিলে প্রত্যেক পরিবারকে অগ্নি উৎপাদনের জন্য সংবৎসরে দুই পয়সার অধিক ব্যয় করিতে হয় না : কিন্তু এ বিষয়ে তাহারা উদাসীন। বিলাসিতা এই ভাবে পল্লীসমাজের নিম্নতম স্তরেও প্রবেশ করিয়া দেশকে দিন দিন নিঃস্ব করিতেছে। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, পল্লীগ্রামের ধোপারা আর গ্রামস্থ লোকের কলাবাগানে প্রবেশ করিয়া, কাপড় কাচিবার জন্য কলাগাছের 'বাস্না' (শুষ্ক কদলীপত্র) সংগ্রহ করে না ; তাহারা সোডা ও সাবান কিনিয়া কলার 'বাস্না' সংগ্রহের কষ্ট হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছে। পূর্ব্বে গৃহস্থের যে কাপড় ছয়মাস পর্য্যন্ত ব্যবহার-যোগ্য থাকিত, এখন তাহা তিন ধোপেই ফরসা! কিন্তু একালের ধোপারা এই প্রকার ব্যয়বাহুল্যে কষ্ট বোধ করে

না। গৃহস্থগণ আর্ত্তনাদ করিয়া বলে—একালে মিলের কাপড়ের সূতা পচা, এজন্য কাপড় টি‍ঁকে না।

আমরা এই সকল তত্ত্বকথার আলোচনা করিতে করিতে মাঠের দিকে অগ্রসর হইলাম। পথে যাইতে যাইতে দেখিলাম, পূর্ব্বগগনে তখন সূর্য্যোদয় হইতেছিল: তাহার রক্তিম-ছটায় বিস্তীর্ণ প্রান্তর উদ্ভাসিত। মাঠ হইতে তখন চৈতালী ফসল উঠিয়া গিয়াছে। মাঠের স্থানে স্থানে নিষ্পত্র ও ফলহীন অরহর গাছগুলি পুঞ্জীভূত ভাবে পড়িয়া আছে। কৃষকরা ফলগুলি যথাসময়ে ঝাড়িয়া লইয়া গিয়াছে। কোন স্থানে গোধূমের নাড়াগুলি পালা দেওয়া আছে। ক্ষেত্রস্বামীরা তখন পর্য্যন্ত তাহা স্থানান্তরিত করিতে পারে নাই। মাঠের কোন স্থানের মাটী কাটিয়া ইষ্টক নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইটের পাঁজার আগুন নিবিয়া গিয়াছে। গর্ত্তগুলিতে যে জল ছিল, ফাল্গুন চৈত্র মাসের প্রখর রৌদ্রে তাহা শুকাইয়া গর্ত্তের মাটী পর্য্যন্ত চৌচির হইয়াছে। অদূরে একটি শিমুল গাছের শাখায় একটা চিল বসিয়া প্রভাতের রৌদ্র উপভোগ করিতে করিতে 'চী-চী' শব্দে মুক্ত প্রান্তর প্রতিধ্বনিত করিতেছিল। মাঠ কোপাইবার জন্য ক্ষেত্রস্বামী কর্ত্তৃক নিযুক্ত ঠিকে মজুরের দল পাঁচ সাত জন পাশাপাশি সারি দিয়া দাঁড়াইয়া সঙ্কীর্ণ-ফলা 'দেঁড়ো' কোদালীর সাহায্যে অত সকালেই জমি কোপাইতে আরম্ভ করিয়াছে; কারণ, বৈশাখ মাসে অধিক বেলায় রৌদ্র প্রখর হইবে, তখন আর তাহারা খোলা মাঠে দীর্ঘকাল কোদালী চালাইতে পারিবে না। পথ হইতে দেখিতে পাইলাম, শ্রেণীবদ্ধ সাত জন মজুরের হাতের কোদালী একসঙ্গে মাথার উপর উঠিতেছে, মাটীতে পড়িতেছে, সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক কোপে মাটীর 'চ্যাঙড়' কাটিয়া উল্টাইয়া পড়িতেছে; আবার এক সঙ্গে কোদালীগুলি ঊর্দ্ধে উঠিতেছে: কোদালীগুলির সুশাণিত তীক্ষ্ণ ফলায় প্রভাত-রৌদ্র প্রতিফলিত হইতেছে। মজুররা মধ্যে মধ্যে কাঁধের গামছা দিয়া ললাটের ঘর্ম্মধারা অপসারিত করিতেছে। বাঁশের চটানির্ম্মিত তাহাদের মাথার 'মাথাল' অদূরবর্ত্তী 'আলে'র উপর পড়িয়া আছে। তাহার পাশে পাটো 'নৈচা'-বিশিষ্ট ডাবা হুঁকা ও গেঁটে কল্‌কে। একটি ছোট গেঁজের ভিতর, তামাক, কয়লা, এবং দিয়াশলাইয়ের বাক্স প্রভৃতি উপকরণ সঞ্চিত। আমরা চলিতে চলিতে দেখিলাম, তাহারা কয়েক মিনিটের জন্য কোদালীগুলি ক্ষেতের উপর ফেলিয়া রাখিয়া হুঁকা কলিকা ও তামাকের সরঞ্জাম পরিবেষ্টন করিয়া বসিয়া মহা উৎসাহে ধূমপানের আয়োজন করিতে লাগিল। কেহ কেহ স্কন্ধদেশ হইতে জীর্ণ ও বিবর্ণ গামছাখানি হাতে লইয়া পাখার মত ঘুরাইয়া বাতাস খাইতে লাগিল; কেহ কেহ গামছা দিয়া বুক পিঠ, কপাল মুছিতে লাগিল। এক জন হুঁকা হাতে লইয়া কলিকাটির প্রতীক্ষা করিতে লাগিল: আর একজন মাথা নাড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে গান ধরিল—

"গেঁটে কল্‌কের মেঠো খর্সান
খেতে খেতে যায় রে পরাণ।"

সঙ্গে সঙ্গে আরও দুই তিন জন সেই বিস্তীর্ণ প্রান্তর প্রতিধ্বনিত করিয়া সমস্বরে গায়িতে লাগিল—

"খেতে খেতে যায় রে পরাণ।"

কিন্তু ইহাদের 'পরাণ' বড়ই কঠিন: গেঁটে কল্‌কের মেঠো খর্সান তামাকের ধূমপানে তাহা যাইবার সম্ভাবনা ছিল না। ধূমপানের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা খটা করিয়া কাসিতে লাগিল।

"ওঃ শালার বলদ, বাঁ, বাঁ"—শব্দে দুইটি লাঙলা বলদকে পাঁচন বাড়ির সাহায্যে পরিচালিত করিতে করিতে একজন কৃষাণ কাঁধে লাঙ্গল এবং বামহস্তে গামছায় বাঁধা ঘটীতে এক ঘটী পানীয় জলসহ ক্ষেতে লাঙ্গল দিতে আসিয়া সেই মজুরগুলির নিকট বসিয়া গেল। তাহার মাথায় 'মাথাল', এবং বস্ত্রাঞ্চলে চাল ছোলা ভাজা গুলি ফাঁস দিয়া বাঁধা। লাঙ্গল দিয়া ক্ষেত চসিতে বেলা দ্বিপ্রহর হইবে, সেই জন্য সে ক্ষেতে বাহির হইবার সময় 'টিফিন' সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল। সে সেই 'গেঁটে কল্‌কের মেঠো খর্সান' টানিয়া আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গমের ন্যায় নাক-মুখ হইতে ধূম উদ্গিরণ করিয়া, লাঙ্গলখানি পুনর্ব্বার কাঁধে তুলিয়া লইল, এবং তাহার বলদ-জোড়াটার অনুসরণ করিল।

প্রাতঃসূর্য্য ক্রমশঃ পূর্ব্বাকাশের অনেক ঊর্দ্ধে উঠিল। আমরা প্রান্তর-পথ হইতে গ্রামে প্রত্যাগমনের অভিপ্রায়ে জিলাবোর্ডের পথের তৃতীয় মাইল-স্তম্ভের নিকট দাঁড়াইয়া পরামর্শ করিতেছিলাম, সেই সময় 'ঝম্‌ঝম্' শব্দ শুনিয়া পূর্ব্বদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলাম; দেখিলাম, আমাদের গ্রাম্য ডাকঘরের ডাক-হরকরা নবীন সর্দ্দার ডাকের ব্যাগ পিঠে

ফেলিয়া গামে ফিরিতেছিল। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন একালের মত মোটর-বাসে ডাক আসিত না। একালে রেল-ষ্টেশন হইতে বিভিন্ন দিকের ডাকের ছয় সাতটি ব্যাগ মোটর-বাসের ছাদে বাহিত হইয়া ডাকঘরে আনীত হয়; কিন্তু সেকালে একটিমাত্র ব্যাগে সকল দিকের ডাক আসিত, এবং নবীন সদ্দার গ্রাম হইতে তিন ক্রোশ দূরস্থ অন্য হরকরার নিকট তাহা গ্রহণ করিয়া গ্রামের ডাকঘরে পৌছাইয়া দিত। নবীনের যে লাঠীতে আবদ্ধ হইয়া ডাকের ব্যাগটি তাহার পিঠে ঝুলিত সেই লাঠীর অগ্রভাগে বর্শার ফলা, এবং সেই ফলায় ঘুঙুর বাঁধা; এই জন্য সে ডাকের ব্যাগ লইয়া দৌড়াইবার সময় 'ঝন্‌ঝন্‌' করিয়া শব্দ হইত, এবং সেই শব্দ বহুদূর হইতে শ্রবণগোচর হইত। সন্ধ্যার প্রাক্কালে সে গোবিন্দপুরের ডাকঘর হইতে ডাক লইয়া যাইত, এবং তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী আড্ডায় অন্য হরকরার জিম্বা করিয়া দিয়া গামে ফিরিত; আবার অতি প্রত্যূষে উঠিয়া ডাক আনিতে যাইত। এইভাবে প্রত্যহ দুইবেলা তাহাকে বার ক্রোশ হাঁটিতে হইত। শীত গ্রীষ্ম, ঝড়-বৃষ্টি, প্রাকৃতিক শত দুর্য্যোগেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইবার উপায় ছিল না। সে একাকী, অথচ সেই ডাক ব্যাগেই কোন কোন দিন ইন্সিওরের থলিতে হাজার হাজার টাকার নোট থাকিত! কোন দিন কোন কারণে তাহার দশ পনের মিনিট বিলম্ব হইলে ডাক-লাইনের ওভারশিয়ারের কাছে তাহাকে কৈফিয়ৎ দিতে হইত; ডেকো ইন্‌স্পেক্টর সেই কৈফিয়তে সন্তুষ্ট হইতে না পারিলে তাহার অর্থদণ্ডও হইত; কিন্তু তাহার ভাগ্যে কোনও দিন পুরস্কার জুটিত না। ডাকবিভাগের ব্যবস্থা এইরূপ অনিন্দ্যসুন্দর।

শীতকালে নবীন সদ্দার গ্রামের লোকের খেজুর গাছ 'কামাইয়া' রস সংগ্রহ করিত। সেই রস জ্বাল দিয়া সে গুড় করিত। এই সময় সে ডাক বহিতে পারিত না—এজন্য পোষ্টমাষ্টার ও ইন্‌স্পেক্টরের নিকট দরবার করিয়া অন্য কাহাকেও তাহার প্রতিনিধিত্ব করিতে দিত; কিন্তু প্রতিনিধির কার্য্যের দায়িত্ব-ভার তাহাকেই গ্রহণ করিতে হইত। তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিতেন বলিয়া পোষ্টমাষ্টার এবং ইন্‌স্পেক্টর উভয়েই তাহার নিকট নলেন গুড় উপহার পাইতেন; এতদ্ভিন্ন সকালে ও সন্ধ্যায় 'জিরেন কাটে'র সুমিষ্ট খেজুর-রস ত তাঁহাদিগকে নিত্য যোগাইতে হইত। এই প্রকার উপরি ব্যয় করিয়া নবীন কয়েক মাসের জন্য হরকরাগিরি হইতে মুক্তিলাভ করিত। গুড় বিক্রয় করিয়া নবীন সদ্দার প্রতি বৎসর কিছু টাকা উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইত; তবে মাসিক বার টাকা বেতন ঐ কয় মাস তাহার ভোগে লাগিত না। তাহাতে তাহার আক্ষেপের কারণ ছিল না; সে প্রতিদিন গুড় ও 'সরাগুড়' বিক্রয় করিয়া এক টাকা লাভ করিত। প্রত্যেক খেজুর গাছের মালিক গাছের খাজনা হিসাবে ঐ কয় মাসে মোট দুই সের গুড় পাইতেন। এখন খাজনার পরিমাণ কিছু অধিক হইয়াছে।

আমরা নানা পথে ঘুরিতে ঘুরিতে নেপালগঞ্জের ঘাটে উপস্থিত হইলাম। এই ঘাটের মালিক স্থানীয় লোকাল-বোর্ড; পূর্ব্বে স্থানীয় কোন লোক নিলামে ঘাট ডাকিয়া লইত। এখন স্থানীয় কোন লোক ঘাট দখল করিতে পারে না, এক জন বিহারী এই ঘাটের মালিক হইয়া বসিয়াছে। তাহার অত্যাচারের সীমা নাই। আমরা ঘাটে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম—ঘাটের নীচে নদীতে জল নাই, যাহারা এক পার হইতে অন্য পারে যাইবে, তাহারা হাঁটুর কাপড় তুলিয়া হাঁটিয়া নদী পার হইতে পারে; কিন্তু তাহাদিগকে নৌকায় পার হইয়া পার-পণ এক পয়সা দিতেই হইতেছে। আমরা নদী-তীরে উপস্থিত হইলে রামকান্তপুরের কয়েকটি 'চেল্‌কী' স্ত্রীলোক গোবিন্দপুরের বাজারে চাউল বিক্রয় করিতে যাইবে বলিয়া পারঘাটার শতাধিক গজ দূরে নদীতে নামিয়া হাঁটিয়া নদী পার হইতেছিল। তাহারা তাহাদের চাউলের মোট মাথায় লইয়া নদী পার হইয়া এপারে আসিবামাত্র গুজরঘাটের ইজারাদারের গোমস্তা তাহাদের গতিরোধ করিয়া পার-পণের জন্য জুলুম আরম্ভ করিল। দরিদ্রা 'চেল্‌কী'রা বলিল, "কেন বাছা, পারাণী দেব? আমরা কাদা ভেঙ্গে ওপার থেকে এপারে এসেছি, তোমাদের 'নৌকো'য় উঠিনি, তবে পারাণী চাও কোন্ আক্কেলে?"

গোমস্তা এক জনের বস্তা ধরিয়া নদীতীরে নামাইয়া ফেলিল, এবং সরোষে গর্জ্জন করিয়া বলিল, "থাম্ শালী, মুখ সামলিয়ে কথা বলিস্। তোরা হেঁটেই নদী পার হ, আর উড়েই আসিস্, আমরা তা দেখ্‌তে চাইনে, এক জগ্‌গর টাকা দিয়ে ঘাট ডেকে নিয়েছি; ও-ভাবে ফাঁকি দিয়ে যদি 'পারকে যাবি' ত আমাদের খাজনার টাকা উঠবে কি ক'রে? নদী পার হ'লেই খাজনা লাগবে; বের কর মাগী,

পয়সা।' কিন্তু তাহারা চাউল বিক্রয় করিতে আসিয়াছে, পয়সা তাহাদের সঙ্গে ছিল না। গোমস্তা প্রত্যেকের মোট হইতে দুই আঁজলা চাউল কাড়িয়া লইয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিল। প্রত্যেকের চাউলের মূল্য অর্দ্ধ আনারও অধিক।

পরে শুনিলাম, বাজারের কয়ালের পরামর্শে তাহারা লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যান উকিল মৌলুবী জনাবালি মিঞার নিকট ঘাটোয়ালের গোমস্তার বিরুদ্ধে নালিশ করিয়াছিল; কিন্তু মিঞা কাজির বিচার করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "গোমস্তা খাঁটি কথাই বলেছে রে, বেটি! ঘাটোয়াল টাকা দিয়ে ঘাট ইজারা নিয়েছে—সকলে ফাঁকি দিয়ে হেঁটে নদী পার হ'লে কোথা থেকে সে বেচারা ইজারার টাকা দেবে? তোরা খেয়া নৌকায় পার হলিনে, সে জন্য কি সরকার লোকসান সহ্য করবে? পারাণীর পয়সা দিতে পারিস্ নি, চা'ল নিয়েছে, বেশ করেছে। যা, মামলা ডিসমিস।"—বুঝিলাম, স্বায়ত্ত-শাসনের অমৃত ফল মুখে পুরিলে দেশের গরীব-দুঃখীদের গলায় সেই অমৃত ফলের আঁটি বাধিয়া যাইবে, এবং তাহারা দমবন্ধ হইয়া মারা পড়িবে। এখন চতুর্দ্দিকেই ইহার লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে!

পূর্ব্বদিন চড়ক-পূজা হইয়াছিল, এজন্য নদীগর্ভ হইতে চড়কগাছটি তীরে তুলিয়া গাজনের সন্ন্যাসীরা তাহাতে তেল-সিঁদূর চন্দন লেপিয়া তাহার পূজা করিয়াছিল। পূজার পর সন্ন্যাসীরা 'শিবের পাট' মাথায় লইয়া তাহাদের বিভিন্ন আড্ডায় ফিরিয়া গিয়াছিল। প্রায় পঞ্চাশ হাত দীর্ঘ চড়কগাছ, নদীতীরেই পড়িয়া থাকিতে দেখিলাম। শুনিয়াছি, বহুকাল পূর্ব্বে এই চড়কগাছ গ্রামস্থ শিবমন্দিরের সম্মুখে লইয়া গিয়া প্রোথিত করা হইত, এবং সন্ন্যাসীরা বুক-পিঠ ফুঁড়িয়া চড়কগাছে ঝুলিয়া নাগরদোলার মত পাক খাইত; কিন্তু একালে এই নিষ্ঠুর আমোদ রহিত হইয়াছে। এখন চড়কগাছ পূজা করিয়াই সন্ন্যাসীরা আত্মপ্রসাদ লাভ করে। আমরা চড়কগাছের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলাম—পাড়ার ও ভিন্ন পাড়ার এক পাল ছেলে চড়কগাছটি জলে নামাইবার জন্য ঠেলাঠেলি করিতেছিল। কতকগুলি মুসলমান বালক কিছু দূরে দাঁড়াইয়া এই দৃশ্য দেখিতেছিল; তাহারা সেই আমোদে যোগদান করিতে না পারায় ব্যথিত হইয়াছিল। এই চড়কগাছ যখন জলের ভিতর ছিল, তখন তাহারা ইহার উপর দাঁড়াইয়া কত খেলা খেলিয়াছে; এখন তীরস্থ চড়কগাছ তাহারা স্পর্শ করিলেই তাহার জাতি যাইবে: ইহাই লোকাচার!

নেপালগঞ্জের ঘাটে অনেকগুলি জেলে-নৌকা ছিল, দেখিলাম, নৌকাগুলি ধুইয়া পরিষ্কৃত করা হইয়াছে, এবং সিঁদূর দ্বারা চক্ষু আঁকিয়া চন্দনের ফোঁটা দিয়া, সোলার মালা, আম্রশাখা প্রভৃতি তাহাদের মাথায় ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ঘাট হইতে গোয়ালাপাড়ার ভিতর দিয়া বাজারের দিকে যাইবার সময় গোপ-পল্লীতে গাভীগুলির পরিচর্য্যা দেখিতে পাইলাম। প্রত্যেক গাভীর সর্ব্বাঙ্গ ধৌত করিয়া তাহার শৃঙ্গে তেল ও সিঁদূর মাখাইয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেক গৃহস্থের গোশালায় দুধ উথলানো হইতেছে। সেখানে তিউড়ি খুঁড়িয়া মালসাতে দুগ্ধ দ্বারা পায়স রাঁধিয়া পরিবারস্থ বালক-বালিকাগণকে আহার করিতে দেওয়া হইয়াছে। সেদিন প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহপ্রাঙ্গণ আলিপন দ্বারা সুশোভিত। ইহা নববর্ষের সুলক্ষণ।

বাজারে প্রত্যেক দোকানের সম্মুখে রজ্জুবদ্ধ আমপাত ও সোলার কদম্বফুলের মালা ঝুলিতেছিল। প্রত্যেক দোকান নূতন খাতার আয়োজনে ব্যস্ত। দেখিলাম, মধ্যাহ্নে বাজারের কালীমন্দিরে বিভিন্ন পল্লীগ্রাম হইতে পট্টবস্ত্র ভূষিত বহু ভক্তের সমাগম হইয়াছে। নারীর সংখ্যাই অধিক। কেহ দুধ, বাতাসা ও কাঁচাগোল্লা আনিয়া পূজার জন্য পুরোহিতকে প্রদান করিতেছে; কেহ নানাপ্রকার ফল আনিয়াছে; কেহ নূতন গাছের প্রথম ফলটি মা'কে উপহার দিতে আসিয়াছে। পুরোহিত অক্ষয় ঠাকুর আজ তাঁহার পূজারীর 'য়ুনিফর্ম্মে' সুসজ্জিত; কণ্ঠে ও প্রকোষ্ঠে রুদ্রাক্ষমালা, পরিধানে তসরের ধুতি, রেশমী নামাবলী দ্বারা দেহ আবৃত, মস্তকের শিখায় একটি ফুল গুঁজিয়া দিয়াছেন। যে সকল দুধ জমিল তাহার কিয়দংশ পায়সের জন্য রাখিয়া পুরোহিতের অনুগৃহীত যদু ঘোষকে তাহা প্রদান করা হইল; সে সেই দুগ্ধে ছানা প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিবে, এবং দুগ্ধের উপযুক্ত মূল্য অক্ষয় ঠাকুরকে প্রদান করিবে। ১লা বৈশাখ সে-বার মঙ্গলবার ছিল: এই জন্য ভক্তরা দূরবর্ত্তী বহু গ্রাম হইতেও মায়ের পূজা দিতে আসিয়াছিল। দেবীর মন্দিরের বাহিরে একটি বৃহৎ বিল্ববৃক্ষ, এবং তাহার পার্শ্বেই শাখাবহুল তমাল তরু; তাহার শীতল ছায়ায় কয়েক জন সন্ন্যাসী ভস্মাবৃত

দেহে উপবিষ্ট ; কটিতটে কৌপীন ভিন্ন দেহে অন্য আবরণ-বস্ত্র ছিল না। তাহারা মুহুর্ম্মুহু গঞ্জিকার ধূমপান করিয়া 'বোম্' 'বোম্' শব্দে চীৎকার করিতেছিল। তাহাদের কণ্ঠস্বরে ভক্তির লেশ মাত্র ছিল না। মন্দিরের সম্মুখে হাড়িকাঠ প্রোথিত। মস্তকচ্যুত পাঁঠাগুলির কণ্ঠশোণিতে সেই স্থানের মৃত্তিকা প্লাবিত। বিভিন্ন দলস্থ ভক্তের ঢাক 'ড্যাং-ড্যাং, ড্যাড়াং-ড্যাং' শব্দে সমগ্র বাজার প্রতিধ্বনিত করিতেছিল। এক দল লোক পূজা দিয়া প্রসাদ লইয়া ফিরিতেছিল, আর এক দল জোড়া পাঁঠা লইয়া ঢাক বাজাইতে বাজাইতে মন্দিরের সম্মুখীন হইতেছিল।

উৎসবমুখর দিবসের অবসানে শ্রান্ত তপন পশ্চিম গগন-প্রান্তে নিদাঘের ধূসরকান্তি মেঘের অন্তরালে অদৃশ্য হইল। সকলেই কাল-বৈশাখীর উদ্দাম ঝটিকা, মুহুর্ম্মুহু সুগম্ভীর মেঘ-গর্জ্জন, এবং মুষলধারায় বর্ষণের প্রতীক্ষায় আকাশের দিকে চাহিতে লাগিল ; কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যে প্রচণ্ড ঝটিকা আসিয়া সেই নিবিড় কৃষ্ণ মেঘস্তর কোথায় উড়াইয়া লইয়া গেল, কেবল পৃথিবী ও আকাশব্যাপী ঘনান্ধকার-সমাচ্ছন্ন ধূলারাশির একটা ঘূর্ণাবর্ত্ত পল্লীবাসীর নয়নসমক্ষে নব বৈশাখের দুরন্ত রূপের ছায়া প্রকটিত করিয়া দিক্-চক্রবাল সীমায় অদৃশ্য হইল।

সায়ংকালে আকাশ নির্ম্মল হইলে গোবিন্দপুরের বাজারের বিভিন্ন পণ্যদ্রব্যপূর্ণ দোকানগুলি সান্ধ্যদীপালোকে উদ্ভাসিত হইল। গাজনের সন্ন্যাসীরা পূর্ব্বদিন চৈত্র সংক্রান্তিতে পল্লীবাসিগণকে আলোক-নৃত্য দর্শন করাইয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারে নাই ; এই জন্য নববর্ষের এই প্রথম দিনের উৎসবচঞ্চল সন্ধ্যায় তাহারা নানাদলে বিভক্ত হইয়া আলোকোজ্জ্বল 'বানের খেলা' দেখাইবার জন্য বিভিন্ন পাড়া অতিক্রম করিয়া কালীবাজারে প্রবেশ করিল। তাহাদের সমাগমে বাজারের আমোদ সন্ধ্যার নিবিড়তার সঙ্গে জমাট বাঁধিয়া উঠিল।

প্রজ্বলিত ধুনার আলোকে নর্ত্তনরত সন্ন্যাসীরা বানের খেলা দেখাইয়া একদল দূরে চলিয়া যাইতেছে, আর একদল বাজারে প্রবেশ করিতেছে। সজোরে ঢাক বাজিতেছে, ঢাকের পাখাগুলি সবেগে আন্দোলিত হইতেছে, উৎসাহে ঢাকীরা ঘুরিয়া ফিরিয়া লাফাইয়া উঠিতেছে : আর সন্ন্যাসীদের পা বাদ্যধ্বনির সমতালে উঠিতেছে, নামিতেছে, ঘুরিতেছে। বানের ডগায় তৈলসিক্ত ধুনাচূর্ণ-মিশ্রিত কুণ্ডলীকৃত নেকড়ার কালি ধ্বক্-ধ্বক্ করিয়া জ্বলিতেছে, এবং সেই অগ্নিতে মিনিটে মিনিটে এক এক মুঠা ধুনার গুঁড়া নিক্ষিপ্ত হইতেছে, আর সকল সন্ন্যাসীর বক্ষসংলগ্ন বানের মাথার আলো একসঙ্গে 'দপ্' করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে। আলোক-দীপ্ত কুণ্ডলীকৃত ধূমে অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশের বহুদূর পর্য্যন্ত মুহুর্ম্মুহু উদ্ভাসিত হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে আরও জোরে জোরে ঢাক বাজিতেছে ; ঢাকের শব্দের সঙ্গে ঢাকীরা দুই হাত ঊর্দ্ধে লাফাইয়া উঠিতেছে। সুরঞ্জিত সাড়ী ও নানা অলঙ্কারে বিভূষিত, পুষ্পমাল্যে সমলঙ্কৃত সন্ন্যাসীর দল উন্মত্তপ্রায় হইয়া কখন উভয় হস্তে পঞ্জর-বিদ্ধ বানের দুইপাশ ধরিয়া, কখন বা অলঙ্কার-বেষ্টিত উভয় বাহু ঊর্দ্ধে তুলিয়া, ঘাড় বাঁকাইয়া, মাথা নাড়িয়া আরও অধিক উৎসাহভরে নৃত্য করিতেছে। তাহাদের পায়ের নূপুর তালে 'রুণু ঝুণু' শব্দে বাজিতেছে, এবং সকলে সমস্বরে হুঙ্কার দিতেছে—'বলো শিবো মহাদেব দেব'। তাহাদের পরিধেয় বস্ত্র সর্ব্বাঙ্গ-প্রবাহিত ঘর্ম্মধারায় সিক্ত, পুষ্পদাম শিথিল, স্থানভ্রষ্ট, পল্লীবধূগণের নিকট হইতে সংগৃহীত ও রূপসজ্জার উপকরণরূপে ব্যবহৃত চুড়ী, বালা, তাগা, বাজু, তাবিজ, উভয় হস্তের প্রবল আন্দোলনে স্খলিত ও শ্লথভাবে পরস্পর সংযোজিত হইয়াছে, সে দিকে তাহাদের লক্ষ্য নাই। তাহাদের কণ্ঠবেষ্টিত কণ্ঠমালায়, চিকে, পাঁচনরীতে এবং দেহের অন্যান্য স্বর্ণালঙ্কারে বক্ষঃসংলগ্ন বানের অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ প্রতিফলিত হইতেছে। তাহাদের পদযুগল পরি-বেষ্টিত নূপুরের নিক্কণ ঢাকের অশ্রান্ত নিনাদে সমাচ্ছন্ন।

এইভাবে চক্রাকারে নাচিতে নাচিতে সন্ন্যাসীদের সকল দল বাজারের ভিতর দিয়া প্রথমে শিবমন্দিরে, তাহার পর কালীতলায় সমবেত হইল। সেখানে দীর্ঘকাল নৃত্য-কৌশল প্রদর্শনের পর তাহারা নাচিতে নাচিতে বিভিন্ন পল্লীর গাজনতলায় প্রত্যাগমন করিল। তখন বাজারের দোকানে হালখাতার আসরে সঙ্গীতালাপ, গল্প, এবং জলযোগ আরম্ভ হইল। কোন কোন দোকানে ক্রীড়া-কৌতুকও চলিল। এইভাবে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত উৎসব চলিবার পর নিমন্ত্রিত গ্রামবাসীরা গৃহে ফিরিল। উৎসবের দীপ একে একে নির্ব্বাপিত হইলে সমগ্র গ্রাম নৈশ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইল।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

ইতিহাসের অনুসরণ

রাজা দনুজমর্দ্দন দেব এবং মহেন্দ্র দেব

বাঙ্গালার ইতিহাসে খৃষ্টীয় ১২০০ শত হইতে অব্দ পর্য্যন্ত সময় পাঠান শাসনকাল বক্তিয়ার খিলজীর বাঙ্গালা অধিকার হইতে দাউদ খাঁর পরাজয়-কাল পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় যে শাসন প্রবর্ত্তিত ছিল, তাহাই 'পাঠান-শাসন-কাল।' যে সকল মুসলমান এই সময়ে বাঙ্গালায় অধিকার স্থাপন করিয়াছিল, তাহারা প্রায় তুর্কী জাতীয়। ইহারা যুদ্ধবিদ্যায় তখনকার মত সুশিক্ষিত ছিল সত্য, কিন্তু তাহাদের কোন বিষয়ে যে কোনরূপ শিক্ষা ছিল, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় নাই। সংস্কৃত সাহিত্যে এবং তাৎকালিক লেখমালায় এই সকল জাতিকে তুর্কী বলাই হইয়াছে। কেবলমাত্র যুদ্ধবিদ্যা ভিন্ন অন্য কোন বিদ্যার চর্চ্চা করা ইহারা প্রয়োজনীয় বলিয়াই গণ্য করিত না। গৌড় পাণ্ডুয়া প্রভৃতি স্থানে তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী হিন্দুকীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ তাহাদের শাসন-বৈশিষ্ট্যের পরিচয় প্রত্যক্ষভাবে প্রদান করিতেছে। তাহাদের শাসনকালে ভূমিদানের কোন শিলালিপি বা তাম্রশাসন একাল পর্য্যন্ত মিলিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ইহারা বাঙ্গালায় আসিয়া বসবাস করিয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহাদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মানসিক ক্ষেত্রে কোন কীর্ত্তির পরিচয় দিতে পারিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। তাহাদের অধিকারমধ্যে সর্ব্বত্রই কেবল তাহাদের কীর্ত্তিনাশা শক্তির মর্ম্মান্তিক নিদর্শন বিকীর্ণ থাকিয়া তাহাদের সভ্যতার স্বরূপ ঘোষণা করিতেছে।

বাঙ্গালাদেশের অন্তর্ভুক্ত পশ্চিম বরেন্দ্রভূমিতেই প্রথমে তুর্কীদিগের শক্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ভাগ্যান্বেষী অসম সাহসিক তুর্কীরা আফগানরাজ্য প্রভৃতি স্থান হইতে বরেন্দ্রভূমিতে প্রবেশ করে। অদ্যাপি মালদহের এবং দিনাজপুরের মুসলমানদিগের আকৃতি এবং প্রকৃতিগত বৈষম্য অন্যান্য স্থানের মুসলমানদিগের সহিত তাহাদের পার্থক্যের দিকে যেন অঙ্গুলি-সঙ্কেত করিতেছে। মালদহ জেলাতেই পাঠান শাসনকালের সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন লেখ আছে। সত্য বটে, বিহার অঞ্চলে মুসলমান শাসনের পুরাতন লেখা মিলিয়াছে, কিন্তু তা মালদহের লেখা হইতে ১০ বৎসরের পরবর্ত্তী।

এই সকল পাঠান এক গোষ্ঠীয় অথবা এক সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল না। তাহারা ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত ছিল। প্রায় সাড়ে তিন শত পোনে চারি শত বৎসরের মধ্যে বঙ্গে অন্ততঃ পঞ্চাশ জন শাসক শাসনকার্য্য পরিচালিত করিয়াছিলেন এবং প্রায় দশটি বিভিন্ন বংশীয় রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে হাবসীও ছিলেন হিন্দুও ছিলেন। ফলে এই সাড়ে তিন শত, পোনে চারি শত বর্ষকাল বাঙ্গালায় কেহ কোন প্রকার সুপ্রতিষ্ঠিত শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিতে সমর্থ হন নাই। ইহাদের শাসনকার্য্যের মধ্যে কোনরূপ শৃঙ্খলা ছিল বলিয়া মনে হয় না। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাদও ছিল। ইহাদের রাজধানীও একস্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিল না। কখনও গৌড়ে, কখন পাণ্ডুয়ায়, কখনও সাতগাঁয়ে কখনও বা সোণার গাঁওয়ে ইহাদের রাজধানী ছিল। ইহারা ধ্বংসিনী ক্ষমতায় অসাধারণত্বের পরিচয় প্রদান করিলেও সংগঠনী শক্তির বিশেষ কোন পরিচয় দিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না। কারণ, সেরূপ দৃষ্টান্তের অত্যন্ত অভাব। এই সময় শক্তিশালী হিন্দু জমিদারবর্গ অনেকে ইহাদের সমকক্ষই ছিলেন, তবে তাঁহারা দূরদৃষ্টির অভাবে অথবা অন্য কোন পারিপার্শ্বিক কারণে ইহাদিগকে দেশ হইতে বিদূরিত করিয়া দিবার চেষ্টা করেন নাই অথবা তাহা করিতে পারিয়া উঠেন নাই। তবে ইহা অতি সহজবুদ্ধিতে বুঝা যায় যে, রাজা গণেশনারায়ণ ভাতুড়ি যে বাঙ্গালার মুসলমান নবাবকে পরাজিত করিয়া স্বয়ং রাজশক্তি পরিচালিত করিয়াছিলেন, ইহা একটা আকস্মিক ঘটনা নহে। তখন জমিদারদিগের ভিতর কাহারও কাহারও ঐরূপ শক্তি ছিল। ইহাদিগকে তুর্কীরা ভয় করিত এবং কাহাকে কাহাকেও হাতে রাখিত, সেইজন্য রাজা গণেশের পুত্র জালালউদ্দীন মহম্মদশাহ যখন মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া হিন্দুদিগের উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তখন ভূস্বামী দনুজমর্দ্দন

তাঁহার প্রবল প্রতিপক্ষ হইয়া উঠিয়াছিলেন। দনুজমর্দ্দন চন্দ্রদ্বীপের কায়স্থ-বংশের আদিপুরুষ। কেহ কেহ দনুজমর্দ্দন এবং রাজা গণেশ উভয়কে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া মনে করেন। কিন্তু রাজা গণেশ ছিলেন ভাতুড়িয়ার ভাদুড়ী-বংশীয় জমিদার, সুতরাং বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, পক্ষান্তরে রাজা দনুজমর্দ্দন ছিলেন কায়স্থ। উভয়েরই বংশধারা ও কুটুম্ব অদ্যাপি বিদ্যমান। একটাকিয়ার ভাদুড়ী-বংশই রাজা গণেশনারায়ণের বংশধর। ইঁহারা ব্রাহ্মণ। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে এই একটাকিয়া ভাদুড়ী-বংশ যশে, মানে এবং প্রভাবে বাঙ্গালা দেশের অভিজাত ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। এখনও তাহিরপুর রাজবংশ রাজা গণেশনারায়ণের ব্রাহ্মণ্যের দেদীপ্যমান প্রমাণস্বরূপ বিরাজমান।

পক্ষান্তরে রাজা দনুজমর্দ্দন ছিলেন কায়স্থ। দ্বিজ বাচস্পতির বঙ্গজকুলজী সারসংগ্রহ হইতে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব যে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা এই :—

দনুজমর্দ্দন রাজা চন্দ্রদ্বীপপতি।
সেই হইল বঙ্গজ কায়স্থ গোষ্ঠীপতি॥
দেবপদ্ধতিতে হোম মহিমা অপার।
সমাজ করিতে রাজা হইল চিন্তাপর॥
গৌড় হইতে আনিলা কায়স্থ-কুলপতি।
কুলাচার্য্য আনাইয়া করাইল স্থিতি॥

সুতরাং এক জন কায়স্থ আর এক জন ব্রাহ্মণ উভয়কে কখনই অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া স্বীকার করা যায় না। ঐতিহাসিকের অনুমান কখনও প্রত্যক্ষকে অস্বীকার করিতে পারে না। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়ের অনেক সিদ্ধান্তই আমার নিকট সঙ্গত মনে হয়, কিন্তু এক্ষেত্রে তাঁহার সিদ্ধান্ত যে অতিমাত্র ভ্রান্ত, ইহাই আমার ধারণা। কারণ, কেবলমাত্র মুদ্রা এবং মুদ্রায় তারিখ দেখিয়া কোন অভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। অস্তিত্ব-নির্ণয়ে মুদ্রা-সম্পর্কিত প্রমাণ বলবান বটে, কিন্তু জাতিনির্ণয়ে বংশধরগত প্রমাণ তদপেক্ষাও বলবান। ইহা লইয়া আমি তর্ক বৃদ্ধি করিতে চাহি না। একথা সত্য যে, দনুজমর্দ্দন দেব প্রায় রাজা গণেশের সমকালীন ব্যক্তি। গণেশের পুত্র যদু যখন জালালউদ্দীন নাম গ্রহণ করিয়া কোপ ও বিদ্বেষবশে হিন্দুদিগের উপর অত্যন্ত অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তখন কায়স্থ জমিদার রাজা দনুজমর্দ্দনের সহিত যদুর যুদ্ধ হইয়াছিল। দনুজমর্দ্দন গণেশনন্দন জালালউদ্দীনকে অল্প দিনের মধ্যেই পাণ্ডুয়া হইতে বিতাড়িত করিয়া আপনাকে স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। পাণ্ডুয়া হইতেই দনুজমর্দ্দন দেব স্বনামে মুদ্রাঙ্কিত করিয়া চালাইয়াছিলেন। তাঁহার ঐ সময়ের মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। ঐ সকল মুদ্রা ১৩৩৯ এবং ১৩৪০ শকাব্দে প্রস্তুত হইয়াছিল। অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৪১৭-১৪১৮ অব্দে দনুজমর্দ্দন যে পাণ্ডুয়ার অধিপতি ছিলেন, ইহা মুদ্রা হইতে প্রাপ্ত প্রমাণে সত্য বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু অত্যন্ত বিস্ময়ের বিষয় এই যে, দনুজমর্দ্দন কর্ত্তৃক পাণ্ডুয়া অধিকার এবং জালালউদ্দিন মহম্মদ শাহ কর্ত্তৃক পাণ্ডুয়া পরিত্যাগের কথা রিয়াজ উস্ সালাতীনে লিখিত হয় নাই। রিয়াজ উস্ সালাতীনের লেখক সে কথা লিখেন নাই কেন, তাহা বুঝা কঠিন। অন্য কোন মুসলমান বা হিন্দু কর্ত্তৃক দনুজমর্দ্দনের জীবনকথা লিখিত হয় নাই। কেবলমাত্র কায়স্থ-কুলশাস্ত্রে তাঁহার কথা উল্লিখিত আছে। কিন্তু তাহাতে তাঁহার জীবন-কথা বিস্তৃতভাবে প্রদত্ত হয় নাই। কুলশাস্ত্রে কেবল কুলের কথাই থাকে। জীবনবৃত্তান্ত বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত থাকে না। সুতরাং ইহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। ইহাতে বেশ বুঝা যায় যে, দনুজমর্দ্দন দেব নামক জনৈক কায়স্থ জমিদার নবাব জালালউদ্দিন মহম্মদ শাহের আমলে অল্পকাল ধরিয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইঁহার অধিকার উত্তর-বঙ্গ. পাণ্ডুয়া হইতে দক্ষিণ এবং পূর্ব্ববঙ্গ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পাণ্ডুয়ায় অর্থাৎ পাণ্ডুনগরে ইহার যে মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে পাণ্ডু নগরের নাম উৎকীর্ণ আছে। ঢাকা অঞ্চলের শিক্ষা-বিভাগের পরিদর্শক মিষ্টার এন, ই, ষ্টেপল্‌টন্ পূর্ব্ববঙ্গ হইতে রাজা দনুজমর্দ্দন দেবের অনেকগুলি মুদ্রা আবিষ্কৃত করিয়াছেন। ঐ সকল মুদ্রা ১৪১৭-১৮ খৃষ্টাব্দেই প্রচলিত করা হয়। পাণ্ডুয়া, চট্টগ্রাম এবং সোনারগাওয়ে তাঁহার মুদ্রা প্রস্তুত হইয়াছিল। তিনি তাঁহার মুদ্রায় শকাব্দা, তারিখ দিয়াছিলেন এবং বাঙ্গালা অক্ষরে ও সংস্কৃত ভাষায় নিজ নাম দিয়াছিলেন। মুদ্রার অপর দিকে "চণ্ডীচরণ পরায়ণস্য" কথা লিখিত। দুর্ভাগ্যক্রমে এত বড় এক জন প্রবল-পরাক্রান্ত রাজার বিশ্বাসযোগ্য

কোন বৃত্তান্ত এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। তবে নানাস্থানে প্রদত্ত বিক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে যতদূর জানিতে পারা যায়—তাহাতে বুঝা যায় যে, তিনি ও তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েক পুরুষ বড় শক্তিশালী জমিদার বা ভূস্বামী ছিলেন। তিনি যুদ্ধে জালালউদ্দীন মহম্মদকে পরাজিত করিয়া পাণ্ডু নগর বা পাণ্ডুয়া অধিকৃত করিয়াছিলেন। তথা হইতে তিনি নিজ নামে মুদ্রাদিও চালাইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি অধিক দিন পাণ্ডুয়া নগর স্বীয় অধিকারে রাখিতে পারেন নাই। সম্ভবতঃ পাঠানরা সম্মিলিত হইয়া তাঁহাকে আবার পাণ্ডুয়া হইতে বিতাড়িত করিয়াছিল। জালালউদ্দীন আবার পাণ্ডুয়ার অধিপতি হইয়াছিলেন। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে রাজা দনুজমর্দ্দনের আধিপত্য পাঠানগণ সহজে ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই। তিনি শেষকালে চন্দ্রদ্বীপে যাইয়া তথায় তাঁহার রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। এইস্থানে থাকিয়াই তিনি ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ সমাজের সংস্কারসাধন করিয়াছিলেন। তিনি শাক্ত ছিলেন, ইহা তাঁহার মুদ্রিত মুদ্রায় "চণ্ডীচরণ পরায়ণস্য" এই কথা হইতে জানিতে পারা যায়। কেহ কেহ বলেন, তিনি তাঁহার গুরুদেবের পরামর্শেই চন্দ্রদ্বীপে যাইয়া রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। কোন ইতিহাসে তাঁহার জীবনকথা লিপিবদ্ধ না থাকায় তাঁহার জীবনের অনেক কথাই বিস্মৃতির তিমিরে অবগুণ্ঠিত হইয়া আছে। কাল যদি সেই তিমিরাবরণ সরাইয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে যে একজন শক্তিশালী হিন্দু-নৃপতির কথা বিশেষভাবে জানিতে পারা যাইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণব মহাশয় তাঁহার "রাজন্য কাণ্ডে" লিখিয়াছেন যে, রাজা দনুজমর্দ্দন দেব রাজা মহেন্দ্র দেবের পুত্র। এইখানে তিনি ভুল করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। রাজা মহেন্দ্র দেব দনুজমর্দ্দন দেবের পিতা নহেন—পুত্র। মুদ্রা ব্যতীত মহেন্দ্র দেবের অস্তিত্বের কোন সাক্ষ্য নাই, একথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। সেই মুদ্রা হইতে জানিতে পারা যায় যে, মহেন্দ্র দেব দনুজমর্দ্দনের পরবর্ত্তী রাজা। শকাব্দা ১৩৩৯ এবং ১৩৪০ সনে প্রচারিত দনুজমর্দ্দন দেবের বহু মুদ্রা পাণ্ডুয়ায় এবং বাঙ্গালার বিভিন্ন স্থানে পাওয়া গিয়াছে। তাহার পর ১৪১৯ খৃষ্টাব্দের মুদ্রায় মহেন্দ্র দেবের নাম পাওয়া যায়। রাজা দনুজমর্দ্দনের সমস্ত মুদ্রাতেই শকাব্দ দেওয়া আছে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা সমস্তই ১৩৩৯ এবং ১৩৪০ শকাব্দের। ইহাতে বুঝা যায় যে, তিনি ১৪১৭-১৮ খৃষ্টাব্দে প্রায় নিখিল বঙ্গে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহা হইতেই অনুমিত হয় যে, তিনি কেবলমাত্র দুই বৎসর কাল সমস্ত বাঙ্গালায় নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাহার পর তাঁহার পুত্র মহেন্দ্র দেব পাণ্ডুয়ার সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। কারণ ১৩৪০ শকাব্দে মহেন্দ্র দেবের নামাঙ্কিত কতকগুলি মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। অর্থাৎ ১৪১৯ খৃষ্টাব্দে মহেন্দ্র দেবের নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রচলিত হইয়াছিল। মিষ্টার ষ্টেপলটন কর্ত্তৃক সংগৃহীত একটি মুদ্রায় ১৩৪০ শকাব্দ দেওয়া আছে। মুদ্রার তারিখগুলি অস্পষ্ট হওয়াতে উহা বুঝিতে অনেক সময় কষ্ট হয়। শ্রীযুত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন:—"মালদহ জেলায় আবিষ্কৃত মহেন্দ্র দেবের মুদ্রার তারিখের এককের অঙ্ক অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র শেঠ ও আমি ঐ তারিখটি ১৩৩৬ পাঠ করিয়াছিলাম। মহেন্দ্র দেবের অন্যান্য মুদ্রায় ১৩৪০ শকাব্দ তারিখ দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, উহা ১৩৩৯ শকাব্দ ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না। ষ্টেপলটন কর্ত্তৃক সংগৃহীত দনুজমর্দ্দনের একটি মুদ্রার তারিখ ১৩৪০ শকাব্দ; সুতরাং দনুজমর্দ্দনের জীবদ্দশায়, তাঁহার মৃত্যুর অন্ততঃ এক বৎসর পূর্ব্বে মহেন্দ্র দেব নিজ নামে মুদ্রাঙ্কণ আরম্ভ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ১৩৩৯ শকাব্দে বিদ্রোহী হইয়া মহেন্দ্র দেব স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন" (বাঙ্গালার ইতিহাস ২য় খণ্ড ১৮৯ পৃষ্ঠা)। অশেষ সেমুষীসম্পন্ন ঐতিহাসিক রাখাল বাবু অনুমান করিয়াছেন যে, পিতার মৃত্যুর অতি অল্পদিন পূর্ব্বে মহেন্দ্র দেব বিদ্রোহী হইয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন। এ অনুমান সত্য না হইতেও পারে। দনুজমর্দ্দন দেবের দুই পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠ মহেন্দ্র দেব, কনিষ্ঠ রমাবল্লভ দেব। মহেন্দ্র দেব পাণ্ডুয়ার রাজা হইয়াছিলেন, রমাবল্লভ দেব হইয়াছিলেন চন্দ্রদ্বীপের রাজা। সম্ভবতঃ দনুজমর্দ্দন দেব তাঁহার জীবিতকালেই তাঁহার রাজ্য উভয় ভ্রাতার মধ্যে বিভক্ত করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন। সে-কালের রাজারা প্রায়ই একাধিক বিবাহ করিতেন। দনুজমর্দ্দনের কয় বিবাহ ছিল, তাহা অবশ্য জানা নাই। কিন্তু যদি এই অনুমান সত্য হয় যে,

মহেন্দ্র দেব এবং রমাবল্লভ দেব দুই বৈমাত্রের ভ্রাতা, তাহা হইলে দনুজমর্দ্দন দেবের পক্ষে উভয় ভ্রাতার মধ্যে তাঁহার বিস্তীর্ণ রাজ্য বিভক্ত করিয়া দেওয়াই স্বাভাবিক। মহেন্দ্র দেব কিছুদিন ধরিয়া পাণ্ডু নগরে রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার আমলের প্রাপ্ত মুদ্রা হইতেই প্রকাশ। তিনি বড় জোর দুই বৎসর কাল পাণ্ডুয়ায় রাজত্ব করিয়াছিলেন। কারণ, উহার পর জালালউদ্দীনের নামাঙ্কিত মুদ্রাই পাওয়া যায়। প্রকৃত বিবরণ পাওয়া যায় না বলিয়াই অনুমিত হয় যে, তুর্কীদিগের সহিত যুদ্ধে মহেন্দ্র দেব পরাজিত এবং নিহত হইয়াছিলেন। মহেন্দ্র দেবের পরই আবার জালাল-উদ্দীন মহম্মদ শাহই (ওরফে যদু) পাণ্ডুয়ার রাজা হইয়াছিলেন, দনুজমর্দ্দনের অপর পুত্র রমাবল্লভই তখন চন্দ্রদ্বীপের রাজা হইয়াছিলেন। এইরূপ অনুমানই স্বাভাবিক। রাজা মহেন্দ্র দেব রায় ঠিক তাঁহার পিতৃপদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াই চলিতেন। তিনিও তাঁহার পিতার ন্যায় তাঁহার মুদ্রা বাঙ্গালা অক্ষরে এবং তারিখে শকাব্দ দিয়া প্রচারিত করেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কতকগুলি প্রাপ্ত মুদ্রা ব্যতীত তাঁহার অস্তিত্বের অন্য কোন প্রমাণই পাওয়া যায় নাই। মুসলমান-ঐতিহাসিকরা তাঁহার কথা লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই, ইহাতে মনে হয়, তাঁহার রাজত্ব স্বল্পস্থায়ী হইলেও শক্তিশালী ছিল। তাই মুসলমানগণ তাঁহার নাম পর্য্যন্ত করেন নাই, স্বল্পকালের জন্য পরাজয় লোক স্বতঃই ঢাকিয়া রাখিতে চাহে। দেখা যাইতেছে যে, দনুজমর্দ্দন দেবের বংশধরগণ চন্দ্রদ্বীপে বহুদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন। রমাবল্লভ দেব রায়ের পর তাঁহার পুত্র কৃষ্ণবল্লভ দেব রায় বহুদিন চন্দ্রদ্বীপে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাহার পর কৃষ্ণবল্লভের পুত্র এবং পৌত্রী যথাক্রমে হরিবল্লভ দেব রায় এবং জয়দেব রায় চন্দ্রদ্বীপে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। চন্দ্রদ্বীপ বহুদিন ধরিয়া নিজ স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল। চন্দ্রদ্বীপ পূর্ব্ববঙ্গে অবস্থিত। পূর্ব্ববঙ্গও নানা ভাগে বিভক্ত ছিল। যথা বঙ্গ, সমতট, বঙ্গাল, হরিকেন এবং চন্দ্রদ্বীপ। এই স্থানগুলির সীমা যে বরাবর একইরূপ নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহা মনে হয় না। সমতট এবং আধুনিক খুলনা, যশোহর এবং ২৪ পরগণার কিয়দংশ সময় সময় বঙ্গদেশের অন্তর্ভুক্ত হইত। চন্দ্রদ্বীপের অপর নাম বাখ্‌লা। *

* চন্দ্রদ্বীপ সন্দীপ নহে। সালিমাবাদ মহল্লা বিযুক্ত বর্ত্তমান বাখরগঞ্জ জিলাই চন্দ্রদ্বীপ। পূর্ব্বে বিক্রমপুর পরগণা চন্দ্রদ্বীপের অধীন ছিল।

দেখা যায় যে, তুর্কী আক্রমণকারীরা যত সহজে পশ্চিম-বঙ্গ অধিকৃত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তত সহজে পূর্ব্ববঙ্গ অধিকার করিতে পারেন নাই। সেন রাজগণের বংশধরগণ পশ্চিমবঙ্গে আধিপত্য হারাইয়া পূর্ব্ববঙ্গে আপনাদের স্বাধীনতা বহুদিন রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তুর্কীরা ঐ অঞ্চল বার বার আক্রমণ করিয়া পরাভূত হইয়া আসিয়াছিলেন। রাজা দনুজমর্দ্দন দেবের বংশধররাও উত্তরবঙ্গে আধিপত্য হারাইয়া পূর্ব্ববঙ্গে, বিশেষতঃ চন্দ্রদ্বীপে কয়েক পুরুষ ধরিয়া স্বীয় স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ পূর্ব্ববঙ্গের বড় বড় নদীর অস্তিত্বই তুর্কীদিগের পরাজয়ের অন্যতম কারণ হইয়াছিল। মধুমতীর পূর্ব্বতীর হইতে ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্বতীর পর্য্যন্ত এবং ইছামতী হইতে সমুদ্র-কূল পর্য্যন্ত রাজা দনুজমর্দ্দনের শাসনাধীন ছিল।

রাজা দনুজমর্দ্দন দেবের ইতিহাস বিস্মৃতি-গর্ভে বিলীন হইয়াছে বলিয়া অনেকে তাঁহার সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্তসিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং করিতেছেন। কেহ কেহ তাঁহাকে দনৌজামাধবের সহিত অভিন্ন এবং কেহ বা তাঁহাকে দনুজ রায়ের সহিত অভিন্ন মনে করিয়াছেন। আধুনিক অনুসন্ধান ফলে ঐ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বলিয়াই সপ্রমাণ হইয়াছে। তিনি যে এক জন প্রবল-পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন, সে বিষয়ে এখন আর কোন সন্দেহ নাই। কাল যদি তাহার উপর পতিত বিস্মৃতির অবগুণ্ঠন কতকটা ঘুচাইয়া দেন, তাহা হইলে সকল তথ্যই জানা যাইবে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, ইনি রাজা গণেশনারায়ণ ভাদুড়ীর এক জন প্রবল সহায় ছিলেন। যত দিন গণেশনারায়ণ জীবিত ছিলেন, তত দিন ইনি তাঁহারই সহায়তা করিয়াছিলেন। রাজা গণেশনারায়ণের পুত্র যদু যখন মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দুদিগের উপর ভীষণ অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তখন দনুজমর্দ্দন বিদ্রোহী হইয়া তাঁহাকে পাণ্ডুনগর হইতে বিতাড়িত করেন। এই উক্তির কোন বিশিষ্ট প্রমাণ নাই। ইহাও অনুমান মাত্র। কিন্তু এ অনুমান সত্য হইতে পারে। দনুজমর্দ্দন যে এক জন প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইঁহার জীবনকথা যে লোক ভুলিয়া গিয়াছে—ইহা বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে।

মহেন্দ্র দেবকে পরাজিত করিয়া জালালউদ্দীন মহম্মদ

একলাখী জালাল্-উদ্দীন্ মহম্মদ্ শাহের সমাধি, পাণ্ডুয়া, মালদহ

শাহ ও তাঁহার পুত্র দনুজমর্দ্দনের কীর্ত্তি সমস্ত বিলুপ্ত করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, দনুজমর্দ্দন দেব শাক্ত ছিলেন। তিনি সম্ভবতঃ তাঁহার রাজধানী পাণ্ডুয়ায় চণ্ডীদেবীর একটি সুন্দর মন্দির নির্ম্মিত করিয়াছিলেন। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, জালাল-উদ্দীনের পুত্র সমসুদ্দীন আহম্মদ শাহ দনুজমর্দ্দনের সেই মন্দির বিধ্বস্ত করিয়া তাহার স্থানেই একলাখী সমাধি-সৌধ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। একলাখী পাঠান-রাজত্বকালের একটি অতি সুন্দর স্থাপত্য-শিল্পের নিদর্শন।* এই একলাখী ইমারতটি জালালউদ্দীন মহম্মদ শাহের সমাধি বলিয়াই খ্যাত। র‍্যাভেন্‌স (Ravenshaw) বলেন, উহা সুলতান গিয়াসউদ্দীন তাঁহার পত্নী এবং পুত্রবধূর সমাধি-মন্দির। রাখাল বাবু দেখাইয়াছেন যে, তাহা হইতেই পারে না। তিনি লিখিয়াছেন যে, "বাঙ্গালা দেশে গিয়াসউদ্দীন উপাধিধারী তিন জন মুসলমান রাজা ছিলেন। বল্‌বনের প্রপৌত্র গিয়াসউদ্দীন বহাদর শাহ বন্দিরূপে দিল্লীতে প্রেরিত হইয়াছিলেন, সিকন্দর শাহের পুত্র গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ ঢাকা জিলার মগরা পাড়া গ্রামে সমাহিত আছেন এবং হুসেন শাহের অপর পুত্র গিয়াস-উদ্দীন মহম্মদ শাহ ভাগলপুরের নিকটে কহল গাঁওয়ে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। সুতরাং একলাখী জালালউদ্দীন মহম্মদ শাহের সমাধি হওয়াই অধিকতর সম্ভব। (বাঙ্গালার ইতিহাস ২য় খণ্ড ১৮৩ পৃষ্ঠা)। এই একলাখী সৌধে হিন্দু এবং বৌদ্ধ-স্থাপত্যের চিহ্নাঙ্কিত বহু

* Cunningham's Report of the Archiological survey of India Vol x v. p 88—90.

মিঃ এক্‌সেল, এইচ্ অক্‌সহলম্ নামক এক জন য়ুরোপীয় দীর্ঘকাল নরওয়ে বসবাস করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতাও চিকিৎসক হিসাবে বহুকাল নরওয়ের গ্রাম্য-জীবন উপভোগ করিয়াছিলেন। মিঃ অক্‌সহলমের জনৈক নরওয়েবাসী পিতৃ-বন্ধু সুইডেন সীমান্তে ৭৫ বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি জন্মস্থান হইতে অন্যত্র গমন করিয়াছিলেন। অন্য উপত্যকাভূমির অধিবাসিনী কোনও কর্ম্মনিপুণা তরুণীকে তিনি বিবাহ করেন। এই দম্পতি অতি দুর্গম পার্ব্বত্য অঞ্চলে নূতন জমির আবাদ করেন। সেই স্থান কৃষিক্ষেত্রের উপযোগী ছিল না। কিন্তু তাঁহারা প্রাণপাত পরিশ্রমের ফলে এই পার্ব্বত্যভূমিতে সোণা ফলাইয়াছিলেন। সুদীর্ঘ ৫০ বৎসর কঠোর পরিশ্রমের পর ইদানীং তিনি সন্নিহিত স্থানসমূহের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ধনী। তাঁহাদের আটটি সন্তান। প্রত্যেককে তাঁহারা বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শিখাইয়া বিভিন্ন শ্রম-শিল্প বা কারিগরী বিদ্যায় দক্ষ করিয়া তুলিয়াছেন। এই বৃদ্ধ এখনও তাঁহার পুরাতন কৃষিক্ষেত্র ত্যাগ করেন নাই। সেইখানেই তাঁহার বাসভবন রহিয়াছে, তবে প্রত্যেক পুত্র ও কন্যার জন্য সেই উপত্যকাভূমিতে তিনি স্বতন্ত্র কৃষিক্ষেত্র ক্রয় করিয়া দিয়াছেন।

পাহাড়ের উপর হইতে তারে ঝুলাইয়া দুগ্ধপাত্র নীচে নামান

মিঃ অক্‌সহলম্ লিখিয়াছেন, "এই পিতৃবন্ধুর জীবনে সাফল্যের প্রধান কারণ, তাঁহার একনিষ্ঠ শ্রম এবং পারিবারি[ক] বন্ধনের দৃঢ়তা। তাঁহার পরিবারের প্রত্যেক নরনারী পর[স্]পরকে সহযোগিতা করিবার জন্য উন্মুখ। তাঁহারা তাঁহাদিগে[র] কৃষিক্ষেত্রে যাবতীয় খাদ্যশস্য উৎপাদন করিয়া থাকেন শুধু কফি, চিনি ও লবণ উৎপাদিত হয় না। একটি হ্রদে এই পরিবারের মৎস্য ধরিবার স্বত্ব আছে। বৎসরে সে[ই] বাবদে তাঁহারা তিন সহস্রাধিক মুদ্রা পাইয়া থাকেন তাঁহাদিগের গৃহপালিত পশু হইতে দুগ্ধ, মাখন, পনী[র] প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হইয়া থাকে। শীতকালে তাঁহারা গৃহে নৌকা, মাছ ধরিবার উপকরণাদি প্রস্তুত করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত পরিধেয় বস্ত্র, জুতা এব[ং] কৃষিক্ষেত্রের উপযোগী যন্ত্রাদিও তাঁহারা ঘরে তৈয়ার করিয়া থাকেন। পুত্রদিগের মধ্যে এক জন দক্ষ সূত্রধর, এক জ[ন] কর্ম্মকার, অপর জন বৈদ্যুতিক বিষয়ে দক্ষ। ইঁহাদে[র] সমবেত চেষ্টায় সেই অঞ্চলের সকলে[র] সুবিধার জন্য জলস্রোতের সাহায্যে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন করি[বার] একটি কল সৃষ্ট হইয়াছে। গৃহি[ণী] এবং তাঁহার কন্যারা অবসরকালে বস্ত্র-বয়ন করিয়া থাকেন। পুত্রগ[ণ] শিকার প্রভৃতির সাহায্যে অতিরিক্ত অর্থও উপার্জ্জন করিয়া থাকে।"

"নরওয়েতে কুটীর এবং অট্টালিকা আছে, কিন্তু কোন প্রাসাদ নাই।"—এ[ই] কথাটা প্রত্যেক পর্য্যটকের রচনায় দেখিতে পাওয়া যায়। কথাটা খুবই সত্য। ইহা হইতে নরওয়ের আর্থিক সামঞ্জস্যের পরিচয় পাওয়া যায়। সাধারণতঃ প্রত্যেক কৃষিক্ষেত্রের পরিমাণ সাড়ে নয় একর জমি আড়াই শত একর পরিমাণ কৃষিক্ষেত্রের সংখ্যা সমগ্র নরওয়েতে কুড়ির অধিক নহে। খুব ধনবানের সংখ্যা অতি অল্প। সকলেই করভার বহন করিয়া থাকে।

কৃষিক্ষেত্র বণ্টন ব্যবস্থায় উত্তরাধিকার আইন প্রযুক্ত হইয়া থাকে। পুরুষ ও নারী সম্বন্ধে এই আইন সমভাবে

প্রযুক্ত হয়। সাধারণতঃ কোন পরিবারের জ্যেষ্ঠপুত্র কৃষিক্ষেত্রের উত্তরাধিকারী হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাকে তাহার সহোদর ও সহোদরাগণকে উপযুক্ত মূল্য প্রদান করিতে হয়। বার্দ্ধক্যবশতঃ কোন কৃষক-দম্পতি যদি মনে করে যে, তাহারা যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছে, —এখন অবসর-জীবন যাপন করিতে চাহে, তখন জ্যেষ্ঠপুত্র কৃষিক্ষেত্রের মালিক হয়। কিন্তু বৃদ্ধ পিতামাতা যত দিন জীবিত থাকিবে, তত দিন তাহাদিগের ভরণপোষণের ভার জ্যেষ্ঠপুত্রকে অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে।

নরওয়ের সর্ব্বত্রই নরনারীর চরিত্রগত সাধুতা বৈশিষ্ট্য-ব্যঞ্জক। অবশ্য দেশে চোর ডাকাত আছে। কিন্তু তাহাদিগের নাম পুলিসের খাতায় লিপিবদ্ধ থাকে। নরওয়ে-ভ্রমণকারীরা সকলেই একথা জানেন যে, শত শত কৃষক-পরিবারকে রাত্রে দরজায় খিল দিয়া ঘুমাইতে হয় না।

যে কোনও বিদেশীর কথায় নরওয়েবাসীরা বিশ্বাস স্থাপন করিতে অভ্যস্ত। মিঃ অক্সহলম্ ভ্রমণ ব্যপদেশে এক উপত্যকা-ভূমিতে উপনীত হইয়াছিলেন। সেখানে সম্পূর্ণ অপরিচিত হইলেও, তিনি একটি পুরাতন ধর্ম্মমন্দির দর্শনের অভিলাষ প্রকাশ করিলে, উহার চাবি তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছিল। এই ধর্ম্মমন্দিরটি চতুর্দশ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত। ইহাতে বহু মূল্যবান দ্রব্যাদি ছিল। পর্য্যটক যখন প্রশ্ন করেন যে, ধর্ম্ম-মন্দিরের চাবি উহার অভ্যন্তরে একটি পেরেকের উপর কেন ঝুলিতেছে? অন্য কেহ অনায়াসে উহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া মূল্যবান দ্রব্যাদি অপহরণ করিতে পারে। তখন তিনি উত্তরে জানিতে পারেন যে, উক্ত উপত্যকায় কেহ কখনও চুরি করে না।

চেয়ারের আকারের 'স্কী'

তরুণী শিঙা-ধ্বনিতে মেষপালকে ডাকিতেছে
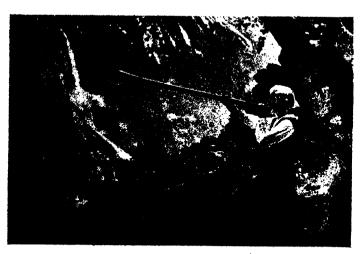
নরওয়েবাসীদিগের সত্যনিষ্ঠা ও সাধুতা সম্বন্ধে মিঃ অক্স্‌হলম্ আরও কতকগুলি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। মোটরযোগে ভ্রমণ-কালে, তাঁহার গাড়ীর জন্য গ্যাসোলিনের প্রয়োজন হওয়ায় তিনি সমগ্র ট্যাঙ্কটি ভরিবার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন।

ছিলেন। যে লোকটি তৈল ভরিতেছিল, সে তাহাকে বলিল, এমন কার্য্য যেন তিনি না করেন। কারণ, প্রতি গ্যালনে এখানকার তৈলের দাম ৩৩ সেণ্ট পড়িবে। কিন্তু উপত্যকার অপর পারে ২৮ সেণ্ট মাত্র লাগিবে। সেখানে চালানী ও সরঞ্জামী খরচ লাগিবে না বলিয়াই তাহারা প্রতি গ্যালনে পাঁচ সেণ্ট কম করিয়া লইয়া থাকে।

কোনও বিদেশীকে ঠকান উচিত নহে, [illegible] নরওয়ের

শিরাঞ্জার ফোর্ড পাহাড়ের নিম্নস্থ পার্ব্বত্য নদী

সর্ব্বত্র প্রতিপালিত হইয়া থাকে। এক সুদূর গ্রামের কোন পান্থনিবাসে মিঃ অক্‌স্‌হলম্‌ আশ্রয় লইয়াছিলেন। ভোর ৭টার সময় তাঁহাকে পান্থনিবাস ত্যাগ করিতে হয়। উহার পরিচালক তখন শয্যায় শায়িত ছিলেন। পরিচারিকার প্রমুখাৎ তিনি মিঃ অক্‌স্‌হলমকে বিল তৈয়ার করিতে অনুরোধ করেন। তিনি বিল তৈয়ার করিয়া তৎসহ মূল্য পাঠাইলে পরিচালক ৫০ সেণ্ট ফিরাইয়া দেন। কারণ, প্রাতরাশকালে অত ভোরে মাছের তরকারী দেওয়া হয় নাই বলিয়া বিল হইতে উহা বাদ দেওয়া হইয়াছিল।

নরওয়ের কৃষিজীবীরা সাধারণতঃ নিয়মানুগ এবং সাধুতার ভক্ত হইলেও, তাহাদিগের চরিত্রে বিবাদপ্রিয়তার লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা অত্যন্ত জেদী। এজন্য, যে যত মোকদ্দমা করিয়াছে, তাহার প্রতিপত্তি তত অধিক, এইরূপ ধারণা নরওয়েবাসীদিগের মধ্যে প্রবল। অতি সামান্য কারণে তাহারা অন্যের নামে মোকদ্দমা করিয়া থাকে।

মিউনিসিপাল বোর্ডের সংসৃষ্ট খ্যাতনামা নরনারীরা এই সকল মামলার নিষ্পত্তি করিয়া দেন। তাঁহারা বাদী ও প্রতিবাদী উভয় পক্ষকে ডাকাইয়া তাহাদিগের বক্তব্য শ্রবণ করেন। তার পর মামলার নিষ্পত্তি করিয়া দেন।

একটি মামলার বিবরণ অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। এক জন কৃষকের কুকুর অপর কৃষকের ট্রাউজার ছিঁড়িয়া দিয়াছিল, ইহা লইয়াই মামলার উৎপত্তি। বিচারফল চমৎকার! বিচারক রায় দিলেন, যে কৃষকের কুকুর ঐ কার্য্য করিয়াছে, তাহাকে অপর কৃষককে ৫ ডলার দিতে হইবে। কারণ, কুকুরের মারফত অপরের অধিকৃতস্থানে সে অনধিকার প্রবেশ করিয়াছিল। উভয়-পক্ষ পরস্পরের করকম্পন করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে বিদায় গ্রহণ করিল।

নরওয়ের অধিবাসীদিগকে আপাত দৃষ্টিতে বড়ই ম্লান ও বিমর্ষ দেখায়। ইহার প্রধান কারণ, বৎসরের অধিকাংশ সময় তাহারা অতি অল্পকাল সূর্য্যালোক দেখিতে পায়। কোন মাসে সূর্য্য সম্পূর্ণ অদৃশ্য থাকে। ইহাতে মানুষে

জাতীয় পরিচ্ছদে প্রণয়ী-যুগল

বিবাহসজ্জা-ভূষিতা কনে

বিবাহসভায় নরনারীর নৃত্য-গীত

রূপার জিনিষের দোকান—আলমারী বন্ধ রাখায় প্রয়োজন নাই

স্তূপীকৃত শালিগুচ্ছ

সুসজ্জিত নরওয়েবাসী

স্বজন-বেষ্টিত বি:য়র কনে ধর্ম্মমন্দিরের পথে

রাজা সপ্তম হাকেন্ ও যুবরাজ-পার্লামেণ্টের পথে

মা ও মেয়ে গির্জ্জার পথে

বালক-বালিকাগণের পুষ্পচয়ন

নরওয়ের অস্‌লো বন্দর

মনের উপর বিষণ্ণতার একটা ছাপ পড়া খুবই স্বাভাবিক।

নরওয়েবাসীদিগের মধ্যে এইরূপ কুসংস্কার আছে যে, কৃষিক্ষেত্রের বৃক্ষের নিম্নে খর্ব্বকায় পিশাচ-বিশেষ বাসা বাঁধিয়া থাকে। ইহাদিগের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য বড় দিনের সময় কৃষকগণ বৃক্ষের চারি দিকে বিয়ার মদ্য ঢালিয়া দেয়।

এক জাতীয় চারা গাছ কোন কোন কৃষক-পরিবারের অঙ্গনে রোপিত হয়। বহু যত্নে তাহাতে জলসেচ করা হইয়া থাকে। এই গাছ যদি শুকাইয়া যায়, তাহা হইলে পরিবারের শান্তিও সেই সঙ্গে অন্তর্হিত হইবে।

কৃষক-পরিবারের আসবাবপত্র সবই প্রায় গৃহে নির্ম্মিত হইয়া থাকে। চেয়ার, বেঞ্চ, টেবল, খাট প্রভৃতি সবই গৃহস্থরা কাষ্ঠ হইতে নির্ম্মাণ করে।

তবে কিছুদিন হইতে কোন কোন কৃষক-পরিবারে আধুনিক সাজ-সজ্জার, প্রভাব দেখা দিয়াছে। তাহার ফলে পুরাতন অন্তঃপুরের সে শ্রী আর নাই।

নরওয়ে অঞ্চলে এপ্রিল হইতে অক্টোবর মাসের শেষ পর্য্যন্ত কৃষিকার্য্য চলে। গ্রীষ্মকালে অনেকক্ষণ সূর্য্যের আলোক থাকে, এজন্য শাকসব্জি প্রভৃতি বেশ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

পার্ব্বত্য-ভূমি হইলেও নরওয়েতে কৃষিকার্য্যের জন্য যন্ত্রাদির ব্যবহার প্রচুর ভাবে হইয়া থাকে। অধিকাংশ যন্ত্র আমেরিকা হইতে আসে। এই দেশে যব, বার্লি, রাই, ওট্ প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হইলেও, বিদেশ হইতে ঐ সকল শস্যের কিছু কিছু আমদানী করিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে।

নব-বিবাহিত দম্পতি

গৃহপালিত পশুদিগের জন্য খড় বা শুষ্ক তৃণের বিশেষ প্রয়োজন আছে। নরওয়েতে আলু, শালগম, ওলকপি প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হয়। তবে যে বার অকালে তুষারপাত আরম্ভ হয়, সে বার ঐ সকল শস্য নষ্ট হইয়া যায়। গত ২৫ বৎসর ধরিয়া এই দেশে ফল ও তরকারী বহুল পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া আসিতেছে।

প্রকৃত প্রস্তাবে পাহাড়ের উপর যাবতীয় নরওয়েজীয়

কৃষিক্ষেত্রের জন্য স্বতন্ত্র গ্রীষ্মকালীন ক্ষেত্র আছে। তথায় গাভী ও ছাগী প্রভৃতিকে জুন মাসে লইয়া যাওয়া হইয়া থাকে। এই সকল ক্ষেত্রে নারীরাই কর্মকর্ত্রী। তাহারা দুগ্ধ হইতে মাখন, পনীর প্রভৃতি উৎপাদন করিয়া থাকে। এইরূপ পার্ব্বত্য কৃষিক্ষেত্রের মালিকদিগের মধ্যে অনেকেরই শিকার করিবার ও মৎস্য ধরিবার স্বত্ব আছে। স্বত্বাধিকারীরা এই অধিকার শিকারীদিগকে ইজারা দিয়া থাকে

নরওয়ের অরণ্যে ভল্লুকের সংখ্যা ইদানীং হ্রাস পাইয়াছে। পূর্ব্বে ভল্লুকের এত প্রাচুর্য্য ছিল যে, অনেক সময় তাহারা মানুষ ও গৃহপালিত পশুর জীবনকে বিপন্ন করিয়া তুলিত। মৃগয়ার পশু হ্রাস পাইলেও, অরণ্যমধ্যে, হরিণ, খরগোস্, শৃগাল প্রভৃতি আরণ্য পশু-শিকারে শিকারীরা আনন্দলাভ করিয়া থাকে। হ্রদসমূহেও বিবিধ জাতীয় মৎস্য পাওয়া যায়।

নরওয়ের অশ্ব অতি চমৎকার। এই টাটু ঘোড়া জাতীয় খর্ব্বকায় অশ্ব কোথা হইতে প্রথমে নরওয়েতে আসিয়াছিল, তাহার কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। এ সম্বন্ধে নানাবিধ জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। কিন্তু তাহা হইতে ঐতিহাসিক সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। এই জাতীয় অশ্বের উচ্চতা অতি অল্প। অশ্বের কেশরের কাছ হইতে পশ্চাৎভাগ পর্য্যন্ত একটি কাল রেখা দেখিতে পাওয়া যায়। সম্মুখের পদদ্বয়েও অনুরূপ কাল ডোরা কাটা আছে।

কিছুকাল পূর্ব্বে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কোনও কৃষক নরওয়ে হইতে এই জাতীয় অশ্ব লইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু সেজন্য তাঁহাকে অনুতাপ করিতে হইয়াছিল। কারণ, অশ্বগুলি বিদেশে যাইবার পর মন-মরা হইয়া পড়িয়াছিল। তাহা ছাড়া ইণ্ডিয়ানরা অশ্বদেহে কাল দাগ দেখিয়া ঘোড়াগুলি চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছিল। ছাগদুগ্ধ হইতে নরওয়ের প্রসিদ্ধ পনীর প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই পনীর অত্যন্ত দুষ্পাচ্য। এজন্য ননীর সহিত পনীর মিশাইয়া লইতে হয়। তাহাতে ছাগদুগ্ধের বোট্‌কা গন্ধ অনেকটা হ্রাস পাইয়া থাকে।

নৌকারোহী বরযাত্রীর দল

ভেড়ার লোমের সহিত ছাগ-লোম মিশাইয়া পায়ের মোজা তৈয়ার হইয়া থাকে। এই মোজা যেমন শীত-নিবারক, তেমনই সহজে জলে ভিজিয়া যায় না।

নরওয়ের হাউণ্ড জাতীয় কুকুরগুলি যেমন বলিষ্ঠ, তেমনই সাহসী। ইহার লাঙ্গুল রোমে আবৃত। এই কুকুরের

তাচারে অন্যান্য কুকুর কাছে পৌঁসিতে পারে না। শিকারে ইহাদের দক্ষতা অসাধারণ।

নরওয়েজীয় কৃষকদিগের কৃষিক্ষেত্রের আকারের তুলনায় তাহারা ধনী বলিয়া মনে হয়। অনেকের কৃষিক্ষেত্র হইতে এমন উপার্জ্জন হয় না, যাহাতে তাহারা পরিবার প্রতিপালন করিতে পারে। কিন্তু তাহারা অন্যান্য কার্য্য করিয়া ধন অর্জ্জন করিয়া থাকে। সহস্র সহস্র কৃষক মৎস্য পরিবার ব্যবসায় করিয়া থাকে। অরণ্য হইতে বাহাদুরী কাঠের কারবারও অনেকে করিয়া থাকে। তাহারা অরণ্যমধ্যে কাঠের ঘর নির্ম্মাণ করিয়া তথায় কার্য্য-ব্যপদেশে বাস করিয়া থাকে। অনেকে জ্বালানী কাষ্ঠ, কাগজের জন্য কাঠের মণ্ড এবং করাতী কাঠের ব্যবসা করিয়া থাকে। যদি দৈবাৎ কোন আকস্মিক দুর্ঘটনায় ক্ষেত্রে শস্যহানি ঘটে, তাহাতে ইহাদিগের পরিবারবর্গ অনাহারে থাকে না। নরওয়ের কাগজ-শিল্প সুপ্রসিদ্ধ।

পার্ব্বত্যভূমিতে কৃষিক্ষেত্র

কোন কোন উপত্যকা-ভূমিতে, বংশপরম্পরানুক্রমে সেক্‌রার কায চলিয়া আসিতেছে। রৌপ্যের কার্য্যে যে নমুনা ব্যবহৃত হয়, তাহাতে প্রাচীনতম যুগের আদর্শ বিদ্যমান। এরূপ সূক্ষ্মতম কারুকার্য্য য়ুরোপের অন্যত্র দেখা যায় না। তামার কাযেও কোন কোন উপত্যকা-ভূমির শিল্পীরা বিশেষ দক্ষতা প্রকাশ করিয়া থাকে। শীতকালে তামার কেৎলী, কফির পেয়ালা এবং পুষ্পাধার প্রভৃতি নির্ম্মিত হয়। সমগ্র দেশে ঐ সকল দ্রব্য বিক্রীত হইয়া থাকে

উপত্যকায় শুষ্ক তৃণ

নরওয়ের দারু-শিল্পের কার্য্য অতি প্রাচীন যুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে। শীত ঋতুতে যখন অন্য কোন বাহিরের কায অসম্ভব, সেই সময় সূত্রধরগণ কাঠের উপর নানা প্রকার কারুকার্য্য করিয়া থাকে। ইহাতে শিল্পীদিগের মৌলিক কল্পনার আদর্শ দেখিতে পাওয়া যাইবে।

ঢালাই লোহার কাযেও নরওয়েজীয়রা বিশেষ দক্ষতার

পরিচয় দিয়া থাকে। ঢালাই লোহার দেওয়ালগিরি, ঝাড়, কব্জা এবং অগ্নিকুণ্ডে ব্যবহারের উপযোগী বহু দ্রব্য পল্লী-গ্রামের কামারগণ তৈয়ার করিয়া থাকে। সমগ্র

নরওয়ের ঘোড়ার গাড়ী

পাহাড়তলীর কুটীর এবং ছাগদল

নরওয়ের বাজারে এই সকল দ্রব্যের চাহিদা আছে। নারী ও বালিকারা বৃক্ষত্বক্, বাদাম এবং নানাবিধ গাছ-গাছড়া প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া থাকে। ঐ সকল দ্রব্য হইতে তাহারা অতি দুষ্প্রাপ্য এবং সুদৃশ্য রং বাহির করিয়া থাকে। এই উদ্ভিজ্জ রং দীর্ঘকাল স্থায়ী।

চিকনের কাযে রমণীরা বিশেষ দক্ষ। হাতে বোনা সোয়েটার, টুপী, গলাবন্ধ, মোজা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নমুনায় তৈয়ার হইয়া থাকে।

কুটীরশিল্প নরওয়েবাসীদিগের জীবনযাত্রায় প্রচুর সহায়তা করিয়া থাকে। নানাবিধ কুটীরশিল্পের জন্য নরওয়ের কোন লোক কাহারও দয়া-দত্ত দানের উপর সাধারণতঃ নির্ভর করে না।

নারীরা যাবতীয় ব্যাপারে অগ্রগণ্য। সকল প্রকার বিষয়েই নারীদিগের প্রচুর অধিকার আছে। নারীর ভোটাধিকার ব্যাপারে নরওয়ে সমগ্র য়ুরোপের পুরোভাগে অবস্থিত। রাষ্ট্র-নীতিক ব্যাপারে এ দেশে নারী ও পুরুষে ভেদাভেদ নাই। পুরুষের সহিত নারী সমান অধিকার সম্ভোগ করিয়া থাকে।

নৌ ও সেনাবিভাগ ব্যতীত সর্ব্বত্রই নরওয়েজীয় নারী পুরুষের সহিত সমান অধিকার সম্ভোগ করিতেছে। পার্লা-মেণ্টে নারী-সদস্য আছেন। সরকারী কার্য্যেও নারী ক্ষমতা পরিচালনা করিতেছেন। বড় বড় কৃষিক্ষেত্র নারীর দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। ব্যবসায়-ক্ষেত্রেও নারী-নেত্রীর অভাব নাই।

নরওয়েজীয় কৃষিক্ষেত্রসমূহ রবিবারে বন্ধ থাকে। শনিবার অপরাহ্নকালে সমগ্র পরিবার রন্ধনাগারের শৃঙ্খলা-বিধানে নিযুক্ত হয়। তখন সাবান ও বালুকার দ্বারা রন্ধনশালার কক্ষতল ধৌত করা হয়। অগ্নিকুণ্ডের ধারে শুষ্ক কাষ্ঠ প্রভৃতি সজ্জিত করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা আছে। রবিবার দিবস কেহ কোন কার্য্য করিবে

না। শনিবারের রাত্রিতে যুবক-যুবতীরা স্ব স্ব সামাজিক মিলন-ক্ষেত্রে সমবেত হইয়া নৃত্য-গীতাদি করিয়া থাকে।

প্রত্যেক উপত্যকার অধিবাসীদিগের মধ্যে স্বতন্ত্র প্রকার নৃত্য ও গান-বাজনার প্রচলন আছে। রচিত সঙ্গীতের মধ্যেও মৌলিকতা পাওয়া যায়।

একটি পার্ব্বত্য নৃত্য সম্বন্ধে দীর্ঘকাল হইতে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। কোন এক নৃত্যে একটি নূতন সুর সংযোগের ব্যবস্থা হইয়াছিল। এই সুরের উন্মাদনা এমন মাত্রায় পৌঁছিয়াছিল যে, সমবেত পুরুষদিগের মধ্যে বিরোধ ঘনীভূত হইয়া উঠে। তাহার ফলে সংঘর্ষ এবং অনেকের মৃত্যু ঘটে। কতিপয় নর্ত্তক প্রাণত্যাগ করিলে, দেখা যায় যে, বংশী-বাদক স্বয়ং শয়তান। এই নৃত্য "শয়তান নৃত্য" বলিয়া পরিচিত। এখনও সেই সুর নৃত্য-কালে ঝঙ্কৃত হইয়া থাকে।

নরওয়ের বৃদ্ধ মৎস্য-শিকারী

রোলডাল্ উপত্যকা-ভূমির অধি-বাসীরা এই দাবী করিয়া থাকে যে, তাহারা পলাতক ফরাসীদিগের বংশধর। কিংবদন্তী অনুসারে তাহারাই এই উপত্যকাভূমি আবিষ্কার করিয়া তথায় বসবাস করিতে থাকে। কিংবদন্তী অনুসারে ইহা জানা যায় যে, তাহাদিগের ধর্ম্মমন্দির-সংলগ্ন যে ক্রুশবিদ্ধ মূর্ত্তি জাল দিয়া সমুদ্রগর্ভ হইতে একজন ধীবর টানিয়া তুলে। কিন্তু উহা এত ভারী বোধ হইয়াছিল যে, ধীবর টানিয়া তুলিবার সময় নরওয়ের যাবতীয় খৃষ্ট-মন্দিরের দোহাই দিতে থাকে। সে যখন রোল্ডাল্ ধর্ম্মমন্দিরের নাম উচ্চারণ করিয়াছিল, তখন সেই ক্রুশবিদ্ধ মূর্ত্তি এমন লঘু মনে হইয়াছিল যে, সে অনায়াসেই উহা তাহার নৌকার উপর টানিয়া তুলিয়াছিল।

এই ঘটনার অল্পকাল পরে এমন রটিয়া গেল যে, খৃষ্টের মুখমণ্ডলের ঘাম রোগ নিরাময়ের অমোঘ ঔষধ। এজন্য বহু শতাব্দী ধরিয়া দেশের সর্ব্বত্র হইতে নরনারী এই ধর্ম্মমন্দিরে রোগ-আরোগ্য-কামনায় আসিয়া থাকে। ধর্ম্মমন্দিরে সহস্র সহস্র অনুশাসনলিপি ক্ষোদিত আছে। তাহা হইতে বুঝা যায় যে, বহু তীর্থযাত্রী এখানে সমবেত হইত।

খৃষ্টের বেদীমূলে এগার জন খৃষ্টশিষ্যের মূর্ত্তি দেখিয়া দর্শকগণ চমৎকৃত হইয়া থাকেন। দ্বাদশ জন শিষ্যের পরিবর্ত্তে একাদশ জন শিষ্য কেন হইল, ইহার উত্তরে শুনা যায় যে, এই ধর্ম্মমতাবলম্বীরা জুডাসের সহিত কোন সম্পর্ক রাখিতে চাহেন না।
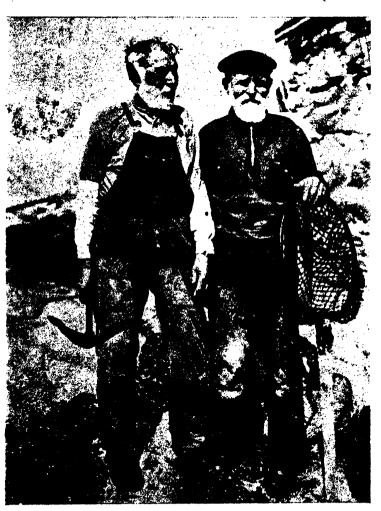
নরওয়ের ছুটীর সংখ্যা অল্প। তন্মধ্যে খৃষ্টমাস পর্ব্ব

উপলক্ষে উৎসব বেশ জাঁকিয়া হইয়া থাকে। পর্ব্বের কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্ব হইতে পিঠা ও অন্যান্য মিষ্ট প্রস্তুত হয়। বীয়ার মদ্যও সেই সময়ে তৈয়ার হইয়া থাকে। কৃষকগণ পরিমিতভাবে সুরা সেবন করিয়া থাকে। বড়দিন, বিবাহ উৎসব এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া উপলক্ষে তাহারা নিয়মিতভাবে সুরা সেবন করে। সাধারণতঃ অন্য সময় তাহারা সুরা পান করে না।

নৌকা-যোগে মোটর বাসের নদী পার

নরওয়ের গমের ক্ষেত্র

খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে, নরওয়েতে যখন পৌত্তলিক ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত ছিল, তখন ধর্ম্মসংক্রান্ত উৎসবে অশ্ববলি প্রদত্ত হইত এবং নরনারীরা অশ্বমাংস ভক্ষণ করিত। ৯ শত বৎসর হইল, নরওয়েতে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে। এখন কোন লোকই অশ্বমাংস গ্রহণে স্পৃহা প্রকাশ করে না।

কৃষিক্ষেত্রসমূহে ব্যায়াম-ক্রীড়ার বিশেষভাবে প্রচলন আছে। 'স্কী' নরওয়ের সর্ব্বত্র প্রধান ক্রীড়া। শুধু ক্রীড়া নহে—এক স্থান হইতে অন্যত্র মাল চালান দিবার সময়ও স্কীর সাহায্য গৃহীত হইয়া থাকে। পার্ব্বত্য অঞ্চলে, স্কী-দৌড়ে যাহারা বিশেষ দক্ষতা অর্জ্জন করিয়াছে, তাহারা সাড়ে ৩ ঘণ্টায় ৩০ মাইল অতিক্রম করিতে পারে।

অস্লোতে প্রতিবৎসর স্কী-ক্রীড়ার নৈপুণ্য প্রদর্শিত হইয়া থাকে। অন্য প্রকার ক্রীড়াও নরওয়েতে প্রচলিত আছে।

এই দেশে ৭৯ হাজার ৮ শত মোটর গাড়ী আছে। প্রত্যেক ৩৬ জনে একখানি মোটর গাড়ী হিসাবে হয়। ট্রাম্, বাস, মোটরগাড়ী সবই আমেরিকায় প্রস্তুত। বড় বড় কৃষিক্ষেত্রে মোটর গাড়ী দেখা যায়, কিন্তু ছোট ছোট কৃষিক্ষেত্রের মালিকরা মোটর গাড়ী রাখিবার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে না। উহাকে তাহারা বিলাস বলিয়া মনে করে।

"স্পারক্স্টোটিং" নামক এক প্রকার যান নরওয়েতে দেখা যায়। ইহা দেখিতে কেদারার মত। দুইখানি ইস্পাতের উপর উহা অবস্থিত। কেদারার পশ্চাতে চালক দাঁড়াইয়া থাকে। হাতলের বাঁট সে ধরিয়া রাখে। চালক তাহার এক চরণের দ্বারা উহা পরিচালিত করে—অসম্ভব দ্রুতবেগে চেয়ারগাড়ী ধাবিত হইতে থাকে। একজন আরোহী ও কিছু মাল

লইয়া এই যানযোগে যাতায়াত করা যায়। পল্লীগ্রাম অঞ্চলে এই জাতীয় যানের বিশেষ প্রচলন।

ভূত, প্রেত, দানব প্রভৃতি সম্বন্ধে নরওয়ের অধিবাসীরা বর্ত্তমানযুগেও কুসংস্কার মুক্ত হইতে পারে নাই। বড় দিনের সময় কৃষকরা ভোজের পূর্ব্বে গোলাঘরের মধ্যে আহার্য্য পানীয় রাখিয়া দেয়। "নিমে" নামক বামন ভূত উহা ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হয় বলিয়া তাহাদিগের বিশ্বাস।

শীতকালে, বেলা থাকিতে শাদা কাপড় আন্দোলিত করা নিষিদ্ধ। কারণ, যাহারা শ্বেত বস্ত্রের ইঙ্গিত অগ্রাহ্য করিয়া সমুদ্রে যানপরিচালন করিতে থাকে, তাহারা অকস্মাৎ নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে। এখনও এইরূপ কুসংস্কার তাহাদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে।

বর্ত্তমানের বিদ্যালয়-শিক্ষা-পদ্ধতি দীর্ঘকাল ধরিয়া নরওয়েতে প্রচলিত। অভিজাত সম্প্রদায়ের নরনারী ব্যতীত যখন কিতাবতী শিক্ষা বহু য়ুরোপীয় দেশে প্রচলিত হয় নাই, তখন হইতেই নরওয়েবাসীরা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া সকলকে শিক্ষা প্রদান করিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

নরওয়ের যাবতীয় বিদ্যালয় রাষ্ট্রের অনুশাসনের অধীন। নরওয়েতে এমন কোন পরিবার নাই, যাহারা বিদ্যালয়ে পাঠের সুযোগ হইতে বঞ্চিত। নরওয়েতে অশিক্ষিতের সংখ্যা শূন্য বলিলেই চলে। রাষ্ট্র এবং মিউনিসিপ্যালিটিসমূহ দেশরক্ষা সম্বন্ধে যত অর্থ ব্যয় করেন, শিক্ষার জন্য তাহার দ্বিগুণ ব্যয় করিয়া থাকেন। যাহারা সমর্থ, মাধ্যমিক শিক্ষায় তাহারাই শুধু বিদ্যালয়ের বেতন প্রদান করিয়া থাকে।
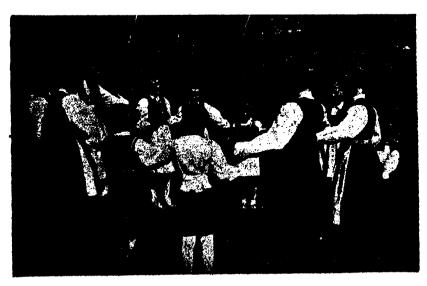
অস্‌লো বিশ্ববিদ্যালয়, ট্রনচিমের কারিগরী বিদ্যালয় এবং 'আস্'এর কৃষি-কলেজ রাষ্ট্রের ব্যয়ে পরিচালিত।

নরওয়েজীয় মেরু-আবিষ্কারকের প্রতিমূর্ত্তি

শস্যক্ষেত্রে বালক-বালিকাগণের নৃত্য-গীত

এখানে কোনও ছাত্রকে অধ্যয়নের ব্যয় দিতে হয় না। নরওয়ের বহু ছাত্র কোন না কোন ব্যবসায় শিক্ষা করিয়া থাকে। পরবর্ত্তী জীবনে যাহাই ঘটুক না কেন,

নরওয়েজীয় গাভী ও তরুণী

প্যাগোডার আকারে নরওয়ের গির্জ্জা

তাড়াতাড়ি বিদ্যালয়ে যাইবার জন্য বালক-বালিকা, তরুণ-তরুণী ছাত্র-ছাত্রীরা স্কীর সাহায্যে বিদ্যালয়ে দ্রুতগতিতে যাত্রা করে।

অনেক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদিগকে বিনা অর্থে জলখাবার দেওয়া হয়। কোন কোন জেলায় বালকবালিকা-দিগকে বিনা ব্যয়ে দাঁতের চিকিৎসা করা হইয়া থাকে। এই সকল কারণে নরওয়েতে করের হার অধিক।

শিক্ষার প্রসার-ফলে নরওয়েতে নূতন সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। যে সকল তরুণ-তরুণী উচ্চ শিক্ষা পাইয়াছেন, তাঁহাদিগের সংখ্যা বহু সহস্রাধিক। শিক্ষার অনুপাতে তাঁহারা এখন কায পাইতেছেন না। এজন্য সংপ্রতি আবার কৃষিকার্য্যে ফিরিয়া যাইবার জন্য প্রবল আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে।

যত ক্ষুদ্রই হউক, প্রত্যেক কৃষক-পরিবারে নানাবিধ গ্রন্থপূর্ণ একটা আল্‌মারী থাকিবেই। প্রত্যেক চাষী কেতাব-কীট বলিলেও চলে। যত ছোট সম্প্রদায়ই হউক না কেন, প্রত্যেকেরই পুস্তকাগার থাকিবেই।

রেডিও সাহায্যে নরওয়ের অধিবাসীদিগের শিক্ষা আরও ব্যাপকতা লাভ করিয়াছে। যত দূরবর্ত্তী স্থানই হউক না কেন, রেডিওযোগে সরকার সর্ব্বত্র নানাবিধ শিক্ষণীয় বিষয় প্রচার করিয়া থাকেন। ইহাতে সকলেই স্বাধীনভাবে সকল বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিতে পারে।

ইহাতে তাহারা যে কোন ভাবে জীবিকা অর্জ্জনে সমর্থ হইয়া থাকে।

শীতকালে প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ অসম্ভব। সুতরাং

দরিদ্রের চিকিৎসা সম্বন্ধে চিকিৎসকগণ কোন অর্থ গ্রহণ করেন না। জনসাধারণের স্বাস্থ্য যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, ষ্টেট বা রাষ্ট্র এ বিষয়ে সচেতন।
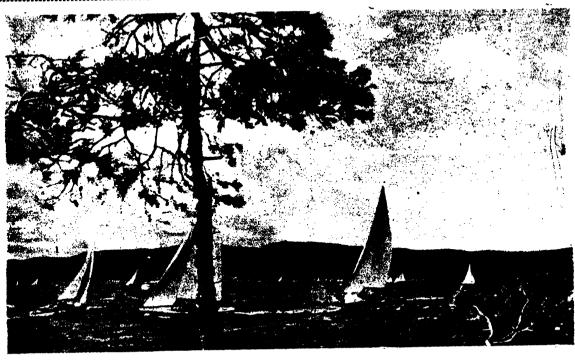
অস্লো ফোর্ডে নৌকা-প্রতিযোগিতা

শ্যাম প্রদেশের সন্নিহিত পাহাড় ও নদী

নরওয়ের দ্বিতীয় বন্দর বার্জেন

রাষ্ট্র এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট হাসপাতাল, শিশুপালন-গৃহ প্রভৃতি পরিচালনা করিয়া থাকেন। সাধারণ হাসপাতালে যক্ষারোগী-দিগের শতকরা ৯০ জন চিকিৎসিত হয়। যাহারা রোগীর চিকিৎসায় অর্থব্যয় করিতে পারে, তাহাদিগের নিকট হইতে দৈনিক ৫০ সেণ্ট হইতে এক ডলার ২৫ সেণ্ট গ্রহণ করা হয়।

নরওয়েজীয় কৃষক রমণীগণ

রাজা সপ্তম হেকন্ অত্যন্ত বুদ্ধিমান্। দেশবাসীর প্রকৃতির সহিত তিনি সুপরিচিত। তাই ৩৪ বৎসর ধরিয়া তিনি শান্তিতে রাজত্ব করিতেছেন। কৃষি-সমস্যা সম্বন্ধে রাজার তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি আছে। গ্রীষ্মকালে তিনি অস্‌লোর বহির্ভাগস্থিত এক কৃষিক্ষেত্রে বাস করেন। উহারই সন্নিহিত প্রদেশে যুবরাজের একটি কৃষিক্ষেত্র আছে।

বহু নরওয়েজীয় আমেরিকায় বসবাস করিতেছে। দক্ষিণ আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি স্থানেও তাহারা কার্য্যোপলক্ষে গমন করিয়াছে। অথচ স্বদেশের সহিত তাহাদিগের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয় নাই।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

জীবন-বীণা

(গল্প)

১
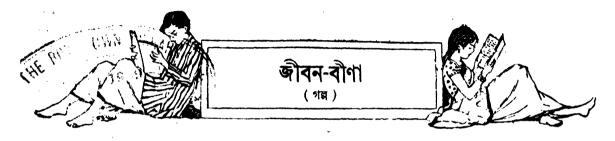
বেলা দশটা বাজিয়া গিয়াছে।

বালিকা-বিদ্যালয়ে ক্লাশ বসিবার পূর্ব্বে প্রার্থনা এই-মাত্র শেষ হইয়াছে।

ঝাঁকড়া চুলগুলি বব্ করিয়া কাটা ফুটফুটে মেয়ে ক্লাশ ওয়ানের রাণু বলিল,—সুমিত্রাদি, অরুণা প্রেয়ারের সময় চোখ খুলেছিল।

অরুণা তাহার চোখের ইশারায় রাণুকে বারণ করিয়া বলিল,—না, সুমিত্রাদি।

সুমিত্রা হাসিয়া রাণুকে বলিলেন,—ও যে চোখ খুলে-ছিল, তুমি কেমন ক'রে জানলে?

—হ্যাঁ। আমি স্বচক্ষে দেখিছি, সুমিত্রাদি!

—চোখ বুজলে সব বুঝি স্বচক্ষে দেখা যায়?

সলজ্জভাবে রাণু বলিল,—আমি তো মাত্র একবার চোখ খুলেছিলুম!

লাইন করিয়া ক্লাশে যাইবার সময় অরুণা রাণুকে বলিল,—কেমন জব্দ! বড় যে আমার নামে! আচ্ছা, আমি তেঁতুল এনেছি, দেবো না তোকে।

রাণু বলিল,—ওঃ ভারি তো! আমিও আমের আচার এনেছি, তোকে দেখিয়ে দেখিয়ে খাবো! কি মজা হবে!

—ওঃ, বয়ে গেল!

বোর্ডে অঙ্ক দিয়া শিক্ষয়িত্রী সুকৃতি সেন তাঁহার চেয়ারে বসিয়া সেলাই করিতেছিলেন। হঠাৎ অস্পষ্ট একটা ফিস্-ফিস্ কথার শব্দে তিনি আড়চোখে চাহিয়া দেখিলেন,—অরুণা ও রাণু দুজনে দুজনার শ্লেট দেখিয়া অঙ্ক কষিতেছে।

সুকৃতি ডাকিলেন,—অরুণা, রাণু তোমাদের শ্লেট নিয়ে এস!

দুই জনে ভয়ে ভয়ে আসিয়া দাঁড়াইল।

—কৈ, অঙ্ক দেখি?

অরুণা বলিল,—আমার অঙ্ক অনেকক্ষণ হয়ে গেছে, সুকৃতিদি!

—তবে দাওনি কেন এতক্ষণ?

অরুণা চুপ করিয়া রহিল।

সুকৃতি রাণুকে বলিলেন—আমায় বুঝিয়ে দাও তো রাণু, তোমার অঙ্কটা!

রাণু ভয়ে ভয়ে বলিল—এই—এই—

অরুণা তাড়াতাড়ি বলিল, আমি পারি বুঝিয়ে দিতে, সুকৃতিদি!

—তুমি চুপ করো। তোমায় বলিনি!

রাণু আমতা আমতা করিয়া, ঢোক গিলিয়া বলিল,—দেখুন, আমি বল্লুম দেখ্‌বো না, তবু ও বল্‌লে ছাখ্‌না, আমারটা ঠিক্ হয়েছে; আমি উত্তর মিলিয়ে দেখেছি। তুই শুধু বসিয়ে বসিয়ে যা। আমার কি দোষ?

সুকৃতি তাহাদের দুই জনকে পৃথক্ বেঞ্চিতে বসাইয়া দিলেন।

কিছুক্ষণ পরে রাণু বলিল,—সুকৃতিদি, অরুণা আমায় ভেংচি কাট্‌ছে।

অরুণা বলিল,—আমি না, সুকৃতিদি! ওই আমাকে জিব্ ভ্যাঙাচ্ছে।

টিফিনের সময় আবার মেয়েদের হৈ-চৈ! মেয়েরা যেখানে খেলা করিতেছিল, লেডি প্রিন্সিপ্যাল মিসেস্ সার্‌কেল্ তাহারি এক পাশ দিয়া যাইতে যাইতে দেখিলেন, অরুণা ও রাণু একটা টিফিন-বাক্স হইতে দুই জনে মহা-আনন্দে টিফিন্ খাইতেছে, আর একটা টিফিনের কৌটার ঢাকনায় তেঁতুল-মাখা ও আমের আচার পড়িয়া আছে।

তিনি তাঁহার মিহি-গলা আরও মিহি করিয়া বলিলেন,—মেয়েরা, তোমরা বুঝি দুজনে এক বাড়ী থেকে আস?

রাণু বলিল, না মিসেস্ সার্‌কেল! ওদের বাড়ী আমাদের বাড়ী থেকে অনেক দূর! আমরা আলাদা বাড়ী থেকে আসি।

মিসেস্ সার্‌কেল বলিলেন, কত দূর?

রাণু বলিল,—সে অনেক দূর! তিনখানা বাড়ীর পর।

হাসিয়া মিসেস্ সার্কেল বলিলেন,—অনেক দূর তো! তোমরা বুঝি একটা বাক্সে দুজনার টিফিন আনো?

রাণু বলিল, না মিসেস্ সার্কেল, ও আমার টিফিন খাচ্ছে।

অরুণা বলিল,—আহা, তুমি যে আমার খাবারটা আগে খেলে, মশাই!"

মিসেস্ সার্কেল হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন। তেঁতুল ও আমের আচারের লোভে অনেক মেয়ে সেখানে আসিয়া জুটিল।

শান্তি বলিল,—ভাই রাণু, আমাকে একটু দে, ভাই!

শান্তিকে রাণু আচার দিতে যাইতেছিল, এমন সময় সুব্রতা কোথা হইতে আসিয়া ছোঁ মারিয়া তাহার হাত হইতে আচারটুকু কাড়িয়া লইল।

শান্তি মুখ ভার করিয়া বলিল, —আচ্ছা, সুব্রতা, তোমার সঙ্গে আড়ি! আড়ি! আড়ি! এবং নিজের দাড়ীতে বৃদ্ধাঙ্গুলি ঠেকাইয়া দেখাইল। রাণু তাহার শেষ সম্বল যেটুকু আচার ছিল, সবটুকু শান্তিকে দিয়া তাহাকে ঠাণ্ডা করিল। অরুণা তাহার ভাগের আচারটুকু রাণুর মুখে দিয়া বলিল, খা!

তাহার পর সকলে মহা-আনন্দে মাঠে বেড়াইতে লাগিল।

শান্তি বলিল,—জানিস, অরুণা! লাট-সাহেবের বৌ এবার আমাদের স্পোর্টের সময় প্রাইজ দেবেন।

অরুণা বলিল,—আহা, তা আর জানি না? লাট-সাহেবের বৌ যে আমার কাকীমা হয়।

মেয়েরা অবাক্ হইয়া বলিল,—তাহ'লে তোরা মেম বল্?

অরুণা অম্লান বদনে বলিল,—নিশ্চয়ই!

সেখান দিয়া একটি ম্যাট্রিক ক্লাসের মেয়ে যাইতেছিল; উহাদের কথায় আকৃষ্ট হইয়া বলিল,—হাঁারে তোরা লাট-সাহেব কি বল্‌ছিস্ রে? তোদের মুখে লাট-সাহেব ছাড়া কথা নেই দেখ্‌ছি যে!

বাসন্তী বলিল,—জানেন, সুলেখাদি, অরুণা বল্‌ছে, লাট-সাহেবের বৌ ওর কাকীমা হয়! ওরা না কি মেম!

সুলেখা হাসিয়া বলিল,—ওঃ, লাট-সাহেব ওর কেউ হয় না! তার বৌ ওর কাকীমা হয়? বলিয়া হাসিতে হাসিতে সে চলিয়া গেল।

ঘণ্টা পড়িলে আসিল মাটীর কাযের ক্লাশ। অরুণা একটি আম তৈয়ারী করিয়া রাণুকে দিল। রাণুর আম তৈয়ারী করিতে সময় চলিয়া গেল, কাজেই তাহার নিজের আম আর তৈয়ার করা হইল না। ঝুনুদিদি মাটীর কায শেখান। তিনি রাণুর আমটি দেখিয়া বলিলেন, চমৎকার হয়েছে।

বাসন্তী বলিল,—ও করেনি, ঝুনুদিদি, অরুণা ক'রে দিয়েছে।

অরুণা বলিল, না ঝুনুদি, ও নিজে করেছে।

ঝুনুদিদি বলিলেন,—অরুণা তোমার আম কোথায়?"

অরুণা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল,—আমারটা আজ কিছুতে হলো না!

স্পোর্টের দিন আসিল। অরুণা ভালো দৌড়াইতে পারে; সেজন্য তাহাকে তিনটা বাজিতে নামানো হইয়াছে। রাণু প্রাক্‌টিসের সময় প্রাইজের নম্বর রাখিতে পারে নাই, কাঁদিয়া হাট বাধাইয়াছিল। অরুণার অনুরোধে রাণুকে প্রোগ্রামে নামানো হইয়াছে। শান্তি সুব্রতারা রাণুকে ক্ষেপাইতেছিল, অরুণা প্রাইজ নিয়ে চলে যাবে! তুই তখন ভেউ-ভেউ ক'রে কাঁদবি। রাণু বেশ একটু মন-মরা হইয়া পড়িল।

অরুণা রাণুর কাণে-কাণে কি বলিল—বলিতে রাণু খানিকটা উৎসাহান্বিত হইয়া উঠিল।

রাণুদের রেশ্ আরম্ভ হইল। অরুণা খুব ছুটিতেছে, দড়ি ধরে-ধরে; এমন সময় হঠাৎ সে রাণুকে ঠেলিয়া দিয়া পড়িয়া গেল, রাণু দড়ি ধরিল।

সকলেই অরুণার দুঃখে নানা সহানুভূতি জানাইতে লাগিল। যিনি প্রতিযোগিতার নম্বর নির্দ্দেশ করিবার কাযে নিযুক্ত ছিলেন, তিনি রাণুকে বলিলেন,—তোমার গুড্ লাক্! এমন বন্ধু পেয়েছো! অরুণাকে তিনি বলিলেন, মিছামিছি একটা প্রাইজ নষ্ট কর্‌লে!

অরুণা বলিল, আমি যে পড়ে গেলুম!

তিনি অরুণাকে ধমক দিলেন, বলিলেন,—ফের মিথ্যে কথা!

ধমক খাইয়া অরুণা কাঁচু-মাচু মুখে বলিল,—আমি তো দুটো পাবো। ও পাবে একটা মাত্র!

কয়েক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। রাণু এবং অরুণারা এখন পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ে। একখানি লাল রঙের খামের চিঠি ক্লাশ-টিচারের হাতে দিয়া রাণু বলিল,—সুমিত্রাদি, আমার ছেলের আজ ফুলশয্যে! আপনার নেমন্তন্ন। যেতে হবে কিন্তু। মা ব'লে দিয়েছেন, আপনাকে ধরে নিয়ে যেতে।

হাসিয়া সুমিত্রা বলিলেন,—তাই না কি? তা কোথায় বিয়ে হলো?

—এই অরুণার মেয়ের সঙ্গে।

রাণুর সঙ্গে সুমিত্রা এবং আরও কয়েক জন শিক্ষয়িত্রী রাণুর ছেলের বিবাহে নিমন্ত্রণ রাখিতে আসিলেন। অরুণাদের বাড়ী হইতে তাহার মা ও ভাইবোনরা আসিয়াছিলেন। সকলে বাগানের এক কোণে বসিয়া গল্প করিতেছিলেন; লনের উপর অরুণা, রাণু, শান্তি, সুব্রতা প্রভৃতি ব্যাড্‌মিণ্টন খেলিতেছে।

হঠাৎ একটা গোলমালে মেয়েদের দিকে তাকাইয়া সকলে দেখেন, দুই বেয়ানে মল্ল-যুদ্ধ বাধিয়াছে, একেবারে হাতাহাতি ব্যাপার! ছুটিয়া সকলে আসিয়া দুই বেয়ানকে অনেক কষ্টে যুদ্ধ হইতে নিরস্ত করিলেন।

দুই জনেই রাগে তখন ফুলিতেছে!

অরুণা বলিল,—আমার কিছু দোষ নেই, মাসীমা! ওই শুধু মিছিমিছি—

রাণু গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিল,—আমি মিছামিছি! আর তুই যে প্রথমে—

—না, কক্ষনো না! দে আমার মেয়ের বিয়ে কাটিয়ে, এক্ষুনি দে। আমার সব জিনিষ ফিরিয়ে দে! আমি এখুনি বাড়ী গিয়ে শান্তির ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেবো খূ—ব ঘটা ক'রে। আমার পুঁতির মালা, ক'খানা কাপড় সব গুণে ফিরিয়ে দে!

রাণু বলিল,—আহা, নে না তোর মেয়ে! এখুনি নিয়ে যা!

শান্তি বেশ গিন্নির মত বলিল,—তা ব'লে ভাই, আজই আমি ছেলের বিয়ে দিতে পারবো না। এখন বাবা আপিস থেকে আসবেন, পয়সা চাইলে আস্ত রাখ্‌বেন না।

অরুণার মা বলিলেন,—সে কি গো? আজ হলো ফুলশয্যে! আজ কি বিয়ে কাটায়!

রাণুর মা বলিলেন,—রাণু, আমি মরছি তোর ছেলের বিয়ের খাটুনী খেটে, আর তোরা দিচ্ছিস্ বিয়ে কাটিয়ে? এঁদের যে তুই নেমন্তন্ন ক'রে নিয়ে এলি, তাহ'লে বিয়ের মতন এঁদের নেমন্তন্নও কাটিয়ে দিতে হবে।

রাণু রাগ করিয়া বলিল,—হোক্ গে! এবং সে গোঁজ হইয়া বসিয়া রহিল।

তাহার পর খাওয়ার সময় দেখা গেল, দুই বেয়ানে মহা হল্লা করিয়া আনন্দে খাইতে বসিয়াছে। কিছু পূর্ব্বে দুজনে যে ভয়ানক কাণ্ড বাধাইয়াছিল, তাহার বিন্দুবাষ্পও কোথাও নাই! খাওয়ার পর কনেদের বাড়ী হইতে অনেক তত্ত্ব আসিল। তাহা লইয়া সকলে মহা ব্যস্ত।

এ-দিকে অরুণার এক বৎসরের ভাইটি সেলুলয়েডের বরটির মাথা মহা আনন্দে চিবাইতেছিল! তাহার আর চিহ্ন নাই। অরুণার এ-দিকে নজর পড়িল। অরুণা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল; এবং ভাইটির পিঠে যত পারিল চড় বসাইল।

কোথায় অপরাধ করিয়াছে বুঝিতে না পারিয়া মার খাইয়া খোকা বেচারা চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

খোকার কান্না শুনিয়া মা ছুটিয়া আসিলেন, এবং খোকার কাণ্ড দেখিয়া তিনি বড় লজ্জিত হইলেন।

অরুণার দুঃখ এবং মাসীমার লজ্জা দেখিয়া রাণু সান্ত্বনার স্বরে বলিল,—তাতে কি হয়েছে, মাসীমা? আমার আর একটা ছেলে আছে, তার সঙ্গে আমার বৌয়ের ফুলশয্যে করিয়ে দেবো'খন।

ইহা ছাড়া অন্য উপায় নাই। কাযেই সকলে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

আরও কয়েক বৎসর কাটিল। এবার রাণু-অরুণারা থার্ড ক্লাশে পড়ে।

এখনও রাণু-অরুণাতে খুব ভাব। এখনও বাড়ী হইতে তাহারা সেই রকম তেঁতুল, আচার, বিস্কুট, পাণ চুরি করিয়া আনে। তবে কাড়াকাড়ি করে না; চাহিলেই পায়। পুতুলের বিবাহ আর দেয় না। এখন তাহারা লুকাইয়া

নভেল পড়ে, দু' একটা কবিতা লেখা ও গল্প লেখার চেষ্টা করে। নূতন নূতন গান শেখে।

সহজে তাহারা এখন বাড়ী হইতে বাহির হইতে পারে না; মায়ের পরোয়ানা ছাড়া। তবে মায়ের কাছে পরোয়ানা সহজেই পায়।

—মা, অরুণার একখানা চিঠি আমার কাছে আছে; কার হাত দিয়ে পাঠাবো? আমিই কেন দিয়ে আসি না? তারপর মায়ের উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া বাহির হইয়া পড়ে। সে চিঠি রাণু নিজেই লিখিয়াছে অরুণাকে।

পত্র-প্রেরক ও পত্র-বাহক একই প্রাণী দেখিয়া অরুণার দিদি হাসিয়া খুন! হাসিয়া বলে,—এখনকার মেয়েরা কি হলো, মা! এরা নিম্-খুন করতে পারে।

দিদিটির অল্পদিন বিবাহ হইয়াছে; চিঠির রসের মত্ততা তাহাকে সবে মাত্র ধরিয়াছে!

এখন ক্লাশে বসিয়া কাহাকে কতবার কোথা হইতে কাহারা দেখিতে আসিয়াছে, তাহার গল্প হয়। বাল্যের উচ্ছলতা কৈশোরে এখন জমাট বাঁধিবার চেষ্টা করিতেছে।

এমন সময় একদিন ক্লাসে আসিয়া রাণু জানাইল, তাহার বিয়ে।

মেয়েরা তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। সকলে মহা উৎফুল্ল হইয়া খুঁটিয়া খুঁটিয়া রাণুকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। রাণুও সানন্দে তাহাদের কথার উত্তর দিল।

টিফিনের ছুটি হইলে মেয়েরা শিক্ষয়িত্রীদের জানাইল, রাণুর বিয়ে—এই মাসের বাইশে! শিক্ষয়িত্রী সুচিত্রা তাহার পার্শ্বোপবিষ্টা সহকর্ম্মিণী মিসেস্ সেন্‌কে বলিলেন,—এই বাল্য-বিবাহের বিরুদ্ধে কত লেখালেখি হলো, তবু হিন্দুদের এই অন্ধ কুসংস্কার কিছুতেই গেলো না! এই জন্য ভাই, হিন্দুদের আমি বড় ঘৃণা করি।

মিসেস্ সেন্ বলিলেন,—দেখুন, হিন্দুদের এই বাল্য-বিবাহ আছে বলেই, এত আঘাত এবং উৎপীড়নেও হিন্দুধর্ম্ম পৃথিবী থেকে মুছে যায় নি। কত ধর্ম্ম হলো, কত ধর্ম্ম গেল, সবই এই হিন্দুধর্ম্ম থেকে, কিন্তু সব অত্যাচার সহ্য ক'রে এই হিন্দুধর্ম্ম রইলো অটল স্থির হ'য়ে! এর জন্ম যেমন কেউ জানে না, তেমনি এর মৃত্যুও কেউ কখনো দেখ্‌বে না। কারণ, এ ধর্ম্মের ভিত্তি হলো সব-চেয়ে বেশী মজবুত! যে সব মেয়ে পঁচিশ ত্রিশ বৎসর বয়সে বিয়ে করেন, তাঁরা তো গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালনের জন্য বিয়ে করেন না, তাঁরা শুধু স্ত্রী-পুরুষ দুজনে দুদিন একত্রে বাস করবার জন্য বিয়ে করেন। প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা, এ-সব বিয়েতে হয় না। কারণ, দেহের যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে মনের যৌবন চলে যায়।

সুচিত্রার মুখে বাল্য-বিবাহের নিন্দা শুনিয়া মেয়েদের মন তাহাতে সায় দিতে পারিল না। সকলেই মনে মনে বলিল, রাণুর কি ভাগ্য! কেমন ওর বিয়ে হচ্ছে! আর আমাদের যে কবে হবে!

শান্তি প্রকাশ্যে বলিয়া ফেলিল,—সুচিত্রাদির বিয়ে জোটে না, কাজেই অন্য মেয়ের বিয়ে সহ্য করতে পারেন না! যে ওঁর রূপ! কে ওঁকে বিয়ে ক'র্‌বে?

৩

রাণুর বিবাহ হইয়া গেল।

অরুণা, শান্তি, সুব্রতা, বাসন্তী সকলে মিলিয়া রাণুকে সাজাইল এবং বিবাহের পর সব নূতন কথা তাহাদের কাছে বলিতে হইবে বলিয়া আবেদন জানাইল।

তাহার পর সকলে মিলিয়া অনুযোগ করিল,—বিয়ের পর আমাদের তুই ভুলে যাবি! দেখ্‌লে চিন্‌তেই পার্‌বিনে ইত্যাদি!

বর-কনে বিদায়ের সময় অরুণা, শান্তি প্রভৃতি সকলে কাঁদিয়া ভাসাইল।

রাণু চুপি চুপি অরুণাকে বলিল,—তোকে যেমন ভালোবাসি, তেমন আর কাকেও ভালোবাস্‌তে পার্‌বো না!

বিবাহ একটা জাঁক-জমক হৈ, চৈ, গহনা, কাপড়, খাওয়া দাওয়ার মস্ত মজা, এই ছিল রাণুর ধারণা। আর এই মজার আনন্দ স্কুলে পড়ার চেয়ে যে অনেক ভালো, তাহাও সে বুঝিত। কিন্তু শ্বশুর-বাড়ী আসিয়া আনন্দের স্রোত যেন মন্থর হইয়া গেল। বর-নামক জীবটি দূর হইতে দেখিতে ভালো। কাছে আসিলে ভয় করে, কিছু অস্বোয়াস্তীও লাগে। বরের চেয়ে অরুণা অনেক ভালো। অনেক আনন্দ হয় অরুণার সঙ্গে গল্প করিলে। কারণ, অরুণার সঙ্গে কথা বলিতে কোথাও বাধে না! গল্প যেন বেগবতী নদীর স্রোতের মতন ছুটিয়া চলে। আর এই

মানুষটির সঙ্গে সকল কথা বিনাইয়া বিনাইয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিতে হয়। এ মানুষটি অরুণার মত রাণুকে কখনো ভালবাসিবে না। তিনি যেন তাহার সকল কথা নিজের এক্তিয়ারের মধ্যে রাখিয়া অহঙ্কার দিয়া ঢাকিয়া তবে বলেন। তিনি যেন রাণুকে অত্যন্ত ছেলেমানুষ ভাবেন! এ-লোকটি যেন অনেকটা দূরে দাঁড়াইয়া রাণুর সঙ্গে আলাপ করেন। এমন ছাড়াছাড়ি আলাপ রাণুর বেশীক্ষণ ভাল লাগে না।

তা ছাড়া এখানে রাণুকে একটা গণ্ডীর মধ্যে ঘোমটার আড়ালে সর্ব্বদা শঙ্কিত মনে আড়ষ্ট হইয়া থাকিতে হয়। ইহাতে সে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে।

মনে পড়িল, ক্লাশের সকলের কথা।

এখন তাহারা সকলে কি করিতেছে? বোধ হয়, এখন অঙ্কের ক্লাশ! যে ক্লাশটাকে সব চেয়ে ভয় করিত, আজ সেই ক্লাশে যাইবার জন্য তাহার মন অস্থির হইয়া উঠিল।

বন্ধুরা বলিয়াছিল, শ্বশুরবাড়ী গেলে আমাদের ভুলে যাবি! তাহারা তো জানে না, শ্বশুরবাড়ী কেমন! এখানে তাহাদের কথাই রাণুর বেশী করিয়া মনে পড়িতেছে।

রাণু বাপের বাড়ী ফিরিয়া আসিল। কিন্তু যে-রাণু শ্বশুর-বাড়ী গিয়াছিল, সে রাণু ফেরে নাই! এ ক'দিনে সে যেন একটু গম্ভীর ও রোগা এবং মলিন বিবর্ণ হইয়াছে।

এখানে আসিয়া অরুণাদের লইয়া সে খেলিত। তবে পূর্ব্বের মতন খেলা আর জমিত না। বন্ধুরা কেহ খেলিতে চায় না; তাহারা কেবল রাণুর বরের গল্প শুনিতে চায়। বরের গল্প করিতে রাণুরও খুব ভালো লাগে।

রাণু বলে,—যা আমরা নাটক-নভেলে পড়ে শিখি, তা কিন্তু আসলে মোটেই মেলে না।

মেয়েরা আরও উৎসুক হয় সকল কথা জানিবার জন্য।

সেদিন বৈকালে অরুণাদের লইয়া রাণু নীচের বাগানে খেলা করিতেছিল, হঠাৎ উপরের বারান্দায় দিদি-বৌদিদির উচ্ছল হাসি ও কি একটা জিনিস লইয়া দুজনের কাড়াকাড়ি দেখিয়া রাণু ছুটিয়া উপরে আসিয়া অবাক্ হইয়া দাঁড়াইল। দিদি হাঁপাইতে হাঁপাইতে একখানা খামের মাথা ফস্ করিয়া ছিঁড়িয়া পড়িতে লাগিল,—

প্রাণের রাণী

রাণু, তুমি ওখানে গিয়ে আমাকে একেবারে ভুলে গিয়েছ। আমি কিন্তু আমার রাণুকে চব্বিশ ঘণ্টাই মনে করছি।

শ্রীমতী রাণু দেবীকে সেলাম দিবার জন্য আমার নিমন্ত্রণ এসেছে, আগামী রবিবার যেতে হবে। কিন্তু রাণু দেবী কি এতে খুসী হবেন? রাণু তুমি কি বিশ্বাস করবে যে, সেই শুভ দৃষ্টির সময় আমি বুকে যে একটা মৃদু-স্পন্দন অনুভব করেছিলাম, যত দিন যাচ্ছে, সেই স্পন্দনটুকু তত দ্রুত বেগে বেড়ে চলেছে…

রাণু আর শুনিতে পারিল না; ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

ক'দিন এই চিঠি লইয়া বাড়ীসুদ্ধ লোক মহা হৈ-চৈ করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

বাবা-মা চিঠি তো পড়িলেনই, উপরন্তু বাড়ীতে যাহারা আসে, তাহারাও একবার করিয়া পড়িয়া যায়।

অরুণার মারফতে রাণুর চিঠিখানি তাহার কাছে আসিল।

মা বলিলেন, "রাণু, এই চিঠিখানা খুব যত্ন ক'রে তুলে রাখ

দিন দুই পরে এক দিন রাত্রে বাবার গলার স্বরে রাণুর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। বাবা যেন কাহাকে বকিতেছেন। সে একটু কাণ পাতিয়া শুনিল।

—কেন চিঠির জবাব এখনও যায়নি? যা আমি না দেখবো, তা আর তোমাদের দ্বারা হবার আশা নেই। নিয়ে এসো শীগ্‌গির কাগজ-কলম, আমিই একটা খসড়া ক'রে দিচ্ছি। ও ছেলে-মানুষ, ও-কি পারবে? সুধীন শেষে চটে যাবে।

মায়ের কথা শুনা গেল—তোমার আর খসড়া ক'রে কায নেই। কাল মানু আসবে, সেই লিখে দেবে এখন।

রাণুর ঠাকুরমার গলা শুনা গেল।

—কি হয়েছে, বৌমা? খোকা এত রাগারাগি করছে কেন?

মা বলিলেন,—সে দিন সুধীন রাণুকে যে চিঠি দিয়েছেন, তার উত্তর এখনও দেওয়া হয়নি শুনে রাগ করছেন। তা আমি থাকি সর্ব্বদা সংসারের কায নিয়ে, আমার কি অত মনে থাকে? উনি বলছেন, জামাই অসন্তুষ্ট হবেন। চিঠির উত্তর এখনও যায়নি কেন?

ঠাকুরমা আপন-মনে গজ-গজ করিতে করিতে চলিয়া

গেলেন,— কি জানি বাবা, তোমাদের কালেই চিঠি দেখ্‌ছি, আমরা তো কস্মিন্ কালেও চিঠি লিখিনি, তা ব'লে কি আমাদের স্বামী আমাদের নিয়ে ঘর করে নি?

সব শুনিয়া রাণু হাসিয়া মনে মনে বলিল, বাবা, আবার চিঠির উত্তর দিতে হবে! তবেই সেরেছে। ভ্যালা বিয়ে হয়েছিল! এত ফ্যাসাদ! আমি কিন্তু নিজে কিছু লিখতে পারবো না। শেষে ওঁদের নাক-ফোলা জামাই কিসে রাগ করবেন! ও বড়দিদি যা করে করবে এখন।

এ ব্যাপারটা অরুণার কাছে বলিবার জন্য তাহার পেট যেন ফুলিতে লাগিল।

মান্তু ওরফে মানসী রাণুর চিঠির উত্তর লিখিয়াছিলেন, একেবারে সচিত্র প্রেম-পত্রের হুবহু নকল। চিঠি দেখিয়া সকলে মহা খুশী। চিঠিখানি বাবা, জ্যেঠামশাই প্রভৃতি সকলে একবার করিয়া দেখিলেন, এবং দেখিয়া সকলেই একটু মুচকাইয়া হাসিলেন। বোধ হয়, পুরানো কথা তাঁহাদের মনে পড়িল!

সকলকে চিঠি দেখাইয়া মান্তু বলিল, দেখো বাপু, তোমরা শেষে আমার দোষ দিও না যেন! যদি কোন ত্রুটি থাকে তো এই বেলা বলো।

এ চিঠির উত্তর আসিল।

রাণু, আমার প্রাণের কথার উত্তর আস্‌বে, তোমার প্রাণ থেকে। এ যেন শেখানো বুলি আওড়িয়ে গিয়েছ। এতে আমার মন ভরে না; প্রাণ আমার কেঁদে ফিরে যায়।

এবার আর মান্তু চিঠি লিখিল না; রাণুই লিখিল। তবে তাহার বৌদির অনেক পরামর্শ লইল। ইহার উত্তর আসিল।

রাণু, তোমায় যেন আমি জোর ক'রে প্রেম করাচ্ছি। তুমি আমার মন রাখার জন্য জোর ক'রে আমার সঙ্গে প্রেম করতে নেমেছ। আমি তোমায় যত ভালবাসি, তুমি আমায় তার বিন্দুমাত্র ভালবাস্‌তে পার নি। তুমি লিখেছ, কাল রাত্রে তুমি আমায় স্বপন দেখেছ? এখানে সারারাত কেটে যেতো, তোমার চোখ খোলাতে—তুমি কবে আমায় দেখলে?

রবিবার আসিল। সুধীন আসিল। দাদা, বৌদিদি, দিদিরা যেন ভারী মজার গন্ধ পাইল! সারাদিন ধরিয়া তাহারা রাণুর ঘর সাজাইল; পরে রাণুকে লইয়া পড়িল। রাণুকে ফুল দিয়া সাজাইয়া তাহার গায়ে নানারকম সেণ্ট ঢালিল। তার পর সুধীনের ঘরে রাণুকে দিয়া আসিল।

চিঠিতে স্বামীর সঙ্গে আলাপ জমাইলেও, আজ তাহার সম্মুখে রাণু পায়ে-পায়ে লজ্জা জড়াইয়া লইয়া আসিল।

আজ স্বামী সম্পূর্ণ নূতন! একেবারেই যেন অপরিচিত মনে হইল!

সুধীন স্মিতহাস্যে রাণুর হাত ধরিয়া তাহাকে বিছানায় বসাইল। এমন সময় বাহিরে চাপা হাসি ও অস্পষ্ট কথার শব্দে দু'জনে হাসিয়া বিছানায় মুখ লুকাইল।

ভোর বেলা উঠিবার সময় রাণু দেখিল, সুধীন ঘুমাইয়াছে। রাত্রে রাণু সুধীনের কাছে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, ভোর বেলা সুধীনের কপোলে চুম্বন দিয়া তাহার ঘুম ভাঙ্গাইবে। সুধীনের সে মহা আবদার! রাণুর মনে হইল, সুধীন ঠিক বলিয়াছে, শুধু সুধীনের মনোরঞ্জনের জন্যই রাণু তাহার কথামত চলে। নহিলে স্বামীর এই সব আবদার তাহার ঠিক ভালো লাগে না! সে তাহার নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করিয়া নেশায় পড়িয়াছে। সুধীন যেন নেশায় মশগুল! রাণুর নেশা লাগে নাই! কিন্তু রাণু যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছে! আজই আবার সুধীন চলিয়া যাইবে। আবার কবে দেখা হইবে?

একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস রাণু রোধ করিতে পারিল না। এদিকে বাড়ীর সকলে জাগিতেছে! রাণু এক পা, দুই পা করিয়া দরজার দিকে চলিল।

অমনই কাতর-মিনতি-পূর্ণ আবদার-ভরা সুধীনের মুখখানি মনে পড়িল। আবার ফিরিল। লজ্জায় সে রাঙিয়া উঠিল! ছি! ছি! কি বিশ্রী! কেন মরিতে রাজি হইয়াছিল? তাহার মনে হইল, রাত্রে যাহা সহজ বলিয়া মনে হইয়াছিল, দিনের আলোয় কেন তাহা এমন কঠিন ও নির্লজ্জ মনে হয়? এ যেন পাগলের সঙ্গে পাগল হওয়া।

বাহিরে সকলের চলাফেরার শব্দ! না, আর নয়! মানুষ যেমন জ্বরের হাত হইতে নিস্তার পাওয়ার জন্য চোখ-কাণ বুজিয়া কুইনিন খায়, রাণু ঠিক্ তেমনিভাবে স্বামীর আব্‌দার রক্ষা করিল।

মুহূর্ত্তে সুধীন বাহু দ্বারা রাণুর কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া প্রতিদান দিল।

রাণু লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। স্বামী যে ঘুমান নাই.

ঘুমের ভাণ করিয়া পড়িয়াছিলেন, তাহা সে বুঝিতে পারে নাই। বুঝিলে রাণু কখনও এমন কায করিত না।

পরদিন সুধীন চলিয়া গেলে রাণুর বড়ই খারাপ লাগিতে লাগিল। কাল এমন সময় বাড়ীতে কত উৎসব, কত সজ্জা! আজ এখন সব মলিন, শুধুই অবসাদ! সে আজ প্রথম অনুভব করিল স্বামীর বিরহ।

অরুণা আসিল। তাহাদের গল্প আজ জমিল না। রাণু আজ কেমন অন্যমনস্ক, উদাস!

অরুণা বলিল—কাল রাত্রে বরের সঙ্গে কি গল্প হলো, বল।

রাণু আজ কিছুই বলিতে পারিল না। আজ প্রাণের বন্ধু অরুণাকেও তাহার অন্য মানুষ বলিয়া মনে হইল।

কাল যাহাকে দেখিয়া রাণুর মনে হইয়াছিল, এ আমার সম্পূর্ণ অচেনা; যাহাকে দেখিয়া কাল তাহার পায়ে-পায়ে লজ্জা জড়াইতেছিল, আজ সে দূরে চলিয়া গেলে তাহাকেই স্মরণ করিয়া রাণুর মনে হইল, পৃথিবীতে একটি মানুষই আছে, যাঁহার কাছে রাণুর কিছুমাত্র লজ্জা নাই! মনে হইল, সমস্ত পৃথিবী একধারে, আর তাহারা দু'জনে অন্য ধারে।

অরুণা চুপি চুপি বলিল, —জানিস, আমার বিয়ে?

এ সংবাদে রাণুর মনের সকল অবসাদ চকিতে কাটিয়া গেল। আনন্দে চোখ-মুখ উজ্জ্বল করিয়া সে বলিল, —কবে রে?

—এই ক'দিন পরেই। উকিল। নাম নরেন্দ্র রায়।

নিজের বিবাহের পূর্ব্বে যদি রাণু এই সংবাদ শুনিত তো কাঁদিয়া ফেলিত তাহার প্রাণের বন্ধু অরুণা পরের হইয়া যাইবে?

কিন্তু কয়দিনে রাণু অন্যরকম হইয়া গিয়াছে! সেজন্য অরুণার বিয়ের সংবাদে তাহারই হইল বেশী আনন্দ!

৪

সুধীন প্রায় আসে।

রাণুকে এখন সুধীনের ঘরে কাহাকেও পৌছাইয়া দিয়া আসিতে হয় না,—সে নিজেই যায়।

সুধীন রাণুর গহনা-পরা পছন্দ করে না। বলে, তোমার ও অস্ত্র-শস্ত্রগুলো খুলে এসো।

পরদিন রাণু গহনা খুলিয়া রাখিল। তাহাকে নিরাভরণা দেখিয়া মা অত্যন্ত চটিয়া গেলেন। বলিলেন, —এ কি অলক্ষণ সব বলো দেখি! জামাই এসেছে বাড়ীতে—সে কি ভাব্‌বে!

রাণুর বৌদিদি রাণুকে নির্জ্জনে ডাকিয়া বলিলেন,—হ্যাঁরে, রাণু, সুধীন বাবু গহনাগুলো খুলতে বলেছে নয়?

সলজ্জে ঘাড় নাড়িয়া রাণু বলিল,—হ্যাঁ।

—কেন রে? ওগুলো বুঝি—

—আঃ যাও! বলিয়া রাণু লজ্জায় বৌদির বুকে মুখ লুকাইল।

রাণু এখন শ্বশুর-বাড়ীতে। সুধীন কলিকাতায় কোন প্রাইভেট্ কলেজে প্রোফেসরি করে। বৎসরে তিনবার বাড়ী আসে। এ কটা দিন রাণু যেন স্বর্গ হাতে পায়! সারা বৎসর ধরিয়া সে এই কটা দিনের প্রত্যাশায় আকুল হইয়া থাকে।

রাত্রে ছাড়া সুধীনের সঙ্গে এখানে রাণুর বড় দেখা হয় না। সুধীন শুধু ছল খুঁজিয়া বেড়ায়, কি করিয়া রাণুর সঙ্গে কথা বলিবে, কি ছুতায় ভীত হরিণের ন্যায় রাণুর চক্ষু দুটি একবার দেখিবে! সারাদিনে সুধীনের সঙ্গে ঘোমটার ভিতর দিয়া রাণুর কত কথা হয়।

গভীর রাত্রে দুজনে ছাদে উঠিয়া বসে।

সুধীন বলে, —রাণু একটা গান গাও।

রাণু গায় অতি আস্তে, চাপা গলায়।

সুধীন বলে,—আর একটু জোরে গাও না!

রাণু বলে,—বাসা ক'রে আমায় কলকাতায় নিয়ে চলো, কত গান তখন তোমায় শোনাবো।

সুধীন বলে,—আমি তখন তোমায় দিন-রাত রঙীন সাড়ী পরিয়ে রাখ্‌বো।

রাণু বলে,—আমি তোমায় কত ভালো ভালো জিনিষ রেঁধে খাওয়াবো।

সুধীন সোৎসাহে বলিয়া ওঠে,—হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি তখন রোজ রাত্রে লুচি আর মাংস খাবো।

তাহার পর দুজনে কথা হয়, কি রকম বাড়ীটা হইবে, কি কি আসবাব-পত্র তাহাতে থাকিবে, কেমন করিয়া সাজানো হইবে, ইত্যাদি।

রাণু বলিল,—সাম্‌নে কিন্তু একটু বাগান থাকবে। আচ্ছা, বাড়ীটা গঙ্গার ধারে হয় না?

সুধীন বলিল,—কেন হবে না? নিশ্চয়ই বাড়ীর সাম্‌নে গঙ্গা থাকবে।

রাণু বলিল,—সেই গঙ্গার ধারে বাগানের মধ্যে একটা বেদী হবে। আমি তার উপর বসে গান গাইব, আর তুমি আমার কোলে মাথা রেখে শুয়ে গান শুনবে।

শুভ্র জ্যোৎস্নায় বসিয়া দু'জনে ভবিষ্যতের কল্পনায় বিভোর হইয়া বাস্তব জগৎ ভুলিয়া যায়। হঠাৎ নীচে খোকার কান্নার শব্দে চমক ভাঙ্গে! দুজনে ছুটিয়া আসে।

কিন্তু বাসা হয় না। রাণু মাঝে মাঝে সুধীনকে তাগাদা দেয়,—কবে তোমার কাছে সদা-সর্ব্বদা থাকতে পাবো?

সুধীন বলে,—দাঁড়াও, মা বাবার মত করাই।

এখন তাহাদের একটি ছেলে ও একটি মেয়ে। ছেলেটি বেশ কথা বলিতে শিখিয়াছে। ছেলেটি একদিন তাহার পিসিমাকে বলিল, জানো পিসিমা, মা বাবার সঙ্গে কথা বলে।

ছেলের মূর্খতা দেখিয়া রাণু লজ্জায় মরিয়া গেল।

বাসা হইল। সুধীন তাহার পিতামাতাকে লিখিল, স্ত্রী পরিবার লইতে আসিবার সময় তাহার হইবে না, কেহ যেন দিয়া যায়।

রাণুর দেওর রাণুকে লইয়া গেল।

একটা বাড়ীর মধ্যে দুখানি ঘর ও রান্নাঘর, এই তাহার বাসা। বাড়ী দেখিয়া রাণুর মুখ নিতান্ত ছোট হইয়া গেল। রাণুর মুখের চেহারা দেখিয়া সুধীন বুঝিল। বলিল,—এ ভাড়ায় আর তো ভাল বাড়ী পাওয়া যায় না। সেই জন্যেই বলেছিলুম, বাসা করায় আমার মত নেই। তোমার বাবা পয়সাওয়ালা লোক, তার উপর কলকাতায় তাঁর নিজের বাড়ী আছে। সেখানে আদরে সুখে থাকার পর এখানে কি তোমার মন বস্‌বে?

রাণু বলিল,—তা হোক গে! তুমি তো আর ছুটি ফুরুলো ব'লে চলে যাবে না। তোমায় তো সর্ব্বদা দেখ্‌তে পাবো।

তাহার পর চলে নতুন সংসার-পাতার কায। অনেক জিনিষ কিনিতে হইবে।

রাণু জিনিসগুলি কিনিতে সুধীনকে অনুরোধ করিল। সুধীন চমকাইয়া উঠিল, বলিল,—বলো কি! কিছু সঙ্গে আনো নি? এই তোমাকে আনার দরুণ কত টাকা খরচ হলো, আবার এগুলো কি দিয়ে কিন্‌বো?

সুধীন বিরক্ত হইল।

এইরূপ প্রত্যেক ব্যাপারে সুধীন বিরক্তি প্রকাশ করে, এবং রাণুর বায়না রক্ষা করিতে গিয়াই এ অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাও সে রাণুকে বলে।

রাণুর বাসার স্বপ্ন উবিয়া যাইতে বসিল। ছেলে-মেয়েরা কাঁদিলে ধরিবার লোক নাই। মাহিনা-করা চাকর সুধীন রাখিতে পারে নাই। একটা কলেজের চাপরাসী বিনা-মাহিনায় রাখিয়াছে। সে শুধু বাসন মাজে। তাহাও সে সব দিন করে না, উপরন্তু আটটার সময় রাণুকে সকল কায ফেলিয়া চাকরটিকে ভাত দিতে হয়।

কিন্তু ছেলে-মেয়ে কাঁদিবার যো নাই! কাঁদিলেই সুধীন রাণুকে বলে,—মা হয়েছো, ছেলে রাখ্‌তে পারো না?

রাণুর দুই চোখ জলে ভরিয়া আসে। তবে মন ভাল থাকিলে সুধীন রাণুর সঙ্গে ঘরকন্না গুছাইতে বসে। রাণুর ভাঁড়ারের নূতন কৌটাগুলি ঝাড়িয়া দেয় এবং রান্নাঘরের, ভাঁড়ার ঘরের জিনিষ কেমন করিয়া রাখিলে সুন্দর দেখাইবে, তাহার পরামর্শ দেয়! তাহার পর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলে, রাণু আমরা গরীব, কলকাতা সহর আমাদের জন্য নয়।

রাণু আর এখন তত মন-মরা নয়। সে ভবিষ্যতের আশা লইয়া খুশী থাকে।

এ বাড়ীতে উঠানে দাঁড়াইয়া সকলের সম্মুখে স্নান করিতে হয়, এইটাই তাহার মস্ত অসুবিধা। বেশী জল খরচ হইলে বাড়ীওয়ালা বক্-বক্ করে। আর ঐ পাশের ঘরের ভদ্র-লোকটিকে তাহার বিশ্রী লাগে। ও লোকটা অত্যন্ত অসভ্য। সুধীনকে রাণু মাঝে মাঝে এ সব জানায়। সুধীন বলে,—তাহ'লে বাসা তুলে দিই? অমনি রাণুর মুখ মলিন হইয়া যায়।

এবার একটা ভালো বাড়ী মিলিল। খুব ছোট বাড়ী! একটি ভদ্র-স্ত্রীলোকের বাড়ী। তাঁহার সঙ্গে বাস করিতে হইবে। তবে এ ভদ্র-মহিলাটি সত্যই ভদ্র!

সুধীন বলিল,—রাণু, আর কিন্তু আমি বাড়ী বদলাতে পারবো না। এই বাড়ীওয়ালাদের পটিয়ে রাখ্‌তে হবে। এঁদের যেন চটিয়ো না।

রাণু মনে-মনে অভিমানে-অপমানে গুমরাইতে লাগিল। আমি বাড়ীওয়ালাদের সঙ্গে বুঝি ঝগড়া করি? তুমি যেন কিছু দেখ্‌তে পাও না? কিন্তু সুধীনকে সে কথা বলিল না।

৫

দিন কাটিতে লাগিল।

পাড়া-পড়শী দুই-একটি বন্ধু রাণুর মিলিল। কী লইয়া লেডিজ পার্কে বেড়াইতেও যায়।

তাহার যাহা কল্পনা ছিল, তাহা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছে।

সুধীন খুব কম সময়ই বাসায় থাকে। সে এখন অনেক-গুলি টুইসনি করে, নোট লেখে। রাণুর সঙ্গে তাহার খুব কম কথা হয়। কথা যা হয়, তাহাও সংসারের প্রয়োজনীয় সুবিধা অসুবিধার কথা। তাহাতে দুই জনের অনেক সময় বচসা হইয়া যায়।

রাণু ঝাড়া-ঘর আবার ঝাড়ে। ছেলে-মেয়েদের পোষাক বদলাইয়া দিনের মধ্যে কতবার যে তাহাদের সাজায়! তাহার পর নূতন নূতন অনেক কিছু সেলাই করে; সোয়েটার বোনে। তবু সময় কাটিতে চায় না।

এক দিন সে সুধীনকে বলিল,—আমি আবার পড়বো। পড়ে ম্যাট্রিক পাশ করবো। সুধীন বলে—বাপ, যে বিদ্যা শিখেছো, তারই ঠেলা, বলে, সামলাতে পারিনে! আর বিদ্যায় দরকার নেই! তা সেদিন যে অর্গানটা কিনে ছিলুম, কৈ, কোনো দিন তো সেটা বাজাও না! আমার টাকাটাই শুধু নষ্ট হলো!

আনন্দে রাণু চোখদু'টি উজ্জ্বল করিয়া বলিল,—শুনবে গান?

সুধীন বলিল,—গাইলেই শুনবো।

রাণু গাহিতে লাগিল, "যৌবন-সরসী-নীরে"—

সুধীন বলিল,—শোন শোন, আমার হিসেবের খাতাটা কোথায়, জানো?

গাহিতে গাহিতে ঘাড় নাড়িয়া রাণু জানাইল, জানে।

—কৈ, দাও দিকি, অনেক দিন হিসেব লেখা হয়নি।

রাণু গাহিয়া চলিল—তার সরম-রক্ত-রাগে, আমার গোপন স্বপ্ন জাগে

—আচ্ছা, দাও দেখি খাতাটা, আমি বাইরের ঘরে বসে হিসেবটা লিখে ফেলি। তুমি ততক্ষণ গান শেষ ক'রে ফ্যালো।

রাণু ঝনাৎ করিয়া বাজনার ডালাটা ফেলিয়া দিয়া গম্ভীর হইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সুধীন অবাক্! কিছুক্ষণ পরে মনে মনে বলিল, আচ্ছা পাগল বটে! রাগের কি হলো! আমি তো সব ভালো কথাই বলেছি!

রাণুর বাসা হইয়াছে, বাজনাও হইয়াছে; আকাশে চাঁদ উঠিয়া ধরার বুকে জ্যোৎস্নাও ছড়ায়; কিন্তু তাহার কল্পনার সঙ্গে কোথাও কিছু মিলিল না। কত জ্যোৎস্না রাণু একা বসিয়া দেখে। কত দিন মান-অপমান ভুলিয়া সুধীনকে পড়ার ঘর হইতে ডাকিতে গিয়াছে।

একটু ছাদে চলো না গো, কি চমৎকার জ্যোৎস্না! শরতের রাত্রি! চাঁদের আলোয় যেন ভুবন মেতে উঠেছে।

সুধীন বই হইতে চক্ষু না তুলিয়াই জবাব দিয়াছে,—তুমি যাও, খ্যাপো গে, আমার বলে, এখন মরবার সময় নেই! জানো, না রাণু, ছেলেগুলোকে ডাহা ফাঁকি দিচ্ছি। আমরা মাষ্টার মানুষ; আমাদের কি কবিত্ব করা সাজে! তুমি যাও, জ্যোৎস্না দ্যাখো গে।

রাণুর চোখে নিমেষে দিগন্তব্যাপী আকাশ-ছাওয়া জ্যোৎস্নার হাসি কালো হইয়া যায়! মন গুমরাইয়া কিসের ব্যথায় সমস্ত অন্তর কাঁদিয়া উঠে।

সে আপন-মনে কবিতা লিখিত। সাহিত্যচর্চ্চা করিত। নিজের লেখা নিজে পড়িত।

রাণুর গহনা-কাপড়ের দিকে সুধীনের দৃষ্টি ছিল বেশ তীক্ষ্ণ। রাণুকে সে কখনও ময়লা বা ছেঁড়া কাপড় পরিতে দিত না। দৈবক্রমে রাণু তাহার গুলাব্রু হার ছড়াটা যদি খুলিয়া রাখিত তো সুধীন মনে মনে দুঃখিত হইত। রাণুকে হার পরাইয়া তবে সে ছাড়িত। মুখে বলিত,—তোমার গলায় হার না থাক্‌লে আমার মনে হয়,—আমি বুঝি মরে গেছি! তুমি বিধবা।

গহনা, নানা রকম সুন্দর সুন্দর সাড়ী সুধীন রাণুকে কিনিয়া দিয়াছে।

রাণুর গহনা দেখিয়া তাহার বৌদিদি রাণুকে ঠাট্টা করিয়া বলিলেন,—হ্যাঁরে রাণু, এগুলো আর বুঝি,…

রাণু লজ্জায় লাল হইয়া বলে, বৌদি, বুড়ো হয়ে মর্‌তে চলেছো, তবু অসভ্যতা ছাড়তে পারো না?

৬

রাণুর বিবাহের পর দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর চলিয়া গিয়াছে।

সংসারের এবং রাণুর ও সুধীনের চেহারাও অনেক বদলাইয়া গিয়াছে।

কলিকাতার উপকণ্ঠে তাহারা একখানি সুন্দর বাড়ী করিয়াছে। একখানি মোটর কিনিয়াছে। এখন সংসারে ঠাকুর, চাকর, ঝি লইয়া সতের-আঠার জন লোক। রাণু বেশ মোটা হইয়াছে,—চোখে চশমা লইয়াছে। সুধীনও বেশ মোটা হইয়াছে। বিশেষ তাহার ভুঁড়িটা বেশ বড়। রাণুর বড় ছেলেটি সবেমাত্র ডাক্তারি পাশ করিয়াছে; বিবাহের সম্বন্ধ আসিতেছে অজস্র। বড় মেয়েটির চার পাঁচ বৎসর বিবাহ হইয়াছে;—সে দুটি সন্তানের জননী।

দিনে-রাতে এখন রাণুর ফুরসত্ নাই। সদা-সর্ব্বদা কাযে ঘুরিতে হয়। এক মুহূর্ত্ত ছুটি নাই। সখের সেলাই, সাহিত্য-চর্চ্চা, কবিতা লেখা এখন অতল জলে! কখনও সে এ-সব করিয়াছে, তাহা তাহার মনেই হয় না! গান তাহার কণ্ঠে আর আসে না। তবু তাহার নিশ্বাস ফেলিবার অবসর নাই।

ছেলে-মেয়েদের পড়ায় চোখ দেওয়া, ঝি-চাকরদের কাছ হইতে সমস্ত কায বুঝিয়া লওয়া, ভাঁড়ারের জিনিষ ঝাড়া-মোছা, জামাই-কুটুম্বদের তত্ত্ব-তল্লাস লওয়া, এই বিরাট সংসারের অফুরন্ত খরচের হিসাব রাখা—সবই তাহাকে করিতে হয়।

বাড়ীর কর্ত্তা সুধীনের সঙ্গে তাঁহার খাওয়ার সময় ব্যতীত তাহার আর দেখা করার ফুরসুত মেলে না। তবে কর্ত্তার খাওয়ার উপর তাহার তীক্ষ্ণ নজর। সুধীনের খাওয়ার জিনিষ সে নিজের হাতেই প্রস্তুত করে।

সুধীনকে বার্দ্ধক্য ধরিয়াছে। কাযেই কতকগুলি বাঁধা খাওয়া তাহার দৈনিক বরাদ্দ।

সুধীন এখন কলেজের প্রিন্সিপাল। পেন্‌সন্ লইতে আর বেশী দিন বাকি নাই। এখন ছুটিতে আছে। কলেজের পড়া ছাড়িয়া দিয়াছে। নোট লেখে না, টুইসনি তো করেই না! কাযেই তাহার সময় আর কাটিতে চাহে না। দর্শন, বেদান্ত লইয়া সারাদিন নাড়াচাড়া করে। দর্শন তাহার নিজে পড়িলে হয় না; রাণুকে পড়িয়া শুনাইতে চায়। কিন্তু রাণুর সেদিকে মোটেই ইচ্ছা নাই দেখা যায়। তার চেয়ে ঝি-চাকরদের বকিলে তাহার কায হয়।

সুধীনের ইচ্ছা, রাণু তাহার কাছে সদা-সর্ব্বদা থাকে,—তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া দেয়, সে রাণুর সঙ্গে সুখ-দুঃখের দুটো কথা বলে। তা রাণু কিছুতেই সংসার ছাড়িতে চাহে না! রাত্রেও রাণুকে পাওয়া যায় না। যদি রাণু পাঁচ মিনিটের জন্য আসে তো অমনি রাণুর ছোট মেয়ে সোণালী এবং বড় মেয়ের মেয়ে দীপালি কাঁদিয়া উঠে। সুধীন অভিমান-ভরে বলে,—তুমি তোমার সোণালী দীপালি নিয়েই থাকো,—আমার কাছে আর এসে কায নেই!

সুধীনের ইচ্ছা, রাণু প্রত্যহ বৈকালে তাহার সঙ্গে বেড়াইতে যায়। কিন্তু রাণুর যাওয়া হইয়া উঠে না। যদি বা কোন দিন সংসারের বিলি-ব্যবস্থা করিয়া বাহির হইবার উদ্যোগ করে, অমনি বড় মেয়ে মমতা মুখ ভার করিয়া বলে, মা বুঝি বেড়াতে যাচ্ছ? বেশ!

রাণু বলিল,—কেন? তুই এখন বেড়াতে যাবি?

মেয়ে বলিল,—হ্যাঁ, ওর আস্‌বার কথা আছে, আমায় নিয়ে বায়স্কোপে যাবে। তা তুমি যাচ্ছ তো আমার ছেলেটাকে কোথায় কার কাছে রেখে যাবো? জানো তো, ঝি-চাকরদের কাছে ছোটছেলে রাখা ও পছন্দ করে না।

গাড়ী হইতে সুধীন উত্তর দেয়,—রমা রাখবে।

উপরের বারান্দা হইতে রমা উত্তর দেয়,—আমি পারবো না বাবা,—আমার পড়া আছে।

সুধীন রাণুর হাত ধরিয়া গাড়ীতে তুলিয়া লইয়া বলে,—কাল তোরা বায়স্কোপে যাস্।

সারা পথ বিশেষ কথা হয় না। রাণুর মানসদৃষ্টিতে ভাসিয়া উঠে মমতার অভিমান-ভরা মুখখানি। মনে হয়, কাযটা ভাল হইল না। ছেলেমানুষ ওরা! এখনই তো ওরা বেড়াইবে। জামাই বা কি ভাবিবে বলো তো? মন সঙ্কোচে অসোয়াস্তীতে আড়ষ্ট হইয়া থাকে! মনে মনে

সুধীনের উপর বিরক্ত হয়। এঁর যেমন কাণ্ড! বুড়োবয়সে কচি রোগ!

সুধীন বলে—জানো, রাণু, এখন আমার সর্ব্বদা তোমায় পেতে ইচ্ছা করে। আমার দিন-রাত মনে হয়, তোমাকে আশ্রয় ক'রে, তোমার বুকে মাথা রেখে এই কটা দিন কাটিয়ে দিই।

রাণুর মুখে কথা সরে না।

এই রকম কথা সে বহু দিন পূর্ব্বে স্বামীর মুখে কতবার শুনিয়াছে,—তবে তাহার সুর, তাহার রং ছিল অন্য রকম!

সুধীন বলিল,—আমাদের পাড়ার কাছে এক উকিল ভদ্রলোক বাড়ী করেছেন। সেদিন তাঁর সঙ্গে আলাপ হলো। ভদ্রলোক বেশ অমায়িক। তিনি বলেন, আরে মশাই, আমার স্ত্রীকে আমি পাইনে, যত সব ভাগিদার এসে জুটেছে, চব্বিশ ঘণ্টা তারা ব্যূহ রচনা করে আমার স্ত্রীকে ঘিরে রেখেছে। আমি তাদের বলি, হ্যাঁরে তোরা যে, এত মা, দিদিমা করিস্, তা ব্যাটারা ওই মানুষটাকে কে এনেছে বল্ তো? তোরা আনতে পেরেছিলি? ভাগ্যে আমি বিয়ে করেছিলুম! ভদ্রলোকটির নাম নরেন্দ্র রায়।

রাণু এতক্ষণ এ সব কথায় মন দেয় নাই। কারণ, স্বামীর এই সব অনুযোগ তাহার কাছে পুরানো মামুলি রসিকতায় দাঁড়াইয়াছে। নরেন্দ্র রায় নামটা শুনিয়া সে চমকিয়া উঠিল!

—কি নাম বললে?

—নরেন্দ্র রায়।

—উকিল তিনি?

হাসিয়া সুধীন বলিল, হ্যাঁ। কে গো, অমন চমকালে কেন? পরিচিত না কি? Old love! কিন্তু জানো, কচি-বয়সের চেয়ে বুড়ো বয়সে বৌ হারালে কষ্ট বেশী হয়!

—আঃ, যাও! তাঁকে জিজ্ঞাসা করো তো, তাঁর স্ত্রীর নাম অরুণা কি না?

—বাঃ, বেশ কথা! আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, মশাই আপনার স্ত্রীর নাম কি অরুণা? যদিও ও-নাম-গুলো ছোটবেলায় তোমার কাছে শুনে শুনে মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল, তবু তিনি শুনে যদি আমায় লাঠী নিয়ে তেড়ে আসেন?

—আঃ, গিয়ে বল্‌বে, মশাই আমার স্ত্রী জিজ্ঞেস্ করেছেন, আপনার স্ত্রীর নাম কি অরুণা? তিনি কি সেণ্ট জোয়ানা স্কুলে ছেলেবেলায় পড়েছিলেন?

পরদিন বেড়াইয়া আসিয়া সুধীন রাণুকে বলিল, তুমি অনুমানে ঠিক্ ধরেছ গো! ভদ্রলোকের স্ত্রীর নাম অরুণাই বটে! নরেন বাবু তো শুনে অবাক্। বললেন, আপনার স্ত্রীর মানুষ চেনার আশ্চর্য্য ক্ষমতা তো! তা চলো একদিন তোমার বাল্যসখীর সঙ্গে দেখা করতে।

রাণু পরদিনই অরুণার সঙ্গে দেখা করিতে গেল।

বহুকাল পরে দুই সখীর মিলন।

অরুণার চেহারাও অনেক বদলাইয়া গিয়াছে। পরিচয় না পাইলে কেহ কাহাকেও চিনিতে পারিত না।

অরুণা মাথার কাপড় টানিয়া মাদুর পাতিয়া রাণুকে বসাইল। তাহার পর দুই জনে দু'জনের পঁচিশ বৎসরের ইতিহাস একটু একটু করিয়া জানিয়া লইল।

অরুণার বড় মেয়েটির বিবাহ হইয়াছে। মেজ মেয়েটি বিবাহ-যোগ্যা হইয়াছে। রাণুর বড় ছেলেটি বিবাহের উপযুক্ত হইয়াছে শুনিয়া অরুণার মনে অনেক আশা জাগিতে লাগিল। কিন্তু মনের আশা মনে রাখিল। সহসা কিছু বলিতে সাহসে কুলাইল না। সুবিধা দেখিয়া তোড়-জোড় বাঁধিয়া, তবে এ কথা পাড়িবে ভাবিয়া মনের কোণে তুলিয়া রাখিল।

রাণু দেখিল, অরুণার চঞ্চল চোখের চাহনি আজ ধীর, স্থির! প্রত্যেক কথাটি সে খুব হিসাব করিয়া শান্তস্বরে বলে। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে যে অরুণা ছিল, সে অরুণার সঙ্গে এ-অরুণার কোথাও মিল নাই। রাণুর মনে হইল, সে আজ অরুণার বাড়ী বেড়াইতে আসে নাই—সে আসিয়াছে, নরেন বাবুর বাড়ী বেড়াইতে।

এমন সময় অরুণা তাহার চাকরের হাতে কি একটা দিয়া চুপি চুপি কি কথা বলিল,—রাণুর চোখে তাহা এড়াইল না।

কিছুক্ষণ বাদে অরুণা আসিয়া অনুরোধ করিল,—একটু মিষ্টিমুখ করতে হবে।

রাণু অনেক আপত্তি করিল, এবং এই সন্ধ্যার সময়

ঠাকুর-দেবতার নাম না লইয়া সে খায় না, তাহাও জানাইল। কিন্তু অরুণা ও নরেন ছাড়িবার পাত্র নয়। তাহারা রাণুর সন্ধ্যার ব্যবস্থা করিয়া দিল। অগত্যা অরুণার অনুরোধ রাখিতে হইল। খাইতে বসিয়া রাণু অরুণাকে তাহার খাবার হইতে জোর করিয়া খাওয়াইল। অরুণা আপত্তি করিতে সে বলিল, মনে করো পঁচিশ বছর পেছিয়ে গেছো!

দুই বন্ধুরই মানসপটে পুরানো দিনের মধুর স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। তখন তাহারা ছিল নির্ম্মল, পবিত্রমনা, সরলা বালিকা। তাহাদের মনের কোন কোণে এতটুকু ময়লা ছিল না, সে জন্য সামান্য খাবার তাহারা কত কাড়িয়া খাইয়াছে, কোন দিন কোথাও লজ্জা বা সঙ্কোচ বাধা দেয় নাই। আজ দুজনেই পূর্ব্বের ব্যবহার পাইতে ব্যর্থ-প্রয়াস করিল। আজ তাহাদের মধ্যে পঁচিশ বৎসরের ব্যবধান-রেখার সঙ্গে জড়াইয়া রহিল ভদ্রতার মৌখিক শিষ্টতার বন্ধন। সেজন্য এই বহুবর্ষ পরে, দুই সখীর মিলনে তাহাদের মনের ব্যাকুলতা ভাষায় মুখর হইয়া উঠিল না। মনের মিলনের উচ্ছ্বাস কণ্ঠের নীচে আসিয়া বাধা পাইল—প্রৌঢ়ত্বের গাম্ভীর্য্যের কাছে। দুজনের আনন্দ হইল দুজনকে দেখিয়া, তবে আজ সে আনন্দ ভরা-নদীর মত পরিপূর্ণ, উচ্ছল নয়। সে আনন্দের স্রোত অন্তরের মধ্যেও চলিল গুরুগম্ভীর তালে।

অরুণা বলিল,—হ্যাঁ রে, তুইতো রায় বাহাদুরের বাড়ীতে পার্টিতে যাচ্ছিস্? তাহ'লে আবার তোর সঙ্গে দেখা হবে। সেখানে গেলে সুব্রতা, শান্তির সঙ্গে দেখা হবে। তারা আবার রায় বাহাদুরের আত্মীয় কি না!

রাণু বলিল,—হাঁ, নিশ্চয়ই যাব। তবে তুই আমার বাড়ী কবে যাচ্ছিস্?

—শীগ্‌গিরই যাব।

অরুণার ছেলে-মেয়েরা রাণুকে প্রণাম করিল; রাণু তাহাদের আশীর্ব্বাদ করিয়া গাড়ীতে উঠিল।

রাণু যেন আবার বালিকা হইল। এতদিন পরে বাল্য-সাথীদের সঙ্গে দেখা হইবে, এ আনন্দ মনের মধ্যে যেন ধরিয়া রাখিতে পারিতেছিল না! সে নিমন্ত্রণের তারিখ গণিতে লাগিল।

নিজের ব্যস্ততায় রাণু নিমন্ত্রণের দিন অরুণার পূর্ব্বেই রায় বাহাদুরের বাড়ী পৌঁছিল। বাড়ীর কর্ত্রী অত্যন্ত সমাদর করিয়া রাণুকে মহিলা-মজলিসে বসাইয়া দিলেন। রাণুর দৃষ্টি কেবল সুব্রতা, শান্তিকে খুঁজিতে লাগিল। সে মুখ দু'খানির এখানে কোথাও তো একটি আঁচড় লাগিয়া নাই।

রাণুর পাশে চশমা-পরা স্থূলকায়া এক ভদ্র মহিলা তাহার সুমার্জ্জিত সাজ-সজ্জার পরিচয় দিয়া জমকাইয়া বসিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তিনীর সঙ্গে দাঁতে চিবাইয়া খুব সাবধানে গুরু-গম্ভীর গাম্ভীর্য্য বজায় রাখিয়া কথা বলিতেছিলেন।

আলাপ অত্যন্ত তুচ্ছ! প্রথমে উঠিল কাচের ও গালার চুড়ি পরার রেওয়াজ লইয়া কথা; তাহার পর চলিল দুই গৃহিণীর ঐশ্বর্য্যের অহঙ্কারের গল্প; স্বামীর একান্ত ভালো-বাসার নিদর্শন গহনা-সাড়ীর উপহার-প্রাচুর্য্য আর জামাই-বাড়ীর ঐশ্বর্য্যের কাহিনী। সেই সঙ্গে নিজেদের দেহে বিবিধ রোগের ফিরিস্তি. রাণু বিরক্ত হইয়া আর একটু দূরে গিয়া বসিল।

সেখানে এক ভদ্র মহিলা তাহার গুরুর অলৌকিক মাহাত্ম্য-কথা প্রচার করিতেছিলেন এবং পাঁচ জন মহিলা মুগ্ধ হইয়া তাহা শুনিতেছিলেন।

এই সব আতিশয্যের আলোচনায় অস্থির হইয়া রাণু সেখান হইতেও উঠিয়া অরুণার অনুসন্ধানে গিয়া দেখিল, আগেকার স্থূলকায়া ভদ্রমহিলাটির সঙ্গে অরুণা গল্প করিতেছে।

রাণুকে দেখিয়া অরুণা বলিল,—রাণু, একে চিনতে পারছিস্ না? শান্তি রে, শান্তি!

রাণু অবাক্ হইয়া শান্তির দিকে তাকাইল! শান্তি রাণুর পরিচয় পাইয়া আনন্দ প্রকাশ করিল। কিন্তু সবই দু একটা মামুলি ভদ্রতা-মূলক?—এই, হাঁ, আর না এর মধ্য দিয়া তাহাদের কথা শেষ; তার পর অরুণা রাণুকে সেই পরম গুরুভক্তিমতী মহিলার কাছে আনিল।

-- এই সুব্রতা—একে চিনতে পারছিস্?

সুব্রতা তখন গুরু-ভক্তিতে আচ্ছন্ন! সে শুধু একবার রাণুর দিকে চাহিল; কোনো কথা বলিল না।

অরুণা বলিল,—ওরে, এ রাণু! চিনতে পারছিস্ না?

সেই যে আমাদের সঙ্গে পড়্‌তো। ওর বিয়েতে আমরা নেমন্তন্নে গিয়েছিলুম। মনে হচ্ছে না?

সুব্রতা আবার একবার রাণুর দিকে চাহিয়া বলিল, ওঃ—তা বোসো। বলিয়া সে গুরুর মহিমা-আলোচনার উচ্ছ্বাস-তরঙ্গে ভাসিয়া চলিল।

অরুণার সঙ্গেও আজ তাহার বেশী কথা হইতে পারিল না। অরুণার ছোট ছেলেটি কাঁদিয়া অস্থির—রাণুর সঙ্গে অরুণাকে গল্প করিতে দিল না। যা দু-একটি কথা হইল, তাহাও সংসারের সুখ-দুঃখের।

রাণু বাড়ী ফিরিল অনেক রাত্রে। বাড়ীর সকলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। আস্তে আস্তে ঘরের সম্মুখের বারান্দায় আসিয়া সে দাঁড়াইল। শুভ্র জ্যোৎস্না সুপ্ত পৃথিবীর বুকে যেন মায়া-জাল বিস্তার করিয়াছে—সে জ্যোৎস্নায় রাণুর মনে কৈশোরের সহস্র সুখস্মৃতি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল!

তাহার বাড়ীর নীচতলাটা এক বালিকা-বিদ্যালয় ভাড়া লইয়াছিল। দুপুর বেলায় বড় গোলমাল করে, সে জন্য সুধীনকে বলিয়া উহাদের উঠিয়া যাইবার জন্য নোটিশ দেওয়া হইয়াছে।

নীচে উঠানের দিকে চাহিয়া সে দেখিল, এখনও সেখানে লার উপর মেয়েদের পায়ের দাগ। তাহাদের খাবারের ঠোঙায়, খাতার ছেঁড়া পাতার জঞ্জালে উঠান ভরিয়া আছে। অন্য দিন ইহা দেখিয়া সে বিরক্ত হইত। আজ বালিকাদের এই চঞ্চল পায়ের দাগ এবং এই আবর্জ্জনা তাহার কাছে বড়ই মনোরম মনে হইল!

মনে পড়িল, সে-দিন স্কুলে যাওয়ার সময় মেয়ে বাণী ভাঁড়ার ঘরে গিয়া তেঁতুল চুরি করিতেছিল,—রাণুর নজরে সে চৌর্য্য ধরা পড়ায় রাণু শুধু তেঁতুল কাড়িয়া লইয়া ক্ষান্ত হয় নাই, বাণীকে একটা চড়ও মারিয়াছিল। আজ এই নিস্তব্ধ নিশীথে রাণুর মনে সে দিনকার ভুল ও অন্যায় কাযের প্রতিচ্ছবি সে দেখিতে পাইল। কেন সে বাণীর অমন আনন্দে বাধা দিয়াছিল? কি করিয়া সে নিজের ক্লাশে বসিয়া তেঁতুল খাওয়ার স্মৃতি ভুলিয়া গিয়াছিল?

রাণুর মেজ মেয়েটির অল্প দিন বিবাহ হইয়াছে। আজ নূতন জামাই আসিয়াছেন। তাহাদের ঘর হইতে অস্পষ্ট গুঞ্জন ও হাসির স্রোত হাওয়ায় ভাসিয়া আসিতেছিল। রাণুর মনে অনেক দিনের অনেক কথা জাগিয়া উঠিল! সেই মধুর আনন্দময় দিনগুলির স্মৃতি রাণুর বুকে স্পন্দন তুলিল।

তার পর রাণু ধীরে ধীরে ঘরে আসিয়া স্বামীর বিছানায় বসিল। জানালা দিয়া জ্যোৎস্না আসিয়া সুধীনের মুখে পড়িয়াছে, রাণু মুগ্ধ নয়নে সেদিকে তাকাইয়া রহিল।

আজ পঁচিশ বৎসর ধরিয়া এই মুখ সে দেখিয়া আসিতেছে! তবু মনে হইল, স্বামীকে সে আজ নূতন করিয়া দেখিতেছে! এ যেন সেই ফুলশয্যার রাত্রি! সে যেন নবোঢ়া বধূ! অভিসারে আসিয়াছে নব-পরিচিত প্রিয়ের কাছে।

রাত্রে কেন এমন মনে হয়! দিনের [illegible] [illegible]', রাত্রে সে হয় রাণু!

স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া চণ্ডীদাসের একটা পদ' মনে পড়িল,—

জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল!

ঘুমের ঘোরে রাণুর কোলের উপর সুধীন একটা হাত [illegible]াখিল।

রাণুর মানস-পটে ছায়াচিত্রের মত ফুটিয়া উঠিল, প্রভাতের বাল-সূর্য্যের তরুণ আলোয় উদ্দীপ্ত [illegible] জীবন, কৈশোরের আনন্দময় প্রদীপ্ত জীবন, যৌবনের প্রেমরসে ভরা স্বপ্নময় জীবন! যেন [illegible] ভূলোক, দ্যুলোক ঝলসিত করিয়া জ্যোতির্ম্ময় পথ দিয়া বরাবর চলিয়া আসিয়াছে,—তাহার একান্ত-কাম্য এই পরিচিত স্থানটিতে।

জীবনের যে সুর হারাইয়াছে ভাবিয়া হৃদয়ে সে দারুণ দৈন্য অনুভব করিতেছিল, সে সুর হারায় নাই! হৃদয়-বীণায় বিস্মৃত-প্রায় সে সুর আজ আবার তেমনই তানে ঝঙ্কার তুলিয়াছে!

শ্রীমতী [illegible] দেবী।

চাঁপদাড়ি রাজপুত্র

(রূপকথা)

মস্ত রাজা। রাজার একটি মাত্র কন্যা। কন্যাটি পরমা-সুন্দরী। রাজা-রাণীর আদরে কন্যার অহঙ্কারের সীমা নেই! অহঙ্কারে রাজকন্যা দুনিয়ার পানে ভ্রূক্ষেপ করেন না!

কন্যা বড় হলেন। এবারে তাঁর বিয়ে দিতে হবে। দেশ-বিদেশ থেকে ঘটক এলো ভালো-ভালো রাজপুত্রের খপর নিয়ে! রাজকন্যা বল্লেন,—বয়ে গেছে আমার বিয়ে করতে!

রাজা-রাণী প্রমাদ গণলেন! রাণী বকলেন—বিয়ে করবি না কি! রাজকন্যারা চিরদিন বিয়ে করে,—আর তোর যত অনাসৃষ্টি ব্যাপার!

রাণীর কথায় রাজকন্যা ফুঁপিয়ে কেঁদে গোসা-ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। কন্যা খান না, দান না, ঘর থেকে বার হন না। উঠলেন না। রাজা এসে কন্যাকে বল্লেন,—কাঁদিস নে, মা। আমার সঙ্গে আয় তুই রাজসভায়!

কিন্তু আদরে-আবদারে ভুলিয়ে রাখলে তো চলবে না! মেয়ে ডাগর হয়েছে—বিয়ে দিতে হবে! না হলে রাজ্যময় নিন্দা রটবে!

রাজা বল্লেন—উপায় কি করি, বলো রাণী? যে তোমার মেয়ের মেজাজ!

রাণী বল্লেন—এক কাজ করুন, মহারাজ! আমার ব্রত-উদ্‌যাপন হবে বলে যত রাজ্যের রাজপুত্রদের নিমন্ত্রণ করুন। জাঁক-জমকে সভা বসান। রাজপুত্রেরা সভায় বসলে মেয়েকে দেখতে পাঠাবো। কাউকে-না কাউকে পছন্দ হবেই। যাকে পছন্দ করবে, তাকে পাত্র স্থির করে বিয়ে দিন।

রাজা বল্লেন—বেশ। তাই হোক্!

এবং তাই হলো। আসর বস্‌লো। অমন পাঁচ-সাতশো রাজ্যের রাজপুত্র নিমন্ত্রিত হয়ে আসরে এসে বস্‌লেন। বাজনা-বাদ্যি, হাতী-ঘোড়া, লোকজনের ভিড়ে সারা রাজ্য একেবারে গমগম্ করতে লাগলো।

সখীরা রাজকন্যাকে আসরে নিয়ে এলো। বল্লে,—কি সুন্দর সুন্দর সব রাজপুত্র এসেছেন, ভাখো সখি!

ভুরু কুঁচকে নাক তুলে রাজকন্যা বল্লেন,—ছাই সুন্দর! ঐ তো গড়মান্দারের রাজপুত্র—পেট মোটা যেন জয়ঢাক! আর ঐ গড়জাঙ্গালের রাজপুত্র···যেন সিড়িঙ্গে পাঁকাঠি! আর ঐ গড়মগুলের রাজপুত্র···যেন কোলা ব্যাঙ্!

এমনি করে কোনো রাজপুত্রকে তিনি বল্লেন—জুতোর শুকতলা; কাকেও বল্লেন পায়ের খড়ম; কাকেও বল্লেন, কাঠের পুতুল! কাকেও বল্লেন, জাম্বুবান, হনুমান! সব-চেয়ে বড় রাজ্যের রাজপুত্রকে বল্লেন—ওমা, ভাখ্ ভাখ্, এটা চাঁপদাড়ি!

এ সব কথা শুনে রাজপুত্রের দল অপমান বোধ করে রেগে না খেয়ে-দেয়ে রাজ্য ছেড়ে চলে গেলেন। রাজা মাথা চাপড়ে সভা ছেড়ে অন্দরে এলেন। রাণী তখন মূর্চ্ছা গেছেন! রাজকন্যার সেদিকে লক্ষ্যই নেই!

রাজা খুব চটে গেলেন, রাণীকে ডেকে বল্লেন—শোনো, আমি পণ করলুম, কাল ভোরে উঠে বাইরে যে লোকের মুখ দেখবো, তারি সঙ্গে দেবো তোমার কন্যার বিয়ে! কারো মানা আমি শুনবো না, বুঝলে!

রাগ করে রাজা গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। রাণী মহা-দুশ্চিন্তায় পড়লেন। রাজাকে তিনি জানেন! পণ করলে সে পণ তিনি রক্ষা করেন! তা থেকে এতটুকু বিচলিত হন না!

রাণী করলেন কি, চুপিচুপি মন্ত্রীকে ডাকলেন, ডেকে রাজার পণের বৃত্তান্ত বল্লেন।

বৃত্তান্ত বলে' রাণী মিনতি জানালেন,—দেখবেন মন্ত্রী মশায়, আপনি লোকজনদের ডাকিয়ে এমন ব্যবস্থা করে দিন, যেন কাল সকালে পথে লোকজন না বার হয়, সেই বেলা বারোটা পর্য্যন্ত। সারা রাজ্যে কাল হরতাল ঘোষণা করুন। কিন্তু সাবধান, মহারাজ যেন এ-কথা জানতে না পারেন!

মন্ত্রী বল্‌লেন—যে আজ্ঞে, মহারাণী!

পরের দিন সকালে রাজা ঘুম ভেঙ্গে উঠলেন। উঠে রাজা এসে বসলেন সদর-বাড়ীর বারান্দায়। পথে লোক নেই, জন নেই! রাজা ভাবলেন, ব্যাপার কি?

খাশ-খানশামাকে জিজ্ঞাসা করলেন,—ব্যাপার কি রে, মাধা?

মাধা বল্‌লে—আজ্ঞে, রাজ্যময় আজ হরতাল, মহারাজ!

—হরতাল কেন?

—তা জানি না, মহারাজ।

রাজা বল্‌লেন—হুঁ!...আচ্ছা, ডাক্ মন্ত্রী-মশায়কে।

মন্ত্রী-মশায় এলেন। রাজা বল্‌লেন—রাজ্যে হরতাল কেন, মন্ত্রী?

মাথা চুলকে মন্ত্রী বললেন,—বোধ হয় বিদেশী রাজপুত্রদের অপমান দেখে প্রজারা হরতাল করেছে!

রাজা বল্‌লেন—ঘটে!

রাজা কিছু বল্‌লেন না। ভাবলেন, ভালো হয়েছে। না হলে যে পণ করেছেন, শেষে রাজকন্যাকে কার হাতে তুলে দিতে হতো!

সারাদিন হরতাল চল্‌লো। সন্ধ্যার আগে হঠাৎ কোথা থেকে এক ভিখিরী এলো। পথে খঞ্জনী বাজিয়ে সে গান গাইছিল!

কে গায়? দেখতে রাজা যেমন পথের দিকে চেয়েছেন, অমনি ভিখিরীর সঙ্গে চোখোচোখি! ভিখিরী বল্‌লে,—দুটি ভিখ পাই, মহারাজ!

মহারাজ শিউরে উঠলেন। সর্ব্বনাশ! ভিখিরী তো বাইরের লোক। তার মুখ আজ প্রথমেই দেখলেন! পণ রক্ষা করতে এর সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে দিতে হবে! না হলে সত্যভ্রষ্ট হবেন!

মাধাকে দিয়ে ভিখিরীকে ডাকিয়ে আনালেন। বল্‌লেন, —ভিক্ষা পাবে না বাপু। রাজকন্যাকে বিয়ে করতে হবে। আমি পণ করেছি কি না! অর্থাৎ...

ভিখিরী মহা-খুশী!

রাজা আদেশ দিলেন—রাজকন্যার বিয়ের ব্যবস্থা করো!

রাণী কাঁদলেন, মন্ত্রী কাঁদলেন, সভাসদ্-অমাত্যেরা কাঁদলো, প্রজারা কাঁদলো। রাজকন্যাও শেষে কেঁদে ফেল্‌লেন।

রাজা বল্‌লেন—কারো কান্নায় রাজার পণ টলে না, কখনো টলেনি। কোনো দিন টল্‌তে পারে না!

উপায় নেই! ভিখিরীর সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে হলো।

এবং বিয়ের পর রাজকন্যাকে নিয়ে ভিখিরী চল্‌লো নিজের ঘরে!

রাজা-রাণী অনেক মণি-মাণিক্য দিলেন, টাকা-মোহর দিলেন। ভিখিরী বল্‌লে,—গরীব ভিখিরী হলেও আমি শ্বশুরের পয়সায় নবাবী করতে পারবো না, মহারাজ! শুধু কন্যা নিয়ে যাবো।

রাজকন্যা কাঁদতে কাঁদতে ভিখিরীর সঙ্গে চল্‌লেন স্বামীর ঘরে।

রাজা হাতী দিয়েছিলেন, ঘোড়া দিয়েছিলেন। ভিখিরী বল্‌লে—আমি ভিখিরী মানুষ, নিজের দিন চলে না, রাজার হাতী-ঘোড়ার খোরাক জোগাবো কোথা থেকে? না মহারাজ, আমার বৌ আমার সঙ্গে পায়ে হেঁটে আমার ঘরে যাবে! গরীবের ঘরে ঐশ্বর্য্য মানায় না। তা ছাড়া এত মণি-মাণিক্য, মোহর-টাকা দেখলে বাড়ীতে ডাকাত পড়বে। আপনার ঐশ্বর্য্য আপনি রেখে দিন!

রাণী লুকিয়ে রাজকন্যার আঁচলে বেঁধে দিলেন মোহর; বল্‌লেন—লুকিয়ে রেখো মা। যা ইচ্ছা হবে, মোহর ভাঙ্গিয়ে কিনে খেয়ো!...

রাজকন্যাকে নিয়ে পায়ে হেঁটে ভিখিরী চললো নিজের ঘরে। রাজ্য জুড়ে প্রজার দল চোখের জল মুছতে লাগলো। হোক অহঙ্কারী, এই রাজ্যের রাজকন্যা তো!

বহু নগর-গ্রাম পেরিয়ে দু'জনে বনে এলেন। বনে কত ফলের গাছ, ফুলের গাছ। গাছে গাছে কত পাখী কলগুঞ্জন করছে। কত দীঘি। তাতে কাকচক্ষু-জল টল-টল করছে।

রাজকন্যা বল্‌লেন—এ কোন্ রাজার বন গা? খাশা বন তো!

ভিখিরী বল্‌লে—যে-রাজপুত্রকে তুমি চাঁপদাড়ি বলে অপমান করেছিলে, এ হলো তাঁর বাপের রাজত্ব! সে রাজপুত্রকে যদি বিয়ে করতে, তা হ'লে এ বন তোমার হতো।

রাজকন্যা শুধু নিশ্বাস ফেল্‌লেন, কোনো কথা বল্‌লেন না।

পরের দিন পথের দু'ধারে ক্ষেত। সোনালি-ধানে ক্ষেত ভরে আছে। রাজকন্যা বললেন—এ সব ক্ষেত কোন্ রাজার?

ভিখিরী বল্‌লে—এ'ও সেই চাঁপদাড়ি-রাজপুত্রের বাপের রাজ্য!

মস্ত-বড় রাজ্য! চলে-চলে রাজ্য আর শেষ হয় না! রাজকন্যা আবার নিশ্বাস ফেল্‌লেন।

এর পর মস্ত এক সহর। বাড়ী-ঘর, দোকান-পাট, গাড়ী-ঘোড়া, লোকজন একেবারে গিশ্‌গিশ্ করছে। রাজকন্যা বল্‌লেন—এ কার রাজ্য?

—এ'ও সেই চাঁপদাড়ি রাজপুত্রের বাপের রাজত্ব! সে রাজপুত্রকে বিয়ে করলে একদিন এ-রাজ্যের রাণী হতে!

বাস্ রে, এত বড় রাজত্বের রাজপুত্র! রাজকন্যা নিশ্বাস ফেল্‌লেন।

অবশেষে চলে চলে দু'জনে এলেন সরু গলির শেষে ভাঙ্গা এক কুঁড়ে-ঘরের সামনে। ভিখিরী বল্‌লে—এই আমার ঘর। এসো রাজকন্যা।

রাজকন্যার মনে হলো, ডাক ছেড়ে তিনি কাঁদেন! শেষে এই ইঁদুরের গর্ত্তে বাস করতে হবে? কিন্তু কাঁদলেন না! কাঁদলে তাঁর দর্প চূর্ণ হবে! তিনি বল্‌লেন—চলো।

ভিতরে লোকজন নেই, কেউ নেই। রাজকন্যা বল্‌লেন, —তোমার দাসী-চাকরদের ডাকো। কাকেও দেখতে পাচ্ছি না যে!

ভিখিরী বল্‌লে—ভিখিরী-মানুষের দাসী-চাকর থাকে না, রাজকন্যা! রান্নাবান্না ঝাঁটপাট—সব কাজ তোমায় করতে হবে। আমি করবো ভিক্ষে।...এখন এক কাজ করো। বসলে চলবে না। উনুনে আগুন দাও; দিয়ে হাঁড়ি-কুড়ি চাপিয়ে রান্নাবান্না করো। আমি পুকুরে চান করে আসি। এসে যেন ভাত পাই। বড্ড খিদে পেয়েছে, বুঝলে!

কথাটা বলে ভিখিরী দাঁড়ালো না। গঞ্জনী রেখে, ভিক্ষার ঝুলি রেখে চান করতে বেরিয়ে গেল।

রাজকন্যার দু'চোখে জল-ধারা! মার জন্য মন-কেমন করতে লাগলো। বাপের উপর রাগে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে উঠলো! কি বলে বাপ হয়ে ভিখিরীর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেছেন?

কিন্তু রাগ করে লাভ নেই! তেজ চূর্ণ হবে! লোকে হাসবে!...

রাজকন্যা উনুন জ্বাল্‌লেন,—রান্নাবান্না করলেন। ভিখিরী এলো চান করে, বল্‌লে—দুজনের ভাত বাড়ো। খেয়ে নেওয়া যাক। তার পর তোমাকে বাসন মেজে বিছানা পেতে দিতে হবে। বড্ড ঘুম পাচ্ছে। আমি ঘুমোবো।

রাজকন্যাকে তাই করতে হলো। তাঁরও যেমন খিদে পেয়েছে, তেমনি ঘুম! জীবনে পথ চলেন নি! এতখানি পথ হেঁটে আসতে প্রাণ যেন বেরিয়ে গেছে!

এমনি করে দু'দিন যায়, দশ দিন যায়! এক দিন ভিখিরী ভিক্ষা করে বাড়ী ফিরে এসে ডাকলো—রাজকন্যা...

রাজকন্যা ঝোল রাঁধছিলেন, বল্‌লেন—কেন?

ভিখিরী বল্‌লে—বসে বসে শুধু রান্নাবান্না করলেই চলবে না। ঐ কোণে থলির মধ্যে তুলো আছে। তুলো পিঁজে ঘরে যে-চর্কা আছে, সেই চর্কা চালিয়ে সুতো কাটো। সেই সুতোয় কাপড় বুনতে হবে—তোমার শাড়ী, আমার ধুতি-চাদর। আমি ভিখিরী মানুষ। দোকান থেকে কাপড় কিনবো, সে সঙ্গতি আমার নেই।

রাজকন্যার চক্ষুস্থির! কিন্তু উপায় কি? রান্নাবান্না সেরে ঘরকর্ণার কাজ সেরে তুলো পিঁজে সুতো কাটতে বস্‌লেন।

কিন্তু সুতো কাটতে জানেন না তো...কাজেই সুতো আর হয় না! সন্ধ্যার সময় ভিখিরী এসে বল্‌লে—নাঃ, কোনো কাজ জানো না! তুলোগুলো আর নষ্ট করো না! তার চেয়ে এক কাজ করো। শুনলুম, চাঁপদাড়ি রাজার রান্নাবাড়ীর জন্যে ওরা এক জন দাসী খুঁজছে। উনুনে আগুন দিতে হবে, রান্নাঘর ধুতে হবে, বাসন-কোশন মাজতে হবে। মাইনে মাসে দু'মোহর। চলো, কাল সকালে রাজবাড়ীর রাঁধুনীর কাছে তোমায় নিয়ে যাই। সারাদিন চাকরি করে রাত্রে ঘরে আসবে।

রাগে রাজকন্যার আপাদ-মস্তক জ্বলে উঠলো। কিন্তু সে

রাগ চেপে রইলেন। যে-রাজার ঘরে রাণী হতেন, সে-রাজার রান্নাবাড়ীতে আজ যাবেন তিনি দাসীর কাজ করতে!

চোখ ফেটে জল আস্‌ছিল, জোর করে রাজকন্যা চোখের জল রোধ করলেন! এতটুকু আঘাত বা প্রতিবাদ জানালেন না! জানালে নীচু হতে হবে! তা হতে পারবেন না!

পরের দিন ভিখিরীর সঙ্গে রাজকন্যা চল্‌লেন রাজ-বাড়ীতে। রাঁধুনির সঙ্গে কথাবার্ত্তা হলো এবং রাজকন্যা সেই দিনই রান্নাবাড়ীর দাসীগিরি-চাকরিতে বাহাল হলেন।

দু'মাস যায়···চার মাস যায়···

এক দিন সকালে রাজবাড়ীতে এসে রাজকন্যা দেখেন, রাজবাড়ীতে ভারী ধূম চলেছে। দাস-দাসীরা রঙ-করা কাপড় পরে কাজ-কর্ম্ম করছে—নবৎখানায় নবৎ বাজছে। মহা সোরগোল!

রাজকন্যা বল্‌লেন,—এত গোলমাল কিসের, বামুনঠাকুর?

বামুন-ঠাকুর বললে—বড় রাজপুত্তুরের বিয়ে হবে। তার আয়োজন!

রাজকন্যা আর চোখের জল সামলাতে পারলেন না! কিসের তাঁর এত অহঙ্কার ছিল যে, ঐ রাজপুত্রকে চাঁপদাড়ি বলে অপমান করেছিলেন! তিনি আজ সেই চাঁপদাড়ির বাড়ীতে সামান্য এক জন দাসী! এঁটো বাসন মেজে তাঁর দিন কাটছে! সেদিন দাঁড়িয়ে রাজপুত্রকে যদি অপমান না করতেন, তা হ'লে এ-বাড়ীতে তিনি আজ···

বামুন-ঠাকুর বল্‌লে—উনুনে আগুন দাও। বেলা হয়ে গেছে!

রাজকন্যা কোনো কথা বলতে পারলেন না। অশ্রুর বন্যায় যেন ভেসে চলেছেন কোথায় কোন্ কূলহারা প্রান্তর-পারে!

রাজবাড়ীর খানসামা এসে ডাকলে,—ওগো দাসীদিদি, রাণীমা তোমার জন্য কাপড় পাঠিয়েছেন। আজকের দিনে এই কাপড় পরে কাজ করবে।

কাগজে-মোড়া শাড়ী রেখে খানশামা চলে গেল।

রাজকন্যা বসে বসে কাঁদতে লাগলেন। চোখের জল কিছুতে আজ আর বাঁধ মানে না···

এমন সময় বেনারশী-জোড় পরে সেখানে এলেন রাজপুত্র। বরের বেশ! তাঁর সঙ্গে রাজপুরীর মেয়েরা এলেন সজ্জিত বেশে। তাঁদের কারো হাতে শঙ্খ, কারো হাতে চন্দনের বাটি, কারো হাতে ফুলের মালা···

দেখে রাজকন্যা আর স্থির থাকতে পারলেন না। তাঁর পায়ের তলার মাটী যেন দুলে উঠলো! রাজকন্যা চেতনা হারিয়ে মূর্চ্ছা গেলেন!

হঠাৎ মনে হলো, কোথা থেকে যেন রথ এলো! যেন রথ থেকে নামলেন চাঁপার বরণ রাজপুত্র! যেন রাজকন্যার হাত ধরে রাজপুত্র ডাকছেন—রাজকন্যা···রাজকন্যা···

রাজকন্যা চোখ মেলে চাইলেন। না, স্বপ্ন নয়! দেখলেন, তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বরবেশী রাজপুত্র···তাঁর হাত ধরে তিনি ডাকছেন,—রাজকন্যা···

রাজকন্যা ধড়মড়িয়ে উঠে বস্‌লেন।

মেয়েরা শঙ্খধ্বনি কর্‌লেন। একখানি সুন্দর হাত রাজ-কন্যার ললাটে চন্দন-তিলক এঁকে দিলে···

রাজপুত্র বল্‌লেন,— ভয় নেই, রাজকন্যা। আমি তোমার সেই ভিখিরী বর,··সেই চাঁপদাড়ি রাজপুত্র। তোমায় দেখে মুগ্ধ হয়েছিলুম। তোমার সে অপমান আমার গায়ে বেঁধেনি। তোমার কথায় সে-দাড়ি কামিয়ে ফেলেছি। ফেলে তোমার বাবার পণের কথা শুনে আমিই ভিখিরী সেজে তাঁর সামনে গিয়েছিলুম। আমিই ভিখিরী-বেশে তোমাকে বিয়ে করে এনেছি। তোমাকে কষ্ট দিয়েছি ঢের, সেজন্য কিছু মনে করো না। তোমার এমন রূপ! এ-রূপে গর্ব্ব-অহঙ্কার শোভা পায় না! তাই তোমার সে-অহঙ্কার চূর্ণ কর্‌বার জন্য একটু শিক্ষা দিয়েছি। রাজকন্যা হয়ে তুমি ভিখিরীর ঘরে রান্নাবান্না করেছো, ঝাঁটপাট দেছো, রাজ-বাড়ীর রান্নাঘরে দাসীর কাজ করেছো,—এতে তোমার মনের সে অহঙ্কার-কালি মুছে গেছে! আজ এসো, ভিখিরীর খোলশকে ছেড়ে রাজপুত্রের বেশে রাজকন্যা বিয়ে করি।

সখীরা রাজবধূর বেশে রাজকন্যাকে সাজিয়ে দিলেন। শঙ্খের রবে, বাজনা-বাদ্যের সমারোহে আনন্দ-উৎসবের ব্যবস্থা হলো। রাজকন্যা সুখী হলেন।

রাজকন্যার মা আর বাবা? হ্যাঁ, তাঁরা এ বিয়েতে এসেছিলেন বৈ কি! তাঁদেরও খুব আনন্দ হলো!

শ্রীসত্যেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

পশু-কৌতুক

মানুষই শুধু খেলা-ধুলা করিতে জানে, এমন ভাবিয়ো না! পশু-পক্ষীরাও খেলা ভালোবাসে এবং খেলায় তাদের বড় আনন্দ! বিড়াল-ছানাদের দেখিয়াছ তো বাতাসে গাছের পাতা উড়িয়া চলিয়াছে, বিড়াল-শিশু অমনি ছুটিল সেই পাতার পিছু-পিছু—লাফাইয়া কখনো ঝরা পাতার উপরে পড়ে, কখনো পাতায় দেয় মৃদু কামড়। এ খেলার ছন্দ অভ্যাস করিয়া পরে সে এমনি ভঙ্গীতে ইঁদুর ধরিতে শিখে। অপর বিড়াল-শাবকদের সঙ্গেও তাদের খেলার লীলা তোমরা নিশ্চয় দেখিয়াছ! পা তুলিয়া মারামারির অভিনয়, গায়ে গা দিয়া আদর-প্রার্থনা! এমনি করিয়া তারা আত্মরক্ষার কৌশল শিক্ষা করে। এ

টিমথি ও টিনি

যুগে ছেলেমেয়েদের যেমন কিণ্ডারগার্টেন-প্রথায় হাতে-কলমে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে, ইতর প্রাণিজগতেও তেমনি নিত্য-খেলার ভঙ্গীতে তারা শিক্ষা লাভ করে।

খেলাধুলায় তোমাদের মনে যেমন অশান্ত দুরন্ত ভাব জাগে, ইতর প্রাণিজগতেও তেমনি দুরন্তপনার অন্ত দেখি না। মানুষের চোখের আড়ালে পশু-পক্ষীর সংসারে মায়ের সঙ্গে শাবকদের খেলার যে লীলা চলে, সত্যই তাহা লক্ষ্য করিবার মতো।

এ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞরা বহু ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছেন এবং পশুপক্ষীর খেলাধুলা দেখিয়া তাঁরা বুঝিয়াছেন, পশু-সমাজে রসজ্ঞতা এবং কৌতুক-প্রিয়তার সীমা নাই। তোমরা যেমন বেচারী-বন্ধুদের লইয়া মর্মান্তিক তামাসা করো, ইতর প্রাণীর দলেও তেমনি মর্মান্তিক তামাসার লীলা চলে। শ্রীমতী ফ্রান্সেশ পিট্ পশুপক্ষী সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানেন। তিনি বলেন, আমার ঘরে আছে পোষা কুকুর এবং পোষা শ্যাক-শিয়ালী। শ্যাক-শিয়ালীটির নাম টিমথি; কুকুরের নাম টিনি। টিমথি আর টিনিতে

কুকুরে-ভোঁদড়ে

ভারী ভাব। দুজনে মিলিয়া মিশিয়া কত খেলা যে করে! দেখিয়া মনে হয়, যেন দুটি মানব-শিশু! টিনির মেজাজ একটু গম্ভীর—তাকে লইয়া টিমথির দুরন্তপনার সীমা থাকে না। টিনি বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করিতেছে,

খেলার ধারা

নিঃশব্দে টিমথি আসিয়া তার ল্যাজ ধরিয়া টানিল, পা ধরিয়া টানিল—নানা রকমে জ্বালাতন সুরু করিয়া দিল। টিনি কখনো তার এ ব্যবহারে রাগ করে না।

বয়স-বাড়ার সঙ্গে মানব-সমাজে খেলার রুচি ও সখ কমিয়া যায়; পশুপক্ষী-সমাজেও ঠিক তাই ঘটে। পেট ভরিয়া খাইয়া-দাইয়া যদি নিশ্চিন্ত সুখে সুখী থাকে, তবেই বয়স্ক পশু-পক্ষীর খেলায় স্পৃহা জাগে।

পশুপক্ষীদের মধ্যে কতকগুলির বুদ্ধি তীক্ষ্ণ, কতকগুলি একটু নীরেট! যে সব পশুপক্ষীর বুদ্ধি তীক্ষ্ণ, তাদের মধ্যে মজা এবং দুরন্তপনা করিবার প্রবৃত্তি বেশ প্রবল। প্রাণিতত্ত্ববিদ্ প্রোফেশর কোহ্লার 'বানরের মনস্তত্ত্ব' নামে একখানি বই লিখিয়াছেন। এ বইয়ে তিনি চিকা নামে এক বানরের কথা বিশেষভাবে লিখিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, দলের বানর-বানরীরা চুপ করিয়া বসিয়া আছে দেখিলেই চিকার মনে দুষ্টামির বাসনা জাগ্রত হয়। লাঠি বা ছড়ি লইয়া সকলের পিছন হইতে আসিয়া চিকা তাদের খোঁচা দিবে। এ রোগের ব্যতিক্রম কোনো দিন দেখি নাই।

বানরে মুর্গীগুলাকে বড় বিরক্ত করে। কোথা হইতে রুটীর টুকরা আনিয়া ভূমে ছড়াইয়া দিল। রুটির টুকরা দেখিয়া মুর্গীরা আসিল সে-রুটি খুঁটিয়া খাইতে। অমনি ক্ষিপ্রহস্তে রুটির টুকরা কুড়াইয়া বানরগুলা কৌতুক উপভোগ করে। এ দৃশ্য প্রোফেশর কোহ্লার বহু বার প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

কাকের দলেও কৌতুক-রঙ্গ-ভরা এমনি দুষ্টামির বহু পরিচয় পাওয়া যায়। কুকুর-বিড়ালদের লইয়া কাকের দুষ্টামি চলে সবচেয়ে বেশী। প্রোফেসর কোহ্লারের পশুশালায় ছিল দুটি পোষা কাক। তাদের নাম বেন্ আর জো। বাড়ীর পোষা বিড়াল কোথা হইতে এক টুকরা মাছ বা মাংস আনিয়া উঠানের কোণে বসিল সেটির সদ্ব্যবহার করিতে—বেন-কাক আসিয়া বিড়ালের পিছন হইতে দিল তাকে ঠোঁটের দুটো ঠোকর! বিড়াল ভোজ্য লইয়া একটু দূরে সরিয়া গেল; তবু তার নিস্তার নাই! ঘুরিয়া ফিরিয়া বেন আবার তার কাছ ঘেঁষিয়া আসিয়া আবার মারিল ঠোকর! বিড়াল আরো দু'পা হটিয়া গেল। বেন ডাকিল, কা-কা! অমনি দোশর জো আসিয়া আসরে দেখা দিল। তার পর দু'জনে মিলিয়া জ্বালাতন সুরু করিল। বেন্ একবার বিড়ালকে খোঁচায়, বিড়াল বেনের কাছ হইতে দূরে সরিয়া যায়; জো অমনি ও-দিক হইতে ঠোকর সুরু করে। বেচারী বিড়াল বিব্রত! নিজেকে রক্ষা করিবে, কি ভোজ্য রক্ষা করিবে, ভাবিয়া স্থির করিতে পারে না! এবং তার এমনি দ্বিধা-সংশয়ের মাঝখানে একটা কাক তার ভোজ্যখণ্ড লইয়া শূন্যে উড়িল! বিড়াল প্রায় কাঁদিয়া খুন। কাককে আক্রমণ করিতে লম্ফ দেয়, কিন্তু কাকের সঙ্গে পারিবে কেন? বহুক্ষণ ফ্যাল-ফ্যাল্ করিয়া নিরাশ নয়নে তাদের পানে চাহিয়া মনের দুঃখে বিড়াল বেচারী আসর ছাড়িয়া প্রস্থানোদ্যত হয়, অমনি কাকের মুখ হইতে ঝুপ্ করিয়া ভোজ্যখণ্ড আসিয়া সামনে পড়ে।

মতলব ভাঁজা

প্রোফেসার কোহ্লার বলেন, এমন কাণ্ড বহু দিন আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি! এ খেলার মধ্যে কাকের তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়!

আর এক জন ভদ্রলোক পশু-পক্ষীর দুষ্টামির প্রসঙ্গে লিখিতেছেন—আমার একটি পোষা ম্যাগপাই পাখী আছে। তার নাম রাখিয়াছি জ্যাক। তার কৌতুকপ্রিয়তা অসাধারণ। এক দিন দুটো কুকুর ভিখারীর মতো আমার পানে চাহিয়া খাদ্য প্রার্থনা করিল। দিলাম তাদের সামনে দুটা বিস্কুট ছুড়িয়া। কুকুর দুটা তখনি তাহা গ্রহণের জন্য ছুটিয়া আসিল। কাছে ছিল ম্যাগপাই জ্যাক। তার কি খেয়াল হইল, সে আসিয়া একবার এ-কুকুরের, এবং পরক্ষণে ও কুকুরের ল্যাজ ধরিয়া সবলে টান্ দিল; দিয়াই নেপথ্যে অপসরণ! অমনি কুকুর দুটো রাগে অন্ধ হইয়া বিস্কুট ফেলিয়া পরস্পরে

কামড়াকামড়ি সুরু করিয়া দিল ! ম্যাগপাই এ কাণ্ড দেখিতে লাগিল। কুকুরদের ঝগড়া থামিলে আবার তারা আসিল বিস্কুট লইতে—ম্যাগপাই আসিয়া আবার তাদের ল্যাজে দিল টান্ ! এমনি করিয়া আধঘণ্টা কাল কুকুর-দুটাকে সে নাস্তানাবুদ খাওয়াইয়াছিল !

এ দুষ্টামির অন্তরালে এতটুকু অনিষ্ট-চিন্তা নাই—নিছক কৌতুক !

জলের অটার বা ভোঁদড় জীবটিরও খেলার স্পৃহা খুব বেশী। অনেক সময় জল ছাড়িয়া তীরে উঠিয়া তারা দৌড়-বাজি সুরু করিয়া দেয়। সে সময় তাদের উল্লাসের সীমা থাকে না ! গড়াগড়ি দিয়া এ উহার ঘাড়ে চড়িয়া কৌতুক-রঙ্গ জমাইয়া তোলে অনেকখানি ! তাদের খেলা দেখিয়া বিস্ময় বোধ হয়। সে-খেলায় তারা নিয়ম-কানুন মানিয়া চলে। খাদ্য চাহিয়া অটার তীব্র বাসনায় জলের বুকে খাড়া উঠিয়া দাঁড়ায়; সে-সময়ে তার মুখ-চোখে যে-ভঙ্গী হয়, সে ভঙ্গী দেখিয়া খাদ্য না দিয়া থাকা যায় না।

পূর্ব্বে আমরা শ্রীমতী ফ্রান্সেশ-পিটের কথা বলিয়াছি। তিনি বহু পশু-পক্ষী পুষিয়াছেন। তাঁর পশুশালার অটার বা ভোঁদড় আছে অনেকগুলি। জল ছাড়িয়া এরা তাঁর পোষা কুকুরের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করে, খেলা করে—এবং খেলিতে খেলিতে বিরোধ বাধিলে রুদ্র-বেশে আঁচড়-কামড় বাদ দেয় না ! ঠিক যেন বাড়ীর ছেলেমেয়ে—ভাব করিতে যেমন উৎসুক, ঝগড়া করিতেও তেমনি ত্বর সয় না !

কাক ও বিড়াল

তারপর ঐ বনমানুষ ! এ-জীবটির খেলায় যেমন সখ, দুষ্টামিও জানে তেমনি ! গম্ভীর মুখে চুপচাপ বসিয়া আছে দেখিলে বুঝিবেন, মনে-মনে দুষ্টামির মতলব ভাঁজিতেছে ! এরা যখন পরস্পরে খেলা করে, তখন সে খেলায় গুণ্ডামি করার বিধি নাই। কেহ যদি গুণ্ডামি করে, তাহা হইলে খেলা ভাঙ্গিয়া যায়; এবং খেলুড়ি-সাথী সে-গুণ্ডামির বিরুদ্ধে দস্তুর-মতো প্রতিবাদ তুলিয়া খেলায় ভঙ্গ দিয়া সরিয়া যায় ! অর্থাৎ খেলিতে চাও, ভদ্রলোকের মতো খ্যালো—no foul ! Foul করিলেই খেলার শেষ !

চোপরও,—ফাউল প্লে !

খেলায়-ধূলায় পশু-পক্ষী শক্তি ও স্বাস্থ্য সঞ্চয় করে। ভবিষ্যতে আত্মরক্ষায় যাহাতে সমর্থ হইতে পারে,—অল্প বয়সের খেলা-ধূলায় তাহারি জন্য তারা নব নব কৌশল শিক্ষা করে। এ নিয়ম মানব-সমাজে যেমন দেখি, ইতর প্রাণি-জগতেও তেমনি ! মানব-সমাজে আমরা যেমন দেখি, কোনো কোনো ভদ্রলোক বেশী-বয়সেও খেলার অভ্যাস রাখিয়া খেলায় বেশ পটুতা লাভ করিয়া 'চ্যাম্পিয়ন' হন, পশুপক্ষীর সমাজেও তেমনি কোনো কোনো পশুপক্ষী খেলার অভ্যাস বরাবর বজায় রাখিয়া মনের-সুখে

বাস করে। পক্ষী-সমাজেও এ রীতি বহুলভাবে পরিলক্ষিত হয়। কাকাতুয়ার খেলার প্রীতি কোনো দিন ঘোচে না। অন্য বহু পক্ষীকে দেখা যায় দাঁড়ে বা গাছের ডালে দোল্ খাইয়া খেলার সখ মিটাইতেছে। বাজ পাখী

খেলার সাথী

বানর ও বিড়ালের খেলা

খেলা ভালোবাসে যাবজ্জীবন। হংস-সমাজে খেলার সখ তীব্র। খাঁচার বাহিরে ভল্লুকরাও খেলার আদর করে চিরকাল। ময়ূর-জাত কখনো খেলা ছাড়ে না! মুর্গীরা বয়স হইলে গম্ভীর হয়; খেলায় তাদের বিরাগ জন্মায়।

কিন্তু অন্য পাখীকে খেলায় মশগুল দেখিলে প্রবীণ মোরগ সবিস্ময়ে সে খেলার পানে চাহিয়া থাকে।

পূর্ব্বে পশুপক্ষীর সহজ রঙ্গ-কৌতুকপ্রিয়তার উল্লেখ করিয়াছি। সে রঙ্গ-লীলায় ক্ষতির দুরভিসন্ধি নাই। তবে পেচক-সম্প্রদায় ভারী হিংসুক! তাদের প্রতিশোধ-গ্রহণের স্পৃহাও খুব প্রবল। এ সম্বন্ধে প্রোফেসর কোহলার লিখিতেছেন,—
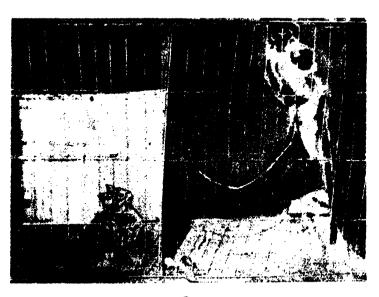
ভোঁদড় খাবার চায়

আমার ছিল একটি পোষা পেচক। তার নাম রাখিয়াছিলাম হুটার। আমার এক দাসী তার কোপে পড়িয়াছিল। এক দিন এ-দাসীটি হুটারকে জলে চুবন দিয়াছিল; তার পর আর-এক দিন পেচকটি ঘরের কার্ণিশের খাঁজে

বসিয়াছিল, দাসী ঝুল ঝাড়া দিয়া খোঁচাইয়া কার্ণিশ ত্যাগ করাইয়া তাকে খাঁচায় পোরে। ভটার এ-আঘাত ভুলিতে পারে নাই। দু'তিন দিন পরে দাসী গিয়াছে ঘর ঝাঁট দিতে, অমনি ভটার আসিয়া তার মাথার উপরে ঝুপ করিয়া বসিল; দাসী ভয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া সে-ঘর ছাড়িয়া পলাইয়া আসে। ভটারের প্রতিশোধ-বাসনা এখানেও মিটিল না। ক'দিন উপর্যুপরি দাসীকে নানাভাবে উৎপীড়িত করিয়া তুলিল। এক দিন শেষে আমি দাসীকে দিয়া ভটারের ভোজ্য-পানীয় পরিবেষণ করাইয়া এ কলহের শেষ করিয়া দিই।

ছেলেমেয়েদের খেলার বৈচিত্র্যে আমরা যেমন মুগ্ধ হই, তেমনি যদি কেহ পশুপক্ষীর খেলা মনোযোগ দিয়া লক্ষ্য করেন, তাহা হইলে তাদের খেলাতেও তেমনি তিনি বিমুগ্ধ হইবেন। ইতর বলিয়া ছাপ মারিয়া দিলেও পশু-পক্ষীরা বুদ্ধিবৃত্তিতে হীন নয়, তাদের নিত্যকার খেলাধূলায় এ সত্যের বহু প্রমাণ পাওয়া যায়।

ক্যামেরার কেরামতি

তোমাদের মধ্যে যারা ক্যামেরা লইয়া ছবি তোলো, একটু কৌশল অবলম্বন করিলে মজার মজার কত ছবি তুলিয়া সকলের তাক্ লাগাইয়া দিতে পারো, তা জানো?
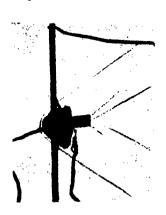
বন্দুকের গুলী কাচ বিঁধিতেছে

ক্যামেরার এই কৌশল অবলম্বন করিয়াই ছায়া-ছবি আজ কি আনন্দ না পরিবেষণ করিতেছে! ইহার কিছু পরিচয় তোমাদের এ আসরে পূর্ব্বে আমরা দিয়াছি। ফিল্মে যে রোমাঞ্চকর ট্রেন-কলিশন, ঘোড়ায় চড়িয়া এক পাহাড় হইতে অন্য পাহাড়ে লম্ফদান, জাহাজ-ডুবি বা বিরাট অগ্নিকাণ্ডের দৃশ্য দেখানো হয়, স্বপ্নেও ভাবিয়ো না, সে সব সত্য ও প্রকৃত ব্যাপারের প্রতিচ্ছবি! ক্যামেরার কৌশলে এ সব দৃশ্য অভাবনীয় সত্যের মতো আমাদের চোখের সামনে প্রতিফলিত করা হয়! খেলা-ঘরের ট্রেন, মাটির ঢেলায় তৈরী পাহাড় এবং রাজ্যের খেলনা-পুতুল লইয়া এ সব ছবি তোলা হয়; এবং সেই ছবিই পর্দার গায়ে প্রতিফলিত হইয়া আমাদের মনে বিস্ময় ও বিভীষিকার সঞ্চার করে!

আজকাল খুন, জাল-জালিয়াতি, চুরি—এ সব ব্যাপারে অপরাধ এবং অপরাধী-নির্ণয়ে ক্যামেরার মারফৎ যে

গুলীর গায়ে কাচের গুঁড়া

সাহায্য মিলিতেছে, তাহা অসামান্য! পানীয় জল ভালো কি মন্দ, জলবিন্দুর ফটো-চিত্র লইয়া সহজে তাহা নিরূপণ করা যায়।
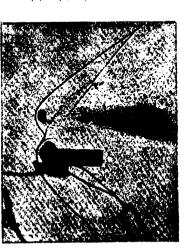
জাল নাম-সই আজ ক্যামেরার সাহায্যে সহজে ধরা পড়িতেছে। খুনীর জামা-কাপড়ে বা ছুরি ও কুঠার প্রভৃতি অস্ত্রে যে রক্ত-চিহ্ন থাকে, তার ফটো লইয়া সেই ফটোর সাহায্যে খুনের তদ্বির হইতেছে। সাদা চোখে যে সব উপসর্গ দেখা যায় না, ক্যামেরার সাহায্যে সে-সবের ছবি তুলিয়া সেই ছবির সাহায্যে বহু সমস্যার সমাধান আজ সম্ভব হইয়াছে। তা ছাড়া বৈজ্ঞানিক নব নব সত্য

গুলী ও ভাঙ্গা কাচ

আবিষ্কারে ক্যামেরার অকল্পিত সাহায্য আজ সকল দিকে সার্থক ও সফল হইতেছে। এগুলা শিক্ষা ও উপকারিতার দিক! ইহার উপর আনন্দ-দানেও ক্যামেরা আজ কতখানি
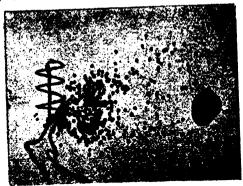
বন্দুক হইতে গুলী বাহির হইতেছে

উদার হইয়াছে, সে পরিচয় দু'চার পৃষ্ঠায় লিখিয়া শেষ করা যায় না।

বন্দুক হইতে গুলী ছুড়িলাম। সে গুলী গিয়া লাগিল সার্শির গায়ে। ভালো ক্যামেরার সাহায্যে বন্দুকের গুলীর এই গতি এবং সার্শির কাচে লাগিয়া সে গুলী কি অনর্থ সৃষ্টি করিল, ক্রম-পর্য্যায়ে ছবি তুলিয়া পর-পর তাহা প্রত্যক্ষ করা সহজ ও সম্ভব হইয়াছে।

আমাদের মধ্যে হাতে-কলমে যাকে কাজ করিতে হয়, তার সে কাজের ছাপ করতলে মুদ্রিত থাকে। যারা এন্‌গ্রেভের কাজ করে, নিত্য কাজ করিয়া করিয়া তার হাতের যে-চেহারা দাঁড়ায়, সে চেহারার সঙ্গে কোচম্যানের ঘোড়ার রাশ ধরিয়া টানা হাতের চেহারার মিল নাই! যে-লোক প্রত্যহ বাটনা বাটে, বাসন মাজে, তার হাত এবং লেখক বা কেরাণীর হাতের চেহারার পার্থক্য আছে। সাদা চোখে দেখা না গেলেও ক্যামেরায় তোলা হাতের ছবি দেখিলে এ পার্থক্য সহজে লক্ষ্য হইবে।

নীচের ছবিতে দেখিতেছ, একটি মেয়ে ত্রিমূর্ত্তি ধরিয়া বিচিত্র ভঙ্গীতে পাশাপাশি বসিয়া আছে। কি করিয়া এ ছবি তোলা সম্ভব হইল, বলি।

বড় একখানা কালো পর্দ্দা টাঙ্গাইয়া সেই পর্দ্দার সামনে ঠিক মাঝখানে মেয়েটিকে দু'হাতে চোখ চাপিয়া বসাইয়া মাঝের ছবিখানি তোলা হইয়াছে। মেয়েটিকে দাঁড় করানোর সময় ক্যামেরার view finder-এ দেখিয়া তিনখানি ছবির জন্য সমান জায়গা মাপিয়া হিসাব করিয়া তবে তাকে দাঁড় করানো হইয়াছে। অর্থাৎ দেখিতে হইবে, view-finder-এ এক-তৃতীয়াংশ মাত্র স্থান প্রত্যেক ছবির জন্য নির্দ্দিষ্ট রাখা চাই। প্রথম ছবি তুলিবার পর view-finder-এ আন্দাজ-মতো এই মাপ দেখিয়া তবে মেয়েটিকে ডানদিকে দাঁড় করাইয়া ডানদিককার ছবি তোলা হইয়াছে এবং তৃতীয় ছবিখানিও তার পরে ঠিক এই প্রণালীতে তোলা হইয়াছে। ছবি তুলিবার সময় খুব হুঁশিয়ার, ক্যামেরা যেন অটল ও অচল থাকে। ক্যামেরা একটু নড়িলে ছবি পণ্ড হইবে। প্রত্যেকখানি ছবি পর্য্যায়ক্রমে তুলিবার পর ক্যামেরার 'শাটার' বন্ধ করিবে, এ কথা বলা বাহুল্য। আর

একই মেয়ের তিন মূর্ত্তি

একটি কথা, প্রত্যেকখানি ছবি পর্য্যায়ক্রমে তুলিবার পর ক্যামেরার 'শাটার' বন্ধ করিয়া মেয়েটিকে ঠাঁই নাড়িয়া দাঁড় করাইতে হইবে। এবং এমন ভাবে দাঁড় করানো চাই, যেন ক্যামেরার ফিল্মে একখানি ছবির উপরে অন্য ছবি না আসিয়া পড়ে!

তেভাঁজ আয়নায়

আয়নার সামনে খুকু

একই লোকের ঘুষোঘুষি

ভূতের ছবি

কালো পর্দার সামনে মেয়েটিকে দাঁড় করাইবার সময় মেয়েটিকে পোষাক পরানো চাই ধব্‌ধবে সাদা অথবা ফিকা-নীল।

আয়নার সাহায্যে ফটোগ্রাফিতে বহু বৈচিত্র্য সম্পাদন করা যায়। বড় তেভাঁজ (wing-mirror)

আয়নার সামনে (আগের পৃষ্ঠার ছবিতে আয়নার গড়ন ভাখো) কাহাকেও দাঁড় করাইলে সামনের আয়নার এবং পাশের ছ'খানি আয়নাতে তার ছায়া প্রতিবিম্বিত হয়। এই অবস্থায় তার পিছন দিক হইতে ছবি তোলো। তিনখানি বিভিন্ন ফটো উঠিবে। ছোট ছেলেমেয়েরা সাধারণতঃ চঞ্চল, সেজন্ম তাদের ফটোগ্রাফ-তোলায় বেগ পাইতে হয় বিলক্ষণ।

সিলুয়েট-ছবি তোলা

এবং ছবি কেমন হইবে, সে সম্বন্ধে সংশয়-দ্বিধার অন্ত থাকে না। এজন্ম আয়নার সামনে ছোট ছেলেমেয়েকে বসাইয়া, তার হাতে খেলনা দিয়া সে-দিকে মনোযোগী রাখিলে আয়নার সাহায্যে ছবি যেমন সহজে তোলা যায়, তেমনি সে-ছবি আর্টের দিক দিয়াও মনোরম হয়।

একই লোকের ছবি—যেন ছ'জনে সামনা-সামনি দাঁড়াইয়া গল্প বা তর্ক করিতেছে, কিম্বা ঘুষোঘুষি করিতেছে—এ ছবি তোলা হয় double exposure প্রণালীতে। নেগেটিভ বা ফিল্মের অর্দ্ধাংশ ঢাকিয়া রাখিয়া লোকটিকে যথাস্থানে যথানুরূপ ভঙ্গীতে দাঁড় করাইয়া বা বসাইয়া ছবি তোলো; তার পর তোলা-অংশ ঢাকা দিয়া আবৃত অংশ খুলিয়া লোকটিকে পাশে আনিয়া অনুরূপ ভঙ্গীতে দ্বিতীয় ছবি তোলো। পরে নেগেটিভ বা ফিল্ম ডেভেলপ-প্রিণ্ট করো। ছবি যা পাইবে, দেখিয়া খুশী হইবে। Double exposure ছবি তুলিবার সময়ে লোকটিকে বার-বার ছবার দাঁড় করানো বা বসাইতে ব্যবধান সম্বন্ধে হুঁসিয়ার থাকা চাই। নচেৎ এ ছ'খানি ছবি গায়ে-গায়ে মিশিয়া বিলমবচনার প্রয়াসটুকুকে ব্যাং করিয়া দিবে।

পরের পৃষ্ঠার ছবিতে দেখিতেছ, ছটি মেয়ে জলের বুকে চিৎসাঁতার কাটিয়া কেমন ভাসিয়া চলিয়াছে! আসলে কিন্তু জলের বুকে মেয়ে ছটিকে শোয়াইয়া এ ছবি তোলা হয় নাই। ঘরের মেঝের ঢেউয়ের তালে চিত্র-বিচিত্র-নক্সা-আঁকা বড় চাদরের উপর মেয়েছটি শুইয়া আছে এবং উচ্চ স্থান হইতে বা বড় টুলের উপরে উঠিয়া ফটোগ্রাফার উর্দ্ধ দিক হইতে ক্যামেরা হেলাইয়া তাদের ছবি তুলিয়াছেন। ক্যামেরায়-তোলা ভূতের ছবি দেখিয়াছ? এ ছবি তুলিবার কৌশল-কথা খুলিয়া বলিতেছি।

ভূতের এ ছবিখানি কি করিয়া তোলা সম্ভব? প্রথমে বন্ধ-দরজার ফটো লও। তার পর এক জন লোককে আপাদ-মস্তক বস্ত্রাবৃত করিয়া সেই বন্ধ দরজার সামনে দাঁড় করাও। দাঁড় করাইয়া যে নেগেটিভে বা ফিল্মে পূর্ব্বে বন্ধ দরজার ছবি তুলিয়াছ, ঐ নেগেটিভ বা ফিল্মের উপরে বস্ত্রাবৃত লোকটির ছবি তোলো। এই double exposureএর ফলে যে ছবি উঠিবে, আগের পৃষ্ঠায় তার প্রতিলিপি ভাখো! ভূতের ছবি বলিয়া মনে হয় না? বন্ধ দরজার ছবি তুলিবার সময় যতক্ষণ exposure দিবে,

ছ'বোন চম্পা

বস্ত্রাবৃত লোকটির ছবি তুলিবার সময় তার অর্দ্ধেক exposure দিতে হইবে।

ছ'বোন চম্পার ছবি কেমন করিয়া তোলা হইয়াছে, জানো? ছটি মেয়েকে চক্রাকারে মেঝেয় দাঁড় করাইয়া!

দাঁড়াইবার সময় পরস্পরে তারা পরস্পরের হাত ধরিয়া আছে! তার পর মইয়ের উপর দাঁড়াইয়া বা উপরে কোনো মাচা বা বারান্দার উপর দাঁড়াইয়া ক্যামেরার মুখ নোয়াইয়া ঊর্দ্ধদেশ হইতে তাদের ছবি তোলা। এ ভাবে তুলিয়া এ ছবি দেখিলে বিস্ময়ের সীমা থাকিবে না।

তার পর 'সিলুয়েট' বা সাদা-কালো ছবির কথা বলি। ঘরের মাঝখানে বড় একখানা বিছানার (সাদা) চাদর খাটাও। যাহার ছবি তুলিবে, চাদরের কাছেই তাহাকে দাঁড় করাও,—চাদরের এক দিকে দূরে যথানুরূপ স্থানে ক্যামেরা বসাও; চাদরের পিছন দিক হইতে কাহাকেও ফ্ল্যাশ-ল্যাম্প জ্বালিয়া চাদরের গায়ে আলোক-পাত করিতে বলো। এই প্রণালীতে যেমন-খুশী ছবি তোলো। এ ছবি প্রিণ্ট করিলে সিলুয়েট-ছবি পাইবে।

চিং-সাঁতার

যে-লোক কিম্বা যে যে বস্তুর ছবি এ ভাবে তুলিতে চাও, সেই লোক এবং সেই সেই বস্তুর উপরে উক্ত প্রণালীতে আলোকপাত করিলে যথানুরূপ সিলুয়েট-ছবি তুলিতে পারিবে।

তার পর রূপকথার রাজা-রাণী, পরীর ছবি যদি তুলিতে চাও তো সে ছবি তোলার প্রণালী বলি। এ-সব ছবি তোলা খুব সহজ।

এ ছবির জন্য প্রথমে চাই ব্যাকগ্রাউণ্ড। মেঘ, চাঁদ, নক্ষত্র আঁকা বা যে রকম দৃশ্য চাও, তেমনি পট আঁকিয়া দেওয়ালে খাটাও। এ পট প্রকাণ্ড না হইলেও চলিবে। এই পটের সামনে রাজা-রাণী বা পরী-সাজা পুতুল রাখো—যে ভাবে রাখিতে চাও, রাজা-রাণী সিংহাসনে বসিয়াছে বা পরীর পাখায় রেশমী সূতা বাঁধিয়া ঝুলাইয়া রাখো—রাখিয়া যোগ্য স্থানে ক্যামেরা আনিয়া ছবি তোলো। পুতুল ও পরীর মুখ-চোখ যদি ভালো হয়, তাহা হইলে প্রিণ্ট করিলে এ ছবির পুতুল-রাজা, পুতুল-রাণী ও পুতুল-পরীর মুখ-চোখ দেখাইবে জীবন্ত মানুষের মুখ-চোখের মতো; এবং আর্টের দিক দিয়া এ ছবি ভারী সুন্দর এবং উপভোগ্য হইবে।

সভ্যতার রূপ

ক্ষুদ্রের প্রাণে সদাই রহিছে ত্রাস,
বৃহৎ আসিয়া কখন করিবে গ্রাস!
বৃহতের নাহি লজ্জা-মানের ভয়,
অকুণ্ঠ চিতে খোঁজে আপনার জয়।

সভ্যতা আজি এরূপে বিরাজ করে—
ন্যায় ও ধর্ম্ম—তার পদাঘাতে মরে।
বুদ্ধ-যীশুর বচন ফুটিছে মুখে,
রক্তের নদী বহায় ধরণী-বুকে!

শ্রীবঙ্কুবিহারী রায়।

ফলের ফলাফল

আজ সেলাইয়ের কথা নয়—অন্য পাঁচ রকমের শিল্প-কাজের কথা বলি।

আমাদের দেশের মেয়েরা আগে নারকোলের ফল-ফুল তৈরী করতেন অজস্রভাবে। নারকোল বেটে কৌশলে সেই বাটা নারকোল রঙে রাঙিয়ে তা থেকে জামরুল, খরমুজা, আম প্রভৃতি তৈরী করতেন। খেতে যেমন, দেখতেও সে তেমনি সুন্দর হতো। ফুলশয্যায় এবং গায়ে-হলুদের তত্ত্বে ঘরের তৈরী এই সব রকমারি ফলের উপহার পাঠানো এখনো দেখা যায়।

কলার পাখী

ফল দিয়ে রকমারি জন্তু-জানোয়ার তৈরী করার কয়েকটি প্রণালীর পরিচয় আজ দিচ্ছি। ঘরের সজ্জা-হিসাবে এগুলির মনোহারিতা যেমন অস্বীকার করা চলে না, তেমনি বাড়ীতে কাজ-কর্ম্ম হলে অভ্যাগত-নিমন্ত্রিতেরা এসে ফলের তৈরী এ-সব উদ্ভট জীবজন্তু দেখে খুশী হবেন খুব।

কলা থেকে পাখী তৈরী করতে পারেন। ছবিতে যে-আকারের কলা দেখছেন, এমনি একটি কলা নিয়ে তার এক প্রান্তে দুটি চোখ বসাবেন। কুঁচ কিম্বা বাদাম কিম্বা লবঙ্গ গুঁজে চোখ তৈরী করতে পারেন। চোখ বসাবার সময় কলার গায়ে ছুঁচ ফুটিয়ে বা ছুরি চালিয়ে একটু বিঁধ করে সেই বিঁধে চোখ এঁটে দেবেন। ঠোঁট তৈরী করুন চেরা-বাদাম গুঁজে। পা হবে দুটি দেশলাইয়ের কাঠি এঁটে। আলুকে আধখানা করে কেটে তাতে দেশলাই-কাঠির পা দু'খানি এঁটে গুঁজে দিলেই পাখী বেশ খাড়া থাকবে। ছবি দেখলে বুঝতে পারবেন, কাটা-আলুর গায়ে কি করে পাখীর পা গুঁজে পাখীটিকে বসানো হয়েছে। তিন-চারটি আঙুর পাখীর সামনে রাখুন,—এগুলি হবে পাখীর ডিম। সবুজ-রঙের কাঁচা আঙুর ভালো মানাবে। তার পর পাখীর পুচ্ছ আর ডানা—সত্যিকারের পালক গুঁজে দিন এই ফলের পাখীর গায়ে! এবারে দেখুন তো, এই কলার পাখী চমৎকারিত্বে আপনাদের মনোহরণ করছে কি না!

হাতী করতে দুটি আপেল নিন। দুটি আপেলকে গায়ে-গায়ে জুড়ে নিন আপেল দুটির গায়ে কাঠি বিঁধে। আপেল

আপেলের হাতী
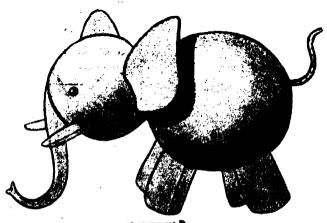
যা নেবেন, তার একটি হবে বড়, অপরটি হবে ছোট-সাইজের। ছোট-সাইজের আপেলের গায়ে যথাস্থানে লবঙ্গ বা বাদাম

বা কুঁচ গুঁজে দুটি চোখ রচনা করুন। দুটি বড় কলা কেটে চার-টুক্‌রো করুন; এইবার ঐ টুক্‌রো বড় আপেলের গায়ে পিন দিয়ে চার-টুক্‌রো কলা আটকে চারখানি পা এবং দু'টুকরো বাদাম গুঁজে নাক তৈরী করুন; কলার খোলা সুকৌশলে কেটে তা দিয়ে তৈরী করুন শুঁড় এবং হাতীর দুটি কাণ; শাকের ডগা গুঁজে ল্যাজ তৈরী করুন। দেখুন তো কেমন হাতী তৈরী হলো।

তার পর কলার মানুষ-পুতুল! দুটি কলা নিন; কলার

পুতুল

ডগার দিকগুলো কেটে বাদ দিতে হবে। বাদ দিয়ে এক টুক্‌রো কলা খাড়া রেখে কলার উপর-দিককার খোশা একটু ছাড়িয়ে ফেলুন,—খোশা-ছাড়ানো এই দিকটা হবে মুখ। অপর কলাটি কেটে চার-টুক্‌রো করুন—এ চার-টুক্‌রো আগের-কলার গায়ে যথাস্থানে কাঠির টুক্‌রো দিয়ে গুঁজে এঁটে দুটি হাত এবং দুটি পা তৈরী করুন। এবারে বাদাম কেটে সেই বাদাম পুতুলের মুখাংশে এঁটে দিলে পুতুলের নাক-চোখ এবং মুখ-বিবর তৈরী হবে। মুখ-বিবরের নীচে তিনটি লবঙ্গ (ছবি দেখে ঐ রকমে) এঁটে দিলে সেগুলো হবে জামার বোতাম। বাদাম-কুচি দু'হাতে এঁটে আঙুল তৈরী করুন। তার পর মাথার টুপি। ভাজবার জন্য আলু যে-রকম কাটা হয়, তারি এক-টুকরোর মাঝখানে গর্ত্ত করে কলার মাথায় এঁটে দিন—টুপী তৈরী হবে। পায়ের জুতোর জন্য কচি আমের কষি কিম্বা জুতোর-আকারে আলু কুচিয়ে পুতুলের পায়ের তলায় এঁটে দিন।

একটি নাশপাতি বা পেয়ারা নিন; আর নিন একটা কমলালেবু! কাঠি দিয়ে এ দুটি ফল গায়ে-গায়ে এঁটে নিন। পেয়ারা বা নাশপাতির গায়ে ছুরি দিয়ে ফুটো করে সে-ফুটোয় কাণের আকারে তৈরী করে দুটুকরো কাগজ গুঁজে দিন; লবঙ্গ বা বাদাম গুঁজে চোখ বসান এবং তুলোর
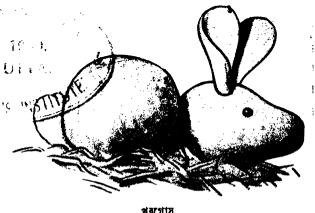
খরগোস

হালকা কুণ্ডলী রচে কমলা লেবুর পিছন দিকে এটে দিন। দেখুন তো, খরগোশ বলে মনে হয় না কি?

এবার 'পুরুষ্টু' এবং সরু একটি কাগ্‌জী বা গোঁড়া লেবু নিন। লেবুর গায়ে চারটি দেশলাইয়ের কাঠি গুঁজে দিন। এ কাঠিগুলি হবে চারটি পা। এই পায়ে ভর দিইয়ে লেবুটিকে ট্যারচা-ভাবে দাঁড় করিয়ে রাখা যাবে। একখানি কার্ড-বোর্ড কাণের আকারে কেটে লেবুর এক প্রান্তে দিন এঁটে। এ দুটি হবে কাণ; এবং দুটি আলপিন গুঁজে তৈরী করুন চোখ। তার পর পাকানো একটু তার এঁটে তৈরী করুন ল্যাজ! খাশা বরাহ তৈরী হবে।

বরাহ

ছবি দেখে পুতুলগুলি তৈরী করবেন, তাহলে প্রণালী বুঝতে কোনো রকম গোলযোগ ঘটবে না।

কাঠের পুতুল

কাচের পুঁতির মতো বাজারে কাঠের পুঁতি বা লম্বা-সাইজের মালার হালি কিনতে পাওয়া যায়। নানা রঙের মালা মেলে। জপের জন্য আমাদের মা-দিদিমা, মাসিমা-পিসিমা তুলশীর মালা গণনা করেন,—তুলশীর মালা হয় গোল; কাঠের এ মালা চাই নানা আকারের। সাদা, লাল, কালো, হল্‌দে। নানা রঙের এই মালার হালি সংগ্রহ করুন—নানা সাইজের কাঠের মালা (beads) নেবেন। পাশের ছবিতে যে রকম সাইজ দেখ্‌ছেন, এমনি সাইজের। সেই সঙ্গে নিন খানিকটা মোটা তার। মোটা মানে এমন মোটা নয় যে, আঙুলে টিপে নোয়ানো যাবে না! আঙুলের টিপে সহজে নোয়ানো যায়, এমন তার নেওয়া চাই। তবে এ তার যেন খুব পাৎলা না হয়, দেখবেন। আর নিন ছেলেদের একটা পেইণ্ট-বক্স।
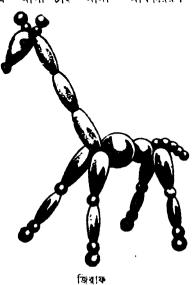
জিরাফ

ধরুন, জিরাফ তৈরী করতে চান। প্রথমে সুরু করুন সামনের পা থেকে। সমান-মাপের লম্বা এক টুকরো তার কেটে নিন,—তারের একটা মুখ ঐ 'ক' ছবির ভঙ্গীতে মুড়ুন। মোড়া দরকার। না হলে তলার বা শেষের কাঠের "বীড্" আটকে থাকবে না; খশে বেরিয়ে যাবে। এ-তারের মধ্য দিয়ে প্রথমে গলিয়ে দিন গোল-সাইজের সব-চেয়ে-বড় একটি বীড; তার পরে গলান তার চেয়ে ছোট সাইজের একটি বীড। তারে 'বীড' বা 'মালা' পরাবেন মালা-গাঁথার প্রথায়। পাশে যে জিরাফের ছবি দেখছেন, ঐ ছবি দেখে অমনি-ভাবে বীডের পর বীড গাঁথুন। তারের আধা-আধি বীড গাঁথা হলে তারটি ইংরেজী 'V' অক্ষরের ছাঁদে দুমড়ে বাঁকিয়ে নিন। 'খ' ছবি দেখুন—সামনের দু'পায়ের তার ওমনি ভাবে মাঝখানে দুমড়ে বাঁকিয়ে নিতে হবে। এবারে ঠিক আগের প্রথায় পা তৈরী করুন 'বীড' পরিয়ে। শেষের 'বীড' পরাবার সময় তারের এই প্রান্তটুকু 'ক' ছবির ছাঁদে বাঁকিয়ে নেবেন। সামনের দুটি পা তৈরী করুন 'বীড' পরিয়ে। শেষের 'বীড' পরাবার সময় তারের এ প্রান্তটুকু 'ক' ছবির ছাঁদে বাঁকিয়ে নেবেন। সামনের দু'টি পা তৈরী হলো তো! ঠিক এমনিভাবে পিছনের পা তৈরী করুন।

'ক'-তার বাঁকানো 'খ'-তারের রকমফের 'গ'-তারের কাঠামো

লাঠি-হাতে ছেলে

এবার দেহের কথা। আর এক-টুকরো লম্বা তার নিন। এ-তারে তৈরী হবে মুখ, মাথা, ঘাড়, দেহ এবং ল্যাজ। নাকের ডগাতে তার একটু মুড়ে নিতে হবে; না হলে নাকের 'বীড' খশে বেরিয়ে যাবে। এই লম্বা তারটুকুও 'খ' ছবির ছাঁদে বাঁকিয়ে নিতে হবে। নিয়ে এবারে 'বীড' গেঁথে যান পর-পর। শিং দুটি তৈরী করতে হবে ছোট একটু তার 'খ' ছবির ছাঁদে বাঁকিয়ে মুড়ে। এখন আলাদা-আলাদা ভাবে তৈরী হলো জিরাফের দু জোড়া পা, দেহ এবং দুটি শিং—আলাদা তিন-প্রস্থে। এ তিন প্রস্থ এবারে টাইট করে জুড়ে নিন সরু তার দিয়ে এঁটে কষে জড়িয়ে বেঁধে। মুখের 'বীডে' কালি দিয়ে চোখ এঁকে দিন—জিরাফ তৈরী হবে'খন।

এবার তৈরী করুন ঐ লাঠি-হাতে ছেলেটি। একটা লম্বা তার নিয়ে তাকে ঠিক 'গ' ছবির ছাঁদে (তারের কাঠামো) বাঁকিয়ে মুড়ে নিন। এটিতে হবে পুতুলের মাথা, দেহ এবং দুই পা। তার পর হাত থেকে বীড-গাঁথা সুরু করুন। হাতের সঙ্গে লাঠিও তৈরী

হবে। হাত তৈরী হলে খানিকটা খুব-মিহি তার নিন—এই মিহি তার সমান মাপে কেটে দু'হাতের দশটি আঙুল তৈরী করতে হবে। হাতে আঙুলগুলি জুড়ে দিন ঐ মিহি তার জড়িয়ে। দেহের একাংশের সঙ্গে অপর অংশ জুড়বেন সর্ব্বত্র ঐ মিহি তার দিয়ে। মাথা ও মুখ তৈরী করবেন বড় সাইজের গোল 'বীড' গেঁথে। মুখে তারপর চোখ-নাক ফুটিয়ে তুলতে হবে কালির রেখায়। মুখে যেমন খুশী রঙ দিতে
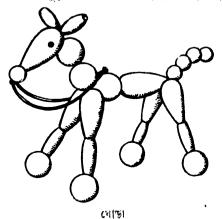
ঘোড়া

পারেন, গায়ের বীডে রঙ দিলে জামায় রকমারি বাহার খুলবে। দুই পা এবং লাঠির উপর ভর করে' এ পুতুল দাঁড়িয়ে থাকবে—এজন্য এগুলি এমন কায়দা করে একটু আগে-পিছে বসানো চাই; তাহলে পুতুল খাড়া থাকবে, পড়ে যাবে না। ডান পা আগে—লাঠি তার সঙ্গে সমান লাইনে থাকবে; এবং বাঁ পা একটু পিছনে রাখবেন। 'দ্বিপদে' পুতুলের

কুমীর
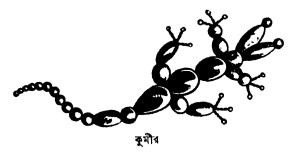
দাঁড়ানো সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকবেন। এভাবে দু'পা তৈরী করলে মনে হবে পুতুল যেন চলছে! চলবার সময় আমাদের এক পা যেমন এগিয়ে থাকে, অন্য পা থাকে পিছনে—এর ভঙ্গীও হবে ঠিক তেমনি!

তারপর ঐ প্রণালীতে ঘোড়া আর কুমীর তৈরী করুন। দেহের ভিন্ন-ভিন্ন অংশ তৈরী করে সেগুলি জুড়তে হবে খুব সরু তার দিয়ে। এই জোড়ের কাজ বেশ টাইট হওয়া চাই; না হলে নাড়াচাড়ায় এদের দেহ এলিয়ে এলোমেলো হয়ে যাবে।

[প]রী-সাপ

এবার ঘর সাজাবার জন্য রকমারি টুকিটাকি, খেলনা পুতুল তৈরী করার কথা বলছি। প্রথমে বলি পরী-সাপের কথা। ছবিতে যে-সাপটি দেখছেন, এ-সাপ কোনো জু-তে জঙ্গলে বা পাহাড়ে দেখা যাবে না। এটি হলো কল্পলোকের সাপ! গৃহ-সজ্জায় এ সাপে বাহার খুলবে অনেকখানি।

কি করে এ সাপ তৈরী করবেন, বলি।

আধ ইঞ্চি পুরু একটি রবারের নল নিন—এক ফুট আন্দাজ। একটু মোটা তার চাই। এমন তার নেবেন, আঙুল দিলে টিপে যে-তার সহজে নোয়ানো-বাঁকানো চলে; আর চাই ছোট-বড় দু সাইজের দুটি ছিপি; এক টুকরো ভালো টিন নেবেন। টিনটুকু খুব পাংলা হওয়া চাই। এমন পাংলা যেন কাঁচি দিয়ে সহজে কাটা যায়। বিস্কুটের বাক্সে যে টিনের পাত থাকে কিম্বা সিগারেটের টিন হলে চলবে।

পরী-সাপ

যে-সাপটি করবেন, সেটির গায়ের রং সবুজের উপরে সাদা-সাদা ফুটকি। বাজারে যে এনামেল পেইণ্ট পাওয়া যায়—এক একটি টিনের দাম আট-আনা, দশ আনা,—সেই পেইণ্ট দিয়ে রবারের নলটি রঙ করে নেবেন,—সবুজ রঙ। সবুজ রঙ শুকোলে তার উপরে সাদা পেইণ্টের ফুটকি-টিপ দিন খড়কে-কাঠির ডগার সাহায্যে।

এবার বড় সাইজের ছিপিটি আমের আধখানা কষির ছাঁচে কেটে নিন। ছবিতে সাপের মাথার যে-ছাঁচ দেখছেন, সেই ছাঁচে ছিপি কেটে নেবেন। এতে সাপের মাথা ও মুখ হবে। তার পর ছোট ছিপিটি কেটে-চেঁছে ছবির সাপের ছাঁদে পুচ্ছ তৈরী করুন। তারটি লম্বালম্বি রবারের নলের মধ্য দিয়ে চালিয়ে দিন। নলের দু'মুখে যেন খানিকটা করে তার বেরিয়ে থাকে। এবার দু'দিকের ঐ তারের

গায়ে আঠা মাখিয়ে (শিরীষের আঠা কিম্বা "সেকোটিন") মাথার দিকে বড় ছিপি এবং পুচ্ছের দিকে ছোট ছিপিটি তারের মধ্য দিয়ে গেঁথে নিন। রবারের নলের দু'দিকে মাথা এবং পুচ্ছ আঁটা-আঁটি ভাবে লাগাতে হবে,—যেন একটু তার না দেখা যায়! এবারে প্রজাপতির পাখার ছাঁদে টিন কেটে কাণ তৈরী করুন—ছবির সাপের কাণের ছাঁদে দুটি কাণ,—আলাদা নয়, দুটি কাণ জোড়া থাকবে। টিনের কাণের গায়ে শুধু সাদা ফুটকি দিলেই চলবে। সাপের গায়ের সঙ্গে রঙের সামঞ্জস্য রাখা চাই, না হলে দেখতে বেমানান হবে। সাপের মাথার নীচে কাণ দিন জুড়ে—রেশমী সুতো দিয়ে। রবারের মধ্যে তার আছে—সেই তারটুকু এঁকিয়ে বেঁকিয়ে নিন। তার যেন সিধে না থাকে। এঁকিয়ে বেঁকিয়ে নিলে সত্যিকারের সাপের দেহের মতো রবারের এ-সাপের দেহও থাকবে আঁকা-বাঁকা—হঠাৎ দেখলে সত্যিকারের সাপ বলে মনে হবে!

এবারে দেখুন তো, এ সাপ তৈরী করে আনন্দ পান কি না!

দেহের ভিদ্

বাড়ী তৈয়ার করিতে হইলে প্রথমে ভিদের জোর চাই। ভিদ্ শক্ত না হইলে তাজমহলের মতো চারুগৃহও খাড়া থাকিতে পারে না।

দেহ সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। দেহের শক্তি ও গঠন নির্ভর করে মেরুদণ্ডের উপর। মেরুদণ্ড হওয়া চাই সুস্থ-সবল এবং নমনীয় (flexible)। আমাদের মেরুদণ্ডে একটি স্বাভাবিক বক্রতা (curve) আছে এবং এই বক্রতার উপরেই তার শক্তি ও নমনীয়তা নির্ভর করে। মেরুদণ্ড যদি কাঠের মতো কঠিন ও অনমনীয় হয়, তাহা হইলে চেহারা বিশ্রী, কদর্য্য হইবে এবং শরীর হইবে স্বাস্থ্যহীন, দুর্ব্বল।

উঠিতে-বসিতে চলিতে-ফিরিতে দেহ যদি বাঁকিয়া যায়, পিঠ ন্যুব্জ-কুব্জাকৃতি ধারণ করে, তাহা হইলে বুঝিবেন, মেরুদণ্ডের অস্বাস্থ্য ঘটিয়াছে; মেরুদণ্ডের ব্যায়ামে ব্যাঘাত ঘটিতেছে। মেরুদণ্ড মজবুত রাখিতে হইলে তার ব্যায়ামের রীতিমত প্রয়োজন আছে। জোর করিয়া পিঠ খাড়া-সিধা কিছুক্ষণের জন্য সম্ভব হয়; কিন্তু মেরুদণ্ডের স্বাভাবিক দৃঢ়তা ও খাড়াভাব রক্ষা করা ব্যায়াম-ভিন্ন সম্ভব নয়।

মেরুদণ্ডটি আমাদের শরীরের বড় সঙ্গীন জায়গায় অবস্থিত। এখানে কোনো আঘাত না লাগে, সে সম্বন্ধে সর্ব্বদা আমাদের খুব সতর্ক থাকা উচিত। মেরুদণ্ডকে যদি সুস্থ রাখেন, তাহা হইলে জীবনে কখনো পিঠ টাটাইবে না! ছুটাছুটি, গলফ্ বা ক্রিকেট-খেলা করিতে গিয়া অনেকের এমন পিঠ টন্‌টন্ করে যে, বেশীক্ষণ খেলিতে পারেন না। ছুঁচ-সুতা লইয়া সেলাই করিতে গিয়া, অর্গান লইয়া গান গাহিতে বসিলে যে পিঠে টান্ পড়ে, বা পিঠ টন্‌টন্ করে, তার কারণ মেরুদণ্ডের অস্বাস্থ্য।

পিঠ-টন্‌টনানির অবশ্য আরো বহু কারণ থাকিতে পারে। স্ত্রীরোগবশতঃ বা মেরুদণ্ডের শিরা-উপশিরা-গুলিতে ক্রিয়ার কোনো ব্যাঘাত ঘটিলে বুক-পিঠ টন্‌টন্ করে। সে উপসর্গ চিকিৎসায় সারে; কাজেই সে-যাতনা হইতে মুক্তি মিলে।

মেরুদণ্ডের স্বাস্থ্য বুঝিতে হইলে মেরুদণ্ডের গঠন ভালো করিয়া বুঝা প্রয়োজন। ছেলেমেয়েদের মেরুদণ্ডে তেত্রিশখানি স্বতন্ত্র অস্থিখণ্ড আছে। বয়স-বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই অস্থিগুলি সুসংবদ্ধ (welded) ও সুদৃঢ় হইতে থাকে; সুসংবদ্ধ হইয়া স্বতন্ত্র এই অস্থির সংখ্যা পরে দাঁড়ায় ছাব্বিশ। মেরুদণ্ডের অস্থিগুলি (cartilege) কশেরুকার (vertebra) সঙ্গে এমনভাবে সংবদ্ধ যে, তাহার কোনোখানে একটু আঘাত লাগিবামাত্র ঘর্ষণাদি (friction) হইতে মেরুদণ্ডকে সে রক্ষা করে এবং মেরুদণ্ডকে স্থিতিস্থাপক (elastic) করিয়া তোলে। এজন্য মেরুদণ্ড সুস্থ না রাখিলে উপসর্গ ঘটাইবে।

প্রাচীন কালে এবং এখন এ যুগেও বহু জাতে মেয়েদের মেরুদণ্ড খুব সুস্থ-সবল দেখা যায়। পিঠে ভারী মোট বহার অভ্যাসে তাদের মেরুদণ্ড এমন সুস্থ, সবল ও নমনীয় থাকে। এ যুগের শিক্ষা-সভ্যতা এবং সংস্কারের ফলে মেয়েরা আর পিঠে ভার বহেন না; বহিবার প্রয়োজনও নাই। কিন্তু তাঁদের দেহের ব্যায়াম-ক্রিয়া প্রতিপদে ব্যাহত হয় বলিয়া মেরুদণ্ড স্বাস্থ্যহীন হইতেছে। বহু প্রসূতিকে প্রসব-কালে যে অসহ্য যাতনা সহিতে হয় এবং অনেকের যে প্রাণসংহার ঘটে, তার কারণ মেরুদণ্ডের অস্বাস্থ্য।

পিঠে ব্যথা ধরা, পিঠ টন্‌টন্‌ করা—এ-সবের আর একটি কারণ কুঁজো হইয়া বসা, দাঁড়ানো ও চলা। হীল-উঁচু জুতা পায়ে দিলেও এ উপসর্গ ঘটিয়া থাকে। এবং পিঠে যদি নিত্য এমন উপসর্গ ঘটে, তাহা হইলে মন মরিয়া যায়, হাসি-খুশী উবিয়া যায়—দেহে-মনে বার্দ্ধক্য আসিয়া দেখা দেয়। অন্তর্বত্নী রমণীদের পক্ষে এমন পিঠ ব্যথা ঘটিলে তখনি তার প্রতিকার করা কর্ত্তব্য, নচেৎ পরিণাম সাংঘাতিক হওয়া অসম্ভব নয়।

বিশেষজ্ঞেরা বলেন, পিঠের এ উপসর্গে প্রতিকারের চেয়ে প্রতিষেধ সহজ। তাঁরা বলেন, An ounce of prevention in the form of regular exercise —will save you many a pain and will improve your figure.

নিত্য-নিয়মিত ব্যায়ামে এ উপসর্গ কোনো কালে পিঠে ঘটিবে না, ঘটিতে পারিবে না এবং চেহারার ছাঁদ ও ঠাম হইবে সুশ্রী সুন্দর। বেশী বয়সেও এ ব্যায়াম সুরু করা চলে; এবং ব্যায়াম করিলে দেহ বেশ সচ্ছন্দ হইবে।

পিঠের এ ব্যায়ামে একাধারে স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্য্য লাভ করিতে পারিবেন। যাদের স্ত্রীরোগাদি উপসর্গ আছে, সুস্থ অবস্থায় তাঁদের পক্ষে নিম্নলিখিত ব্যায়াম উপযোগী এবং উৎকৃষ্ট।

১নং ছবির ভঙ্গীতে হাঁটু তুলিয়া আসনপিঁড়ি হইয়া মেঝেয় বসুন। দুই হাত ঊর্দ্ধে তোলা থাকিবে। তার পর দেহ সিধা খাড়া রাখিয়া ঊর্দ্ধে-তোলা-অবস্থায় দুই হাত পিছন দিকে নামান। যতখানি পারেন, নামাইবেন। দেহ যেন না বাঁকে, সাবধান! একদমে দশ-বার হাত-তোলা-নামা করিয়া এক-মিনিট কাল বিশ্রাম করুন; তার পর এ ব্যায়াম আবার করুন পনেরো বার। সামনে বড় আয়না রাখিলে আয়নার প্রতিবিম্বে দেখিবেন, দেহ সিধা খাড়া আছে কি না!

পিঠের পেশী সবল করিতে, দেহের গঠন সুঠাম, সুছাঁদ রাখিতে এবং পিঠের সর্ব্ববিধ উপসর্গ-প্রতিষেধ-কল্পে এই ব্যায়াম চর্চ্চা করুন,—

বাঁ হাঁটু মুড়িয়া ডান পা সিধা এবং দৃঢ়ভাবে প্রসারিত করিয়া পিঠ ঝুঁকিয়া ২নং ছবির ভঙ্গীতে দু'হাত দিয়া ডান পায়ের আঙুল স্পর্শ করুন। স্পর্শ করিতে না পারেন,

১। হাত তুলিয়া আসনপিঁড়ি

যতখানি সম্ভব দুই হাত সামনের দিকে প্রসারিত করুন। এই অবস্থায় থাকিয়া পর-মুহূর্ত্তে ৩নং ছবির মতো দেহকে চিতাইয়া ডান হাত ঊর্দ্ধে তুলিয়া ভূমির উপর বাঁ হাত রাখুন। বাঁ হাত এবং বাঁ পায়ের উরু-দেশ সম-রেখায় (Parallel) থাকিবে।

২। বাঁ-পায়ের হাঁটু মেঝেয় রাখিয়া
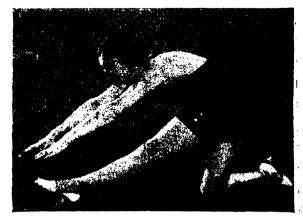
২ এবং ৩নং ব্যায়াম একাদিক্রমে পর-পর পাঁচ বার করিয়া দু'মিনিট বিশ্রাম; তারপর আবার পাঁচ বার করা চাই। শেষ বারের ব্যায়াম শেষ হইলে মেঝের উপরে

হাত-পা ছড়াইয়া চিৎ হইয়া শুইয়া মৃদুমন্দভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করুন।

উপুড় হইয়া মেঝেয় শয়ন করুন; হাঁটু দুমড়াইয়া মাথার দিকে বাঁকান; সঙ্গে সঙ্গে পিঠের উপর দিয়া দুই হাত চালাইয়া ৭নং ছবির ভঙ্গীতে দু'হাত দিয়া দু'পায়ের গোছ ধরুন। এ অবস্থায় মেঝে হইতে বুক তুলুন। এইভাবে কিছুক্ষণ থাকিয়া পা ছাড়িয়া দিন, তারপর আবার ধরুন। পর্য্যায়-ক্রমে এ ব্যায়াম করা চাই দশ-বারো বার।

৫নং ছবির ভঙ্গীতে উপুড় হইয়া মেঝেয় শুইয়া দু'পা এবং দু'হাত সিধা সরল ভাবে বিস্তারিত করিয়া দিন। (৫নং ছবি দেখুন)। তারপর মেঝে হইতে দু'হাত এবং
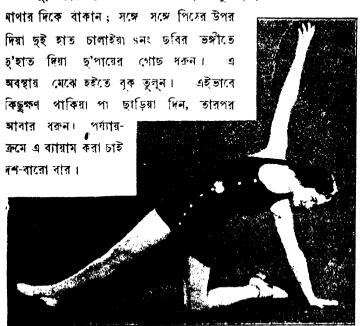
৩। দেহ চেতাইয়া ডান হাত

৬। চেয়ারের পিঠে হাত

৪। উপুড় হইয়া শুইয়া

দু'পা তুলুন। হাত-পা তুলিয়া এই অবস্থায় থাকিয়া এক হইতে কুড়ি পর্য্যন্ত গণনা করুন; তারপর হাত-পা নামান; নামাইয়া এক হইতে কুড়ি পর্য্যন্ত গুণুন এবং তারপর আবার হাত-পা তুলিতে হইবে। এ ব্যায়াম করা চাই একাদিক্রমে দশ বার; বারো বার; পনেরো বার।

একখানি চেয়ার রাখুন। চেয়ার হইতে তিন ফুট দূরে চেয়ারের দিকে পিছন ফিরিয়া চেয়ারের পিঠে দুই হাত রাখিয়া ৬নং ছবির ভঙ্গীতে দাঁড়ান। দেহখানিকে দৃঢ়ভাবে

[illegible]

রাখিবেন। তারপর পিছন দিকে মাথা হেলাইয়া দিন; পিলানের মতো পিঠ একটু বাঁকিয়া থাকিবে। দেহের ভর থাকিবে দুই পায়ের গোড়ালির উপর। কাঁধ ও পিঠের স্বাস্থ্য এবং গঠন এ-ব্যায়ামে ভালো হইবে।

দাঁড়াইয়া এক-পা সামনের দিকে আগাইয়া দিন (৭নং ছবি)। হাঁটু বেশ শক্ত ও খাড়া থাকিবে। এবার দু'হাত

৭। সামনে এক পা আগাইয়া দিন

পিছন-দিকে তুলিয়া মাথা ঝুঁকিয়া, মাথা দিয়া ডান পায়ের হাঁটু স্পর্শ করুন। এই ভাবে থাকিয়া পাঁচ মিনিট দুলিবেন। দুলিবার সময় মাথা পিছনে হেলিবে এবং মাথা পিছনে হেলিবার সময় দুই হাত সামনে থাকিবে। এই দোলন-ব্যায়াম করা চাই দশ-পনেরো বার।

ফুলের পরিচর্য্যা

ফুলকে দীর্ঘদিন তাজা রাখার উপায় খুবই সহজ। সেই উপায়ের কথা বলিতেছি।

সর্ব্বাগ্রে চাই পরিষ্কার জল। জল পরিষ্কার রাখিতে হইলে জলে এক-টুকরা কাঠ-কয়লা ফেলিয়া দিবেন। ফুলদানীর জল যখনই বদল করিবেন, তখনই প্রত্যেকটি ফুলের বোঁটা কলম-কাটার ভঙ্গীতে একটু কাটিয়া দিবেন।

যে-পাত্রে কার্নেশন ফুল রাখিবেন, সে পাত্রের জলে একটু বোরিক-এসিড মিশাইয়া লইবেন। তিন সের জলে এক-চামচ (চায়ের চামচ) বোরিক এসিড দিবেন। তাহা হইলে ফুল পাঁচ ছ'দিন তাজা থাকিবে।

ডালিয়া, গোলাপ, ক্রীশনথীমামের জলে ক'ফোঁটা এ্যাসপিরিন দিবেন। বারো-চৌদ্দ সের জলে এক গ্রেণ পরিমিত এ্যাসপিরিণ মিশাইলেই চলিবে।

গোলাপের রঙ এবং গন্ধ যদি অনেক দিন তাজা রাখিতে চান, তাহা হইলে রাত্রে ফুলদানি হইতে ফুল তুলিয়া লম্বা কোনো পাত্রে জল ভরিয়া সেই পাত্রে গোলাপ রাখিবেন। ফুল রাখিবার সময় হুঁশিয়ার, পাপড়িগুলি যেন চাপাচাপি না থাকে; বোঁটার সবটুকু যেন জলে ভিজিয়া থাকে। এ-সেবায় গোলাপ বেশ তাজা টাট্‌কা থাকিবে। অর্কিড ফার্ণ প্রভৃতির প্রাণও এমনি ভাবে দীর্ঘ করা যায়।

টিউলিপ্ জাতীয় ফুলেরা এক রাত্রেই মাথা নুইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। এ ফুলকে তাজা রাখিতে হইলে রাত্রে পাতলা কাগজে ফুলগুলিকে চাপিয়া মুড়িয়া লম্বা কোনো পাত্রে জল ভরিয়া সেই জলে বোঁটা ডুবাইয়া রাখিয়া দিবেন। রাত্রে ঐ কাগজের সাহায্যে জল শুষিয়া ফুল চমৎকার তাজা থাকিবে।

লিলি রাখিতেও এমনি বেগ পাইতে হয়। লিলির পাপড়ি দুমড়াইয়া মলিন পাতের মত হইয়া যায়। লিলিকে তাজা রাখিতে হইলে মোটা কাগজে গোল ছিদ্র রচিয়া আল্‌তোভাবে সেই ছিদ্রে এক-একটি ফুল যদি স্বতন্ত্রভাবে গুঁজিয়া রাখিতে পারেন, লিলি স্বচ্ছন্দ দীর্ঘায়ু হইবে।

ডাকে বা রেলে যদি কোথাও ফুল পাঠাইতে চান, তাহা হইলে পাঠাইবার পূর্ব্বে প্রত্যেকটি ফুলের বোঁটা মোম দিয়া ঢাকিয়া তার উপরে ভিজা ব্লটিং-কাগজ জড়াইয়া দিবেন। এ ভাবে প্যাক করিয়া ফুল পাঠাইলে সে ফুল বহু দিনে মলিন বা বিশুষ্ক-বিবর্ণ হইবে না; ফুলের পাপ্‌ড়ি ঝরিবে না—টাট্‌কা তাজা থাকিবে। ঝিমানো-গোছ মলিন বিশুষ্ক-প্রায় ফুলের গাছে যদি ঈষৎ-তপ্ত গরম জল ছিটাইয়া দেন, তাহা হইলে সে গাছ তখনি সজীব হইবে।

য়ুরোপের আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি

য়ুরোপের আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি দিন দিন অধিক শঙ্কাজনক হইয়া উঠিতেছে। জার্ম্মাণী এবং ইটালী এই দুইটি স্বৈরশাসিত দেশ পূর্ব্ব-দক্ষিণ য়ুরোপে যেরূপভাবে নিজ প্রভাব বিস্তৃত করিতেছে, তাহাতে মনে হইতেছে যে, যতই দিন যাইতেছে, ততই য়ুরোপের অবস্থা অধিকতর জটিল হইয়া পড়িতেছে। জার্ম্মাণী একে একে পূর্ব্ব দক্ষিণ য়ুরোপের কতকগুলি রাজ্যকে কিরূপভাবে নিজ আয়ত্তের মধ্যে আনিয়াছেন, তাহা সকলেই জানেন। এখন ইটালী আলবেনিয়ার মত ক্ষুদ্র রাজ্যটিকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। গণতন্ত্র-শাসিত রাজ্যগুলি স্বৈর-শাসিত রাজ্যদ্বয়ের এই আচরণের প্রতিবাদ করিয়াছেন,—কিন্তু সে প্রতিবাদে বিশেষ কোন কাজ হয় নাই। স্বৈর-শাসকরা নৈতিক বাধা গ্রাহ্য করিতেছে না। ইহাতে মনে হইতেছে যে, হাতে-হাতিয়ারে তাহাদিগকে বাধা না দিলে তাহারা এই কার্য্যে কিছুতেই ক্ষান্ত হইবে না। কাজেই অবস্থা অত্যন্ত শঙ্কাজনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গণ-শাসিত রাজ্যগুলির একটা প্রধান দোষ এই যে, তাহাদিগকে সর্ব্বসাধারণের মত লইয়া কার্য্য করিতে হয়। দেশের লোকের সকলেই কখনই এক বাক্যে সমর ঘোষণার সমর্থন করে না। বিশেষ যতক্ষণ সকলের ব্যক্তিগত বা রাষ্ট্রগত স্বার্থে আঘাত না পড়ে, ততক্ষণ সাধারণ লোকের মধ্যে অধিকাংশই সমর ঘোষণার বিরোধী থাকে। কিন্তু স্বৈরশাসিত এবং একনায়করাজ্যের একটা উৎকট কার্য্য করিতে বিলম্ব ঘটে না। সেই জন্য হিট্‌লার এবং মুসোলিনী সহসা যাহা করিতে পারেন, চেম্বারলেন বা রুজভেল্ট তাহা তত শীঘ্র করিতে পারেন না। কাজেই এইরূপ অবস্থায় গণ-শাসিত রাজ্যগুলিকে একনায়ক-নিয়ন্ত্রিত রাজ্যগুলির নিকট রাজনীতিক চা'লবাজীতে পরাজিত হইতে হইতেছে। এখন ঠিক এইরূপ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে যে, আর শান্তভাবে শান্তির কোন প্রস্তাব সফল করিয়া তুলিবার কোন সম্ভাবনাই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। গ্রেটবৃটেন সংগ্রামে লিপ্ত হইতে একান্তই অনিচ্ছুক। কিন্তু ফাসিষ্ট এবং নাজী নায়কদ্বয় যেরূপ ক্ষিপ্রকারিতার সহিত দেশের পর দেশ জয় করিয়া লইতেছেন, ইংরেজ এবং ফরাসী উভয়েই উহাতে মৌখিক আপত্তি মাত্র করিয়াছেন,—কিন্তু

মাদ্রিদ অধিকারের পর রাজপথে যুযুধান পক্ষের সম্মিলন

তাহাতে কোন ফলই ফলে নাই। হার হিটলার এবং সিনিওর মুসোলিনী যাহা করিবার, তাহা অতি ক্ষিপ্রতার সহিত করিয়া ফেলিতেছেন। ভূমধ্যসাগরে পূর্ণ-প্রতা প্রতিষ্ঠিত করাই যে ইটালীর এক মাত্র লক্ষ্য, তাহা বুঝিতে বিশেষ কষ্ট হয় না। এলবেনিয়া অধিকার করিয়া ইটালী

এলবেনিয়ার ভূতপূর্ব্ব রাজা জগ ও তাঁহার পত্নী

জেচোস্লোভাকিয়া অভিযানের পর বার্লিনে হিটলারের অভিনন্দন

আড্রিয়াটিক উপসাগরটিতে সম্পূর্ণ একাধিপত্য স্থাপন করিল। কারণ, উহার প্রবেশ-পথের দুই দিকেই রহিল ইটালীর অধিকার। এই আড্রিয়াটিক সাগরেই ইটালীর সমস্ত রণতরীর স্থান।

এদিকে স্পেনে ফ্রাঙ্কোর জয়লাভে ইটালীর ও জার্ম্মানী সুবিধা ঘটিয়াছে। স্পেন এখন একনায়ক-রাজ্যের প্রভা পতিত। ফ্রাঙ্কো এখন কি করিবেন, তাহা ঠিক বু যাইতেছে না। সম্ভবতঃ তিনি নাজি ফাসিষ্ট চক্রে আবর্ত্তিত হইবেন। জিব্রাল্টার বন্দর গ্রেটবৃটেন হই ভূমধ্যসাগরের প্রবেশ-পথেই অবস্থিত বন্দরটি ইংরেজ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত। এ স্পেন যদি ফাসিষ্ট নাজী-চক্রের ম যাইয়া পড়েন, তাহা হইলে তাঁহা ইংরেজদিগকে জিব্রাল্টার ছাড়িয়া দি বলিতে পারেন। ইহার মধ্যেই সে ক উঠিয়াছে। স্পেন এখন অনেক ইটালীর প্রভাবাধীন। কারণ, প্রধান ইটালীই সেনাপতি ফ্রাঙ্কোকে বিশে ভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন। ইটা যুরোপে এই প্রভাব বিস্তারে জার্ম্মা অপেক্ষা কম যাইতেছে না। কিন্তু স্পেন রাজ্যটি এখন ইটালীর সহি বাধ্যবাধকতা সম্বন্ধে আবদ্ধ হই সে হিসাবে মরক্কোতেও ইটালী কতকটা প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইবে এরূপ অবস্থায় ইটালী স্বয়ং স্পেনকে দিয়া বলাইতে পারে ে ইংরেজ জিব্রাল্টার বন্দরটি ছাড়ি দিন। সে কথা বলাও হইয়াছে স্পেনকে বলা হয় যে, অবিলম্বে স্পে হইতে বিদেশী সৈন্য সরাইয়া লও হউক। তাহার উত্তরে স্পেন বলিয়াছে উহা সরাইয়া দেওয়া হইবে বটে, কি তৎপূর্ব্বে বৃটিশ জাতিকে জিব্রাল্টা বন্দর হইতে সৈন্য সরাইয়া লইতে হইবে স্পেন জানে যে, গ্রেটবৃটেন জিব্রাল্টা হইতে সৈন্য সরাইয়া লইতে সম্মত হইবে না। অতএব স্পে হইতেও বিদেশী সৈন্য সরাইয়া লইবার কথাটা চাপা পড়িবে ইটালী এখন ভূমধ্যসাগরে স্বীয় প্রভাব পূর্ণমাত্রায় প্রতিষ্ঠি করিতে চাহে। ইহাতে গ্রেটবৃটেনের বিলক্ষণ স্বার্থহানি

ঘটিবার সম্ভাবনা। সেইজন্য মনে হইতেছে যে, গ্রেটবৃটেনের ইচ্ছা না থাকিলেও তাহাকে সংগ্রামক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে। গ্রেটবৃটেন মুখে যাহাই বলুন না কেন, তাঁহারা যে, যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেইজন্য তাঁহারা ২০।২১ বৎসর বয়স্ক যুবকদিগকে সৈনিকের কার্য্য শিক্ষা দিবার জন্য বাধ্য করিতেছেন। তাঁহারা সামরিক ব্যয়ও অতিশয় বৃদ্ধি করিতেছেন।

ইটালী কেবলমাত্র এলবেনিয়া রাজ্যটি গ্রাস করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবে বলিয়া মনে হয় না। তাহারা যুগো-শ্লোভকিয়া রাজ্যটি গ্রাস করিবে বলিয়া মনে হইতেছে। অথচ ইটালী সন্ধি বা সর্ত্ত করিয়া এই রাজ্যে প্রবেশলাভ করিবে কি না, তাহা ঠিক বুঝা যাইতেছে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ইটালী যেরূপ পথে চলিয়াছে, তাহাতে তাহারা ভূমধ্যসাগরে স্বীয় প্রাধান্য বা পূর্ণ-অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। ইহার মধ্যে ইংরেজের সহিত ইটালীর একটা সন্ধি বা রফা বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছিল। সেই নিষ্পত্তির সর্ত্তগুলির মধ্যে প্রধান সর্ত্ত ছিল যে, ভূমধ্য-সাগরের ব্যবস্থা যেরূপ চলিয়া আসিতেছে—সেইরূপই রাখিতে হইবে, তাহার কোন ব্যতিক্রম করা যাইতে পারিবে না। দ্বিতীয়তঃ স্পেন হইতে বিদেশী সৈন্য সরাইয়া আনিতে হইবে। ইটালী সে সর্ত্ত অনুসারে কায করিতে সম্মত হইতেছে না। তাহারা এখন স্পেন হইতে বিদেশী সৈন্য সরাইবে না। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, ইটালী ও জার্ম্মাণী গণ-তন্ত্রবাদী রাজ্যগুলিকে গ্রাহ্য করিতেছে না। তাহারা নিজ ইচ্ছা অনুসারেই আপনাদের মতলব মত কায করিয়া যাইতেছে। এখন জোর করিয়া তাহাদের কার্য্যে বাধা না দিলে, আর অন্য উপায়ে তাহাদিগকে নিরস্ত করা সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না।

ইটালী এবং জার্ম্মাণী এক সঙ্গে থাকিলে তাহারা যে বিশেষ প্রবল এবং শক্তিশালী হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আবার তাহাদিগকে জানান হইয়াছে যে, যদি তাহারা পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া বা গ্রীসের উপর হস্তক্ষেপ করে, তাহা হইলে ইংরেজ ও ফরাসী ঐ সকল রাজ্যের সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবে। কিন্তু গণশাসিত গ্রেট-বৃটেন এবং ফ্রান্সের ভাব দেখিয়া পোল্যাণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষ কতদূর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবেন, তাহা বুঝা যাইতেছে না।

টিরানা অধিকারের পর কাউণ্ট সিয়ানো জেনারেল গুজোনির সহিত আলোচনারত

মাদ্রিদে বিজয়ী ফ্রাঙ্কোর সেনাবাহিনীর প্রবেশ

পোল্যাণ্ডের রাষ্ট্রনায়কগণ যদি বুঝেন যে, তাঁহারা ঐ দুইটি স্বৈরশাসিত কেন্দ্রী শক্তির দলে ভিড়িলে বা তাহাদের সহিত একটা বাণিজ্য-সন্ধি করিলে তাহারা আপনাদের রাজনীতিক স্বাধীনতা কতকটা অক্ষুণ্ন রাখিতে সমর্থ হইবে, তাহা হইলে তাহারা সে কার্য্যে সম্মত হইতেও পারে। কারণ, "সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ" এ নীতি সর্ব্বত্রই এবং সর্ব্বকালেই সমাদৃত। এখনও যতদুর বুঝা যাইতেছে, তাহাতে মনে হইতেছে যে, পোল্যাণ্ডের ফাসিষ্ট

মাদিদের প্রয়োজনীয় অট্টালিকাসমূহ দখল করিবার জন্য জেনারেল ফ্রাঙ্কোর সাহায্যকারী ফ্যালাঞ্জিষ্টগণ চলিয়াছেন

কাউণ্ট সিয়ানোর টিরানা পরিদর্শন

নাজী চক্রে ঘূর্ণিত হইবার ইচ্ছা নাই। কিন্তু সে ইচ্ছা কত দিন থাকিবে, তাহা বলা কঠিন।

এ দিকে জার্ম্মাণীর আচরণে মার্কিণ অতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। মার্কিণের প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট সেজন্য জার্ম্মাণীকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু জার্ম্মাণী তাহা বিশেষ গ্রাহ্য করিবার মত মনোভাব প্রকটিত করিতেছে না। মার্কিণ অত্যন্ত দূরে অবস্থিত। সেজন্য হিটলার তাঁহাকে তেমন গ্রাহ্য করিতেছেন না। মার্কিণ যে সহজে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারিবে, সে বিশ্বাসও জার্ম্মাণীর নাই। হিটলার সেই জন্য মার্কিণের কথার জোর করিয়া জবাব দিয়াছেন। ফলে যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে স্বৈরশাসিত রাজ্যগুলির সহিত গণ-শাসিত রাজ্যগুলির শক্তি পরীক্ষার সময় আগতপ্রায় বলিয়া মনে হইতেছে। জার্ম্মাণী এবং ইটালীর কি জন্য এই অকুতোভয়, তাহা ঠিক বুঝা যাইতেছে না। বিগত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধে জার্ম্মাণী জেপেলিন ও সাবম্যারিণ দ্বারা লোককে সন্ত্রস্ত করিয়াছিল। এবার জার্ম্মাণী কি বিজ্ঞানবলে সেইরূপ সংহার অস্ত্রপ্রভাবে য়ুরোপব্যাপী সমরানল প্রজ্বলিত করিবে? রসায়ন-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত জার্ম্মাণজাতির পক্ষে ইহা যে একেবারেই অসম্ভব, তাহা মনে হয় না। অথবা এই যুদ্ধের হুমকী হিটলারের একটা শূন্য-গর্ভ চা'লবাজী মাত্র। ইহার কোনটাই অসম্ভব নহে।

কিন্তু জার্ম্মাণী কেবল প্রেমারায় তাড়া দিয়া চা'লবাজী করিয়া জিতিয়া যাইবে, ইহা অসহ্য। কেবলমাত্র ধাপ্পার জোরে জার্ম্মাণী নিজ কার্য্যোদ্ধার করিয়া লইতেছে। এরূপ অবস্থায় কি করা কর্ত্তব্য, তাহাই হইতেছে য়ুরোপের মহাসমস্যা। কাযেই

এখন কথা হইতেছে যে, ইংরেজ, ফরাসী, রুশিয়া এবং মার্কিণ যদি একই ভাবে একযোগে কেন্দ্রী শক্তিগুলিকে শিক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হন, তাহা হইলে হয় ত তাহাতে ফল হইতে পারে। গ্রেটবৃটেন এবং ফ্রান্স সম্মিলিত হইয়া কার্য্য করিবে। মার্কিণও এই বিষয়ে উঁহাদের সহায় হইবে বলিয়াই বোধ হয়। সমস্যা হইতেছে রুশিয়াকে লইয়া। রুশিয়ার সামরিক বল অত্যন্ত অধিক সত্য, তাহা হইলেও রুশিয়া এখন পরের জন্য সংগ্রামে যোগ দিতে পারিবে কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ বিদ্যমান। কারণ, রুশিয়ার নামে গণশাসন প্রতিষ্ঠিত হইলেও কাযে তথায় ঘোর স্বৈরশাসন চলিতেছে। রুশিয়ায় মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা একেবারে নাই। তথায় এক দরিদ্র নারী পাঁচটি রূপার রুবল রাখিয়াছিল বলিয়া তাহার ও তাহার স্বামীর প্রাণদণ্ড হইয়াছিল। সে দেশে একরূপ বিনা বিচারে লোকের প্রাণদণ্ড হয়, সরকারের প্রতিকূল মত ব্যক্ত করিলে যমালয়ে যাইতে হয়। এরূপ অবস্থায় সেখানে ধনসাম্যবাদ প্রহেলিকায় পরিণত হইয়াছে। রুশিয়ার শান্তির সময়েই সাড়ে পনর লক্ষ সৈন্য রহিয়াছে। ইহা ভিন্ন সামরিক কার্য্যে শিক্ষিত নাগরিক সৈন্যও বিস্তর আছে। কিন্তু এই সমস্ত সৈন্যই তাহাকে দেশরক্ষার জন্য নিযুক্ত রাখিতে হইয়াছে। এখন যদি রুশিয়া বাহিরের যুদ্ধে বিব্রত হয়, তাহা হইলে তাহার রাজ্যমধ্যে ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হইবে। ইহার উপর জাপানের সহিত রুশিয়ার অনেক বুঝা-পড়া আছে। রুশিয়া তাহার কিছুই করিতে পারিতেছে না,—কেবল তলে তলে চীনের সমরাগ্নিতে ইন্ধন যোগাইতেছে। আবার সাম্রাজ্যবাদী এবং মূলধনপ্রধান জাতিরা রুশিয়াকে অপাঙ্‌ক্তেয় মনে করে। কাযেই তাহারা রুশিয়ার সহিত মিলিতে চাহে না।

ফিল্ড মার্শাল গোয়েরিং হিটলারকে অভিনন্দিত করিতেছেন

ইটালীয় বাহিনীর ভ্যালোনা অধিকার

নতুবা পূর্ব্ব-দক্ষিণ যুরোপে জার্ম্মাণী এবং ইটালী আপনাদের বাণিজ্য-ক্ষেত্র বিস্তার করিতেছে,—কিন্তু রুশিয়া কৃষি এবং শিল্প কার্য্যে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক অগ্রসর হইলেও সে বিষয়ে বাক্যব্যয়ও করিতেছে না কেন? রুশিয়ার এখনও, রণোন্মাদনা জাগে নাই।

যেরূপ গতিক দেখা যাইতেছে,—তাহাতে মনে হইতেছে যে, গ্রেটবৃটেনের যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা একেবারেই নাই। বিগত যুরোপীয় মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতা হইতে গ্রেটবৃটেন বুঝিয়াছে, ঐ যুদ্ধে গ্রেটবৃটেনের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতি হইয়াছে। তাহার বাণিজ্যধারা এবং পরিমাণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। বহু দেশের পণ্য-বীথীই হস্তচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে—বহু ঋণ হইয়াছে—ভারতে রাজনীতিক অশান্তি অত্যন্ত প্রবলভাবে দেখা দিয়াছে। ইংরেজ-জাতির ব্যবসায়

ইটালীয়ান বাহিনীর ডুরাজো অধিকার

সস্ত্রীক জেনারল ফ্রাঙ্কো এবং পুরস্কৃত বহু সন্তানের জননীগণ
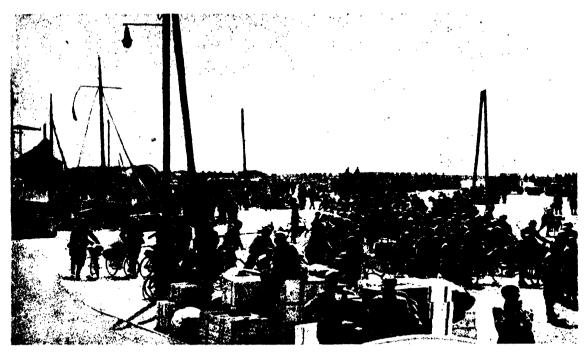
ইংরেজ আজ চেম্বারলেনের এই বেতসী নীতির নিন্দা করিতেছেন,—কিন্তু মনে কি পড়ে যে, অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া আর্ল গ্রে যখন বিগত মহাযুদ্ধে ফ্রান্স ও বেলজিয়ামকে রক্ষা করিবার জন্য মিত্রশক্তির পক্ষে যোগ দিয়াছিলেন, তখন বৃটিশবাসীরা অনেকে তাঁহাকে প্রশংসা করিয়াছিলেন। যখন জাম্মাণ জেপেলিন ও সবম্যারিণ বৃটেনের বিশেষ ক্ষতি করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তখন তাহাদের সে সুর বদলাইয়া গিয়াছিল। সে সময় অপেক্ষা এ সময় সমরের সাঙ্ঘাতিকতা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। অনেক নূতন নূতন মারণ-

বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ। তাহারা বুঝে যে, ভারত যদি তাহাদের হস্তচ্যুত হয়, তাহা হইলে তাহারা কোথায় তলাইয়া যাইবে, তাহা বুঝা কঠিন। ইংরেজ তাহা বুঝিতেছে বলিয়া তাহারা অপমানকে মাথা পাতিয়া লইয়া শান্তিরক্ষার জন্য সকলকে স্তুতিনতি করিতেছে। মিষ্টার গ্রাহাম পোলের ন্যায় অনেক

অস্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে। কাযেই এখন অগ্রসর হইয়া যুদ্ধ করিতে যাওয়া অতিশয় অবিমৃষ্যকারিতা। সেই জন্য জর্জ্জ বার্ণার্ডশ 'রোটারিয়ান' মাসিক পত্রে লিখিয়াছেন যে, বর্ত্তমানযুগে আর পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধ হইবে না। অন্ততঃ উহা ঘটিবার সম্ভাবনা যে অতি অল্প, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ইহার অর্থ—এখন কেহই অন্যের স্বাথরক্ষার জন্য ব্যাপকভাবে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে চাহিবে না। জার্ম্মাণী ইংরেজদিগকে বিশেষ অসন্তুষ্ট করিতে চাহিতেছে না। তাহারা তাহাদিগের উপনিবেশগুলি ফিরাইয়া চাহিতেছে, কিন্তু ফিরাইয়া না দিলে তাহারা যুদ্ধ করিবে, এমন কথা বলিতেছে না। বরং ইটালী যখন আবিসিনিয়া জয় করিতে গিয়াছিল, তখন তাহারা ইংরেজদিগের প্রতি অনেক কটূক্তি করিয়াছিল। কাযেই বৃটেন আচম্বিতে জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে সম্মত নহে। বিগত য়ুরোপব্যাপী মহাসংগ্রামে যেমন বৃটেনকে অত্যন্ত অধিক ঝক্কি-ঝঞ্ঝা সহিতে হইয়াছিল, যুদ্ধে লিপ্ত অন্য কোন জাতিকে তত ঝামেলা সহিতে হয় নাই। কাযেই গ্রেটবৃটেন সহসা সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে চাহেন নাই। কিন্তু জার্ম্মাণী ও ইটালী ক্রমশঃ যেরূপ ভাবে অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে আর ইংরেজ অধিক দিন স্থির থাকিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না। স্থিরধী চেম্বারলেনকেও এইবার সংগ্রামের জন্য যুবকদিগকে আহ্বান করিতে হইল।

এ দিকে ফ্রান্স ইটালীর সহিত মিত্রতা বা আপোষ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। ইটালী সুয়েজ খাল বোর্ডে দুই জন ইটালীয় সদস্য লইবার প্রস্তাব করিয়াছেন। জীবুটিতে স্বাধীনভাবে গমনাগমনের অধিকার, আদ্দিস আবাবা রেলওয়ে নিয়ন্ত্রণাধিকার এবং টিউনিসে ইটালীয়ান বা ইটালীয়ান-নাগরিকদিগের অধিকার ভোগ করিবেন, এইরূপ দাবী করিয়াছেন। ফ্রান্স ইহার কতক দাবী পূর্ণ করিতে সম্মত হইয়াছেন। এ দিকে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সকলকে অনুরোধ করিতেছেন। রুশিয়াও এই শান্তির সম্পর্কিত আলোচনায় যোগ দিয়াছে। ফলে যুদ্ধ হইবে বলিয়া মনে হইতেছে না, অন্ততঃ এখনও কেহ যুদ্ধ অপরিহার্য্য মনে করিতেছে না।

এখন ইটালীর সহিত জার্ম্মাণীর কোন [illegible] রা সম্ভব কি না, কোন কোন য়ুরোপীয় রাজনীতিক তাহা বিষ্কারের চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু এই উভয় দেশের ষ্ট্রনায়কই অত্যন্ত তীক্ষ্ণবুদ্ধি, সে জন্য সে চেষ্টা সফল বে বলিয়া আশা হয় না। উভয়ের উক্তি হইতেও হা বুঝা যায়। তবে যেরূপ অবস্থা হইতেছে, তাহাতে

সৈয়দ বন্দরে প্রবেশপথ দৃশ্য
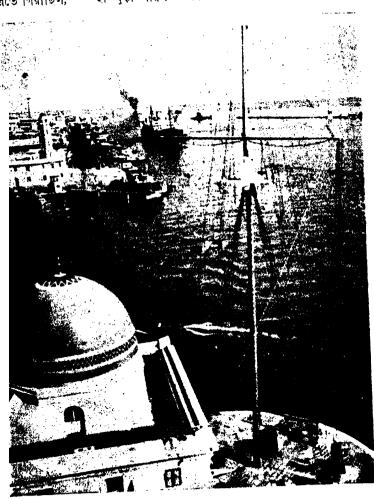
অপ্রতর্কিতভাবে একটা সংগ্রাম উপস্থিত হওয়াও বিস্ময়ের বিষয় নহে।

ঝটিকাকেন্দ্র পোল্যাণ্ড

আপাততঃ দেখা যাইতেছে যে, পোল্যাণ্ডই য়ুরোপের ঝটিকা-কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হার হিট্‌লার পোল্যাণ্ডের

সহিত একটা চুক্তি করিয়া ডানজিগ গ্রাস করিবার প্রস্তাব করেন। পোল্যাণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষ সে প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারেন নাই। সেই জন্য হার হিট্‌লার রোষরক্ত-নয়নে পোল্যাণ্ডকে বলেন যে, তিনি পোলজার্ম্মাণ চুক্তি বাতিল করিতেছেন। জর্ম্মাণীর পার্লামেণ্টে গত ২৮শে এপ্রিল তিনি যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি অতীব নির্ম্মমভাবে বলিয়াছিলেন যে, "ডানজিগকে জার্ম্মাণ-প্রতিনিধি সভার অন্তর্ভুক্ত একটি স্বাধীন নগরীতে পরিণত করা হইবে। য়ুরোপের শান্তিরক্ষার্থ ইহার অধিক আর সুবিধাজনক ব্যবস্থার কল্পনা করাও সম্ভব নহে।" ইহা ভিন্ন জার্ম্মাণীকে পোল্যাণ্ডের প্রান্তিক দেশের ভিতর একটি রেলপথ নির্ম্মিত করিতে দিতে হইবে এবং ঐ প্রান্তিক অঞ্চল পোল্যাণ্ডের ন্যায় জার্ম্মাণীরও প্রান্তিক অঞ্চল বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। সম্প্রতি পোল্যাণ্ডের পররাষ্ট্র সচিব কর্ণেল বেক হিট্‌লারের উক্তির জবাব দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, পোল্যাণ্ড তাহার আত্ম-সম্মান ও স্বাধীনতা রক্ষার সঙ্কল্পে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাহারা শান্তি চাহে, কিন্তু জার্ম্মাণীর পদতলে তাহাদের আত্মসম্মান বিকাইয়া দিয়া শান্তি কিনিতে চাহে না। পোল্যাণ্ড তাহার প্রান্তিক প্রদেশের অধিকার কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ করিতে সম্মত নহে। ইহাতে হিটলারের উক্তির স্পষ্ট জবাবই হইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। গ্রেট বৃটেন এবং ফ্রান্স কর্ণেল বেকের এই উত্তর সঙ্গত এবং নির্ভীক বলিয়া প্রশংসা করিতেছেন। কিন্তু জার্ম্মাণীর রাজনীতিক এবং সাংবাদিকরা উহার বিপরীত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অথচ গ্রেটবৃটেন, রুশিয়া এবং ফ্রান্স এই তিন শক্তি পোল্যাণ্ডকে সাহায্য করিবেন, এই আশায় পোল্যাণ্ড জার্ম্মাণীকে ঐরূপ নির্ভীক উত্তর দিতে সাহসী হইয়াছেন বলিয়া মনে হইতেছে। এদিকে গ্রেটবৃটেনের ঝুনা রাজনীতিক-দিগের মুখপত্র "টাইমস" ক্রমাগতই বলিতেছেন,—"দূর হউক! সামান্য একটা ডানজিগ্ বন্দরের জন্য কি সমস্ত য়ুরোপময় একটা মহাযুদ্ধ উপস্থিত করা যায়? পোল্যাণ্ড উহা ধীর ভাবে জার্ম্মাণীর সহিত আপোষ মীমাংসা করিয়াই লউক না।" ইহা পোল্যাণ্ডের পক্ষে বিশেষ আশার কথা নহে। আবার শুনা যাইতেছে যে, ডান্‌জিগের দুই জন জননায়ক বার্কেসগেডেনে হার হিট্‌-লারের সহিত ডানজিগ সম্বন্ধে আলাপ করিতে আসিয়াছেন। এই সংবাদে মনে হয়, হিট্‌লার বুঝি বিনা যুদ্ধেই ডান্‌জিগ্ গ্রাস করিবে। কারণ, জার্ম্মাণী যখন জেকোশ্লোভেকিয়া রাজ্যটি কুক্ষিগত করে, তাহার কিছু দিন পূর্ব্বেই ঐ রাজ্যের কয়েক জন জননায়ক ঐ বার্কেসগেডেনে হার হিট্‌লারের সহিত আলাপ করিতে আসিয়াছিলেন। এই ক্ষেত্রে যে ঠিক ঐরূপ ফলই ফলিবে, এমন কোন কথা নিশ্চয় বলা যায় না। এ দিকে আবার গ্রেটবৃটেনের ভূতপূর্ব্ব পররাষ্ট্র সচিব মিষ্টার ইডেন বিলাতের কমন্স সভায় স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন যে, 'টাইমসের' উক্তি হইতে লোকের মনে একটা ভ্রান্ত ধারণা জন্মিতে পারে। আশা করি, পার্লামেণ্ট নিশ্চিতরূপে জানাইবেন যে, পোল্যাণ্ডকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে, তাহা কিছুমাত্রও ক্ষুণ্ণ করা হয় নাই।

এ দিকে বৃটিশ-দূত সার নেভিল হেণ্ডার্সনের বার্লিনে প্রত্যাগমন লইয়া নানা গুজবের সৃষ্টি হইয়াছে। কেহ কেহ বলিতেছেন যে, "হার হিটলারকে দুইটি বিষয় গোপনে সাবধান করিয়া দিবার জন্য হেণ্ডার্সন আবার বার্লিনে গিয়াছেন। প্রথম সাবধানবাণী তিনি যদি প্রকাশ্যে যুদ্ধ না করেন, তাহা হইলে নির্ব্বিবাদে তাঁহার অভিলষিত ফল পাইবেন। দ্বিতীয় সাবধানবাণী—হিট্‌লার যদি বাড়াবাড়ি করেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে সুবিধা হইবে না। তাহা হইলে এখন যাহারা বৃটেনের শাসনযন্ত্র পরিচালিত করিতে-ছেন, তাঁহাদের পদচ্যুতি ঘটিবে। সুতরাং তাহাতে তাঁহার বরং সর্ব্বনাশই হইবে।" এ-সংবাদটি বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। এখন য়ুরোপের নিত্য পরিবর্ত্তনশীল অবস্থা এবং সংবাদ হইতে প্রকৃত পরিস্থিতি ঠিক করাই কঠিন।

আবার শুনা যাইতেছে যে, জার্ম্মাণী পূর্ব্বে পোল্যাণ্ডকে বলিয়াছিলেন যে—পোল্যাণ্ড এবং জার্ম্মাণীকে একযোগে রুশিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান করিতে হইবে। পোল্যাণ্ড সে প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। কারণ, পোল্যাণ্ড মনে করিয়া-ছিলেন যে, ঐরূপ যুদ্ধের ফলে পোল্যাণ্ডের বিস্তার কমিবে এবং দুর্জ্জয় জার্ম্মাণী কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া থাকিতে হইবে। এইরূপ বহু গুজবের মেঘাড়ম্বরে য়ুরোপের রাজনীতিক গগন ঘনঘটাচ্ছন্ন।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যারত্ন)।

আগে-পরে

[গল্প]

সিনেমা ভাঙ্গিল। বাহিরে দারুণ বৃষ্টি পড়িতেছে। ল্যাণ্ডিংয়ের সাম্‌নে মস্ত ভিড়। যাদের গাড়ী আছে, কোনোমতে গাড়ীতে চড়িয়া তাঁরা বাড়ী ফিরিতেছেন; যাদের গাড়ী নাই, ভ্রূ-ভঙ্গী করিয়া তাঁরা দাঁড়াইয়া আছেন ঢাকা ল্যাণ্ডিংয়ে।

সে-ভিড়ে কমলা দাঁড়াইয়াছিল; স্বামী প্রদোষ গিয়াছে ট্যাক্সির সন্ধানে। দূরে এক জন লোকের উপরে কমলার দৃষ্টি নিবদ্ধ···লোকটি যেন চেনা চেনা!

সহসা ভিড় ঠেলিয়া কমলা তার কাছে আসিল; ডাকিল,— চিত্তদা···

চমকিয়া লোকটি কমলার পানে ফিরিয়া চাহিল।

কমলার দু'চোখে আবেগ ও উত্তেজনার আভাস!

লোকটি কহিল—কমলা!

কমলা কহিল হ্যাঁ। এদিকে এসো···

উত্তেজনার ঘোরে চিত্তর হাত ধরিয়া কমলা তাকে একরকম টানিয়া আনিল···

একটু ফাঁকা জায়গা।

আসিয়া কমলা কহিল—তোমার খপর কি, বলো তো? বেঁচে আছো? আছো কোথায়? এমন নিরুদ্দেশ হয়ে থাকার মানে? কত বছর পরে যে দেখা···দেখা হবে, মনেও হয়নি! কেন, কোনো খপর দাও না, বলো তো?

কমলার দু'চোখে হাসি-অশ্রুর উচ্ছ্বাস! চিত্তর হাত কমলা ধরিয়া আছে।

চিত্ত কহিল—তুমি কিন্তু একটুও বদলাও নি, কমলা! কত বছর আগে যেমন দেখেছিলুম, এখনো ঠিক তেমনি আছো।

কমলা কহিল—তোমায় কিন্তু চেনা যায় না। অনেকক্ষণ ধরে আমি তোমায় দেখছি। ভয় হচ্ছিল, পাছে ভুল করি! শেষে থাকতে পারলুম না···

হাসিয়া চিত্ত কহিল—সাধে বলেছি, এখনো ঠিক তেমনি আছো···তেমনি পাগল!

কমলা কহিল থামো। পাগল আমি কোনো কালেই নই। তা তোমায় যখন পেয়েছি আজ, ছাড়বো না। আমাদের সঙ্গে যেতে হবে। ভয় নেই, দেরী হবে না··· উনি গেছেন ট্যাক্সি ধরতে।

চিত্ত কহিল উনি মানে? স্বামী প্রদোষ বাবু? তাঁর সঙ্গে সিনেমা দেখতে এসেছো?

তার সঙ্গে আসবো না তো কে আমার কুটুম আছে, যার সঙ্গে সিনেমায় আসবো? কিন্তু না, কোনো কথা শুনবো না। আমাদের সঙ্গে যেতে হবে। কত বছরের কত খপর জমে আছে, সব শুনবো। খেয়ে-দেয়ে তার পর বাড়ী যাবে। এখন তো সবে এই সাড়ে আটটা বেজেছে!···তা কোথায় আছো শুনি?

প্রশ্নের পর প্রশ্ন···সঙ্গে সঙ্গে দু'চোখের দৃষ্টি দিয়া কমলা যেন চিত্তকে নিঃশেষে দেখিয়া লইতেছিল! দীন-দরিদ্র বেশ—জীর্ণ মলিন মূর্ত্তি! এ কি সেই চিত্ত?

—কেমন আছো? অসুখ করেছিল খুব, নিশ্চয়! জানি, কোনোদিনই শরীরের যত্ন করতে শিখলে না তো! ···ঐ উনি এসেছেন। ঐ ট্যাক্সি···এসো, এসো···

হাত ধরিয়া টানিয়া চিত্তকে কমলা আনিল ল্যাণ্ডিংয়ের প্রান্তে। ইহার পরেই ফুটপাথ। তখনো বৃষ্টি পড়িতেছে··· বড় বড় ফোঁটা।

ফুটপাথের গায়ে ট্যাক্সি থামাইয়া প্রদোষ নামিয়া পড়িল। ফুটপাথে একটু জল জমিয়াছে। প্রদোষ কহিল

দাঁড়াও, দাঁড়াও···আমি হাত ধরি। আমার হাত ধরে তুমি ট্যাক্সিতে চড়ো···জুতো-কাপড় ভিজবে না!

এ উপদেশ মানিবে, কমলার ততখানি স্বর সহিতেছিল না। চিত্তর হাত ধরিয়া তাকে টানিয়া কমলা ট্যাক্সিতে চড়িয়া বসিল। সবিস্ময়ে আগন্তুকের পানে চাহিয়া প্রদোষও গাড়ীতে উঠিয়া বসিল।

ড্রাইভারকে প্রদোষ বলিল—সেণ্ট্রাল এভেন্যু।

গাড়ী চলিল।

কথাও চলিল। স্বামীর পানে চাহিয়া কমলা কহিল—এ হলো চিত্তদা। ছেলেবেলায় আমরা ছিলুম পরস্পরের বন্ধু। প্রায় আট বছর নিরুদ্দেশ। কোনো খপর নেই। সিনেমা ভাঙ্গতে তুমি গেলে ট্যাক্সি ধরতে, আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি···হঠাৎ দেখি, পাঁচ সাত জন লোকের পরেই দাঁড়িয়ে আছে চিত্তদা।···চিত্তদা কি সুন্দর গান গাইতো···তার পর আবার সে চিত্তর পানে চাহিল, কহিল,—এখনো গান গাও? না, সে সব বিসর্জ্জন দেছ? আশ্চর্য্য লোক কিন্তু···

কমলার কথার শেষ নাই। যেন গ্রামোফোনে দম দেওয়া হইয়াছে···রেকর্ড বাজিতেছে!

গাড়ী চলিতেছে। প্রদোষ বা চিত্ত কাহারো মুখে কথা নাই। বাহিরে বৃষ্টির ঘনঘটা···জলে-কাদায় বিশ্রী অস্পষ্টতা! প্রদোষের মনে জাগিতেছিল সহস্র প্রশ্ন,···বন্ধু? ছেলেবেলার বন্ধু? আট বছর নিরুদ্দেশ! গান গাহিত! হঠাৎ আজ তার দেখা পাইয়া কমলার আনন্দ যেন ঐ আকাশের বারি-ধারার মতো উন্মুক্ত উৎসারিত হইয়া উঠিয়াছে!···কিন্তু কৈ, এ চিত্তর নাম তো কোনোদিন শুনি নাই! এত লোকের এত কথা কমলা বলিয়াছে···কিন্তু এই চিত্তর কথা···

মনের গহনে সন্ধান করিল। না, এ নাম শোনে নাই! কখনো না!

প্রদোষ চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, চিত্তর পানে চাহিয়া কমলাকে কহিল—কৈ, এঁর কথা তো কখনো শুনিনি!

কমলা বলিল—না, এবারে শুনো···বলবো'খন···

গাড়ী আসিয়া সেণ্ট্রাল এভেন্যুতে একখানা পাঁচতলা ফ্ল্যাটের সামনে থামিল। কমলা নামিল সকলের আগে; নামিয়া চিত্তকে উদ্দেশ করিয়া কহিল—নামো চিত্তদা···

চিত্ত নামিল। প্রদোষ নামিল···

সামনে গাড়ী-বারান্দা। গাড়ী-বারান্দায় আসিয়া চিত্ত কহিল, আজ আসি কমল···তোমরা এলে সিনেমা দেখে···ফিরিয়ে খাওয়া-দাওয়া করবে না? আর একদিন বরং···

—না, না, না—কমলা আবার তার হাত ধরিতে যাইতেছিল, হঠাৎ যেন বাধা বোধ করিল! স্বামীর পানে চাহিয়া কমলা বলিল—ছেড়ো না গো···চিত্তদাকে ধরে আনো।···এসো চিত্তদা, না, এ-বৃষ্টিতে তোমার যাওয়া হবে না। চেহারা যা দেখছি, যেন সত্ত অসুখ থেকে উঠেছো!··· লক্ষীটি, এসো···

চিত্তকে আসিতে হইল।

তিন জনে আসিল তেতলায়—প্রদোষ ও কমলার ঘরে।

সুইচ টিপিতে আলো জ্বলিল।

পরিপাটী ঘর। সুচারু সজ্জিত। কমলা কহিল,—তোমরা দুজনে বসে কথা কও। আমি ঠাকুরকে দেখি। রান্নার একটা ব্যবস্থা···চা খাবে তো, চিত্তদা?

চিত্ত কহিল,—চা!

তার স্বরে দ্বিধা।

কমলা কহিল—হাঁ, চা···এর জন্য এত চিন্তা কিসের, শুনি?

চিত্ত কহিল—প্রদোষবাবু খাবেন?

কমলা কহিল—না, উনি এত রাত্রে চা খান না। তবে তুমি যদি খাও, ওঁকেও এক পেয়ালা থেকে বঞ্চিত করবো না!···উনি চান্ চা খেতে; আমি খেতে দিই না। বলি, না, চা খাবে না! বেশী চা খাওয়া ভালো নয়!···তা বলো, চা আনি তাহলে?

হাসিয়া চিত্ত কহিল—আনো।

কমলা চলিয়া গেল। চিত্ত দাঁড়াইয়া ঘরের চারিদিকে দৃষ্টি বুলাইতে লাগিল। একখানা বড় ছবি। প্রদোষ ও কমলার ছবি। চমৎকার!

এ ছবির পাশেই ছোট একটি ছেলের ছবি···

চিত্ত কহিল—ছেলে?

প্রদোষ কহিল—হাঁ।

চিত্ত কহিল—একটি ছেলে শুধু?

প্রদোষ কহিল—হাঁ।

—কত বয়স হলো?

—পাঁচ বছরে পড়েছে।...

ছবির পানে চাহিয়া চাহিয়া চিত্ত কহিল—মুখ হয়েছে ঠিক মায়ের মতো! কমলার মুখ হুবহু এমনি ছিল ঐ বয়সে। আজো আমার মনে পড়ে...কোঁকড়া কালো চুলের থোলো এমনি কপালের উপর ঝরে পড়েছে...তা ছেলেকে সিনেমায় নিয়ে যাননি?

প্রদোষ কহিল—না। তাকে আমার শাশুড়ীর কাছে রেখে গিয়েছিলুম। রাত্রে এ বৃষ্টিতে আজ আর আনলুম না। কাল সকালে আনবে।

—হুঁ...

চিত্তর ঘর-দেখা আর শেষ হয় না!

প্রদোষ কহিল—বসুন...

চিত্ত কহিল—হাঁ, বসছি।

একটা নিশ্বাস সে রোধ করিতে পারিল না।

চিত্ত সোফায় বসিল। সামনে ছোট টেবিলের উপর সিগারেটের টিন রাখিয়া প্রদোষ কহিল—নিন, স্মোক্ করুন। আমি একবার একটু ছুটী চাইছি—মানে, মুখ-হাত ধুয়ে আসবো।

চিত্ত কহিল—যান।...

তার পর...

প্রদোষ গেল পাশের ঘরে একখানা জরুরি চিঠি লিখিবার জন্য। চিত্ত চা খাইতেছে,...সামনে বসিয়া কমলা।

কমলা বলিল,—এত কথা মনে হচ্ছে, চিত্তদা...কোনটা আগে বলি, কোনটা পরে, ঠিক করতে পারছি না।... নিরুদ্দেশ যেন হয়ে গেলে, কিন্তু আমাকে মাঝে মাঝে খপর দিতে তোমার কি হয়েছিল, বলো তো?...যখনি মার কাছে গেছি, তোমার কথা জিজ্ঞাসা করেছি। বলেছি, জানো মা তার খপর? মা বলেছে, না! সে কোনো খপর দেয় না।...

চিত্ত কহিল,—কোনো খপর দেবার নেই,...ছিল না কোনো দিন, তাই খপর দিইনি!...খপর আজ নেবো তোমার কাছে...স্বামী-পুত্র নিয়ে ঘর করছো...সুখের সংসার...

বাধা দিয়া কমলা বলিল—আমাদের আর নতুন খপর কি, বলো? সব সংসার যেমন, আমার সংসারও তেমনি। হাসি-কান্না, রোগ-দুশ্চিন্তা,—এই নিয়ে দিন কাটছে! ...ভালো কথা, বিয়ে করেছো, চিত্তদা?

মলিন হাস্যে চিত্ত বলিল- বিয়ে! ও-বিলাস-সুখের সামর্থ্য হলো না কোনো দিন! তাছাড়া...তা তুমি বেশ ভালোই আছো, দেখছি।...এমন সজ্জা, এমন পরিপাটী আসবাব-পত্র...সিনেমায় যাচ্ছো দেখে আনন্দ হয়!

কমলা বলিল,—ওঁর সখ। আমি বলি, সব বাজে খরচ কেন করো?...ঝড়-ঝাপটা কম যায়নি মাথার উপর দিয়ে।...আমি বলেছিলুম, এ ফ্ল্যাট ছেড়ে চলো কোনো গলির মধ্যে ছোটখাট বাড়ী নিয়ে থাকি। আয় বুঝে ব্যয় করতে হবে তো! তা বললেন, না, পাঁচ-জনের কাছে একবার যখন মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছি, তখন সে মাথা নীচু করতে পারবো না! এতে যা ঘটে, ঘটুক!...তা ছাড়া ওঁর মত, বাইরের চালচলন ছোট করলে কোনো কালে আর বড় হতে পারবো না! অদ্ভুত!...কাজেই আমি কিছু বলি না।...সত্যি, ওঁকে নিয়েই সব! উনি যা পছন্দ করেন, উনি যা ভালো বোঝেন, ওঁর যা ভালো লাগে, করবেন বৈ কি! পাছে উনি মনে কষ্ট পান, তাই কিছু বলি না।...তোমাকে দেখাই এসো, ছেলের জন্য খেলনাপত্র যা কিনে জড়ো করেছেন, রাজা-রাজড়ার ঘরের ছেলেরাও এত পায় না। যদি বলি ছেলেটাকে বাবু করতে চাও? হেসে বলেন, কিছু বলো না গো! আমার বাবা যখন মারা যান, আমার বয়স ছিল তখন পাঁচ বছর,—বাপের আদর কাকে বলে জানিনি! দুঃখিনী মায়ের দুঃখ নিয়ে বড় হয়েছি। এখন ছেলে হয়েছে, যদ্দিন আছি, বাপের আদরে ছেলে যেন বঞ্চিত না থাকে! ...কিন্তু না, নিজের কথাই বলছি একরাশ। তোমার কথা বলো দিকিনি...এত বছর ধরে কোথায় অজ্ঞাতবাসে ছিলে? কি-বা করলে?

চিত্ত বলিল আমার এ-ক'বছরের ইতিহাস শুধু দুঃখের ইতিহাস!...তোমার তখন বিয়ের কথা চলেছে! প্রায় আট বছর আগে তোমার সঙ্গে সেই শেষ দেখা! না, মাঝে একবার দেখা হয়েছিল চকিতের জন্য!...হ্যাঁ, যা বলছিলুম,

বাবা মারা গেলেন, সংসারে অনাটন…আমি এক বন্ধুর সঙ্গে বেরিয়ে পড়লুম ব্যবসার কারবার করতে। যেটুকু পুঁজি ছিল, বন্ধুর হাতে ধরে দিলুম। বন্ধু ছিল পাকা কারবারী। অনেকগুলো টাকা কিন্তু লোকসান হয়ে গেল! তার পর যা বাকী ছিল, নিয়ে আবার এলুম দেশে…

কমলার মন বলিল, আহা! নিশ্বাস ফেলিয়া মুখে সে বলিল,—তার পর ?

চিত্ত বলিল—তার পর একটা চাকরি জোটালুম ক্যালকাটা কর্পোরেশনে। ছ'মাস চাকরি করলুম। তার পর হলো অসুখ…নিউমোনিয়া। চিকিৎসা করাবো, সাধ্য ছিল না। কোনোমতে বাসায় পড়ে বিনা-পয়সার হোমিওপ্যাথি ওষুধ খেয়ে সেরে উঠলুম। মরতে পারলুম না।

কমলা কহিল—সে ক'বছরের কথা ?

—বছর চারেক আগে।

কমলা বলিল আমার খোকা তখন এক বছরের। …তা আমাকে কোন একটা খপর দিয়েছিলে! আমার তেমন অবস্থা না হলেও তোমাকে বিনা-চিকিৎসায় থাকতে হতো না!

প্রদোষ আসিল কহিল—কি, পুরোনো দিনের স্মৃতি-কথা হচ্ছে ?

কমলা কহিল, —হ্যাঁ। আহা, বেচারী কি কষ্টই না ভোগ করেছে গো! বসো না, শুনবে!

প্রদোষ বসিল।

কমলা চাহিল চিত্তর পানে, কহিল তার পরে বলো…

চিত্ত কহিল—ভালো লাগবে না…একটানা দুঃখের কাহিনী…

কমলা ডাকিল—চিত্তদা…

তার স্বরে অভিমানের বজ্রতেজ!

চিত্ত কহিল—রোগ থেকে উঠে দেখি, চাকরিটি খোয়া গেছে। তার পর আবার একজনের সঙ্গে যৌথ কারবার! …নালিশ করবার আগে কেউ টাকা শোধ করেছে, এমন ব্যাপার কখনো একালে দেখেছো?…আপনিই বলুন, প্রদোষ বাবু! আপনার মাথাটি সামনে পেয়ে কাঁঠাল ভাঙ্গতে অপরে নিরস্ত আছে, এমন ঘটেছে কখনো? বিশ্বাস করে যার হাতে চাবি-কাঠি তুলে দেছেন, সে-বিশ্বাস সে কখনো রেখেছে?

প্রদোষ কহিল—এমন ব্যাপার আমার জীবনে ঘটেছে চিত্তবাবু। মানুষ মাত্রেই অবিশ্বাসী নয়, অসাধু নয়। আমার সৌভাগ্য, মানুষকে এতখানি অবিশ্বাসের পাত্র বলে' মনে করবার কারণ আমার জীবনে ঘটে নি!

চিত্ত কহিল,—আপনি তাহলে ভাগ্যবান ব্যক্তি।

কমলা বলিল—কিন্তু আমার ভারী আশ্চর্য্য বোধ হচ্ছে, চিত্তদা! এককালে দেখেছি, তোমার কত বন্ধু-বান্ধব ছিল। তোমায় ছেড়ে থাকতো না। তুমিই গল্প করতে, এমন সব বন্ধু…যারা তোমার জন্য পয়সা তো তুচ্ছ, প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারে।

চিত্ত কহিল—বলেছি না কি এ-কথা ?

কমলা বলিল—নিশ্চয়। একবার তোমার দেড়শো টাকা দেনা হয়েছিল, হাতে পয়সা ছিল না, পাওনাদারে খুব অপমান করছিল…তা তুমি বললে, সে-দেনা তোমার কে বন্ধু শোধ করে দেয়। তোমার গানের জন্যও ভক্ত আর শিষ্য বড় কম জোটেনি!…দেখেছি তো!…অম্বুজ, ক্ষেত্তর, মহিম, নলিন…আরো কত…সব নাম মনে নেই এখন!…

কমলার স্বরে কি তেজ…কি স্পষ্টতা! সহসা স্বামীর পানে কমলার দৃষ্টি পড়িল। স্বামীর দৃষ্টিতে কঠিন নিষেধের আভাস।

কমলা তখনি কথা ফিরাইল; কহিল—তার পর কি হলো, বলো…

চিত্ত বলিল—তার পর সেই মস্ত বিপদ ঘটলো, যাতে দুটি বছর গেল নষ্ট হয়ে।…তার পরেই তোমার সঙ্গে চকিতের জন্য দেখা—তোমার মার সঙ্গে তুমি গিয়েছিলে গঙ্গাস্নান করতে…অক্ষয় তৃতীয়া, না কি একটা ব্যাপার ছিল সেদিন…

কমলা কহিল,—হ্যাঁ। সেদিন অক্ষয় তৃতীয়া।…তার পর ?

চিত্ত কহিল,—তার পর মেজো মামা আমায় কিছু টাকা দিলেন। প্রায় পাঁচশো টাকা। দিয়ে বললেন—কলকাতায় আর নয়। এ টাকা নিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ো। চলে যাও আসাম, তুলোর ব্যবসা করো গে। মামার জানা লোক ছিল আসামে। গেলুম তার কাছে। কিন্তু তার ব্যবসা তখন খাবি খাচ্ছে—আমার টাকায় সে-ব্যবসাকে বাঁচানো গেল না। নিঃসম্বল ফিরে আসতে হলো।…কিন্তু এ

দুঃখের কথা আর কত শুনবে? ভালো লাগবে না! আসলে আমার বরাত বড় মন্দ…সোনার মুঠি চিরদিন ছাই হয়ে আসছে! জীবনের সকল দিকে!…তুমি তো জানো…

তার পর একটা নিশ্বাস। নিশ্বাস ফেলিয়া চিত্ত বলিল, —কিন্তু উঠে দাঁড়িয়াছি প্রত্যেক বার। আঘাতে-আঘাতে কাবু হলেও মাটিতে লুটিয়ে পড়িনি! এখনো দাঁড়াবার চেষ্টার ত্রুটি নেই! কিন্তু যে বরাত…এই গ্যাখো হাত…•

চিত্ত মণিবন্ধ দেখাইল, বলিল,—একটা রিষ্ট-ওয়াচ ছিল—সুখে-দুঃখে চির-সহচর। সেটা যে কোথায় ব্যাণ্ড ছিঁড়ে পড়ে গেল…আজই বিকেলে। ট্রাম ধরবার জন্য ছুটেছিলুম, লালদীঘির ধারে একটা দরকার ছিল। মানে, একটু আশা—ট্রামে চড়ে সময় কত দেখতে গিয়ে দেখি, ব্যাণ্ড সমেত ঘড়িটি অদৃশ্য হয়েছে। সোনার ঘড়ি…বম্বায় কিনেছিলুম নগদ ষাট টাকা দাম দিয়ে।

কথায় কথায় রাত্রি বাড়িল। প্রদোষ কহিল—খাবারের ব্যবস্থা করো গো। ভদ্রলোককে কতক্ষণ আর বসিয়ে রাখবে?…বৃষ্টি থেমেছে, দেখছি…

ইহারি মধ্যে কমলা আয়োজন করিয়াছে মন্দ নয়; ঠাকুরকে দিয়া খানিকটা মাংস আনাইয়াছে: কারি, ডিমের বড়া, চাটনি, ফল, দই, রাবড়ি, সন্দেশ…রকমারি খাদ্য।

চিত্ত কহিল,—কমলা চিরদিনই কমলা…এত আয়োজনের কোনো দরকার ছিল না। তা'ছাড়া এ হলো রাজ-ভোগ…মুখে এ সব আর রোচে না, কমল!

কমলার বুকখানা যেন কে পা দিয়া মাড়াইয়া ধরিল! এই চিত্তদা…একদিন কি সৌখীন না ছিল! আহারে-বেশে কি সখ! কত নজর! তাকেও কতদিন এই চিত্তদা কত কেক, প্যাটি কিনিয়া খাওয়াইয়াছে। তা'ছাড়া বিদেশী ফল,—চেরি, প্লাম, ষ্ট্রবেরি, পীয়ার, ক্যালিফোর্ণিয়ান অরেঞ্জ …মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে যখন যে নূতন ফল আমদানি হইয়াছে, আনিয়া খাওয়াইয়াছে।

কমলার বুকের মধ্যে সজল বাষ্প পুঞ্জিত হইয়া উঠিল। কমলা কহিল—বক্‌বক্‌ না করে খাও দিকিনি চুপ-চাপ! কথা ঢের শিখেছো, দেখছি। এ বম্বাই লৌকিকতা? না, আসামী এটিকেট?

তার পর বিদায়ের পালা। প্রদোষের মমতা হইয়াছিল, ভাগ্য-লক্ষ্মীর কৃপায় বঞ্চিত বেচারী! প্রদোষ কহিল—মাঝে মাঝে আসবেন। দুই বন্ধু…বহু কাল পরে দুজনকে দুজনে যখন আবিষ্কার করলেন…আবার যদি দুজনে দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ হয়ে যায়, সে বড় মর্মান্তিক হবে। সন্ধ্যার সময় থেকে এ বাড়ীর দরজা অবারিত জানবেন রাত বারোটা পর্যন্ত।

আগ্রহ-ভরে চিত্ত কহিল বটে! আসবো? বিরক্ত হবেন না?

প্রদোষ কহিল—না এলেই বিরক্ত হবো। এলে খুশী হবো।

কমলা কহিল—লক্ষ্মীটি, এসো চিত্তদা…যখনি মনে হবে, এসো।…কিন্তু ভালো কথা, একটা কথার জবাব এখনো দাও নি তো! এখানে আছো কোথায়?

চিত্ত কহিল আপাততঃ আছি সিমলের একটা হোটেলে। প্যারাডাইশ হোটেল…সেখানে আমার আস্তানা। তা এ বাসা ক'দিন থাকে, জানি না। আমি তো এক জায়গায় বেশী দিন টেঁকতে পারি না। মানে, পকেট বুঝে আস্তানার ব্যবস্থা করতে হয়। আগে পয়সা না পেলে কেউ জায়গা দেয় না। ভাবি তাই, আমার মতো এরাও বুঝি ঠেকে শিখেছে! তা যা হোক, আসবো বৈ কি মাঝে মাঝে। দুঃখের ভার যখন বড্ড অসহ্য বোধ হবে, তখনি আসবো তোমাদের এ সুখের সায়রে ডুব দিয়ে সে দুঃখ কতক ভুলবো বলে।…আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলুম, জানি না। যে আনন্দ পেলুম, বলবার নয়। আসি কমলা…আসি প্রদোষ বাবু…নমস্কার!

চিত্ত বাহির হইয়া গেল। প্রদোষ তার সঙ্গে গেল এক-তলার ফটক পর্যন্ত আগাইয়া দিতে। ফিরিয়া আসিয়া কমলার পানে চাহিয়া প্রদোষ কহিল—নিজে থেকে বোধ হয় আসতে পারবেন না, কমল…লজ্জা হবে।

কমলা কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। মনের মধ্যে অতীত দিনগুলা বিচিত্র কলরব তুলিয়াছে!

স্বামীর কথায় নিশ্বাস ফেলিয়া কমলা কহিল—তুমি

ওর সঙ্গে চমৎকার ব্যবহার করেছো···সত্যি ! আমার ভারী ভালো লাগছিল। আজ এই রকম, নাহলে একদিন এই চিত্তদা···

দু'চোখে আবেশ ! আবেগ-উচ্ছ্বাসে কমলার কণ্ঠ নিমেষের জন্য রুদ্ধ হইয়া গেল। তার পর কাশিয়া কণ্ঠ সাফ করিয়া কমলা বলিল,—সিনেমায় প্রথমে যখন চিত্তদাকে দেখলুম ···আমার সর্বাঙ্গ কেমন কেঁপে উঠলো···গা ছমছম করতে লাগলো। ডাকবো ? না, ডাকবো না ? কথা কইবো, কি, কইবো না—কি যে করবো, প্রথমটা বুঝতে পারছিলুম না। শেষে আর থাকতে পারলুম না !···তা কেমন দেখলে ওকে, বলো তো ?

প্রদোষ কহিল—জীবন-যুদ্ধে চোট খেয়ে জখম হয়েছেন খুব ! মলিন জীর্ণ বেশ, ঠিকানার ঠিক-ঠিকানা নেই ! মনে হচ্ছে, খিদে তেষ্টাও ভুলে গেছেন। খাবার যদি মেলে, খান ; না মেলে, না খেয়েই দিন কাটিয়ে দেন। পকেটে পয়সা কখনো দু'চারটে জমে—কখনো পকেট খালি হা-হা করতে থাকে। দুর্দশায় পড়ে দুর্গতির চরম অবস্থা ! তোমায় তবে বলি, সিগারেটের টিনটা ধরে দিয়ে আমি গিয়েছিলুম মুখ-হাত ধুতে। এসে দেখি, সিগারেট মুখে আছে—তবু টিন থেকে কতকগুলো সিগারেট পকেটে পুরছেন চটপট···ভবিষ্যতের সংস্থান। নিঃশব্দে আমি এসেছিলুম, আমায় দ্যাখেননি। দেখলে লজ্জা পেতেন। আমি তাই সরে এলুম।

কমলার দু'চোখ কপালে উঠিল। বড় একটা নিশ্বাস ফেলিয়া উদাস-নয়নে সে স্বামীর পানে চাহিয়া রহিল।

প্রদোষ কহিল—ছেলেবেলায় তোমার সঙ্গে খুব মেলা মেশা ছিল ? কিন্তু কৈ, আমার কাছে এঁর কথা তো কখনো বলোনি !

নিশ্বাস ফেলিয়া কমলা বলিল,—না, বলিনি···

স্বর উদাস। কমলা আর কিছু বলিল না, বলিতে পারিল না···শূন্য নয়নে খোলা জানলার দিকে চাহিয়া রহিল।

এক-টুকরা আকাশ দেখা যাইতেছিল। বৃষ্টি থামিয়াছে। আকাশে কয়েকটা নক্ষত্র। মেঘ এখনো কাটে নাই বলিয়া নক্ষত্রগুলায় তেমন দীপ্তি নাই !

প্রদোষ কমলাকে লক্ষ্য করিল অনেকক্ষণ। তার পর কহিল,—গভীর রহস্যে ভদ্রলোকের জীবন ভরে আছে এখন ! অবস্থা এক দিন ভালো ছিল।···কি বিপদের কথা বললেন না···যার জন্য দু'দুটো বছর নষ্ট হয়ে গেছে ?

নিশ্বাস ফেলিয়া কমলা বলিল,—হ্যাঁ। সেবারে মার কাছে গিয়ে শুনলুম, চিত্তদা আর সে চিত্তদা নেই। কি রকম হয়ে গেছে। নানা বিপদ যাচ্ছে মাথার উপর দিয়ে।···কোন অফিসে চাকরি করছিল ···মামা চাকরি করে দিয়েছিল। সেখানে টাকা ভাঙ্গার দায়ে জেল হয়। কিন্তু সে-টাকা ও ভাঙ্গেনি···এ আমি বলতে পারি।···ও তেমন লোক নয়···হতে পারে না।···আপিসের এক বন্ধুকে বিশ্বাস করতো—তার কাছে রাখতো সিন্দুকের চাবি। এ তার কাজ।···বিশ্বাস করতো সকলকে বড্ড বেশি রকম···জানি তো।···পরের দোষ নিজের ঘাড়ে নিয়ে জেলে গেল দু'বছরের জন্য। ···তার পরে আমার সঙ্গে চকিতের জন্য দেখা। মার সঙ্গে গিয়েছিলুম দক্ষিণেশ্বরে চান করতে—সেইখানে। কি হীন বেশ ! সেই সময় আমাকে বলেছিল, বিশ্বাস করো তুমি, আমি টাকা ভেঙ্গেছি ? আমি বলেছিলুম, না। চিত্তদা বললে—তাই বিশ্বাস করো। সত্যি কথা। টাকা ভেঙ্গেছে আমার এক বন্ধু···আমি ভাঙ্গিনি।

প্রদোষ কি যেন ভাবিতেছিল ! বলিল,—দাঁড়াও। নাম চিত্ততোষ মজুমদার ?

কমলা কহিল, হ্যাঁ।

প্রদোষ বলিল, ঠিক ! আমার বন্ধু শরৎ তখন নতুন উকিল হয়ে পুলিশকোর্টে বেরুচ্ছে···আসামী চিত্ততোষ মজুমদারের মকদ্দমা সে করেছিল। শরৎ আমাকে বলেছিল, লোকটা নির্দোষ···কিন্তু এমন হতভাগ্য যে, সাক্ষী প্রমাণ দিয়ে তার সে নির্দোষিতা এস্টাবলিশ্ করবে···এমন উপায় রাখেনি !

একটা আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া কমলা বলিল,—তুমি তাহলে জানো ? আমারো তাই বিশ্বাস···

স্বামীর কথায় কমলা অনেকখানি তৃপ্তি বোধ করিল। প্রদোষ বলিয়াছে সে জানে, চিত্তদা টাকা ভাঙ্গে নাই ; তার উকিলের মুখে শুনিয়াছে !

মনটা হালকা হইল।

অন্য দিনগুলা কমলার মনে বিচিত্র তরঙ্গ

সৃষ্টি করিয়া তুলিল !···হাসি, গল্প, গান···আনন্দ, কৌতুক !··· ছেলেবেলা হইতে শুনিত, চিত্তদার সঙ্গে বিবাহ হইবে··· কমলা সে-কথা বিশ্বাস করিত ! সে-বিশ্বাস মনে ছিল কত দিন পর্য্যন্ত ! যখন চৌদ্দ বৎসর, তখনো ! বারান্দার টবে অজস্র বেলফুল ফুটিত···সে-ফুল তুলিয়া রাখিত চিত্তদার জন্য।···চিত্তদা গান গাহিত। সেই গান,—

আমার সকল-মনের সকল-আশায় তোমায় চাই,
তুমি কামনারি মণি।

এ গান শিখাইবার জন্য চিত্তদার কি সাধ্য-সাধনা ! কত গান যে কমলা চিত্তদার কাছে শিখিয়াছিল !···

এত ভালো লাগিত চিত্তদার গল্প, চিত্তদার হাসি, চিত্তদার গান, চিত্তদার রঙ্গ-কৌতুক, খেলা, আমোদ-প্রমোদ···জীবনের ও-দিকটা চিত্তদা রঙীন করিয়া দিয়াছিল !

তার পর কোথা দিয়া কি যে ঘটিল···আকাশ-ধরণীর চেহারা গেল বদলাইয়া···

আজ স্বামী-পুত্র···সংসার···প্রীতি-মায়া···সুখ-শান্তি···এ সুখ-শান্তিতে মন ভরিয়া আছে···তবু থাকিয়া থাকিয়া চিত্তদার কথা যখনি মনে হইয়াছে···মন বেদনায় টনটন্ করিয়া উঠিয়াছে···

প্রদোষ কহিল—হাঁ, বেশ মনে পড়ছে···তোমার কাছে নাম শুনে অবধি আমার কেবলি মনে হচ্ছিল, এ নাম যেন জানা-জানা···কি সূত্রে জানলুম, মনে পড়ছিল না ! শরৎ বলেছিল, লোকটা লেখাপড়া জানলে কি হবে, ভারী আল্‌সে-স্বভাবের। বোকা বললে অন্যায় হয় না।

কমলা আরাম বোধ করিল। কহিল—লোকের উপর এই জন্যেই আজ ওর এমন অবিশ্বাস জন্মেছে !···শুনলে তো, বললে—কাকে আমি বিশ্বাস করবো ?···আমি জানি··· দেখছি তো ওকে ছেলেবেলা থেকে। তা'ও অপরকে ও দোষ দিচ্ছে না, বলছে বরাতের দোষ !

প্রদোষ কহিল—দারিদ্র্য-দোষো গুণরাশিনাশী···যাক, ও কথা ভেবে আর কি হবে ? অনেক রাত হয়েছে··· এসো, শুয়ে পড়বে···ওঁর আশা আর রেখো না···উনি আর এ পথ মাড়াবেন বলে মনে হয় না !

কিন্তু প্রদোষের এ ভবিষ্যৎবাণী ব্যর্থ করিয়া চার দিন পরে সন্ধ্যার পূর্ব্বে চিত্ত আসিয়া হাজির। প্রদোষ তখনো অফিস হইতে ফেরে নাই। কমলা চুল বাঁধিতেছিল। ভৃত্য চিত্তকে বসাইল; কমলার কথায় চায়ের পেয়ালা দিয়া অভ্যর্থনা করিল।

চুল বাঁধিয়া গা ধুইয়া কমলা আসিল। প্রথমেই চোখ পড়িল চিত্তর বেশভূষায়। সেদিনকার সেই ধুতি, সেই জামা ···আরো মলিন হইয়াছে !

মমতা হইল।

কমলা কহিল—একটা কথা বলবে, চিত্তদা ?

—কি কথা ?

—লজ্জা করবে না আমার কাছে ?

চিত্ত কি ভাবিল, তার পর কহিল,—না।

কমলা কহিল—তোমার জামা-কাপড়ের খুব দুর্দ্দশা যাচ্ছে ? হাতে পয়সার টানাটানি ?

চিত্ত হাসিল। মলিন হাসি। চিত্ত কহিল,—এক প্রস্থ দিয়েছি ড্রাইং-ক্লিনিংয়ে কাচতে; দু'প্রস্থ প'ড়ে আছে ধোপার বাড়ী। ধোপা কাপড় ফেরত দেয় দেড় মাসে একবার। কোথা থেকে কুলিয়ে উঠি, বলো ?

কমলা কোনো কথা বলিল না, অবিচল নেত্রে চিত্তর পানে চাহিয়া রহিল।

সে দৃষ্টির সামনে চিত্ত কেমন অস্বস্তি বোধ করিল, কহিল,—প্রদোষ বাবু এখনো ফেরেন নি ?

—না।···

—তাঁর absence-এ এসে অন্যায় করিনি তো ?

কমলা কহিল,—না।

তার পর ক্ষণেক স্তব্ধতা। চারিদিকে চাহিয়া চিত্ত কহিল—তোমার ছেলেটিকে দেখছি না ?

কমলা কহিল—না। ঠাকুরের সঙ্গে সে গেছে পার্কে বেড়াতে। সকালে-বিকেলে দু'বেলায় পার্কে পাঠিয়ে দিই।

—ভালো করো। এ অভ্যাসটা বরাবর রেখো···

চিত্ত এখন প্রায় আসে। আগে আসিত বৈকালের দিকে। এখন আসার-সময়ে কোনো নিয়ম নাই। প্রদোষ যেদিন থাকে, তিনজনে বসিয়া গল্প হয়। প্রদোষ যেদিন না থাকে, সেদিন অতীতের দু'চারিটা কথা।···তারপর কমলার ছেলেকে চিত্ত গল্প বলে। তার

সঙ্গে লুডো খেলে, ক্যারম খেলে, ব্যাগাটেলে খুঁটি মারে। কমলা দু'চার-রকম খাবার তৈরী করিতে উঠিয়া যায়—মাঝে মাঝে ফিরিয়া আসে। গল্প হয়।

এমনি করিয়া দিন যায়।

প্রদোষের মেলামেশায় এখন একটু কেমন ঔদাস্য। লোকটা আসিতেছে—কোনোমতে দু-এক কথায় তার সে-আগমনকে শুধু মানিয়া লয়! তারপর লৌকিকভাবে মার্জ্জনা চাহিয়া কাজের অছিলায় প্রদোষ সরিয়া যায়। এ-লোকের সঙ্গে নিত্য অর্থহীন কথা কহিয়া কাজের মানুষ আনন্দ পায় না, তার দিন চলে না!

কখনো কমলা প্রদোষ বসিয়া সংসারের কথা কহিতেছে, বা কমলা গান গাহিতেছে, কাছে প্রদোষ অফিসের কাগজ-পত্র পাড়িয়া বসিয়াছে, চিত্ত আসিয়া হাজির। চিত্ত বলিয়া ওঠে—কপোত কপোতীর সুখনীড়ে বজ্রাগ্নি এলুম না তো?

হাসিয়া কমলা বলে কাকে কি তামাসা করতে হয়, আজো তোমার সে-জ্ঞান হলো না, চিত্তদা…

প্রদোষ বলে,—কপোত আর এখন কপোত নেই… জেনা পক্ষী হয়ে উঠেছে…

এ আসরে আর একজন প্রায় আসে। সে শ্যামলী। খৃষ্টান-বিধবা। তিন তলার ফ্ল্যাটে থাকে শ্যামলী মায়ের সঙ্গে। শ্যামলীর বয়স প্রায় পঁচিশ বছর; স্বামী পয়সা-কড়ি রাখিয়া গিয়াছে। শ্যামলী একটা মিশন-স্কুলে টীচারী করে। শ্যামলী আর কমলা ছেলেবেলায় এক-স্কুলে পড়িত। বহু বৎসর পরে এ-ফ্ল্যাটে আবার দুজনে দেখা। রূপসী না হইলেও শ্যামলী মেয়েটি ভালো। শ্যামলীকে মা বলেন আবার বিবাহ করিতে। ছেলে-মেয়ে নাই। তার উপর স্বামীর সুখ একটি দিনের জন্য পায় নাই। স্বামী কালটন্ সিংহ ছিল গোঁয়ার মাতাল। শ্যামলীর জন্য চার্লস্ সান্যাল, আর্থার মণ্ডল হাত বাড়াইয়া আছে।…মা মারা গেলে শ্যামলীকে কে দেখিবে? মায়ের তাই এত দুশ্চিন্তা! শ্যামলী বলে, না, মণ্ডল বা সান্যালকে সে বিবাহ করিবে না। তাদের নজর শ্যামলীর উপরে নয়; শ্যামলীর টাকার উপর!

শ্যামলীর সঙ্গে চিত্তর আলাপ-পরিচয় হইয়াছে এবং চিত্তর গল্প শুনিতে শ্যামলীর ভালো লাগে। চিত্ত এখন এ-বাড়ীতে এমন ঘন-ঘন যাতায়াত করিতেছে, এ-আসার কারণ বুঝিতে কমলার বিলম্ব রহিল না।

কোনো বিষয়ে তর্ক উঠিলে চিত্ত লয় শ্যামলীর দিক্; শ্যামলীকে তার পেয়ালায় চিনি ও দুধ ঢালিয়া দিতে বলে; বলে, আপনি চমৎকার চা তৈরী করেন। চিনি আর চা এমন মাত্রায় মেশান যে it is a treat! আপনার চায়ের লোভে এখন দু'বেলা এ বাড়ীতে আসছি! আর চা…পেয়ালা বাড়িয়ে দিয়েছি কত, তা দেখতেই পাচ্ছেন!…

এ কথায় সলজ্জ আনন্দে শ্যামলীর মুখ রাঙা হইয়া ওঠে! কমলা আরো লক্ষ্য করিয়াছে, শ্যামলীর হাত হইতে পেয়ালা লইবার সময় চিত্তর দু'চোখ যেন জ্বলিতে থাকে! পেয়ালা লইতে গিয়া শ্যামলীর হাতের আঙুলগুলি চিত্ত চকিতের জন্য স্পর্শ করিয়া লয়…

দেখিয়া কমলা লজ্জায় আড়ষ্ট হইয়া থাকে। শ্যামলীকেও দেখিয়াছে, এখানে আসিয়া চিত্তকে না দেখিতে পাইলে সে যেন কেমন হইয়া থাকে! কোনো কথায় প্রাণ খুলিয়া যোগ দিতে পারে না…অন্যমনস্ক ভাব! যেন কার প্রতীক্ষায় সে উন্মুখ অধীর! অথচ মুখ ফুটিয়া চিত্তর সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন তোলে না! কমলার ভয় হয়, শেষে যদি…

একদিন চিত্ত আসিয়া কমলাকে বলিল—তোমার সঙ্গে একটু কথা আছে।

কমলার বুকখানা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। কমলা বলিল—আমারো কথা আছে…বেশ, তোমার কথা আগে বলো… তার পর আমি বলবো আমার কথা।

চিত্ত কহিল,—প্রথম কথা, তোমার স্বামী জানেন তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে কথা ছিল…ছেলেবেলায়?

কমলার বুক কাঁপিল। কোনোমতে সে কহিল,—না।

—ভালো।…এ সব কথা ওঁকে না জানানোই ভালো। মানুষের মন…আমি তো জানি, কি অদ্ভুত সে বস্তু…! এখন আসল কথা শোনো, শ্যামলীকে আমি বিয়ে করতে চাই।…তুমি ওঁর মায়ের কাছে কথাটা তুলে ব্যবস্থা করে দাও।

কমলা কহিল,—কিন্তু শ্যামলী খৃষ্টান…

মৃদু হাসিয়া চিত্ত কহিল—আমিও খৃষ্টান হবো।

কমলা কহিল খৃষ্টান হবে? বিয়ের জন্য ধর্ম্ম ছেড়ে দেবে?

হাসিয়া চিত্ত কহিল ধর্ম্ম! তার মানে?

কমলা অবাক! ধর্ম্মের মানে সে জানে না, তাহা লইয়া আলোচনাও করিতে চায় না।

চিত্ত কহিল আর পারছি না, কমলা! আমি ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছি। শ্যামলী চাকরি করছে...ওর পয়সা-কড়ি আছে...ওর আশ্রয়ে কোনোমতে আমি নিরাপদে থাকতে চাই।

বাধা দিয়া রুক্ষস্বরে কমলা ডাকিল, কাওয়ার্ড! সেল্‌ফিশ্‌!

—রাগ করো না, কমলা। ভালোবাসা নয়। কি করবো? তবে শ্যামলী আমাকে ভালোবাসে!... ভালোবাসাবাসি আমি বুঝি না। জীবনে অনেক ভালোবাসাই দেখলুম! তা নয়...আমার আসল কথা, আমি একটু আশ্রয় চাই...নিরাপদ নিশ্চিন্ত আশ্রয়। এবং সে আশ্রয় মিলবে শ্যামলীকে বিয়ে করলে। এ বিষয়ে তোমায় সাহায্য করতে হবে।

রাগে কমলা জলিয়া উঠিল, কহিল—সাহায্য! আমায় তুমি এমন ইতর ভাবো।...তোমায় জেনে...তোমার আগা-গোড়া ইতিহাস...তুমি ভাবো, শ্যামলীর জীবন আমি দেবো তোমার জীবনের সঙ্গে জুড়ে...?

কমলা কাঁপিতেছিল।...

চিত্ত বলিল,—বসো, কমলা।...তোমার মনে আছে, একদিন তুমি আমায় বলেছিলে আমাকে ছাড়া আর কাকেও তুমি বিয়ে করবে না! তোমার বিয়ের রাত্রেও আমার কাছে কেঁদেছিলে...বলেছিলে, তুমি পালিয়ে আসবে আমার কাছে...। আমায় এত ভালোবাসতে, তবু তো প্রদোষ বাবুকে বিয়ে করলে! আমার জীবনটা গেল নষ্ট হয়ে তোমারি জন্যে! আজ তুমি সুখে সংসার করছো...আমার কথা সে-সুখে কাঁটার যাতনা দেয় না?

সরোষে কমলা কহিল—চিত্তদা...

চিত্ত কহিল,—শোনো, রাগ করো না।

কমলা রাগিয়া উঠিল,—কাঁটা! হ্যাঁ, সুখেই আমি সংসার করছি তো! এ সুখের মর্ম্ম তুমি কি বুঝবে?...যে সব কথা বললে, ও কি কথা? ও সব পাগলের প্রলাপ। সে কথা কত মিথ্যা, তুমি তখনি বুঝেছিলে আমিও বুঝেছিলুম—তবে দুদিন পরে।...স্বামী কি, তার দাম কতখানি ...বিয়ে না হলে কেউ তা বোঝে না।...আমাকে ভয় দেখাবার জন্যে যদি ও কথা তুলে থাকো, তাহলে শোনো আমার জবাব...সে-কথা আমি আমার স্বামীর কাছে বলতে পারি...একতিল গোপন না করে'... অকপটে!...আর এও জেনে রাখো, তুমি মাতাল...তুমি... তুমি...তুমি...একদিন যে সব কাণ্ড করেছো জেলে যাবার আগে...সে-সব জেনে এ বিয়ের সাহায্য তো আমি করবোই না...বরং শ্যামলীকে আমি রক্ষা করবো তোমার হাত থেকে।

চিত্ত চুপ করিয়া শুনিল...

চিত্ত বলিল—আমাকে এবারে তুমিই ডেকে এনেছিলে... আমি তোমার করুণা ভিক্ষা করিনি!...যদি তোমার সে মোহ না থাকবে, কেন ডেকেছিলে?

—কেন ডেকেছিলুম?...শুধু অনুকম্পা!...দয়া!... কিন্তু আমি ভুল করেছিলুম। ভেবেছিলুম, দুঃখ পেয়েছো, যদি আজো তোমায় মানুষ করা যায়, দেখি।... দেখছি, তা অসম্ভব! এত দিনে নিজেকে এতখানি অমানুষ করে তুলেছো যে, এ-জন্মে তোমায় মানুষ করা... ভগবানও পারবেন না...

চিত্ত কি বলিতে যাইতেছিল...বাধা দিয়া কমলা কহিল—তোমার সঙ্গে বাজে কথা ক'বার সময় আমার নেই। মনে কোনো অভিসন্ধি নিয়ে তুমি যদি এখানে আসা-যাওয়া করে থাকো তো জেনো, তোমার সে আশা কখনো পূর্ণ হবে না!

মৃদু বক্রহাস্যে চিত্ত বলিল জেলশি হয়েছে...তোমার সামনে আর-একজনকে ভালোবাসছি।...

কমলা কহিল চুপ...চুপ...চুপ করো। তোমায় নিয়ে জেলশি!...তুমি...তুমি...তুমি পাগল!

কথাটা বলিয়া কমলা গমনোদ্যত হইল। চিত্ত কহিল—তাড়িয়ে দিচ্ছ?

কমলা ফিরিল। কহিল—তাড়িয়ে দিইনি। তবে ভদ্রসমাজে মিশতে হলে মনকে ভদ্র করো...নাহলে তোমার এ-জন্মের এ-দুঃখ কখনো ঘুচবে না।

কমলা উঠিল। টলিতে টলিতে একেবারে আসিল স্বামীর কাছে। প্রদোষ দাড়ি কামাইতেছিল…

আসিয়া কমলা কহিল,—শুনচো? তোমাকে একটা কথা বলা হয়নি…আজ বলি। ঐ চিত্তদা…ওর সঙ্গে আমার বিয়ে হবে, এ কথা শুনতুম জ্ঞান হওয়া ইস্তক। তার পর তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হলো… তার কারণ চিত্তদা ছিল অপাত্র, কুপাত্র। গোড়ায় আমি অত বুঝিনি! বিয়ের সময় মন আমার ভেঙ্গে গিয়েছিল… বিয়ের দিন চিত্তদাকে বলেছিলুম, আমি তোমার কাছ থেকে পালিয়ে তার কাছে যাবো। এ শুধু মুখের কথা!…এ ছাড়া জীবনে কোনো অন্যায় করিনি…বলো, এ কি আমার মহাপাপ? এ পাপের মার্জ্জনা পাবো না তোমার কাছে?…

প্রদোষ অবাক! কমলা দাড়াইতে পারিল না…ফুঁপাইতে ফুঁপাইতে একেবারে প্রদোষের পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল।

প্রদোষ তার হাত ধরিয়া তুলিল; তুলিয়া বলিল,—এ কি পাগলামি করছো, কমলা…

—পাগলামি নয়…বলো,…তুমি বলো…। সিনেমা থেকে চিত্তদাকে যে এ বাড়ীতে আনি, সে শুধু মমতা-বশে। বেচারী…যদি তাকে তোমার কাছে এনে দিলে সে মানুষ হতে পারে…এই জন্য…শুধু এই জন্য…। ওর সঙ্গে প্রণয়-চর্চ্চা করবো, এমন কথা আমার মনের কোণেও ঠাঁই পায় নি। তুমি বিশ্বাস করবে এ-কথা?

প্রদোষ কহিল—বিশ্বাস করি কমলা। আমি তোমায় জানি, তুমিও আমায় জানো…এ নিয়ে কেন তুমি অনর্থক উতলা হচ্ছো! বিয়েয় মানুষের নব জন্ম হয়… বিশ্বাস আর প্রেমের উপরে নির্ভর করে গৃহ-সংসারের স্থিতি আর পালন। আমাদের সংসারে এ দুটো জিনিষ অটুট আছে।…পাগলামি করো না…তুমি কোনো অন্যায়, কোনো পাপ করোনি, আমি জানি…নাহলে তোমার চিত্তদাকে এ-বাড়ীতে কখনো আমি আসতে দিতুম না।…

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

অস্ফুট

বলি বলি মনে করি হয় না তা বলা
তারি লাগি ঘুরি ফিরি এই পথ চলা।
এই গান এই সুর
সে কথায় ভরপুর—
তারি লাগি ছেনী তুলি, যত চারুকলা।

শুধু তার এলো মেলো পাই যে খপর;
ফুটিতে লাগিতে পারে জনমান্তর।
সে সুধা-সাগর জলে
মিশে আছে কুতূহলে
সুরভি বাঁধিছে বাসা মৃগনাভি পর।

ভাস্কর করিতেছে শুধু রেখা-পাত—
কয়লাতে হীরা-অণু করে যাতায়াত।
এখনো বাঁধেনি চাক
শুনি গুন্ গুন্ ডাক
আবছায়া রাখিয়াছে ঢাকিয়া প্রভাত

বন্দরে আজও তরী দেয় নাই আঁট—
শিল্পী আঁকিছে ছবি রুদ্ধ কবাট।
কি যে প্রেম কি যে তৃষা
গড়িতেছে 'মোনালিসা—'
অপরূপ রূপে এসে বাঁধিছে জমাট।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

বৈদেশিক প্রসঙ্গ

হিটলার অতঃপর কোন্ রাজ্য গ্রাস করিবেন ?

পর-রাজ্য গ্রাস করিয়া হিটলারের ক্ষুধা ঘৃতাহুতিপ্রাপ্ত হুতাশনের ন্যায় ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে, এবং অতি-ভোজনে তাঁহার অগ্নিমান্দ্যেরও কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না! তাঁহার ধারণা, জার্ম্মাণীকে 'আঙ্গুল ফুলিয়া কলাগাছ' করিবার জন্য তিনি ঈশ্বর-প্রেরিত মহাপুরুষ। সুতরাং মহাপুরুষের যাহা কার্য্য, তাহা তিনি অসম্পন্ন রাখিবেন না।

নাজীগণের প্রভাব-বিস্তারের পথে চারিটি বিভিন্ন রাজ্য বাধা-স্বরূপ বিরাজিত; পোল্যাণ্ড, হাঙ্গেরী, যুগোশ্লাভিয়া এবং রুমানিয়া। এগুলি একে একে গ্রাস করিয়া জীর্ণ করিবার জন্য হিটলার মুখ-ব্যাদান করিয়া সুসজ্জিত জার্ম্মাণ সৈন্যমণ্ডলী এবং বিমান-বাহিনীর দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিতেছেন। তিনি জানেন, যে ধাপ্পার বলে তিনি বিনারক্তপাতে এতদূর অগ্রসর হইয়াছেন, তাহাই তাঁহাকে ভবিষ্যতেও সাফল্য প্রদান করিবে। সোভিয়েট সরকার এখনও দূরে দাঁড়াইয়া বাহুবলের গর্ব্ব করিতেছেন, এবং বৃটিশ-সহ যুদ্ধের জন্য এখনও প্রস্তুত হইতে না পারিয়া চূড়ান্ত অপমান বরদাস্ত করিতে করিতে লাঙ্গুল আস্ফালন করিতেছেন; সুতরাং এই সুযোগে যাহা পাওয়া যায়, তাহাই তিনি তাড়াতাড়ি গ্রাস করিবেন;—ইহাই তাঁহার সমর-নীতি।

কিন্তু কোন্ রাজ্যে তিনি প্রথম থাবা মারিবেন?

পোল্যাণ্ড আত্মরক্ষার উপযুক্ত সুশিক্ষিত সৈন্য সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে; সুতরাং হিটলারের আস্ফালন দেখিয়া সে বিচলিত না হইয়া তাঁহাকে বিপন্ন করিবারই চেষ্টা করিবে, এই সংবাদ তাঁহাকে জ্ঞাপন করা হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্ব-য়ুরোপে জার্ম্মাণী যদি অক্ষুণ্ণ প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে পোলরা নিঃসন্দেহ বার্লিনের উপদেশে পরিচালিত হওয়াই প্রার্থনীয় মনে করিবে। পোল্যাণ্ডকে কিছু কালের জন্য নিরপেক্ষ রাখাই জার্ম্মাণীর আন্তরিক কামনা; যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে হিটলার বন্ধুত্বের আশা দিয়া পোল্যাণ্ডকে এই পথে পরিচালিত করিবেন। কিন্তু ওয়ার্শ ইহাতে বাধা দান করিলে তিনি ভয় প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইবেন।

তাহার পর হাঙ্গেরী। হাঙ্গেরী অর্থের জন্য জার্ম্মাণীর নিকট মাথা বাঁধা দিয়াছে, সুতরাং ওদিক্ হইতে জার্ম্মাণীর বিপদের আশঙ্কা নাই। হাঙ্গেরী জার্ম্মাণীর আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হইয়াছে, অষ্ট্রিয়ার ন্যায় তাহাকেও জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা সহজ হইবে। বাধা কিছু কিছু থাকিতে পারে, কিন্তু সে সকল বাধা হিট্লারের নিকট নিতান্তই তুচ্ছ।

মুসোলিনী তাঁহার প্রভাব-বিস্তারের জন্য য়ুরোপের যে ভূভাগ নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন, যুগোশ্লাভিয়া তাহার অন্তর্ভুক্ত; সুতরাং হিট্লার সে দিকে দৃষ্টিপাত করিলে রোম হইতে আর্ত্তনাদ উত্থিত হইতে পারে। সেই আর্ত্তনাদের ভয়ে না হউক, হিট্লার বর্ত্তমান অবস্থায় মুসোলিনীকে চটাইতে পারিবেন না; কারণ, ইহাদের বন্ধুত্ব যে স্বার্থের উপর নির্ভর করিতেছে, আপাততঃ সেই স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করা হিটলার নীতিসঙ্গত বলিয়া মনে করিবেন না। ইতিমধ্যেই এইরূপ কাণাঘুষা চলিতেছে যে, যুগোশ্লাভিয়ার রাজপ্রতিনিধি প্রিন্স পল ফ্যাসিষ্ট-পক্ষপাতী ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী মিলান ষ্টয়াডিনোভিচ্‌কে ডাকিয়া-আনিয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে মন্ত্রিপদে স্থাপিত করিবার জন্য মুসোলিনী কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ অনুরুদ্ধ হইতেছেন। তিনি ঐ পদে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হইলে যুগোশ্লাভিয়ায় জার্ম্মাণী ও ইটালীর বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে—ইহাই ইটালীর ধারণা।

উক্ত চারিটি দেশের মধ্যে রুমানিয়াই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লাভের সম্পত্তি। এই জন্য হিট্লার ক্যারল হোহেনজোলার্নকে তাঁহার মতানুবর্ত্তী করিবার উদ্দেশ্যে ক্রমাগত চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন।

কয়েক মাস পূর্ব্বে রুমানিয়ার রাজা ক্যারল জার্ম্মাণীর বার্চেস-গাডেনে হিটলারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। হিটলারের ধারণা, তিনি সম্মোহন শক্তির অধিকারী। তিনি তাঁহার অতিথি রাজা ক্যারলের প্রতি এই শক্তি প্রয়োগের চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার সেই চেষ্টা বিফল হইয়াছিল। রাজা ক্যারল নিঃশব্দে হিটলারের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া, সম্পূর্ণ অচঞ্চল ভাবেই তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন, রুমানিয়া বার্লিনের সাহায্য ব্যতীত তাহার মুক্তির পথ অনর্গল রাখিতে পারিবে।

গত মার্চ্চ মাসের মধ্যভাগে জার্ম্মাণী হইতে রাজা ক্যারলকে এই বলিয়া সতর্ক করা হয় যে, রুমানিয়া সরকারের অর্থনীতি নাৎসীদের আদর্শানুসারে সংগঠিত ও পরিচালিত করিতে হইবে। কিন্তু রাজা ক্যারল এই প্রস্তাব সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার জন্য সময় লইয়াছেন। এই ভাবে তিনি এই দ্বিতীয় বারও নাজীর পীড়ন হইতে আত্মরক্ষায় সমর্থ হইয়াছেন। এডল্ফ হিটলার জানেন, জার্ম্মাণীর সকল অভাব তিনি নানা কৌশলে পূর্ণ করিলেও পেট্রলের অভাব দূর হয় নাই, এবং রুমানিয়ার তৈলকূপগুলি অত্যন্ত প্রলোভনের সামগ্রী। সুতরাং রাজা ক্যারল যে তৃতীয় বার হিট্লারের শনির দৃষ্টি হইতে মুক্তিলাভ করিবেন, এবং প্রতিবেশী ক্ষুদ্রশক্তি রাজগণের সহিত যুক্তি-পরামর্শ করিয়া লাভবান হইবেন, তাহার সম্ভাবনা অল্প। এ অবস্থায় হিটলার এবার ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় ক্ষুদ্র রুমানিয়ার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িলে কেহ বিস্মিত হইবেন বলিয়া মনে হয় না।

বস্তুতঃ, রুমানিয়া ও পোল্যাণ্ড উভয়ই লোভের সামগ্রী, সুতরাং হিট্লার ভাবিতেছেন, 'কারে ফেলে কারে রাখি, কে বেশী সুন্দর ?' দেখিয়া শুনিয়া মনে হইতেছে, রাজা ক্যারলের ভবিষ্যৎ অন্ধকার!

বোহিমিয়া ও মোরাভিয়ার পতনকাহিনী

মধ্য য়ুরোপের দুইটি ক্ষুদ্র রাজ্য বোহিমিয়া ও মোরাভিয়ার স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইয়াছে; ক্ষুধার্ত্ত হিট্লার বিনা রক্তপাতে কেমন

চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া তাহা অধিকার করিয়াছেন। ইহা কি ঐতিহাসিক ঘটনারই পুনরাবৃত্তি? এই দুইটি স্বাধীন রাজ্য জার্ম্মাণীর অধিকারভুক্ত হইয়াছে—সংবাদপত্রের পাঠকগণ পূর্ব্বেই তাহা জানিতে পারিয়াছেন; কিন্তু কি কৌশলে ইহা সম্ভব হইল, এ দেশের জনসাধারণের তাহা অজ্ঞাত। আমরা সেই প্রসঙ্গের আলোচনা করিতেছি।

জার্ম্মাণীর ভূতপূর্ব্ব রাষ্ট্রনায়ক প্রিন্স অটো ভন্ বিসমার্কের নাম আমাদের পাঠকগণের সুবিদিত। তাঁহার সময়ে তিনি সমগ্র য়ুরোপে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতিজ্ঞ বলিয়া সম্মানিত হইতেন। তিনি জার্ম্মাণীর 'Iron Chancellor' নামে পরিচিত ছিলেন। বিসমার্ক বলিয়াছিলেন, 'Whoever is master of Bohemia is master of Europe' যিনি বোহিমিয়া অধিকার করিবেন, তিনিই য়ুরোপের প্রভুত্ব লাভ করিবেন। গত ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে বিসমার্ক অষ্ট্রীয়ানগণকে পরাজিত করিয়া বোহিমিয়া অধিকার করিয়াছিলেন। অষ্ট্রিয়াণগণ তাঁহার মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিল। অবশেষে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মাণী এবং অষ্ট্রীয়া উভয় শক্তিই সম্মিলিত মিত্র শক্তিপুঞ্জের পদানত হইতে বাধ্য হইয়াছিল; তাহার ফলে বোহিমিয়া স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল।

বার্লিনে চ্যান্সেলারের যে ভবন আছে, সেই ভবনের প্রধান অলিন্দে বিসমার্কের একটি মূর্ত্তি, এই মূর্ত্তির প্রতি দৃষ্টি সন্নিবিষ্ট করিয়া জার্ম্মাণীর বর্ত্তমান চ্যান্সেলার এডলফ হিটলারের সেই বিখ্যাত বাণী স্মরণ হইয়াছিল, তিনি তাঁহার বিশাল পাঠাগার ত্যাগ করিয়া গত মার্চমাসের শেষ সপ্তাহে বিনা রক্তপাতে বোহিমিয়া এবং তাহার প্রতিবেশী রাজ্য মোরাভিয়া অধিকার করিয়াছেন। এই কাহিনী উপন্যাসিক ঘটনার ন্যায় অদ্ভুত।

হের হিটলার ঠিক এক বৎসর পূর্ব্বে অষ্ট্রিয়ার সুদক্ষ চ্যান্সেলার সুচনীগকে যেরূপ ধাপ্পায় অভিভূত করিয়া অষ্ট্রিয়া অধিকার করিয়াছিলেন, এবারও তিনি সেইরূপ ধাপ্পার সাহায্যে এই দুইটি রাজ্য জার্ম্মাণীর অধিকারভুক্ত করিয়াছেন।

বার্লিনে জেকোস্লোভাকিয়ার প্রেসিডেণ্ট হাচা

স্লোভাকিয়া রাজ্যের গণনায়ক প্রেসিডেণ্ট টিসো স্লোভাকিয়ার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধের আয়োজন করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রাণপণ চেষ্টায় সেই আয়োজন সম্পূর্ণ হইয়াছিল। তিনি স্লোভাকিয়ার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার ঘোষণা প্রচার করিলে প্রেগস্থিত জার্ম্মাণ প্রেসিডেণ্ট হাচার নিকট প্রস্তাব করেন,—তিনি বার্লিনে গমন করিয়া জার্ম্মাণ কর্তৃপক্ষের সহিত সকল বিষয়ের আলোচনা করুন; ইহাই সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল।

এই উপদেশ অনুসারে আইনজ্ঞ প্রেসিডেণ্ট হাচা তাঁহার পররাষ্ট্র সচিব এবং তরুণী কন্যাটিকে সঙ্গে লইয়া জার্ম্মাণীর কর্তৃপক্ষের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য বার্লিনে উপস্থিত হইলেন। বার্লিনে তাঁহারা সামরিক প্রথায় মহাসম্মানে অভ্যর্থিত হইয়া এডলন হোটেলে সমারোহসহকারে নীত হইলেন। তাঁহাদের অভ্যর্থনার জন্য হোটেলটি পত্রপুষ্পে সুসজ্জিত হইয়াছিল। সেই রাত্রিতেই হিটলার এবং তাঁহার দক্ষিণ হস্ত রিবেনট্রপ চ্যান্সেলার-ভবনে এই সম্মানিত অতিথিদ্বয়ের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

চ্যান্সেলার-ভবনের সুসজ্জিত অফিস-কক্ষে টেবলের উপর একখানি দলীল পূর্ব্ব হইতেই সংরক্ষিত ছিল; এই দলীলের মর্ম্ম এই যে, অতঃপর বোহিমিয়া ও মোরাভিয়া জার্ম্মাণীর আশ্রিত রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হইবে। ভবিষ্যতে এই উভয় রাজ্যের শাসন কার্য্য জার্ম্মাণ কর্তৃপক্ষের ইচ্ছানুসারে পরিচালিত হইবে। জার্ম্মাণরা আসিয়া জেকদিগকে সাহায্য করুক, জেকদিগের পক্ষ হইতে এই মর্ম্মের একখানি অনুরোধ পত্রও সেই টেবলে রক্ষিত হইয়াছিল।

সেই আফিস-কক্ষের পার্শ্বস্থ একটি কক্ষে কয়েক জন ডাক্তার উপবিষ্ট ছিলেন, যদি জেক-প্রতিনিধিরা এই প্রস্তাব শুনিয়া মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া পড়েন বা মনে কঠোর আঘাত পাওয়ায় তাঁহাদের 'হার্টফেলের' উপক্রম হয়, তাহা হইলে ডাক্তাররা তাঁহাদের পরিচর্য্যা করিবেন, বা

তাঁহারা অজ্ঞান হইয়া পড়িলে তাঁহাদের চেতনা সম্পাদন করিবেন, এই উদ্দেশ্যে ডাক্তারগণকে সেখানে বসাইয়া রাখা হইয়াছিল।

সেই আফিস-কক্ষে জার্ম্মাণীর চ্যান্সেলার হার হিটলারের সহিত এই সম্মানিত অতিথিদ্বয়ের সাক্ষাৎ হইলে, হার হিটলার তাঁহাদের নিকট সংক্ষেপে এই মন্তব্য প্রকাশ করিলেন যে, বাজে কথায় তাঁহাদের সময় নষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই, দলীলে যে সকল সর্ত্তের উল্লেখ ছিল, জার্ম্মাণীর পক্ষে তাহাই পাকা কথা, এবং চরম কথা; তাহার কোনরূপ পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা নাই। যদি তাঁহারা দলীলের সর্ত্ত সমূহে সম্মত হইয়া দলীল স্বাক্ষরিত না করেন, তাহা হইলে জার্ম্মাণ-সৈন্যগণ পরদিন প্রত্যূষে ছয় ঘটিকায় সময় তাঁহাদের রাজ্যে অভিযান করিবে, এবং তাহারা সকল বাধাই চূর্ণ করিবে। এই সকল কথা বলিয়া হার হিটলার জার্ম্মাণীর পক্ষ হইতে সেই দলীলে নিজের নাম স্বাক্ষর করিলেন, এবং তাঁহার অতিথিদ্বয় যদি কোন কারণে সেই দলীল স্বাক্ষরিত করিতে আপত্তি করেন, বা কোন প্রকার ওজর করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের উপযুক্ত শিক্ষা দানের জন্ম তাঁহার অনুচরবর্গকে আদেশ করিয়া তিনি (হার হিটলার) সেই কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

বলা বাহুল্য, প্রেসিডেণ্ট হাচা এবং তাঁহার পররাষ্ট্র সচিব স্বালকাবস্কি এই প্রস্তাবে বিস্তর আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন, এবং এই ভাবে বলপ্রয়োগে তাঁহাদের স্বাক্ষর আদায় করা কিরূপ গর্হিত কার্য্য, ইহাও তাহাদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু হিটলারের আদেশ অপরিবর্ত্তনীয়, অমোঘ। তাঁহাদিগকে দলীলে স্বাক্ষর করিতে অসম্মত দেখিয়া হিটলারের অনুচরগণ তাঁহাদিগকে জানাইল, আটশত বোমারু রণবিমান বোমায় পূর্ণ করিয়া প্রস্তুত রাখা হইয়াছে, তাহারা ইঙ্গিত পাইলেই প্রেগে উড়িয়া যাইবে এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে শান্তিপূর্ণ, শোভাময় সমৃদ্ধ প্রেগ নগর চূর্ণ করিয়া ধূলিসাৎ করিবে, নিরপরাধ নগরবাসিগণের, বালক-বালিকা, রমণী ও বৃদ্ধ নাগরিকবর্গের মৃতদেহে নগরের পথ পূর্ণ হইবে; প্রেগ নগর বিধ্বস্ত হইবে। তাহার রক্ষার অন্য কোন উপায় নাই। চ্যান্সেলার হার হিটলারের এই আদেশ অলঙ্ঘনীয়।

এই ভীষণ কথা শুনিয়া ৬৭ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ হাচা আর্ত্তনাদ করিয়া তাঁহার আসনে মূর্চ্ছিত হইলেন। তখন ডাক্তাররা অন্য কক্ষ হইতে আসিয়া তাঁহার শুশ্রূষা আরম্ভ করিলেন, অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল যত্নে পরিচর্য্যার পর তাঁহাকে একটি ইনজেক্সন দেওয়া হইল। এই ইনজেক্সনের ফলে তিনি কতকটা প্রকৃতিস্থ হইলেন। রাত্রি বারটা হইতে তিনটা পর্য্যন্ত এই ভাবে অতিবাহিত হইল। রাত্রি তিনটার সময় হাচা এবং স্বালকাবস্কি এক একটি কলম লইয়া কম্পিত হস্তে তাঁহাদের আত্মহত্যার পরোয়ানায় স্ব স্ব নাম স্বাক্ষর করিলেন। তাঁহাদের প্রাণরক্ষা হইল বটে, কিন্তু বোহিমিয়া ও মোরাভিয়া এই দুইটি স্বাধীন রাজ্যের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইল।

হিটলার এতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন যে, হাচা যে সময় জার্ম্মাণীর কর্ত্তৃপক্ষের সহিত সাক্ষাতের জন্য বার্লিনের পথে অগ্রসর হইতেছিলেন, সেই সময়েই জার্ম্মাণ সৈন্যদল তাঁহাদের রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিল। হাচা দলীলে নাম স্বাক্ষর না করিলে হিটলারের আদেশ কার্য্যে পরিণত হইত।

হিটলার যে এই প্রকার বাটপাড়ির সাহায্যে বোহিমিয়া ও মোরাভিয়ার স্বাধীনতা অপহরণ করিয়াছেন, এ সংবাদ আমাদের দেশের লোকের অজ্ঞাত। য়ুরোপীয় রাজনৈতিক পত্র হইতে সর্ব্বপ্রথম এই সংবাদ এদেশে প্রকাশিত হইল। হুমকী দিয়া পররাষ্ট্র অধিকার হিটলারের প্রকৃতির সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি। ইহা জার্ম্মাণীর ভাগ্যবিধাতার উপযুক্ত কার্য্য বটে!

পোল্যাণ্ডে শনির দৃষ্টি

বিশাল জন-সমুদ্রের মধ্যে চারিটি মূর্ত্তির প্রতি আজ সমগ্র পৃথিবীর দৃষ্টি আকৃষ্ট। ১ম, এডল্ফ হিটলার, ২য়, বেনিটো মুসোলিনী, ৩য়, শান্তিস্রষ্টা নেভিল চেম্বারলেন, ৪র্থ, এডওয়ার্ড ডালাডিয়ার। কিন্তু গত এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে য়ুরোপের আর এক ব্যক্তি সহসা সমগ্র সভ্যজগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন; তিনি পোল্যাণ্ডের সমর-বিভাগের ইন্স্পেক্টর জেনারেল মার্সাল এডোয়ার্ড স্মিগলি রীজ। তিনি পোল্যাণ্ডের ভূতপূর্ব্ব 'ডিক্টেটর'

পোল্যাণ্ডের মার্শাল এডোয়ার্ড স্মিগলী রীজ

স্বদেশপ্রেমিক মার্সাল যোসেফ পিল্সুড্স্কির মন্ত্রশিষ্য, স্বদেশের নির্ভীক সেবক, এবং সমরনিপুণ বীরপুরুষ।

পোল্যাণ্ডের প্রতি হিটলারের লুব্ধ দৃষ্টি নিপতিত দেখিয়া, পোল্যাণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাগরিক মার্সাল স্মিগলি রীজ সরল, সঙ্ক্ষিপ্ত ভাষায় হিটলারের নিকট তাঁহার মনের ভাব প্রকাশ করিয়াছেন; সে ভাষা বুঝিতে হিটলারের বিন্দুমাত্র কষ্ট হইবে না।

মার্সাল স্মিগলি রীজ বলিয়াছেন, "হিটলারের যদি পোল্যাণ্ড অধিকার করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে তাঁহাকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। পোল্যাণ্ড তিনি ঠকাইয়া লইতে পারিবেন না।"

কিন্তু মার্সাল জার্ম্মাণীর দাম্ভিক ডিক্টেটরকে 'যুদ্ধং দেহি' রবে আহ্বান করিলেও, য়ুরোপের পশ্চিমাংশের গণতন্ত্রবাদীরা জার্ম্মাণীর

আক্রমণের বিরুদ্ধে এক বিরাট মৈত্রীসঙ্ঘ সংস্থাপনের স্বপ্ন দেখিতেছেন; কিন্তু এই স্বপ্ন ইসপের গল্পের বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধিবার প্রস্তাবের ন্যায় বিফল হইয়াছে।

গত বৎসর বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী নেভিল চেম্বারলেন মহা উৎসাহে দুইবার জার্ম্মাণীতে উড়িয়া গিয়া হিটলারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। গত মাসে অধিকাংশ মাতব্বর বৃটন (nearly all responsible Britons) তাঁহাকে ধরিয়া আগ্রহভরে বলিয়াছিলেন, 'শীঘ্র একটা উপায় কিছু করো, মুরুব্বি !'—কিন্তু মিঃ চেম্বারলেন এবার আর ছাতা বগলে লইয়া ক্রয়ডনের দিকে দৌড়াইলেন না, কিছুই করিলেন না; মুখ বুজিয়া বোবার মত ঘরে বসিয়া রহিলেন !

কিন্তু বৃটিশ 'ডিপ্লোমাটিয়া' একটা জার্ম্মাণ-বিরোধী বাধা খাড়া করিবার জন্য সারা য়ুরোপের বেড়া নাড়িয়া গৃহস্থের মন বুঝিলেন। সোভিয়েট রুশিয়া প্রস্তাব করিয়াছিল—নব শক্তির একটা পরামর্শ-সভা তাড়াতাড়ি আহ্বান করা হউক; কিন্তু বৃটিশ মন্ত্রিসভা ভদ্রতা সহকারে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন; তাঁহারা বলিলেন, ঐ পোল্যাণ্ডটাই প্রকাণ্ড বাধা।

ঐ প্রকার 'গয়ংগচ্ছ' করিতে করিতে এদিকে হিটলার রুমানিয়ার সঙ্গে এক অর্থনৈতিক চুক্তি করিয়া, যাহা চাহিয়াছিলেন, তাহার প্রায় পনের আনা পাইলেন, এবং লুথানিয়ার মেমেলও গ্রাস করিলেন। এখন তাঁহার আরও চাই, সুতরাং এবার তাঁহার দৃষ্টি পড়িল—পোল্যাণ্ডে।

মার্শাল স্মিগলি রীজের সাহস, বীরত্ব ও কৌশলের পরিচয় পূর্ব্বেও পাওয়া গিয়াছিল। য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধে জার্ম্মাণ-দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ হইলে এবং রুশিয়ান বলসেভিক ফৌজ ওয়ারসর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলে পোল্যাণ্ডের তাৎকালীন সমর-সচিব স্মিগলি রীজই লিথুনিয়ার ভিল্নাকে স্বাধীনতা প্রদান করেন, বলসেভিক সৈন্যবাহিনী পরাস্ত করেন, এবং মার্শেল পিলসুডস্কির নির্দ্দেশে রুশিয়ার দুর্দ্দমনীয় লাল ফৌজের কবল হইতে লাটভিয়াকে মুক্তি দান করেন। অবশেষে তিনি পোল্যাণ্ডের কেন্দ্রীয় সৈন্যদল পরিচালিত করিয়া রুশিয়ার লাল সৈন্য-বাহিনীকে পরাজিত করেন। তাঁহার যে সকল চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার নিম্নে তাঁহার এই বাণী লিখিত আছে,—'পোল্যাণ্ডের অধিকারে কেহ যেন হস্তক্ষেপ করিতে না পারে।' তিনি হিটলারের সাহায্য প্রত্যাখ্যান করিয়া, ফরাসী সরকারের নিকট আড়াই কোটি পাউণ্ড ঋণ গ্রহণে পোলিস্ সৈন্য-দল সংগঠন করিয়াছেন।

তিনি হিটলারের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া জার্ম্মাণীর আক্রমণে বাধা দানের জন্য ১০ লক্ষ সৈন্য সমাবেশ করিয়াছেন, এবং এরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, প্রয়োজন হইলে তাঁহার আদেশ মাত্র পোল্যাণ্ডের প্রত্যেক অস্ত্রধারী যোদ্ধা যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত হইবে; তাহাদের সংখ্যা প্রায় ৪০ লক্ষ।

গত মার্চ্চ মাসের শেষে পোল্যাণ্ডস্থিত জার্ম্মাণ-দূত হান্স ভন্ মলটকে দুইবার পোলিস্ পররাষ্ট্র আফিসে উপস্থিত হইয়া, একবার এই অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, মোরাভিয়ায় সংরক্ষিত জার্ম্মাণ সৈন্যগণকে পোলদিগের অধিকৃত টেমেনের এলাকাস্থিত ওডারবার্গের রেলওয়ে-জংসন দখল করিবার অনুমতি দান করা হউক; দ্বিতীয় বার অনুরোধ করা হয়—ডানজিগকে জার্ম্মাণীর আশ্রয়াধীন করিতে দেওয়া হউক। কিন্তু জার্ম্মাণীর এই উভয় অনুরোধই প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিল।

এখন পোল্যাণ্ডে যুদ্ধের আয়োজন চলিতেছে। দেশরক্ষার জন্য ৪ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ড ঋণ গ্রহণের প্রস্তাব হইয়াছে। জার্ম্মাণ-বিরোধী জাতীয়তাবাদী পোলসংবাদপত্রসমূহ জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে প্রচার-কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে। পোল্যাণ্ডের জনসাধারণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছে।

সুতরাং হিটলার ধাপ্পা দিয়া পোল্যাণ্ডকেও আশ্রিত রাজ্যে পরিণত করিবেন, আপাততঃ তাহার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না।

সোভিয়েট সমর-সচিবের আস্ফালন

হের হিটলার সোভিয়েট য়ুক্রেনের অদূরবর্ত্তী আর একটি দেশে তাঁহার বজ্রমুষ্টির প্রভাব অনুভব করাইবার ২৮ ঘণ্টা পূর্ব্বে সোভিয়েট সমর-সচিব ক্লেমেণ্ট এফ্ রেমোভিচ্ ভোরোসিলফ্ মস্কোর

ক্লেমেণ্ট এফ্ রেমোভিচ্ ভোরোসিলফ্

ক্রেমলিনে এক বক্তৃতা করেন। জার্ম্মাণীর নাজী সরকারকে 'মারি পকাস্ দিব' বলিয়া ভয় প্রদর্শন করাই সম্ভবতঃ তাঁহার এই প্রকার দম্ভ প্রকাশের উদ্দেশ্য।

কমিয়ুনিষ্ট দলের অষ্টাদশ কনফারেন্সে দুই সহস্র প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন, সেই সভায় সমর-সচিব তাঁহার প্রফুল্ল মুখে বিশাল গাম্ভীর্য্যের অবতারণা করিয়া প্রতিনিধিবর্গকে বলেন, "যদি কোন বিকৃতবুদ্ধি আততায়ী (হায় হিটলারকে অনেকে 'পাগল' বলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করেন) তাহার ক্ষিপ্ততার আতিশয্যে সোভিয়েটের মাতৃভূমিকে আক্রমণ করিতে আসে, তাহা হইলে সোভিয়েট বিমান-বাহিনী অনায়াসে তাহাকে চাপা দিতে পারিবে।"

তিনি ইহাও বলেন যে, "গত পাঁচ বৎসরে আমাদের সৈন্যসংখ্যা

দ্বিগুণ হইয়াছে; বিমান-বাহিনী শতকরা ১৩০ হিসাবে বর্দ্ধিত হইয়াছে, এবং নৌবিভাগ সুবিশাল নৌ-বহরে পরিণত হইয়াছে।

অতঃপর 'ক্রিম' ভোরোসিলফ, তাঁহার পদাতিক সৈন্যদলের শক্তির পরিচয় উপলক্ষে বলেন, তাঁহার ৬০ হাজার পদাতিক সৈন্য প্রতি মিনিটে প্রায় ৭০ টন গোলা বর্ষণ করিতে পারে, কিন্তু ফরাসী সৈনিকরা মিনিটে ৫৪ টন, এবং জার্ম্মাণ সৈন্যরা ৫৩ টনের অধিক পারে না। তিনি এ কথাও বলেন যে, ট্যাঙ্কের সংখ্যা তাঁহারা দ্বিগুণ করিয়াছেন, এবং সাঁজোয়া-কারের সংখ্যাও শতকরা ৬ শত ৫০ হিসাবে বর্দ্ধিত হইয়াছে। যদিও তাঁহাদের বিমান-বিধ্বংসী কামানের সংখ্যা পূর্ব্বে অনেক অল্প ছিল, কিন্তু চারি বৎসর পূর্ব্বে এই সকল কামানের সংখ্যা যত ছিল, এখন তাহা অপেক্ষা প্রায় তিন গুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। বিমানসংখ্যাও এখন দ্বিগুণ হইয়াছে; এখন তাহাদের শক্তি ৩১ লক্ষ - হাজার ৯ শত অশ্বশক্তির সমান। তাহারা এখন শত্রু ধ্বংস করিবার জন্য ৬ হাজার টন বোমা বহন করিতে পারে।

কিন্তু সমর-সচিব কৌশলে তাঁহাদের বিমান-বাহিনীর প্রকৃত সংখ্যার কথা গোপন করিয়াছেন। জনরবে প্রকাশ, সোভিয়েট সরকারের রণ-বিমানের সংখ্যা দশ সহস্রেরও অধিক, এবং তাহারা তাহাদের মাতৃভূমির শত্রু ধ্বংস করিতে সদা-প্রস্তুত; কিন্তু বিমান সম্বন্ধে অভিজ্ঞগণের ধারণা, সোভিয়েট সরকারের রণ-বিমানের সংখ্যা ৩ সহস্রের অধিক নহে।

সোভিয়েট সরকারের ধারণা, কেবল গ্যাসের ব্যবহারেই ভবিষ্যতে যুদ্ধ ফল নির্ণীত হইবে; এই জন্য তাঁহারা 'মিলিটারী একাডেমি'তে রাসায়নিক যুদ্ধ শিক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিয়া ঐ প্রণালীর শিক্ষা-কেন্দ্রের সংখ্যা বর্দ্ধিত করিতেছেন। হিটলার ক যুক্রেরিয়ার প্রাচুর্য্য-পূর্ণ শস্যক্ষেত্র সমূহ হইতে ভয় প্রদর্শন করিয়া বিতাড়িত করিবার অভিপ্রায়ে সমরসচিব ভোরোসিলফের সহকারী মার্শাল সিমিয়ন মিখা-ইলোভিচ্ বুদেনী এই কথা বলিয়া আস্ফালন করিতেছেন যে, "যদি ফ্যাসিষ্ট আততায়ীরা রাসায়নিক বাষ্প সাহায্যে আমাদিগকে আক্রমণ করে, তাহা হইলে আমরাও তাহাদের উপর গ্যাস নিক্ষেপ করিব; সেই যুদ্ধে রাসায়নিক বাষ্পই শক্তিশালী অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইবে। আমরা প্রথমেই তাহাদিগকে গ্যাসের সাহায্যে আক্রমণ করিব না; যদি কেহ আমাদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধে এই পথ প্রদর্শন করে, তাহা হইলে আমরা তাহাদের যেরূপ দুরবস্থা করিব, সেজন্য তাহারাই যেন আপনাদিগকে দায়ী মনে করে।"

এখন কথা এই যে, সোভিয়েট সরকারের সমর বিভাগের এই প্রকার আস্ফালনে হিটলার কি বিচলিত হইবেন? কিন্তু হিটলার এ পর্য্যন্ত কেবল যুদ্ধের ভয় প্রদর্শন করিয়াই পূর্ব্বাঞ্চলের দুর্ব্বল রাজ্য সমূহে জার্ম্মাণীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন; তিনি সোভিয়েট সরকারকে খোঁচা দিতে সাহস করিবেন, এরূপ কোন লক্ষণ বুঝিতে পারা যায় নাই। তবে যদি তাঁহার ঐরূপ সঙ্কল্প থাকে, তাহা হইলে তাঁহাকে আরও অধিক শক্তি সঞ্চয় করিতে হইবে।

বৃটিশ সমরনীতি-সংক্রান্ত ঘোষণা

বৃটিশ রাজকীয় বিমান-বহরের অধ্যক্ষ লর্ড ট্রেন্‌চার্ড প্রধান মন্ত্রী নেভিল চেম্বারলেনের ক্ষমাশীলতা ও ঔদাসীন্যের বহর দেখিয়া ভয়ঙ্কর চটিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন, এ কি উৎপাত! এক গালে চড় খাইয়া অন্য গাল পাতিয়া দেওয়ার যুগ এখনও কি আছে?—তিনি বলেন, যে এক ঘা মারিবে, তাহাকে পাঁচ ঘা দিবে, তবে ত মান-সম্ভ্রম বজায় থাকিবে; বৃটেনেরও এই নীতি অবলম্বন করা উচিত।

অল্পদিন পূর্ব্বে বৃটিশ-পার্লামেণ্টের লর্ডস্ সভায় তিনি প্রশ্ন করেন, "কোন শত্রুবাহিনী আমাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিলে তাহাকে প্রচণ্ডবেগে পাল্টা আক্রমণের যথোচিত ব্যবস্থা করা হইতেছে কি?" তিনি এই মর্ম্মে একটা প্রতিশ্রুতি চাহিয়াছিলেন যে, বৃটেনের শত্রুপক্ষকে আক্রমণের জন্য যে শক্তির প্রয়োজন, তাহা যেন তাহার আত্মরক্ষার আয়োজনেই নিঃশেষিত না হয়।

তিনি তাঁহার বক্তৃতার উপসংহারে বলেন, "আমি আশা করি, লর্ড চ্যাট্‌ফীল্ড এ কথা বলিতে পারিবেন যে, আমাদের সামরিক শক্তি আততায়ীবর্গের আতঙ্ক উৎপাদনে সমর্থ।"

ভূতপূর্ব্ব পুলিশ-কমিশনার ট্রেন্‌চার্ডের গোঁফ দেখিয়া শিকারী বিড়াল বলিয়া মনে হইলেও (with a rugged moustache) তাঁহার হাসিটি মিষ্ট। তিনি বিশেষ মুরুব্বিয়ানার ভঙ্গিতেই এই সকল কথা বলিয়াছিলেন।

লর্ড ট্রেন্‌চার্ড 'সল্সবারি সেণ্ট্রাল ফ্লায়িং দলে'র অধ্যক্ষ ছিলেন; ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে বৃটিশ বিমান-বহরের 'কম্যাণ্ডাণ্ট' পদে নিযুক্ত করা হয়। য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের পর সুদীর্ঘ একাদশ বৎসর তিনি বৃটিশ বিমান-বহরের কর্ণধারের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

লর্ড ট্রেন্‌চার্ডের প্রশ্নের পর 'Defence co-ordination Minister' তাহার যে কৌশলপূর্ণ উত্তর দিয়াছেন, তাহা লর্ড ট্রেন্‌চার্ডের 'মনের মত' না হইলেও তাহা কূটনীতিপূর্ণ; সেই উত্তরেই তাঁহাকে সন্তুষ্ট হইতে হইয়াছে।

লর্ড চ্যাট্‌ফীল্ড তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন, বৃটিশ জাতি শান্তিপ্রিয়, (চিরদিনই?) তাঁহারা অন্যকে আক্রমণ করা অপেক্ষা আত্মরক্ষা-সংক্রান্ত প্রসঙ্গের আলোচনারই অধিক পক্ষপাতী। উপসংহারে তিনি অত্যন্ত সতর্কভাবে বলিয়াছেন, "সরকারের পক্ষ হইতে আমি নিশ্চিতরূপে লর্ড ট্রেন্‌চার্ডকে এই মর্ম্মে প্রতিশ্রুতি দিতে পারি না যে, আমরা এরূপ প্রচণ্ড সামরিক শক্তি সংগঠনের মনস্থ করিয়াছি—যাহা সকল আক্রমণকারীর হৃদয়েই আতঙ্ক সঞ্চার করিবে।"

এই উত্তরে রস এবং শ্লেষ উভয়ই বর্ত্তমান; বৃটিশ বিমান-বহরের তেজস্বী অধ্যক্ষ অন্য গাল পাতিয়া ইহা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।
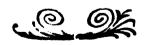
সাময়িক প্রসঙ্গ

কচুরি পানা নাশ

বৈশাখ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে বাঙ্গালার মন্ত্রিমণ্ডলী কয়েকদিন ধরিয়া কচুরি পানা ধ্বংসকার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। তাঁহারা মোটর ও রেলযোগে বাঙ্গালার বিভিন্ন জিলায় ঘুরিয়া কচুরি পানা উচ্ছেদ-কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। মফঃস্বলের স্কুল পাঠশালা প্রায় সবই বন্ধ করিয়া ছাত্র এবং শিক্ষকরা জলে নামিয়া কচুরিপানা উত্তোলন করিয়াছিলেন। কোন কোন স্থানে আদালতও বন্ধ করা হইয়াছিল। মোটা বেতনের মন্ত্রীরা অথচ "না ছুঁই পানি"-নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, ছেলেরা জলে নামিয়া জলৌকার এবং কাঁকড়ার দংশন জ্বালা সহিয়া দেশের কাজ করিয়াছে। কিন্তু লাভ কি হইল, তাহা ত বুঝিতে পারিতেছি না। ইহার ফলে মন্ত্রিদিগের ভাতা লাভ ভিন্ন অন্য কাহারও কিছু লাভ হইবে কি? যে ভাবে এই কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে, তাহাতে কচুরি পানার উচ্ছেদসাধন সম্ভব হইবে না, উহাদের প্রকোপ না কমিয়া বরং বাড়িবে; কারণ, উহা সম্পূর্ণভাবে উঠাইয়া দূরে নিক্ষেপ না করিলে উহার বীজ জলে থাকিয়া আবার দ্বিগুণ তেজে জলাশয় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। আগামী বর্ষায় মন্ত্রিগণ তাহার প্রমাণ পাইবেন।

কৃষিজ আয়ের উপর আয়-কর

বেহার এবং আসাম প্রদেশের সরকার কৃষিজ আয়ের উপর আয়-কর ধার্য্য করিয়াছেন। সেইজন্য লক্ষ্ণৌ সহরে ভূম্যধিকারী-সমিতি এই কর-ধার্য্য কার্য্যের "তীব্র প্রতিবাদ" করিয়াছেন। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, কৃষিজ আয়ের উপর আয়-কর ধার্য্য সঙ্গত কি না? প্রায় ৮০ বৎসর পূর্ব্বে সিপাহী-বিদ্রোহের পর আয়-কর আইন প্রবর্ত্তন সময়েই সরকার বলিয়াছিলেন যে, ভারতে কৃষিজ আয়ের উপর আয়-কর ধার্য্য হইবে না। ভারতীয় করাবধারণ অনুসন্ধান সমিতি কিন্তু এই চিরাচরিত প্রথার সমর্থন করিতে পারেন নাই। সুতরাং ভূম্যধিকারীদিগের এই তীব্র প্রতিবাদ অরণ্যে রোদনেই পর্য্যবসিত হইবে। আমরা কিন্তু কৃষিজ আয়ের উপর আয়-কর ধার্য্যের আদৌ পক্ষপাতী নহি। কারণ, কৃষিজ আয়ের পরিমাণ ঠিক করাই কঠিন। হাজা, মজা, ফৌতি ফেরারীর জন্য অনেক আয় বাদ যায় এবং অনেক ক্ষতি হয়। তাহার উপর জমীদারগণকে রোডসেস প্রদান করিতে হয়।

নূতন মেয়র

সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মিষ্টার নিশীথচন্দ্র সেন এবার সর্ব্বসম্মতিক্রমে কলিকাতার মেয়র নির্ব্বাচিত হইয়াছেন; য়ুরোপীয়রাও তাঁহাকে ভোট দিয়াছিলেন; তিনি কংগ্রেসের আস্থাভাজন এবং বিচক্ষণ ব্যবহারাজীব, তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার হিসাবে বহুদর্শিতা লাভ করিয়াছেন; আশা করি, এই দুর্দ্দিনে কলিকাতার পৌর-প্রতিষ্ঠানের মর্য্যাদা সম্পূর্ণ রক্ষা করিতে তিনি সমর্থ হইবেন। এই নির্ব্বাচনে আমরা তাঁহাকে এবং নূতন ডেপুটী মেয়র প্রিন্স ইউসুফ মির্জ্জাকে অভিনন্দিত করিতেছি।

ব্যারিষ্টার নিশীথচন্দ্র সেন

মত গ্রহণ না সিদ্ধান্ত মান্য?

ভারতীয় ফেডারাল কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার মরিস গাওয়ার রাজকোটের ব্যাপারের যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,

তাহা তিনি ব্যক্তিগতভাবে করিয়াছেন, কি ফেডারাল কোর্টের প্রধান বিচারপতিরূপে করিয়াছেন, তাহা লইয়া বিতর্ক চলিতেছে। কিন্তু ইহাতে মতভেদের অবকাশ নাই। কারণ, লর্ড লিনলিথগো সার মরিসকে এই বিচারভার প্রদানের প্রস্তাবের সময়েই তাঁহাকে ফেডারাল কোর্টের প্রধান বিচারপতি বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। সার মরিস ঐ রোয়েদাদ স্বাক্ষরের নিম্নে আপনাকে ফেডারাল আদালতের প্রধান বিচারপতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মহাত্মাজী ১০ই এপ্রিল রাজকোটের ঠাকুর সাহেবকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতেও তিনি The Chief Justice's Award (প্রধান বিচারপতির রোয়েদাদ) এই কথা দুইবার ব্যবহার করিয়াছেন। ১০ই এপ্রিল ঠাকুর সাহেব মহাত্মাজীকে যে পত্র দিয়াছেন, তাহাতেও তিনি The Award of the Hon'ble Chief Justice of India এবং The Chief Justice of India's decision এ কথা লিখিয়াছেন; এরূপ অবস্থায় তিনি প্রধান বিচারপতিরূপেই এই সিদ্ধান্ত করিয়া দিয়াছেন, এ কথা অস্বীকার করা যায় কি? মহাত্মাজী যদি বলিতেন, সার মরিস গাওয়ার ব্যবহার-শাস্ত্রে বিচক্ষণ বলিয়াই তাঁহাকে রাজকোট সমস্যার মীমাংসাভার প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহা হইলে এ কথা উঠিত না। আমাদের ধারণা, মহাত্মাজী ভারতবর্ষের প্রধান বিচারপতি সার মরিস গাওয়ারের নিকট ঠাকুর সাহেবের স্বীকৃতি-পত্রের ব্যাখ্যা লইয়া ফেডারেশনের অঙ্গ ফেডারাল কোর্টকে পরোক্ষভাবে মানিয়া লইয়াছেন। কূট তর্কের দ্বারা ইহা অস্বীকার করা সম্ভবে না।

রাজকোটে মহাত্মাজীর পরাজয়

এত করিয়াও মহাত্মাজী মনের মত করিয়া রাজকোটের শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তনে সমর্থ হন নাই। সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল শাসন-সংস্কার কমিটীতে যে সাত জন সদস্যকে মনোনীত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের ছয় জনই না কি রাজকোট রাজ্যের প্রজা নহেন। সুতরাং সার মরিস গাওয়ারের রোয়েদাদ অনুসারে ঠাকুর সাহেবের ঐ ছয় জন সদস্যের নাম অগ্রাহ্য করিবার অধিকার আছে। অন্য বিষয়েও রাজকোট দরবারের সহিত গান্ধীজীর মতভেদ ঘটিয়াছে। রাজকোট দরবার বলিয়াছেন যে, সংস্কার কমিটী যে রিপোর্ট দিবেন, ঠাকুর সাহেবের সেই রিপোর্ট সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার অধিকার আছে। পক্ষান্তরে গান্ধীজী বলিয়াছেন, ঠাকুর সাহেবের সেই অধিকার নাই—তাঁহাকে রিপোর্ট অনুসারেই কায করিতে হইবে। অর্থাৎ ঠাকুর সাহেবকে উহা নির্ব্বিচারে আদালতের রায়ের মত সমস্তটাই গ্রহণ করিতে হইবে। এখন কে এই সমস্যা মীমাংসা করিবেন?

মহাত্মাজীর অপর প্রস্তাব, রাজকোটের প্রজাপরিষদ সর্দ্দার প্যাটেলের মনোনীত সদস্যগণকে লইয়া গঠিত হইবে। প্রয়োজনানুসারে তাঁহাদের ভিন্ন মতের রিপোর্ট ভারতের প্রধান বিচারপতির নিকট দাখিল করিবার অধিকার থাকিবে। অর্থাৎ রাজকোট দরবার একটি কমিটী নির্ব্বাচন করুন, সেই কমিটী রাজকোট রাজ্যের শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে এক মাস চারি দিনের মধ্যে ঠাকুর সাহেবের নিকট তাঁহাদের রিপোর্ট দাখিল করিবেন; যদি ঐ শাসন-সংস্কার প্রস্তাব সর্দ্দার প্যাটেল কর্ত্তৃক মনোনীত সাত জন সদস্যের মনঃপূত না হয়, তাহা হইলে তাঁহারা তাঁহাদের মতদ্বৈধ জ্ঞাপন করিয়া ঐ সম্বন্ধে স্বতন্ত্র রিপোর্ট সার মরিস গাওয়ারের নিকট পেশ করিতে পারিবেন। ঠাকুর সাহেব ইহা নূতন প্রস্তাব বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। এখন জিজ্ঞাস্য, এই ব্যাপারে গোড়ায় গলদ কাহার হইল? সর্দ্দার প্যাটেল অবশ্যই জানিতেন যে, যাঁহারা রাজকোট দরবারের প্রজা নহেন—তাঁহাদিগকে মনোনীত করিয়া দিলে ঠাকুর সাহেব সে মনোনয়ন অগ্রাহ্য করিবেন। কিন্তু তাহা জানিয়াও কি তিনি সাত জনের মধ্যে এমন ছয় জনকে মনোনীত করিলেন, যাঁহারা রাজকোট দরবারের প্রজা নহেন? পক্ষান্তরে যাঁহারা বহুকাল ধরিয়া রাজকোট দরবারের প্রজা,—তাঁহাদিগকে প্রজাত্বে অস্বীকার করা কি ঠাকুর সাহেবের পক্ষে সম্ভবে? তবে রাজ্যে বিভ্রাট-সৃষ্টির জন্য অল্পদিন পূর্ব্বে যাঁহারা রাজকোট রাজ্যে বসবাস করিয়াছেন, সর্দ্দার প্যাটেল যদি তাঁহাদেরই মধ্যে ছয় জনকে সদস্য মনোনীত করিয়া থাকেন, তাহা হইলেই দরবারের পক্ষে তাঁহাদের প্রজাত্ব অস্বীকার করা সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু যাঁহারা বংশানুক্রমে দরবারের প্রজা, তাঁহাদের প্রজাত্ব অস্বীকার করা কি সম্ভবপর? সর্দ্দার প্যাটেল বা মহাত্মাজী ঐ ছয় জন যে রাজকোট দরবারের স্থায়ী প্রজা, ইহা সপ্রমাণে বিশেষ চেষ্টা করেন নাই। ঐ ছয় জনকে প্রজা সপ্রমাণ করিতে পারিলে

ত সকল গোলযোগের অবসান হইত। রাজকোটের ছয় জন স্থায়ী প্রজাকে মনোনীত না করিয়া ঐ ছয় জনকে সদস্য করিতে হইবে, ইহারই বা অর্থ কি? এ পর্য্যন্ত রাজকোট সমস্যার মীমাংসা হয় নাই—মহাত্মাজীর পরাজয় ঘটিয়াছে। গান্ধীজী বলিয়াছেন যে, "সাহসী লোকরাই অহিংসার ফল প্রাপ্ত হন। অতএব আমি স্বাস্থ্য ভগ্ন—আশা ভগ্ন করিয়া এ স্থান হইতে চলিলাম। রাজকোট আমার পক্ষে অতুল্য পরীক্ষাগার। কাথিবাড়ের কুটিল রাজনীতিতে আমার ধৈর্য্যের কঠোর পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। রাজকোট আমার যৌবন হরণ করিয়াছে।"

রাজকোট হইতে বিদায় গ্রহণের পূর্ব্বে তিনি বীরওয়ালাকে (বীরবল?) বলিয়াছিলেন যে, "আমি পরাজিত। দরবার শ্রীবীরওয়ালার জয়। দেশের লোককে যতদূর সম্ভব অধিকার দিয়া সন্তুষ্ট করিয়া আমাকে টেলিগ্রামে সে সংবাদ জানাইলে নিরাশায় আশা পাইব।" ইহার পর তিনি নিরাশায় আশা পাইয়াছেন। নিখিল ভারতীয় গান্ধী-সেবাসঙ্ঘে তিনি ঘোষণা করিয়াছেন, আমি ভীরু নহি। রাজকোটের জনগণের পক্ষ ত্যাগ করিব না। আমি প্রতিদিনই হৃদয়ের ও মনের বল পাইবার প্রয়াস পাইতেছি। তিনি বীরওয়ালাকে পুনরায় রাজকোট যাইবার অভিপ্রায় জানাইলে বীরওয়ালা তাঁহাকে রাজকোটে যাইতে নিষেধ করিয়া তার করিয়াছিলেন। তাহার উত্তরে গান্ধীজী বীরওয়ালাকে জানান যে, তিনি ২৮শে বৈশাখ নিশ্চয়ই রাজকোটে যাইবেন। গান্ধীজী চম্পারনের বৃন্দাবনে চরকায় সূতা কাটা ও জুতা প্রস্তুতের জন্য উৎসাহ প্রদান করিয়া কাশী ও বোম্বাই হইয়া নূতন আশার আলোক অনুসরণে রাজকোট গিয়াছেন। সুতরাং রাজকোট-প্রহেলিকার এখনও সমাধান হয় নাই। অতঃপর দ্বিতীয় অধ্যায় চলিবে। রাজকোটের ঠাকুর সাহেব যদি গান্ধীজীর আদেশ—সর্দ্দার পেটেলের নির্দ্দেশ-মত প্রজাগণকে ন্যায়সঙ্গত রাজনীতিক অধিকার দিয়া তুষ্ট করিতে সম্মত হন, তাহা হইলেই মহাত্মাজীর সম্ভ্রম রক্ষা হইতে পারে। কিন্তু এই ব্যাপার আবার ভারতের প্রধান বিচারপতির বিচারাধীন হইবার সম্ভাবনাই প্রবল। গান্ধীজীও ২৭শে বৈশাখ বোম্বাইয়ে সেই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি এখনও শাসন-সংস্কার কমিটীতে মুসলমান ও ভায়াতগণের প্রতিনিধি গ্রহণে অসম্মত। গান্ধীজীর প্রায়োপবেশনের প্রভাবে যে রাজকোট-অধিপতির মনের পরিবর্ত্তন সম্ভব হয় নাই—মহাত্মার পরাজয় হইয়াছে, আশা করি, তাহা তিনিও অস্বীকার করিবেন না।

কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশনে রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ

১৫ই বৈশাখ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর কলিকাতা অধিবেশন প্রারম্ভে রাষ্ট্রপতি শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু সভাপতি-পদ ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি কংগ্রেসের অধিকাংশ সদস্যের ভোটে নির্ব্বাচিত হইবার পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার বিরুদ্ধে যে হীন ষড়যন্ত্র চলিয়া আসিতেছিল,—তাহাই জয়লাভ করিয়াছে। সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতি গঠন সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধীর সহিত তিন দিন নিভৃত আলোচনায় মীমাংসা সম্ভব না হওয়ায় দেশসেবার একান্ত কর্ত্তব্য-প্রণোদিত হইয়া পদত্যাগ পত্র প্রদান করিয়াছেন। তিনি গণতন্ত্রের পূর্ণ সম্মান প্রদান জন্যই ত্রিপুরী কংগ্রেসে পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাব উপস্থাপন অনুমোদন করিয়াছিলেন। সেই প্রস্তাব গৃহীত হইবার পর তিনি তদনুসারে কার্য্য করিতেও সম্মত হইয়াছিলেন। কারণ, গান্ধীজীর প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা অনন্যসাধারণ। কিন্তু মহাত্মাজী সুভাষবাবুকে কার্য্যকরী সমিতি গঠন বিষয়ে কোন সহায়তা করিতে চাহিলেন না বা পারিলেন না। কঠিন পীড়ায় দুর্ব্বল সুভাষবাবুর পক্ষে দূরস্থ গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করা সম্ভব হয় নাই। এদিকে কার্য্যকরী সমিতি গঠনে অযথা বিলম্ব হইতেছে বলিয়া রাজাজী-বল্লভজীর দল নেপথ্যে থাকিয়া ঘোর কলরব করিতে থাকিলেন। মহাত্মাজী রাজকোটে আকাশকুসুম আহরণে ব্যস্ত ছিলেন, তিনি কর্ত্তব্যানুরোধে লাট-বাড়ীতে যাওয়া-আসা করিতেছিলেন। কাযেই তিনি এলাহাবাদে আবুল কালাম আজাদকে দেখিতে আসিতে পারিলেও অসুস্থ সুভাষচন্দ্রকে দেখিতে জামডোবায় শুভাগমন করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই।

সুভাষচন্দ্র অনন্যোপায় হইয়া গান্ধীজীকে সুদীর্ঘ পত্র লিখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, কিন্তু আসল সমস্যার সমাধান দিন দিন দূরতর হইতেছিল। শেষে মহাত্মাজী বাঙ্গালার

আসিলেন—কিন্তু থাকিলেন কংগ্রেসের কর্ম্মকেন্দ্র কলিকাতার উপকণ্ঠে সোদপুরে জনৈক অনুগত ভক্তের ভবনে। এইখানে সুভাষচন্দ্রের সহিত গান্ধীজীর তিন দিন সঙ্গোপন আলোচনা হইয়াছিল। কিন্তু আসল সমস্যার সমাধান হয় নাই। কংগ্রেসে গৃহীত পন্থজীর প্রস্তাব অনুসারে কার্য্যকরী সমিতি গঠন করিবার জন্য সুভাষচন্দ্রের মহাত্মাজীকে উহার গঠনভার প্রদান করাই সঙ্গত হইয়াছিল। কিন্তু গান্ধীজী তাহা করিতে সম্মত হন নাই। নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটীর উপর কার্য্যকরী সমিতি গঠনভার অর্পণ করিলে তাঁহারা যেরূপ ভাবে ঐ কমিটী গঠন করিয়া দিতেন, সুভাষবাবুর তাঁহাদের সহিত কাজ করা সম্ভবপর ছিল না। সুভাষবাবু বলিয়াছেন যে, উহা তাঁহার পক্ষে বেমানান হইবে (in which I shall be a misfit)। মহাত্মাজী সুভাষবাবুকে স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, আমি যদি কার্য্যকরী সমিতির সদস্যদিগের বলি তোমার উপর চাপাইয়া দেওয়া হইবে মাত্র (it would be an imposition on you)। ফলে সকল দিক দিয়াই "চালমাৎ" অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল। কার্য্যকরী সমিতির পুরাতন সদস্যদিগকে লইয়া পরামর্শ করিয়াও কোন পথের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। ফলে হয় সুভাষবাবুকে পদত্যাগ করিতে হয়,—অথবা তাঁহাকে গণতন্ত্রবাদের মূলনীতিই ছাড়িতে হয়, এইরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল। সুভাষবাবু মূলনীতি ত্যাগ করেন নাই,—তিনি পদত্যাগ করিয়াছেন। এই সম্মানজনক ত্যাগে তাঁহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠা স্বদেশানুরাগ সুপরিস্ফুট হইয়াছে। এই প্রসঙ্গের রহস্য-যবনিকা কিন্তু এখনও অপসারিত হয় নাই।

মহাত্মাজী বলিয়াছেন, কার্য্যকরী সমিতির সদস্যদিগের "নাম দিবার তিনি সম্পূর্ণ অযোগ্য।" কিন্তু "পন্থের প্রস্তাব কি গান্ধীজীকে জানাইয়া সম্মতি লইয়া রচিত—উপস্থাপিত হয় নাই? এই প্রস্তাব ত গান্ধীজীর অনুমোদনে রচিত—উপস্থাপিত বলিয়া ত্রিপুরীর অধিবেশন সময়েই সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। এমন কথাও শুনা গিয়াছিল যে, উহা হইতে একটি কথা বাদ দেওয়াও মহাত্মাজীর অভিপ্রেত নহে। সে কথা কি তবে মিথ্যা? যদি তাহা মিথ্যা হয়, কে সে গুজব রটাইয়াছিল? সেই সময় পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু কোন-যোগে মহাত্মাজীর মত জানিতে চাহিলে মহাত্মা এ প্রস্তাবের একটি কথাও বাদ দেওয়া হইবে না, উত্তর দিয়াছিলেন বলিয়াও সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। এ সকল সংবাদ জনরব কি গান্ধীজীর সম্পূর্ণ অজ্ঞাত? ব্যাপারটা অত্যন্ত জটিল—দুর্ব্বোধ্য।

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু পদত্যাগ-পত্র প্রদান করিবার পর নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটীর ১৬ই বৈশাখের অধিবেশনে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু পদত্যাগ-পত্র প্রত্যাহারের জন্য এক প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, সুভাষবাবুর সহিত অধিকাংশ সদস্যের মূলতঃ কোন মতভেদ নাই। কিন্তু সুভাষবাবু নীতিবর্জ্জনের বিনিময়ে রাষ্ট্রপতির পদ-গৌরবের অধিকারী থাকিতে সম্মত হন নাই। পণ্ডিত জওহরলাল নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটীর অনুমতিক্রমে তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাহার করিয়াছিলেন। এই ব্যাপারে সুভাষচন্দ্রের ধৈর্য্য, তিতিক্ষা, তাঁহার ন্যায় দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন নেতার পক্ষেই সম্ভব—শোভন।

নূতন সভাপতি নির্ব্বাচন

কংগ্রেসের বৈধভাবে নির্ব্বাচিত সভাপতিপদ ত্যাগ করিবার পরই নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটীর সাময়িক সভাপতি শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদকে কংগ্রেসের সভাপতি মনোনীত করেন। এই কার্য্যে যে কংগ্রেসের বিধিনিষেধ পদদলিত করা হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। কংগ্রেসের নির্ব্বাচিত সভাপতি পদ ত্যাগ করিলে বিভিন্ন স্থানের প্রতিনিধিরা নিজ নিজ প্রাদেশিক সমিতিতে টিকিট দ্বারা ভোট দিয়া পুনরায় সভাপতি নির্ব্বাচিত করিবেন, ইহাই সাধারণ নিয়ম; কিন্তু যদি সময়াভাবে বা অন্য কোন জরুরী কারণে (ballot) ব্যালট দ্বারা ভোট গ্রহণ করিয়া নূতন সভাপতি নির্ব্বাচন করা অসুবিধাজনক হয়, তাহা হইলেই নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটী সভাপতি নির্ব্বাচন করিতে পারেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বে পূর্ব্বনির্ব্বাচিত সভাপতির পদত্যাগ-পত্র যথারীতি গৃহীত হওয়া প্রয়োজন। এস্থলে তাহার কিছুই করা হয় নাই। কংগ্রেস কমিটীকে ঐ পদত্যাগ-পত্র গ্রহণের জন্য ভোট দিবার অবকাশ দেওয়া হয় নাই। নিখিল ভারতীয়

কংগ্রেস কমিটীর ১৬ই বৈশাখের অধিবেশনে পণ্ডিত নেহরুর প্রস্তাব প্রত্যাহৃত হইলে, সভানেত্রী শ্রীমতী সরোজিনী নাইড়ু, শ্রীযুত চৈতরাম গিডোয়ানীর প্রস্তাব অনুসারে বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদকে অবশিষ্ট কয়েক মাসের জন্য সভাপতি মনোনীত করেন। এ বিষয়ে ভোট লওয়াও হয় নাই। মিষ্টার নরীম্যান এইভাবে সভাপতি নিয়োগ করা অবৈধ বলিয়া প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন; শ্রীযুত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্রের সমর্থনের পরও এ প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। মিষ্টার এম, এন, এনি এবং শ্রীযুত মানবেন্দ্রনাথ রায় এই অনাচারের প্রতিবাদস্বরূপ সভা ত্যাগ করিয়াছিলেন। সুভাষবাবুর নিকট ঐ পদত্যাগ সম্বন্ধে পুনর্বিচার করিবার জন্য ফিরাইয়া পাঠানই সঙ্গত ও শোভন হইত, কিন্তু তাহাও করা হয় নাই। ইহাতে স্বতই মনে হয় যে, সুভাষবাবুর পদত্যাগ-পত্রপ্রাপ্তির জন্য গান্ধীপন্থীরা অতিমাত্রায় ব্যাকুল হইয়াছিলেন। ইহার ভিতর কি কোন গূঢ় রহস্য নিহিত আছে? সভার পরিচালিকা শ্রীমতী সরোজিনী নাইড়ুও স্বীকার করিয়াছিলেন যে, তিনি বে-আইনীভাবেই কার্য করিতেছেন।

সুভাষবাবুর উপর দোষারোপের প্রয়াস

একটা গভীর ষড়যন্ত্রের ফলে যে সুভাষবাবুকে পদত্যাগ করিতে হইয়াছে, ইহা বুঝিতে বোধ হয় আর কাহারও বাকী নাই। কিন্তু গরজ কি নাহি লাজ। গান্ধীর বশম্বদ দল নানা অনাচার করিয়া এখন আপনাদের সাধুতা দেখাইবার জন্য সুভাষবাবুর উপর সমস্ত দোষের পসরা চাপাইবার প্রয়াসে ব্যস্ত হইয়া বক্তৃতা করিতেছেন। গান্ধীজীর ব্রাহ্মণবংশাবতংস বৈবাহিক রাজাগোপাল আচারিয়া কলিকাতা হইতে মাদ্রাজে ফিরিয়া 'কংগ্রেস-ভবনে' যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহা সত্যাগ্রহীর সত্যনিষ্ঠার অপূর্ব্ব নিদর্শন! তিনি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের অবৈধ নির্ব্বাচনের কৈফিয়ৎ দিয়া বলিয়াছেন,—"আমরা একটি কূপ হইতে জল তুলিতে গিয়াছিলাম এবং এক জনের হাতে দড়ি ও কলসী দিয়া জল তুলিবার ভার দিয়াছিলাম। কিন্তু কলসী যখন জলের দিকে অর্দ্ধ-পথমাত্র অগ্রসর হইয়াছে, তখন সেই লোকটি হঠাৎ দড়ি ছাড়িয়া দিল। যদি আর এক জন তখনই দড়িটি ধরিয়া না ফেলিত, তাহা হইলে দড়িও যাইত, কলসীও যাইত—আমরাও জল পাইতাম না।" উপমায় কালিদাস-তুল্য গান্ধীজীর বৈবাহিক যাহা বলিয়াছেন, তাহা কি যথার্থ না কূপমণ্ডূক-ন্যায়? সুভাষবাবু কি সহসা দড়ি ছাড়িয়া দিয়াছেন, না ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছেন?

বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের ১৭ই বৈশাখের বিবৃতিতে সুপ্রকাশ—সুভাষবাবুর সহিত মহাত্মাজী এবং তাঁহার ভক্ত-দলের বিলক্ষণ মতবিরোধ বিদ্যমান। এরূপ অবস্থায় মহাত্মাজী কার্য্যকরী সমিতির সদস্যগণের নাম করিয়া তাহাদিগকে সুভাষবাবুর স্কন্ধে চাপাইয়া দিতে সম্মত হন নাই। সেইজন্য তিনি বসু মহাশয়কে স্বীয় মনের মত লোক লইয়া কমিটী গঠিত করিতে বলিয়াছিলেন, সুভাষবাবু তাহাতেও সম্মত হন নাই। পুরাতন সদস্য লইয়াও তিনি ওয়ার্কিং কমিটী গঠিত করিতে সম্মত হন নাই। তিনি দুই পথের কোন পথই ধরিতে চাহেন নাই। অতএব দোষ সুভাষবাবুরই, ইহাই রাজেন্দ্রবাবুর বিবৃতির গূঢ় অর্থ।

কিন্তু সুভাষবাবু সহসা পদত্যাগ করেন নাই, অনেক সহ্য করিয়া তবে পদত্যাগ করিয়াছেন, ইহা বিদিত ভুবনে।

কংগ্রেসে প্রগতিশীল দল

গান্ধীভক্তদিগের বিরুদ্ধ-ব্যবহারেও সুভাষচন্দ্র বিশেষভাবে মর্ম্মাহত হন নাই। অনন্যসাধারণ স্বদেশপ্রেমই তাঁহার রক্ষাকবচ, তিনি অভিমানভরে কংগ্রেস ত্যাগ করেন নাই। তিনি কংগ্রেসে থাকিয়াই দেশসেবায় ব্রতী থাকিবেন এবং প্রগতিশীল লোকদিগকে লইয়া একটি স্বতন্ত্র অগ্রগামী দল সংগঠন করিবেন। তাঁহার গুরু গান্ধীজীর প্রতি আস্থা ও সম্ভ্রম-বুদ্ধি হারান নাই; বরং বলিয়াছেন, "নূতন দল গান্ধীজীর ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে প্রবল শ্রদ্ধা ও সম্মান-বুদ্ধি পোষণ করিবে এবং রাজনীতিক ব্যাপারে যে অহিংস অসহযোগনীতি গান্ধীজী জাতিকে দান করিয়াছেন, তাহাতে অবিচলিত থাকিবে।" তাঁহার গুরুভক্তি যে এতখানি ব্যাপারের পরও অবিচলিত, ইহা তাঁহার স্বদেশ-প্রেমের প্রকৃত পরিচয়। মহাত্মাজী ভারতবাসীর উপকার করিয়াছেন, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন; তাই তিনি গান্ধীজীর প্রতি ব্যক্তিগতভাবে শ্রদ্ধা-বুদ্ধি এবং সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিতে বলিয়াছেন। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি যে সকলকে

মহাত্মাজীর মতের অন্ধভাবে সমর্থন এবং অনুসরণ করিতে বলিয়াছেন, ইহা কোনমতেই মনে করা উচিত নহে। তিনি স্বয়ং তাহা করেন নাই। স্বয়ং গান্ধীজীও বলিয়াছেন যে, তাঁহার সহিত সুভাষবাবুর মতের মূলগত বিরোধ বিদ্যমান। সুভাষবাবুকে মহাত্মাজী যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে সে কথা স্পষ্টই বলা আছে। সুতরাং সুভাষবাবু যে অবিচারিত-ভাবে গান্ধীজীর মতকে মানিয়া লইতে বলিয়াছেন, ইহা আমরা মনে করিতে পারি না। দ্বিতীয়তঃ, তিনি রাজ-নীতি-ক্ষেত্রে গান্ধীজীর প্রবর্ত্ত অহিংসনীতিতে সকলকে অবিচলিত থাকিতে বলিয়াছেন। অহিংস অসহযোগনীতি কিন্তু গান্ধীজীর প্রবর্ত্তিত নহে। উহা অতি প্রাচীন কালেই ভারতে উদ্ভাবিত ও বিকশিত হইয়াছিল। ইংরেজশাসন-কালেই বাঙ্গালার কৃষীবল দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ নীলকরদিগের বিরুদ্ধে এই অহিংস অসহযোগনীতির বিনিয়োগ করিয়া জয়লাভের পথে অগ্রসর হইয়াছিল। ফুলারী-শাসনকালে যখন বরিশাল কনফারেন্স ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়, তখন এই বাঙ্গালার যুবকরা পুলিসের লাঠি খাইয়াও অহিংসার পথে অবিচলিত ছিলেন। সুতরাং রাজনীতি-ক্ষেত্রে এই অহিংসনীতি যে গান্ধীজীর দান, ইহা অসঙ্কোচে স্বীকার করা যায় কি? সুভাষবাবু গণ-তন্ত্রের মূলসূত্র ভালরূপ বুঝেন। গণ-তন্ত্রে গুরুবাদের বা কর্তাভজানীতির স্থান নাই। কতকগুলি উদ্ভিদ (যেমন নারিকেল গাছ) যেমন ভিতর হইতে বৃদ্ধি পায়, উহার ঊর্দ্ধদিকে যেমন শাখা ও পত্র বাহির হইয়া উহাকে বৃদ্ধি করে, আর তাহার পরই উহার নিম্নের শাখা সকল ঝরিয়া পড়িয়া যায়, সেইরূপ গণ-তান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান যেমন প্রগতির পথে প্রধাবিত হইতে থাকে, তেমনই নূতন নূতন নেতা আসিয়া ঐ প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন, পুরাতন নেতাদের বিদায় লইবার সময় আসে। এই জন্য আমরা গান্ধী-ভক্তিকে এই নূতন দলের creed করিবার প্রস্তাবের সমর্থন করি না। যাহা হউক, এই দল কেবল নূতন হইয়াছে। পঞ্জাব, মাদ্রাজের বহু নেতা ইহার সমর্থন করিয়াছেন। কংগ্রেসের এই প্রকার বৃদ্ধির ফলে পূর্ব্বে চরমপন্থী, স্বরাজপন্থী প্রভৃতির আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছে। এখন এই দল অহিংসার পথে অবিচলিত থাকিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হউন, ইহাই আমরা কামনা করি। এখন ইহা নূতন। ইহার সম্বন্ধে সকল কথা না জানিলে আমরা আর কিছু বলাই সমীচীন মনে করি না।

সার এন্ এন্ সরকারের অবসর গ্রহণ

ভারতসরকারের আইন-সচিব সার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার ২১শে বৈশাখ সরকারী-কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ

সার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার

করিয়াছেন। আইন-বিশারদ হাইকোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যারিষ্টার—নৃপেন্দ্রনাথ গত পাঁচ বৎসর ভারত সরকারের আইন-সচিবের কার্য্যে যে প্রজ্ঞা ও প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অনন্যসাধারণ। প্রধানতঃ তাঁহারই প্রচেষ্টায় মন্দির-প্রবেশাধিকার বিল বিধিবদ্ধ না হওয়ায় উচ্চবর্ণের হিন্দুর ধর্ম্মসাধনার অধিকার সংরক্ষিত হইয়াছে—এজন্য তিনি স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দুসমাজের প্রীতি,—শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। বীমা আইন, কোম্পানী আইন সংগঠন তাঁহার অন্যতম কীর্ত্তি। ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে তাঁহার রসিকতাস্নিগ্ধ তর্কযুক্তিনৈপুণ্য প্রতিপক্ষেরও প্রসংশালাভ করিত। তাঁহার অবসর-গ্রহণে ধর্ম্মপ্রাণ

হিন্দুসমাজের যে বিশেষ ক্ষতি হইল, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। তিনি বিলাতে মহাত্মা গান্ধীর পুণা-প্যাক্টের ফলস্বরূপ সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের যে তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, বাঙ্গালী কৃতজ্ঞহৃদয়ে তাহা চিরদিন স্মরণ করিবে। সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ প্রভাবে বাঙ্গালার হিন্দুর অবস্থা শোচনীয়। প্রতিভার বরপুত্র সার নৃপেন্দ্রনাথ কর্ম্মসাধনায় যথেষ্ট সম্পত্তি ও প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন। জীবন-সাধনায় বিজয়-গৌরব লাভের পর তিনি কি বাঙ্গালার এই দুর্দ্দিনে বিপন্ন বাঙ্গালী জাতিকে জীবনসংগ্রামে জয়ী করিবার জন্য নেতৃত্বভার সাদরে গ্রহণ করিবেন না?

বাঙ্গালায় নারী-নিগ্রহ

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় রায় শ্রীযুত হরেন্দ্রনাথ চৌধুরীর প্রশ্নের উত্তরে—বাঙ্গালার স্বরাষ্ট্র-সচিব সার নাজিমুদ্দীন গত পাঁচ বৎসরে বাঙ্গালায় নারী-নিগ্রহের যে তালিকা দিয়াছেন, তাহা ভয়াবহ—মর্ম্মন্তুদ।

	ধর্ষিতা নারীর সংখ্যা			আসামী		
খৃষ্টাব্দ	হিন্দু	মুসলমান	মোট	হিন্দু	মুসলমান	মোট
১৯৩৪	৩১৪	৫০৫	৮১৯	৪৭৭	১০২৬	১৫০৩
১৯৩৫	৩৭৫	৪৪০	৮১৫	৪৩৯	৯৩৬	১৩৭৫
১৯৩৬	৪২৮	৪২৫	৮৫৩	৫২৭	৯০৭	১৪৩৪
১৯৩৭	৩৯৩	৪৮৫	৮৭৮	৫১২	৯৫৩	১৪৬৫
১৯৩৮	৪৮২	৫১৫	৯৯৭	৫৬৫	১২৭৮	১৮৪৩
মোট	২২৭২	২২৯০	৪৫৬২	২৫২০	৫১০০	৭৬২০

বঙ্গীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের (তথা পুলিস বিভাগের) মন্ত্রীর প্রদত্ত তালিকা হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, এই জঘন্য অপরাধের সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। কিন্তু এই পৈশাচিক অপরাধের অনেক ঘটনার সংবাদই গোপন রাখিতে হয়। হিন্দুর মধ্যে অনেকে ইজ্জৎনাশের ভয়ে এই অত্যাচারের কথা প্রকাশ করে না। কারণ, পল্লী অঞ্চলে এইরূপ ধর্ষিতা নারী ঘরে লওয়া, জাতিনাশের আশঙ্কায়, হিন্দু গৃহস্থের পক্ষে সম্ভবপর নহে। সাধারণতঃ নিম্ন-শ্রেণীর এবং অশিক্ষিত হিন্দু-সম্প্রদায়ভুক্ত নারীর উপর এইরূপ অত্যাচার অধিক হইয়া থাকে। অনেক সময় এরূপ অভিযোগও শুনিতে পাওয়া যায়, অত্যাচারপীড়িত নারীর পক্ষ হইতে কেহ থানায় সংবাদ দিতে গেলে কখন কখন কতকগুলি পুলিশ কর্ম্মচারী সে সম্বন্ধে যথাযথ তদন্ত করিতে চাহে না। ইহা কতদূর সত্য, বিশেষ সন্ধান লওয়া উচিত। অনেকে দুর্ব্বৃত্তদিগের ভয়েও থানায় সংবাদ দিতে চাহেন না। কাজেই এই শ্রেণীর অপরাধ যত ঘটে, তত প্রকাশ পায় না।

বদমায়েস পশুধর্ম্ম লোক সকল সমাজেই আছে। ইহাদিগকে কঠোর শাস্তির দ্বারা সংযত না করিলে ইহারা প্রশ্রয় পায়। ফলে সমাজে এই পাপ বাড়িয়া যায়। সার নাজিমুদ্দীনের প্রদত্ত হিসাব দেখিলেই বুঝা যায়, ধর্ষিতা নারীদিগের মধ্যে হিন্দু-নারী অপেক্ষা মুসলমান নারীর সংখ্যা কিছু অধিক। কিন্তু আসামীদিগের মধ্যে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা অনেক অধিক,—দ্বিগুণেরও অধিক। তাহা হইলেও হিন্দু সমাজেও এত পশুধর্ম্ম জীব আছে,—ইহা ভাবিয়া আমরা বিস্মিত। বাঙ্গালার হিন্দু এবং মুসলমান সমাজে বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষের সংখ্যা প্রায় সমান, মুসলমান পুরুষের সংখ্যা কিছু অধিক। কিন্তু এই শ্রেণীর নরপশুর সংখ্যা মুসলমান সমাজে হিন্দু সমাজের দ্বিগুণ। আমরা এই প্রকার দুর্ব্বৃত্তদিগকে বিশেষরূপে সংযত করিবার জন্য মুসলমান সমাজের নেতৃগণকে অনুরোধ করি। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দ শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তনের দ্বিতীয় বৎসর, এই বৎসরে বাঙ্গালায় এই শ্রেণীর অপরাধী দাঁড়াইয়াছে সংখ্যায় ১৮৪৩ জন আর তাহাদের মধ্যে কেবল ২৭৩ জন আসামীমাত্র দণ্ড পাইয়াছে। এত অধিক নারী-নির্য্যাতন ইতিপূর্ব্বে ঘটে নাই, এত অধিক লোকও অভিযুক্ত হয় নাই, এবং আসামীদের মধ্যে এত অল্পসংখ্যক দুর্ব্বৃত্তও ইহার পূর্ব্বে দণ্ড পায় নাই। আসামী-দিগের আনুপাতিক হারেও হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান অনেক অধিক। ইহার কারণ কি? এ বিষয়ে মন্ত্রিমণ্ডলীর বিশেষ-ভাবে অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য নহে কি? অবশ্য এই লজ্জা-জনক ব্যাপারের জন্য যদি তাঁহারা যথার্থ দুঃখিত হন, তাহা হইলেই তাঁহারা তাহা করিবেন। যে অঞ্চলে মুসলমানের সংখ্যা অধিক, সে অঞ্চলে হিন্দুনারী ধর্ষিতা হইলে হিন্দুরা গুণ্ডামির ভয়ে সে কথা প্রকাশ করিতে সাহস করে না। সুতরাং প্রকাশিত ধর্ষণ-সংবাদের সংখ্যা দেখিয়া উহার ব্যাপকতা অনুমান করা যায় না। অনেক অপহৃতা নারীর আর সন্ধান পাওয়া যায় না বা মৃতদেহ পাওয়া যায়। ফলে এই শ্রেণীর অপরাধে আসামীদিগকে কঠোর শাস্তি না দিলে

এই উপদ্রবের উপশান্তি হইবে না। পুরুষদিগের প্রাণপণে নারী-ধর্ষকদিগকে বাধা দেওয়া কর্ত্তব্য। নারীদিগেরও আত্মরক্ষা করিবার উপায় শিক্ষা করা অত্যাবশ্যক।

কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন

মিষ্টার ফজলুল হকের সচিবসঙ্ঘের কুকীর্ত্তি-সৌধের আর একটি চূড়া রচিত হইয়াছে। সমগ্র সৌধ ধূলিসাৎ হইবার অপেক্ষা করিতেছে। ঔরঙ্গজেব যেমন বারাণসীতে—হিন্দু-ভারতের রাজধানীতে বিশ্বনাথ-মন্দির অপবিত্র করিয়া সেই স্থানে মসজেদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, এই সচিবসঙ্ঘ তেমনই দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলিকাতা কর্পোরেশনে প্রকৃত স্বায়ত্ত-শাসনাত্মক ব্যবস্থা নষ্ট করিয়া গত ১১শে বৈশাখ তাহার স্থানে এই নিন্দিত ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। সুরেন্দ্রনাথ সাম্প্রদায়িকতার উচ্ছেদ-সাধনকল্পে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কর্পোরেশনে ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দ হইতে যৌথ নির্ব্বাচকমণ্ডলীই থাকিবে। সেই সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত এই ব্যবস্থায় যে সকল মুসলমান কাউন্সিলার নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে বর্ত্তমান প্রধান সচিবও এক জন। নূতন আইনে স্বতন্ত্র নির্ব্বাচক-মণ্ডলীর ব্যবস্থা করিয়া নাগরিক প্রতিষ্ঠান সাম্প্রদায়িকতায় বিষদুষ্ট করা হইবে। এই আইন হিন্দুদিগকে আক্রমণ কর্পোরেশন উপলক্ষমাত্র যে ভাবে কাউন্সিলার-সংখ্যা নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহাতেই ইহা সুপ্রকাশ। সচিবসঙ্ঘ যে সব বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন, সেই সকলেই দেখা যায়—কলিকাতায় মুসলমান-নির্ব্বাচকের সংখ্যা ২,৮০,৮৮৭ অর্থাৎ লোকসংখ্যার শতকরা ২৫ জনও নহে। অথচ মুসলমানদিগকে ২১ জনের সঙ্গে ১ জন "ফাউ" দিয়া ২২ জন কাউন্সিলার নির্ব্বাচনের অধিকার প্রদান করা হইবে। আর সাধারণ নির্ব্বাচনকেন্দ্রে লোকসংখ্যা ৮,৯০,০০০—শতকরা ৭৩ জনেরও অধিক। সুতরাং ৮৯ জন নির্ব্বাচিত কাউন্সিলারের মধ্যে ৬২ জন এই কেন্দ্র হইতে নির্ব্বাচিত হওয়া সঙ্গত। অথচ এই কেন্দ্র হইতে মোট মাত্র ৪৬ জন নির্ব্বাচিত করা হইবে। অর্থাৎ ১৬ জন কাউন্সিলার কম করা হইবে। আবার সরকারের দ্বিতীয় বিবৃতি অনুসারে ১২ ও ২ জন কাউন্সিলার বিশেষ কেন্দ্র হইতে নির্ব্বাচিত করিলে অবশিষ্ট সংখ্যার মধ্যে ১৮ জন মাত্র মুসলমানদিগের প্রাপ্য। অথচ অকারণে মুসলমানদিগকে অতিরিক্ত ৪ জন কাউন্সিলার নির্ব্বাচিত করিতে দিয়া ঐ সংখ্যা ২২ করা হইতেছে। এই হিসাবে সাধারণ কেন্দ্র হইতে ৫১ জন কাউন্সিলার নির্ব্বাচিত হইবার কথা, অথচ উহা হ্রাস করিয়া ৪৬ করা হইয়াছে।

জনসংখ্যার পর কোন সম্প্রদায় হইতে করের কত ভাগ আদায় হয়, তাহা বিবেচ্য। কলিকাতা কর্পোরেশন কর্ত্তৃক যে কর আদায় হয়, তাহার শতকরা ৫ ভাগ মাত্র মুসলমানরা দিয়া থাকেন। রেলওয়ে, পোর্ট-ট্রাষ্ট, ও ইমপ্রুভমেণ্ট-ট্রাষ্ট বাদ দিলে য়ুরোপীয়, ফিরিঙ্গী ও ইহুদীরা ১২ ভাগের সামান্য অধিক, এবং হিন্দুরাই উহার শতকরা ৮০ ভাগ দিয়া থাকেন। ইহাতেই নূতন ব্যবস্থা যে অসঙ্গত, একদেশদর্শী ও অন্যায়, তাহা বুঝিতে আর বিলম্ব হয় না। মনোনয়ন প্রথাও ত্যাগ হয় নাই।

সচিবসঙ্ঘ নিরপেক্ষতার নামে এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। বাঙ্গালার হিন্দুরা যে ইতঃপূর্ব্বে স্বায়ত্ত-শাসন-নীতির বিরোধী মিউনিসিপ্যাল আইনের ধ্বংস-সাধন করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। ইতিহাসে অনেক সময় দেখা যায়, পুরাতনের পুনরাগমন হয়। আমরা আশা করি, এ বারও তাহাই হইবে। শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু ব্যবস্থা পরিষদে এই আশা প্রকাশ করিয়াছেন। আর শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলিয়াছেন, যে ক্ষমতা হস্তগত হওয়ায় আজ বর্ত্তমান সচিবসঙ্ঘ এইরূপ ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছেন, সে কেবল হিন্দুরা, বিশেষ বাঙ্গালার হিন্দুরা, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সহিত সংগ্রাম করিয়া জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকল ভারতবাসীর জন্য অর্জ্জন করিয়াছেন—যাহারা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সহিত সংগ্রাম করিয়া জয়ী হইয়াছেন, তাঁহারা বাঙ্গালার বর্ত্তমান সচিবসঙ্ঘের পুত্তলিকার মত সচিবদিগের সহিত সংগ্রাম করিতে দ্বিধা করিবেন না। যাহা অসঙ্গত ও অন্যায়, তাহা কখন স্থায়ী হইতে পারে না।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত
কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী' রোটারী মেসিনে শ্রীশশিভূষণ দত্ত মুদ্রিত ও প্রকাশিত

১৮-শ বর্ষ] জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৬ [২য় সংখ্যা

গীতা-বিচার

১২

এবার (চ) অনুপ্রশ্নের অর্থাৎ ষষ্ঠ অনুপ্রশ্নের বিচার, 'কর্ম্ম ও ধর্ম্মে ভেদ আছে কি না?' ইহাই (চ) অনুপ্রশ্ন। সাধারণতঃ প্রচলিত কর্ম্ম ও ধর্ম্মে ভেদ প্রসিদ্ধ। এ বিষয় বিচারের প্রয়োজন হয় না—যথা পুণ্য কর্ম্ম ও পাপ কর্ম্ম, পুণ্য কর্ম্মের নামান্তর ধর্ম্ম, পাপ কর্ম্মের নামান্তর অধর্ম্ম—সুতরাং কর্ম্ম দ্বিবিধ—ধর্ম্ম তাহার অন্তর্গত,—একটি ব্যাপক ও অপরটি ব্যাপ্য, অতএব কর্ম্ম ও ধর্ম্মের ভেদ সুস্পষ্ট, ইহার আবার বিচার কেন?

বিচারের প্রয়োজন আছে। গীতায় আছে—

'যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ। কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।'

(৩য় ১৪, ১৫)

জৈমিনীর ধর্ম্মমীমাংসা-দর্শনে আছে—

চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্ম্মঃ। (১।১।২)

গীতার কথিত 'কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি'—এই ব্রহ্ম শব্দের অর্থ বেদ—বেদ হইতে কর্ম্মের উৎপত্তি,—জৈমিনীয় ধর্ম্মমীমাংসা-দর্শনে বলিলেন, বেদবিধি হইতে যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা ধর্ম্ম। অতএব গীতা যে কর্ম্মের কথা বলিলেন, তাহাই ধর্ম্মমীমাংসা-দর্শনোক্ত ধর্ম্ম, ইহা জানা যায়। গীতার অন্যত্র (৪ অঃ ১৭) দেখা যায়,—কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম—এই ত্রিবিধ নির্দ্দেশ,—পাপ কর্ম্ম বিকর্ম্মেরই অন্তর্গত, কর্ম্মের অন্তর্গত নহে,—অতএব গীতোক্ত কর্ম্ম ধর্ম্মের নামান্তর—ইহা মনে হইতে পারে। পক্ষান্তরে গীতাতেই (৩।৮ শ্লোকে) কথিত হইয়াছে—'শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ।' কর্ম্ম না করিলে, শরীররক্ষাও হয় না। এস্থলে কর্ম্ম ও ধর্ম্ম যে এক নহে, তাহা জ্ঞাত হওয়া যায়—শরীররক্ষার্থ যে যে কর্ম্ম করিতে হয়, তৎসমস্তই যে বেদ-বিহিত, ইহা বলা যায় না। ত্রিবিধ কর্ম্ম সাধারণতঃ প্রচলিত, দ্বিবিধ নহে,—(১) বেদবিধিবোধিত, (২) বেদনিষিদ্ধ, (৩) যাহা বেদে বিহিতও নহে, নিষিদ্ধও নহে। প্রথমোক্ত কর্ম্ম ধর্ম্ম, দ্বিতীয় পাপ, তৃতীয় ধর্ম্মও নহে, পাপও নহে—যেমন প্রাতঃ সায়ং ভ্রমণ, চিকিৎসার্থ বৈদ্য আহ্বান, ঔষধ সেবন, ধনার্জ্জনার্থ মন্ত্রণা ইত্যাদি লৌকিক কর্ম্ম অনেক আছে। এই সমস্ত লৌকিক কর্ম্ম না করিলে শরীররক্ষা হয় না। অতএব এস্থলে গীতায় শাস্ত্রের কর্ম্মশব্দের ব্যাপক অর্থই গৃহীত হইয়াছে—ধর্ম্মই কেবল কর্ম্ম নহে—কর্ম্ম ও ধর্ম্মে ভেদ আছে, ইহা বলিতে হয়।

অতএব কর্ম্ম বিষয়ে গীতার সিদ্ধান্ত কি? সকল ধর্ম্মই কর্ম্ম অথবা অন্যবিধ কর্ম্মও কর্ত্তব্যরূপে গীতায় স্বীকৃত? ইহাই বিচার্য্য।

গীতাসিদ্ধান্তে কর্ম্ম ও ধর্ম্ম এক নহে।— বরং মীমাংসা-দর্শনসম্মত বহু ধর্ম্মই গীতামতে অকর্ম্ম অর্থাৎ সেই ধর্ম্মাচরণ—নৈষ্কর্ম্ম্যমধ্যে গণ্য। কেবল ধর্ম্ম নহে—যে কোন কর্ম্ম যাহার দৃষ্টিতে অকর্ম্ম, —তাহাকে প্রকৃত কর্ম্মী বলা যায়।

কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।

স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষ স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ ॥ ৪।১৮।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে,—যাহা অকর্ম্ম বলিয়া ঘোষিত, তাহার আচরণ নৈষ্কর্ম্ম্য বলিয়া গণ্য হয় হউক—সেই নিষ্কর্ম্মাকে প্রকৃত কর্ম্মী বা সকল কর্ম্মকর্ত্তা বলা হইল কিরূপে?

এ জিজ্ঞাসার উত্তর ঐ শ্লোকমধ্যেই নিহিত আছে। কর্ম্মে অকর্ম্ম দৃষ্টির অর্থ—আমি কর্ত্তা নহি এই উপলব্ধি আর 'অকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ' যাহা অকর্ম্ম—কর্ম্ম না করিয়া কর্ম্ম-ক্লেশ পরিহারের জন্য তূষ্ণীম্ভাবে যে বসিয়া থাকা, তাহাকেই কর্ম্মবোধে ত্যাগ করা যাহার ঘটিয়াছে, মনুষ্যগণমধ্যে সে-ই বুদ্ধিমান, সে-ই যোগী এবং সে-ই সর্ব্বকর্ম্মকর্ত্তা, এরূপ প্রশংসা উক্ত শ্লোকে আছে। আমি কর্ত্তা নহি, এই উপলব্ধি এবং কর্ম্মক্লেশ না হওয়ায় আমি সুখী, এই মনোভাবের নিবৃত্তি কাহার হয়?—না—যে কর্ম্মযোগী, তাহার। যে ব্যক্তি দেহকে আত্মা বলিয়া মনে করে,—কর্ম্মজনিত ক্লেশ-বোধ তাহার হইতে পারে, কিন্তু সেই কর্ম্মজনিত ক্লেশ অপেক্ষা অধিক সুখ বা অধিকতর দুঃখের নিবৃত্তি আশা করিয়া দেহাত্মবাদী হইলেও—সে ব্যক্তি কর্ম্ম করে, চুপ করিয়া থাকে না এবং চুপ করিয়া থাকাকে কর্ম্মও বলে না, —তবে আয়াসী দেহাত্মবাদী কর্ম্ম করিতে চাহে না,—আর, সকল দেহাত্মবাদীই পরকালের সুখের জন্য বৈধকর্ম্ম করিতে চাহে না। কর্ম্ম না করাতেই সুখ বোধ করে,—কিন্তু আত্মদর্শী ঐরূপ অকর্ম্মকে —(চুপ করিয়া থাকাকেই) কর্ম্ম অর্থাৎ বন্ধনহেতু মনে করেন,—তিনি স্বয়ং এরূপ অকর্ম্মা হইতে পারেন না, অন্যকে ঐরূপ হইতে দেখিলে তিনি বুঝেন,—এই ব্যক্তি আত্মতত্ত্বজ্ঞ নহে,—সেই কারণে দেহক্লেশকে আত্মক্লেশ মনে করিয়া কর্ম্ম করে না, তাহাতেই আপনাকে সুখী মনে করে। যিনি আত্মতত্ত্বজ্ঞ দৈহিক ক্লেশকে তিনি আত্মক্লেশ মনে করেন না, দেহক্লেশ হেতু কর্ম্ম না করায় তিনি আত্ম-সুখও মনে করেন না, —এইরূপ আত্মতত্ত্বজ্ঞ বা আত্মদর্শীই কর্ম্মকে অকর্ম্ম ও অকর্ম্মকে কর্ম্ম দেখিবার অধিকারী,—এই-রূপ অধিকারীর অনাসক্তভাবে বৈধকর্ম্মাচরণ—নৈষ্কর্ম্ম্য-মধ্যে গণ্য, সর্ব্ব-সৎকর্ম্মানুষ্ঠাতার যে ফল, সেই ফললাভ প্রাগুক্ত ব্যক্তির হইয়া থাকে। ইহা উক্ত বচনের ভাবার্থ।

এস্থানে আপত্তি।

১। চিদচিদ্‌ব্রহ্মবাদে অর্থাৎ যাহা গীতা-বিচার প্রবন্ধে গীতাসিদ্ধান্ত বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে, সেই মতে —আত্মার কর্তৃত্ব নাই—আত্মার কোন কর্ম্ম নাই,—এই সব কথা মোটেই সঙ্গত হয় না, চিন্মাত্রই আত্মা, এই মতেই উহা সঙ্গত হইতে পারে।

২। 'কর্ম্মণি—অকর্ম্ম' এবং 'অকর্ম্মণি কর্ম্ম' এই সংস্কৃতের ভাষা অনুসরণ করিলে—পূর্ব্বোক্ত অর্থ হইতে পারে না, কারণ—কর্ম্মণি এবং অকর্ম্মণি দুইটি পদে সপ্তমী বিভক্তি, তাহার অর্থ—অধিকরণ, যেমন 'গৃহে শয্যাদর্শন' বলিলে গৃহকে শয্যা-স্বরূপে দেখা বুঝায় না, সেইরূপ কর্ম্মে অকর্ম্ম-দর্শন—কর্ম্মকে অকর্ম্ম বা কর্ম্মের অভাব-স্বরূপে দর্শন বুঝায় না, অকর্ম্মকেও কর্ম্মস্বরূপে দর্শন বুঝায় না।

এই দুই আপত্তির উত্তর।

১। চিদচিদ্ ব্রহ্মবাদে—দেহ দ্বারা বিভক্ত বিভিন্নরূপ আত্মদর্শন—আমি অমুক ইত্যাদি জ্ঞানই মোহ, তাহা আত্মদর্শীর থাকে না,—আত্মদর্শী আপনার স্বরূপ অনুভব করে বিশ্বব্যাপক—এক দেহ দ্বারা বিভক্ত নহে। সেই আত্মাই ব্রহ্ম। চিদচিদ্ এই উভয়কে আশ্রয় করিয়া কোন কর্ম্মই থাকে। না, চিৎ—জ্ঞানস্বরূপ, অচিৎ—প্রকৃতি—সত্ত্ব রজঃ তমো গুণের সমভাবাপন্ন অবস্থা, চিৎস্বরূপে কর্ম্ম নাই, অচিৎস্বরূপে আছে—এইরূপ হইলে উভয়স্বরূপে কর্ম্ম থাকিতে পারে না। মনে করা যাক্, পুষ্পে গন্ধ আছে—আলোকে তাহা নাই—ইহা হইলেও যদি বলা যায়—পুষ্প ও আলোক উভয়েই গন্ধ আছে, তাহা কি ভুল নহে? সেইরূপ কেবল অচিৎ প্রকৃতিতে কর্ম্ম থাকিলেও চিৎ-জ্ঞানস্বরূপে কর্ম্ম না থাকায় চিদচিদুভয়ে কর্ম্ম নাই,—সেই জন্যই যথার্থ আমি যে চিদচিদ্ ব্রহ্ম তিনি কর্ত্তা নহেন,—কর্ম্মমাত্রই তাঁহার

অকর্ম্ম—তিনি কিছুই করেন না এই জ্ঞান যথার্থ আত্মদর্শীর হইতে পারে। সেইরূপ জ্ঞানীই 'কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ'—কর্ম্মবাদীর সমস্ত বৈধকর্ম্মে যে ফল কথিত হয়, সেইরূপ জ্ঞানীর তৎ-সমস্ত ফলই লাভ হইয়া থাকে।

গীতার আর একটি শ্লোকে আছে,

সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।

অতএব চিদচিদ্ ব্রহ্মবাদে যে প্রথম আপত্তি প্রদর্শিত হইয়াছিল, ইহা তাহারই উত্তর।

১। সংস্কৃত ভাষার অনুসরণ করিলেই ঐরূপ অর্থ হইবার পক্ষে বাধা নাই—'কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ' এবং 'অকর্ম্মণি চ কর্ম্ম' এরূপ প্রয়োগ বিষয়সপ্তমী স্থলেও হয়, যথা—মরীচিকায়ামুদকং পশ্যতি' মরীচিকায় জল দেখিতেছে—এস্থলে সপ্তমী অধিকরণে নহে—কারণ, মরীচিকা জলের অধিকরণ হইতে পারে না। প্রভেদ এই—'মরীচিকায়ামুদকং পশ্যতি' ইহা ভ্রান্তের দর্শনবোধক, আর 'কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ,' ইহা অভ্রান্তের দর্শনবোধক। ইহার অনুরূপ উদাহরণ—রেল-গাড়ীতে যাইবার সময়ে দেখা যায়, সম্মুখ ও পার্শ্বস্থ ভূমি যেন চলিতেছে, সেই ভ্রমমণ্ডিত গমনে অগমন, নিশ্চয়-স্থলে 'তথাবিধ ভূমিগমনে গমনাভাবঃ নিশ্চিনোতি'—গমনকে গমনাভাব স্বরূপে নিশ্চয় করিতেছে—এইরূপ প্রয়োগ ভাষা হিসাবে অসঙ্গত নহে। সেইরূপ যাহাকে ভ্রমবশতঃ আমার কর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহা আমার কর্ম্ম নহে এইরূপ দর্শনকে 'কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ' এই অংশ দ্বারা বুঝান হইয়াছে, কর্ম্মে অশক্ত বৃদ্ধের মনে মনে ফন্দী আঁটাই 'অকর্ম্মণি কর্ম্ম'—ঐরূপ দর্শনই অকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ ইহার অর্থ সপ্তমী অধিকরণে নহে, বিষয়সপ্তমী। অতএব দ্বিতীয় আপত্তিও অকিঞ্চিৎকর। এই 'কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ' ইত্যাদি শ্লোকের যে ব্যাখ্যা উপরে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা শঙ্কর মতানুসরণে, ইহাতেই কর্ম্মশব্দের ব্যাপক অর্থ অবলম্বিত, কিন্তু এস্থলে নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা আশ্রয় করিলে প্রথম ও তৃতীয় কর্ম্ম শব্দের অর্থ যজ্ঞই হইতে পারে বটে,—কিন্তু দ্বিতীয় ও চতুর্থ কর্ম্মশব্দের অর্থান্তর করিতেই হয়; অতএব কিন্তু সেই সব কর্ম্ম কর্ত্তব্য কি না, এই বিষয়ে এখনও গীতা-সিদ্ধান্ত প্রদর্শিত হয় নাই। 'কর্ম্মণ্যকর্ম্ম' ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যান্তর প্রদর্শিত হইতেছে,—'কর্ম্মণি যজ্ঞকর্ম্মণি যঃ অকর্ম্ম কর্ম্মাভেদং পশ্যেৎ' অকর্ম্মণি যজ্ঞত্যাগে যঃ কর্ম্ম পশ্যেৎ স মনুষ্যেষু বুদ্ধিমান—ইত্যাদি।

অর্থাৎ কর্ম্মকে (বেদবিহিত যজ্ঞকে) অকর্ম্ম দৃষ্টিতে যিনি দেখিতে পারেন, এবং সেই যজ্ঞত্যাগস্বরূপ কর্ম্ম-নিবৃত্তিকে যিনি কর্ম্মদৃষ্টিতে দেখেন, তিনি মনুষ্যমধ্যে বুদ্ধিমান্ ইত্যাদি। এই অনুবাদও সহজবোধ্য নহে,—ইহা বুঝিতে হইলে—গীতার তৃতীয়াধ্যায়স্থ নবম শ্লোক বিশেষ ভাবে অনুশীলনীয়। যথা—

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥

যজ্ঞার্থ কর্ম্ম ব্যতীত আর যে কিছু কর্ম্ম আছে, তদ্দ্বারা জীব সংসারবন্ধনে বদ্ধ হয়। অতএব কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করিয়া যজ্ঞার্থ কর্ম্ম কর। (বন্ধন ভয় নাই), 'যজ্ঞার্থ কর্ম্ম' শব্দের অর্থ ঈশ্বরারাধনা ইহা শাঙ্করভাষ্যের বিষ্ণু আরাধনা ইহা শ্রীধরস্বামী টীকার সম্মত। মূল গীতায় পরবর্ত্তী তিনটি শ্লোক দেখিলে মনে হয়—যজ্ঞার্থ কর্ম্ম যজ্ঞানুষ্ঠান। সে কথা পরে হইবে। এখন এই শ্লোকের সহিত মিলাইলে 'কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ অকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।' এই অংশের তাৎপর্য্য এইরূপ হয় যে, যজ্ঞকর্ম্ম অকর্ম্ম—অর্থাৎ সংসার-বন্ধনের হেতু নহে। আর অকর্ম্ম (যজ্ঞ ত্যাগ) কর্ম্ম অর্থাৎ সংসারবন্ধনের হেতু ইহা যিনি দেখিতে পান, তিনি মনুষ্য-মধ্যে বুদ্ধিমান্।

মানবের পারলৌকিক মঙ্গলার্থ তিনটি যোগ বা মার্গ শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট,—* কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি। জ্ঞানযোগের অনুরক্ত-গণ কর্ম্মের নিন্দা করিয়া থাকেন,—তাঁহাদিগের মূল প্রমাণ 'কর্ম্মণা মৃত্যুমৃষয়ো নিষেদুঃ' 'ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন, ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ।' ইত্যাদি শ্রুতি। কর্ম্ম হইতে মৃত্যু—অর্থাৎ সংসারই হয়, অমৃত লাভ হয় না। 'তদ্যথেহ নেহ কর্ম্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে, এবমেবামুত্র পুণ্য-জিতো লোকঃ ক্ষীয়তে (ছান্দোগ্য ৭।১।৬)। ইহকালের প্রযত্নসাধিত ভোগের ন্যায় পুণ্যকর্ম্মসাধিত পারলৌকিক ভোগও নশ্বর। অতএব কর্ম্মমাত্রই বন্ধনের হেতু, মোক্ষের

* যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়ো বিধিৎসয়া।
জ্ঞানং কর্ম্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তি কুত্রচিৎ।
শ্রীমদ্ভাগবত ১১ স্কন্ধ ২০ অধ্যায় ৬ শ্লোক।

নহে। মোক্ষ নশ্বর নহে, —অতএব তাহা অমৃত, মোক্ষপ্রাপ্তের পুনরায় সংসার হয় না, কর্ম্ম হইতে মোক্ষ না হওয়ায় কর্ম্মজনিত স্বর্গাদি ভোগক্ষয়ে পুনর্জ্জন্ম হয়। মোক্ষের হেতু জ্ঞান, অতএব জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, কর্ম্ম হেয়। কর্ম্মবাদী বলেন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্ম্মের ফল নশ্বর, সোমযাগ প্রভৃতি মহৎ কর্ম্মের ফল অমৃত, ইহা বেদে স্পষ্ট আছে 'অপাম সোমম্ অমৃতা অভূম' সোম পানের ফলে আমরা অমৃত হইয়াছি। তবে যে জ্ঞান হইতে মুক্তি হয়, এ কথা বেদে আছে—

'তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়'

তাহার তাৎপর্য্য এই যে, দেহাতিরিক্ত নিত্য আত্মাকে না জানিলে যজ্ঞে প্রবৃত্তিই হইতে পারে না, কারণ, যজ্ঞফল পরকালভোগ্য, দেহ ইহলোকেই ভস্মীভূত হয়, দেহাতিরিক্ত আত্মা না থাকিলে কে পরলোকে সুখভোগ করিবে? অতএব দেহাতিরিক্ত আত্মজ্ঞানের প্রয়োজন,—কিন্তু কর্ম্ম ব্যতীত অমৃত লাভ হয় না, এই জন্যই শ্রুতি কর্ম্মকাণ্ডমধ্যে বারংবার কর্ম্মের উপদেশ দিয়াছেন, জ্ঞানকাণ্ডেও বলিয়াছেন—

কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ
ঈশ উঃ।

কেবল কর্ম্ম করিবার জন্যই শতবর্ষ জীবনে স্পৃহা পোষণ করিবে। অতএব কর্ম্মযোগ বা কর্ম্মমার্গই বেদোক্ত, অন্য কোন যোগ বা মার্গ নাই।

অপরে বলেন যে—জ্ঞান ও কর্ম্ম দুইটিই সম্মিলিতভাবে মোক্ষের হেতু, কেবল কর্ম্মও মুক্তিহেতু নহে, কেবল জ্ঞানও মুক্তিহেতু নহে

উভাভ্যামেব পক্ষাভ্যাং যথা খে পক্ষিণাং গতিঃ।
তথৈব জ্ঞানকর্ম্মভ্যাং প্রাপ্যতে ব্রহ্ম শাশ্বতম্।

পক্ষীর আকাশ সঞ্চরণে যেমন দুখানি পক্ষই প্রয়োজনীয়, একখানি পক্ষে আকাশ সঞ্চরণ হয় না, তদ্রূপ জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ে মিলিত হইয়া জীবের শাশ্বত ব্রহ্মপ্রাপ্তির অর্থাৎ মুক্তিলাভের হেতু হয়, কেবল জ্ঞানও মুক্তির হেতু হয় না, কেবল কর্ম্মও হয় না।

এই দুই সম্প্রদায়ই ভক্তিকে লক্ষ্যের মধ্যেই আনেন নাই।

জ্ঞানবাদী ও কর্ম্মবাদীর এই আত্মকলহের সুযোগে বৈদিকধর্ম্মের বিরুদ্ধদলের অভ্যুত্থান হয়। মহাভারতে বর্ণিত রাক্ষস চার্ব্বাক তাহার মধ্যে প্রধান।

বৈদিকধর্ম্ম-রক্ষক আসুরভাববিধ্বংসী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতার উপাসনা দ্বারা জ্ঞানবাদ ও কর্ম্মবাদের সমন্বয় সাধিত করিয়া, বৈদিক ধর্ম্মবিরোধীদিগের সুযোগ নষ্ট করিয়াছেন।

তিনি কর্ম্মকে দ্বিবিধরূপে বিভাগ করিয়াছেন, এক—যজ্ঞার্থ কর্ম্ম, —এবং অপর—তদ্ভিন্ন কর্ম্ম;—শেষোক্ত কর্ম্ম বন্ধনের হেতু। যজ্ঞকর্ম্মকে সে শ্রেণীমধ্যে দর্শন না করিয়া তাহা যে 'অকর্ম্ম অর্থাৎ সাধারণ কর্ম্মের ন্যায় বন্ধনহেতু নহে, তাহা দর্শন করা এবং যজ্ঞকর্ম্ম পরিত্যাগকেই সাধারণ কর্ম্ম দৃষ্টিতে বন্ধনহেতু জ্ঞান করাই বুদ্ধিমত্তা এবং কর্ম্মযোগের লক্ষণ, 'কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ' এই শ্লোকের এইরূপ তাৎপর্য্য বর্ণনা করিলেও কর্ম্ম ও ধর্ম্মে ভেদ মানিতেই হয়। কর্ম্ম যে ব্যাপক অর্থে গীতার বহু স্থানেই প্রযুক্ত, তাহা অস্বীকার করা যায় না, তবে তাহার কর্ত্তব্যতা বিষয়ে গীতার সিদ্ধান্ত এখনও নিশ্চয় হইল না।

অধিকন্তু এখানেও অনেকগুলি আপত্তি উঠিতেছে—

১। শঙ্কর ও শ্রীধর মতে যে 'যজ্ঞার্থ কর্ম্ম' শব্দের অর্থ করা হইয়াছে, তাহা ত্যাগ করিলে—

'যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে…
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক-
মশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্।…
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।'

এই গীতা বচনের সহিত বিরোধ হয়; কারণ, যজ্ঞকর্ম্ম যে মুক্তির হেতু নহে, ইহাতেও যে পুনর্জ্জন্ম হয়, ইহাই স্পষ্ট ভাবে কথিত। অতএব 'যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।' এই উক্তি অলীক হইয়া যায়। যজ্ঞার্থ কর্ম্ম শব্দের অর্থ ঈশ্বরারাধনা বা বিষ্ণুপাসনা হইলে, বিরোধ হয় না, সাধারণ যজ্ঞ হইতে তাহার প্রভেদ সিদ্ধ হয়, এইরূপ কর্ম্ম বন্ধনের হেতু নহে। কিন্তু বেদবোধিত কাম্য ফলপ্রদ, বহু যজ্ঞই বন্ধনহেতু,—এরূপ অর্থই সঙ্গত। মূল গীতার বচনের কথা উল্লেখ করিয়া তাহা ত্যাগ করা উচিত হয় নাই।

২। ত্রিবিধ যোগ—কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি—শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট: ইহা পূর্ব্বে কথিত, কিন্তু গীতায় আছে,—

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্ ॥

এই স্থলে এবং পূর্ব্বাপর বহু স্থলেই জ্ঞানযোগ ও কর্ম্ম-যোগ এই দ্বিবিধ যোগের উল্লেখ আছে, ভক্তিযোগের উল্লেখ নাই, ত্রিবিধ যোগ স্বীকার করায় গীতাবিচারে গীতা-সিদ্ধান্তের বিরোধ লক্ষিত হইতেছে।

৩। কর্ম্মশব্দ যদি ব্যাপক অর্থে গীতায় প্রযুক্ত হইয়া থাকে, তাহাতে কর্ম্ম ও ধর্ম্মে ভেদ হইবে কেন? গঙ্গা প্রবাহ সুদূর-বিস্তৃত—ব্যাপক; কলসীতে গঙ্গাজল আনিলে তখন তাহা ক্ষুদ্রাধারে স্থিত ব্যাপ্য; তাই বলিয়া সেই ব্যাপ্য জলকে যেমন গঙ্গাজল নহে বলা যায় না, সেইরূপ ধর্ম্মকে কর্ম্ম নহে, ইহাও বলা যায় না; অতএব কর্ম্ম ও ধর্ম্মে ভেদ যে গীতাসিদ্ধান্ত ইহা বলা যায় না।

৪। বাঙ্গালা ভাষায় রচিত বিচারে সংস্কৃত ভাষায় অনুশীলন উচিত নহে।

এই চারিটি আপত্তির উত্তর একে একে দিতেছি।

১। 'যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র' এই শ্লোক এবং পরবর্ত্তী তিনটি শ্লোক এখানে উদ্ধৃত না করিলে, আমার বক্তব্য সুস্পষ্ট হইবে না বলিয়া তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করিতে হইল,—

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ ৯।
সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্ ॥ ১০।
দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥ ১১।
ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ ॥ ১২।

যজ্ঞার্থ কর্ম্ম ব্যতীত সকল কর্ম্মই জীবের বন্ধন হেতু, অতএব হে কৌন্তেয়! মুক্তসঙ্গ হইয়া অর্থাৎ ফলকামনা ও কর্ত্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করিয়া যজ্ঞার্থ কর্ম্ম কর। ৯। পূর্ব্বকালে প্রজাপতি যুগপৎ যজ্ঞ ও প্রজা সৃষ্টি করিয়া প্রজাদিগকে (যজ্ঞাধিকারী মানবদিগকে) বলিলেন, এই যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা তোমরা সন্তান-সন্ততিযুক্ত হইবে এবং এই যজ্ঞ তোমাদিগের অভীষ্ট ভোগ প্রদান করে। ১০। এই যজ্ঞ দ্বারা তোমরা দেবগণের ভাবনা করিবে, দেবতারাও তোমা-দিগের ভাবনা ভাবিবেন। পরস্পরের এইরূপ ভাবনা হইলে তোমরা পরম কল্যাণ প্রাপ্ত হইবে। ১১। যজ্ঞভাবিত দেবগণ তোমাদিগকে অভিলষিত ভোগ্য প্রদান করিবেন, তৎপ্রদত্ত ভোগ্য বস্তু তাঁহাদিগকে না দিয়া—যজ্ঞ না করিয়া—যে ভোগ করে, সে চৌর্য্য পাপে পাপী। ১২। এই চারটি শ্লোকে যজ্ঞের উপদেশ, যজ্ঞের ফল কীর্ত্তন এবং তাহা না করিলে দোষ কীর্ত্তন আছে। তন্মধ্যে প্রথম শ্লোকের 'যজ্ঞ'শব্দের এক অর্থ—এবং পরবর্ত্তী শ্লোকসমূহে অপর অর্থ স্বীকার করিতে মন চাহে কি? বিশেষতঃ, আরম্ভে ভগবান্ জোর দিয়াছেন,—'মুক্তসঙ্গঃ সমাচর' এবং উপসংহারে বলিয়াছেন,—

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ ॥ ১৯।

অতএব যাহা কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তাহা অসক্ত (মুক্তসঙ্গ) হইয়া আচরণ কর, অসক্ত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠানকারী পুরুষ পরম ফল প্রাপ্ত হয়। ১৯।

যজ্ঞ যে একান্ত কর্ত্তব্য, তাহা ১২ শ্লোকের "যজ্ঞ না করা চৌর্য্যাপরাধ"—এই ভাবের উক্তি দ্বারা বুঝা যায়। তৎপরবর্ত্তী শ্লোকেও কথিত হইয়াছে—

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥ ১৩।

যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজন করা যাহাদিগের নিয়ম, তাহারা সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হয়, পক্ষান্তরে আপনার উদরের জন্য যে ব্যক্তি পাক করে, (যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য নহে।) তাহার ভোজনব্যাপার কেবল পাপানুষ্ঠান ॥ ১৩।

আরও আছে—

এ সমস্ত শ্লোকের তাৎপর্য্য আলোচনা করিলে বুঝা যায়, যজ্ঞ করিলে কাম্য ফল লাভ হয় এবং না করিলে পাপ হয়।

যে নিষ্কাম, তাহার পক্ষে কাম্য ফল লাভ উপেক্ষিত হইতে পারে, কিন্তু না করিলে যে দোষ, তাহা তো উপেক্ষণীয় নহে। এই জন্য যজ্ঞ 'কার্য্যং কর্ম্ম' শুধু কর্ম্ম নহে অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম। অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়াই যে যজ্ঞানুষ্ঠান, তাহাই গীতাসম্মত; ফলাকাঙ্ক্ষায় যজ্ঞানুষ্ঠান গীতা-সম্মত নহে।

'ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক-
মশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্।
তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।'

বেদত্রয়ে অভিজ্ঞ সোমপায়ীরা যজ্ঞ দ্বারা আমারই (ঈশ্বরের) আরাধনা করিয়া স্বর্গ প্রার্থনা করে, স্বর্গলাভও হয়, দেবভোগ্য ভোগ তাহাদিগের হয়, কিন্তু পুনর্ব্বার মনুষ্যলোকে আসিতে হয়।

ইহা যজ্ঞের দোষ নহে, যজ্ঞকর্ত্তার অভিসন্ধির দোষ,—অভিসন্ধিমধ্যে যদি স্বর্গের ভোগসুখের কামনা থাকে, তাহা হইলে যজ্ঞ দ্বারা ঈশ্বরারাধনা হইলেও পুনর্জন্ম হইতে পরিত্রাণ হয় না; পুনঃপুনঃ সংসারে আসিতে হয়।

পক্ষান্তরে ফলকামনা ও কর্ত্তৃত্বাভিমান-শূন্য হইয়া যে যজ্ঞানুষ্ঠান, তাহা মুক্তি হেতু। ইহা কর্ম্মযোগের অন্তর্গত।

যে সকল কার্য্য স্বভাবতঃ পারলৌকিক ফলদানে অসমর্থ,—তাহার অনুষ্ঠানে ঐরূপ ফলকামনা না করায় কর্ত্তার মনোভাব বুঝা যায় না,—কিন্তু যে কার্য্য স্বর্গসুখ-দানে ও অন্যবিধ ভোগসম্পাদনে সমর্থ, সে কার্য্য করিবার সময়েও যে কর্ত্তার ফলে কামনা থাকে না, তিনিই কর্ম্মযোগী।

যজ্ঞ হইতে যে কাম্য ভোগ প্রাপ্ত হওয়া যায়, ইহা পূর্ব্বোক্ত ১০।১১ শ্লোকে এবং দ্বাদশ শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধে বর্ণিত হইয়াছে, নতুবা সকাম কর্ম্মের বিরোধী গীতোপদেশ-মধ্যে এই সকল ফলকামনার উপযোগী উপদেশ স্থান পাইত না।

অতএব তৃতীয় অধ্যায়ের ঐ সমস্ত শ্লোকেই যজ্ঞশব্দের একই অর্থ—কোন স্থলেই যজ্ঞশব্দের অর্থ ঈশ্বর বা বিষ্ণু নহে, এ সিদ্ধান্তে কোনই দোষ নাই।

ইহা প্রথম আপত্তির উত্তর।

২। গীতায় জ্ঞান ও কর্ম্ম এই দ্বিবিধ যোগের উপদেশ থাকিলেও ভক্তিযোগ পরিত্যক্ত হয় নাই—দ্বাদশাধ্যায়ের নামই ভক্তিযোগ। কিন্তু এই যোগকে পৃথক্ রূপে গ্রহণ না করিবার কারণ—কর্ম্ম ও জ্ঞানযোগ দেহমাত্র, উভয় যোগেরই প্রাণ ভক্তি। প্রাণহীন দেহবৎ ভক্তিহীন কর্ম্ম ও ভক্তিহীন জ্ঞান—গীতা-মতে যোগই নহে,—পক্ষান্তরে প্রাণ যেরূপ দেহকে আশ্রয় করিয়াই থাকে, ভক্তিও সেইরূপ কর্ম্ম বা জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়াই থাকে। স্বতন্ত্র ভাবে থাকে না—এই কারণেই দুইটি যোগের কথাই গীতাতে উক্ত হইয়াছে। এ বিষয়ে প্রমাণ—

'মচ্চিত্তাশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।'

ইত্যাদি স্থলে ভক্তি, কর্ম্মের প্রাণরূপে গৃহীত।

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ। ৭।১৬।
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত এক ভক্তির্বিশিষ্যতে। ১৭।

এস্থলে ভক্তি, জ্ঞানের প্রাণরূপে গৃহীত। দ্বাদশাধ্যায়ে ভক্তি যোগাধ্যায়ে ইহা স্পষ্টীকৃত।

অতএব কর্ম্ম ও জ্ঞান ভক্তি দ্বারাই প্রাণবান হইয়া কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগ নামে মোক্ষসাধন উপায়রূপে গীতাশাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট—কেবল ভক্তি দেহহীন প্রাণের ন্যায় অনির্দ্দেশ্য, ইহাই গীতার সিদ্ধান্ত। যে শাস্ত্রে ত্রিবিধ যোগের নির্দ্দেশ আছে, তাহাতে ঐ ত্রিবিধের স্বরূপই প্রদর্শিত। সহকারি ভাব তাহাতে নিবারিত হয় নাই, ভক্তি ব্যতীত জ্ঞান যে বিফল, তাহা শ্রীমদ্ ভাগবতে বিশেষভাবে কথিত,—

শ্রেয়ঃস্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবল বোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে।
নান্যদ্যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্।

হে বিভো! মঙ্গলমার্গ ত্বদীয় ভক্তিকে ত্যাগ করিয়া যাহারা কেবল জ্ঞানলাভের জন্য ক্লেশ প্রাপ্ত হয়,—(ধান্যের স্থানে) কেবল তুষে অবঘাত করার ন্যায় ক্লেশমাত্রই তাহার ফল হয়, কেবল তুষ ঢেঁকিতে কুটিলে যত পরিশ্রমই কর, তাহাতে চাউল বাহির হয় না, সেইরূপ ভক্তিকে ত্যাগ করিয়া কেবল জ্ঞানলাভের জন্য যত চেষ্টাই কর না কেন, প্রকৃত জ্ঞানলাভ হয় না, কষ্টই সার। অতএব কর্ম্ম ও জ্ঞান দ্বিবিধ যোগের নির্দ্দেশ গীতাশাস্ত্রে যাহা আছে, তাহা ত্রিবিধ যোগের বিরুদ্ধ নহে, কেবল ভক্তিকে হৃদয়ে লইয়াই দ্বিবিধের স্থিতি, ইহাই দ্বিবিধ যোগ-কথনের উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় আপত্তির উত্তর এইস্থানে সমাপ্ত।

৩। এই আপত্তি হাস্যকর; কারণ, ব্যাপকশব্দে যাহা অধিক, এরূপ অর্থ আমার অভিপ্রেত নহে, আমার অভিপ্রেত যে শব্দের প্রয়োগ নানাবিধ অর্থে আছে, তাহাই ব্যাপক। গঙ্গাজল শব্দের একই অর্থ প্রবাহস্থ গঙ্গাজল ও কলসীস্থ গঙ্গাজলের ভেদ না থাকায় ঐ শব্দ নানার্থ নহে;—অর্থও একাধিক নহে। কর্ম্ম শব্দের অর্থ নানা প্রকার—বেদবিধিবোধিত যজ্ঞ, লৌকিক গমনাগমন, পান-ভোজন ইত্যাদি সমস্তই কর্ম্ম শব্দের অর্থ,—আর ধর্ম্ম বেদবিধিবোধিত কর্ম্মমাত্র, সুতরাং উভয়ের অভেদ হয় না, ভেদই হয়। 'কর্ম্মে ও ধর্ম্মে ভেদ আছে কি না?' এই প্রবচন হইতে বুঝা যায়, যাহা কর্ম্ম তাহাই ধর্ম্ম এবং যাহা ধর্ম্ম তাহাই কর্ম্ম—এইরূপ অভেদ কর্ম্ম ও ধর্ম্মে আছে কি না? তাহার উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে—নাই, ভেদই আছে। কর্ম্ম, অকর্ম্ম বিকর্ম্ম এই তিনই কর্ম্ম কিন্তু ধর্ম্ম নহে, ইহা স্মরণ রাখিলেই তৃতীয় আপত্তির উত্তর হৃদয়ঙ্গম হইবে। ইহা তৃতীয় আপত্তির উত্তর।

৪। গীতা যখন সংস্কৃত ভাষায় উপদিষ্ট, তখন তাহার বিচারে ভাষাবিচার হওয়াই স্বাভাবিক, তথাপি পাঠকের সুবিধার্থ যথাসম্ভব তাহার পরিহারে যত্ন করা হইয়াছে। যে পাঠকের এইরূপ স্থানে সংস্কৃত বিচার অরুচিকর মনে হইবে, তাঁহারা সেটুকু বাদ দিয়াও অনায়াসেই প্রবন্ধ পাঠ করিতে পারিবেন, অতএব এ সম্বন্ধে এ অপেক্ষা স্পষ্ট উত্তর আর কিছু হইতে পারে না।

এই আপত্তির উত্তর দানের পরে, সিদ্ধান্তের কথা বলিতেছি,—

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে কর্ম্ম ত্রিবিধ—(১) বেদবিহিত, (২) বেদনিষিদ্ধ, এবং (৩) যাহা বিহিতও নহে নিষিদ্ধও নহে।

এতন্মধ্যে প্রথমোক্ত কর্ম্ম ধর্ম্ম নামে অভিহিত,—অপর কর্ম্মের সহিত এই প্রকার ধর্ম্মের ভেদ স্বীকার করিতেই হয়। তাহা হইলেও তৃতীয় প্রকার কর্ম্মও মুক্তসঙ্গ হইয়া করিবার বিধি গীতায় আছে। 'কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন,' 'তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।' এই উপসংহার বাক্যেও এই সিদ্ধান্ত ঘোষিত।

রোগখিন্ন জরাজীর্ণ হস্তের কম্পিত লেখনী আর অগ্রসর হইল না। সুতরাং এবারের বিচার এই স্থানেই সমাপ্ত হইল।

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন।

পাশ্চাত্য গণ-

...২। তাহার পর তিনি

...লণ্ডে আমরা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়া

..., গণতন্ত্রে জনমতের সমর্থনের এবং রাজনীতিক

...র পরিবর্ত্তন লোককে চমকিত করে, সেই জন্য

...ও যে দল শাসন-তরণী চালায়, তাহারা বিনীত এবং

...দল যখন বিরোধী দলে পরিণত হয়, তখন তাহারা

...শাসিত হইয়া থাকে। সুতরাং গণ-শাসনযন্ত্রের মূল কথা এই যে, সংখ্যাল্প দল যে চিরকালই সংখ্যাল্প থাকিবে, এবং সংখ্যাধিক দলও যে চিরকালই সংখ্যাধিক দল থাকিবে এমন কোন কথা নাই। কোন রাজনীতিক দলের পক্ষে এরূপ চুক্তি প্রদান করা সঙ্গত নহে যে, কোন বিশেষ শাসনপ্রণালী, যথা সংহিত রাষ্ট্রতন্ত্র (Federation), প্রথমেই সম্প্রদায়বিশেষের হস্তে অধিকাংশের ক্ষমতা ন্যস্ত করিতে পারে, এই যুক্তি প্রয়োগ করা সঙ্গত নহে।" ইহা পাঠ করিয়া আমাদের ধারণা জন্মিয়াছে যে, তিনি এত কষ্ট করিয়া ভারতে আসিয়াও ভারতবাসীর আপত্তির মূল

religion, অর্থাৎ ... সম্বন্ধই থাকা উচিত নহে। এই মত তাহা... সর্ব্বজনপরিগৃহীত হইয়াছে বলিয়া গ্রেট বৃটেনে রাজনীতিক ব্যাপারে ধর্ম্ম সম্পর্কিত কোন প্রশ্নই উঠে না। গ্লাডষ্টোন ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে বিলাতের যে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠানের উপর ধার্য্য কর (church rates) রহিত করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা ঐরূপ মতবিস্তারের ফলে। Voluntary principle ঐ মতের জন্যই গৃহীত হয়। কিন্তু বিলাতে যাহা ঘোর অনিষ্টকর বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে, ভারতীয় শাসন সংস্কার আইনে সেই অবিধিকে বিধি বলিয়া স্থান দেওয়া হইয়াছে। অতএব বিলাতের নজীর ও অভিজ্ঞতা-জনিত জ্ঞান ভারতে প্রবর্ত্তিত এই কিম্ভূতকিমাকার শাসন-সংস্কার আইনে খাটিতে পারে না।

ভারতবাসীরা যে ফেডারেশন চাহেন না, তাহা নহে। তবে বর্ত্তমান শাসন-সংস্কার আইনে যে ভাবে ফেডারেশনের ব্যবস্থা পরিকল্পিত হইয়াছে এবং তাহার সম্বন্ধে ভারতবাসীরা যে আপত্তি করিতেছে, সে কথার পুনরাবৃত্তি অনাবশ্যক।

কর্ণেল মুরহেডের ভারতভ্রমণের অভিজ্ঞতা

বর্ত্তমান সহকারী ভারতসচিব লেপ্‌টেনাণ্ট্‌ কর্ণেল এ, জে মুরহেড গত শরৎকালে ভারতভ্রমণে আসিয়াছিলেন। স্বল্পকাল ভারতভ্রমণে তিনি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন—সে সম্বন্ধে বিলাতের রুবেন্স হোটেলে এক বক্তৃতা করিয়াছেন। তাঁহার সেই বক্তৃতা বিলাতের 'এসিয়াটিক রিভিউ' পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি ভারতসচিবের সহকারিরূপে ভারতের শাসন-যন্ত্র নিয়ন্তৃগণের অন্যতম। সত্য বটে, বর্ত্তমান শাসনসংস্কার প্রবর্ত্তনের ফলে ভারত-সচিবের ভারতের শাসনযন্ত্র পরিচালনকার্য্য কিছু দৃশ্যতঃ কমিয়াছে,—কিন্তু কার্য্যতঃ উহা যে বিশেষ কমিয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

আমরা তাঁহার বক্তৃতা আদ্যন্ত পাঠ করিয়া বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাইলাম না। তিনি ভারতের প্রকৃত সমস্যা সম্বন্ধে কিছুই জানেন নাই। কৃষির কথা কিছু বলিয়াছেন সত্য,—কিন্তু তাহাতে নূতনত্ব কিছুই খুঁজিয়া পাইলাম না। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ পরি... ...নথ, সে কার্য্য করিবার মাত্র সপ্তাহকাল ... যে কর্ত্তার ফলে কামনা থাকে না, তিনিই কর্ম্মযোগী।

যজ্ঞ হইতে যে কাম্য ভোগ প্রাপ্ত হওয়া যায়, ইহা পূর্ব্বোক্ত ১০।১১ শ্লোকে এবং দ্বাদশ শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধে বর্ণিত হইয়াছে, নতুবা সকাম কর্ম্মের বিরোধী গীতোপদেশ-মধ্যে এই সকল ফলকামনার উপযোগী উপদেশ স্থান পাইত না।

অতএব তৃতীয় অধ্যায়ের ঐ সমস্ত শ্লোকই যজ্ঞশব্দের একই অর্থ—কোন স্থলেই যজ্ঞশব্দের অর্থ ঈশ্বর বা বিষ্ণু নহে, এ সিদ্ধান্তে কোনই দোষ নাই।

ইহা প্রথম আপত্তির উত্তর।

২। গীতায় জ্ঞান ও কর্ম্ম এই দ্বিবিধ যোগের উপদেশ থাকিলেও ভক্তিযোগ পরিত্যক্ত হয় নাই—দ্বাদশাধ্যায়ের নামই ভক্তিযোগ। কিন্তু এই যোগকে পৃথক্‌ রূপে গ্রহণ না করিবার কারণ—কর্ম্ম ও জ্ঞানযোগ দেহমাত্র, উভয় যোগেরই প্রাণ ভক্তি। প্রাণহীন দেহবৎ ভক্তিহীন

তাঁহার বক্তৃতা পাঠে জানা যায় না। তবে তাঁহার মতামত দেখিয়া আমাদের ধারণা যে, তিনি বিশেষভাবে সরকারী আমলাদিগের অথবা তাঁহাদের বশীভূত লোকদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। সুতরাং এই দ্রুতভ্রমণে তাঁহার একদেশদর্শী ধারণাও জন্মিয়াছে বলিয়াই মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

তিনি বলিয়াছেন যে, "বর্ত্তমান যুগের যাতায়াতের সুবিধায়—পরস্পর ভাবের আদান-প্রদানে ভারতীয় জীবনে একটা অভিনব—অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে। ভারতীয় জীবনের মূল সুদূর অতীতে নিবদ্ধ। শত শত বৎসরে তথাকার লোকের জীবনধারার এবং রীতি-নীতির মূল অবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। কেহ কেহ হয় ত মনে করিতেছেন যে, অতীতে তাহার পরিবর্ত্তন যেরূপ মন্থর হইয়াছে, ভবিষ্যতেও সেইরূপ ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তন সম্ভব হইবে। কিন্তু বর্ত্তমান যুগের যাতায়াতের সুবিধা এবং পরস্পর ভাবের বিনিময় ইহার সহিত মিলিত হইতেছে। জ্ঞান যে বিফল, তাহা ..., মোটর-যান, বিমান প্রভৃতিকে

শ্রেয়ঃস্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো মানবীয় বাক্যের
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে। বজীবনে
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে। যাচ্ছে।
নান্যদ্যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্‌। ধ্যাপ

ভাবে

হে বিভো! মঙ্গলমার্গ ত্বদীয় ভক্তিকে ত্যাগ করিয়া যাহারা কেবল জ্ঞানলাভের জন্য ক্লেশ প্রাপ্ত হয়,—(ধান্যের স্থানে) কেবল তুষে অবঘাত করার ন্যায় ক্লেশমাত্রই তাহার ফল হয়, কেবল তুষ ঢেঁকিতে কুটিলে যত পরিশ্রমই কর, তাহাতে চাউল বাহির হয় না, সেইরূপ ভক্তিকে ত্যাগ করিয়া কেবল জ্ঞানলাভের জন্য যত চেষ্টাই কর না কেন, প্রকৃত জ্ঞানলাভ হয় না, কষ্টই সার। অতএব কর্ম্ম ও জ্ঞান দ্বিবিধ যোগের নির্দ্দেশ গীতাশাস্ত্রে যাহা আছে, তাহা ত্রিবিধ যোগের বিরুদ্ধ নহে, কেবল ভক্তিকে হৃদয়ে লইয়াই দ্বিবিধের স্থিতি, ইহাই দ্বিবিধ যোগ-কথনের উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় আপত্তির উত্তর এইস্থানে সমাপ্ত।

নূতন এবং অজ্ঞাতপূর্ব্ব ব্যাপারের সম্মুখীন হইয়াছি। এরূপ অবস্থায় যাঁহাদের দীর্ঘকালব্যাপী ভারতীয় অভিজ্ঞতা রহিয়াছে, তাঁহাদিগকেও নিজকে শিক্ষার্থী বলিয়া মনে করিতে হইবে। তিনি যে সকল ভারতীয় আমলাকে এই উপদেশ দিয়াছেন, তাঁহারা তাহা স্মরণ রাখিলেই ভাল করিবেন। আমাদের বিশ্বাস, ভারতবাসীরা যদি তাহাদের বহুসহস্রব্যাপী সাধনা এবং সংস্কৃতি একেবারে বিস্মৃত হইয়া একটা নূতন পথ ধরে, প্রাচীর পথ ছাড়িয়া প্রতীচীর পথে দ্রুত অগ্রসর হয়, তাহা হইলে তাহাদের পরিণামে মঙ্গল হইবে না।

তাহার পর সহকারী ভারতসচিব গণতন্ত্রবাদের কথা পাড়িয়াছেন। এ বিষয়ে তিনি সাধারণ ইংরেজ ব্যুরোক্র্যাটের ন্যায়ই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। ভারতবাসীরা গণ-শাসনে নূতন পদন্যাস করিতেছে। তাহাদের ইতিহাসে দীর্ঘকাল-ব্যাপী গণতন্ত্রের কোন দৃষ্টান্ত নাই। সুতরাং ইহা হাতে-কলমে একটা নূতন পরীক্ষা। মিষ্টার মুরহেডের এই সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত নহে। ভারতে অতি প্রাচীনকাল হইতে গণ শাসন অর্থাৎ জনমতের অনুবর্ত্তী শাসন প্রবর্ত্তিত ছিল। সে কথা লইয়া এ স্থানে আলোচনা অনাবশ্যক। তবে ভারতীয় গণ-শাসনের সহিত বর্ত্তমান পাশ্চাত্য গণ-শাসনের একটা পার্থক্য আছে। তাহার পর তিনি বলিয়াছেন যে, "ইংলণ্ডে আমরা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়া থাকি যে, গণতন্ত্রে জনমতের সমর্থনের এবং রাজনীতিক ক্ষমতার পরিবর্ত্তন লোককে চমকিত করে, সেই জন্য ইংলণ্ডে যে দল শাসন-তরণী চালায়, তাহারা বিনীত এবং সেই দল যখন বিরোধী দলে পরিণত হয়, তখন তাহারা আশান্বিত হইয়া থাকে। সুতরাং গণ-শাসনযন্ত্রের মূল কথা এই যে, সংখ্যাল্প দল যে চিরকালই সংখ্যাল্প থাকিবে, এবং সংখ্যাধিক দলও যে চিরকালই সংখ্যাধিক দল থাকিবে এমন কোন কথা নাই। কোন রাজনীতিক দলের পক্ষে এরূপ চুক্তি প্রদান করা সঙ্গত নহে যে, কোন বিশেষ শাসনপ্রণালী, যথা সংহিত রাষ্ট্রতন্ত্র (Federation), প্রথমেই সম্প্রদায়বিশেষের হস্তে অধিকাংশের ক্ষমতা ন্যস্ত করিতে পারে, এই যুক্তি প্রয়োগ করা সঙ্গত নহে।" ইহা পাঠ করিয়া আমাদের ধারণা জন্মিয়াছে যে, তিনি এত কষ্ট করিয়া ভারতে আসিয়াও ভারতবাসীর আপত্তির মূল কোথায়, তাহা কিছুমাত্র বুঝিতে পারেন নাই। যেখানে রাজনীতিক মত লইয়া দল গঠিত হয়, সেখানে তাঁহার কথা সত্য হইতে পারে। কিন্তু যেখানে রাজনীতিক মত হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে (যথা ধর্ম্মবিশ্বাস হইতে) দল গঠিত হয়, সেখানে তাঁহার কথা খাটিতে পারে না। যেখানে কোন একটি দল ক্ষমতা লাভ করিলে অন্য সম্প্রদায়ের হস্তে ক্ষমতা না হইলেও তাহাদের ধর্ম্ম বিপন্ন হইবে, এইরূপ রব তুলিয়া ব্যক্তিবিশেষ বা দলবিশেষ নিজের হাতে ক্ষমতা রক্ষা করিবার প্রচেষ্টায় ব্যস্ত হয়, সেখানে তাঁহার কথা খাটিতেই পারে না। বৃটেনের গণতন্ত্রের ইতিহাসে কি এমন দৃষ্টান্ত আছে যে, তথায় ধর্ম্মমত অনুসারে নির্ব্বাচক-মণ্ডলী গঠিত হইয়াছে এবং কোন দল আপনাদের রাজনীতিক কার্য্য দ্বারা সর্ব্বসাধারণের কি উপকার করিয়াছে, তাহা না দেখাইয়া কেবল Catholicism is in danger, Protestantism is in danger বলিয়া রব তুলিয়া দল রাখিবার চেষ্টা করিয়াছে? কেহ কস্মিন্ কালেও তাহা করেন নাই। তাঁহার দেশে বরং বর্ত্তমান সময়ে প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দ ধরিয়া এই মতই সর্ব্বজনগ্রাহ্য হইয়া আসিতেছে যে, The State Should have nothing to do with religion, অর্থাৎ ধর্ম্মের ব্যাপারের সহিত রাষ্ট্রের কোন সম্বন্ধই থাকা উচিত নহে। এই মত তাঁহাদের দেশে সর্ব্বজনপরিগৃহীত হইয়াছে বলিয়া গ্রেট বৃটেনে রাজনীতিক ব্যাপারে ধর্ম্ম সম্পর্কিত কোন প্রশ্নই উঠে না। গ্লাডষ্টোন ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে বিলাতের যে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠানের উপর ধার্য্য কর (church rates) রহিত করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা ঐরূপ মতবিস্তারের ফলে। Voluntary principle ঐ মতের জন্যই গৃহীত হয়। কিন্তু বিলাতে যাহা ঘোর অনিষ্টকর বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে, ভারতীয় শাসন সংস্কার আইনে সেই অবিধিকে বিধি বলিয়া স্থান দেওয়া হইয়াছে। অতএব বিলাতের নজীর ও অভিজ্ঞতা-জনিত জ্ঞান ভারতে প্রবর্ত্তিত এই কিম্ভূতকিমাকার শাসন-সংস্কার আইনে খাটিতে পারে না।

ভারতবাসীরা যে ফেডারেশন চাহেন না, তাহা নহে। তবে বর্ত্তমান শাসন-সংস্কার আইনে যে ভাবে ফেডারেশনের ব্যবস্থা পরিকল্পিত হইয়াছে এবং তাহার সম্বন্ধে ভারতবাসীরা যে আপত্তি করিতেছে, সে কথার পুনরাবৃত্তি অনাবশ্যক।

বিস্ময়ের বিষয় এই যে, সহকারী ভারতসচিব ভারতবাসীর সেই সকল আপত্তির একটি আপত্তির খণ্ডন করা দূরে থাকুক, উল্লেখ পর্য্যন্ত করেন নাই। কাযেই ভারতবাসীর মনে হইতেছে যে, ভারতবাসীর সেই সকল আপত্তি অখণ্ডনীয়।

তাহার পর সহকারী ভারতসচিব বলিয়াছেন যে, দেশের যে স্থানেই তিনি গিয়াছেন, সেইখানেই তিনি হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের কথা শুনিয়াছেন। তিনি ইহাও শুনিয়াছেন যে, এই সাম্প্রদায়িক বিবাদ উত্তরোত্তর বাড়িয়াই যাইতেছে। তিনি বলিয়াছেন যে, এই বিরোধের মূল ধর্ম্মবিষয়ক সংস্কার নহে,—উহার বহিঃস্থিত অনেক বিষয় লইয়া আত্মপ্রকাশ করে। তবে তিনি বলেন যে, তাঁহার মনে হয়, এক কথায় উহা উভয় সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রানির্ব্বাহের রীতি পদ্ধতি (mode of life) হইতে সম্ভূত। ইহা তাঁহার অত্যুৎকট ভ্রম। হিন্দু-মুসলমানের জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহের,—রীতি-নীতি প্রভৃতির ভিন্নতা ভারতে মুসলমান অধিকারের সময় হইতেই আছে, কিন্তু কখনও এ ভারতে, বিশেষতঃ বাঙ্গালায়, সাম্প্রদায়িক বিরোধ এত তীব্র আকার ধারণ করে নাই। প্রথম মুসলমানবিজয়কালে সাম্প্রদায়িক বিবাদ ও বিদ্বেষ দেখা গিয়াছিল, কিন্তু পরে তাহা প্রশমিত হইয়াছিল। ইহার প্রমাণের অভাব নাই। 'সৈয়ার-উল-মুতাক্ষরীণ', 'Topography of Dacca' প্রভৃতিতে তাহার প্রমাণ আছে। ইহার সূচনার কারণ বিদিত ভুবনে। পূর্ব্বে কতকগুলি মুসলমান-প্রতিনিধি, তদানীন্তন বড় লাট লর্ড মিণ্টোর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মুসলমানদিগের তরফ হইতে কতকগুলি বিশেষ অধিকারের দাবী করিয়াছিলেন। লর্ড মিণ্টো সানন্দে সেই প্রস্তাবে সম্মত হইলে মুসলমানদিগের জন্য সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচকমণ্ডলী গঠনের সূত্রপাত ঐখানেই হইয়াছিল। এই সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচকমণ্ডলীই সাম্প্রদায়িক বিবাদ উদ্ভবের উর্ব্বরক্ষেত্র, তাহা কে না বুঝে? মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কারের রিপোর্টে সে কথা স্পষ্টভাষায় স্বীকৃত হইয়াছে। সাইমন কমিশনের রিপোর্টও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। উহার ফলে যে সাম্প্রদায়িক বিবাদ উপস্থিত হইবে, তাহা প্রত্যেক বিচক্ষণ রাজনীতিকই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। লর্ড মর্লি তাঁহার 'Recollection' নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, তিনি লর্ড মিণ্টোকে স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার কথাতেই মুসলমানগণ অতিরিক্ত দাবী করিতে উৎসাহিত হইয়াছে। * সুতরাং এ অনিষ্টের মূল উভয় সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহের পদ্ধতিগত প্রভেদ মোটেই নহে,—উহা রাজনীতিক ব্যবস্থাগত বলিয়াই মনে হয়। ইনি আরও বলিয়াছেন যে, কোন এক জন সরকারী আমলার সহিত এক স্থানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিষয় আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, কোন্ কোন্ বিষয়ে মতবৈষম্যহেতু হাঙ্গামার উদ্ভব হইয়া থাকে? উত্তরে উক্ত সরকারী আমলা বলিয়াছিলেন,—"যাহা লইয়াই হিন্দু-মুসলমানে হাঙ্গামা বাধিয়া উঠুক না কেন,—আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে উহা সাম্প্রদায়িক বিরোধে পরিণত হইবেই। যে কারণেই এই হাঙ্গামার উদ্ভব হউক না কেন, ভারতের ভিতরে এবং ভারতের বাহিরে মুসলমানসমাজে উহার যে প্রতিনাদ হইবে, তাহা সামান্য বলিয়া উপেক্ষা করা যায় না।" সামান্য কারণে যে এই বিরোধ সৃষ্টি হয়, তাহার প্রমাণ সম্প্রতি গয়ায় পাওয়া গিয়াছে। গয়ায় দুইটি ষাঁড় রাজপথে সংগ্রামে রত হইয়াছিল, সেই জন্য তথায় নির্ব্বাপিত দাঙ্গার অনলশিখা আবার প্রজ্বলিত হয়। সরকারী আমলারা সহকারী ভারতসচিবকে বলিয়াছেন যে, "হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা উপস্থিত হইলেই তাহার যে প্রতিনাদ ভারতের ভিতরে এবং ভারতের বাহিরে উপস্থিত হয়, তাহা তুচ্ছ বলিয়া উপেক্ষা করা যায় না।" ইহা ঠিক নহে। ভারতের বাহিরে উহার যে প্রতিনিনাদ উপস্থিত হয়, তাহা কাল্পনিক। ভারতের বহিঃস্থিত মুসলমানদিগের ভারতীয় এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সম্বন্ধে ভারতীয় মুসলমানদিগের সহিত কোন সহানুভূতি আছে বলিয়া মনে হয় না। মিশরের মুসলমানদিগের মনোভাব ইতঃপূর্ব্বে বহুবার প্রকাশ পাইয়াছে। ইরাণ তুরাণের মুসলমানদিগের ভারতীয় মুসলমানদিগের সহিত সহানুভূতি কত গাঢ়, তাহা মহাজরীণ ব্যাপারে বুঝা গিয়াছিল।

তাহার পর কর্ণেল মুরহেড বলিয়াছেন যে, "ভারতের

* Only I respectfully remind you, once more that it was your early speech about their extra claims that first started the Muslim hare. --Recollections, vol II p 325.

রাজনীতিক বিকাশসাধনের জন্য সরকার কর্তৃক যে শাসন-যন্ত্র গঠিত হইয়াছে, তাহার গঠন কিরূপ হইয়াছে, এবং কিরূপভাবে তাহা কার্য্য করিবে, তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে অবহেলা করা উচিত নহে। কিন্তু যখন আমরা ভাবি যে, বিলাতেই, বিলাতী লোকের অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও বিলাতী শাসনযন্ত্র প্রায়ই ক্যাঁচ-কোঁচ শব্দ করিতে থাকে, এবং তদ্দ্বারা বহুদিন পূর্ব্বে তাহার সংস্কার করা উচিত ছিল, এ কথা জানাইয়া দেয়, তখন ভারতের শাসনযন্ত্রের যে সে দোষ থাকিবে, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই।" কিন্তু গোড়ায় শাসনযন্ত্রটি গঠনের যদি এমন দোষ থাকে যে, তাহা দেখিয়া স্পষ্টই বুঝা যায় যে, উহা রাজনীতিক বিকাশসাধনের অন্তরায়স্বরূপ হইবে, তাহা হইলে দেশের লোকের তাহাতে আপত্তি করিবার ন্যায়সঙ্গত কারণ অস্বীকার করা যায় না। সাইমন কমিশন তাঁহাদের রিপোর্টে বলিয়াছেন যে, শাসনযন্ত্রে এরূপ ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক যে, আপনা আপনিই উহা বিকশিত করিয়া তুলিবার ব্যবস্থা যেন উহাতে রক্ষিত হয়। কিন্তু বর্ত্তমান শাসনসংস্কার আইনে তাহা রাখা হয় নাই। কাজেই দেশের লোক ইহা গ্রাহ্য করিতে পারে না। এইরূপ উহাতে অনেক দোষ আছে। পূর্ব্বেই 'মাসিক বসুমতীতে' এ প্রসঙ্গের আলোচনা হইয়াছে। সহকারী ভারত-সচিব সে সকল আপত্তির উল্লেখ পর্য্যন্তও করেন নাই, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়।

ইহার পর তিনি ভারতীয় পল্লীগ্রাম সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, "ভারতীয় সমস্যা কেবলমাত্র রাজনীতি ও শাসনযন্ত্রগত নহে। ভারতের কৃষি এবং পল্লীজীবন ভারতীয় সমস্যার একটা বড় অংশ। ভারত-সচিব স্বয়ং পল্লী অঞ্চলের লোক; সেই জন্য পল্লীজীবনের দিকে তাঁহার মনে টান অত্যন্ত অধিক। সেই জন্য তিনি স্বয়ং পল্লীজীবন দেখিতে গিয়াছিলেন। তিনি বলেন, সমস্ত দেশের মানব জাতির মধ্যে পল্লীজীবনের একটা সাদৃশ্য বিদ্যমান। পল্লীবাসীদিগের জীবনে একটা সাধারণ ভাব, ভাষার গণ্ডীর বহির্দ্দেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। যে ব্যক্তি একগাছি তৃণের স্থানে দুই গাছি তৃণ উৎপাদন করেন, তিনি মানব জাতির সর্ব্বাপেক্ষা উপকারসাধক—ইহা কৃষি-জীবনের সনাতন বার্ত্তা। ভারতবাসীর আহারের মানদণ্ড অত্যন্ত ছোট। ইহা যিনি দেখিয়াছেন, তিনিই স্বীকার করিবেন যে, ভারতের পক্ষে ভালভাবে এবং অল্প ব্যয়ে অধিক পণ্যের উৎপাদন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। প্রকৃত কৃষীবল যাহাতে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ফল পায়, তাহাই সমস্ত পৃথিবীব্যাপী কৃষিসমাজের সঙ্গীন সমস্যা।" তাঁহার এই কথাগুলির আমরা সম্পূর্ণ সমর্থন করি। তাঁহার এই কথাগুলিতে মৌলিক চিন্তার বা আসল সমস্যার সমাধানের কোন কথা নাই। তিনি মামুলী প্রথামতে এ দেশের মহাজনগণের নিন্দা করিয়াছেন, তবে তিনি সঙ্গে সঙ্গে এ কথা স্বীকার করিয়াছেন যে, আইন প্রণয়নের দ্বারা এই সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান সম্ভবে না। কৃষকরা যাহাতে তাহাদের উৎপন্ন পণ্যের মূল্য যথাসম্ভব অধিক পায়, তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। সেজন্য পণ্যবিক্রয়ের সুবিধা এবং ভাল-মন্দ হিসাবে উৎপন্ন পণ্যের পর্য্যায় ভাগ (grading) প্রভৃতির দিকে অবহিত হওয়া বিধেয়। তিনি পল্লী-উন্নয়নের কথাও সোজাসুজি ভাবে বলিয়াছেন। কিন্তু একটা বিষয় বিশেষ-ভাবে লক্ষ্য করিবার আছে। তিনি এত বড় বিস্তীর্ণ দেশে শ্রমশিল্পের অবস্থা কিরূপ, তাহা কুত্রাপি বলেন নাই। তাঁহার বক্তৃতাতে সে প্রসঙ্গই তিনি উত্থাপন করেন নাই। তিনি নিখিল ভারতবর্ষকে যেন একটা কৃষিপ্রধান দেশ বলিয়া মনে করিয়াছেন। ইহা তাঁহার ভুল। ভারতবর্ষের মনীষিগণ চিরকালই শিল্পের এবং কৃষির একটা সামঞ্জস্য সাধিত করিয়া উহার উন্নতির ধারা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। ভারতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনকালে সেই সামঞ্জস্য নষ্ট হইয়া যায়। কর্ণেল মুরহেড যাহাই বলুন না কেন, শিল্পোন্নতি না করিলে ভারতবর্ষ কোন মতেই আত্মোন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হইবে না।

তিনি ভারতে শিক্ষার অভাবের কথা বলিয়াছেন। তাঁহার মতে এ দেশে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার হওয়া আবশ্যক। কিন্তু ভারতবাসীরা শিক্ষায় নরনারীকে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের নূতন পথ বা বৃত্তি প্রদান করিবে মনে করে। সেই জন্য তাহারা শিক্ষালাভ করিয়া কেরাণীগিরি করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করে। তিনি বলেন, শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য মানুষকে বংশগত বৃত্তির সাধনায় তাহারই উন্নতিবিধান করিবার উপদেশ সকলকে দেওয়া আবশ্যক। শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের নিজ নিজ বৃত্তি পরিত্যাগ

করা কর্ত্তব্য নহে। তাঁহার এই উক্তির আমরা সমর্থন করি। ভারতে শিল্পী জাতির সংখ্যা অল্প নহে। তাহারা যাহাতে নিজ নিজ জাতির সেবাশিল্পের উন্নতিসাধন করিতে পারে, তাহা করাই বিধেয়, ইহা আমরা স্বীকার করি। পল্লীগ্রামে শিক্ষার এইরূপ লক্ষ্য হওয়াই উচিত।

তাহার পর ইনি ভারতীয় শ্রমিকদিগের অবস্থা সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, সহরে শ্রমিকদিগের বাসস্থানের অবস্থা শোচনীয়। তিনি কেবল শ্রমিকদিগের 'পরিচালকসঙ্ঘের কথা বলিয়াছেন। শ্রমশিল্পসেবকদিগের মধ্যে অশিক্ষিত ব্যক্তিদিগের সংখ্যাই অত্যন্ত অধিক, সুতরাং তাহারা সুশৃঙ্খলভাবে শ্রমিক-প্রতিষ্ঠান পরিচালিত করিতে অক্ষম, সেইজন্য বাহিরের লোক শ্রমিকসঙ্ঘ পরিচালন করে। এই সকল বাহিরের লোক ভাল হয় না। ধনিকরা তাহাদিগকে আন্দোলনকারী বলিয়া অভিহিত করেন, সেই জন্য তাঁহারা শ্রমিকসঙ্ঘকে মানিতে চাহেন না। ইহার ফলে একটি ভ্রান্তিপূর্ণ ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়ার পাপচক্র আবর্ত্তিত হইতে থাকে। তিনি ইহার কোন প্রতিকারের উপায় নির্দেশ করেন নাই। তাঁহার এই উক্তি একটু অতিরিক্ত না হইলেও একেবারে মিথ্যা নহে। কিন্তু শ্রমিকদিগের মধ্যে সুশিক্ষার বিস্তার না হইলে ইহার প্রতিকার সম্ভবে না। ভারত সম্বন্ধে এই কয়টি কথা বলিয়া তিনি ব্রহ্ম দেশের কথাও বলিয়াছেন। তিনি সহকারী ভারতসচিব। ভারতের ভাগ্যচক্রের আবর্ত্তনে তাঁহার মতামত কতকটা প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, সেই জন্যই তাহার মতামতের আলোচনা করিলাম।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যারত্ন)।

শিশিরাঘাত

থর থর কাঁপি নিশীথের তারা কি কথা জানালো আভাসে?
কম্পিত তনু উদাস উতলা—কি ব্যথা জানালো বাতাসে?
ফুল চেয়ে রয় চাঁদিমার পানে, রিক্ত করেছে বক্ষের গানে!
কোয়েল বঁধুয়া কি মাগিয়া কাঁদে? কোন্ সকরুণ ভাষা সে!

নবীন নেশায় মোহিত হ'ল কি যৌবন-হারা ধরণী?
উচ্ছল নদী স্তব্ধ গভীর চাহি অনিমেষে সরণি!
সারা অন্তরে কি জাগিল ব্যথা?
প্রকৃতির মুখে নাহি সরে কথা!
কাহার লাগিয়া ঝরিছে নয়ন? কে তার বেদন-হরণী?

সুন্দরী-ধরা কাহার জটায় ভস্ম-কুহেলি মাখালো?
কাশ কুসুমের লাজ-বাস খুলি কেন তারে আজি জাগালো?
বিরস হিমেল আসন বিছায়ে করিল স্মরণ উত্তর বায়ে।
কোন তাপসের পাদ-পীঠতলে নতশিরে আজি দাঁড়ালো?

চকিত চমকে ধেয়ানের মাঝে উমার হাসি কি স্ফুরিছে?
রতি আনমনা, অজানা বিষাদে, ক্ষণে ক্ষণে আঁখি ঝুরিছে?
শঙ্কা-জড়িতা দিশাহারা বালা মরমে কি এক বিচ্ছেদ-জ্বালা!
ত্রস্ত হৃদয়ে ঘন ঘন কাঁপি কি দাহনে যেন পুড়িছে!

স্তম্ভিত দেব স্তম্ভিত ধরা হেরি ম্লান হ'ল সবিতা!
চাঁদিমা আননে পাণ্ডুর আভা! ছিঁড়িল মিলন-কবিতা!
সন্ধ্যা-বধূর জাগে সন্ত্রাস,
কাঁদিছে এলায়ে ঘন কেশপাশ!
গিরি-বনতল বিস্ময়ভরে হেরে গগনের ছবিতা।

অস্ত ভানুর বিজয়-আরতি ডুবে গেল আজি নিকষে।
ভেবে সারা হ'ল প্রকৃতি-বক্ষ ভরি দিবে আজি কি রসে!
তরু দিতে নারে ফুল অঞ্জলি, তরুণ বায়ুর নাহি সঞ্চলি,
মৃণাল-ভুজের মধু-কিঙ্কিণী নাহি সরসীর উরসে।

পাপড়ি মেলিয়া জাগে না কমল মধুভরা মধু-প্রভাতে,
বন্দনা গান গাহে না বিহগ রাজার বিশ্ব-সভাতে—
চক্রধারীর চিন্তা ললাটে, প্রকৃতির হিয়া বিরহে যে ফাটে!
দহিয়া অনলে এমন সাধনা কে করেছে হেন ধরাতে?

শ্রীমতী ইলারাণী মুখোপাধ্যায়।

বাণান-বিভ্রাট

[প্রায় বৎসর দুই পূর্ব্বে যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়োজিত বাণান-কমিটির প্রস্তাবাবলী উপলক্ষ্যে বঙ্গীয় শিক্ষিত সমাজে তুমুল আন্দোলন উঠিয়াছিল তখন এতৎসম্বন্ধে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ঘোষ এম্, এ. বি, এল্ মহাশয়ের সহিত কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আরও অনেক সুধীব্যক্তির পত্রালোচনা "মাসিক বসুমতী"তে প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই আন্দোলন ও আলোচনার সুফলও যথেষ্ট হইয়াছিল। সম্প্রতি এই প্রসঙ্গে দেবপ্রসাদ বাবু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতাধ্যাপক ডাঃ মুহম্মদ শহীদুল্লা মহাশয়কে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা বঙ্গভাষানুরাগী পাঠকের উপভোগ্য হইবে বিবেচনায় নিম্নে প্রকাশিত হইল। ইতি "মাসিক বসুমতী"-সম্পাদক।]

[অধ্যাপক ডাঃ মুহম্মদ শহীদুল্লা মহাশয় সমীপেষু]

কলিকাতা
১২শে বৈশাখ, ১৩৪৬

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

অনেকদিন আপনার সঙ্গে আমার পত্রব্যবহার হয় নাই। বছর দুই পূর্ব্বে যখন বাঙ্গালা বাণান লইয়া শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গে কিঞ্চিৎ আলোচনা আমার করিতে হইয়াছিল, এবং বিশ্ববিদ্যালয়-নিয়োজিত বাণান-সমিতির প্রস্তাবাবলীর বিরুদ্ধে কিঞ্চিৎ মসীযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, তখন আপনার নিকট দুই একখানি ছোট্ট চিঠি পাইয়াছিলাম। কিন্তু আজ অনেকদিন পরে এই বৈশাখ মাসের "প্রবাসী"-তে আপনার বাঙ্গালা-বাণান-সম্পর্কীয় প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া আপনাকে চিঠি না লিখিয়া থাকিতে পারিলাম না।

প্রথমেই বলিয়া রাখি যে আপনার এবারকার প্রবন্ধটি পড়িয়া আমি খুবই আনন্দিত হইয়াছি। আপনি যতগুলি প্রস্তাব করিয়াছেন সবগুলি সম্বন্ধেই যে আমি আপনার সহিত একমত তাহা নহে; কিন্তু বাণান-কমিটির প্রস্তাবাবলীর মধ্যে যে সমস্ত অসঙ্গতি ও ত্রুটী আপনি লক্ষ্য করিয়াছেন এবং এখন প্রকাশ করিয়াছেন, এই সমস্ত অসঙ্গতি ও ত্রুটীর বিরুদ্ধেই আমি দুই বৎসর পূর্ব্বে তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। উঁহারা সাধুভাষায় সুপ্রতিষ্ঠিত রূপেও যত্র তত্র বিকল্পের বিধান করিয়াছেন, আর কথ্যভাষাতে ত নিয়ন্ত্রণের পরিবর্ত্তে একেবারে বিকল্পের ছড়াছড়ি করিয়া ছাড়িয়াছেন; আবার কোন কোন স্থলে, যেমন রেফের পরে বর্ণদ্বিত্ব ও মূর্দ্ধন্য ণ বিষয়ে, কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত মাত্রায় সঙ্কল্প প্রদর্শন করিয়াছেন। বাণান-কমিটির এই বিকল্প-বিলাস এবং সঙ্কল্পের অত্যাচারের অসঙ্গতি ও অশোভনতাই আমি দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছিলাম। আজ অনেকদিন বিলম্বে হইলেও এবিষয়ে আপনার ন্যায় বিশেষজ্ঞ ও ভাষাবিদ্ পণ্ডিতের সমর্থন লাভে যথার্থই আনন্দিত হইয়াছি।* শুধু এইটুকু অনুযোগ করিবার ইচ্ছা মনে জাগে যে বহুপূর্ব্বেই এই সব মন্তব্য সুস্পষ্টভাবে আপনার করা উচিত ছিল—তাহা হইলে হয়ত এই সমস্ত প্রস্তাবাবলী-জনিত অনিষ্ট অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়া যাইত।

* "বানান ব্যুৎপত্তিসঙ্গত কিংবা ধ্বনিসঙ্গত হওয়া উচিত। কিন্তু যদি বানান কিছু ব্যুৎপত্তিসঙ্গত, কিছু ধ্বনিসঙ্গত হয়, তবে তাহা খামখেয়ালি হইবে মাত্র, বৈজ্ঞানিক নিয়ম হইবে না। ···· তবে বানানের ভয়ানক অনিয়ম হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানের নিয়মে সেই অনিয়মই ঘটিয়াছে। ইহা আমি দেখাইতেছি।

বিশ্ববিদ্যালয় ১০নং নিয়মে বলিতেছেন, 'মূল সংস্কৃত শব্দ অনুসারে তদ্ভব শব্দে শ ষ বা স হইবে; যথা, আঁশ (অংশু), আঁষ (আমিষ), শাঁস (শস্য), ইত্যাদি'। ইহা ব্যুৎপত্তিসঙ্গত বটে। কিন্তু ৭ নং নিয়মে তাঁহারা বলেন, 'অ-সংস্কৃত শব্দে কেবল ন হইবে; যথা, কান, সোনা, ইত্যাদি'। 'অথচ ব্যুৎপত্তির জন্য কাণ (কর্ণ), সোণা (স্বর্ণ), এইরূপ বানানই সঙ্গত। ব্যুৎপত্তিসঙ্গত বলিয়া শ, ষ, স চলিবে, অথচ ণ চলিবে না—এ কি নিয়ম?' হয় উভয়-ক্ষেত্রেই বানান ধ্বনিসঙ্গত হইবে, না হয় ব্যুৎপত্তিসঙ্গত হইবে।

আরও মজার কথা, কোন কোন বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় 'এ-ও হয়, ও-ও হয়' এই রকম স্বেচ্ছাচারের নিয়ম বা অনিয়ম করিয়াছেন। তাঁহারা ৫ নং নিয়মে বলেন, 'যদি মূল সংস্কৃত শব্দে ঈ বা ঊ থাকে, তবে তদ্ভব বা তৎসদৃশ শব্দে ঈ বা ঊ অথবা বিকল্পে ই বা উ হইবে।' ······ইহারও ব্যতিক্রম (exception) আছে।

৬ নং নিয়মটি বেশ কৌতূহলজনক। তাহাতে আছে, 'এই সকল শব্দে য না লিখিয়া জ লেখা বিধেয়—কাজ, জাউ, জাঁতা, জাঁতি, জুঁই, জুত, জো, জোড়, জোড়া, জোত, জোয়াল।' এই বানান-গুলি ধ্বনিসঙ্গত। কিন্তু ব্যুৎপত্তি ধরিলে য লেখা উচিত।·········

তাঁহারা তো ঈ ঊ স্থানে বিকল্পে ই উ ব্যবস্থা করিলেন, অথচ ১ নং নিয়মে বলিতেছেন, 'রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হইবে না।'

কারণ অনিষ্ট কিছু যে হইয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার নহে। যদিও তৎকালীন আন্দোলনের ফলে বঙ্গীয় শিক্ষাবিভাগ এবং শেষটা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও এই সব নূতন বানান "জোরের জোরে" চালাইবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়াছেন, তথাপি বানান-কমিটির কার্য্যকলাপের ফলে বানান-বিভ্রাট যে অনেক পরিমাণে ঘটিয়াছে তাহা নিঃসন্দেহ। আজকাল দেখিতে পাইবেন যে একই মাসিক পত্রিকায় হয়ত কতক প্রবন্ধে "আশ্চর্য্য স্টাইল"-এর বানান ও অন্যান্য প্রবন্ধে প্রচলিত রীতির বানান, পাশাপাশি চলিয়াছে। রবিবাবুর নিজের সাংস্কারিক উৎসাহও দেখিতেছি সম্পূর্ণটাই রেফের পরে বর্ণদ্বিত্ব করণেই নিয়োজিত—বানান-কমিটির অন্যান্য প্রস্তাবে মনোযোগ দেওয়ার কোন আবশ্যকতা তিনি দেখিতেছেন না।

এখানে পাণিনি প্রভৃতি সমস্ত বৈয়াকরণ বিকল্পে দ্বিত্ব বিধান করেন। ফলে দাঁড়াইতেছে অর্চনা, কর্তা প্রভৃতি শব্দগুলি সংস্কৃত ব্যাকরণ-মতে বিশুদ্ধ হইলেও, তাঁহাদের নিকট অচল!

চলিত বাঙ্গালার ক্রিয়াপদের বানান সম্বন্ধে তাঁহারা ১১ নং নিয়মে কয়েকটি উদাহরণ দিয়াছেন। এখানে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। তাঁহারা হব বা হবো, শোব বা শোবো, লিখব বা লিখবো, উঠব বা উঠবো এই রকমই বিধান দিয়াছেন; কিন্তু হ'ল, শুল, উঠল, হ'ত, শুত, উঠত প্রভৃতি স্থলে অন্ত্য অ-কার উচ্চারিত হইলেও বিকল্পে ও-কারের বিধান দেন নাই। ইহার কারণ আমাদের বুদ্ধির অগম্য।

তাঁহারা বলেন, 'লাম বিভক্তি স্থলে লুম বা লেম লেখা যাইতে পারে;' অর্থাৎ হ'লাম, হ'লুম, হ'লেম তিন রূপই হইতে পারে। যদি সকল বাঙ্গালাভাষীর মনস্তুষ্টির জন্য এইরূপ বিকল্পেই প্রশ্রয় দেওয়া হয়, তবে করছে, কচ্ছে, করছেছে, কর্‌তে আছে এইরূপগুলি কেন বিকল্পে ব্যবহার্য্য হইবে না? ....

তাঁহারা 'তুমি কর, লেখ, ওঠ' ইত্যাদি স্থলে ক্রিয়াপদের শেষে ও-কার দেন না; কিন্তু ক'রো, লিখো, উঠো ইত্যাদি স্থলে অন্ত্য ও-কারের ব্যবস্থা দিয়াছেন। ব্যুৎপত্তির দিক্ হইতে দেখিলে লেখ = প্রাচীন লিখহ, এবং লিখো = প্রাচীন লিখিহ। কাজেই ব্যুৎপত্তির দিক্ হইতেই হউক বা উচ্চারণের দিক্ হইতেই হউক, লেখ, লিখো—উভয় স্থানেই অন্ত্যস্বর একরূপেই বানান করা উচিত।...

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ৮নং নিয়মে বিকল্পে কাল, কালো; ভাল, ভালো; মত মতো, ইত্যাদি লেখার ব্যবস্থা দিয়াছেন। কিন্তু কাল (সময়, কল্য), চাল (চাউল, ছাদ, গতি), ডাল (দাইল, শাখা)—এইরূপ বানানের বিধান করিয়াছেন।......বলা হইয়াছে যে কলিকাতা অঞ্চলে কাল (সময়) এবং কাল (কল্য) ইত্যাদি শব্দযুগলের উচ্চারণে কোনও পার্থক্য নাই। কিন্তু কলিকাতার বাহিরে পশ্চিম বঙ্গের সর্ব্বস্থানে উচ্চারণ-পার্থক্য আছে, এবং তাহাদের ব্যুৎপত্তিও ভিন্ন। এজন্য আমরা এস্থলে কলিকাতার উচ্চারণ গ্রহণ করিতে পারি না। কলিকাতায় অনেকে ঘোঁড়া, ঘাঁস, ক্যাঁটা, ক্যাঁকড়া বলেন; প্রায় সকলেই কর্‌লুম, গেলুম বলেন। আমরা কিন্তু এই উচ্চারণ বা বানান মাথা পাতিয়া লইতে পারি না।" ডাঃ মুহম্মদ শহীদুল্লা, "বাঙ্গালা বানান-সম্পর্কে কয়েকটি কথা" ("প্রবাসী", বৈশাখ, ১৩৪৬)।

তিনি পূর্ব্ববৎ "চাকি," "কেরানি," "ইংরেজি," "বিলেতি," "বুড়ি," ইত্যাদি লঘুস্বরান্ত বানানই চালাইতেছেন। এবারকার "প্রবাসী"-তে রবিবাবুর প্রথম কবিতাটিতেও দেখিবেন যে "হাতী-হাতি" যুগপৎ পাশাপাশি গজেন্দ্রগমনে বিচরণ করিতেছে। অর্থাৎ লাভের মধ্যে হইয়াছে এই যে কথ্যভাষার যে রূপবাহুল্য, "গেলুম" "গেলেম" "গেলাম", "করছে" "কোরছে" "কচ্ছে" কচ্চে," ইত্যাদি, তাহা ত আগের মত উচ্ছৃঙ্খলভাবেই চলিতেছে, উপরন্তু সাধুভাষায় যে সব স্থলে এক রূপই সাহিত্যে চলিত ছিল সেখানেও নানাবিধ রকমারি রূপের আমদানী হইয়াছে। ঠিক এমনটিই আমি আশঙ্কা করিয়াছিলাম, এবং ঘটিয়াছেও অবিকল তাহাই। রকমসকম দেখিয়া মনে হইতেছে যে আজকালকার কোন কোন উদীয়মান নব্য "স্মার্ট" (অর্থাৎ smart) লেখক নয়া বানান ব্যবহার করাই সাহিত্যিক তরুণিমার লক্ষণ মনে করিতেছেন—ওদিকে কিন্তু স্ব-ণত্ব হ্রস্ব দীর্ঘ সম্বন্ধে তাঁহাদের ঔদাসীন্য অপরিমেয় (এবং হয়ত অজ্ঞতাও অগাধ)। সুতরাং বানান-কমিটির দৌলতে এই অনর্থক বানান-বিভ্রাটটি বাঙ্গালা ভাষার উপরে বেশ রীতিমতই চাপিয়া বসিয়াছে।

সে যাহা হউক, এখনও আপনার ন্যায় পণ্ডিতগণ এবিষয়ে অবহিত ও সতর্ক হইলে বোধ করি শ্রাদ্ধ আর অনেক দূর গড়াইবে না। আর এ শ্রাদ্ধ যে একেবারেই ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ। কারণ বাঙ্গালা সাধুভাষাতে এমন কোন গুরুতর বানান-বিশৃঙ্খলা নাই, যাহাতে ভয়ানক বিব্রত হইবার কোন কারণ ঘটিতে পারে—সংস্কৃত বা তৎসম শব্দে ত নাই-ই, এমন কি অধিকাংশ তদ্ভব এবং দেশজ শব্দেও নাই। আমার পূর্ব্বের আলোচনায় তাহা দেখাইয়াছি।

আছে কথ্য বা মৌখিক ভাষায়—মৌখিক উচ্চারণগুলি স্বভাবতঃই নানাবিধ এবং নানালোকে নানাভাবে সেগুলিকে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে। সুতরাং মৌখিকরূপের নানাবিধ shades and nuances of sound থাকিবেই, এবং ক্রমশঃ তাহার পরিবর্ত্তন হইবেই। সাধু সাহিত্যে যদি এই সব মৌখিক রূপ বহুলপরিমাণে আমদানী করা হয়, তবে এই বানান-বিশৃঙ্খলা অবশ্যম্ভাবী। বহু চেষ্টার ফলে যদি কোন নিয়ম আজ বাঁধিয়া দেওয়াও যায়, উচ্চারণ-বিকৃতির ফলে কালই সে নিয়ম ভাঙ্গিয়া যাইবে, কিংবা কৃত্রিম হইয়া দাঁড়াইবে। এই কারণেই মৌখিক বা colloquial রূপ, এবং নানাবিধ প্রাদেশিক বা dialectical রূপ সাধুসাহিত্যে ব্যবহৃত হওয়া উচিত নহে। এই কারণেই আমি পূর্ব্বের আলোচনার সময়ে রবীন্দ্রনাথকে লিখিয়াছিলাম, "সাধু বাঙ্গালা ত আর কোন অপরাধ করে নাই—বঙ্গভাষাভাষীদিগের নানাবিধ প্রাকৃত বুলি বা dialect-এর একটা সর্ব্বজনবোধ্য common form বা common forum সৃষ্টি করিয়াছে মাত্র!" আমি খুবই সুখী হইয়াছি যে এতদিন পরে বন্ধুবর সুনীতি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সাধুভাষা বনাম কথ্যভাষার দ্বন্দ্বপ্রসঙ্গে sanity-র দিকে ফিরিয়া আসিয়াছেন।* আশা করি, এই বানান-বিভ্রাট ব্যাপারেও অচিরেই তিনি অনুরূপ sanity প্রদর্শন করিবেন।

* বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের কুমিল্লা অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ।

থাক্। এবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা এ প্রসঙ্গে অনবশ্যক। যে সমস্ত detailed suggestion আপনি দিয়াছেন—কোন কোন বাণান-সম্বন্ধে—তাহা আলোচনার যোগ্য। এই সব বিষয়ে আমার মতামত আপনার অনেকটা জানাই আছে—পুনরুল্লেখ বোধ করি নিষ্প্রয়োজন। শুধু ছোট দুই একটা বিষয়ে কিছু বলি—পূর্ব্বে এবিষয়ে আমি কিছু বলিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না।

একটি হইল চন্দ্রবিন্দুর প্রয়োগ বিষয়ে। আমার মনে হয়—এবং আপনিও বোধ হয় লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন—যে রাঢ়দেশ কিঞ্চিৎ চন্দ্রাহত; সুতরাং চন্দ্রবিন্দুর কিঞ্চিৎ ছড়াছড়ি তথায় স্বাভাবিক; যেমন, ঘোঁড়া, হাঁস, প্রভৃতি। কিন্তু এসব স্থলে চন্দ্রবিন্দুর কোনই কারণ নাই। তাছাড়া, সাধারণভাবে বলিতে গেলে আমার মনে হয় যে যেখানে মূল শব্দে অনুনাসিক নাই, সেখানে তদ্ভব শব্দেও চন্দ্রবিন্দু থাকা উচিত নহে; যেমন, "ইষ্টক" হইতে "ইট," "উষ্ট্র" হইতে "উট", প্রভৃতি। মূলে অনুনাসিক থাকিলে অবশ্য চন্দ্রবিন্দু থাকাই উচিত। (ইট, উট শব্দে আপনি চন্দ্রবিন্দু কেন আনিতে চাহেন তাহা ভাল বুঝিলাম না—এ প্রসঙ্গে হিন্দী উচ্চারণের সার্থকতা কি? *)

দ্বিতীয় "গণ" শব্দের ব্যবহারে। আমার মনে হয় যে বাঙ্গালায় বহুবচনবাচক "রা" "গুলি" ইত্যাদি বিভক্তি ত আছেই (এবং সম্ভবতঃ "গুলি" বিভক্তিটি "গণ" হইতেই আগত); কাজেই "গুণীরা" "নেতারা" "বিদ্বানেরা" "পক্ষীগুলি" ইত্যাদি আমরা স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করিয়া কাজ চালাইতে পারি—সংস্কৃত "গণ" শব্দ লইয়া টানাটানি করিবার আবশ্যকতা নাই। একটু গুরুগম্ভীর ভাষাতেই "গণ" ব্যবহৃত হইয়া থাকে; তথায় আমার মনে হয় সংস্কৃত প্রয়োগানুসারে ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস ভাবেই উহার ব্যবহার হওয়া উচিত—সুতরাং "গুণিগণ" "নেতৃগণ" "বিদ্বদ্গণ" "মহাত্মগণ" লেখাই ভাল—দেখায়ও ভাল, শুনায়ও বেশ গুরুগম্ভীর। তাছাড়া, সংস্কৃতে "মাতৃগণ" "পিতৃগণ" প্রভৃতির ব্যবহার এত সুপরিচিত, যে সেই একই শব্দ বাঙ্গালাতে "মাতাগণ" "পিতাগণ"-রূপে লেখা অত্যন্ত অসুবিধা-জনক এবং আমার মনে হয় অসঙ্গত। † ("সকল" শব্দও সংস্কৃত, তবে বিশেষণরূপেই উহার ব্যবহার; বাঙ্গালার ন্যায় উহার "সমস্ত" অর্থে বিশেষ্য-প্রয়োগ—যেমন, ব্যাঘ্রসকল—ততটা দেখা যায় না।)

লিপ্যন্তর বিষয়ে আপনি সামান্য একটু আলোচনা করিয়াছেন। আমিও পূর্ব্বে এবিষয়ে অনেক আলোচনা করিয়াছি—বোধ করি আপনার স্মরণ আছে। তবে বাঙ্গালা ভাষার বাণান-আলোচনা প্রসঙ্গে ইহার গুরুত্ব খুব বেশী নহে। এবারকার প্রবন্ধে আপনি "z" কে "য" দিয়া প্রকাশ করিবার একটা প্রস্তাব করিয়াছেন। * আমার যতদূর মনে পড়ে, বাণান-কমিটির এক অধিবেশনেও আপনি এই আলোচনা তুলিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন যে "Aurangzeb"-কে আপনি "ঔরঙ্গযেব" লেখেন। এই প্রস্তাবের অসুবিধা কি জানেন? বাঙ্গালা উচ্চারণে য-এর উচ্চারণ জ-এর ন্যায়। সুতরাং আপনি "য" দিয়া লিখিলেও পাঠক উহাকে z-এর ন্যায় পড়িবে না, পড়িবে জ-এর ন্যায়ই; কারণ ঐরূপ দুই একটি transliterated শব্দ ব্যতীত আরও ত অজস্র য-ওয়ালা শব্দ ভাষাতে রহিয়াছে, যেমন, যে, যাহা, যন্ত্র, যামিনী, ইত্যাদি; তাহাদের যেরূপ উচ্চারণ করা হইয়া থাকে, পাঠক আপনার "ঔরঙ্গযেব"-এরও সেইরূপ উচ্চারণই করিবে। সুতরাং ধ্বনি পৃথক্করণের যে চেষ্টা আপনি "য" ব্যবহার দ্বারা করিতে চাহেন, তাহা সফল হইবে না। সে দিক্ দিয়া দেখিলে, জ-এর নীচে ফুটকি দিয়া প্রকাশ করিবার চেষ্টা বেশী ফলপ্রদ, কারণ জ-এ ফুটকি কোন প্রচলিত অক্ষর নহে, একেবারেই নূতন চিহ্ন, সুতরাং লোকে প্রথম হইতেই নূতন উচ্চারণ করিতে শিখিবে, জানিবে যে জ়=z। তবে এসম্বন্ধে আমার আসল বক্তব্য এই যে সাধারণ লৌকিক ব্যবহারে জনসাধারণের জন্য এত সূক্ষ্মতা বা refinement-এর কোনই আবশ্যকতা নাই—জ-এর ব্যবহারেই স্বচ্ছন্দে চলিতে পারে। দিল্লী যদি Delhi দ্বারা চলিতে পারে, ঢাকা যদি Dacca দ্বারা চলিতে পারে, Zebra তবে "জেব্রা" দ্বারা কেন চলিবে না? আর যদি পূর্ব্ববঙ্গীয় জ-এর উচ্চারণ ধরেন, তবে ত "জ" একেবারেই "z"—"জাহাজ"-কে আমরা বাঙ্গালরা বলি "zahaz"!

আর একটা কথা। একস্থানে আপনার যেন একটু ভুল হইয়াছে মনে হইল। আপনি লিখিয়াছেন "ক'নে (কন্যা), খ'ল (খইল) প্রভৃতি শব্দে অ-কারের উচ্চারণ জার্ম্মান Schön, Höll (Hölle?) প্রভৃতির অভিশ্রুত ও-কারের সমান।" আমার ত তাহা মনে হয় না। জার্ম্মাণ ö (o umlaut) যখন দীর্ঘ হয়, তখন উহা আদিতে ও-ভাবাক্রান্ত হইলেও শেষটা এ-তে পর্য্যবসিত হয়, এবং মোটামুটি বলিতে গেলে এ-ধ্বনিটাই উহার lasting এবং predominant ধ্বনি—সুতরাং Schön-এর উচ্চারণ কতকটা "শ্বেন্"-এর ন্যায় (ব-ফলার উচ্চারণ অন্তঃস্থ ব-এর উচ্চারণ ধরিতেছি)। আর হ্রস্ব ö-এর উচ্চারণও প্রায় ঐরূপই, তবে হ্রস্ব; এবং হ্রস্ব হওয়ার দরুণ কতকটা ইংরাজী "her"-এর ধ্বনির মত অর্থাৎ "হ্রস্ব আ"-র মত শুনায় অর্থাৎ, Hölle-এর উচ্চারণ ইংরাজী "Helle" কিংবা "Hulle" কিংবা ইহাদের মাঝামাঝি অতি সংক্ষিপ্ত একটা কিছু ধ্বনি। কিন্তু বাঙ্গালার ক'নে কিংবা খ'ল, ইহাদের অ-কারের ধ্বনি জার্ম্মাণ হ্রস্ব কিংবা দীর্ঘ ö-এর কোনটার মতই নহে। বরং একেবারে

* "ভাষাতত্ত্ব ও উচ্চারণের অনুরোধে বাঁকা (প্রাকৃত বঙ্ক), খাঁটি (প্রাচীন বাং খান্টি), খুঁটি (প্রাচীন বাং খুন্টি) ইট (হিন্দী ইঁটা), উঁট (হিন্দী উঁট) প্রভৃতি শব্দেও চন্দ্রবিন্দুর বিধান আবশ্যক।" ডাঃ শহীদুল্লার উল্লিখিত প্রবন্ধ।

† "আমাদের বিবেচনায় এখানে সম্বন্ধ-তৎপুরুষ না মানিয়া 'সকল' শব্দের ন্যায় 'গণ' বহুবচনের চিহ্ন বলিয়া স্বীকার করা কর্ত্তব্য; যেমন, চাঁদাদাতাগণ, বিদ্বান্‌গণ, পক্ষীগণ, মহাত্মাগণ।" ডাঃ শহীদুল্লার উল্লিখিত প্রবন্ধ।

* "যদি বিদেশী শব্দে z-এর জন্য 'য' ব্যবহার হয় তবে বিশেষ সুবিধা হয়। প্রাচীন ভারতীয় শিলালিপিতে Azes স্থানে 'অযস' পাওয়া যায়। আপত্তি হইবে যে য-কারের প্রকৃত উচ্চারণ z নয়। আমি বলিয়াছি সুবিধার জন্য 'য' ব্যবহার করিতে।" ডাঃ শহীদুল্লার উল্লিখিত প্রবন্ধ।

ঠিক বেশটি পাওয়া না গেলেও, ইহাদের উচ্চারণ "কোনে" এবং ".খাল"-এরই অনুরূপ। তাছাড়া, "বসিয়া" স্থলে কলিকাতা অঞ্চলের কথ্যরূপ "বোসে" হইলে, "কন্যা" (অর্থাৎ কন্‌+য়া) স্থলে কথ্যরূপ "কোনে" লেখা অসঙ্গত নহে। *

শুধু ধ্বনি-প্রসঙ্গেই আমি এই মন্তব্যটি করিলাম। আসলে,"বোসে" "কোনে" এই উভয় স্থলেই "ব'সে" "ক'নে" লেখা আমি পছন্দ করি—এমন কি "বসে" "কনে" লিখিতেও আমার আপত্তি নাই—প্রসঙ্গ বা context আলোচনা করিলেই ঠিক উচ্চারণটি পাঠক ধরিতে পারেন। বস্তুতঃ মৌখিক ভাষার এই সব সূক্ষ্ম পরিবর্ত্তমান ধ্বনি চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করাই দুরূহ। আর আপনার প্রস্তাবানুযায়ী ও-কার ব্যবহার করিলেই যে সব গোলমালের অবসান হইবে বা অনিশ্চয়তা দূরীভূত হইবে এমন নহে; † কারণ, "পোড়ে" লিখিলে কি বুঝিব ? পড়িয়া = প'ড়ে = পোড়ে, না, পুড়িয়া যায় —পোড়ে ? "মোরে" লিখিলে কি বুঝিব ? মরিয়া = ম'রে = মোরে, না, আমাকে = মোরে ? "ভোরে" লিখিলে কি বুঝিব ? ভরিয়া = ভ'রে = ভোরে, না, প্রভাতে = ভোরে ? কাজেই ambiguity একেবারে দূর করিবার কোন উপায় আছে ব'লিয়া মনে হয় না। যতটা মূল ধাতুর সহিত, ব্যুৎপত্তির সহিত সঙ্গতি রাখিয়া বাণান করা যায়, ততটাই মঙ্গল।

সে যাহাই হউক, আলোচনা এইখানেই সাঙ্গ করা যাউক। আমার মতামত আপনার অনেকটা জানাই আছে। আমি শুধু বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি ইহা দেখিয়া যে বাণান-কমিটির প্রধান প্রধান প্রস্তাব বিষয়ে—যথা রেফের পরে বর্ণদ্বিত্ব, মূর্দ্ধন্য ণ, হ্রস্ব দীর্ঘ, লাম-লুম-লেম, ইত্যাদি সম্বন্ধে এতদিন পরে আপনার নিকট হইতে আমার মতের সমর্থন পাইলাম। আপনাকে আমি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানিবেন। আপনার সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল প্রার্থনা করি। ইতি

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ

* 'ক'নে ঘরের কোণে ব'সে আছে" এই বাক্যে ক'নে ও কোণে এই দুই শব্দের উচ্চারণ আমার কাছে এক নয়। কাজেই 'ব'সে' (বসিয়া) স্থানে 'বোসে' লেখা চলে; কিন্তু 'ক'নে' স্থানে 'কোনে' লেখা চলিবে না।" ডাঃ শহীদুল্লার উল্লিখিত প্রবন্ধ।

† "করিয়া, বলিয়া, হইয়া ইত্যাদি পদের চলতি রূপে কোরে, বোলে, হোয়ে লেখা আবশ্যক। আমাদের বিবেচনায় অন্যত্র যেখানে অভিশ্রুতি (umlaut) এর জন্য আদ্য স্বরে ও-কার উচ্চারণ হয়, বানানে উর্দ্ধকমা ব্যবহার না করিয়া সোজাসুজি ও-কার ব্যবহার করা উচিত।" ডাঃ শহীদুল্লার উল্লিখিত প্রবন্ধ।

গতিমুখে

চলে গেছে মসীনয়ী সন্ধ্যা
পোহায়েছে ওরে কালরাত্রি,
টুটে গেছে আঁখি হতে তন্দ্রা
ছুটে চলে সম্মুখে যাত্রী !

স্তব্ধ গিরির শিরে গম্ভীর
ধূর্জটি ধ্যান তাঁর ভাঙ্‌লো,
শঙ্খে শ্বসিত সতী-মন্দির—
শাওনের বর্ষণ নাম্‌লো !

দিন যায় দুঃখে ও হর্ষে
আশা জাগে কম্পিত বক্ষে ;
চিত্ত চমকে কার স্পর্শে,—
গেছে পথ ধেয়ে ধ্রুব লক্ষ্যে !

পিছনের ক্রন্দন থামেনি
জানি আজও নেই কত বাহিরে !—
এখনো গলিত শিলা নামেনি —
নদীতে জোয়ার বেগ নাহি রে !

যাবে মুছে ক্ষীয়মান ভ্রান্তি
যাবে ধীরে জড়তার পঙ্ক
কবে হয়ে গেছে গ্রহশান্তি
ভাগ্যের গগন নিঃশঙ্ক !

ঐ দেখ্ আকাশের আলোকে
মুক্তির অপূর্ব্ব নর্ত্তন ;
পুষ্পে ও মঙ্গল তিলকে
জাতির এ মহাপরিবর্ত্তন !

শ্রীবিমলচন্দ্র নস্কর

[উপন্যাস]
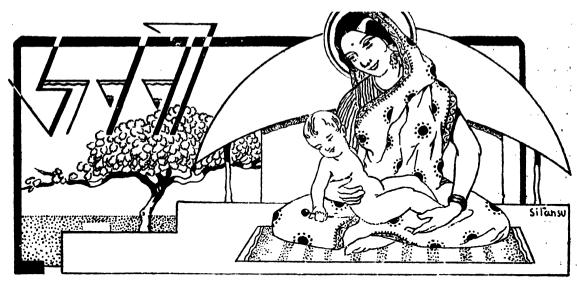
সম্মুখে দেবদত্তের পরীক্ষা ছিল। পাছে তাহার অধ্যয়নে কোন ক্ষতি হয়, সেই জন্য মৃণালিনী তাহার বিবাহের যে আয়োজন করিতে লাগিলেন, তাহা কতকটা গোপনেই হইতে লাগিল। আয়োজনের অনেকটা আর করিতে হইবে না—মৃণালিনীর যে অলঙ্কার ছিল, তাহাই যথেষ্ট। এক দিন তিনি কণাকে ও রেণুকে ডাকিয়া সে সব দেখাইয়া বলিলেন—"এখন ত সব নূতন ধরণ হয়েছে তোমরা দেখ, কোন্‌খানা রাখবে, কোন্‌খানা ভেঙ্গে নূতন করবে, ভেবে দেখ।" বলিতে বলিতে তিনি এক জোড়া বালা সরাইয়া রাখিলেন। সে জোড়াটি দেখিয়া কণা বলিল, "ঐ জোড়াটি সরাচ্ছেন কেন?"

মৃণালিনী বলিলেন, "ও জোড়াটি ভাঙ্গা হ'বে না।"

কণা হাসিয়া বলিল, "ওর উপরে অত মায়া কেন, দিদিমা?"

"বালা জোড়াটি আমার শাশুড়ীর ছিল; তিনি 'বৌ-পরিচয়ে' ঐ দিয়ে আমাকে দেখেছিলেন—ও দেবুর বৌ পা'বে—তা'র ইচ্ছা হয়, সে ভেঙ্গে নূতন গহনা গড়াবে।"

কণা বালা জোড়াটি হাতে লইয়া বলিল, "অনেক দিন ব্যবহার হয়েছে—এই বুঝি সে সময়ে চলিত ছিল?

"হাঁ। ওর নাম অমৃতিপাক।"

রেণু বলিল, "কোন গহনাই বদলান হ'বে না।"

মৃণালিনী বলিলেন, "বলিস্ কি, মা, এ সব যে সেকেলে—দেখ্‌লে লোক হাসবে।"

"তা' হাসুক। তোমার শাশুড়ীর বালা ভাঙ্গতে তোমার যেমন ব্যথা বোধ হয়, তোমার গহনা ভাঙ্গতে কি আমার তেমনই কষ্ট হয় না?"

কণা বলিল, "মা ঠিক বলেছেন—ও সব আপনার গায়ে দেওয়া—ও সব পরা বৌয়ের ভাগ্য বলতে হ'বে।"

মৃণালিনী বলিলেন, "আশীর্ব্বাদ করি, যেন আমার ভাগ্য তোমরা কেউ না পাও।"

স্থির হইল, সব গহনাই যেমন আছে, তেমনই থাকিবে—বরং নূতন ধরণের দুই চারিখানি প্রস্তুত করান হইবে।

কণার ও অশোকের জননীর যে সব অলঙ্কার ছিল, সে সব কণাকে ও অমলাকে দেওয়া হইয়াছিল—রেণু কখন সে সব ব্যবহার করে নাই।

কাপড় কিনিবার ভার কণাকে দেওয়া হইল—সে তাহার শাশুড়ীর সহিত পরামর্শ করিয়া সে সব কিনিবে। রেণু কখন সখ করিয়া কোন কাপড় কিনে নাই, জামা করায় নাই। কাযেই তাহাকে সে ভার দেওয়া বৃথা।

অমলার ভগিনী কমলাকে আর নূতন করিয়া "দেখিতে" হইল না।

দেবদত্তের পরীক্ষা হইয়া গেল। তাহার পরীক্ষার পূর্ব্বে মৃণালিনী তাহাকে প্রতিদিন আপনার কাছে

বসাইয়া আয়-ব্যয়ের বিষয় বুঝাইয়া দিতেন—কেবল পরীক্ষার অব্যবহিত পূর্ব্বে তিন মাস আর তাহা করেন নাই। কাযেই বৈষয়িক ব্যাপারেও তাহার অভিজ্ঞতা জন্মিতেছিল। মৃণালিনী আপনি প্রস্তুত হইতেছিলেন—তিনি দেবদত্তকে কার্য্যভার দিয়া স্বয়ং অবসর গ্রহণ করিবেন। তিনি জানিতেন, এই কার্য্যের গুরুত্ব ও দায়িত্ব অসাধারণ; ইহাতে যে সতর্কতা প্রয়োজন, তাহা একটু শিথিল হইলেই ক্ষতি অনিবার্য্য হয়। কাযেই ইহা শিক্ষাসাপেক্ষ। সে শিক্ষা তাঁহাকে "ঠেকিয়া" লাভ করিতে হইয়াছিল। তিনি তাঁহার অভিজ্ঞতা যথাসম্ভব দেবদত্তকে দিতেছিলেন যে, সে "দেখিয়া" শিখিতে পারে এবং তাহার শিক্ষা তাহাকে তাহার স্বার্থরক্ষায় সমর্থ করে।

দেবসেবার অনুষ্ঠানে আত্মনিয়োগ করিয়া মৃণালিনী এখন তাহাতে যেরূপ অনুরক্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে সে কাযে তিনি আনন্দ বা তৃপ্তি অনুভব করিতেন। কিন্তু বিষয়কর্ম্মে তিনি কখন সে তৃপ্তি লাভ করেন নাই; কেবল কর্ত্তব্যবোধেই তিনি তাহা করিতেন এবং তাঁহার কর্ত্তব্য-বোধ এমনই প্রবল ছিল যে, সে কার্য্যে তিনি দক্ষতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন—তাঁহাকে প্রতারিত করা কাহারও পক্ষে সহজ ব্যাপার ছিল না।

দেবদত্তের পরীক্ষা শেষ হইবার পর তাহার বিবাহের আয়োজন আর কাহারও নিকট গোপন রহিল না। কিন্তু মৃণালিনী লক্ষ্য করিলেন, দেবদত্তের মুখে চিন্তার ভাব দেখা যাইতে লাগিল। তিনি তাহা লক্ষ্য করিয়া প্রথমে আপনি তাহার কারণ চিন্তা করিতে লাগিলেন। কেন এমন হইতেছে? যখন বসন্তাগম হয়, তখন যেমন তরুলতায় পত্র ও পুষ্প স্বভাবতঃ আত্ম-প্রকাশ করে—যেমন পিককণ্ঠে গীত আপনি ব্যক্ত হয়, তেমনই কৈশোরের পর মানুষের মনে ভালবাসিবার ও ভালবাসা লাভ করিবার বাসনা স্বতঃই স্ফূর্ত্ত হয়; তাই ইংরেজ কবি টেনিসন লিখিয়াছেন, বসন্তকালে বিহঙ্গমের অঙ্গে নূতন বর্ণপাত হয় আর যুবকের চিন্তা স্বভাবতঃই প্রেমের দিকে অগ্রসর হয়। যৌবনই মানবের জীবনে বসন্ত। আমাদিগের এই দেশে ঐ বাসনা তাহার পরি-তৃপ্তির পাত্র সন্ধান করিয়া যাহাতে ভুল না করে, সেই জন্য সামাজিক নিয়মে—বিবাহের দ্বারা সেই পাত্র তরুণ-তরুণীকে—পত্নী ও পতিতে প্রদান করা হইত। ধর্ম্মের বন্ধন সেই পাত্রেই তাহাদিগকে আকৃষ্ট করিত। এই অবস্থায় বিবাহের কথায় দেবদত্ত কেন চিন্তিত হইল, তাহা বুঝিবার চেষ্টা মৃণালিনী করিতে লাগিলেন। তিনি সে বিষয়ে রেণুর ও কণার সহিত আলোচনাও করিলেন। কিন্তু কেহই কারণ নির্ণয় করিতে পারেন নাই। রেণু বলিয়া-ছিল, সে তাহার স্বামীকে এই কথা বলিয়াছিল, সে বলিয়াছে—কেবল অধ্যয়ন করিয়া দেবদত্ত অত্যন্ত গম্ভীর-প্রকৃতি হইয়াছে এবং সব বিষয়েই অকারণ অধিক গুরুত্বা-রোপ করে, সেই জন্য সে বিবাহ বিশেষ দায়িত্ব ও গুরুত্বপূর্ণ মনে করিতেছে—ও ভাব থাকিবে না। তাহার পর সুনীল যাহা বলিয়াছিল, তাহা স্মরণ করিয়া কণার মুখে লজ্জার অরুণআভা ফুটিয়া উঠিল। সুনীল বলিয়াছিল, "হয় ত আমিও কত কথা ভেবেছিলাম কিন্তু তুমি এসে সে ভাবনা ভালবাসায় ভাসিয়ে দিলে"—বলিয়া সে পত্নীকে আদর করিয়াছিল।

শুনিয়া মৃণালিনী বলিলেন, "হবেও বা। বুড়ো মানুষের কাছে থেকে দেবু যেন অকালে গম্ভীর হয়েছে।"

রেণু কোন কথা বলিল না বটে, কিন্তু সংবাদটা তাহার চিন্তার কারণ হইল। সে মনে করিল, তাহার যে অদৃষ্ট, তাহাতে না জানি কি হয়! যে অদৃষ্ট তাহার সমস্ত জীবন ব্যর্থতায় পরিণত করিয়াছে, সেই অদৃষ্ট কি তাহার সন্তানকেও অনুসরণ করিবে? সে দিন গৃহে ফিরিবার সময় সে মাসীমা'র ঠাকুর-ঘরে দেবতাকে প্রণাম করিবার সময় দেবতার চরণে নিবেদন জ্ঞাপন করিল—সে তাহার ব্যর্থ জীবনে আরও যাহা সহ্য করিতে হয় অকাতরে করিবে, কিন্তু দেবদত্ত যেন সুখী হয়।

কণার কথা শুনিয়া মৃণালিনী অনেকটা আশ্বাস পাইয়া-ছিলেন; কাযেই তিনি ঐ বিষয়ে আর অধিক মনোযোগ দিলেন না।

মৃণালিনীর সকল দিকে লক্ষ্য থাকিত, তাই তিনি মনে করিয়াছিলেন, নীরেন্দ্র যতই নির্লিপ্ত থাকিতে চাহুক না কেন, তাহার কর্ত্তব্যে তাহাকে বঞ্চিত করা হইবে না। তিনি নীরেন্দ্রকে ডাকিয়া পাঠাইয়া তাহার সহিত পরামর্শ করিবার চেষ্টা করিলেন। নীরেন্দ্র বলিল, "আমাকে আবার কি জিজ্ঞাসা করবেন, মাসীমা? আপনি যা'

করবেন, তা'তে কোন কথাই থাকতে পারে না। তা'র উপর আবার আপনি আপনার মেয়ের সঙ্গে পরামর্শ করছেন।"

মৃণালিনী হাসিয়া বলিলেন, "এখন আরও এক জন —এক জন কেন, দু'জন পরামর্শ করবার লোক জুটেছেন।"

"কে কে, মাসীমা।"

"প্রথম কণা—তিনিই ত এর মূলে আছেন—তিনি একাধারে বরকর্ত্তা, কন্যাকর্ত্তা, ঘটক।"

"তিনি ত এক জন, আর এক জন?"

"অমলা। তাঁ'র ভগিনীর সঙ্গে সম্বন্ধ।"

নীরেন্দ্র হাসিয়া বলিল, "অবশিষ্ট কেবল অশোক?"

মৃণালিনী বলিলেন, "বাবা, তুমিও যখন পাশ কাটাবার চেষ্টা করছ, তখন আমরা মনে করছি, কাযটায় আমরা আর পুরুষের সম্পর্ক রাখব না।"

"তা' যদি করেন, মাসীমা, তবে দেখবেন, কাযটা যেমন সুশৃঙ্খলায় সম্পন্ন হ'বে, তেমনই সুসম্পন্ন হবে।"

"যত গোল তোমরাই পাকিয়ে তুল?"

নীরেন্দ্র বলিল, "সে বিষয়ে আমি কবুল-জবাব দিচ্ছি, মাসীমা।"

তাহার পর মৃণালিনী নীরেন্দ্রকে ফর্দ্দ দেখাইলেন ও জিনিসগুলি দেখাইবার জন্য আহ্বান করিলেন।

নীরেন্দ্র বলিল, "আপনি দেখা'বেন, আমি দেখছি; কিন্তু আমি যে কোন মতপ্রকাশের অধিকারী নই, তা' আমি ভালরূপই জানি।"

এ দিকে আয়োজন চলিল। ও দিকে কন্যাপক্ষের সঙ্গে কথাবার্ত্তাও অগ্রসর হইতে লাগিল। অবশ্য সে বিষয়ে কোন গোল হইল না—হইবে, এমন বিশ্বাসও কাহারও ছিল না। কন্যাপক্ষ অমলার বিবাহ দিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহারা কমলার এই বিবাহ-প্রস্তাবে আপনাদিগকে বিশেষ ভাগ্যবান বলিয়াই মনে করিলেন।

কিন্তু মৃণালিনী যতই লক্ষ্য করিতে লাগিলেন, দেবদত্তের মুখে চিন্তার ছায়া, ততই তাঁহার মন অস্থির করিতে লাগিল। তিনি যে দারিদ্র গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি অন্তরের মধ্য হইতে সমর্থন লাভ করিয়াছিলেন। তিনি কোন কায করিবার পূর্ব্বে দেবতাকে স্মরণ করিতেন। এবারও তিনি তাহাই করিলেন। কিন্তু যখন তাঁহার মনের সন্দেহ ঘুচিল না, তখনই তিনি অস্বস্তি অনুভব করিলেন। তিনি রেণুকে ও কণাকে ডাকিয়া বলিলেন, তিনি দেবদত্তের নিকট তাহার মত জিজ্ঞাসা করিবেন।

শুনিয়া কণা রাগ করিল—"দিদিমা, আপনি কি ছেলেকে ইংরেজ ভাবছেন?"

মৃণালিনী বলিলেন, "না, দিদি, দেবুকে ত কখন আমি চিন্তিত দেখিনি! তাই আমার ভয় হচ্ছে।"

কণা হাসিয়া বলিল, "তা'হলে মেয়ের মতও জিজ্ঞাসা করবেন ত?"

মৃণালিনী বলিলেন, "সে তোমরা বল্‌তে পার। এ কালের কথা ত আমরা বল্‌তে পারি না।"

"কিন্তু আপনি যে একেবারে এ কালের ব্যবহারই কর-ছেন, দিদিমা। কই অশোককে ত কিছু জিজ্ঞাসা করেন নি।"

"তা'কে ত চিন্তিতও দেখিনি, দিদি। বরং তার মুখে হাসিই ফুটে উঠ্‌তে দেখেছি।"

"অর্থাৎ সেই

'মুখের হাসি চাপলে কি হয়—
প্রাণের হাসি চোখে খেলে।'

কি বলেন, দিদিমা।"

রেণু বলিল, "আপনার যখন জিজ্ঞাসা করতেই ইচ্ছা হয়েছে, তখন তা'ই করুন।"

মৃণালিনী বলিলেন, "তাই করব। মন নারায়ণ।"

সে দিন সন্ধ্যায় ঠাকুর-ঘরে বসিয়া মৃণালিনী বহুক্ষণ ভাবিলেন, আর ঠাকুরকে ডাকিলেন। তিনি তাহার পর যাইয়া যখন শয়ন করিলেন, তখন দেবদত্ত ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কাযেই তখন আর তাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করা হইল না। তিনি যখন সে ঘুমাইয়াছে কি না দেখিতে-ছিলেন, তখন তিনি লক্ষ্য করিলেন, একগুচ্ছ চুল তাহার কপালের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। তিনি অতি সাবধানে সেই কেশগুচ্ছ সরাইয়া যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করিলেন।

কিন্তু তাহাতেই দেবদত্তের নিদ্রাভঙ্গ হইল। নিদ্রাভঙ্গ হইল বটে, কিন্তু সে চক্ষু উন্মীলিত করিল না। তাহার মনের মধ্যে যে ভাব কয় দিন তাহাকে চঞ্চল করিতেছিল,

তাহার পক্ষে মৃণালিনীর এই স্নেহপরিচয় এই স্পর্শ যেন সে বিক্ষুব্ধ ভাবের ভেষজ বলিয়া তাহার মনে হইল।

অতি ধীরে তাহার মস্তকে করতল অর্পিত করিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া মৃণালিনী যাইয়া পার্শ্বে তাঁহার শয্যায় শয়ন করিলেন। কিন্তু বহুক্ষণ তাঁহার নিদ্রা হইল না! তিনি কত কথা ভাবিতে লাগিলেন। তিনি জানিতে পারিলেন না, দেবদত্তও বিনিদ্রাবস্থ হইয়া অনেক কথা ভাবিতেছিল। তাহার মনের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব চলিতেছিল, তাহা যেন সে আর গোপন করিতে পারিতেছিল না। কিন্তু মনে কোন দ্বিধা—কোন সন্দেহ উপস্থিত হইলে যাঁহার নিকট তাহা জানাইয়া সে শান্তিলাভ করিত, এ বার সে তাঁহাকেই সে কথা জানাইতে পারিতেছিল না। যিনি তাহাকে যে স্নেহে পালন করিয়াছেন, তাহা সে জানে এবং জানিয়া সে কিছুতেই তাঁহার অভিপ্রায়বিরুদ্ধ কোন কাষ করিতে পারে না। কিন্তু তাহার মনের মধ্যে যে অভিমান বেদনায় পরিণত হইয়াছিল, তাহা তাহাকে ব্যথিতই করিতেছিল। সে কি করিবে, তাহা স্থির করিতে পারিতেছিল না।

প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করা দেবদত্তের অভ্যাসে পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু মৃণালিনী তাহারও পূর্ব্বে শয্যা ত্যাগ করিয়া যাইতেন। তিনি যখন কক্ষ ত্যাগ করিতেন, তখনও দেবদত্তের নিদ্রাভঙ্গ হইত না। পরদিন শয্যাত্যাগ করিয়া যাইবার সময় মৃণালিনী দেখিলেন, মুক্ত বাতায়নপথে যে আলোক কক্ষে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাতে মনে হইল—দেবদত্ত জাগিয়া আছে। তিনি আলোকটি জ্বালিলেন। দেবদত্ত জাগিয়া ছিল—শয্যাত্যাগ করিল।

মৃণালিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঘুম কি এখন ভেঙ্গে গেল ?"

দেবদত্ত কখন মৃণালিনীর নিকট মিথ্যা কথা বলিবার কথা কল্পনাও করিতে পারে নাই; সে বলিল, "না—আগেই ভেঙ্গেছে।"

"ভাল ঘুম হয় নি ?"

"না।"

মৃণালিনী মনে করিলেন, তিনি যাহা স্থির করিতেছিলেন, তাহাই করণীয়। তিনি বলিলেন, "দেবু, আমি ক' দিন থেকেই লক্ষ্য করছি, তুমি যেন বিষণ্ণ—চিন্তিত।"

দেবদত্ত কোন কথা বলিল না।

মৃণালিনী বলিলেন, "আমি—আমরা তোমার বিয়ের আয়োজন করছি। আমরা মনে করেছিলাম, তুমি মনে করবে, আমরা যা' করব, তা' তোমার মঙ্গল হ'বে বলেই করব।"

দেবদত্ত বলিল, "তা'তে আমার কোন সন্দেহই নাই।"

"কিন্তু আমি দেখছি, তুমি বিষণ্ণ।"

দেবদত্ত কোন কথা বলিল না।

"তাই আমি রেণুকে আর কণাকে বলেছি, হয় ত এ বিয়েয় তোমার আপত্তি আছে—আমি তোমাকে কথাটা জিজ্ঞাসা করব শুনে কণা আমার উপর রাগ করেছে, বলেছে, আমি তোমাকে ইংরেজ ভাবছি। কিন্তু আমি মনে করেছি, তোমায় জিজ্ঞাসা করব।"

দেবদত্ত চুপ করিয়া রহিল।

মৃণালিনী বলিলেন, "আজ আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি, এ বিয়েতে কি তোমার আপত্তি আছে ?

দেবদত্ত বলিল, "আপনি যা' করবেন, তা'তে আমার কোন আপত্তি থাকতে পারে না।"

মৃণালিনী লক্ষ্য করিলেন, দেবদত্তের দেহ মৃদু মৃদু কম্পিত হইতেছিল। তিনি বলিলেন, "আমার কাছে তোমার সুখের চেয়ে বড় আর কিছু নাই; আমার জন্য নিজের কষ্ট বরণ করে নিও না।"

দেবদত্ত যেন আর আপনাকে সংযত রাখিতে পারিতেছিল না। সে বলিল, "তা' নয়। তবে—"

মৃণালিনী জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে দেবদত্তের দিকে চাহিলেন। দেবদত্ত বলিল, "কিন্তু যে সংসারে মা আপনার ছেলেকে বিলিয়ে দিতে পারেন, সে সংসারে আর ভার বাড়ান কেন ?"

যে অভিমান এত দিন তাহার মনে পুঞ্জীভূত হইয়াছিল, আজ সহসা তাহা আত্মপ্রকাশ করিয়া ফেলিল। মনের ভার যে লঘু হইল, তাহা সে অনুভব করিতে পারিল না—কারণ, কথাটা বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই দেবদত্তের মনে হইল, তাহার কথায় মৃণালিনী আঘাত পাইলেন না ত ?

মৃণালিনী কিরূপ আঘাত পাইলেন, তাহা সে প্রথমে অনুমান করিতেও পারিল না—অনুভব করা ত পরের কথা। কিন্তু যে আঘাতে কেহ কেহ ভাঙ্গিয়া পড়ে, কেহ কেহ তাহা

সহ্য করিয়া তাহা প্রস্তুত করিতেও পারে। দেবদত্তের কথা মৃণালিনীর নিকট এমনই অপ্রত্যাশিত ছিল যে, তিনি মুহূর্ত্তের জন্য যেন প্রাণহীন পাষাণ-প্রতিমার মত প্রতীয়মান হইলেন। কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্য। তাহার পরই তিনি বলিলেন, "তুমি কিন্তু একটা দিকই দেখেছ; আর একটা দিক দেখ নি। সন্তানের কল্যাণ হ'বে বিশ্বাস ক'রে—সে বিশ্বাস ভুলও হ'তে পারে—মা যেমন তা'র সন্তানকে বিলিয়ে দিতে পারে; তেমনই মা'র স্নেহের ক্ষুধায় নিঃসন্তান নারী পরের সন্তানকে বুকে নিয়ে আপনার মনে ক'রে।"

শেষ দিকে মৃণালিনীর গলাটা যেন কেমন "ধরিয়া" আসিতেছিল।

দেবদত্ত কখন মৃণালিনীকে বিচলিতা হইতে দেখে নাই; তাই সে তাহার কথার গুরুত্ব উপলব্ধি করিল। সে এতক্ষণ দৃষ্টি নত করিয়াই ছিল; এই বার মুখ তুলিয়া চাহিল—তাহার মনে হইল, মৃণালিনীর দুই চক্ষুতে অশ্রু আসিয়াছে।

সে কি করিয়াছে? দেবদত্ত একেবারে বসিয়া পড়িয়া মৃণালিনীর দুই পদ জড়াইয়া ধরিল, আবেগকম্পিত কণ্ঠে বলিল, "মা, আমি আপনাকে ব্যথা দিয়েছি—আপনি কি আমার উপর রাগ করবেন?"

মৃণালিনী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না—তিনিও বসিয়া পড়িলেন; দেবদত্তকে বুকে টানিয়া লইয়া বলিলেন, "আমি তোমার উপর রাগ করতে পারি না—কেবল তোমাকে আশীর্ব্বাদ করতেই পারি।"

দেবদত্ত বলিল, "আমাকে আশীর্ব্বাদই করুন—মা, আশীর্ব্বাদই করুন।"

মৃণালিনী তাহার কণ্ঠস্বরে বুঝিতে পারিলেন, সে কাঁদিতেছিল। তিনি তাহাকে বলিলেন, "আমি রাগ করিনি—করতে পারি না।"

তাহার পর মৃণালিনী আপনার নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে চলিয়া যাইলেন।

দেবদত্ত ভাবিতে লাগিল।

[ক্রমশঃ।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

তুমি মোরে করিলে সুন্দর

সম্মুখে মুকুর রাজে, পড়েছে তাহাতে
আমারি মুখের ছায়া। সুগভীর রাতে
কাল তুমি এই মুখে এঁকেছ চুম্বন—
প্রেমের অমৃতধারা করেছ সিঞ্চন।
এই ওষ্ঠ, এই মোর তন্দ্রাতুর আঁখি
তোমার আঁখির 'পরে দৃষ্টিটুকু রাখি'
লভিয়াছে স্পর্শ তব ওই সুকুমার
রক্ত অধরের।
আপনারে কত বার
হেরিয়াছি এ মুকুরে, শুধু লজ্জা-গ্লানি
করেছে চঞ্চল মোরে! তুমি দিলে টানি'
বিস্মৃতির যবনিকা সর্ব্বগ্লানি 'পরে;
তুমি মোরে করিলে সুন্দর! থরে থরে
সৃজনের শতদল উঠিল ফুটিয়া
শব্দহীন মৌন তুমি, মূর্চ্ছাহত হিয়া!
লভিলাম নব জন্ম! তোমার পরশ,
ওই তব চারু অঙ্গ কোমল সরস
রূপের মাধুরী-ধারে ভরি' দিল আজ
এ দেহ আমার। মৃদু-কম্পিত সলাজ
তোমার হৃদয়খানি মোর বক্ষোদেশে
রেখেছ সোহাগভরে। মৃদু হাসি হেসে
খুলিয়া দিয়েছি তব কৃষ্ণ কেশপাশ
কাজল মেঘের মত। করেছি প্রকাশ
বিদ্যুতের বহ্নি তব নয়নের কোণে।
তুমি শুধু অসহায় বাহুর বাঁধনে
বাঁধিয়াছ কণ্ঠ মোর; প্রেম-অশ্রুজলে
লুকায়েছ মুখখানি মোর গ্রীবাতলে।

রূপের সায়রে তব করি' পুণ্যস্নান
কাহিনী যা' ছিল তা'র লভিনু সন্ধান!

শ্রীবিমলকৃষ্ণ সরকার।

য়ুরোপে মহাসংগ্রাম কি আসন্ন?

পৃথিবীর রাজনীতিক পরিস্থিতির কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। এখনও সকলের মুখে সেই একই জিজ্ঞাসা—শীঘ্র কি য়ুরোপে সংগ্রাম বাধিবে? কেহ কেহ বলিতেছেন, যুদ্ধ আবার নূতন করিয়া বাধিবে কি, যুদ্ধ বাধিয়াই ত আছে। সাত বৎসর পূর্ব্বে যখন জাপান মাঞ্চুরিয়া দেশটা দখল করিয়া বসিয়াছিল, তখনই ত সংগ্রাম বাধিয়াছে। তাহার পর স্পেনের গৃহ-যুদ্ধ, ইটালী কর্ত্তৃক আবিসিনিয়া গ্রাস, এ সমস্ত খণ্ডযুদ্ধ ত ঐ বৃহত্তর যুদ্ধের এক একটা পর্ব্ব। কথা-গুলি এক হিসাবে সত্য। কিন্তু এরূপ ভাবগত সংগ্রামের কথা ধরিয়া সংগ্রামের কথা বিচার করিতে হইলে আরও সূক্ষ্ম হিসাব করিয়া বলিতে হয় যে, যে সময়ে পৃথিবীতে কতকগুলি জাতি সাম্রাজ্যবাদী হইয়া উঠিয়াছিল, সেই সময় হইতেই এই প্রবহমান সংগ্রামের আরম্ভ হইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যে সময় ইংরেজ এবং ফরাসী এই দুইটি সাম্রাজ্যলোলুপ জাতি ভারতের দক্ষিণাপথে এবং উত্তর-আমেরিকার কুইবেক অঞ্চলে সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছিল, সেই সময়েই এই প্রবহমান সংগ্রামের উৎস ফুটিয়া উঠে। তদবধি এই সংগ্রামের ধারা কখনও প্রচ্ছন্ন ভাবে, কখনও প্রকট ভাবে বহিয়া চলিতেছে। এক কথায় যেদিন সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বগ্রাসী বদন মানব-সমাজে বিস্তৃত হইয়াছে, সেই দিনই এই প্রবহমান সংগ্রাম আরব্ধ হইয়াছে। এ প্রসঙ্গে আমরা সেই প্রচ্ছন্ন সংগ্রামের কথা বলিব না। প্রকট সংগ্রামের কথাই আলোচনা করিব।

পৃথিবীতে এখন দুই প্রকারের সাম্রাজ্যবাদী দেশ আছে। এক প্রকার সাম্রাজ্যবাদীদিগের অধিকারে বহু দেশ আছে,—আর এক প্রকারের সাম্রাজ্যবাদী দেশের অধিকারে অধিক দেশ নাই। গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স এবং মার্কিণ এই তিনটি দেশই 'ভুক্তসাম্রাজ্যবাদী' দেশ; অর্থাৎ তাহাদের অধিকারে অনেক দেশ আছে। জার্ম্মাণী, ইটালী এবং জাপান 'অভুক্তসাম্রাজ্যবাদী' দেশ, কারণ, তাহাদের সাম্রাজ্য প্রাপ্তির ক্ষুধা নিবৃত্ত হয় নাই। জার্ম্মাণীর প্রায় সমস্ত অধিকৃত বিদেশী রাজ্য বিগত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের ফলে জার্ম্মাণরা হারাইয়া ফেলিয়াছে। তাহার অনেকগুলি এখন ইংরেজের হস্তে প্রদত্ত আছে। যাহাদের সাম্রাজ্য-প্রাপ্তির ক্ষুধা আছে—কিন্তু সাম্রাজ্য নাই,—তাহারা বিষম মুস্কিলে পড়িয়াছে। কারণ, পৃথিবীতে অধিকার করিয়া লইবার মত দেশ আর অধিক নাই। যাহা আছে, তাহা অধিকার করিয়া লইলে বিশেষ লাভ হইবে না,—অথবা তাহা অধিকার করিলে অন্য সাম্রাজ্যবাদী দেশ তাহাতে বাদ সাধিবে। অতৃপ্ত সাম্রাজ্যবাদী দেশের মধ্যে জাপান সন্নিকটবর্ত্তী কোরিয়া, মাঞ্চুরিয়া এবং চীন গ্রাস করিয়াছে এবং করিতেছে,—ইটালী আবিসিনিয়া কাড়িয়া লইয়াছে। জার্ম্মাণী বিশেষ কিছু না পাইয়া ছলে ও কৌশলে তাহার পূর্ব্বদিগের রাজ্যগুলিতে প্রভাব বিস্তৃত করিতেছে। এ স্বার্থ লইয়া দুই দলের বিবাদ যেন অগ্নিগর্ভ আগ্নেয়গিরির ন্যায় হইয়া পড়িয়াছে,—এখন কখন যে ইহা হইতে অনলশিখা বাহির হইয়া পৃথিবীর শান্তি দগ্ধ করিয়া ফেলে, তাহা বুঝা কঠিন। এখন অভুক্তসাম্রাজ্যবাদীদিগকে কিছু খোরাক দিবার ব্যবস্থা করিলে হয় ত উপস্থিত এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে, কিন্তু সে ব্যবস্থা করে কে? যিনি যাহা গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছেন, তিনি তাহা উদ্গার করিতে সম্মত হইতেছেন না। কাযেই এই জটিল সমস্যার সমাধান হইতেছে না।

এখন কথা হইতেছে যে, তবে যুদ্ধ বাধিতেছে না কেন? তাহার কারণ, অগ্রসর হইয়া যুদ্ধ বাধাইবার শক্তি বা ইচ্ছা কাহারও নাই। প্রথমতঃ দেখা যাইতেছে যে, অভুক্ত-সাম্রাজ্য-বাদীরা যেন ক্ষুধার তাড়নায় যাহা কিছু পাইতেছে, ভাল-মন্দ বিচার না করিয়া তাহাই উদরসাৎ করিতেছে। তবে তাহারা এমন স্থান গ্রাস করিতেছে না, যাহার জন্য হঠাৎ যুদ্ধ বাধিতে পারে। বর্ত্তমান যুগে যে পক্ষে টাকা অধিক, সেই পক্ষেরই জয়লাভের সম্ভাবনা বেশী। স্পেনের গৃহযুদ্ধই তাহার প্রমাণ। স্পেনের গৃহ-যুদ্ধে এক দিকে জমিদার এবং ধর্ম্মযাজকগণ, অন্য দিকে প্রজা-সাধারণ। ধর্ম্মযাজক-দিগের টাকা অনেক। বিখ্যাত ফরাসী-বিপ্লবের পর স্পেনে ১ লক্ষ ৩৩ হাজার ধর্ম্ম-যাজক, ৪৬ হাজার মঠবাসী ব্রহ্মচারী এবং ৩২ হাজার মঠবাসিনী তপস্বিনী ছিলেন। আর তাঁহাদের টাকা ছিল সুপ্রচুর। এখন তথাকার

ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রচুর টাকা আছে। সুতরাং স্পেনের সেনাপতি ফ্রাঙ্কোর দলে অর্থবল প্রবল ছিল, কিন্তু সৈনিক তত অধিক ছিল না। দেশের অধিকাংশ লোকই সরকারী দলে ছিল। ফলে ফ্রাঙ্কোর দলে লোকাভাব হইয়াছিল, সেই জন্য তাহাদিগকে মূর, ইটালীয়ান্ এবং জার্ম্মাণ লইয়া যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। সরকারী দলে কখনও লোকের অভাব ঘটে নাই। অভাব হইয়াছিল টাকার এবং সমর-বিদ্যা-কুশল সেনানীর। শেষে টাকার জোরে ফ্রাঙ্কোই জয়লাভ করিলেন। সরকারী দল পরাজিত এবং বিধ্বস্ত হইল। বর্ত্তমান যুগের যুদ্ধে এইরূপ টাকারই জয় হইয়া থাকে।

এখন ইংরেজ এবং ফরাসী একপক্ষ। এ পক্ষে ইংরেজদেরই টাকার জোর আছে। ফরাসীদিগের টাকার তেমন জোর নাই। কিছু দিন পূর্ব্বে ফ্রান্সের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত মন্দ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, এখন তাহারা অনেকটা সামলাইয়া লইয়াছে। এখন ধনী ইংলণ্ড যদি সমর ঘোষণা করেন, তাহা হইলে এখনই যুদ্ধ বাধিয়া যায়। কিন্তু ইংলণ্ডে তাহার অন্তরায় আছে। যুদ্ধ বাধিলে ইংলণ্ডের ক্ষতির সম্ভাবনা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। পরিণামে জয়ী হইলেও ইংরেজকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অসুবিধা এবং ক্ষতি সহিতেই হইবে। কারণ, ইটালী ও জার্ম্মাণী হয় ত ভূমধ্যসাগর দিয়া ইংরেজের যুদ্ধ-জাহাজ যাতায়াতের বাধা ঘটাইতে পারে। স্পেন এখন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকিবে, কি, স্বৈরাচারীদিগের পক্ষ ধরিবে, তাহা বুঝা যাইতেছে না। যাহা হউক, ভূমধ্য-সাগরে ইটালীয় প্রভাব নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে। ইটালী এখন বলীয়ান্ হইয়া উঠিয়াছে। উত্তর-ইটালীতে পাঁচ লক্ষ সশস্ত্র সৈন্য বিরাজিত। আবিসিনিয়ায় ইটালীয় ২ লক্ষ ৮০ হাজার, স্পেনে ৬০ হাজার, আলবেনিয়ায় ৫০ হইতে ৬০ হাজার, লিবিয়ায় ৮০ হাজার এবং রোড্‌শে ৩০ হাজার সুশিক্ষিত সৈন্য রহিয়াছে। আলবেনিয়ায় যে সৈন্য রহিয়াছে, তাহারা গ্রীসকে ভয় দেখাইবে এবং যুগোশ্লোভিয়াকে নিরপেক্ষ রাখিতে চেষ্টা করিবে। স্পেনে যে সৈন্য আছে, তাহারা পিরিনিস্ পাহাড়ে ফরাসী-সৈন্যদিগকে বাধা দিতে পারিবে এবং ফ্রান্সের পক্ষে উত্তর-ইটালী আক্রমণ করা কঠিন করিয়া তুলিবে। কারণ, জার্ম্মাণী কর্ত্তৃক ফ্রান্স আক্রমণ বিশেষ কঠিন হইবে না। আবিসিনিয়ায় অনেক ইটালীয় সৈন্য আছে। অত সৈন্যের তথায় প্রয়োজন না হইতে পারে। তথা হইতে কয়েক দল সৈন্য লইয়া সুদান আক্রমণ করা কঠিন হইবে না। লিবিয়ায় যে ৮০ হাজার ইটালীয় সৈন্য আছে, তাহাদের পক্ষে মিশর আক্রমণ করা অতি সহজ হইবে। লিবিয়া মিশরের ঠিক পশ্চিমদিকেই অবস্থিত। ইহা এখন ট্রিপলি নামেও অভিহিত। এই অঞ্চল হইতে সরাসরি মিশরে যাইবার একটি ভাল পথ আর একটি কাঁচা রাস্তা আছে। কাঁচা রাস্তায় মোটর লইয়া যাওয়া কিছু কঠিন। তাহা হইলেও এ দিক্ দিয়া মিশর এবং সুয়েজ খাল আক্রমণ করা কঠিন হইবে না। যদি আচম্বিতে ইটালী মিশর ও সুয়েজ খাল আক্রমণ করিয়া উহা অধিকার করিয়া লয়, তাহা হইলে ইংরেজকে প্রথমে একটু বিব্রত হইয়া পড়িতে হইবে। অথচ ভূমধ্যসাগরে ইংরেজের যে রণতরী আছে, তাহা ইটালীয় রণতরী অপেক্ষা কোন অংশেই হীন নহে। ভূমধ্য-সাগরে ইংরেজের যে চারিখানি বড় বড় রণতরী রহিয়াছে, তাহা পুরাতন হইলেও সম্পূর্ণ আধুনিক ধরণের করিয়া লওয়া হইয়াছে; সুতরাং তাহারা বিমান হইতে বোমার আক্রমণ অনেকটা ব্যর্থ করিয়া দিতে পারিবে। ফরাসী রণতরী ও ইংরেজ রণতরী বহরের সহিত যোগ দিতে পারিবে। সুতরাং রণতরীর দিক্ দিয়া ইটালীর জয়লাভ করা কঠিন হইবে। তবে বিমানযোগে বোমানিক্ষেপ এবং সবম্যারিণ দ্বারা জাহাজ নাশ যে সম্ভব হইবে না, তাহা নহে। কিন্তু সে জন্য বিশেষ শঙ্কার কারণ নাই। কারণ, এখন বোমার দ্বারা বড় জাহাজ নাশ করা বিশেষ সম্ভব নহে। তবে সবম্যারিণ দ্বারা কতদূর কি করা যাইতে পারিবে, তাহাই হইতেছে বিশেষ চিন্তনীয়। বিগত মহাযুদ্ধে জার্ম্মাণ সবম্যারিণগুলি অনেক জাহাজ নাশ করিয়াছিল। এবার আরও সবম্যারিণের উন্নতিবিধান জার্ম্মাণী করিয়াছে। কাযেই বৃটিশ জাতির পরাজিত হইবার সম্ভাবনা না থাকিলেও ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে। জার্ম্মাণ-জাহাজ ভূমধ্যসাগরে ইটালীকে সাহায্য করিতে পারিবে বলিয়া কোন মতেই মনে করা যাইতে পারে না। উত্তর-সাগরে বৃটিশ জাতির রণ-তরীর যে বিপুল বহর আছে, তাহা জার্ম্মাণীকে বাল্টিক সাগর হইতে বাহিরে আসিতে দিবে না। কাযেই এ যুদ্ধে ইংরেজের ভীত হইবার কোন কারণ না থাকিলেও

বিব্রত হইবার কারণ আছে। সুতরাং ইংরেজ অগ্রসর হইয়া যুদ্ধ করিতেছে না বলিয়া যাঁহারা বিস্মিত হইতেছেন, তাঁহাদের বিস্ময়ের কোন কারণ নাই। অনিশ্চয়তার ভয় সকলেই করে। এ জন্য বর্ষীয়ান্ চেম্বারলেন সহজে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে চাহিতেছেন না। তিনি একেবারে নিশ্চিত জয়লাভ হইবে, এমনভাবে চলিতে চাহেন। তিনি চাহেন Collective Security—দশে মিলে করি কায, হারি-জিতি নাই লাজ। তিনি হারিতে রাজি নহেন।

৫ই জ্যৈষ্ঠ বিলাতী কমন্সসভায় মিষ্টার লয়েড জর্জ্জ আন্তর্জ্জাতিক অবস্থা সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছিলেন, সেই উপলক্ষে বিলাতের প্রধান মন্ত্রী মিষ্টার চেম্বারলেন তাঁহার বক্তব্য বলিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে "যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়াছে, ইহা তিনি কখনই মনে করেন নাই। সমরানল জ্বলিয়া উঠিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি ঐরূপ মনে করিবার কোন কারণ দেখিতেছেন না। অবস্থা যত নৈরাশ্যজনক হইয়া পড়িবে, যুদ্ধ ঘটিবার আশঙ্কা যতই ঘনীভূত দাঁড়াইবে, যুদ্ধ যাহাতে না ঘটে, তাহার জন্য ততই সর্ব্ব শক্তি দিয়া চেষ্টা করিতে হইবে।" ইহাই যাঁহার ধারণা, তিনি শাসন-তরণীর কাণ্ডারী পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে আচম্বিতে যুদ্ধ বাধিতে পারে না। তাঁহার উক্তি হইতে ইহাও স্পষ্ট বুঝা যায় যে, গ্রেটবৃটেন স্বয়ং অগ্রসর হইয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিবেন না।

যাঁহারা যুদ্ধ করিবার জন্য আগ্রহযুক্ত, তাঁহারা কেহই একক জার্ম্মাণীর বা ইটালীর সহিত যুদ্ধ করিতে সম্মত নহেন। তাঁহারা চারি পাঁচটি জাতি সম্মিলিত হইয়া ইটালী এবং জার্ম্মাণীর সহিত যুদ্ধ করিতে চাহিতেছেন। এক দল বলিতেছেন যে, যুদ্ধ উপস্থিত হইলে মার্কিণ যে ইংরেজদিগের পক্ষ সমর্থন করিবে, সে বিষয়ে নিশ্চিত একটা ব্যবস্থা করা চাই। কেহ কেহ বলিতেছেন যে, রুশিয়াকে তাহাদের দলে টানা উচিত। মিষ্টার চেম্বারলেন স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, "বৃটেন শান্তিকামী রাজ্যগুলিকে সম্মিলিত করিতে ইচ্ছা করেন।" তিনি আরও বলিয়াছেন, "এ বিষয়ে রুশিয়ার সাহায্য পাইলে গ্রেট বৃটেন পরম প্রীতিসহকারে তাহা গ্রহণ করিবে।" তাহার পর তিনি বলিয়াছেন, "তাঁহারা সোভিয়েট সরকারের সহিত একটা চুক্তি করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত হইয়া আছেন। পররাজ্যলিপ্সার বিরুদ্ধে অভিযান করিবার জন্য তাঁহারা শান্তিকামী শক্তিবর্গের সহিত সম্মিলিত হইতে চাহেন।" রুশিয়ার সহিত সম্মিলিত হইবার ব্যবস্থা কতকটা ঠিক হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু রুশিয়া, গ্রেট বৃটেন এবং ফ্রান্সের প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারেন নাই। ইংরেজ যদি এই সময়ে রুশিয়ার সহিত সম্মিলিত হইতে পারিতেন, তাহা হইলে সুবিধা হইতে পারিত। বিগত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধে রুশিয়া পূর্ব্বদিকে জার্ম্মাণীর কয়েক ডিভিসন সৈন্যকে আটক রাখিতে পারিয়াছিল, তাই রক্ষা, নতুবা জার্ম্মাণসেনা পশ্চিম-য়ুরোপ পর্য্যুদস্ত করিয়া ফেলিতে পারিত। বিগত যুদ্ধের পূর্ব্বে ইটালী জার্ম্মাণীর মিত্র ছিলেন, কিন্তু ইংরেজ সে বার তাঁহাকে স্বদলে আনিতে পারিয়াছিলেন। এবারে তাহা পারিবেন বলিয়া মনে হইতেছে না। তাহা পারিলে এখনই জার্ম্মাণীকে চূর্ণ করা সম্ভব হইত।

নেভিল চেম্বারলেন

গ্রেট বৃটেন পোল্যাণ্ড, রুমেনিয়া এবং গ্রীস্‌কে অভয় দিয়াছেন। তাঁহারা বিপৎকালে ইহাদিগকে সদলে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবেন। জার্ম্মাণী কিন্তু ডান্‌জিগ গ্রাসের চেষ্টা এখনও ছাড়ে নাই। সুতরাং য়ুরোপের রাজনীতিক পরিস্থিতি এখনও বিশেষ শঙ্কাজনক হইয়াই রহিয়াছে। নিত্যই নূতন নূতন অবস্থার উদ্ভব হইতেছে। এখন এই অবস্থার সমাধান হইবে, না আবার রণডঙ্কা বাজিয়া উঠিবে, কে বলিতে পারে?

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যারত্ন)।

উপন্যাস

৩৯

শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া শৈল ভয়ানক চমকিয়া ঠিক্‌রাইয়া পড়ার মত এক পাশে সরিয়া গেল।

সুলেখা কৌচখানার উপর শুইয়াছিল। উঠিয়া বসিয়া কহিল, "আমাকে দেখে তুমি অবাক হবে জানতুম কিন্তু এতখানি যে চম্‌কাবে, তা বুঝিনি।"

শৈল কথা কহিতে পারিল না। এই স্বপ্নাতীত ব্যাপারটাকে সে যেন বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। ঘনায়মান সন্ধ্যার ছায়াচ্ছন্ন আঁধারে তাহার নিভৃত শয়ন-কক্ষে সুলেখার এই অভাবনীয় আবির্ভাবটা তাহার বুদ্ধির অগম্য হইয়া পড়িয়াছিল।

শৈলর এই একান্ত অভিভূত মূর্ত্তিটা সুলেখাকে যেন একটা আঘাত করিল। মুখখানা তাহার বিবর্ণ হইয়া গেল। কিন্তু মানুষের ভিতর সহিবার শক্তিটা যত বেশী পরিমাণে আছে, স্রষ্টার হাতের অন্য কোন সৃষ্টিতে বোধ করি ততখানি নাই।

সুলেখা কহিল, "তোমার কাছে আমার আসাটা কি এতই অসম্ভব হয়ে উঠেছে যে, তুমি কিছুতেই আমাকে স্বীকার করতে পাচ্ছ না?"

বিস্ময়াহত উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তটা তখন সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিতে পারে নাই। শৈল কহিল, "তোমার নিজের কথার উত্তর যখন নিজেই দিতে পার, তখন আমাকে সে কষ্টটা দিচ্ছ কেন?"

সমুদ্র তরঙ্গের মত একটা প্রচণ্ড অভিমান সুলেখার বুকের মাঝে দুলিয়া ফুলিয়া উঠিল। কতদিন পরে সে শৈলর সমীপে আসিয়াছে, দ্বিধাহীন-চিত্তে তাহার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়াছে। অভিন্ন, আপনার ভাবিয়া তাহার লজ্জা, কুণ্ঠা কিছু শৈলর কাছে নাই। অন্তরতম প্রদেশের সেই একান্ত প্রিয়, দূরত্বের ব্যবধান রচিয়া বাহিরের আসনে বসিতে চাহিল, বেদনার ভারে সুলেখার সারা চিত্ত যেন মূর্চ্ছাহত হইয়া পড়িল; জানালার সন্নিহিত চেয়ারখানা অধিকার করিয়া শৈল বসিয়াছিল। সুলেখার অবনমিত মুখের পানে চাহিয়া, সে যেন যুগান্তরের কথা ভাবিয়া লইল। কহিল, "তোমার বাবা দেশেই তো আছেন?"

সংক্ষিপ্তকণ্ঠে সুলেখা কহিল,—"হাঁ।"

"তোমার দাদার সঙ্গে দেখা কর নি?"

তেমনই সংক্ষিপ্ত উত্তর হইল, "না।"

শৈল জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি দেশ হ'তে সটান এখানে এসেছ?"

তেমনই অবস্থায় থাকিয়া সুলেখা কহিল, "হাঁ।"

আবার সব চুপ-চাপ। পাথরের মত একটা জমাট নিস্তব্ধতা কক্ষটাকে যেন অসাড় করিয়া রাখিল, এবং তাহার কঠিনতা যে কত যন্ত্রণাদায়ক, তাহা মুখামুখি উপবিষ্ট দুইটি নরনারীর চিত্তই সমভাবে উপলব্ধি করিতেছিল; তথাপি নীরবতা ভাঙ্গিবার পথ কেহই যেন খুঁজিয়া পাইতেছিল না। গ্রহবৈগুণ্যে হঠাৎ যখন নিকটতম জনও পর হইয়া পড়ে, ভাষার অভাব তখন বড় বেশী হইয়া দেখা দেয়। মর্ম্মান্তিক দুঃখের অনুভূতি কথায় প্রকাশের ভাষা আজিও আবিষ্কৃত হয় নাই।

মুক্ত বাতায়ন-পথে সাজান বাগানের দিকে চোখ পাতিয়া দুই জনে স্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিল। পূর্ণিমার চাঁদ তাহার রূপালি আলো পৃথিবীর বুকে ছড়াইয়া দিল।

সদ্য ফোটা পুষ্পসৌরভ বাতাসের সঙ্গে কক্ষে ভাসিয়া আসিতেছিল। শৈল মুখ ফিরাইয়া সুলেখার পানে চাহিল। অকস্মাৎ সে চমকিয়া উঠিল। সহসা শৈলর মনে হইল, কুয়াসা ঢাকা চাঁদের আলোর মত সুলেখার নিষ্প্রভ মুখখানাতে যেন একটা মৃত্যুর ছায়া পড়িয়াছে। বিদ্যুৎ-প্রবাহের মত একটা ভয়ের শিহরণ শৈলর সমগ্র অন্তরের উপর দিয়া নিমিষে খেলিয়া গেল। দ্রুতকণ্ঠে শৈল কহিল, "লেখা—"

সুলেখা শিহরিয়া উঠিল। পলকে শৈলর কণ্ঠে অতীতের স্বর, স্নেহ, সম্ভাষণ জাগিয়া উঠিয়াছে!

শৈল কহিল, "লেখা, আর কি আগেকার দিনের মত আমার কাছে মনের কপাট খুলতে পার না?"

সুলেখা শৈলর মুখের পানে চাহিল, দেখিল, তাহার আয়ত নেত্রের কোমল দৃষ্টির উপর যেন একটা বেদনার ছায়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। মুহূর্ত্তে কি যেন হইয়া গেল।

কঠোর শাসনে প্রতিহত অশ্রুরাশি অকস্মাৎ বিদ্রোহী হইয়া ক্ষিপ্রগতিতে সুলেখার গণ্ডস্থল ভাসাইয়া দিল এবং তাহাকে লুকাইতে সে হাতে মুখ ঢাকিয়া কৌচের উপর উপুড় হইয়া পড়িল।

জ্যামুক্ত শরের মত নিমিষে নিজের চেয়ার ছাড়িয়া শৈল সুলেখার কৌচখানার উপর আসিয়া বসিল। তাহার পিঠে হাত রাখিয়া মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে কহিল, "লেখা, লেখা! আমায় মাপ কর।"

শৈলর কণ্ঠস্বর বাষ্পরুদ্ধ হইয়া আসিল। দীর্ঘ দিন ধরিয়া পুঞ্জীভূত যে দুঃখ, অভিমান, বেদনার স্তূপ পর্ব্বত আকারে দুই জনের মাঝে ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছিল, অকস্মাৎ সেটা যেন ভাঙ্গিয়া গুঁড়া হইয়া গেল।

বেদনার ভার চোখের জলেই লাঘব হয়। বাধাহীন হইয়া তাহার খানিকটা ঝরিয়া পড়িল। শৈলর সাধ্য-সাধনায় সুলেখা মুখ তুলিল। তাহার অশ্রুধৌত আরক্ত মুখখানি নিজের রুমালে সস্নেহে মুছাইয়া দিয়া ম্লান কণ্ঠে শৈল কহিল, "নিজের দুঃখটাই বড় ক'রে দেখা মানুষের স্বভাব, সু!"

সুলেখার মনে হইল, শৈলর কণ্ঠস্বর হইতে একটা মর্ম্মান্তিক বেদনা করুণ অভিযোগের মত ঝরিয়া পড়িল। শৈলর হাতটা সুলেখা মুহূর্ত্তে চাপিয়া ধরিল। কয়েক মুহূর্ত্ত নিঃশব্দ থাকিয়া নিজের মাঝে সে যেন কত কি ভাবিয়া লইল। তার পর কহিল, "আমি তোমার কাছে বিদায় নিতে এসেছি।"

সুলেখার হাতের মাঝে নিজের হাতখানা তেমনই রাখিয়া শৈল কহিল, "বিদায়! যদি বিদায়ই হয়, তবে এতখানি কষ্ট ক'রে তা নিতে আসবার দরকার কি, সু? সে তো অনেক দিন দেওয়া-নেওয়া হয়ে গেছে, লেখা!"

সুলেখা কহিল, "আমি সে বিদায় বলি নি। আমি তোমার কাছে হতে একটা বাঁধন নিতে এসেছি। যা মৃত্যু অবধি আমাকে জড়িয়ে থাকবে। তাই এমনি ক'রে তোমার ঘরে একলা ঢুকতে পেরেছিলুম। তুমি তো জান, যে ব্রত আমি নিয়েছি, এতে অনেকের কাছে আমায় যেতে হবে; মানুষের মন কখন কি দুর্ব্বলতার ফাঁকে কি ত্রুটি কি অপরাধ কোথায় করে ফেলি, এই আমার ভয়। তাই আমার রক্ষা-কবচের দরকার। তুমি আমার সেই রক্ষা-কবচ দাও, আমি তাই চাইতে এসেছি, যা আমাকে সকল রকম অবস্থা থেকে রক্ষা করবে।"

শৈল রুদ্ধ-নিশ্বাসে বসিয়াছিল। সুলেখার শিথিল মুঠা হইতে তাহার হাতখানা খসিয়া পড়িয়াছিল। একটা গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া সে কহিল, "সু, দু'জনে মিলে একদিন যার স্বপ্ন দেখতুম, যে ছবি আঁকতুম, আজ তাকে সত্য করতে তুমি সেই পথে চলে গেলে। কিন্তু আমার পথ রুদ্ধ। কেন জান? এক পথে যাত্রা করলে পাছে পরস্পরের নিকটে আমরা এসে পড়ি। নিজকে আমি ঠিক বিশ্বাস করতে পাচ্ছি না। তাই যে পথ তোমার খোলা থাকবে, সে পথ আমায় বন্ধ করতে হবে।"

সুলেখা কহিল, "আমি তা জানি। দাদা বলেন, অনিলা তোমায় চায় না। কিন্তু দাদা এটা বুঝতে পারে না; তোমার জীবনে এইটিই সব চেয়ে বড় অগ্নি-পরীক্ষা। ভগবানের কাছে কি মানুষের চোখে তুমি ছোট হয়ে যাও, এ আমি কিছুতেই সইতে পারব না। সন্তোষ বাবুর সঙ্গে আমার এত বন্ধুত্ব কেন জান?"

শৈল চমকিয়া উঠিল। কহিল, "কেন?"

সুলেখা, শৈলর ম্লানমুখে অন্ধকার ঘনাইয়া উঠিতে দেখিল। তাহার নিরানন্দ চিত্তের বেদনাটা তাহার নিকট অজ্ঞাত রহিল না।

সুলেখা কহিল, "আমার মনের কথা অন্তর্যামী ছাড়া কেউ জানতে পারবে না, এই ছিল আমার সঙ্কল্প। কিন্তু আজ বুঝতে পারলুম, অন্তরে যে কথার গুঞ্জরণ ওঠে, পৃথিবীতে অন্ততঃ একটি প্রাণীও তাহার শ্রোতা হয়।" সুলেখা একটু থামিল। কপালের ঘাম রুমালে মুছিয়া কহিল, "যে দিন সন্তোষ বাবুর মুখে জানতে পারলুম, অনিলার সে বিশেষ আত্মীয়, তোমাকেও সে জানে, সেই দিন মনে হল, আমার সব সমাচারটা সন্তোষের মারফত অনিলার কাণে ঢেলে দেব। তা'হলে তোমাকে পেতে তার আর কোন বাধা থাকবে না।"

কিছু বুঝিতে না পারিয়া বিহ্বলের মত সুলেখার মুখের পানে চাহিয়া শৈল কহিল, "এতে তার বাধা কি ঘুচবে? তোমার কথা জানতে পারলে তার কি সার্থকতা তার কাছে থাকবে, আমি তো তা বুঝতে পাচ্ছি না, লেখা?"

বর্ষণক্লান্ত আকাশের বুকে দিনমণির প্রথম মৃদু দীপ্তির মত একটুখানি মধুর হাসি সুলেখার ওষ্ঠপুটে ফুটিয়া উঠিল। চিরকালের অভ্যাসমত রহস্যপূর্ণ-কণ্ঠে সে কহিল, "সত্যিকারের ভাল না বাসলে মানুষের মন বোঝা যায় না তা ঠিক, আর মেয়েদের মত পুরুষ তো কোন দিন ভালবাসতে পারে না—"

বাধা দিয়া শৈল কহিল, "আমি মেয়ে যখন নই, তখন তাদের ও-জিনিষটা কি রকম, তা বুঝতে পারব না। কিন্তু অনিলার কথা তুমি কি বলছ লেখা, সেইটাই আমি বুঝতে চাইছি।"

সুলেখা কহিল, "আমিও তাই তোমায় বোঝাতে চাইছি। এই আগুনে যে না পুড়েছে, এ যে কি জিনিষ, তা কিছুতেই সে কল্পনায় আনতে পারবে না। যা বলতে যাবে, যা ভাববে, সবই ব্যর্থ হবে। আমি নিজের অন্তর হতে উপলব্ধি করেছি, অনিলা আমার কথা ভেবে, তোমার সুখ-চিন্তা ক'রেই এমন ক'রে নিজেকে তফাত করেছে। সে আমার মতই তোমায় ভালবাসে, কিন্তু যে দিন বুঝতে পারবে, আমাকে পাওয়া তোমার কিছুতেই সম্ভব হবে না, সে দিন তোমার কাছে আসতে তার কোন বাধাই থাকবে না। আর সে এলে তুমিও তাকে বিমুখ করতে পারবে না।"

সুলেখা পূর্ণ-দৃষ্টিতে শৈলর পানে চাহিল।

শৈল কহিল, "না, আমি তা পারব না। সে আমার কাছে এলে ভগবানের আশীর্ব্বাদের মত তাকে আমি গ্রহণ করব। তার বাবার অন্তিম ইচ্ছা আমার বুকের মাঝে অনুক্ষণ জেগে আছে।"

শৈল থামিল, একটু চিন্তা করিল। তার পর সুলেখার হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া আঙ্গুলের আংটীটা খুলিয়া সুলেখার আঙ্গুলে পরাইয়া দিল। কহিল, "এই নাও, সু!" শৈলর কণ্ঠস্বর ভারী হইয়া আসিল।

সুলেখা কোন কথা কহিতে পারিল না। শুধু নত হইয়া শৈলর পায়ের ধূলা লইল। শৈল তাহার হাতখানা চাপিয়া ধরিল, উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে কহিল, "আজ তোমাকে ছাড়ার সঙ্গে আমার নিজের কতখানি ছাড়ছি, এ শুধু আমার অন্তর্যামীই জানেন। তোমার সঙ্গে এ রকম ব্যবহার করাতে যদি কোন অন্যায় হয় তো আমার বুকের মাঝে চেয়ে তিনি ক্ষমা করবেন!"

শৈলর কণ্ঠস্বর কাঁপিতেছিল। বুঝি মর্ম্মান্তিক ব্যথার অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করিতে অক্ষম বলিয়া সে কয়েক মুহূর্ত থামিল। তার পর কহিল, "আমার মৃত শ্বশুরের ভালবাসাকে স্মরণ ক'রে তোমায় বিদায় দিলুম, লেখা! জন্মের মত তোমার সম্বন্ধ ত্যাগ করলুম। তুমি আমার কাছ থেকে স্মৃতিচিহ্ন নিলে, কিন্তু আমি অতি সামান্য একটা কিছুই তোমার কাছ হতে নিতে পারলুম না। যা তুমি আমি ছাড়া জগতের তৃতীয় প্রাণীও জানত না, তাও আমি পারব না। আমাকে কায়মনোবাক্যে অন্যের হতে হবে। এ ঘর আমার শ্বশুরের হাতে সাজান, তাঁকে ক্ষুণ্ণ করতে কিছুতেই আমি পারব না।"

৩১

বিরজামোহন দ্রুতপদে সিঁড়িগুলা অতিক্রম করিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে ত্রিতলে আসিলেন, ব্যস্ত-কণ্ঠে কহিলেন, "অনু কোথা রে?"

"এই যে জ্যাঠামশাই" বলিয়া অনিলা কক্ষের বাহিরে আসিল।

বিরজামোহন কহিলেন, "পাটনা হতে তার এসেছে, শৈলর ভারী অসুখ।"

একটা আকাশ-পাতাল-জোড়া ভয়ের অন্ধকার নিমিষে যেন অনিলাকে গ্রাস করিয়া ফেলিল এবং তাহার পায়ের

তলায় পৃথিবীটা ফুলিয়া উঠিল। নিজের পতনটা রক্ষা করিতে পাশের রেলিংটা সে চাপিয়া ধরিল, কহিল, "জ্যাঠা-মশাই! পাটনার ট্রেণ কটায়? আচ্ছা, আমার ঘরে টাইম-টেবল আছে।"

অনিলার বিমর্ষ মুখ, কম্পিত ওষ্ঠাধরের পানে চাহিয়া বিরজামোহনের অন্তরও বেদনায় ভরিয়া উঠিল। বাস্তবিক শৈলকেও তিনি স্নেহ করিতেন। তাহার পীড়ার সংবাদটা তাঁহার অন্তরে একটা ভীতির সঞ্চার করিয়াছিল। তিনি কহিলেন, "আমি জানি, মা। রাত্রি আটটার সময়ে!"

অনিলা কহিল, "এখন তো বেলা বারটা। না, আমি আট ঘণ্টা দেরী করতে পারব না।"

জয়ন্তী কহিলেন, "তুমি তবে যাবে কি এরোপ্লেনে?"

অনিলা জয়ন্তীর কথায় সাড়া দিল না। তাঁহার পানে চাহিয়াও দেখিল না। বিরজামোহনকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, "আপনি আমার অভিভাবক হ'য়ে আমার বাবার স্থলে বসে আছেন।" অনিলার কণ্ঠস্বর দৃঢ়! অন্তরের একটা কঠিন সঙ্কল্পের দীপ্তি সমগ্র মুখে-চোখে ফুটিয়া উঠিল।

বিরজামোহনের মুখখানা এতটুকু হইয়া গেল। কণ্ঠস্বর জড়াইয়া আসিল। আমতা আমতা করিয়া কহিলেন, "সে তো নিশ্চয়ই, মা।"

"তবে বাবা থাকলে তিনি যে কায করতেন, আপনিও তা করুন।" অনিলার কণ্ঠস্বরে কর্তৃত্বের সুর ধ্বনিয়া উঠিল, কহিল, "আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি। অবনী বাবুর বাড়ী আপনি ট্যাক্সী করে যান। বাবার মোটর তিনিই কিনে রেখেছেন। আমি চাইলেই পাব। সেই গাড়ীতেই আমি পাটনা যাব।"

সবিস্ময়ে বিরজামোহন কহিলেন, "তুমি মোটরে পাটনা যাবে?"

অনিলা উত্তর দিল, "আমি বাবার সঙ্গে মোটরে অনেক স্থানে গেছি। কোন ভয় নেই।"

নিশ্চিত পরাজয়টা যত আসন্ন হইয়া আসে, বিপক্ষের উপর ক্রোধটা ততখানি মাত্রায় বর্দ্ধিত হইতে থাকে—হিংসা প্রবৃত্তি তেমনই উগ্র হইয়া উঠে।

জয়ন্তী তিক্তকণ্ঠে কহিলেন, "তোমার সঙ্গে যাবে কে? এই বুড়ো মানুষটি? না, আমি ওঁকে এ-ভাবে ছেড়ে দিতে পারি না।"

জয়ন্তীর প্রকৃতি অনিলা জানিত। জানিত না তাহার চরমটা কোনখানে। মানুষের সর্ব্বনাশের মুখেও যে হৃদয় অটল, অচল অদ্রির মতই নিজেকে স্থির রাখিতে পারে, এটুকু সে কল্পনায়ও আনিতে পারিত না। কিন্তু, সত্য যে কল্পনাকে অতিক্রম করিয়া যায়, তাহার উদাহরণের অভাব ঘটে না।

অনিলা স্তম্ভিত হইয়া গেল। কিন্তু মুহূর্ত্তমাত্র। পর-ক্ষণেই ভিতরে ভিতরে নিজেকে ঝাড়া দিয়া সে যেন নিজেকে সম্মুখ-যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করিয়া লইল। অনিলা বিরজামোহনকে কহিল, "সুন্দর সিং আমাদের এতটুকু বেলা হতে দেখেছে। সেই অবনী বাবুর ওখানে সোফার হয়ে আছে। সে-ই গাড়ী নিয়ে আসবে। আমার কাউকেই প্রয়োজন নেই। আমিই গাড়ীর ব্যবস্থা করতে অবনী বাবুর ওখানে যাচ্ছি।"

উগ্র ক্রোধ, মদের নেশার মত মানুষকে অনেক সময়ে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, ভাল-মন্দটা বুঝিতে দেয় না। জয়ন্তী অনিলার কথার মাঝে "প্রয়োজন নেই," শব্দের মর্ম্মটা গ্রহণ করিতে পারিলেন না। কিন্তু সেটা পারিলেন বিরজা-মোহন। তাই তিনি ভয়ানক বিব্রত হইয়া পড়িলেন এবং ভ্রাতুষ্পুত্রীর প্রতি স্নেহের পরিমাপটা বর্ষার নদীর মত হঠাৎ এত বৃদ্ধি পাইল যে, সবেগে কহিলেন, "না, না, তা কি হয়। তুমি কি আমার রক্তের টানের জিনিষ নও, বাছা! আমি তোমায় একা ছাড়তে পারব না। আমি তোমার সঙ্গে যাবই।"

গম্ভীর কণ্ঠে অনিলা কহিল, "বেশ, আমার ট্যাক্সীতে আসুন। হ্যাঁ, ওঁর দাদাদেরও একটা সংবাদ দেওয়া উচিত।"

এক ঘণ্টার মধ্যে অনিলা নিজেদের আবশ্যক জিনিস-পত্র গুছাইয়া সোফার সুন্দর সিংকে সঙ্গে লইয়া পাটনায় রওনা হইতে মোটরে উঠিল। তখন সর্ব্বনাশা ঝড় উঠিবার পূর্ব্বে স্তব্ধ আঁধার মূর্ত্তির পানে চাহিয়া বিরজামোহনের বুঝিতে বাকী রহিল না, এ বাড়ীতে তাঁহাদের থাকা শেষ হইয়া গেল।

স্বামীর বিষণ্ণ মূর্ত্তির পানে চাহিয়া জয়ন্তী কহিলেন, "হাঁ করে দাঁড়িয়ে ভাবছ কি? মেয়েমর্দ্দানী হয়ে ভাইঝি তো গেল ভগ্নীপতির সেবা করতে!"

বিরজামোহন স্ত্রীর মুখের পানে একটা রুক্ষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বিরক্ত কণ্ঠে কহিলেন, দেখ, "জাল-বোনা জিনিসটা

ভারী বিশ্রী। মাকড়সা নিজের জালে নিজেই শেষে বন্দী হয়। যেমন আমরা হলুম।"

জয়ন্তী কহিলেন, "আমরা জালে বন্দী হলুম কিসে? ওর ওই ভগ্নীপতির সেবা করতে যাওয়া বার করব। তাই বুঝি চির-কুমারী থাকবার কঠোর সঙ্কল্প। আত্ম-পরিজনের কাছে তো মুখ দেখাতে হবে।"

বিরজামোহন রাগিয়া ছিলেন। উদ্দীপ্ত-কণ্ঠে কহিলেন, "আত্ম-পরিজনের কাছে সবাইকে মুখ দেখাতে হবে। আমরাও তা হতে বাদ পড়ব না।"

জয়ন্তী কহিলেন, "আমরা এমন কোন কায করিনি যে, মুখ দেখাতে লজ্জা পাব। শুভাকে নিয়ে যেমন শৈলর বাড়ীতে দু'মাস ছিলুম, আমার মনে যাই থাক, সে বিচার তো হবে না। শুভা তার বাপ-মার সঙ্গেই ছিল, এ কথা সবাই জানে; এইবার বুঝবে বাছাধন, কে জিতলো।"

মানুষ নিজের বুদ্ধির মাপকাঠি দিয়া যখন হার-জিত বিচার করে, তখন সে একটা বড় বোকামী করিয়া বসে।

বিরজামোহন কহিলেন, "তা হ'লে জিতের খেলা এখন তোমার।"

সদর্পে জয়ন্তী জবাব দিলেন, "নিশ্চয়ই। আমার মুখ থামাবার জন্য অনিলা নিজে গিয়ে শৈলকে ধরবে, শুভাকে বিয়ে করবার জন্যে। এটা ঠিক জেন, সৃষ্টি রসাতলে যেতে বসলেও শৈলর দ্বারা অনিলার কথা হেলা করা সম্ভব হবে না।"

"আর যদি অনিলা সে অনুরোধ না করে?"

জয়ন্তীর ওষ্ঠাধরে একটা অবজ্ঞার হাসি ফুটিয়া উঠিল। কহিলেন, "করবে না তো কি? এ ভিন্ন তার উপায় কি আছে?"

"নিরুপায় বা সে কিসে হল? সে যদি এখানে আর না আসে? তবে নিরুপায় তো আমরাই হলুম। এই যে শৈলর নিকট হতে মাসে দু'শো ক'রে টাকা পাচ্ছিলুম, বড় বৌ, এই জন্যেই বল্‌তে হয়, নিজের স্বার্থের উপর বড্ড বেশী চেতন থাক্‌লে শেষটা এমনি দুর্গতিই ঘটে।"

জয়ন্তী কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া রহিলেন। অনিলা ফিরিয়া না আসার দিক্‌টা একবারও তিনি চিন্তা করিয়া দেখেন নাই। মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার সমস্ত মনটা একবার বিকল হইয়া উঠিল, তবে পলকমাত্র। কহিলেন, "তুমি যেমন পাগল। অনিলা যদি শৈলকে বিয়ের ইচ্ছেই থাক্‌ত, তা অনেক আগেই তো মত দিতে পার্‌ত। শৈল নিজ মুখেই তো ওর কাছে বিয়ের প্রস্তাব করেছিল।"

বিরজামোহন ভাবিয়া দেখিলেন, কথাটা মিথ্যা বা অতি-রঞ্জিত নহে। সে দিন যখন অনিলা বিবাহে সম্মতি দেয় নাই, এখনই বা দিবে কেন?

স্বামীর চিন্তাচ্ছন্ন মুখের পানে চাহিয়া সাহঙ্কারে জয়ন্তী কহিলেন, "এইবার তো বুঝেছ, তোমার বুদ্ধি আর আমার বুদ্ধি! ওগো মেয়ে-মানুষ সব সইতে পারে, সইতে পারে না শুধু চরিত্রের অপবাদ। তা সত্যিই হোক—মিথ্যাই হোক। এর ভয়ে সে এমন কায নেই যা করতে পারে না। আর সুনাম একবার হারালে জীবনে তা ফিরে পাওয়া যায় না।"

৩২

ডাক্তার সাহেবের মোটর গেট অতিক্রম করিবার পরমুহূর্ত্তে অপর একখানি সুদৃশ্য কার একরাশি ধুলা উড়াইয়া গেটের মধ্যে প্রবেশ করিল।

সুকুমার, বাগানের গ্যালারি সিঁড়িটার উপর থমকিয়া দাঁড়াইল।

লাল সুরকী ছড়ান উদ্যান-পথ শেষ করিয়া মোটরখানি আসিয়া পাতাবাহারি টবে সাজান সেই প্রশস্ত সোপানা-বলীর সম্মুখে থামিল। ড্রাইভার হাত বাড়াইয়া গাড়ীর দরজা খুলিয়া দিতেই, খদ্দরের চাদরে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করা একটি তরুণী মহিলা গাড়ী হইতে অবতরণ করিলেন। ইতস্ততঃ দৃষ্টিতে চারিপাশে চাহিয়া সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া ত্বরিত পদে সম্মুখের বৃহৎ হলটার দিকে অগ্রসর হইলেন।

অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া দুই পদ অগ্রসর হইয়া সুকুমার কহিল, "আপনি কি মিস্ বোস্?"

অনিলা থমকিয়া দাঁড়াইল। প্রশ্নকারীর মুখের পানে চাহিয়া দেখিল। তার পর কহিল, "হ্যাঁ, আমি ব্রজমোহন বসুর কন্যা। মিঃ রায়ের কাছে যেতে চাই।"

সুকুমার উত্তর দিল, "আপনি বোধ করি অবগত আছেন, তিনি বিশেষ পীড়িত?"

অচঞ্চল-কণ্ঠে অনিলা কহিল, "তা আমি জানি, আর সেই জন্যেই মোটরে এতটা পথ ছুটে আসতে বাধ্য হয়েছি।

কোন্ দিকে গেলে তাঁর ঘরটা পাব, অনুগ্রহ ক'রে আমাকে দেখিয়ে দিন।"

"আসুন" বলিয়া সুকুমার অগ্রসর হইল। একটা দুর্নিবার কৌতূহলের বশে সুকুমারের এই মেয়েটির সহিত কথা কহিবার ইচ্ছা হইতেছিল। আগ্রহ জন্মিতেছিল; নিজেই পরিচয়টা জানাইয়া দিয়া শৈলর সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করে। পিতা ও ভগিনীর মুখে এই তরুণীটির টুক্‌রা টুক্‌রা কাহিনী সে শুনিয়াছে, তাহাকে জোড়া-তাড়া দিলে মনোরাজ্যে বিচিত্র হেঁয়ালীর আভাস পাওয়া যায়—যাহা অপূর্ব্ব ও অদ্ভুত হইয়া উঠে।

একটা কক্ষের সম্মুখে আসিয়া উভয়ে থামিল এবং পর্দ্দা তুলিয়া পায়ের সাণ্ডাল খুলিয়া অনিলা গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল।

অনিলা দেখিয়াই বুঝিতে পারিল, শুভার বর্ণিত এ সেই সুরম্য সজ্জিত শৈলর শয়ন-কক্ষ। ভূমিকম্পে সমুদ্র-দোলার মত তাহার সমস্ত বুকের ভিতরটা মুহূর্ত্তে আলোড়িত হইয়া উঠিল। সম্মুখের দেওয়ালে পিতার সুবৃহৎ তৈল-চিত্র। এক পাশে খাটের উপর শৈল চোখ বুজিয়া শুইয়াছিল। রৌদ্রতাপে শুষ্ক ফলের মত প্রচণ্ড জ্বরের উত্তাপে তাহার কমনীয় মুখখানাকে ক্লিষ্ট ও বিবর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। সমস্ত অবয়বের উপর কঠিন রোগ তাহার নিষ্ঠুর যন্ত্রণার চিহ্ন যেন সদর্পে আঁকিয়া নিজের আগমনের পরিচয়টা সকলের চোখে সুস্পষ্ট করিয়া দিতেছে। পাশের মার্ব্বেল-টেবলে ঔষধের শিশি, কৌটা, থার্ম্মোমিটার, ফিডিং-কাপ, মেজার গ্লাস, রোগের রিপোর্ট লিখিবার ও টেম্পারেচার রেকর্ড করিবার খাতা ইত্যাদি পীড়িতের পরিচর্য্যার যাবতীয় জিনিষ সাজান রহিয়াছে। নিকটে টুলের উপর একটা বিহারী ভৃত্য বসিয়া শৈলর মাথায় আইসের ব্যাগটা ধরিয়া রাখিয়াছে।

কিছুক্ষণ শৈলর মুখের পানে স্থির-নেত্রে চাহিয়া থাকিয়া অনিলা ধীরে ধীরে সেই মার্ব্বল-টেবলটার সন্নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। পীড়িতের বিধি-বিধানের খাতাখানা তুলিয়া লইয়া নিঃশব্দে সেখানা পড়িতে পড়িতে ঔষধ সেবনের সময়গুলা দেখিয়া ঘড়ির পানে চাহিয়া মনে মনে কি হিসাব করিয়া লইল।

হঠাৎ এক সময়ে মুখ তুলিতেই অনিলার চোখে সুকুমার পড়িল। সে-ও অনিলার মতই নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া পরম বিস্ময়ে অনিলার কার্য্য-কলাপগুলাকে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল।

অনিলা ইঙ্গিতে তাহাকে নিকটে ডাকিল। সুকুমার কাছে আসিতেই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি এই সব লিখেছেন?"

সুকুমার উত্তর দিল "হাঁ।"

"কিন্তু দু'রকম হাতের লেখা দেখ্‌ছি কেন? প্রথম দু'দিনের সঙ্গে তো এ তিন দিনের লেখা মিল খাচ্ছে না বলে মনে হচ্ছে।"

সুকুমার কহিল, "আপনি ঠিকই ধরেছেন। প্রথম দু'দিন আমার বোন সুলেখা রোগীর পরিচর্য্যা করেছিলেন। কিন্তু আমার বাবা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায়"···

অনিলা কহিল, "তাই আপনার হাতে পড়েছে। আচ্ছা, জ্বরটা তো টাইফয়েড। রক্তপরীক্ষা হয়েছিল?"

সুকুমার চমকিয়া উঠিল। শিক্ষিতা নার্শের মত অন্তঃপুর-বদ্ধা হিন্দুর ঘরের মেয়ে যে রোগের খুঁটিনাটি সম্বন্ধে কথা কহিতে পারে, তাহা সুকুমারের জানা ছিল না।

সে কহিল, "হাঁ, টাইফয়েড। ব্লাডে তাই পাওয়া গিয়েছে। ডাঃ বলেট জ্বরের গতির লক্ষণ দেখে প্রথম হতেই সন্দেহ করেছিলেন।"

অনিলা পুনরায় ফিরিয়া শৈলর মুখের পানে, নিমীলিত নেত্রের পানে কয়েক মুহূর্ত্ত তাকাইয়া রহিল। পীড়িতের নিশ্বাস গ্রহণ ও পতনের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া কহিল, "পাল্‌সের বিট্ কাউণ্ট করা, ব্রীদ কাউণ্ট করার তো কিছু রিপোর্ট দেখছি না। ডাক্তার বলেট কি এ সম্বন্ধে কোন উপদেশ দেন নি? এটা তো দ্বিতীয় সপ্তাহ চল্‌ছে।"

সুকুমার স্তম্ভিত হইয়া গেল। এই অপরিচিতা তরুণীটির একটা দিকের পরিচয় সে কিছু কিছু অবশ্য জানিত। কিন্তু তাহার কল্পনার বাহিরে অসাধারণ আর একটা দিক্ অকস্মাৎ সুকুমারের মনের মূল অবধি নাড়িয়া দিল এবং দপ্ করিয়া বিদ্যুৎরেখার মত মাথার ভিতর খেলিয়া গেল; করুণার পাত্রী বলিয়া ইহাকে অনুকম্পা দেখান শুধু নিজের নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দেওয়া।

অনিলা আবার কহিল, "দেখুন, ওঁর নিশ্বাস-প্রশ্বাস দেখে মনে হচ্ছে, যেন হার্টের ট্রাবল আরম্ভ হয়েছে।" অনিলা সুকুমারের পানে চাহিল।

হার্টের সম্বন্ধে ডাঃ বলেট যে আজ একটু চিন্তান্বিত হইয়া ব্যবস্থা করিয়াছেন, ইঙ্গিতে সেটুকু অনিলাকে জানাইয়া গভীর শ্রদ্ধান্বিত কণ্ঠে সুকুমার কহিল, "উনি নার্শ দেখ্‌তে পারেন না। আমি একলা মানুষ, লোকজনের সাহায্য নিয়ে যা করি। কিন্তু আপনার কাছে স্বীকার করতে আমার লজ্জা নেই, আপনাকে দেখে আমি বুঝতে পেরেছি, সেবার সম্বন্ধে আমি সব চেয়ে বড় আনাড়ি।"

একটু থামিয়া সুকুমার কহিল, "তবু এখন খানিকক্ষণ আমি চালাতে পারব, আপনি একটু বিশ্রাম নিতে, কাপড় বদলাতে যাবেন না?"

"আমি? না, আমার এখন ও-সবে কোন প্রয়োজন হবে না। আমি সময়মত সব ক'রে নেব। ডাক্তার তো এসেছিলেন?"

"নিশ্চয়। একটু আগেই তিনি এসেছিলেন। আমি মোটরে ক'রেই ওষধ আনতে পাঠিয়েছি।"

অনিলা শৈলর বিছানার দিকে সরিয়া গেল। কহিল, "আমি একেবারে ওষধ দিয়েই যাব। আপনি যে রাত্রি জেগেছেন, দেখেই বুঝতে পাচ্ছি। পাশের কোন ঘরে আপনি একটু ঘুমনগে। প্রয়োজন হলে খবর দেব।"

অনিলা ভৃত্যকে উঠিবার ইঙ্গিত করিয়া তাহাকে বরফের থলিটা ভরিয়া আনিতে বলিল এবং নিজে রুমাল দিয়া শৈলর কপালের জলগুলা মুছিয়া দিয়া থলিটাকে সে ভাল করিয়া ধরিল।

সুকুমার কক্ষ হইতে নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল। এই কয়েক মুহূর্তের পরিচিতা তরুণীর অটুট গাম্ভীর্য্যভরা মূর্ত্তি, কর্তৃত্ব করিবার অসাধারণ শক্তি, তাহার অন্তরের প্রচণ্ড বিস্ময়ের উপর সূর্য্যকিরণে জ্বলিয়া উঠা নদীর জলের মত একটা গভীরতর শ্রদ্ধা ক্ষণে ক্ষণে ঝল-মল করিয়া উঠিতে লাগিল। নির্ভরতার মুহূর্ত্তে আশ্রয়ের শক্তির পরিমাণটা যখন মানুষ খোঁজে, তখন তাহার সৌন্দর্য্য-বিচার আসে না।

[ক্রমশঃ।

শ্রীমতী পুষ্পলতা দেবী।

মরতের মায়া-পথে

মরতের মায়া-পথে কত পদচিহ্ন পড়ে, কত চিহ্ন ধূলিতে মিশায়,
যত প্রাণ, যত গান, আসে যায় এ সংসারে, ফিরে নাহি চাহে সেই পানে।
কত ঋতু আবর্ত্তনে কত পুষ্প বিকশিয়া অভিমানে নিত্য ঝরে যায়,
অলীক আশার অলি গুঞ্জরিয়া চক্র তার রচিল না কভু সেইখানে।

সিন্ধুবক্ষে ভেসে যায় সংসারের ঘাট হ'তে দূরগামী অসংখ্য তরণী,
ধ্যানমৌন মহাকাশে বিহঙ্গেরা নিরুদ্দেশ, মরুবক্ষে সাগর শুকায়,
রক্তমাখা রণশ্রান্ত যোদ্ধ্‌সম ব্যথাতুর কত আয়ু-সূর্য্য অস্ত যায়,
তাহাদের পানে কেহ চাহিল না, নিরুত্তর চিরদিন রহিল অবনী।

কত তারা উঠিতেছে বেদনার পুষ্পসম ক্ষণে ক্ষণে আকাশের পথে,
কত তারা নিবিতেছে প্রদীপের শিখাসম, শূন্যে নাহি চিহ্ন রহে আঁকা।
অতীত পাষাণ হ'ল মৃত্তিকার স্তরে স্তরে ছায়াচ্ছন্ন পথপ্রান্ত হতে,
রহস্যের ইন্দ্রজালে দূর হতে দূরান্তরে উড়ে চলে অক্লান্ত বলকা!

অতীতের যাত্রিগণ করে গেছে দিনগুলি উদাসীন—চির অশ্রুময়,
এ পাষাণ বক্ষে মোর অনন্ত বেদনা রহে, পথ চলা সাঙ্গ নাহি হয়।

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।

অভিশপ্ত ভবন

গল্প

জনবহুল, সদা কোলাহল-মুখরিত ও নিত্য সংগ্রাম-নিরত নগরে দীর্ঘকাল বাস করিয়া কয়েক দিন শান্তিলাভের জন্য যাহাদের প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠে, মধ্যে মধ্যে পল্লীগ্রামে গমন করিয়া সেখানে কিছুদিন বাস তাঁহাদের বড়ই মধুর ও উপভোগ্য বলিয়া মনে হয়। আমারও মনের যখন এইরূপ অবস্থা, সেই সময় সে-বার আমাদের গ্রীষ্মাবকাশ আরম্ভ হইল। এই সুযোগে আমার কোন প্রিয়বন্ধু আমাকে তাঁহার পল্লীভবনে কয়েক দিন কাটাইয়া আসিতে অনুরোধ করায় আমি তাঁহার আগ্রহপূর্ণ অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলাম না। আমি তাঁহার সহিত তাঁহার পল্লীভবনে গমন করিয়া কয়েক দিন সেখানে অতিবাহিত করিয়াছিলাম। জিলার সুদূর প্রান্তে অবস্থিত সেই 'পাখীডাকা' ছায়ায় ঢাকা বিজন পল্লীগ্রামখানি আমাকে যে আনন্দ ও তৃপ্তিদান করিয়াছিল, তাহা অতুলনীয়। পল্লীবাসের সেই আনন্দ কখন বোধ হয় ভুলিতে পারিব না। তাহার সুখ-দুঃখের স্মৃতি আমার হৃদয়ে এখনও অক্ষুণ্ণভাবে বিরাজ করিতেছে। আমার সেই কয়েক দিনের পল্লীবাসে বৈচিত্র্যেরও অভাব ছিল না। বন্ধু তাঁহার অবসরকালে আমাকে জেলে-নৌকায় তুলিয়া লইয়া গ্রামপ্রান্তবাহিনী নদীর অপর পারস্থ জঙ্গলে শিকার করিতে লইয়া যাইতেন। আমরা প্রসিদ্ধ শিকারী নহি, এবং সদলে বাঘ-ভালুকও শিকার করিতে যাইতাম না; আমাদের শিকারের লক্ষ্য দুই একটি নিরীহ পক্ষী, অথবা খরগোস বা সজারু।

এইরূপ শিকারের উদ্দেশ্যে একদিন বন্ধুর সহিত নৌকা-রোহণে নদীর অপর পারে যাত্রা করিলাম। কিন্তু কি কারণে জানি না, বন্ধুর সে-দিন শিকার করিতে প্রবৃত্তি হইল না। আমরা নদীর অপর পারে না নামিয়া নৌকারোহণে নদীর ভিতর ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম।

কিছু দূরে নদীটি বাঁকিয়া অন্য দিকে গিয়াছিল; আমরা সেই বাঁক অতিক্রম করিতেই নদীর অপর পারে একখানি সুদৃশ্য অট্টালিকা দেখিতে পাইলাম। তাহার গঠন-পারিপাট্যে মগ্ন হইয়া কয়েক মিনিট সেই অট্টালিকা হইতে দৃষ্টি ফিরাইতে পারিলাম না। তাহার পর বন্ধুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলাম, "দেখেছ কি সুন্দর বাড়ী?" আমার প্রশ্নে বন্ধু হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "হাঁ, বাড়ীখান সুন্দর বটে, আর যিনি সর্ব্বপ্রথমে এই বাড়ীর মালিক ছিলেন, তিনিও অতি চমৎকার লোক ছিলেন।"

বন্ধুর এই কথার পর আমার বোধ হয় আর কোন কথা না বলিলেও চলিত, কিন্তু সেই অট্টালিকা আমার মনের উপর এরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে, কথাটা আমি সেই স্থানেই শেষ করিতে না পারিয়া বলিলাম, "গৃহস্বামী হয় ত চমৎকার লোকই ছিলেন, কিন্তু এ রকম সুন্দর বাড়ী তিনি এই ভাবে জঙ্গলাকীর্ণ ক'রে ফেলে রেখেছেন, এতে তাঁর সুরুচির কি কোন পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে?"

বন্ধু আমার মন্তব্য শুনিয়া বলিলেন, "তুমি বোধ হয় আমার কথা লক্ষ্য কর নাই; আমি ব'লেছিলাম, যিনি সর্ব্ব-প্রথমে এই বাড়ীর মালিক ছিলেন, তিনি চমৎকার লোক ছিলেন; কিন্তু তাঁর সুরুচির অভাব ছিল, তোমার এরূপ অনুমানের কারণ কি?"

আমি বলিলাম, "তবে কি তিনি এখন এ বাড়ীর মালিক নহেন? কে এই বাড়ীর বর্ত্তমান মালিক? তাঁরই বা এরূপ রুচি-বিকারের কারণ কি?"

আমার প্রশ্নের উত্তরে বন্ধু বলিলেন, "সে অনেক কথা। যিনি এই সুন্দর বাড়ীখান তৈয়ারী করেন, প্রায় ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে তাঁর মৃত্যু হয়। তার পর এই দীর্ঘকালে বহু হাত ঘুরে বাড়ীখান এখন যাঁর দখলে এসেছে, তিনি বাড়ীর আদি মালিকের কোন আত্মীয় নহেন; তিনি আইনের বলে বাড়ী দখল করেছেন। কিন্তু তিনিও এ বাড়ী বিক্রী করবার

জন্যে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। এ বাড়ী কিনতে তাঁর যত টাকা লেগেছে, তার চেয়ে অনেক কম টাকাতেও বিক্রী করতে তাঁর আপত্তি নেই, কিন্তু কোনও লোক এ বাড়ী কিনতে চায় না। কাজেই জনমানবহীন বাড়ী জঙ্গলাকীর্ণ হ'য়ে, শ্মশানের নিস্তব্ধতা বুকে নিয়ে এই দীর্ঘকাল খালি পড়ে আছে।"

বন্ধুর কথায় আমার কৌতূহল প্রবল হইয়া উঠিল; এই সুবিশাল সুন্দর অট্টালিকা, ইহার বর্ত্তমান অধিকারী অতি অল্প মূল্যে ইহা বিক্রয় করিতে উৎসুক, তথাপি কেহই ইহা ক্রয় করিতে চাহে না, ইহার কারণ জানিবার জন্য আমি আগ্রহ প্রকাশ করিলে বন্ধু ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, "এ অঞ্চলের জনসাধারণের ধারণা, বাড়ীখানার উপর অভিশাপ আছে, যে এ বাড়ী কিনবে—তার ভোগে লাগ্‌বে না। সকলেই জানে, পূর্ব্বে যারা এ বাড়ীর মালিক ছিল, তাদের কেউ দীর্ঘকাল এই বাড়ীতে বাস করতে পারে নি। তোমার আমার মত 'ইয়ং বেঙ্গল'রা অবশ্যই এ কথা বিশ্বাস করতে পারবে না; কিন্তু বহু বৎসর পূর্ব্বের যে মর্ম্মন্তুদ শোচনীয় ঘটনার স্মৃতি ঐ বাড়ীর প্রতি কক্ষের সঙ্গে বিজড়িত আছে—সেই লোমহর্ষণ কাহিনী শুনলে ঐ বাড়ীখান কিনতে কারও প্রবৃত্তি হবে না। মনে হয়, বাড়ীখান সত্যই অভিশপ্ত।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া বন্ধু নীরব হইলেন এবং নিস্তব্ধভাবে অদূরবর্ত্তী অরণ্যের দিকে চাহিয়া যেন একটা চাপা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তাঁহাকে অত্যন্ত বিচলিত বলিয়া মনে হইল।

বন্ধুর কথা শুনিয়া ও তাঁহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া আমি বিস্মিতভাবে বলিলাম, "সেই মর্ম্মভেদী ঘটনার কাহিনী কি তোমার জানা আছে? সেই ঘটনার বিবরণ শুন্‌বার জন্য আমার বড়ই আগ্রহ হয়েছে, ভাই! আশা করি, তা বল্‌তে তোমার আপত্তির কোন কারণ নাই।"

বন্ধু বলিলেন, "সে সব ঘটনার বিবরণ আগাগোড়া আমার জানা আছে; আর তা তোমার নিকট প্রকাশ কর্‌তেও আপত্তির কোন কারণ নাই। সেই শোচনীয় ঘটনার বিবরণ জান্‌বার জন্য তোমার যখন আগ্রহ হয়েছে, তখন তা' তোমাকে বল্‌তে আমার কুণ্ঠিত হবারও কারণ দেখি না।"

নৌকার উপর বন্ধুর বন্দুকটা তাঁহার পাশেই পড়িয়াছিল; তিনি তাহার উপর বাঁ হাতের ভর দিয়া সোজা হইয়া বসিয়া, নদীর নির্ম্মল জলস্রোতের দিকে চাহিয়া গম্ভীর স্বরে বলিতে আরম্ভ করিলেন, "ঐ পরিত্যক্ত বাড়ীর পাশে অরণ্যাবৃত যে সঙ্কীর্ণ পথটি দেখ্‌তে পাচ্ছ—এখন সন্ধ্যার পর ঐ পথে চল্‌তে গ্রামের লোক ভয় পায়; কিন্তু কিছুকাল পূর্ব্বেও পথিকদের ঐ রকম ভয়ের কোন কারণ ছিল না। তখনও ঐ বাড়ীতে মানুষের বাস ছিল, এবং সকালে সন্ধ্যায় উহা জনকোলাহলে মুখর হ'য়ে উঠ্‌তো। সেই কোলাহলধ্বনি কিরূপে স্তব্ধতায় পরিণত হ'ল, আমি সে কথার আলোচনা করতে চাই নে। তবে এ কথা বলা নিষ্প্রয়োজন নয় যে, প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে যখন ঐ বাড়ীর চতুর্দ্দিক্ ঐ প্রকার জঙ্গলপূর্ণ হয়নি, পারিবারিক উৎসবের যে বাঁশী যখন মধ্যে মধ্যে বেজে উঠে চতুর্দ্দিক্ প্রতিধ্বনিত ক'রত, তখন এই বাড়ীতে বাস করতেন রায় গ্রামের জমিদার—বিশ্বাস বংশের শেষ বংশধর অমরনাথ বিশ্বাস। অমরনাথ বিপুল বিত্তের অধিকারী ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর সদ্ব্যয়ও ছিল প্রচুর। এ দেশের জমিদাররা সাধারণতঃ যেরূপ বিলাসী, অমরনাথ সেরূপ বিলাসী ছিলেন না। তাঁর নানা গুণের পরিচয় পেয়ে গ্রামের জনসাধারণ তাঁকে দেবতার মত ভক্তি করত; তাঁকে দর্শন করলে পুণ্য হয়, এ কথা তারা অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস করত। অমরনাথের কোন পুত্র-সন্তান ছিল না; অনেকগুলি সন্তান পর পর মারা যাওয়ায় তাঁকে বহু শোক সহ্য করতে হ'য়েছিল; অবশেষে তাঁর জীবনাপরাহ্ণে তাঁর স্ত্রী তাঁকে একটি কন্যারত্ন উপহার দান করেন। তাঁর এই মেয়েটি পরমাসুন্দরী ছিল, সে তার মা-বাপের গর্ব্বের বস্তু ছিল। বাপ-মা তার নাম রেখেছিলেন—গৌরী। অমরনাথের শেষ জীবনের প্রধান আকাঙ্ক্ষা ছিল, গৌরীকে তিনি পুত্রের মত শিক্ষা দান করবেন। পূর্ব্বেই বলেছি, বিপুল বিত্তের অধিকারী হ'লেও অমরনাথ বিলাসী ছিলেন না, বিলাসকে তিনি চিরদিন উপেক্ষা ক'রে এসেছিলেন; কিন্তু তাঁর স্ত্রী এ বিষয়ে সম্পূর্ণ ভিন্নমতাবলম্বিনী ছিলেন। বিলাসিতায় তাঁর অনুরাগ ছিল অসাধারণ। তাঁর মত সৌখীনা নারী ধনাঢ্য সমাজেও বিরল; সাজ-সজ্জার প্রতি তাঁর ঝোঁক অত্যন্ত

অধিক ছিল; এজন্য তিনি শেষ বয়সের একমাত্র অবলম্বন গৌরীকে নিত্য নূতন সাজে সজ্জিত করতেন, এবং তাকে নিত্য নূতন মূল্যবান বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত ক'রেও যেন তৃপ্তি লাভ করতে পারতেন না। সংসারে অনাসক্ত দেব-প্রকৃতি স্বামীর রুচির প্রতি তাঁর লক্ষ্য ছিল না; গৌরীকে বিলাসিনী ক'রে তোলাই যেন তাঁর নারী-জীবনের একমাত্র কামনা ছিল।

"তাঁর জীবন-সমুদ্রে গৌরীই যেন ধ্রুবতারার স্থান অধিকার ক'রেছিল। গৌরীর বয়স যখন নিতান্ত অল্প, সেই সময় হ'তেই তিনি গৌরীর বিবাহের গহনা প্রস্তুত করাতে আরম্ভ করলেন। অমরনাথ স্ত্রীর এই সকল খেয়াল লক্ষ্য করতেন; কিন্তু তিনি কোন দিন স্ত্রীর এই সকল ব্যবহারের প্রতিবাদ করেন নি। অবশেষে এই সকল বিষয়ে স্ত্রীর বাড়াবাড়িতে তিনি কিঞ্চিৎ বিচলিত হ'য়ে একদিন তাঁকে মৃদু অনুযোগের সুরে বললেন, 'গৌরীকে তুমি বড্ড বেশী বিলাসিনী ক'রে তুলছো। সংসারে যাদের কোন অভাব নেই, যারা ইচ্ছামত অর্থব্যয় করতে পারে—বিলাসিতা করা তাদের পক্ষে কঠিন নয়; আমার বয়স অনেক হয়েছে, হঠাৎ কোন্ দিন ওপার থেকে ডাক্ আসবে, তা ত বলা যায় না; তুমি আমার অবর্ত্তমানে গৌরীকে কেবল বিলাসিনী ক'রেই তুলো না। মেয়ে তোমার পরম রূপবতী, যাতে পাঁচ জন তার গুণেরও প্রশংসা করতে পারে—এখন থেকে ওকে সেই রকম শিক্ষাই দিও, আমি যেন তৃপ্তির সঙ্গে তা দেখে যেতে পারি।'

"কিন্তু অমরনাথের এই কামনা পূর্ণ হ'ল না, দুই তিন মাসের মধ্যেই পরপার থেকে তাঁর ডাক পড়ল, তিনি হঠাৎ এক দিন ইহলোক থেকে প্রস্থান করলেন; তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে তাঁর স্ত্রী শোকপ্রকাশেরও যথেষ্ট অবসর পেলেন না। কারণ, স্বামীর মৃত্যুর পর এক সপ্তাহ মধ্যেই তিনিও গৌরীকে ত্যাগ ক'রে অন্ধকারাচ্ছন্ন অজ্ঞাত পথে স্বামীর অনুসরণ করলেন। অতি অল্প কয়েক দিনের ব্যবধানেই জমিদার-দম্পতির ইহলীলার অবসান হ'ল।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া বন্ধু হঠাৎ নীরব হইলেন, যেন অদূরবর্ত্তী ঐ অট্টালিকার অভ্যন্তরস্থ সেই সকরুণ শোচনীয় দৃশ্যের স্মৃতি তাঁহার বিষাদ-সমাচ্ছন্ন হৃদয়-ফলকে প্রতিফলিত হইল। আমিও মৌনভাবে অস্তমিত তপনের লোহিতালোক-প্রতিফলিত নদীবক্ষে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলাম।

দুই এক মিনিট নিস্তব্ধ থাকিয়া বন্ধু পুনর্ব্বার বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"পিতামাতার মৃত্যুর পর সেই বৃহৎ সংসারে গৌরীর আপনার বলতে কেউ রইল না। বার বৎসর কাল যারা নিবিড় স্নেহ-যত্নে তাকে মানুষ ক'রে তু'লেছিলেন তাঁরা হঠাৎ কোথায় অদৃশ্য হলেন, গৌরী তা বুঝতে পারল না। গৌরীর কোন নিকট-আত্মীয় না থাকায় অমরনাথের জমিদারীর বৃদ্ধ ম্যানেজার ভেবে দেখলেন— পিতামাতার অভাবে স্বামীই স্ত্রীলোকের একমাত্র অবলম্বন। এই জন্য তিনি দারুণ শোকেও মন স্থির ক'রে গৌরীর জন্য সুপাত্রের সন্ধান করতে লাগলেন। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের অধিবাসী মতিলাল দত্তর বড় ছেলে সুব্রতর সঙ্গে গৌরীর বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হ'ল। সুব্রত সেই বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়ে ফলের প্রতীক্ষা করছিল। সুব্রত রূপে গুণে গ্রামবাসিগণের প্রশংসা অর্জ্জন ক'রেছিল।

"সুব্রত শৈশবে পিতৃহীন হয়েছিল। তার মা অন্নদা-সুন্দরী নিরুপায় হ'য়ে ছোট ছোট তিনটি ছেলে নিয়ে ভাইদের আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। মতিলাল মৃত্যু-কালে টাকা-কড়ি কিছুই রেখে যেতে পারেন নি, অধিকন্তু কিছু ঋণ ছিল। অন্নদাসুন্দরী ভাইয়েদের গলগ্রহ হয়ে অতি কষ্টে ছেলে তিনটিকে মানুষ করছিল, এবং তাকে সেই সংসারে দাসীর অভাব পূর্ণ করতে হচ্ছিল। ম্যানেজার গৌরীর জন্য সুপাত্রের সন্ধানে বেশী পরিশ্রম না ক'রে হাতের কাছে যা জুটলো, তাই গ্রহণযোগ্য মনে করলেন। গৌরীর মুখের দিকে চাইলে তিনি কখন এমন সম্বন্ধ স্থির করতেন না। কিন্তু তাঁর এই অবিবেচনার ফল গৌরীকেই ভোগ করতে হ'ল।

"মা-বাপকে হারিয়ে দু'মাস না যেতেই গৌরী শুনলে, তার বিয়ে হচ্ছে। বার বছরের মেয়ে, বিয়ে কাকে বলে তা' সে জানত না; তার ধারণা ছিল—ওটা এক রকম খেলা, সেই খেলায় অনেক বাজনা বাজে, অনেক লোকজন নিমন্ত্রণ খায়। মেয়েরা উলু দেয় ও শাঁখ বাজায়, এবং টোপর মাথায় দিয়ে বর আসে—ইত্যাদি। বার বছর বয়সে

তার মন ছিল শিশুর মনের মত সরল। কুসুম-কোরকের মত পবিত্র।

২

"বিয়ের পর গৌরীকে শ্বশুর-বাড়ী যেতে হ'ল না; কারণ, তার শ্বশুরের যে ভিটে ছিল শ্বশুর মতিলাল দত্তর মৃত্যুর কয়েক মাস পরেই তার দেনার দায়ে তা' নিলামে বিক্রী হয়ে গিয়েছিল। অন্নদাসুন্দরীর একটা 'ছিল্লে' হ'ল; বিয়ের পর সে ছেলেদের নিয়ে গৌরীর বাপের বাড়ীতেই আশ্রয় নিলে। যে সকল 'দজ্জাল' শাশুড়ীর অত্যাচারের সংবাদ মধ্যে মধ্যে খবরের কাগজে দেখতে পাও, অন্নদাসুন্দরী সেই শ্রেণীর শাশুড়ীর আদর্শ। গৌরীর সুন্দর মুখ, তার সরল ব্যবহার অন্নদাসুন্দরীর মনের উপর বিন্দুমাত্র প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। অন্নদার রূপের খ্যাতি তার যৌবনকালেও ছিল না; এ জন্য সে বাল্যকাল থেকেই সুন্দরীদের হিংসা করত। এবং নারীর রূপের কোন প্রয়োজন আছে এ কথা সে স্বীকার করত না। তার ধারণা ছিল, বাঘ, ভালুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর তীক্ষ্ণ দাঁত ও ধারাল নখের প্রয়োজন যে জন্য, নারীর রূপের প্রয়োজনও ঠিক সেই জন্য; পুরুষ জাতিকে ক্ষত-বিক্ষত করাই তার উদ্দেশ্য; এ অবস্থায় বিধাতা যাদের রূপে বঞ্চিত করেছেন, নারী জাতির মধ্যে তারাই শ্রেষ্ঠ! কিন্তু কুরূপা হওয়ার যে ব্যথা, অন্নদাসুন্দরী সেই গোপন ব্যথা কোন দিন ভুলতে পারে নি। আজ ফুটন্ত ফুলের মত সুন্দর ও রূপের আধার গৌরীকে দেখে তার সেই গোপন ব্যথা প্রৌঢ়ত্বের সীমা-প্রান্তে এসেও তার বুকের মধ্যে তীক্ষ্ণধার কাঁটার মত খচ্-খচ্ ক'রে বিঁধতে লাগ্‌ল। তার মনে হ'ল—যদি এই একরত্তি মেয়ের এত রূপ না থাকতো ত তাতে কার কি ক্ষতি হ'ত? সে গৌরীর বাপের টাকা দেখেই গৌরীর সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিয়েছিল; তার রূপের কোন মূল্য ছিল বলে সে স্বীকার করে নি। তার সর্ব্বদা আশঙ্কা হত, এ রূপের কাছে ঘেঁস্‌তে দিলে তার ছেলে কি আর তার বশে থাকবে? তার পর অন্নদা দেখ্‌লে, অমরনাথের বিপুল ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারিণী ঐ ক্ষুদে মেয়েটা। এ সম্পত্তিতে তার ছেলেদের বিন্দুমাত্র অধিকার নাই। গৌরীর দয়ার ওপর তাদের নির্ভর করে থাকতে হবে ভিক্ষুকের মত। অন্নদার সর্ব্বদা মনে হ'ত—তার দারিদ্র্যকে উপহাস করবার জন্যই বৈবাহিক অমরনাথের ঐশ্বর্য্যের এই অসহ্য আড়ম্বর! পিতৃ-মাতৃহীনা গৌরী কৈশোরেই আপনার অবস্থা বুঝে একটু বেশী গম্ভীর হ'য়ে উঠেছিল; কিন্তু তার এই গাম্ভীর্য্যও অন্নদা মার্জ্জনার অযোগ্য ব'লে ধারণা করলে; তার সর্ব্বক্ষণই মনে হতো, বৌ তার বাপের অর্থের ও নিজের রূপের গর্ব্বে ঐ রকম গম্ভীর। গৌরীর নম্রতাকে দুঃসহ বিদ্রূপ ব'লেই অন্নদার ধারণা হওয়ায় সে মনের আগুনে নিরন্তর দগ্ধ হ'তে লাগল। কিন্তু সেই আগুনে সে গৌরীকেও দগ্ধ না ক'রে স্থির থাকতে পারল না। অন্নদার সর্ব্বক্ষণ সতর্ক দৃষ্টি থাক্‌ল সেই অহঙ্কারী 'বড়লোকের বেটী' কোন রকমে যেন তার সম্মুখে মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে।"

৩

এই পর্য্যন্ত বলিয়া বৃদ্ধ আবার নীরব হইলেন। বোধ হয়, সেই বালিকার দুঃসহ দুঃখ ও তাহার কোমল হৃদয়-সঞ্জাত পুঞ্জীভূত বেদনার স্মৃতি তাঁহার সহানুভূতিপূর্ণ হৃদয়কে কঠোর ভাবে নিপীড়িত করিয়া, দুই এক বিন্দু অশ্রুরূপে তাঁহার নয়ন-কোণে সঞ্চিত হইয়াছিল; তখন সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হওয়ায় আমি তাঁহার মুখের ভাব-পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতে পারিলাম না; কিন্তু তাঁহার বিচলিত কণ্ঠস্বরে তাঁহার সমবেদনার অনুভূতি আমার ব্যথিত হৃদয় স্পর্শ করিল। তিনি পুনর্ব্বার করুণার্দ্র-কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "দেখতে দেখতে বৎসরের পর বৎসর কেটে গেল। অন্নদার প্রবল প্রতাপে বাড়ীর সকলেই ত্রস্ত। সে বৈবাহিক-গৃহের কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ ক'রে বাড়ীর পুরানো ঝি-চাকরগুলাকে কোন না কোন ছলে বিদায় করেছিল। অবশেষে বৃদ্ধ ম্যানেজার পর্য্যন্ত অন্নদার অদ্ভুত চক্রান্তে প্রাণ এবং তদপেক্ষাও প্রিয় সম্মান নিয়ে মনিববাড়ী ছেড়ে পলায়ন করতে বাধ্য হলেন। অসহায়া গৌরী সে প্রকাণ্ড অট্টালিকার কোন্ কোণে একাকিনী মুখ গুঁজে পড়ে থাকে—কে-ই বা তার সন্ধান নেবে? সংসার যেন তার সঙ্গে সকল সম্পর্ক শেষ করে দিয়েছে! কিন্তু বাড়ীর সকলেই গৌরীকে ভুললেও এক জন তাকে ভুলতে পারেনি। যার জন্য প্রবল প্রতাপশালিনী অন্নদাসুন্দরী এই বৃহৎ সংসারের কর্ত্রী, সে গৌরীর স্বামী সেই সুব্রত। সুব্রত

তখন কল্‌কাতায় থেকে পড়াশুনা ক'রত; মায়ের কঠোর আদেশে তার বাড়ী অর্থাৎ শ্বশুরবাড়ী যাওয়ার তেমন বেশী সুযোগ ছিল না। পূজার সময় কয়েক দিন সে বাড়ীতে কাটিয়ে আস্‌ত; সেই কয় দিনের স্মৃতি সে সারা বৎসরের জন্য জীবন-পথের পাথেয়রূপে সঞ্চয় ক'রে রাখত। গ্রীষ্মাবকাশে তাকে ছোট ভাইদের নিয়ে দার্জ্জিলিং বা শিমলা পাহাড়ে গ্রীষ্ম যাপন করতে হ'ত; তারা গরীবের ছেলে বটে, কিন্তু তখন তাহাদের মা বড় লোকের সম্পত্তির একমাত্র অভিভাবিকা। অন্নদা বেয়াই-এর সম্পত্তি মুঠোর মধ্যে পুরে তা' উপভোগের সুব্যবস্থা ক'রে নিয়েছিল। বড়-দিনের ছুটীতেও সুব্রতর বাড়ী আস্‌বার হুকুম ছিল না; মাকে সে বাঘিনীর মত ভয় করত। পূজার কয় দিন সুব্রত গৌরীকে খুব কম সময়ই দেখ্‌তে পেত। কারণ, এদিকে অন্নদার সতর্ক দৃষ্টি ছিল। উভয়ের দেখা-সাক্ষাতের যে অল্প সুযোগ হতো, তাই তারা জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মুহূর্ত্ত বলে মনে করত। তাদের বুকভরা পিপাসায়—বিন্দু পরিমাণ সুশীতল জল যেন তৃষার্ত্ত চাতকের শুষ্ক কণ্ঠের বারিবিন্দু; তা সুস্নিগ্ধ হ'লেও অশনিপাতের ভয়ে তারা সর্ব্বদা ব্যাকুল হ'য়ে থাক্‌ত। সঙ্গোপনে তাদের প্রেম দিন দিন ঘনীভূত হ'য়েছিল।

"মানুষ যে কত নিষ্ঠুর হ'তে পারে, তা গৌরীর প্রতি অন্নদার কঠোর ব্যবহারে সুস্পষ্টরূপেই বুঝ্‌তে পারা যেত। ধনীর কন্যা গৌরী বাল্যকাল থেকে বিলাসিতায় প্রতিপালিত হয়েছিল, পাছে সে বিলাসিতায় নষ্ট হয়, এই ভয়ে অন্নদা তাকে লাল কস্তা পেড়ে মোটা শাড়ী ভিন্ন কোন দিন মিহি তাঁতের সাড়ী পর্‌তে দিত না। মূল্যবান ভাল সাড়ী তার অনেক ছিল, কতক তার মায়ের বাক্সের কাপড়; কিন্তু সেই সকল উৎকৃষ্ট সাড়ী তার স্পর্শ করবারও অধিকার ছিল না। তার মা তাঁর হাজার হাজার টাকার বহুমূল্য জহরতের অলঙ্কার তার জন্য রেখে গিয়েছিলেন, তার নিজের অলঙ্কারও প্রচুর ছিল; কিন্তু অন্নদা তাকে দু'হাতে দু'গাছা বালা ভিন্ন অন্য অলঙ্কার ব্যবহার করতে দিত না। তথাপি বিধাতার কি অন্যায় বিধান, গৌরীর রূপ দিন দিন ফুটে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। বিধাতার এই দানে বাধা দিতে না পারায় সময়ে সময়ে অন্নদার হিংসা-জর্জ্জরিত অন্তরাত্মা বিদ্রোহী হ'য়ে উঠ্‌ত। সে গৌরীর আহার সম্বন্ধেও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখ্‌ল। গৌরী যাতে সময়ে পেট ভরে দুটি খেতে না পায়, তার ব্যবস্থারও সে ত্রুটি করল না। ক্ষুধার জালায় এক এক দিন গৌরীর দুই চোখ ফেটে জল পড়ত, তার মনে হ'ত—জেলখানার কয়েদীরাও তার চেয়ে সুখী, তার চেয়ে স্বাধীন, তাদেরও দু'বেলা পেট ভরে খাবার অধিকার আছে। মায়ের সঞ্চিত নানা রকম জামা-কাপড়পূর্ণ আলমারির দিকে চেয়ে গৌরীর মনে কত দিন দুর্দ্দমনীয় লোভ জেগে উঠ্‌ত; কিন্তু সে জান্‌ত, সেই দুরাকাঙ্ক্ষা তাকে সংবরণ করতেই হবে। ভিখারিণী যেমন লুব্ধ-নেত্রে পথপ্রান্তবর্ত্তী সুসজ্জিত দোকানের দিকে চেয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে, নিজের সঞ্চিত দ্রব্যের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রেও তার সেইরূপ অবস্থা! সংসারে এমন এক জনও নেই, যে তাকে এই নিদারুণ নির্য্যাতন থেকে রক্ষা করতে পারে। তার জীবনের একমাত্র নির্ভর স্বামী—অক্ষম, মায়ের ভয়ে মূক! তার সমবেদনা বেদনায় জীর্ণ, নিষ্ফল।

"সুব্রত পরীক্ষার জন্য বড় ব্যস্ত ছিল, বাড়ীর কথা চিন্তা করবার তার অবসর ছিল না; তথাপি বাড়ীর আকর্ষণ তাকে ব্যাকুল করে তু'লেছিল, এজন্য যেদিন তার পরীক্ষা শেষ হ'ল, সেই দিনই সে জিনিষপত্রগুলা তাড়াতাড়ি গুছিয়ে নিয়ে বাড়ী রওনা হ'ল। এবার সে তার মায়ের আদেশের প্রতীক্ষা পর্য্যন্ত করে নি। তার আশা ছিল, এবার সে কিছু বেশী দিনের জন্য গৌরীর কাছে থাক্‌তে পারবে; গৌরীর হৃদয়ভরা স্নেহে, প্রেমে, তার ক্ষুধিত, ব্যথিত, বিরহী হৃদয় দীর্ঘকাল পরে শান্তি ও তৃপ্তিলাভ করবে। সে তার বহু-দিনের স্বপ্ন সফল, সার্থক ক'রে তুলবে; কিন্তু তার স্বপ্ন আর সফল করবার সুযোগ হ'ল না। সে বাড়ীতে পৌঁছানমাত্র শুনলে, তার মা, দিদিমা এবং আরও কয়েক জন অনুগতা সঙ্গিনীকে নিয়ে দুই এক দিনের মধ্যেই তীর্থভ্রমণে যাবেন। তার মা স্থির করেছেন—সুব্রতকেই রক্ষক হ'য়ে তাঁদের সঙ্গে যেতে হবে। তার পরীক্ষা শেষ হয়েছে—নিষ্কর্ম্মা হ'য়ে বাড়ীতে বসে থেকে সে কি চতুর্ভুজ হবে?—মায়ের এই কঠোর আদেশে সুব্রতর মাথায় যেন বজ্রাঘাত হ'ল; দারুণ অভিমানে তার চক্ষুদুটি অশ্রু-সজল হ'ল। কিন্তু মায়ের আদেশের প্রতিবাদ করতে তার সাহস হ'ল না।

শেষে সে দীর্ঘকাল চিন্তার পর সাহস সঞ্চয় ক'রে অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে মাকে জানালে—তার শরীরটা তেমন ভাল নেই; বিশেষতঃ, পরীক্ষার পরিশ্রমে সে অত্যন্ত ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে। এ অবস্থায় তাঁরা অন্য কাউকে সঙ্গে নিয়ে গেলেই ভাল হয়; লোকের ত অভাব নেই, আর অনেকেই তীর্থ-ভ্রমণে যাওয়ার জন্যও উৎসুক। ছেলের আপত্তি শুনে মা তার মুখের দিকে চেয়ে বললে, "তোমার শরীর ভাল নেই, খোকা! তা হ'লে ত তোমার বাইরে যাওয়া আরও বেশী দরকার। না, তুমি এতে আর আপত্তি ক'রো না, তোমারই যাওয়া স্থির।'—সুব্রত ফাঁসীর আসামীর মত মুখের ভঙ্গি ক'রে মায়ের সম্মুখ হ'তে স'রে গেল। তার সকল আশা শূন্যে বিলীন হ'ল। এই শস্য-শ্যামলা, সুখৈশ্বর্যপূর্ণ বৈচিত্র্যময়ী বসুন্ধরা, মরুভূমধ্যে এক বিশাল মরুভূমিরূপে তার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে প্রকট হ'য়ে উঠ্‌ল।

"সেই যৎসামান্য অবসরকালে শুধু চোখের দেখা ভিন্ন সুব্রত গৌরীকে একটিও মনের কথা বল্‌বার সুযোগ পেল না। এইভাবে গৌরীর নিকট বিদায় গ্রহণ করতে তার অন্তরাত্মা বিদ্রোহী হ'য়ে উঠ্‌ল। গৃহত্যাগ করবে না এ ইচ্ছা তার প্রবল; কিন্তু হায়, 'তবু যেতে হ'ল।' মায়ের কঠোর আদেশ উপেক্ষা করবার উপায় নেই।

"সুব্রতর ভাগ্য মন্দ; তার কলেজ খুল্‌বার পূর্ব্বে মায়ের তীর্থ-দর্শন শেষ হ'ল না, কাজেই বাড়ী ফিরে সে কয়েক দিন বিশ্রাম করবে—সে অবসর ঘটে উঠ্‌ল না। অবশেষে সে বিরক্ত হ'য়ে তার মাকে জানালে তার কলেজ খুলেছে—দুই এক দিনের মধ্যেই তাকে কলকাতায় ফির্‌তে হবে।

"মা তৎক্ষণাৎ বল্‌লে, 'বেশ ত, তুই বাড়ীতে একটা টেলিগ্রাম ক'রে দে, কেউ হাওড়া ষ্টেশনে এসে আমাদের দেশে নিয়ে যাবে। তুই হাওড়া হ'তে কলকাতার বাসায় যাবি। তোকে কলেজ কামাই কর্‌তে হবে কেন?'

"সুব্রত বুঝ্‌তে পার্‌ল না—তার মায়ের হৃদয় কোন্ উপাদানে নির্ম্মিত! সে যথাসময়ে হাওড়ায় নেমে মায়েদের স্বগ্রামে পাঠাবার ব্যাবস্থা ক'রে কল্‌কাতার বাসায় ফিরে এল; কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা কর্‌ল—আর সে বাড়ী যাবে না—যত দিন তার মা তাকে যেতে না লিখ্‌বে।

"প্রায় এক বৎসর পরে এক দিন কলেজ হ'তে বাসায় ফিরে সুব্রত একখান চিঠি পেয়ে তাড়াতাড়ি খুলে দেখ্‌ল—পত্রখান লিখেছে তার ছোট ভাই মুকুল। সুব্রতর এই ভাইটি গৌরীর বড় অনুগত ছিল, তার অন্তর্ব্বেদনা সে সমস্ত হৃদয় দিয়ে অনুভব কর্‌ত! পত্রখান সংক্ষিপ্ত; তাতে এই কটি-মাত্র কথা লেখা ছিল—'বড়দা', বৌদি'র বড় অসুখ, তিনি তোমায় দেখ্‌তে চাইছেন। তুমি তাড়াতাড়ি এস, আর মাকে এ চিঠির কথা জানিও না। আমি লুকিয়ে তোমাকে চিঠি দিলাম, মা জানতে পার্‌লে আমাকে আস্তো রাখ্‌বে না বড়দা', তুমি ত মাকে চেন।'

"চিঠি প'ড়ে সুব্রত স্তব্ধ হ'য়ে ধক্কের মত ব'সে রৈল। চিঠির মর্ম্ম অত্যন্ত স্বচ্ছ: তা' বুঝ্‌তে তার বিলম্ব হ'ল না। সুব্রত ভাব্‌লে সে কি নির্ব্বোধ! মিথ্যা অভিমানে নিজেকে ত বঞ্চিত করেছেই, আর একটি নিরীহ, নিরপরাধ বালিকাকে তার জীবনে বসন্ত না আস্‌তেই হয় ত মৃত্যু-মুখে ঠেলে দিয়েছে!—মা গঙ্গাস্নান উপলক্ষে কতবার কল্‌কাতায় এসে সুব্রতকে দেখে গিয়েছেন, কিন্তু একটিবারও তাকে বাড়ী যেতে বলেন নি, তারও যে বাড়ী-ঘরে প্রয়োজন থাক্‌তে পারে, এ কথা কোন দিন তাঁর মনে স্থান পায় নি! দারুণ অভিমানে সে বাড়ী যাওয়ার নামও মুখে আনে নি; আর এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে সে গৌরীর কোন খবরও নেয় নি। নিজের উপর তার ভয়ঙ্কর রাগ হ'ল, কিন্তু আর ত ভাব্‌বার সময় নেই। গৌরীর অবস্থা কেমন কে জানে?

"পরদিন সন্ধ্যার সময় সুব্রত বাড়ী পৌঁছাল। তাকে দেখে তার মা অবাক্; সন্দিগ্ধ-স্বরে জিজ্ঞাসা ক'রল, 'তুই যে হঠাৎ এখন বাড়ী এলি?'—মায়ের এই স্নেহ-হীন রুক্ষ প্রশ্নে চিরসহিষ্ণু সুব্রতর মুখে কি একটা রূঢ় উত্তর বেরিয়ে আস্‌ছিল; কিন্তু সে জিহ্বা সংবরণ ক'রে সটান দোতালায় নিজের ঘরে প্রবেশ কর্‌ল; কিন্তু সে সেখানে যাকে দেখ্‌বার আশা করেছিল—সেই গৌরীকে দেখ্‌তে পেলে না, তবে কি গৌরী—সেই অনাদৃতা, লাঞ্ছিতা বালিকা রোগে শোকে—তাকে ত্যাগ ক'রে—সুব্রত আর ভাবতে পারল না। সে কি কর্‌বে ভাবছে, সেই সময় মুকুল এসে তাকে বল্‌লে, 'বড়দা, এলে? বৌদি যে তোমাকে দেখবার জন্যে আকুল হ'য়ে উঠেছে, বড়দা! তার অবস্থা দেখে আমার কান্না পাচ্ছে, কেবল মার ভয়ে কাঁদতে পাচ্ছিনে।'

"সুব্রত মুকুলের কাছে জানতে পারল,- 'বৌদি' নীচের ঘরে আছেন, মা তাঁকে দোতলায় থাকতে দেয় না। নীচের ঘরটা এমন অন্ধকার যে, দিনের বেলাতেও সেখানে একা যেতে ভয় করে। মা আমাদের কাউকে সে ঘরে যেতে দেয় না; বলে ওর ছোঁয়াচে রোগ; ওর নিশ্বাসে বিষ, ওর কাছে যাস্ নে। বৌদি' বোধ করি আর বাঁচবেন না, বড় দা'!' বলতে বলতে মুকুলের দুই চক্ষু জলে ভ'রে উঠ্ল।

"বাড়ীর নীচের তালার কতকগুলো ঘর বহুকাল অব্যবহৃত অবস্থায় পড়েছিল, মুকুল তারই একটা অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘর সুব্রতকে দেখিয়ে দিলে, সুব্রত অন্ধকারে কিছুই দেখতে না পাওয়ায় নিজের ঘর থেকে তার টেবল-ল্যাম্পটা নিয়ে এল; এ-কালের মত তখনও এ দেশে টর্চের আমদানী হয় নি ত। সুব্রত সেই ল্যাম্পের উজ্জ্বল আলোকে গৌরীকে দেখে ভয়ে-বিস্ময়ে চমকিয়ে উঠ্ল। এই কি তার সেই 'রূপরাণী' গৌরী? মেঝের উপর মলিন শয্যায় ততোধিক মলিন একটা জীর্ণ উপাধানে গৌরীর রুক্ষ কেশপূর্ণ জ্বরতপ্ত মাথাটা লুটোচ্ছিল; তার দেহ যেন বিছানার সঙ্গে মিশিয়ে গিয়েছিল।

"সুব্রত গৌরীর পাশে হতাশ ভাবে ব'সে পড়লো; তার ললাটে শীতল হাতখানি রাখ্তেই গৌরী চমকে উঠে চক্ষুর রোগকাতর ক্ষীণ দৃষ্টি তুলে সুব্রতর মুখের দিকে চাইল। সে প্রথমে চক্ষুকে বিশ্বাস করতে পারল না। সত্যই সুব্রত এসেছে? সম্মুখে সত্যই কি তার ইহজীবনের শেষ স্বপ্ন—কামনা মূর্ত্তি ধরে তাকে দেখা দিল?

"স্তম্ভিত সুব্রত কোন কথা বলবার পূর্ব্বেই গৌরী অতি কষ্টে ক্ষীণ স্বরে বলল, 'ওঃ, তুমি এসেছ? তুমি সত্যিই এসেছ? আঃ'—গভীর তৃপ্তি-বিজড়িত কণ্ঠ থেকে তার আর কোন কথা উচ্চারিত হ'লো না। তার চক্ষু হ'তে নিঃশব্দে দু'বিন্দু অশ্রু ঝ'রে শুষ্ক তপ্ত গাল দু'খানি সিক্ত করল।

"গৌরী রোগযন্ত্রণায় হাঁপাচ্ছিল; অতি কষ্টে, যথাসাধ্য চেষ্টায় সে আপনাকে সংযত ক'রে নিয়ে কষ্টোচ্চারিত স্খলিত স্বরে থেমে থেমে আবার বলতে লাগ্ল, 'এ স্বপ্ন নয়, সত্যিই তুমি এসেছ? তোমাকে দেখে আশা হচ্ছে, আমি মরব না, বেঁচে উঠ্বো।'

"সহসা সে দুই হাতে সুব্রতকে বুকে টেনে নিয়ে বলল, 'ওগো, আমার মরতে যে একটুও ইচ্ছে নেই। জীবন আমার অসহ্য দুঃখে, কষ্টে, যন্ত্রণায় কেটে গেছে, তবু আমি তোমায় ফেলে রেখে এই চরম দুঃখ-কষ্টেরও ওপারে যে যেতে চাইনে। ওগো আমার জীবনের দেবতা! তোমার কাছে আমি কোন দিন কিছু চাইনি; আজ ভিক্ষা চাইছি আমার জীবন; আমায় বাঁচাও। আমার বাবার সকল ঐশ্বর্য্য ব্যয় ক'রে আমার জীবন দান কর। এই আলো-হাসিতে ভরা, এই সুখময়ী ধরা থেকে এমন অসময়ে আমি বিদায় নিতে চাইনে। আমি বাঁচ্তে চাই।'

"সুব্রত দু'হাতে মুখ ঢেকে বিদীর্ণ কণ্ঠে বললে, 'গৌরী, গৌরী, চুপ কর; আর আর আমি সহ্য করতে পারছি নে, গৌরী!'

"সেই রাত্রে সুব্রতকে কেউ সেই ঘর হ'তে অন্য ঘরে নিয়ে যেতে পারল না। এখন আর বিনা চিকিৎসায় রাখা উচিত নয় ব'লে সুব্রত সেই রাত্রিতেই পাড়ার ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করল। ডাক্তার বললেন, 'আমিই আপনার স্ত্রীর চিকিৎসা করছিলাম, রোগ সাংঘাতিক হবার পূর্ব্বে আপনার মাকে সতর্ক করেছিলাম, সুচিকিৎসার ও যথাযথ পথ্যের ব্যবস্থা করতে বলেছিলাম; কিন্তু তিনি আমার উপদেশ অগ্রাহ্য ক'রে চিকিৎসা পর্য্যন্ত বন্ধ করলেন! এখন আর আমি কি করতে পারি বলুন? তবে মনে হয়, ভাল রকম চিকিৎসা ও পরিচর্য্যা হ'লে রোগীর এখনও বাঁচ্বার আশা আছে। আপনি সহর থেকে এক জন বড় ডাক্তার আনবার ব্যবস্থা করুন; আমিও তাঁর সঙ্গে থাক্ব।'

"সুব্রত সেই রাত্রেই সহর থেকে বড় ডাক্তার আনতে উদ্যত হল; কিন্তু টাকা? টাকা ভিন্ন তার চেষ্টা সফল হবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু টাকা সুব্রতর ছোট মামার নিকট; সেই ব্যক্তিই তখন ষ্টেটের ম্যানেজার। তার কাছে সুব্রত টাকা চাওয়ায় সে বল্লে, 'তোমার মায়ের আদেশ ভিন্ন একটি পয়সা আমি তোমাকে দিতে পারব না।'

"সুব্রত মায়ের কাছে ছুটে গেল; তখন তার আর অভিমান করবার অবসর ছিল না। সুব্রত তাকে টাকার কথা বল্তেই সেই পিশাচী রাগে আগুন হয়ে উঠ্ল, কঠোর স্বরে বল্লে, 'টাকা? টাকা কি খোলার কুচি যে, পথে প'ড়ে আছে? যক্ষ্মারোগীকে উনি 'চিকিচ্ছে' ক'রে বাঁচাবেন! যা নয় তাই! একটি পয়সাও আমি দিচ্ছিনে।'

"সুব্রত অনেক কথা বলে মায়ের সঙ্গে তর্ক করতে পারত, কিন্তু তর্ক করবার প্রবৃত্তি তখন তার ছিল না। তর্ক করে ফল কি? হঠাৎ তার মনে হ'ল—তার নিজের সোনার ঘড়ির চেন, হীরার আংটী থাকতে সে টাকার জন্যে ভাবছে কেন? কি ভুল! সে তার ঘর হতে ঘড়ি, চেন, আংটী নিয়ে দ্রুতবেগে বেরিয়ে গেল।

"তার মা তাকে বাধা দিতে সাহস করলে না বটে, কিন্তু তাকে ঘড়ি চেন নিয়ে বেরিয়ে যেতে দেখে সে যেন ক্ষেপে উঠলো, এবং ক্ষ্যাপা কুকুরের মত চীৎকার করে বাড়ীর সকল লোককে সন্ত্রস্ত করে তুললে। তার পর গৌরীর শয়ন-কক্ষে গিয়ে যে ভাষায় তাকে গাল দিতে লাগল— কোন ভদ্রনারীর মুখে তা উচ্চারিত হ'তে পারে না। সে সব কথা তোমাকে ব'লে আমি জিহ্বা কলুষিত করতে চাইনে।

* * * * *

"পরদিন অপরাহ্ণে সুব্রত যখন ডাক্তারসহ গৌরীর রোগ-শয্যাপ্রান্তে উপস্থিত হ'ল, তখন সেই কক্ষের বিরাট নিস্তব্ধতায় তার সমগ্র হৃদয় কি এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় কেঁপে উঠল। গৌরীর বরফের মত শীতল দেহ স্পর্শ ক'রে সুব্রত ব্যাকুলস্বরে ডাকলে, 'গৌরী, গৌরী, আমি এসেছি, একবার চক্ষু মেলে চেয়ে দেখ।'—কিন্তু কে তার আকুল আহ্বানে সাড়া দেবে? ডাক্তার অগ্রসর হ'য়ে গৌরীর দেহ পরীক্ষা ক'রে গম্ভীরস্বরে বললেন, 'সব শেষ।'

"সুব্রত গৌরীর বুকের উপর উপুড় হ'য়ে পড়ে স্তব্ধ ভাবে অশ্রুবর্ষণ করতে লাগল: তার সকল ইন্দ্রিয়ের শক্তি তখন স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিল। জিহ্বাও বাক্‌শক্তিহীন।

"অট্টালিকার যে কক্ষে গৌরী অন্তিম-নিদ্রায় অভিভূত, সেই কক্ষের কয়েক গজ পূর্ব্বে এই নদী। সেই অপরাহ্ণে কয়েকটি যুবক নদীবক্ষে নৌকারোহণে জলবিহার করছিল, এক জন তখন গান ধরেছিল,

নিমেষের তরে সরমে বাধিল,
মরমের কথা হ'ল না;
জনমের তরে তাহারই লাগিয়ে
রহিল হৃদয় বেদনা!"

বন্ধু নীরব হইলেন। আমিও কয়েক মিনিট নিস্তব্ধ থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তার পর?'

বন্ধু ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "তার পর আর কি? তার পর সকলকে ঐ বাড়ী ছাড়তে হ'ল, কেউ মারা গেল, কেউ আত্মহত্যা করলে, কেউ বা ভয়ে পালিয়ে গেল, সেই সময় হ'তে ঐ বাড়ী পরিত্যক্ত।"

শ্রীমতী প্রকৃতি বসু

সীমা-হীন

জীবনের শেষ সে কি মরণেই
অথবা এ জীবনের সীমা নেই,
দূরের যে রেখা-আঁকা আকাশের
সেথায় ত আকাশের ছোঁওয়া নেই।

যে ঢেউ মিলায়ে যাবে সাগরে,
সে ঢেউ লাগিবে ফিরে কিনারে;
যে তারা নিভিয়া গেছে আলোকে,
সে তারা জাগিয়া থাকে আঁধারেই।

মরণেতে শেষ যদি জীবনের,
নির্ব্বাণ নব-জাগা জীবনের,
সৃজনের শেষ যদি প্রলয়ে—
সৃজনের জাগরণ প্রলয়েই।

যাত্রার সুরু হ'ল যেখানেই,
যাত্রার বিরতি ত সেখানেই;
অসীমের যেথা সুরু সেথা শেষ,
আদি আর অন্ত যে কিছু নেই।

শ্রীশৈলেন গঙ্গোপাধ্যায়

বৈষ্ণবমত-বিবেক

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সেবাবুদ্ধিতে ব্রজবাসিগণের প্রতি শ্রীল সনাতন গোস্বামী এমন প্রীতিসাধনে সিদ্ধ হইয়াছিলেন যে, ব্রজবাসিগণ স্ত্রী-পুরুষ-বাল-বৃদ্ধ-নির্ব্বিশেষে তাঁহাকে প্রাণপণে ভালবাসিত। তিনি যখন যে গ্রামে যাইতেন, তখনই সেই গ্রামের লোকে অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে লইতে আসিত। ভক্তিরত্নাকরে এ সম্বন্ধে যে সুন্দর প্রাণস্পর্শী বর্ণনা আছে, এখানে তাহা উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না—

"সনাতন গোস্বামী এ ব্রজবাসিগণে।
নিরন্তর প্রাণের অধিক করি মানে॥
ব্রজপরিক্রমা যবে করেন গোসাই।
গ্রামে গ্রামে রহে যে সুখের সীমা নাই॥
এক গ্রামে রহি আর গ্রামে যবে যায়।
গ্রামবাসী লোক গোস্বামীর পাছে ধায়॥
কিবা বাল বৃদ্ধ কেহ ধৈর্য্য নাহি মানে।
গোস্বামীর বিচ্ছেদে কান্দয়ে সর্ব্বজনে॥
সনাতন গোস্বামীও ক্রন্দন করিয়া।
নিজ নিজ গৃহে পাঠায়েন প্রবোধিয়া॥
ক্রন্দন সম্বরি সবে নিজ গৃহে গেলে।
তবে সনাতন অন্য গ্রামে শীঘ্র চলে॥
যে গ্রামে যাইত সেই গ্রামবাসিগণ।
দূর হৈতে দেখে সনাতনের গমন॥
কি বা বাল-বৃদ্ধ-যুবা স্ত্রী-পুরুষগণে।
সবে কহে ঐ দেখ রূপসনাতনে॥
ব্রজবাসিগণের অদ্ভুত স্নেহ হয়।
রূপে দেখিলেও রূপসনাতন কয়॥
গ্রামিলোকগণ কেহ স্থির হৈতে নারে।
আগুসরি চলে সনাতনে আনিবারে॥
বহুমূল্যলভ্যে দরিদ্রের সুখ যৈছে।
সনাতন দর্শনে সবার সুখ তৈছে॥
অতি বৃদ্ধ বৃদ্ধা যত স্ত্রীপুরুষগণ।
পুত্রভাবে সনাতনে করয়ে লালন॥
কেহ কহে অরে পুত্র মো সবে ভুলিয়া।
কিরূপে আছিলা কোথা মরি এ চিন্তিয়া॥
ঐছে কহি সবে সনাতন মুখ চাই।
আপনা নির্ব্বন্ধে মনে মহাসুখ পাই॥
স্ত্রীপুরুষ যুবা যার জন্ম যে গ্রামেতে।
তা সবার ভ্রাতৃভাব বিহ্বল স্নেহেতে॥
কেহ কহে ভ্রাতা তুমি আইলা কেমনে।
বুঝি মো সবারে কভু না করিলে মনে॥
কেনে ভ্রাতা মো সবারে হইলে নির্দ্দয়।
ঐছে কত কহে নেত্রে অশ্রুধারা বয়॥
বালিকাবালক আসি চরণ স্পর্শিতে।
করে নিবারণ সবে নারে নিবারিতে॥
কিছু দূরে রহিয়া গ্রামের বধূগণ।
সঙ্কোচিত হইয়া সবে করে দরশন॥
* * * *
গ্রামে প্রবেশিতে যে যে আইসে ধাইয়া।
হস্তে ধরি লইয়া চলে দৃঢ় আলিঙ্গিয়া॥
দিব্য বৃক্ষতলে সবে মনের উল্লাসে।
সনাতনে বসাই বৈসয়ে চারিপাশে॥
দধি দুগ্ধ নবনীত আদি গৃহ হৈতে।
আনে যত্নে সবে সনাতনে ভুঞ্জাইতে॥ ইত্যাদি
—পঞ্চম তরঙ্গ।

যিনি নিঃস্বতম হইয়াও এইরূপ স্নেহের বাঁধনে সকলের নিকট ধরা দেন, তাঁহার চরিত্র যে কিরূপ অলোকিক, তাহা ভাষার দ্বারা বুঝান অসম্ভব। গাম্ভীর্য্যের সহিত মাধুর্য্যের এমন সংযোগ—জনপ্রিয়তার সহিত জনহিতৈষণার এরূপ সমাবেশ সত্যই অপূর্ব্ব। ব্রজধামের সর্ব্বত্র তিনি আনন্দের বার্ত্তা বহন করিয়া বেড়াইতেন—তিনি যেখানে যাইতেন, সেখানেই আনন্দের প্রবাহ ছুটিত—আনন্দময় যেন সশরীরে অবতীর্ণ হইতেন। এই আনন্দভ্রমণের মধ্যে এই সুগভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থরচনার মধ্যেও মহাসিদ্ধ সনাতনের সাধনের বিরাম ছিল না। পদকর্ত্তা শ্রীরাধাবল্লভ দাস বলিতেছেন—

"কত দিন অন্তর্দ্ধনা ছাপ্পান্ন দণ্ড ভাবনা
চারি দণ্ড নিদ্রা বৃক্ষতলে।
স্বপ্নে রাধাকৃষ্ণ দেখে নামগানে সদা থাকে
অবসর নাহি এক তিলে॥"

গৌড়ের স্বাধীন সম্রাটের সর্ব্বপ্রধান মন্ত্রী প্রথমে ব্রজপুরের ঘরে ঘরে মাধুকরী ভিক্ষা করিয়া খাইতেন। তার পর শ্রীমদনমোহনের সেবা স্থাপিত হইলে—

কখন বনের শাক অলবণে করি পাক
মুখে দেন দুই এক গ্রাস।

তাহার পর আবার প্রিয়শিষ্য কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারীর উপর শ্রীল মদনমোহনের সেবার ভার অর্পিত হইলে সনাতন তখন—

ছাড়ি ভোগবিলাস তরুতলে কৈল বাস
এক দুই তিন উপবাস।
সূক্ষ্ম বস্ত্র বাজে গায় ধূলায় লুটায় কায়
কণ্টকে বাজয়ে কভু পাশ।

এইরূপ মহাপুরুষগণের উপর স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের আচার ও প্রচারের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের আচার্য্য ও গোস্বামীদিগের আদিগুরু শ্রীসনাতন ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধ হইয়া আসিলেন। তথাপি তাঁহার নিয়মাগ্রহ শিথিল হইল না। তিনি সাক্ষাৎ শ্রীহরিতনু শ্রীগোবর্দ্ধনের নিত্যপরিক্রমার জন্য মানসগঙ্গার তীরে শ্রীগোবর্দ্ধনমূলে চক্রেশ্বর তীর্থে আসিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই স্থানের নাম চক্রেশ্বর বা চাকলেশ্বর। এই স্থানে যে শিবলিঙ্গ অবস্থান করেন, তাঁহার নামও চক্রেশ্বর বা চাকলেশ্বর।, শুনা যায়, শ্রীল চক্রেশ্বরদেব নিজেই সনাতন গোস্বামীকে এই স্থানে অবস্থান করিতে বলিয়াছিলেন—কিন্তু সনাতন গোস্বামী তাঁহার নিকট এই স্থানে মশক, মক্ষিকা ও অন্যান্য কীট-পতঙ্গের উপদ্রবের অভিযোগ করেন। চক্রেশ্বর তখন তাঁহাকে বলেন যে, "তুমি যে স্থানে অবস্থান করিবে, তাহার সীমার মধ্যে কোনও কীটপতঙ্গের উৎপাত হইবে না।" তদবধি সনাতন গোস্বামীর অবস্থানের স্থলে আর মশা-মাছির উপদ্রব হয় নাই। আজিও ঐ স্থানে কোনও কীটপতঙ্গের উপদ্রব নাই; কিন্তু ঐ স্থানটুকু ভিন্ন উহার পার্শ্বস্থিত অন্যান্য স্থলে মশক, মক্ষিকা ও অন্যান্য কীটপতঙ্গের দুর্ব্বিষহ উপদ্রব বিদ্যমান।

শ্রীসনাতন এই স্থানে অবস্থান করিয়া প্রতিদিন গোবর্দ্ধন পরিক্রমা করিতে লাগিলেন। এখন সনাতন গোস্বামীর বয়স অশীতিবর্ষ পার হইয়াছে। এই স্থানে আসিয়া অবস্থান করিয়াছিলেন বলিয়া এই স্থান 'বৈঠান' নামে পরিচিত।

শ্রীবৃন্দাবন হইতে শ্রীরূপ, শ্রীজীব, শ্রীগোপাল ভট্ট ও শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী ও শ্রীবৃন্দাবনের অন্যান্য বৈষ্ণবগণ প্রায়ই এই স্থানে সনাতনকে দেখিতে আসিতেন। এদিকে শ্রীরাধাকুণ্ড হইতে শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রমুখ বৈষ্ণববৃন্দ শ্রীল সনাতনের দর্শনলাভ করিতে আসিতেন। ব্রজমণ্ডলের ব্রজবাসিগণ পরমাহ্লাদিতচিত্তে বৈঠানে আসিয়া শ্রীল সনাতন গোস্বামীর ভজনাবসরে তাঁহার সঙ্গলাভ করিয়া ধন্য হইত।

কিন্তু বয়স অধিক হওয়ায় প্রতিদিন দ্বাদশ ক্রোশ গোবর্দ্ধন পরিক্রমণে তিনি পরিশ্রান্ত হইতে লাগিলেন। এক দিন শ্রীকৃষ্ণ একটি গোপবালকের বেশ ধরিয়া আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "গোসাই, তুমি বৃদ্ধকালে এত পরিশ্রম করিতে পারিবে কেন? এ বিষয়ে আমি তোমাকে যাহা বলিব, তাহা তোমায় শুনিতে হইবে।" সনাতন বলিলেন—"তোমার কথাগুলি শুনিবার উপযুক্ত হইলে অবশ্যই শুনিব।" ইহা বলিলে গোপবালক গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের উপরিভাগে আরোহণ করিয়া গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের একখানি শিলা আনয়ন করিলেন। এই শিলাখানিতে শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন অঙ্কিত ছিল। গোপবালক এই শিলাখানি আনয়ন করিয়া সনাতন গোস্বামীকে বলিলেন—"গোস্বামি! তুমি এই শ্রীকৃষ্ণপদচিহ্নিত শিলাখানি গ্রহণ কর, এই শিলাখানি প্রদক্ষিণ করিলেই তোমার গোবর্দ্ধন-পরিক্রমা সিদ্ধ হইবে।" এই বলিয়া গোপবালক শ্রীল সনাতন গোস্বামীর সাধন-কুটীরে এই শিলাখানি বহন করিয়া দিয়াই অন্তর্হিত হইলেন। সনাতন তখন শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং আসিয়া এই কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া, প্রেমভরে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না বলিয়া, খেদ করিতে লাগিলেন। কিন্তু এইরূপ পরম-প্রেমিক ভক্তের সহিত কৌতুকে যাঁহার লীলার পরমোৎকর্ষ, তিনি অন্যের অদৃশ্য থাকিয়া সনাতনকে দর্শন দান করিয়া, তাঁহাকে পরমানন্দে অভিষিঞ্চিত করিলেন।* সনাতন তদবধি এই শিলা প্রদক্ষিণ করিয়া নয়নজলে ভাসিতেন এবং শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীরাধিকার নানাবিধ লীলা-কৌতুক উপলব্ধি করিয়া, আত্মহারা হইয়া যাইতেন। এই ঘটনার পরেই শ্রীল সনাতনের অন্তর্দ্দশায় অবস্থানের কাল বাড়িয়া গেল। যখনই বাহ্যজ্ঞান লাভ করেন, তখনই সম্মুখস্থ পুষ্পবনে, হয় সখীগণ সহ শ্রীরাধিকার বিবিধ ক্রীড়াবিলাস দেখিতে পাইতেন, না হয় দেখিতেন, শ্রীকৃষ্ণ

* ভক্তিরত্নাকর, পঞ্চম তরঙ্গ।

মানসগঙ্গার ঘাটে নৌকা লইয়া শ্রীরাধিকাকে পার করিতেছেন, অথবা মানসগঙ্গায় তাঁহাদের সহিত জলক্রীড়া করিতেছেন। এইরূপ নিত্যলীলার অনুভবে সনাতন দিবারাত্রি মগ্ন থাকিতেন। শ্রীরূপ বুঝিলেন—সনাতন শীঘ্রই লীলা সম্বরণ করিবেন। তিনি শ্রীগোবিন্দের, শ্রীল মদনমোহনের ও শ্রীরাধাদামোদরের সেবার বন্দোবস্ত করিয়া নিজে শ্রীজীব, সনাতনের মর্ম্মজ্ঞ শিষ্য কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী ও গোপাল ভট্ট গোস্বামীকে লইয়া আসিলেন। শ্রীল গোপাল মিশ্র গুরুদেবের এই অবস্থার সংবাদ পাইয়া আসিলেন। বল্লভভট্টের পুত্র শ্রীমৎ বিঠ্ঠলনাথ আসিলেন। শ্রীবৃন্দাবন, শ্রীরাধাকুণ্ড, মথুরা ও ব্রজমণ্ডলের অসংখ্য বৈষ্ণবের সম্মুখে আষাঢ়ী পূর্ণিমা দিবসে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অলৌকিক কৃপাপ্রাপ্ত তাঁহারই দ্বিতীয় তনুস্বরূপ—জগদ্গুরু শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী হাস্যময় বদনে, আনন্দময় চিত্তে নিত্যলীলায় সমাগত হইলেন। শ্রীবৃন্দাবনের পূর্ণচন্দ্র এইরূপে পূর্ণিমার দিনে অস্তমিত হইলেন—শ্রীবৃন্দাবন আঁধার হইয়া গেল।

শ্রীচৈতন্যদেব চিদানন্দময় যে অপ্রাকৃত তনুকে আলিঙ্গন করিয়া পরমা তৃপ্তি লাভ করিতেন—যে দিব্যদেহ সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের মন্দির, শ্রীরূপ যথোচিত মর্য্যাদাসহকারে তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপ্ত করিয়া শ্রীমদনমোহনের শ্রীমন্দিরের সন্নিকটে তাহা সমাহিত করিলেন। শ্রীব্রজমণ্ডলের আবালবৃদ্ধ-বনিতা তাঁহাদের আত্মসম শ্রীশ্রীসনাতনগোস্বামীর বিয়োগে শোকে মুহ্যমান হইলেন। কোটিসমুদ্রগম্ভীর শ্রীরূপের যে কি হইল, তাহা বর্ণনা করিয়া বুঝাইবার মত ভাষা অদ্যাপি সৃষ্টি হয় নাই—তবে তিনি জ্যেষ্ঠভ্রাতা ও গুরুদেবের প্রতি শেষ কর্ত্তব্য পালনের জন্য অপরিসীম বিয়োগবেদনা হৃদয়ে লুকাইয়া, সকলকে সান্ত্বনা দান পুরঃসর মহামহিমময় শ্রীপাদ সনাতনের বিয়োগ-মহোৎসব অনুষ্ঠানের ভার গ্রহণ করিলেন। ব্রজমণ্ডলের সকলেই—কি ধনী, কি দরিদ্র, কি মথুরার কোটিপতি শেঠ, কি বনচারী ভিক্ষোপজীবী ব্রজবাসী, যাহার যাহা সাধ্য, দ্রব্য-সামগ্রী আনিয়া শ্রীল মদনমোহনের মন্দিরপ্রাঙ্গণে সমবেত হইলেন। ব্রজমণ্ডলের সর্ব্বজনের হৃদয়ের অপরিসীম আর্ত্তিমিশ্রিত প্রার্থনায় শ্রীল মদনমোহন বিশ্বম্ভররূপে সর্ব্বহৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া সকলকে এক দিকে—হৃদয়ে প্রেরণা, শরীরে কর্ম্মশক্তি ও অন্য দিকে—বাহিরে অনন্ত ভোজ্যাদি সামগ্রীরূপে পরিণত হইয়া এই মহামহোৎসব সম্পাদন করিলেন। শ্রীবৃন্দাবনে বুঝি এরূপ মহোৎসব ইহার পূর্ব্বে আর কখনও হয় নাই। কত লোক, কত মহেন্দ্রসদৃশ তেজঃপুঞ্জ-কলেবর সর্ব্বসম্প্রদায়ের সাধু, বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ, গৃহস্থ, যতি, ব্রহ্মচারী, স্ত্রী, পুরুষ সমাগত হইয়া এই মহোৎসব শেষ করিলেন। দেবগণ ও শ্রীভগবানের নিত্য পার্ষদগণ নরদেহ ধারণ করিয়া এই মহোৎসবে যোগ দিয়াছিলেন কি না, তাহা কে বলিবে? সনাতন বাহ্যমূর্ত্তিতে লোকলোচনের অগোচর হইলেন বটে, কিন্তু বোধ হয়, চিদানন্দময় মূর্ত্তিতে তিনি তাঁহার প্রভুদত্ত ভক্তিপীঠ শ্রীব্রজমণ্ডলের ভক্তিসাম্রাজ্য শাসন করিবার জন্য সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া, সর্ব্বত্র বিরাজ করিতে থাকিলেন। আজিও আদর্শ ভক্তগণ বড় গোস্বামীর সাক্ষাৎ কৃপালাভ করিয়া ধন্য হইয়া থাকেন এবং অদ্যাপি ব্রজবাসিগণ বড় গোস্বামীর নামের দোহাই দিয়া শ্রীবৃন্দাবনে তাঁহার ভক্তি-সাম্রাজ্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া থাকেন। যত দিন ভক্তিদেবী একেবারে ভূমণ্ডল হইতে লুপ্ত না হইবেন, তত দিন শ্রীপাদ সনাতনের নাম কেহই বিস্মৃত হইতে পারিবেন না। সনাতন চিরকালই "সনাতন" হইয়া বিরাজিত থাকিবেন।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু (এম-এ, বি-এল)।

ভিন্ন রুচি

রামায়ণ পড়ে মুদী বসিয়া দোকানে—
মন পড়ে আছে কিন্তু ক্রেতাদের পানে!
নিরক্ষর চাষা এক বসি সেই ঘরে,
ভক্তিতে শুনিছে কথা, চোখে জল ঝরে।

মুদী-পুত্র ছিল সেথা, বোঝে নাকো কথা,
হামা দিয়ে চলে শিশু, গিলিবারে পাতা!
উদাসীন কাক এক বসি শাখা পরে,
উপেখি এ সব কথা, "কা-কা" রব করে।

শ্রীবিনয়ভূষণ সেনগুপ্ত

মায়ের ডাক

[গল্প]

১

শিশিরের পড়িবার ঘরে সমধর্ম্মী বন্ধুর দল জটলা করিতেছিল।

শিবপ্রসাদের গলার স্বর কখনও উদারার পর্দ্দা ছাড়াইয়া না গেলেও তর্কে সে হঠিবার পাত্র ছিল না। বন্ধুরা তাহা জানিত। যুক্তি সকল ক্ষেত্রে না থাকিলেও, উক্তিতে সে নিজের মত অটল রাখিবার জন্য সর্ব্বক্ষণই সচেতন। গ্রীষ্মের প্রখরতাপে অপরাহ্নের বাতাস যেমন অগ্নিবর্ষণ করিতেছিল, শিবপ্রসাদের কথাগুলির মধ্যেও তদপেক্ষা তীব্রতর জ্বালা বন্ধুদিগকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল।

শিবপ্রসাদ অনুত্তেজিত কণ্ঠে, কিন্তু দৃঢ়তার সহিত বলিল, "বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন ছাড়া রাষ্ট্রীয় চেতনা অসম্ভব। সব নতুন করে গড়ে তুলতে হবে। তবেই জয়যাত্রা সার্থকতার পথে চলবে।"

বন্ধুগণের সকলেই কংগ্রেসের সভ্য। দেশের ডাকে ছাত্রজীবনেই তাহারা সাড়া দিয়াছে। কিন্তু সকলের ভাবধারা যে একই খাতে বহিতেছিল, এ কথা হলপ্ করিয়া বলা চলে না।

সুধাকান্ত প্রতিবাদের ভঙ্গীতে বলিল, "শিবদা, কথাটা তোমার ধার-করা। সাগরপারের বুলি তুমি আওড়াচ্ছ; কিন্তু ভারতবর্ষের গতি-প্রকৃতির উপর লক্ষ্য রেখে কথাটা তুমি বললে না। অন্য দেশের আদর্শ হুবহু যে এ দেশে বিশেষতঃ বাঙ্গালার ঘাড়ে চাপিয়ে, ভাঙ্গনের যে প্রস্তাব তুমি তুলছ, তা যে সমূহ কল্যাণকর হবে, এ কথা বলবার প্রমাণ কোথায়?"

শিবপ্রসাদ হাসিয়া বলিল, "তুমি যে কথা বলছ, অনেকেই তা অনেক দিন থেকে বলে আসছেন। ওটার মধ্যে যুক্তি খুবই দুর্ব্বল। সাগরপারের ধার করা কথা বলে আমায় উপহাস করতে পার, কিন্তু দৃষ্টান্তগুলি ভুললেও ত চলবে না। কল্যাণের শুভহস্ত কি সেখানে দেখা যাচ্ছে না?"

সুধাকান্ত ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "না, দাদা, তোমার কথায় সায় দিতে পাচ্ছি না। স্বাধীন দেশে যা সম্ভব, এ পরাধীন দেশে তা সম্ভবপর নয়। তার পর আর একটা কথা। রাষ্ট্রীয় চেতনা, রাষ্ট্রনীতি, এ সব কথা খুব গালভরা; কিন্তু তার মানে এ দেশে এখন খাটে কি? আমাদের পরাধীন দেশ, আমাদের রাষ্ট্র কোথায় যে, রাষ্ট্রনীতি, রাষ্ট্রীয় চেতনা বলে তার নামকরণ করতে পারি? আগে সারা দেশের ডাল-ভাতের সমস্যা-সমাধান করবার ব্যবস্থা না হলে কিছুই হবে না, দাদা।"

শিবপ্রসাদ খুব খানিকটা হাসিয়া বলিল, "ও সব মামুলী বুলি ছাড়, ভাই! দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে, স্ত্রীপুরুষ মিলে সমাজবন্ধনের দাসত্ব থেকে আগে মুক্তিলাভ ক'রতে হবে। এ ছাড়া কোন গতি নেই। তাই দেশের নারীসমাজকে আমাদের দলে টেনে আনতে হবে। এখন আমাদের প্রধান লক্ষ্য হবে তাই।"

বীরেন শিবপ্রসাদের বিশেষ ভক্ত। সে বলিল, "শিবদার কথাই ঠিক। কংগ্রেসে মেয়েদের দলে দলে যোগ দেবার জন্য চেষ্টা ক'রতে হবে। অবশ্য সামাজিক বাধা তাতে খুবই বেশী। কিন্তু সে সব বাধা মেনে চলা অসম্ভব। আমার বোন্‌কে কংগ্রেসের সভ্য করে দিয়েছি। সে এখন অনেক কায ক'রছে।"

সুধাকান্ত বলিল, "তা ত জানি। তোমার বোন্ রেণু পাড়ায় পাড়ায় মেয়েদের কাছে গিয়ে কংগ্রেসের চাঁদা আদায় করছে। সে ত ভাল কথা। কিন্তু তোমার মা, পিসীমা,

জ্যেঠাইমা এঁদের প্রাণে দেশের ডাক পৌঁছে দিতে পারছ না কেন? তাঁরাও ত দেশের মেয়ে।"

শিবপ্রসাদ তাহার বিশিষ্ট ভঙ্গীসহকারে বাধা দিয়া বলিল, "তাঁদের বয়স হয়েছে। এ সব কাযে তারুণ্যের স্ফূর্তি দরকার, তা বোঝ সুধাকান্ত?"

"কিন্তু প্রবীণাদের ধৈর্য্য এবং বিচার-বুদ্ধিকেও ত দেশের কাযে উপেক্ষা করা চলে না, শিবদা।"

শিবপ্রসাদ বলিল, "আরে, তুমি এখনও ছেলেমানুষ আছ। সব কথা বুঝবার শক্তি তোমার এখনও বাকি।"

শিবপ্রসাদ সুধাকান্ত অপেক্ষা ৫ বৎসরের বড়। সুধা এবার আই-এ পরীক্ষা দিয়াছে।

মৃদু হাসিয়া সে বলিল, "বয়সে যে জ্ঞান কম হয়, এটা যদি স্বীকার কর, শিবদা, তা হ'লে তোমার চেয়ে যাঁরা বয়সে বড়, তাঁদের কাছে তোমার বুদ্ধিও ত কাঁচা বলে মনে হতে পারে!"

বন্ধুদিগের আলোচনা যখন বেশ জমিয়া উঠিয়াছে, সেই সময় শিশির বাড়ীর ভিতর হইতে বাহিরের ঘরে আসিল।

প্রত্যহই বন্ধুর আসরে এমনই জটলা হইত। প্রত্যেকেই ছাত্রজীবনের গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়া রাজনীতি, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করিত। শুধু শিবপ্রসাদ ছাত্রজীবন অতিক্রম করিয়া, অন্য কর্ম্মের অভাবে একমাত্র কংগ্রেসের কার্য্যেই আত্মনিয়োগ করিয়াছিল। দলপতি হিসাবে বন্ধুদিগের উপর তাহার দাবীও যেমন সমধিক ছিল, নানা দেশের রাষ্ট্রনীতিতে অভিজ্ঞ বলিয়া তাহার সম্মানও তাহাদিগের কাছে অল্প ছিল না।

শিশির বলিল, "তর্ক করে তোমাদের গলা শুকিয়ে উঠেছে দেখ্‌ছি। চা আস্‌ছে। গলা ভিজিয়ে নিয়ে তারপর আবার আরম্ভ করা যাবে, কি বল শিবদা?"

"অতি উত্তম প্রস্তাব। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন কর্‌ছি। তোমার বোন্ অশোকা বাড়ী নেই?"

হাস্যমুখে শিশির বলিল, "আছে বৈ কি। সে তোমাদের রাষ্ট্রনীতিক আলোচনা মন দিয়েই শোনে। পাশের ঘরে বসে সে তোমাদের সব আলোচনাই শুন্‌ছিল।"

শিবপ্রসাদ বলিল, "তাকে এখানে ডেকে আন না। এখন শুধু অন্তঃপুর আর মেয়েদের কর্ম্মক্ষেত্র নয়। দেশ এখন তাঁদের ডাক্‌ছে। সবাইকে সে ডাকে সাড়া না দিলে চল্‌বে না! পুরুষদের সঙ্গে অবাধ সাহচর্য্য—"

বাধা দিয়া সুধাকান্ত বলিল, "অবাধ সাহচর্য্য? কথাটার অর্থ ভাল করে বুঝিয়ে দাও ত, শিবদা।"

মৃদু হাসিয়া শিবপ্রসাদ বলিল, "কথার অর্থ খুবই সরল। কদর্থ ত এর মধ্যে কিছু নেই। নারী ও পুরুষ দেশের কল্যাণ-কামনায় পরস্পর পরস্পরকে সহায়তা করতে গেলে, ভাবের আদান প্রদানের জন্য সহজভাবে আলোচনা করতে হবে। বর্ত্তমান প্রগতি-যুগ সেই নির্দ্দেশই দিয়েছে।"

ঘরের পর্দ্দা এমন সময় সরিয়া গেল। একখানি ট্রেতে চারি পাঁচ জনের খাবারের রেকাব সাজাইয়া লইয়া এক জন ভৃত্য প্রবেশ করিল। পশ্চাতে আর একখানি ট্রেতে পেয়ালাপূর্ণ চা লইয়া অশোকা দেখা দিল।

বন্ধুদিগের সকলেই এই তন্বী সুন্দরীকে একাধিকবার দেখিয়াছে। ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর গৃহেই সে আই-এ পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল।

অকুণ্ঠিত-ভাবে সে দাদার বন্ধুবর্গকে চা পরিবেশন করিল।

শিবপ্রসাদ গরম সিঙ্গাড়ার সদ্ব্যবহার করিতে করিতে প্রশংসমান দৃষ্টিতে অশোকাকে দেখিয়া বলিল, "আপনি ঐ চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসুন না, মিস্ চ্যাটার্জ্জি।"

শিশির বলিল, "অশোকা এখন থেকে কংগ্রেসের কাযে নাম্‌বে, শিব-দা।"

উল্লাসভরে শিবপ্রসাদ বলিয়া উঠিল, "এই ত চাই। শুনে বড় আনন্দ হল। দেশের মেয়েরা যদি মুক্তির আহ্বানে সাড়া না দেন, তা হলে দেশ এগোতে পারে না। আমি আপনাকে অভিনন্দিত কর্‌ছি, মিস্ চ্যাটার্জ্জি।"

সুধাকান্ত কাপে চুমুক দিয়া বলিল, "কিন্তু, শিবদা, তুমি বিদেশী প্রথায় অশোকাকে অভিনন্দিত করে, বাঙ্গালার মর্য্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করছ না ত?"

সকলে হাসিয়া উঠিল। অশোকারও অমলিন আননে মুহূর্ত্তের জন্য বিদ্যুৎদীপ্তি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

২

প্রচণ্ড গ্রীষ্মের অসহনীয় উত্তাপ কাল-বৈশাখীর অতর্কিত আবির্ভাবে কিছু কমিয়াছিল। তখনও বেলা ৫টা বাজে নাই। বাহিরে কে ডাকিল, "শিশির, বাড়ী আছ?"

ঝড়বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছিল। অশোকা বাহিরের ঘরে আসিয়া বলিল, "আপনি বসুন, শিব বাবু। দাদা এখুনি আস্‌বে। আপনাকে বস্‌বার জন্য বলে গেছে।"

শিবপ্রসাদ সে আহ্বানে উপেক্ষা প্রকাশ করিল না।

শিশির ও অশোকার পিতা যোগেশ বাবু বাঙ্গালার স্বদেশী-যুগের লোক। দাসত্বের পরিবর্ত্তে তিনি নিজের প্রভূত চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে প্রসিদ্ধ কাষ্ঠব্যবসায়ী হিসাবে প্রচুর ধন উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। নেপাল, তরাই, আসাম ও রেঙ্গুনের অনেক জঙ্গল তিনি ক্রমে ক্রমে ইজারা লইয়াছিলেন। শুধু ভারতবর্ষ নহে, ভারতের বাহিরেও তিনি কাষ্ঠ চালান দিতেন।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে যাহারা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলেন, যুবক যোগেশচন্দ্র তাঁহাদিগের অন্যতম ছিলেন। স্বধর্ম্মের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা সত্ত্বেও তিনি অবরোধের পক্ষপাতী ছিলেন না। অন্তঃপুরের বিশুদ্ধতা রক্ষায় মনোযোগী হইলেও, বাহিরের আলো-বাতাসকে আড়াল করার কোন প্রয়োজন তিনি আদৌ অনুভব করিতেন না—স্বীকারও করিতেন না। বিধি-নিষেধের মূলতত্ত্ব যুক্তিসহ বিবেচিত না হইলে তিনি তাহা পরিহার করিয়াই চলিতেন।

সুস্থ, সবল, পবিত্র পরিবেষ্টনের মধ্যে শিশির ও অশোকা আশৈশব বাড়িয়া উঠিয়াছিল। দূরদর্শী, উদারহৃদয়, স্নেহময় পিতা এবং কল্যাণময়ী জননীর স্নেহে শিশির ও অশোকা স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিবার সুযোগ পাইয়াছিল। তাহারই ফলে অকারণ কুণ্ঠা বা অশোভন লজ্জা অশোকার ব্যবহারে কোন দিন প্রকাশ পায় নাই। যোগেশ বাবু কন্যার সম্বন্ধে এমনই সচেতন ছিলেন।

ভ্রাতৃবন্ধুকে বাহিরের ঘরে বসাইয়া অশোকা শান্তকণ্ঠে বলিল, "একটু অপেক্ষা করুন, আপনার চা নিয়ে আসি, শিব বাবু।"

অল্পক্ষণ পরে অশোকা স্বয়ং কিছু খাবার ও এক পেয়ালা চা লইয়া আসিল।

শিবপ্রসাদ একবার উজ্জ্বল দৃষ্টি অশোকার উপর নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "রবিবার শিশিরের সঙ্গে সভায় আপনার যাবার কথা ছিল, কিন্তু আপনাকে ত দেখিনি?"

অশোকা সঙ্কোচহীন-কণ্ঠে বলিল, "না, মা-বাবার সঙ্গে সে দিন দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী যেতে হয়েছিল।"

মুখ বাঁকাইয়া শিবপ্রসাদ বলিল, "এ যুগের মেয়েদের মধ্যে এ রকম কুসংস্কার বাঞ্ছনীয় নয়।"

অশোকার মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু কি বলিতে গিয়া সে আপনাকে সংযত করিয়া লইল।

শিবপ্রসাদ আপনাকে বোধ হয় মানব-মনোবিজ্ঞান বিশারদ বলিয়া মনে করিত। সে অশোকার আননে মুহূর্ত্ত দৃষ্টিপাতের পর স্বভাবসিদ্ধ মৃদু কণ্ঠস্বরে বলিল, "আপনি আসছে বার আই-এ পরীক্ষা দেবেন?"

বাহিরের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া অশোকা বলিল, "ইচ্ছে ত তাই।"

চায়ের কাপ্ নামাইয়া রাখিয়া শিবপ্রসাদ বলিল, "প্রাইভেটে পরীক্ষা না দিয়ে কলেজে গেলেন না কেন? কত মেয়েছেলের সঙ্গে মতের আদান-প্রদান হলে জ্ঞান বেড়ে যায় না কি?"

অশোকা সংক্ষেপে উত্তর করিল, "কলেজের আবেষ্টন বাবা পছন্দ করেন না, আমারও ভাল লাগে না।"

শিবপ্রসাদের স্বভাবসিদ্ধ তর্কপ্রবৃত্তি এবং তর্কে জয়লাভ করিবার উদ্যম ও ইচ্ছা সহসা প্রবল হইয়া উঠিল। কিন্তু বন্ধুর সহোদরার নির্লিপ্তভাব এবং সংক্ষিপ্ত উত্তর তাহাকে তর্কপ্রবৃত্তি হইতে নিরস্ত করিল।

টেবলের উপর হইতে একখানা মাসিকপত্র তুলিয়া লইয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে শিবপ্রসাদ বলিল, "বীরেনের বোন্ রেণু আপনার বন্ধু, না?"

মাথা হেলাইয়া অশোকা বলিল, "তাকে আমি খুব পছন্দ করি।"

"হাঁ, মেয়েটির যেমন সাহস, তেমনি কর্ম্মনিষ্ঠা আছে।"

দাদা তাহাকে বলিয়া গিয়াছে, বন্ধু শিবপ্রসাদকে কথায় কথায় যেন বসাইয়া রাখে। তাই অশোকা ভ্রাতৃবন্ধুর আতিথ্য সৎকারে সে কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেছিল। তাহা ছাড়া, শিবপ্রসাদ অত্যন্ত দেশভক্ত এবং পণ্ডিত, এ কথাও সে তাহার দাদার কাছে শুনিয়াছিল। তাই সে এই মানুষটিকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিত।

শিবপ্রসাদ মাসিকপত্র হইতে মুখ তুলিয়া বলিল "আপনাদের মত মেয়েরাই দেশের আশা। মাতৃভূমিকে স্বাধীন করতে হলে আপনাদের আরো এগিয়ে যেতে হবে। রেণুর মধ্যে সে শক্তি আছে।"

অশোকা ইহার কোন উত্তর দিল না। সে বার বার বাতায়নপথে বাহিরের দিকে চাহিতে লাগিল। না, দাদার এখনও দেখা নাই। বাবা ত সন্ধ্যার পরে ফিরবেন।

সহসা শিবপ্রসাদ বলিয়া উঠিল, "আমার পরিচিত বন্ধু-বান্ধবদের ফটো সংগ্রহ করা আমার স্বভাব। রেণুর ফটো পেয়েছি। আপনার একখানা ফটোগ্রাফ আমায় দেবেন, মিস্ চ্যাটার্জ্জি ?"

অশোকা বিন্দুমাত্র বিব্রত বোধ না করিয়া বলিল, "দাদার সঙ্গে কিছুদিন আগে একখানা ফটো তুলেছিলাম। যদি বেশী থাকে, একখানা দিতে পারি।"

"না, না, শিশিরের সঙ্গে তোলা ফটো আমি চাইনে। আপনার আলাদা ফটো আমার দরকার। দেবেন দয়া করে ?"

অশোকা আরক্ত-মুখে আবার কি বলিতে যাইতেছিল; কিন্তু পুনরায় সে আপনাকে সংবরণ করিল।

কথার মোড় ঘুরাইয়া দিয়া শিবপ্রসাদ বলিল, "আপনি নিশ্চয় গান গাইতে জানেন, মিস্ চ্যাটার্জ্জি ?"

"জানি, কিন্তু—"

এমন সময় শিশির সুধাকান্তকে সঙ্গে লইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। ভগিনীকে দেখিয়া সে বলিয়া উঠিল, "তুই শিবদাকে আট্‌কে রেখেছিস্, এজন্য ধন্যবাদ। এখন আমাদের জন্য চা নিয়ে আয়। শিবদার জন্যও আনিস্। দ্বিতীয় দফায় তোমার নিশ্চয় আপত্তি হবে না, শিবদা ?"

মৃদু হাসিয়া শিবপ্রসাদ বলিল, "নিশ্চয়ই না।"

অশোকা লঘুচরণে বাহির হইয়া গেল।

৩

যোগেশচন্দ্র তাঁহার বৈঠকখানা ঘরে বসিয়াছিলেন। রবিবারে আপিস বন্ধ। এই দিনটা তিনি সম্পূর্ণরূপে বিশ্রাম করিতেন। বিশ্রাম অর্থে অলসভাবে সময়ক্ষেপ নহে—সাহিত্য, দর্শন, কাব্য, ইতিহাস ইচ্ছামত পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করিতেন। তাঁহার গৃহে বহু মূল্যবান গ্রন্থের সংগ্রহ ছিল।

পুত্র শিশির বন্ধুদিগের সহিত শ্রদ্ধানন্দপার্কে বক্তৃতা শুনিতে গিয়াছে। যোগেশ বাবু সভা-সমিতিতে কদাচিৎ যাইতেন। বক্তৃতা-শ্রবণ অপেক্ষা কাযই তিনি বেশী পছন্দ করিতেন।

কলিকার আগুন নিভিয়া গিয়াছিল। মধুকে ডাকিয়া তিনি তামাক দিতে বলিলেন। এমন সময় রেণু দ্রুতচরণে অন্দরের দিকে যাইতেছিল। রেণু তাঁহার প্রতিবেশী বন্ধুর কন্যা।

যোগেশ বাবু বলিলেন, "কি গো, রেণু মা! এত তাড়াতাড়ি চলেছ যে! ব্যাপার কি ?"

হাস্যমুখী রেণু বলিল, "জ্যেঠিমার কাছে যাচ্ছি, জ্যেঠামশাই। তাঁর কাছে চাঁদা পাওনা। আজই আদায় করা চাই।"

"কিসের চাঁদা, রেণু মা ?"

"ওঃ! আপনি জানেন না বুঝি, জ্যেঠামশাই ? আমাদের পাড়ার মেয়েদের কাছ থেকে চাঁদা আদায়ের ভার আমার ওপর পড়েছে। দক্ষিণ-কলকাতায় কংগ্রেসের এক সভা হবে। রাষ্ট্রপতি সুভাষ বাবুকে অভিনন্দন দেওয়া হবে। তাই মেয়েদের কংগ্রেসের সভ্য করে, অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ থেকে চাঁদা আদায় করতে হবে। জ্যেঠিমাও যে কংগ্রেসের এক জন সভ্য।"

যোগেশ বাবু হাসিয়া বলিলেন, "তা বেশ। কিন্তু সুভাষ বাবু ত আর রাষ্ট্রপতির পদে নেই। তিনি ত ছেড়ে দিয়েছেন।"

উৎসাহভরে রেণু বলিল, "ষড়যন্ত্র! ঘোর ষড়যন্ত্র, জ্যেঠামশাই! সুভাষ বাবু রাষ্ট্রপতি না থাক্‌লেও, আমরা তাঁকে রাষ্ট্রপতিই বল্‌ব। সেই অন্যায় হয়েছে ব'লেই আমরা তাঁকে অভিনন্দিত করতে চাই।"

হাসিতে হাসিতে রেণু ভিতরের দিকে পা বাড়াইল। যোগেশ বাবু নীরবে সঞ্চারিণী লতার ন্যায় বিদ্যুৎগর্ভ মেয়েটির দিকে চাহিয়া রহিলেন। সহসা তাঁহার গম্ভীর আননে একটা আলোক-দীপ্তি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

তিনি বলিলেন, "একটা কথা শুনে যাও, রেণু মা।"

"আমাকে ডাক্‌ছেন, জ্যেঠামশাই ?"

"হ্যাঁ, মা। আচ্ছা, লেখাপড়া ছেড়ে এই সব কাযে মেতেছ, এতে পড়াশোনার ক্ষতি হবে না ?"

গম্ভীরভাবে রেণু বলিল, "ক্ষতি কিছু হবে, কিন্তু তা ব্যক্তিগত ব্যাপার, জ্যেঠামশাই। মা, খুড়ীমা, পিসীমা, মাসীমারা কেউ দেশের ডাকে সাড়া দিতে বেরোবেন না। অথচ মেয়েরা সমান তালে দেশের কাযে না নাম্‌লে, আমরা

যা চাই, তা মিল্‌বে কি? কাজেই আমরা—যারা ছোট, তারাই সে ভার নেবার চেষ্টা ক'র্‌ছি। এটা কি মন্দ, জ্যেঠামশাই?"

প্রৌঢ় যোগেশচন্দ্র সহসা উত্তর করিতে পারিলেন না। তিনি শুধু বলিলেন, "তোমার জ্যেঠিমার কাছ থেকে ফিরে যাবার সময় একবার আমার সঙ্গে দেখা করে যেও।"

ভৃত্য কলিকা বদলাইয়া দিয়া গিয়াছিল। তিনি আলবোলার নলটি তুলিয়া লইলেন।

যৌবনের বিস্মৃতপ্রায় দিনগুলির স্মৃতি সহসা তাঁহার মানসপটে ভাসিয়া উঠিল—সে যুগের কাযগুলি ভিড় করিয়া, অতীতের যবনিকা সরাইয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

সারা বাঙ্গালা 'বন্দে মাতরম' মন্ত্রের শক্তিতে উন্মত্তপ্রায়। ভাঙ্গা বাঙ্গালাকে জোড়া দিবার জন্য বাঙ্গালী হিন্দুর কি কঠোর তপস্যা! তাঁহার মনে পড়িল, পথে পথে মাতৃভক্ত সন্তানদলসহ মাতৃবন্দনার উদাত্ত সঙ্গীত, চাঁদা সংগ্রহ, ভিক্ষা এবং লেখনী পরিচালনা!

সে দলে যোগেশচন্দ্র একান্তভাবেই যোগ দিয়াছিলেন। আজ পরলোকগত দেশভক্ত, পরিচিত মায়ের সুসন্তানগণের স্মরণীয় মূর্ত্তি তাঁহাকে যেন উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিল। সুরেন্দ্র-নাথ, বিপিনচন্দ্র, ব্রহ্মবান্ধব, চিত্তরঞ্জন, যতীন্দ্রমোহন প্রভৃতি সুসন্তানগণ দেশমাতৃকাকে রাজেশ্বরী মূর্ত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য নব নব পরিস্থিতিতে কি বিপুল ত্যাগস্বীকার করিয়া কণ্টকারণ্যের মধ্য দিয়া জাতির গতিপথ নির্ণয় করিয়া দিয়াছিলেন। সব কথাই তাঁহার চিত্তকে উদ্বেল করিয়া তুলিল।

দাসত্বের নিগড়ে মানুষ তাহার মেরুদণ্ডের দৃঢ়তাকে বক্র ও দুর্ব্বল করিয়া ফেলে বলিয়াই তিনি সে যুগে সহজলভ্য উচ্চ রাজপদের মোহ ত্যাগ করিয়া শ্রম ও কষ্টসাধ্য স্বাধীন ব্যবসায়ের পথে যাত্রারম্ভ করিয়াছিলেন। দেশের বুভুক্ষু আর্ত্ত, পীড়িত, দারিদ্র্যপিষ্ট কোটি কোটি নরনারীর অভাব অভিযোগের আর্ত্তনাদ তাঁহার চিত্তকে বিমথিত করিয়াছিল বলিয়াই, তিনি দেশের যে কয় জনকে পারেন, নিজের ব্যবসায়ের আশ্রয়ে স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের সুযোগ করিয়া দিতে পারিয়াছেন। ইহাতে আজ তাঁহার মনে সামান্য পরিমাণ আনন্দ ও তৃপ্তি জন্মিলেও, সমগ্র দেশব্যাপী অভাব অভিযোগের তীব্রতা তাহাতে কতটুকু হ্রাস পাইয়াছে?

রেণুর কয়টি কথা তাঁহার চিত্তের অন্তর্নিহিত ভাব-ধারাকে দোলা দিয়া গেল। সত্যই সমগ্র দেশে প্রাণের স্পন্দন তুলিতে না পারিলে, এত দিনের চেষ্টা, পরিশ্রম, ত্যাগ সবই ব্যর্থ হইয়া যাইবে। নারী-সমাজ মানব-জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অংশ—সাধনার পথে অগ্রসর না হইলে, কাম্য ফল দুর্লভ হইয়াই থাকিবে, এ চরম ও পরম সত্যকে তিনি অস্বীকার করিতে পারেন কি?

বহু অর্থ ধনভাণ্ডারকে স্ফীত করিয়া তুলিলেও, এখনও তিনি অনাড়ম্বর, সাধারণ জীবনধারার পথ হইতে আপনাকে সরাইয়া লইতে চাহেন নাই। আত্মীয় পরিজনকে অভাবের বেদনা হইতে রক্ষা করিতে পারিলেও, ভোগবিলাসের অনাবশ্যক আড়ম্বর তাঁহার গৃহে ছিল না। তিনি জানিতেন, ইহাতে তাঁহাদের কোন অধিকার নাই। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী সর্ব্বক্ষণ তাঁহার মনকে অনুপ্রেরণা প্রদান করিত—যত্র জীব তত্র শিব। দরিদ্র নারায়ণের সেবাই পরম ধর্ম্ম। আরও মনে পড়িত, স্বামীজী বলিয়াছিলেন, "দেশের একটা কুকুরও যত দিন অভুক্ত থাকিবে, তত দিন আমি মুক্তি চাহি না!"

আলবোলার নল কখন তাঁহার হস্তচ্যুত হইয়াছিল, সে দিকে তাঁহার খেয়াল ছিল না। তিনি প্রাচীর-বিলম্বিত বিবেকানন্দের তেজোগর্ভ চিত্রের প্রতি চাহিয়া বিমনা হইয়া উঠিলেন।

"জ্যেঠামশাই, আমি এখন বাড়ী যাচ্ছি।"

রেণুর হাস্যপ্রফুল্ল মুখের দিকে চাহিয়া যোগেশ বাবু বলিলেন, "জ্যেঠিমার কাছে চাঁদা পেয়েছ?"

"শুধু চাঁদা নয়, জ্যেঠামশাই, তিনি আমাদের এ অঞ্চলের মহিলা-সঙ্ঘের প্রেসিডেণ্ট হ'তে স্বীকার করেছেন।"

"তুমি আমার সঙ্গে এস, মা।"

যোগেশ বাবু তাঁহার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিলেন। দেরাজ হইতে বিশখানা দশ টাকার নোট বাহির করিয়া রেণুর হাতে দিবার সময় বলিলেন, "তোমাদের অভ্যর্থনা সমিতি যেন ভাল করে রাষ্ট্রপতির অভিনন্দনের যোগাড় করেন। যদি বেশী কিছু খরচ হয়, তোমাদের মহিলা-সঙ্ঘের নাম দিয়ে তাও পরে দিতে পারবে।"

রেণু ভূমিষ্ঠ হইয়া জ্যেঠামহাশয়ের পদধূলি গ্রহণ করিল।

সে দিনও রবিবার। অশোকার মাতা কচুরি ভাজিতেছিলেন। রেণু বেলিয়া দিতেছিল। অদূরে অশোকা বঁটি পাতিয়া আম ছাড়াইতেছিল। প্রতি রবিবারে নানাপ্রকার খাবার তৈয়ার করা অশোকার জননীর সখ। স্বামী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতিকে স্বহস্তে প্রস্তুত খাদ্য পরিবেশন করিয়াই তাঁহার আনন্দ।

ঠাকুর চা ও খাবার লইয়া শিশিরের বন্ধুদিগকে দিয়া আসিল।

অল্পক্ষণ পরে শিশির ভিতরে আসিয়া বলিল, "হ্যাঁ রে অশোকা, আজ যে ঠাকুরের হাত দিয়ে খাবার ও চা পাঠিয়ে দিলি? নিজে যেতে পারলি না? এতে আতিথ্যধর্ম্ম ক্ষুণ্ণ হয় না?"

মাতা পুত্রের মুখের দিকে নীরবে চাহিলেন।

অশোকা দাদার আরক্ত আননের দিকে মুহূর্ত্ত দৃষ্টিপাত করিয়া হাসিয়া বলিল, "তুমি ত দেখ্‌ছ, দাদা, আমার হাত জোড়া। এক সঙ্গে দু'রকম কাষ হয় কখনো? তা ছাড়া, তুমি নিজে যখন বন্ধুদের কাছে আছ, তখন আতিথ্যধর্ম্ম ক্ষুণ্ণ হবে কেন?"

শিশির অপেক্ষাকৃত শান্ত হইয়া বলিল, "শিবুদা বল্‌ছিল, তোমার বোন্ কি আমাদের 'বয়কট' করলেন?"

প্রশান্ত-স্বরে অশোকা বলিল, "তার মানে?"

"মানে খুব সোজা। এত দিন নিজের হাতে খাবার, চা পরিবেশন করে এসেছিস্, আজ ক'দিন ধরে তা বন্ধ। এতে শিবুদা ও-রকম প্রশ্ন ত করতেই পারে। তারা সব দেশের কাযে সর্ব্বস্ব পণ করে নেমেছে। মেয়েদের কাছ থেকে সেবা-যত্ন পেয়ে আস্‌ছিল। এখন সেটা বন্ধ হতেই মনে খট্‌কা লাগে না? মা, তুমি অশোকাকে ওদের কাছে যেতে বারণ করেছ না কি?"

জননী কিছু বলিবার পূর্ব্বেই অশোকা বলিল, "মা-বাবা আমাকে কোন দিন কোন কায করতে বাধা দেন নি। তোমাকেই কি দিয়েছেন কখনো, দাদা? তবে মাকে ও কথা বলছ কেন? আমার সময় হয়নি, তাই আমি যেতে পারিনি। এতে ত জোর করবার কিছু নেই, দাদা!"

রেণু এতক্ষণ নীরবেই কচুরী বেলিয়া দিতেছিল। এবার সে সোজা হইয়া বসিয়া বলিল, "আমি একটা কথা বলি, শিশিরদা! মহিলা-সঙ্ঘের কায বেড়ে গেছে। আমরা মেয়েদের ব্যাপার নিয়েই সব সময় ব্যস্ত থাকি। তোমরা পুরুষ মানুষ, পুরুষদের বিষয় নিয়েই তোমাদের এগিয়ে যাওয়া উচিত। এতে পুরুষ মানুষ, মেয়েদের সঙ্গের অভাব অনুভব যদি করে, তবে সেটা খুব সঙ্গত হবে কি?"

শিশির বিস্ফারিত-নেত্রে রেণুর দিকে চাহিয়া বলিল, "এ সব কি বলছিস্ তুই?"

রেণু হাসিতে হাসিতে বলিল, "খুব সত্য কথাই বল্‌ছি, শিশির দা! কেমন, জ্যেঠিমা, আমি অন্যায় কিছু বলেছি কি?"

অশোকার মাতা মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

শিশির এবার চটিয়া গিয়া বলিল, "পুরুষ মানুষ মেয়েদের সঙ্গের অভাব অনুভব করে, এ কথাটা তুই বললি কি করে, রেণু?"

অশোকা প্লেটে আমের টুকরা সাজাইতে সাজাইতে বলিল, "তুমি চটে যাচ্ছ কেন, দাদা? রেণুদি ঠিক কথাই বলেছে। দেশের কায সবাইকে করতে হবে, সেটা ঠিক। পুরুষরা পুরুষদের নিয়ে থাক্‌বে, মেয়েরা থাক্‌বে মেয়েদের নিয়ে। এতে কাযের সুবিধাই ত হয়। দরকারও তাই। মেয়েরা পুরুষদের কাছে গিয়ে দেশপ্রেমের বাণী শোনাবে, আর পুরুষরা মেয়েদের কাছে গিয়ে বল্‌বে—আপনারা সব মায়ের কাযে এগিয়ে আসুন—এ ব্যবস্থা যদি না হয়, তাহলে দেশ জাগবে না, এই যদি তোমাদের ধারণা হয়, তা' হলে সে ধারণাটি যথার্থ হবে বলে আমি বিশ্বাস করিনে।"

শিশির একটু বিরত-ভাবে বলিল, "তোদের কথা আজ আমি ঠিক্ বুঝে উঠ্‌তে পারছি না। সোজা কথা সরলভাবে বল্ ত শুনি!"

এবার রেণু হাসিয়া বলিল, "মায়ের ডাক এসেছে, তা আমরা মানি—বিশ্বাস করি। রাজনীতির চর্চ্চা করা দরকার, তাও আমরা মনে প্রাণে স্বীকার করি। কিন্তু শিশিরদা, যদি কোন পুরুষ—অবশ্য দেশপ্রেমিক—কোন যুবতীকে আড়ালে দাঁড়িয়ে অন্যের অগোচরে বাইরে যাবার জন্য ইসারা করে, তবে তার মধ্যে দেশপ্রেম ও রাজনীতির কোন সন্ধান পাওয়া যায় কি?"

ঠাকুর তখন আম্রপূর্ণ রেকাবিগুলি লইয়া বাহিরে গিয়াছিল।

শিশিরের নয়নে বিস্ময়-রেখা ফুটিয়া উঠিল। সে বলিল, "তোমার কথা বুঝ্‌তে পার্‌ছি না, রেণু।"

দাদার সম্মুখে আসিয়া অশোকা বলিল, "আমি তোমায় বুঝিয়ে দিচ্ছি, দাদা। কোন মেয়ে যদি তার মা-বাপের সঙ্গে দেবদর্শনে যায়, তবে তোমাদের কাছে সেটা কুসংস্কার হতে পারে। কিন্তু কুমারী নবতী মেয়ের ফটোগ্রাফ যদি কেউ চায়—তা ভাই-বোনে একত্র তোলা ফটোগ্রাফ হলে চল্‌বে না—আলাদা তোলা ফটো চাই; তা হলে কি এ প্রশ্ন করা যায় না, এ সকলের মধ্যে দেশপ্রেম বা রাজনীতির কি সম্পর্ক থাক্‌তে পারে?"

শিশির বলিল, "ও, বুঝেছি। শিবুদা রেণুর কাছ থেকে তার ফটো নিয়েছিল। কিন্তু—"

বাধা দিয়া রেণু বলিল, "আমি তোমার শিবুদাকে আমার কোন ফটোগ্রাফ দেই নি। যদি দাদা দিয়ে থাকে, আমি তা জানিনে।"

"সে যাই হোক্, তাতে দোষ কি? এক জন কুমার যদি কোন কুমারীর ফটোগ্রাফ রাখে, তাতে দূষ্যভাব আস্‌বে কেন? এমন হতে পারে, সে হয় ত মেয়েটিকে ভালবেসে বিয়ে করতে পারে!"

উচ্ছ্বসিতভাবে হাসিয়া অশোকা বলিল, "কিন্তু এমনও ত হতে পারে, মেয়েটি তাকে মোটেই পছন্দ করে না। তা ছাড়া, যারা দেশের মুক্তি চায়, তারা কি ব্যক্তিগত প্রেমের সাধনাকে বড় করে তুল্‌বে? দাদা, আমাদের বাবা কম দেশের জন্য ভাবেন না। দেশ-জননীকে তিনি প্রাণ দিয়ে ভালবাসেন। আমি তাঁর মুখে শুনেছি, তাঁদের যুগে যাঁরা দেশের জন্য সর্ব্বস্ব পণ করেছিলেন, নারীজাতিকে তাঁরা মা'র আসনে স্থান দিয়েছিলেন। এ যুগের মত ছোট আদর্শ তাঁদের ছিল না!"

সহসা অশোকার মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। সে বলিল, "তোমার শিবুদাকে বলো, মেয়েরা যখন দেশের ডাকে সাড়া দেয়, তখন তারা ন্যাকামি করে না। প্রাণ দিয়েই তা করে।"

"তুই বড় ফাজিল হয়েছিস্" বলিতে বলিতে শিশির দ্রুত সে স্থান ত্যাগ করিল। কারণ, সে দেখিল, তাহার বাবা ধীরে ধীরে সেই দিকে আসিতেছেন।

যোগেশ বাবু কাছে আসিয়া মৃদু হাস্যভরে বলিলেন, "আজ আমার মা-লক্ষ্মীরা এত উত্তেজিত কেন?"

অশোকা গাঢ়স্বরে বলিল, "বাবা, আজ থেকে আপনার কাছে মায়ের ডাকে কি করে সাড়া দিতে হয়, তার পাঠ শিক্ষা নেব!"

যোগেশ বাবু হাসিয়া বলিলেন, "পাগলী, মা আমার!"

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

প্রিয়ার পত্র

এমন চিঠি লিখ্‌লে কেন প্রিয়?
আজকে তাহার জবাবটুকুই দিয়ো।
চাইনে তোমার মুখের পানে,
এমন কথা মন না মানে;
তাই, এ আমার কৈফিয়ৎটি নিয়ো।

খরচ? আমি কি-ই বা করি বেশী।
কথা বলা তোমার এ কোন্ দেশী!
ছ'খানা কাপড় বছর মাঝে
লাগ্‌লে, তাহাও বেশী না যে;
না হয় কাপড় পরেই থাকি দেশী।

সাবান লাগে দশ পনের খানা।
তাও কি তুমি করতে পারো মানা।
ছেঁড়া কাপড়, নোংরা কাঁথা
ধোপায় দেওয়া নয় ত' যা' তা'
তাইতে সাবান, এও ত' তোমার জানা।

হিমানী হায়? স্বপন আছে বেড়ে।
হেজ্‌লিন্-স্নো, দিয়েছি আজ ছেড়ে।
শীতে যখন ফেটেই থাকি—
তখন একটু' আধটু' মাখি;
তবু আমায় লিখ্‌বে কলম নেড়ে?

আলু, পটল; কি-ই বা তাহার দাম?
এই খরচেই খরুচে মোর নাম!
তেলটা কিছু বেশী লাগে,
জানো কি সব কতই মাখে;
চালাও নিজে—এতই যদি টান।

সায়া সেমিজ, বলো ত' বুক ঠুকি'
বেশী কি চাই? উঠ্‌ছো কেন রুখি'।
মরণ হ'লেই এখন বাঁচি—
আছি ত' তার কাছাকাছিই;
প্রণাম। ইতি—তোমার পোড়ারমুখী।

শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্য-পুরাণতীর্থ

গন্ধ-শিল্পের জন্য গোলাপ উৎপাদন

অনেক দিন হইতেই গোলাপ গন্ধ-জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আসিতেছে। তথাপি ইহা চন্দন, অগুরু, গুগ্‌গুল প্রভৃতির ন্যায় প্রাচীনত্বের দাবী করিতে পারে না। তাহার মূল কারণ বোধ হয় এই যে, গন্ধ-দ্রব্যাদির আবিষ্কার ও ব্যবহার প্রথমতঃ গ্রীষ্ম-প্রধান দেশসমূহেই হইয়াছিল এবং গোলাপের চাষ এখন গ্রীষ্মমণ্ডলমধ্যে হইলেও ইহার আদিম বাসস্থান নাতিশীতোষ্ণমণ্ডল। হিমালয়ের কতিপয় অঞ্চলও ২।১ জাতীয় গোলাপের জন্মস্থান; কিন্তু প্রাচীন হিন্দুগণের এই জাতীয় গাছ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় নাই। পুরাতন সাহিত্য বা ধর্ম্ম-গ্রন্থাদিতে গোলাপের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। ভারতে মুসলমান-দিগের আগমনের পূর্ব্বে গোলাপগুল্ম সাধারণের নিকট পরিচিত ছিল না। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে কয়েক জন মুসলমান লেখক সর্ব্বপ্রথমে গুজরাট অঞ্চলে গোলাপ-চাষের বিবরণ প্রদান করিয়াছিলেন। সে সময় প্রায় ৭০ জাতীয় গোলাপের চাষ হইত এবং বলা বাহুল্য, সেগুলির অধিকাংশই পারস্য ও তন্নিকটবর্ত্তী দেশসমূহ হইতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। যাহা হউক, ইহা ধরিয়া লইতে পারা যায় যে, ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে ধনী ও সৌখিন ব্যক্তিগণ তাঁহাদিগের উদ্যানে গোলাপ চাষ করিতে আরম্ভ করেন এবং মোগল বাদশাহগণের সময় দেশের নানা স্থানে গোলাপবাগিচা-সমূহ স্থাপিত হয়। ইতিহাসপ্রসিদ্ধা সুন্দরী সাম্রাজ্ঞী নূরজাহানই সর্ব্বপ্রথমে গোলাপ পুষ্প হইতে আতর প্রস্তুত-প্রথা ১৬১২ খৃষ্টাব্দে আবিষ্কার করেন বলিয়া কথিত রহিয়াছে। মোগল-গৌরব-রবি অস্তমিত হওয়ার পর, কিছু দিবসের জন্য গোলাপ চাষ ও শিল্পের অবনতি হইয়াছিল, কিন্তু তৎকালীন যুদ্ধ-বিগ্রহ ও অরাজকতার দিনেও ইহার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সাধন হয় নাই। বরং পরবর্ত্তী সময়ে স্থানে স্থানে শতাব্দীর পর শতাব্দী গোলাপ-চাষ সমভাবে চলিয়া আসিতেছে।

কিন্তু ভারতে গোলাপ-চাষ ও শিল্প উভয়েরই অস্তিত্ব থাকিলেও উহাদের অবস্থা নিতান্ত অনুন্নত এবং সংগঠনেরও একান্ত অভাব। আলিগড়, এটোয়া, কনৌজ, জৌনপুর, লাহোর, অমৃতসর প্রভৃতি স্থানে অল্পবিস্তর পরিমাণে গোলাপ উৎপাদিত হয়; কিন্তু গাজীপুরের গোলাপ ক্ষেত্র-সমূহকেই এতদ্দেশীয় গোলাপ-গন্ধ-শিল্পের প্রধান কেন্দ্র বলিতে পারা যায়। এ স্থলে গোলাপের আতর ও গোলাপ-জল উৎপাদন প্রায় দুই শতাব্দী যাবৎ চলিয়া আসিতেছে। গন্ধ-শিল্পে প্রয়োগের জন্য গোলাপ উৎপাদন ও সংগ্রহের যথেষ্ট অবসর এতদ্দেশে রহিয়াছে। কিন্তু আধুনিক প্রথায় গোলাপ-শিল্পসম্প্রসারণের চেষ্টা এখনও হয় নাই। সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণার্থ—সেই জন্য এ স্থলে এই বিষয়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাইতেছে।

গন্ধ-শিল্পের উপযোগী গোলাপজাতি

বর্ত্তমান সময়ে বহুসংখ্যক বিদেশীয় গোলাপ জাতি ভারতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে; এই সমুদয় জাতির ফুল প্রধানতঃ কাটা ফুলরূপে বাজারে বিক্রয় হইয়া থাকে। অবশ্য কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি মহানগরীতে কাটা ফুলের ব্যবসায়ে লাভ সামান্য হয় না, কিন্তু গোলাপ-জাত দ্রব্যাদি প্রস্তুতের ন্যায় বৃহত্তর শিল্পের লাভের সহিত ইহার তুলনা করা যায় না। গোলাপ কুঁড়ি, পাপড়ি, খণ্ড (confection) এবং সর্ব্বোপরি গোলাপজল ও গোলাপের উদ্বায়ী (essential) তৈল লইয়া জগতে একটা বড় ব্যবসায় চলে। এরূপ ব্যবসায়ে ভারতের অংশ যৎসামান্য বা কিছুই নাই বলিলেও চলে। এই সকল দ্রব্য-প্রস্তুতের জন্য কয়েকটি বিশিষ্ট জাতীয় গোলাপ ব্যবহৃত হয়; তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি ভারতে অল্প-বিস্তর পরিমাণে পাওয়া যায়।

১। Rosa moschata:—এই কষ্টসহ গোলাপ ফুল শ্বেত-বর্ণ; পশ্চিম-হিমালয়ের অনেক স্থলে বসন্তকালে পর্ব্বতগাত্রে

এই জাতীয় গোলাপের অসংখ্য ফুল ফুটিয়া অপূর্ব্ব শোভার সৃষ্টি করিয়া থাকে। পার্ব্বত্য জাতিগণ ইহার কুঁড়ি কতক পরিমাণে সংগ্রহ করিয়া শুষ্ক করে এবং তাহা বাজারে 'ফুলকুজো' নামে বিক্রয় হয়।

২। Rosa centifolia :—ইহাকে শতদল গোলাপ বলিতে পারা যায়। পারস্য দেশের গোলাপ-উৎপন্ন দ্রব্যাদির অধিকাংশই এই জাতীয় গোলাপজাত। ককেসস্ ও অ্যাসিরিয়া দেশ ইহার আদিম জন্মস্থান হইলেও বহু শতাব্দী পূর্ব্বে ইহা ভারতে প্রবর্ত্তিত হইয়া এখন নানা স্থানে জন্মিতেছে।

৩। Rosa involucrata জাতির ফুল অপেক্ষাকৃত বড় কিন্তু সুগন্ধ কিছু কম। কেবলমাত্র এই জাতিই উষ্ণ, আর্দ্র জল-হাওয়ায় স্বভাবতঃ জন্মিয়া থাকে এবং সেই জন্যই গাঙ্গেয় প্রান্তরের কতিপয় অঞ্চলে ইহা অনেকটা সুলভ।

৪। Rosa macrophylla :—উত্তর-ভারতের ইহাই বৃহত্তম রক্তবর্ণ গোলাপ। ফুলগুলি প্রায় হাতের চেটোর মত বড় হয়। পঞ্চনদ, যুক্তপ্রদেশ, নেপাল, ভুটান ও সিকিম সর্ব্বত্রই পার্ব্বত্য প্রদেশে এই জাতি সচরাচর দেখা যায়।

৫। Rosa multiflora :—হিমালয়ের পাদদেশে দেরাদুন প্রভৃতি অঞ্চলে এই লতানিয়া গোলাপকে অতি নিকৃষ্ট জমিতেও জন্মাইতে দেখা যায়। ফুলের গন্ধ অধিক না হইলেও প্রাচুর্য্যের হিসাবে ইহা উল্লেখযোগ্য।

৬। Rosa damascena :—ইহাকে ডামাস্ক বা বসরা গোলাপও বলা হয়। গোলাপ-শিল্পে এই জাতির সমাদরই অধিক। বুলগেরিয়া, তুর্কী, মিশর, মরক্কো প্রভৃতি দেশে গোলাপতৈল বা আতর প্রস্তুত করিবার জন্য বসরা গোলাপের সুবৃহৎ বাগিচাসমূহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এতদ্দেশে গাজীপুরেই ইহার সর্ব্বপ্রধান ক্ষেত্র। অমৃতসর, হোসিয়ারপুর, আলিগড়, কাণপুর, পাটনা প্রভৃতি গোলাপ উৎপাদনের অন্যান্য কেন্দ্রে কেবলমাত্র বসরা গোলাপের চাষ হয় না; ক্ষেত্রমধ্যে অন্যান্য জাতীয় গোলাপও থাকে।

কোন জাতীয় ভারতীয় গোলাপের ফুলে উদ্বায়ী তৈলের মাত্রা কিরূপ, বিশিষ্ট প্রণালীতে চাষ দ্বারা উহার উন্নতি সাধন করা যায় কি না, ব্যবসায়িক চাষের হিসাবে কোন্ জাতীয় গোলাপ কোন্ প্রদেশের পক্ষে উপযোগী, ইত্যাদি বিষয়ে এ পর্য্যন্ত ধারাবাহিক অনুসন্ধান হয় নাই। এমন কি, আপাততঃ ভারতে গোলাপ উৎপাদনের দুইটি প্রধান প্রদেশ -বিহার ও যুক্তপ্রদেশের কৃষি ও শিল্প বিভাগের কর্ত্তারাও গোলাপ-চাষের জমি ও ফসলের পরিমাণ সম্বন্ধে কোন সংবাদ দিতে পারেন না। গোলাপ-শিল্পের পুষ্টিসাধন করিতে হইলে পরীক্ষা ও অনুসন্ধানমূলক তথ্যাদি সংগৃহীত হওয়া যে একান্ত আবশ্যক, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

বর্ত্তমান অবস্থা

গোলাপের বিশিষ্ট সদগন্ধ উহার পাপড়ির কোষনিহিত তৈলকণাসমূহজনিত। এক বিন্দু আতর সংগ্রহ করিতে শতাধিক পুষ্প আবশ্যক হয়। সেই জন্য গোলাপের আতর পূর্ব্বে দুর্মূল্য ছিল এবং কেবলমাত্র বিত্তশালী ব্যক্তিগণই উহা ব্যবহার করিতে সমর্থ হইতেন। কিন্তু কালক্রমে নানা দেশে গোলাপ-চাষ বিস্তৃতিলাভ করায় এবং অধুনাতন কৃত্রিম গন্ধদ্রব্যাদির প্রতিযোগিতায় গোলাপতৈল পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সুলভ হইয়াছে। সেই সঙ্গে জনসাধারণের মধ্যে ইহার ব্যবহারও বৃদ্ধি পাইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতেই গোলাপতৈল বা অটোরোজ সর্ব্বপ্রথম পাশ্চাত্য বাণিজ্যে প্রবর্ত্তিত হয়। তাহার পর হইতে অনেক দেশেই এই বহুমূল্য তৈল উৎপাদনের চেষ্টা চলিতেছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কি চাষের পরিসরে ও কি তৈল উৎপাদনের মাত্রায় বুলগেরিয়াকে কোন দেশই অতিক্রম করিতে পারে নাই।

আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, গাজীপুর ভিন্ন ভারতের অন্য কুত্রাপি ব্যবসায়িক হিসাবে গন্ধ-শিল্পের জন্য গোলাপ উৎপাদনের প্রচেষ্টা দেখা যায় না এবং অন্যান্য দেশের তুলনায় গাজীপুরেও গোলাপ-চাষ অতি সামান্য। এ স্থলে চাষও গতানুগতিক ভাবেই হইয়া থাকে। ফুলের জাতির কিম্বা চাষপ্রণালীর উন্নতিসাধনের জন্য স্থানীয় লোকের কোন আগ্রহ দৃষ্ট হয় না। এই সুবিখ্যাত ভারতীয় গোলাপ উৎপাদনকেন্দ্রের বিবরণ প্রদান করা এ স্থলে অনাবশ্যক। গাজীপুর ক্ষেত্রসমূহে গড়ে বিঘাপ্রতি প্রায় এক হাজার গাছ রোপিত হয় এবং তৎসমুদয় হইতে প্রতি মরসুমে এক লক্ষ ফুল পাওয়া যায়। এই পরিমাণ ফুলের ওজন সওয়া এক মণ এবং ইহা চোলাই করিয়া

সাধারণতঃ ২ তোলা আতর ও ১০০ বোতল প্রথম শ্রেণীর গোলাপজল পাওয়া যায়। বিভিন্ন জাতীয় ভারতীয় গোলাপে উদ্বায়ী তৈলের মাত্রা কিরূপ, তাহা এ পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত হয় নাই। কিন্তু ২।৩ স্থলে পরীক্ষা দ্বারা যে সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বনিম্ন অঙ্ক পাওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যবর্ত্তী অঙ্ক ধরিলে তৈলের মাত্রা দাঁড়ায়—ফুলের ওজনের শতকরা ০·০২৫ ভাগ; য়ুরোপজাত ফুলের তুলনায় ইহা অনেক কম। এ স্থলে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, আলিগড়ে কতিপয় পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, উন্নত প্রণালীতে চাষ করিয়া, বিশেষতঃ উপযুক্ত সময়ে জলসেচন দ্বারা ফুলে তৈলের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে পারা যায়। কিন্তু এই সমুদয় পরীক্ষালব্ধ তথ্যের সুযোগ গ্রহণ কোন স্থলে করা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না।

ভারতীয় গোলাপ-শিল্প ও গোলাপজাত দ্রব্যাদির ব্যবসায় সম্বন্ধে কোন অঙ্কাদি পাওয়া যায় না। কিন্তু ইহা সচরাচর দৃষ্ট হয় যে, দেশোৎপন্ন গোলাপ-কুঁড়ি, পাপড়ি, গোলাপজল ও আতর দ্বারা অভাব পূরণ হয় না। এই সমুদয় দ্রব্য বিদেশ হইতেও কতক পরিমাণ আসে; ইদানীন্তন কৃত্রিম গোলাপনির্য্যাসের আমদানি বহু পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়াছে। বন্য ও কর্ষিত গোলাপ লইয়া ভারতে গোলাপ-শিল্পসংগঠনের সম্ভাব্যতা প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে। এরূপ শিল্প সংগঠিত হইলে শুধুই যে দেশমধ্যে গোলাপজাত দ্রব্যাদির চাহিদা মিটাইতে পারা যাইবে, তাহা নহে; অধিকন্তু বিদেশের বাজারে ঐ সমুদয় দ্রব্য পাঠাইয়া লাভবান হইতে পারা যাইবে। কিন্তু আসল কথা, শুধু গোলাপ কেন, অন্যান্য অনেক ফুলের সদ্গন্ধ-যুক্ত উদ্বায়ী তৈল এতদ্দেশে অবহেলায় নষ্ট হইতেছে কিম্বা গন্ধদ্রব্য কাঁচা মালরূপে বিদেশে পাঠাইয়া সামান্য আয় হইতেছে। দেশমধ্যে সেগুলি পূর্ণ সদ্ব্যবহারের বিশেষ কোন ব্যবস্থা হয় নাই। এই শ্রেণীর যে সকল তৈল এখন সামান্য পরিমাণে উৎপাদিত হয়, সেগুলিও গুণে নিকৃষ্ট। তাহা হওয়াও আশ্চর্য্য নহে; কারণ, গন্ধী অথবা দরফরাস নামক এক দল ব্যবসায়ী এতদিন পর্য্যন্ত সুগন্ধ চোলাইর কার্য্য করিয়া আসিতেছে। তাহাদিগের শিক্ষা যেমন সামান্য, কার্য্যপদ্ধতিও সেইরূপ পুরাযুগের। এরূপ অবস্থায় প্রভূত পরিমাণ গন্ধদ্রব্যের অপচয় ও নিকৃষ্ট তৈল উৎপাদন ব্যতীত আর কিছু আশা করিতে পারা যায় না।

গোলাপজাত দ্রব্যাদি

যে উদ্বায়ী তৈল গোলাপের সুগন্ধের হেতু, তাহা টাট্‌কা ফুলেই অধিক পরিমাণে অবস্থিত। ফুল ফুটিয়া শুষ্ক হইতে আরম্ভ হইলে গন্ধ ক্রমশঃ কমিয়া যায়। পূর্ণ, পরিপুষ্ট অথচ অপরিস্ফুট ফুল যত্নের সহিত রাখিয়া দিলে কিন্তু গন্ধ অধিক দিন স্থায়ী হয়। গোলাপকুঁড়ি ও পাপড়ি লইয়া সেই জন্য ব্যবসায় চলে। পূর্ব্বে এগুলির ঔষধে ব্যবহার ছিল; এখন পাশ্চাত্যে কেবলমাত্র গন্ধ ও বর্ণসংযোগ করিবার জন্যই এগুলি খাদ্য ও পানীয়-প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয়। ভারতে কিন্তু গুলকন্দ নামক এক প্রকার সুস্বাদু মৃদু বিরেচক ঔষধ প্রস্তুতব্যাপারে এগুলি এখনও প্রয়োগ করা হয়। হকিমগণ তাঁহাদিগের উচ্চ শ্রেণীর রোগিগণের জন্য ইহা প্রায়ই ব্যবস্থা করেন। গোলাপতৈল বা আতরই কিন্তু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গোলাপজাত দ্রব্য। গন্ধ-শিল্পে এবং সমপ্রকারের অন্যান্য শিল্পে ইহার যথেষ্ট ব্যবহার রহিয়াছে। বিশুদ্ধ গোলাপ-তৈল ঈষৎ পীতবর্ণ এবং অৰ্দ্ধকঠিন, কিন্তু বাজারে ইহা অপেক্ষাকৃত বিরল। অধিকাংশ স্থলেই ইহার সহিত জিরানিয়োলের অংশবিশেষ, চন্দনতৈল, বেঞ্জিল বেনজোয়েট কিম্বা গন্ধবিহীন খনিজ তৈল সংমিশ্রিত থাকিতে দেখা যায়।

উন্নত প্রণালীর প্রয়োজনীয়তা

যাহাদিগের এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, আপাততঃ যে প্রথায় গন্ধীগণ গোলাপ-জল ও আতর প্রস্তুত করে, তাহা নিতান্ত সেকেলে ধরণের। অন্যান্য দেশে গন্ধ-শিল্পের জন্য ব্যবসায়িক গোলাপ-চাষের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়া তৈল উৎপাদনের মাত্রা বৃদ্ধি পাইয়াছে; তৎসঙ্গে ফুলের সমস্ত তৈল নিঃশেষে বাহির করিয়া লইবার অভিনব প্রণালীও উদ্ভাবিত হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে দুই এক স্থলে গোলাপ-শিল্পের উন্নতিসাধনের জন্য সাময়িক চেষ্টা হইলেও এতদ্দেশে ধারাবাহিক বা ব্যাপক-রূপে এ বিষয়ে কোন চেষ্টা হয় নাই। বসরা গোলাপই অবশ্য গন্ধশিল্পের হিসাবে সর্ব্বাগ্রগণ্য। ইহার একাধিক

উপজাতি বা ভেদ (variety) স্থানবিশেষে দৃষ্ট হয়। ইহাদের তৈল-মাত্রা-বিষয়ক তুলনামূলক পরীক্ষা এ পর্য্যন্ত হয় নাই, তাহা সম্পাদিত হইলে কোনগুলি উৎপাদন করা লাভজনক, তাহা প্রমাণিত হইবে। সমভাবে অন্যান্য দেশে যে সকল গোলাপজাতি চাষ করা হয়, তন্মধ্যেও কোন কোনটি এতদ্দেশের জল-হাওয়ার পক্ষে উপযোগী, চাষ দ্বারা তাহাও পরীক্ষিত হওয়া আবশ্যক। বিহার, যুক্তপ্রদেশ ও পঞ্চনদে সরকারী বাগান-বাগিচার অভাব নাই। এই সমুদয়ই উক্তরূপ পরীক্ষার উপযুক্ত ক্ষেত্র। গোলাপ চোলাই-প্রণালীরও আমূল সংস্কার ও উন্নতিসাধন প্রয়োজনীয়। কেহ কেহ ইহা বলিয়া থাকেন যে, গন্ধীগণ-অনুসৃত চোলাই-প্রথা দেশের আর্থিক অবস্থার উপযোগী। তাহা অবশ্য কোন সময় ছিল এবং এখনও স্থানবিশেষে থাকিতে পারে। কিন্তু জগতের বাজারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হইলে প্রাচীন প্রথা একবারেই অচল। আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত চোলাই কারখানা স্থাপন করিতে এককালীন অধিক খরচ পড়ে বটে, কিন্তু ইহাতে যেমন উৎকৃষ্ট শ্রেণীর তৈল প্রস্তুত হয়, পড়তাও তেমনই কম পড়ে। প্রধান প্রধান গোলাপ-উৎপাদন কেন্দ্রে সমবায়-প্রথায় আধুনিক কলকব্জাসমন্বিত কারখানা স্থাপন করা গন্ধদ্রব্য-ব্যবসায়িগণের পক্ষে অসম্ভব হইবে বলিয়া বোধ হয় না।

অন্যান্য দেশে শিল্পের অগ্রগতি

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, গোলাপ-উৎপাদক দেশসমূহের মধ্যে বুলগেরিয়াই এখন সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করে। উক্ত দেশে প্রধানতঃ যে অঞ্চলে গোলাপ-চাষ হয়, তাহার দৈর্ঘ্য প্রায় ১২৫ মাইল; প্রস্থ ৭ হইতে ১৫ মাইল। ইহা পর্ব্বতমালার পাদদেশে অবস্থিত এবং কতিপয় ক্ষুদ্রগিরি-তটিনী দ্বারা জলসিক্ত। সমগ্র অঞ্চলটি ক্ষুদ্র, বৃহৎ ক্ষেত্রসমূহে বিভক্ত; গড়ে প্রত্যেক ক্ষেত্রের আয়তন প্রায় ৬০ বিঘা। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে বুলগেরীয় ক্ষেত্র-গুলিতে মোট ১১০ লক্ষ কিলোগ্রাম (১ কিলোগ্রাম কিঞ্চিদধিক ১ সের) ফুল উৎপাদিত হয়। ইহা হইতে তৈল অথবা আতর পাওয়া যায় ২৭৫০ কিলো, অর্থাৎ ১ কিলো আতর প্রস্তুত করিতে প্রায় ৪০০০ কিলো ফুল লাগে। ইহা সন্তোষজনক মাত্রা নহে। কারণ, সুফলনের সময় উক্ত পরিমাণ তৈল ৩৫০০ কিলো ফুল হইতেই পাওয়া যায়। ভারতে ফুল প্রতি তৈলের হার আরও কম। তাহা এই বলিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, দুর্বৎসরেও উক্ত দেশে ১৫০০০ ফুল হইতে ১ আউন্স তৈল পাওয়া যায়; ভারতে সেই স্থলে ৫০০০০ ফুল প্রয়োজন হয়। বুলগেরিয়ার গোলাপ-তৈলের অধিকাংশই বিদেশে চালান যায় এবং ফরাসী দেশই ইহার প্রধান ক্রেতা। কিছুদিন পূর্ব্বে জগতের বাজারে মন্দা পড়ায় বুলগেরিয়ায় কতক পরিমাণে তৈল জমিয়া গিয়াছে। বুলগেরিয়া ব্যতীত পূর্ব্ব-য়ুরোপের অন্য গোলাপ-উৎপাদন-কেন্দ্র হইতেছে—অ্যানাটোলিয়া। এ স্থলে বৎসরে প্রায় ৩০০ কিলো তৈল উৎপাদিত হয়। সম্প্রতি একটি ফরাসী-কারখানা স্থাপিত হইয়া উৎপাদনের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফ্রান্স ও জার্ম্মাণীতেও গোলাপ-চাষ আছে। কিন্তু উক্ত দেশদ্বয়ের বিরাট গন্ধ-শিল্পের প্রয়োজনেই তাহার ফসল পর্য্যবসিত হইয়া যায়। অবশেষে সকল দেশের গন্ধ-শিল্পকেই বুলগেরিয়ার গোলাপ-তৈলের উপর নির্ভর করিতে হয়।

শিল্প-সংগঠন

অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে বুলগেরিয়ায় গোলাপ-শিল্পে শীর্ষস্থান অধিকারের মূল কারণ---উক্ত শিল্প-সংগঠনে সরকারী প্রচেষ্টা---সহায়তা। ক্ষেত্রে গোলাপ-চাষ হইতে আরম্ভ করিয়া তৈল রপ্তানী পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্যই সরকারী বা আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রথমতঃ জগতের বাজারে তৈলের চাহিদা বুঝিয়া চাষের জমির পরিমাণ ঠিক করিয়া দেওয়া হয়; তৎপরে সরকারী পরি-দর্শকগণ ক্ষেত্রাদি দেখেন ও আবশ্যকমত উপদেশ দেন। সমগ্র ফসল সরকার ক্রয় করিয়া লইয়া প্রত্যেক চোলাই-কারীকে সঙ্গত পরিমাণে ফুল কৃষি-ব্যাঙ্কের মারফৎ সরবরাহ করিয়া থাকেন। প্রস্তুতীকৃত তৈলে যাহাতে ভেজাল না থাকে, তজ্জন্য কোন কারখানার তৈলই সরকারী বীক্ষণা-গারে পরীক্ষিত না হইয়া বাজারে চালাইবার অনুমতি দেওয়া হয় না। বুলগেরিয়ার গোলাপ চাষ ও তৈল-উৎপাদননিয়ন্ত্রণ-প্রথা ভারতে সম্পূর্ণভাবে প্রযুজ্য না হইতে পারে, কিন্তু ইহা স্থির যে, সরকারী সাহায্য ও তত্ত্বাবধান

ব্যতীত এতদ্দেশে প্রথম স্তরের গোলাপ-শিল্প সংগঠন হওয়া সম্ভব নয়।

বন্য-গোলাপের বিষয় আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। গোলাপ-শিল্প প্রতিষ্ঠার কোন পরিকল্পনার মধ্যে প্রকৃতিপ্রদত্ত এই অফুরন্ত উপাদানকে বাদ দিলে চলিবে না। দক্ষিণ-ফ্রান্স ও ইতালী দেশে বন্য সুগন্ধ ফুল হইতে গন্ধসংগ্রহের জন্য চোলাই যন্ত্রসহ ভ্রাম্যমান, চোলাই-কার দল নানা স্থানে গমন করে এবং বড় বড় ব্যবসায়ীর জন্য যথাসম্ভব সুগন্ধিসার প্রস্তুত করিয়া আনে। সমপ্রকার ব্যবস্থা দ্বারা ভারতের স্বভাবজ সুগন্ধি ফুলেরও সদ্ব্যবহার হইতে পারে।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত।

মানুষ

মানুষ দেখেছি নবরূপে বারে বারে।
দেখেছি, কিন্তু বুঝিতে পারিনি তারে
মানুষ দেখেছি নির্ম্মম, নিষ্ঠুর,
সর্পের মত ক্রূর;
বিদ্যুৎসম মনোরম, সুন্দর,
—তেমন ভয়ঙ্কর।

মানুষ দেখেছি দু'হাত জমির তরে
খুনোখুনি ক'রে মরে,
অনাবশ্যক বাহুল্য লাগি প্রাণপণ করে লোকে,
শুধু—দুনিয়ায় স্বার্থসিদ্ধি বোঝে।
মানুষ দেখেছি,—কারখানা-ঘরে রোধ ক'রে নিশ্বাস
মানুষ পিসিয়া মাংস করিছে গ্রাস।
মানুষের বধে মানুষের কারসাজি
দিগন্তে ওঠে আর্ত্তকণ্ঠে বাজি'।
মানুষ দেখেছি পঙ্কিলতার সর্ব্বশেষের স্তরে—
রুগ্নমনের পিপাসিত প্রান্তরে
প্রেত—বীভৎসতম,
তৃষ্ণা মেটায় নিজের রক্তে ছিন্নমস্তা সম।
মানুষ দেখেছি হিমাদ্রি সম সমুচ্চ মহীয়ান্
আকাশের মত মুক্ত উদার প্রাণ,
ধূর্জ্জটি সম সর্ব্বত্যাগী মহৈশ্বর্য্যশালী
হাসিমুখে হাতে বহে ভিক্ষার থালি।

মানুষ দেখেছি, নিজ মহিমার আসন হইতে নেমে
এলো মানুষের প্রেমে;
নিজেরে হারালো বিপুল ভিড়ের মাঝে
হাজার তুচ্ছ কাজে;
আপনি রহিয়া গোপন অন্তরালে,
উজ্জ্বল দীপশিখা এঁকে দিল কৃষ্ণ রাতির ভালে।
এই পৃথিবীর গিরি-নদী-মরু-গহতারা শশী রবি
ভালো ও মন্দে আঁকা মঙ্গল ছবি
ভুলায়েছে তার মন,
মানুষ দেখেছি—মানুষ চিরন্তন।
মানুষ দেখেছি মায়ের অশ্রুজলে
স্নেহের শাসন বলে,
প্রণয়ীর স্থির বিশ্বাসে আর বন্ধুর নির্ভরে
মানুষ দেখেছি সমগ্র রূপ ধরে।
অনন্ত কাল ধরি'
মানুষ রেখেছে মৃত্যুরে নব অমৃত-রসে ভরি;

আজো দেখি আর বিস্ময়ে চেয়ে থাকি,
বুঝিবার দিন চিরদিন রবে বাকী।

শ্রীবিমলকান্তি সমদ্দার

উপন্যাস]

তৃতীয় প্রবাহ

"এ নারী পিশাচী"

ডিটেক্‌টিভ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট রিচার্ড ষ্টীট তাঁহার শয়ন-কক্ষে নিদ্রামগ্ন ছিলেন ; তাঁহার আর্দালী জেনিংস্ প্রত্যূষে এক পেয়ালা চা' সহ সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করিল।

নিদ্রাভঙ্গ হইতেই পূর্ব্বরাত্রির সকল কথা তাঁহার স্মরণ হইল। পূর্ব্ব-রাত্রিতে তিনি অক্সফোর্ড ষ্ট্রীটের একটি অট্টালিকার অন্তরালে লুকাইয়া থাকিয়া অভিনেত্রী বেটা সেমুর এবং প্রসিদ্ধ তস্কর অল মার্কস্‌কে পাশাপাশি চলিতে চলিতে ঘনিষ্ঠভাবে গল্প করিতে দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাহারা বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ! কর্ণেল অলমার্কস্ লণ্ডনের নামজাদা জহরৎ-চোর ; চুরি করিয়া ধরা পড়ায় সে একাধিক বার কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল, এবং স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের দপ্তরখানায় তাহার অনেক 'কীর্ত্তি'র বিবরণ লিপিবদ্ধ ছিল। এই প্রকার ভীষণ-প্রকৃতি পাকা চোরের সহিত বেটা সেমুরের ন্যায় সর্ব্বজন-সমাদৃতা, নিষ্কলঙ্ক-চরিত্রা অভিনেত্রীর ঘনিষ্ঠতার কি কারণ থাকিতে পারে—তাহা তিনি ধারণা করিতে পারিলেন না। তাহাদের এই প্রকার ঘনিষ্ঠতার কথা অন্য কেহ তাঁহার নিকট প্রকাশ করিলে তিনি তাহা বিশ্বাস করিতেন না ; কিন্তু তিনি তাহাদের উভয়কে একত্র পথ দিয়া চলিতে দেখিয়াছেন। গভীর রাত্রিতে উভয়ে পথে চলিতে চলিতে আগ্রহভরে গল্প করিতেছিল, তাহাও তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার চক্ষুকে অবিশ্বাস করিতে পারেন নাই। তিনি দীর্ঘকাল চিন্তা করিয়াও এই জটিল রহস্য ভেদ করিতে পারিলেন না। অবশেষে তিনি স্থির করিলেন, যত শীঘ্র সম্ভব বেটীকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিবেন ; সে তাহার প্রশ্নের উত্তর দিয়া মনের ধাঁধা অপসারিত করিতে পারিবে।

এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া ছিক প্রাতভোজনের পর প্রভাতিক সংবাদপত্রগুলিতে মনঃসংযোগ করিলেন। তিনি প্রথমে যে দৈনিকখানি খুলিলেন, তাহার সম্পাদকীয় প্রবন্ধ পাঠ করিতে আরম্ভ করিয়াই তাঁহার মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর হইল, এবং চক্ষুতে ক্রোধ ও বিরক্তি পরিস্ফুট হইল।

এই প্রবন্ধে পুলিশের অবলম্বিত কার্য্য-প্রণালীর বিরুদ্ধে কঠোর মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল। উপসংহারে সম্পাদক লিখিয়াছিলেন, "যে ভীষণপ্রকৃতি দুর্দ্দান্ত দস্যুদল জন-সাধারণের সুখ-শান্তি নষ্ট করিয়া অহরহঃ তাহাদের মনে আতঙ্ক সঞ্চার করিতেছে, তাহাদের ধন-প্রাণ বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে, সেই সকল দস্যুকে শাস্তি প্রদান করিয়া, তাহাদের অত্যাচারের পথ রুদ্ধ করিতে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের অক্ষমতা অমার্জ্জনীয় ও অত্যন্ত লজ্জাজনক। এ অবস্থায় স্বরাষ্ট্র-সচিবকে প্রতিপন্ন করিতে হইবে—যোগ্য ব্যক্তিকেই তাহার দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে। আট মাসেরও অধিক কাল হইতে 'মিড্‌নাইট' নামক দস্যুদল নগরবাসিগণের জীবন নানা ভাবে বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে ; কিন্তু এই দীর্ঘকালমধ্যে তাহাদের অত্যাচার দমনের কোন প্রকার চেষ্টারই পরিচয় পাওয়া যায় নাই। স্যর রবার্ট ম্যালেটকে এখন স্বহস্তে এই ভার গ্রহণ করিতে হইবে ; এবং যদি প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে পুলিশের জড়-দেহে তাহাকে নূতন শোণিত-সঞ্চারেরও ব্যবস্থা করিতে হইবে। বস্তুতঃ, পুলিশের অকর্ম্মণ্যতা জনসাধারণের আতঙ্ক ও উদ্বেগের কারণ হইয়া উঠিয়াছে ; তাহা অপসারিত করা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। পুলিশ যদি জনসাধারণের ধন-প্রাণ রক্ষার ভার গ্রহণ করিতে অসমর্থ হয়, তাহা

হইলে এই গলগ্রহগুলার প্রতিপালন-ভার বহনের সার্থকতা কি ?"

অন্যান্য দৈনিক পত্রিকাগুলিও এই উক্তির প্রতিধ্বনি করিয়াছিল ; কিন্তু 'ম্যাগাফোনের' ভাষা তীব্রতায় সংযমের সীমা অতিক্রম করিয়াছিল।

ডিক ষ্টীট সংবাদপত্রগুলির কঠোর মন্তব্য পাঠ করিয়া অত্যন্ত নিরুৎসাহ চিত্তে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের আফিসে যাত্রা করিলেন। তিনি আফিসে উপস্থিত হইয়া জানিতে পারিলেন, সহকারী পুলিশ-কমিশনার কয়েক বার তাঁহার সন্ধান লইয়াছিলেন, এবং অধীরভাবে তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। ডিক এই সংবাদ পাইয়াই সুদীর্ঘ বারান্দা অতিক্রম করিয়া তাঁহার আফিস-কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

সহকারী পুলিশ-কমিশনার কর্ণেল এলেন তাঁহার আফিস-কক্ষে সুবৃহৎ ডেস্কের পাশে বসিয়া কাগজপত্র পাঠ করিতেছিলেন। ডিক ষ্টীট সেই কক্ষের দ্বারে করাঘাত করিতেই কর্ণেল মুখ তুলিয়া বলিলেন, "ভিতরে এস, ষ্টীট !"

ডিক ষ্টীট তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেন, "আজ সকালে দৈনিক কাগজগুলি দেখিবার অবসর পাইয়াছিলে কি ?—বোধ হয় সেগুলি দেখিয়াছ।"

ডিক ডেস্কের অন্য ধারে বসিয়া বলিলেন, "হাঁ দেখিয়াছি, এবং তাহাদের মন্তব্য উপভোগ করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছি।"

কর্ণেল এলেন একটা সিগারেট মুখে গুঁজিয়া নিস্তব্ধ ভাবে ধূমপান করিলেন ; তাহার পর গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "একটা কিছু করিতেই হইবে। গত সাত মাস হইতে এই দস্যুদল দমনের ভার তোমার উপর ন্যস্ত আছে ; কিন্তু এই দীর্ঘকালে তুমি কিছুই করিতে পারিলে না ! যদি কৃতকার্য্য হইবার জন্য কোনও চেষ্টা করিয়া থাক, তাহা হইলে সেই চেষ্টা বিফল হইয়াছে। এই কর্ত্তব্য-পালনে তুমি যে অযোগ্যতার পরিচয় দিয়াছ—তাহা অত্যন্ত লজ্জাজনক। কিন্তু আর ও-ভাবে সময় নষ্ট করিলে চলিবে না, একটা কিছু করিতেই হইবে, এবং অতি শীঘ্র তাহা করা প্রয়োজন।"

ডিকের মুখমণ্ডল এই অপমানে লাল হইয়া উঠিল ; তিনি অতি কষ্টে মানসিক চাঞ্চল্য দমন করিয়া বলিলেন, "আমার আশা আছে, কয়েক দিনের মধ্যেই নির্ভরযোগ্য কোন কোন সংবাদ আপনাকে জানাইতে পারিব। আপনি মনে করিবেন না, ইহা আমার একটা বাজে ওজর। এ কথা বলিয়া আপনাকে প্রবোধ দানের চেষ্টা করিতেছি, এরূপ মনে করিলে আমার প্রতি অবিচার করা হইবে। আমি আপনাকে প্রকৃত অবস্থার কথাই বলিতেছি। আজ সকালে আমি সার্জেণ্ট কলিন্সের নিকট হইতে একটা সংবাদ পাইয়াছি।"

কর্ণেল এলেন আগ্রহসহকারে বলিলেন, "বটে ! কলিন্স কি সংবাদ দিয়াছে ?"

ডিক বলিলেন, "তাহার রিপোর্ট সত্য হইলে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, সে দস্যু-সর্দ্দার মিড্‌নাইটের গতি-বিধির সন্ধান পাইয়াছে। এই মিড্‌নাইট লোকটাকেই আমাদের প্রয়োজন। এ কথা আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, যদি আমরা তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারি, তাহা হইলে তাহার দলভুক্ত দস্যুগুলাকে ভয় করিবার কোন কারণ নাই। যদি তাহারা তাহাদের দলপতির সাহায্য না পায়, তাহা হইলে এক সপ্তাহ মধ্যেই তাহাদের দল ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইবে, এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই, মহাশয় !"

সহকারী কমিশনার তাঁহার মুখ হইতে সিগারেটটি অপসারিত করিয়া বলিলেন, "তুমি দস্যুদের দলপতির কথা বলিতেছ ; কিন্তু দস্যু-সর্দ্দার মিড্‌নাইট যে পুরুষ, এ বিষয়ে তোমার নিঃসন্দেহ হইবার কারণ কি ?"

ডিক কর্ণেল এলেনের এই প্রশ্নে এরূপ বিস্মিত হইলেন যে, প্রায় দুই মিনিট তাঁহার মুখে কথা সরিল না ! অবশেষে তিনি জড়িত স্বরে বলিলেন, "আমি আপনার ও-কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলাম না, মহাশয় !"

কর্ণেল সম্মুখের দিকে ঈষৎ ঝুঁকিয়া-পড়িয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "দস্যুদলের অধিনায়ক এই মিড্‌নাইট যে নারী নহে, সে পুরুষ—ইহার কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ আমাদের হস্তগত হয় নাই। আমি যে কথা বলিলাম—ইহা আমার অনুমান মাত্র ; অনুমান প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না। সুতরাং আমার এই উক্তি নিশ্চিতই নির্ভরযোগ্য নহে ; তবে আমার কথাটা তুমি ভাবিয়া দেখিও।"

এই কথা বলিয়া তিনি ডিক ষ্টীটকে বিদায় দানের ইঙ্গিতস্বরূপ অন্য কাযে হাত দিলেন। সহকারী কমিশনারের কথা শেষ হইয়াছে বুঝিয়া ডিক উঠিয়া নিঃশব্দে

সেই কক্ষ ত্যাগ করিলেন ; কিন্তু তাঁহার মন নূতন দুশ্চিন্তায় পূর্ণ হইল। তিনি কর্ণেল এলেনের আফিস-কক্ষ হইতে বাহিরে আসিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন ; কারণ, তিনি যে সকল দুর্ব্বাক্য ও অপমানসূচক উক্তি শুনিবার আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তাঁহাকে ততদূর অপমানসূচক উক্তি শুনিতে হয় নাই। তাঁহাকে যে কয়েকটি কঠোর মন্তব্য শুনিতে হইল, তাঁহার ন্যায় তাঁবেদারের তাহা ত অঙ্গের ভূষণ! উপর-ওয়ালার ঐ প্রকার কঠোর উক্তি শ্রবণে তাঁহারা অভ্যস্ত। কিন্তু কর্ণেল এলেনের শেষ কথাগুলি অত্যন্ত বিস্ময়কর বলিয়াই তাঁহার ধারণা হইল। মিড্‌নাইট নামক দুর্দ্দান্ত দস্যুদলের অধিনায়ক পুরুষ নহে, নারী? এরূপ অসম্ভব কথা পূর্ব্বে কোনও দিন ডিক ষ্ট্রীটের কল্পনাতেও স্থান পায় নাই।

ডিক ষ্ট্রীট তাঁহার আফিস-কক্ষে প্রবেশ করিয়া ইন্‌স্পেক্টর লুকাসকে তাঁহার ডেস্কের সম্মুখে উপবিষ্ট দেখিলেন। লুকাস তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিল।

ইন্‌স্পেক্টর লুকাস বহুদর্শী, প্রবীণ কর্ম্মচারী। সে ডিকের মুখের দিকে চাহিয়া সহানুভূতি ভরে বলিল, "শরীর কি তেমন ভাল নাই?"

ডিক বলিলেন, "শরীর সুস্থই আছে।"

লুকাস বলিল, "শুনিয়া খুব সুখী হইলাম ; তবে মন ভাল না থাকিবারই কথা বটে। আপনি ত খবরের কাগজগুলা দেখিয়াছেন? সম্পাদকেরা আফিসের চেয়ারে বসিয়া কাগজে যে সব অসঙ্গত মন্তব্য প্রকাশ করেন, তাহা শুনিয়া রাগে সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া যায়। ইচ্ছা হয়, এই সব বচনবাগীশ সম্পাদককে কয়েক দিনের জন্য আমাদের চাকরীতে বসাইয়া দিই ; তাহা হইলে তাঁহারা কি করিয়া দেশের চোর, ডাকাতগুলাকে ধরিয়া জেলে আটক করেন তা' দেখা যায়।—আজ সকালে তাহারা 'কাবোর্ডটা' লইতে আসিয়াছিল ; এরকম জিনিস রাখা সরকারী আফিসের পক্ষে লজ্জার কথা।"

ডিক ষ্ট্রীটের আফিসে দেওয়ালের নিকট একটা জীর্ণ 'কাবোর্ড' ছিল ; তিনি দেখিলেন, সেটি সেখানে নাই। তাহার ভিতর যে সকল কাগজ-পত্র ছিল, সেগুলি মেঝের এক স্থানে স্তূপাকারে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

ডিক অন্যমনস্কভাবে বলিলেন, "ঐ সকল কাগজপত্র ওখানে ফেলিয়া রাখা সঙ্গত নহে, শীঘ্রই ওগুলির একটা গতি করিতে হইবে।"

ইন্‌স্পেক্টর লুকাস্ বলিল, "উহারা কালই একটা নূতন 'কাবোর্ড' রাখিয়া যাইবে।—গত রাত্রির হত্যাকাণ্ডের রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে।"

ডিক বলিলেন, "নূতন কোন সংবাদ পাওয়া গিয়াছে কি?"

ইন্‌স্পেক্টর লুকাস্ মাথা নাড়িয়া বলিল, "না ; আপনি কি নূতন কোন সংবাদের আশা করেন? আমি ত কোন আশা করি না। আমাদের একটি লোক অল্‌মার্কসের উপর নজর রাখিবার জন্য তাহার অনুসরণ করিয়াছিল ; কিন্তু অল্‌মার্কস্ পিকাডেলীর নিকট হইতে তাহার চক্ষুতে ধূলা নিক্ষেপ করিয়া অদৃশ্য হইয়াছে! যে কর্ম্মচারী তাহার অনুসরণ করিতেছিল, তাহাকে গালি দিয়া ভূত ছাড়াইয়াছি, কেবল প্রহার বাকি।—কিন্তু ওকি, আপনাকে এত অন্যমনস্ক দেখিতেছি কেন? আমার কথাগুলি কি আপনার কাণে গিয়াছে?"

ডিক ষ্ট্রীট সত্যই তখন অন্যমনস্ক হইয়াছিলেন। ইন্‌স্পেক্টর লুকাস অল্‌মার্কসের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেই অক্সফোর্ড ষ্ট্রীটের পূর্ব্বরাত্রির ঘটনার প্রতি তাঁহার মন আকৃষ্ট হইয়াছিল, এবং তখন তিনি সেই সকল কথাই চিন্তা করিতেছিলেন। সহকারী কমিশনার তাঁহাকে যে অদ্ভুত কথা বলিয়াছিলেন, তাহাও সেই সময় তাঁহার মনে পড়িয়াছিল। তাঁহার মনে হইল—কর্ণেল এলেন যখন সেই দস্যু-সর্দ্দারের কথা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, তখন কি বেটী সেমুরের কথা তাঁহার মনে উদিত হইয়াছিল?

এই কথা চিন্তা করিয়া ডিক ষ্ট্রীট অস্ফুট-স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "না, না, ইহা অসম্ভব"।

ইন্‌স্পেক্টর লুকাস্ সেই কথা শুনিয়া বিস্ময়পূর্ণ-দৃষ্টিতে ডিকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনি কি ভাবিয়া এ কথা বলিলেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না! তবে যদি গত রাত্রির দুর্ঘটনার রহস্যভেদ সম্বন্ধে এ কথা বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমি আপনার সহিত একমত ; এই জটিল রহস্য ভেদ করা অসম্ভবই বটে। সে লোকটি বলিয়াছিল, জগতে কিছুই অসম্ভব নহে, আপনি বোধ হয় তাহার কথা জানেন। সেই ব্যক্তি তখন মিড্‌নাইট দস্যুদলের শক্তি-সামর্থ্যের কথা জানিত না। মিড্‌নাইটের দল যে কি চীজ, তাহা জানা থাকিলে তাহার মুখ হইতে ও-কথা বাহির হইত না।"

ইন্‌স্পেক্টর লুকাস ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিল, "উহারা যে কিরূপ অসম্ভব কার্য্য করে, আপনি ক্রমশঃ তাহার পরিচয় পাইবেন।"

ইন্‌স্পেক্টর লুকাস ডিকের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলে ডিক টেলিফোনের রিসিভার তুলিয়া লইয়া ভিক্টোরিয়ার একটি নম্বর বলিলেন।

কয়েক মিনিট পরে তিনি টেলিফোনে সাড়া পাইলেন। বেটী-সেমুর কোমল স্বরে বলিল, "কে আপনি ?"

ডিক উত্তর দিলেন, "আমি ডিক ষ্ট্রীট। আমার মনে হইল, গত রাত্রির দুর্ঘটনার পর তুমি কেমন আছ, টেলিফোনে তাহা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া পরে তোমার সঙ্গে দেখা করিব।"

বেটী নিজের সম্বন্ধে কোন কথা না বলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "গত রাত্রির দুর্ঘটনাটা সত্যই কি ভয়াবহ নহে ?"—ডিকের মনে হইল কথাগুলি বলিবার সময় বেটীর কণ্ঠস্বর ঈষৎ কম্পিত হইয়াছিল, কিন্তু ইহা সত্য, কি তাঁহার অনুমান মাত্র, তাহা তিনি ঠিক বুঝিতে পারিলেন না।

ডিক জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ রাত্রিতেও তুমি কি অভিনয় করিবে ?"

বেটী বলিল, "হাঁ, অভিনয় করিতেই হইবে। মিঃ ডেল্‌ম্যান বলিতেছিলেন—বিজ্ঞাপন হিসাবে আজ রাত্রির অভিনয় যৎপরোনাস্তি সাফল্য লাভ করিবে। এরূপ সুযোগ ত্যাগ করা উচিত নহে।"

ডিক মুহূর্ত্তকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, "কিন্তু এরূপ লোক বিস্তর আছে, যাহারা মিঃ ডেল্‌ম্যানের এই মতের সমর্থন করিবে না। আজ বিকালে কি তোমার কোন কায আছে ? চা-পান উপলক্ষে কোথাও কি আমার সঙ্গে তোমার দেখা করিবার সুযোগ হইবে না ?"

বেটী ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "তোমার প্রস্তাবটি লোভনীয় বটে ; কিন্তু আমি পূর্ব্বেই যে কোন বন্ধুর সহিত চা-পানের জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াছি, এবং দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহাকে কথা দিয়া ফেলিয়াছি।"—সে মুহূর্ত্তকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল, "তবে কাল এই সময় তোমার সঙ্গে 'লঞ্চে' যোগদান করিতে আমার কোন অসুবিধা হইবে না, যদি তুমি—"

ডিক তাহার কথায় বাধা দিয়া উৎসাহভরে বলিলেন, "বাঃ, চমৎকার হইবে ; আমি কাল বেলা একটার সময় কার্লটোনিয়ানে তোমার সঙ্গে দেখা করিব।—আর শোন, কাল রাত্রিকালে সেই দুর্ঘটনার পর রঙ্গমঞ্চে তোমার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলাম; কিন্তু তখন তুমি বাড়ী চলিয়া আসিয়াছিলে।"

বেটী খুসী হইয়া বলিল, "তুমি আমার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলে ? সত্যই কি ? এ তোমার বহুৎ দয়া ; কিন্তু আমি তাড়াতাড়ি বাড়ী চলিয়া আসিয়াছিলাম। শরীরটা ভাল ছিল না ; কেমন যেন অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম।"

ডিক হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি সোজা বাড়ী চলিয়া গিয়াছিলে ?"

বেটী বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, "হাঁ, বাড়ী আসিয়াছিলাম ; ও কথা কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ বল ত !"

ডিক বাধ-বাধ স্বরে বলিলেন, "আ—আমার মনে হইয়াছিল—আমি যেন তো—তোমাকে অক্সফোর্ড ষ্ট্রীট দিয়া হাঁটিয়া যাইতে দেখিয়াছিলাম।"

বেটী হো-হো শব্দে হাসিয়া বলিল, "আমাকে ? আমাকে তুমি অক্সফোর্ড ষ্ট্রীট দিয়া হাঁটিয়া যাইতে দেখিয়াছিলে ? স্বচক্ষে ? সত্যি ?—না, যাহাকে তুমি দেখিয়াছিলে—সে আমি নই। অসম্ভব ! আমি তখন আমার শয্যায় শুইয়া গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত। তোমার দেখিতে ভুল হইয়াছিল। হী-হী, কাল দেখা হইবে।—গুড্ নাইট্ !'

বেটী রিসিভার রাখিয়া দিলে 'খট্' করিয়া শব্দ হইল। ডিক টেলিফোন সরাইয়া রাখিলেন; কিন্তু তাঁহার মন অত্যন্ত দমিয়া গেল। বেটীর 'হী-হী' হাস্যধ্বনি তাঁহার কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল; তাঁহার মনে হইল—সেই হাসি আন্তরিক নহে, তাহাতে যেন উপহাসের আভাস ছিল।

ডিক নিজের চক্ষুকে অবিশ্বাস করিতে পারেন না। তিনি পূর্ব্ব-রাত্রিতে কয়েক ফুট দূরে থাকিয়া, পথের উজ্জ্বল আলোকে বেটী সেমুরকে সুস্পষ্টরূপে দেখিয়াছিলেন ; আর বেটী তাঁহাকে অসঙ্কোচে বলিল—তিনি যাহাকে দেখিয়াছিলেন সে অন্য স্ত্রীলোক ! তিনি বুঝিতে পারিলেন, বেটী মিথ্যা কথায় তাঁহাকে প্রতারিত করিল ! তিনি ভাবিলেন, এইভাবে তাঁহাকে প্রতারিত করিবার, মিথ্যা কথা বলিবার কি প্রয়োজন ছিল ? বেটীর কপটতায় তিনি মনে অত্যন্ত আঘাত পাইলেন। তাঁহার ধারণা হইল, বেটী তাঁহার

নিকট কোন কথা গোপন করিতে চাহে। কিন্তু সে কোন্ কথা?

সহকারী কমিশনার আফিসে তাঁহাকে যে কথা বলিয়াছিলেন, সহসা তাহা তাঁহার স্মরণ হইল। তিনি নতমস্তকে চিন্তা করিতে লাগিলেন; সেই চিন্তা আদি-অন্তহীন, অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত।

কয়েক মিনিট পরে তিনি বৈদ্যুতিক ঘণ্টায় অঙ্গুলী স্পর্শ করিলেন, ঝন্-ঝন্ শব্দ হইল, এবং দুই মিনিট পরে এক জন কনষ্টেবল তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল।

ডিক কনষ্টেবলকে বলিলেন, "স্মিথসন, তুমি আফিসের সেরেস্তায় গিয়া, যে সকল স্ত্রীলোক অপরাধ করিয়া শাস্তি পাইয়াছে তাহাদের মামলা-সংক্রান্ত 'ফাইল'গুলি আমাকে আনিয়া দাও। কোনও অপরাধিনীর 'ফাইল' যেন পড়িয়া না থাকে। যাহারা কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে, তাহাদের 'ফাইল'ও লইয়া আসিবে; তবে যাহারা কাহারও পকেট মারিয়া শাস্তি পাইয়াছে, কি কোন দোকান হইতে কোন জিনিস হাতাইয়া ধরা পড়ায় সামান্য দণ্ডভোগ করিয়াছে—তাহাদের 'ফাইলে' প্রয়োজন নাই। আমি দুঃসাহসী নারী দস্যুদের 'ফাইল' চাই।"

স্মিথসন তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিল। ডিক উঠিয়া তাঁহার আফিস-কক্ষের মুক্ত বাতায়নের নিকট উপস্থিত হইলেন; অদূরে টেম্স নদীর বাঁধ তাঁহার দৃষ্টি-গোচর হইল; তিনি নির্নিমেষ নেত্রে সেই বাঁধের দিকে চাহিয়া কি চিন্তা করিতে লাগিলেন, তাহা বোধ হয় তিনি বলিতে পারিতেন না। কত সামঞ্জস্য-বিহীন অদ্ভুত চিন্তা! তাঁহার মনে হইল—এ সংসারে স্নেহ নাই, প্রেম নাই, সহৃদয়তা নাই; সর্ব্বত্রই হীন কপটতা, কেবল নীচ স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা! গোলাপ এত সুন্দর, তাহারও বৃন্ত তীক্ষ্ণ কণ্টকরাশিতে পরিবেষ্টিত! ভগবানের সৃষ্টি দুর্ব্বোধ্য রহস্যে পূর্ণ। জীবনে নিরবচ্ছিন্ন সুখ-শান্তির আশা বিড়ম্বনামাত্র। এ জগতে বিশ্বাসের পাত্রী কি কেহই নাই? পুরুষ কেন নারীর প্রেমে মুগ্ধ হয়? সেই প্রেম কি স্বার্থেরই অভিব্যক্তি নহে?

সহসা স্মিথসনের আবির্ভাবে ডিকের চিন্তাস্রোত অবরুদ্ধ হইল। স্মিথসন রাশিকৃত 'ফাইল' তাঁহার ডেস্কে রাখিয়া প্রস্থান করিল।

ডিক তাঁহার আসনে বসিয়া 'ফাইল'গুলি একে একে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া তিনি সেই সকল 'ফাইল' পরীক্ষা করিলেন। বহুসংখ্যক অপরাধিনীর অপরাধের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া, যে সকল অপরাধিনীর অপরাধ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া তাঁহার ধারণা হইল, যাহারা কোন দস্যুদলের অধিনায়িকা হইয়া মিড্নাইটের দলের মত দস্যুদল পরিচালিত করিতে পারে বলিয়া তাঁহার উপলব্ধি হইল, তাহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প; তিনি তাহাদের 'ফাইল' চিহ্নিত করিয়া স্থানান্তরে রাখিলেন।

অবশেষে যখন তিনি শেষ 'ফাইল'টি খুলিলেন, তখন সূর্য্য অস্তমিত হইয়াছিল। তিনি সেই 'ফাইল'টি খুলিয়াই চমকিয়া উঠিলেন, এবং সোজা হইয়া বসিয়া ফাইলের প্রথম পৃষ্ঠা-সংলগ্ন ফটোখানি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন।

সেই ফটোর নীচে একখানি আল্গা কাগজে যে বিবরণ লিখিত ছিল ডিক ষ্ট্রীট অতঃপর রুদ্ধ নিশ্বাসে তাহা পাঠ করিলেন,

বিবরণটি এইরূপ,—

"যে নারীর এই ফটো তাহার নাম 'মেরী ড্রিউ।' চুরি অপরাধে ছয় মাস তাহার সশ্রম কারাদণ্ড হওয়ায় তাহাকে হলওয়ের কারাগারে আবদ্ধ করা হয়। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ৮ই জুন তাহাকে মুক্তিদান করা হয়। ইহার পূর্ব্বেও পাঁচ বার তাহাকে সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছিল।"

এই বিবরণের নিম্নে মেরী ড্রিউর পরিচয় সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিত ছিল। সকলের নীচে লাল কালী দিয়া মোটা মোটা অক্ষরে লিখিত ছিল, "এ নারী পিশাচী।"

ডিক রুদ্ধনিশ্বাসে এই বিবরণ দুইবার পাঠ করিলেন। তাঁহার মুখকান্তি নিদাঘাপরাহ্নের মেঘের ন্যায় গম্ভীর হইল, এবং ক্ষণকাল পরে তাহা মৃতের মুখের ন্যায় বিবর্ণ হইল।

এই ফটো যে বিখ্যাত অভিনেত্রী বেটী সেমুরের—এ বিষয়ে তাঁহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না; যেন বেটী সেমুর তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত!

[ক্রমশঃ

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

আবির্ভাবের আভাস

সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়াছে। নীল আকাশে ত্রয়োদশীর চাঁদ হাসিতেছিল। অদূরে ভাগীরথীর বিশাল বুকে চাঁদের আলোর ঝিকিমিকি—স্রোতের ধারা অবিরল বহিয়া চলিয়াছে।

আচার্য্য অদ্বৈত নিয়মিত সন্ধ্যাবন্দনা সারিয়া কুটীরের সম্মুখস্থ ফুলের বাগানে পদচারণা করিতেছিলেন। প্রকৃতির সুন্দর শোভা তাঁহার দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করিতে পারে নাই। নিতান্ত বিষণ্ণ মনে তিনি কি ভাবিতেছিলেন, আর মাঝে মাঝে তাঁহার নয়নে অশ্রুধারা বহিতেছিল।

কুটীর-অঙ্গনে দাঁড়াইয়া সীতা দেবী স্বামীর এই বিচলিত ভাব লক্ষ্য করিতেছিলেন। স্বামীর বিশাল হৃদয়ে কি ভাবের বন্যাপ্রবাহ বহিয়া চলিয়াছে, সাধ্বী স্ত্রীর তাহা অগোচর ছিল না। পরম পণ্ডিত, বৈষ্ণবাগ্রগণ্য স্বামী দেশের দুর্দ্দিনের কথা ভাবিয়া ভাবিয়া যে ক্রমেই অধিকতর অধীর হইয়া উঠিতেছেন, তাহা তিনি ভাল করিয়াই জানিতেন।

অনেকক্ষণ প্রতীক্ষার পর সীতা দেবী স্বামীর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার হৃদয়ে সমবেদনার প্রবাহ উচ্ছ্বসিত।

এবার ব্রাহ্মণের সম্বিৎ যেন ফিরিয়া আসিল। তিনি স্থিরদৃষ্টিতে পত্নীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আর সহ্য হয় না, ব্রাহ্মণি! এত অনাচার, এত ভক্তিহীনতা মানুষের মধ্যে বেড়ে চলেছে যে, আর দুঃখ রাখবার জায়গা নেই!"

বেদনার ভারে ব্রাহ্মণের কণ্ঠস্বর ভারী হইয়া উঠিল। তিনি যুক্তকর ললাটে স্পর্শ করিয়া আবেগভরে বলিয়া উঠিলেন, "আর কত দিন—আর কত যুগ তুমি পুণ্যভূমি ভারতকে বিস্মৃত হয়ে থাকবে, প্রভু! সব যে যায়! নবদ্বীপে শত শত টোলে, কেবল ন্যায়ের বিচার-তর্ক—অসংখ্য পণ্ডিত শুষ্ক জ্ঞানালোচনায় ব্যস্ত, কিন্তু প্রেম-ভক্তি-সাধনায় যে কত সহজে তোমায় পাওয়া যায়, সে কথা সকলে বিস্মৃত, তাই তোমার সেবা আরাধনার কথা কাহারও মনে আসে না, তোমার লীলারস আস্বাদনে সকলে বঞ্চিত, তবে কলিকল্মষনাশের উপায় কি?"

ব্রাহ্মণের নয়ন-পথে দরবিগলিত ধারা বহিয়া চলিল। তাঁহার আকুল আবেদন, ব্যথাভরা হৃদয়ের প্রার্থনা কি তাঁহার চরণতলে পৌঁছিল?

সীতাদেবী স্বামীর হাত ধরিয়া করুণস্বরে বলিলেন, "অধীর হয়ো না, ঠাকুর! তোমার অচলা ভক্তি, একাগ্র প্রার্থনা ব্যর্থ হবার নয়। তিনি আসবেন—নিশ্চয় আসবেন। তুমিই ত বলেছ—পাপী, তাপী, ভ্রান্ত যারা, তাঁদের উদ্ধারের জন্য প্রেমময় ঠাকুর আবার এ পৃথিবীতে নেমে আসবেন। ঠাকুর কখনই তোমার সে কথা মিথ্যা হতে দেবেন না।"

দৃঢ়কণ্ঠে অদ্বৈতাচার্য্য বলিলেন, "হাঁ, তাঁকে আসতেই হবে। জ্ঞানের নীরস তর্কে আজ প্রেমভক্তির মহিমা বিস্মৃতপ্রায়—নাস্তিকতা প্রসারিত। তিনি এসে সে মোহজাল ছিন্ন-ভিন্ন করে দেবেন, শুদ্ধা ভক্তির পুণ্য-জ্যোৎস্নায় ভারত স্নিগ্ধ—পবিত্র করবেন, সে স্বপ্ন আমি যে রোজ দেখি। সেই আশ্বাসেই আমি যে প্রাণ ধরে আছি।"

সীতা দেবী মধুর হাসিয়া বলিলেন, "তবে—তবে তুমি কেন এত বিচলিত হচ্ছ, ঠাকুর! তিনি ঠিক সময়েই এসে দেখা দেবেন।"

অদ্বৈতাচার্য্য এবার যেন অপেক্ষাকৃত শান্ত ভাবে বলিলেন, "বড় দুঃখ পাই, ব্রাহ্মণি! শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তন ঘরে ঘরে হবে, তা না হয়ে দেখছি, সমস্ত সংসার শ্রীকৃষ্ণ-সেবাভক্তিশূন্য। বড় বড় পণ্ডিত যাঁরা, তাঁরা শাস্ত্রব্যাখ্যা করে হরিভক্তি-প্রসারে বিরত।

'সকল সংসার মত্ত ব্যবহার রসে।
কৃষ্ণপূজা বিষ্ণুভক্তি কারো নাহি বাসে।'

এ কি কম দুঃখ!"

এখন হইতে ৪ শত ৫৫ বৎসর পূর্ব্বের কথা। বাঙ্গালা তখন অরাজক—অনাচারের লীলাভূমি। বাঙ্গালায় তখন

মুসলমান-শাসন চলিতেছিল। বাঙ্গালী তখন পরাধীনতার নাগপাশে আত্মবিস্মৃত জাতিতে পরিণত হইতে চলিয়াছে। কোন হিন্দু রাজা দীর্ঘকাল বাঙ্গালার কোথাও স্থায়িভাবে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতে পারিতেছিলেন না। কোন কোন হিন্দু রাজা মুসলমানধর্ম্মও গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ধর্ম্মসাধনার নামে নানা অনাচার অনুষ্ঠিত হইতেছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালায় বামাচার শ্মশানের শবসাধনা বৌদ্ধতন্ত্রের আভিচারিক সাধনায় সিদ্ধিলাভই অসংখ্য লোকের একান্ত কাম্য হইয়াছিল। তখন—

"বাসুলী পূজয়ে কেহো নানা উপহারে।
মদ্যমাংস দিয়া কেহো যক্ষ পূজা করে॥
নিরবধি নৃত্যগীত বাদ্য কোলাহল।
না শুনি কৃষ্ণের নাম পরম মঙ্গল॥"

* * * *

"যে বা ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী মিশ্র সব।
তাহারাও না জানয়ে গ্রন্থ অনুভব॥
শাস্ত্র পড়াইয়া সভে এই কর্ম্ম করে।
শ্রোতার সহিতে যম-পাশে ডুবে মরে॥"

তখন ভাগীরথী-তীরবর্ত্তী নবদ্বীপ ধনে, জনে, পাণ্ডিত্যে অপূর্ব্ব খ্যাতি লাভ করিয়াছে। ঘরে ঘরে টোল—বিদ্যা-চর্চ্চায় নবদ্বীপ তখন শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। টোলে অসংখ্য ছাত্র। প্রত্যেকেরই মুখে কাব্য-সাহিত্য, স্মৃতি, ন্যায়, বেদান্তের আলোচনা। ভাগীরথী-তীরে রাজপথ—রাজ-পথের দুই ধারে গাছের সারি। বৃক্ষবীথির সুশীতল ছায়ায় বসিয়া উৎসাহী ছাত্ররা বিদ্যার আলোচনায় নিমগ্ন।

গঙ্গায় হাজার হাজার লোক প্রত্যহ স্নান করিত। পূজার ফুল গঙ্গাবক্ষে ভাসিয়া যাইত। সন্ধ্যাসমাগমে ভাগীরথী-তীরে ব্রাহ্মণগণ যখন শ্রেণীবদ্ধ ভাবে বসিয়া সন্ধ্যা বন্দনার বেদমন্ত্র সমবেতকণ্ঠে আবৃত্তি করিতেন, তখন তপোবনের ভাব প্রতীত হইত। নবদ্বীপে তখন নব্য ন্যায়ের যুগ। বাসুদেব সার্ব্বভৌম মিথিলা হইতে সমগ্র ন্যায়শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করিয়া আসিয়া নবদ্বীপে টোল খুলিয়াছিলেন। বিদ্যার অনুশীলন তখন নবদ্বীপের প্রধান সম্পদ্। শাস্ত্রালাপ, বিচার-বিতর্ক ব্যতীত তখন অন্য আলোচনাই নবদ্বীপ-বাসিগণকে প্রলুব্ধ করিতে পারিত না। এই শাস্ত্রচর্চ্চা স্ত্রী-বালকগণের মধ্যেও প্রসারিত হইয়াছিল।

কিন্তু পণ্ডিতগণ ন্যায়শাস্ত্রের কূটতর্কে দিগ্বিজয়ী হইলেও, শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-ভক্তির মন্দাকিনী ধারায় তাঁহাদের তাপিত হৃদয় স্নিগ্ধ হয় নাই। তখন—

"কেন বা কৃষ্ণের নৃত্য, কেন বা কীর্ত্তন?
কারে বা বৈষ্ণব বলি, কিবা সঙ্কীর্ত্তন?
কিছু নাহি জানে লোক ধনপুত্র-রসে।
সকল পাষণ্ড মেলি বৈষ্ণবেরে হাসে॥"

কাজেই পরমবৈষ্ণব অদ্বৈতাচার্য্যের নির্ম্মলচিত্ত যে শ্রীভগবানের লীলায় ভক্তিবিশ্বাসহীনতা দেখিয়া বিচলিত—বিক্ষুব্ধ হইবে, ইহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ নাই।

আচার্য্য অদ্বৈত আকাশপানে চাহিয়া তাঁহার ইষ্টদেবতার ধ্যানে আবার তন্ময় হইয়া গেলেন। সীতা দেবীও স্বামীর দৃষ্টান্তে মনে মনে একান্তভাবে শ্রীহরিকে স্মরণ করিতে লাগিলেন।

নিস্তব্ধ রজনী শুভ্র জ্যোৎস্নাপুলকিত; সেই পূণ্য জ্যোৎস্নায় যেন কাহার আনন্দঘন রসধারা উছল হইয়া উঠিল। যেন কাহার নূপুরে রুণ-ঝুণ ঝঙ্কৃত হইল। আচার্য্যের দেহে আনন্দের শিহরণ সঞ্চারিত হইল।

সহধর্ম্মিণীর দিকে মুখ ফিরাইয়া তিনি বলিলেন, "শ্রীনিবাস, গঙ্গাদাস, শুক্লাম্বর—আমরা সকলে হরিনাম গান করি, তাই শুনে পাষণ্ডরা আমাদের উপর অত্যাচারের ভয় দেখায়। আমি তাদের বলে দিয়েছি, আমরা শ্রীকৃষ্ণের নাম গান করে বেড়াবই। আমাদের ডাকে প্রভুকে আসতেই হবে। তখন আমার চিরসুন্দরকে সকলের কাছে নিয়ে দেখাব। যদি তাঁকে আবার না এ ধরায় আনতে পারি, তা হলে—

'প্রকাশিয়া চারি ভুজ, চক্র লইমু হাতে।
পাষণ্ডীর করিমু স্কন্ধ নাশ।
তবে কৃষ্ণ প্রভু মোর, মুঞি তাঁর দাস'॥'

ব্রাহ্মণের নয়নযুগল ধ্বক্ ধ্বক্ জ্বলিয়া উঠিল।

সীতা দেবী আবার স্বামীর দক্ষিণ করতল চাপিয়া ধরিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "ঠাকুর, তোমার সাধ তিনি পূর্ণ না করে পারেন না। এখন চল, বিশ্রামের সময় হয়েছে। সারাদিন উপবাসী হয়ে হরিনাম গান করেছ। এখন সামান্য কিছু প্রসাদ—"

বাধা দিয়া আচার্য্য বলিলেন, "সত্যই তোমার কথা আমি ভুলে গিয়েছিলুম। সারাদিন তুমিও জলবিন্দু গ্রহণ করো নি। চল যাই।"

উভয়ে ধীরে ধীরে কুটীরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

আবির্ভাবের সূচনা

"বাবা, জগন্নাথ!"

"কি মা?"

জগন্নাথ মিশ্র মাতা শোভা দেবীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

তখন তরুণ তপনের প্রথম কিরণজাল গাছের পাতায় পাতায় সোণা ছড়াইতেছিল।

শোভা দেবী বলিলেন, "বাবা, তোমরা নবদ্বীপে ফিরে যাও। অনেক দিন দেখিনি, বৌমা, বিশ্বরূপ আর তোমাকে দেখে আমার সাধ মিটেছে।"

জগন্নাথ মিশ্র পত্নী শচীদেবী ও পুত্র বিশ্বরূপকে লইয়া মাতার আদেশে শ্রীহট্টে নিজ গ্রামে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার আর নবদ্বীপে ফিরিয়া যাইবার বাসনা ছিল না। একে একে তাঁহার আটটি কন্যা জন্মগ্রহণের পর তাঁহারা নবদ্বীপের বুকেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহার পর পুত্র বিশ্বরূপের জন্ম। মিশ্র মহাশয়ের ইচ্ছা ছিল, জন্মভূমিতেই জীবনের অবশিষ্ট কাল, মার চরণ-সেবা করিয়া কাটাইয়া দিবেন।

পুত্র মার কাছে বসিয়া বলিলেন, "না, মা, তুমি আর আমায় নবদ্বীপে যেতে আদেশ করো না। আমরা তোমার কাছেই থাকব।"

শোভা দেবী মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "না, বাবা, নবদ্বীপে তোমাদের যে ফিরে যেতেই হবে।"

পুত্রকে ছাড়িয়া থাকা জননীর পক্ষে কিরূপ বেদনাদায়ক, সংসারাভিজ্ঞ জগন্নাথ মিশ্রের তাহা সুবিদিত। তিনি এই প্রস্তাবে মাতার মুখের দিকে সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন। তিনি নিজে সন্তানের জনক। মাতার বুকে বাৎসল্য রসের স্নিগ্ধপ্রবাহধারার বেগ কিরূপ প্রবল, তাহা তিনি অনুভব করিলেন।

কিন্তু মিশ্র মহাশয় দেখিলেন, মাতার করুণ মুখশ্রীতে একটা অপূর্ব্ব দীপ্তি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। উহা কি ত্যাগের বিচিত্র মহিমাদ্যুতি?

জননী বলিলেন, "ভবিষ্যতের কথা ভেবেই আমি তোমাদের যাবার কথা বল্‌ছি। এর বেশী আর এখন বল্‌তে পার্‌ছি না।"

তাঁহার অশ্রু-ছলছল নয়নে দীপ্তি প্রতিভাত। তিনি রাত্রিশেষে যে বিচিত্র স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাহার স্মৃতিপ্রভায় তাঁহার মানসপট সমুজ্জ্বল। স্বপ্নে তিনি দৈববাণী শুনিয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশে শ্রীভগবানের ঐশীশক্তির বিকাশ হইবে। নবদ্বীপে সেই মহাপুরুষের আগমনে ভারত ধন্য হইবে। নবদ্বীপ তাঁহার সাধনার পুণ্যতীর্থ সুপবিত্র কর্ম্মক্ষেত্র। মাতৃস্নেহের আতিশয্যে তিনি যেন তাঁহার পুত্র ও পুত্রবধূকে শ্রীহট্টে রাখিবার জন্য জেদ না করেন।

ধর্ম্মশীলা মহীয়সী মহিলা এই স্বপ্নদর্শনের পর মনের সকল দ্বন্দ্ব জয় করিয়া স্থির করিয়াছিলেন, পুত্রকে নবদ্বীপে অবশ্যই ফিরাইয়া পাঠাইবেন।

অদূরে দাঁড়াইয়া শচীদেবী মাতা ও পুত্রের আলোচনা শুনিতেছিলেন। নবদ্বীপে আবার যাইতে হইবে; এক অননুভূত আনন্দরসে তাঁহার চিত্ত উদ্বেল হইয়া উঠিল। কয়েক মাস হইতে তিনিও অনুভব করিতেছিলেন, আবার তিনি সন্তান-জননী হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন।

কিন্তু এবার ক্লান্তির পরিবর্ত্তে তাঁহার শরীরে অননুভূত পুলক সঞ্চারে তিনি সদাই যেন উল্লসিত। যাত্রার আয়োজন হইল। তখন শ্রীহট্ট হইতে নবদ্বীপে আসিতে দীর্ঘ সময় লাগিত। প্রধানতঃ নদীপথেই যাত্রিগণকে নৌকাযোগে যাতায়াত করিতে হইত। দশহরা গঙ্গাস্নান উপলক্ষে বহু যাত্রী নবদ্বীপে যাইতেছিলেন। মিশ্র মহাশয়ও দশহরার দিন সপরিবারে নবদ্বীপের বাড়ীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

১৪০৬ শক—৮৯১ সালের মাঘ মাসে শ্রীচৈতন্যদেব গর্ভাবাসে প্রবেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু ১০ মাস ১০ দিন অতীত হইল, আবার মাঘ মাস ফিরিয়া আসিল, তথাপি তাঁহার ধরাধামে অবতীর্ণ হইবার কোন লক্ষণ নাই দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইলেন।

মিশ্র মহাশয় প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদের গণনায় জানিতে পারিলেন, শচী মাতার গর্ভে কোন মহাপুরুষ আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। সকল প্রকার শুভক্ষণের সংযোগ না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি ভূমিষ্ঠ হইবেন না।

শচী দেবীর পিতা নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী, জগন্নাথ মিশ্র এবং আত্মীয়-স্বজন জ্যোতিষীর গণনার কথা শুনিয়া আশ্বস্ত হইলেন এবং পরমানন্দ লাভ করিলেন। সকলে আগ্রহ-সহকারে ফাল্গুনী পূর্ণিমার প্রতীক্ষায় রহিলেন। জ্যোতিষীর নির্দ্দেশমতে ঐ দিন মহাপুরুষের শুভ আবির্ভাব সম্ভব হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছিল।

আবির্ভাব

ফাল্গুনী পূর্ণিমার সন্ধ্যা। নির্ম্মল আকাশে জ্যোৎস্নার প্লাবন বহিয়া চলিয়াছিল। নব বসন্তপবনে জগন্নাথ মিশ্রের নিম গাছের পাতা শিহরিয়া উঠিতেছিল। দিকে দিকে যেন এক অজানা আনন্দের হিল্লোল বহিয়া চলিয়াছে।

নিম গাছের তলায় সূতিকা-গৃহ। আসন্নপ্রসবা শচীমাতা সেই কুটীরে শায়িতা। এক অপূর্ব্ব আলোক-দীপ্তি দেখিয়া, প্রসব-বেদনার পরিবর্ত্তে তিনি এক অনুপম আনন্দের আবেশ অনুভব করিতেছিলেন।

প্রাঙ্গণ-তলে বহু লোক আসিয়া ভিড় করিয়াছে। আজ জগন্নাথ মিশ্রের কুটীরে, মহাপুরুষ জন্ম পরিগ্রহ করিবেন, এ কথা জ্যোতিষীর গণনায় নবদ্বীপে রাষ্ট্র হইয়াছিল।

১৪০৭ শক—৮৯২ সালের পৌর্ণমাসী সন্ধ্যায়, সিংহ-রাশিতে পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্রে মহাপুরুষের আবির্ভাব হইবে—এই ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়া জগন্নাথ মিশ্রের আত্মীয়স্বজন সকলেই কুটীর-প্রাঙ্গণে জটলা করিতেছিলেন।

উৎকণ্ঠিতচিত্তে জগন্নাথ মিশ্র ধাত্রীর নিকট হইতে সংবাদ জানিবার প্রতীক্ষায় ছিলেন। সহসা শুভ শঙ্খধ্বনি সাত বার শোনা গেল। অমনই সমবেত জনগণের কণ্ঠ হইতে আনন্দধ্বনি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

তিনি আসিয়াছেন যাঁহার প্রতীক্ষায় ত্রয়োদশ মাস সকলে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছিল, তিনি মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন।

কিন্তু ধাত্রী নবজাত শিশুটিকে দেখিয়া আশঙ্কায় চীৎকার করিয়া উঠিল। দীর্ঘকালের প্রতীক্ষার পর, ত্রয়োদশ মাসে যে শিশু পৃথিবীর বুকে দেখা দিলেন, তাঁহার দেহে জীবনের স্পন্দনমাত্র নাই কেন?

ধাত্রীর চীৎকারে আকৃষ্ট হইয়া অন্যান্য পুরনারীরা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। নানা প্রকার প্রক্রিয়া চলিতে লাগিল। সকলেরই আননে গভীর উৎকণ্ঠা ও আশঙ্কার রেখা।

কিয়ৎকাল পরে শিশুর নিশ্বাস পড়িতে লাগিল। জীবনের লক্ষণ ফিরিয়া আসিল। তখন আবার আনন্দের রোল উঠিল। কোন কোন বিষ্ণুভক্ত আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

শিশুর বর্ণ কাঁচা সোণার ন্যায় দেখিয়া সকলে মুগ্ধ হইলেন। কুটীর যেন আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে।

সে দিন গ্রহণ—দলে দলে স্নানার্থীরা গঙ্গার অভিমুখে যাইতেছিলেন।

এই আবির্ভাব উপলক্ষে শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে ভক্তির উচ্ছ্বাস লহরিত হইয়াছে:—

"অনন্ত ব্রহ্মা শিব, আদি করি যত দেব,
সভেই নররূপ ধরি রে।
গায়েন হরি হরি, গ্রহণ ছল করি,
লখিতে কেহ নাহি পারে রে॥
দশদিগে ধায়, লোক নদীয়ায়,
বলিয়া উচ্চ হরি হরি রে।
মানুষ দেবে মেলি, এক ঠাঁঞি কেলি,
আনন্দে নবদ্বীপ পূরি রে॥
শচীর অঙ্গনে সকল দেবগণে,
প্রণাম হইয়া পড়িল রে।
গ্রহণ অন্ধকারে, লখিতে কেহ নারে,
দুর্জ্ঞেয় চৈতন্যের খেলা রে॥"

গ্রহণের কবলে পূর্ণিমার চাঁদ অস্তমিত হইল। চারিদিক্ ঘনান্ধকারে আচ্ছন্ন। সঙ্কীর্ত্তনরোলে নবদ্বীপ মুখরিত, হরি-ধ্বনি উচ্ছ্বসিত। এই শুভক্ষণে জগন্নাথ মিশ্রের শশধর-প্রতিম পুত্ররত্ন ভূমিষ্ঠ হইলেন।

শচী দেবীর পিতা নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী মহাশয় দৌহিত্রের জন্ম হইবার পরই শিশুর জন্মপত্রিকা প্রস্তুত করিবার জন্য দৈবজ্ঞকে আহ্বান করিলেন। জ্যোতির্ব্বিদ্ লগ্নফল গণনা করিয়া যাহা বলিলেন, তাহাতে সমবেত সকলেই বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। বিপ্র কহিলেন—

"লগ্নে যত দেখি এই বালক-মহিমা।
রাজা হেন বাক্যে তাঁরে দিতে নারি সীমা॥
*   *   *   *   *
বিপ্র বোলে, এ শিশু সাক্ষাৎ নারায়ণ।
ইহা হইতে সর্ব্ব-ধর্ম্ম হইবে স্থাপন।"

জগন্নাথ মিশ্র পুত্রের ভাগ্যফল শুনিয়া আনন্দে অধীর হইয়া উঠিলেন।

আত্মীয়-স্বজন যে শুনিল, সেই নবজাত শিশুকে দেখিবার জন্য আগ্রহে অধীর হইয়া উঠিল।

জ্যোতিষী শিশুর নাম রাখিলেন—শ্রীবিশ্বম্ভর।

শচী দেবী পুত্রকে কোলে করিয়া বসিলেন। তাঁহার মনে হইল, ক্ষুদ্র কুটীর যেন অপূর্ব্ব আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। যেন কত সুরদেবীর চরণধ্বনি কক্ষতলে ধ্বনিত হইতেছে। নূপুর, কিঙ্কিণীর মধুর ঝঙ্কার যেন লোকাতীত জগতের বার্ত্তা বহন করিয়া আনিতেছে। শচী দেবী নির্নিমেষ-লোচনে নবদ্বীপচন্দ্রের সুষমাবিভাসিত আননে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া সম্মোহিত হইলেন।

[ক্রমশঃ

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

কামনা

ওগো ও মানুষ স্বপন-সৌধ গ'ড়ে চল অবিরল
কারু-কার্য্যের গৌরবভরা হীরামণি ঝলমল;
ছুটে চলে তব রথ-কল্পনা আকাশের গায় গায়
স্বণ-তুলির রাঙা আল্পনা কুটীরে বুলানো যায়;
চিহ্ন রাখে না তার
সহসা নিমিষে ঝঞ্ঝা রুদ্র ভেঙ্গে করে চুরমার।

প্রবাল-দ্বীপের হাস্য-সুষমা পরাণেতে যায় ভাসি
পর্ণ কুটীর আঙিনায় জ্বাল বাসনার দীপরাশি;
তিক্ত নিমের মিঠা সৌরভে গাঁথ কামনার হার
কোথা তা' ভাসায় তোমার আঁখির অশ্রুর পারাবার!
রচিবে স্বর্গ-ভূমি
ভুলে কেন যাও খেলনার সম অতি অসহায় তুমি?

আমি যে ক্ষুদ্র নর
তৃপ্ত যে তাই রিক্ত বীথির শুনি শুধু মর্ম্মর।
ক্যালিফোর্ণিয়া ভুলেও চাহি না নিমিষের তরে তাই
বুলবুলি আর পাপিয়ার মাঝে নিজেরে মিশাতে চাই।
জ্যোছনায় ঝরে যে ব্যথা বেদনা হর্ষ উথলে তায়
দীনহীন নর—তাই মোর মন গুল্ম তৃণই চায়।

শ্রীসত্যনারায়ণ দাশ (বি-এ)।

বাঙলার মেয়ে

[গল্প]

শশধর সান্যাল জজীয়তি করেন। সারা-জীবন খাটিতেছেন—কখনো ছুটী লন নাই। পাবনায় থাকিতে ছোট ছেলে ভানুর হইল অসুখ। ঘুনঘুসে জর। দু'দিন ভালো থাকে; আবার জর হয়। এ-জ্বর কিছুতে ছাড়িতে চায় না! ঔষধ-পথ্যে হার মানিয়া ডাক্তাররা পরামর্শ দিলেন,—ছুটী লইয়া ছেলেকে সঙ্গে করিয়া কোনো পাহাড়ের উপরে চড়িয়া দু'মাস থাকুন, না হয় জাহাজে চড়িয়া সাগরের বুকে···

গৃহিণী মধুমতী বলিলেন,—ছুটী নাও গো···নিয়ে দেশে চলো। জাহাজে চড়ে লঙ্কা ঘুরতে হবে না—পাহাড়ে চড়বারও দরকার নেই! ভালো দেখে একখানা বজরা নিয়ে বাঙলা দেশেই ছেলেকে নিয়ে ঘুরবো। এক জায়গায় থাকা নয়, পাঁচ জায়গায় ঘোরা—তাতে ওর দেহ-মন ভালো হয়ে উঠবে'খন।

মুন্সেফী এবং জজীয়তি করিতে করিতে শশধরের স্বভাব হইয়াছে কুণো-রকমের। আইনের কেতাব-পত্র এবং নাথ ঘাঁটিয়া জীবন কাটাইতেছেন পাঁচ জনের সঙ্গে মেলামেশার অবকাশ কোথায়? বজরায় চড়িয়া ঘোরা-ফেরার কথায় বুকখানা ধড়াশ্ করিয়া উঠিল! কোথায় কখন থাকা—খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা কি হইবে—তার উপর রোগের একটা ধাক্কা লাগিলে কি যে করিবেন···

মধুমতী কহিলেন—দুশ্চিন্তার কারণ নেই। এখন ফাগুন মাস। এ সময়ে রোগ-বালাই বা ম্যালেরিয়ার ভয় নেই। তা ছাড়া সেজো-মামার একবার খুব অসুখ করে, কিছুতে সারতে চায় না—আমার বয়স তখন সাত বছর; দাদামশাই সেজো-মামাকে নিয়ে, আমাদের নিয়ে বজরায় বেরিয়েছিলেন। বজরায় আমরা ছিলুম প্রায় চার মাস। সেজো-মামার শরীর পনেরো-দিনে সেরে গেল। তার পরে দেহ যা হলো···দেখেচো তো সেজো-মামাকে··· সেই বজরায় বেড়ানোর পর থেকে সেজো-মামাকে কে যেন ভেঙ্গে গড়লে!···

চাকরির কল্যাণে শশধর বাবু নিজের উপরে নির্ভর রাখিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। কাছারিতে পেশ্কারের হাতে নিজেকে সঁপিয়া দেন; আর গৃহে আছেন গৃহিণী মধুমতী। দু'জনের ঠেলা খাইয়া জীবনের পথে এতখানি অগ্রসর হইয়া আসিয়াছেন! গৃহ এবং কাছারি—দু'জায়গার কোনোখানে কোনোদিন কলরব উঠিলে অসহায় বালকের মতো এই দু'জন অভিভাবকের মুখ চাহিয়াই আপদঃ শান্তি করে! কাজেই এ ক্ষেত্রে ভাবিয়া-চিন্তিয়া উপায় না পাইয়া শ্রীমতী মধুমতী দেবীর হাতে আত্মসমর্পণ করিয়া তিনি নিশ্বাস ফেলিলেন।

লোক দিয়া মধুমতী বজরার ব্যবস্থা করিলেন এবং ভালো দিন-ক্ষণ দেখাইয়া এক মাসের মতো চাল-ডাল-পথ্য, বামুন-চাকর ও এক জন দাসী লইয়া স্বামী-পুত্রসহ বাগবাজারের ঘাটে বজরায় চাপিয়া বসিলেন।

বড় ছেলে গোবিন্দ সদ্য ল' পাশ করিয়া হাইকোর্টে বাহির হইতেছে। বাপের খাতিরে এক বড় উকিল তাকে ল্যাংবোট করিয়া পিছনে বাঁধিয়াছেন; মেজো ছেলে সুধা-মাধব পড়ে মেডিকেল কলেজে ফোর্থ ইয়ারে। তারা রহিল গৃহে। বড় মেয়ে সুহাসিনী, ছোট মেয়ে সুভাষিণী—দু'জনেরই বিবাহ হইয়া গিয়াছে; তারা আছে শ্বশুর-বাড়ী। তাদের সাধ, বজরায় চড়িয়া বেড়াইতে যায়। কিন্তু ওদিক্ হইতে দুই বেয়াই-ই বৌ ছাড়িয়া দিতে রাজী হইলেন

না,—কাজেই পারিবারিক দলটি তেমন পরিপুষ্ট হইতে পারিল না।

বজরা চলিয়াছে…

বাঙলা দেশের গ্রাম-নগরের গা ছুঁইয়া…দুই তীরে ছায়া-ছবির বিচিত্র দৃশ্য ভেদ করিয়া!

এক মাস কাটিয়া গেছে। ছানুর জ্বর গেছে ছাড়িয়া—সে সারিয়া উঠিতেছে। তার সম্বন্ধে গৃহিণীর মনে আর এতটুকু দুশ্চিন্তা নাই।

সে দিন দুপুর-বেলায় ত্রিবেণীর কাছে একটা খালে বজরা ঢুকিল। চওড়া খাল। মধুমতী কহিলেন,—এক মাস আর বাকী,—চলো, এবারে এই সব খালে-বিলে বজরা নিয়ে ঢোকা যাক্! দেশ দেখবো।

মাঝিরা বলিল,—শীতকালে খালে তেমন জল থাকে না, মাঠাকরুণ। শেষে বজরা যদি চড়ায় লেগে আটকে যায়!

মাঠাকরুণ বলিলেন—চড়া দেখলে এগুবে কেন? যত দূর চড়া না পাও, যেতে দোষ নেই!

কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম! বজরা খালে ঢুকিল।

সন্ধ্যার পরে রাত্রি। মাথার উপরে আকাশ-ভরা জ্যোৎস্না। খালের উভয়-তীরে নীচু পাড়। বজরার ছাদে ডেকচেয়ারে বসিয়া মধুমতী দেখিতেছিলেন উভয় তীরে বিস্তীর্ণ মুক্ত প্রান্তর। কোথায় বুঝি বনফুল ফুটিয়াছে! বাতাসে সে-ফুলের গন্ধ-মাধুরী…দূরে অস্পষ্ট তরুকুঞ্জের ফাঁকে-ফাঁকে জোনাকির মতো আলোর ঝিকিমিকি…সে আলোয় লোকালয়ের আভাস! চমৎকার লাগিতেছিল! ছেলেবেলার যত স্মৃতি মনের কোণে নিতান্ত অনাদরে-অবহেলায় পড়িয়া ছিল, সেগুলা এ জ্যোৎস্নায়, এ পুষ্প-গন্ধে প্রাণ পাইয়া মনকে বিহ্বল-বিমুগ্ধ করিয়া দিল!…

শশধর বসিয়াছিলেন পাশে একটা ডেকচেয়ারে,… দু' চোখ মুদ্রিত করিয়া তিনি ভাবিতেছিলেন, কি একঘেয়ে জীবন! এ ক'টা দিনে কতগুলো মামলা ফয়শালা করিয়া ফেলিতেন! তার উপরে সেই দু'দুটো ভারী পার্টিশনের মামলা…উভয়-পক্ষের উকিলে মিলিয়া নিত্য দরখাস্ত গুঁজিয়া কি হায়রাণ না করিত! এক মাস সে কলরব নাই, কোলাহল নাই…তবু প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিতেছে! ভয় হয়, এক মাস কাজ ফেলিয়া ছুটী…দিন যেন কাটিতে চায় না! ইহার পরে পেন্সন হইলে কি লইয়া দিন কাটাইবেন? ছেলে ছানু ছাদের উপরে ছোট সতরঞ্চ বিছাইয়া ব্যাগাটেলে ঘুঁটি মারিতেছে!…

হঠাৎ বজরা গেল থামিয়া। মাঝিরা লগি ঠেলিয়া, গুণ টানিয়া হিমসিম খাইয়া গেল, বজরা তবু নড়ে না!

শশধরের চেতনা হইল। তিনি কহিলেন—কি হলো, পীতাম্বর?

মাঝি পীতাম্বর কহিল—এজ্ঞে, চড়ায় লেগেছে।

চড়া! শশধর শিহরিয়া উঠিলেন, কহিলেন, উপায়?

পীতাম্বর কহিল—এজ্ঞে, পুরো জোয়ার এলে তবে যদি উপায় হয়…

শশধর বলিলেন- জোয়ার কখন আসবে?

পীতাম্বর বলিল—জোয়ার আসবে সেই রাত দুটোয়। পুরো-জোয়ার হতে যাকে বলে সেই ভোর ছ'টা।

শশধর একটা নিশ্বাস ফেলিলেন। এই বিজন প্রান্তরের বুকে বাস…এখানে সারা রাত বসিয়া থাকা! ছেলেবেলায় পিশিমার কাছে গল্প শুনিয়াছিলেন, বজরায় ডাকাত পড়িত। …হয়তো এমনি জায়গাতেই…আশ্চর্য্য নয়!

সে কথা মনে পড়িল। বুকখানা ধড়াস্ করিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন—এখানে গাঁ আছে?

পীতাম্বর কহিল—এজ্ঞে, এপারে ধবলগা…আর ওপারে তিন-আঁঠি।

তিন আঁঠি? মধুমতীর চমক ভাঙ্গিল। স্মৃতির কল্পলোক হইতে মধুমতী নামিয়া আসিলেন বাহিরে বাস্তবের মর্ত্ত্যালোকে!

কহিলেন—কোন্দিকে তিন-আঁঠি, পীতাম্বর?

—এজ্ঞে, এই বাঁয়ের ডাঙ্গা।

মধুমতী কহিলেন—তিন-আঁঠি মানে? হুগলি জেলার তিন-আঁঠি গ্রাম?

মাঝি বলিল,—এজ্ঞে, মাঠাকরুণ…

মনের পুরীতে সহসা যেন জোয়ারের প্লাবন! মধুমতী কহিলেন—ওগো…

ওগো একটা নিশ্বাস ফেলিয়া মধুমতীর পানে চাহিলেন নিরুপায় দৃষ্টি!

মধুমতী কহিলেন—তোমার মনে পড়ে? শৈল···মানে, আমার ছেলেবেলার বন্ধু শৈল গো! নাম শুনেছো আমার কাছে। সে থাকে এই তিন-খাঁঠিতে। মাঝে মাঝে আমাকে চিঠি লেখে; আমিও তাকে চিঠি লিখি।···দুজনে একদিন কি ভাবই ছিল···কেউ কাউকে না দেখলে থাকতে পারতুম না!·· তার বিয়ে হয় আমার বিয়ের আগে। বর তখন বি-এ পড়ে···নাম শশী মিত্তির। বিয়ের পরে শৈল সেই যে শ্বশুর-বাড়ী এলো—আর দেখা হয়নি। সে কি আজকের কথা!···চব্বিশ বছর কেটে গেছে। শৈলর বিয়ের পরের বছরে আমার বিয়ে হলো। শৈল প্রায় চিঠি লিখতো···আমার বিয়েতে আসতে পারলে না বলে চিঠিতে কি দুঃখই না জানিয়েছিল···

মধুমতী নিশ্বাস ফেলিলেন।

পাশের দুই তীরের ঝোপে ঝাপে ঝিল্লীর অবিরাম ঝঙ্কার। আর কোনো শব্দ নাই। তীর, প্রান্তর, দূরের ঐ বনরেখা, লোকালয়ে আলোর ঝিকিমিকি···সব যেন মধুমতীর বাল্যস্মৃতির বেদনায় আর্দ্র আতুরের মতো নীরব, ম্লান···

মধুমতীর পানে শশধর তেমনি অবিচল দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন।

মধুমতী কহিলেন—তোমাদের বজরা তো এখন চলবে না! নেমে আমি একবার শৈলর সঙ্গে দেখা করে আসি।

শশধর যেন আকাশ হইতে পড়িলেন! বাল্যসখীর প্রসঙ্গ শেষে এ-সঙ্কল্পে আসিয়া দাঁড়াইবে, তাহা ছিল শশধরের স্বপ্নের অগোচর!

তিনি কোনো কথা কহিলেন না,—বিস্ময়ে তাঁর দুই চোখের দৃষ্টি আর-একটু বিস্ফারিত হইল।

মধুমতী কহিল,—কার সঙ্গে যাবো বলো তো? পীতাম্বরকে সঙ্গে নি।

মধুমতী ডেকচেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

কাছারিতে জজের আসনে বসিয়া তেজী-উকিলের আইনের আস্ফালন শুনিয়াও শশধর সান্যাল কখনো এমন চকিত হন নাই! তিনি কহিলেন—পাগল হয়েছো! এখন কোথায় যাবে এই রাত্তিরে?

মধুমতী কহিল—কতই বা রাত্তির!···

শশধর কহিলেন—তাহলেও বলা নেই, কওয়া নেই, যার-তার বাড়ীতে অযাচিত-ভাবে এ সময়ে গিয়ে ওঠা···

মধুমতী কহিল—শৈলর বাড়ী যাবো, তাতে আবার লৌকিকতা কিসের!···তুমি জানো না, শৈলর সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি! রাত দুটোয় গিয়ে যদি তার বাড়ীতে উঠি, তাতেও এসে যাবে না। সে খুশী হবে। এখনো যে রকম চিঠি লেখে আমায়···তুমি তো সে চিঠি পড়োনি!

শশধর কহিলেন—না, না···মান-ইজ্জত আছে··· পাড়াগাঁ! তাছাড়া তার বাড়ীতে অন্য আরো পাঁচটা লোকজন আছে···তারা ভাববে কি?

মধুমতী কহিলেন—শৈলর কাছে আমার মান ইজ্জত বলে কিছু নেই গো। ও তুমি বুঝবে না। জজের স্ত্রী হলেও তার কাছে চিরদিনই আমি মধুমতী—সে ও আমার কাছে শৈল!

শশধর দেখিলেন গৃহিণীর চকিতের বাসনা একেবারে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞার মতো কঠিন দুর্জ্জয় হইয়া উঠিতেছে! তবু তিনি আশা ছাড়িলেন না, বলিলেন কথা শোনো ···বুঝলে?

মধুমতী কহিলেন—না,···এখানে ওর বাড়ীর এত-কাছে এসে ওকে না দেখে চলে যাবো! ওর কাছে এর পরে মুখ দেখাবো কি বলে? মুখ দেখানো নয়—মানে, এর পরে ওকে যখন চিঠি লিখবো, তখন কি জবাব দেবো, বলতে পারো? পাবনা থেকে আসবার মুখে তাকে চিঠির জবাব দিয়ে এসেছি। লিখেছিলুম—ডাক্তার জন্যে কোথাও বেড়াতে বেরুবো···উনি ছুটীর দরখাস্ত করেছেন···সে-ছুটী মঞ্জুর হলে। তাই ছোট চিঠি লিখছি। পরে বড় চিঠি দেবো··· ঠিকানা দেবো।···এত কথা লিখেছিলুম গো···এখন দৈবাৎ ওর বাড়ীর কাছে এত দিন পরে এসে ওর সঙ্গে দেখা না করে যদি চলে যাই, তাহলে ওর অভিমান যা হবে···! ও ভারী অভিমানী···হয়তো কাঁদবে···সত্যি কাঁদবে। তুমি ওকে জানো না, আমি জানি।

শশধর বলিলেন—কিন্তু তোমার শৈল জানবে কি করে' যে তুমি এখানে এসেছিলে? এ কথা তাকে তুমি নাই লিখলে!

মধুমতীর মন কোনো কথায় ভুলিল না; শৈলর সঙ্গে দেখা করিবার বাসনায় অধীর উদগ্র হইয়া উঠিল।

মধুমতী কহিলেন—তোমার কোনো ভয় নেই। দিব্যি জ্যোৎস্না রাত।…শেয়াল-কুকুরের ভয় করছো? বেশ, না হয় পীতাম্বর একটা লণ্ঠন আর লাঠি নিয়ে সঙ্গে যাবে।

শশধর বলিলেন—কিন্তু কত-বড় গ্রাম…কতদূরে তার বাড়ী…সারা রাত কোথায় ঘুরবে?

মধুমতী কহিল—না হয় একটু ঘুরলুমই! চুপ করে বজরায় বসে থাকতুম…এ তবু একটা দেশ দেখা হবে।

মধুমতী হাসিলেন। শশধরের বুকে সে-হাসি বিঁধিল অগ্নি-শিখার মতো! তিনি কহিলেন—একে দেশ দেখা বলে না। শেষে শেয়াল-কুকুরে তাড়া করুক!…কিম্বা এই সব নদীর ধারে ঝোপে-ঝাপে সাপ থাকে, তা জানো? শীতকাল নয় যে পথে সাপের ভয় থাকবে না।

তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া মধুমতী বলিলেন—এ দেশে শুধু সাপ থাকে, মানুষ থাকে না, বলতে চাও?

এ কথার পর মধুমতী ডাকিলেন—পীতাম্বর…

বজরায় বাঁধা ছোট নৌকোয় বসিয়া পীতাম্বর তামাক খাইতেছিল, বলিল—মাঠাকরুণ…

মধুমতী কহিলেন—আমার সঙ্গে একবার এসো তো বাবা…আমি একবার ঐ তিন-আঁঠিতে যাবো। এক জন আপনার লোক এ গাঁয়ে থাকেন, তাঁর সঙ্গে দেখা করে আসবো।

পীতাম্বর কহিল—চলুন, মাঠাকরুণ…

মধুমতী কহিলেন—একটা লাঠি আর একটা লণ্ঠন নাও। বাবু ভয় করছে, যদি শেয়াল-কুকুর থাকে…

পীতাম্বর লাঠি ও লণ্ঠন লইয়া প্রস্তুত হইল। একখানা মোটা চাদর গায়ে জড়াইয়া মধুমতী কহিলেন—এসো পীতাম্বর…

একবার তিনি চাহিলেন শশধরের পানে, কহিলেন,—তোমরা খেয়ে নিয়ো গো,—আমার জন্যে বসে থেকে রাত করো না…

বজরা হইতে মধুমতী তীরে নামিলেন। পীতাম্বর নামিল তাঁর সঙ্গে। তীরে ঝোপ-ঝাপের ফাঁকে-ফাঁকে পায়ে-চলা মেটে পথ…

পীতাম্বর কহিল—এই যে পথ আছে, মাঠাকরুণ……

বজরার ছাদ হইতে শশধর আর-একবার ডাকিলেন,—পীতাম্বর…

পীতাম্বর দাঁড়াইল। কহিল,—বাবু ডাকছেন, মাঠাকরুণ…

মধুমতী দাঁড়াইলেন…বজরার পানে চাহিলেন।

শশধর কহিলেন—তোমরা একটু দাঁড়াও গো। আমিও যাবো তোমাদের সঙ্গে।

পীতাম্বরকে মধুমতী বলিলেন—ওঁকে আসতে বারণ করো। বুড়ো-মানুষ…কষ্ট হবে!

পীতাম্বর কর্ত্রীর অভিপ্রায় জানাইল…শশধর কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়াইয়া রহিলেন……নিথর নিশ্চেতন!

পায়ে-চলা মেটে-পথ আঁকিয়া-বাঁকিয়া গ্রামে গিয়া ঢুকিয়াছে।

মাঠ, জলা, ভাঙ্গা পাচিল, উপুড়-করা দুখানা নৌকা পাশে রাখিয়া খানিকটা খোলা জায়গা। সেখানে মাটীর দেওয়ালে-ছাওয়া বড় মণ্ডপ; মাথায় ছাদ বা চাল নাই। এবং এ মণ্ডপের গায়ে ওদিকে পথ। চওড়া পথ।

পীতাম্বর কহিল—এইটে হাট, মাঠাকরুণ। আর এই পথ গাঁয়ে গেছে নিশ্চয়।

হাটের পরেই বিজন পথ…দুদিকে ঝোপ-ঝাপ…বন…জঙ্গল…

খানিকটা অগ্রসর হইয়া আসিয়া একটা মুদির দোকান। দোকানে তেলের আলো জ্বলিতেছে। আলোর সামনে বসিয়া মুদি দিনের কেনাবেচা মিলাইয়া খাতা লিখিতেছে…

পীতাম্বরকে ডাকিয়া মধুমতী বলিলেন—ওকে জিজ্ঞাসা করো তো, পীতাম্বর, এখানকার ইস্কুলের হেডমাষ্টার মশায়ের বাড়ী কোন্‌দিকে?

মুদিকে ডাকিয়া পীতাম্বর প্রশ্ন করিল। মুদি বলিল,—ও, শশীবাবুর বাড়ী খুঁজছেন?

মধুমতীই জবাব দিলেন, বলিলেন—হ্যাঁ।

মুদি বলিল—সিধে পথ ধরে চলে যান, মা। খানিকদূর গিয়ে পুলিশ-ফাঁড়ি। সেই ফাঁড়ির ডান দিকে একটা গলি বেঁকে গেছে। গলির মধ্যে খানিক গিয়ে দেখবেন, সামনে রোয়াকওয়ালা একতলা বাড়ী, একটা চাঁপা ফুলের গাছ আছে। সেইটে শশীবাবুর বাড়ী…

মধুমতী বুঝিয়া লইলেন। পীতাম্বর কোনো ঠিকানা করিতে পারিল না। মধুমতী বলিলেন—চলো, পীতাম্বর···

পীতাম্বর চলিল। আগে-আগে মধুমতী।

দূর হইতে বাতাসে বাজনার শব্দ ভাসিয়া আসিতেছিল। সঙ্গে সঙ্গে গানের রব। একসঙ্গে দশ-বারোজন মিলিয়া গান গাহিতেছে···

খানিক আসিয়া মিলিল ফাঁড়ি—এবং ফাঁড়ির ডান দিকে গলি।

মধুমতী কহিলেন—এই গলি, পীতাম্বর···

গলির একদিকে ঘেঁটু-বন। তীব্র কটু গন্ধে বাতাস ভারী হইয়া আছে···

গলির মধ্যে তু'পাশে ক'খানা গোলপাতার ঘর। পল্লী। মধুমতী বিস্মিত হইলেন, কতই বা রাত! ন'টা, সাড়ে ন'টা? ইহারি মধ্যে সকলে নিদ্রাগত! আশ্চর্য্যই বা কি? কি এখানে আছে? কি লইয়া মানুষ জাগিয়া থাকিবে? কাজকর্ম্ম শেষ হইয়াছে···এখন ঘুম।

দরিদ্র গ্রাম···আমোদ-প্রমোদ করিবে, এমন আয়োজনও নাই!

মধুমতীর বুকের মধ্যে সাগর উথলিয়া উঠিয়াছে··· আনন্দের সাগর। কি মজাই না হইবে! শৈল স্বপ্নে ভাবে নাই—চব্বিশ বৎসর পরে মধুমতী আসিবে তার দ্বারে!

শৈল কি করিতেছে? রান্নাবান্না? না। চিঠিতে লেখে···তুই ছেলে। তুটিই ডাগর হইয়াছে; কাছে থাকে না। বড়টি থাকে কলিকাতায়—মেকানিক্যাল এঞ্জিনীয়ারিং শিখিতেছে। ছোট থাকে বর্দ্ধমানে, সেখানকার কলেজে পড়ে···ফার্ষ্ট ইয়ার। ছুটীতে ছেলেরা কাছে আসে; নহিলে সে আর স্বামী শশী বাবু···তুটি প্রাণী এখানে বাস করে!···

চিন্তার মালা গাঁথিতে গাঁথিতে মধুমতী আসিলেন মুদিবর্ণিত সেই রোয়াকওয়ালা একতলা বাড়ীর সামনে। বাড়ীর গায়ে চাঁপা গাছ। গাছে ফুল ফুটিয়াছে। বাতাস সে ফুলের গন্ধে ভরিয়া আছে!

সদরের কপাট বন্ধ। রাস্তার দিকে একখানা ঘর। তারো দ্বার-জানলা বন্ধ। চারিদিক্ নিশুতি!···

ইহারি মধ্যে রান্নাবান্না খাওয়া-দাওয়া চুকাইয়া শুইয়া পড়িয়াছে? কিম্বা হয়তো শশী বাবু এগজামিনের খাতা দেখিতেছেন···অথবা ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন! আর শৈল বসিয়া মধুমতীকেই চিঠি লিখিতেছে!

যদি তাই হয়? আঃ! চমকাইয়া দিবেন শৈলকে! বলিবেন, চিঠিতে খবরের স্বর সহিল না রে···আমি নিজে আসিয়াছি তোর খপর লইতে! তুই তো কোনোদিন গিয়া দেখিয়া আসিবার নাম করিস্ না!

সঙ্গে সঙ্গে বুকখানা ধড়াস করিয়া উঠিল···যদি চিনিতে না পারে? চব্বিশ বৎসর আগে মধুমতী ছিলেন মাধুরীশ্রীমণ্ডিতা কিশোরী! যৌবনের সে নিটোল দেহবল্লরী আজ মেদে-মাংসে ভরিয়া···

শৈলকে তিনি চিনিতে পারিবেন তো? খুব পারিবেন। শৈলকে ভোলা যায় না! তার সেই হাসি···হাসির রেখা অধরে ফুটিবামাত্র তুই গালে সেই তুটি টোল···তার সেই কুঞ্চিত কেশের রাশি···

বয়সে যতই বদলাক্, সে-মুখের ছাঁদ কোনোকালে বদলাইবার নয়! রূপে জৌলুশ নাই, শ্যামাঙ্গিনী শৈল। তবু তার পানে চাহিলে চোখ সহজে ফিরিতে চাহিত না···

হঠাৎ খেয়াল হইল, বাড়ীর দ্বারে পুতুলের মতো এমনি দাঁড়াইয়া থাকিবেন?

মৃদু-হাসি-মুখে মধুমতী দ্বারের কড়া ধরিয়া নাড়িলেন।

সাড়া নাই···

আবার কড়া নাড়িলেন। আবার···আবার···আবার···

মৃদু স্বরে ডাকিলেন—শৈল···

নিঃশব্দে দ্বার খুলিয়া সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন প্রৌঢ় এক ভদ্রলোক। তাঁর মাথার সামনের দিক্ জুড়িয়া মস্ত টাক···মোটা গোঁফ···স্থূল বর্ত্তুল দেহ···

ইনিই শশী বাবু? চব্বিশ বৎসর পূর্ব্বে শৈলর বরের বেশে ইঁহাকে দেখিয়াছিলেন?···চব্বিশ বৎসরে মানুষের চেহারা এমন করিয়া বদলাইয়া যায়?···কৈ, শশধরের চেহারায় তো কোনো পরিবর্ত্তন হয় নাই! তখন যেমন ছিলেন, এখনো প্রায় তেমনি! দেখিলে কেহ চিনিতে পারিবে না—এমন নয়। আর শশী বাবু? কে বলিবে, চব্বিশ বৎসর পূর্ব্বে ইনিই বর সাজিয়া শৈলকে বিবাহ করিতে গিয়াছিলেন?

চকিতের দ্বিধা!···কথা কহিবেন?

নিশ্চয় কহিবেন ! শৈলর স্বামী···

মধুমতী কহিলেন—আপনিই শশীবাবু ?

বিস্ময়-ভরা দৃষ্টিতে মধুমতীর পানে চাহিয়া তাঁকে আপাদ-মস্তক লক্ষ্য করিয়া ভদ্রলোক কহিলেন,—হাঁ···

মধুমতী কহিলেন আমায় চিনতে পারছেন না ? আশ্চর্য্য ! চান্ দিকিনি আমার পানে···মনে পড়ছে না ? আচ্ছা, বিয়ে করতে গিয়েছিলেন যখন, বাসর-ঘরে সেরাত্রে গান গেয়ে শুনিয়েছিল কে ? সেই গান

'আজ লো সজনি জোছনা-তরঙ্গে
রঙ্গে কুঞ্জে যাপিব দু'জনে···?

মধুমতীর অধরে দীপ্ত হাস্যরেখা···

শশী বাবুর অবিচল কঠিন দৃষ্টিতে সে হাস্যরেখা মুছিয়া গেল।

মধুমতী কহিলেন—খুব স্মরণশক্তি তো ! এই স্মরণশক্তি নিয়ে লেখা-বিদ্যা ছেলেদের বিতরণ করছেন কি করে ? আমার নাম মধুমতী···বুঝেছেন ? শৈলর বন্ধু···মনে পড়েছে ?

শুষ্ক বিরস কণ্ঠে শশী বাবু বলিলেন,—···হাঁ। আপনাকে আমার স্ত্রী চিঠি লেখেন না ? আপনার স্বামী সাবজজ ?

মধুমতী কহিলেন—হাঁ। কিন্তু শুধু শৈলই আমাকে চিঠি লেখে, তা নয় ; আমিও শৈলকে চিঠি লিখি।

শশী বাবু বলিলেন—জানি।

শশীর কণ্ঠের স্বরে বা চোখের দৃষ্টিতে আগ্রহ নাই, কৌতুহল নাই, প্রাণ নাই···কিছুই নাই !

মধুমতীর বুকে কে যেন মুগুর মারিল !···তবে কি শৈলর কোনো বিপদ ? কঠিন পীড়া ? তাহারি জন্য দুশ্চিন্তায় ভদ্রলোক এমন বিকল হইয়া আছেন ?

ভয়-কম্পিত বক্ষে মধুমতী প্রশ্ন করিলেন,—শৈল ভালো আছে ?

শুষ্ক উত্তর—আছে।

—ছেলেরা ?

পূর্ব্ববৎ নীরস-কণ্ঠে উত্তর—হাঁ।···

আর কোনো কথা নয় ! আসুন, বা বসুন···কিছু না ! আনন্দের পশরা ভরিয়া মধুমতী মনের নৌকা বাহিয়া দিয়াছিলেন প্রসাদ-পবনে ! সে নৌকা আসিয়া শশী বাবুর বে-দরদের এই কঠিন কঠোর পাহাড়ে ধাক্কা খাইয়া ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল ! অপ্রত্যাশিত এ সঙ্কটে তিনি ভাবিলেন, শৈলর দ্বারে আর্ত্ত চীৎকার তুলিয়া ডাকেন, শৈল···শৈ···আমি আসিয়াছি···মধুমতী !

কিন্তু বলিতে পারিলেন না। কোথায় যেন কি একটা··· হয়তো কৌতুক ! হয়তো রহস্য !···

আর একবার দেখি ভাবিয়া মধুমতী বলিলেন,—শৈল বাড়ী আছে তো ?

শশী বাবু বলিলেন—না···

বুকের উপর আবার সেই হাতুড়ির ঘা ! জিভটা কে যেন ভিতর-দিকে টানিয়া ধরিল···

মধুমতী কহিলেন—শৈল কোথায় গেছে ?

—যাত্রা শুনতে।

গম্ভীর স্বর···

—এইখানেই ?

আরো গম্ভীর স্বরে জবাব মিলিল,—হাঁ। ঐ পালপাড়াতে।···

কিসের জন্য এমন গাম্ভীর্য্য ?···স্বামি-স্ত্রীতে অভিমান কলহ হইয়াছে বুঝি ?

কিন্তু যত বড় কলহই হোক, তিনি আসিয়াছেন কৈশোর-সঙ্গিনী···নূতন মানুষ···এই প্রথম আসিয়াছেন···এত রাত্রে! যদি বিপদে পড়িয়া আসিয়া থাকেন ? মানুষ তো একটা প্রশ্ন করে ! অজানা-অচেনা হইলেও প্রশ্ন করে ! এখানে তা নয় ···মধুমতীর নাম জানেন, শৈলর সঙ্গে তাঁর কি সম্পর্ক তাও জানেন !···তবু এমন অবিচল নির্ব্বিকার ভাব ! এ-ভাবের অর্থ ?

ক্ষুব্ধ মন বার-বার খোঁচা দেয়, বলে,—চলো···আর কেন ?···দুই চরণ তবু চলিতে চায় না ! দুই চরণ বলে,—আর একটু থাকি ! আর একবার দেখি !

শৈল···সেই শৈলর গৃহে আসিয়াছেন !

উদ্গত নিশ্বাস সবলে চাপিয়া মধুমতী কহিলেন,—যাত্রা ভাঙ্গলে আসবে বুঝি ?

—হাঁ···

—যাত্রা ভাঙ্গবে কখন ?

—রাত চারটে···ভোর পাঁচটা···ছ'টা···আমি জানি না।

মধুমতীর আশ্চর্য্য ঠেকিতেছিল ! মনে হাজার চিন্তা ! শশী বাবুর মাথার ঠিক আছে তো ?···সহজ মানুষ এভাবে কথা কয় ?

আবার তিনি প্রশ্ন করিলেন—কার সঙ্গে যাত্রা শুনতে গেছে ?

গম্ভীর কণ্ঠে স্বর বাহির হইল কার সঙ্গে আবার ? পাড়ার যত সব হুজুগে মেয়ে···

ও···তাই অভিমান হইয়াছে ! মধুমতী মনে মনে হাসিলেন।

চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। বাহির হইতে বাড়ী-ঘর দেখিতেছিলেন···যতটুকু দেখা যায় !

ছাদের আলিসায় একখানা শাড়ী ঝুলিতেছে। ড়ুরে শাড়ী। এ শাড়ী পরিবার লোক এ বাড়ীতে···কে ?··· শৈল পরে ? এখনও এ বয়সে ড়ুরে-শাড়ী ?···যদি পরে, কি দোষ ? সিল্ক-জর্জ্জেটের সাত-রঙা শাড়ী পরায় যদি দোষ না হয়, সুতির ড়ুরের দোষ হইবে কেন ?···

উঠানে একটা নারিকেল গাছ ; মাথা তুলিয়াছে আকাশের দিকে। বাতাসে গাছের পাতা নড়িতেছে···সে শব্দে যেন ব্যথার আর্ত্ত রব !···

মধুমতী অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। পীতাম্বর বসিয়া আছে রোয়াকের উপর দুই পা ঝুলাইয়া। পাশে লাঠি পড়িয়া আছে ; পথের উপরে পায়ের কাছে হারিকেন লণ্ঠন···

মধুমতী নিশ্বাস ফেলিলেন, তার পর বলিলেন,—শৈল এলে দয়া করে তাকে বলবেন, তার ছেলেবেলার বন্ধু মধুমতী এসেছিল। এধারে এসেছিলুম। বজরায়। ঐ খালে। ভাঁটার জন্যে চড়ায় আমাদের বজরা আটকে গেছে। ভোরে পুরো-জোয়ার না পেলে বজরা চলবে না। বজরায় বসে শুনলুম, তিন-আঁঠি গ্রামের নীচে বজরা রয়েছে···তাই শুনে বজরা থেকে নেমে এখানে এসেছিলুম শৈলর সঙ্গে দেখা করতে। দয়া করে তাকে বলবেন।···বলবেন তো ? মনে থাকবে···নাম মধুমতী···তার ছেলেবেলার বন্ধু ?

শশীবাবু তেমনি অবিচল গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন,—বলবো ···দেখা না হওয়ার দরুণ তাঁর কষ্ট হবে···

তার পর একটা নিশ্বাস ফেলিলেন ; নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—যেমন গেছেন, বেশ হবে ! আমি বারণ করেছিলুম। যেমন যাওয়া ? যাত্রা কি একটা দেখবার জিনিষ ? হুঁঃ···

মধুমতীর বিস্ময় কাটিল না। বুকে ক্ষোভ-নৈরাশ্য ও বেদনার বোঝা···সে বোঝার উপরে বিস্ময়ের বোঝা চাপাইয়া মধুমতী ফিরিলেন···যে পথে আসিয়াছিলেন, সেই পথে।

মাথার উপর আকাশে তখন খণ্ড-খণ্ড মেঘ জমিয়া জ্যোৎস্নাকে ঢাকিয়া দিতেছে···

বাতাস বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কেমন একটা গুমট ভাব···

সারা পথ মধুমতীর মনে একটিমাত্র প্রশ্ন ! এই লোকটি শৈলর স্বামী ? কি করিয়া এ বনে শৈলর দিন কাটিতেছে, মধুমতী বুঝিলেন ; বুঝিয়া শিহরিয়া উঠিলেন।

মধুমতী বজরায় ফিরিলেন···

বজরার ছাদে ডেকচেয়ারে বসিয়া শশধর ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন···ছানু নীচের কামরায় ঘুমাইতেছে···

মধুমতী বাঁচিয়া গেলেন ! শশধর এখনি সহস্র প্রশ্ন তুলিতেন,—কি গো, বন্ধু কি বললে ? বন্ধুর স্বামীকে কেমন দেখলে ?

সে প্রশ্নের হাত হইতে বাঁচিয়া গিয়াছেন···নৈরাশ্যের বেদনায় যেন স্নিগ্ধ প্রলেপ পড়িল !···

মধুমতী গুম্ হইয়া বসিয়া রহিলেন। আকাশে মেঘের পর্দ্দা ছিঁড়িয়া চাঁদ ঐ আবার দেখা দিয়াছে। মেঘেরা কুণ্ডলী পাকাইয়া ওধারে প্রকাণ্ড দল বাঁধিতেছে···চাঁদকে এবার আরো বিক্রমে আক্রমণ করিবে···

বাতাস বন্ধ হইয়া গিয়াছিল ; আবার বহিতে সুরু করিয়াছে···

কিন্তু···এ-সবের দিকে মধুমতীর লক্ষ্য নাই ! তাঁর বুকের মধ্যে রাশি-রাশি মেঘ···বুকের যেখানে একটু জ্যোৎস্না, যেখানে একটু বাতাস···সেইখানেই সে-মেঘ কুণ্ডলী পাকাইয়া জমিয়া সে জ্যোৎস্না-ও-বাতাসকে চাপিয়া ধরিতেছে !···

হঠাৎ শশধরের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। শশধর বলিলেন— এই যে···কখন ফিরলে ?

নিশ্বাস চাপিয়া মধুমতী বলিলেন—অনেকক্ষণ।

—বন্ধু কি বললে?

প্রাণটা হা-হা-করিয়া উঠিল। এ বেদনা মধুমতী চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না…শুধু বলিলেন—সে বাড়ী নেই। যাত্রা শুনতে গেছে।…

—কে বললে?

—তার স্বামী…শশীবাবু নিজে।

শশধর হাসিলেন। হাকিম-মানুষ…চিরদিন সাক্ষীদের সন্দেহ করিয়াছেন। সে সন্দেহ দাঁড়াইয়াছে রোগে…এ রোগ কোথায় যাইবে? শশীবাবুকে তিনি সন্দেহ করিলেন, বলিলেন,—হুঁঃ, বাজে কথা!

বেদনার জায়গাটা কেহ মাড়াইয়া ধরিলে মানুষ যেমন আর্ত্ত চীৎকার তোলে, তেমনি আর্ত্ত ভাবে মধুমতী বলিলেন—তার মানে?

শশধরবাবু বলিলেন—মানে, এত রাত্রে কোথা থেকে বনের মধ্যে কুটুম এসে উপস্থিত! তার উপরে বলেছো, চড়ায় বজরা আটকেছে! ভদ্দর লোক ভাবলেন, হয়তো এক-পাল মানুষ-জন এসে ঘাড়ে চেপে বসবে, তাই…না হলে দরজা চেপে দাঁড়িয়ে মানুষ কারো সঙ্গে কথা কয় না…বিশেষ তুমি লেডি-লোক…এবং সে লেডিলোক ওঁর স্ত্রীর বাল্য-বন্ধু…

তাই? মধুমতীর বুকে চিন্তার দোলা…

শশধর বলিলেন—ভাবচো, এতে তোমার শৈলবতী দেবীর যোগ নেই? হুঁঃ!…চিঠিপত্রে অমন ঢের বন্ধুত্ব দেখানো চলে গো…কিন্তু প্রত্যক্ষ শরীর নিয়ে সে বন্ধু যদি রাতি-দুপুরে বাড়ীতে এসে উদয় হয়, তখন মনের সব সেন্টিমেন্ট যায় ঝরে! এ জীবনে মানব-চরিত্র সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা কম ভাবো, তুমি? তোমার কাছেই শুধু হার মেনেছি—নাহলে বলে, বিচার-কাজ করে আসছি সারা জীবন…আমার বিচারে ভুল পাবে না।

মধুমতীর মেজাজ ভালো ছিল না। শশীবাবুর উপরে যে-রাগ, সে-রাগ এতক্ষণে সমস্ত পুরুষ-জাতের উপরে ছড়াইয়া পড়িয়াছে…

মধুমতী বলিলেন—থামো! আর বিচারের ব্যাখ্যানা করো না! মাথার ওপরে তাই দু'দুটো আপীল-আদালত রয়েছে!

এ-কথায় শশধর চুপ করিলেন। তার উপরে ঘুম পাইয়াছিল খুব। হাসিয়া বলিলেন—বেশ, আমার এখানকার আপীল-আদালতের রায় মেনে বিচারে খতম!…কিন্তু এখানে বসে থেকো না। এই বন…তাও অজানা বন… চোর-ছ্যাঁচোড় যদি একটা আসে…সালঙ্কারা রমণী তাদের মুখে মস্ত টোপ্! গন্ধে গন্ধে ওরা টের পায়। বিচক্ষণ কি না এ বিদ্যায়। নীচের চলো…কথা শোনো।

মধুমতী নিশ্বাস ফেলিলেন। বুকের মধ্যটা হু হু করিতেছিল। খোলা আকাশের নীচে এ ভাব ঘুচিবার নয়। বলিলেন—চলো…

বিছানায় শয়নমাত্রে শশধরের নাসিকা গর্জ্জন তুলিল… মধুমতীর চোখে ঘুম নাই। মন আরো অধীর আকুল হইয়াছে। এত কাছে আসিয়া শৈলর সঙ্গে দেখা না করিয়া চলিয়া যাইবেন?…

কিন্তু বড় ভুল হইয়া গিয়াছে! শশীবাবুর অভদ্রতায় রাগ করিয়া বজরায় না ফিরিয়া যদি যাইতাম… যেখানে যাত্রা হইতেছে…সেইখানে! ডাকিয়া কাহাকেও যদি বলিতাম, একবার ডাকিয়া দাও তো গো ঐ শশী মাষ্টার মশায়ের স্ত্রীকে!…তাকে বলো গিয়া, মধুমতী আসিয়াছে!

কেন যে তখন এ বুদ্ধি মাথায় আসিল না…

এমনি চিন্তার পর চিন্তা…মুহূর্ত্ত বিরাম নাই। মনের মধ্যে যেন হাজার পাখী কাকলী তুলিয়া দিয়াছে…তাদের সে কাকলী-রবে প্রাণে অবধি তালা লাগিবার জো!…

ঐ না শোনা যায় বাজনার শব্দ? গানের রব? যাত্রার বাজনা…যাত্রার গান!…শৈল নিশ্চিন্ত-পুলকে ওখানে বসিয়া ঐ-যাত্রা শুনিতেছে! আর মধুমতী? এখানে শৈলকে স্মরণ করিয়া তাঁর মন মাথা খুঁড়িয়া মরিতেছে —শৈল তার কিছুই জানে না!

সেই সদাহাস্যমুখী শৈল! আর ঐ তার স্বামী? বুকের মধ্যে নিশ্বাস যেন বন্ধ হইয়া আসে…

তার পর করুণা করিয়া কখন্ দু'চোখে ঘুম আসিয়া বসিল…

বজরার কামরার দ্বারে করাঘাত-শব্দ…সঙ্গে সঙ্গে ডাক —মাঠাকরুণ…মাঠাকরুণ…

কে ডাকে ?

মধুমতীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি উৎকর্ণ রহিলেন! পাশে শশধরের নাসা সমানে গর্জ্জন তুলিয়াছে, যেন নিদ্রার বিজয়-গান গাহিতেছে!

ঐ আবার ডাকে—মাঠাকরুণ···মাঠাকরুণ···

পীতাম্বর।

কেন ডাকে ?

মধুমতী উঠিলেন। দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিলেন; কহিলেন—কেন পীতাম্বর ?

পীতাম্বর কহিল—একটি মা এসেছেন···জিজ্ঞেস্ছেন, জজ-সাহেবের বৌ আছেন এ বজরায় ?

পিস্তলের আওয়াজ করিয়া রঙ্গমঞ্চে যেন পট-পরিবর্ত্তন হইয়া গেল···বিভীষিকা-ভরা শ্মশানের দৃশ্য সরাইয়া চকিতে সেখানে পরীস্তান-প্রকাশ!

সে কি শৈল···?

পীতাম্বর কহিল—ডাঙ্গায় দাঁড়িয়ে আছে সে মাঠাকরুণ।

আকাশে মেঘের চিহ্ন নাই···! নির্ম্মল অনাবিল আকাশে জ্যোৎস্নার পরিপূর্ণ দীপ্তি!

সে জ্যোৎস্নায় মধুমতী দেখিলেন, অদূরে তীরে দাঁ[illegible] শৈল। বলিলেন—শৈল ? আয়··

ছুটিয়া গিয়া শৈলর হাত ধরিলেন। শৈলবতীও হাত চাপিয়া ধরিলেন···তার পর বুকে বুক দিয়া দুই সখী চক্ষু মুদিলেন।······

শৈলবতী বলিলেন—এ-কি সত্যি ? আমার ভাই, বিশ্বাস হচ্ছে না। যাদু-মায়া নয় তো ?

মধুমতী বলিলেন—চ' ভাই, ছাদে বসি। চেয়ার আছে···

শৈলবতী কহিলেন—কিন্তু না বলে, না কয়ে হঠাৎ এখানে এই রাত্রে ?

—হঠাৎই! ভগবান দু'জনের মনের আকুলতা বুঝেছিলেন! বোধ হয়, তাঁর প্রাণে মায়া হয়েছিল! ছানুকে নিয়ে একমাসের ওপর বজরায় ঘুরছি। হঠাৎ আজ সন্ধ্যার আগে কি খেয়াল হলো, মাঝিকে বললুম, গঙ্গায় ভেসে ভেসে মা-গঙ্গাকে আর ভালো লাগচে না, চলো ঐ খালে। তার পর ভগবান সদয় হলেন। চড়ায় বজরা আটকালো; ভোরের আগে বজরা চলবার উপায় নেই! মাঝিদের মুখে কথায়-কথায় শুনলুম, এপারের গাঁয়ের নাম তিন-আঁঠি। শুনে চমকে উঠলুম,···সঙ্গে সঙ্গে ছুটলুম শৈলবতীর মন্দিরে। তার পর···

শৈলবতী বলিলেন—ছেলে কেমন ? সেরেছে তো ?

মধুমতী কহিলেন—হ্যাঁ ভাই, ভালো আছে।

তার পর নিশ্বাস ফেলিয়া একটু আগে যাহা ঘটিয়াছিল, মধুমতী সে বৃত্তান্ত খুলিয়া বলিলেন···

শৈল নিঃশব্দে শুনিলেন; শুনিয়া হাসিলেন। মলিন মৃদু হাসি।

সে-হাসি মধুমতীর বুকে বাজিল বেদনার মতো। তিনি কহিলেন—তোর জন্যে দুঃখ হয় শৈ···সত্যি, এ বনে কি সুখে যে পড়ে আছিস্!

শৈল বলিলেন—কেন ভাই, আমি তো বেশ ভালোই আছি···

—ছেলে দুটি কাছে নেই···

—তাদের মানুষ করতে হবে তো। বুকে চেপে কাছে রাখলে তো চল্‌বে না, ভাই। এই যে তুই বেরিয়েছিস্ বজরায়···তুই ছেলে রয়েছে কলকাতায়। তাদের তো সঙ্গে নি[illegible] আস্‌তে পারিস নি···

শৈলর মুখের পানে চাহিয়াছিলেন মধুমতী। সেই শৈল। হাসি-গল্পে প্রাণটা চিরদিন যে একেবারে উৎসারিত করিয়া দেয়! রাখিয়া-ঢাকিয়া যে হাসিতে জানে-না, গল্প করিতে জানে না! যার হাসি-গল্পের কোনোখানে এতটুকু ছলনা নাই, নকল নাই, মলা-মাটা নাই!

মধুমতী ডাকিলেন—শৈ···

—কেন ?

—সত্যি কথা বল্‌বি ? ছেলেবেলায় যেমনি বলতিস্ ?

—কিসে তোর সন্দেহ হলো বল্ তো যে তোর কাছে মিথ্যা বলবো ? নিশ্চয়, সত্যি কথা বলবো।

—এ বনে কক্‌খনো তুই সুখে থাকতে পারিস না··· তোর মনে অনেক দুঃখ।

—ও মা···তুই যে অবাক করলি, মধু! কেন আমার দুঃখ হবে, বল্ তো ?···যদি বলিস্, ভালো দু'খানা গয়না নেই, শাড়ী নেই ? সত্যি ভাই সেজন্যে আমার এতটুকু

দুঃখ হয় না !···গয়না-শাড়ী মানুষ চায় পাঁচজনকে দেখাবে বলেই তো···তা এখানে আমার সে-বালাই নেই।···কাজেই দুঃখ কেন হবে বল্ ওজন্যে ?

একাগ্র মনোযোগে মধুমতী এ-কথা শুনিলেন ; নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—এই যে তুই কোথাও যেতে পাস্ না···

—যাবার জো নেই, ভাই, সত্যি। সেজন্য আগে একটু কষ্ট হতো। এখন সয়ে গেছে। তুই ভাবিস, কি করি এ বনালয়ে বসে···দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ধরে'?···সকালে উঠে ওঁর জন্যে চা তৈরী করি। তার পর ঘর ঝাঁট দি। বাসন-কোশন মাজতে হয় না, ঝী আছে। ঘরের কাজ সেরে রান্না-বান্না করি। তার পর খেয়ে-দেয়ে উনি যান ইস্কুলে···আমি চান-টান সেরে খেয়ে নি। দুপুরবেলায় পাড়ার দু'চারটি মেয়ে আসে। গরীব। তা হোক, বড় ভালো। তাদের সঙ্গে গল্প করে, সেলাই করে দিন কেটে যায়।··· সন্ধ্যায় রান্নাবান্না···তার পর উনি খাওয়া-দাওয়া করেন···

মধুমতী কহিলেন—ঐ শশী বাবুকে নিয়েই তোর সব কিছু !

সলজ্জ হাসির একটু আভা ! শৈলবতী কহিলেন,—একটু বাগান আছে বাড়ীর মধ্যে···বাগানের কাজ করি। আকাশে যখন মেঘ করে, বাড়ীর ছাদে গিয়ে উঠি। চেয়ে থাকি সেই মেঘের পানে। বৃষ্টি হলে ওধারের জানলা খুলে বসে বৃষ্টি দেখি···খুব-বেশী বৃষ্টি হলে ঘরে থাকতে পারি না ভাই, সে-বৃষ্টিতে বেরিয়ে খুব ভিজি···সেই ছেলেবেলার মতো···

বাধা দিয়া মধুমতী বলিলেন,—এই যে লোকালয়ের বাইরে পড়ে আছিস···লোকালয়ে যেতে ইচ্ছা করে না ?

একটা নিশ্বাস রোধ করিয়া শৈল বলিলেন,—ইচ্ছা হলেও যাবার উপায় নেই, মধু। ওঁকে ছেড়ে নড়তে পারি না···উনি নড়তে দেন না। সকালে উনি খপরের কাগজ পড়েন, কাছে বসে ওঁর কাগজ-পড়া শুনতে হয়। কোথায় কি হচ্ছে···আমায় বলেন। খপরের কাগজ পড়ে শোনান। ছেলেদের এগজামিনের খাতা দেখেন উনি, আমাকে পাশে বসে থাকতে হয়। খাতা পড়ে শোনান ···আমায় জিজ্ঞাসা করেন—আচ্ছা শুনলে তো, একে কত নম্বর দেওয়া যায় ? বলতেই হবে···না বললেই বাবুর রাগ ! তা'ও কি যা বলবো, সেই নম্বর দেবেন ? আমি যদি বলি—দশ নম্বরের মধ্যে আট দাও···তাতে তর্ক করেন, বলেন, কেন আট নম্বর দেবো ? ঐ ভুল—এই ভুল···না, পাঁচের বেশী নম্বর একে দেওয়া চলে না। এমনি···! কোথাও যাবো কি ভাই, গেলে উনি যেন পাগল হয়ে যান !···বলি, ছেলেরা ডাগর হয়েছে···এখনো এ পাগলামি করতে লজ্জা হয় না ? তাতে বলেন, ছেলে যেমন ছেলে, তেমনি স্বামী স্বামী এবং স্ত্রী স্ত্রী। বলেন, ছেলেরা ডাগর হয়েছে, হোক—আমরা তো তাদের সামনে বল-নাচ নাচছি না, বা একসঙ্গে প্রেমের ডুয়েট্-গান গাইছি না !···এ মানুষকে কি বলি, বল্ তো ভাই ?

মধুমতীর দুই চোখ বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। ঘুমাইয়া যেন দুঃস্বপ্ন দেখিতেছিলেন···সে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল ! সঙ্গে সঙ্গে দুঃস্বপ্ন ঘুচিয়া তিনি দেখিলেন পৃথিবীর অপরূপ সৌন্দর্য্য ···তার কোথাও বিশৃঙ্খলা নাই, বৈষম্য নাই···

শৈলবতী বলিলেন —একবার···বিয়ের প্রায় তিন বছর পরের কথা বলছি। জানিস তো, বিয়ে হয়ে সেই যে কাছে এনেছেন, একটি দিনের জন্য কাছ-ছাড়া করেন নি। মা কত বলেছেন যাবার জন্যে···যেতে পাই নি। তোর বিয়ের সময় কেঁদে রসাতল করেছিলুম···পায়ে ধরে বলেছিলুম, ওগো তিনটি দিনের ছুটী দাও···মধু আর আমি একপ্রাণ—আমার বিয়েয় সে কি না করেছিল ! তাতে বললেন, বেশ, যাও,—ফিরে এসে আমাকে আর দেখতে পাবে না !···এ কথার পর সত্যি ভাই যেতে পারিনি—ভয় হয়েছিল প্রাণে ! ···তার পর যা বলছিলুম···বিয়ের তিন বছরের পরের কথা—ছোট কাকীর সাধ। আমায় নিয়ে যাবে বলে সকলের কি ব্যগ্রতা ! আমি গেলুম। উনিও চললেন সঙ্গে। বললুম, লোকে হাসবে···খুড়শাশুড়ীর সাধে জামাই এসেছে নেমন্তন্ন ! তাতে বললেন—হাসুক গে লোকে···তোমায় ছেড়ে থাকতে হবে না তো !···গেলেন। কিন্তু যজ্ঞিবাড়ীর গোলমালে আমার সঙ্গে একদিন দেখা হয় নি···ভেবে একেবারে অসুখ করে বসলেন। লজ্জায় আমি মরে যাই !···এই যে পাড়ায় যাত্রা হচ্ছে···আমার তত সখ নয়, ভাই—পাড়ার পাঁচ জনের কি সাধ্য-সাধনা ! বলে, চলুন আপনি, চলুন ! দু'দিন ওঁর জ্বালায় নানা ছলে তাদের অনুরোধ এড়িয়েছি ···আজ আর পারিনি। কি এমন লাট সাহেবের গিন্নী বল তো ? ওরা ভাববে, দেমাক ! তাই যেতে হলো। ওদের কাছে তো বলতে পারি না যে, তোমাদের হেড-মাষ্টার-মশাই বৌ

ছাড়া একদণ্ড থাকতে পারেন না! আমি তাঁর অঞ্চলের নিধি!···সময়-সময় রাগ ধরে। আজই সন্ধ্যার আগে বেশ খানিকটা ঝগড়া করেছিলুম। ঝগড়া করে যাত্রা শুনতে গিয়েছিলুম। তাও কি একদণ্ড সুস্থির হয়ে শুনেছি রে! মন পড়েছিল বাড়ীতে। কেবলি ভেবেছি, আমার অঞ্চলের নিধি আমায় ছেড়ে কি যে না করে বসবেন এর মধ্যে! তা ঘুমোন নি; জেগে শুয়েছিলেন। এসে বললুম—জেগে রয়েছো এত রাত্তির অবধি? তাতে মলিন-মুখ করে বললেন—তুমি তো জানো, তুমি পাশে না থাকলে ঘুম আসে না!

মধুমতী শুনিতেছিলেন একাগ্র-মনে। এ যেন কাব্য-কাহিনী শুনিতেছেন! আজিকার সংসারেও এমন হয়, সত্য?

শৈল বলিলেন—খান নি, দান নি। খাবার তৈরী করে ঢাকাচাপা দিয়ে রেখে গিয়েছিলুম। বললেন—খাবার কথা মনে ছিল না। হাত ধরে খেতে বসালুম···বসলেন। বললুম—আচ্ছা এমন যে করো, যদি আমি মরে যাই? এমন তো হয়···লোকের স্ত্রী মারা যায়···তখন? তাতে বললেন তাহলে আমি একদণ্ড বাঁচবো, ভাবো? আমি বললুম—ছেলেগুলো কার মুখ চেয়ে থাকবে তাহলে? বেহায়ার মতো বললেন, তুমি যদি না থাকো, তাহলে ছেলেদের মানুষ করবো কি-সুখে? কার জন্যে?···বল্ দিকিন্ ভাই, এ পাগলের ওপর মায়া হয় না?···কি জানিস, আমি ওঁর ধ্যান-জ্ঞান—আমি ওঁর ইহকাল-পরকাল সব। কাজেই এ পাগলের জন্য সংসারের সমস্ত বর্জ্জন করতে হয়েছে আমাকে, নিজের সখ-সাধ, নিজের আত্মীয়-বন্ধু···সব। খেতে খেতে আমায় বললেন, বেশ হয়েছে! যেমন পাড়া বেড়াতে গিয়েছিলে, তেমনি শাস্তি হয়েছে! তোমার মধুমতী বন্ধু এসেছিলেন! দেখা হলো না!···তাঁদের বজরা ঐ খালে চড়ায় আটকেছে···ভোরের আগে বজরা চলবে না···

চব্বিশ বৎসরের যত কথা মনে জমিয়া ছিল, কথায়-কথায় বাঁধ ভাঙ্গিয়া কথার স্রোত বহিল!···

সে-কথার মধ্যে দুজনের চোখের সামনে হইতে বাস্তব-জগৎ কোথায় যে অদৃশ্য হইয়া গেছে, কখন্ রাতের জ্যোৎস্নার গায়ে ভোরের আলো আসিয়া মিশিয়াছে এবং বজরা চলিয়াছে···সেদিকে কারো খেয়াল নাই!

সহসা চমক ভাঙ্গিতে শৈলবতী কহিলেন—ওমা, সকাল হয়ে গেছে!···বজরা কোথায় চললো রে!

চমকিয়া মধুমতী কহিলেন—তাই তো! বজরা ছেড়ে দেছে!

শৈলবতী কহিলেন—ও ভাই, আমাকে যে হরণ করে নিয়ে চল্‌লি···এ্যাঁ! আমার পাগল তাহলে কি নিয়ে থাকবে?

মধুমতী ডাকিলেন—পীতাম্বর···

—মাসীকরুণ···

দাঁড়ী দাঁড় টানিতেছে, পীতাম্বর বসিয়াছে হালে। খালের কাণায়-কাণায় জল—জোয়ারের জীবন্ত উচ্ছ্বাস! বজরা চলিয়াছে।

মধুমতী কহিলেন—বজরা খুলে দেছ! তিন-আঁঠির মাসীকরুণ যে বজরায় রয়েছেন!

পীতাম্বর অপ্রতিভ! বলিল,—তাই তো মাসীকরুণ, খেয়াল করি নি। বজরা এমনি ছিল চড়ার মাটীতে; নোঙর করিনি তো। ভেবেছিলুম, জোয়ারে চড়া ডুবলে বজরা আপনি চলবে'খন।···তা বজরা ফেরাই?

মধুমতী বলিলেন,—নিশ্চয় ফেরাবে।

পিছনের দিকে তাকাইয়া শৈলবতী কহিলেন,—বজরা আর ফেরাতে হবে না···শুধু রাখো।

মধুমতী চাহিলেন শৈলর পানে। বিস্মিত দৃষ্টি!

হাসিয়া শৈলবতী কহিলেন—ঐ ত্থাখ্, মধু···

শৈলবতীর নির্দ্দেশে মধুমতী চাহিয়া দেখিলেন,—ডাঙ্গার উপর দিয়া এদিকে আসিতেছে এক জন মানুষ। চিনিলেন, কালিকার রাত্রের সেই শশীবাবু।

শৈলবতী কহিলেন—ঠিক হয়েছে। আমি সেই ছুটে বেরিয়ে এসেছি তোর কাছে···রাত তখন কত? সাড়ে তিনটে হবে। তিনটেয় যাত্রা ভেঙ্গেছে···তার পর বাড়ী এসেছি। তাই···সাড়ে তিনটেই! উনিও বোধ হয় সঙ্গে সঙ্গে এসেছেন। পাছে ওঁর সীতাকে তুমি হরণ করে নিয়ে যাও, চৌকি দিতে···

পীতাম্বর বজরা ভিড়াইল। কাশিতে-কাশিতে শশধর বাবু উঠিয়া বাহিরে আসিলেন···

মধুমতী বলিলেন,—কি ঘুম মানুষের! একজন ভদ্র-মহিলা এসেছেন···তাঁর একটু অভ্যর্থনা করো—তা নয়,

ঘুম! লোকে যে বলে, প্রভিন্সিয়াল জুডিসিয়াল সার্ভিসে ঢুকলে মানুষ সামাজিকতা ভুলে যায়, সে কথা সত্যি!

শশধর যেন কাঠ! কাশি গেল থামিয়া স্ত্রীর মুখে প্রভাতের নবসূর্য্যোদয়ে এই স্তুতি-বচন শুনিয়া!

মধুমতী বলিলেন,—এ শৈল···বুঝলে···যার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দেখা ঘটেনি। শৈল যাত্রা শুনতে গিয়েছিল। যাত্রা থেকে ফিরে যেমন শুনেছে আমি এসেছিলুম, অমনি ঘর-সংসার-স্বামী—সব ফেলে ছুটে এসেছে···

শশধরের মুখে হাস্যরেখা···

মধুমতী কহিলেন—এখন আলোচনার সময় নেই ···শৈল চললো।···দেখেচো, ডাঙ্গায় ওর চৌকিদার দাঁড়িয়ে আছে? ওকে নিয়ে পালাচ্ছিলুম···গ্রেফতার না করেন!

শৈলবতী হাসিয়া কহিলেন—গ্রেফতার করতেই এসেছি দুজনে। এবেলায় যেতে পাবেন না···ফিরে-জোয়ারে খাল থেকে বেরুবেন। সত্যি মধু, চব্বিশ বছর পরে দেখা···আরো চব্বিশ বছর যে বাঁচবো তখন আবার দেখা হবে, সে আশা নেই রে···নাব্ ভাই সকলে। ক্ষুদ-কুড়ো যা আছে, খেয়ে তবে যাবি।

নামিতে হইল।

তার পর আবার জোয়ার আসিল বেলা প্রায় বারোটায় এবং সে জোয়ার পরিপূর্ণ হইতে বেলা চারটে বাজিল।

তখন বজরা ছাড়িল।

বজরার পাশে দাঁড়াইয়া শৈল আর শশীবাবু···শৈলর দু'চোখে জলের ধারা!

বজরা ভাসিয়া চলিল। শৈল আর শশীবাবু ক্রমে চোখের আড়ালে অদৃশ্য হইলেন।

মধুমতী তখনো দাঁড়াইয়া আছেন বজরার ছাদে। দু'চোখে উদাস দৃষ্টি···

শশধর হাসিলেন; কহিলেন—তোমার সখীর সখাটি যেন কেমন! সখীটি চমৎকার। মানে, যেন বুদ্ধির তীব্র শিখা! কিন্তু উনি এ বনে খুব সুখে বাস করছেন, এমন মনে হয় না। ওঁর মতো বুদ্ধিমতী মেয়ে···

মধুমতী কহিলেন—সুখী! ওর মতো সুখ কারো নয়। তুমি আমাকে ঐশ্বর্য্য দেছো, দাস-দাসী দেছো, সত্যি! কিন্তু এ-বনে শৈল যা পেয়েছে, তার আর তুলনা নেই! শৈলর মতো ভাগ্য···তার জন্য বুঝি মেয়েদের আলাদা রকম তপস্যা করতে হয়!

মধুমতীর দু'চোখে জলোচ্ছ্বাস!

শশধর বাবু গোলমাল সহিতে পারেন না কোনো দিন। আইনের জটিল প্যাঁচ দেখিলেও তত কাবু হন না···কিন্তু মধুমতীর এই দীর্ঘনিশ্বাস, চোখে এই বাষ্পোচ্ছ্বাস···এ দেখিলে চমকিয়া ওঠেন···চিরদিন!

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কম্পিত বক্ষে তিনি ছাদ হইতে নামিয়া বজরার কামরায় প্রবেশ করিলেন। ছানু সকালে উঠিয়াই ব্যাগাটেল পাড়িয়া বসিয়াছে।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

ফতুয়ার ব্যথা

বহি অবিরাম শরীরের ঘাম যত কিছু মলা মাটী,
বর্ষা ও শীতে দিনে রাত্রিতে সমভাবে মরি খাটি'।
সহিতে পারে না এতটুক্ ক্লেশ সিল্কের পাঞ্জাবী,
আমার বুকের উপরে দাঁড়ায়ে বাবুয়ানা করে দাবী।

যাহাদের প্রাণ বাঁচাবার লাগি, নীচে প'ড়ে খাই খাবি,—
বাজারে শুধুই নাম পায় সেই, সার্ট-কোট-পাঞ্জাবী।
বড়দের লাগি ছোট-খাটো যারা প্রাণ করে' যায় ক্ষয়,—
সৃষ্টি-নিয়ম সে অভাগাদের থাকে নাক' পরিচয়।

শ্রীঅনাথবন্ধু সেনগুপ্ত (বি, এল)।

ভারতীয় নাট্যের প্রাচীনতা

খ্রীষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ বা পঞ্চম শতাব্দীতেও ভারতে নাট্যচর্চ্চা ও নটসূত্র-রচনা হইত, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ মহর্ষি পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী' ব্যাকরণসূত্র হইতে অসংশয়ে পাওয়া যায়—ফাল্গুনের 'মাসিক বসুমতী'তে ইহা সংক্ষেপে প্রতিপাদনের চেষ্টা করা হইয়াছে। এই তথ্যটির যথার্থতা যাঁহারা স্বীকার করিতে অসম্মত নহেন, তাঁহারা ভারতীয় নাট্যোৎপত্তির উপর গ্রীক্ প্রভাবের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশেষ আস্থাবান্ হইতে পারেন না। কারণ, খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বে গ্রীসে পূরাদস্তর নাট্যাভিনয় প্রচলিত ছিল —এরূপ সিদ্ধান্তে এ পর্য্যন্ত কোন গবেষকই উপনীত হইতে সাহসী হন নাই।

প্রাচীন যুগে গ্রীসের দেবতা (Thracian god) Dionysos-এর পূজা উপলক্ষে Attica ও Athens-এ যে প্রকার নৃত্য-গীত-মূকাভিনয় প্রচলিত ছিল,—Peloponnesos বা Doric Italy-তে ছাগবেশধারী বিদূষক নর্ত্তকবৃন্দের যে মিলিত নৃত্যগীতাদির (Satyroi বা Tragoi) অনুষ্ঠান হইত (১),—আর এই সম্মিলিত নৃত্যগীত (Choral Lyric) ও হাস্যরসাত্মক বাগভিনয়ের মিশ্রণে যে Doric Farce-এর বিকাশ হইয়াছিল,—ও এতদনুরূপ অন্যান্য যে সকল প্রাচীন প্রথা পরবর্ত্তী যুগে উদ্ভূত গ্রীক্ নাট্যের (Aischylean Tragedy ও Old Comedy of Athens) উৎপত্তির পূর্ব্বাভাস বলিয়া পাশ্চাত্ত্য গবেষকগণকর্ত্তৃক বিবেচিত হইয়া থাকে,—সেই সকল অনুষ্ঠানের প্রারম্ভ খ্রীষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দী অপেক্ষা প্রাচীনতর কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। আন্দাজ ৫৩৯ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে Ikarios-এর অধিবাসী Thespis উক্ত Satyroi বা Tragoi-এর মধ্যে একটি মাত্র মুখোস্‌ধারী নট (বা বাগভিনেতা) সন্নিবিষ্ট করিয়া Satyrikon বা Satyr-play-এর জন্মদান করিয়াছিলেন। পরে Aischylos-এর যুগে (খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৪৮৫) এই Satyr-play-ই Tragedy-তে পরিণত হয়।

প্রাচীন গ্রীসে প্রধানতঃ দুই প্রকার সম্মিলিত নৃত্য-গীতানুষ্ঠান (Choral Lyric) প্রথা প্রচলিত ছিল—(১) নৃত্য-গীত ও তৎসহ মধ্যে মধ্যে বাচিক অভিনয়; (২) কেবল গীত ও তৎসহ স্বল্প নৃত্য। ইহাদের মধ্যে প্রথম শ্রেণী—Attic Satyr-play ও Tragedy-র উৎপত্তিস্থল, আর দ্বিতীয় শ্রেণী—Old Comedy of Athens-এর উৎস বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। পরবর্ত্তী যুগে এই দ্বিতীয় শ্রেণীর Dionysiac Choral Lyric ক্রমশঃ Attic Chorus-এ পরিণত হইল। ইহাতে সাধারণতঃ পল্লীর ছদ্মবেশধারী গায়ক ও নর্ত্তকগণ যোগ দিতেন। কিন্তু Satyroi বা Tragoi-তে যেমন ছাগবেশ ধারণপূর্ব্বক ছাগ-রূপী বন-দেবতাগণের অনুকরণাত্মক অভিনয় করিতে হইত, এই সকল ছদ্মবেশী গায়ক নর্ত্তকগণের গীত-নৃত্যে সেরূপ অনুকরণাত্মক অভিনয়ের বিন্দুমাত্রও অস্তিত্ব ছিল না। ইহাতে গায়ক-নর্ত্তকগণ ছদ্মবেশ ধারণ করিতেন বটে, কিন্তু সে ছদ্মবেশ কোন বিশিষ্ট ভূমিকার অনুকরণে গৃহীত হইত না। উহা নিষ্কারণ রূপান্তর-পরিগ্রহ ছিল মাত্র—কবিবর্ণিত চরিত্রের অনুকরণমূলক রূপারোপ নহে। ঐ প্রকার ছদ্মবেশধারী পল্লীবাসী গায়কসম্প্রদায়ের নাম ছিল Komoi (২); ইঁহারা কোন ভূমিকার অভিনয় না করিলেও আপনারা নানারূপ বিচিত্র বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া গীতনৃত্যাদির অনুষ্ঠান করিতেন। খ্রীষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীতে ইহার সহিত Doric Farce-এর অনুকরণে হাস্যরসাভিনেতার সংযোগসূত্র স্থাপিত হয়; আর এই অভিনব সংযোগের ফলেই এথেন্সের প্রাচীন কমেডি (Old Comedy of Athens) জন্মলাভ করে।

(১) Satyr—গ্রীসের এক শ্রেণীর বনদেবতা; অশ্ব (বা ছাগের) আকৃতির সহিত মনুষ্যের আকৃতি মিশ্রিত হইলে যেরূপ অদ্ভুত আকৃতির উদ্ভব হয়, এই সকল দেবযোনির আকৃতিও ছিল তদ্রূপ। এইরূপ এক জন বিখ্যাত Satyr ছিলেন—প্যান (Pan, the god of Arkadia.)

(২) 'Tragoidia' বলিলে প্রাচীন যুগে যেমন Satyr Chorus-কেই বুঝাইত, তেমনই 'Komoidia' বলিতেও বুঝাইত Komos-এর সঙ্গীত।

উক্ত Doric Choral Lyric-এর প্রবর্ত্তকগণ,—Satyrikon-এর প্রবর্ত্তক Thespis (খ্রীঃ পূঃ ৫৩৪),—Phrynichos (খ্রীঃ পূঃ ৪৯৪) ও তাঁহার সহকর্ম্মী Pratinas, Choirilos প্রভৃতি,—Attic Tragedyর জন্মদাতা Aischylos (খ্রীঃ পূঃ ৫২৫ অথবা ৫২১ হইতে খ্রীঃ পূঃ ৪৫৬), ও তাঁহার অনুগামী Sophokles (খ্রীঃ পূঃ ৪৯৫-৪০৬), Euripides (খ্রীঃ পূঃ ৪৮০-৪০৮), Agathon প্রভৃতি,—Dionysiac Choral Lyric ও Doric Farce-এর প্রবর্ত্তকবৃন্দ,—Doric Comedy-র সুবিখ্যাত রচয়িতা Phormis, Epicharmos (জন্ম খৃঃ পূঃ ৫৪০) ও Deinolochos,—Phlyakes (বা Hilarotragoidia)-র লেখক Rhinthon (খ্রীঃ পূঃ ৩০০), Blaisos, Sopatros ও Skiros,—Old Attic Comedy-র আদি কবি Euetes Euxenides, Myllos, Chionides (খ্রীঃ পূঃ ৪৮৭), Ekphantides, Magnes, Kratinos (মৃত্যু খ্রীঃ পূঃ ৪২০),—Old Comedy-র শ্রেষ্ঠ কবি Aristophenes (খ্রীঃ পূঃ ৪৫০-৩৮৬), Krates, Pherekrates (খ্রীঃ পূঃ ৪৩৭), Telekleidos, Hermippos, Phrynichos (খ্রীঃ পূঃ ৪২৯), Kallias (খ্রীঃ পূঃ ৪১২), Hegemon, Eupolis (মৃত্যু ৪১১ খ্রীঃ পূঃ) প্রভৃতি গ্রীক্ নাট্যকারগণের কেহই খ্রীষ্টপূর্ব্ব সপ্তম বা ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী নহেন। বিশেষতঃ, খ্রীষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগের পূর্ব্বে যে পূর্ণাঙ্গ নাট্যরচনা গ্রীসে আরম্ভ হয় নাই, তাহার পর্য্যাপ্ত প্রমাণ আছে। পক্ষান্তরে, খ্রীষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বা তাহারও পূর্ব্বে যে ভারতে একাধিক 'নটসূত্র' রচিত হইয়াছিল—তাহার দৃঢ় প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে; আর নটসূত্র রচিত হইবার পূর্ব্বেই নাট্যরচনার প্রারম্ভ হওয়া যে স্বাভাবিক, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

গ্রীক্ প্রভাবের কথা উঠিলেই সর্ব্বাগ্রে মনে পড়ে 'যবনিকা'র কথা। এই একটি মাত্র বহু-বিচারিত শব্দকে কেন্দ্র করিয়া Weber, Windisch প্রমুখ পাশ্চাত্ত্য গবেষকমণ্ডলী এককালে খুবই মাতিয়া উঠিয়াছিলেন। এক্ষণে অবশ্য 'যবনিকা' শব্দটির উপর নির্ভর করিয়া ভারতীয় নাট্যে গ্রীক্-প্রভাবের অস্তিত্ব প্রমাণ করিবার প্রবৃত্তি গবেষকদিগের মধ্যে আর বড় একটা দেখা যায় না। 'যবনিকা'র সহিত 'যবন' শব্দটির (যবন—Ionian, Bactrian Bactro-Persian Greek) ব্যুৎপত্তিগত সম্বন্ধ অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তাই আমাদিগের মনে হয়, হয় ত পারস্য বা ব্যাক্‌ট্রিয়া হইতে কারুকার্য্যখচিত সুদৃশ্য মূল্যবান্ পর্দ্দা ভারতে তৎকালেও আসিত; কিন্তু অতি প্রাচীন যুগে ঐগুলি রঙ্গমঞ্চে ব্যবহৃত হইত কি না, তদ্বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কারণ—প্রথমতঃ, 'ড্রপ' (drop) অর্থে 'যবনিকা' শব্দের প্রয়োগ প্রাচীন ভারতের নাট্যসাহিত্যে দৃষ্ট হয় না; দ্বিতীয়তঃ, খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর প্রথম ভাগে রচিত কবিরাজ রাজশেখরের 'কর্পূরমঞ্জরী সট্টক' নামক কেবল প্রাকৃতভাষাময় দৃশ্যকাব্য ব্যতীত অন্য কোন প্রাচীনতর সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যে 'যবনিকা' (বা 'জবনিকা') শব্দের ব্যবহার দেখা যায় না। এমন কি, নবম শতাব্দীতেও সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক বাচস্পতি মিশ্র উক্ত অর্থে 'তিরস্করণী' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। সাধারণতঃ প্রাচীন নাট্যগ্রন্থাদিতে অনুরূপ অর্থে 'পটী', 'অপটী', 'প্রতিসীরা,' 'তিরস্করণী' (বা 'তিরস্করিণী') প্রভৃতি শব্দেরই ব্যবহার দেখা যায়। অতএব, 'যবনিকা' অর্থে গ্রীক্, ব্যাক্‌ট্রিয়ান্ বা পারসীক পর্দ্দা বুঝাইলেও উহার সাহায্যে ভারতীয় নাট্যে গ্রীক্-প্রভাবের অস্তিত্ব প্রমাণিত করা চলে না।

এইরূপে যবনিকা-সমস্যার উপর যবনিকাপাত সম্ভব হইলেও মহাকবি কালিদাসকৃত 'অভিজ্ঞানশকুন্তল' নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে উল্লিখিত সশস্ত্রা সুন্দরী যবনী প্রতিহারীর মায়াজাল অথবা রঘুবংশের চতুর্থ সর্গে (রঘুর দিগ্বিজয়ে) পারসীক-বিজয়ের আনুষঙ্গিক ফলস্বরূপ 'যবনীমুখপদ্মের' 'মধুমদ' হইতে এত সহজে নিস্তার পাওয়ার উপায় নাই। "Periplus of the Erythroean Sea" নামক খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রচিত একখানি সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক্ পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পশ্চিম-ভারতের সুবৃহৎ বন্দর Barygaza-র (বর্ত্তমান Broach বা ভৃগুকচ্ছ) রাজগণের বিলাস-সঙ্গিনীরূপে গ্রীক্ বণিক্‌গণ নৌকা বোঝাই দিয়া যবনী (বা ব্যাক্‌ট্রো-পারসীয়ান্-গ্রীক্) সুন্দরী আমদানী করিতেন (৩)। আর পশ্চিম-ভারতের অনার্য্য বিলাসপ্রিয় শক নরপতিগণ এই সকল অনায়াসলভ্যা মনোমোহিনী

(৩) ৺দেবেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত 'শকুন্তলায় নাট্যকলা'র ভূমিকা—৺সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার এম্-এ, পি-আর-এস লিখিত, পৃঃ ১২, ১৫-১৬ ও দেবেন্দ্রবাবুর মূলগ্রন্থ পৃঃ ১৩৪-১৩৫।

বিদেশিনী গণিকাকল্পা বীরাঙ্গনাগণকে প্রকাশ্যে শরীর-রক্ষিণীরূপে ও নেপথ্যে নর্ম্মসখীরূপে প্রতিপালন করিতেন। শাকুন্তল নাটকে যে এইরূপ যবনীর ছায়া দৃষ্ট হয়, তাহা অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু তাই বলিয়া ভারতীয় নাট্যের উৎপত্তির উপর গ্রীক্ নাট্যের প্রভাব স্বীকার করিবার উপযুক্ত কোন হেতুই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এইরূপ যবনী সুন্দরীগণের ভারতে আমদানী খ্রীঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীর (অর্থাৎ আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের) পূর্ব্বে কোনরূপেই সম্ভব হয় নাই। অথচ তাহার বহু পূর্ব্ব হইতেই ভারতে পূর্ণমাত্রায় নাট্যাভিনয় চলিত—ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে।

গ্রীক্ নাট্যের দুইটি প্রধান বিশেষত্ব—(১) দেশ-কাল-ঘটনার সাম্য বা সামঞ্জস্য (unity), ও (২) সম্মিলিত গীত-নৃত্যের (Chorus) প্রবর্ত্তন। আর প্রাচীন ভারতীয় নাট্যে ছিল এই দুইটি বিষয়েরই একান্ত অভাব। ভারতীয় নাট্যে দেশ-কাল-ঘটনার সমতা প্রায় নাই বলিলেও চলে। দুইটি অঙ্কের ব্যবধানে একযুগ-পরিমিত কাল পর্য্যন্ত অতীত হইয়াছে—এরূপ দৃষ্টান্ত ভারতীয় নাটকাদিতে বিশেষ বিরল নহে। এই সকল কারণে ভারতীয় নাট্যকে গ্রীক্ নাট্যের প্রভাবমুক্ত স্বতন্ত্র ব্যাপার বলিয়া গণনা করাই সমীচীন বলিয়া বোধ হয়।

খ্রীষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ বা তাহারও পূর্ব্ব পূর্ব্ব শতাব্দীতে ভারতে যে প্রকৃত নাট্যাভিনয় হইত, সে সম্বন্ধে পরোক্ষ প্রমাণের অভাব না থাকিলেও সে সকল নাট্যাভিনয়ের কোনরূপ প্রত্যক্ষ বিবরণ সংগ্রহ করা বর্ত্তমানে কঠিন। পৌরাণিক প্রমাণ বাদ দিয়া কেবল ঐতিহাসিক প্রমাণের উপর নির্ভর করিলে একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, অভিনয়ের প্রাচীনতম বিবরণ ভগবান্ পতঞ্জলির মহাভাষ্যে সংগৃহীত হইয়াছে (৪)। ভাষ্যকারের মতে পরোক্ষ অতীতের ঘটনা প্রত্যক্ষবৎ দেখাইবার উপায় ছিল তিনটি—(১) শৌভিক বা শোভনিকগণ দর্শকবৃন্দ-সমক্ষে 'কংসবধ', 'বলিবন্ধ' প্রভৃতি সুদীর্ঘকাল অতীত ঘটনাবলীর যথাযথ অনুকরণ করিয়া যাইতেন—পাশ্চাত্ত্য গবেষকগণ ইহাকে মূক অঙ্গাভিনয় বলিয়া থাকেন। (২) চিত্রফলকের সাহায্যেও এই সকল অতীত ঘটনার বর্ত্তমানে প্রত্যক্ষবৎ দর্শন সম্ভব হইত। (৩) গ্রন্থিকগণ এই সকল ঘটনার আবৃত্তি করিয়া সমবেত শ্রোতৃবৃন্দকে শুনাইতেন। 'কংসবধ' পালার আবৃত্তিকালে তাঁহারা দুইটি দলে বিভক্ত হইতেন। একদল হইত কংসের পক্ষভুক্ত ও অপর দল হইত বাসুদেব-ভক্ত। শ্রোতৃবর্গের মনে অনুক্রিয়মাণ ঘটনাটির গভীর ছাপ দিবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা নিজ নিজ অঙ্গে বিভিন্নরূপ বর্ণ-লেপও (paint) প্রদান করিতেন। সাধারণতঃ কংসপক্ষগণ 'কালমুখ' ও বাসুদেব-ভক্তবৃন্দ 'রক্তমুখ' হইতেন। মহাভাষ্যকারের উক্ত সংক্ষিপ্ত ও কিয়দংশে অস্পষ্ট বিবরণ হইতে ইহা অবশ্য সুস্পষ্টই বুঝা যায় যে, শৌভিকগণ কেবল আঙ্গিক অভিনয় করিতেন। পক্ষান্তরে, গ্রন্থিকগণ বাচিক অভিনয় (ও সম্ভবতঃ তৎসহ অল্পবিস্তর অঙ্গাভিনয়ও) করিতে অভ্যস্ত ছিলেন। আর বর্ণবিন্যাসের বিধান দেখিয়া বোধ হয় যে, শেষোক্ত শ্রেণীর অভিনেতৃবর্গ নেপথ্যবিধান বা আহার্য্যাভিনয় (dress, make-up) সম্বন্ধেও একেবারে উদাসীন থাকিতেন না। শৌভিকগণও মূকাভিনেতা ছিলেন কি না, তদ্বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। মহাভাষ্যের টীকাকার কৈয়ট বলিয়াছেন—'শোভনিক' শব্দের অর্থ—'কংসাদির অনুকরণকারী নটগণের ব্যাখ্যানোপাধ্যায়।' কৈয়টের এই 'ব্যাখ্যানোপাধ্যায়' শব্দটিও বড়ই অস্পষ্ট। এই টীকাংশ হইতে ঠিক বুঝিয়া উঠা যায় না যে, শোভনিকগণ বর্ত্তমান রঙ্গমঞ্চের নাট্যাচার্য্য বা শিক্ষকরূপে কংসাদির অনুকরণকারী নটগণকে শিক্ষা প্রদান করিতেন, অথবা তাঁহাদিগের মূকাভিনয়ের তাৎপর্য্য দর্শকগণকে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিতেন (৫)। যদি প্রথমোক্ত অর্থ গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে শোভনিকগণকে

(৪) মহাভাষ্য ৩।১।২৬; মহাভাষ্যকারের আবির্ভাবকাল এক্ষণে খ্রীঃ পূঃ ১৫০-১৫০ বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে। যাঁহারা অবশ্য মমঃ ৺গণপতি শাস্ত্রী মহাশয়ের মতানুবর্ত্তী তাঁহারা তদীয় সিদ্ধান্ত অনুসারে পাণিনি ও কৌটিল্যের পূর্ব্ববর্ত্তী মহাকবি ভাসের দৃশ্যকাব্যগুলিকেই ভারতীয় নাট্য-সাহিত্যের বর্ত্তমানে উপলভ্যমান প্রাচীনতম নিদর্শন বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন।

(৫) বর্ত্তমানে দক্ষিণভারতের 'কঠকড়ি' (কথাকলি) নৃত্যে এরূপ ব্যাপার দৃষ্ট হয়। এক জন নর্ত্তক মূকাভিনয় করেন, আর তাঁহার অভিনয়ের বিষয়-বস্তু পশ্চাৎ হইতে গায়ক ও কথকের দল গীত ও আবৃত্তির মধ্য দিয়া প্রকাশ করিতে থাকেন। কিন্তু প্রাচীনযুগে এরূপ কোন অভিনেতৃ-সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল কি না, বলা কঠিন।

অতি সুশিক্ষিত নট ও নাট্যাচার্য্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। অন্যথা বলিতে হয়, শোভনিকগণ নট ছিলেন না, মূকাভিনেতৃগণের কর্ম্মাবলী দর্শকসমাজে ব্যাখ্যা করিয়া দিতেন মাত্র। যাহাই হউক, 'শৌভিক' শব্দটির কোন অর্থ স্থির না হইলেও বিশেষ ক্ষতি নাই; কারণ, গ্রন্থিকগণের ক্রিয়াপদ্ধতির বিবৃতিদর্শনে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, আঙ্গিক, বাচিক ও আহার্য্য অভিনয় ভগবান্ পতঞ্জলির অবিদিত ছিল না। পতঞ্জলিকে বর্ত্তমানে একরূপ সর্ব্বসম্মতিক্রমেই 'শুঙ্গ'-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা পুষ্যমিত্রের (খ্রীঃ পূঃ ২য় শতাব্দীর মধ্যভাগ) সমকালবর্ত্তী বলিয়া ধরা হয়। অতএব, ঐ সময়ে যে পৌরাণিক আখ্যান অবলম্বনে রচিত রূপকাবলী ভারতে অভিনীত হইত, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া চলে। কেবল ঐরূপ অভিনয় ব্যতীত, নটস্ত্রীগণের সর্ব্বজনবিদিত দুশ্চরিত্রতার কথা ও 'ভ্রূকুংস' নামক স্ত্রীবেশধারী পুরুষ নটনর্ত্তকের উল্লেখও মহাভাষ্যমধ্যে দৃষ্ট হয়। পাশ্চাত্ত্য গবেষকগণ কি এ সকলই মূকাভিনয় বলিয়া উড়াইয়া দিবেন?

হিন্দু-শাস্ত্রগ্রন্থগুলির ন্যায় প্রাচীন বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থমধ্যেও অভিনয়ের সুস্পষ্ট উল্লেখ দৃষ্ট হয়। প্রাচীন বৌদ্ধ 'সুত্ত' গ্রন্থগুলিতে বৌদ্ধ-ভিক্ষুগণের পক্ষে 'বিসূকদস্সন', 'নচ্চ', 'পেক্‌খা' প্রভৃতিতে যোগদান নিষিদ্ধ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে (৬)। পাশ্চাত্ত্য গবেষকগণ বলেন, এগুলির সহিত পূর্ণাঙ্গ অভিনয়ের কোন সম্পর্ক নাই—আর এই সকল 'সুত্ত' গ্রন্থের রচনাকালও অনিশ্চিত। কিন্তু বিশেষজ্ঞ বৌদ্ধতত্ত্ববিদ্গণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এই সকল সুত্তগ্রন্থ খ্রীঃ পূঃ প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দীর পরে রচিত হয় নাই। 'ললিতবিস্তরে' বুদ্ধের (সিদ্ধার্থের) নাট্যকলাজ্ঞানের উল্লেখ আছে। 'দিব্যাবদানেও' নাট্যরচনার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বুদ্ধের জীবদ্দশায় বিম্বিসার যে অন্ততঃ একবারও নাট্যাভিনয় করাইয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। 'অবদান-শতক' মধ্যেও নাট্যের প্রাচীনতার আভাস দৃষ্ট হইয়া থাকে। অবদানশতকে বর্ণিত আছে যে, 'ক্রকুচ্ছন্দ' নামে বহু প্রাচীন এক বুদ্ধের আদেশে শোভাবতী নগরীতে নাট্যাভিনয় হইয়াছিল। গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব-কালেও রাজগৃহে অভিনয় হইত। 'কুবলয়া' নাম্নী এক জন অভিনেত্রী ঐ সময় নাট্যকলায় যেরূপ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তদনুপাতে বহু বৌদ্ধ-ভিক্ষুকে ধর্ম্মপথভ্রষ্ট করিয়াছিলেন। অবশেষে বুদ্ধ তাঁহাকে এক কুৎসিতা বৃদ্ধা রমণীতে রূপান্তরিত করিয়া দেন। তখন অনুতপ্তা অভিনেত্রী ভিক্ষুণীর জীবন অবলম্বন করেন। 'সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীক' গ্রন্থখানি সংলাপ বা সংবাদে (dialogue) গ্রথিত—নাটকীয়ভাবে পরিপূর্ণ। 'মহাবংশে' দৃষ্ট হয় যে, 'থূপ'-প্রতিষ্ঠা মহোৎসবে নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা ছিল। এই সকল বৌদ্ধ গ্রন্থের কোনখানিই খ্রীষ্ট জন্মের পরবর্ত্তীকালে রচিত বা সঙ্কলিত হয় নাই।

অজণ্টার 'ফ্রেস্‌কো' চিত্রগুলিকে যদি প্রমাণ স্বরূপে ধরা হয়, তাহা হইলে তন্মধ্যে অভিনয়ের সূচনা স্পষ্টই পাওয়া যায়। কারণ, ইহাতে নৃত্য-গীত-নাট্যসম্পর্কিত চিত্রের অভাব নাই। কিন্তু এগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়া গবেষকবৃন্দ অনুমান করিয়া থাকেন।

তিব্বতেও অতি প্রাচীন লৌকিক নাট্যাভিনয়ের লুপ্তাবশিষ্ট ধারা এখনও সম্প্রদায়ক্রমে রক্ষিত ও প্রদর্শিত হইয়া থাকে। চীনেও এ জাতীয় অনুষ্ঠানের অভাব নাই। ইহাদের কোন কোনটি আবার ভারতীয় বৌদ্ধ আখ্যায়িকা অবলম্বনে রচিত।

বৌদ্ধ গ্রন্থাবলীর ন্যায় প্রাচীন জৈন গ্রন্থগুলিতেও ভিক্ষুর পক্ষে নৃত্য-গীত-নাট্যদর্শনের নিষেধ কথিত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বয়ং নানাবিধ শি[illegible] বিশেষতঃ নাট্যকলায়—অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহারও উল্লেখ জৈনগ্রন্থে পাওয়া যায়।

হিন্দুদিগের প্রসিদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থ 'শ্রীমদ্ভাগবত' মহাপুরাণেও দৃষ্ট হয় যে, শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম চতুঃষষ্টি ললিতকলায় পারদর্শী ছিলেন। রামায়ণে ও মহাভারতে নাট্যসম্পর্কিত নানা শব্দের উল্লেখ পূর্ব্বেই করা হইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান পাশ্চাত্ত্য গবেষক-বৃন্দের নিকট হিন্দুর আর্ষ ধর্ম্মগ্রন্থাদির বিশেষ কোনই ঐতিহাসিক মূল্য নাই। অতএব, এ সকল আর্ষ উক্তিকে তাঁহারা বিনা দ্বিধায় ও বিনা যুক্তিতে পরবর্ত্তী কালের প্রক্ষিপ্ত রচনা বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন। কিন্তু প্রকৃত তত্ত্বান্বেষীর তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না। হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন

(৬) অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বর্ত্তমানে পাশ্চাত্ত্য গবেষকবৃন্দের মতানুসারে ভারতীয় নাট্যের প্রাচীনতম উপলভ্যমান নিদর্শন—বৌদ্ধ কবি অশ্বঘোষেরই লেখনীপ্রসূত।

শাস্ত্রের আলোচনায় এটুকু বেশ স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, খ্রীষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে ভারতে নাট্যাভিনয় বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। সে অভিনয়ে গণিকা অভিনেত্রীও নিয়োজিত হইত। আবার কখন কখন বা স্ত্রীভূমিকায় স্ত্রীবেশধারী পুরুষও অবতীর্ণ হইতেন।

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সারগুজা ষ্টেটে যে রামগড় পাহাড় বর্ত্তমান, তাহার দুইটি গুহা 'সীতাবেঙ্গা' ও 'জোগীমারা'—প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের সুপরিচিত। এই দুইটি গুহায় খ্রীষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীর ব্রাহ্মী অক্ষরে খোদিত দুইটি শিলালেখ অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। এই শিলালেখে 'দেবদত্ত' নামক কোন 'রূপদক্ষ' (নট) ও 'সুতনুকা' নাম্নী কোন 'দেবদাসী'র (নটী বা নর্ত্তকী নাম পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া সীতাবেঙ্গা গুহাটি ভরত-নাট্য-শাস্ত্রোক্ত মানবীয় কনিষ্ঠ পরিমাণের রঙ্গমঞ্চের আকারে কাটা। উহার পার্শ্বস্থিত জোগীমারা গুহাটিও 'নেপথ্য'গৃহের (অর্থাৎ সাজঘরের) আকারে সজ্জিত। ইহা হইতে স্পষ্টই অনুমান করা যায় যে, ঐ স্থানে খ্রীষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে রঙ্গাভিনয় চলিত।

মহাভাষ্যের পরবর্ত্তী যুগ হইতে ভারতে যে সকল নাট্যাভিনয় হইয়াছে, তাহাদের একটা মোটামুটি ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়। অশ্বঘোষ, ভাস, শূদ্রক, কালিদাস, চন্দ্র, শ্রীহর্ষ, মহেন্দ্রবিক্রম বর্ম্মা, ভবভূতি, বোধায়ন কবি, বিশাখদত্ত, ভট্টনারায়ণ, মুরারি, রাজশেখর, ভীমট, ক্ষেমীশ্বর, কৃষ্ণমিশ্র প্রভৃতির নাট্যরচনার পরিচয় অনেকেরই সুবিদিত। হয় ত এই সকল কবির কাহারও কাহারও (যথা, ভাস ও কালিদাস) রচনাকাল বা আবির্ভাবসময় সম্বন্ধে মতদ্বৈধ থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার ফলে ইতিহাসের ধারা অধিক বিচ্ছিন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। কেবল মহাকবি ভাসকে (মমঃ ৮ গণপতি শাস্ত্রীর মতানুসারে) চাণক্য (কৌটিল্য) ও পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া প্রমাণ করিতে পারিলে ভারতীয় নাট্যের প্রাচীনতা সম্বন্ধে অনেকটা স্থিরনিশ্চয় হওয়া যায়। অন্যথা অবশিষ্ট কবিগণের সময় দুই এক শতাব্দী এদিক্‌-ওদিক্‌ হইলে বিশেষ কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় না।

পাশ্চাত্য গবেষকবৃন্দ ভারতীয় রূপকের উৎপত্তি সম্বন্ধে বহু বিচিত্র মতবাদের সৃষ্টি করিয়াছেন। Sir William Ridgeway-প্রমুখ পণ্ডিতগণ বলেন যে, মৃত মহাপুরুষগণের স্মৃতিতর্পণোৎসব (রাম-কৃষ্ণ-শিব-দুর্গা-কালী-ইন্দ্র প্রভৃতি দেবদেবীগণের উপাসনা এই উৎসবেরই প্রকারভেদ মাত্র) নাট্যের উৎপত্তির উৎসস্বরূপ। আবার Pischel প্রভৃতি বিদ্বদ্বর্গের মতে পুতুলনাচই নাট্যের আদি বলিয়া বিবেচিত হয়। পক্ষান্তরে, Luders, Konow প্রভৃতি গবেষকবৃন্দের সিদ্ধান্তানুসারে ছায়ানাট্যকেই নাট্যের বীজ বলিয়া ধরিতে হয়। অবশ্য নাট্যের উপর উপাসনা বা তজ্জাতীয় ধর্ম্মমূলক অনুষ্ঠানের (যথা,—হোলি, রামলীলা, দশেরা প্রভৃতি বর্ত্তমান অনুষ্ঠানের প্রাচীন রূপ—জর্জ্জর উৎসব প্রভৃতি) প্রভাব অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু ছায়ানাট্যের প্রাচীনতা প্রমাণ করা কঠিন। পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তসমূহের যে কোন একটিও ভারতীয় রূপকের উৎপত্তিকাল-সমস্যা সমাধানের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে। 'রূপক' হইতেছে 'লোকানুকৃতি';—তাই মানবজীবনের প্রারম্ভের ন্যায় উহারও আদি চিরদিনই রহস্যাবৃত থাকিয়া যাইবে।

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী (এম, এ, পি, আর, এস)।

মুগ্ধ

এ'পারের শ্যামতট'পর
হর্ষ-শিহরণ ;
ও'পারেতে কাঁদে বালুচর
বিরহ-কাঁদন,

মুক্তা ও মাণিক যেন দু'টি,—
কান্না আর হাসি,—
কা'রে ঠেলে ফেলে রাখি আমি !
কা'রে ভালবাসি !

শ্রীঅদ্বৈতকুমার সরকার।

দেব-রোষে ইংরেজ

(অলৌকিক সত্য-ঘটনা)

উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া, এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা-প্রভাবেও বাঙ্গালার অধিকাংশ শিক্ষিত হিন্দুযুবক, এমন কি, মহিলাগণ পর্য্যন্ত দেব-দেবীর প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাসে বঞ্চিত হইয়াছেন। অনেকে দৈববলকে বুজ্‌রুকি বলিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করেন; এ অবস্থায় কুসংস্কার-বর্জ্জিত এক জন ইংরেজ মা কালীর রোষভাজন হইয়া কিরূপ বিপন্ন হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার একটি 'মিলিটারী' বন্ধুকে কি ভাবে ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল, তাহার রোমাঞ্চকর বিবরণ পাঠ করিলে হিন্দুর দেব-দেবীর শক্তি সম্বন্ধে শিক্ষিত যুবকগণের কিরূপ ধারণা হইবে—তাহা জানিতে আগ্রহ হয়। দেব-রোষ সম্বন্ধে এই অনতিরঞ্জিত সত্য ঘটনার বিবরণ গত মে মাসে লণ্ডনের কোন বিখ্যাত মাসিকে যিনি প্রকাশ করিয়াছেন, তিনিও ইংরেজ; তাঁহার নাম মিঃ জি কে মর্ফি।

মিষ্টার মর্ফি লিখিয়াছেন "জেম্‌স ক্যারিংটন ভারতীয় বন বিভাগের 'ফরেষ্ট অফিসার।' তিনি এক দিন তাঁহার অস্থায়ী তাঁবুর অফিসে বসিয়া কার্য্যশেষে বিশ্রাম করিতেছিলেন, সেই সময় তাঁহার আর্দ্দালী প্রমোদ সিং একখানি লেফাপা-হস্তে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া বলিল, 'এই টেলিগ্রাম এইমাত্র আসিয়াছে, হুজুর। টেলিগ্রাফ-পিয়ন ইহার উত্তরের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে।'

ক্যারিংটন লেফাপা ছিঁড়িয়া টেলিগ্রামে পাঠ করিলেন, 'আজ রাত্রি আটটার ট্রেণে পৌঁছিতেছি; ইহা সুবিধাজনক মনে হইলে তারে জানাইবে—ওয়াইল্ড।'

ক্যারিংটন তাঁহার অফিসের বাক্স হইতে টেলিগ্রাফের 'ফরম' বাহির করিয়া তাড়াতাড়ি উত্তর লিখিয়া, আর্দ্দালীর হস্তে প্রদান করিলেন।

অল্প কাল পরে তিনি আর্দ্দালীকে ডাকিয়া বলিলেন, 'আর্দ্দালী, তুলসীকে এখনই আমার স্নানের যোগাড় করিয়া দিতে বল, আর মাহুত আব্দুল গনিকে খবর দাও—সে যেন আওয়াজখালি হাতীটার পিঠে হাওদা চড়াইয়া রেল ষ্টেশনে যাইবার জন্য প্রস্তুত থাকে; আমি সন্ধ্যা সাতটার সময় ষ্টেশনে যাইব।'

প্রমোদ সিং বলিল, 'যো হুকুম, হুজুর!'

সন্ধ্যা ঠিক সাতটার সময় ক্যারিংটন তাঁহার আদরিণী হস্তিনী আওয়াজখালীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া রেল-ষ্টেশন অভিমুখে ধাবিত হইলেন। তিনি ষ্টেশনে পৌঁছিয়া ষ্টেশন-মাষ্টারের অফিসে প্রবেশ করিলেন, এবং সন্ধান লইয়া জানিতে পারিলেন—আটটার ট্রেণ আধ ঘণ্টা 'লেট!'

অগত্যা তিনি প্রথম শ্রেণীর আরোহিগণের 'ওয়েটিং রুমে' প্রবেশ করিয়া একখান চেয়ার বাহির করিয়া আনিলেন, এবং বারান্দায় বসিয়া, তাঁহার বন্ধু মীরাটের সীফোর্থ হাইল্যাণ্ডার্স নামক সৈন্যদলের মেজর ওয়াইল্ডের সহিত শিকারে যোগদান করিয়া কি ভাবে পনের দিন কাটাইয়া দিবেন—মনে মনে তাহার 'প্রোগ্রাম' স্থির করিয়া ফেলিলেন।

ট্রেণ প্লাটফর্ম্মে প্রবেশ করিলে ক্যারিংটন ব্যগ্রভাবে ট্রেণের প্রথম শ্রেণীর কামরার দিকে অগ্রসর হইলেন। মুহূর্ত্ত পরে মেজর ওয়াইল্ড সেই কামরা হইতে প্লাটফর্ম্মে নামিয়া পড়িলেন।

মেজর ওয়াইল্ড বন্ধুর করমর্দ্দন করিয়া বলিলেন, 'আছ কেমন ওলড্ চ্যাপ! আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া তুমি বড়ই সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছ। আমি ছুটী লইয়া এক মাসের মধ্যেই দেশে যাইতেছি। এখানে একটা বাঘ শিকার করিতে পারিলে কি আনন্দই যে হইবে!'

ক্যারিংটন হাসিয়া বলিলেন, 'তোমার শিকারের সকল রকম সুবিধাই করিয়া দিব।'

বন বিভাগের 'রেষ্ট-হাউসে' ডিনার শেষ করিয়া উভয় বন্ধু খোলা বারান্দায় বেতের ইজি চেয়ারে বিশ্রাম করিতে বসিলেন। সেই সময় ক্যারিংটন তাঁহাদের পঞ্চদশ দিন-ব্যাপী শিকারের 'প্রোগ্রাম' বন্ধুর গোচর করিলেন।

পর দিন প্রভাতে সাড়ে আটটার সময় ডাক আসিলে ক্যারিংটন কয়েকখানি জরুরী পত্র পাইলেন; পত্রগুলির গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন, শিকার মাথায় উঠিল!

তিনি ক্ষুব্ধস্বরে ওয়াইল্ডকে বলিলেন, 'তোমাকে বলিতে দুঃখ হইতেছে যে, আজ আর তোমার সঙ্গে আমার শিকারে যাওয়া ঘটিয়া উঠিল না; কতকগুলা জরুরী কায ঘাড়ে আসিয়া পড়িয়াছে। আমার আর্দ্দালী প্রমোদ সিংএর সঙ্গে শিকারে যাইতে তোমার আপত্তি আছে কি?'

মেজর বলিলেন, 'না, কোন আপত্তি নাই। আমার জন্য তোমাকে উৎকণ্ঠিত হইতে হইবে না, ওল্ড চ্যাপ! আমি সব ঠিক করিয়া লইতে পারিব।'

ক্যারিংটন বন্ধুকে খুসী করিবার জন্য বলিলেন, 'বনের যে অংশে চিতল ও বুনো শুয়োর আছে, সেই অংশে তোমাকে লইয়া যাইবার জন্য আর্দ্দালীকে আদেশ করিব; তাহা তোমার পছন্দ হইবে কি?'

মেজর বলিলেন, 'চমৎকার হইবে। চিতল হরিণের এক জোড়া ভাল শিংএর অভাব বহুদিন হইতেই অনুভব করিতেছি।'

পনের মিনিটের মধ্যে ওয়াইল্ড প্রমোদ সিংকে সঙ্গে লইয়া 'রেষ্ট-হাউস' হইতে পদব্রজে যাত্রা করিলেন। উভয়েই রাইফেল লইয়া শিকারে চলিলেন।

এক ঘণ্টার মধ্যেই তাঁহারা অরণ্যে প্রবেশ করিলেন।

প্রমোদ সিং মৃদুস্বরে বলিল, 'খুব সতর্ক থাকিবেন, হুজুর, নিঃশব্দে আমার অনুসরণ করুন; আমরা চিতলের এলাকায় আসিয়া পড়িয়াছি।'

অরণ্যের ভিতর আরও আধ মাইল অগ্রসর হইবার পর আর্দ্দালী সম্মুখে অঙ্গুলী প্রসারিত করিয়া বলিল, 'ঐ দেখুন হুজুর, প্রকাণ্ড এক পাল চিতল; নিঃশব্দে আগাইয়া গিয়া, একটা ভাল হরিণ নিশানা করিয়া 'ফায়ার' করুন।'

হরিণগুলি নিঃশঙ্কচিত্তে নবোদ্গত তৃণাঙ্কুর ভক্ষণ করিতেছিল।

পালের সর্ব্বোৎকৃষ্ট হরিণটিকে লক্ষ্য করিয়া মেজর 'ফায়ার' করিলেন। হরিণটা আহত হইয়া শূন্যে লাফাইয়া উঠিল, তাহার পর যূথভ্রষ্ট হইয়া একাকী এক দিকে দ্রুতবেগে পলায়ন করিল। পালের অন্যান্য হরিণও তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হইল।

হরিণটা আহত হইয়াছে বুঝিয়া ওয়াইল্ড মহা উৎসাহে দ্রুতবেগে তাহার অনুসরণ করিলেন, এবং এক মাইল দূরে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিলেন; কিন্তু আহত মৃগের আর সন্ধান মিলিল না।

অতঃপর তিনি নিরুৎসাহচিত্তে ধীরে ধীরে চলিয়া একটা ফাঁকা যায়গায় উপস্থিত হইলেন। তিনি প্রমোদ সিংকে সাড়া দেওয়ার জন্য হুইস্ল-ধ্বনি করিলেন; কিন্তু তাহার কোন সাড়া পাইলেন না। অদূরে অরণ্যপ্রান্তে একটি মন্দির দেখিয়া তিনি সেই মন্দির অভিমুখে অগ্রসর হইলেন; এবং মন্দিরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া মন্দির দ্বারে গৈরিক আলখেল্লা মণ্ডিত এক জন বৃদ্ধ সাধুকে উপবিষ্ট দেখিলেন। বিশাল জটাভার উষ্ণীষের আকারে সাধুর মস্তকের ঊর্দ্ধে বিজড়িত ছিল। ধ্যানমগ্ন সাধুর অঙ্গুলিতে রুদ্রাক্ষের মালা; তিনি মুদিতনেত্রে অস্ফুটস্বরে সেই মালা জপ করিতেছিলেন।

সাধু অপরিচিত আগন্তুককে লক্ষ্য করিলেন না।

ওয়াইল্ড কোন কথা চিন্তা না করিয়া, সেই সাধুকে লঙ্ঘন করিয়াই মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। মন্দিরে কি আছে—তাহাই পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহার কৌতূহল হইয়াছিল।

তিনি মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া হিন্দুদের যে দেবী-মূর্ত্তি দর্শন করিলেন—সে অতি ভীষণ মূর্ত্তি! সেই মূর্ত্তির আপাদ-মস্তক ঘোর কৃষ্ণবর্ণ; কণ্ঠে শোণিত-রঞ্জিত নরমুণ্ডমালা, কটিতটে অসংখ্য নরহস্তের মেখলা; উলঙ্গিনী, ভীষণা কালীমূর্ত্তি! সেই মূর্ত্তির পাদমূলে একটি সেকেলে প্রদীপ জ্বলিতেছিল; চঞ্চল দীপশিখা সেই মূর্ত্তিতে প্রতিফলিত হওয়ায় তাঁহার ভীষণতা বহুগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

ওয়াইল্ড সেই মূর্ত্তি দেখিয়া গভীর বিতৃষ্ণাভরে বলিয়া উঠিলেন,

হরিণটা আহত হইয়া শূন্যে লাফাইয়া উঠিল

'ওঃ, কি ঘৃণিত পদার্থ!'—আর তাঁহার সেখানে দাঁড়াইবার প্রবৃত্তি হইল না; তিনি অবজ্ঞাভরে সেই মন্দিরের দ্বারের বাহিরে পদবিক্ষেপ করিলেন।

বৃদ্ধ সাধু এইবার ধ্যানভঙ্গে ওয়াইল্ডের মুখের দিকে কঠোর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহার আরক্তিম চক্ষুযুগল হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিঃসারিত হইতে লাগিল; তাঁহার মুখমণ্ডল ক্রোধে অতি ভীষণ আকার ধারণ করিল। তিনি তাঁহার প্রসারিত হস্তদ্বয় আন্দোলিত করিয়া ক্রোধকম্পিত স্বরে বলিলেন, 'ওরে ম্লেচ্ছ, এই মুহূর্ত্তে তুই দূর হ। কোন্ সাহসে তুই মা কালীর মন্দির অপবিত্র করিয়াছিস্?'

সাধুর তিরস্কার শুনিয়া ওয়াইল্ডের ধারণা হইল—তিনি ভুল করিয়াছেন; তিনি ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দুস্থানী ভাষায় বলিলেন, 'ডেখো বুড্ঢা আড্মি, হাম্ বহুট ডুখথিট হুয়া; লেকেন হামারা কুছ বদ্ মৎলব নেহি থা, তুম্ গোসা মৎ করো, ফকিরজী!'

ঠিক সেই সময় প্রমোদ সিং দ্রুতপদে সেই স্থানে উপস্থিত হইল। সে আতঙ্ক-বিহ্বল স্বরে মেজরকে বলিল, 'কি সর্ব্বনাশ, আপনি করিয়াছেন কি, হুজুর!'

ওয়াইল্ড বলিলেন, 'কেন? আমি অন্যায় কাযটা কি করিয়াছি? মন্দিরের ভিতর কি আছে তাহাই দেখিয়া আসিয়াছি।'

আর্দ্দালী বলিল, 'তাহা ত জানি, হুজুর! কিন্তু আপনি জুতা-সমেত মন্দিরে প্রবেশ করিয়া কালী মায়ীর মন্দির কলুষিত করিয়াছেন।'

মেজর বলিলেন, 'আমি ভয়ানক দুঃখিত হইয়াছি; জুতা-সমেত মন্দিরে প্রবেশ করা যে দোষের, ইহা ভুলিয়া গিয়াছিলাম।'

অতঃপর মেজর পকেট হাতড়াইয়া চারিটি টাকা বাহির করিলেন, এবং তাহা প্রমোদ সিংএর হাতে দিয়া বলিলেন, 'এই টাকা বুড়া ফকিরকে বকশিস্ দাও; আর তাহাকে বল—আমার ভুলের জন্য আমি দুঃখপ্রকাশ করিতেছি।'

আর্দ্দালী ভয়-কম্পিত বক্ষে সাধুর সম্মুখে উপস্থিত হইল, এবং সম্ভ্রমভরে তাঁহাকে বলিল, 'বাবাজি, এই সাহেব ইংরেজের ফৌজের এক জন সেনাপতি; উনি আমাদের দেশের রীতি-নীতি জানেন না। উনি উঁহার ভ্রমের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন, আপনি উঁহার অপরাধ ক্ষমা করুন, বাবাজি!'

কিন্তু বাবাজি তাহার সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না; তিনি ঘৃণাভরে সেই স্থানে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিয়া মেজর-প্রদত্ত টাকা-গুলি দূরে নিক্ষেপ করিলেন; তাহার পর দক্ষিণ হস্ত ঊর্দ্ধে প্রসারিত করিয়া বিকৃত স্বরে বলিলেন, 'কালী মায়ী ঐ সাদা লোকটার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছেন; তিনি এক সপ্তাহের মধ্যেই উহার প্রাণ বিনষ্ট করিবেন। ভাগ, হিঁয়াসে জল্‌দি।'

প্রমোদ সিং বিস্তর কাকুতি-মিনতি করিয়া সাধুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল; কিন্তু সাধুর ক্রোধ প্রশমিত হইল না; তখন ওয়াইল্ড প্রমোদ সিংএর সহিত তাম্বুতে প্রত্যাগমন করিলেন।

অতঃপর আহারে বসিয়া ক্যারিংটনের নিকট তিনি তাঁহার অভিযান-সংক্রান্ত সকল বিবরণ বিবৃত করিলেন। সেই সকল কথা শুনিয়া ক্যারিংটন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন; তাহার পর গম্ভীর ভাবে বলিলেন, 'সেই সাধু তোমাকে অভিসম্পাত করিয়াছে—ইহা আমি ভাল লক্ষণ বলিয়া মনে করিতে পারিতেছি না।'

তাঁহার কথা শুনিয়া মেজর অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন; এবং শ্লেষভরে বলিলেন, 'এই সকল ফকির সন্ন্যাসীর দৈবশক্তি আছে—ইহাই কি তুমি আমাকে বিশ্বাস করিতে বল? তুমিও তাহা বিশ্বাস কর কি?'

ক্যারিংটন গম্ভীর স্বরে বলিলেন, 'হাঁ, আমি সত্যই তাহা বিশ্বাস করি, ওল্ড চ্যাপ! আমি জানি, তাহারা অনেক অতিপ্রাকৃত কার্য্য সাধন করিতে পারে; কিন্তু কিরূপে তাহা সাধিত হয়, তাহা আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধির অগোচর।'

ওয়াইল্ড বন্ধুর কথা বিশ্বাস করিতে না পারিয়া বলিলেন, 'একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টা আমাকে বুঝাইয়া দিতে পার?—আমার ধারণা—ইহা বিকৃত-মস্তিষ্কের খেয়াল মাত্র।'

কিন্তু ক্যারিংটন অতঃপর এই প্রসঙ্গের আলোচনায় সম্মত হইলেন না। তিনি অধিকতর গম্ভীর হইয়া বলিলেন, 'সময়ান্তরে হয় ত ইহার প্রমাণ দিতে পারিব। তোমার মত অবিশ্বাসিগণের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য প্রচুর প্রমাণের প্রয়োজন বটে, তবে সম্ভবতঃ একটিই যথেষ্ট হইতে পারে।'

ক্যারিংটনকে অত্যন্ত বিমর্ষ দেখিয়া মেজর ওয়াইল্ড হাসিয়া বলিলেন, 'স্ফূর্ত্তি কর, ক্যারিংটন, তোমার আতঙ্কের কোন কারণ

'ওরে ম্লেচ্ছ, এই মুহূর্ত্তে তুই দূর হ।'

নাই। এক বেটা বুড়া ফকিরের ভবিষদ্বাণী সফল করিবার জন্য আমি যে এক সপ্তাহের মধ্যে পরলোকে যাত্রা করিতে পারিব, তাহার কোন সম্ভাবনা দেখিতেছি না। আপাততঃ আমার মরিবার অবসরও নাই।'

ক্যারিংটন বন্ধুর এই শ্লেষোক্তি শুনিয়া কিছু বলিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু প্রমোদ সিং সেই মুহূর্তে একখানি টেলিগ্রাম লইয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। ক্যারিংটন টেলিগ্রামের বাদামী লেফাপা ছিঁড়িয়া টেলিগ্রামখানার উপর চক্ষু বুলাইয়াই ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, 'কি কদর্য্য বিড়ম্বনা! আমাকে অবিলম্বে নাইনিতালে রওনা হইতে হইবে। 'কন্‌জারভেটার অফ ফরেষ্ট' আমার উপরওয়ালা; সে আমাকে অবিলম্বে তাহার সহিত দেখা করিতে বলিয়াছে। এ জন্য আমাকে বেলা দু'টোর ট্রেণ ধরিতে হইবে; প্রস্তুত হইবার জন্য আমার আর এক ঘণ্টার অধিক সময় নাই। ভয়ঙ্কর দুঃখিত হইলাম, ওয়াইল্ড! কিন্তু আমি ফিরিয়া তোমার ভাল শিকারের ব্যবস্থা করিব।'

ওয়াইল্ড বলিলেন, 'বেশ, তাহাই হইবে।'

অনন্তর ক্যারিংটন আগ্রহভরে বলিলেন, 'দেখ ওয়াইল্ড, পাছে আমি ভুলিয়া যাই, এজন্য আগেই তোমাকে বলিয়া রাখি, আমার অনুপস্থিতি কালে তুমি বিশেষ সাবধান থাকিবে। আমি প্রমোদ সিংকে এবং আমার সকল চাকরকে বলিয়া যাইব, তাহারা সর্ব্বদা তোমার উপর দৃষ্টি রাখিবে। তুমি তাহাদিগকে তোমার নিজেরই চাকর বলিয়া মনে করিবে। কিন্তু শোন, স্মরণ রাখিও—আমি আন্তরিক আগ্রহের সঙ্গেই তোমাকে এ কথা বলিতেছি,—তুমি কোন দিন কোন কারণে সেই মন্দিরের দিকে যাইবে না; যখনই শিকারে যাইবে, প্রমোদ সিংকে তোমার পাশে রাখিবে; আর সন্ধ্যার পর কোন দিন বাহিরে বেড়াইবে না।'

বন্ধুর আগ্রহ দেখিয়া ওয়াইল্ড হাসিয়া বলিলেন, 'উত্তম, আমি এ অঙ্গীকার করিলাম; আর কোন কথা তোমার বলিবার আছে?'

ক্যারিংটন বলিলেন, 'হাঁ; আমি আমার 'ক্যাম্পের' কেরাণী গৌরী দত্তকে বলিয়া যাইব—সে প্রত্যহ রাত্রিকালে বারান্দায় দুই জন আর্দ্দালীর শয়নের ব্যবস্থা করিবে।'

মেজর সবিস্ময়ে বলিলেন, 'গ্রেট স্কট! তুমি কি ভাবিয়াছ, কেহ আমাকে হত্যা করিতে আসিবে?'

ক্যারিংটন অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া বলিলেন 'না, তা' নয়; তবে যতদিন তুমি এখানে আছ, তোমাকে নিরাপদে রাখিবার জন্য আমি দায়ী। তিন দিনের মধ্যেই আমি ফিরিয়া আসিব; ইত্যবসরে, আশা করি, আমার এই অনুরোধগুলি রক্ষা করিবে।'

ওয়াইল্ড হাসিয়া বলিলেন, 'বেশ, তাহাই হইবে, ওল্ড চ্যাপ্!'

সেই দিন বেলা ১টা ৪৫ মিনিটের সময় ওয়াইল্ড ক্যারিংটনকে ট্রেণে তুলিয়া দেওয়ার জন্য তাঁহার সঙ্গে রামবাগ ষ্টেশনে চলিলেন। ট্রেণ চলিতে আরম্ভ করিলে ক্যারিংটন প্ল্যাটফর্ম্মে দণ্ডায়মান সহাস্যবদন ওয়াইল্ডকে রুমাল উড়াইয়া বিদায়-সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিলেন।

ক্যারিংটনের অনুপস্থিতি কালে ওয়াইল্ড প্রমোদ সিং, এবং গৌরী দত্তের নির্ব্বাচিত অন্য এক জন আর্দ্দালীকে সঙ্গে লইয়া পদব্রজে শিকার করিতে গিয়াছিলেন। তিনি কয়েকটি বন্য কুক্কুট, ময়ূর ও একটা হরিণ শিকার করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার অঙ্গীকার স্মরণ করিয়া কোনও দিন সেই ক্ষুদ্র দেবমন্দিরের সীমা-মধ্যে গমন করেন নাই, সেই ভয়ঙ্কর স্থানটি এড়াইয়াই চলিয়াছিলেন।

তৃতীয় দিন শিকারের জন্য অরণ্যে প্রবেশ করিয়া মেজর অত্যধিক গরমে পিপাসায় কাতর হইয়া পড়িলেন, এবং পুনঃ পুনঃ জলপান করায় তাঁহার 'ফ্লাস্কের' জল নিঃশেষিত হইল। মধ্যাহ্ন কালে তাঁহারা তাম্বু হইতে চারি মাইল দূরবর্ত্তী অরণ্যে ঘুরিতেছিলেন। পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ মেজর 'জল, জল' করিয়া অস্থির হইয়া উঠিলেন। এই ভাবে চলিতে চলিতে একটি জলাশয় তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। মেজর দ্রুতবেগে সেই জলাশয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন।

মেজরকে সেই জলাশয়ের জলপানে উদ্যত দেখিয়া প্রমোদ সিং ব্যগ্রভাবে বলিল, 'ও জল পান করিবেন না, হুজুর! ও জল তেমন পরিষ্কার নয়।'

ওয়াইল্ড শুষ্ককণ্ঠে বলিলেন, 'তা হোক, আর্দ্দালী! দেখিতেছ না, পিপাসায় আমার প্রাণ যায়! তুমি কি আমার অবস্থা বুঝিতে পারিতেছ?'

প্রমোদ সিং বলিল, 'কিন্তু হুজুর,—'

আর 'কিন্তু হুজুর'!—ওয়াইল্ড সেই জলাশয়ের জলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া অঞ্জলী ভরিয়া সুশীতল জল পান করিলেন। জলপানে তিনি পরিতৃপ্ত হইয়া বলিলেন, 'খাসা জল; জল পান করিয়া যেন মৃতদেহে প্রাণ পাইলাম! চল, এখন তাম্বুতে ফিরিয়া যাই।'

বেলা একটার পর তাঁহারা 'রেষ্ট-হাউসে' প্রত্যাগমন করিলেন। মেজর ওয়াইল্ড স্নানান্তে পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিয়া আহারে বসিলেন; কিন্তু হঠাৎ অত্যন্ত মাথা ধরায়, বিশেষতঃ পুনঃ পুনঃ দুর্দ্দমনীয় পিপাসার জন্য তিনি তৃপ্তির সহিত আহার করিতে পারিলেন না; ভোজন অসমাপ্ত রাখিয়াই উঠিয়া পড়িলেন।

অপরাহ্ন তিনটার সময় তাঁহার যন্ত্রণা এরূপ দুঃসহ হইল যে, তিনি কেরাণী গৌরী দত্তকে ডাকাইয়া বলিলেন, 'বাবু, এখানে কি কোন ডাক্তার আছে? আমি বড়ই অসুখ বোধ করিতেছি।'

গৌরী দত্ত বলিল, 'আমি এখনই ডাক্তারকে ডাকাইতেছি; আপনার বোধ হয় রোদ লাগিয়াছে।'

স্থানীয় সব-এসিষ্ট্যাণ্ট-সার্জ্জন গোবিন্দ পন্থ কুড়ি মিনিটের মধ্যেই ক্যারিংটনের তাম্বুতে উপস্থিত হইলেন। তিনি মেজরের রোগ পরীক্ষা করিলেন, তাঁহার দেহের উত্তাপ লইলেন; তাহার পর চিন্তিত ভাবে বলিলেন, 'লক্ষণগুলা দেখিয়া মনে হইতেছে—সর্দ্দিগর্ম্মি হইয়াছে; তবে এখনও ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। যাহা হউক, আপনি শুইয়া থাকুন, আমি আপনার জন্য একটা 'মিক্সচার' পাঠাইয়া দিতেছি।'

কিন্তু ওয়াইল্ড-বেচারার অবস্থা ক্রমশঃ আরও অধিক খারাপ হইয়া উঠিল। তাঁহার দেহের উত্তাপ ভীষণ ভাবে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। রোগের যন্ত্রণায় তিনি ছটফট্ করিতে লাগিলেন। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া গৌরী দত্ত ভয় পাইয়া কাপ্তেন পলককে সংবাদ দিতে ছুটিল। কাপ্তেন পলক একটা কাঠের কারখানায় কায করিতেন; আধ মাইল দূরে তিনি তাঁহার তাম্বুতে বাস করিতেন।

সংবাদ পাইবামাত্র কাপ্তেন পলক মেজরকে দেখিতে আসিলেন। ডাক্তার পন্থকে সঙ্গে লইয়া তিনি ওয়াইল্ডের সঙ্গে দেখা

করিলেন; তাহার পর তিনি ডাক্তারকে বাহিরে লইয়া গিয়া বলিলেন, 'ডাক্তার, তোমার সন্দেহ, মেজর কলেরায় আক্রান্ত হইয়াছেন; রোগটা যদি সত্যই কলেরা হয়, তাহা হইলে ত আর সময় নষ্ট করা উচিত নয়। অন্য কোন চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করাই উচিত। আমরা কোষ্টিপুরে ডাক্তার কাশীরামকে কি তার করিব?'

ডাক্তার পন্থ বলিলেন, 'হাঁ মহাশয়, আমারও মনে হইতেছে তাহাই করা উচিত।'

কোষ্টিপুরের ডাক্তার কাশীরামের নিকট জরুরী তার প্রেরিত হইল। অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় মেজর রোগযন্ত্রণায় শয্যায় পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতে করিতে এক টেলিগ্রাম পাইলেন। প্রমোদ সিং টেলিগ্রামখানি তাঁহার হাতে দিলে তিনি তাহা খুলিয়া পাঠ করিলেন,—

'আজ রাত্রি আটটার ট্রেণে ফিরিতেছি—ক্যারিংটন।'

মেজর কেরাণী গৌরী দত্তকে ডাকাইয়া এই সংবাদ জানাইলে গৌরী দত্ত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'সাহেব, এখন কি রকম বোধ করিতেছেন?'

ওয়াইল্ড ক্ষীণস্বরে বলিলেন, 'বাবু, আমার ভয়ঙ্কর অসুখ; আমার জীবনে আর কখনও এ রকম অসুখ হয় নাই।'—তিনি ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন, 'আচ্ছা বাবু, কালী মায়ীকে কি তোমার বিশ্বাস হয়?'

গৌরী দত্ত দৃঢ়-স্বরে বলিল, 'নিশ্চিতই বিশ্বাস হয়। তাঁহাকে বিশ্বাস করিব না? তিনি অত্যন্ত শক্তিশালিনী দেবী। হিন্দু আমি, তাঁহাকে বিশ্বাস করা আমার অবশ্য-কর্ত্তব্য।'

পুনর্ব্বার ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া মেজর বলিলেন, 'বুঝিলাম, কিন্তু তোমার কি মনে হয়, তোমাদের এই কালী মায়ী শাপ দিয়া তোমাকে মারিয়া ফেলিতে পারে?'

গৌরী দত্ত লোকটি নিতান্ত নির্ব্বোধ ছিল না; তাহার মনে হইল—সাহেব হঠাৎ এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন? সে মেজরের প্রশ্নের উত্তর না দিয়া কুণ্ঠিত-ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, 'সাহেব, কি উদ্দেশ্যে এ কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন?'

মেজর ক্ষীণ স্বরে বলিলেন, 'জঙ্গলের ভিতর কালী মায়ীর এক মন্দির আছে; সেই মন্দিরের বৃদ্ধ ফকির চারি দিন পূর্ব্বে আমাকে শাপ দিয়াছিল।'

মেজরের উত্তর শুনিয়া গৌরী দত্তের মুখ ভয়ে চুণ হইয়া গেল, তাহার চক্ষুতে আতঙ্ক ফুটিয়া উঠিল; কিন্তু সে মনের ভাব গোপন করিয়া বলিল, 'ও সকল কথা ভাবিবেন না সাহেব, ক্যারিংটন সাহেব আজই ত ফিরিয়া আসিতেছেন; তিনি আসিয়া সব ঠিক করিয়া দিবেন।'

কিন্তু ওয়াইল্ড গৌরী দত্তের মুখে আতঙ্কের চিহ্ন লক্ষ্য করিয়াছিলেন। গৌরী দত্তর কথায় তিনি আশ্বস্ত হইতে না পারিয়া বিচলিত চিত্তে কাপ্তেন পলককে ডাকাইয়া পাঠাইলেন।

অল্পকাল পরেই কাপ্তেন পলক পুনর্ব্বার তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন, এবং তাঁহার শয্যাপ্রান্তে বসিয়া তাঁহাকে প্রবোধ দানের চেষ্টা করিলেন। ডাক্তার গোবিন্দ পন্থও পনের কুড়ি মিনিট অন্তর তাঁহার ধমনীর গতি পরীক্ষা ও রোগের উপসর্গগুলি লক্ষ্য করিয়া, তাহা নোট-বহিতে লিখিয়া রাখিতে লাগিলেন। ওয়াইল্ড যে কলেরায় আক্রান্ত হইয়াছিলেন, এ বিষয়ে তখন আর তাঁহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না; কিন্তু কাপ্তেন পলক রোগীর নিকট এ কথা প্রকাশ করিতে তাঁহাকে নিষেধ করিয়া বলিয়াছিলেন—রোগী যেন জানিতে পারেন তাঁহার রোগ সর্দ্দি-গরমি মাত্র, তাঁহার ভয়ের কোন কারণ নাই।

ওয়াইল্ড ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ডাক্তার, তুমি কি মনে কর, আমাকে তুমি আরোগ্য করিতে পারিবে?'

গোবিন্দ পন্থ হাসিয়া বলিলেন, 'কেন পারিব না সাহেব? আপনি নিশ্চয়ই আরোগ্য লাভ করিবেন।'

সেই সময় আর একখানি টেলিগ্রাম আসিল, তাহাতে লিখিত ছিল,—

'রাত্রি আটটার ট্রেণে পৌঁছাইতেছি—কাশীরাম।'

ক্যারিংটনও সেই ট্রেণেই ফিরিতেছিলেন। তাঁহার বন্ধু ওয়াইল্ড সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুর সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন, তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই; ট্রেণ ষ্টেশনে পৌঁছিতে কুড়ি মিনিট বিলম্ব করায় তিনি অত্যন্ত অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন। অবশেষে ট্রেণ রামবাগ ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম্মে প্রবেশ করিলে তিনি ওয়াইল্ডকে দেখিবার আশায় চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন। ওয়াইল্ডকে না দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। সেই সময় তাঁহার অফিসের কেরাণী গৌরী দত্ত তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল, 'গুড্ ইভ্‌নিং, সার!'

ক্যারিংটন বলিলেন, 'গুড ইভ্‌নিং! কিন্তু মেজর ওয়াইল্ড কোথায়? তিনি কি ষ্টেশনে আসেন নাই?'

গৌরী দত্ত কুণ্ঠিত ভাবে বলিল, 'না সাহেব; বড়ই দুঃখের বিষয় যে তিনি কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া শয্যাগত হইয়াছেন।'

ক্যারিংটন ভীতি-বিহ্বল স্বরে বলিলেন, 'কঠিন-রোগ! কি রোগে তিনি শয্যাগত?'

গৌরী দত্ত শুষ্ক কণ্ঠে বলিল, 'তাঁহার কলেরা হইয়াছে, সার! ডাক্তার গোবিন্দ পন্থ তাঁহার চিকিৎসা করিতেছেন; কিন্তু কোন উপকার না হওয়ায় ডাক্তার কাশীরামকে তার করা হইয়াছে। তিনিও এই ট্রেণেই—'

গৌরী দত্তের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই ক্যারিংটন ব্যগ্রভাবে বলিলেন, 'ডাক্তার কাশীরামকে হাতীতে তুলিয়া লইয়া এস, আমি আগেই চলিলাম।'

ক্যারিংটন আর মুহূর্ত্তমাত্র সেখানে বিলম্ব না করিয়া একটা সোজা পার্ব্বত্য পথ ধরিয়া দশ মিনিটের মধ্যে 'রেষ্ট-হাউসে' উপস্থিত হইলেন। ঘরের বারান্দায় পলক ও ডাক্তার পন্থের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তিনি তাঁহাদের উভয়কেই অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ও বিচলিত দেখিলেন।

পলক তাঁহাকে ব্যাকুল স্বরে বলিলেন, 'পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ যে, তুমি আসিয়া পড়িয়াছ। মেজর তোমার কথা পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন।—না, না, তুমি ও কামরায় প্রবেশ করিও না।'

ক্যারিংটন বলিলেন, 'প্রবেশ করিব না! কেন বল ত।'

পলক বলিলেন, 'মেজর অত্যন্ত খারাপ রকম কলেরায় আক্রান্ত হইয়াছেন; বড় ছোঁয়াচে রোগ কি না—তাই—'

ক্যারিংটন বাধা দিয়া বলিলেন, 'হোক্ ছোঁয়াচে; আমি এই মুহূর্ত্তেই তাহাকে দেখিতে যাইব।'

তিনি রোগীর শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া বন্ধুর অবস্থা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন; মেজর ওয়াইল্ডকে দেখিয়া চিনিবার উপায় ছিল না! কয়েক দিন পূর্ব্বে যে যুবককে তিনি সবল ও সুস্থ দেখিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার অস্থিচর্ম্মসার জীর্ণ দেহ যেন শয্যার সহিত মিশিয়া গিয়াছিল। কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন!

ক্যারিংটন বন্ধুর নীলাভ শুষ্ক মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয়, ওল্ড ম্যান!'

মেজর কোটরগত চক্ষুর নিষ্প্রভ দৃষ্টি বন্ধুর মুখের উপর স্থাপন করিয়া অস্ফুট স্বরে বলিলেন, 'সে কথা সত্য। তুমি আসিয়াছ দেখিয়া আমার বড়ই আনন্দ হইয়াছে। ভাবিয়াছিলাম, আর বুঝি দেখা হইল না। আমার জীবনের আর কোন আশা নাই; আমার আয়ু শেষ হইয়াছে, বন্ধু!'

ক্যারিংটন প্রফুল্লতা প্রকাশের চেষ্টা করিয়া বলিলেন, 'পাগলের মত ও সব কি বলিতেছ, ওয়াইল্ড! আমি ডাক্তার কাশীরামকে লইয়া আসিয়াছি। কাশীরাম বিচক্ষণ চিকিৎসক, তিনি তোমাকে শীঘ্রই নীরোগ করিবেন। আমি তাঁহাকে তোমার নিকট লইয়া আসিতেছি।'

পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে ডাক্তার কাশীরামের সহিত ক্যারিংটনের সাক্ষাৎ হইল। ডাক্তার তাঁহাকে বলিলেন, 'গুড্ ইভ্নিং, সার! মেজর সাহেবের রোগের সংবাদ পাইয়া বড়ই দুঃখিত হইয়াছি। তাঁহাকে দেখিতে যাইব কি?'

ক্যারিংটন বলিলেন, 'রোগীর নিকট যাইবার পূর্ব্বে আমার যে দুই একটি কথা বলিবার আছে, তাহা শুনিয়া রাখুন।'—তিনি কালী-মন্দিরস্থ সাধুর অভিসম্পাত সংক্রান্ত সকল কথা সংক্ষেপে ডাক্তারের গোচর করিয়া অবশেষে বলিলেন, 'আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস, আমার বন্ধুটিকে বিষ দেওয়া হইয়াছে! বিষের কোন লক্ষণ আছে কি না, তাহা আপনি সতর্ক ভাবে পরীক্ষা করিবেন; কিন্তু তাঁহাকে এ সম্বন্ধে কোন কথা বলিবেন না।'

অতঃপর ডাক্তার কাশীরাম অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে রোগীর শয্যাপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন। তিনি অত্যন্ত সতর্ক ভাবে রোগ পরীক্ষা করিয়া ক্যারিংটনকে গোপনে জানাইলেন, রোগীর দেহে বিষের চিহ্নমাত্র নাই; তাঁহাকে বিষ দেওয়া হয় নাই। রোগী যে কলেরায় আক্রান্ত হইয়াছেন, তাহা অতি ভীষণ প্রকৃতির কলেরা!

ডাক্তার কাশীরাম এক ঘণ্টার অধিককাল মেজর ওয়াইল্ডের চিকিৎসা করিলেন, অন্য সকলে নানাভাবে তাঁহাকে সাহায্য করিলেন। কিন্তু চিকিৎসায় কোন ফল হইল না; রোগীর অবস্থা ক্রমশঃ অধিকতর মন্দ হইতে লাগিল। অবশেষে তিনি শান্তভাবে মহানিদ্রায় অভিভূত হইলেন। সাধুর অভিসম্পাতের পর পাঁচ দিনের মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হইল!

প্রিয় বন্ধুর মৃত্যু-শোকাভিভূত ক্যারিংটন পার্শ্ববর্ত্তী কামরায় একখানি ইজিচেয়ারে বসিয়া ঢুলিতে ঢুলিতে সেই রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। সেই সময় সাধুর অভিসম্পাতের কথা পুনঃ পুনঃ তাঁহার মনে পড়িতেছিল। কোন প্রকার কুসংস্কার তাঁহার মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে না পারিলেও তাঁহার ধারণা হইল—সাধু তাঁহার বন্ধুকে যে অভিসম্পাতগ্রস্ত করিয়াছিলেন, সেই অভিসম্পাতই তাঁহার বন্ধুর শোচনীয় মৃত্যুর কারণ। অভিসম্পাতটা হাতে হাতেই ফলিয়া গেল! ক্যারিংটন স্থির করিলেন—তিনি শীঘ্রই একবার সাধুর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

অতঃপর তিনি গৌরী দত্তকে ডাকিয়া রামবাগের ছুতারমিস্ত্রীদের দ্বারা একটি শবাধার নির্ম্মাণ করাইতে বলিলেন; তাহার পর গৌরী দত্তকে বলিলেন, 'তুমি প্রমোদ সিংকে কাল নয়টার সময় কালীমন্দিরে পাঠাইয়া দিবে। প্রমোদ সিং সাধুকে জানাইবে, আমি তাহার সহিত দেখা করিতে যাইব। তুমি স্মরণ রাখিবে, আমার এই আদেশ জরুরী।'

গৌরী দত্ত তাঁহার আদেশ শুনিয়া ভয়কম্পিত স্বরে বলিল, 'কিন্তু সার, আপনার বর্ত্তমান মানসিক অবস্থায় সেই কোপন-স্বভাব সাধুর—'

গৌরী দত্তর মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া ক্যারিংটন তাহার কথায় বাধা দিয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন, 'হ্যা, আমি সেই সাধুর সঙ্গে দেখা করিয়া তাহাকে গোটাকতক কথা বলিব। তুমি আমার আদেশ পালন করিবে; এ সম্বন্ধে তোমার কোন উপদেশ শুনিবার জন্য আমার আগ্রহ নাই; বুঝিয়াছ?'

প্রত্যূষে চারিটার সময় গৌরী দত্ত তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে জানাইল, ছুতারমিস্ত্রীরা শবাধার লইয়া আসিয়াছে।

বেলা নয়টার সময় কাপ্তেন পলক ক্যারিংটনের তাম্বুতে উপস্থিত হইলে মেজর ওয়াইল্ডের মৃতদেহ অরণ্যপ্রান্তবর্ত্তী প্রান্তরে সমাহিত করা হইল। সমাধির উপর একটি কাঠের ক্রশ প্রোথিত হইল।

ক্যারিংটন তাম্বুতে প্রত্যাগমন করিয়া প্রাতর্ভোজন শেষ করিলেন; তাহার পর সন্ধান লইয়া জানিতে পারিলেন, প্রমোদ সিং তাঁহার আদেশানুসারে কালীমন্দিরে সাধুর সহিত দেখা করিতে গিয়াছে। তখন তিনি অশ্বে আরোহণ করিয়া সাধুর সহিত দেখা করিতে চলিলেন। তিনি কালী-মন্দিরের অদূরে প্রমোদ সিংহকে দেখিতে পাইলেন। সে সাধুর সহিত দেখা করিয়া তাম্বুতে প্রত্যাগমন করিতেছিল। ক্যারিংটন প্রমোদ সিংএর মুখের দিকে চাহিয়া তাহাকে অত্যন্ত ভগ্নোৎসাহ ও বিচলিত দেখিলেন।

ক্যারিংটন জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমাকে ও রকম বিমর্ষ দেখিতেছি কেন?'

প্রমোদ সিং সভয়ে বলিল, 'হুজুর, আপনি সাধুর নিকট যাইবেন না। সাধুকে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ দেখিলাম; আমার আশঙ্কা হইতেছে, তিনি হুজুরকেও হয় ত শাপ দিবেন।'

ক্যারিংটন বিচলিত স্বরে বলিলেন, 'সাধু আমাকে শাপ দিবে? আমি তাহার অভিসম্পাতের কি ধার ধারি? তুমি তাহাকে আমার কথা বলিয়াছ কি?'

প্রমোদ সিং বলিল, 'হাঁ হুজুর, বলিয়াছি। আমার কথা শুনিয়া সাধু বলিলেন, 'এখনই হইয়াছে কি? তিনি জানেন—আরও অনেক লোক মরিবে। তিনি তাহাদেরও মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছেন!'

ক্যারিংটন তাঁহার আর্দ্দালীকে তাঁহার অনুসরণের আদেশ প্রদান করিয়া মন্দিরাভিমুখে অশ্ব পরিচালিত করিলেন। তিনি যে সময় সাধুর সহিত আলাপ করিবেন—সেই সময় তাঁহার ঘোড়া ধরিয়া রাখিবার জন্যই তিনি প্রমোদ সিংকে মন্দিরে ফিরিবার আদেশ করিয়াছিলেন।

প্রমোদ সিং নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত তাঁহার এই আদেশ পালন করিল।

ক্যারিংটন মন্দির-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া সাধুকে মন্দিরের বাহিরে উপবিষ্ট দেখিলেন। তিনি অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া সাধুকে বলিলেন, 'সেলাম, বাবাজি!'

সাধু গম্ভীর স্বরে বলিলেন, 'সেলাম, সাহেব! তুমি কি জন্য আমার ধ্যান-ধারণায় বাধা দিতে আসিয়াছ? কেহ আমাকে বিরক্ত করিতে আসে—ইহা আমি পছন্দ করি না। আমি কাহাকেও আমার নিকট আসিতে দিব না। তুমি অবিলম্বে আমার সম্মুখ হইতে চলিয়া যাও।'

ক্যারিংটন তাঁহার হাতের চাবুক আন্দোলিত করিয়া কঠোর স্বরে বলিলেন, 'আমি তোমাকে যে কথা বলিতে আসিয়াছি, তাহা তুমি না শুনিলে আমি এই স্থান ত্যাগ করিব না। আমার কথা বুঝিতে পারিয়াছ?'

বৃদ্ধ সাধু কর্কশস্বরে বলিলেন, 'হাঁ, বুঝিয়াছি; কিন্তু তোমার বন্ধু যে ভাবে কালী মায়ীর কোপে পড়িয়াছিল, তোমাকেও সেইরূপ তাঁহার কোপে পড়িতে না হয়—সে বিষয়ে হুঁসিয়ার থাক। তিনি এক জনকে তাঁহার কোপানলে দগ্ধ করিয়াছেন, পুনর্ব্বার আর এক জনকেও সেইরূপ করিতে পারেন।—আমার কথা বুঝিয়াছ?'

কিন্তু ক্যারিংটন তখন এতই ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন যে, সাধুর তর্জ্জন গর্জ্জনে ভীত হইলেন না। তিনি দুই এক পদ অগ্রসর হইয়া উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, 'শোন সাধু, যদি তুমি সংযত হইয়া না চল, তাহা হইলে আমি তোমার ঐ মন্দির ভাঙ্গিয়া গুঁড়া করিয়া ফেলিব। আমি তোমার কোন অপকার করি নাই, তথাপি তুমি অকারণে আমাকে ভয় প্রদর্শন করিতেছ—তোমার এত দূর গোস্তাকি!'

ক্যারিংটনের কথায় সহসা সাধুর মনোভাবের পরিবর্ত্তন হইল; সম্ভবতঃ তাঁহার মনে হইল, এই ধর্ম্মজ্ঞান-বর্জ্জিত ম্লেচ্ছটা তাঁহাকে যে ভয় প্রদর্শন করিল, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতেও পারে। এই জন্য তিনি হঠাৎ অত্যন্ত নরম হইয়া ক্যারিংটনের সম্মুখে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং শান্তভাবে বলিলেন, 'সাহেব তুমি যথেষ্ট সাহসের পরিচয় দিয়াছ, কিন্তু দেখিবে?'

এই কথা বলিয়া মলিন কৌপীন মাত্র সম্বল, উলঙ্গপ্রায় সাধু তাঁহার উভয় হস্ত ক্যারিংটনের সম্মুখে প্রসারিত করিলেন, এবং উভয় করতল উন্মুক্ত করিয়া দেখাইলেন, তাঁহার উভয় করতলই খালি ছিল; কিন্তু তিনি দক্ষিণ হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া মুষ্টিতে চাপ দিতেই তাঁহার মুষ্টির ভিতর হইতে টুপ্‌টাপ্‌ করিয়া জল ঝরিতে লাগিল। অতঃপর তিনি মুষ্টি খুলিলেন; ক্যারিংটন দেখিলেন, সাধুর করতলে কিছুই নাই, তাহা সম্পূর্ণ শুষ্ক, জলবিন্দুর সংস্পর্শরহিত।

অতঃপর সাধু বলিতে লাগিলেন, 'দেখিলে ত? যে ভাবে আমার বদ্ধমুষ্টি হইতে জল ঝরিয়া পড়িল, ঐ ভাবেই তোমার ভাগ্যে অর্থাগম হইবে; কোনও দিন তোমাকে অভাবের কষ্ট সহ্য করিতে হইবে না। কিন্তু তোমার অতি কঠিন পীড়া হইবে। আমি স্পষ্ট দেখিতেছি—তুমি বাধ্য হইয়া বন-বিভাগের চাকরীতে ইস্তফা দিয়া বিলাত যাইতেছ। আর তুমি এদেশে ফিরিয়া আসিবে না। তবে তোমার রোগ সাংঘাতিক হইবে না; পরে তুমি স্বাস্থ্যলাভ করিবে। কিন্তু আমি দেখিতেছি, তোমার দুই জন অনুচর কয়েক দিনের মধ্যেই প্রাণত্যাগ করিবে। যদি তুমি অবিলম্বে রামবাগ ত্যাগ করিয়া দূরে পলায়ন কর—তাহা হইলেই তোমার মঙ্গল, সাহেব!'

ক্যারিংটন সাধুর কথা শুনিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, 'শোন

'তুমি ভাল ব্যবহার না করিলে, তোমার মন্দির চূর্ণ করিব!'

সাধু, আমি এখানে তোমার যাদু দেখিতে আসি নাই, ভবিষ্যদ্বাণী শুনিবার জন্যও আমার আগ্রহ নাই। যদি তুমি আমার তাম্বুর লোকগুলিকে শাপ দিয়া থাক, তাহা হইলে সেই অভিসম্পাত প্রত্যাহার কর; নতুবা আমি—' তিনি তাঁহার কথা শেষ না করিয়া তাঁহার উভয় হস্ত এভাবে মন্দিরের দিকে প্রসারিত করিলেন যে, তাহাতেই তাঁহার মনোভাব পরিস্ফুট হইল।

সাধু সংযত স্বরে বলিলেন, 'তোমার মনের ভাব আমি বুঝিয়াছি, সাহেব! আমি অভিসম্পাত করি নাই; শাপ দিয়াছেন—কালী মায়ী। ইহা দেব-রোষ। কালী মায়ীকে তুষ্ট করাই

তোমার কর্ত্তব্য। আমার কিছুই করিবার শক্তি নাই। আমি তাঁহার ক্ষুদ্র সেবকমাত্র।'

ক্যারিংটন সরোষে বলিলেন, 'তাহা হইলে আমি পুলিশে সংবাদ দিব; তাহারা তোমাকে জেলে পুরিবে।'

সাধু অবজ্ঞাভরে হাসিয়া বলিলেন, 'হাঁ, তাহাদের সে শক্তি আছে বটে; কিন্তু তাহারা আমার এই জড় দেহমাত্র কারাগারে আবদ্ধ করিতে পারে; আমার এই দেহমাত্রই আমি নহি; আমার দেহ কারাগারে থাকিলেও আমার আত্মার স্বাধীনতা অক্ষুন্ন থাকিবে। কিন্তু তুমি কালী মায়ীর প্রসন্নতা অর্জ্জনের জন্য সামান্য একটা কায করিবে?'

ক্যারিংটন কৌতূহলী হইয়া বলিলেন, 'কি কায, বল।'

সাধু বলিলেন, 'আজই রামবাগের মন্দিরে একটা পাঠাবলির ব্যবস্থা কর। তাহা হইলে দেবী প্রসন্ন হইয়া অভিসম্পাত প্রত্যাহার করিতেও পারেন।'

ক্যারিংটন বলিলেন, 'উত্তম, তাহাই হইবে। সেলাম, বাবাজি!'

সাধু বলিলেন, 'সেলাম, সাহেব! তুমি যেন দেবগণের আশীর্ব্বাদ লাভ করিতে পার।'

ক্যারিংটন অশ্বে আরোহণ করিয়া রামবাগে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি তাম্বুতে ফিরিয়া গৌরী দত্তকে ডাকিয়া বলিলেন, 'তুমি একটা পাঁঠা কিনিয়া রামবাগ-মন্দিরের পূজারীর নিকট বলির জন্য অবিলম্বে পাঠাইয়া দাও। খরচটা আমার নিজের হিসাবেই লিখিয়া রাখিবে।'

গৌরী দত্ত খুসী হইয়া বলিল, 'এ অতি-উত্তম কথা সার! খুব ভাল প্রস্তাব।'—প্রকৃত ব্যাপার জানিবার জন্য তাহার আগ্রহ হইল। প্রমোদ সিং সকলই জানিত; সে সুযোগের প্রতীক্ষায় রহিল।

ক্যারিংটন পূর্ব্বেই সমর বিভাগের কর্তৃপক্ষের নিকট টেলিগ্রামে মেজর ওয়াইল্ডের মৃত্যুসংবাদ প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি সেই দিনই অপরাহ্নে এক টেলিগ্রাম পাইয়া জানিতে পারিলেন—মেজর ওয়াইল্ডের জিনিস-পত্র লইয়া যাইবার জন্য এক জন সৈনিক তাঁহার তাম্বুতে প্রেরিত হইবে।

ক্যারিংটন চা পান করিতে বসিয়াছিলেন; সেই সময় গৌরী দত্ত অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ভাবে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল, 'বড়ই দুঃসংবাদ সার! আমাদের ডাক-হরকরা গঙ্গাপ্রসাদের কলেরা হইয়াছে। তাহাকে চাকরদের তাম্বুতেই রাখা হইয়াছে; ডাক্তার গোবিন্দ পন্থ তাহাকে দেখিতেছেন।'

'রেষ্ট-হাউসের' প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে পরিচারকবর্গের তাম্বু। ক্যারিংটন তাড়াতাড়ি সেই তাম্বুতে গমন করিয়া ডাক্তার পন্থকে রোগীর নিকট উপবিষ্ট দেখিলেন। তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে ডাক্তার বলিলেন, 'রোগীর অবস্থা বড় খারাপ, জীবনের আশা অল্প।'

রাত্রি ন'টার সময় ক্যারিংটন প্রমোদ সিংএর নিকট সংবাদ পাইলেন—হতভাগ্য ডাক-হরকরার মৃত্যু হইয়াছে। ক্যারিংটন ভৃত্যগণকে আদেশ করিলেন—তাহারা যেন রামগঙ্গা নদীর জলে স্নান না করে, এবং সেই জল পান না করে। তিনি তাহাদিগকে নল-কূপের জল ব্যবহার করিতে বলিলেন।

পরদিন প্রভাতে ক্যারিংটন গৌরী দত্তকে ডাকিয়া বলিলেন, 'আজই অপরাহ্নে আমি এই স্থান ত্যাগ করিব: তাম্বুগুলি অবিলম্বে গুটাইয়া লও। আমরা বৈলপাড়ায় অফিস স্থাপন করিব। এই সংবাদ শীঘ্র রেঞ্জ-অফিসারদিগকে জানাও।'

গৌরী দত্ত বলিল, 'বড়ই সদ্বিবেচনার কায হইল, সাহেব! এই স্থানটা অভিশপ্ত। আমাদের দূরে যাওয়াই উচিত।'

সেই দিন অপরাহ্ণ ৫টার সময় ক্যারিংটন বৈলপাড়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন; তিনি অপেক্ষাকৃত স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করিলেন। সেই সময় প্রমোদ সিং তাঁহার সম্মুখে আসিয়া গম্ভীর স্বরে বলিল, 'হুজুর, পরমানন্দ খালাসীর ভেদ-বমি আরম্ভ হইয়াছে; কিন্তু দাওয়াই দিবেন কি?'

ক্যারিংটন ব্যগ্রভাবে ভৃত্যগণের তাম্বুতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, পরমানন্দ খালাসীও যায় যায়! তিনি তাড়াতাড়ি 'রেষ্ট হাউসে' প্রত্যাগমন করিয়া তাহার জন্য কয়েকটি 'কলেরা-পিল' পাঠাইয়া দিলেন; কিন্তু ঔষধে কোন ফল হইল না। সে বেচারাও মধ্য-রাত্রিতে প্রাণত্যাগ করিল।

সাধুর ভবিষ্যৎবাণীর একাংশ সফল হইল।

ক্যারিংটন মনে মনে বলিলেন, 'বুড়া 'রাস্কেল' যাহা বলিয়াছিল, তাহাই ঘটিল দেখিতেছি! এবার বোধ হয় আমার পালা। আমি কোন কঠিন রোগে আক্রান্ত হইলে ভারত সরকারের চাকরী ত্যাগ করিতে বাধ্য হইব। বুড়া বলিয়াছে আমি অজস্র অর্থলাভ করিব। চাকরীই যদি গেল, তবে টাকা আসিবে কোথা হইতে? বুড়া সাধুকে কথাটা জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল।'

ক্যারিংটন এবার নাইনিতালে পলায়নের সঙ্কল্প করিলেন। নাইনিতাল সাগরতল হইতে ছয় হাজার ফুট ঊর্দ্ধে অবস্থিত; ইহা প্রাদেশিক সরকারের গ্রীষ্মনিবাস।

তিনি গৌরী দত্তকে ডাকিয়া বলিলেন, 'সমতল ক্ষেত্রে বাস করিতে আর আমার সাহস হয় না। এবার আমরা সোজা নাই-নিতালে যাত্রা করিব। মাহুতদের বল—তাহারা যেন তিন ঘণ্টার মধ্যে হাতীগুলাকে সজ্জিত করে।'

গৌরী দত্ত বলিল, 'তোফা ফন্দী করিয়াছেন, সার! নাইনিতাল চমৎকার স্বাস্থ্যকর স্থান। সেখানে কোন সংক্রামক ব্যাধির আক্রমণের ভয় নাই।'

প্রত্যূষে চারিটার সময় বৈলপাড়া হইতে যাত্রা করিয়া ক্যারিংটন সাড়ে ছয়টার সময় হিমালয়ের পাদস্থিত কালাবুঙ্গীর 'রেষ্ট-হাউসে' উপস্থিত হইলেন। তাহার পর অশ্বারোহণে অষ্টাদশ মাইল অতিক্রম করিলেন। তিনি মধ্যাহ্নকালে নাইনিতালে উপস্থিত হইয়া ডেপুটি কমিশনার মিঃ মরের নিকট সকল ঘটনার বিবরণ বিবৃত করিলে মিঃ মরে তাঁহাকে একমাস সেখানে বাস করিবার অনুমতি দান করিলেন।

পরে তিনি সংবাদ পাইলেন—কলেরা রামবাগে সংক্রামক হওয়ায় এই রোগে সেখানে কয়েক দিনের মধ্যেই দেড় শত লোকের মৃত্যু হইয়াছিল। ক্যারিংটন অতঃপর কালী-মন্দিরের সেই সাধুর সংবাদ লইবার জন্য ব্যগ্র হইলেন; কিন্তু কেহই সাধুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হইল না। কয়েক দিন পরে ক্যারিংটন এক জন কর্ম্মচারীর পত্র পাইলেন।

এই কর্ম্মচারী লিখিয়াছিল, 'হুজুরের আদেশে আমি কালী-মন্দিরে বাবাজির সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম; কিন্তু

মন্দিরে বাবাজিকে দেখিতে পাই নাই ; মন্দির খালি পড়িয়াছিল। বহু অনুসন্ধানেও বাবাজির সংবাদ জানিতে পারি নাই।'

কিন্তু বাবাজির শেষ ভবিষ্যদ্বাণীও সফল হইয়াছিল। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ক্যারিংটন ম্যালেরিয়া ও আমাশয় রোগে আক্রান্ত হইয়া এরূপ অকর্ম্মণ্য হইলেন যে, তাঁহাকে ভারত সরকারের বন-বিভাগের চাকরীতে ইস্তফা দিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইতে হইল। ভারতের ও বিলাতের ডাক্তারগণ তাঁহার রোগ পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছিলেন, ছয় মাসের অধিক কাল তাঁহার জীবনের আশা নাই; কিন্তু সাধুর ভবিষ্যদ্বাণীই সত্য; কিছু দিন স্বদেশে বাস করিয়া জল-বাতাসের গুণে তিনি রোগ-মুক্ত হইলেন, এবং পূর্ব্বস্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইলেন; কিন্তু প্রচুর অর্থাগমের কোন সম্ভাবনা দেখিতে পাইলেন না। অন্ধকারাচ্ছন্ন ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে কে জানে ?"

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

নারী

সুগোল বাহু তার কাঁকণ পরা,
শাসন করিতেছে বিরাট ধরা !
মুখেতে কথা তার ঝরিলে, পলে
জগতে কত মন আপনি টলে !
নিজেরে বলিদান দিয়েও কত প্রাণ
দরদ চায় তার নয়ন-ভরা।
সুগোল বাহু তার কাঁকণ পরা।

তাহারি তরে কবি সাধনা করে ;—
যামিনী আনে মধু পাতার পরে।
জোছনা তাই হয় মধুর অত—
কুসুম ফোটে তাই কাননে শত !
সুধার পাত্র সে বহিছে কত কাল
রচিছে মায়াজাল দরদ-ভরে—
তাহারি তরে কবি সাধনা করে।

একটি পরাণে যে জগৎ জাগে,
ব্যথিত প্রাণ ভবে জীবন মাগে।
কবিতা ফুটে ওঠে তরুর শাখে,
সুরভি দিনে তাই পাপিয়া ডাকে।—
বিজলী যায় খেলে আঁধারে অবহেলে,
আকাশ লাল হয় আবীর-রাগে।
একটি পরাণে যে জগত জাগে !

অজানা-কালে জাগা প্রকৃতি সে যে,—
পায়েতে ওঠে তার নূপুর বেজে।
সৃজন-সোনা-কাঠি তাহার করে
অভয় বর জাগে সাগর পরে।
ভারতী বেশে এসে মানসী হয় হেসে
অমরাবতী করে সাহারাকে যে !
অজানা-কালে জাগা প্রকৃতি সে যে !

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়।

রাজা ও মন্ত্রী

(রূপকথা)

এক রাজা আর তাঁর মন্ত্রী।

রাজার বয়স বেশী নয়। বছর খানেক হলো পুরোনো রাজা মারা গেছেন; ইনি ছেলে রাজা হয়ে সিংহাসনে বসেছেন। মন্ত্রীর বয়স হয়েছে। সাবেক মন্ত্রী।

সকালে রাজা বসেছেন রাজ-সভায়। পাত্রমিত্র, অমাত্যবর্গ রাজ্যের খপর শোনাচ্ছেন, এমন সময় মন্ত্রী এলেন। তাঁর মুখ মলিন।

মন্ত্রীর বিরস মুখ দেখে রাজা চমকে উঠলেন, ডাকলেন, —মন্ত্রিমশায়…

নিশ্বাস ফেলে মন্ত্রী বললেন—মহারাজ…

রাজা বললেন—আপনাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখছি!

মন্ত্রী বললেন—হাঁ মহারাজ। ঘরে যা কিছু পয়সা-কড়ি নিয়ে যাই, গৃহিণী দরাজ হাতে তা খরচ করেন। এই দেখুন না মহারাজ, আজ মাসের ষোল তারিখ—পয়লা তারিখে রাজকোষ থেকে মাইনে নিয়ে গেছি, ছেলে-মেয়েদের খাওয়া-দাওয়ায়, খেলনা-পুতুলে, জামা-কাপড়ে আর নিজের গহনা গড়িয়ে গৃহিণী তার সব খরচ করে ফেলেছেন। এখন মাসের বাকী এতগুলো দিন আমি কি করে চালাই, তাই মহা-ভাবনা হয়েছে।

রাজা বললেন—তার জন্য এত ভাবনা কেন? আপনি বাবার আমোল থেকে মন্ত্রিত্ব করছেন, আপনার দায়ে আমার দেখা কর্ত্তব্য। যা দরকার, খাতাঞ্চি-মশায়ের কাছ থেকে নিয়ে যাবেন'খন।

মন্ত্রীর দুশ্চিন্তা কাটলো। তিনি খুশী হলেন।

এমন সময় প্রহরী এসে খপর দিলে রাজপুরীর বাইরে পথে এক পশারী এসেছে, তার বাজরায় নানা রকমের জিনিষ। মহারাজের কাছে সে জিনিষ বেচতে চায়।

রাজা বললেন—নিয়ে এসো তাকে। ব্যবসায়ী-লোককে সাহায্য করা রাজার কর্ত্তব্য! আমি তার জিনিষ কিনবো।

পশারী এলো নানা রকমের পশরা নিয়ে। হাল ফ্যাশনের বিস্তর সব গহনা, কাচের চুড়ি, বাসন, পুতুল, হাতীর দাঁতের খেলনা—আরো কত কি। রাজা অনেক জিনিষপত্র কিনলেন। কিনে পাত্রকে দিলেন; মিত্রকে দিলেন; আমাত্যদের দিলেন। দিয়ে খাতাঞ্চিকে বললেন—ফর্দ্দ মিলিয়ে একে দামগুলো দিয়ে দিন, খাতাঞ্চি-মশায়।

সোনা-বাঁধানো একখানি মাথার চিরুণী নিয়ে মন্ত্রীমশায় উল্টে-পাল্টে দেখছিলেন। রাজা দেখলেন। দেখে বললেন—ওখানি পছন্দ হয় যদি, বেশ, নিন, মন্ত্রিণী-ঠাকরুণকে দেবেন।

মন্ত্রী অপ্রতিভ হলেন। বললেন না, না মহারাজ। মন্ত্রিণী-ঠাকরুণের আর চিরুণি মাথায় দেবার বয়স নেই। তাঁর মাথার চুল কতক গেছে পেকে, কতক গেছে উঠে। এ চিরুণী তিনি মাথার কোথায় গুঁজবেন? আর কি তাঁর সে খোঁপা আছে, মহারাজ!

রাজা বললেন—তা হোক, ওখানি নিন। বলবেন, খোকা-রাজা কিনে দেছে।

মন্ত্রী বললেন—আপনার দান তিনি মাথায় তুলে নেবেন।

মন্ত্রীকে সে-চিরুণী নিতে হলো।

পশারী খুশী-মনে বাজরায় পশরা গুছিয়ে তুলছিল। রাজা দেখলেন, বাজরার উপরে হাতীর দাঁতের তৈরী লম্বা একটা বাক্স। এ জিনিষটা তো দেখা হয়নি! তিনি বললেন—দেখি, দেখি, কি আছে ও-বাক্সে।

পশারী বললে—এ এক ভারী আশ্চর্য্যি বাক্স, মহারাজ। কাশীর এক সন্ন্যাসী আমায় দিয়েছিলেন। এ বাক্সে আছে ছোট একটি কৌটো আর তালপাতায় লেখা ছোট একখানা পুঁথি।

—বটে! বটে! দেখি তোমার সে কৌটো আর

রাজার হাতে পশারী তুলে দিলে হাতীর দাঁতের বাক্স। বাক্স খুলে রাজা দেখেন, পশারীর কথা সত্যি। বাক্সে আছে ছোট একটি কৌটো তাতে গুঁড়ো-নস্যি। আর পুঁথিখানা?

তাই তো! অক্ষর চেনেন না। রাজা পড়তে পারলেন না। মন্ত্রীর হাতে পুঁথি দিয়ে বললেন, সংস্কৃত লেখা, দেখুন তো, মন্ত্রীমশায়।

পুঁথি নেড়েচেড়ে মন্ত্রীমশায় তার অক্ষর বোধগম্য করতে পারলেন না। বললেন,—ছেলেবেলায় পণ্ডিতের কাছে সংস্কৃত পড়েছিলুম, মহারাজ। কিন্তু সে তো এ রকম অক্ষর নয়। সে সংস্কৃত বোঝা যেতো—এ সংস্কৃত বোঝবার জো নেই!

সভায় কেউ সে-অক্ষর বুঝতে পারলেন না। তখন টোল থেকে সভা-পণ্ডিতের ডাক পড়লো।

সভা-পণ্ডিত এলেন। রাজা বললেন—এ পুঁথির লেখা পড়ে দিন তো, সার্ব্বভৌম মশায়।

সভা-পণ্ডিত সার্ব্বভৌম মশায় অনেক-কষ্টে পুঁথির পাঠোদ্ধার করলেন। করে বললেন,—এ হলো পালি-ভাষা, মহারাজ। এতে লেখা আছে, কৌটোতে যে-নস্যি আছে, সে নস্যি নাকে দিয়ে মানুষ কামনা করে যে-কোনো রকমের পশু-পক্ষী কীট-পতঙ্গ হতে পারে। মানে, সিন্ধু ঘোটক গয় গবাক্ষ বাঘ ভাল্লুক থেকে আরম্ভ করে হাঁস চিল ময়ূর কাক,—মায় টিকটিকি গিরগিটি বিছে ছুঁচো উচ্চিংড়ে পর্য্যন্ত। আর সেই-রূপে সকল পশু-পক্ষীর ভাষা সে বুঝতে পারবে। কিন্তু সাবধান, পশু-পক্ষীর দেহ ধারণ করে থাকবার সময় কখ্‌খনো হাসবেন না—মরে গেলেও নয়! হাসলেই অনর্থ ঘটবে। হাসলে সঙ্গে সঙ্গে ফিরে-ফিরতি মানুষ হবার যে মন্তোর, সেই মন্তোর ভুলে যাবে।

রাজা বললেন—বাঃ, এ তো ভারী মজার নস্যি!

মন্ত্রী বললেন—তার পর যদি আবার সে মানুষ হতে চায়, তার মন্তোর?

সার্ব্বভৌম মশায় বললেন,—একটি মন্তোর লেখা আছে, মনে-মনে সেই মন্তোর উচ্চারণ করলেই আবার যে-মানুষ সেই মানুষ হবে।

এ কথা শুনে রাজার মন নেচে উঠলো! রাজা বললেন—এ বাক্সটি আমি কিনবো, পশারী। কত দাম নেবে, বলো।

পশারী বললো—আজ্ঞে মহারাজ, এটি তো আমি বেচবো না।

রাজা বললেন—কেন বেচবে না?

মন্ত্রী বললেন—দাঁও কষ্‌ছো বাপু! রাজার সখ হয়েছে বলে ভেবেচো, কেল্লা মেরেছো! তা হচ্ছে না। যদি না বেচো, তাহলে রাজ সরকারে এটি আমরা বাজেয়াপ্ত করবো, বুঝলে!

এ কথা শুনে পশারী গেল ভড়কে। বললে—তাহলে আপনি মহারাজ হচ্ছেন, নিন। নিয়ে দিন আমাকে এর দাম দশ-হাজার মোহর।

রাজা খাতাঞ্চিকে ডেকে বললেন একে দিন দশ হাজার মোহর…এ বাক্সর দাম।

দাম নিয়ে পশারী চলে গেল।

তার পর রাজা সকলকে বললেন—আজকের মত সভা ভঙ্গ হোক। আপনারা এখন বাড়ী যান। মন্ত্রী-মশায়ের সঙ্গে আমার একটা গূঢ় রকমের পরামর্শ আছে।

সকাল-সকাল ছুটী হতে অমাত্য-পাত্রমিত্রেরা সকলে খুশী হয়ে যে যার বাড়ী চলে গেলেন। তখন রাজা বললেন—আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে, মন্ত্রী-মশায়।

মন্ত্রী বললেন—কি মতলব, মহারাজ?

রাজা বললেন—আসুন, আমরা রাজ্যের বাইরে কোথাও গিয়ে এ নস্যি নাকে দিয়ে একজাতের পাখী হই। পাখী হয়ে উড়ে আকাশে বেশ খানিকটা চক্কর দিয়ে আসি।

নিশ্বাস ফেলে মন্ত্রী বললেন—মন্ত্রিণীর যে-রকম মেজাজ হয়েছে আজকাল…সত্যি মহারাজ, আমার এক একবার উড়তে সাধ হয়। কিন্তু ওড়া-বিদ্যে শিখিনি তো কখনো। শেষে সাঁতার-না-জানা-মানুষ সাঁতার কাটতে গিয়ে যেমন ডুবে মরে, যদি তেমনি একটা দুর্ঘটনা ঘটে?

রাজা বললেন—তা কেন হবে? যদি পাখী হই, তাহলে সেই সঙ্গে পাখীর ওড়ার শক্তি-সামর্থ্যও তো পাবো…

মন্ত্রী বললেন—পাবো তো বললেন, মহারাজ! কিন্তু বিশ্বাস কি? যদি না পাই? তখন?

রাজা বললেন,—তা কখনো হতে পারে? না, না, মন্ত্রীমশায়, আপনি আপত্তি করবেন না। আসুন, খাওয়া-দাওয়া সেরে দুজনে বেরিয়ে পড়ি। রাজধানী ছেড়ে অনেক দূরে গিয়ে কোনো খোলা মাঠে এ-নস্যির গুণাগুণ পরীক্ষা করা যাবে।

মন্ত্রীমশায় বললেন—পাখী যেন হলুম মহারাজ, তার পর আবার যখন আপনি মহারাজ আর আমি মন্ত্রীমশায় হতে চাইবো?

রাজা বললেন—কেন? তার মন্তোর তো পুঁথিতে লেখা আছে। মনে-মনে সেই মন্তোর বললেই আবার যে-মানুষ সেই মানুষ হবো।

মন্ত্রী বললেন—কিন্তু সে মন্তোর তো আমরা জানি না।

রাজা বললেন,—ঠিক! সভাপণ্ডিত-মশায়কে ডাকিয়ে বাঙলা অক্ষরে সে মন্তোর লিখিয়ে নি। নিয়ে দুজনে বেশ করে মুখস্থ করি। তাহলে তো আর গোল হবে না।

মাথা চুলকে মন্ত্রী বললেন,—কি জানি মহারাজ, আমার কেমন ভালো বোধ হচ্ছে না! আছি মানুষ…বেশ আছি। হঠাৎ মানুষের শরীর ছেড়ে পাখী হওয়া…যদি ধাতে সহ্য না হয়?

রাজা বললেন—না, না না, মন্ত্রীমশায়, আপনার বয়স হয়েছে বলে এত ভয় করছেন! কিন্তু আমি বলছি, কোনো ভয় নেই। সভাপণ্ডিতকে ডাকান। মন্তোরটা লিখে নিয়ে মুখস্থ করা যাক।

সভাপণ্ডিত মশায় এলেন; এসে মন্তোর লিখে দিলেন বাঙলা ভাষায়। মন্তোরটি ছোট। সে মন্তোর,

ওম্ হোম্ ফুটঃফটঃ ছট্!
মনুষ্য-দেহং পুনর্ঘট্!

মন্ত্রী বললেন,—দেখবেন পণ্ডিত-মশায়, অনুস্বার-বিসর্গগুলোয় যেন ভুল না হয়। এ সব হলো ভয়ঙ্কর মন্তোর! ঠাকুর-পূজোর মন্তোর নয় যে "লম্বোদর-সুতং"কে 'লম্বা-করো-সুতো' বলে চালিয়ে দেবেন! বুঝলেন?

সভাপণ্ডিত বললেন—না, না, ভুল হবে কেন? এই অনুস্বার-বিসর্গ নিয়েই সারা জীবন কাটিয়ে দিচ্ছি। আমার হবে অনুস্বার-বিসর্গে ভুল?

মন্তোর বলে' সভাপণ্ডিত চলে গেলেন। রাজা আর মন্ত্রী দুজনে বসে সে মন্তোর মুখস্থ করলেন। তার পর দুজনে দুজনের কাছে মুখস্থ-বিদ্যার পরীক্ষা দিলেন এবং পরীক্ষায় দুজনেই উত্তীর্ণ হলেন।

বিকেলে রোদ পড়ো-পড়ো। রাজা আর মন্ত্রী দুজনে দুজনের ঘোড়ায় চেপে সেই ঘোড়া হাঁকিয়ে দিলেন রাজধানীর বাইরে খোলা মাঠের দিকে।

মাঠে জনপ্রাণী নেই। এক ধারে মস্ত একটা বিল। সেই বিলে জড়ো হয়েছে রাজ্যের বক। রাজা বললেন—আসুন মন্ত্রীমশায়, নস্যি নাকে দিয়ে আমরা দুজনে বক হই…

কৌটো খুলে নাকে নস্যি দেবেন, মন্ত্রী বললেন—মন্তোরটা একবার আউড়ে নি আসুন, মহারাজ। নাহলে জানেন তো, কি অনর্থ যে না ঘটবে!

রাজা বললেন—ঠিক বলেছেন।

দুজনে মন্তোর আওড়ালেন উচ্চ-স্বরে,

ওম্ হোম্ ফুটঃফটঃ ছট্
মনুষ্য-দেহং পুনর্ঘট্!

মন্তোর উচ্চারণ করে দুজনেই নিশ্চিন্ত হলেন—হাঁ, মন্তোর তাহলে ভোলেন নি!

দুজনে নাকে এক-টিপ করে নস্যি নিলেন, সঙ্গে সঙ্গে মুখে বললেন—বক হবো।

দেখতে-দেখতে তাঁদের পাগুলো হলো লিক্‌লিকে সিড়িঙ্গে সরু; হাতগুলো হয়ে গেল বকের ডানা; গলাটা হলো সরু আর লম্বা এবং মুখ হুবহু বকের মতো ঠোঁটওয়ালা। সে মূর্তি দেখে কেউ আর কাউকে চিনতে পারলেন না!

রাজা বললেন,—জলের ধারে গিয়ে শোনা যাক বকের সভায় কিসের আলোচনা চলেছে।

দুজনে বক-বেশে এলেন জলের ধারে বেত-বনের আড়ালে। সত্যিকারের বকের দলে তখন চলেছে মস্ত আলোচনা। বকেরা বলাবলি করছে—

১। বক-রাজার এ কি মজার হুকুম বলো তো! তাঁর ছেলের বিয়েতে যত বককে ছেলে-বুড়ো মেয়ে-পুরুষ মিলে নাচতে-নাচতে বরযাত্রী যেতে হবে।

২। এ বয়সে নাচি কি করে? কখনো কি নাচ শিখেচি? না, কেউ শিখিয়েছে?

৩। মানুষদের দেখে বক-রাজার এ খেয়াল হয়েছে। সেখানে এখন রেওয়াজ উঠেছে নাচো, নাচো! নাহলে শরীর হবে বেজুত, স্বাস্থ্য হবে বেমজবুত!

৪। ও নিয়ম কি বকেদের খাটে?

৫। দুঃখ করে কি লাভ, বলো? রাজার হুকুম জানো তো, যে না নাচবে, তার গলাটি হবে কুচ্!

৬। আলোচনা রেখে এসো, নির্জ্জনে নাচ রপ্ত করি।

বকেরা নাচতে সুরু করলে। লম্বা ঠ্যাং তুলে সে যা নাচ···

নাচ দেখে রাজা আর মন্ত্রী দুজনেই হো-হো করে হেসে উঠলেন। সে কি হাসি! সে হাসি আর থামতে চায় না।

হাসতে হাসতে মন্ত্রী হঠাৎ শিউরে উঠলেন, ডাকলেন,—মহারাজ···

হাসতে হাসতে রাজা বললেন—কি বলচেন মন্ত্রী মশায়?

মন্ত্রী তখন দু'চোখে দেখচেন সর্ষের ক্ষেত! তাঁর প্রাণ উড়ে গেছে! তিনি বললেন—কি সর্ব্বনাশ করলুম! হেসে ফেলেছি···মন্ত্রোর?

রাজা বললেন—সে মন্তোর ভোলবার জো কি! অত জোর মুখস্থ করেছি। সেই তো মন্তোর···

রাজা মন্তোর উচ্চারণ করতে গেলেন, পারলেন না। মন্তোর গেছেন ভুলে! মন্ত্রী-মশায়েরও সেই দশা!

রাজা বললেন—কি সে মন্তোরটা? আহা, আগেকার কথা হচ্ছে ওম্! তার পর?

মন্ত্রী বললেন—ব্যোম্! না, না, তাই তো! পরের কোনো কথা আর মনে পড়ছে না যে, মহারাজ···

রাজা বললেন—ভাবুন, ভাবুন। সেই যে কথা, ছটফট্ না, ঝটপট্! লটপট্! না। মটমট্···

নিশ্বাস ফেলে মন্ত্রী বললেন—না, না, না···ওরে বাবা, কিছুই যে মনে পড়ছে না।

দুজনে অনেক চেষ্টা করলেন। বর্ণমালার সমস্ত অক্ষর-গুলোর পিছনে 'ট' বসিয়ে কত কথাই না তৈরী করলেন। কিন্তু সে-মন্তোর আর মনে পড়ে না! দুজনে ফট-ফট ভুলে বাতনায় ছটফট করে বেড়াতে লাগলেন।

সারা রাত···তার পরের দিন···তার পরের দিন।

মন্তোর কিছুতেই মনে পড়লো না। দুজনে নিশ্বাস ফেলে বললেন—এ জীবনটা বক পাখী হয়েই কাটাতে হবে শেষে···

মন্ত্রী বললেন—ছেলেমানুষের বুদ্ধিতে চলে' আজ এই দুর্দ্দশা। এই জন্যেই শাস্ত্রে বলেছে মহারাজ, বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যং···তখন মানা করেছিলুম।

রাজা বললেন—দুঃখ কি মন্ত্রী মশায়! মানুষ তো এ্যাদ্দিন ছিলুম। বাকী জীবনটা যদি বক হয়ে কাটাতে হয়···একটা নতুন রকম কিছু হবে। এমনটি আর কখনো হয়েছে?

নিরুপায়···

দুজনে বক হয়ে উড়ে বেড়ান। লোকালয়ে যেতে গেলে মন্ত্রী মানা করেন, বলেন—না মহারাজ! কে শেষে গুলি মেরে শীকার করে বসবে! পৈত্রিক প্রাণটাও কি যাবে!

বনে-বনে মাঠে-মাঠে দুজনে উড়ে বেড়ান। বকরা খায় কাঁচা মাছ, পোকা-মাকড়···

মন্ত্রী বলেন—ও-সব খাওয়া মুখে রুচবে কেন, মহারাজ? দেহখানা বকের হলেও রুচিটা তো মানুষের।

রাজা বললেন—বনের ফল খেয়ে থাকতে পারবো না?

নিশ্বাস ফেলে মন্ত্রী বললেন—অগত্যা।

তাই হলো।

দু'মাস পরে মন্ত্রীর নিষেধ না শুনে রাজা বললেন—রাজ্যে যাবো। উড়ে-উড়ে দেখতে হবে, রাজ্যে কি কাণ্ড হচ্ছে।

মন্ত্রী বললেন—চলুন। আমারো বাসনা মহারাজ, ঘর-সংসার আছে? না, ছেলেপিলে-গিন্নী সব না খেতে পেয়ে প্রাণে মারা গেছে?

এলেন দুজনে উড়তে উড়তে রাজ্যে। এ গাছে বসেন, ও গাছে বসেন—সে বাড়ীর ছাদে ওঠেন, আর এক বাড়ীর কার্ণিশে কখনো···

হঠাৎ দেখেন বাজনা-বাদ্যির ঘটা। পথে বেরিয়েছে মস্ত মিছিল। ব্যাপার কি?

ব্যাপার তখনি বুঝলেন। সেনাপতি-মশায় সিংহাসনটি দখল করে রাজা হয়ে বসেছেন। তাঁর অভিষেক হয়েছে। সেনাপতি-রাজা এখন বাজনা বাদ্যি করে রাজ্য-প্রদক্ষিণে বেরিয়েছেন, প্রজাদের কাছ থেকে নজরানা আদায় করবার জন্য!

রাজা বললেন—দেখেছেন মন্ত্রী মশায়, কত বড় দুরাত্মা ঐ সেনাপতি!

মন্ত্রী বললেন—দেখে আর কি হবে, মহারাজ! কিছু তো করতে পারবেন না। বকের কি-বা শক্তি, কতখানি বা সামর্থ্য!

রাজা ভাবলেন, ঠিক! তিনি ভেবে এসেছিলেন, বক হয়ে রাজত্ব করা চলবে না সত্যি। তবু এই রাজ্যেই ঐ লালদীঘির ধারে বাসা বেঁধে বাস করবেন। কিন্তু সেনাপতির স্পর্দ্ধা দেখে রাগে গা গিষ্‌গিষ্‌ করতে লাগলো। তিনি বললেন—চলুন মন্ত্রী মশায়, এ রাজ্যে আর থাকবো না।

মন্ত্রী নিজের বাড়ীর চিল-কোঠার ছাদে বসে-বসে দেখছিলেন—ছেলেমেয়ে-গিন্নী সকলে খাশা আছেন! খাওয়া-দাওয়ার ভারী ঘটা! তাঁর আমলে ছিল মৌরুলো মাছ আর কুচো চিংড়ীর বরাদ্দ! এখন দু'বেলা চলেছে পোলাও-কালিয়া মাছ-মাংস-রাবড়ির ধূম! তার উপরে সেদিন শুনলেন, পাশের বাড়ীর গিন্নী মন্ত্রিণীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করছেন, মন্ত্রী-মশায় ফিরবেন কবে গো, মন্ত্রিণী ঠাকরুণ?

মন্ত্রিণী বললেন—কে জানে? বুড়ো বয়সে মৃগয়া করতে গেছেন। পায়ে বাত নিয়ে ফিরবেন'খন। তখন দেখে নেবো, কে সে-বাতে মহামাষ তেল মালিশ করে দেয়! আমার বয়ে গেছে…

মন্ত্রীর বুকে বাজলো এ-সব মুগুরের মতো! মনে-মনে তিনি বললেন, ধেত্তেরি! এদের জন্যে আমি করি এত মায়া! আর মায়া নয়!

মন্ত্রী বললেন—চলুন, মহারাজ। সত্যি, এ রাজ্যে আর নয়।

উড়তে উড়তে দুজনে কত দেশ, কত নদ, কত নদী, কত পাহাড় পার হলেন। পার হয়ে শেষে এলেন কাশীতে।

মন্ত্রী বললেন—এইখানেই বাস করা যাক মহারাজ; কাশীতে মারা গেলে আর-জন্মে মহাদেব হবো। শাস্ত্রে লেখে, কাশীতে মারা গেলে শিবত্ব-প্রাপ্তি।

একটা পুরোনো পোড়ো ভাঙ্গা মন্দিরে দুজনে নিলেন আশ্রয়। এধারে জনপ্রাণী বাস করে না। মন্দিরের কোথাও একটা টিকটিকি-আর্শুলারও দেখা মিললো না।

রাত্রে দুজনে ঘুমোচ্ছেন। নিশুতি রাত। হঠাৎ কান্নার শব্দে দুজনের ঘুম গেল ভেঙ্গে।

রাজা বললেন—কে কাঁদে?

মন্ত্রী বললেন—ভূত।

রাজা বললেন,—দেখতে হবে।

মন্ত্রী বললেন খবর্দ্দার মহারাজ! বক হয়েও প্রাণটা যা হোক বেঁচে আছে, শেষে ভূতের হাতে সে-প্রাণ…

রাজা হাসলেন, বললেন—ভূত আমি মানি না, মন্ত্রীমশায়।

মন্ত্রী নিরুপায়। ছোকরা-রাজার পাল্লায় পড়ে যে দুর্গতি ঘটেছে! আরো কি না ঘটবে, ভেবে তিনি নিশ্বাস ফেললেন।

রাজা বেরুলেন—কান্নার শব্দ লক্ষ্য করে। বেশী দূর যেতে হলো না। পাশের ভাঙ্গা নাট-মন্দিরের কার্ণিশ থেকে কান্নার শব্দ আসছিল।

রাজা চেয়ে দেখলেন। সেদিন ছিল জ্যোৎস্না রাত… জ্যোৎস্নার আলোয় দেখেন, ঘুলঘুলিতে একটি লক্ষ্মী-প্যাচা।

রাজা বললেন—তুমিই কাঁদচো?

লক্ষ্মী-প্যাচা বললে হ্যা।

রাজা বললেন—প্যাচার আবার দুঃখ কি?

মন্ত্রী বললো—পোকা মাকড় খেতে পায় নি মহারাজ, তাই কাঁদছে।

লক্ষ্মী-প্যাঁচা বললে—আমি প্যাঁচা নই। আমি হলুম মৌটুশী রাজ্যের রাজকন্যা। একটা বুড়ো যাদুকর তার ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে চেয়েছিল। এসে বাবার কাছে সে কথা বলতে বাবা রাগে চাবুক মেরে তাকে তাড়িয়ে দ্যান। সেই অপমানে সে একদিন বাগানে আমাকে একা পেয়ে মন্তোর পড়ে লক্ষ্মী-প্যাঁচা করে দেয়। সেই অবধি প্যাঁচা হয়ে আছি।…দিনের বেলায় বেরুবার জো নেই। রাজ্যের পাখী আঁচড়ে কামড়ে

ঠুকরে সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করে দেয়। রাত্রে বেরুতে ভয় করে। প্যাচার দেহ হলেও রাজকন্যা তো আমি!

রাজা বললেন,—তুমি মন্তোর ভুলে গেছ বুঝি? রাজকন্যা হবার মন্তোর?

লক্ষীপ্যাচা বললে,—অনেক দেবতার মন্দিরে কেঁদে কেঁদে ফিরেছি, আমার মন্তোর নেই! কোনো দেবতার দয়া হয়নি। শেষে এই কাশীতে এসে বাবা বিশ্বনাথের মন্দিরের কোটরে আশ্রয় নিয়েছিলুম। রোজ রাত্রে বাবার কাছে কেঁদে কাকুতি জানিয়েছি, আবার আমায় মানুষ করে দাও, বাবা। রাজকন্যা না করো, গরীব-ভিখিরী করে দাও, তাতেই আমি স্বর্গ পাবো! বাবা দয়া করলেন। বললেন, পোড়ো-মন্দিরে গিয়ে আশ্রয় নে। তোর মতো আর কোনো মানুষ যদি যাতুকরের যাতুতে পাখী হয়ে তোর কাছে কখনো আসে, তবে তার দ্বারাই শুধু তোর মুক্তি হতে পারে। নাহলে মুক্তির অন্য কোনো উপায় নেই।···তাই আমি রোজ কাঁদি। কেঁদে বাবা-বিশ্বনাথকে বলি, হে বাবা-বিশ্বনাথ, কবে এমন মানুষ-পাখী তুমি এনে দেবে?

রাজা বললেন,—বটে! তাহলে তোমার ভয় নেই। আমরা বক নই। যাতু-মায়ায় আমরা বক হয়ে আছি!··· কিন্তু আমাদের মানুষ হবার যে মন্তোর, সে মন্তোর আমরা ভুলে গেছি। কে-বা সে মন্তোর বলে দেবে, কাজেই আমাদের উদ্ধারের আর আশা দেখি না।

—নাঃ! বলে' মন্ত্রী ছেলেমানুষের মতো কেঁদে উঠলেন।

লক্ষীপ্যাচা বললে—তোমার যাতুর বৃত্তান্ত আমাকে বলতে পারো?

রাজা বললেন—নিশ্চয়।

রাজা সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন।

শুনে লক্ষীপ্যাচা বললে—বুঝেছি। এ'ও সেই যাতুকরের কাজ। তার ছেলে—সেই তো তোমার রাজ্যে সেনাপতি ছিল। এখন রাজা হয়ে তোমার সিংহাসনে বসেছে। তা দাঁড়াও, সে মন্তোর আমি উদ্ধার করে দেবো।

রাজা বললেন—কি করে পারবে?

লক্ষীপ্যাচা বললে—সেই যাতুকর তার দল নিয়ে এই ভাঙ্গা মন্দিরে আসে···প্রতি-অমাবস্যায়। এখানে এসে কালী পূজো করে। তা অমাবস্যার তো আর দেরী নেই। সে এসে আমাকে আজো লোভ দেখায়। বলে, যদি তার ছেলেকে বিয়ে করি, তাহলে সে আবার আমাকে রাজকন্যা করে দেবে।···এবারে সে এলে বুদ্ধি করে' তোমাদের মন্তোর আমি ঠিক আদায় করে নেবো।···

অমাবস্যার দিন গভীর রাত্রে যাতুকর এলো। সঙ্গে দশ বারো জন সঙ্গী। ক'জনে মিলে কালী পূজো করলে; তার পর খাওয়া-দাওয়া।

খেতে বসে লক্ষীপ্যাচাকে ডাকলে, বললে—আমার কথায় রাজী আছো? আমার ছেলেকে বিয়ে করবে? সে এখন এক রাজ্যের রাজা। আমার শক্তি বুঝচো তো!

লক্ষীপ্যাচা বললে—উঃ, ভারী তো শক্তি! আমার মতো একটা বাচ্চা মেয়েকে ভুলিয়ে লক্ষীপ্যাচা করা—এতে আবার শক্তি কি? এমন শক্তির আর-কোনো পরিচয় কোথাও দিয়েছো, বলতে পারো?

তাচ্ছলের অট্টহাস্য-রব তুলে যাতুকর বললে—দিইনি? যাতুকর তখন রাজা আর মন্ত্রীর বক হবার বৃত্তান্ত খুলে বললে।

শুনে লক্ষীপ্যাচা বললে—তাদের আবার মানুষ করে দিতে পারো···আছে তোমার এমন শক্তি?

যাতুকর বললে—নেই? হা-হা-হা! একটা মন্তোর আছে। সে মন্তোর

ওম্ হোম্ ফুটঃফটঃ ছট্
মনুষ্য-দেহং পুনর্ঘট্!

রাজা আর মন্ত্রী ছিলেন পাশের ঘরে ওৎ পেতে। যাতুকর যেমন মন্তোর বলেছে, অমনি সঙ্গে সঙ্গে তুজনে সেই মন্তোর উচ্চারণ করলেন!

মন্তোর উচ্চারণ করবামাত্র বকের দেহ—গলা, পা বকের ঠোঁট কোথায় গেল মিলিয়ে! তুজনে হলেন আবার সেই আগেকার রাজা আর মন্ত্রী।

রাজা এক মুহূর্ত্ত দাঁড়ালেন না। তলোয়ার খুলে পাশের ঘরে ঢুকে যাতুকরের গলায় দিলেন একটি চোট বসিয়ে! যাতুকরের ধড় থেকে মাথাটি কুচ্ করে' কেটে মাটীতে লুটিয়ে পড়লো। রক্তের ফোয়ারা ছুটলো।···

ব্যাপার দেখে যাদুকরের লোকজন একেবারে হতভম্ব !

গর্জ্জন করে রাজা বললেন—এইবারে তোদের পালা। তোরা ঐ দুরাত্মার সঙ্গী···

ভয়ে তারা রাজার পায়ের উপরে পড়ে মিনতি-ভরে বললে—দোহাই মহারাজ, আমাদের ক্ষমা করবেন। আমরা যাদুবিদ্যা জানি না। ওর কালী-পূজোয় আমরা নেমন্তন্ন খেতে এসেছিলুম ! বললে, দ্বাদশটি ব্রাহ্মণ-ভোজন করাবো। তাই। আমরা ব্রাহ্মণ, মহারাজ !

এ কথা বলে' তারা পৈতে তুলে দেখালে।

রাজা বললেন—যাও, তোমাদের ক্ষমা করলুম। কিন্তু ফের যদি দেখি তোমরা এমনি বাঁদরামি করে বেড়াচ্ছো, তাহলে তোমাদের ব্রাহ্মণ বলে মানবো না, বদমায়েস-বাঁদর বলে এই তলোয়ারের চোটে···বুঝেচো ?

তারা বলে উঠলো—খুব বুঝেছি মহারাজ···

বলেই তারা পড়ে-কি-মরে এমনিভাবে দিলে চম্পট।

তখন রাজার দৃষ্টি পড়লো ঘরে। লক্ষ্মীপ্যাঁচা ? লক্ষ্মীপ্যাঁচা কোথায় গেল ? নেই ! তার বদলে সুন্দর ঐ মেয়েটি এলো কোথা থেকে ?

হেসে মেয়েটি বললে,—আমি সেই লক্ষ্মীপ্যাঁচা। আমার যাদু কেটে গেছে মহারাজের কৃপায়।

মন্ত্রী বললেন—আপনি তাহলে নিশ্চয় যাবেন বাপের রাজ্যে ?

মেয়েটি বললেন---মহারাজ যদি অনুমতি দ্যান্ ! উনি আমায় উদ্ধার করেছেন। ওঁর অনুমতি ছাড়া আমার কোথাও যাবার জো নেই।

এবারে মন্ত্রীর মন্ত্রী-বুদ্ধি খুললো। মন্ত্রী বললেন---এক কাজ করুন মহারাজ। উনি হলেন রাজকন্যা। আপনিও মহারাজা—আইবুড়ো-রাজা। তার উপরে দুজনেই পক্ষি-জন্ম ধারণ করেছিলেন। এমন রাজযোটক মিল ! মহারাজ রাজকন্যাকে বিয়ে করে ফেলুন। তার পর মহারাণীকে সঙ্গে নিয়ে শ্বশুরবাড়ী ঘুরে নিজের রাজ্যে চলুন। সেখানে সিংহাসন জুড়ে বসে আছে আর-একটা পাপাত্মা দুর্জ্জন ! তাকে শায়েস্তা করে নিজের বেদখল-সিংহাসন আবার নতুন করে দখল করে' তাতে চেপে বসবেন।

রাজা বললেন—বেশ কথা বলেছেন মন্ত্রি-মশায় ! কিন্তু এতদিন পরে রাজ্যে ফিরে গেলে সকলে যখন জিজ্ঞাসা করবে, এ্যাদ্দিন কোথায় ছিলেন মহারাজ ?

মন্ত্রী বললেন—তার জবাব আমি দেবো। আমি বলবো, রাজ্যে যোগ্য পাত্রী পাইনি বলে অনেক দূরের এক রাজ্যে গিয়ে সেখানকার রাজকন্যার সঙ্গে মহারাজের বিয়ে দিয়ে মহারাণী নিয়ে এলুম।

এবং তাই হলো। রাজা রাজ্যে ফিরলেন রাণী নিয়ে। শ্বশুর-রাজার সৈন্য-সামন্ত এলো সঙ্গে। এ খপর পাবামাত্র সেনাপতি সিংহাসন ছেড়ে কোথায় যে চম্পট দিলে, আজ পর্য্যন্ত তার আর কোনো সন্ধান মেলে নি !

শ্রীসত্যেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

কীট-পতঙ্গের সমাজ

পরস্পরের সঙ্গে দেখা হলে যদি মনের ভাব প্রকাশ করতে চাই, তাহলে আমরা কি করি ? কথা কয়ে মনের ভাব প্রকাশ করি ; কিম্বা ইঙ্গিতে-ভঙ্গীতে সে কাজটুকু সেরে নি।

কীট-পতঙ্গ-সমাজেও ভাবের আদান-প্রদান চলে,—এবং এ আদান-প্রদানের প্রণালী আমাদের সমাজের ভাব-প্রকাশের প্রণালীর চেয়ে অনেক ভালো।

ভাব-প্রকাশের জন্য মুখে আমরা বিচিত্র শব্দ সৃষ্টি করি। শৃঙ্খলিত নিয়মে সে শব্দ-সমষ্টি থেকে ভাষার সৃষ্টি হয়েছে। মৌমাছি এবং পিপীলিকারা ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সকল রকমের সংবাদ বার্ত্তা প্রকাশ ও প্রচার করে। তাদের এ প্রকাশ-প্রণালী খুবই শৃঙ্খলিত।

মৌমাছি এবং পিপীলিকাদেরও ভাষা আছে। সে ভাষার প্রকাশ গন্ধে। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, মানুষ যদি তার ঘ্রাণ-শক্তির বিকাশ-সাধন (develop) করতো, তাহলে এই নাসিকার সাহায্যে মানুষ আজ কীট-পতঙ্গ সমাজের ভাষা বুঝতে সমর্থ হতো।

আমেরিকার প্রসিদ্ধ কৃষি-শাস্ত্রবিদ-অধ্যাপক ডক্টর এন্, ই ম্যাকইণ্ডো মৌমাছিদের ভাষা-রীতি জানবার জন্য বহু সাধনা করেছেন। প্রথমে তাঁর মনে কৌতূহল জাগে —এই যে বিপুল মৌমাছি-সমাজে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি

মৌমাছি বিচরণ করছে, এরা আত্মীয়-বন্ধুদের পরস্পরকে কি করে চিনতে পারে? জান্‌তে পারে? কি করে পরস্পরের মধ্যে খপর-বার্ত্তা দেয়? কি করে অবোলা জীব —এরা শত্রুর অভিযান বোঝে?

কেউ কেউ বলেন, চোখের দৃষ্টিশক্তির সাহায্যে এই জানাজানি আর চেনাচেনি হয়। কিন্তু তা কখনো সম্ভব বলে' মনে হয় না। এক-একটি সমাজে বা চাকে গড়ে প্রায় হাজার জীবের বাস। শুধু দৃষ্টি-শক্তির সাহায্যে এত জীবকে চেনা যাবে, এ কথায় আস্থা রাখা কঠিন! ম্যাকইণ্ডো অনুমান করলেন, দৃষ্টি-শক্তির কথাটা ঠিক নয়! নিশ্চয় এ জানাজানি এবং খপরাখপর দেওয়ার অন্য রকম উপায় আছে।

কি সে উপায়?

এই উপায়-নির্দ্ধারণের জন্য ডক্টর ম্যাকইণ্ডো বহু অধ্যবসায়ে বহু অনুশীলন করেছেন এবং অনুশীলনের ফলে তিনি জানতে পারলেন, গন্ধই হলো মৌমাছি ও পিপীলিকা-সমাজে ভাব-প্রকাশের ভাষা। নানা পরীক্ষায় তিনি প্রমাণ পেলেন—বহু কীট-পতঙ্গের বর্ণ-পার্থক্য বোঝবার শক্তি অসাধারণ রকমের। তাছাড়া একটি বিশেষ গন্ধই যে তারা নিমেষে উপলব্ধি করে, তা নয়; বহু গন্ধের সমষ্টি থেকেও প্রত্যেকটি গন্ধ চক্ষের নিমেষে বিচ্ছিন্নভাবে এরা উপলব্ধি করতে পারে। এই যে তাদের গন্ধ-উপলব্ধি শক্তি বা গন্ধ-জ্ঞান, এ জ্ঞান বেশ জটিল। একটি বিশেষ গন্ধে যেমন একটিমাত্র বাক্য বোঝা যায়, তেমনি বহু মিশ্র গন্ধ থেকে তারা এক-একটি ছত্র বা প্যারাগ্রাফের মর্ম্ম উপলব্ধি করে। এবং এমনি বহু গন্ধে বা ছত্রের তারা সমগ্র বিষয়টি বুঝে নেয়।

মাকড়শার পায়ের শুঁড়ে গন্ধ-থলি

এই জটিল-তত্ত্ব আবিষ্কার করতে গিয়ে ডক্টর ম্যাকইণ্ডো আর এক বিচিত্র তত্ত্ব জানতে পেরেছেন। সে তত্ত্ব মৌমাছি এবং পিপীলিকা-সমাজে ছটি মূল (fundamental odors) গন্ধ আছে। এবং এ ছটি মূল-গন্ধকে প্রোফেসর ম্যাকইণ্ডো আমাদের বর্ণমালার সঙ্গে তুলনা করে মৌমাছি ও পিপীলিকা-সমাজের আদি-বর্ণমালা আখ্যা দিয়েছেন।

কোটি-কোটি মৌমাছি-সমাজে প্রত্যেকটি মৌমাছির

একটি বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র গন্ধ আছে। Every bee has its own odor.—এ সত্য ম্যাকইণ্ডো নিঃসংশয়-ভাবে জেনেছেন। আরো জেনেছেন, রাণী-মৌমাছির গায়ের গন্ধ এক রকম; কর্ম্মী-মৌমাছিদের গায়ের গন্ধ সম্পূর্ণ আলাদা রকমের। এক-চাকের এক মৌমাছি-রাণীর ছেলেমেয়েদের গায়ের গন্ধ হয় তাদের মায়ের গায়ের গন্ধের মতো; তার উপরে থাকে তাদের নিজেদের গায়ের স্বতন্ত্র বিশিষ্ট গন্ধ।

বৈশিষ্ট্য, সেই বৈশিষ্ট্য যেন তার রাজতিলক! জন্মক্ষণেই মৌমাছি-সমাজ সে-গন্ধে চিনে নেয়, বয়স-কালে এই মৌমাছি হবে চাকের রাণী বা সর্ব্বময়ী কর্ত্রী।

যে-চাকে রাণী নেই, সে চাক বিপ্লবী-বিরোধীদের আড্ডা। সেখানে শৃঙ্খলা দেখা যায় না। রাণীর ঐ বিশিষ্ট গন্ধে যে-ভাষা ব্যঞ্জিত হয়, সেই ভাষার প্রভাবেই মৌচাকের কর্ম্মী-সমাজ খুশী-মনে কাজ করে, মৌচাকে শান্তি বিরাজ করে। যে চাকে রাণী নেই, সে চাকের
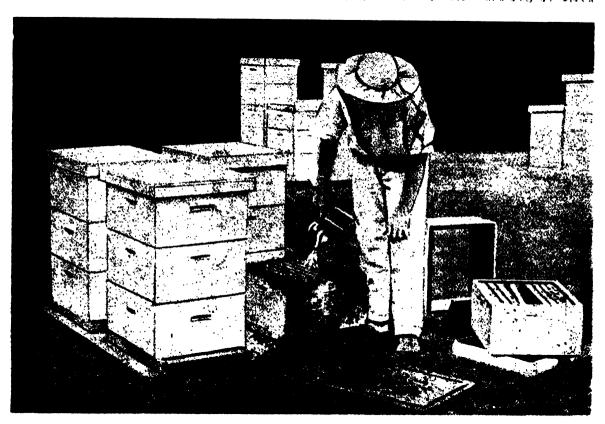
সুরভি-সার দিয়া জাতি-পরীক্ষা

ডক্টর ম্যাক্ইণ্ডো মৌমাছি-সমাজের সম্বন্ধে সুগভীর অনুশীলন করে দেখেছেন, যে-মৌমাছি চাকের রাণী বা সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হয়, তার যা কিছু প্রভাব বা শক্তি নির্ভর করে তার ঐ গায়ের বিশিষ্ট গন্ধে। আমাদের মানব-সমাজে রাশিচক্র বা হাতের রেখা দেখে আমরা যেমন বলি, অমুক মেয়ের ভাগ্য খুব ভালো হবে; অমুকের বরাৎ লক্ষ্মীছাড়া—তেমনি মৌমাছি-রাণীর গায়ের গন্ধে যে

মৌমাছিরা হয় অত্যন্ত অলস আর হিংসুটে। সে-চাকে অশান্তি-উপদ্রব চলে সারাক্ষণ।

কর্ম্মী-মৌমাছিরা দিনের কাজ চুকিয়ে যখন চাকে ফেরে, তখন চাকের প্রবেশ-পথে প্রথমেই তাদের দেখা হয় চাকের রক্ষী-মৌমাছিদের সঙ্গে। গায়ের গন্ধে রক্ষী-মৌমাছিরা চিনতে পারে, এ মৌমাছিরা আমাদের এ চাকের। কাজেই তাদের প্রবেশ হয় নিরুপদ্রব। কোনো মৌমাছি যদি পরের

চাকে অনধিকার প্রবেশ করতে চায়, রক্ষী-মৌমাছিরা তার গায়ের গন্ধে নিমেষে জানতে পারে, এটা এ-চাকের মৌমাছি নয়; এ চাকে সে ট্রেশ্‌পাস্‌ করছে কোনো অভিসন্ধি নিয়ে! অমনি তাকে সদলে তারা

মাকড়শার জালে বন্দী গন্ধ-মুগ্ধ পতঙ্গ

আক্রমণ করে। রক্ষী-মৌমাছিদের গন্ধ-স্তানে ধুলো দিয়ে অন্য-চাকের মৌমাছি চাকে ঢুকবে, সে-উপায় মৌমাছি-রাজ্যে নেই।

তবে মৌমাছিদের এই বিশিষ্ট গন্ধ যাবার ভয় আছে বিলক্ষণ। (A bee is in danger of losing its pass-word or odor) এ সম্বন্ধে ম্যাক্‌ইণ্ডো দেখে-ছেন, চাক থেকে একাদিক্রমে তিন দিন যদি কোনো মৌমাছিকে চাক-ছাড়া করে রাখা যায়, তাহলে তার চাকের গন্ধ বিলুপ্ত হয়। সে অবস্থায় জাত-হারা মৌমাছির চাকে ফেরবার আর উপায় থাকে না! চাকে ঢুকতে গেলে রক্ষীদের পীড়নে তার পক্ষে প্রাণ বাঁচানো দুর্ঘট হয়।

কিন্তু শুধু এই গন্ধেই যে মৌমাছিরা ভাব প্রকাশ করে, তা নয়। খুব বেশী খুশী হলে মৌমাছিরা নৃত্য করে। ডক্‌টর ম্যাকইণ্ডো মৌমাছিদের বহু ভঙ্গীর নৃত্যলীলা দেখেছেন।

জার্ম্মাণ পশুতত্ত্ববিদ ভন্‌ ফ্রিশ্‌ বলেন,—মৌমাছি-সমা-জের নাচের নেশা ঠিক মানব-সমাজের অনুরূপ। মধু নিয়ে

নাসায় গন্ধ লইয়া পিপীলিকাদের পথ-নির্ম্মাণ

চাকে ফিরে মৌমাছিরা প্রথমেই নেচে মনের আনন্দ-আবেগ প্রকাশ করে। এ নাচ না কি কতকটা ওয়াল্‌জ্‌ নাচের মতো। মধু নিয়ে চাকে ফেরবামাত্র রক্ষী-মৌমাছিরা কর্ম্মীদের অভিবাদন জানায়; এবং ঝাঁকে-ঝাঁকে তারা চাকের মৌমাছিদের সঙ্গে গায়ে-গায়ে মেলা-মেশা করে। গায়ে-গায়ে এ মেলা-মেশার নাম কোলাকুলি বা 'শেকহ্যাণ্ড' করা। এ মিলনে চাকের মৌমাছিরা পায় বহি-র্জগতের খপর-বার্ত্তা। চাকের মৌমাছিরা মধু বা পুষ্পবাহী মৌমাছিদের পিঠে তুলে বরণ করে নেয়। দিনের শেষে কাজ করে ঘরে ফিরে এমন সমাদর মানব-সমাজের বড় বড় ব্যারিষ্টার বা সদাগর বা বড় চাকুরেদের ভাগ্যে মেলে কি না সন্দেহ!

মৌমাছিদের স্বভাব অনেকটা মানুষের মতো। যতক্ষণ কাজে উৎসাহ থাকে, ততক্ষণ চাকে কি আনন্দ, কি শৃঙ্খলা! সকলেই খুশী! সকলেই নড়ে-চড়ে বেড়াচ্ছে

মৌমাছিদের পুলক-নৃত্য

ফুলের গায়ে পদরেখা
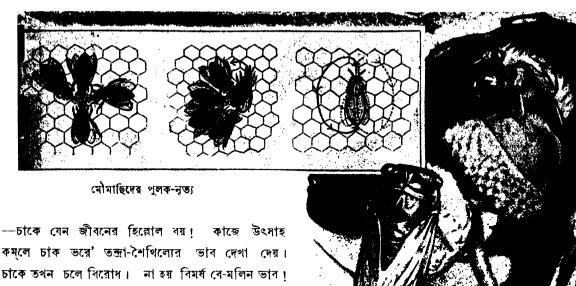
—চাকে যেন জীবনের হিল্লোল বয়! কাজে উৎসাহ কম্‌লে চাক ভরে' তন্দ্রা-শৈথিল্যের ভাব দেখা দেয়। চাকে তখন চলে বিরোধ। না হয় বিমর্ষ বে-মলিন ভাব!

ডক্টর ম্যাকইণ্ডো আর একটি কথা বলেছেন। তিনি বলেন,—পুষ্পে-পুষ্পে বিচরণ-কালে মৌমাছিরা অনেক সময় তাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয় আবদ্ধ রাখে; পুষ্পে পরাগ বা মধু পেলে ঘ্রাণেন্দ্রিয় মুক্ত করে। মুক্ত করে পুষ্পদলে নিজের গন্ধ-রেশ রেখে যায়। অর্থাৎ প্রমাণ রেখে যায় যে, এ ফুলে বসে পরাগ বা মধু যা নেবার, তা নিয়েছি! যেন attendance-bookএ সই করা!

মৌমাছির পায়ে গন্ধথলি

মৌমাছিদের আর একটি গুণ আছে—এক চাকের মৌমাছি যে ফুল থেকে মধু বা পরাগ আহরণ করে, সে ফুলে অন্য চাকের মৌমাছি কখনো বসে না! অর্থাৎ পরের ক্ষেতে যাওয়া তারা গর্হিত মনে করে।
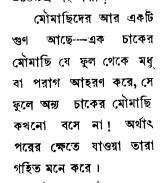
ডক্টর ম্যাকইণ্ডো শুধু মৌমাছি-সমাজ নিয়েই অনুশীলন করেন নি—পিপীলিকা-সমাজটাকেও তন্ন তন্ন করে দেখেছেন। মৌমাছিদের প্রধান ভাষা যেমন গন্ধ, পিপীলিকা-সমাজেরও তেমনি প্রধান ভাষা এই গন্ধ। গন্ধ দ্বারা তারাও ভাবের আদান-প্রদান এবং বার্তা জ্ঞাপন করে।

কতকগুলি পিপীলিকার গায়ের গন্ধ ধোঁয়াটে-ধরণের; কোনোটার বা কষা; কোনোটার গন্ধ ঈথরের গন্ধের মতো! কোনোটার গন্ধ লেবুর মতো; কোনোটার বা জিরানিয়ামের মতো; কোনোটার বা দালচিনির মতো। এমনি নানা গন্ধ দেখা যায়। যেখানে যায়, সেইখানেই পিপীলিকারা চরণ-রেখায় নিজ-নিজ জাত ও বাসার গন্ধরেখা রেখে যায়।

ম্যাজিক

ম্যাজিক কথাটার বাঙলা প্রতিশব্দ ভেলকি বা ভোজ-বাজি অর্থাৎ ফাঁকি! আমরা সকলেই ম্যাজিক দেখতে ভালোবাসি। জানি, ম্যাজিসিয়ান বা যাদুকর আমাদের ঠকাচ্ছেন,—বুদ্ধি-বৃত্তিতে তাঁর কাছে আমরা ঠক্‌ছি; তবু এ ঠকায় আমরা আনন্দ পাই অনেকখানি। এবং এ আনন্দ যে উপভোগ করি তার কারণ, যাদুকরের হাতের

কশরতি এবং বাহাদুরিতে আমাদের মন প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

ম্যাজিকের ওস্তাদী নির্ভর করে হাত-সাফাইয়ের উপর। এ বিষয়ে যিনি যত কুশলী এবং ক্ষিপ্র-গতিতে কাজ করতে পারেন, তাঁর ম্যাজিক হয় তত সফল এবং সার্থক।

ম্যাজিক-দেখানোয় কৃতিত্ব লাভ করতে হলে আর একটি গুণ থাকা দরকার। সে গুণ বাক্‌চাতুর্য্যে দর্শকদের ভুলিয়ে রাখা। কেন না, যত বেশী তাঁদের ভুলোতে পারবেন, ততই তাঁদের সেই অন্যমনস্কতার ফাঁকে যাদুকরের খেলা অভূতপূর্ব্ব বিভ্রম-রচনায় সমর্থ হবে।

আজ আমরা খুব সহজ রকমের ক'টি ম্যাজিকের কথা বলবো। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি বেশ নিষ্ঠাভরে সাধনা করো, তাহলে প্রকাশ্য সাধারণ রঙ্গমঞ্চে সে-ম্যাজিক দেখিয়ে সকলের তাক্ লাগাতে না পারলেও নিজেদের বাড়ীর আসরে বৈঠকখানায় সে-ম্যাজিক দেখিয়ে সে সকলকে খুশী করতে পারবে, তাতে সন্দেহ নেই।

প্রথমে বলি, ডিশের উপর থেকে পয়সা বা টাকার তাড়া সরানোর কথা।

একখানা ডিশ-প্লেট বা চায়ের পিরীচ নাও; আর নাও বিশ পঁচিশটি টাকা বা পয়সা। টাকা বা পয়সাগুলি প্লেটের উপরে রাখো। থাড়া-থাড়িভাবে রাখতে হবে; আলাদা-আলাদা রাখা নয়। এই ছবিতে যেমন একটির উপরে আর একটি, তার উপরে আর একটি করে টাকা বা পয়সাগুলি রাখা হয়েছে, এমনি-ভাবে রাখতে হবে। এখন ঐ ডিশের উপর থেকে টাকা-পয়সাগুলি টেবিলের উপরে ছুড়ে ফেলতে হবে এমন কৌশলে, যে পয়সাগুলি একসঙ্গে আঁটা থাকবে,—ছড়িয়ে পড়বে না। কি করে তা হবে, বলি।

এ খেলায় হাত নাড়ার বেশ একটু কৌশল শিক্ষা করতে হবে। প্রথমে মক্সো করবার সময় প্লেটের বদলে বাঁধানো মোটা বইয়ের উপরে পয়সা রেখে অভ্যাস করো। নাহলে অনভ্যস্ত হাতে প্রাকটিশ্ করতে গেলে ডিশ-প্লেট ভাঙ্গবে অনেকগুলি।

এ ম্যাজিকে ডিশখানি ধরো ঠিক ঐ ছবিতে যেভাবে ধরা হয়েছে, তেমনি ভঙ্গীতে। টাকা-পয়সা তাড়াবন্দী-

ডিশের ওপর থেকে টাকা-পয়সা ফেলা
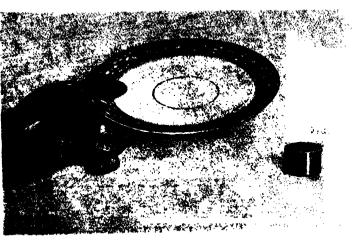
ভাবে ডিশের মাঝখানে রাখো। রেখেছো? এবারে কব্জীতে জোর রেখে ডিশখানিকে একটু নীচে এবং
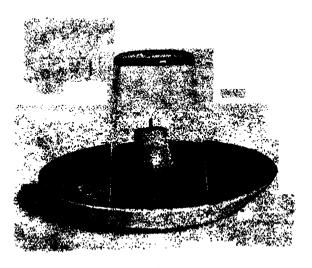
বাতি ও ডিশ

বাইরের দিকে ছোড়বার ভঙ্গীতে ক্ষিপ্রভাবে ঝাঁকানি দাও। ডিশের ওপরে রাখা পয়সার তাড়া স্থানচ্যুত হয়ে এক সঙ্গে যেমন আছে, তেমনিভাবে ডিশ থেকে টেবিলের

ওপরে এসে পড়বে। এই ঝাঁকানি দেবার সময় যদি ডিশখানি কোনো দিকে বেশী হেলে থাকে বা বেঁকে যায়, তাহলে পয়সাগুলি বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে পড়বে। দু'দশ বারের অভ্যাসে ডিশ-নাড়ার এ কায়দাটুকু রপ্ত হবে।

দ্বিতীয় বাজির চাই একখানি কানা-উঁচু ডিশ, ছোট এক-টুক্‌রো বাতি, একটি কাচের গ্লাশ, আর সেই সঙ্গে দেশলাই ও খানিকটা জল।

প্রথমেই দর্শকদের ডিশখানি দেখাও। দেখিয়ে ডিশখানি টেবিলের উপরে রেখে তাতে খানিকটা জল ঢালো। কাণায়-কাণায় জল নিয়ো না। ডিশে জল ঢেলে সেই জলে একটা পয়সা কিম্বা একটা আধুলি বা টাকা রাখো। এই পয়সা, আধুলি বা টাকা যা রাখবে, এমন ভাবে তা রাখা চাই, যেন সেটি জলে ডুবে থাকে; অথচ সেটি থাকবে ডিশের কাণার কাছে। এবার দর্শকদের ডেকে বলো---তাঁরা আঙুল না ভিজিয়ে ডিশ থেকে ঐ পয়সা বা আধুলি-টাকা তুলতে পারেন কি না? (ছবিতে গ্যাখো—ডিশের কোন্‌খানে পয়সা আছে) তোমার প্রশ্নের উত্তর তাঁরা বলবেন--না, তাঁরা তা করতে পার্‌বেন না! বেশ, তাঁরা না পেরে হার মেনে নিজেদের আসনে গিয়ে বসলে তুমি বলবে,--আপনারা পারলেন না! দেখুন, আমি পারি।

এ-কথা বলে ঐ ছোট বাতিটুকু ডিশের ঠিক মাঝখানে রেখে বাতিটি জেলে দেবে; বাতি জল্‌লে কাচের গ্লাশটি নিয়ে উপুড় ক'রে সে বাতিটি দাও ঢেকে। গেলাস দিয়ে জলন্ত বাতি ঢাকবামাত্র বাতি নিভে যাবে; এবং প্লেটের জল ঐ গেলাসের নীচে ফেঁপে উঁচু হ'য়ে এসে জম্‌বে। গেলাসের বাইরে ডিশের উপরে যেখানে পয়সা বা টাকা আধুলি রেখেছো, সেখানে জল থাকবে না। তখন আঙুল না ভিজিয়ে ঐ টাকা-পয়সা হাতে তুলে সকলকে তুমি দেখাবে। হাসির লহর বয়ে যাবে।

কেন এমন হলো, জানো? জলন্ত বাতিটি যে-মুহূর্ত্তে গেলাস-চাপা দিলে, সেই মুহূর্ত্তে গেলাসের মধ্যকার বাতাসটুকু অগ্নিশিখার তাপে হাল্‌কা হয়ে বেরিয়ে এলো এবং অক্সিজেনের অভাবে বাতি গেল নিভে! এ ব্যাপার ঘটবার সঙ্গে-সঙ্গে গেলাসের ভিতরকার বাতাসটুকু ঠাণ্ডা হলো; ঠাণ্ডা হবামাত্র ভিতরকার জল সঙ্কুচিত হয়ে যে-vacuumএর সৃষ্টি করলো, সে vacuum পূরণ করতে প্লেটের মাঝখানকার জলটুকুকে শুষে সে ভিতরে টেনে নিলে!

এবারে ক'টা দেশলাইয়ের কাঠি নিয়ে তিন-নম্বরের ম্যাজিক দেখাও। দেশলাইয়ের তিনটি কাঠি নিয়ে একটি ত্রিভুজ (triangle) রচনা করো। এ তিনটি কাঠির কাছা-কাছি আরো তিনটি কাঠি রাখো। এইবার দর্শকদের বলো, শেষের তিনটি কাঠি নিয়ে তাঁরা আরো তিনটি বা
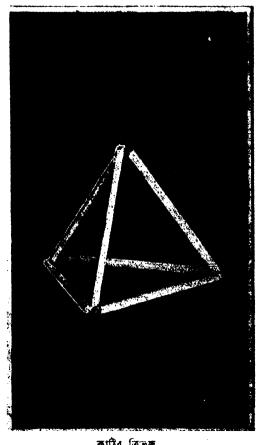
কাঠির ত্রিভুজ

চারটি ত্রিভুজ বা triangle তৈরী করতে পারেন কি না? খুব সম্ভব তাঁরা বল্‌বেন, না, পারবো না।

তাঁরা হার মান্‌লে তোমার পালা। পাশের ছবি গ্যাখো,—ঠিক এমনি ভঙ্গীতে শেষের এ-তিনটি কাঠি নিয়ে তিনটি ত্রিভুজ রচনা করবে।

এবারে ও-পাতায় ছবির দিকে গ্যাখো তো। একটি কাচের গ্লাশের কাণার উপরে পাৎলা এক-টুক্‌রো কাগজের এক প্রান্তে একটি পয়সা বা আধুলি রয়েছে। এমনভাবে

কায়দা করে কাগজটুকু সরিয়ে নিতে পারো—যে কাগজ সরিয়ে নিলেও পয়সা বা আধুলিটি কাগজের ঐ দিক্‌টা টেনে বার করে নিলেও গেলাসের কাণায় ব্যালান্স রেখে খাড়া থাকবে—পড়ে যাবে না? কি করে এ খেলা দেখাবে, বলি শোনো।

পাৎলা একটা কাগজের স্লিপ কেটে নাও। স্লিপের এক দিক্ তুমি দু হাতের আঙুলে ধরে থাক্‌বে। (ছবির ভঙ্গীতে) আর এক দিক্ থাক্‌বে গেলাসের উপরে এবং গেলাসের এক দিকে স্লিপ-কাগজের উপরে রাখবে পয়সা বা আধুলি।

টাকার ব্যালান্স

এইবারে হাতের কৌশল-পর্ব্ব! ছবিতে দেখচো কাগজের যে-দিক্‌টা আঙুলে টিপে ধরে আছে—ডান হাতের একটি আঙুল দিয়ে ঐ প্রান্তটুকু একটু নীচের দিকে হেলিয়ে সজোরে টানতে হবে। টানলে দেখবে, কাগজ চলে এসেছে; আধুলি বা পয়সাটি রয়ে গেছে গেলাশের কাণায়। তার ব্যালান্স টলেনি!

এ খেলাটি খুবই সহজ—অভ্যাসে হাতের এ টান ক্রমে এমন রপ্ত হবে যে, ব্যর্থতার কোনো আশঙ্কা থাকবে না।

আর একটি ম্যাজিকের রহস্য-কথা বলে এবারের মতো শেষ করি।

ম্যাজিক দেখতে গিয়ে সকলেই দেখেছো, দর্শকদের কাছ থেকে যাদুকর এক-একখানি রুমাল চেয়ে নেন; নিয়ে সেগুলো কোণে-কোণে বেঁধে ডাঁই করে তোলেন। তার পরে তিনি দু'চারটে বাক্‌চাতুর্য্যে দর্শকদের হাসিয়ে বিভ্রান্ত করে বাঁধা রুমালগুলিতে দেন দেশলাই জেলে। আগুনে সকলের সামনে রুমালগুলি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। তিনি তখন বড় একটা টুপির তলায় সেই ছাই ঢাকা দিয়ে টুপির উপরে একখানা হাড় বা 'মায়া-ছড়ি' বুলিয়ে টুপি তুলে সেই বাঁধা রুমালগুলি অপণ্ড অক্ষত ভাবে প্রত্যর্পণ করেন। এ ব্যাপার দেখে দর্শকদের দলে বিপুল হাততালি ওঠে।

এ ম্যাজিকের রহস্য জানো? এ খেলা দেখাবার আগে যাদুকর নিজের একগাদা রুমাল এক সঙ্গে কোণে কোণে বেঁধে জড়ো করে লুকিয়ে রাখেন। তার পর দর্শকদের কাছ থেকে ন্যান্ তাঁদের রুমাল; দর্শকদের রুমাল নিয়ে কোণে কোণে সেগুলো এক সঙ্গে বেঁধে দর্শকদের দেখান—তার পরেই সুরু হয় তাঁর ফাঁকির কশরতি। বচন-চাতুর্য্য এবং তার ফাঁকে ধাঁ করে রুমালের এই বাণ্ডিল তিনি জামার হাতার মধ্যে বা অন্য কোথাও লুকিয়ে রাখেন এবং নিজের পুঁজির সেই রুমালগুলিতে লাগান আগুন! যাদুকরের নিজের রুমাল আগুনে পুড়ে ছাই হয় এবং তার পর হাতের কশরতিতে দর্শকদের রুমালগুলি বেরোয় তাঁর টুপির তলা থেকে! এ খেলার সাফল্য নির্ভর করে স্রেফ হাতের কশরতির উপরে।
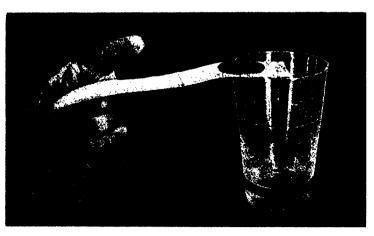
ভাঁজ-করা কাগজের রুমাল

পাৎলা কাগজের রুমাল নিয়েও এ খেলা দেখানো যায়। রুমালের-সাইজের পাৎলা কাগজ দেখেছো? বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। এই কাগজ-রুমালের দাম খুব শস্তা! এই কাগজে অনেকে বিয়ের সময় পদ্য ছাপান—সেই রুমালের কথা বলছি। এমনি রুমাল নিয়ে খুব মিহি ভাঁজ করে যাদুকর একখানি রুমাল রাখেন নিজের

আঙুলের টিপে গুঁজে গোপনভাবে এবং আর একখানি কাগজের রুমাল বার করে তিনি দর্শকদের দেখান। দর্শকদের দেখা হলে এই রুমালটিতে লাগান আগুন। এ রুমালটি পুড়ে ছাই হলে যাদুকর তাঁর আঙুলের-ভাঁজে-লুকোনো কাগজের রুমাল বার করে সকলের তাক্ লাগিয়ে দ্যান।

কাগজের রুমাল নিয়ে যে-খেলা হয়, তার ছবি দেওয়া হলো। শেষের ছবিতে দেখবে, কাগজের রুমাল ভাঁজ করে কি ভাবে আঙুলের ভাঁজে লুকিয়ে রাখা হয়। লুকিয়ে রেখে হাত নাড়া বা হাত দেখানো—এটুকুতেই যা কৌশল! এ কৌশল যাদুকর বহু-সাধনায় রপ্ত করেন। ঘরে এ সব ব্যায়ামের দস্তুরমতো রিহার্শাল দিয়ে তবেই আসরে নামেন ম্যাজিক দেখাতে; নাহলে আনাড়ি-হাত হলে ব্যাত্রমের সীমা থাকবে না!

চিঠি

মা,

এবার তোমায় চিঠি লিখছি অনেক দিনের পরে।
লেখাপড়া, নানা ফ্যাসাদ,—বোঝাই কেমন করে?
কাল-বোশেখী নেই বোশেখে, গরমেতে মরি।
আম-জামরুল ফল্‌লো কেমন, লিখো সত্যি করি'!

শ্বশুর বাড়ী থেকে 'রাণী' আসছে না কি সত্যি?
ছেলেটি তার কেমন আছে? কবে পেলে পত্তি?
ভেবেছিলেম, এই ছুটীতে ঘুরে আসবো বাড়ী!
তিনু মামা বদলি হয়ে বাসা দিয়ে ছাড়ি
চলে গেল বাখরগঞ্জে। কোথায় থাকি? শেষে
অনেক দেখে-শুনে আমি এসেছি এক মেশে।
না, না, মেশের নাম শুনে মা চম্‌কে উঠো না,
এ-মেশ্ ভালো—সকল দিকে দিব্যি ভদ্রয়ানা।
নাওয়া-খাওয়া-শোওয়া-পড়ার খাশা বন্দোবস্ত;
আলো-বাতাস খ্যালে—ঘরের আছে দৈর্ঘ্য-প্রস্থ।
দেহের যত্ন করি। তুমি বলে দেছ যা-যা,
প্রতি-কথা মেনে চলি। মিথ্যে বলি নে মা।
তুমি, বাবা কেমন আছো? কেমন আছে কাকা?
চিঠি পাবামাত্র আমায় পাঠিয়ো কুড়ি টাকা।

মেশে থাকতে খরচ বড়—
ধার হয়েছে অনেক জড়ো;
মেশে উঠতে খরচ হলো মিথ্যে কটা টাকা!
বাড়লো নাপিত-ধোপার খরচ। যাবে কি আর থাকা?
ভাবছি, দুধটা বন্ধ করি! কাজ কি গাওয়া-ঘীয়ে?
বিকেলে রোজ বেড়িয়ে আসবো বরং মাঠে গিয়ে!
লেখাপড়া বন্ধ হবে? ভাবছি, এ কি জ্বালা—
এত টাকা একটা ছেলের পিছনেতে ঢালা
অসাধ্য যে! সেদিন হঠাৎ হাজির বন্ধু-মামা—
আমার কাছে টাকা নিয়ে কিনলে জুতো-জামা।
বল্‌লে, বড় টানাটানি—ও-মাসেতে দেবে।
আমার কিসে চলবে যে তার দিশে না পাই ভেবে।
প্রতি-মাসে টেনে যত খরচ করতে চাই,—
এটা, না হয় ওটা ঘটে,—কামাই তারি নাই!

যাহোক, প্রণাম দিয়ো-নিয়ো তুমি, বাবা, কাকা।
ভুলো না মা—চিঠি পেয়ে পাঠিয়ো কুড়ি টাকা।

শ্রীসুচিত্রা মুখোপাধ্যায়।

ছবির প্রতিমূর্ত্তি

খুব পাৎলা কাঠে-আঁটা ষ্টারের মতো শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের ফটো-মূর্ত্তি বাজারে এখন কিনতে পাওয়া যায়। শুধু এ সব ফটো-মূর্ত্তি কেন, হরপার্ব্বতী, রাধা-কৃষ্ণ, রাম-সীতা এবং অন্য দেব-দেবীর এমনি রঙীন প্রতিমূর্ত্তিও বাজারে মেলে; এবং ঐ সব ছবির প্রতিমূর্ত্তি কিনে এনে অনেকে ঘর সাজাচ্ছেন।

এ সব ছবির মূর্ত্তি রাখলে ঘরে বাহার খোলে সত্যি; কিন্তু এতে একটা মুস্কিল আছে এই যে, দোকানীর রুচি-অনুযায়ী আমাদের ছবির মূর্ত্তি সংগ্রহ করতে হয়; আমাদের নিজেদের রুচি-মাফিক ছবির মূর্ত্তি পাবার আশা থাকে না! অথচ এই ছবির প্রতিমূর্ত্তি—আমাদের যেমন খুশী—ঘরে স্বহস্তে তৈরী করা খুবই সহজ।

অ্যাশ্-ট্রে

এবারে আমরা এই ছবির মূর্ত্তি-রচনার কৌশল-কাহিনী বলছি।

এ মূর্ত্তি তৈরী করতে প্রথমে চাই ছবি। যদি দেশের কোনো বড় লোক কিম্বা নিজেদের আত্মীয়-বন্ধুর ছবির প্রতিমূর্ত্তি গড়তে চান, তাহলে সর্ব্বাগ্রে সংগ্রহ করুন তাঁর ফটোগ্রাফ। যে সাইজের প্রতিমূর্ত্তি গড়বেন, ফটো-খানি সেই সাইজ-মাফিক এনলার্জ্জ করিয়ে নেবেন। তার পরে চাই খুব পাৎলা কাঠ। এই পাৎলা কাঠে ছবি এঁটে ঠিক ঐ ছবি-আঁটা কাঠের অংশটুকু বজায় রেখে বাড়তি-কাঠের অংশ কেটে বাদ দিন। এ কাঠ কাটবার জন্য চাই খুব মিহি-গড়নের করাত। এ রকম করাত ও আনুসঙ্গিক ছোটসাইজের র‍্যাঁদা, তুরপুন প্রভৃতি যা বাজারে কিনতে পাওয়া যায় এবং তার দাম তেমন বেশী নয়।

শুধু মুখখানি

পাশাপাশি ছবির দৃষ্টান্ত ধরে রচনা-প্রণালীর কথা এবার বুঝিয়ে দিচ্ছি।

ধরুন, ছোট একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে—তার পার্শ্বমূর্ত্তি বা পাশ-ফিরে-দাঁড়ানো (side-view) মূর্ত্তি তৈরী করতে চান। তেমনি-ধরণে দাঁড়-করিয়ে নেওয়া মেয়েটির ফটো এনলার্জ্জ করিয়ে নেবেন। মেয়ের ছবি হলো ধরুন দশ ইঞ্চি। এই মেয়েটির মূর্ত্তি দিয়ে একটি 'ছাই-ঝাড়া পাত্র' (ash-tray) তৈরী করতে চান্। প্রথমে মেয়েটির এনলার্জ্জ-করা ফটো-ছবি কাঁচি দিয়ে নিপুণভাবে কেটে নিন। এমন ভাবে কাটবেন, যেন মেয়েটির দেহ ছাড়া বাইরের কোনো অংশ তার সঙ্গে না লেগে থাকে। এবারে এই ছবি-খানি খুব মিহি পাৎলা কাঠের গায়ে শিরীষের আঠা দিয়ে আঁটুন। এঁটে ঐ ছবির রেখায়-রেখায় করাত চালিয়ে কাঠখানি কেটে নিন। মেয়েটির পায়ের তলার দিকে আধ ইঞ্চিটাক কাঠ রাখবেন; কেটে বাদ দেবেন না।

এবার আর এক-টুক্‌রো কাঠ নিন এটা হবে ছবির মূর্ত্তি আঁটবার জমি বা base। এই 'জমি' বা base-কাঠের মাঝামাঝি গর্ত্ত করে সেই গর্ত্তে মেয়ের মূর্ত্তির পায়ের নীচে যে কাঠটুকু রেখেছেন, সেটা কাপে-কাপে বসিয়ে এঁটে নিন। মূর্ত্তি খাড়া দাঁড়িয়ে থাকবে।

এবার ঐ মেয়েটির হাতে একটি পাত্র এঁটে দিতে হবে; সেই পাত্রে চুরুটের ছাই ঝাড়বেন। এ্যালুমিনিয়ামের ছোট একটি এ্যাশ-ট্রে কিনে এনে মেয়ের মূর্ত্তির প্রসারিত ছুই হাতের কাঠের উপর এই ট্রেটি কাঁটা-পেরেক মেরে এঁটে নিন—'ফিগার'-ওয়ালা এ্যাশ-ট্রে তৈরী হবে। ফটোখানি যদি বাড়ীর কোনো মেয়ের বা ছেলের হয়, তাহলে সে এ্যাশ-ট্রেতে গৃহসজ্জা এবং আনন্দ ছুই পাবেন!

ফটোর মূর্ত্তিটিতে যদি রঙ দিয়ে ন্যান, তাহলে মূর্ত্তিটি আরো সজীব দেখাবে। রঙ দিতে হলে ও-বিদ্যায় অবশ্য পটুতা থাকা চাই। যেমন-খুশী রঙ ল্যাবড়ালে ছবির বাহার খুলবে না, এ-কথা বলা বাহুল্য মাত্র।

এই প্রণালীতে ঘর সাজাবার জন্য যেমন-খুশী ছবি নিতে পারেন। প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি—ধরুন, কাঞ্চনজঙ্ঘা, কিম্বা কাশ্মীরের লেক, পাহাড়; কিম্বা বাঙলার পল্লীগ্রামের দৃশ্য; কিম্বা সহরের ঐ ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল বা মনুমেণ্ট—এ সবের ছবি নিয়েও পাৎলা কাঠে এঁটে ঐভাবে টেবিলের সজ্জা-ভূষণ সম্পাদন করতে পারেন।

ভোমর্-যন্ত্র ঠোঁট-ফুটোনো

টাই-র‍্যাক্

পাৎলা কাঠ ছ্যাঁদা করবার জন্য 'ড্রিল' বা ভোমর বা যে যন্ত্র চাই, পাশের ছবিতে তার প্রতিলিপি দেওয়া হলো।

ছবিতে দেখবেন একটি মেয়ের মুখখানির ছবি নিয়ে গৃহ-সজ্জার জন্য কি সুন্দর মূর্ত্তি রচা হয়েছে। এ মূর্ত্তিটি ঠিক ঐ প্রণালীতেই তৈরী করতে পারবেন।

ফটোগ্রাফের এ-সব মূর্ত্তি গৃহ-সজ্জার পক্ষে সত্যই অপরূপ। আমাদের দেশের ছোট-ছোট মেয়েরা কাগজ কেটে পুতুলের আদর্শে পুতুল তৈরী করে; ক্যাটালগ থেকে বা বইয়ের ছবি রেখায়-রেখায় কাঁচি দিয়ে কেটে তাই নিয়ে পুতুল-খেলার রকমারি সখ মেটায়। ঐ কাটা ছবি অনুরূপ-মিহি-কাঠে এঁটে নিলে সেগুলি মজবুত হবে এবং অনেক দিন টেঁকবে।

আজকাল আমাদের দেশে বিলিতি পোষাকের খুবই রেওয়াজ চলেছে। নেকটাই রাখবার জন্য একটু রকমারি টাই-র‍্যাক (tie-rack) চান? বেশ, আপনার ছোট ছেলের বা মেয়ের ফটো এনলার্জ্জ করিয়ে নিন্। শুধু মুখটুকু—মাথা থেকে গলা পর্য্যন্ত নেবেন। এ ছবি কেটে নিন ও-পাতায় ছবি দেখে ওম্নি রেখায়-রেখায়। এবারে এই ছবি এঁটে নিন পাতলা তক্তায়। এঁটে মুখ-বিবরে ছাঁদা করুন। ছাঁদা করবেন খুব সাবধানে—ছবির মুখে দুটি ঠোঁট চিরে; তারপর সেই ছিদ্র-পথে লম্বা সরু লোহার বা পিতলের রড চালিয়ে দিন। কাঠের যে-অংশ বাইরে বেরিয়ে থাকবে, সে অংশে টাই ঝুলিয়ে রাখুন। ঐ সরু রডের অপর দিক দেওয়ালে বা কাঠের ব্লকে গুঁজে দিন; চমৎকার টাই-র‍্যাক তৈরী হবে। এমনি ভাবে গামছা, তোয়ালে বা রুমাল রাখবার জন্য বাহারি র‍্যাক তৈরী করতে পারেন। দেখলে মনে হবে, মেয়েটি যেন দাঁত দিয়ে টাই বা রুমাল-গামছা চেপে রয়েছে!

এই প্রণালীতে নিজের নিজের রুচি-মাফিক প্রয়োজনীয় বহু গৃহসজ্জা—ফুলদানি, বাতিদান প্রভৃতি—সহজেই তৈরী করতে পারেন। এবং এতে যে কৃতিত্ব প্রকাশ পাবে, তার দাম সামান্য হবে না!

কাঠে আঁটা পুতুল

পুতুলের মডেল

সূচী-শিল্প

এবারে একটা নতুন ধরণের এমব্রয়ডারীর কথা বলবো। একে বলে "ওল্ড ইংলিশ-এমব্রয়ডারী" এ-সব সেলাই আমাদের কাঁথা-শিল্পের মত পুরোনো।

কুশনের ওপরের নক্সাটি ভালো করে দেখুন; তার পরে সবিশেষ মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করুন পাশের নক্সাটি—যাতে ১।২।৩ ইত্যাদি নম্বর দেওয়া আছে। কি ভাবে সেই নম্বর-দেওয়া অংশগুলি ভরাতে হবে, সে সম্বন্ধে নির্দ্দেশ দেবো পরে।

এইভাবে ঘর কেটে নক্সাটি তুলে দেবার উদ্দেশ্য—যারা মানচিত্র-আঁকার (যেমন ১ ইঞ্চি = ১০০ বর্গ-মাইল) পদ্ধতি জানেন, তাঁরা সেই নিয়ম-অনুসারে এটিকে বড় করে এঁকে কিম্বা আঁকিয়ে নেবেন।

এই সেলাইটি করবেন বেশ মোটা কাপড়ের ওপর—কেন না সেলাইটি করতে হবে পশম (wool) দিয়ে। কাজেই যে-কাপড়ের ওপরে নক্সা তুলবেন, সে-কাপড়টি মোটা খদ্দর-জাতীয় হওয়া চাই।

তার উপর এ ব্যায়ামে শ্রী ও সৌন্দর্য্য-সম্পদ লাভ করিবেন।

নাচে দেহের যে উপকার হয়, এ ব্যায়ামেও ঠিক সেই উপকার মিলিবে।

এ ব্যায়ামের জন্য একটা 'বল' সংগ্রহ করিবেন। ছেলেরা যে-বল লইয়া খেলা করে—রবার বা প্লাশের বল।

এবারে ব্যায়াম-লীলার কথা বলি।

২। বল ছুড়িয়া

জোড়া-পায়ে মেঝের উপরে দাঁড়ান—ডান হাতে বলটি নিন। এবারে পা হইতে কোমর পর্য্যন্ত বেশ টাইট খাড়া রাখিয়া কোমরের উপর হইতে মাথা পর্য্যন্ত দেহের উর্দ্ধভাগ সামনের দিকে নোয়াইয়া দিন। দুই হাত থাকিবে পিছন দিকে—বলটি থাকিবে ডান হাতের চেটোর উপরে (১ নং ছবি দেখুন)। এইভাবে দাঁড়াইয়া দেহের উর্দ্ধভাগ ক্ষিপ্র সোজা করিয়া সঙ্গে সঙ্গে বলটি ছুড়িয়া দিন উপর-দিকে (২ নং ছবির ভঙ্গীতে); এবং ঐ বল দু'হাতে লুফিতে থাকুন। এইভাবে এ ব্যায়াম প্রথম প্রথম করিবেন ছ'বার; তার পর সংখ্যা বাড়াইয়া ষোলবার করিতে হইবে।

দু' নম্বর ছবির ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া উপর দিকে

৩। হাঁটু মুড়িয়া বসিয়া বল লোফা

বল ছুড়িয়া সঙ্গে সঙ্গে ৩ নং ছবির ভঙ্গীতে হাঁটু মুড়িয়া দু'হাত প্রসারিত করিয়া প্রসারিত সেই দু'হাতে বল লুফিয়া লইবেন। একবার উঠিয়া দাঁড়াইয়া বল ছোড়া এবং পরক্ষণে হাঁটু মুড়িয়া বসিয়া সে বল লুফিতে হইবে। এ ব্যায়াম করিবেন পনেরো বার, ষোল বার।

৪ নং ছবির ভঙ্গীতে দাঁড়ান। বাঁ পায়ে ভর দিয়া ডান

পা পিছন দিকে মেলিয়া দাঁড়ান। দুই হাত সামনের দিকে ঊর্দ্ধে প্রসারিত করিয়া মৃদু লম্ফ দিয়া বল লোফালুফি করিয়া ঘরময় বিচরণ করুন। দশ-মিনিট কাল এ ব্যায়াম করিতে হইবে।

একখানি চেয়ারে বা বেঞ্চে বসুন। দুই হাত সামনের দিকে প্রসারিত করিয়া দিন। ডান হাতে থাকিবে বল; বাঁ হাত রাখিবেন ডান হাতের একটু উপরে (৫ নং

৪। বাঁ পায়ে ভর দিয়া

ছবি) সমান্তরাল-ভাবে (parallel)। দেহ বাঁকিবে না; সিধা খাড়া রাখিতে হইবে। এবার বাঁ হাতের আঙুলের ডগা দিয়া বলটি স্পর্শ করুন। সাবধান, দেহ যেন না বাঁকে, বা নত না হয়। তার পর বাঁ হাতে বল রাখিয়া ডান হাতের আঙুলের ডগা দিয়া বল স্পর্শ করুন। ঐ একই প্রণালী। এমনি করিয়া একবার ডান হাতে; পরে বাঁ হাতে বল রাখিয়া এ ব্যায়াম করিবেন পনেরো-ষোল বার।
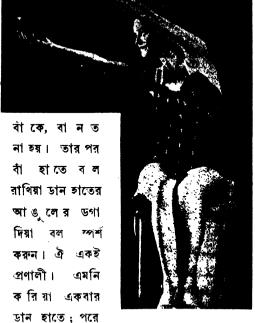
চেয়ারে বসুন

সোজা হইয়া দাঁড়ান। দু'হাত দুদিকে তুলুন। কাঁধের সঙ্গে সমরেখায় দুদিকে প্রসারিত ভাবে হাত তুলিতে হইবে। এবার বলটি জোরে মেঝেয় ফেলুন। মেঝেয় পড়িয়া বলটি লাফাইয়া উঠিবে, ঠিক সেই সময়ে ডান পায়ের অগ্রভাগ দিয়া বলে কিক্ করুন। একবার ডান পায়ে বল কিক্ করিবেন, পরের বারে বাঁ (৬ নং ছবি) পায়ে কিক্ করিবেন। কিক্ করা চাই বেশ দ্রুত-তালে। বল যদি ফশ্কায়, ক্ষতি নাই! বল তুলিয়া আবার মেঝেয় ফেলিবেন এবং বল লাফাইয়া ঊর্দ্ধে উঠিবামাত্র পা তুলিয়া বলে কিক্ করিবেন। এ ব্যায়ামে দেহ-ছাঁদ সুঠাম হইবে।

বলটি মেঝেয় রাখিয়া দেহ সিধা করিয়া দাঁড়ান; দুই হাত দুদিকে থাকিবে লম্বালম্বি ভাবে (৭ নং ছবি)। এবারে হাঁটুর কাছ হইতে ডান পা মুড়িয়া পায়ের ডগা দিয়া বলটিকে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া লীলা-ছন্দে

৬। মেঝেয় বল ফেলিয়া

৭। পায়ের ডগা দিয়া

ঘরময় বিচরণ করুন। প্রায় পাঁচ-মিনিট কাল বিচরণ করুন। পাঁচ মিনিট পরে বাঁ পায়ের ডগা দিয়া বল লইয়া ঐ ভাবে বিচরণ করিতে হইবে।

ঘর-সাজানো

ঘর-সাজানোর ব্যাপারে আমরা খুব অমনোযোগী। সে পরিচয় নেবার জন্য বাইরে যাবার দরকার নেই—ঘরে-ঘরেই তার পরিচয় মিলবে।

বেশী পয়সা খরচ করবার সামর্থ্য যাদের আছে, দেখি জবড়-জঙ্গ বহু আসবাবে তাঁদের ঘর ঠাশা; সেগুলি রুচি-মাফিক সাজানো নয়; তার পর সে সব আসবাব যত দামীই হোক, ধুলোয় ভরে বিশ্রী বিমলিন! সে ঘরে ঢুকলে রুচিজ্ঞানের অভাব দেখে স্তম্ভিত হতে হয়।

যাঁদের পয়সার সামর্থ্য নেই, তাঁরা বলেন, পয়সা নেই, কি দিয়ে ঘর-সাজাবো? এই কথা বলে নিশ্বাস ফেলে ঘরগুলিকে তাঁরা কদর্য্য বিশৃঙ্খল করে রাখেন।

আসল কথা, ঘর-সাজানোর জন্য খুব বেশী টাকা-পয়সা বা রকমারি সৌখীন জিনিষের দরকার হয় না; দরকার শুধু পরিশ্রম এবং রুচি।

আমাদের দেশের সামান্য-রোজগেরে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান-দের ঘরেও দু'-চারখানি ডিশ, প্লেট, কাপ, ফটো, আয়না, কম-দামী পর্দা—এমনি টুকিটাকি জিনিষে ঘরের যে

সজ্জা তারা সম্পাদন করে, বড় বড় বাঙালী জমিদার বা পয়সাওয়ালা বাবুদের ঘরে দামী কৌচ, শোফা, মেহগ্নি কাঠের আসবাব-পত্র, বড় বড় দামী আয়নাতেও তেমন সজ্জা-সম্পাদন দেখি না। আগে বলেছি, ঘর সাজাতে টাকা-পয়সা বা দামী আসবাবের তত দরকার নেই, যত দরকার রুচিজ্ঞানের। দামী এবং সৌখীন জিনিষেও আমরা যে ঘরের সজ্জাশ্রী সম্পাদন করতে পারি না, তার কারণ পরিচ্ছন্নতার জ্ঞান থাকলেও আমরা খাটুতে নারাজ!

প্রথমে ধরুন ঘরের পর্দা। ঘরের দেওয়ালে যে রঙই থাকুক, তাতে কিছু এসে যাবে না। সাদা-চূণকাম-করা ঘরের জানলায় যে-কোন রঙের পর্দা চমৎকার মানাবে। তবে সাদা পর্দার চেয়ে রঙীন পর্দাই ভালো। তার কারণ, সাদা পর্দা চট্ করে ময়লা হয়ে যায়—রঙীন পর্দায় সে ভয় নেই। এ পর্দায় যদি পাড়ের সুতো বুনে নক্সা করে ন্যান, তাহলে তাতে ঘরের শোভা শতগুণ বাড়বে।

তার পর ছবি। ছবি-খাটানো সম্বন্ধে আমাদের রুচি ছবিতে অরুচি ধরিয়ে দ্যায়! অনেকে ভাবেন, একরাশ ছবি খাটালেই বুঝি ঘরের সজ্জা এবং ইজ্জৎ বাড়ে! এ ধারণা ভুল—মস্ত ভুল। দেওয়াল যত খালি রাখ্‌বেন, ঘরের তত শোভা হবে। তার ওপর ঘরে ধুলো-বালি-ঝুল জম্‌তে পারবে না। দেওয়ালে ছবি খাটান—ক্ষতি নেই, তবে ছবির সংখ্যা করুন খুব কম। যে ছবি খাটাবেন, তা যেন দেওয়ালের গায়ে-গায়ে বা দেওয়ালে সেঁটে না থাকে। লম্বা-তারে ছবি বেশ খানিকটা ঝুলিয়ে খাটাবেন। তাতে বাহার খুল্‌বে।

তার পর আসবাব-পত্র। ঘরের একদিকে কাঠের সিন্দুকের ওপরে বড় বড় বাক্স-তোরঙ্গ বই জড়ো করে রাখ্‌তে হয়। স্থানাভাব,—উপায় নেই, মানি। কিন্তু সেগুলোর ওপরে একটা বাহারে কাপড়ের ঘেরা-টোপ টেনে দিন। চোখের সামনে ডাঁই-করা ছোট-বড় বাক্স-প্যাঁটরার বোঝা—তাতে চোখে পীড়া বোধ হয়, মনে অস্বাচ্ছন্দ্য জাগে।

সোফা, কৌচ কিনে যারা ঘরের সজ্জা সম্পাদন করতে চান, ঘরের সাইজ-হিসাবে সোফা-কৌচের সাইজ ও সংখ্যা সম্বন্ধে তাঁরা যেন হুঁশিয়ার হন। সোফার কভার, দেওয়ালের রঙ আর ঘরের পর্দার রঙ যেন এক-রকমের হয়—তাতে ঘরে বাহার খুলবে। রঙের অসামঞ্জস্যে সজ্জাশ্রী নষ্ট হয়।

তার পর পুতুল-খেলনা। অনেকে এগুলো কাচের আলমারিতে সাজিয়ে রাখেন। এতে সুরুচির অভাব লক্ষ্য হয়। যদি পুতুল সাজাতে চান, তাহলে এক-গাদা পুতুল নাই কিনলেন! পছন্দ-মাফিক কয়েকটি পুতুলে ঘরের যে বাহার খুলবে, একরাশ পুতুলে সে বাহারের সিকিও খুলবে না। একটু চোখ মেলে দেখ্‌লেই এ-কথার যাথার্থ্য সম্বন্ধে মনে বিন্দুমাত্র সংশয় থাকবে না!

জ্যৈষ্ঠ

জ্যৈষ্ঠ তুমি, জ্যেষ্ঠ ঋতু শ্রেষ্ঠ জেনো এই ধরার,
প্রচণ্ড রূপ আন্‌লে তুমি, ভয়ঙ্করী চণ্ডিকার।
দুপুরবেলায় তরুর শাখায় এক সাথেতে ডাকলে কাক,
ঠিক মনে হয় যোগাঘ্যারি মন্দিরেতে বাজ্‌ছে শাঁখ।
আস্‌লে পরে উষ্ণ বাতাস উঠলে পরে ভীষণ ঝড়,
মনে পড়ে ভস্ম মদন হান্‌তে গিয়ে পুষ্প-শর।
রোদের তাপে দগ্ধ চরণ, নগ্নশিরেই যখন যাই,
সীতার অগ্নি-পরীক্ষারি একটু যেন আভাস পাই।
বরফ দেওয়া ডাব-তরমুজ,
বেলের ঘোলের মিষ্টি পানার,—
পান করিলে হঠাৎ ভাবি, দেবের ওদন ইন্দ্র-সভায়।
"জামরুল" আর "পরমুজ" আম,
'কেসুর', 'গোলাবজামের' ডালি,
জ্যৈষ্ঠ যেন বাংলা মায়ের চরণতলেই দিচ্ছে ঢালি।
প্রথম রোদেই মাঠের বুকে, নাচ্‌ছে মরীচিকার মায়া,
ঘনায় হেথায় বটের তলায় স্নিগ্ধ-মধুর শীতল ছায়া।
রবির কিরণ তপ্ত দারুণ ছুটছে বেগে বাঁধন-হারা,
আকাশ থেকেই মন্দাকিনীর টানছে যেন সলিলধারা।
এমনি রোদেই গাছের তলায় বিছিয়ে আঁচল ঘুমায় চাষা,
কাঠ-বিড়ালী লেজ নাড়ি ধায় সেথায় আছে তাহার বাসা।
ডাক-পাখী আর ভেক ডাকিছে আজ দুপুরে জ্যৈষ্ঠ মাসে,
বাংলা-মায়ের আঁচল ধরি মেঘ ভেসে যায় নীল আকাশে।

কাদের নওয়াজ।

ইতিহাসের অনুসরণ

অন্ধকূপ-হত্যা *

অন্ধকূপ-হত্যার রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে হইলে প্রথমতঃ আমাদিগকে কয়েকটি বিষয়ের বিশেষ আলোচনা করিতে হইবে।

১। অন্ধকূপ-কারাগারে যাহারা আবদ্ধ ছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে যাহারা জীবিতাবস্থায় বাহির হইয়া আসেন, তাঁহারাই এ ব্যাপারে প্রত্যক্ষদর্শী। তাঁহাদিগের মধ্যে কে কে অন্ধকূপ-হত্যার সম্বন্ধে বিবরণ দিয়াছেন?

২। প্রত্যক্ষদর্শীদিগের বিবরণে কোথায় কি অসামঞ্জস্য আছে এবং তাহার গুরুত্ব কতটুকু?

৩। অপর কাহারা এই হত্যার বিবরণ দিয়াছেন এবং তাঁহাদিগের কাহিনীর মূল কোথায়?

৪। অন্ধকূপ-হত্যার সংবাদে দেশী ও বিদেশী মহলে কিরূপ চাঞ্চল্য ঘটিয়াছিল?

৫। নবাব বা তাঁহার স্বপক্ষীয়দিগের পত্রাদিতে অথবা দেশীয় ঐতিহাসিকদিগের বিবরণীতে অন্ধকূপ-হত্যার কি উল্লেখ আছে?

প্রথমতঃ দেখা যাক, অন্ধকূপ-হত্যার বিবরণী কে বা কাহারা প্রথম প্রকাশ করিয়াছিল। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে জুন মাসের কোনও এক তারিখে মিঃ জন গ্রে (জুনিয়র) কর্তৃক লিখিত নবাবের কলিকাতা অধিকারের কাহিনীতে সর্ব্বপ্রথম অন্ধকূপ-হত্যার বিবরণ প্রকাশিত হয় বলিয়া জানা গিয়াছে। এই পত্রের তারিখ নাই। এই পত্রখানি মিষ্টার ওয়াট এবং

---

* ১৩৩৮ সালের ফাল্গুন সংখ্যা হইতে 'মাসিক বসুমতী'তে আমার স্বর্গগত পিতৃদেব নিখিলনাথ রায় মহাশয় লিখিত "সিরাজ ও ইংরেজ" নামক প্রবন্ধ ধারাবাহিক ভাবে বাহির হইতেছিল। ১৩৩৯ সালের কার্ত্তিক মাসের 'মাসিক বসুমতী'তে সিরাজউদ্দৌলার সহিত ইংরেজদিগের বিরোধ-সূচনা লিখিয়া পর-সংখ্যায় অন্ধকূপ-হত্যা সম্বন্ধে তিনি আলোচনা করিবার বাসনা প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ অল্প কয়েক দিনের জ্বরে ১৮ই কার্ত্তিক তারিখে সহসা পরলোক গমন করায় তাঁহার সে ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুরোধে পিতৃদেবের সেই অসমাপ্ত কার্য্য আমি সম্পন্ন করিতে প্রয়াসী হইয়াছি।

অন্ধকূপ-হত্যা সম্বন্ধে বহু ঐতিহাসিক ইতিপূর্ব্বে বহু আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয় এবং মিষ্টার জে এ লিটলের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অক্ষয় বাবু তাঁহার 'সিরাজদ্দৌলা'-নামক গ্রন্থে অন্ধকূপ-হত্যা যে হলওয়েল সাহেবের স্বকপোলকল্পিত কাহিনী, ইহাই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বে ডাক্তার ভোলানাথ চন্দ্র কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ম্যাগাজিনে এ সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন, "It is little better than a bogy against which was raised an uproar of pity" ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের Bengal Past and Present নামক পত্রিকার একাদশ খণ্ডে মিষ্টার লিটল্ অন্ধকূপ-হত্যার কাহিনীকে সম্পূর্ণ অলীক বলিয়া প্রমাণের চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহার ফলে য়ুরোপীয় ঐতিহাসিক মহলে বহু বাক্‌বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়। অবশেষে পরবৎসরে মার্চ্চ মাসের ২৪শে তারিখে আর্কডিকন W. K. Firminger M A. B. D মহোদয়ের সভাপতিত্বে এশিয়াটিক সোসাইটী গৃহে Calcutta Historical Societyর এক বিতর্ক সভা আহূত হয়। তাহাতে Mr Little এবং অক্ষয় বাবু অন্ধকূপ-হত্যা কাহিনীর বিপক্ষে এবং প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক Mr Oaten তাহার স্বপক্ষে বহু আলোচনা করেন।

এই আলোচনার পরে আরও কয়েক জন ঐতিহাসিক এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তথাপি এ সম্বন্ধে এ যাবৎ কোনোরূপ স্থির সিদ্ধান্ত ঐতিহাসিকমণ্ডলী মানিয়া লইতে পারেন নাই। এই প্রবন্ধে প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা নিরপেক্ষ ভাবে আমরা এই সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করিতেছি।

কয়েক জন সমসাময়িক ঐতিহাসিকের রচিত ইতিহাস এবং সমসাময়িক পত্রাদি হইতে আমরা সিরাজউদ্দৌলার শাসনকালের ইতিহাস জানিতে পারি। এই সকল ঐতিহাসিকের মধ্যে তিন জন ভারতবাসী। এবং এই তিন জনই সেই সময়ের ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। বহু ব্যাপারে তাঁহারা নিজেরাই ছিলেন নায়ক। ১। "মুতাক্ষরীণ"-রচয়িতা সৈয়দ গোলাম হোসেন। ২। "রিয়াজ উস্‌সালাতিন"-রচয়িতা গোলাম হোসেন সলেমী এবং ৩। "মুজাফ্‌ফরনামা" নামক ইতিহাসের রচয়িতা। য়ুরোপীয় ঐতিহাসিকগণের মধ্যে Robert Orme এবং Edward Ives তৎকালে মাদ্রাজে ফোর্ট সেণ্ট জর্জ্জে কর্ম্মচারী ছিলেন এবং J. Z. Holwell স্বয়ং অন্ধকূপে বন্দী ছিলেন। Mr. Orme, Mr. S. C Hill, Revt. J. Long এবং Mr. J. T. Wheeler-এর সংগৃহীত পত্রাদি হইতে এই সময়ের বহু ঐতিহাসিক রহস্য জানা যায়। ইহা ব্যতীত Malleson, Busteed, C. R Wilson প্রমুখ পরবর্ত্তী ঐতিহাসিকগণের রচিত ইতিহাসও এই রহস্য-সমাধানে প্রচুর আলোকপাত করিয়াছে।

মিষ্টার কোলেট কোর্ট অব ডিরেক্টরের নিকট যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, তাহার সহিত প্রেরিত হয়। মিষ্টার অর্ম্মের সংগৃহীত পত্রাদি-সংগ্রহে, (Orme MSS India VII pp 1802—8) মূল পত্রের তারিখ আছে ৩রা জুলাই; কিন্তু এই পত্রে ৬ই জুলাই লিখিত ড্রেক ও তাঁহার কলতা কাউন্সিলের পত্রের উল্লেখ আছে, সুতরাং মিষ্টার হিলের মতে ইহার তারিখ ১৬ই জুলাই, কিন্তু গ্রের পত্রের তারিখ সম্বন্ধে মিষ্টার হিল কোন মন্তব্য প্রকাশ করেন নাই। আমাদের মনে হয়, এ পত্রখানি জুন মাসে লিখিত হয় নাই। এই পত্রে গ্রে সাহেব বলিতেছেন, "দুর্গে যাহারা ছিলেন, তাঁহাদিগের অনেককেই অন্ধকূপে আবদ্ধ রাখা হইয়াছিল। তাঁহাদের সংখ্যা ১৪৬। এই সঙ্কীর্ণ স্থানে এত লোককে আবদ্ধ রাখার ফলে ১২৩ জন লোক সেই নিদারুণ গ্রীষ্মে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন।"—(Hill vol I p 108) এই ১৪৬ জনের মধ্যে ১২৩ জনের মৃত্যু-কাহিনীই শেষ বিবরণ, তাহাই এ যাবৎ প্রকৃত ইতিহাস বলিয়া চলিয়া আসিতেছে। হলওয়েল প্রমুখ প্রথম সংবাদদাতারা বিভিন্ন পত্রে বিভিন্ন বিবরণ দিয়াছেন। পরে আমরা এ বিষয়ের আলোচনা করিব।

৯ই নবেম্বর তারিখে (১৭৫৬) ফোর্ট সেণ্ট্ জর্জ্জের Select Committeeর আলোচনায় ব্যবহৃত একখানি ৩রা জুলাই তারিখের পত্রে (Hill vol I pp 48–53) অন্ধকূপ-হত্যার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া অনেকের ধারণা, কিন্তু এই পত্রের লেখক একজন ফরাসী; ইহা ব্যতীত আর কিছুই জানা যায় নাই। কাহার নিকট হইতে তিনি অন্ধকূপ-হত্যার কাহিনী শুনিলেন, তাহাও জানা যায় না। যাহা হউক, এই পত্রলেখক প্রত্যক্ষদর্শী নহেন। *

৮ই জুলাই কাশীমবাজার কুঠী হইতে মিষ্টার সাইক্স্ হলওয়েলের পত্রের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিয়া পাঠান। এই বিবরণকে প্রত্যক্ষদর্শীর পত্র বলা যাইতে পারে। পত্রখানি এইরূপ—"গত মাসের ১৮ই তারিখে ম্যানিংহাম ও ফ্রাঙ্কল্যাণ্ড দুর্গ ছাড়িয়া চলিয়া যান। পরদিন সকালে President, Commandant. Adjutant General এবং Mackett ঐভাবে দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া একখানি জাহাজে গিয়া উঠেন এবং নঙ্গর খুলিয়া দেন। দুর্গে অপর যাহারা পড়িয়া রহিল, তাহাদের পলায়নের জন্য একখানি নৌকা বা ডিঙ্গি না রাখিয়া তাঁহারা প্রস্থান করিলেন। ঐ সকল ব্যক্তি চলিয়া যাওয়ায় দুর্গের নেতৃত্ব-ভার পড়িল হলওয়েলের উপর। অবশিষ্ট দুর্গবাসীর সহিত তিনি সাহসসহকারে দুর্গ-রক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ২০শে ও ২১শে তারিখে তাঁহারা দিবারাত্র যুদ্ধ করিলেন। অবশেষে যখন অস্ত্রাগারের ক্যাপ্টেন আসিয়া সংবাদ দিলেন যে, তাঁহাদের যে গুলী-বারুদ আছে, তাহাতে আর একদিনও যুদ্ধ চলিবে না, তখন সন্ধিজ্ঞাপক পতাকা তুলিয়া দেওয়া হইল। যখন তাঁহারা সন্ধি সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন, তখন কয়েক জন ওলন্দাজ-সৈনিক নবাবকে দুর্গের পশ্চাদ্দিকস্থ কপাট খুলিয়া দেয়। অগত্যা তাঁহাদিগের আত্মসমর্পণ করা ব্যতীত অন্য উপায় রহিল না। এই দুই দিনের অবিরাম যুদ্ধে বিশিষ্ট-ব্যক্তিগণের মধ্যে ২৫ জন হত ও ৭০ জন আহত হইয়াছিল। দুর্গে আসিয়া নবাব দেখিলেন, কোম্পানীর নিযুক্ত কর্ম্মচারী (Covenanted servants), সৈন্য ও সেনানায়কগণকে (Officers) লইয়া মোট ১৬০ জন দুর্গে রহিয়াছেন। তাঁহাদিগকে অন্ধকূপ নামক একটি স্থানে রাখা হইল। স্থানটি এত সঙ্কীর্ণ যে, পরদিন প্রাতে দেখা গেল, ১১০ জন শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। Jenks, Reveley, Law, Eyres, Bailie, Cooke, Captain Buchanan, Scott এবং আমাদিগের অন্যান্য সকল সেনানী এবং কোম্পানীর কর্ম্মচারী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। রাইটার ও অফিসারগণ সাহসের পরিচয় দিয়াছিল। বহুসংখ্যক মুসলমান নিহত হয়। আমাদিগের এই হতভাগ্য ভদ্রলোকগুলি সারারাত্রি যখন অন্ধকূপে আবদ্ধ ছিলেন, নবাবের লোকরা তখন দরজার ভিতর দিয়া তাঁহাদের উপর গুলী চালাইতেছিল।"—(Hill vol I pp 61-62)

অন্ধকূপহত্যার বহুদিন পরে ক্যাপ্টেন মিল্স্ অর্ম্মে সাহেবকে একখানি পকেটবুক পাঠাইয়াছিলেন; তাহাতে ৭ই জুন হইতে ১লা জুলাইয়ের ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ ছিল। এই পকেটবই দৈনন্দিন রোজনামচা হিসাবে লেখা। সুতরাং এ বইখানি নিশ্চয় অন্ধকূপ-কারাগারে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। কিন্তু এই পকেটবইখানির বর্ণনা হইতে ইহাকে

* এই পত্রখানির সম্বন্ধে যথাকালে আলোচিত হইবে।

রোজনামচা বলিয়া মনে হয় না; ইহা ঘটনার পরে লিখিত বলিয়া মনে হয়। কারণ, এই ডায়েরীর ৯ হইতে ১১ পৃষ্ঠায় অন্ধকূপ-কারাগারে নিহত ও সেখান হইতে উদ্ধারপ্রাপ্ত জীবিত ব্যক্তিগণের নাম লিখিত হইয়াছে; অথচ দ্বাদশ পৃষ্ঠায় দুর্গাধিকারকালে যাহারা পলায়ন করিয়াছিল, তাহাদের নাম লেখা আছে। ত্রয়োদশ পৃষ্ঠায় দুর্গ অধিকারের পূর্ব্বেকার ঘটনা লিখিত আছে এবং চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ পৃষ্ঠায় দুর্গের যুদ্ধোপকরণের তালিকা রহিয়াছে। ইহা হইতে মনে হয়, অর্ম্মে সাহেবকে ইতিহাসের উপাদান যোগাইবার নিমিত্তই এই পকেট বইখানির সৃষ্টি!—(Hill Vol I pp 40-45)

এই পকেটবইয়ে লিখিত আছে—"যাহারা দুর্গে ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেককে অন্ধকূপে আবদ্ধ করা হইয়াছিল। তাহাদের সংখ্যা পুরুষ, স্ত্রীলোক ও শিশু লইয়া সর্ব্বসমেত ১৪৪ জন। এইরূপ একটি ক্ষুদ্র কক্ষে এত লোক আবদ্ধ হওয়ায় গ্রীষ্ম-তাপে এবং পরস্পরের উপরে দাঁড়াইয়া থাকার জন্য শ্বাসরুদ্ধ হইয়া ১২০ জনের অপেক্ষা বেশী লোক শোচনীয়ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন।

"যাহারা মরিয়া গিয়াছিলেন, সেই সব হতভাগ্যদিগের মধ্যে Eyros, Bailie Senior, Coales, Dumbleton, Jewkes, Revely, Law, Jebb, Carse, Vallicourt, Bellimy Senior and Junior, Patrick Johnstone, Street, Stephen এবং Edward Pages, Grubb, Dodd, Torrians, Krapton, Ballard, Captain Clayton, Buchanan Whitherington, Lieutenants Simson, Hays, Blagg, Bishop, Paccard, Ensign Scott, Wedderborm, James Guy, Carpenter, Captain Hunt, Robert Carey, Thomas Leach Stopfordsদ্বয়, Porter, Hylierd, Cocker এবং Carceএর নাম উল্লেখযোগ্য।"—(Hill vol I p 43)

অবশেষে প্রত্যক্ষদর্শীদিগের বিবরণের মধ্যে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে জুন মাসে 'London Chronicle' পত্রিকায় কয়েকটি বিবরণ বাহির হইয়াছিল। তাহার মধ্যে একটি বিবরণে (Hill vol III p 71) লেখক নিজেকে এক জন প্রত্যক্ষদর্শী ও অন্ধকূপ-কারাগার হইতে জীবিতাবস্থায় প্রত্যাগত ব্যক্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই বিবরণে প্রকাশ, ১৭০ জনকে অন্ধকূপ-কারাগারে আবদ্ধ করা হইয়াছিল এবং পরদিন প্রভাতে মাত্র ১৬ জন জীবিত ছিল। ইনি হলওয়েলের সহিত নবাবের নিকট বন্দী অবস্থায় প্রেরিত হইয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং ইনি কোর্ট, বার্ডেট বা বুর্ডেট অথবা এনসাইন ওয়ালকট—কিন্তু এনসাইন ওয়ালকট এই বিবরণ বাহির হইবার সময় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। সুতরাং ইনি রিচার্ড কোর্ট অথবা মিষ্টার বুর্ডেট হইতে পারেন! দুঃখের বিষয়, এ ভদ্রলোকের নাম প্রকাশিত হয় নাই।

ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত অপর একটি বিবরণে দুর্গাধিকার কালে নিহত, অন্ধকূপে নিহত, পলায়নকালে নিমজ্জিত, আত্মঘাতী এবং বন্দীকৃত ব্যক্তিগণের তালিকা বাহির হইয়াছিল, তাহা হইতে বহু তথ্য আবিষ্কৃত হইবে। আমরা পরে তাহার কথা বলিতেছি।—(Hill vol III pp 71-72)

অপর এক জন প্রত্যক্ষদর্শী লিখিতেছেন, "মোগলগণ (অর্থাৎ মুসলমানগণ) দুর্গে প্রবেশ করিয়া যাহারা দুর্গে ছিলেন, তাঁহাদিগকে শৃঙ্খলিত করিয়া অন্ধকূপ নামক একটি কক্ষে সেই রাত্রির জন্য আবদ্ধ করিল। কিন্তু ১৭৫ জনের মধ্যে পরদিন প্রভাতে ১৬ জন মাত্র জীবিত ছিলেন। তাহার মধ্যে মিঃ হলওয়েল এবং বার্ডেট নামক এক জন রাইটার ছিলেন।"—(Hill vol III p 74)

অপর একটি বিবরণে (Hill vol III p 75) Mr. Tooke অন্ধকূপে আবদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া লিখিত হইয়াছে। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই নবেম্বর তারিখে Mr. W. Tooke একটি বিবরণে লেখেন, "যাহারা কুঠীতে ছিলেন, তাঁহাদের সংখ্যা প্রায় ১৪৭। তাঁহাদিগকে সন্ধ্যাকালে অন্ধকূপ নামক কারাগৃহে আবদ্ধ করিয়া সেই স্থানেই সমস্ত রাত্রি রাখা হইয়াছিল। পরদিন প্রভাতে ২৩ জন মাত্র জীবিতাবস্থায় বাহিরে আসে। অপর সকলে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মারা গিয়াছিল।"—(Hill Vol I p 293)

সুতরাং দেখা যাইতেছে, অন্ধকূপহত্যার প্রত্যক্ষদর্শীগণের মধ্যে মিঃ জন গ্রে (জুনিয়র) মিঃ হলওয়েল, কাপ্তেন মিল্‌স্, মিঃ টুক্ এবং London Chronicleএ প্রকাশিত বিবরণের লেখকত্রয় অন্ধকূপ-হত্যার বিবরণ লিখিয়াছেন।

এখন দেখা যাক, এই বিবরণগুলির মধ্যে কি কি অসামঞ্জস্য রহিয়াছে। প্রথমতঃ মিষ্টার হলওয়েলের বিবরণের আলোচনা করা যাক্। মিষ্টার হলওয়েল সর্ব্বসমেত

চারিটি লিখিত বিবরণ দিয়াছেন। তাহার প্রথম বিবৃতিই উপরিউক্ত বিবরণের অনুরূপ। তাহার পর ১৭ই জুলাই (১৭৫৬) মুরশিদাবাদ হইতে বোম্বে ও মাদ্রাজের কাউন্সিলে হলওয়েল যে পত্র লেখেন, তাহাতে তিনি লিখিতেছেন—"আমাদের বাধা প্রদানে নবাবের যে ক্ষতি হইয়াছিল, তাহাতে নবাব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে এবং অন্যান্য বন্দিগণকে লইয়া ১৬৫ বা ১৭০ জনকে নির্ব্বিচারে অন্ধকূপ নামক দুর্গের একটি ক্ষুদ্রায়তন কারা-কক্ষে আবদ্ধ রাখিতে আদেশ দিলেন, তাহা হইতে পরদিন প্রভাতে কেবল ১৬ জন মাত্র জীবিতাবস্থায় বাহির হইয়া আসিলাম। অপর সকলের শ্বাসরুদ্ধ হইয়া প্রাণবিয়োগ ঘটিয়াছিল—জীবিতের মধ্যে আমি, মিঃ রিচার্ড কোর্ট, মিঃ জন কুক, মিঃ লুশিংটন, এনসাইন ওয়ালকট, মিঃ বার্ডেট (এক জন যুবা স্বেচ্ছা-সৈনিক,) ক্যাপ্‌টেন মিল্‌স, ক্যাপ্‌টেন ডিকসন এবং প্রায় ৭৮ জন কৃষ্ণকায় ও শ্বেতকায় সৈন্য; মৃতের মধ্যে আয়ার, উইলিয়মবেলী, রেভারেণ্ড বেলামী, জেঙ্কস্, রাইভলী, ল, টি কোল্‌স ইত্যাদি, আমাদের তিন জন মিলিটারি ক্যাপ্‌টেন, ৯ জন সবলটার্ণ, বহুসংখ্যক স্বেচ্ছা-সৈনিক এবং দুর্গবাসী। ইহাদের বিশেষ তালিকা আমার যাহা মনে আছে, তাহা মাননীয় কোম্পানী বাহাদুরকে পাঠানো হইবে।"

হলওয়েলের তৃতীয় বিবরণ—৩রা আগষ্ট হুগলী হইতে হলওয়েল ফোর্ট-সেণ্ট্-জর্জ্জের কাউন্সিলে যে পত্র লেখেন, তাহাতে তিনি বলেন—"আমি পূর্ব্বে যে অন্ধকূপে বন্দী ও মৃত ব্যক্তিগণের তালিকা দিয়াছিলাম, তাহাতে হিসাবে বেশী করিয়া ফেলিয়াছিলাম। প্রথমোক্ত ব্যক্তিগণের (অর্থাৎ বন্দিগণের) সংখ্যামাত্র ১৪৬ এবং শেষোক্ত (অর্থাৎ মৃত ব্যক্তিগণের) সংখ্যা ১২৩; সকালে দরজা খুলিয়া দেওয়ায় বাতাস পাইয়া অনেকে বাঁচিয়া গিয়াছিল; এবং কোন উপায় থাকিলে বা যত্ন লইলে আরও অনেকে যে বাঁচিতে পারিত তাহাতে সন্দেহ নাই। ইচ্ছা করিয়া আমাদিগকে সেই ক্ষুদ্র কারাকক্ষে ঠাসিয়া পুরিয়া আবদ্ধ করার আদেশ দিয়া অশ্রুতপূর্ব্ব নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়াছেন বলিয়া যে নবাবের উপর দোষারোপ করিয়াছিলাম, এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখিতেছি, তাহা ঠিক নহে। আমি তাঁহার উপর অবিচার করিয়াছিলাম। এক্ষণে জানিতে পারিয়াছি, আমাদের এতগুলি লোককে এরূপ মুক্ত অবস্থায় ছাড়িয়া রাখা অনুচিত বিবেচনায় নবাব সাধারণ ভাবে আমাদিগকে সেই রাত্রে বন্দী করিয়া রাখিতে বলিয়াছিলেন। তাঁহার জমাদার ও বরকন্দাজদিগের দয়া এবং হুকুমের উপর ছাড়িয়া দেওয়ায় তাহাদের অসংখ্য নিহত সঙ্গীদিগের কথা ভাবিয়া আমাদিগের উপর তাহারা এরূপ নিষ্ঠুর প্রতিশোধ লইয়াছিল; বাস্তবিক তাহারা সেই অবর্ণনীয় ভীষণ দৃশ্য দেখা সত্ত্বেও সমস্ত রাত্রি অনবরত আমাদের গালি দিয়াছিল।"—(Hill Vol p 186) *

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে ২৮শে ফেব্রুয়ারী সাইরেন স্লুপ হইতে মিঃ হলওয়েল, মিঃ উইলিয়ম ডেভিসকে একখানি পত্র লেখেন, তাহাতে এই অন্ধকূপ-হত্যার কাহিনী উল্লিখিত করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সেই পত্রে তিনি লিখিয়াছেন, "লোকে বাঙ্গালার ইতিহাস পড়িয়া এইমাত্র জানিয়া রাখিবে যে, ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের ২০শে জুনের নিদাঘ-সন্তপ্ত নিশীথ সময়ে ১৪৬ জন বন্দীর মধ্যে ১২৩ জন হতভাগ্য অন্ধকূপে জীবন বিসর্জ্জন করিতে বাধ্য হইয়াছিল! কেমন করিয়া এই সর্ব্বনাশ সংঘটিত হইল, তাহার যথাযথ বর্ণনা করিতে পারেন, এমন অল্প লোকেই প্রাণ লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন।"—(অক্ষয়কুমার মৈত্র 'সিরাজদ্দৌলা' ৩য় সং পৃ ১৮৭)

প্রত্যক্ষদর্শীদিগের বিবরণের অসামঞ্জস্যের বিষয় আলোচনা করিবার পূর্ব্বে আমরা অপর যাহারা কলিকাতা অধিকারের বিবরণ লিখিয়াছেন, পাঠকবর্গকে তাহা জানাইতেছি।

২৫শে জুন চন্দননগরের ফরাসী কুঠীর অধ্যক্ষ মশিয়ে রেণো মসুলিপত্তনের কুঠীতে যে পত্র লেখেন, তাহাতে বলেন—"(ইংরেজগণ) দুর্গাবরোধের প্রথম হইতেই সতর্কভাবে কর্ম্মচারী এবং বিশিষ্ট নগরবাসীদিগের পরিবারের স্ত্রীলোকদিগকে জাহাজে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। ......যাহারা দুর্গ অধিকার-কালে দুর্গে ছিল, তাহাদিগের প্রতি নবাব কোনরূপ অসদ্ব্যবহার করেন নাই। তিনি কেবল তাহাদিগের অর্থাদি কাড়িয়া লইয়া ছাড়িয়া দিবার অনুমতি দিয়াছিলেন। কয়েক জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে বন্দী করা হইয়াছিল।"—(Bengal Past & Present vol XII.

---

* প্রথম পত্রখানির সহিত তুলনা করুন।

তাহার পর ২রা জুলাই চন্দননগর হইতে মিঃ ওয়াট এবং মিঃ কোলেট ফোর্ট সেণ্টজর্জ্জে যে পত্র লেখেন, তাহাতে বলেন—"আমরা শুনিতেছি, মিঃ হলওয়েলকে দুর্গে বন্দী করা হইয়াছে এবং এখনও তিনি কারারুদ্ধ আছেন। আমরা অপরাপর কর্ম্মচারীদিগের সম্বন্ধে কোন সঠিক সংবাদ পাই নাই; কিন্তু শুনিতেছি, তাহাদের যাহা কিছু ছিল কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে। গভর্ণর প্রভৃতি দুর্গ-ত্যাগ করিয়া যাওয়ার পর অবশিষ্ট যাহারা ছিল, তাহারা হয় নিহত নতুবা কঠোর নির্য্যাতনে মৃত্যু বরণ করিয়াছে।"—(Hill vol I p 47)

চন্দননগর হইতে লিখিত ৩রা জুলাই তারিখ চিহ্নিত একটি পত্রে এই বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল—"যে মুহূর্ত্তে মুসলমানগণ দুর্গ-অধিকার করিল, তখন যুদ্ধ হইতে পলায়ন কালে যেরূপ ঘটিয়া থাকে সেইরূপ ঘটিল—অনেক লোক নদীবক্ষে জাহাজে আশ্রয় লইতে চেষ্টা করিতে গিয়া জলমগ্ন হইল। প্রথম দুই দিন স্বেচ্ছাচার ও কোন স্থান বলপূর্ব্বক অধিকার করিলে যেমন ঘটিয়া থাকে, সেইরূপ বিশৃঙ্খলায় কাটিয়া গেল, কেবল নরহত্যা হয় নাই। কারণ, মুসলমানগণ নিরস্ত্র ব্যক্তিকে হত্যা করিতে অভ্যস্ত নহে। প্রায় ১৬০ জন ইউরোপীয় দুর্গমধ্যে ছিল; তাহাদিগকে লইয়া একটি ক্ষুদ্র কক্ষে আবদ্ধ করা হইল। কক্ষটি এত ক্ষুদ্র যে, তাহারা তাহাদের বাহুদ্বয় ঊর্দ্ধে তুলিয়া কোনমতে ঘরের মধ্যে দাঁড়াইতে সমর্থ হয়। সেই রাত্রিতে ১৩২ জন দারুণ গ্রীষ্মতাপে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মারা গিয়াছিল।"—(Hill vol I p 50)

এই পত্রখানির লেখক কে এবং কাহার নিকট হইতে তিনি এই কাহিনী শুনিলেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। এই পত্রলেখক একজন ফরাসী। তিনি এই পত্রে মিঃ ওয়াট ও কোলেটের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহারা তৎকালে ফরাসীদিগের আশ্রয়ে ছিলেন। এই পত্র ফোর্ট সেণ্ট-জর্জ্জের Select Committee-র আলোচনায় ৯ই নবেম্বর তারিখে ব্যবহৃত হইয়াছিল। মিঃ ওয়াট ও কোলেটের ২রা জুলাইয়ের পত্রে অন্ধকূপহত্যার কথা নাই এবং পরবর্ত্তী ২৯শে আগষ্ট তারিখে লিখিত চন্দননগর কুঠীর অধ্যক্ষ মশিয়ে রেণো মসলিপত্তনে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতেও অন্ধকূপ-হত্যার কোন উল্লেখ নাই। এই পত্রের বিবরণ পরে দিতেছি।

৭ই জুলাই তারিখে মশিয়ে ভার্ণে মশিয়ে লাতুরকে যে পত্র লেখেন, তাহাতে বলেন—"৫ দিন অবরোধের পর তিনি (নবাব) উহা (কলিকাতার দুর্গ) অধিকার করিলেন। কিন্তু ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত যে, এই দুর্গ অধিকার তাঁহার রণ-চাতুর্য্য বা সাহসিকতার ফলে সম্পন্ন হয় নাই, পরন্তু গভর্ণর ড্রেকের অব্যাচরণের ফলেই ঘটিয়াছে। তিনি দুই শতাধিক বাছাই সৈন্য লইয়া শত্রুকে আক্রমণ করিবার অছিলায় দুর্গত্যাগ করেন, কিন্তু উক্ত কার্য্য করা দূরে থাক্, তিনি পূর্ব্বদিনে সমস্ত স্ত্রীলোককে এবং অধিকাংশ ধনরত্ন জাহাজে পাঠাইয়া দিয়া এই সমস্ত লোক লইয়া কম্যাণ্ডাণ্ট ম্যানিংহাম ও ফ্রাঙ্কল্যাণ্ডের সহিত জাহাজে গিয়া উঠিয়া সমুদ্রাভিমুখে রওনা হইলেন। যে কয়েক জন সাহসী লোককে নবাবের ক্রোধবহ্নির সম্মুখে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন, দুর্গ-অধিকারকালে তাহারা শত্রুহস্তে নিহত হইতে লাগিল, কিন্তু শীঘ্রই নবাব ইহা বন্ধ করিয়া দিলেন।"—(Hill vol. I p 60)

১০ই জুলাই তারিখে লিখিত প্রশিয়ান কুঠীর অধ্যক্ষ মিঃ জন ইয়ং মিঃ রোজার ড্রেককে যে পত্র লেখেন, তাহাতে তিনি হলওয়েলের প্রমুখাৎ অন্ধকূপ-হত্যার যে কাহিনী শুনিয়াছিলেন, তাহার একটি বিবরণ দিয়াছিলেন—"যাহারা বাঁচিয়াছিল, তাহাদিগের সকলকে তৎক্ষণাৎ (অর্থাৎ দুর্গ অধিকারের পরেই) বন্দী করিয়া অন্ধকূপে ঠাসিয়া পুরিয়া দেওয়া হয়। তাহাদের মধ্যে আহত ও সুস্থ সকল শ্রেণীর লোকের সংখ্যা ১৪৬ বা ১৫০। যে ২৩ জন মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছিল, হলওয়েল তাহার একজন।" মিঃ হলওয়েল ১৬ই জুলাই মুর্শিদাবাদ হইতে মুক্তি পান, সুতরাং এই পত্র কোনমতেই ১৬ই জুলাইয়ের পূর্ব্বের হইতে পারে না। ১৭ই জুলাইয়ের লিখিত হলওয়েলের পত্রের সহিত ইহার মিল নাই এবং ৩রা আগষ্টের পত্রের সহিত ইহার কতকটা মিল আছে; সুতরাং মনে হয়, এই পত্র ১৭ই জুলাই ও ৩রা আগষ্টের মধ্যে লিখিত।

১৩ই জুলাই ক্যাপটেন গ্রাণ্ট কলিকাতা অধিকারের যে বিবরণ লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি দুর্গ পরিত্যাগের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে এবং দুর্গ অধিকারের এবং তৎপরবর্ত্তী ঘটনা অপরের নিকট শুনিয়া লিখিতেছেন—"নবাবের নিকট সুপারিশ করিবার জন্য উমিচাঁদকে পাঠান

স্থির হইল, কিন্তু সে যাইতে চাহিল না; তখন নবাবকে পত্র লেখাই স্থির হইল, কিন্তু আমাদের কাশী লেখা মুন্সী অন্যান্য কালা আদমীর সহিত আমাদের ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়ায় তাহাও অসম্ভব হইল।......আমরা ডড্‌লী নামক জাহাজে গিয়া উঠিলাম, তথায় মিঃ ম্যানিংহাম ও ফ্রাঙ্কল্যাণ্ড প্রায় সকল স্ত্রীলোকের সহিত অপেক্ষা করিতেছিলেন।...... পরদিন ২০শে বৈকালে গভর্ণর দুর্গত্যাগ করিবার প্রায় ৩০ ঘণ্টা পরে দুর্গ অধিকৃত হইল; ইতিমধ্যে মিঃ ক্রটেণ্ডন ও মিঃ আয়ারের বাড়ী, গীর্জ্জা এবং কোম্পানীর বাড়ী হইতে গুলীবর্ষণের ফলে দুর্গরক্ষায় নিযুক্ত ৫০ জনের অধিক য়ুরোপীয় নিহত হইয়াছিল।......যে সকল হতভাগ্য বন্দী হইয়াছিল, তাহাদিগকে রাত্রে ১৬ ফুট সমচতুষ্কোণ অন্ধকূপ নামক একটি স্থানে আবদ্ধ করা হইয়াছিল। য়ুরোপীয় পর্ত্তুগীজ এবং আর্ম্মেনীয়ান লইয়া তাহাদিগের সংখ্যা প্রায় ২ শত, তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই আহত ছিল। এই সঙ্কীর্ণ কারাগৃহে তাহাদিগকে এত গাদাগাদি করিয়া রাখা হইয়াছিল যে, উত্তাপ ও শ্বাসরোধে পরদিন সকাল পর্য্যন্ত ১০ জনের অধিক জীবিত ছিল না। যাহারা আমাদিগকে এই সংবাদ দিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলে, সমস্ত রাত্রি তাহাদিগের উপর জানালা ও দরজার মধ্য দিয়া গুলীবর্ষণ হইয়াছিল। কিন্তু অনেকে আবার ইহার প্রতিবাদ করিয়া থাকে।"—(Hill vol I pp 73 89)

চন্দননগর হইতে ওয়াট ও কোলেট কোর্ট অব ডিরেক্টরের নিকট একখানি পত্র লেখেন, অর্ম্মের পত্রসংগ্রহে (Orme M. SS. India VII pp 1802-8) তাহার তারিখ আছে ৩রা জুলাই, কিন্তু ঐ পত্রে ড্রেক ও কলতার কাউন্সিল কর্ত্তৃক লিখিত ৬ই জুলাইয়ের পত্রের উল্লেখ আছে। হিল সাহেবের মতে এই পত্রের তারিখ ১৬ই জুলাই। এই পত্রে লেখা আছে—"পার্কেস, হলওয়েল, আয়ার এবং বেলী কোম্পানীর বাকী কর্ম্মচারিগণের এবং সৈনিকগণের সহিত দুর্গে রহিলেন। কিন্তু যখন গভর্ণর প্রভৃতি চলিয়া গেলেন, সৈন্যগণ তখন নায়কবিহীন হইয়া মদ্য প্রভৃতি উত্তেজক পানীয় পান করিয়া মত্ত হইয়া উঠিল। সেই রাত্রে ৫৬ জন ওলন্দাজ সৈন্য দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। তাহার পর চারিদিকে কলরব, বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগ হইতে লাগিল। আমাদের মনে হয়, সেই জন্য সন্ধির প্রস্তাব করিবার জন্য দুর্গবাসিগণ যুদ্ধ-বিরতিজ্ঞাপক পতাকা তুলিয়া দিয়াছিলেন। এই অবসরে মুসলমানগণ তাহাদের প্রতি ধাবিত হইয়া প্রাচীরগাত্রে মই লাগাইয়া দুর্গে প্রবেশ করিল এবং অনতিবিলম্বে উহা দখল করিয়া ফেলিল। ভদ্রলোকদিগের মধ্যে অনেককে, অফিসার ও সৈনিকগণকে বন্দী করিয়া নবাবের নিকট লইয়া যাওয়া হইলে নবাব তাহাদিগকে অন্ধকূপে আবদ্ধ রাখিতে আদেশ দেন। সেখানে ১৪৬ জনের মধ্যে পরদিন প্রভাতে ১২৩ জন বদ্ধ কক্ষে শ্বাসরোধে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়।"—(Hill vol I pp 102-3)

এই পত্রে অন্ধকূপে বন্দীর সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে ১৪৬ জন এবং মৃতের সংখ্যা ১২৩ জন। হলওয়েল মুরশিদাবাদ হইতে নৌকাযোগে চন্দননগরের দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহার ১৭ই জুলাইয়ের পত্রে অন্ধকূপের বন্দীর সংখ্যা ছিল ১৬৫ বা ১৭০; কিন্তু হুগলী হইতে ৩রা আগষ্ট যে পত্র লিখিতেছেন, তাহাতে উহা ১৪৬এ নামিয়াছে, সুতরাং মনে হয়, হলওয়েল চন্দননগরে আসিয়া ওয়াট ও কোলেটের সহিত আলাপের পর ইহার সংখ্যা কমাইয়া ছিলেন। এই পত্র যখন লেখা হয়, তখনও হলওয়েল চন্দননগরে আসেন নাই। ওয়াট ও কোলেট প্রের নিকট হইতে যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহাই এই পত্রে লিখিয়াছেন। তাঁহার এই পত্রের সঙ্গে প্রের পত্রের অনুলিপি কোর্ট অব ডিরেক্টরের নিকট পাঠাইয়াছিলেন।*

১৯শে জুলাই তারিখে গভর্ণর ড্রেক সিরাজদৌল্লা কর্ত্তৃক কলিকাতা অধিকারের যে বিবরণ লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি বলেন—"সিরাজের কলিকাতা আক্রমণের পূর্ব্বে ১১ই জুন তারিখে দুর্গে সর্ব্বসমেত ৫১৫ জন অস্ত্রধারী ছিল। * * যে শত্রুকে আমরা এযাবৎ তুচ্ছ মনে করিয়া আসিয়াছিলাম, তাহারা এই সময়ে যথেষ্ট নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিল। তাহাদিগের দ্বারা এইরূপে আমাদিগের উপনিবেশ অধিকৃত হইল, কলিকাতা ধ্বংস ও লুণ্ঠিত হইল এবং আমাদিগের কয়েক জন সৈন্য মদ্যপান করিয়া দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিলে নবাব বন্দিনির্ব্বিশেষে—মিঃ হলওয়েল হইতে

* এই স্থানে মনে রাখা আবশ্যক যে, ওয়াট ও কোলেটের ২রা জুলাইয়ের পত্রে অন্ধকূপহত্যার উল্লেখ পর্য্যন্ত নাই।

সামান্য সৈনিক পর্য্যন্ত সকলকেই—আবদ্ধ করিয়া রাখিতে আদেশ দিলেন। তাঁহার লোকেরা আমাদিগের কষ্টে কোনরূপ অনুকম্পাবিহীন হইয়া প্রায় বায়ু-চলাচলহীন অন্ধকূপ নামক অতি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে সেই প্রায় দুই শত ব্যক্তিকে জল বা কোনরূপ খাদ্যদ্রব্য না দিয়া আবদ্ধ করিয়া রাখিল। স্থানাভাবে তাহারা পরস্পরে পরস্পরকে পদদলিত করিতে বাধ্য হইল। শুশ্রূষার কোন ব্যবস্থা না করিয়া বহু আহত সৈনিককেও সেইস্থানে আবদ্ধ করা হইয়াছিল। প্রচণ্ড উত্তাপ এবং তাহাদের ক্ষতের দুর্গন্ধে হতভাগ্যদের সকল দুঃখের অবসান ঘটাইল। সন্ধ্যা হইতে পরদিন ২১শে জুন সকাল সাতটার মধ্যে এই সকল বন্দীর মধ্যে ২৫ জনের অধিক জীবিত রহিল না, তাহার মধ্যে সাত বা আট জন কোম্পানীর কর্ম্মচারী বা সেনানায়ক। যাহারা দুর্গ অধিকার-কালে পলাইতে পারিয়াছিল অথবা যুদ্ধকালে গম্বুজে, প্রাচীরপার্শ্বে বা ঘাঁটিতে নিহত হইয়াছিল, তাহা ব্যতীত সকলেই—এই নিষ্ঠুর ও অপমানজনক মৃত্যুকে বরণ করিয়াছিল।"—(Hill vol I p 137, pp 160—161)।

জুলাই মাসের কোন এক তারিখে 'সাইরেন' জাহাজ হইতে মিঃ উইলিয়ম লিণ্ডসে অর্মে সাহেবকে কলিকাতা অধিকারের একটি বিবরণ লিখিয়াছিলেন। সেই পত্রে তিনি লিখিতেছেন—"প্রায় এক ঘণ্টা পরে নবাব দুর্গে প্রবেশ করিলেন এবং তাঁহার এই সাফল্যের জন্য কর্ম্মচারীদিগের অভিনন্দনগ্রহণের জন্য একটি দরবার করিলেন। প্রথমে তাহারা ইংরেজ বন্দীদিগের সহিত খুব ভাল ব্যবহার করিলেন, কিন্তু কয়েক জন সৈনিক মাতাল হইয়া পড়ায় তাহাদের সকলকে—সংখ্যায় প্রায় দুই শত লোককে নির্ব্বিচারে অন্ধকূপে আবদ্ধ রাখিতে আদেশ দেওয়া হইল। এই কারাগারে ঐ সংখ্যার চতুর্থাংশ লোকও ধরে না। তাহারা রাত্রি ৯টা হইতে সকাল ৬টা পর্য্যন্ত আবদ্ধ ছিল, পিপাসায় এক ফোঁটা জলও কেহ দেয় নাই এবং জানালাটি এত ক্ষুদ্র ছিল যে, ঘরের মধ্যে একটু বাতাসও প্রবেশ করে নাই। যখন দরজা খোলা হইল, তখন ২০।২৫ জনের অধিক জীবিত ছিল না, বাকী সকলে শ্বাসরোধে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। জীবিতদিগের মধ্যে হলওয়েল, কোর্ট, কুক, লুশিংটন, বার্ডেট এবং আরও ২।১ জন ভদ্রলোক ছিলেন, বাকী সৈনিক ও পর্ত্তুগীজ। হলওয়েলকে তৎক্ষণাৎ নবাবের নিকট লইয়া যাওয়া হইল এবং বাকী সকলকে যথা-ইচ্ছা যাইতে আদেশ দেওয়া হইল। কুক এবং লুশিংটন আদেশ পাইবামাত্র তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া পড়িল এবং সেই রাত্রেই আমরা যেখানে বজবজের নিকট নোঙ্গর করিয়াছিলাম, সেইখানে আসিয়া জাহাজে আশ্রয় লইল।"—(Hill Vol I p 168—169)

ইহার পর ২৯শে আগষ্ট তারিখে চন্দননগরের অধ্যক্ষ মশিয়ে রেণো মসুলিপত্তনে যে পত্র লিখিয়াছিলেন; তাহাতে অন্ধকূপহত্যার কোনও উল্লেখ করেন নাই। ১৬ই সেপ্টেম্বর মশিয়ে রেণো সুরাটের কুঠীর অধ্যক্ষ M. Le Verrierকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি চন্দননগরে আশ্রয়-প্রাপ্ত ইংরেজদিগের নিকট হইতে শুনিয়া অন্ধকূপহত্যার একটি বিবরণ দিয়াছেন—"প্রায় দুই শত ব্যক্তিকে একটি গুদামঘরে পুরিয়া রাখা হইয়াছিল, তাহাতে প্রায় সকলেই মারা গিয়াছিল।"—(Bengal Past and Present vol xii)

এখন আমাদিগের দ্বিতীয় ও তৃতীয় মূল প্রশ্নের সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিব। গ্রের পত্রের তারিখ জুন মাস বলিয়া লিখিত হইয়াছে, কিন্তু এই পত্র জুন মাসে লিখিত হইতে পারে না। ক্যাপটেন মিলের নোটবুক বিশ্বাস করিলে এ কথা বলিতে হইবে, দুর্গ অধিকার-কালে জুনিয়র গ্রে—এই পত্রের লেখক—দুর্গ হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন—(Hill vol 1 p 44)। সুতরাং মিঃ গ্রে জুনিয়র প্রত্যক্ষদর্শী নহেন, তিনি হলওয়েল ও অপরাপর ব্যক্তিগণের বিবরণ শুনিয়া একটি কাল্পনিক বিবরণ লিখিয়াছিলেন। গ্রের পত্রে লিখিত আছে—"যে সময় নবাবের সৈন্যগণ লুণ্ঠনে ব্যাপৃত ছিল, সেই সময়ে কয়েক জন ব্যক্তি পলায়ন করিয়া নৌকাযোগে জাহাজে আশ্রয় লইয়াছিলেন। মিঃ গ্রে স্বয়ং সেই দলের একজন।"—(Hill vol 7 p 108)

আমরা পূর্ব্বেই ক্যাপটেন মিলের পকেট-বইয়ের সমালোচনা করিয়াছি এবং দেখাইয়াছি, উহা রোজনামচা নহে—পরে অবসরমত উহা লেখা হইয়াছিল। ক্যাপটেন মিল লিখিয়াছেন,—"পুরুষ, স্ত্রী ও শিশু লইয়া ১৪৪ জনকে অন্ধকূপে আবদ্ধ করা হইয়াছিল।" তিনি স্থির জানিতেন যে, স্ত্রী ও শিশু না লইলে ১৪৪ সংখ্যা

পূর্ণ হয় না, সুতরাং ইহা তাঁহার উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য ইচ্ছাকৃত উদ্ভাবনা! ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে জুন মাসে London Chronicle পত্রিকায় যে সকল পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল—অন্ধকূপ হইতে যে সব ব্যক্তি উদ্ধার পাইয়াছিল, এ পত্রিকায় তাহার একটি তালিকা দেওয়া হইয়াছে। সেই তালিকায় Captain Millএর নাম নাই। তাহাতে লিখিত আছে—John Knox, George Gray Junior, Captain Mills, Mr. Kerword এবং অপর কয়েক জন নাবিক সৌভাগ্যবশতঃ অন্ধকূপে আবদ্ধ হন নাই, মুসলমানগণের আদেশে তাঁহাদিগকে কলিকাতা পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল।"—(Hill vol III p 73) সুতরাং ক্যাপটেন মিল ও জন গ্রে জুনিয়র অন্ধকূপে আবদ্ধ হন নাই।

৩রা জুলাইয়ে চন্দননগর হইতে লিখিত ফরাসী-পত্রে অন্ধকূপহত্যার বিবরণ আছে, কিন্তু মশিয়ে রেণো ২৯শে আগষ্ট তারিখে যে পত্র লিখিতেছেন, তাহাতে অন্ধকূপের উল্লেখ পর্য্যন্ত নাই। এই পত্র পড়িয়া মনে হয়, এই পত্রলেখক এমন একজনের নিকট সমস্ত সংবাদ পাইয়াছেন, যিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমস্ত বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। অথচ কোন ফরাসী-পত্রে এরূপ বর্ণনা নাই, এ পত্র যেন কোনো উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য ফরাসী ভাষায় লিখিত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, এই পত্র ৯ই নবেম্বর তারিখে ফোর্ট সেণ্ট জর্জ্জে সিলেক্ট-কমিটীর আলোচনায় ব্যবহৃত হয়। আরও বিস্ময়ের বিষয়, ২রা জুলাই ওয়াট ও কোলেট যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে অন্ধকূপের উল্লেখ নাই। সহসা ৩রা জুলাই এই একজন ফরাসী এত সংবাদ কোথা হইতে পাইলেন? এই পত্রে অন্ধকূপে আবদ্ধ ব্যক্তির সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে ১৬০ জন এবং তাহারা সকলেই য়ুরোপীয় এবং মৃতের সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে ১৩২।

ইহার পর ৮ই জুলাই লিখিত মিঃ সাইক্সের পত্র। এই পত্রে হলওয়েলের লিখিত বর্ণনার বিষয় লেখা আছে। এই পত্র অনুসারে হলওয়েলের মতে ১৬০ জনকে অন্ধকূপে আবদ্ধ করা হয়, পরদিন প্রভাতে ১১০ মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং সমস্ত রাত্রি মুসলমানগণ অন্ধকূপের ভিতর গুলীবর্ষণ করিয়াছিল।—পূর্ব্বোল্লিখিত ৩রা জুলাইয়ের পত্রে অথচ লেখা আছে, "মুসলমানগণ নিরস্ত্র ব্যক্তিকে হত্যা করিতে অভ্যস্ত নহে।"

১৩ই জুলাই লিখিত ক্যাপটেন গ্রাণ্টের বর্ণনামতে য়ুরোপীয়, পর্ত্তুগীজ ও আর্ম্মেনীয় লইয়া ২ শত জনকে অন্ধকূপে আবদ্ধ করা হয়, তন্মধ্যে ১০ জন মাত্র জীবিত ছিল।

হলওয়েলের ১৭ই জুলাইয়ের পত্রে বন্দিসংখ্যা ১৬৫ বা ১৭০ এবং মৃতের সংখ্যা ১৪৯ বা ১৫৪। ওয়াট ও কোলেট কোর্ট অব ডিরেক্টরের নিকট যে পত্র লেখেন, তাহাতে বন্দীর সংখ্যা ১৪৬ এবং মৃতের সংখ্যা ১২৩। ইহার পর হইতে এই সংখ্যার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। হলওয়েল তাঁহার তৃতীয় পত্রে তাঁহার পূর্ব্বপত্রের সংশোধন, পরিবর্ত্তন এবং পরিবর্দ্ধন করিয়াছেন; এই পত্রে তিনি ১৪৬ জন বন্দী ও ১২৩ জন মৃত বলিয়া ঠিক করিয়াছেন। ১৯শে জুলাই কলতা হইতে মিঃ ড্রেক যে পত্র লিখিয়াছেন, তখনও ওয়াট ও কোলেট বা হলওয়েলের পত্রের কথা তাঁহারা অবগত ছিলেন না, তাই বন্দিসংখ্যা দিতেছেন ২০০ এবং মৃতের সংখ্যা ১৭৫। মিঃ উইলিয়ম লিণ্ডসের পত্রেও ড্রেকের পত্রের অনুরূপ বিবরণ আছে। ২৯শে আগষ্ট তারিখে চন্দননগরের অধ্যক্ষ মশিয়ে রেণোর পত্রে ২০০ জন বন্দীর উল্লেখ আছে। এই সকল হইতে বুঝা যায়, Captain Millএর পকেটবুক এবং গ্রের পত্র হলওয়েলের এই পত্র প্রকাশিত হইবার পর লিখিত।

হলওয়েলের প্রথম বিবরণে "কোম্পানীর নিযুক্ত কর্ম্মচারী, সৈন্য ও সেনানায়ক লইয়া মোট ১৬০ জন।"—বলিতে সকলেই য়ুরোপীয়, এই কথাই মনে হয়। ৩রা জুলাইয়ের চন্দননগরের পত্রে বন্দিগণ সকলেই য়ুরোপীয় বলিয়া সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। হলওয়েলের দ্বিতীয় বিবরণে বন্দিগণ কৃষ্ণকায় ও শ্বেতকায়। হলওয়েলের তৃতীয় বিবরণ হইতে জানা যায়, বন্দিগণের মধ্যে ওলন্দাজ ও দেশী পর্ত্তুগীজ সৈনিক ছিল।

এখন দেখা যাক, দুর্গে কত জন লোক দুর্গাধিকারকালে ছিল। অধ্যক্ষ ড্রেকের মতে কলিকাতা অবরোধকালে দুর্গে য়ুরোপীয়, আর্ম্মেনিয়ন ও পর্ত্তুগীজ লইয়া মোট ৫১৫ জন অস্ত্রধারণক্ষম পুরুষ ছিল। তাহার মধ্যে ৪৫ জন মিলিটারী, ৫০ জন ভলাণ্টিয়ার, ৬০ জন মিলিশিয়া, ৩৫ জন গোলন্দাজ এবং কয় জন নৌ-সৈনিক—তাহাদের সংখ্যা আন্দাজ ৪০; মোট ২৩০ য়ুরোপীয়, বাকী ২৮৫ জন

আর্ম্মেনিয়ন ও দেশী পর্ত্তুগীজ। ড্রেকের হিসাবে এই ২৩০ জন য়ুরোপীয়ের মধ্যে ৩৬ জন ওলন্দাজ (ইহারা ওলন্দাজ কুঠী হইতে পলায়ন করিয়া আসিয়াছিল) এবং ১৯০ জন ইংরেজ ও অন্যান্য বিদেশীয়।

Mr. William Lindsay অর্ম্মে সাহেবকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতেও ঐরূপ তালিকা দিয়াছেন। কলিকাতা অধিকার কালে যাহারা অস্ত্রধারণ করিয়াছিল, তাহার একটি তালিকা S. C. Hill সঙ্কলিত Bengal in 1756-57এর তৃতীয় খণ্ডের ৪১৫-১৬ পৃষ্ঠায় দেওয়া আছে। তাহাতে সর্ব্বসমেত ৪২৫ জনের হিসাব আছে। ইহা ব্যতীত আরও কয়েক জন কলতায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। তাহাদের নাম এ তালিকায় নাই। এই তালিকায় ৪২ জন কোম্পানীর কর্ম্মচারী, ১৯ জন মিলিটারী কর্ম্মচারী, ২ জন পাদ্রী, ৮ জন ডাক্তার, ৯ জন আইন-ব্যবসায়ী, ১০ জন স্বাধীন ব্যবসায়ী, ২৮ জন নগরবাসী, ১৪ জন বিদেশী, ৬ জন বংশীবাদক, ৪১ জন নাবিক কর্ম্মচারী, ৭ জন সারেঙ্গ, ৩৫ জন য়ুরোপীয় সৈনিক, ২৫ জন য়ুরোপীয় গোলন্দাজ, ১৯০ জন তোপাজ বা ফিরিঙ্গী সৈনিক, ৫০ জন পর্ত্তুগীজ এবং আর্ম্মেনীয় সৈনিকের উল্লেখ আছে।

গভর্ণর ড্রেক যখন চলিয়া যান, তখন তাঁহার সহিত প্রায় দুই শত বাছাই সৈন্য তিনি লইয়া যান। দুর্গে তখন অবশিষ্ট থাকে প্রায় দুই শতাধিক লোক—(Hill III 169)। ক্যাপ্‌টেন গ্র্যান্ট বলেন, গভর্ণর চলিয়া যাইবার ৩০ ঘণ্টার মধ্যে ৫০ জন য়ুরোপীয় শত্রুর গুলীতে নিহত হয়—(Hill I 88)। হলওয়েলও বলেন, ২০শে দ্বিপ্রহরে বিশিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে ২৫ জন নিহত ও ৭০ জনের অধিক আহত হইয়াছিল, সঙ্গের লোকের (Train) মধ্যে মাত্র ১৪ জন অবশিষ্ট ছিল।—(Hill I 114) মিঃ গ্রের বর্ণনা হইতে জানা যায়, ৫৬ জন ওলন্দাজ দুর্গ অধিকারের পূর্ব্বে পলায়ন করিয়াছিল। গ্রাণ্টের বর্ণনা-মতে এবং আরও অনেক পত্র হইতে জানা যায়, দুর্গ অধিকারকালে মুসলমানদিগের হস্তে বহু ইংরেজ সৈনিক নিহত হইয়াছিল। মিলের পকেটবুকে দুর্গ অধিকার-কালে যাহারা পলায়ন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ১৫ জন য়ুরোপীয়ের উল্লেখ আছে। London Chronicle-এর একটি তালিকায় (Hill III p 71-72) অন্ধকূপে যাহাদিগকে বন্দী করা হয় নাই, তাহার মধ্যে Captain Mill এবং George Gray Junior-এর নাম উল্লেখযোগ্য।

Captain Grant বলিয়াছেন, দুর্গ অধিকারকালে যাহাদের অঙ্গে লালকোর্ত্তা ছিল, তাহাদের সকলকেই মুসলমানগণ কাটিয়া ফেলিয়াছিল। দুর্গ অধিকারকালে যে বহু সৈনিক নিহত হইয়াছিল, এ কথা বলাই বাহুল্য। এই সকল উক্তির সামঞ্জস্য করিতে গেলে অন্ধকূপে আবদ্ধ হইবার মত লোক খুব অল্পই থাকে, তাই বুঝিয়া ক্যাপ্‌টেন মিল লিখিয়াছেন, পুরুষ, স্ত্রী ও শিশু লইয়া ১৪৪ জন অন্ধকূপে আবদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু এই ক্যাপ্‌টেন মিল তখন কোথায়?

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।

শ্রীত্রিদিবনাথ রায় (এম্‌-এ, বি-এল)।

"রমণীর নম্র হিয়া-তলে"

রমণীর নম্র হিয়াতলে　　শরতের রবি-শশী জ্বলে;
ও অঙ্গ আলোর প্রভা ঝরিয়া কেবল,
ধরণীর প্রতি গৃহে জ্বালে সন্ধ্যাদীপ সমুজ্জ্বল।

ও অঙ্গ কৌমুদীধারা লাগি　সারা বিশ্ব থাকে তাই জাগি;
ও হিয়া অতুল ধারা বাঞ্ছিত বিশ্বের,
ও তনু জ্যোতির তীর্থ আনে মুক্তি মহামানবের।

দুঃখ দৈন্য আঁধারের পর　　ও আনন্দ মাধুরী নির্ঝর,
শীতল শান্তির ঝর্ণা ঢালি অবিরল,
রজত পূর্ণিমা সম করে হিয়া আনন্দ উজ্জ্বল।

জীবনের খরতর স্রোতে　　ভেসে যবে যাই লক্ষ্যপথে,
হারাইয়া ধরণীর সর্ব্ব শেষ কূল;
নারীর মহিমা কত তখনি সে বুঝিল নির্ভুল।

জ্বালিয়া মঙ্গলদীপ নারী　　দ্বারে এসে হয় সে যে দ্বারী,
অন্ধকার গৃহ হতে দেখাইয়া পথ,
সোণার আলোক-রাজ্যে চালাইয়া নেয় স্বর্ণ রথ।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার পাল।
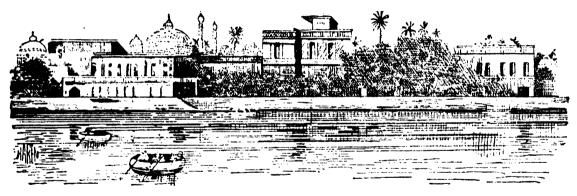
সাও পাওলো

দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিলের অন্তর্গত সাও পাওলো নগর অল্প দিনের মধ্যেই কৃষি-কার্য্যের ফলে কিরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছে—'মাসিক বসুমতীর' পাঠকগণকে তাহার বিবরণ প্রদান করিতেছি।

সাও পাওলো ষ্টেটের প্রধান নগরের নাম সাও পাওলো। পূর্ব্বে এই স্থান অরণ্য-সমাকুল ছিল। এখনও সাও পাওলো নগরের চারিদিকে অনতিউচ্চ পাহাড়ের শ্রেণী ও ফাঁকা বিস্তৃত প্রান্তর দেখিতে পাওয়া যাইবে।

সহরে অট্টালিকা সমূহ প্রতিদিনই নির্ম্মিত হইতেছে—বড় বড় ইমারত ও বাস-ভবনের সংখ্যা ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছে। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে সহরের যে সকল অংশে ঝোপ জঙ্গল ছিল, তথায় এখন মনোরম বাসভবন এবং উদ্যানশ্রী দেখিয়া দর্শকের মন পরিতৃপ্ত হইবে।

সাও পাওলোতে কফিপানরত যুবকবৃন্দ

প্রতি বৎসর কিরূপ অনুপাতে ভবন-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। মিঃ রবার্ট মুর-লিখিত সাও পাওলোর বিবরণে দেখা যায়, যে বৎসরে ৩৬৫ দিনে, দৈনিক ৮ ঘণ্টা করিয়া কাযের সময় ধরিলে, প্রতি ঘণ্টায় ২ খানি করিয়া ভবন নির্ম্মিত হইয়া সাও পাওলোর শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতেছে। তথাপি সাও পাওলোকে এখনই প্রথম শ্রেণীর সহর বলা সঙ্গত নহে; কিন্তু এই সহরটি যে ক্রমোন্নতিশীল তাহা বলিতেই হইবে। ব্রেজিলের মধ্যে সাও পাওলো খুব পুরাতন সহর হইলেও ইহার উন্নতি প্রথম হইতে মন্থরগতিতে চলিয়াছিল। তথাপি দেখা যায় যে, গত ৬০ বৎসরের মধ্যে নগরের অধিবাসীর সংখ্যা ৪০ গুণ বাড়িয়াছে। এখন ইহার লোকসংখ্যা ১২ লক্ষ।

কর্ম্মীরা অপরাহ্নে কার্য্যালয় হইতে বাহির হইয়া বাসে চড়িতেছে

কফির বোঝা লইয়া মুটিয়ারা গুদামজাত করিতেছে

সাও পাওলোর উন্নতির মূল কারণ কফির চাষ। গত শতাব্দীতে অর্থাৎ ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে বিভিন্ন দেশের জনগণের সমাগম হইয়াছে। ইটালীয়, স্পেনিস্ ও পোর্ত্তুগীজরা দলে দলে দলে সাও পাওলোতে আসিতে থাকে। প্রধানতঃ ষ্টেট হইতে এই সকল ব্যক্তির আগমনের জন্য সাহায্য প্রদত্ত হইয়াছিল। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ১ লক্ষ ৩১ হাজার নর-নারী সাও পাওলো ষ্টেটে আশ্রয় গ্রহণ করে।

ব্রেজিলের মধ্যে সাও পাওলো ষ্টেট কৃষির পক্ষে অত্যন্ত উর্ব্বর বলিয়া বিদেশ হইতে অনেকে আকৃষ্ট হইয়া এখানে চাষ-বাসের জন্য আগমন করিয়াছিল। কফি, তুলা, এবং নানাবিধ ফল উৎপাদনে সাও পাওলোর ভূমি অত্যন্ত উপযোগী।

সাও পাওলো সমুদ্র হইতে দূরে অবস্থিত এবং ইহার কাছাকাছি কোন প্রবল স্রোতস্বিনীও নাই। এজন্য নানা দিক হইতে রেলওয়ে লাইন নির্ম্মিত হইয়া সাও পাওলোর সহিত যোগসূত্র অবিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে।

সাও পাওলো বন্দর নহে। জলপথের কোন সুবিধা

এখানে পাওয়া যাইবে না। আটলান্টিক মহাসাগর এখান হইতে ৩৫ মাইল দূরে অবস্থিত। একটি জলাভূমির প্রান্ত দিয়া টাইটী নদী আছে বটে, কিন্তু তাহাতে ছোট ছোট নৌকাযোগে জলবিহার করা চলে; কিন্তু অর্ণবপোতের যাতায়াত সম্ভব হয় না।

সমুদ্র-বক্ষ হইতে সাও পাওলো ২ হাজার ৭ শত ফুট উচ্চে অবস্থিত। যাবতীয় পণ্য রেলপথে নগরে আসে অথবা সেরা ডো মার মালভূমির উপর দিয়া স্যাণ্টোজে আসিয়া জমা হয়।

বহুকাল ধরিয়া স্যাণ্টোজ অস্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। পীতজ্বর, ম্যালেরিয়া, প্লেগ এবং প্রচণ্ড উত্তাপের জন্য এখানে কেহ সুস্থ দেহে বসবাস করিতে পারিত না। কিন্তু জনগণের সমবেত সাধনায় স্যাণ্টোজ স্বাস্থ্যকর স্থানে পরিণত হইয়াছিল।

সূর্য্যালোকে ডিম পরীক্ষা করা হইতেছে

প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে নগরের উন্নতিবিধানকল্পে একটি সঙ্ঘ গঠিত হইয়াছিল। তাহাদিগের প্রচেষ্টায় খাল কাটিয়া জলনিকাশের সুবন্দোবস্ত হইয়াছিল। সুপেয় পানীয় জলের সরবরাহের ব্যবস্থাও সঙ্গে সঙ্গে হইয়াছিল, সহর হইতে অনতিদূরে যে নূতন বন্দর নির্ম্মিত হইয়াছে তাহা যে নদীর উপর অবস্থিত, সেই নদীরও গভীরতা বৃদ্ধি করা হয়। আধুনিক ডক বা পোতাশ্রয় তদুপরি নির্ম্মিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে বন্দরের নানা স্থানে বহু হোটেল নির্ম্মিত হইয়াছে। সাও পাওলো সহর এবং অন্যত্র হইতে এখন দলে দলে এখানে নরনারীরা অবসর-সময়-বিনোদনের জন্য ভিড় করিয়া থাকে।
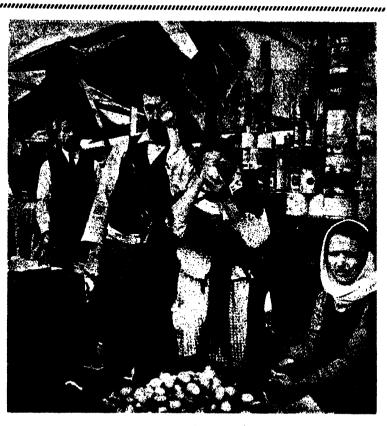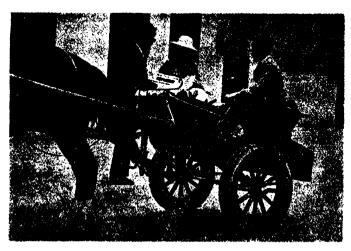
সহর-উপকণ্ঠে সাবেকী বগী গাড়ী চলিতেছে

স্যাণ্টোজএর কিছুদূরে জলা-ভূমির ধারে ধারে কদলী-ক্ষেত্র। সাও পাওলোর উৎপন্ন প্রচুর কদলী জাহাজ বোঝাই হইয়া বিভিন্ন স্থানে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হইয়া থাকে।

কফি উৎপাদন ও রপ্তানি ব্যবসা স্যান্টিষ্টাদিগের জীবন-যাত্রার প্রধান অবলম্বন। কেহ উহা ক্রয় করে, কেহ বিক্রয় করে। আবার কেহ বা উহা জাহাজে করিয়া চালান দেয়, কেহ কেহ উহা বহন করে। বাকী লোক কফির দ্বারা কো[...] না কোন উপায়ে জীবিকা অর্জ্জন করিয়া থাকে। কফি[...] গন্ধে সমস্ত সহর পরিপূর্ণ। গভীর রাত্রে নিশীথ "রা[...] পুষ্পের দুর্গন্ধ" বাতাসে ভারাক্রান্ত হইলে কফির গন্ধ আর অনুভূত হয় না। সাও পাওলো ষ্টেটের নানা স্থানে প্রায় দেড় লক্ষ কোটি কফি গাছ আছে। জগতের নানা স্থানে যত কফি শুঁটি আহৃত হইয়া থাকে, তাহার অর্দ্ধাংশেরও অধিক সাও পাওলো ষ্টেট হইতে উৎপাদিত হয়। প্রতি বৎসর ৯০ লক্ষ হইতে ১ শত কোটি বস্তা কফি, জগতের এই বৃহত্তম বন্দর হইতে রপ্তানী হইয়া থাকে। প্রত্যেক বস্তায় প্রায় ১ মণ ২৫ সের পরিমাণ কফি থাকে। ব্রেজিলের অন্যান্য বন্দর হইতে ১ কোটি ২০ লক্ষ হইতে ১ কোটি ৫০ লক্ষ বস্তা কফি রপ্তানী হইয়া থাকে।

মধ্যাহ্নে পাউলিষ্টারা লাঞ্চ খাইতে ট্রামে চলিয়াছে

বিষহীন কৃষ্ণকায় বৃহৎ মাকড়সা

স্যান্টোজের গুদাম-গৃহে সকল সময়েই ২০ লক্ষ বস্তা কফি সঞ্চিত থাকে। কফি শুটিপূর্ণ নমুনার আধারগুলি বিক্রয়ের পূর্ব্বে পরীক্ষিত হয় এবং তদনুসারে কফির শ্রেণী বিভাগ করা হইয়া থাকে। গন্ধের সাহায্যেই ভাল মন্দ জাতীয় কফি নির্ণীত হইয়া থাকে। এ জন্য বহুসংখ্যক পরীক্ষক নিযুক্ত আছে

পরীক্ষার পর যে সকল কফি অতি নিম্ন স্তরের বলিয়া বিবেচিত হইত, তাহা স্বতন্ত্র করিয়া রাখা হইত। বিগত ১৯৩১ খৃষ্টাব্দ হইতে এ পর্য্যন্ত ব্যবহারের অযোগ্য ৬ কোটি ৫১ লক্ষ ৯০ হাজার বস্তা কফি পুড়াইয়া ফেলা হইয়াছে।

তুলার চাহিদা প্রবল হওয়ার ফলে কতকগুলি কফি

স্যান্টোজ হইতে জাহাজে কলা চালান দেওয়া হইতেছে

বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনকারী জলস্রোত ,লের ভিতর দিয়া আসিতেছে

সাও পাওলোর জলাশয়ে কৃষ্ণহংস খেলা করিতেছে

পরীক্ষক কফির স্বাদ গ্রহণ করিতেছে

উৎপাদনের অঞ্চলে তুলার চাষ আরম্ভ হইয়াছে। সাও পাওলোর তুলার চাহিদা সর্ব্বপ্রথম আমেরিকার গৃহ-যুদ্ধের সময় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। বিগত বিশ্ব-যুদ্ধের সময়ও উহার চাহিদা বাড়িয়াছিল। সম্প্রতি কয়েক বৎসর ধরিয়া সাওপাওলোর তুলা বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দ হইতে সাও পাওলো বিশগুণ তুলা উৎপাদন করিতেছে। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে এই অঞ্চল হইতে ৩০ লক্ষাধিক গাইট তুলা উৎপাদিত হইয়াছিল। উহার ৫ ভাগের ৪ ভাগ তুলা এবং তুলা-বীজের তৈল স্যাণ্টোজ বন্দর হইতে বিভিন্ন দেশে রপ্তানী হইয়াছিল। তন্মধ্যে জাপান ও জার্ম্মাণীতে অর্দ্ধেক তুলা প্রেরিত হয়।

স্যাণ্টোজ হইতে সাও পাওলো পর্য্যন্ত পদব্রজে গমন করিলে পথে পাহাড়ের প্রাচীর দৃষ্ট হইবে। সে পথে যাত্রা করিলে শুধু প্রকৃতির বিচিত্র ও বিস্ময়কর দৃশ্য পথিকের মনকে অভিভূত করিয়া রাখে।

এই পথে রেলগাড়ী যাতায়াত করিয়া থাকে। উচ্চাবচ পথ দিয়া রেলগাড়ী হু-হু শব্দে চলিয়াছে। কোন গাড়ী উপরের দিকে পাহাড় অতিক্রম করিয়া উঠিতেছে। আবার কোনও ট্রেণ দ্রুত নামিয়া আসিতেছে।

স্যাণ্টোজ বন্দর হইতে কিছু দূরে সেরা পর্ব্বতমালা অবস্থিত। এই পর্ব্বত হইতে বৃষ্টির জলধারা নামিয়া টাইটী নদীতে গিয়া পড়িত। তথা হইতে পাবানা নদীর স্রোতোধারার সহিত মিলিত হইয়া জলরাশি ক্রমশঃ রায়োডিলা প্লাটার লবণাক্ত সলিলরাশিতে আত্মবিসর্জ্জন করিত। রায়োডিলা প্লাটা বিউনস্ এয়ার্স্‌এ অবস্থিত।

মালভূমির উপর সুকৌশলে এমন বাঁধ দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে যে, বৃষ্টির জল-প্রবাহ এক সুবিস্তৃত স্থানে সঞ্চিত হয়। এই স্থানটি সেরা পর্ব্বতের চূড়ার সমতল।

মালভূমির চূড়ায় বৎসরে ১ শত ৮০ হইতে ২ শত ৪০ ইঞ্চি বারিপাত হইয়া থাকে। সুতরাং মানব হস্তরচিত

গ্রামোফোন রেকর্ড সংগ্রহাগার

নূতন বৎসরের উৎসবে গায়ক ও বাদক দল গান করিতেছে

কিন্তু এখন আর তাহা হইবার উপায় নাই। দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ বৈজ্ঞানিক এঞ্জিনীয়ারদিগের প্রচেষ্টায় প্রকৃতির খেয়াল পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। এঞ্জিনীয়ারগণ জলের স্রোতোধারা ঘুরাইয়া পাহাড়ের উপর দিয়া প্রবাহিত হইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

এই হ্রদে প্রতিবর্ষে প্রচুর জল সঞ্চিত হয়। নবেম্বর হইতে মে মাস পর্য্যন্ত এখানে বারিপাতের সময়।

৩ লক্ষ ৮০ হাজার অশ্ব-শক্তির বেগে জলধারা যখন পাহাড়ের পাশ দিয়া মত্তবেগে প্রবাহিত হইতে থাকে, তখন দর্শক সে দৃশ্য দেখিয়া বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া পড়ে। কিন্তু

সেই জলস্রোতকে যখন পাঁচটি বিভিন্ন নলপথের সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত করা হয়, তখন তাহা আরও বিস্ময়কর বলিয়া প্রতিভাত হয়।

বড়দিনের সময় সাও পাওলোর সাও বেনটো এবং

সর্প-মুখবিবর হইতে বিষ সংগ্রহ

জাহাজের নাবিকদিগকে সর্পক্ষেত্রের সহকারী সর্পবিষ-নিষ্কাশন ব্যাপার দেখাইতেছে

রুয়া ডায়রেইটা পথে বেলা ১০টা হইতে সন্ধ্যা ৮টা পর্য্যন্ত কোন প্রকার যান চলাচল করে না। তখন দলে দলে সুবেশা নারী ও পুরুষগণ দোকানে ক্রয়-বিক্রয় কার্য্যে নিরত থাকে।

পথে ৯ ফুট দীর্ঘ এক মনুষ্যমূর্ত্তি দেখা যায়। ইহার মুখমণ্ডল শ্মশ্রুল, পৃষ্ঠে ও কক্ষপুটে সুরার ঝুড়ি ও ফলের আধার দেখিতে পাওয়া যাইবে। এই দীর্ঘকার মনুষ্যমূর্ত্তির অন্তরালে এক জন লোক ক্রেতাদিগকে প্রার্থিত দ্রব্য বিক্রয় করিতেছে।

পথে পথে ক্যামেরা লইয়া আলোক-চিত্রকর ঘুরিতে থাকে।

তাহারা সস্তায় লোকের ফটো তখনই তুলিয়া দেয়। রাজপথের নানা স্থানে ফাউন্টেনপেন-বিক্রেতারা পথিকদিগকে বিবিধপ্রকার কলম বাহির করিয়া দেখাইতেছে। সাপুড়েরা ঔষধ ও মন্ত্রের জোরে কি করিয়া সাপকে বশীভূত করা যায়, তাহাও দেখাইতে ব্যস্ত।

পথের মোড়ে মোড়ে যন্ত্রচালিত খাবার-সরবরাহের ঘর আছে। ক্ষুধা বোধ করিলে তথায় গিয়া ছিদ্রপথে যথা-নির্দ্দিষ্ট মূল্য প্রদান করিলে অমনই স্যাণ্ড-উইচ, মাংস, স্যালাড, সুরা, দুগ্ধ, কফি—যাহা যাহা ক্রেতা-দিগের খাইবার ইচ্ছা, নির্দ্দেশমত সেই সকল সুখাদ্য বাহির হইয়া আসে।

কফির দোকানের সংখ্যা নাই। বসিয়া, দাঁড়াইয়া, বেড়াইয়া বেড়াইয়া যদৃচ্ছ কফি পান করা চলে। অনেক আপিসে দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে এবং অপরাহ্নে বেয়ারারা ট্রেতে কফিপূর্ণ পাত্র লইয়া গতায়াত করিতেছে, ইহা নিত্য-সংঘটিত দৃশ্য।

ভূমিচম্পক জাতীয় ফুলের প্রাচুর্য্য সাও পাওলোতে দেখিতে পাওয়া যায়। বলনৃত্যা-গার, আহারের ঘর, হোটেল, সর্ব্বত্রই অর্কি-ডের ছড়াছড়ি। সাও পাওলো অর্কিডের জন্য প্রসিদ্ধ। বহু শত বিভিন্ন জাতীয় অর্কিড গৃহস্থের উদ্যানে দেখিতে পাওয়া যাইবে। কোন কোন ব্যক্তির গৃহের উদ্যানে আড়াই হাজার বিভিন্ন প্রকারের

স্যাণ্টোজের তালগাছের মাথী সংগ্রহ

পুলিস-পরিচ্ছদধারী বালক মোটরের গতিবেগ লক্ষ্য করিতেছে

পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কফি-বন্দর স্যাণ্টোজ

। ব্রেজিল সর্পবিষ সম্বন্ধে প্রচুর গবেষণা করিয়া রোগ-প্রতিষেধক ঔষধ উদ্ভাবন করেন। হস্র সহস্র ব্রেজিলবাসীর জীবন রক্ষা পায়। বর ৫ হাজার হইতে ১০ হাজার লোক সর্প-

চলচ্চিত্রের ছবিসম্বলিত ... । নিক্ষেপ করিয়া আহার্য্য সংগ্রহ করিতেছে

শত মৃত সর্পের মুখ হইতে উগ্র বিষ নিষ্কাশিত করা হইয়া থাকে।

সাপের কণ্ঠদেশ ক্ষিপ্রহস্তে চাপিয়া ধরিয়া সহকারীরা বলপূর্ব্বক সর্পের মুখবিবর উন্মুক্ত করে। তারপর একটা কাচের পাত্রের প্রান্তদেশ বিষদন্তের কাছে ঠেলিয়া দেয়। মাথার পাশে যে গ্রন্থি অবস্থিত, উহাতে চাপ দিলে সাপ বাধ্য হইয়া বিষ নির্গত করিয়া দেয়। কার্য্যশেষে, সহকারীরা সাপটাকে বেড়া ডিঙ্গাইয়া আর একটা খোপে নিক্ষেপ করে।

সহকারীরা এমন ক্ষিপ্রতা ও শৃঙ্খলার সহিত বিষনিষ্কাশন কার্য্য করে যে, দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। ভুল তাহাদের কদাচিৎ হয়! যদি দৈবাৎ কাহারও ভুল হয়—সর্পের বিষদাঁত সহকারীর অঙ্গুলিতে বিদ্ধ হয়, তখনই সে ব্যক্তি চিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ করে।

কোন কোন সর্পের নিষ্কাশিত বিষের বর্ণ কমলা নেবুর রসের ন্যায় পীতবর্ণ। আবার কোন কোন সর্পবিষ দুগ্ধবৎ শুভ্র অথবা জলের ন্যায় বর্ণহীন ... ২ শত ... মাত্র ... প-

আনহাঙ্গাবাহু পার্ক—দক্ষিণে মিউনিসিপ্যাল থিয়েটার

...াপিকো" নামক ...ষ্ঠানটি চলিত ...স্র দর্শক এই

স্যাণ্টোজের তালগাছের মাথা সংগ্রহ

পুলিস-পরিচ্ছদধারী বালক মে... স্রোত নামিতেছে

...কার। তবে ...নের মত লঘু কাষ্ঠও ...াছে। সমগ্র ব্রেজিলে ৬ শত প্রকার হইতে নানাবিধ গৃহব্যবহার্য্য আলমারী, দেরাজ, টেবল, চেয়ার প্রভৃতি আসবাব প্রস্তুত হইয়া থাকে। ৪ শত প্রকার কাষ্ঠই সাওপাওলো ষ্টেটে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

সাওপাওলোর দোকানে কারুকার্য্য খোদিত নানা প্রকার কাঠের ট্রে, আলোকস্তম্ভ, বাক্স এবং টেবল-শয্যার দ্রব্যাদি বিভিন্ন প্রকার কাষ্ঠ হইতে নির্ম্মিত হইয়া বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে।

সাও পাওলোর ইপিরাঙ্গা মিউজিয়ম্
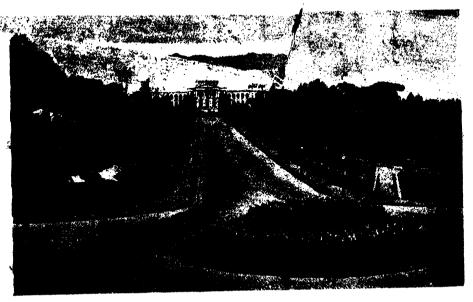
১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে এই সর্পক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সময় গাল-গলাফোলা প্লেগ স্যাণ্টোজে প্রবলভাবে দেখা দিয়াছিল। সর্পক্ষেত্র প্রতিষ্ঠানের প্রধান পরিচালক

ডাক্তার ভিটাল ব্রেজিল সর্পবিষ সম্বন্ধে প্রচুর গবেষণা করিয়া সর্পবিষ হইতে রোগ-প্রতিষেধক ঔষধ উদ্ভাবন করেন। তাহার ফলে সহস্র সহস্র ব্রেজিলবাসীর জীবন রক্ষা পায়।

প্রতি বৎসর ৫ হাজার হইতে ১০ হাজার লোক সর্প-

ভোজনার্থীরা যন্ত্রের ছিদ্রপথে মুদ্রা নিক্ষেপ করিয়া আহার্য্য সংগ্রহ করিতেছে
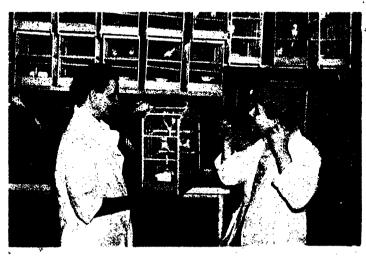
পাখীর বাজার

বিষ হইতে উৎপন্ন "সিরম্" প্রয়োগে চিকিৎসিত হইয়া থাকে। ইহাতে বহু ব্যাধি নিরাময় হয়।

সর্পক্ষেত্রে গমন করিলে দেখা যাইবে, সহকারীরা সর্পমুখ হইতে বিষ আহরণ করিতেছে। এক একদিনে ৯ শত মৃত সর্পের মুখ হইতে উগ্র বিষ নিষ্কাশিত করা হইয়া থাকে।

সাপের কণ্ঠদেশ ক্ষিপ্রহস্তে চাপিয়া ধরিয়া সহকারীরা বলপূর্ব্বক সর্পের মুখবিবর উন্মুক্ত করে। তারপর একটা কাচের পাত্রের প্রান্তদেশ বিষদন্তের কাছে ঠেলিয়া দেয়। মাথার পাশে যে গ্রন্থি অবস্থিত, উহাতে চাপ দিলে সাপ বাধ্য হইয়া বিষ নির্গত করিয়া দেয়। কার্য্যশেষে, সহকারীরা সাপটাকে বেড়া ডিঙ্গাইয়া আর একটা খোপে নিক্ষেপ করে।

সহকারীরা এমন ক্ষিপ্রতা ও শৃঙ্খলার সহিত বিষনিষ্কাশন কার্য্য করে যে, দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। ভুল তাহাদের কদাচিৎ হয়! যদি দৈবাৎ কাহারও ভুল হয়—সর্পের বিষদাঁত সহকারীর অঙ্গুলিতে বিদ্ধ হয়, তখনই সে ব্যক্তি চিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ করে।

কোন কোন সর্পের নিষ্কাশিত বিষের বর্ণ কমলা লেবুর রসের ন্যায় পীতবর্ণ। আবার কোন কোন সর্পবিষ দুগ্ধবৎ শুভ্র অথবা জলের ন্যায় বর্ণবিহীন। ব্রেজিলে ২ শত বিভিন্ন শ্রেণীর সর্প আছে। তন্মধ্যে মাত্র তিন প্রকার সর্পের বিষ আছে। সর্পবিষ-চিকিৎসার বিশেষজ্ঞরা বলেন যে, উক্ত সর্প-বিষসমূহ হইতে উৎপাদিত তিন প্রকার 'সিরমের' সাহায্যে সকল প্রকার সর্প-দংশন-জর্জ্জরিত ব্যক্তিকে রক্ষা করা যায়।

ব্রেজিলের 'র‍্যাটেল স্নেক' বা ঝম্-ঝম্ শব্দকারী সর্প ভয়ঙ্কর বিরাক্ত। এই জাতীয় সর্পের লেজের দিকে অনেকগুলি গ্রন্থি আছে। উহা যখন চলিতে থাকে, তখন উক্ত গ্রন্থিসমূহ হইতে ঝম্-ঝম্ শব্দ উত্থিত হয়। এই জাতীয় সর্প প্রায়ই মানুষকে দংশন করিয়া থাকে।

সমগ্র ষ্টেট হইতে প্রতিবৎসর ৩০ হাজার সর্প জাহাজে করিয়া উক্ত সর্পক্ষেত্রে আনীত হইয়া থাকে। এই সকল সাপ আসিবার সময় জাহাজে কোন ভাড়া লাগে না। যাহারা সাপ ধরিয়া দেয়, তাহাদিগের জন্যও বিশেষ কোন অর্থব্যয়

হয় না। যে ব্যক্তি ৪টি সর্প ধরিয়া দিবে, উক্ত প্রতিষ্ঠানের গবেষণাগার হইতে উদ্ভূত একশিশি সিরম তাহাকে পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

এক জাতীয় সর্প আছে, তাহারা সাপ-ভক্ষণ করে। এই জাতীয় সাপ মানুষের কোন অনিষ্ট করে না। উহাদের বিষ নাই। সাপগুলি দেখিতে উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ। ইহারা নির্ব্বিচারে বিষহীন বা বিষধর সর্পকে গিলিয়া খায়।

সাও পাওলোর গবেষণাগারে নানাজাতীয় মাকড়সার সংগ্রহ আছে। প্রকাণ্ড আকারের, কৃষ্ণবর্ণের এবং লোম-বহুল মাকড়সা দেখিলেই দর্শকের মনে ভীতির সঞ্চার হইবে। কিন্তু দেখিতে ভয়ঙ্কর হইলেও তাহারা তেমন অনিষ্টকারী নহে। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রকায় ধূসরবর্ণের মাকড়সারই বরং বিষ সমধিক। মাকড়সা-দংশনের প্রতিকার-স্বরূপ নানাপ্রকার সিরম্ এই সর্পক্ষেত্রের গবেষণাগারে প্রস্তুত হইয়া থাকে। বৃশ্চিক-বিষের প্রতিষেধকও এইখানে প্রস্তুত হয়।

সাও পাওলের মেডিক্যাল স্কুলে ডাক্তার এম্, ই, আলভারো চক্ষুচিকিৎসা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ। কোন কোন ক্ষেত্রে অস্ত্রোপচারের পর চক্ষু হইতে রক্তপাত হইতে থাকিলে, সর্পবিষের কোন এক প্রকার মিশ্রণ প্রয়োগের ফলে রক্তপাত বন্ধ হইয়া যায়। কোন কোন চক্ষুপীড়ার যখন অসহ্য যন্ত্রণা হইতে থাকে, তখন গোক্ষুর এবং ঝুমঝুমি সর্পের বিষ প্রয়োগে চিকিৎসকগণ যন্ত্রণা নিবারণ করিয়া থাকেন।

সাও পাওলোতে জনসাধারণের জন্য স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটী বহুসংখ্যক গ্রামোফোন রেকর্ড প্রকাশ্য স্থানে রাখিয়াছেন। একটা বড় হলঘরে ৬ হাজার প্রসিদ্ধ গানের রেকর্ড সুসজ্জিত। গান ও লোকসঙ্গীতগুলির একটি তালিকাও সংরক্ষিত। যে কেহ তালিকা দেখিয়া রেকর্ড বাছিয়া লয়। তার পর যন্ত্রে রেকর্ড বসাইয়া সঙ্গীত শ্রবণ করে।

প্রতি ব্যক্তি ৪০ মিনিট কাল ঘরে বসিয়া গান শুনিবার অধিকারী। প্রতি দিন ২০ জন শ্রোতা গান শুনিবার জন্য আসিয়া থাকে। সেখানে মিউনিসিপ্যালিটী এই গ্রামোফোন রেকর্ড ও যন্ত্র রাখিয়াছেন, সেই অট্টালিকার

সাও পাওলোর মাছের বাজার

পুষ্পাভরণা তরুণী সুন্দরীযুগল

বাহিরে লেখা আছে, "ডিস্কটিকা পব্লিকা মিউনিসিপাল্।" এই প্রতিষ্ঠানটি ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হইয়াছে।

সাও পাওলোতে রেডিও ষ্টেশন আছে। দিনে দুইবার এই ষ্টেশন হইতে সমগ্র সহরে রেডিওযোগে সঙ্গীত, বক্তৃতা এবং নানাবিধ সংবাদ প্রচারিত হয়।

সহরোপকণ্ঠের বাজারে মৎস্যবিক্রেতা

সাও পাওলোতে জন-যান নিয়ন্ত্রণের সুব্যবস্থা আছে। লাল আলো দেখাইয়া রাজপথে যানসমূহকে থামান হয়। সাও পাওলোর রাজপথসমূহে মোটরগাড়ীগুলির চালকগণ বে-পরোয়াভাবে গাড়ী চালাইলে সে-জন্য জরিমানা দিতে হয়।

অভিযুক্ত মোটর-চালকগণ জরিমানা দিবার জন্য কদাচিৎ আদালতে নীত হইয়া থাকেন। নূতন করিয়া লাইসেন্স লইবার পূর্ব্বে যদি কেহ জরিমানার টাকা না দেন, তখন
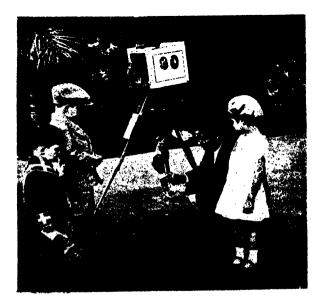
পথের মাঝে ফটো তোলা

তাঁহাকে সে বিষয়ে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হয়। সেই সময়ে জরিমানার টাকা দিবার ব্যবস্থা করিতে হয়।

পুলিসের পরিচ্ছদে ভূষিত যান-বাহন-নিয়ন্ত্রণকারীরা মোটরগাড়ীর ঘোরা-ফিরা করিবার স্থানে পাহারায় থাকে। তাহারা প্রত্যেক গাড়ীর গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য করে।

মোটরের মালিকগণকে মোটর-লাইসেন্সের জন্য বৎসরে মাত্র এক ডলার প্রদান করিতে হয়। লাইসেন্স-ফলকখানি ষ্টিয়ারিং-বোর্ডে আঁটিয়া রাখিতে হয়।

নৈশ ক্লাবের কাছে পুলিশ-প্রহরীরা দাঁড়াইয়া প্রত্যেক ব্যক্তিকে পরীক্ষা করিয়া দেখে, তাঁহাদিগের কাছে কোন

৯ ফুট দীর্ঘ মূর্ত্তির দেহে সুরা ও ফলের বোঝা

প্রকার অস্ত্র-শস্ত্র আছে কি না। ইহা পুলিশের দৈনন্দিন কার্য্য।

সাও পাওলোতে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে সংশোধনাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তথায় পাপী-তাপীদিগকে রাখিয়া তাহাদিগকে সমাজে চলিবার উপযোগী শিক্ষা প্রদান করা হয়।

এই সংশোধনাগারের পরিচ্ছন্নতা প্রশংসনীয়। কি করিয়া মানুষ শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্ত্তিতা শিক্ষা করিতে পারে, ঐখানে তাহার সুব্যবস্থা আছে।

মানবমনোবৃত্তি-বিশারদগণ প্রত্যেক ব্যক্তিকে পরীক্ষা

সাও পাওলোর আকাশচুম্বী অট্টালিকা

সাও পাওলোর রাজপথে সকাল ১০টা হইতে সন্ধ্যা ৮টা পর্য্যন্ত যান-চলাচল বন্ধ
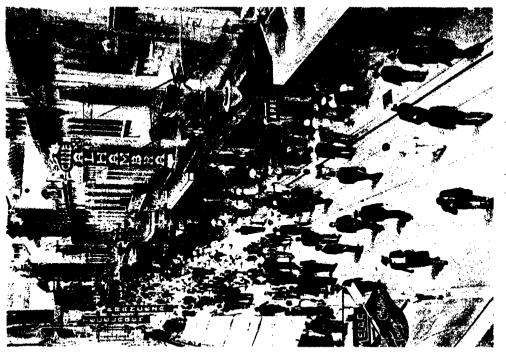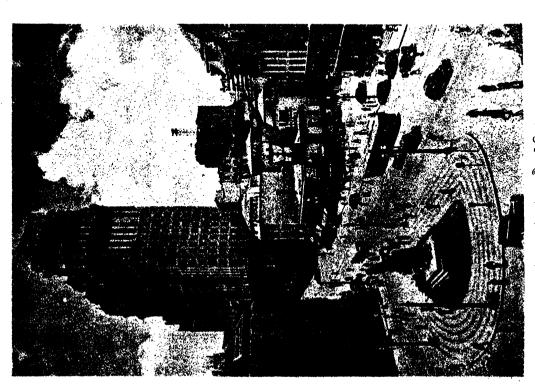
করিয়া, তাহাদিগের উপযোগী কার্য্যব্যবস্থা করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি যে কার্য্যে দক্ষতা দেখাইতে পারিবে, তাহাকে সেইরূপ কার্য্যশিক্ষায় নিয়োজিত করা হয়।

যে সকল ব্যক্তি এই প্রতিষ্ঠানে আনীত হয়, তাহাদিগের চারি ভাগের তিন ভাগ বর্ণজ্ঞানবিবর্জ্জিত। যাহারা অল্প-দিনের জন্য দণ্ডভোগ করিতে আইসে, তাহারা ব্যতীত, সকলকেই লেখাপড়া শেখান হয়। দণ্ডকাল উত্তীর্ণ হইবার পর প্রায় প্রত্যেকেই নিজ-নিজ যোগ্যতার উপযোগী বিষয়ে
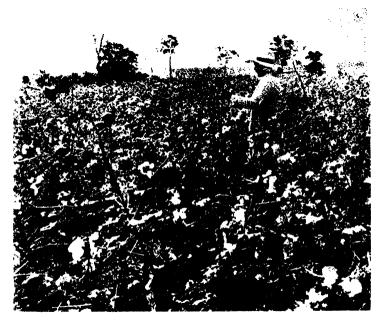
সাও পাওলোর তুলা ক্ষেত্র

শিক্ষালাভ করিয়া সংশোধনাগার ত্যাগ করে। এখানে থাকিবার সময়, প্রত্যেকের কর্ম্মের অনুপাতে যে উপার্জ্জন নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহা ব্যাঙ্কে জমা থাকে। মুক্তিলাভের পর সেই অর্থের দ্বারা তাহারা যথোপযুক্ত কায সংগ্রহ করিয়া লয়।

সাও পাওলোর দৃষ্টান্ত অনুসারে ব্রেজিলের অন্যান্য সহরেও অনুরূপ সংশোধনাগারসমূহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

প্রতি রবিবারে এখানে সঙ্গীত শিক্ষা প্রদত্ত হইয়া থাকে। চলচ্চিত্রও প্রতি রবিবারে বিনামূল্যে প্রদর্শিত হইবার ব্যবস্থা আছে।

সাও পাওলোতে বহু ক্লাব-গৃহ বিদ্যমান। প্রত্যেক বৈদেশিক জাতির জন্য স্বতন্ত্র ক্লাব দেখিতে পাওয়া যাইবে। সুতরাং কাহারও আমোদ-প্রমোদে কোনরূপ ব্যাঘাত ঘটে না।

তিনপুরুষ ধরিয়া ব্রেজিলের প্রধান সম্পদ ছিল কফি। কিন্তু ১৯২০ খৃষ্টাব্দ হইতে শ্রমশিল্পও সাও পাওলোতে বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে। নানাবিধ যন্ত্র এখানে নির্ম্মিত হইতেছে। বিভিন্ন পরিচ্ছদ ও বোতাম প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে এখানে প্রস্তুত হয়।

গিরিশৃঙ্গের উপর একটি স্মৃতিস্তম্ভ এবং ইপিরাঙ্গা মিউজিয়ম প্রতিষ্ঠিত আছে। এই যাদুঘরে নৃতত্ত্ব সংক্রান্ত বহু উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে। ব্রেজিলের ঐতিহাসিক বহু সংগ্রহ এখানে স্থানলাভ করিয়াছে।

এলবার্টো, স্যান্টোজ, ডুমণ্ড সর্ব্বপ্রথম যে বিমানে ব্যোমপথে উড়িয়াছিলেন, সেই ২৫ অশ্বশক্তিবিশিষ্ট বিমানখানি এই মিউজিয়মে সংরক্ষিত।

সাও পাওলো হইতে প্রতি সপ্তাহে ডাক লইয়া বিমান য়ুরোপে ২ বার যাতায়াত করিয়া থাকে। যুক্তরাষ্ট্রে সপ্তাহে ৪ বার বিমান-ডাক যাতায়াত করে।

সাও পাওলো যাদুঘরে ব্রেজিলের বহু পুরাতন কর্ম্মীর চিত্র আছে। এন্টোনিও রাপোস্যে টাভার্ণ-ফার্ণাও ডায়াস্ পেলেমি, বার্থলোমিউ বুয়েনো প্রভৃতি অভিযানকারীরা সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্রেজিলে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের প্রস্তরমূর্ত্তি বা চিত্রপট সংগ্রহ সাও পাওলো মিউজিয়ামের গৌরব বর্দ্ধিত করিতেছে।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

রুশিয়ার বিরুদ্ধে 'প্রোপাগাণ্ডা'

রুশিয়ার জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলির অভিযোগ এই যে, "অধিকাংশ আক্রমণ-বিমুখ দেশ, (Non-aggressor Countries) প্রধানতঃ ইংলণ্ড ও ফ্রান্স জোটবদ্ধভাবে নির্ব্বিঘ্নতা অবলম্বনের (policy of collecting security) নীতি,—আততায়িগণের আক্রমণে একযোগে বাধাদানের নীতি ত্যাগ করিয়া, 'পরের পাড় পিটার ভাঙ্গুক—দাঁড়িয়ে দেখি তফাতে' এই নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করিয়াছে।"

ইহাদের অবলম্বিত নীতির মর্ম্ম,—'আততায়ীরা কোন দেশ আক্রমণ করিলে সেই দেশের সাধ্য হয়—সে আত্মরক্ষা করুক, সে সাধ্য না থাকে, মরুক ; আমরা তাহাতে বাধা দিতে যাইব না। যে আক্রমণ করিবে, এবং যে আক্রান্ত হইবে, তাহাদের উভয়ের সঙ্গেই আমরা ব্যবসায় বাণিজ্য চালাইব।'

কিন্তু যাহারা এই নীতি অবলম্বন করিয়াছে, তাহারা প্রকারান্তরে আক্রমণকারিগণকেই উৎসাহিত করিতেছে। তাহারা সমর দানবের শৃঙ্খল মুক্ত করিবার উপলক্ষ হইতেছে। ইহার ফলে পৃথিবীব্যাপী সমরানল প্রজ্বলিত হইবে। এই নীতির ফলে বিভিন্ন দেশ দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে ; তখন প্রবল শক্তি শান্তিস্থাপনের অজুহাতে যুদ্ধ-নিরত দুর্ব্বল জাতির স্কন্ধে লাফাইয়া-পড়িয়া তাহাদিগকে পদানত করিবে।

এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়া তাঁহারা বলিয়াছেন,—দৃষ্টান্তস্বরূপ জার্ম্মাণীর কথাই ধরা যাউক। ঐ সকল নিরপেক্ষ জাতি স্বাধীন অষ্ট্রিয়াকে অবাধে জার্ম্মাণীর অধিকারভুক্ত হইতে দিল। সুডেটেন মুলুক জার্ম্মাণীকে গ্রাস করিতে দিল। জেকোশ্লোভাকিয়াকে তাহার ভাগ্যের উপর ছাড়িয়া দিল। সন্ধির সকল সর্ত্ত ভঙ্গ করিল। এখন তাহাদের সংবাদপত্রসমূহে 'রুশ সৈন্যসমূহের দুর্ব্বলতা' 'রুশীয় বিমান বাহিনীর নৈতিক অধঃপতন' 'সোভিয়েট য়ুনিয়ানে দাঙ্গা হাঙ্গামা'—প্রভৃতি মিথ্যা সংবাদ উচ্চৈঃস্বরে বিঘোষিত হইতেছে। তাহারা জার্ম্মাণদিগকে আরও অধিক পূর্ব্বে অগ্রসর হইবার জন্য উৎসাহিত করিতেছে; তাহাদিগকে পরামর্শ দিতেছে, 'তোমরা বলশেভিকদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ কর; তাহার পর সব ঠিক হইয়া যাইবে।'—এই প্রকার ব্যবহারে যে, আততায়িগণকে উৎসাহ প্রদান করা হইতেছে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। তাহারাও কি ইহা বুঝিতে পারিতেছে না ?

সোভিয়েট য়ুক্রেন সম্বন্ধে বৃটিশ, ফরাসী ও উত্তর আমেরিকান প্রেসসমূহ যে কোলাহল আরম্ভ করিয়াছে, তাহাও এইরূপ বিশেষত্বমূলক। চীৎকারে, তাহারা গলা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া বলিতেছে—"জার্ম্মাণরা সোভিয়েট য়ুক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছে ; তাহারা ৭ লক্ষ অধিবাসিপূর্ণ তথাকথিত কার্পেথিয়ান য়ুক্রেন হস্তগত করিয়াছে, এবং আগামী বসন্ত কালের মধ্যেই জার্ম্মাণরা ৩ কোটি অধিবাসিপূর্ণ সোভিয়েট য়ুক্রেন তথাকথিত কার্পেথিয়ান য়ুক্রেনের অন্তর্ভুক্ত করিবে!'

"এই সন্দেহজনক প্রোপাগাণ্ডার প্রকৃত উদ্দেশ্য জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে সোভিয়েট য়ুনিয়নের ক্রোধানল প্রজ্বালিত করা, বিসম্বাদের সৃষ্টি করা, এবং অকারণে জার্ম্মাণীর সহিত বিবাদ বাধাইয়া দেওয়া। অবশ্য, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, জার্ম্মাণীতে এরূপ উন্মাদের অভাব নাই, যাহারা হস্তীকে অর্থাৎ সোভিয়েট য়ুক্রেনকে মশা অর্থাৎ তথাকথিত কার্পেথিয়ান য়ুক্রেন কর্ত্তৃক শৃঙ্খলিত করিবার স্বপ্ন দেখে! যদি সত্যই জার্ম্মাণীতে এরূপ উন্মাদ কেহ থাকে, তাহা হইলে তাহাদিগকে শায়েস্তা করিবার জন্য আমরা উপযুক্ত পরিমাণে Strait jackets সংগ্রহ করিতে পারিব।

"কিন্তু পাগলের কথা ছাড়িয়া দিলেও প্রকৃতিস্থ লোকের মধ্যে কি এরূপ লোকও থাকিতে পারে—যাহারা সত্যই বিশ্বাস করিতেছে—কার্পেথিয়ান য়ুক্রেন সোভিয়েট য়ুক্রেনকে আত্মসাৎ করিতে উদ্যত হইয়াছে! যাহারা এরূপ নির্ব্বুদ্ধিতাপূর্ণ, উপহাসাস্পদ মিথ্যা সম্বন্ধে গম্ভীর ভাবে আলোচনা করিতে পারে তাহাদের উদ্দেশ্য বুঝিতে কি বিলম্ব হয় ?"

কিন্তু যাহারা তফাতে দাঁড়াইয়া মজা দেখিতেছে—এই তীব্র তিরস্কার কি তাহাদের গণ্ডারের চর্ম্ম ভেদ করিতে পারিবে ?

রুশ-জাপান মেছোহাটায়

মার্কিণ যুক্তরাজ্যের ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেন্ট রুসভেল্ট গত ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে রুশিয়ার সহিত জাপানের শেষ যুদ্ধের পর উভয়ের বিরোধের মীমাংসার জন্য জোড়াতালি দিয়া একটা সন্ধি করিয়া দিয়াছিলেন। সেই সন্ধির বলে দীর্ঘ চিম্নী-মুকুটিত জাপানী মেছোজাহাজগুলা এতকাল ধরিয়া অপ্রতিহত গতিতে প্রশান্ত মহাসাগরের রুশীয় সীমান্তে মৎস্য শিকার করিয়া আসিতেছে।

পীতবর্ণ জেলেদের রুশিয়ার এলাকাভুক্ত সমুদ্রসীমা হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য সোভিয়েট রুশিয়া গত বৎসর তাহাদিগকে মাছ ধরিবার মঞ্জুরী প্রদান করে নাই। ইহাতে জাপান সরকার ক্রুদ্ধ হইয়া সোভিয়েট সরকারের এই ব্যবস্থার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিল। সোভিয়েট সরকার এই প্রতিবাদে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিল, "আমার জলে তোমার জেলেদের যদি জাল ফেলিতে না দিই, সেজন্য তোমার মাথা গরম করিয়া ফল কি ?" কিন্তু জাপান এত বড় লাভের ব্যবসায় সোভিয়েট সরকারের রক্তচক্ষু দেখিয়াও ছাড়িতে পারে নাই ; তাহার ফলে উভয় সরকারে মন-কষাকষি চলিতেছিল, কিন্তু 'মুখোমুখী ছেড়ে হাতাহাতি' হয় নাই। জেলে-জাহাজওয়ালারা

কখন কখন দুই এক ঘা পিঠে বরদাস্ত করিয়াছিল; কারণ, তাহারা জানিত, 'পেটে খেলে পিঠে সয়।'

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে মাছ ধরিবার মরসুম আরম্ভ হইলেই উভয় সরকারে এই ব্যাপার লইয়া পুনর্ব্বার কলহ আরম্ভ হইয়াছিল, এবং গত মার্চ্চ মাসের শেষ সপ্তাহে এই কলহ মেছোহাটায় পরিণত হইয়াছিল। ইহার ফলে দস্তুরমত যুদ্ধ না বাধুক, কিল ঘুসি প্রভৃতি চলিবে—এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এই বিরোধের প্রসঙ্গে কেহ কেহ বলিতেছেন, জাপানের ইহাতে ক্ষুব্ধ হইবার কারণ আছে; এবং 'পরের ধনে পোদ্দারী' করিতে সুদক্ষ একটি ফ্যাসিষ্ট সরকার জাপানের ক্রোধানলে ইন্ধন জোগাইতেছে। এখন তিনটি সমুদ্রে মাছ ধরিবার অধিকার লইয়া সোভিয়েট সরকারের সহিত জাপ সরকারের বিরোধ চলিতেছে। (১) জাপানের অধিকৃত দ্বীপসমূহ, এবং একদিকে জাপান-শাসিত কোরিয়া ও অন্যদিকে সোভিয়েট সাইবেরিয়ার ব্যবধানে যে সমুদ্র আছে সেই সমুদ্রে (২) ওখট্স্ক সাগরের যে অংশ সাইবেরিয়ান উপকূলের সান্নিধ্যে অবস্থিত—সেই সমুদ্রে, এবং (৩) বেরিং সাগরের যে অংশ সোভিয়েট-সাইবেরিয়া ও উত্তর আমেরিকান আলাস্কার অন্তর্ব্বর্ত্তী—সেই অংশে, জাপান তাহাদের মৎস্য ধরিবার অধিকার আছে বলিয়া দাবী করিতেছে। জাপান দুর্ব্বল হইলে সোভিয়েট সরকারের তর্জ্জন গর্জ্জনে এ দাবী হয় ত ত্যাগ করিত, কিন্তু জাপান দুর্ব্বল নহে। এবং সে ক্রমাগত আস্তিন গুটাইয়া ঘুসি পাকাইতেছে। সোভিয়েট সরকার বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিতেছে—'ও ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়।'

সোভিয়েট সরকার জাপ সরকারকে তাহার এলাকামধ্যে ৩৮০টি স্থান মৎস্য ধরিবার জন্য ইজারা বিলি করিয়াছিল। জাপ সরকার ঐ সকল স্থানে মৎস্য ধরিবার জন্য বৎসরে ২০ হাজার জেলে প্রেরণ করে। এই সকল জেলে জাল ফেলিয়া যে বিপুল জলজ সম্পদ সংগ্রহ করে—তাহার মধ্যে সালমন মৎস্য এবং সামুদ্রিক কাঁকড়াই অধিক; তাহা যেরূপ মুখরোচক, সেইরূপ মূল্যবান। এই দ্বিবিধ খাদ্যদ্রব্য জাপান টিনে পুরিয়া দেশ-বিদেশে রপ্তানী করিয়া থাকে, এবং তাহা বিক্রয় করিয়া প্রতি বৎসর কুড়ি লক্ষ পাউণ্ড পকেটস্থ করে।

জাপানী সরকারের এইরূপ লাভের সংবাদ সোভিয়েট সরকারের অজ্ঞাত ছিল না। সোভিয়েট সরকার জাপানের মাছের ব্যবসায় হস্তগত করিবার জন্য ব্যাকুল হইল। তাহাদের অধিকার-সীমায় মাছ ধরিয়া জাপান প্রতি বৎসর কুড়ি লক্ষ পাউণ্ড লাভ করিতেছে। সোভিয়েট সরকার আর এ বিষয়ে উদাসীন থাকিতে না পারিয়া, এই ব্যবসায় নিজের হাতে লইবার জন্য জাপানী প্রথায় মাছ ধরিবার আশায় কতকগুলি জাপানী জেলেকে প্রচুর বেতন দিয়া রুশিয়ায় আনিল, এবং রুশ-শ্রমজীবিগণকে তাহাদের অধীনে শিক্ষানবীশ নিযুক্ত করিল। রুশ-শ্রমজীবীরা যখন জাপানী জেলেদের নিকট সকল কৌশল শিখিয়া লইল, তখন সোভিয়েট সরকার বেতনভোগী জাপানী জেলেগুলিকে বিদায় দান করিয়া সুশিক্ষিত রুশ-জেলেগুলিকে এই ভার প্রদান করিল। এইরূপে মৎস্যের ব্যবসায়ে জাপানীদের সহিত তাহাদের প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইল। ক্রমশঃ জাপান সরকারের অর্দ্ধেক লাভ সোভিয়েট সরকারের হস্তগত হইল।

জাপান এইভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায়, জাপানী মন্ত্রীরা টোকিওতে এক মন্ত্রণা-সভার অধিবেশন করেন। স্থির হয়—জাপানী জেলেরা তাহাদের বৈধ সীমায় মাছ ধরিতে যাইবে, এবং তাহাদের সাহায্যের জন্য যুদ্ধজাহাজ প্রেরিত হইবে। প্রয়োজন হইলে তাহারা আপত্তিকারীদের উপর গোলাগুলী চালাইতে কুণ্ঠিত হইবে না।

এদিকে ধূসরবর্ণ সোভিয়েট সবমেরিণগুলিও জাপানী জেলেদের জালের কাঁকড়া ও সাল্‌মন মাছের কাছে জলের ভিতর হইতে ভোঁস করিয়া মাথা তুলিতেছে। সুতরাং অতঃপর কখন উভয় পক্ষে গোলা-গুলী বর্ষণ আরম্ভ হয়, এবং জাপানী মেছো-জাহাজ সোভিয়েট সবমেরিণের গুঁতায় ফুটা হয়—তাহা যথাসময়ে জানিতে পারা যাইবে। আসর ক্রমে জমিয়া উঠিয়াছে মাত্র।

হিটলারের গিরিশিখরাশ্রম

য়ুরোপের কোন মহাপরাক্রান্ত বিপুল ঐশ্বর্য্যশালী দাম্ভিক সম্রাটও এ পর্য্যন্ত যে অদ্ভুত খেয়াল ও উৎকট রুচির পরিচয় দিতে পারেন নাই, জার্ম্মাণীর মুকুটহীন সম্রাট, জার্ম্মাণীর তথাকথিত গণ-তন্ত্রের সর্ব্বশক্তিমান্ নায়ক এডল্‌ফ হিটলার আরাম উপভোগের জন্য সংপ্রতি তাহার পরিচয় প্রদান করিতেছেন। ইহা তাঁহার কল্পনার মৌলিকতারও নিদর্শন। যাঁহারা বলেন, হিটলার নিজের সুখ-সচ্ছন্দতাবিধানের জন্য জার্ম্মাণ সরকারের একটি কপর্দ্দকও ব্যয় করেন না, আশা করি, অতঃপর তাঁহাদেরও ভ্রম দূর হইবে।

হার হিটলার এতদিন যে প্রাসাদে বাস করিয়া আসিয়াছেন—তাহার নাম 'বার্গফ্'; এই প্রাসাদটি 'হাউস্ ওয়াচেনফেল্ড' অর্থাৎ 'পার্ব্বত্য খামারবাড়ী' নামে পরিচিত। কিন্তু এই নিভৃত ভবন অপেক্ষাও নির্জ্জন স্থানে বাস তিনি বাঞ্ছনীয় মনে করায় অল্পদিন পূর্ব্বে তিনি অষ্ট্রো-জার্ম্মাণ সীমান্তে অবস্থিত দুর্গম কেলষ্টিন গিরি শিখরে কাচ ও লৌহ দ্বারা একটি প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। 'লিফ্‌টের সাহায্যে এই প্রাসাদে আরোহণ করিতে হয়। 'লিফ্‌ট' পরিচালিত করিবার জন্য গিরি-গর্ভ কাটিয়া পর্ব্বতের পাদদেশ হইতে তাঁহার প্রাসাদ পর্য্যন্ত একটি সুদীর্ঘ সুড়ঙ্গ নির্ম্মিত হইয়াছে। পর্ব্বতের পাদদেশে লিফ্‌টে উঠিবার জন্য যে কক্ষ নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার প্রবেশ-পথ 'ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ডের' ধনাগার অপেক্ষাও অধিকতর সতর্কতাসহকারে সুরক্ষিত। হার হিটলারের এই স্ফাটিক প্রাসাদ সমুদ্রতল হইতে ৫ হাজার ৫ শত ফুট ঊর্দ্ধে অবস্থিত।

নগর-বাসে হিটলারের চিরদিনই বিতৃষ্ণা। যখন তিনি ব্যাভেরিয়ার মিউনিক নগরে তাঁহার পরিচালিত নাজী দলের প্রধান আড্ডা স্থাপন করেন, তখনও তিনি ওবারসাল্‌জবার্গ পর্ব্বতের ঊর্দ্ধদেশে একখানি ক্ষুদ্র বাসগৃহ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ইহা ব্যাভেরীয় আল্পসএর পাদদেশ-স্থিত বার্চেসগাডেনের দেড় হাজার ফুট ঊর্দ্ধে অবস্থিত ছিল। তিনি জার্ম্মাণীর চ্যান্সেলার পদে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর তাঁহার বাসগৃহের আয়তন বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। এই প্রাসাদই 'বার্গফ' নামে পরিচিত।

কিন্তু 'বার্গফে' বাস করিয়া হার হিটলার শান্তিলাভ করিতে পারিলেন না, তাঁহার এই প্রাসাদের নির্জ্জনতা ভঙ্গ হইতে লাগিল;

কারণ, তিনি চ্যান্‌সেলার হইবার পর তাঁহার এই প্রাসাদ জার্ম্মাণ নাজীদের মহাতীর্থে পরিণত হইল। জার্ম্মাণীর সকল প্রদেশ হইতে নাজীরা দলে দলে বার্চেসগাডেনে সম্মিলিত হইয়া তাঁহার উক্ত গিরি-নিবাসের পাদদেশস্থিত দারুময় ফটকে ভীড় করিয়া দাঁড়াইত, এবং তৃষিত চাতকের ন্যায় উর্দ্ধমুখ হইয়া সমস্বরে প্রার্থনা করিত, "আমরা আমাদের 'ফুরার'কে দেখিতে আসিয়াছি; তাঁহার দর্শন চাই।"

হার হিটলার তাঁহার দর্শনার্থী ভক্ত নাজীগণের কোলাহলে বিরক্ত হইয়া গত বৎসর সঙ্কল্প করেন, তিনি আল্পস্ পর্ব্বতের এরূপ উচ্চশৃঙ্গে বাসভবন নির্ম্মাণ করিবেন—যে স্থানে ভক্তগণের কোলাহল তাঁহাকে স্পর্শ করিতে না পারে। অবশেষে তিনি হোহেনগোয়েল গিরিমালার কেলষ্টিন-শৃঙ্গে এই প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। ইহা ওবারসাল্‌জ-বার্গ নামক গিরিচূড়াস্থিত তাঁহার পূর্ব্ব-নির্ম্মিত ভবন অপেক্ষা আড়াই হাজার ফুট উর্দ্ধে অবস্থিত।

বহু সুদক্ষ জার্ম্মাণ এঞ্জিনিয়ার ও বিখ্যাত স্থপতি তাঁহার নির্দ্দেশক্রমে এই প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। আট মাস মাত্র পূর্ব্বে এই প্রাসাদ নির্ম্মিত হইলেও এতদিন জার্ম্মাণীর বাহিরের লোক এই প্রাসাদ নির্ম্মাণের কথা জানিতে পারে নাই; কারণ, হার হিটলার আদেশ করিয়াছিলেন—কোন জার্ম্মাণ সংবাদপত্রে এই প্রাসাদ-সংক্রান্ত কোন সংবাদ প্রকাশিত হইবে না। হিটলারের অনুগত ফটোগ্রাফারগণও ইহার 'ফটো' তুলিবার অনুমতি লাভ করিতে পারে নাই।

বার্লিনে কিছু দিন বাস করিতে হইলেই হিটলার না কি 'নার্ভাস্' অর্থাৎ বিচলিত হইয়া উঠেন; এ জন্য সুযোগ পাইলেই তিনি তাঁহার গিরিনিবাসে পলায়ন করেন। গ্রীষ্মকালে তিনি মিউনিকে গমন করেন, এবং শীতকালে তাঁহার নিজের ট্রেণে ভ্রমণ করেন। সাল্‌জবার্গ পর্য্যন্ত তাঁহার নিজের মোটর-কার চালাইবার জন্য প্রস্তর ও সিমেণ্ট সংমিশ্রণে যে নূতন পথ প্রস্তুত হইয়াছে—সেই পথে তিনি তাঁহার সুবিখ্যাত এবং অসাধারণ শক্তিশালী মার্শেডিস্ কারে' মিউনিক ত্যাগ করেন। তাহার পর নবনির্ম্মিত জার্ম্মাণ আল্‌পাইন রোড দিয়া বার্চেসগাডেনে প্রবেশ করেন। আল্পস্ পর্ব্বত ফুঁড়িয়া এই পথটি তাঁহারই জন্য পাহাড়ের ভিতর দিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে।

'বার্গফ' পর্য্যন্ত তাঁহার মোটর-কার পাহাড়ের উপর দিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া উর্দ্ধে উঠিতে থাকে। (চিত্র দেখুন) তাহার পর আরও পাঁচ মাইল দুর্গম ঘুরো পথ অতিক্রম করিয়া তাঁহার নূতন প্রাসাদে গমন করিতে হয়। গিরিশৃঙ্গের উর্দ্ধদেশে ব্রোঞ্জ ধাতু-নির্ম্মিত একজোড়া বিশাল দরজা আছে। হিটলারের মোটর-কার সেই দরজার সম্মুখে উপস্থিত হইলেই দরজা ধীরে ধীরে খুলিয়া যায়, তাঁহার 'কার' কেলষ্টিন-শৃঙ্গের পাদদেশে অবস্থিত একটি বিশাল গুহায় প্রবেশ করে। এই গুহা বহু ভাস্করের দীর্ঘকালের পরিশ্রমে ক্ষোদিত হইয়াছে। ইহা একটি বিশাল হল-ঘরের অনুরূপ; মসৃণতাবর্জ্জিত মার্ব্বল দ্বারা ইহা মণ্ডিত। এই গুহা ১ শত ৩০ গজ দীর্ঘ, এবং ২০ গজ প্রশস্ত। ইহার অভ্যন্তরে বহুসংখ্যক মোটর-কারের গ্যারেজ বর্ত্তমান।

এই গুহা হইতে একটি সুড়ঙ্গ বাহির হইয়া পর্ব্বতের অন্তর্দ্দেশ পর্য্যন্ত প্রসারিত; এই সুড়ঙ্গ-পথে লিফ্‌টের সম্মুখে উপস্থিত হওয়া যায়। লিফ্‌ট সুপ্রশস্ত, এবং তাহার ধের উজ্জ্বল পিত্তল-নির্ম্মিত।

কেলষ্টিন-গিরিশিরস্থ হিটলারের গোপন আবাস-স্থান

আসনগুলি স্থূল চর্ম্মমণ্ডিত। এই লিফ্‌ট হিটলারকে লইয়া ৪ শত ফুট উর্দ্ধস্থ গিরিশৃঙ্গে উপস্থিত হয়।

হিটলার গিরিচূড়ায় নির্ম্মিত যে কক্ষে বাস করেন, সেই কক্ষে ১৮ জন লোক আরামের সহিত বাস করিতে পারে। উহা শুভ্রবর্ণে রঞ্জিত। এই কক্ষের বাতায়ন-পথে নীচে দৃষ্টিপাত করিলে মাথা ঘুরিয়া যায়। চতুর্দ্দিকে তুষারমুকুটিত ব্যাভেরীয় আল্পসের তুঙ্গশৃঙ্গ দর্শকের নয়ন মুগ্ধ করে।

এই স্থানে বাসের কোন অসুবিধা নাই। বৈদ্যুতিক পম্পে এখানে জল সরবরাহ করা হয়, এবং বিদ্যুৎ দ্বারা গৃহ উত্তপ্ত করা হয়। এখানে যে পাকশালা আছে, সেই পাকশালায় হিটলারের জন্য

নিরামিষ ভোজ্য দ্রব্য প্রস্তুত হয়। তাহা নিতান্ত সাধারণ খাদ্য, এবং সর্ব্বপ্রকার বাহুল্যবর্জ্জিত। কিন্তু এখানে ধূমপানের উপায় নাই, এবং হিটলারের সম্মুখে কাহারও ধূমপানের অধিকার নাই। এই বাসভবনে হিটলার তাঁহার অবসর কালে রাজনীতিক সাধনায় মগ্ন থাকেন।

আকাশ-পথে কোন বিমান-পোত উড়িয়া আসিয়া হিটলারের এই শান্তি-নিকেতন চূর্ণ করিতে পারে, এই আশঙ্কায় বার্চেসগাডেন জিলা বিমান-বিধ্বংসী কামানশ্রেণী দ্বারা সুরক্ষিত। জার্ম্মাণীর অন্য কোন অংশে এরূপ ব্যবস্থা নাই।

তথাপি আর এক প্রকার বিপদের আশঙ্কা আছে। হিটলারের 'লিফ্‌ট' চারি শত ফুট উর্দ্ধে উঠিবার বা নামিবার সময় সহসা গিরি-প্রাচীরের ভিতর আটক পড়িয়া নিশ্চল হইতে পারে। হিটলার তাঁহার কোন ইংরেজ বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া এই প্রাসাদে গমন করিতেছিলেন। তিনি হিটলারকে প্রশ্ন করেন, "আপনার লিফট আপনাকে লইয়া নীচে নামিতে নামিতে যদি হঠাৎ অচল হয়, তাহা হইলে কি হইবে?"—হিটলার তৎক্ষণাৎ মৃদু হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "তাহা হইলে পৃথিবীর ইতিহাস বোধ হয় দুই ঘণ্টার জন্য অচল হইয়া পড়িবে।" এইরূপ দম্ভপূর্ণ উক্তি হিটলারের মুখেই শোভা পায়।

বৃটিশ রাজনীতি ও খিলাফৎ আন্দোলন

প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে ছয় ফুট দীর্ঘ, পরিপুষ্ট বদন, সুদৃঢ় চুয়াল এবং স্থিরদৃষ্টি যে যুবক মিশরের সুদৃশ্য মখমল-মণ্ডিত স্বর্ণসিংহাসনের এবং তাঁহার পিতা রাজা ফুয়াদ-সঞ্চিত এক কোটি পাউণ্ডের উত্তরাধিকারী হইয়া এই অল্প দিনের মধ্যেই প্রজাপুঞ্জের হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন, তাঁহার বয়স এখন উনিশ বৎসর মাত্র। রাজা ফারুকই শাসনদণ্ডপরিচালক রাজগণমধ্যে বয়সে সর্ব্বাপেক্ষা তরুণ। তিনি একটি নবজাগ্রত স্বাধীন জাতির পরিচালকরূপে রাজনীতির ইতিহাসে ইতিমধ্যেই প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন। রাজা ফারুক অপেক্ষা অল্পবয়স্ক রাজা পৃথিবীতে একাধিক আছেন। ইরাকের রাজা ফৈজলের বয়স এখন তিন বৎসর, যুগোশ্লাভিয়ার পিটারের বয়স এগার বৎসর, শ্যামের রাজা আনন্দ মহীদলের বয়স এখন তের বৎসর; ইঁহারা রাজা ফারুক অপেক্ষা অল্পবয়স্ক হইলেও রাজ্যশাসনের ভার গ্রহণ করেন নাই। আজ মিশরের প্রতি—ফারুকের প্রতি সমগ্র পৃথিবীর দৃষ্টি আবদ্ধ। রাজা ফারুক মিশরের মেরুদণ্ডস্বরূপ কৃষিজীবী সমাজের হৃদয় জয় করিয়াছেন, এবং আলেকজাণ্ড্রিয়া ও কায়রোর উভয় সমাজও তাঁহার পক্ষপাতী।

রাজা ফারুক এই অল্প সময়ের মধ্যে ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী নাহাস পাশাকে পরাস্ত করিয়া মন্ত্রিমণ্ডলীর উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন। কায়রোর প্রবীণ রাজনীতিজ্ঞগণ আশা করিতেছেন, রাজা ফারুক ভবিষ্যতে খালিফের পদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন।

রাজা ফারুককে মুসলমানধর্ম্মজগৎ খালিফ বলিয়া স্বীকার করিলে, তিনি সমগ্র পৃথিবীর বিংশাধিক কোটি মুসলমান অধিবাসীর ধর্ম্মগুরুর পদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন। এসিয়ার ১৬ কোটি, আফ্রিকার ৪ কোটি ৪০ লক্ষ এবং য়ুরোপের ৫০ লক্ষাধিক মুসলমান ধর্ম্মবিষয়ে তাঁহার নেতৃত্ব স্বীকার করিবে।

গত এপ্রিল মাসের মধ্যভাগে বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ যেরূপ কার্য্যপ্রণালীর অনুমোদন করিয়াছিলেন, তাহাতে রাজা ফারুকের খালিফত্ব লাভের পথ কতকটা পরিষ্কার হইয়া আসিয়াছে। তাঁহারা প্যালেষ্টাইনের কর্ত্তৃত্ব-ভার বেসরকারী ভাবে রাজা ফারুকের স্কন্ধে স্থাপন করিয়া নিশ্চিন্ত হইবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী নেভিল চেম্বারলেনের আশীর্ব্বাদপুষ্ট মিশরের প্রধান মন্ত্রী মহম্মদ মামুদ পাশা কায়রোতে মন্ত্রণা করিয়া একটি নূতন ও বিধিবহির্ভূত (informal) প্যালেষ্টাইন-কনফারেন্সের আয়োজন করিয়াছিলেন। গত মার্চ্চ মাসে যে সকল প্রতিনিধি সেণ্ট জেমস্ প্রাসাদের ব্যর্থ অধিবেশনে যোগদান করিবার পর স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, তাঁহারা মিশর রাজধানীতে বিশ্রামকালে উক্ত কনফারেন্সে সম্মিলিত হইয়াছিলেন।

রাজা ফারুক

লণ্ডনস্থ মিশর রাজদূত ডক্টর হাসান নাসাৎ পাশা মিশরের প্রধান মন্ত্রী মামুদের সহিত টেলিফোনে ও 'কেব্‌ল'-যোগে দীর্ঘকাল পরামর্শ করিয়া গত ইষ্টার সোমবারে লণ্ডন হইতে বিমান-যোগে মিশর রাজধানীতে প্রত্যাগমন করেন। প্যালেষ্টাইনে আরব ও ইহুদীরা যে ক্ষত-যন্ত্রণায় কাতর, সেই ক্ষত আরোগ্য করিবার উদ্দেশ্যে তিনি বৃটিশ সরকারের পক্ষ হইতে কতকগুলি নূতন প্রস্তাব লইয়া গিয়াছিলেন।

মিশর রাজদূত নাসাৎ পাশা রক্ষণশীল দলের রাজনীতিক, তিনি ভূতপূর্ব্ব রাজা ফুয়াদের বিশ্বস্ত উপদেষ্টা ছিলেন এবং বর্ত্তমানকালেও তিনি রাজমাতা নাজলীর বিশ্বাসভাজন। সাম্রাজ্যবাদী লর্ড লয়েড যখন হাই-কমিশনারের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, সেই সময় নাসাৎ পাশা মিশরের রাজদূতরূপে বার্লিনে প্রেরিত হইয়াছিলেন, এবং নাৎসীদলের অন্যতম অধিনায়ক হারমান গোয়েরিংএর বন্ধুত্ব লাভ করিয়াছিলেন। অতঃপর রাজা ফারুক মিশর-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া শাসনবিভাগের আভ্যন্তরিক কার্য্যভার গ্রহণ করেন।

তাঁহার ২৪ বৎসর বয়স্কা পত্নী যে জুলফিকার-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; সেই বংশে বর্ত্তমান রাজমহিষী ফরিদারও জন্ম। রাণী ফরিদা তাঁহার স্ত্রীর নিকট-আত্মীয়া।

নাসাৎ পাশার চেষ্টায় প্যালেষ্টাইনের আরব ও ইহুদিগণের বিরোধের মীমাংসার জন্য কায়রো নগরে যে সমিতির অধিবেশন হইয়াছিল, তাহা ফলপ্রদ হইবে বলিয়াই তাঁহার ধারণা হইয়াছিল। কিন্তু সমিতিতে যে সকল প্রস্তাব আলোচিত হইয়াছিল, তাহা আরব বা ইহুদী কোন পক্ষের সমর্থন লাভ করিতে পারে নাই। বিভিন্ন কারণে উভয় পক্ষই এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়াছেন। তবে রাজা ফারুকের নেতৃত্বে উভয় পক্ষকে নিরপেক্ষভাবে স্বাধীনতা প্রদানের অঙ্গীকার করা হইলে ভবিষ্যতে আপোষ-নিষ্পত্তি হইতেও পারে।

রাজা ফারুকের উপদেষ্টাগণ তাঁহাকে খালিফের সম্মানিত পদে প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে প্যালেষ্টাইনের আরব-ইহুদী সমস্যার মীমাংসাভার গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিয়াছেন।

বলা বাহুল্য, য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে তুরস্কের সুলতান খালিফ অর্থাৎ মুসলমান-ধর্ম্মজগতের গুরু ছিলেন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে তুরস্কে রাজতন্ত্রের অবসান হইলে খালিফ-সুলতান ওয়াহিদ-উদ্দিন আঙ্কারা হইতে পলায়ন করেন, তাঁহার পিতৃব্যপুত্র আবদুল মাজিদ এফেন্দি তাঁহার পরিবর্ত্তে খালিফ নির্ব্বাচিত হইলেও তাঁহাকে কোন দিন খেলাফতি করিতে দেওয়া হয় নাই, এবং দুই বৎসরের মধ্যেই তাঁহাকে পদচ্যুত ও নির্ব্বাসিত হইতে হইয়াছিল। অতঃপর হেজাজের রাজা হুসেন হাসিমি আপনাকে খালিফ বলিয়া বিঘোষিত করেন। কিন্তু তিনি নানা ভাবে বিপন্ন হইয়া স্বেচ্ছায় সিংহাসন ত্যাগ করেন, তাঁহার খালিফীরও অবসান হয়। তাহার পর হইতে এই পদ খালি পড়িয়া আছে, এবং তুরস্কের ডিক্টেটর কামাল আতাতুর্ক এই পদের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। অন্য কোন স্বাধীন রাজ্যের রাজা এই সম্মানলাভের চেষ্টা করেন নাই।

গোয়েরিং

নাহাস পাশা

রাজা ফারুক খালিফের পদ লাভ করিলে 'জেহাদ' ঘোষণা করিতে পারিবেন; তিনি জেহাদ ঘোষণা করিলে প্রত্যেক স্বধর্ম্মনিষ্ঠ মুসলমান যুদ্ধের জন্য তাঁহার পতাকাতলে সম্মিলিত হইতে বাধ্য। তিনি খালিফ হইলে সকল মুসলমান নরপতি তাঁহার প্রাধান্য স্বীকার করিতে ধর্ম্মতঃ বাধ্য হইবেন। সুতরাং, ইরাক, ট্রান্সজর্ডানিয়া, সাউদি, আরব প্রভৃতি আরব-রাজ্যগুলিকে তাঁহার নেতৃত্ব স্বীকার করিতে হইবে, এবং তিনি প্যালেষ্টাইনের আরব-ইহুদী বিরোধের যে মীমাংসা করিবেন, আরবরা নতশিরে তাহাই মানিয়া লইবে, এবং এক পক্ষ বিরোধ ত্যাগ করিয়া শান্তি অবলম্বন করিলে অন্য পক্ষকে শান্ত করা কঠিন হইবে না। ইহাই ভবিষ্যতের আশা। গত জানুয়ারী মাসে রাজা ফারুক এল কুসিমের প্রসিদ্ধ মসজেদে ইমামের কার্য্য করিলে, তিনি যে খালিফত্ব লাভের উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন, তাহা সেই সময় সকলেই বুঝিতে পারিয়াছিল। সেই দিন সান্ধ্য উপাসনা শেষ হইলে ভক্তগণ একবাক্যে তাঁহাকে খালিফ ফারুক বলিয়া অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। কিন্তু মুসলমানধর্ম্মের বিভিন্ন সম্প্রদায় এই ঘোষণায় অসন্তোষ প্রকাশ করিলে তাহাদিগকে শান্ত করিবার জন্য মিশর-সরকারের পররাষ্ট্রবিভাগ হইতে প্রচার করা হয়, রাজা ফারুক খিলাফতি লাভের জন্য উৎসুক নহেন। তিন দিন পরে পুনর্ব্বার ইহা প্রকাশ্য ভাবে বিঘোষিত করা হয়। কিন্তু এই ঘোষণার প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হয় নাই।

তিন মাস পূর্ব্বে রাজা ফারুকের উনবিংশ জন্মবার্ষিক উৎসবে তিনি তাঁহার প্রজাবর্গকে সুস্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন—খিলাফতিতে তাঁহার অধিকার আছে বলিয়াই তিনি বিশ্বাস করেন।

রাজা ফারুক খালিফত্ব লাভ করিলে বৃটেনের যথেষ্ট সুবিধা হইবে, বৃটিশ রাজনীতিকগণের ইহা অজ্ঞাত নহে। বেনিটো মুসোলিনী আবিসিনিয়া গ্রাসের পর আপনাকে 'ইস্‌লামের রক্ষক' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিলে তাঁহার কৃপাপ্রার্থী অনেক মুসলমান—'তা বটে তা বটে হাঁ' বলিয়া এই উক্তির সমর্থন করিয়াছিল; কিন্তু তিনি মুসলমানরাজ্য আলবেনিয়া ইটালীর অন্তর্ভুক্ত করায় আর কেহ তাঁহার ভণ্ডামীতে ভুলিতেছে না। এই সুযোগে বৃটিশ-স্বার্থের পক্ষপাতী খালিফ নির্ব্বাচনের জন্য অনেকে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহাদের এই ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইলে আরবগণকে বৃটেন নিজের দলে টানিয়া আনিতে পারিবে, এবং পূর্ব্বভূমধ্যসাগরীয় বৃটিশ নৌসৈন্যের পক্ষে হাইফা পর্য্যন্ত প্রসারিত ইরাকের তেলের পাইপের লাইন নিরাপদ থাকিবে; এতদ্ভিন্ন আরবের বন্ধুত্বফলে প্যালেষ্টাইন হইতে বৃটিশ-বাহিনী অপসারিত করিয়া অন্য প্রয়োজনে বিনিয়োগ করা সহজ হইবে।

এই সকল কারণে কাইরো নগরস্থ বৃটিশ-দূত কূটনীতিক সার মাইল্‌স ওয়েডারবর্ণ ল্যাম্পসন রাজা ফারুককে খালিফ

নির্ব্বাচিত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। সার মাইল্‌সের বয়স এখন ৫৮ বৎসর হইলেও তিনি যুবকের ন্যায় কর্ম্মঠ ও সবল; পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে তিনি মিশরের হাই-কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি এই পদে যোগ্যতার পরিচয় দিয়া রাষ্ট্রদূতের পদ লাভ করেন। তিনি ও তাঁহার বিলাসিনী পত্নী রাজা ফারুকের শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, ও প্রীতি অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টায়, বিশেষতঃ পারস্যপতির সহিত রাজা ফারুকের নূতন সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়ায় রাজা ফারুকের খেলাফতিলাভের সম্ভাবনা দিন দিন সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে।

বৃটেনে দেশরক্ষার ট্যাক্স

দেশরক্ষার জন্য বৃটেনে ট্যাক্সের হার বর্দ্ধিত হওয়ায় মোটর-কার নির্ম্মাতৃগণ এবং তাম্রকূটভক্তরা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আর্ত্তনাদ আরম্ভ করিয়াছে; কিন্তু তাহাদিগকে স্বীকার করিতে হইয়াছে, স্বদেশের স্বার্থরক্ষার জন্য কোন প্রকার ত্যাগ স্বীকারেই তাহাদের বিমুখ হওয়া অনুচিত। যুদ্ধের ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য চ্যান্‌সেলার সার জন সাইমন ট্যাক্স বৃদ্ধি দ্বারা ২ কোটি ৪৫ লক্ষ পাউণ্ড অতিরিক্ত আয়ের সংস্থান করিয়াছেন।

বৃটেনে প্রতি বৎসর গড়ে ১ লক্ষ ১২ হাজার টন তামাক আমদানী হইয়া থাকে। তামাকের কারখানাওয়ালাদিগের ট্যাক্স পূর্ব্বে প্রতি পাউণ্ডে ৯ পেন্স হিসাবে বর্দ্ধিত হইয়াছিল, কিন্তু যুদ্ধের ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য চ্যান্‌সেলার প্রতি পাউণ্ডে আরও ২ শিলিং ট্যাক্স বর্দ্ধিত করায় সিগারেটের কারখানাওয়ালারা মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়াছে। বৃটেনের বিভিন্ন অংশে সিগারেট প্রস্তুতের জন্য ৫ লক্ষ কল আছে এই সকল কলে যে সকল সিগারেট প্রস্তুত হয়, তাহার প্রতি ৫ ডজন প্যাকেটের জন্য ৬ পেনী ও ১ শিলিং শুল্ক দিতে হয়।

এই সকল কলের নির্ম্মাতৃগণের মধ্যে ক্রয়ডনের হারপার অটোমেটিক মেসিন ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী সর্ব্বপ্রধান। ইহার ম্যানেজিং ডিরেক্টর পার্সি-হারপার আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন, "বহু সপ্তাহের জন্য কলগুলি অকর্ম্মণ্য হইবে।"

পার্সি-হারপার দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে উলওয়ার্থের একটা কারখানায় ঝাড়ুদারের কার্য্য করিতেন, এখন তিনি কল বিক্রয় করিয়া বার্ষিক এক লক্ষ পাউণ্ড লাভ করেন। ইতিমধ্যেই ইম্পিরিয়াল টোবাকো কোম্পানীর অধ্যক্ষ লর্ড ডনডারটন এবং কারেবাস লিমিটেডের অধ্যক্ষ এডওয়ার্ড এস ব্যারণ ঘোষণা করিয়াছেন, ৬ পেন্স মূল্যের সিগারেটের প্যাকেট সাড়ে ৬ পেন্সে, এবং ১ শিলিং মূল্যের প্যাকেট ১৩ পেন্স মূল্যে বিক্রয় করা হইবে। প্রতি আউন্স পাইপের তামাকের মূল্য দেড় পেনী হিসাবে বর্দ্ধিত হইয়াছে। ভবিষ্যতে 'বাজেট-সিগারেট' বাজারে বাহির হইবে, তাহার প্রতি প্যাকেটে ১০টির পরিবর্ত্তে ৯টি সিগারেট থাকিবে, মূল্য পূর্ব্ববৎ ৬ পেন্স, এবং ১৮টি সিগারেটপূর্ণ প্যাকেট ১ শিলিং মূল্যে বিক্রয় হইবে। আর এক প্রকার সিগারেট ১০টির প্যাকেট ৬ পেন্সে বিক্রয় হইবে, কিন্তু তাহা অপেক্ষাকৃত পাতলা হইবে।

মোটর-কারেরও ট্যাক্স বর্দ্ধিত হইয়াছে। মোটর-কারের প্রতি অশ্ব-শক্তিতে ট্যাক্স ১৫ শিলিং হইতে ২৫ শিলিং হইয়া যায়। শতকরা ৬৬ হারে বাড়িয়াছে। লর্ড অষ্টিন ইহা অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। যে সকল মোটর-কারে অনধিক ৪ জন বসিবে, তাহার ট্যাক্স ১০ পাউণ্ড; অনধিক ৮ জন বসিবার 'কারের' ট্যাক্স ১২ পাউণ্ড।

বিদেশী আমদানী চিনির ট্যাক্স প্রতি পাউণ্ডে সিকি পেনী হারে বর্দ্ধিত হইয়াছে।

ফিল্মের ট্যাক্স বৃদ্ধির জন্য ফিল্ম কোম্পানীরা হাহাকার আরম্ভ করিয়াছে। বৃটিশ নিউজ রীল কোম্পানীসমূহ আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছে, "যদি ট্যাক্সের পরিমাণ হ্রাস করা না হয়, তাহা হইলে ব্যবসায় বন্ধ করিতে হইবে। সপ্তাহে প্রস্তুত ১০ লক্ষ ফুট ফিল্মের জন্য তাহাদিগকে ২ হাজার ৮৩ পাউণ্ড সাপ্তাহিক ট্যাক্স প্রদান করিতে হইবে, ইহাতে তাহাদের বার্ষিক লাভের অপেক্ষাও ট্যাক্সের পরিমাণ সমধিক হইবে, এ জন্য তাহাদের ক্ষতি অনিবার্য্য।"

ইংলণ্ড আয়করের 'সার ট্যাক্স' ২ হাজার পাউণ্ড আয় হইতে আরম্ভ। যাহাদের আয় বার্ষিক ৮ হাজার পাউণ্ড অপেক্ষা অল্প, তাহাদের আয়কর শতকরা ৫ পাউণ্ড এবং ৮ হাজার পাউণ্ডের অধিক আয়ের উপর ১০ পাউণ্ড হিসাবে বর্দ্ধিত হইয়াছে এবং ৫০ হাজার পাউণ্ড আয়ের উপর আর ১০ পাউণ্ড হারে আয়কর বর্দ্ধিত হইয়াছে।

মুসোলিনী কি মিশর আক্রমণ করিবেন?

বৃটিশ সরকার মিশরের নবীন নরপতি ফারুককে খালিফের পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সমগ্র মুসলমান-জগৎ বৃটেনের ইঙ্গিতে পরিচালিত করিবার সুখস্বপ্নে বিভোর,অন্য দিকে মুসোলিনী 'মুসলমান ধর্ম্মের রক্ষক' সাজিয়া য়ুরোপের একমাত্র মুসলমান-রাজ্যের স্বাধীনতা হরণ করায় মুসলমানগণের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসে বঞ্চিত হইয়া নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। তিনি বৃটেনের সঙ্কল্প ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

এডলফ হিটলার লুঠের ভাগ (share of the Axis plunder) না দেওয়ায় তাঁহার বন্ধু বেনিটো মুসোলিনীর ক্রোধ ও বিরক্তি দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিয়াছে। পোলাণ্ডের বিরুদ্ধে জার্ম্মাণীর অভিযানে যদি ইটালীকে সাহায্য করিতে হয়, তাহা হইলে মুসোলিনীর দাবী—তিনিও সঙ্গে সঙ্গে অন্যের অধিকারে থাবা মারিবেন, এবং তাঁহার এই কার্য্যে হিটলারকে সাহায্য করিতে হইবে। নাজীরা যে সকল প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিয়াছে, রোম আর তাহা গ্রাহ্য করিতে প্রস্তুত নহে।

ড্যান্‌জিগ গ্রহণে হিটলার মুসোলিনীর সমর্থন না পাইয়া যে নূতন পন্থা অবলম্বনের সঙ্কল্প করিয়াছেন, তৎসংক্রান্ত কাগজ-পত্র বার্লিনে হিটলারের আফিসের ডেস্কে সংরক্ষিত হইয়াছে; য়ুরোপের রাজনীতিকগণ তাহার মর্ম্ম জানিতে পারেন নাই, কিন্তু রোমের নেতৃবর্গ তাহার কিছু কিছু আভাস পাইয়াছেন।

এইরূপ জানিতে পারা গিয়াছে যে, যুদ্ধ উপস্থিত হইলে জেনারেল উইলহেম ভন ব্রচিস্ জার্ম্মাণ-সৈন্যের পরিচালন-ভার

গ্রহণ করিবেন। তিনি গত মে মাসের প্রথম সপ্তাহে ত্রিপলীর পথে রোমে পদার্পণ করিয়াছিলেন। যুদ্ধকালে ইটালী প্রাচ্য ভূখণ্ডে কি ভাবে সৈন্য পরিচালিত করিবে, তৎসম্বন্ধে কর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনা করিবার জন্যই তিনি রোমে গমন করিয়াছিলেন।

তিনি হিটলারের নিকট হইতে এই আদেশ লইয়া গিয়াছিলেন যে, ইটালীয়ানরা টিউনিসিয়া আক্রমণের জন্য প্রথমে যে সঙ্কল্প করিয়াছিল, সেই সঙ্কল্প তাহাদিগকে ত্যাগ করিতে হইবে। হিটলারের ধারণা, ফরাসীরা সেখানে শত্রুর আক্রমণে বাধা দানের জন্য প্রচুর আয়োজন করিয়া রাখিয়াছে। সেখানে তাহাদের শক্তি এরূপ প্রবল যে, দন্তস্ফুট করা অত্যন্ত কঠিন হইবে। এই জন্য জেনারেল ভন ব্রচিস এইরূপ স্থির করিয়াছেন যে, যদি মিশরের বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালিত করা হয়, তাহা হইলে সেই চেষ্টা ফলপ্রদ হইবে। মিশর-সরকারের আত্মরক্ষার আয়োজন তেমন প্রচুর নহে।

গত মে মাসের প্রথম সপ্তাহে ফরাসী সরকারের নিকট প্রেরিত গোপনীয় ডেস্‌প্যাচে প্রকাশ, যে সকল ইটালীয় সৈন্য লিবিয়ায় অবস্থান করিতেছে, তাহারা মিশর-সীমান্তে সমবেত হইয়াছে। মুসোলিনীর নাজী উপদেষ্টাগণই তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়াছে—টিউনিসিয়ায় সংরক্ষিত ফরাসী সৈন্যদল অপেক্ষা মিশরে রক্ষিত ইংরেজ সৈন্যদল অত্যন্ত দুর্ব্বল, সুতরাং তাহাদিগকে পরাস্ত করা অত্যন্ত সহজ হইবে।

বস্তুতঃ জার্ম্মাণীর কর্তৃপক্ষ এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, মধ্য-য়ুরোপের কর্ম্মক্ষেত্র হইতে বৃটিশের মন অন্য দিকে আকৃষ্ট করিতে হইলে, হিটলার যে সময় ড্যান্‌জিগ মুষ্টিগত করিবার চেষ্টা করিবেন, সেই সময় সুয়েজ খালের অঞ্চলে ইংরেজদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলে আশানুরূপ ফল পাওয়া যাইবে।

বৃটিশ সরকার জার্ম্মাণ সরকারের এই চালবাজির সংবাদ অবগত হইয়া প্যালেষ্টাইনে আরব ও ইহুদীর বিরোধ যত শীঘ্র মিটাইয়া ফেলিতে পারেন, তাহার চেষ্টা করিতেছেন। বৃহত্তর স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইতে পারে, এই আশঙ্কায় এবার হয় ত এই বিরোধ-নিষ্পত্তির জন্য তাঁহারা আন্তরিক চেষ্টা করিবেন।

কিন্তু এখন কথা—বৃটিশপ্রভাব যেখানে পূর্ণভাবে বিরাজিত, সেই স্থানে মুসোলিনী কি বাহুবলপ্রকাশের চেষ্টা করিবেন?

মার্শাল পেট্রো বাডোগলিও আবিসিনিয়ার রাজধানী আদিস্ আবাবায় বিজয়ী ইটালীয় সৈন্যবাহিনী পরিচালিত করিয়াছিলেন, তিনি মুসোলিনীর এই সঙ্কল্পের প্রতিবাদ করিয়াছেন, তিনি মুসোলিনীকে সতর্ক করিবার জন্য বলিয়াছেন, বৃটিশ-রক্ষণাধীন মিশর আক্রমণ করিলে ইটালীয় সৈন্যগণকে বিপন্ন হইতে হইবে।

কিন্তু ইটালীয় সৈন্যবাহিনীর প্রধান অধ্যক্ষ (Chief of Staff) জেনারেল আলবর্টো পারিয়ানি জার্ম্মাণীর পক্ষপাতী; তিনি নাজীদের সিদ্ধান্তের সমর্থন করিয়াছেন। তাড়াতাড়ি মিশর আক্রমণ করাই তাঁহার মতে অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু এ বিষয়ে ইটালীতে মতভেদের সম্ভাবনা। নানা কারণে মুসোলিনী জনসাধারণের অপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছেন। তাহার উপর ইটালীয় সৈন্যগণের একটি শক্তিশালী দল মিশরের বিরুদ্ধে অভিযানে আপত্তি করিয়াছে। কিন্তু মুসোলিনীর ইচ্ছা, তিনি সুদান অধিকার করিয়া আবিসিনিয়ার সহিত লিবিয়ার সংযোগ সাধন করিবেন; ইহাতে আফ্রিকায় ইটালীর একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইবে, এবং তাঁহার রোমান সাম্রাজ্যস্থাপনের স্বপ্ন আংশিক ভাবে সফল হইবে।

মুসোলিনী

বাডোগলিও

সনুসাইট নামক এক সম্প্রদায়ের মুসলমান ধর্ম্মান্ধ, এবং লিবিয়ায় তাহারা অত্যন্ত পরাক্রান্ত; সংপ্রতি ফরাসী সরকার তাহাদিগকে কৌশলে বশীভূত করিয়াছেন; তাহারা ইটালীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবে। এতদ্ভিন্ন, স্বাধীনতাপ্রিয় হাবসিগণের বিশ্বাস, য়ুরোপে মহাসমর আরম্ভ হইলে তাহারা ইটালীর দাসত্বশৃঙ্খল চূর্ণ করিয়া স্বাধীনতা লাভের সুযোগ পাইবে। এই সকল লোক ইংরেজ ও মিশরীয় সৈন্য অপেক্ষা মুসোলিনীকে অধিকতর বিব্রত করিবে; তাহারাই মুসোলিনীর প্রধান শত্রু।

এতদ্ভিন্ন, যে সকল ইটালীয় সামরিক কর্ম্মচারী আশা করিয়াছিলেন, জার্ম্মাণী জেকোশ্লোভাকিয়া গ্রাস করিয়া ইটালীকে লাভবান করিয়াছে, হিটলার যাহা লাভ করিয়াছিলেন, ইটালী তাহার অর্দ্ধাংশ বখরা পাইয়াছে; তাঁহারা এখন জানিতে পারিয়াছেন, উহা বখরা নহে, ইটালীকে উহা ঋণস্বরূপ প্রদান করা হইয়াছে, এই সংবাদে

তাঁহারা জার্ম্মাণীর উপর হাড়ে চটিয়াছেন। জেকগণের যে সকল কামান জার্ম্মাণীর হস্তগত হইয়াছিল, তাহা ফরাসী সীমান্তে ইটালীর নূতন কিল্লাগুলিতে সংরক্ষিত হইয়াছিল; কিন্তু কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে সেই সকল কামান জার্ম্মাণীতে প্রেরিত হইয়াছে; কারণ, ঐ সকল কামানে জার্ম্মাণীর প্রয়োজন আছে। ভার্ণেলীর ইটালীয় সামরিক কর্ম্মচারিগণ জার্ম্মাণীর এই ব্যবহারের প্রতিবাদ করিলে জার্ম্মাণ জেনারেল বোডেনসাজ তাঁহাদিগকে প্রবোধ দানের জন্য বলিয়াছিলেন, ইটালীর সহিত জার্ম্মাণীর বন্ধুত্ব এতই প্রগাঢ় যে, ইটালীর দ্রব্যসামগ্রী জার্ম্মাণী আত্মসাৎ করিলে ইটালীর তাহাতে ক্ষোভের কোন কারণ নাই। সুতরাং ইটালীয়ানরা হিটলারের বন্ধুত্বের মূল্য বুঝিতে পারিয়াছে, এবং তাহাদিগকে সন্তুষ্ট রাখা হিটলারের বন্ধু মুসোলিনীর অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে।

—

জিবরালটারে রণসজ্জা

গত মে মাসের প্রথম সপ্তাহে বৃটিশাধিকৃত জিবরাল্টারের সমুন্নত, লোহিতাভ বাদামী পাহাড়ের তিন দিক জার্ম্মাণীর যুদ্ধজাহাজসমূহ দ্বারা বেষ্টিত হইয়াছে। ইহার চতুর্থ দিকে স্প্যানীস্ ডিক্টেটর ফ্রান্সিস্কো ফ্রাঙ্কোর বহু সৈন্যের সমাবেশ হইয়াছে। সুতরাং জিবরাল্টারের অবস্থা এখন অবরুদ্ধ নগরের অনুরূপ।

কিন্তু জিবরাল্টার অবিলম্বে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া জিবরাল্টারের গভর্ণর এবং প্রধান সেনাপতি ছয় ফুট চারি ইঞ্চি দীর্ঘ দেহ বিশাল বপু সার উইলিয়াম এডমণ্ড আয়রণ-সাইড ভূমধ্যসাগরের এই চাবি (Key to Mediterranean) সুরক্ষিত করিবার ব্যবস্থায় মনঃসংযোগ করিয়াছেন। বৃটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষে অপরিহার্য্য এই প্রসিদ্ধ দুর্গ শত্রুপক্ষ যাহাতে অধিকার করিতে না পারে, তাহার যথাযোগ্য আয়োজন চলিতেছে।

সার উইলিয়ম আইরণসাইড

বৃটিশের সৈন্যবাহী জাহাজ 'ডিভনসায়ার' হইতে অবতরণ করিয়া ওয়েল্‌স্ গার্ডস্ (Welsh Guards) নামক সৈন্যদলের প্রথম ব্যাটালিয়ন নগরের অদ্ভুত নামবিশিষ্ট বঙ্কিম পথগুলির ভিতর দিয়া তাহাদের ব্যারাকসমূহে প্রবেশ করিয়াছে। পাহাড়টির বিভিন্ন অংশ মধুচক্রের ন্যায় সচ্ছিদ্র করিয়া গোপনে কামান সংস্থাপিত করিবার জন্য যে সকল স্থান নির্ব্বাচিত হইয়াছে, সামরিক কর্ম্মচারিগণ সেই সকল স্থান তাড়াতাড়ি পরীক্ষা করিয়া আসিয়াছেন।

ইহার লা লাইনিয়া সীমান্তে বৃটিশাধিকারের পার্শ্বেই স্পেনের সীমা। এই স্থানে শত্রুপক্ষের ট্যাঙ্কের আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য নূতন ব্যবস্থা করা হইয়াছে; কারণ, পূর্ব্বে স্পেন যখন নির্ব্বিরোধ গণতন্ত্রপরিচালিত রাজ্য ছিল, সেই সময় এই সীমান্তরক্ষার জন্য তেমন কোন গুরু আয়োজনের প্রয়োজন ছিল না, এবং বাধাও সুদৃঢ় ছিল না। দুর্গসংস্কারক সৈন্যগণ ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে নগরের প্রধান প্রধান পথে স্থলে ব্যবহারযোগ্য 'মাইন'সমূহ সংস্থাপিত করিয়া স্থলপথে শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধের উপায় অবলম্বন করিয়াছে।

বহুদর্শী সেনানায়ক আয়রণসাইড এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, শত্রুপক্ষ যদি হাউইজারসমূহের সাহায্যে জিবরাল-টারে অগ্নিস্রোত প্রবাহিত করে, এবং তাহাদের রণবিমানসমূহ হইতে বোমা বর্ষিত হয়, তাহা হইলে জিবরালটারের পাহাড়ে যে সকল কামান সংস্থাপিত আছে, তাহাই যে কোন আততায়ীর আক্রমণ হইতে প্রণালীটিকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে, এবং কোন বৈদেশিক শক্তি ইহার বন্দরগুলি তাহার নৌ-বহরের ঘাটী (Naval base)রূপে ব্যবহার করিতে পারিবে না।

ভূমধ্যসাগরের চাবি
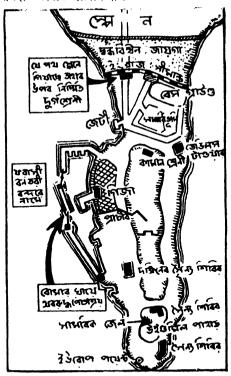
কিন্তু এই ভাবে আক্রমণের উদ্দেশ্যে শত্রুপক্ষ দীর্ঘকাল জিবরাল-টারকে অবরুদ্ধ অবস্থায় রাখিতে পারে বুঝিতে পারিয়া গভর্ণর আয়রণসাইড আত্মরক্ষার জন্যও প্রস্তুত হইয়াছেন। তিনি পাহাড়ের ভিতর যে পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহা পঞ্চবিংশতি সহস্র সৈন্যের ছয় মাসেরও অধিক কাল ক্ষুধা-নিবৃত্তির পক্ষে যথেষ্ট। এতদ্ভিন্ন, পাহাড় খনন করিয়া দশটি সুবৃহৎ জলাধার নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাতে প্রচুর পরিমাণে পানীয় জল সংরক্ষিত

হইয়াছে। ভূগর্ভে যে সকল গ্যালারী নির্ম্মিত হইয়াছে, বোমারু বিমানপোত হইতে বোমা বর্ষিত হইলে নগরবাসীরা সেই সকল গ্যালারীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া প্রাণরক্ষা করিতে পারিবে। শত্রুপক্ষের বিমান-পোত আক্রমণের জন্ম নানা স্থানে বিমান-বিধ্বংসী কামানসমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন, প্রচুর পরিমাণে যুদ্ধোপকরণ এবং গ্যাসের আক্রমণ-নিবারক মুখোসসমূহ সঞ্চিত হইয়াছে। পথগুলি খনন করিয়া ড্রেণের পাইপসমূহ পূর্ব্বাপেক্ষা গভীরতর স্থানে স্থাপিত হইয়াছে।

কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে জার্ম্মাণ সামরিক কর্ম্মচারিগণ তাঁহাদের জাহাজে বসিয়া বৃটিশ রণবিমানসমূহের যুদ্ধাভিনয় সন্দর্শন করিয়াছেন। রণ-বিমানসমূহ গগন-পথে আবির্ভূত হইয়া আক্রমণের
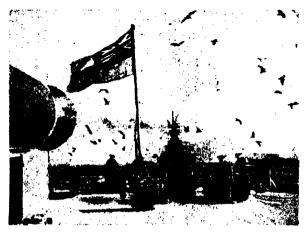
বৃটিশ রণতরীসমূহ পাহারা দিতেছে

উদ্দেশ্যে মাথার উপর ঘুরিতে আরম্ভ করিলে বংশীধ্বনি শ্রবণমাত্র নগরবাসীরা গোপনীয় আশ্রয়-স্থানে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিল। গভর্ণর আয়রণসাইড শত্রু-পক্ষের বিমানাক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার এইরূপ ব্যবস্থা করিলেও তিনি শত্রুপক্ষের বোমারু রণবিমানসমূহ হইতে অনিষ্টের আশঙ্কা করেন না। তাঁহার ধারণা, পাহাড়ের উচ্চ শৃঙ্গসমূহ হইতে যে প্রচণ্ড বায়ুস্রোত প্রবাহিত হয়, তাহার বেগের মুখে শত্রুপক্ষের রণবিমানসমূহ স্থির থাকিয়া নগরবাসিগণকে বোমা নিক্ষেপে বিপন্ন করিবে তাহার সম্ভাবনা নাই।

বস্তুতঃ জিবরালটারে শত্রুপক্ষের আয়োজনের ঘটা দেখিয়া সকলেরই ধারণা হইয়াছে, যুদ্ধারম্ভের আর অধিক বিলম্ব নাই, যে কোন মুহূর্ত্তে যুদ্ধ ঘোষিত হইতে পারে। ইংরেজদের আয়োজন শেষ হওয়া পর্য্যন্ত হিটলার বিলম্ব সঙ্গত মনে করিবেন কি না, কে বলিতে পারে?

ত্রিশক্তির চুক্তি

রুশিয়াকে বৃটেন এবং ফ্রান্সের সহিত সম্মিলিত করিবার জন্ম চেষ্টা হইতেছে। সহসা ড্যান্‌জিগে এক দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। ড্যান্‌জিগের জার্ম্মাণরা আচম্বিতে ক্যাল্‌থপের পোলিস শুল্ক-আফিস আক্রমণ করে। পোল্যাণ্ড সরকার এজন্ম জার্ম্মাণদিগের নিকট হইতে ক্ষতি-পূরণের দাবী করেন। তাহার পাল্টা জবাবে গ্রবেল্‌দার নামক এক জন জার্ম্মাণকে হত্যার জন্ম জার্ম্মাণরাও পোলদিগের নিকট হইতে ক্ষতিপূরণের দাবী করে। ব্যাপারটা লইয়া য়ুরোপময় বেশ একটু সাড়া পড়িয়াছিল। গ্রেট বৃটেনের প্রধান সচিব মিষ্টার নেভিল চেম্বারলেন এই ব্যাপারে যেন নিদ্রোত্থিতের ন্যায় উঠিয়া রুশিয়ার সহিত মিত্রতা করিবার প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভব করেন। পোল্যাণ্ডের শুল্কগৃহ-সম্পর্কিত হাঙ্গামা জার্ম্মাণরা বাধাইয়াছিল, কি, উহা স্থানীয় নাজীদিগেরই কীর্ত্তি, তাহা ঠিক বুঝা যায় নাই। যাহা হউক, এই উপলক্ষে রুশিয়ার সহিত মিত্রতা করিবার জন্য ইংলণ্ড কতকটা সচেষ্ট হন। তখন শুনা গিয়াছিল, জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যভাগেই গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স এবং রুশিয়া এই শক্তিত্রয়ের মধ্যে একটা আপোষ নিষ্পত্তি হইয়া যাইবে। কিন্তু তাহা এখনও পর্য্যন্ত সম্ভব হয় নাই। সর্ত্ত লইয়াই তাহাদের মধ্যে একটু গোল বাধিয়াছে।

গ্রেট বৃটেন এবং ফ্রান্স রুশিয়ার নিকট একযোগে যে চুক্তির প্রস্তাব পাঠাইয়াছিলেন, রুশিয়া তাহার উত্তর দিয়াছে। সে উত্তর বৃটিশ সরকার প্রকাশ করিবেন না। তবে সে উত্তর আশাপ্রদ। বিলাতের 'সাণ্ডে টাইমস্' উহার একটা সংক্ষিপ্ত মর্ম্মমাত্র প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা কতদূর বিশ্বাস্য, তাহা বলা যায় না। তবে সোভিয়েট সরকারের মুখপত্র 'প্রভেদা'য় কয়েকটি সর্ত্ত প্রকাশ পাইয়াছে। তন্মধ্যে জার্ম্মাণীর আক্রমণ হইতে বল্‌টিক রাজ্যগুলিকে রক্ষা করিবার সর্ত্তটিই প্রধান। চীনকে রক্ষা করা সম্বন্ধে কোন মতই রুশিয়া প্রকাশ করে নাই। বল্‌টিক রাজ্য বলিতে লিথুনিয়া লাটভিয়া এবং ইস্‌থোনিয়া প্রভৃতিকেই বুঝায়। উহা বল্‌টিক সাগরের উপান্তে অবস্থিত। এক সময়ে উহা রুশিয়ারই শাসনাধীন ছিল। এই রাজ্যগুলিকে রক্ষা করায় রুশিয়ার স্বার্থ আছে। রুশিয়া বলিতেছেন যে, গ্রেটবৃটেন এবং ফ্রান্স যেমন পোল্যাণ্ডকে রক্ষা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, সেইরূপ তাঁহাদিগকে বল্‌টিক রাজ্যগুলির নিরাপত্তা সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে। কিন্তু বৃটিশ জাতির স্বার্থ—বল্‌কান রাজ্যগুলির স্বাধীনতা-রক্ষা। রুশিয়ার এই উত্তরে ফ্রান্স আশান্বিত। গ্রেট বৃটেনের সমাজতন্ত্রবাদী দলও এই উত্তরে আনন্দিত। ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রী ডালাডিয়ার এই উত্তর পাইয়া সগর্ব্বে বক্তৃতা করিয়াছেন। ফ্রান্স ভিতরে ভিতরে ইটালীর সহিত নানা পরামর্শ করিতেছে। এদিকে ইটালীর সহিত জার্ম্মাণীরও একটা সামরিক চুক্তি হইয়া গিয়াছে। ফলে য়ুরোপের রাজনীতিক ঘটনাবলি এমন জটিল পথে চলিয়াছে যে, তাহার অনুসরণ করা কঠিন। ইথিওপিয়ায় আবার হাঙ্গামা বাধিয়াছে, ইহাতে ইটালীর বিব্রত হইবার সম্ভাবনা। ইটালীই এখন জার্ম্মাণীর প্রধান সহায়। এখন যদি রুশিয়া আসিয়া গ্রেট বৃটেন এবং ফ্রান্সের সহিত যোগদান করে, তাহা হইলেই হার হিটলারের এবং মুসোলিনীর বাহ্বাস্ফোট থামিয়া যাইবে বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু ত্রিশক্তির চুক্তি এখনও সমাধা হয় নাই। মিষ্টার চেম্বারলেন গত ২৪শে বৈশাখ বলিয়াছেন, এই চুক্তির কথা সন্তোষজনক ভাবে অগ্রসর হইতেছে। এই চুক্তির আসল কথা—চুক্তিবদ্ধ জাতিত্রয় পরস্পর পরস্পরকে পূর্ণমাত্রায় সাহায্য করিবেন। তিনটি দেশ যে সামরিক চুক্তিতে

আবদ্ধ হইবেন, তাহার সর্ত্তানুসারে কাহারও নিজ দেশ আক্রান্ত হইলে পরস্পরকে পূর্ণমাত্রায় সাহায্য করিবেন। এরূপ অবস্থায় তিনটি সরকারের পক্ষে গ্রহণ করিবার মত একটা সূত্র খুঁজিয়া বাহির করা সম্ভব হইবে বলিয়া মিষ্টার চেম্বারলেন আশা করিয়াছেন। এই সকল বিষয়ের সত্বর সিদ্ধান্ত করিবার জন্য প্যারিসের বৃটিশ রাষ্ট্রদূত ও লর্ড হ্যালিফাক্সের পরামর্শানুসারে পররাষ্ট্রবিভাগের মিঃ উইলিয়াম ষ্ট্রাঙ্গ ২৭শে জ্যৈষ্ঠ বিমানযোগে মস্কো গিয়াছেন।

হিটলারের আসন্ন সঙ্কট

ইটালী ও জার্ম্মাণী এতদিনে গণতান্ত্রিক শক্তির লৌহ-শৃঙ্খলে ধীরে ধীরে পরিবেষ্টিত হইয়াছে। তাহাদের প্রায় ৮০ লক্ষ যোদ্ধা রণ-সাজে সজ্জিত। য়ুরোপের স্বর্ণ-রাশি য়ুনাইটেড্ ষ্টেটসের নিরাপদ ধনভাণ্ডারে সুরক্ষিত হইবার জন্য জলস্রোতের ন্যায় আমেরিকা অভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে। বৃটিশ, ফরাসী, জার্ম্মাণ ও ইটালীয় রণতরীবহর যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত।

বৃটিশসিংহ বুঝিয়াছেন, লাঙ্গুল আস্ফালন করিয়া কেবল গর্জ্জনে আততায়িগণের মনে আতঙ্ক-সঞ্চারের সম্ভাবনা নাই। শান্তি-রক্ষার চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই, কিন্তু সে চেষ্টা নিস্ফল; এজন্য বৃটেন ভাইকাউণ্ট গর্টের নেতৃত্বে পরিচালিত আর্ম্মি কাউন্সিলের কঠোর দাবীতে, এবং সমরসচিব হোর বেলিসার অনুমোদনে বল-পূর্ব্বক সৈন্যসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

য়ুরোপে রণডঙ্কা বাজিয়া উঠিয়াছে; এ সময় জাপান সহসা ডিক্টেটরদ্বয়ের সহিত মৈত্রীবন্ধন অক্ষুণ্ণ রাখা হইবে কিনা ভাবিয়া বিচলিত হইয়াছে।

জেনারেল ফ্রাঙ্কো

কাউণ্ট ডিনো গ্র্যাণ্ডি

১৯১৪ খৃষ্টাব্দের পর কখন জার্ম্মাণীকে এরূপ শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বিগণের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে হয় নাই। সম্মুখে বিপুল সমরায়োজন দেখিয়া হিটলার চিন্তিত, এখন তিনি কি করিবেন? মুখব্যাদান করিয়া এখনও পররাজ্য গ্রাসে অগ্রসর হইবেন, অথবা এখন থামিয়া যাওয়াই ভাল, ভাবিয়া পরধনহরণে নিবৃত্ত হইবেন?

কঠিন সমস্যা!

এক সময় যিনি পথে পথে সচিত্র পোষ্টকার্ড বিক্রয় করিয়া অন্নের সংস্থান করিয়াছিলেন, এখন তিনি জার্ম্মাণীর সর্ব্বশক্তিমান্ চ্যান্সেলার; তাঁহার বিশ্বাস, তিনি দৈবশক্তির অধিকারী; এজন্য তিনি ন্যায়ের সমর্থন করিতে অসম্মত।

কিন্তু এই দৈববলসম্পন্ন জার্ম্মাণ ডিক্টেটরও গত মে মাসের প্রথমে স্বীকার করিয়াছেন, জার্ম্মাণী, ইটালিয়ান্ ও স্প্যানিস্ সাহায্যপুষ্ট হইয়াও বৃটেন, য়ুনাইটেড্ ষ্টেট্স্, ফ্রান্স, পোল্যাণ্ড, রুশিয়া, রুমানিয়া, গ্রীক তুরস্ক এবং সম্মিলিত মুসলমান রাজ্যগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারে, এরূপ শক্তি সঞ্চয় করিতে পারে নাই।

নাজীপ্রবল হঙ্গেরী, যুগোশ্লেভিয়া এবং বুলগেরিয়া এখনও জার্ম্মাণীর নিকট মাথা বিক্রয় করে নাই। অধিক কি, স্পেন-বিজয়ী জেনারেল ফ্রাঙ্কো ইটালী ও জার্ম্মাণীর সহিত সুদৃঢ় সামরিক মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারেন নাই; ভবিষ্যতে অবস্থার পরিবর্ত্তনে তাঁহারও নূতন সুর বাহির হইতে পারে।

এই সকল কারণে হিটলার বিনাযুদ্ধে য়ুরোপের গণতন্ত্র-সমূহকে পুনর্ব্বার যতাতে আর একটা পরাজয়ের গ্লানি অনুভব করাইতে পারেন, এজন্য গোপনে ফন্দী আঁটিতেছেন।

বৃটেন নিদ্রাভঙ্গে স্থির করিয়াছেন, হিটলারকে আর পর-রাজ্য গ্রাস করিতে দিবেন না; এজন্য বৃটেনে যে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে, তাহা হিটলারের অজ্ঞাত নহে। ইহাতে হিটলারের মনোভাবের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই, কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে সংঘটিত একটি ঘটনার সংবাদ হইতে এরূপ অনুমান করা কঠিন।

বৃটেন পোল্যাণ্ডকে সাহায্যদানে প্রতিশ্রুত হইলে, মুসোলিনী অল্পদিন পূর্ব্বে বৃটিশ সরকারের নিকট অঙ্গীকারাবদ্ধ হইয়াও সেই অঙ্গীকারের প্রতিবাদ স্বরূপ আলবেনিয়ায় ছোঁ মারিতে বাধ্য হইয়া-ছিলেন; কারণ, বার্লিন হইতে তিনি এইরূপই জরুরি উপদেশ পাইয়াছিলেন। এই উপদেশ তিনি অগ্রাহ্য করিতে পারেন নাই। হিটলারের পররাজ্য আক্রমণ নীতির প্রতিকূলে যে বিরাট মৈত্রীবন্ধনের ব্যবস্থা হইয়াছে, (the organisation of a

Grand Alliance) মুসোলিনীর আলবেনিয়া আক্রমণ তাহারই উত্তর।

ইহার অল্পদিন পরেই বৃটিশ সরকার রুমানিয়া ও গ্রীসকেও অভয় দান করায় হিটলার গণতন্ত্রে দণ্ডাঘাত করিবার জন্য পুনর্ব্বার যে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, তাহারও প্রমাণের অভাব নাই; হিটলার বৈদেশিক ব্যাপারের পরামর্শদাতা যোয়াকিম ভন রিবেনট্রপকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন, ২০শে এপ্রিল তাঁহার পঞ্চাশৎ জন্মদিনে গণতন্ত্রে প্রচণ্ড আঘাত করিবেন; সেই আঘাতের ফলে ড্যান্‌জিগ তাঁহার হস্তগত হইবে। ড্যান্‌জিগ গ্রাসের জন্য তিনি মুখব্যাদান করিয়াছিলেন।

ওদিকে নাজী সংবাদপত্রসমূহ পোলগণের বিরুদ্ধে ভীষণ আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছিল; তাহাদের অভিযোগ—পোলরা তাহাদের স্বদেশে জার্ম্মাণগণের প্রতি নানা প্রকার অত্যাচার করিতেছে। অতঃপর জার্ম্মাণ সরকার ওয়ারস সরকারের প্রেসিডেন্ট মস্‌সিকির নিকট চরমপত্র পাঠাইয়াছেন—জার্ম্মাণীকে বালটিক সাগর পর্য্যন্ত মোটর চালাইবার একটা পথ দিতে হইবে, এবং ড্যানজিগকে রীচের অধিকারভুক্ত করিতে দিতে হইবে—পোলিস ও জার্ম্মাণ রাজপুরুষগণ একযোগে তাহার শাসনকার্য্য পরিচালিত করিবে। ইহার বিনিময়ে জার্ম্মাণী ২৫ বৎসরের মধ্যে পোল্যাণ্ড আক্রমণ করিবে না বলিয়া চুক্তিনামায় স্বাক্ষর করিবে। ২৫ বৎসরের জন্য পোল্যাণ্ড নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবে।

ভন রিবেনট্রপের ধারণা, পোলরা জার্ম্মাণীর এই দাবী অগ্রাহ্য করিবে, তখন হিটলার ড্যানজিগ গ্রাস করিবার একটি ছল পাইবেন এবং তিনি তাঁহার জন্মদিনের উপহারস্বরূপ ড্যান্‌জিগ গ্রহণ করিবেন। কিন্তু এই সঙ্কল্প স্থির হইবার তিন দিন পরে রোমের নাজী গোয়েন্দা প্রতিষ্ঠানের উপদেশ অনুসারে হিটলার মধ্যপথে থামিয়া গিয়াছেন।

হিটলারের সহসা এইরূপ বৈরাগ্য অবলম্বনের কারণ, মুসোলিনী হঠাৎ তাঁহার অবাধ্য হইয়া উঠিয়াছেন। মুসোলিনী ইটালীতে কোন রাজনীতিজ্ঞের নিকট এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, হিটলার যদি ড্যানজিগের দিকে হস্ত প্রসারিত করেন, তাহা হইলে আমি তাঁহার এই কার্য্যের সমর্থন করিব না।

রোমে অনুসন্ধানের ফলে জানিতে পারা গিয়াছে, মুসোলিনীর জামাতা, ইটালীর পররাষ্ট্র-সচিব জার্ম্মাণীর পক্ষপাতী কাউণ্ট গালিজো সিয়ানো এবং তাঁহার পত্নী এডা এই ব্যাপার লইয়া মুসোলিনীর সহিত ভীষণ বিরোধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা মুসোলিনীকে এ বিষয়ে হিটলারের মতাবলম্বী করিতে পারেন নাই। মুসোলিনীর সহিত তাঁহার বিদ্রোহী জামাতার এই প্রকার বিরোধে বিরক্ত হইয়া ইটালীর লণ্ডনস্থ দূত কাউণ্ট ডিনো গ্র্যাণ্ডি চাকরী ত্যাগ করিবেন বলিয়া জনশ্রুতি প্রচারিত হইয়াছিল। কাউণ্ট গ্র্যাণ্ডি রোম হইতে লণ্ডনে প্রত্যাগমন করেন নাই; ওয়েষ্টওয়ার্থে তাঁহার বাসভবন শীঘ্র বিক্রয় করিয়া ব্যবসায়-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন। কিন্তু তাঁহার 'কাস্তে ভেঙ্গে করতাল' গঠনের জনরব কতদূর সত্য, তাহার নিশ্চয়তা নাই।

বৃটিশের রয়েল হর্স আর্টিলারী—গোলন্দাজ সৈন্য

বৈদ্যুতিক মোটরচালিত ব্যায়াম যন্ত্র

বিন্দুমাত্র হাঙ্গামা ও বিপদ ব্যতীত ব্যায়ামচর্চ্চার অভিনব যন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে। এই বৈদ্যুতিক ব্যায়াম যন্ত্র একটি পাদপীঠে সংস্থাপিত। উপরে দুইটি হাতল এবং নিম্নভাগে দুইটি পা রাখিবার পেডেল আছে। কোনও লোক ব্যায়াম করিবার সময়
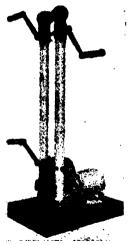
বৈদ্যুতিক মোটরচালিত ব্যায়াম যন্ত্র

একখানি চেয়ার টানিয়া আনিয়া তাহাতে উপবেশন করিবেন। পা-দানীতে পা ও হাতলে হাত রাখিয়া কল টিপিয়া দিবেন। অমনই আপনা হইতে হস্ত ও পদের আবর্ত্তন আরম্ভ হইবে। ইহাতে মাংসপেশী সুগঠিত হইবে, কিন্তু বিন্দুমাত্র আয়াস স্বীকার করিতে হইবে না।

——

আপেলের অঙ্গরাখা

বাজারে গিয়া তুমি বহু সন্ধান করিয়া আপেল কিনিয়া আনিলে—সুঠাম তাহার আকার, উজ্জ্বল তাহার বর্ণ। তুমি স্থির ধারণা করিয়া লইলে, এ আপেল একেবারে তাজা। কিন্তু নির্ব্বিচারে কামড় মারিবার পূর্ব্বে একবার দেখিয়া লইও। তাহার গায়ে জামা পরান নাই তো? আজকাল আপেলরাও জামা পরিতে শিখিয়াছে। অত্যন্ত সূক্ষ্ম রবারের তৈয়ারী একপ্রকার আবরণ বাজারে বাহির হইয়াছে, এদেশে নয়, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের একান্ত

আপেল তাজা রাখিবার অভিনব কৌশল

সভ্যতার মধ্যে। এই আবরণ চোখে দেখা যায় না কিন্তু এটি থাকার ফলে বাহিরের ধূলা-বালি শীত-গ্রীষ্ম হইতে আপেলের আত্মরক্ষার সুবিধা হয়। আমরা পথ চাহিয়া আছি, কবে বাজারের অসভ্য কমলালেবু-আম-কাঁঠালের দল কাপড় পরিতে শিখিবে।

——

বিচিত্র নৌকা

চিকাগো সহরের তরুণ বৈজ্ঞানিক উইলি হ্যারিস্ বিচিত্রদর্শন নৌকা তৈয়ার করিয়াছেন। এই নৌকাটি আগাগোড়া ইস্পাতের দ্বারা নির্ম্মিত। নৌকায় একটি কামরা আছে। কামরাটি বন্ধ থাকিলে, ঝটিকার সময় সমুদ্রের প্রবল তরঙ্গ তাহার উপর দিয়া

বহিয়া গেলেও, কামরার অভ্যন্তর ভাগে এক কণা জল প্রবেশ করিবার উপায় নাই। কামরার কজা-যুক্ত ঢাকনি বন্ধ থাকিলেও

বিচিত্র নৌকা

কামরার অভ্যন্তরে নির্ম্মল বায়ুপ্রবাহ প্রবাহিত হইবার সুব্যবস্থা আছে।

ক্যানারী পাখীর সফর

পারাবত-পৃষ্ঠে এক ক্যানারী পাখী বিশ মাইল ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছে,—হুজুকের দেশ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষেও এ একটি একেবারে

নূতন ব্যোমযানে ক্যানারী

অভিনব সংবাদ। প্রকাশ, ক্যানারী পাখীটি অসুস্থ হইয়া পড়িলে তাহার মনিব তাহাকে হাসপাতালে পাঠান। যাহাতে পথে কোনো-রূপে বিলম্ব না হয়, তাহার জন্য তিনি একটি রেসের পায়রার পিঠের উপর একটি অভিনব বসিবার আসন নির্ম্মাণ করেন। এ আসনে চড়িয়া পাখীটি বিনা ক্লেশে জার্সী সহর হইতে নিউ ইয়র্কে পৌঁছিয়াছে।

প্যাঁচাল গ্যারাজ

গাড়ীতে-গাড়ীতে ধাক্কা লাগিয়া হাত পা ভাঙ্গা বিলাতের পথচারী মহলে একটা অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা। এ দুর্বিপাকের হাত হইতে রক্ষা পাইবার বাসনায় ইংলণ্ডের বৈজ্ঞানিক-মণ্ডলী এক অভিনব গ্যারাজ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। থিয়েটার-সিনেমা প্রভৃতি জায়গায়
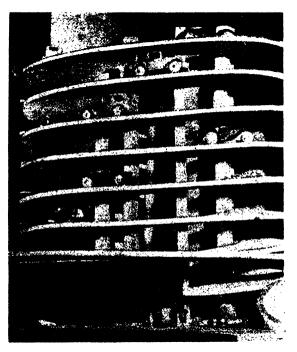
ডবল প্যাঁচাল গ্যারাজ

বহু গাড়ীর আমদানি হয়। এই সব জায়গায় এই ধরণের গ্যারাজ ব্যবহার করা হইবে। ছবিটি দেখিলে ব্যাপারটি আগাগোড়া বোঝা যাইবে। ডবল প্যাঁচ থাকায় নামিবার ও উঠিবার পথে গাড়ী চলে ভিন্নপথে এবং উভয় পক্ষের অবাঞ্ছিত সাক্ষাতের সম্ভাবনা থাকে না।

রেডিও-আজ্ঞাবহ কুকুর

অষ্ট্রেলিয়ার সিডনী সহরের পুলিস একটি কুকুরকে রেডিওয় পাঠান নির্দ্দেশমত কাষ করিতে শিখাইয়াছে। কুকুরটি মাদী, এবং তাহার 'আদিম নিবাস' হইল রাশিয়া। কুকুটির পিঠে একটি ছোট আকারের রেডিও সেট বাঁধা থাকে। সেই রেডিও-যোগে

বেতারে নির্দ্দেশ পাঠান হইলে কুকুরটি সেই মত কাজ করে। অন্যান্য বিষয়েও কুকুরটির শিক্ষা অসাধারণ। সে মইয়ে উঠিতে,

শিক্ষিত কুকুর ও তাহার রেডিও

নামিতে, কল খুলিতে ও বন্ধ করিতে, এমন কি, নিজের বগলস খুলিতে এবং পিস্তল ছুড়িতে পারে।

ঘণ্টায় মুক্তা

নিউ-ইয়র্কের বিশ্ব-প্রদর্শনীতে এক জাপানী কোম্পানী একটি ঘণ্টা আমদানি করিয়াছে। এ ঘটনাটি অবশ্য অসাধারণ কিছুই নয়,

মুক্তাখচিত ঘণ্টা

কিন্তু যদি বলি, এ ঘণ্টাটির দাম এক কোটি ডলার (১ ডলার প্রায় ৩ টাকা) তাহা হইলে ব্যাপারটি তখনি অসাধারণ হইয়া পড়ে না কি ? ঘণ্টাটির আকার হইল উচ্চতায় ১ ফুট ২ ইঞ্চি এবং ব্যাস ১ ফুট ৩ ইঞ্চি। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ যে ঘণ্টা বাজাইয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়, এ ঘণ্টা হইল তাহারই প্রতিমূর্ত্তি। কিন্তু সে জন্যই যে ইহার দাম অত বেশী তা নয়। ঘণ্টাটি আগাগোড়া রূপার উপর মুক্তা বসাইয়া নির্ম্মিত। এটি গড়িতে ১১ হাজার ৬ শতটি মুক্তা, ৩৬৬টি হীরা ও সের দশ বারো রূপা লাগিয়াছে।

মোটরের রুদ্ধ দ্বার

অনেক সময় মোটর গাড়ীতে ছোট ছেলে-মেয়ে রাখিয়া নামিয়া যাইতে হয়। সেই অবসরে ছেলে যাহাতে গাড়ী হইতে নামিতে না পারে, তাহার জন্য একটি নূতন ধরণের খিল বাজারে বাহির হইয়াছে। ছোট এই খিলটিকে সামনের দরজায় লাগাইয়া রাখিতে হয়। তাহা হইলে সম্মুখের দরজা খোলায় কোনোরূপ বাধা হয় না কিন্তু ভিতর

মোটর গাড়ীর দরজায় খিল

হইতে পিছনের দরজা খোলা যায় না। সামনের দরজা বন্ধ থাকিলেই এ খিল কায করে। অন্য সময়ে এটি নেহাৎ অবহেলায় পড়িয়া থাকিতে প্রস্তুত আছে।

রাক্ষুসে লাঙ্গল

দুইটা শীর্ণকায় অনাহারক্লিষ্ট বলদ অক্লেশে টানিয়া চলে মাঠের বুক চিরিয়া—লাঙ্গল বলিতে আমরা ইহাই বুঝি। একবার সুভাষচন্দ্র রাষ্ট্রপতির মসনদে চড়িবার জন্য ৫১ গরুর গাড়ীতে চাপিয়াছিলেন বটে, কিন্তু একটা লাঙ্গল টানিতে ছয় শত ঘোড়া জুতিয়া দেওয়া হইল, যে চাষ দেওয়া হইল, তাহাতে একটা প্রমাণ মানুষ ডুবিয়া যায়—এ তার চাইতেও অভিনব ব্যাপার নয় কি? আমরা জানি, পলি পড়িয়া এবং অন্য প্রাকৃতিক কারণে উপরের রোদ-বাতাস-লাগা উর্ব্বর মাটি ক্রমাগত নীচে চলিয়া যায়। ফলে কিছুকাল চাষ করিলে উপরের জমির উৎপাদনী-শক্তি কমিয়া যায়, কিন্তু নীচে উর্ব্বর মাটি চাপা থাকে। এই ভিতরের মাটিকে টানিয়া তুলিবার মানসে ক্যালিফোর্নিয়ার কৃষিবহুল শাস্তা য়্যানা অঞ্চলের অধিবাসী দুই ভাই এক অতিকায় লাঙ্গল তৈয়ারী করিয়াছেন। এ লাঙ্গল ছয় ফুট গভীর করিয়া গর্ত্ত কাটিয়া চলে। এ লাঙ্গল টানিবার জন্য তিনটি ট্র্যাক্টর জুতিয়া দেওয়া হয়। এ তিনটিতে মোট ৬০০ অশ্বশক্তি সংগ্রহ করিয়া অগ্রসর হয়। আবার যাহাতে 'স্বখাত সলিলে' লাঙ্গলটি ডুবিয়া না যায়, সে জন্য আরও দুইটি ট্র্যাক্টর তাহাকে পাশের দিকে টানিয়া রাখে। এ লাঙ্গলে এক এক-বারে পাঁচ গজ পরিমিত স্থানের মাটি উল্টাইয়া দেওয়া হয় এবং ঘণ্টায় অর্দ্ধ একর (একর প্রায় ৩ বিঘা) চাষের কার্য্য সুসম্পন্ন হয়। এটি ছোট খাট চাষীদের ভাড়া দেওয়া হইতেছে।
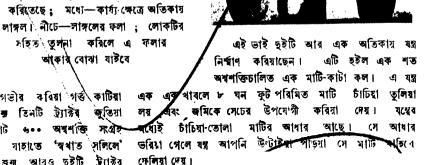
উপরের চিত্র—রাক্ষুসে মাটাকাটা কল জমি সমান করিতেছে; মধ্যে—কার্য্য-ক্ষেত্রে অতিকায় লাঙ্গল। নীচে—লাঙ্গলের ফলা; লোকটির সহিত তুলনা করিলে এ ফলার আকার বোঝা যাইবে

এই ভাই দুইটি আর এক অতিকায় যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এটি হইল এক শত অশ্বশক্তিচালিত এক মাটি-কাটা কল। এ যন্ত্র এক এক থাবলে ৮ ঘন ফুট পরিমিত মাটি চাঁচিয়া তুলিয়া লয় এবং জমিকে সেচের উপযোগী করিয়া দেয়। যন্ত্রের মধ্যেই চাঁচিয়া-তোলা মাটির আধার আছে। সে আধার ভরিয়া গেলে যন্ত্র আপনি উল্টাইয়া পড়িয়া সে মাটি বাহিরে ফেলিয়া দেয়।

আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি

বৃটেন—

জেকোশ্লোভেকিয়ার অস্তিত্ব-বিলুপ্তির পর বৃটেনের বিক্ষুব্ধ জনমত শান্ত করিবার উদ্দেশ্যে চেম্বারলেন-মন্ত্রিসভা তাঁহাদিগের মনোভাব পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। পররাষ্ট্র-নীতিতে তাঁহারা জার্ম্মাণীর ক্রমবর্দ্ধমান পররাজ্যলোলুপতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়া সোভিয়েট রুশিয়ার সহিত মিত্রতা স্থাপনের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। স্বরাষ্ট্র-নীতিতেও তাঁহারা জাতিকে সর্ব্বতোভাবে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করাইতে তৎপর হইয়াছেন। বর্ত্তমান বৎসরের বাজেটে যুদ্ধায়োজনের জন্য ৬ কোটি ৩০ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত, কুড়ি হইতে একুশ বৎসর বয়স্ক যুবকদিগকে সামরিক কার্য্যে যোগদান করাইবার জন্য বাধ্যতামূলক বিধান প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

ফ্যাসিষ্ট-প্রেমিক চেম্বারলেন-মন্ত্রিসভা—স্পেন, অষ্ট্রিয়া, জেকোশ্লোভেকিয়া ও আলবেনিয়ার সর্ব্বনাশসাধনে পরোক্ষ সাহায্যদাতা চেম্বারলেন মন্ত্রিসভা নিতান্ত বাধ্য হইয়াই আজ পররাষ্ট্রনীতিতে তাঁহাদিগের সুর বদলাইয়াছেন; কিন্তু ইহাতে যে তাঁহাদিগের আন্তরিকতা নাই, তাহা ইঙ্গ সোভিয়েট আলোচনায় দীর্ঘসূত্রতা হইতেই প্রমাণিত হইতেছে। চেম্বারলেন-হ্যালিফ্যাক্সের পররাষ্ট্র-নীতির প্রতিবাদে উদারনৈতিক লয়েড জর্জ্জ, রক্ষণশীল ইডেন-চার্চ্চিল, শ্রমিক-প্রতিনিধি এট্‌লী প্রভৃতির কণ্ঠধ্বনি ক্রমেই উচ্চ হইতে উচ্চতর হইতেছিল; ইহার প্রভাব জনসাধারণের মধ্যেও পরিব্যাপ্ত হইতেছিল। মিউনিকে হতভাগ্য জেকদিগকে পরোক্ষভাবে জার্ম্মাণীর পদানত করাইয়াও তাহাদিগের রাষ্ট্রনৈতিক স্বাতন্ত্র্যরক্ষার জন্য প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল। সেই মিউনিক চুক্তির অন্যতম স্বাক্ষরকারী বৃটেন ও ফ্রান্সকে উপেক্ষা করিয়া জেকোশ্লোভেকিয়া সম্পর্কে জার্ম্মাণীর যথেচ্ছ ব্যবস্থা অবলম্বনে তাহারা অবনমিত হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত, রুমানিয়ায় বৃটেনের এবং পোলণ্ডে ফ্রান্সের অর্থনৈতিক স্বার্থও বিপন্ন হইতেছিল। কাজেই, জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে অন্ততঃ মৌখিক প্রতিবাদ জ্ঞাপন ব্যতীত চেম্বারলেন মন্ত্রিসভার আর গত্যন্তর ছিল না। তাঁহারা তখন পররাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে নানা অজুহাতে কালহরণের সুযোগ পাইবার জন্যই সাময়িকভাবে দেশের জনমত শান্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যেই বাধ্যতামূলক সামরিক কার্য্যের বিধান প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। সামরিক বিভাগের ব্যয়বৃদ্ধিতে দেশবাসীর করভার বর্দ্ধিত হইয়াছে। চেম্বারলেন-মন্ত্রিসভার এই কৌশল কার্য্যকর হইয়াছে; ইডেন-চার্চ্চিল ও লয়েড জর্জ্জ তাঁহাদিগের এই ব্যবস্থা সমর্থন করিয়াছেন এবং দেশবাসীও এই ব্যবস্থাকে ফ্যাসিষ্ট অত্যাচার প্রতিরোধের জন্য তাঁহাদিগের আন্তরিকতার পরিচায়ক মনে করিয়াছে। শ্রমিক দল বাধ্যতামূলক সামরিক কার্য্যসংক্রান্ত বিধানের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছে; কারণ, তাহাদিগের নিকট চেম্বারলেন্-হ্যালিফ্যাক্সের "চাল" ধরা পড়িয়াছে। কিছুকাল পূর্ব্বে মিঃ চেম্বারলেন ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, যদি যুদ্ধ আরম্ভ না হয়, তাহা হইলে বর্ত্তমান পার্লামেণ্টের কালে কখনও বাধ্যতামূলক সামরিক কার্য্যের বিধান প্রবর্ত্তিত হইবে না। বর্ত্তমান ব্যবস্থা এই ঘোষণার বিরোধী; তাহার পর পররাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী নীতি গ্রহণে ইতস্ততঃ করিয়া স্বরাষ্ট্রক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক সামরিক কার্য্যের ব্যবস্থা ও দেশবাসীর করভার বৃদ্ধি সমর্থনযোগ্য হইতে পারে না। চেম্বারলেন-মন্ত্রিসভা তাঁহাদিগের এই ব্যবস্থায় এক দিকে যেমন গভর্ণমেণ্ট-বিরোধী রক্ষণশীল ও উদারনৈতিকদিগকে সাময়িকভাবে সন্তুষ্ট করিতে চাহিয়াছিলেন, তেমনই বাধ্যতামূলক সামরিক কার্য্যসংক্রান্ত বিধানে গভর্ণমেণ্ট বিরোধী যুব-আন্দোলনে বাধা দান করাও তাঁহাদিগের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল।

লর্ড হ্যালিফ্যাক্স

উইনষ্টন চার্চ্চিল

গত মার্চ্চ মাসে জেকোশ্লোভেকিয়া রাষ্ট্রের ধ্বংস সাধিত

হইবার অব্যবহিত পরেই বৃটেন পোলণ্ডের রাজ্যগত অখণ্ডতা ও রাজনীতিক স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, পরে রুমানিয়া ও গ্রীসকেও ঐরূপ আশ্বাস দিয়াছেন। পূর্ব্ব-ভূমধ্যসাগর সম্পর্কে বৃটেন তুরস্কের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়াছেন। রুমানিয়া ও পোলণ্ডের সহিত বৃটেন ও ফ্রান্সের অর্থনীতিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে, কাযেই, এই দুইটি রাজ্যে জার্ম্মাণীর প্রতিপত্তি স্থাপিত হয়, ইহা বৃটেন্ ও ফ্রান্স কখনও সহ্য করিতে পারেন না। রুমানিয়ার তৈলখনির প্রতি বহু দিন হইতেই জার্ম্মাণীর লোলুপ-দৃষ্টি রহিয়াছে। জেকোশ্লোভেকিয়া অধিকারের পর রুমানিয়ার রাজনীতিক স্বাধীনতা হরণের ভীতি প্রদর্শন করিয়া জার্ম্মাণী তাহাকে ব্যাপক অর্থনীতিক চুক্তিতে আবদ্ধ করিয়াছে। রুমানিয়ার তৈল ব্যবসায়ে বৃটেনের স্বার্থ গভীরভাবে বিজড়িত; কাযেই রুমানিয়া ও জার্ম্মাণীর বাণিজ্য চুক্তিতে সে উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠে এবং কালবিলম্ব না করিয়া রুমানিয়ার সহিত অর্থনীতিক চুক্তি করে। পোলণ্ডের ব্যবসা-ক্ষেত্রে ফরাসী ধনিকের স্বার্থ জড়িত রহিয়াছে; কাযেই জেকোশ্লোভেকিয়ার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিলুপ্তির পর পোলণ্ড যখন তিন দিকে জার্ম্মাণীর দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়, তখন ফ্রান্সের উৎকণ্ঠা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। রুমানিয়ার ব্যবসায়ে বৃটিশ ধনিকের স্বার্থ এবং পোলণ্ডের ব্যবসায়ে ফরাসী ধনিকের স্বার্থরক্ষার জন্যই বৃটেন ও ফ্রান্স অত্যন্ত তৎপরতার সহিত ঐ দুইটি রাষ্ট্রের রাজনীতিক স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আপনাদিগকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করিয়াছে। তবে, ইঙ্গ-সোভিয়েট আলোচনা যদি ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে চেম্বারলেন-মন্ত্রিসভা ড্যান্‌জিগ ও "পোলিস্-করিডর" সম্পর্কে জার্ম্মাণীর দাবী পূর্ণ করাইয়া তাহাকে শান্ত করিতে প্রয়াস পাইতে পারেন। মিঃ চেম্বারলেন কিছু দিন পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে, ড্যানজিগ সংক্রান্ত সমস্যা এত বিরাট নহে যে, উহা লইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতে পারে। কর্ণেল বেক্ হিটলারের রাইখস্ট্যাগ বক্তৃতার উত্তরে বলিয়াছিলেন যে, "We stand firmly on the grounds of our rights of overseas trade and maritime policy in Danzig" এই উক্তির এইরূপ অর্থ করা যাইতে পারে যে, উল্লিখিত দুইটি অধিকার যদি অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহা হইলে ড্যান্‌জিগ জার্ম্মাণ রাইখের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় পোলণ্ডের কোন আপত্তি নাই। "পোলিস্ করিডর" জার্ম্মাণীর হস্তে অর্পণ করিতে সম্মত না থাকিলেও উহার মধ্য দিয়া জার্ম্মাণীকে যাতায়াতের সুবিধা দানে কর্ণেল বেক্ প্রস্তুত আছেন, এই কথাও তিনি তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন।

মেজর এটলী

এন্থনি ইডেন

ইটালী কর্ত্তৃক আলবেনিয়া অধিকৃত হওয়ায় পূর্ব্ব-ভূমধ্যসাগরে বৃটেনের প্রভাব ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। তাহার পর, ইটালী ডোডেকেনিজ দ্বীপপুঞ্জে সামরিক আয়োজন করিয়া গ্রীস্‌কে বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছিল। কাযেই, গ্রীসের রাজনীতিক স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে আশ্বাস দান বৃটেনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়ে। গ্রীস্ যদি ইটালীর আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হইত, তাহা হইলে পূর্ব্ব ভূমধ্য-সাগর হইতে বৃটেনের সকল প্রভাব দূরীভূত হইত। তুরস্ক বহু দিন হইতেই সোভিয়েট রুশিয়ার প্রতি অনুরক্ত; সোভিয়েট রুশিয়া তাহাকে ত্যাগ করিয়া বৃটেন ও ফ্রান্সের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইবে না, ইহা নিশ্চিত। এই জন্য মঃ পোটেমকিন্ কিছু দিন পূর্ব্বে আঙ্কারায় গমন করিয়া তুর্কি গভর্ণমেণ্টকে সত্বর বৃটেনের সহিত চুক্তি করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। ইহার কারণ এই যে, তুরস্ক যদি বৃটেনের সহিত মিত্রতা স্থাপন করে, তাহা হইলে সঞ্জক লইয়া ফ্রান্সের সহিত তুরস্কের যে বিরোধ চলিতেছিল, তাহার মীমাংসায় অগ্রণী হইতে ফরাসী গভর্ণমেণ্ট বাধ্য হইবেন। মঃ পোটেম্‌কিনের এই কৌশল কার্য্যকর হইয়াছে; ইঙ্গ-তুর্কি চুক্তির পর ফ্রান্সও সঞ্জক সম্পর্কিত সমস্যার মীমাংসা করিয়া ফ্রাঙ্কো-তুর্কি চুক্তি স্থাপনের জন্য আগ্রহান্বিত হইয়াছে।
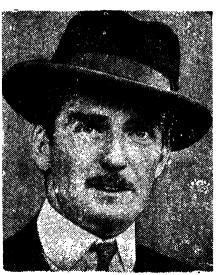
তাহার পর ইঙ্গ-সোভিয়েট আলোচনা; গত এপ্রিল মাসের মধ্যভাগ হইতে এই আলোচনা চলিতেছে। কিন্তু উহা ফলপ্রসূ হইবে কি না, তাহা এখনও বুঝা যাইতেছে না। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সোভিয়েট রুশিয়ার সহিত সাম্রাজ্যবাদী বৃটেন অকপটে মিত্রতা স্থাপন করিতে ইতস্ততঃ করিবে, ইহা স্বাভাবিক। অল্প কাল পূর্ব্বেও বৃটেন ফ্যাসিষ্ট শক্তিদ্বয়ের সহিত সোভিয়েট রুশিয়ার বিরোধ বাধাইয়া নিরপেক্ষ থাকিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এখন জনমতের প্রভাবেই বৃটেন সোভিয়েট রুশিয়ার সহিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন; লয়েড্ জর্জ্জ বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের মনোভাব সম্পর্কে স্পষ্টই বলিয়াছেন, "There is a great desire, if possible,

to do without Russia. Russia offered to come in months ago and for months we have been staring this powerful gift-horse in the mouth, but we are frightened of its teeth.

বৃটেন, ফ্রান্স ও সোভিয়েট রুশিয়ার মধ্যে আক্রমণ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে পারস্পরিক সাহায্য প্রদানের প্রতিশ্রুতির জন্য সোভিয়েট রুশিয়া প্রস্তাব করিয়াছে। ইহা ব্যতীত, এই তিনটি রাষ্ট্র একযোগে সোভিয়েট সীমান্তের বিভিন্ন রাষ্ট্র এবং মধ্য ও দক্ষিণ-য়ুরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রের নিরাপত্তা সম্পর্কে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হউক—ইহাই এখন সোভিয়েট রুশিয়ার প্রস্তাবের সার মর্ম্ম। কিন্তু বৃটেন্ সোভিয়েট রুশিয়ার সহিত "জড়াইয়া" পড়িতে চাহেন না; বৃটেন পোলণ্ড, রুমানিয়া ও গ্রীসের নিরাপত্তা সম্পর্কে রুশিয়ার নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি "আদায়" করিতে চাহেন।

মুর অশ্বারোহী সেনাদল পরিবেষ্টিত হইয়া জেনারেল ফ্রাঙ্কো ক্যাপিটাসিয়া প্রাসাদ ত্যাগ করিতেছেন

পোলণ্ড, রুমানিয়া ও গ্রীসের নিরাপত্তা রক্ষায় যে সোভিয়েট রুশিয়ার স্বার্থ নাই, তাহা নহে; কিন্তু ইহাতে বৃটেন্ ও ফ্রান্সের স্বার্থ রক্ষিত হইবে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। অথচ, সোভিয়েট রুশিয়ার সাহায্য ব্যতীত এই সকল রাষ্ট্রকে রক্ষা করা বৃটেন্ ও ফ্রান্সের পক্ষে অসম্ভব। এই জন্য তাঁহারা ঐ কয়েকটি রাষ্ট্র সম্পর্কে সোভিয়েট রুশিয়ার আশ্বাস চাহিয়াছেন। সোভিয়েট সীমান্তে বাল্টিক সাগরের তীরবর্ত্তী রাষ্ট্রগুলি আক্রান্ত হইলে বৃটেন্ ও ফ্রান্স নিষ্ক্রিয় থাকিবে; ইহাদিগের মধ্যে কোন একটি রাষ্ট্রের সীমান্ত অতিক্রম করিয়া ফ্যাসিষ্টবাহিনী যদি সোভিয়েট রুশিয়াকে আক্রমণ করে, তাহা হইলেও ইহারা নিশ্চেষ্ট থাকিবেন। অথচ ইহারা আশা করেন,—সোভিয়েট রুশিয়া ইহাদিগের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে পোলণ্ড, রুমানিয়া ও গ্রীসের জন্য বিব্রত হউক!

গত ২৩শে মে তারিখে মঃ মলটভ্ রুশ পার্লামেন্টের সমক্ষে বক্তৃতাকালে বৃটেন ও ফ্রান্স কর্ত্তৃক উত্থাপিত শেষ প্রস্তাব সম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছেন যে, সোভিয়েট রুশিয়ার উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের তিনটি রাষ্ট্র সম্পর্কে কোনরূপ প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় নাই; অথচ এই সকল রাষ্ট্রের পক্ষে আপনাদিগের নিরপেক্ষতা রক্ষা করা সম্ভবপর নহে। ইহা ব্যতীত, আক্রমণ-বিরোধী দলের প্রতি জাতি-সঙ্ঘের কতকগুলি বিধান প্রয়োগের চেষ্টার বিরুদ্ধেও মঃ মলটভ্ প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। সোভিয়েট রুশিয়ার এই আপত্তির উত্তরে মিঃ চেম্বারলেন গত ৭ই জুন তারিখে কমন্স সভায় বলিয়াছেন—যে সকল রাষ্ট্র আপনাদিগের নিরপেক্ষতা রক্ষার উদ্দেশ্যে আশ্বাস চাহে না, তাহাদিগকে আশ্বাস দান অসম্ভব। মিঃ চেম্বারলেন আশা করেন, এই প্রসঙ্গসংক্রান্ত অসুবিধা সত্বর দূরীভূত হইবে। তিনি ঘোষণা করিয়াছেন যে, এই আলোচনা সত্বর শেষ করিবার উদ্দেশ্যে বৃটিশ পররাষ্ট্রীয় দপ্তরের জনৈক প্রতিনিধি মস্কৌতে প্রেরিত হইবেন। জাতি-সঙ্ঘের ধারা প্রয়োগ সম্পর্কে মিঃ চেম্বারলেন কোন কথা বলেন নাই।

মঃ মলটভের বক্তৃতার উল্লিখিত তুইটি আপত্তি সুযুক্তিপূর্ণ। বর্ত্তমান যুগে কোন দুর্ব্বল রাষ্ট্র ইচ্ছা করিলেই নিরপেক্ষ থাকিতে পারে না; গত মহাযুদ্ধের সময় বেল্‌জিয়ামের দুর্দ্দশা, এই কথার সত্যতা প্রমাণ করিয়াছে। আজ বাল্টিক সাগরের পূর্ব্বতীরবর্ত্তী রাষ্ট্রগুলি জার্ম্মাণীর সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে বলিতেছে যে, তাহারা নিরপেক্ষ—আন্তর্জ্জাতিক দল গঠনে তাহারা কোন পক্ষে যোগ দিবে না। কিন্তু যে জার্ম্মাণী অষ্ট্রিয়া ও জেকোশ্লোভেকিয়া সম্পর্কে তাহার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়াছে—যে জার্ম্মাণী স্পেনের অন্তর্দ্বন্দ্ব সম্পর্কিত নিরপেক্ষতা সমিতির সদস্য হইয়াও স্পেনে নিয়মিতভাবে সৈন্য ও সমরোপকরণ প্রেরণ করিয়াছে, তাহার প্রতি কি বিশ্বাস স্থাপন করা সম্ভব? নিরপেক্ষ রাষ্ট্রকে কেহ আক্রমণ করিবে না, আন্তর্জ্জাতিক বিরোধে ঐ রাজ্যের মধ্য দিয়া কেহ সৈন্যপরিচালনা করিবে না—ইহাই রীতি। কিন্তু আন্তর্জ্জাতিক বিধান লঙ্ঘন করাই যে জার্ম্মাণীর বৈশিষ্ট্য, সে যে একদিন এই সকল নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের মধ্যে একটির উপর স্বীয় অধিকার বিস্তার করিয়া সোভিয়েটের সীমান্তে পৌঁছিবে না, অথবা ইহাদিগের কোন একটির মধ্য দিয়া সৈন্যপরিচালনা করিয়া সোভিয়েট রুশিয়াকে আক্রমণ করিবে না—তাহার নিশ্চয়তা কোথায়? জাতি-সঙ্ঘের বিধান-প্রয়োগ সম্পর্কে সোভিয়েট রুশিয়ার আপত্তিও অযৌক্তিক নহে। আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে প্রথমে অর্থনীতিক ব্যবস্থা এবং পরে সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বন সম্পর্কে জাতি-সঙ্ঘের বিধান কার্য্যে পরিণত করা কিরূপ দুরূহ, তাহা আবিসিনিয়া যুদ্ধের সময় প্রমাণিত হইয়াছে। এই সময় ইটালীর তৈল সরবরাহ বন্ধ করা হইবে কি হইবে না—ইহা লইয়া আট মাসকাল জল্পনা কল্পনা চলিয়াছিল। ইত্যবসরে ইটালীয় সৈন্য

বিমান হইতে বোমা বর্ষণ করিয়া শত সহস্র হাবসী নারী, শিশু ও বৃদ্ধকে যমালয়ে প্রেরণ করিয়াছিল, হাসপাতালে বোমা বর্ষণ করিয়া রুগ্ন হাবসীকে রোগযন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি দিয়াছিল, বিষবাষ্প ব্যবহার করিয়া শত শত হাবসীকে হস্তপদাদি-বিচ্ছিন্ন মাংসপিণ্ডে পরিণত করিয়াছিল!

সোভিয়েট রুশিয়ার সহিত চুক্তিবদ্ধ হইবার জন্য বৃটেন ও ফ্রান্সের যদি সত্যই আগ্রহ থাকে, তাহা হইলে মঃ মলটভ কর্তৃক উত্থাপিত আপত্তিগুলি উপেক্ষা করিলে চলিবে না। এই সম্পর্কে উত্তমরূপে বিবেচনা করিয়া প্রকৃত কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

জার্ম্মাণী—

এপ্রিল মাসের প্রথমে আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট স্বয়ং হার হিটলার ও সেনর মুসোলিনীর নিকট একখানি পত্র প্রেরণ করিয়া য়ুরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষা সম্বন্ধে তাঁহাদিগের নিকট হইতে আশ্বাস চাহিয়াছিলেন। এই পত্রের উত্তর দানের জন্য হার হিটলার রাইখস্ট্যাগের এক বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিয়াছিলেন। গত ২৮শে এপ্রিল তারিখে রাইখস্ট্যাগের এই অধিবেশনে হার হিট্‌লার বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন যে, জার্ম্মাণীর নিকট হইতে আশ্বাস গ্রহণের কোন প্রয়োজন নাই; কারণ, সে ইতঃপূর্ব্বে বিভিন্ন রাষ্ট্রকে ঐরূপ আশ্বাস প্রদান করিয়াছে। এই বক্তৃতায় হার হিটলার অত্যন্ত সংযতভাবে বিভিন্ন প্রসঙ্গের আলোচনা করিয়াছিলেন। বিশেষ করিয়া তিনি বৃটেনের অত্যধিক গুণকীর্ত্তন করেন; বৃটেনের সহিত তাঁহার কোন বিরোধ

হিট্‌লার

রুজভেল্ট

নাই, ইহা তিনি একাধিকবার উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হন নাই। ইঙ্গ-জার্ম্মাণ নৌচুক্তি বাতিল করিবার কারণ সম্পর্কে হার হিট্‌লার বলেন যে, বৃটেন কর্ত্তৃক পোলণ্ডকে আশ্বাস দানের পর ঐ চুক্তির অসারতা প্রমাণিত হইয়াছে। পোল্-জার্ম্মাণ অনাক্রমণাত্মক চুক্তি বাতিল হওয়া সম্পর্কেও ঐ একই কারণ প্রদর্শন করা হইয়াছে। হার হিট্‌লার এই বক্তৃতায় বৃটেন্‌কে পুনরায় স্বদলে আনয়ন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; আবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে ভীতি প্রদর্শনও করিয়াছিলেন।

হিট্‌লার বৃটেনের নিকট এই মিত্রতার আবেদন জানাইয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি বৃটেন্ ও সোভিয়েট রুশিয়ার সম্ভাবিত মিলনের বিরুদ্ধে শক্তিসঞ্চয়ে মনোযোগী হন। এই উদ্দেশ্যে ইটালী ও জার্ম্মাণীর মধ্যে অচ্ছেদ্য সামরিক ও রাজনৈতিক মিলন সাধনের ব্যবস্থা হয়। এই বিষয়ে জার্ম্মাণীর পররাষ্ট্রসচিব হার ভণ রিবেন্‌ট্রপ্ ও ইটালীর পররাষ্ট্র সচিব কাউণ্ট সিয়ানো মিলানে আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। জার্ম্মাণীর সামরিক কর্ম্মচারিগণ ইটালী ও আফ্রিকায় পরিভ্রমণ করিয়া সামরিক গুরুত্বসম্পন্ন স্থানগুলি পরীক্ষা করেন। যুদ্ধের সময় ইটালীয় সৈন্য যাহাতে জার্ম্মাণ-সেনানায়কের অধীনে কার্য্য করিতে পারে, জার্ম্মাণ-সেনাপতিগণ যাহাতে ইটালীর অধিকৃত বিভিন্ন অঞ্চলের সহিত সুপরিচিত থাকেন, তাহারও ব্যবস্থা হইয়াছিল। এই সকল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সুসম্পন্ন হইবার পর গত ২২শে মে ইটালো-জার্ম্মাণ সামরিক ও রাজনৈতিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে।

জার্ম্মাণীর আভ্যন্তরীণ অবস্থা এখন এইরূপ হইয়াছে যে, জার্ম্মাণী যদি অদূর ভবিষ্যতে কোন যুদ্ধে ব্যাপৃত না হয়, তাহা

হইলে হয় ত জার্ম্মাণ রাইখের মধ্যে অন্তর্বিপ্লবের সৃষ্টি হইবে। সম্প্রতি জার্ম্মাণীর রপ্তানী-বাণিজ্য অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে; একমাত্র বৃটেনে জার্ম্মাণীর রপ্তানী শতকরা ২৫ ভাগ হ্রাস পাইয়াছে। অষ্ট্রীয়া ও জেকোশ্লোভেকিয়ার রপ্তানী বাণিজ্যের দ্বারা জার্ম্মাণী উপকৃত হয় নাই; জার্ম্মাণ পণ্যের উপর শতকরা ২৫ ভাগ শুল্ক ধার্য্য করিয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এই বাণিজ্যের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে। বল্‌কান্ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে অনেকে জার্ম্মাণীর সহিত স্বেচ্ছায় অর্থনীতিক সম্বন্ধ স্থাপন করিতে চাহে না; কারণ, জার্ম্মাণীর "বিনিময়-প্রথায়" অনুন্নত দেশগুলির শ্রমশিল্প উন্নত হইতে পারে না। তাহার পর, জার্ম্মাণ রাইখের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন অঞ্চলে শ্রমিকদিগের মধ্যে বিক্ষোভ আরম্ভ হইয়াছে। এই সকল অবস্থা লক্ষ্য করিয়া অনেকে মনে করেন যে, অন্তর্বিপ্লব বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে জার্ম্মাণী হয় ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবে।

কাউণ্ট সিয়ানো

হার ভন্ রিবেনট্রপ

ইটালী—

আল্‌বেনিয়া অধিকারের পর ইটালী যুগোশ্লোভিয়াকে স্বদলে আনয়ন করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিল। তাহার সে চেষ্টা ফলবতী হইয়াছে। আল্‌বেনিয়া ইটালীর অধিকারভুক্ত হওয়ায় যুগোশ্লোভিয়া বহির্ব্বাণিজ্যসম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে ইটালীর প্রভাবাধীনে নিরুপায় হইয়া ইটালীর সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়াছে। পরে "কমিণ্টর্ণ-বিরোধী" দলে যোগদান করিয়াছে। যুগোশ্লোভিয়ার পর বুল্‌গেরিয়ার উপর "চাপ" দেওয়া হইতেছে। বুল্‌গেরিয়ার দোব্‌রুজা অঞ্চল রুমেনিয়ার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে; বুল্‌গেরিয়া উহা ফিরাইয়া পাইতে চাহে। ইহা ব্যতীত গ্রীসের মধ্য দিয়া ঈজিয়ান্ সাগরে প্রবেশ-পথ পাওয়াও বুল্‌গেরিয়ার আকাঙ্ক্ষা। তাহার এই দুইটি ইচ্ছা পূর্ণ না হওয়ায় সে বৃটেন্ ও ফ্রান্সের পক্ষে যোগ দিতে ইতস্ততঃ করিতেছে। এদিকে ইটালীর পক্ষে যুগোশ্লোভিয়াকে স্বদলভুক্ত করিবার পর বুল্‌গেরিয়াকে "চাপ" দেওয়া সহজ হইয়াছে। আল্‌বেনিয়া অধিকারের পর ইটালীর প্রধান কার্য্য ইটালো-জার্ম্মাণ সামরিক চুক্তি। এই চুক্তিতে বস্তুতঃ ইটালীতে জার্ম্মাণীর সামরিক প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

জার্ম্মাণ পদাতিক বাহিনী প্রেগ অধিকার করিতেছে

প্যালেষ্টাইন—

বর্ত্তমান বৎসরে ফেব্রুয়ারী মাসে প্যালেষ্টাইন সমস্যার সমাধানের জন্য লণ্ডনে যে সম্মিলনী আহূত হইয়াছিল, উহার উদ্দেশ্য বিফল হইবার পর ঐ সমস্যার সমাধানের ভার বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিয়াছিলেন। গত ১৭ই মে শ্বেতপত্রে প্যালেষ্টাইন সমস্যার সমাধান সম্পর্কিত বৃটিশ প্রস্তাব প্রকাশ পাইয়াছে। এই প্রস্তাবের প্রধান কথা এই—দশ বৎসরের মধ্যে প্যালেষ্টাইনকে স্বাধীন দেশে পরিণত করা হইবে; প্যালেষ্টাইনে বসবাস করিবার জন্য পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত ইহুদীগণ তথায় গমন করিতে পারিবে; তাহাদের সংখ্যা ৫,০০০-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হইবে। নূতন রাষ্ট্রটি বৃটেনের সহিত সন্ধিসূত্রে

আবদ্ধ থাকিবে; এই সন্ধির সর্ত্তে উভয় দেশের বাণিজ্যের প্রয়োজন ও সামরিক প্রয়োজন মিটাইবার ব্যবস্থা থাকিবে।

একমাত্র নাসাসিবির দল (নরমপন্থী) ব্যতীত অন্য কেহ—কি আরব কি ইহুদী—এই প্রস্তাবে সন্তুষ্ট হয় নাই। ইহুদীদিগকে বৃটেন্ প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, প্যালেষ্টাইনে তাঁহাদিগের স্থায়ী বসবাসের ব্যবস্থা হইবে। এই প্রস্তাবে সেই প্রতিশ্রুতি প্রতিপালিত হয় নাই। গত মহাযুদ্ধে আরবদিগকে স্বদলভুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে স্বাধীনতা দানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল, আজ এত কাল পরে বৃটেন্ আরবদিগকে বলিতেছেন—আরও দশ বৎসর অপেক্ষা কর! তাহার পর, ইহুদীদিগের নিকট জমি বিক্রয় বন্ধ করিবার জন্য আরবরা বহু দিন হইতে আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছে। এই আন্দোলনের উত্তরে বৃটিশ প্রস্তাবে সংক্ষেপে বলা হইয়াছে যে, জমি হস্তান্তর সম্পর্কিত সকল ক্ষমতা হাই কমিশনারকে দেওয়া হইল। এইরূপ প্রস্তাবে যে কোন পক্ষই সন্তুষ্ট হইবে না, ইহা স্বাভাবিক।

ইটালীর রাজা ইমানুয়েলকে আলবেনিয়ার রাজা বলিয়া স্বীকার করা হইতেছে

প্যালেষ্টাইনের সহিত বৃটেনের স্বার্থ গভীরভাবে বিজড়িত রহিয়াছে। বৃটেন্ প্যালেষ্টাইনের অশান্তির সুযোগ গ্রহণ করিয়া আরও দশ বৎসর সময় লইতে চেষ্টা করিতেছেন। এই দশ বৎসরের মধ্যে যদি আন্তর্জ্জাতিক অবস্থার পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, তাহা হইলে তখন প্যালেষ্টাইনকে স্বাধীনতা দান সম্পর্কিত এই প্রতিশ্রুতি আংশিকভাবে প্রতিপালিত হইতে পারে। কিন্তু আন্তর্জ্জাতিক অবস্থা যদি অপরিবর্ত্তিত থাকে, তাহা হইলে বৃটেন্ তখন প্যালেষ্টাইনকে স্বাধিকারে রাখিবার জন্য পুনরায় কারণ প্রদর্শন করিবেন। গত মহাযুদ্ধের সময় প্যালেষ্টাইনবাসী আরবদিগকে স্বাধীনতা দানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধাবসানের পর আবিষ্কৃত হয় যে, আরবগণ আপনাদিগের দেশ শাসনের অযোগ্য।

চীন-জাপান—

সম্প্রতি চীনের রণক্ষেত্রের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বিভিন্ন রণক্ষেত্রে চীনা সৈন্যের প্রতি-আক্রমণে জাপানী সৈন্য বিব্রত হইতেছে। উত্তর হোপী প্রদেশে চীনা সৈন্যের প্রতি-আক্রমণে জাপানী সৈন্যেরা অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। এনহুই প্রদেশে চীনা গরিলা সৈন্য অধিকাংশ হস্তচ্যুত অঞ্চল পুনরধিকার করিয়াছে—কেবল প্রধান প্রধান নগর ও রেলপথ জাপানীদিগের অধিকারভুক্ত রহিয়াছে। মার্শাল চিয়াং-কাইসেক ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, এই যুদ্ধ তিনটি স্তর অতিক্রম করিবে—প্রথমে জাপানী সৈন্যেরা জয়ী হইবে; পরে চীনা গরিলা সৈন্যের প্রতি-আক্রমণে জাপানী সৈন্য বিব্রত হইবে; পরিশেষে জাপানী সৈন্য চীন হইতে বহিষ্কৃত হইবে। বর্ত্তমান সময়ের অবস্থা দেখিয়া মনে হয়, সুদূর প্রাচীর যুদ্ধ দ্বিতীয় স্তরে পৌছিয়াছে।

মার্শাল চিয়াং কাইসেক

সম্প্রতি জাপান এময়ের নিকটবর্ত্তী কুলংসু দ্বীপে স্বীয় অধিকার বিস্তারের জন্য সচেষ্ট হইয়াছিল। অতি তুচ্ছ কারণে জাপানী সৈন্য এই দ্বীপে অবতরণ করে; সঙ্গে সঙ্গে জাপান ঐ দ্বীপের মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলের নিকট কতকগুলি দাবী উত্থাপন করে। বৃটেন্, ফ্রান্স ও আমেরিকার দৃঢ়তায় জাপান সেই দ্বীপ হইতে সৈন্য প্রত্যাহারে বাধ্য হইয়াছে; কুলংসুর মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলও জাপানের দাবী অগ্রাহ্য করিয়াছেন। জাপান কিছু কাল হইতে সাংহাই ও তিয়ান্‌সীনের মিউনিসিপ্যাল্ কাউন্সিলের উপর স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতে চেষ্টা করিতেছে। সাংহাই ও তিয়ান্‌সীন্ সংক্রান্ত উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিতে উদ্যত হইলে বৃটেন্, ফ্রান্স ও আমেরিকা কিরূপ মনোভাব গ্রহণ করিবে, তাহা জানিবার জন্যই কুলংসু সম্পর্কে জাপান এই চাল চলিয়াছিল। প্রতীচ্য শক্তিত্রয়ের দৃঢ়তায় জাপানের এই "চাল" ব্যর্থ হইয়াছে।

শ্রীঅতুল দত্ত।

গান্ধী-সুভাষ সম্বাদ
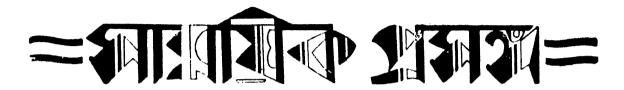
ত্রিপুরী কংগ্রেসের নির্ব্বাচিত সভাপতি শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুর সহিত মহাত্মা গান্ধীর যে সকল পত্র-ব্যবহার হইয়াছিল, গত বৈশাখ মাসের সংক্রান্তির দিন তাহা দৈনিক সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত হইয়াছে। যে ঘটনাচক্রের আবর্ত্তনফলে রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, এই পত্রগুলিতে তাহার কারণসম্বন্ধে অনেক কথারই আলোচনা হইয়াছিল। সেই জন্য এই পত্রগুলির প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক। পত্রগুলি পাঠ করিলে, অধিকাংশ সদস্যগণের ভোটে সুভাষবাবু সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন বলিয়া একদল কংগ্রেসওয়ালা কিরূপ হীন ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন, তাহা বেশ বুঝা যায়। পত্র এবং টেলিগ্রামের সংখ্যা অনেক ও সুদীর্ঘ। পত্রগুলি পড়িলে মনে হয় যে, সুভাষবাবু সকল কথাই তাঁহার রাজনীতিক গুরুজীর নিকট অকপটে নিবেদন করিয়াছিলেন, আর গুরুজীও বিচক্ষণ রাজনীতিকের মত অতি স্বল্প ভাষায় তাহার উত্তর দিয়াছিলেন। তিনি অনেক কথারই জবাব দেন নাই। তবে এই অভাবনীয় ব্যাপারে উভয়ের পত্রের ভাষায়, ভাবে পরস্পরের প্রতি কোন প্রকার উষ্মা, বিতৃষ্ণা, অপ্রীতি প্রকাশ পায় নাই। পরস্পর বেশ শ্রদ্ধার এবং অনুরাগের সহিত পত্রালাপ করিয়াছেন। সুভাষবাবুর প্রত্যেক পত্রেই গান্ধীজীর উপর হিন্দুজনোচিত গুরুভক্তি এবং অকপট শ্রদ্ধা পরিস্ফুট। গান্ধীজীর পত্রগুলিতে সুভাষবাবুর উপর প্রীতির ভাব প্রতিবিম্বিত। প্রায় তিন সপ্তাহকাল উভয়ের মধ্যে এই অপ্রীতিকর বিষয়ের মীমাংসার আশায় পত্র-ব্যবহার চলিয়াছিল। পত্রে মূলতঃ এবং প্রসঙ্গতঃ অনেক কথাই আলোচিত হইয়াছিল। স্বল্প স্থানে উহার সকল কথার আলোচনা সম্ভব হইবে না। তবে পত্রগুলি ভবিষ্যতে কংগ্রেসের ইতিহাসলেখকদিগের বিশেষ উপকারে আসিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পত্রগুলিতে স্থূলতঃ দুইটি বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে। প্রথমতঃ—কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতি গঠনের কথা, দ্বিতীয়তঃ—পণ্ডিত-পন্থের কংগ্রেসে উপস্থাপিত প্রস্তাবের কথা।

কার্য্যকরী সমিতিগঠনে অসুবিধা

যে ঘটনাচক্রের আবর্ত্তনে সুভাষবাবুকে পদত্যাগ করিতে হইয়াছিল, তাহা সকলেই জানেন, তাহার পুনরাবৃত্তি অনাবশ্যক। সুভাষবাবুর পীড়া এবং পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাব যে কার্য্যকরী সমিতিগঠনের অন্তরায় হইয়াছিল, তাহাও বিদিত ভুবনে। মহাত্মাজী রাজকোটের ব্যাপার লইয়া ব্যস্ত ছিলেন, সেই জন্য তিনি শয্যাগত সুভাষবাবুর সহিত জামাডোবায় সাক্ষাৎ করিতে যাইবার অবকাশ করিতে পারেন নাই। অগত্যা সুভাষবাবু টেলিগ্রাম এবং পত্র লিখিয়া মহাত্মাজীর মতানুবর্ত্তী হইয়া কার্য্যকরী সমিতি গঠন করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু মহাত্মাজী এ বিষয়ে সুভাষবাবুকে সাহায্য করিতে সম্মত হন নাই। তিনি সুভাষবাবুর অনেক কথার জবাবই দেন নাই। তবে পত্রপাঠে এই মাত্র জানা যায়, মহাত্মাজী একমতাবলম্বী অর্থাৎ রাষ্ট্রপতির সমমতাবলম্বীদিগকে লইয়া কার্য্যকরী সমিতি গঠিত করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। সুভাষবাবু বিভিন্নমতাবলম্বী লোক লইয়া উক্ত সমিতি গঠনের পক্ষপাতী ছিলেন, কাযেই ইহার কোন মীমাংসাই সম্ভব হয় নাই। মহাত্মাজী এ সম্বন্ধে অধিক কথা বলেন নাই। শেষকালে সুভাষবাবু মহাত্মাজীকে লিখিয়াছিলেন—"যদি শেষ পর্য্যন্ত আপনার এইরূপই ধারণা থাকে যে, মিশ্র-সমিতি লইয়া কায করা সম্ভব হইবে না, এবং একমতাবলম্বী সদস্য লইয়া কার্য্যকরী সমিতি গঠন করা ভিন্ন অন্য গতি নাই, অধিকন্তু আপনি যদি আমায় পছন্দমত সদস্য লইয়া আমাকে সমিতি গঠন করিতে বলেন, তাহা হইলে আগামী কংগ্রেসের অধিবেশনকাল পর্য্যন্ত আমার উপর আপনার আস্থা থাকিবে, একথা আপনাকে বলিতে হইবে, ইহাই আমার একান্ত অনুরোধ।" মহাত্মাজী এ কথার কোন উত্তরই দেন নাই। বলা বাহুল্য, ইহাতে অনেকেই বুঝিয়াছেন—সুভাষবাবুর উপর মহাত্মাজী আস্থাহীন। কেন আস্থাহীন, তাহাও তিনি বলেন নাই। সুভাষবাবু প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্তই বলিয়া আসিয়াছেন

যে, মহাত্মাজীর সহিত তাঁহার যে মতবিরোধ, তাহা মূল নীতিগত নহে। মহাত্মাজী তাঁহার একখানি পত্রে সুভাষবাবুকে লিখিয়াছেন,—"তুমি কি দেখিতেছ না যে, একই বস্তু তুমি এবং আমি ভিন্ন দিক্ দিয়া দেখিয়া থাকি, আমাদের সিদ্ধান্তও বিপরীত হইয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় আমরা কি করিয়া এক রাজনীতিক মঞ্চোপোরি সম্মিলিত হইতে পারি? অতএব আমরা যদি পরস্পর রাজনীতিক বিষয়ে ভিন্নমতই হইয়া থাকি, তবে সামাজিক, নৈতিক এবং মিউনিসিপ্যাল বা নাগরিক ব্যাপারে আমরা একযোগে কার্য্য করিতে পারিব। অর্থনৈতিক ব্যাপারের কথা আমি বলিলাম না, —কারণ, ঐ বিষয়ে আমাদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে, ইহা আমরা বুঝিয়াছি।" গান্ধীজীর এই উক্তি পড়িলেই মনে হয় যে, রাজনীতিক বিষয়ে তাঁহার সহিত সুভাষবাবু সম্পূর্ণ ভিন্নমত। সে মতভেদ এত অধিক যে, তাঁহারা উভয়ে একমত হইয়া কার্য্য করিতে একেবারেই অক্ষম। সুভাষবাবু ত্রিপুরী কংগ্রেসে বৃটিশ সরকারকে চরম পত্র দিয়া যে সার্ব্বজনীনভাবে আইনভঙ্গ আন্দোলনের প্রবর্ত্তন করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহার সহিত গান্ধীজীর মতভেদ ঘটিয়াছিল। মহাত্মাজী সুভাষবাবুকে লিখিয়াছেন—"তুমি যে লিখিয়াছ, দেশ এখন যেরূপ অহিংস হইয়াছে, পূর্ব্বে আর কখনই সেরূপ অহিংস হয় নাই। সে কথা আমি কোনমতেই স্বীকার করিতে পারিতেছি না। আমি যে নিশ্বাস গ্রহণ করিতেছি, তাহাতেই আমি হিংসার গন্ধ পাইতেছি—হিংসা অতিশয় সূক্ষ্ম আকার ধারণ করিয়াছে। আমরা পরস্পরে পরস্পরের প্রতি যে অবিশ্বাস পোষণ করি, তাহাও এক প্রকার হিংসা। হিন্দু-মুসলমানে বিবাদ যে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে হিংসার অস্তিত্বের পরিচয় দিতেছে। * * * এরূপ অবস্থায় আমি অহিংস আন্দোলনের অনুকূল কোনরূপ পরিস্থিতি দেখিতে পাইতেছি না। চরম পত্রের পশ্চাতে যদি প্রবল সমর্থন না থাকে, তাহা হইলে তাহা কখনই সফল হইবে না। * * * আমি দৃঢ়ভাবে এই বিশ্বাস পোষণ করি যে, বর্ত্তমান অবস্থায় কংগ্রেস আইন অমান্য আন্দোলন প্রবর্ত্তিত করিতে পারে না। তোমার কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আমি বুঝিব যে, আমি সেকেলে হইয়া পড়িয়াছি এবং আমার কার্য্য শেষ হইয়াছে।" ইহাতে বোধ হয় যে, পূর্ণ স্বরাজের দাবী পেশ করিলে সরকার যদি তাহা দিতে অসম্মত হন, তাহা হইলে সুভাষ বাবু আইন অমান্য আন্দোলন উপস্থিত করিবার যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহা এবং অন্যান্য বিষয় লইয়া মহাত্মাজীর সহিত সুভাষবাবুর বিলক্ষণ মতভেদ ঘটিয়াছিল। কিন্তু এইরূপ মতভেদ স্বাভাবিক। কংগ্রেস যখন ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করেন নাই,—তখন ঐ প্রস্তাব ত পরিত্যক্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। কংগ্রেস-প্রেসিডেণ্ট এই প্রস্তাব আর এক বৎসরকাল গ্রহণ করিতে পারিবেন না। বিশেষতঃ দেশের অধিকাংশ ব্যক্তিই এই বিষয়ে সুভাষ বাবুর সহিত ভিন্নমত।

পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাব

কংগ্রেসের সভাপতি-সম্পর্কিত ব্যাপারেই যে পন্থের গৃহীত প্রস্তাবই বিশেষ অনর্থের সৃষ্টি করিয়াছিল, এ বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত। গান্ধী-সুভাষ পত্রব্যবহারেও একথার বিশেষ আলোচনা হইয়া গিয়াছে। এই প্রস্তাব কংগ্রেসে উপস্থিত করা এবং কংগ্রেসে গ্রহণ করা যে কংগ্রেসের বৈধ অধিকারের বহির্ভূত (ultravires) হইয়াছিল, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ থাকিতে পারে না। যিনি যত মহৎ হউন, তিনি যদি কংগ্রেসের চারি আনা চাঁদা-দাতা সদস্যও না হন, তাহা হইলে তাঁহার হস্তে কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতি গঠনের একমাত্র অধিকার দেওয়া কখনই গণতন্ত্রের সমর্থনযোগ্য নহে। তাহার উপর যদি ঐ প্রস্তাব গান্ধীজীর সম্পূর্ণ সমর্থন ব্যতীত কংগ্রেসে উপস্থাপিত এবং গৃহীত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহা কিছুই নহে। উহাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করাই কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু গান্ধীজীর সম্পূর্ণ জ্ঞাতসারে —অনুমোদন অনুসারে পন্থ-প্রস্তাব ত্রিপুরী কংগ্রেসে উপস্থাপিত হইয়াছে বলিয়াই গান্ধীপন্থীরা যে ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাহা সকলেরই স্মরণ আছে। সুভাষবাবু সে কথা পত্রে মহাত্মাজীকে লিখিয়াছিলেন। পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাবসম্বন্ধে ত্রিপুরী হইতে রাজকোটে টেলিফোনযোগে সংবাদ আদান-প্রদান হইয়াছিল বলিয়াও ত্রিপুরীতে সংবাদ প্রচারিত হইয়াছিল। পন্থের প্রস্তাব হইতে একটি কথা বাদ দিলে মহাত্মাজী তাহাতে সন্তুষ্ট হইবেন না বলিয়াও রটনা করা হইয়াছিল। এইরূপ গুজব স্বার্থপর

পক্ষ ভিন্ন অন্য কেহ রটাইতে পারে না বলিয়াই অনেকের বিশ্বাস। অন্ততঃ যাঁহারা জানিয়া শুনিয়া ঐ গুজবের প্রতিবাদ করেন নাই, তাঁহারাও তুল্য অপরাধে অপরাধী। যাহারা রাজনীতিক অভিপ্রায়সিদ্ধির জন্য সত্যাগ্রহ করেন, ইহা কি তাঁহাদের সত্যনিষ্ঠার পরিচায়ক? কিন্তু গান্ধী-সুভাষ পত্রব্যবহারে প্রকাশ, রাজকোটে মহাত্মাজী এই প্রস্তাব সম্বন্ধে কোন কথাই জানিতে পারেন নাই। মহাত্মাজীর পত্রে ইহাই স্পষ্ট ভাষায় বলা হইয়াছে যে, ত্রিপুরীতে কেবলমাত্র পদত্যাগী কার্য্যকরী সমিতির উপর পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হইতেছে। তিনি তাহাতে বলিয়াছিলেন, 'ভালই হইতেছে।' তিনি তাঁহার পত্রে লিখিয়াছেন যে, তিনি এলাহাবাদে আসিয়া পন্থের প্রস্তাব দেখিয়াছিলেন। তাহার পূর্ব্বে তিনি ঐ প্রস্তাব দেখেন নাই। সুভাষবাবুও ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি একাধিক পত্রে মহাত্মাজীকে ঐ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে থাকেন। শেষে মহাত্মাজী সুভাষবাবুকে লিখিয়াছিলেন,—Pandit Pant's resolution I cannot interpret. The more I study it the more I dislike it. অর্থাৎ "আমি পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাবের ব্যাখ্যা করিতে পারি না। আমি উহা যতই মনোযোগসহকারে পড়িতেছি, ততই উহার উপর আমার বিতৃষ্ণা জন্মিতেছে।" কেন তিনি উহার ব্যাখ্যা করিতে পারেন না, আর কেনই বা তিনি যত উহার মর্ম্মোদ্ঘাটন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, ততই ঐ প্রস্তাবের উপর তিনি বীতশ্রদ্ধ হইয়াছেন, তাহা তিনি বলেন নাই। তিনি যদি সে কথা খুলিয়া বলিতেন, তাহা হইলে অনেক কথা বুঝা যাইত। মহাত্মাজী ঐ কথা বলিয়াই বলিয়াছেন যে, "যাহারা এই প্রস্তাব রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্য ভাল। কিন্তু উহা বর্ত্তমান সমস্যার সমাধান করিতে অসমর্থ।" মহাত্মাজী উহার মর্ম্ম বুঝাইতে অসমর্থ; কিন্তু যাহাদের কূটবুদ্ধি হইতে ঐ প্রস্তাব বাহির হইয়াছে, তাহাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সার্টিফিকেট দিতে খুব তৎপর। সুভাষবাবু মহাত্মাজীকে বার বার জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, পন্থের ঐ প্রস্তাব কংগ্রেসের বৈধ অধিকার-বহির্ভূত হইয়াছে কি না? মহাত্মাজী সরলভাবে তাহার কোন উত্তর দেন নাই। তিনি সুভাষবাবুকে কেবলই বলিতেছেন যে, "তুমি যখন বুঝিতেছ, পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাব ঠিক বিধিসঙ্গত হয় নাই এবং কার্য্যকরী সমিতি সম্পর্কিত দফাটি অবৈধ এবং বে-বনিয়াদ, তখন তোমার পন্থা সম্পূর্ণ পরিষ্কার। কার্য্যকরী সমিতিতে তোমার মনোমত সদস্য গ্রহণে কোন বাধা নাই।" কিন্তু সুভাষবাবুর স্পষ্ট জিজ্ঞাসা সত্ত্বেও পন্থের প্রস্তাব নিয়মবহির্ভূত এবং অধিকার-বহির্ভূত কি না, সে বিষয়ে তিনি একটি কথাও বলেন নাই। তিনিই বর্ত্তমান কংগ্রেসের নিয়ম কানুন করিয়াছেন, সুতরাং তিনিই এই বিষয়ে অভিমত দিতে পারিতেন। এলাহাবাদে আসিয়াই যদি তিনি প্রস্তাবটি প্রথম দেখিয়া থাকেন, তাহা হইলে সেই সময়ই উহার প্রতিবাদ করেন নাই কেন? তিনি যদি তাহা করিতেন, তাহা হইলে ব্যাপারটা এতদূর গড়াইত কি? আর যাহারা তাঁহার মত না লইয়াও তাঁহার স্কন্ধে একটা গুরু কার্য্যভার চাপাইয়াছেন, তাঁহাদিগকেও ত তিনি একটা কথা বলার প্রয়োজন বোধ করিলেন না; বরং সার্টিফিকেট দিয়াছেন।

এই পন্থ-প্রস্তাবে কি হিংসা সূক্ষ্মাকারে লুকাইয়া নাই? ব্যাপারটা আগাগোড়াই রহস্যময়।

রাজকোট

বিচারপতি গাওয়ারের সিদ্ধান্তের ফলে মহাত্মা গান্ধী রাজকোট সত্যাগ্রহের যে সুবিধা পাইয়াছিলেন, তাহা তিনি স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি কেবল রাজকোটে সত্যাগ্রহের ফলপ্রাপ্তি কালেই উহা বর্জ্জন করেন নাই,—ত্রিবাঙ্কুর, কচ্ছ এবং ঢেনকেনালের রাষ্ট্রীয় প্রজাবর্গের আন্দোলনও বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে নানা দিক্ হইতে বিক্ষোভের উদ্ভব হইয়াছে। রাজকোট-দরবারে গান্ধীজী যথেষ্ট সম্মান সম্বর্দ্ধনা লাভ করিয়াছেন। তিনি গত ১৯শে চৈত্র সুভাষবাবুকে লিখিয়াছিলেন—"এই ব্যাপার সম্বন্ধে আমি যে উপায় অবলম্বন করিয়াছি, তাহার জন্য আমার অনুশোচনার কারণ নাই। আমি জাতীয়তার দিক্ দিয়া উহা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মনে করি।" ৬ই জ্যৈষ্ঠ 'হরিজন পত্রে' তিনি লিখিয়াছেন, ৩রা জ্যৈষ্ঠ সন্ধ্যাকালে তিনি তাঁহার সহকর্ম্মীদিগের সহিত আলোচনা কালে বুঝিতে পারেন, তাঁহার ঐ কার্য্যে যে সকল সুবিধা তিনি পাইয়াছেন, তাহা অহিংস উপায়ে লব্ধ নহে। অতএব তিনি

উহা সমস্তই পরিহার করিবেন। কারণ, তাঁহার অবলম্বিত কার্য্য হিংসাদিগ্ধ ছিল। তিনি বুঝিয়াছেন, তাঁহার উপবাসে মণ্ডলেশ্বর শক্তি ঠাকুর সাহেবকে প্রতিশ্রুতি পালন করাইবার জন্য যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাহাতে বল-প্রয়োগের লক্ষণ প্রকটিত। উহা অহিংসার পথ নহে। তাঁহার উপবাস পূর্ণমাত্রায় অহিংস হইত, যদি তাহা কেবল ঠাকুর সাহেবের অথবা দরবার বীরওয়ালার হৃদয়কে দ্রবীভূত করিবার জন্য বিনিযুক্ত হইত। তাহা যখন হয় নাই, তখন উহা হিংসাকলুষিত, অতএব উহার ফল তিনি গ্রহণ করিবেন না। তাঁহার ভ্রান্তির ফলে তিনি যে বহু লোককে কষ্ট দিয়াছেন, সে জন্য তিনি লর্ড লিনলিথগো, সার মরিস গাওয়ার, দরবার বীরওয়ালা এবং ঠাকুর সাহেবের নিকট ত্রুটি স্বীকার করিয়াছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি তাঁহার অভীপ্সিত ফল হস্তগত হইতে বসিয়াছে দেখিয়া যখন বুঝিয়াছেন যে, তাঁহার প্রযুক্ত উপায় অনাবিল অহিংস নহে, তখন তিনি সে ফল ত্যাগ করিলেন। ইহাতে সকলে চমকিত। তিনি যে যুক্তি দিয়াছেন, সে যুক্তি অখণ্ডনীয় এবং সত্য। কিন্তু রাজনীতি ক্ষেত্রে তাঁহার এই যুক্তি সকলে বুঝিবে কি? রাজনীতির কথা এই যে, উদ্দেশ্য উপায়কে পবিত্র করে। নৈতিক দৃষ্টিতে উপায় যতই মলিন হউক না কেন, উহা যদি সাধু উদ্দেশ্য সাধনে পরিচালিত হয়, তাহা হইলে উহাই নিষ্কলঙ্ক বলিয়া মানিতে হইবে। কাজেই মহাত্মাজীর রাজকোটের ব্যাপার সমস্তই বরবাদ হইল। রাজনীতিক মহল ইহাতে বিক্ষুব্ধ হইয়াছে। সেই জন্য গুজরাটের কংগ্রেস-সমাজতন্ত্রী দলের সেক্রেটারী এবং সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়ান ষ্টেটস্ পীপল্ সমিতির ভাইস প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুত কমলশঙ্কর পাণ্ডে নৈরাশ্যজনিত আক্রোশে বলিয়াছেন যে, "আমাদের দেশের সর্ব্বপ্রধান নেতা আজ যে ভাব প্রকটিত করিয়াছেন, তাহার সহিত আমাদের জাতীয় মহত্ত্বের এবং সম্মানের সামঞ্জস্য সাধন করা যায় না। রাজকোটে দুইটি সত্যাগ্রহের যে ফললাভ হইয়াছিল, অহিংসার নামে তাহা বিলাইয়া দেওয়া হইল। এখন সর্ব্বত্রই পূর্ব্বতন গান্ধীবাদ পরাজিত হইয়া নিয়মতান্ত্রিকতার মধ্যে আবদ্ধ হইতেছে; তাহার বৈপ্লবিক ভাব আজ নিষ্প্রভ। এখন সকল দিকে ত্যাগ স্বীকার এবং বৈপ্লবিক সুর পরিহার করাই গান্ধীজীর বর্ত্তমান উক্তির প্রধান উদ্দেশ্য।" তিনি আরও বলিয়াছেন, "ভারতীয় রাষ্ট্রগুলিতে আন্দোলন রহিত করার ফলে যে উৎসাহহীনতা প্রকট হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে প্রতিক্রিয়াশীল দলই জয়যুক্ত হইয়া উঠিতেছেন। গান্ধীজীর উক্তি সামন্তরাজ্যের আন্দোলন চূর্ণ করিয়া দিবে। এখন রাজন্যশাসিত প্রদেশগুলি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পতিত হইল।" যাহারা এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহারা কি গান্ধীজীর অহিংসানীতির যথার্থ মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন? অহিংসা নির্ম্মল হইলে তাহাই কেবল ফলপ্রসূ, ইহা কি অনেকেরই ধারণাতীত নহে? অহিংসার মর্য্যাদা কয় জন বুঝে? এখন কি আশা করা যায়, রাজকোটের ব্যাপার দেখিয়া সামন্ত-রাজগণ তাঁহাদের রাজ্যের শাসনসংস্কার প্রবর্ত্তিত করিবেন?

অগ্রগামী দল

সুভাষবাবু কংগ্রেসের মধ্যেই প্রগতিশীলসঙ্ঘ নামে নূতন দল সংগঠন করিতেছেন। এই অগ্রগামী দলের সবাই যে সকল বিষয়ে একমত হইবেন, এমন কোন কথা নাই। সেই জন্য তিনি এই দলের নাম Forward bloc বলিয়াছেন। Bloc বলিলে দুই কিম্বা তিন সম্প্রদায়ের সম্মিলনকেই বুঝায়। ইংরেজীতে রাজনীতিক পরিভাষায় Bloc এবং Party ঠিক একার্থবোধক নহে। এই দল সংগঠিত হওয়ায় নৈষ্ঠিক গান্ধীভক্তদল ঘোর আপত্তি তুলিয়াছেন। অনেকে সংবাদপত্রে ইহাতে আপত্তি প্রকাশও করিতেছেন। কিন্তু নূতন দল গঠনে আপত্তি করিবার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ নাই। কংগ্রেসেই যখন স্বরাজী, পরিবর্ত্তন-বিরোধী, সমাজতন্ত্রী, বামপন্থী, দক্ষিণপন্থী প্রভৃতি নানা সম্প্রদায় বিদ্যমান, তখন বোঝার উপর শাকের আটি চাপাইতে আবার আপত্তি কেন?

তবে ফরওয়ার্ড ব্লক—"প্রগতিসঙ্ঘের" যে কার্য্যপদ্ধতি সুভাষবাবু বিবৃত করিয়াছেন,—আমরা সে সম্বন্ধে তাঁহার সকল নির্দ্দেশের সহিত একমত নহি। তিনি অবশ্য বলিয়াছেন যে, এই দলের কর্ম্মসূচি অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে হইবে। ৩রা জ্যৈষ্ঠ তিনি কানপুরে সাংবাদিকদিগের সভায় বলিয়াছেন,—সিভিল ডিস্ওবিডিয়ান্স

আইন অমান্য আন্দোলনের অনুরূপ সংগ্রাম চালাইতে হইবে। সেই আইনভঙ্গ আন্দোলনে কৃষক কর্ম্মী এবং সামন্ত রাজ্যের জনসাধারণ সঙ্ঘবদ্ধভাবে যোগ দিবেন। কিন্তু মহাত্মাজীর নেতৃত্বে অহিংস আইন অমান্য আন্দোলন ব্যর্থ হইবার পর এই পরিকল্পনা সার্থক হইবার সম্ভাবনা আছে কি? দেশ এখন এতটা প্রস্তুত—হিংসাশূন্য হইয়াছে কি যে, এখনই আইনভঙ্গ আন্দোলন অবলম্বিত হইতে পারে? সুভাষবাবু বলিয়াছেন যে, কংগ্রেসে বহু মিলনের প্রস্তাব গৃহীত হওয়া সত্ত্বেও এ পর্য্যন্ত হিন্দুমুসলমানে মিলন সম্ভব হয় নাই। "প্রগতিশীল সঙ্ঘ" গঠিত হইয়াছে বলিয়া সংখ্যাল্প সম্প্রদায় খুব আনন্দিত হইয়াছেন। সেই জন্য তিনি আশা করেন যে, প্রগতিশীল সঙ্ঘের সহায়তায় সাম্প্রদায়িক ঐক্য স্থাপন করিতে সমর্থ হইবেন। কিন্তু ইহা তাঁহার বৃথা আশা। তিনি অবশ্যই অবগত আছেন যে, চুক্তি বা পরস্পর নিষ্পত্তি দ্বারা এই বিষয়ের মীমাংসা হইতেই পারে না। লক্ষ্ণৌ-প্যাক্ট হইতে তাহা বেশ বুঝা গিয়াছে। পুণা-প্যাক্টের ফল তিনি দেখিতেছেন: তবে তিনি কোন্ উপায়ে এই জটিল সমস্যার সমাধান করিতে চাহেন? আশা করি, তিনি সমস্যাটির গুরুত্ব অনুভব করিয়াছেন। ভারতে মোটের উপর মুসলমানসম্প্রদায় সংখ্যায় অল্প। সে জন্যই কি সুভাষচন্দ্র নিখিল ভারতের সর্ব্বত্রই মুসলমানদিগকে স্থানীয় অবস্থা নির্ব্বিশেষে সংখ্যাল্প সম্প্রদায় মনে করিয়াছেন? বাঙ্গালায় এবং পঞ্চনদে হিন্দুরা সংখ্যাল্প। এই দুই প্রদেশে যে বিশেষ সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, তাহা সমাধানের তিনি কি উপায় স্থির করিয়াছেন বা করিবেন?

তিনি বলিয়াছেন, কংগ্রেস সরকারী কার্য্য গ্রহণ করিবার পর উহার বিপ্লবসাধক মনোভাব (rovolutionary mentality) কমিয়া গিয়াছে। বিপ্লবাত্মক মনোভাব বলিতে কি বুঝায়? এই প্রশ্নের উত্তরে সুভাষবাবু বলিয়াছেন, উহার দুইটা দিক্ আছে। একটি ধ্বংস, অন্যটি গঠন। তিনি বলিয়াছেন, রুশিয়ায় কমিউনিজম এবং আয়ার্লণ্ডে সমাজতন্ত্রবাদ অনেক কিছু গঠন করিয়াছে; "বিপ্লব বলিলেই যে রক্তপাত বুঝাইবে, ইহার কোন অর্থ নাই; ইংলণ্ড বহু রক্তপাতহীন বিপ্লবের দ্বারা প্রগতির পথে অনেক অগ্রসর হইয়াছে।" রক্তপাতহীন বিপ্লব যে ঘটে না, এমন কথা আমরা বলিতেছি না। কিন্তু কোন দেশের সমস্ত বিপ্লব কি রক্তপাতহীন এবং অহিংস হইয়াছে? যে বিপ্লবের ফলে প্রথম চার্লসের স্বৈরিতাপূর্ণ শাসনের অবসান হইয়াছিল, তাহা কি রক্তপাতহীন ও হিংসাশূন্য হইয়াছিল? রুশিয়ায় যে বিপ্লবের ফলে জারের সিংহাসন মেরুতুষারে সমাহিত করিয়া রুশিয়ায় কমিউনিজমের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহা কি অহিংস হইয়াছিল? অহিংসার পথে বিপ্লব চালাইতে হইলে অশেষ ধৈর্য্য এবং তিতিক্ষার প্রয়োজন। ইহার জন্য লোকের মনে পূর্ণ অহিংসার ভাব ফুটাইয়া তুলিতে হয়—ফললাভে বিলম্ব ঘটে, সেজন্য অধৈর্য্য হইলে চলিবে না। সুভাষবাবু কি মনে করেন, দেশের লোক নৈতিক পথে এতদূর অগ্রসর হইয়াছে যে, তাহারা অহিংস বিপ্লববাদে অবিচলিত থাকিতে সমর্থ হইবে? আমরা তাহা মনে করি না। সেই জন্য আমরা তাঁহার এই অভিমতের সমর্থন করিতে পারিলাম না। আশা করি, সুভাষবাবু আইন অমান্য আন্দোলনের নির্দ্দেশ প্রদানের পূর্ব্বে বিশেষ করিয়া ভাবিয়া দেখিবেন।

হায়দ্রাবাদে সত্যাগ্রহ

হিন্দুর অধিকার-রক্ষার্থ হায়দ্রাবাদে সত্যাগ্রহ চলিতেছে। এই সত্যাগ্রহীদিগের সর্ব্বনিম্ন দাবী কি, তাহা মহাশয় কৃষ্ণ বিশেষ বিবৃতিতে বলিয়াছেন,—আর্য্যসমাজীরা নিজাম বাহাদুরের বা মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করে নাই। তাহারা হিন্দু এবং অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের ধর্ম্ম, নীতি এবং সংস্কৃতি সম্পর্কিত অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্যই সত্যাগ্রহ করিতেছেন। তাঁহাদের নিম্নতম দাবী:—

(১) অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণের মনোভাবের উপর সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক বৈদিক ধর্ম্ম এবং সংস্কৃতি প্রচার বিষয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হইবে।

(২) অন্যের অনুমতি না লইয়া নূতন আর্য্যসমাজ-গৃহ, মন্দির, যজ্ঞশালা, হবনকুণ্ডপ্রতিষ্ঠা এবং পুরাতনগুলির সংস্কারের স্বাধীন অধিকার দিতে হইবে।

উপসংহারে তিনি বলিয়াছেন, হায়দ্রাবাদে এ পর্য্যন্ত ৭ হাজার স্বেচ্ছাসেবক ধরা পড়িয়াছেন। তন্মধ্যে কেবলমাত্র শতকরা ৭ জন ঐ রাজ্যের লোক। যত দিন হিন্দু ও আর্য্যসমাজীদিগের মৌলিক অধিকারগুলি পাওয়া না

যাইবে, তত দিন তাঁহারা সত্যাগ্রহ চালাইয়া যাইবেন। আর্য্যসমাজীদিগের অধিকারের ন্যায় হিন্দু এবং অন্য সম্প্রদায়ের অধিকার রক্ষার জন্যও তাঁহারা চেষ্টা করিবেন। আর্য্যসত্যাগ্রহীদিগের এই দাবী খুবই ন্যায়সঙ্গত, তাহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। কোন রাষ্ট্রপতিরই দেশবাসীর ধর্ম্মসম্পর্কিত অধিকারে হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা থাকা সঙ্গত নহে,—ইহা বর্ত্তমান যুগের সমস্ত সভ্যদেশের সুধীজনসঙ্গত মত। দেশীয় খৃষ্টানগণও এই সত্যাগ্রহে যোগদান করিবেন।

হিন্দু মহাসভার সভাপতি শ্রীযুত সাভারকার ঘোষণা করিয়াছেন, হায়দ্রাবাদের সত্যাগ্রহ সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিতে দেখা কর্ত্তব্য নহে। প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক দোষদর্শিতার ও নির্ব্বুদ্ধিতার ফলে সাধারণের এই চেষ্টায় বাধা দেওয়া কোনক্রমেই উচিত নহে। সমস্ত হিন্দুসমাজের পক্ষ হইতে সম্মিলিতভাবে এই আন্দোলনে সত্বর যোগদান করা বিধেয়। হায়দ্রাবাদের নিজাম এই সত্যাগ্রহের প্রতিকারকল্পে একটি ষ্ট্যাটিউটারী কমিটী নিযুক্ত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। তাহাতে হিন্দু, মুসলমান এবং পার্শী সম্প্রদায়ের সদস্য থাকিবেন, এক জন খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী দরবারের কর্ম্মচারী উহার সভাপতি হইবেন। এখন কমিটী গঠিত না হইলে কিছুই বুঝা যাইতেছে না।

পাবনা জিলা রাষ্ট্রীয় সম্মেলন

২০শে জ্যৈষ্ঠ পাবনা হিমাইতপুরে পাবনা জিলার রাষ্ট্রীয় সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। এবার পাবনা জিলা সম্মেলনের অধিবেশন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে সুরাট কংগ্রেসের পর স্বর্গীয় বালগঙ্গাধর তিলক এবং শ্রীযুত অরবিন্দ ঘোষের নেতৃত্বে কংগ্রেসের তরুণদল তূর্য্যনিনাদে যেমন এক নবীন চরমপন্থীদলের অভ্যুত্থান ঘোষণা করিয়াছিলেন, এবারও ত্রিপুরী কংগ্রেসের পর সেইরূপ 'ফরওয়ার্ড ব্লক'—অগ্রগামী দলের আবির্ভাব সম্ভাবিত হইয়াছে। সুরাটে কংগ্রেস ভঙ্গের পর স্বর্গীয় আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিত্বে ও কবীন্দ্র শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে পাবনায় প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন হইয়াছিল। সেই অধিবেশনে মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা মহাশয়ের ওজস্বিনী বক্তৃতায় জাতীয়দল-আকাঙ্ক্ষিত স্বরাজের আদর্শ সমবেত জনগণের সমর্থন লাভ করিয়াছিল। সেই সভায় দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনন্য-সাধারণ বাগ্মিতাও নিষ্ফল হইয়াছিল—মডারেট-মনোভাব সমর্থিত হয় নাই। জাতীয়দলের—চরমপন্থীদলের সে দিনের জয় বাঙ্গালীর জয়যাত্রার রণভেরীর আহ্বান। এবারও তেমনই পাবনার রাষ্ট্রীয় সভায় সভাপতি শ্রীযুত শরৎচন্দ্রের ঘোষণায় 'ফরওয়ার্ড ব্লক' সংগঠনের প্রস্তাব তরুণ বাঙ্গালার জয়োল্লাসে সমর্থিত হইয়াছে। শরৎবাবু তাঁহার অভিভাষণে বর্ত্তমান

শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু

কংগ্রেসের অনাচারের কথা বিশেষ ভাবে বলিতেও বিস্মৃত হন নাই। হিন্দু-অহিন্দু নির্ব্বিশেষে সমস্ত বঙ্গবাসী আজ যে জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছেন, সে সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, "বাঙ্গালার ভদ্রসমাজ জীবিকার প্রশ্ন-সমাধানে বিভ্রান্ত এবং হতবুদ্ধি। দারিদ্র্য ও ঋণজালে কৃষক মুমূর্ষু। শিক্ষা, সমাজ এবং ধর্ম্মের ক্ষেত্রে সকল দিক্ হইতে পুরাতন কাঠামো ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে—অথচ নূতন জীবনের পাকা বনিয়াদও গাঁথা হইতেছে না। এ সকল গুরুতর ভাবনার এবং আশঙ্কার কথা।" শরৎবাবু যথাযথ ভাবেই সমস্যা

নির্ণয় করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, "আমাদের প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সভা এই সমস্যাসমাধানের কোন নির্দ্দেশ দিতে পারেন নাই।" ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের শাসনসংস্কার আইন অনুসারে বাঙ্গালার যে অনুপম মন্ত্রিমণ্ডলী গঠিত হইয়াছে, কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহাদের অপরূপ কৃতিত্ব প্রকটিত। সভাপতি তাঁহাদের কীর্ত্তিকলাপের কথঞ্চিৎ পরিচয় দিয়াছেন। বাঙ্গালার মন্ত্রিসভার মনোবৃত্তি যে সাবেক ব্যুরোক্র্যাটিক মনোবৃত্তির অনুরূপ, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। তিনি আরও বলিয়াছেন, "এই জাতীয়তার যুগে যখন জাতি ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকল ভারতবাসীকে এক করিবার চেষ্টা চলিতেছে—যখন ভারতের বাহিরে অবস্থিত সমস্ত মুসলমান দেশসমূহে জাতীয়তা মুসলমানত্বকে অতিক্রম করিয়া উপরে উঠিতেছে, তখনও যে কেহ এই যুগবিরোধী সাম্প্রদায়িকতাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে পারে, ইহা যেন বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না।" তাঁহার অভিভাষণ সরকারী চাকুরীর ভাগ-বাটোয়ারা, ফেডারেশন গ্রহণে আপত্তি প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় কথায় পূর্ণ। তিনি কংগ্রেসের বর্ত্তমান পরিচালকগণের মনোবৃত্তির এবং আদর্শভ্রষ্টতার কথা বলিতে ভুলেন নাই।

উপসংহারে শরৎ বাবু 'অগ্রগামীদল' সংগঠন সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—

"স্বাধীনতা লাভ করিতে হইলে এবং ভারতবর্ষের জনগণের জীবনযাত্রায় ন্যায় ও কল্যাণকে সর্ব্বতোভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে আমাদের রাজনৈতিক কর্ম্মীদিগকে আরও সংহত হইতে হইবে, ইহাও প্রগতিকামীদের অভিমত। ইহার জন্য শুধু কংগ্রেস-কমিটী গঠন করিলেই চলিবে না, একটা কর্ম্মীবাহিনী গঠন করাও প্রয়োজন। আমাদের রাষ্ট্রীয় কর্ম্মকে পূর্ণ সফলতা দিবার জন্য এইরূপ কর্ম্মীবাহিনীর অত্যন্ত আবশ্যক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এই বাহিনীর সদস্যগণ যেমন রাজনৈতিক নির্দ্দেশ কার্য্যে পরিণত করিবেন, তেমনই আবার প্রয়োজন হইলে পীড়িতের সেবা করিবেন, অত্যাচারীদের উদ্ধার করিবেন, দুঃস্থের সহায়তা করিবেন। ইহাদের চরিত্রসম্পদ ও কর্ত্তব্যবুদ্ধির উপরই দেশের জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক জ্ঞানের প্রসার, এবং কংগ্রেসকর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্ম্মের সফলতা নির্ভর করিবে।

'ফরওয়ার্ড ব্লক' যে দেশকে রাষ্ট্রীয় সংগ্রামে উৎসুক ও প্রস্তুত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছে; তাহার আরও একটি গুরুতর কারণ আছে। এই সংঘের প্রবর্ত্তকগণের বিশ্বাস, জাতীয় স্বাধীনতা লাভের যে সুযোগ বর্ত্তমানে ভারতবাসীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে, উহার অনুরূপ অবস্থা গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে কখনও দেখা দেয় নাই। আজ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে কংগ্রেস দেশের মধ্যে অসাধারণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে; ভারতবর্ষের আটটি প্রদেশের শাসনতন্ত্র কংগ্রেসের আয়ত্তাধীন। কৃষক, শ্রমিক ও ছাত্রগণের মধ্যে নবভাবের জাগরণ দেখা দিয়াছে। উহারা সমাজ ও রাষ্ট্রকে নূতন রূপ দিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে। অন্য দিকে বৃটিশজাতি আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রীয় বহু সমস্যার চাপে বিভ্রান্ত। বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিপত্তি ও অধিকার ইটালী, জার্ম্মেণী, জাপানের নূতন সাম্রাজ্যবাদীরা খর্ব্ব করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছে। এই অবস্থায় আমাদের জাতীয় দাবী সম্বন্ধে বৃটিশ জাতির সহিত চূড়ান্ত একটা বোঝাপড়া করিয়া লইবার সময় আসিয়াছে। এইরূপ সুযোগ কোন জাতির জীবনে বহুবার আসে না। এই সন্ধিক্ষণে যদি আমরা আত্মপ্রত্যয়ের অভাব অনুভব করি, তাহা হইলে আমাদের দীনতা ও পরাধীনতা কখনও ঘুচিবে না। কিন্তু এই আত্মপ্রত্যয়ের অভাব কেন? দেশ কি আজ পূর্ব্বাপেক্ষা শক্তিহীন, পূর্ব্বাপেক্ষা স্বার্থমগ্ন বা জাতীয় স্বাধীনতা সম্বন্ধে পূর্ব্বাপেক্ষা উদাসীন? এইরূপ কোনও লক্ষণ ত আমি চারিদিকে দেখিতে পাইতেছি না, বরঞ্চ একটা নূতন যুগ যে আসন্ন, এই চেতনা যেন জনগণের মধ্যে দিনে দিনে অধিকতর প্রসার লাভ করিতেছে। তবু যদি আমাদের নেতৃগণ আমাদিগকে স্বাধীনতার পথে না লইয়া যাইতে পারেন, তবে সে ব্যর্থতার দায়িত্ব তাঁহাদের—দেশবাসীর নয়। নেতৃগণ জনসাধারণকে পরিচালনা করিবেন, পথনির্দ্দেশ করিবেন—ইহাই সকলে আশা করেন। আজ যদি এই চিরন্তন ধারার ব্যতিক্রম হইয়া থাকে, তবে জনসাধারণের কর্ত্তব্য—নেতৃগণকে কর্ম্মের জন্য অনুপ্রাণিত করা।"

শরৎ বসুর আশা পূর্ণ হউক। যে বাঙ্গালীর মনীষায়—প্রতিভায়—দেশাত্মবোধে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত—নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে, আবার সেই বাঙ্গালীর নেতৃত্বে—সাধনায় কংগ্রেসে কর্ম্মের—লক্ষ্যের—ঐক্যের—সাম্যের—ত্যাগের পঞ্চপ্রদীপ প্রজ্বলিত হইয়া মাতৃ-পূজা সুসম্পন্ন করুক। দেশবাসীর জীবনব্রত সার্থক হউক—জয়যুক্ত হউক।

মহাত্মাজীর নূতন আলোক

শতকরা ৮৫ জন হিন্দু অধিবাসী-অধ্যুষিত হায়দ্রাবাদে হিন্দুপ্রজাগণের ধর্ম্মসাধনায় স্বাধীনতা লাভের জন্য কংগ্রেস-কর্ম্মীরা যে সত্যাগ্রহ চালাইতেছিলেন, গান্ধীজীর আদেশে ছয় মাস পূর্ব্বেই তাহা বন্ধ হইয়াছে। আর্য্যসমাজীগণ নিজামরাজ্যে এখনও সত্যাগ্রহ চালাইতেছেন। সম্প্রতি গান্ধীজী সুদীর্ঘ বিবৃতি প্রকাশ করিয়া ত্রিবাঙ্কুরের তথা অন্যান্য সামন্ত রাজ্যে সত্যাগ্রহ আন্দোলন স্থগিত রাখিতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। তাঁহার বিবৃতিতে বলিয়াছেন, তিনি নূতন আলোকের সন্ধান পাইয়াছেন; সেই জন্য ষ্টেট কংগ্রেসের নেতৃবর্গকে এই কয়টি বিষয়ে অবহিত হইতে বলিয়াছেন।

(১) অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য সত্যাগ্রহ স্থগিত রাখিতে হইবে। (২) আপনাদিগকে অগ্রসর হইয়া কর্ত্তৃপক্ষের সহিত সম্মানজনক সর্ত্তে রফা বন্দোবস্ত করিতে হইবে। (৩) যে সকল সত্যাগ্রহী কারাগারে আবদ্ধ আছেন, তাঁহাদের জন্য কোন প্রকার উদ্বেগ প্রকাশ করা হইবে না। (৪) আবশ্যক হইলে দাবী কমাইয়া আপোষের আলোচনা করিতে হইবে। শ্রীযুত পট্টমথানুপিল্লাই, শ্রীযুত বাধেদী এবং শ্রীযুত ফিলিপোজের সহিত ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার সুদীর্ঘ আলোচনা হইয়া গিয়াছে। তিনি বুঝিয়াছেন যে, উপযুক্ত সময়েই ত্রিবাঙ্কুরের সত্যাগ্রহ স্থগিত করা হইয়াছে। এই সংবাদে নিখিল ভারত চমকিত। এ যেন 'সকল পথ দৌড়াদৌড়ি খেয়াঘাটে গড়াগড়ি'! মহাত্মাজী স্বীকার করিয়াছেন, ত্রিবাঙ্কুরের কোন কোন সমালোচকের মতে সত্যাগ্রহ স্থগিত রাখিবার ফলে রাজ্যে অধিকতর উৎপীড়ন আরম্ভ হইয়াছে। ইহার উত্তরে তিনি বলিয়াছেন, উৎপীড়ন পরিহার করিবার জন্য অথবা স্থগিত রাখিবার জন্য সত্যাগ্রহ স্থগিত রাখা হয় নাই। জনসাধারণের মনকে হিংসার ভাবমুক্ত করিবার জন্যই ঐ আন্দোলন স্থগিত রাখা হইয়াছে। মানুষের স্বভাব যাহাতে বর্ব্বরের ন্যায় না হয়, তাহার জন্যই ঐ আন্দোলন বন্ধ করা হইয়াছে। কিন্তু এই ব্যাপারে রাজনীতিক মহলে যে একটা বিরাট বিক্ষোভে চাঞ্চল্য সঞ্চার হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ত্রিপুরী কংগ্রেসে সামন্তরাজ্যসমূহে সত্যাগ্রহ আন্দোলন চালাইবার জন্য সহানুভূতিসূচক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। রাজকোটের সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সাফল্যে রাজকোটের প্রজাগণই যে কেবল ভবিষ্যতে দায়িত্বমূলক শাসনতন্ত্র পাইবেন, অনেকে এমন আশা করেন নাই। অধিকন্তু রাজন্যশাসিত সমস্ত রাজ্যেই ঐ ভাবে শাসনসংস্কার প্রবর্ত্তিত হইবে, আশা করিয়াছিলেন। লোকের আশা যখন প্রায় ফলবতী হইয়া আসিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে গান্ধীজী এই আন্দোলন বন্ধ করিয়া দেওয়াতে লোকের মনে বিক্ষোভ এবং অসন্তোষের উদ্ভব খুব স্বাভাবিক। তাঁহারা বলিতেছেন যে, হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি বড় বড় রাজ্যে শাসকবর্গ অত্যন্ত নির্ম্মমভাবে দমননীতির অনুসরণ করিয়াছেন, সত্যাগ্রহ স্থগিতের ফল বিপরীত হইবার সম্ভাবনাই সমধিক। মহাত্মাজী এই ক্ষেত্রে বিজ্ঞ জননায়কোচিত নির্দ্দেশ দিয়াছেন কি? তাঁহার 'ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।' যখন তিনি সামন্ত রাজ্যে এই সত্যাগ্রহ আন্দোলন প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, তখনই তাঁহার এই বিষয় ভাবিয়া দেখা একান্ত কর্ত্তব্য ছিল না? সামন্ত রাজগণের হৃদয় বিগলিত করিয়া প্রজাবর্গের ন্যায্য অধিকার আদায় করা সত্যাগ্রহের উদ্দেশ্য সত্য, কিন্তু যেখানে স্বার্থের ব্যাপার, সেখানে স্বার্থপর ব্যক্তিদিগের হৃদয় সহজে বিগলিত হয় কি? বিশেষতঃ কতকগুলি সামন্ত রাজ্যে এমন কতকগুলি কূটবুদ্ধিসম্পন্ন লোক থাকেন, যাঁহারা রাজন্যদিগকে অনেক কথাই জানিতে দেন না। এরূপ অবস্থায় কার্য্য আরম্ভ করিয়া অর্দ্ধপথে তাহা ছাড়িয়া দিলে তাহার ফল কি মন্দই হইবে না?

হক ছাহেবের অদ্ভুত ফন্দি

মৌলভী ফজলুল হক প্রধান মন্ত্রী হইবার পর হইতে কখন কি বলেন, তাহা বুঝা দায়। তাঁহার উক্তিতে অনেক সময়ই যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তিনি কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের সংশোধক বিল সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, এই বিলখানি উপস্থিত করিবার উদ্দেশ্য কলিকাতা কর্পোরেশনে হিন্দুদিগের সংখ্যাধিক্য হ্রাস করা নহে—কংগ্রেসওয়ালাদিগকে কর্পোরেশন হইতে বহিষ্কার করাই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য। খাজা সার নাজিমুদ্দীনও ঐ কথার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। ইহা বড় অদ্ভুত কথা। কংগ্রেসওয়ালাদিগকে কর্পোরেশন হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য তাঁহার এই ব্যস্ততা কেন? যে গণতন্ত্রের দোহাই দিয়া তিনি আজ বাঙ্গালার প্রধান সচিবের পদ পাইয়াছেন, এই প্রকার মনোবৃত্তি কি সেই গণতন্ত্রের অনুমোদিত?—বিলাতে গণতন্ত্র বা আংশিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে এ পর্য্যন্ত কোন সম্প্রদায় বা দলকে কোন প্রতিষ্ঠানে যোগদানের প্রতিবন্ধক কোন ব্যবস্থাই প্রবর্ত্তিত হয় নাই। বিলাতের নিয়ম ও পদ্ধতি অনুসারেই এ দেশে এই সকল ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছে। হক ছাহেব তাঁহার অভিপ্রায়সিদ্ধির জন্য সোজাসুজি এইরূপ নিয়ম করিলেই ত পারিতেন যে, খৃষ্টান, মুসলমান, হিন্দু যে জাতিই হউন, কংগ্রেসের সভ্য হইলে আর কর্পোরেশনের কাউন্সিলার হইতে পারিবেন না। এরূপ বিধান গণতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিরোধী হইলেও হক ছাহেবের উদ্দেশ্য সংসাধিত হইত। হিন্দু-মন্ত্রিগণের সহায়তায় তাঁহার অভিপ্রায়সিদ্ধির বিঘ্ন হইত না।

মন্ত্রীরা কি সরকার ?

পাঞ্জাব ও বাঙ্গালায় কয়েকটি রাজদ্রোহের মামলা উপস্থিত হইয়াছিল। ঐ মামলার বাদী মন্ত্রিমণ্ডলী এবং প্রতিবাদী তাঁহাদের কার্য্যের সমালোচক—সংবাদ-পত্রের সম্পাদক ও প্রকাশক। প্রথম মামলা পাঞ্জাবে লুধিয়ানার নিখিল ভারতীয় মজলিস অহরারের সভাপতি মৌলভী হবিবুল রহমানের বিরুদ্ধে দায়ের হয়। লুধিয়ানার ম্যাজিষ্ট্রেট কথর শিবসিংহ এই মামলার বিচার করেন। তিনি তাঁহার রায়ে বলিয়াছেন, ঐ মামলা ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪ক ধারার আমলে আসিতে পারে না। কারণ, সাধারণের মন্ত্রীদিগের কার্য্যের প্রতিকূল সমালোচনা করিবার বৈধ অধিকার আছে। মন্ত্রীরা সরকার নহেন। দ্বিতীয় মামলা হয় কলিকাতা প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট। আসামী ছিলেন 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ডের' সম্পাদক এবং মুদ্রাকর। প্রধান ম্যাজিষ্ট্রেট উভয় আসামীকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া তাঁহাদের প্রত্যেককে ৬ মাস কারাদণ্ড এবং হাজার টাকা করিয়া অর্থদণ্ড করেন। আসামীরা সেই আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করিয়াছিলেন। হাইকোর্টের বিচারপতি খন্দকার এবং বিচারপতি বার্টলির নিকট এই মামলার বিচার হয়। বিচারপতি বার্টলি তাঁহার রায়ে বলিয়াছিলেন, ভারত-শাসন আইনের ৪৯ এবং ৫০ ধারা মতে মন্ত্রীরা সরকার নহেন। তাঁহারা গবর্ণরের পরামর্শ দাতা মাত্র। তাঁদের শাসনকার্য্যপরিচালনের ক্ষমতা নাই। তাহার পর লাহোরের মোটা সিং ঐ ধরণের এক রাজদ্রোহের অভিযোগে দণ্ডিত হইয়া সেই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে লাহোর হাইকোর্টে আপীল করিয়াছিলেন। বিচারপতি বক্সী টেকচাঁদ এই আপীল নিষ্পত্তির রায়ে বলেন যে, মন্ত্রীরা জনসাধারণের প্রতিনিধিদিগের মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। এরূপ অবস্থায় তাঁহাদের কার্য্যের প্রতিকূল সমালোচনা করিলে সেই সমালোচনার ফলে যদি তাঁহাদের উপর বিরাগ প্রসারিত হয়, তাহা হইলেও সেই কার্য্য ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪ক ধারার আমলে আসিতে পারে না। তিনি আসামীকে খালাস দেন।

তাহার পর 'দৈনিক বসুমতী'র সম্পাদক শ্রীযুত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ এবং মুদ্রাকর শ্রীযুত শশিভূষণ দত্তের নামে উপর্য্যুপরি ঐ ১২৪ক ধারায় রাজদ্রোহ অভিযোগে দুইটি মামলা উপস্থিত করা হয়। একটি মামলার বিচার হয় কলিকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট, আর একটির বিচার হয় অতিরিক্ত প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে। উভয় বিচারকই এই সম্বন্ধে একইরূপ প্রশ্নের সমাধান জন্য মামলা দুইটি হাইকোর্টে পাঠাইয়াছিলেন। প্রশ্নগুলি এই :—

(১) ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ভারত-শাসন আইনের ৪৯ ধারা অনুসারে বাঙ্গালার মন্ত্রীরা গবর্ণরের অধীনস্থ কর্ম্মচারী কি না ?

(২) মন্ত্রিসভাকে বিধি-প্রতিষ্ঠিত গবর্ণমেণ্ট বলিয়া বিবেচনা করা যায় কি না ?

(৩) ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৭ ধারা মতে যাহাকে প্রদেশের কার্য্যকরী গবর্ণমেণ্ট বলা হয়, প্রাদেশিক মন্ত্রিমণ্ডলীকে তদনুসারে কার্য্যকরী সমিতির অঙ্গ বলিয়া বুঝায় কি না ?

'দৈনিক বসুমতী'র মামলা দুইটির বিচার জন্য হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি, বিচারপতি মিষ্টার নাসিম আলি ও বিচারপতি মিষ্টার রাও—তিন জনকে লইয়া একটি স্পেশাল বেঞ্চ গঠিত হইয়াছিল। দুই দিন শুনানীর পর তিন জন বিচারপতিই একমত হইয়া প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের তিনটি প্রশ্নের উত্তরে ২২শে জ্যৈষ্ঠ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন—"**না**"। অতএব বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রধান বিচারালয় এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, মন্ত্রিমণ্ডলী বা কোন মন্ত্রী সরকার নহেন। তাঁহারা সরকারের বা গবর্ণরের পরামর্শদাতা মাত্র। এই মামলায় যে একটা প্রয়োজনীয় সমস্যার সমাধান হইয়া গেল, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

মসজেদের সম্মুখে বাদ্য

মসজেদের সম্মুখে বাদ্যধ্বনি লইয়া বৃটিশ-শাসিত ভারতের নানা স্থানে কয়েক বৎসরের মধ্যে যে কত দাঙ্গা-হাঙ্গামা এবং কত রক্তপাত হইয়া গেল, তাহার ইয়ত্তা নাই। অথচ এই আপত্তিটি সম্পূর্ণ বে-বনিয়াদ। সম্প্রতি যুক্তপ্রদেশের মোরাদাবাদ সহরে জমিয়ৎ-উল-উলেমার এক বৈঠক বসিয়াছিল। উহার সভাপতি হইয়াছিলেন মৌলভী আবদুল মানান। তিনি তাঁহার অভিভাষণে স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন, "মসজেদের সম্মুখে বাদ্যধ্বনি করিলে নমাজের কোনরূপ ব্যাঘাত জন্মে না। মুসলমানদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে মসজেদের সম্মুখে বাদ্য করা কুত্রাপি নিষিদ্ধ হয় নাই।"—মুসলমান-রাজত্বকালে মসজেদের সম্মুখস্থ রাজপথে বাদ্যভাণ্ড কোথাও নিষিদ্ধ হইয়াছে, এরূপ কথা কোন ইতিহাসেও নাই,—কখন শুনাও যায় নাই। যাহা হউক, মৌলানা আবদুল মানান যে এই সম্বন্ধে স্পষ্ট কথা বলিয়াছেন, সে জন্য তিনি সাধারণের প্রশংসার পাত্র—ধন্যবাদের যোগ্য।

শিমলা-প্রয়াণ

ভারত-সরকার প্রতি বৎসর সদলে শিমলা-শৈলে গমন করেন। সেজন্য সরকারের অনেক টাকা অকারণ ব্যয় হয়, এজন্য ভারতবাসীরা ঐ ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিবার জন্য বহুদিন হইতে আন্দোলন করিয়া আসিতেছিলেন। ভারত-সরকার আংশিকভাবে এই শিমলা-শৈল বিহার রহিত করিবেন, স্থিতিকাল এক মাস দেড় মাস কমাইবেন স্থির করিয়াছেন। ইহাতে যে অর্থ বাঁচিবে, তাহা উপস্থিত

দিল্লীতে হর্ম্ম্যাদি নির্ম্মাণে ব্যয়িত হইবে। ইহাতে যে কতকটা লাভ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এখন কার্য্যক্ষেত্রে কিরূপ হয়, তাহাই দ্রষ্টব্য।

চাকুরীর ভাগ-বাটোয়ারা

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল, সরকারী চাকুরীতে শতকরা ৬০ জন মুসলমান, ২০ জন তালিকাভুক্ত হিন্দু এবং অবশিষ্ট ২০ জন খৃষ্টান, বৌদ্ধ এবং বর্ণহিন্দুকে গ্রহণ করা হইবে। বাঙ্গালার মন্ত্রিমণ্ডলী সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, মুসলমানদিগকে শতকরা ৫৫টি সরকারী পদ প্রদান করিতে হইবে। লজ্জাবিজয়ে—ত্রিভুবনজয়ে সমর্থ বাঙ্গালার বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলী যে দম্ভভরে এই প্রস্তাবের সমর্থন—অনুমোদন করিয়াছেন, ইহাতে বিস্ময়ের অবকাশ নাই। কিন্তু এই প্রস্তাবটি কেবল নীতি-যুক্তিবিরুদ্ধ নহে,—ইহা অবৈধ বা আইনবিরুদ্ধ। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ভারতীয় শাসন সংস্কার আইনের ২ শত ৯৮ ধারার (১) এবং (৩) অন্তধারায় স্পষ্টই বলা হইয়াছে, সম্রাটের কোন প্রজাকেই তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাস, জন্মস্থান, জাতি, বর্ণের জন্য কোন সরকারী পদ হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না, কেবল গবর্ণর বা গবর্ণর-জেনারল সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার জন্য কতকগুলি পদ স্বতন্ত্র করিয়া রাখিতে পারিবেন। সুতরাং এই প্রস্তাবগ্রহণ ব্যবস্থা পরিষদের সভার অধিকার-বহির্ভূত, কেন না, উহা বে-আইনী। এই ব্যাপারে এ দেশের সর্ব্ব-সাধারণ বিক্ষোভে চঞ্চল হইয়াছেন। যোগ্যতা হিসাবেই সকলকে সরকারী চাকুরী দেওয়া উচিত—ইহাই সুধীজন-সম্মত মত। এই প্রস্তাব বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে গৃহীত হওয়ায়—শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রভৃতি ইহার প্রতিবাদ করিয়া বাঙ্গালার অস্থায়ী গবর্ণরের নিকট এক টেলিগ্রামে জানান—হিন্দুদিগের কয়েক জন প্রতিনিধি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছেন, তাঁহাদিগের কথা না শুনিয়া গবর্ণর যেন ঐ প্রস্তাবে সম্মতি না দেন। বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ, প্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব শ্রীযুত নরেন্দ্রকুমার বসু প্রমুখ হিন্দু-প্রতিনিধিগণ ১৩ই জ্যৈষ্ঠ দার্জ্জিলিঙ্গে গবর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অভিযোগ জানাইয়াছিলেন। অস্থায়ী গবর্ণর সার রবার্ট রীড্ প্রতিনিধিগণের কথা মনোযোগের সহিত শুনিয়াছিলেন। অর্থ-সচিব শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকার এই ব্যবস্থাপ্রবর্ত্তনে হিন্দুগণের প্রতি অবিচার হইলে মন্ত্রিত্ব পরিত্যাগ জন্য পদত্যাগপত্র পেশ করিবেন বলিয়াও জনরব প্রচারিত হইয়াছিল।

সচিবসঙ্ঘের সিদ্ধান্ত অনুসারে ২৯শে জ্যৈষ্ঠ বাঙ্গালার নূতন লাট সার জন উড্‌হেড্ সম্মতি দিয়াছেন যে, বাঙ্গালার সরকারী চাকুরীতে শতকরা ৫০ জন মুসলমান নিযুক্ত হইবেন এবং অবশিষ্টাংশ হিন্দু ও অন্যান্য সম্প্রদায় পাইবেন। যোগ্যতা অনুসারে সরকারী চাকুরীতে শতকরা ৫০ জন মুসলমান উচ্চপদে উন্নীত না হওয়া পর্য্যন্ত যোগ্যতাক্রমে অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোক উচ্চপদে উন্নীত হইবেন, কিন্তু সমতা রক্ষার জন্য সরকারী চাকুরীতে শতকরা ৫০ জন মুসলমান নিয়োগ না হওয়া পর্য্যন্ত হিন্দু বা অন্য সম্প্রদায়ের লোক মনোনীত হইবেন না। ইহাতে স্বতঃই মনে হয়, আগামী দ্বাদশ বা ততোধিক বৎসর অতীত না হইলে বাঙ্গালার উচ্চবর্ণের হিন্দুর সরকারী চাকুরী পাইবার সম্ভাবনা অল্প। যোগ্যতা অনুসারেই সরকারী চাকরী প্রদান যে একান্ত কর্ত্তব্য, বাঙ্গালার সচিবসঙ্ঘ ব্যতীত আর কেহই তাহা অস্বীকার করিবেন না। ইহাই পৃথিবীর সর্ব্বদেশের প্রচলিত রীতি। সরকারী চাকুরীতে মুসলমান সম্প্রদায়ের অধিকার-প্রাবল্য সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ায় শৈলবিহারে সমবেত বাঙ্গালার সচিবসঙ্ঘ বিজয়গর্ব্বে জয়োল্লাসে আত্মহারা হইয়া কলিকাতায় ফিরিয়াছেন।

সরকারী চাকুরীতে সাম্প্রদায়িক প্রাধান্য-প্রতিষ্ঠায় সাফল্যলাভে পর তীব্র সমালোচনার আশঙ্কায় প্রধান সচিব হক হিন্দু যুবকগণের জন্য আশ্বাস-বাণী ঘোষণা করিয়া সাফাই গাহিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "সমালোচকগণ যেন আমাদের এই সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা প্রচারে হিন্দুগণকে উত্তেজিত করিয়া 'লেলাইয়া' না দেন। হিন্দু যুবকগণের সম্মুখে বহু পথ উন্মুক্ত—তাহারা অনায়াসে বে-সরকারী, আধা-সরকারী আপিসে চাকুরীর চেষ্টা করিতে পারে। আমাদিগের ঘোষিত নীতিতে সরকারী চাকুরী লাভে তাহাদের সামান্য অসুবিধা হইয়াছে মাত্র। মুসলমান যুবকগণ যাহাতে স্বদেশের শাসন-কার্য্যে যথাযথ অংশ গ্রহণ করিতে পারে, সেজন্য আমি অমুসলমান সম্প্রদায়ের সহানুভূতি কামনা করি। অমুসলমান যুবকগণের প্রতি আমি বিদ্বেষ ভাব পোষণ করি না, তাহারা মুসলমান যুবকগণের মত আমার বক্ষে আরামে বাস করুক—আমার স্নেহশীতল পক্ষের আশ্রয়ে ক্রমশঃ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া পূর্ণ মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করুক।" হক্ সাহেবের আচকানের বিরাট পকেটে যখন শত শত জওহরলালের স্থান হওয়া সম্ভব, তখন তাঁহার বিশাল বক্ষে অনায়াসে যে উচ্চশিক্ষিত সহস্র সহস্র বেকার হিন্দু যুবক আরামে সুখ-নিদ্রা উপভোগ করিতে পারিবেন, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। "স্নেহ-কোমল" ডানার আশ্রয়ে পক্ষিশাবক পুষ্ট হইতে পারে সত্য, কিন্তু পূর্ণ মনুষ্যত্ব অর্জ্জন সম্ভবপর কি? ইহা অবশ্যই মৌলভি সাহেবের মৌলিক আবিষ্কার বলিতে হইবে। তাঁহার আশ্বাসবাণী কি কথার ছলনা মাত্র নহে?

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত
[illegible] 'বসুমতী' রোটারী মেসিনে শ্রীশশিভূষণ দত্ত মুদ্রিত ও প্রকাশিত

১৮শ বর্ষ] আষাঢ়, ১৩৪৬ [৩য় সংখ্যা

গীতা-বিচার

১৫

ছ—অনুপ্রশ্ন 'স্বর্গ ও মোক্ষ বিষয়ে ভেদ কিরূপ ?' 'ছ'র অর্থ সপ্তম। এবার এই অনুপ্রশ্নের বিচার।

অনেকেই বলিবেন, ইহা তো জানা কথা, স্বর্গ—দেবলোক ভোগ,—পৃথিবীতে যেমন মনুষ্য বাস করে, ঐ যে উপরের গ্রহগুলি নক্ষত্রাকারে প্রতি নির্ম্মল রাত্রিতেই আমরা প্রত্যক্ষ করি—পৃথিবীর ন্যায় ঐগুলিও জীবের বাসস্থান—ঐ স্থানের অধিবাসী জীবগণ দেবতা নামে খ্যাত—আর ঐ সব অবস্থা দেবলোক,—মনুষ্য ভারতে কর্ম্ম করিয়া মরণান্তে ঐ সব স্থানে গমন করে, এবং পৃথিবী-দুর্লভ সুখ তথায় ভোগ করে—ঐ সব স্থানের নাম স্বর্গ। তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন আছে,—পুণ্যক্ষয়ে স্বর্গ-চ্যুত হইতে হয়। গ্রহগণের কথা বুঝাইবার জন্য বলিলাম, গ্রহ ব্যতীত স্থানও আছে, যাহা দেবলোকের মধ্যে গণ্য।

মোক্ষ সেরূপ নহে,—মোক্ষ লাভ হইলে, আর বিচ্যুত হইতে হয় না। অতএব এ বিষয়ে বিচার নিষ্প্রয়োজন।

বাস্তবপক্ষে নিষ্প্রয়োজন নহে। সূক্ষ্ম বিষয়ে গভীর ভাবে প্রবেশই বিচারের প্রয়োজন। ঠাকুরমার গল্প হইতে মোটামুটি একটা ধারণা হিন্দুর ঘরে চলিয়া আসিয়াছে, আজ অর্দ্ধ শতাব্দী হইতে ক্রমে তাহার ব্যতিক্রম হইলেও এখনও একবারে উঠিয়া যায় নাই। 'শিক্ষিত' মহলে সাগর-পারে ঘুরিয়া দর্শনের আলোকও পড়িতেছে, তথাপি সূক্ষ্মতত্ত্বে তেমন প্রবেশ দেখি না—সেই জন্যই বিচারের প্রয়োজন।

বিচার করিতে হইলে প্রথমে শাস্ত্রসিদ্ধান্তে স্বর্গ এবং মোক্ষ কি—তাহা বুঝা একান্ত আবশ্যক, নতুবা—ভেদ কি অভেদ এ বিষয়ে আলোচনাই চলিতে পারে না।

স্বর্গ বিষয়ে উপনিষদের উপদেশ যথা—'স্বর্গে লোকে ন ভয়ং কিঞ্চনাস্তি ন তত্র ত্বং ন জরয়া বিভেতি। উভে তীর্ত্বা অশনায়া পিপাসে লোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে।

স্বর্গলোক সর্ব্বভীতিশূন্য, তথায় জরা মৃত্যু নাই,—জীব ক্ষুধাতৃষ্ণাশূন্য ও লোকাতীত হইয়া স্বর্গলোকে' আনন্দভোগ করে।

মীমাংসকের উপদেশ—

যন্ন দুঃখেন সংভিন্নং ন চ গ্রস্তমনন্তরম্।
অভিলাষোপনীতঞ্চ তৎ সুখং স্বঃপদাস্পদম্॥

যে সুখ দুঃখ-মিশ্রিত নহে, উত্তরকালেও যাহা দুঃখগ্রস্ত হয় না এবং যে সুখ ইচ্ছা মাত্রেই উপনীত হয়, তাহা স্বর্গ।

স্বর্গলোক পৃথক্ আছে,—সে স্থানের সুখ অন্যলোকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, সেই সুখই স্বর্গ।

গীতায় আছে—

যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্॥

এই প্রকার যুদ্ধ—উন্মুক্ত স্বর্গদ্বারস্বরূপ। সুখী ক্ষত্রিয়গণই ইহা প্রাপ্ত হ'ন।

স্মৃতিশাস্ত্রে আছে—

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে সূর্য্যমণ্ডলভেদকৌ।
পরিব্রাড়্ যোগযুক্তশ্চ রণে বাভিমুখো হতঃ॥

যোগযুক্ত পরিব্রাজক (সন্ন্যাসাশ্রমী) এবং সম্মুখ সংগ্রামে নিহত যোদ্ধা এই দুই ব্যক্তিই সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করিয়া গমনে সমর্থ।

'সূর্য্যদ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রয়ান্তি'

এই শ্রুতিও সূর্য্যকে গমনের পথস্বরূপ বর্ণন করিয়াছেন।

দেবযানপথে ব্রহ্মলোকযাত্রীরও এই সূর্য্য অতিক্রমের কথা আছে।

এই সকল উপদেশ পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যায়, স্বর্গ অক্ষয় সুখ।

মোক্ষও অক্ষয় সুখ—উপনিষদের উপদেশ যথা—'তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্।' 'তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়,' শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের এই দুইটি মন্ত্র পাশাপাশি ধরিলেই বুঝা যায়—শাশ্বত সুখ অর্থাৎ অক্ষয় সুখ ব্রহ্মজ্ঞানলভ্য, তাহাই মোক্ষ। গীতায় আছে—

স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে। ৫।২১।

অতএব অক্ষয় সুখরূপে ধরিলে স্বর্গ ও মোক্ষের বাস্তব ভেদ থাকে না।

এখন দেখা যাক্, গীতার মন্ত্রে অর্থাৎ বচনে এই দু'এর কি ভাবে পরিচয় আছে?

একটি বচন এই—

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥ ১৪।২৭।

এই শ্লোকের শঙ্করসম্মত অর্থ দুই প্রকার—প্রথম অর্থ গ্রহণ করিলে তিনটি চকার ব্যর্থ। মূলের সকল পদগুলি সার্থক করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন শ্রীধর স্বামী। কিন্তু প্রতিষ্ঠা শব্দের অর্থ করিয়াছেন প্রতিমা।

শাঙ্কর-ভাষ্য-সম্মত প্রথমার্থের * অনুবাদ—"আমি, অমৃত (অবিনাশী), অব্যয় (নির্ব্বিকার), সনাতনধর্ম্মলভ্য, অব্যভিচারী, আনন্দস্বরূপ পরমাত্মায় প্রতিষ্ঠা—তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা পরমাত্মস্বরূপ নির্ণীত হয়।" অতএব 'ব্রহ্মণঃ' বিশেষ্য পদ এবং অমৃতস্য ইত্যাদি ষষ্ঠ্যন্ত পদগুলি বিশেষণার্থে ব্যবহৃত। সুতরাং মূলস্থ চকারগুলি ব্যর্থ হয়। তবে এস্থলে শ্রীশঙ্করাচার্য্য স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন 'সা শক্তির্ব্রহ্মৈবাহং'—সেই প্রতিষ্ঠাস্বরূপা শক্তি ব্রহ্ম, তিনিই আমি।

শ্রীধর স্বামীর ব্যাখ্যাসম্মত † অনুবাদ—"সূর্য্যমণ্ডল যেমন ঘনীভূত তেজঃ সেইরূপ আমি (শ্রীকৃষ্ণ) ঘনীভূত ব্রহ্ম-চৈতন্য, আমি নিত্য মুক্ত বলিয়া অনপায়ী মোক্ষের শুদ্ধ স্বরূপ বলিয়া শাশ্বত ধর্ম্মের এবং পরমানন্দ স্বরূপ বলিয়া ঐকান্তিক সুখের প্রতিষ্ঠা বা প্রতিমা।

শাঙ্কর-ভাষ্য-সম্মত দ্বিতীয় অর্থ ‡ গ্রহণে তিনটি 'চ' ব্যর্থ হয় না। কিন্তু ভাষাবিন্যাসে দৃষ্টিপাত করিলে, অর্থান্তরের অস্তিত্বে আকাঙ্ক্ষা জাগে। কারণ

ব্রহ্ম অর্থাৎ সবিকল্পক ব্রহ্মের আমি অর্থাৎ নির্ব্বিকল্প ব্রহ্ম—আশ্রয়, সেই সবিকল্পক ব্রহ্ম অমৃত এবং অব্যয়। আর তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠা স্বরূপ নিত্যধর্ম্মের আমি আশ্রয়। তজ্জনিত ঐকান্তিক সুখেরও আমি আশ্রয়—দ্বিতীয় অর্থের ইহা

* 'ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ হি যস্মাৎ প্রতিষ্ঠাহং প্রতিতিষ্ঠত্যস্মিন্ইতি প্রতিষ্ঠা প্রত্যাগাত্মা, কীদৃশস্য ব্রহ্মণঃ—অমৃতস্য অবিনাশিনঃ, অব্যয়স্য অবিকারিণঃ, শাশ্বতস্য চ নিত্যস্য ধর্ম্মস্য জ্ঞানযোগধর্ম্ম প্রাপ্যস্য সুখস্যানন্দরূপস্য ঐকান্তিকস্যাব্যভিচারিণঃ, অমৃতাদিস্বভাবস্য পরমানন্দরূপস্য পরমাত্মনঃ প্রত্যগাত্মা প্রতিষ্ঠা সম্যগ্‌জ্ঞানেন পরমাত্মতয়া নিশ্চীয়তে'। শাঙ্কর ভাষ্য।

† হি যস্মাদ্ ব্রহ্মণোঽহং প্রতিষ্ঠা প্রতিমা ঘনীভূতং ব্রহ্মৈবাহং যথা, ঘনীভূতপ্রকাশ এব সূর্য্যমণ্ডলং তদ্বদিত্যর্থঃ, তথা অব্যয়স্য নিত্যস্য অমৃতস্য মোক্ষস্য নিত্যযুক্তত্বাৎ তেথা তৎসাধনস্য শাশ্বতস্য ধর্ম্মস্য চ শুদ্ধসত্ত্বাত্মকত্বাৎ তথা অখণ্ডিনস্য সুখস্য চ প্রতিষ্ঠাহং পরমানন্দরূপত্বাৎ। শ্রীধর স্বামী।

‡ ব্রহ্মশব্দবাচ্যত্বাৎ সবিকল্পকং ব্রহ্ম তস্য ব্রহ্মণো নির্ব্বিকল্পকোঽহমেব নান্যঃ প্রতিষ্ঠাশ্রয়ঃ, কিং বিশিষ্টাস্যামরণধর্ম্মকস্য ব্যয়রহিতস্য কিঞ্চ শাশ্বতস্য চ নিত্যস্য ধর্ম্মস্য জ্ঞাননিষ্ঠা লক্ষণস্য সুখস্য তজ্জনিতস্যৈকান্তিকস্য নিয়তস্য চ প্রতিষ্ঠাহমিতি।

অনুবাদ। এই অর্থে 'ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহং' এই বাক্য-দ্বারা 'সবিকল্পক ব্রহ্মের আমি আশ্রয়।' এই প্রকার অর্থ বোধ হইলে—সবিকল্পক ব্রহ্মকে বুঝাইবার জন্য নিষ্প্রয়োজন বিশেষণব্যবহার এবং তৎপরবর্ত্তী দুইটি অংশের পৃথকভাবে বিশেষ্যরূপে ব্যবহার—উৎকৃষ্ট রচনার উপযুক্ত নহে।

মূলানুগত অপর অর্থের কথা বলিতেছি, এই বচনের পূর্ব্ববর্ত্তী বচন—

মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে। ১৪।২৬।

যে সাধক অব্যভিচারী ভক্তিযোগে আমাকে সেবা করে, উক্ত ত্রিগুণ (প্রকৃতিসম্ভূত সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ) অতিক্রম করিয়া তাহার ব্রহ্মভাব লাভে সামর্থ্য হয়। এই যে বিশেষ ফললাভ তাহার হেতুরূপে কথিত বচন বিন্যস্ত হইয়াছে। যাজ্ঞিকসম্প্রদায় বলিতে পারেন,—যজ্ঞই সর্ব্ববিধ সুখের মূল,—সেই যজ্ঞ বেদপ্রতিষ্ঠিত,—ভক্তি করিতে হইলে বেদের প্রতিই তাহা করা উচিত। জ্ঞানী বলিতে পারেন—'শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ'। ব্রহ্মভাব প্রাপ্তিহেতু যে তত্ত্বজ্ঞান তাহা বেদসাপেক্ষ,—বেদ হইতেই পরমাত্মবিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞান-অনুসারে মনন ও সমাধি হইলে, ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার, তদনন্তর ব্রহ্মভাব লাভ হয়। অতএব 'অব্যভিচারী ভক্তিযোগে' আমার সেবা ও তদ্দ্বারা ব্রহ্মলাভ হয়। এই যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ, ইহাতে অর্জ্জুনের যদি সংশয় হয়, তাহার নিবৃত্তির জন্য ভগবান বলিলেন, ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্ ইত্যাদি। অর্থাৎ "বেদ আমাতেই প্রতিষ্ঠিত, আমিই তাহার আশ্রয়,—সেই বেদকে আশ্রয় করিয়া যাহা শ্রবণাদি দ্বারা লভ্য সেই অব্যয় অমৃত বা মোক্ষও আমাতেই প্রতিষ্ঠিত—বেদোক্ত সনাতনধর্ম্মও আমাতে প্রতিষ্ঠিত, আর সেই ধর্ম্ম জন্য যে ঐকান্তিক সুখ তাহাও আমাতেই প্রতিষ্ঠিত, অতএব আমাতে ঐকান্তিকী ভক্তি ও তৎসহকারে মদীয় সেবা করিলে, আমার আশ্রিত বেদের সহায়তায় আমারই আশ্রিত যে ফল প্রাপ্তির কথা বলিতেছ, স্বয়ং আমার সেবায় সে ফল যে অধিকতর সুলভ, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।"

বেদে দুই কাণ্ড আছে—জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ড,—জ্ঞানকাণ্ডে ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ, কর্ম্মকাণ্ডে যজ্ঞাদির উপদেশ; উপাসনাকাণ্ড—কর্ম্মকাণ্ডেরই অন্তর্গত। ব্রহ্মজ্ঞান হইতে মোক্ষ, যজ্ঞ হইতে ঐকান্তিক সুখ—অর্থাৎ স্বর্গ। মোক্ষ ও স্বর্গসুখের মূল বলিয়া যদি বেদে ভক্তি হয়, সেই বেদের যিনি মূল,—মোক্ষ ও স্বর্গের যিনি প্রদাতা, তাঁহার প্রতি ভক্তির উপরে কোন তর্কই আসিতে পারে না। ইহা সরল অর্থ—ইহাতে কোন 'চ'কার ব্যর্থ হয় না, ভাষা-বিন্যাসেও দোষ থাকে না। অধিকন্তু গীতাতে ৫।২১ বচনে মোক্ষকে অক্ষয় সুখ বলা হইয়াছে। এ স্থানেও স্বর্গকে ঐকান্তিক সুখ বলাতে বিশিষ্ট সুখরূপে মোক্ষ ও স্বর্গের অভেদে ইঙ্গিত পাওয়া যায় না কি?

এই সব কারণেই বিচার। এ স্থলে সিদ্ধান্ত এই যে—গীতাতে মোক্ষ ও স্বর্গের ভেদ স্পষ্টাক্ষরেই কথিত,—স্বর্গ ঐহিক সুখের ন্যায়ই নশ্বর, তাহা অক্ষয় নহে। মোক্ষ-সুখ অক্ষয়। স্বর্গ—ভোগসুখ, অতএব নশ্বর।

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ॥ ৫।২২।

ভোগসুখ মাত্রই বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগ হইতে উৎপন্ন, অতএব সে সমস্তই দুঃখের হেতু—অক্ষয় সুখ ত নহেই প্রত্যুত ভবিষ্যৎ দুঃখের হেতু। তাহার উৎপত্তি ও বিনাশ আছে, অতএব জ্ঞানী তাহাতে রত হ'ন না।

স্বর্গ এই ভোগ সুখেরই অন্তর্গত—ইহা গীতাতে স্পষ্টই কথিত,—'তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।'

অন্যত্র আছে—'কামাত্মনঃ স্বর্গপরা ইত্যাদি।

বেদ ও উপনিষদে যে কচিৎ স্বর্গের অক্ষয়ত্ব বর্ণিত—তাহার কারণ,—স্বর্গভোগ মনুষ্যাদিলোকের ভোগাপেক্ষা বহুকালব্যাপী। এই জন্যই তাহাকে অক্ষয় বলা হইয়াছে, যেমন দেবগণকে অমর বলা হয়।

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ইত্যাদি স্মৃতিবচনে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি কথিত হইলেও তাহা অক্ষয় নহে।

গীতাতে কথিত হইয়াছে—

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥ ৮।২৬।২৯

ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত গতি হইলেও—পুনর্ব্বার ফিরিতে হয়—

পুনর্জ্জন্ম হয়। আমাকে প্রাপ্ত হইলে আর ফিরিতে হয় না। আমাকে প্রাপ্তির অর্থ—মোক্ষলাভ।

মীমাংসক মতে অক্ষয় স্বর্গ আছে—তাহাই মোক্ষ নামে কথিত, 'যন্ন দুঃখেন সংভিন্নম্' ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত প্রমাণে সেই অক্ষয় স্বর্গকে বুঝিতে হয়। কিন্তু দর্শনশাস্ত্রের বিশেষতঃ ন্যায়শাস্ত্রের নিয়মে, অক্ষয় স্বর্গ হইতেই পারে না, যাহাকে হাঁ'র দলে ফেলিতে হয়—না—যাহার স্বরূপ নহে, তাহার উৎপত্তি মানিলে নাশ স্বীকার করিতেই হয়। হাঁ'র দল কাহাঁরা?—যাহাদিগের দার্শনিক নাম ভাব-পদার্থ, না কাহার স্বরূপ? অভাব-পদার্থের। সুখ বস্তুকে লোকে অন্তঃকরণেই অনুভব করে, তাহার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না, যে দুঃখী তাহার সুখ নাই—এই যে না-স্বরূপ তাহাই অভাব। সুখ নাই বলিলে সুখের অভাব বুঝিতে হয়। সেইরূপ—দুঃখ নাই বলাতে দুঃখ না থাকা বুঝিলেও উহার দ্বারা সুখের স্বরূপ বুঝা যায় না। অতএব—'না'—সুখের স্বরূপ নহে,—স্বর্গ বা বিশেষ সুখকে ঐরূপ অভাবমধ্যে গ্রহণ করা যায় না। সুতরাং সুখ অভাব পদার্থ নহে, ভাব পদার্থ,—ভাব পদার্থের উৎপত্তি থাকিলেই নাশ আছে, ইহা দার্শনিক সিদ্ধান্ত। অতএব যজ্ঞাদি দ্বারা যে স্বর্গসুখ উৎপন্ন হয়, তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। এই নিয়মে স্বর্গ কখনই অক্ষয়—অবিনাশী হইতে পারে না। ইহার উপর প্রশ্ন—মোক্ষও তো তত্ত্বজ্ঞান হইবার পরে উৎপন্ন হয়—তাহাকে অক্ষয় সুখ বলিয়া স্বীকার করার বিপক্ষে ঐ দার্শনিক নিয়ম অবস্থিত হয় না কেন?

উত্তর। অন্ধকার গৃহে দ্রব্যসম্ভার থাকিলে তাহা দৃষ্টি-গোচর হয় না, আলোক জ্বালিলে তাহা দৃষ্টি-গোচর হয়; কিন্তু তখন যে দ্রব্যসম্ভার উৎপন্ন হয় তাহা নহে—সেইরূপ মোক্ষ আত্মারই স্বরূপ,—অন্ধকারের ন্যায় অজ্ঞান তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, জ্ঞানালোক প্রজ্বলিত হইলে অজ্ঞান বিনষ্ট হয়—যথাবস্থিত- আত্মার স্বরূপ তখন প্রকাশিত হয় এই প্রকাশমান আত্মস্বরূপই মোক্ষ, তাহার উৎপত্তি নাই অতএব বিনাশ নাই। সেই আত্মস্বরূপ পরমানন্দ—যে আনন্দের তুলনা হয় না সেই আনন্দ,—তাহাই অক্ষয়।

অন্য যত আনন্দই আছে—সে আনন্দের নিকট সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রতর ক্ষুদ্রতম। স্বর্গ ভোগসুখ, ক্ষুদ্রানন্দ মধ্যে গণনীয়। অতএব স্বর্গ ও মোক্ষে প্রচুর ভেদ। পূর্ব্বে দেখাইয়াছি—গীতা ভোগজন্য সুখকে দুঃখহেতু বলিয়াছেন, স্বর্গও দুঃখের হেতু, মোক্ষ অক্ষয় সুখস্বরূপ।

এখন জিজ্ঞাস্য এই—'ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্' ইত্যাদি পূর্ব্বোল্লিখিত বচনে,—ঐকান্তিক সুখশব্দে স্বর্গকে বুঝাও উচিত নহে,—যাহা দুঃখহেতু, তাহাকে ঐকান্তিক সুখরূপ নূতনভাবে ব্যাখ্যা করা অসঙ্গত নহে কি? দুই প্রকারে ইহার উত্তর দিতেছি—

১। অক্ষয় সুখ আর ঐকান্তিক সুখ এক। ঐকান্তিক সুখের অর্থ অব্যভিচারী সুখ—যে উপায়ের সহিত যে সুখের নিশ্চিত সম্বন্ধ, যে উপায় অবলম্বন করিলে সুখ অবশ্যম্ভাবী, তাহাই সেই উপায়লভ্য ঐকান্তিক অব্যভিচারী সুখ। বৈদিক যজ্ঞফলে স্বর্গ অবশ্যম্ভাবী। অতএব তাহা ঐকান্তিক সুখ হইতে পারে।

২। ঐকান্তিক সুখশব্দের অর্থ জীবন্মুক্তি। 'অমৃতস্যা-ব্যয়স্য চ' এই অংশের অর্থ যে মোক্ষ,—তাহা কৈবল্য,—ইহা পরমমুক্তি নামেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

তত্ত্বজ্ঞানী অর্থাৎ ইহ শরীরে যিনি ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, তাঁহার যতদিন জীবন থাকে, ততদিন তাঁহার জীবন্মুক্তি—ঐকান্তিক মোক্ষানন্দ লাভ হয়—তাহাতেই (পরমেশ্বরেই) সেই আনন্দের প্রতিষ্ঠা, সেই জীবন্মুক্তের দেহপাতে যে মুক্তি তাহা কৈবল্য—সেই কৈবল্য মুক্তির প্রতিষ্ঠাও পরমেশ্বরে। কারণ, জীবন্মুক্তিই বল আর পরম-মুক্তিই বল, উভয়ই সেই সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ পরমেশ্বরকে আশ্রয় করিয়াই অবস্থিত। সেই আনন্দময় সত্য পরমেশ্বর ব্যতীত মোক্ষের অন্য কোন আশ্রয় নাই।

অতএব 'ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্' ইত্যাদি বচনে স্বর্গের ইঙ্গিত থাকিতেও পারে, নাও পারে। স্বর্গের ইঙ্গিত থাকা মানিয়া লইলেও স্বর্গকে অক্ষয় সুখের আসনে স্থাপন করা গীতাতে কোথাও হয় নাই। আর ঐ স্থান গীতার পূর্ব্ববচন পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যায়—ঐ বচনে স্বর্গের ইঙ্গিত নাই, জীবন্মুক্তিই ঐকান্তিক সুখশব্দের অর্থ।

জিজ্ঞাসা আরও আছে,—যদি ঐকান্তিক সুখশব্দের অর্থ—জীবন্মুক্তি হয়, তাহা হইলে—'শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য' এই অংশের অর্থ কি? যজ্ঞ হইতে পারে না,—কারণ, কৈবল্যের কারণ যদি তত্ত্বজ্ঞান হয়, তাহা হইলে জীবন্মুক্তির

কারণ তাহাই হইবে,—'ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্' এই অংশ হইতে যদি তত্ত্বজ্ঞান বুঝিতে হয়, তাহা হইলে ঐকান্তিক সুখের—জীবন্মুক্তির তাহাই কারণ,—'শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য' এই অংশ নিষ্প্রয়োজন হয়।

ইহার উত্তর—

গীতামধ্যে বহুস্থানেই কথিত হইয়াছে—মোক্ষমার্গ দুইটি—সাংখ্য ও যোগ।

'জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্।
যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।'

ইত্যাদি।

এখানেও সেই দুই মার্গই উপদিষ্ট,—'ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্' ইহার দ্বারা জ্ঞানমার্গ ও কর্ম্মকাণ্ডস্বরূপ সম্পূর্ণ বেদ বুঝিলেও 'অমৃতস্যাব্যয়স্য চ' ইহা থাকাতে, সাংখ্য অর্থাৎ জ্ঞানকাণ্ডের ফল এই স্থানে বলা হইয়াছে,—'শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য' ইহা কর্ম্মযোগ—যজ্ঞাদি অর্থে প্রযুক্ত। এই কর্ম্মযোগের ফল জীবন্মুক্তি ইহা বলাতে কৈবল্যও যে কর্ম্মযোগের ফল তাহা আর পৃথক বলিতে হয় না। উভয়ের পার্থক্য এই যে, কর্ম্মযোগ—অর্থাৎ পরমেশ্বর-ভক্তিপ্রধান আসক্তি ও ফলকামনাশূন্য যজ্ঞাদি কর্ম্ম অচিরে মুক্তিফল দান করে, আর ভক্তিহীন সাংখ্য দীর্ঘ-কালে মুক্তি ফল দান করে।

এই ভাবের আভাস দ্বাদশ অধ্যায়েও আছে—

'ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্'। ইত্যাদি বচনই তাহার নিদর্শন।

অতএব "শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য" এ অংশ নিরর্থক ত নহেই—প্রত্যুত ভক্তিপ্রধান বলীয়ান কর্ম্মযোগের সাংখ্যজ্ঞান সহ বিন্যাস দ্বারা গীতার পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য সুরক্ষিত হইয়াছে।

প্রতিবাদী বলিলেন,—এখনও জিজ্ঞাসা নিবৃত্তি হয় নাই।

গীতাতে কথিত আছে—

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যা স্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥৯।৩২।

যাহাদিগের জন্ম নীচ কুলে, তাহারা অথবা স্ত্রীজাতি বৈশ্য এবং শূদ্র জাতি ইহারাও আমাকে আশ্রয় করিলে পরমগতি প্রাপ্ত হয়।৯।৩২।

অথচ গীতোক্ত আশ্রয় করিবার উপায় অর্থাৎ সাধন-মার্গ দুইটি সাংখ্য ও যোগ—জ্ঞানমার্গ ও কর্ম্মমার্গ। কর্ম্মমার্গ বিষয়ে গীতাতেই আছে "যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ॥" এই বিচার-প্রবন্ধের সিদ্ধান্ত যজ্ঞ ব্যতীত কর্ম্মে অর্থাৎ সকাম কর্ম্মে সংসার বন্ধন হয়, তাহা হইলে সেই বচন ও 'ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্' এই বচনে মিলাইলে অর্থ হয় বেদোক্ত জ্ঞানমার্গ ও বেদোক্ত কর্ম্মমার্গই পরম গতি অর্থাৎ মোক্ষ লাভের উপায়। স্ত্রী শূদ্রের বেদাধিকার বিষয়ে শাস্ত্রীয় বাধা থাকায় পরমেশ্বরের আশ্রয় গ্রহণের গীতাসম্মত পথ স্ত্রী শূদ্রের পক্ষে মিলিতেছে না। অতএব "মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য" ইত্যাদি শ্লোক মিথ্যা আশ্বাস বাক্যে পরিণত হয়। তবে যদি বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেই সকল জাতিই ব্রাহ্মণ হইয়া যায়, ইহা স্বীকৃত হয়; তাহা হইলে অসঙ্গতি থাকে না—হরিভক্তিবিলাসে তত্ত্ব-সাগর গ্রন্থ হইতে প্রমাণও উদ্ধৃত হইয়াছে যথা—

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্॥

রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কাংস্য ধাতু যেমন স্বর্ণ হয়, বিষ্ণুমন্ত্রদীক্ষায় সকল মানবেরই সেইরূপ ব্রাহ্মণ্য প্রাপ্তি হয়।

অতএব যে জাতিই হউক, বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেই সে দৈক্ষ্য ব্রাহ্মণ হইবে, বৈদিক জ্ঞান ও কর্ম্মে তাহার অধিকার হইবার পক্ষে কোন বাধা থাকে না। এইরূপ ব্যবস্থা গীতাসম্মত কি না? যদি না হয়, তাহা হইলে স্ত্রী শূদ্রের পরমেশ্বর সাধনায় গীতাসম্মত পথ কি?

ইহার উত্তর—

'যথা কাঞ্চনতাং যাতি' ইত্যাদি বচন পূর্ব্বতন বৈষ্ণবা-চার্য্যগণের অজ্ঞাত,—ইহা বর্ণাশ্রমহীন বীর শৈব বা পাশুপত-মতের অনুকরণ—পরবর্ত্তী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বচন। বৈষ্ণব-মতের শ্রেষ্ঠ সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক শ্রীরামানুজাচার্য্য বলেন,—

'ইদানীং পশুপতিমতস্য বেদবিরোধাদসামঞ্জস্যাচ্চানা-দরণীয়তোচ্যতে' ইহার পরে—তদীয় সম্প্রদায়ভেদ ও মত নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন—

'কেনচিৎ ক্রিয়াবিশেষণ বিজাতীয়ানামপি ব্রাহ্মণ্যপ্রাপ্তি মুত্তমাশ্রমপ্রাপ্তিঞ্চাহুঃ॥'—

'দীক্ষাগ্রহণমাত্রেণ ব্রাহ্মণো ভবতি ক্ষণাৎ
কাপালং ব্রতমাস্থায় যতির্ভবতি মানবঃ ॥' ইতি

অর্থাৎ পাশুপত-মত বেদবিরুদ্ধ ও সামঞ্জস্যহীন বলিয়া তাহা আদরণীয় নহে—ইহা 'পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ' (ব্রহ্মসূত্র ২ অঃ ২ পাদ শঙ্করভাষ্যমতে ৩৭ এবং শ্রীভাষ্যমতে ৩৫ সূত্র ব্যাখ্যা স্থলে আছে)। পাশুপত মতের পরিচয় প্রদানাদির পরে উপরে যে ভাষ্য পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার অনুবাদ—'কোন ক্রিয়াবিশেষের ফলে ব্রাহ্মণেতর জাতির ব্রাহ্মণ্য লাভ ও উত্তমাশ্রম—(যত্যাশ্রম) প্রাপ্তিও পাশুপতগণ বলিয়া থাকে, তাহাদিগের প্রমাণ—শৈবদীক্ষা হইলেই মনুষ্যমাত্রেরই ব্রাহ্মণ্য লাভ হয় এবং 'কাপাল ব্রত' গ্রহণ করিলেই যতি (চতুর্থাশ্রমী) হইয়া থাকে। অতএব দীক্ষা দ্বারা অপর জাতির ব্রাহ্মণ্য লাভ বেদবিরুদ্ধ, ইহাই সুপ্রসিদ্ধ। প্রতিষ্ঠিত পূর্ব্বতন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অপরিগৃহীত এবং কল্পিত বচন সম্পাদিত—ইহাই অনাদরমাত্র। এইজন্য হরিভক্তিবিলাসে তত্ত্বসাগরের বচন উদ্ধৃত হইলেও তাহা যে বৈষ্ণব দীক্ষার স্তুতিমাত্র—ইহা সেই প্রকরণস্থ অপর বিধানে ও পুরশ্চরণ প্রকরণের বিধানে পরিস্ফুট হইয়াছে। দীক্ষা-প্রকরণে আছে,—বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত পঞ্চরাত্র বিশারদ এবং গুরু কর্তৃক আচার্য্যপদে অভিষিক্ত ব্রাহ্মণ সকল বর্ণের গুরু হইবেন,—সেরূপ ব্রাহ্মণের অভাবে, ঐ প্রকার গুণসম্পন্ন ক্ষত্রিয়—ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয়ের গুরু হইবেন, তদভাবে ঐরূপ গুণসম্পন্ন বৈশ্য, বৈশ্য ও শূদ্রের গুরু হইবেন, তদভাবে ঐরূপ গুণসম্পন্ন শূদ্র, শূদ্রের গুরু হইবেন। গুরু শব্দের অর্থ দীক্ষাদাতা। কিন্তু প্রাতিলোম্যে ন দীক্ষয়েৎ—নিম্নবর্ণ উচ্চবর্ণকে দীক্ষা দিবে না। (হরিভক্তিবিলাসের দীক্ষা প্রকরণ দ্রষ্টব্য)।

পুরশ্চরণ অদীক্ষিতের নাই, বৈষ্ণবের পুরশ্চরণ প্রসঙ্গে হরিভক্তিবিলাসে আছে, হোমে অশক্ত ব্যক্তির হোমানুকল্পরূপ—জপদ্বারা হোমের ফল হইবে। পুরশ্চরণে মন্ত্রবিশেষে—বিশেষ বিশেষ সংখ্যা নির্দ্দেশ আছে, কোন মন্ত্রের পুরশ্চরণ ছয় লক্ষ জপ, কোন মন্ত্রে ১০ লক্ষ জপ ইত্যাদি। পুরশ্চরণে যত জপ—তাহার দশ ভাগের এক ভাগ হোমসংখ্যা হইবে, যথা ৬ লক্ষ জপে পুরশ্চরণ হইলে, ৬ হাজার হোম হইবে, হোমে অক্ষম ব্রাহ্মণের ১২ হাজার জপ—অতিরিক্ত করিতে হইবে উহা হোমের অনুকল্প—

'যদ্‌যদঙ্গং ভবেদূনং তৎসখ্যাদ্বিগুণো জপঃ।
হোমকর্ম্মণ্যসক্তানাং হোমসংখ্যাগুণঃস্মৃতঃ ॥'

ইহার পর, জাতিবিশেষে জপসংখ্যা নির্দ্দেশ এবং সর্ব্বশেষে আছে—

যং বর্ণমাশ্রিতঃ শূদ্রঃ স চ তস্য বিধিং চরেৎ।
অনাশ্রিতস্য শূদ্রস্য দিক্‌সংখ্যাকঃ সমীরিতঃ ॥

ব্রাহ্মণের পক্ষে হোমানুকল্প দ্বিগুণ জপ, ক্ষত্রিয়ের চতুর্গুণ, বৈশ্যের ৮ গুণ,—আর শূদ্র যে বর্ণের আশ্রয়ে থাকিবে অর্থাৎ দাস্যে নিযুক্ত থাকিবে, সেই বর্ণের বিহিত সংখ্যানুসারে তাহার জপ, অনাশ্রিত (দাসত্বহীন) শূদ্রের ১০ গুণ জপ—অর্থাৎ পুরশ্চরণে যত জপ—অনাশ্রিত শূদ্রেরও হোমানুকল্প তত জপ হইবে। এক্ষণে কথা এই—যদি বৈষ্ণব দীক্ষাতে প্রকৃতই ব্রাহ্মণ্য হইত—তাহা হইলে, হোমের অনুকল্পস্থলে জাতিবিশেষে জপের সংখ্যাবিশেষ হরিভক্তিবিলাসে উপদিষ্ট হইত না। হরিভক্তিবিলাস-কথিত বৈষ্ণব পুরশ্চরণ বিষ্ণুমন্ত্র দীক্ষা না হইলে ত হইতেই পারে না।

অতএব শৈব দীক্ষা দ্বারা সকল মানবের ব্রাহ্মণ্য লাভ পাশুপত মতে স্বীকৃত হওয়াতে শ্রীরামানুজাচার্য্য যে বেদবিরোধ প্রদর্শন দ্বারা ঐ মতকে হেয় বলিয়াছেন, বৈষ্ণব মতে সেই দোষ থাকিলে তাহাও হেয় হইত,—অতএব ঐ দোষ বৈষ্ণব দীক্ষার নাই,—ইহা যেমন শ্রীরামানুজাচার্য্যের মত, হরিভক্তিবিলাসেরও ঐ মত। শৈবাগমে শৈব দীক্ষা স্তুতির ন্যায় তত্ত্বসাগরেও—বৈষ্ণব দীক্ষায় স্তুতির জন্য—'যথা কাঞ্চনতাং যাতি' ইত্যাদি বচন গ্রহণীয় বলিলে, শৈব মত ও বৈষ্ণব মত কিছুই অনাদরণীয় হয় না। দীক্ষা দ্বারা জাতিপরিবর্ত্তন যে প্রামাণিক বৈষ্ণবাচার্য্যগণের অসম্মত ইহা প্রমাণিত হইল। অতএব বৈষ্ণব দীক্ষা প্রাপ্ত শূদ্রের ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্মাধিকার স্বীকার করিয়া শূদ্রের পরমগতি প্রাপ্তিবোধক গীতা বচনের সমন্বয় সাধন হয় না। কিন্তু সমন্বয় সাধনের উপায় গীতাতেই আছে—যথা—

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবি র্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণাহুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্ম সমাধিনা ॥ ৪।২৪।

হইতে—

দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞা স্তথা পরে।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ৪।২৮

পর্য্যন্ত শ্লোকে যে যজ্ঞের উপদেশ আছে, তাহা বেদমূলক হইলেও—বেদাধ্যয়ন বা বেদমন্ত্র পাঠসাধ্য নহে,—তাহাতে স্ত্রী-শূদ্রেরও অধিকার আছে।

সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে॥

এই বচন পূর্ব্বপ্রবন্ধে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

এই সমস্ত কর্ম্মও কর্ম্মযোগ নামে উক্ত সনাতন ধর্ম্মের অন্তর্গত। এই সকল কর্ম্মে সকল জাতির স্ত্রী-পুরুষের অধিকার আছে।

অতএব এই সকল অনুষ্ঠান কর্ম্মযোগমার্গের অন্তর্গত বলিয়া—'ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহং' এই বচনের সহিত 'মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য' ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত বচনের কোনই বিরোধ নাই।

যে সব যজ্ঞের ফল স্বর্গ—যথা অগ্নিহোত্র সোমযাগাদি—তাহাতে শূদ্রের অধিকার না থাকিলেও—প্রণাম নামকীর্ত্তনাদি দ্বারা, দান দ্বারা এবং ধ্যানাদি দ্বারা যে পরমেশ্বরের আরাধনা—তাহাতে অধিকার শূদ্রেরও আছে—মানব মাত্রেরই আছে। সেই আরাধনায় যে আত্মসমর্পণ করিতে পারিয়াছে—যে জাতিই হউক 'তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্।' তাহারও পরমগতি হয়।

শ্রবণ মননাদিক্রমে যে পথ তাহা ব্রাহ্মণের জন্য নির্দ্দিষ্ট। ইহাই গীতা-সিদ্ধান্ত।

বর্ত্তমান প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত সার এই যে—স্বর্গ ও মোক্ষে ভেদ আছে। মতান্তরে অক্ষয় স্বর্গ স্বীকৃত হইলেও গীতা-সিদ্ধান্তে অক্ষয় স্বর্গ নাই, মোক্ষসুখই অক্ষয়। স্বর্গ সকাম কর্ম্মের ফল। মোক্ষ নিষ্কামভাবে পরমেশ্বরারাধনা ও শ্রবণাদি সম্পাদিত জ্ঞানযজ্ঞের ফল। ফল বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেও মোক্ষের উৎপত্তি নাই, প্রকাশ মাত্র। পরমেশ্বরে আত্মসমর্পণ করিতে পারিলে সেই মোক্ষ সকল মানবেরই হইতে পারে।

সপ্তম অনুপ্রশ্নের বিচার সমাপ্তি এই স্থানেই হইল।

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন।

বিদায় মাগি

উজানেতে গুণ টানিয়া
　　সুদীর্ঘ পথ এসেছি ভাই,
যে ভার আমি নিয়েছিলাম
　　বন্দরে তা নামায়ে যাই।
দেয়নি আমায় বারেক তরে
　　উৎসাহ কি সাহস কেহ,
ভগবানে ভর করিয়া
　　বল পেয়েছে অবশ দেহ,
ঝঞ্ঝা ঝানাস্ অনেক পেলাম
　　অনেক নিশি কাট্‌লো জাগি,
আজ্‌কে আমি শ্রান্ত বড়
　　বিদায় দে'হ বিদায় মাগি।

ঈশান কোণে মেঘের ডাকে
　　তরী আমি ভিড়াই নিকো,
সম্মুখেরি ঘুর্ণী ভয়ে
　　গতি তাহার ফিরাই নিকো।
দরাজ বুকে হাল ধরেছি
　　সাম্‌নে রেখে ধ্রুবতারা,
পণ্যভরা পুণ্যতরী
　　ছুটেছিল তকুল হারা,
আঁট দিয়েছি আজকে ঘাটে—
　　কোন কায আর নাইক বাকি
আজকে আমি শ্রান্ত বড়
　　বিদায় দে'হ, বিদায় মাগি।

যাহার ডাকে কঠিন পথে
　　আনন্দেতে এসেছিলাম,
সকল বিপদ বরণ করে
　　যাঁরে ভাল বেসেছিলাম।
জীবন ধরে যাঁহার কোল
　　জয়-পতাকা বহেছি ভাই,
অকারণে নিন্দা ঘৃণা
　　লাঞ্ছনাও সহেছি ভাই,
তাঁহার আদেশ পালন করে
　　তাঁহার গুণের অনুরাগী—
আজকে আমি শ্রান্ত বড়
　　বিদায় দে'হ বিদায় মাগি।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

ভারতের বাণিজ্য এবং রাজস্ব

কংগ্রেস-মন্ত্রীরা ভারতের আটটি প্রদেশের শাসন-তরণির কর্ণধার হইয়া দেশের প্রকৃত হিতসাধন করিবার জন্য যে বিশেষ আগ্রহান্বিত হইয়াছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। স্বায়ত্তশাসন লাভ হইলে দেশের হিতসাধন করিবার আকাঙ্ক্ষা স্বতই জাগিয়া উঠে। বর্ত্তমান সময়ে ভারতের আর্থিক সমস্যাই উৎকট হইয়া উঠিয়াছে। এক কালের ধনধান্যে সমৃদ্ধ ভারতবর্ষ এখন দুর্ভিক্ষ জীর্ণ এবং বেকার-সমস্যায় শীর্ণ। শত শত লোক কর্ম্মাভাবে সহরে কর্ম্মপ্রাপ্তির জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছে এবং দিন মজুরের মত বেতনের কোন চাকুরী পাইলেই আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতেছে। শত শত লোক অর্থাভাবে পর্য্যাপ্ত এবং উপযুক্ত খাদ্যের সংস্থান করিতে না পারিয়া অর্দ্ধাশনে বা অনশনে ক্ষীণবল হইয়া সংসার হইতে বিদায় লইতেছে। এখন ভারতের পক্ষে এই সমস্যার সমাধান যে শাসনকার্য্য পরিচালন সম্পর্কে সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্বপ্রধান সমস্যা, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশমাত্র নাই। যাহা হউক, সেই জন্য আটটি কংগ্রেসশাসিত প্রদেশের মন্ত্রীরা এই সমস্যার সমাধানে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন; ধীরে ধীরে কিছু কিছু কাযও হইতেছে। গত বৎসর এই কংগ্রেস-শাসিত প্রদেশাষ্টকের সচিবমণ্ডলী দিল্লী সহরে এক সমিতি বসাইয়া এই আর্থিক সমস্যার সমাধানকল্পে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। সেই সমিতিতে সিদ্ধান্ত করা হয় যে, ভারতে যথাসম্ভব সত্বর উচ্চ অঙ্গের শ্রমশিল্প গঠন করিতে হইবে। সরকার পক্ষ হইতে ভারতে শিল্প-সমস্যার সমাধানকল্পে এইরূপ সমিতি আর কখনই আহূত হয় নাই। এই ব্যাপার বর্ত্তমান ভারতে নূতন।

অষ্ট প্রদেশের সচিব-সমিতি পরামর্শ পূর্ব্বক স্থির করিয়াছেন যে, ভারতে অবিলম্বে শ্রমশিল্প গড়িয়া তুলিতে ত হইবেই, অধিকন্তু কি ভাবে সেই শ্রমশিল্প গড়িয়া তোলা যাইবে, তাহা ভাবিয়া স্থির করিবার জন্য একটি জাতীয় পরিকল্পনা-সমিতি গঠিত করিতে হইবে। তদনুসারে একটি জাতীয় পরিকল্পনা-সমিতিও গঠিত হইয়াছে। সম্প্রতি বোম্বাই সহরে সেই সমিতির বৈঠক বসিয়াছিল। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সেই সমিতির সভাপতি হইয়াছেন। ঐ সমিতি গঠিত হইবার ফলে হোমরা-চোমরা য়ুরোপীয় বার্ত্তাশাস্ত্র-বিশারদ মহলে ভারতের বহির্বাণিজ্য এবং সরকারী রাজস্ব সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশিত হইতেছে, তাহারই সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতেছি।

বিগত সংখ্যার 'এসিয়াটিক রিভিউ' পত্রে এই সম্বন্ধে মিষ্টার আর ডবলিউ ব্রক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। মিষ্টার ব্রক ভারত সম্বন্ধে অভিজ্ঞ। তিনি অনেক দিন কলিকাতায় "ক্যাপিটাল" পত্রিকার সম্পাদনা করিয়া গিয়াছেন। অর্থ এবং বাণিজ্য সম্বন্ধে তাঁহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। সুতরাং তাঁহার কথার যে একটা বিশেষ মূল্য আছে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। বিশেষতঃ য়ুরোপীয় মহলে তাঁহার কথার মূল্য কিছু অধিক।

মিষ্টার ব্রক তাঁহার প্রবন্ধের মুখবন্ধেই বলিয়াছেন, গত মার্চ্চ মাসে ভারত সরকারের রাজস্ব-সচিব তাঁহার শেষ বাজেট প্রস্তাব দাখিল করিবার সময় যে বিবৃতি প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে একটা ব্যাপার বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার আছে। বিদেশ হইতে ভারতে আমদানীর শুল্কের পরিমাণ দেখিয়া বুঝা যায় যে, ভারতে অধিক পরিমাণে যন্ত্রপাতি ও কার্পাস তুলা আমদানী হইতেছে। ভারতবর্ষ যে অধিক পরিমাণে কল-কব্জা কিনিতেছে, তাহা দেখিয়া বেশ বুঝা যায়, ভারতবাসীরা ক্রমশঃ শ্রমশিল্প-সেবায় রত হইতেছে। ইদানীং কয়েক বৎসর ভারতীয় কার্পাস কলওয়ালারা লম্বা আঁকড়াযুক্ত কার্পাস প্রতি বৎসর গড়ে ৭ লক্ষ গাঁট করিয়া আমদানী করিতেছেন। ভারতবর্ষ যে বিদেশ হইতে কাঁচা মাল আমদানী করে, ইহা একটা নিয়ম-বহির্ভূত ব্যাপার। কারণ, ভারতবাসীরা ঐ সকল কাঁচা মাল তাহাদের দেশেই উৎপন্ন করিতে পারে। তবে প্রস্থানপর রাজস্ব-সচিব বলিয়াছেন যে, লম্বা আঁকড়াযুক্ত কার্পাস তুলার উপর আমদানী-শুল্কের মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া দেওয়াতে ভারতে ঐ প্রকার তুলার চাষ অধিক হইতে পারিবে। আমদানী-শুল্ক বৃদ্ধি করার ফলেই যে ভারতে লম্বা আঁকড়ার তুলা অধিক উৎপন্ন হইবে, না হইলে হইবে না, একথা সিদ্ধান্তানুসারে মনে করিতে পারা যায় না। গত মার্চ্চ মাসে আমদানী-শুল্ক ত বসিয়াছে, কিন্তু তথায় পূর্ব্ব হইতেই যে ভারতে লম্বা আঁকড়ার তুলার চাষ অধিক হইতেছে, তাহা মিষ্টার ব্রক জানেন না কি? গত এপ্রিল মাসে কলিকাতায় কমার্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স বিভাগের ডিরেক্টার কার্পাস তুলা সম্বন্ধে যে বিবরণ বাহির করিয়াছেন, তাহাতে তিনি কৃষি বিভাগের ডিরেক্টারদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত বিবরণ সন্নিবিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। সেই বিবরণীতে প্রকাশ, বর্ত্তমান বৎসরে ভারতে ৫১ লক্ষ ২০ হাজার গাঁট তুলা উৎপন্ন হইবে। ব্যবসায়ীদিগের অনুমান ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক। তাঁহারা অনুমান করিতেছেন যে ৫৯ লক্ষ ৭৯ হাজার গাঁট কার্পাস-তুলা এবার জন্মিবে। তন্মধ্যে সাড়ে ৪ লক্ষ গাঁট কাপড়ের কলে না আসিয়া বাহিরে বিকাইবে। এই উৎপন্ন তুলার প্রায় শতকরা ৫ ভাগ তুলার আঁকড়া লম্বে এক ইঞ্চি বা তাহার উপর, আর শতকরা ৩২ ভাগ তুলার আঁকড়ার দৈর্ঘ্য এক ইঞ্চির কিছু কম (⅞ ইঞ্চি হইতে ৩১/৩২ ইঞ্চি পর্য্যন্ত)। ইহার পূর্ব্ব বৎসর ভারতে মোট উৎপন্ন তুলায় শতকরা ২৭ ভাগ, তৎপূর্ব্ব বৎসর শতকরা ৪ ভাগ ঐরূপ আঁশযুক্ত তুলা উৎপন্ন হইয়াছিল। সুতরাং ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, ভারতে ইদানীং লম্বা এবং মাঝারি আঁকড়ার তুলা ক্রমেই অধিক উৎপন্ন হইতেছে। শুল্কবৃদ্ধি করার ফলে এই ফল লাভ হয় নাই। ভারতবাসীরা তাহাদের প্রয়োজন বুঝিয়াই এই বিষয়ে অবহিত হইয়াছে।

রাজস্ব-সচিবের শুল্ক-নীতির সমর্থক এই লেখকটি বলিয়াছেন যে, ভারতের কার্পাস-কলওয়ালারাই কয়েক বৎসর ধরিয়া তাহাদের দেশের উচ্চ শুল্ক প্রাকার দ্বারা সুরক্ষিত ভারতীয় বাজারের সর্ব্ববিধ সুবিধা পাইয়া আসিতেছিলেন। পক্ষান্তরে কার্পাস-উৎপাদক

কৃষীবলকে এক দিকে তাহাদের উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা দিন দিন হ্রাস এবং অন্য দিকে উহার উৎপাদন ক্রমশঃ বৃদ্ধির জন্য প্রবর্দ্ধমান প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হইতেছিল। এ পর্য্যন্ত এই সঙ্কট অবস্থায় কোন কার্য্যকরী সমাধানের উপায় খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই।" সার জেমস গ্রীগের কার্য্যের এইরূপ সমর্থন শুনিয়া আমরা বিস্মিত হই নাই, কিন্তু এদেশের তন্তুবায় প্রভৃতি শিল্পী জাতিদিগকেও কি এইরূপ সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয় নাই? মিষ্টার ব্রক অবশ্য জানেন যে, এক সময় এই বাঙ্গালা দেশ হইতে কোটি টাকা মূল্যেরও অধিক বস্ত্র বিদেশে রপ্তানী হইত এবং পরে তাহা একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা হইতে বিদেশে ১ কোটি ৩১ লক্ষ ৫১ হাজার ৪ শত ২৭ সিক্কা টাকার কাপড় রপ্তানী হইয়াছিল, তাহার পর বৎসর রপ্তানী হইয়াছিল প্রায় ১ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকার বস্ত্র। * কিন্তু তাহার পর যখন লাঙ্কাশায়ারের কলজাত বস্ত্রের সহিত প্রতিযোগিতায় বাঙ্গালার তন্তুবায়দিগকে বিপন্ন হইতে হইয়াছিল, তখন কি তাহাদিগকে ঐরূপ সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয় নাই? ভারতীয় কলওয়ালারা আজকাল প্রতি বৎসর ৭ লক্ষ গাঁট করিয়া লম্বা আঁকড়ার তুলা মিশর ও মার্কিণ হইতে লইতেছেন. সেই জন্যই মিষ্টার ব্রক সার জেমসের কার্য্যের এই সমর্থন করিতে যাইয়া এক লোষ্ট্রে দুই পক্ষী শিকারের প্রয়াস পাইয়াছেন।

ভারতে কার্পাস-কল যেমন অধিক প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, তেমনই ভারতজাত কার্পাস ভারতের মধ্যেই অধিক বিকাইতেছে। ভারতীয় কার্পাসকলগুলিতে কার্পাসের হিসাব দেখিলেই তাহা বুঝা যাইবে। কোন্ বৎসর কার্পাসকল কত বসিয়াছে, এবং তাহাতে কত কার্পাস খরচ হইয়াছে, তাহার হিসাব নিম্নে দিতেছি:—

খৃষ্টাব্দ	কলের সংখ্যা	কলে গৃহীত কার্পাস-তূলার পরিমাণ	গাঁট
১৯২৮	৩৩৫	২০,০৯,৭৮২	"
১৯২৯	৩৪৪	২১,৬১,১৬৬	"
১৯৩০	৩৪৮	২৫,৭৩,৭১৪	"
১৯৩১	৩৩৯	২৬,৩৩,১৭৬	"
১৯৩২	৩৩৯	২৯,১১,২৬৪	"
১৯৩৩	৩৪৪	২৮,৩৭,১৫৮	"
১৯৩৪	৩৫২	২৭,০৩,৯৯০	"
১৯৩৫	৩৬৫	৩১,২৩,৪১৪	"
১৯৩৬	৩৭৯	৩১,৮৪,৪১৮	"
১৯৩৭	৩৭০	৩১,৪৬,৭৫২	"

এই হিসাব দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, ভারতে কার্পাস-কলের সংখ্যা যত বৃদ্ধি পাইতেছে,—ভারতীয় কার্পাস-কলে সেই কার্পাসের কাটতিও তত বৃদ্ধি পাইতেছে। তবে বিদেশে পণ্য বেচিতে হইলেই আন্তর্জ্জাতিক বাজারের প্রতিযোগিতা সকলকেই সহ্য করিতে হইবে। ভারত বেনদার দেশ বলিয়াই ভারতের বহির্দ্দেশে পণ্য চালান দিবার প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক।

ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ প্রচুর। সেই সম্পদ বৃদ্ধির সম্ভাব্যতাও যথেষ্ট রহিয়াছে। তাহার সদ্ব্যবহার এবং বিকাশসাধনের অধিকার যে ভারতবাসীর আছে, মিষ্টার ব্রকও তাহা অস্বীকার করেন নাই। মিষ্টার ব্রক বলিয়াছেন যে, "ভারতবাসীকে যে ইদানীং আর্থিক স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে, রাজনীতিক ক্ষেত্রেও ইহার যাথার্থ্য স্বীকার করিতেই হইবে। সেই জন্য ইদানীং বৃটিশ সরকার বৃটিশ পণ্যাজীবিদিগের সহিত ভারতীয় পণ্যাজীবিদিগের মধ্যে স্বার্থ লইয়া আপাতপ্রতীয়মান দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইলে ভারতীয় শাসন পরিষদের এবং ব্যবস্থা পরিষদের মতকে বরাবরই অগ্রাহ্য করিয়া আসিতেছেন। উভয় পক্ষের যে কথা-বার্ত্তা চালনার ফলে অটোয়া-চুক্তি সিদ্ধ হইয়াছিল, সেই কথা-বার্ত্তা চালাইবার সময় বৃটিশ জাতির প্রতিভূগণ সঙ্কল্প গ্রহণ পূর্ব্বক নিরপেক্ষতা প্রকটিত করিয়াছিলেন। সেই অটোয়া-চুক্তির ফলে গ্রেট বৃটেন অপেক্ষা ভারতবাসীরা অধিক লাভবান হইয়াছিল; ইহা বাণিজ্যের হিসাব দেখিলেই বুঝা যায়। ভারতের সহিত গ্রেট-বৃটেনের যে নূতন বাণিজ্য-চুক্তি হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে কথা-বার্ত্তা দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিয়াছিল এবং সেই কথা-বার্ত্তা চালাইবার সময় ভারতবাসীরা অটোয়া-চুক্তির সর্ত্তগুলির তারস্বরে নিন্দা করিয়াছিলেন, তখনও বৃটিশ প্রতিনিধিরা ধৈর্য্য ধরিয়া সেই নিরপেক্ষতা রক্ষা করিয়া চলিয়াছিলেন।"—ইহাই মিষ্টার ব্রকের উক্তির ধ্বনি। অটোয়া-চুক্তি এবং নূতন ইঙ্গ-ভারতীয় চুক্তি সম্বন্ধে অনেক কথাই ভারতবাসীদের পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে, সুতরাং বাক্‌বিতণ্ডা নিষ্প্রয়োজন। মিষ্টার ব্রকের প্রবন্ধটি আদ্যন্ত পাঠ করিলে বেশ বুঝা যায়, অন্যান্য অনেক বৃটেনবাসীর ন্যায় তিনিও ভারতে অধিক মাত্রায় শ্রমশিল্পের প্রতিষ্ঠা বিশেষ সুনজরে দেখিতে পারেন না। ইহা মানুষের স্বভাবসিদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু নিরপেক্ষ বিচারের পরিচায়ক নহে। ভারতবাসীরা যে শ্রমশিল্পসেবায় আত্মনিয়োগ করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাহাতে গ্রেট বৃটেন যে কোন প্রকার তীব্র আর্থিক বা অন্যপ্রকার বাধা প্রদান করেন নাই,—ভারতবাসীরা বৃটিশ-পণ্য অল্প পরিমাণে খরিদ করিতেছেন, সে দিকে বৃটিশ জাতিরা ভ্রূক্ষেপ করেন নাই,—এইরূপ ভাবের কথা তাঁহার উক্তির ব্যঞ্জনা হইতে বেশ বুঝা যায়। তিনি বলিয়াছেন যে, ১৯০৯ হইতে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গ্রেট বৃটেন ভারতের সমস্ত আমদানী পণ্যের শতকরা ৬৩ ভাগ সরবরাহ করিয়া আসিয়াছে। ইহার মধ্যে টাকা-কড়ি এবং সরকারী হিসাবের আমদানী ধরা হয় নাই। আর ইহার পর ১৯৩৫-৩৬ খৃষ্টাব্দে যোগানের আনুপাতিক পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল শতকরা ৩৯ অংশ। তাহার পর ১৯৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দে বৃটেন কর্ত্তৃক ভারতে আমদানী পণ্যের আনুপাতিক পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে শতকরা ৩০ ভাগ। পক্ষান্তরে বিলাতে ভারতীয় পণ্য-আমদানীর পরিমাণ যুদ্ধের ঠিক পূর্ব্বসময়ে শতকরা ২৫ ভাগ ছিল। তাহার পর ১৯৩৫-৩৬ খৃষ্টাব্দে উহার আনুপাতিক হার দাঁড়াইয়াছিল শতকরা ৩১ ভাগ; ১৯৩৭—৩৮ খৃষ্টাব্দে দাঁড়াইয়াছে শতকরা ৩০ ভাগ।

ইহার পরই মিষ্টার ব্রক লাঙ্কাশায়ারস্থ তাঁতিদিগের ক্ষতির কথা তুলিয়া বলিয়াছেন যে, অটোয়া-চুক্তির দ্বারা লাঙ্কাশায়ারের তাঁতিদিগের কোন লাভই হয় নাই। বিগত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বকার ৫ বৎসরের হিসাব দেখিলেই বুঝা যায় যে, এ সময় ভারতে বিদেশ হইতে যত পণ্য আমদানী হইত, তাহার শতকরা ৩৬ ভাগ আসিত কার্পাস-পণ্য। পরে ১৯৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দে ভারতে বিদেশ হইতে যত পণ্য আমদানী

* সার চার্লস ট্রেভেলিয়ান ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে যে হিসাব দিয়াছিলেন, তাহা হইতে সঙ্কলিত।

হইয়াছে, তাহার শতকরা ৯ ভাগ মাত্র ছিল বিলাতী বস্ত্র। তিনি কথাটা আরও খোলসা করিয়া বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বে ভারতে যে পরিমাণ কল-জাত বস্ত্র কাটিত, তাহার চারি ভাগের তিন ভাগ যোগাইত লাঙ্কাশায়ারের তাঁতিরা আর সিকি ভাগ যোগাইত ভারতীয় কার্পাস-কলওয়ালারা। আর এখন লাঙ্কাশায়ারের তাঁতিরা এবং জাপানী তাঁতিরা ভারতের সিকি পরিমাণ কাপড় যোগাইতেছে, আর ভারতীয় কলওয়ালারা বার আনা পরিমাণ কাপড় বেচিতেছে। ভারতীয় কার্পাস-কলসমূহে উৎপন্ন পণ্যের পরিমাণ ৫০ কোটি গজ বৃদ্ধি পাইয়া ৪ শত ৮ কোটি ৪০ লক্ষ গজে দাঁড়াইয়াছে, ইহা ট্রেড-কমিশনার সার টমাস আইনস্কর্ক বলিয়াছেন। মিষ্টার ব্রক তাঁহার কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, "এক সময়ে ভারতে ৩ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের লাঙ্কাশায়ারী বস্ত্র বিকাইয়াছে, আর গত বৎসর তথায় ৯০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের বিলাতী কাপড় বিকাইয়াছে। যে আন্দোলনের ফলে এই অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, তাহার পরিবর্ত্তন বাঞ্ছনীয় হইলেও সে চেষ্টা সফল হইত না।"

মিষ্টার ব্রক লাঙ্কাশায়ারের বস্ত্র ভারতে কম আমদানী হইতেছে বলিয়া যেন একটু উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছেন এবং ভারতীয় কলওয়ালাদিগের কতকগুলি বিশেষ সুবিধা আছে, ইহাও বলিয়াছেন। ভারতবাসীর যে স্বদেশে বস্ত্র উৎপাদনের অধিকার আছে, ইহা মিষ্টার ব্রকও অস্বীকার করিতে পারেন নাই। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী এদেশে বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে এই ভারতে যে পরিমাণ বস্ত্র উৎপন্ন করা হইত, তাহাতে সমস্ত ভারতবাসীর প্রয়োজন মিটাইয়া বিদেশে বহু কোটি টাকার বস্ত্র চালান দেওয়া হইত। তাহার পর যখন ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী এদেশে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন, তখনও প্রতিবৎসর এই বাঙ্গালাদেশ হইতে বহু কোটি টাকার বস্ত্র বিদেশে চালান যাইত। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে বিদেশ হইতে এই বাঙ্গালায় কেবলমাত্র ৯১ হাজার ১০ টাকার কার্পাস-বস্ত্র আমদানী হইয়াছিল। ১৮১৪-১৫ খৃষ্টাব্দে বিদেশ হইতে বঙ্গদেশে ৫৫ হাজার সিক্কা মূল্যের বস্ত্র আমদানী হইয়াছিল,—ইহা সার চার্লস ট্রেভেলিয়ানের প্রদত্ত হিসাব হইতেই বুঝা যায়। এত বড় বঙ্গদেশের পক্ষে ইহা অধিক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। ঐ সময়ে বাঙ্গালা হইতে অনেক টাকার বস্ত্র বিদেশে রপ্তানী হইত। আর গত বৎসর ভারতে ১২ কোটি টাকারও (৯০ লক্ষ পাউণ্ডের) অধিক মূল্যের বস্ত্র এই ভারতে আমদানী হইয়াছে, তাহাতে লাঙ্কাশায়ারের তাঁতিদিগের এরূপভাবে আর্ত্তনাদ করা কি শোভনীয়? ১৮২৪-২৫ খৃষ্টাব্দে ভারতে বিদেশ হইতে সূতা আমদানী হইতে আরম্ভ হইয়াছে। তাহার পূর্ব্বে এদেশে বিদেশ হইতে সূতা আমদানী হইত না। তাহার পর হইতে এই সূতা আমদানী অতি দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে সার চার্লস্ ট্রেভেলিয়ান তাঁহার মন্তব্যে লিখিয়াছিলেন,—

Bengal piece-goods have been displaced in the foreign market to the extent of about a crore of rupees a year, and in the home-market (cotton twist included) to the extent of about 80 lacs, being in all to the extent of about a crore and eighty lacs. Even a trifling quantity of piece-goods which is still exported is for the most part made from English twist

অর্থাৎ "বিদেশ হইতে বস্ত্র আমদানীর ফলে বাঙ্গালার ভিতরে এবং বাহিরে বাঙ্গালী তাঁতিদিগের প্রস্তুত ১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকার কার্পাস-বস্ত্র ও সূত্র উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদেই কম বিকাইতে থাকে। এই জন্য যাহাদের বৃত্তিনাশ হইয়াছিল, তাহাদের জন্য কিছু করিতে সার চার্লস্ ট্রেভেলিয়ান সরকারকে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু সরকার বা বিলাতী তন্তুবায়রা সে কথায় কর্ণপাতও করা কর্ত্তব্য মনে করেন নাই।"

এই ভারতবাসীর পূর্ব্ব-পুরুষগণ কার্পাস-শিল্পের উদ্ভাবনা ও উৎকর্ষ সাধন করিয়া গিয়াছেন। দুই শত বৎসর পূর্ব্বে পাশ্চাত্য-খণ্ডের অধিবাসীরা কার্পাসের নাম পর্য্যন্ত শুনে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। * স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতে কার্পাস বস্ত্র প্রস্তুত এবং ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। এরূপ অবস্থায় ভারতবাসীর সেই শিল্পের পুনরুজ্জীবন করিবার চেষ্টা কি ন্যায়তঃ একান্ত কর্ত্তব্য নহে? যাহা ন্যায়তঃ কর্ত্তব্য, ভারতবাসীরা তাহাই করিতেছেন। সে জন্য আপত্তি করিলে চলিবে কেন? কলরব তুলিলেই বা লোক তাহা শুনিবে কেন? মিষ্টার ব্রক এবং সার টমাস আইনস্কর্ক উহাতে তীব্র ভাষায় আপত্তি করেন নাই বটে,—কিন্তু তাঁহাদের মনের ভাব তাঁহাদের লেখার ভঙ্গীতেই সুপ্রকাশ। বৃটিশ ট্রেড-কমিশনার সার টমাস আইনস্কর্ক স্পষ্টই বলিয়াছেন, দেশের লোকের জিনিষ কিনিবার অর্থ যে বাড়িয়াছে, তাহা বিভিন্ন পণ্যের আমদানী বৃদ্ধি দেখিলেই ধরা যায়। কিন্তু ভারতীয় মিলগুলি এক এক করিয়া বৃটিশ কলওয়ালাদিগের বিভিন্ন রকমের বা ঢোলের (style) কাপড় প্রস্তুত করিয়া বাজারে বাহির করিতেছে, সেই জন্য বিলাতি বস্ত্র-বাণিজ্যে ভাটা পড়িতেছে। বিলাতের বস্ত্রপ্রস্তুতকারকরা যে উপায়ে ভারতবাসীর নিকট হইতে বস্ত্রনির্ম্মাণের কৌশল জানিয়া লইয়াছিল, তাহা ইতিহাসে উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত আছে।

বিলাত হইতে ভারতে ইস্পাতের আমদানী কমিতেছে,—সে কথাও মিষ্টার ব্রকওয়ে বলিতে ভুলেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন যে, ভারতে ঘরের শিল্প বিস্তারলাভ করিতেছে বলিয়া বিলাতী পণ্য ভারতে কম বিকাইতেছে। উদাহরণস্বরূপ তিনি ইস্পাতের কথা বলিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন, বিলাতী কলওয়ালারা ভারতীয় বাজারে লাভ করিবেন বলিয়া ভারতে তাঁহাদের কারখানার শাখা খুলিয়াছেন,—তাহার ফলেও বিলাতী পণ্য ভারতে আরও কম আমদানী হইতেছে। বিলাতী লৌহ এবং ইস্পাত ভারতে

* The enormous importance of the textile today, in the agricultural, commercial, industrial and social life of the world, renders it difficult to believe that, but little more than two hundred years ago cotton was practically unknown to the civilized nation of the West.—The Commercial products of India, p 570.

এখন অল্প বিকাইতেছে সত্য,—কিন্তু এ ভাব যে উপস্থিত হইবে, তাহা তাঁহাদের জানাই উচিত ছিল। ভারতে লৌহ এবং ইস্পাত-শিল্প অজ্ঞাত ছিল না। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেও লক্ষ লক্ষ লোক ঐ শিল্প-কার্য্যে জীবিকা অর্জ্জন করিত। এ সম্বন্ধে অনেক তথ্যই ইদানীং প্রকাশ পাইয়াছে। বিলাত এবং অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশ হইতে কলের সাহায্যে প্রস্তুত লৌহ এ দেশে শস্তাদরে প্রভূত পরিমাণে আমদানী হওয়ায় ঐ সকল শিল্প নিঃশেষ হইয়া যায়। ভারতীয় লোহার, কোল প্রভৃতি জাতি,—যাহারা পুরুষপরম্পরাক্রমে * লৌহশিল্পের সেবা করিয়া দিনযাপন করিত, তাহারা বৃত্তি-বিহনে হাহাকার করিয়া মরিয়াছে, কিন্তু সরকার বা শাসক-জাতির অন্য কেহ তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাদের কনিষ্ঠাঙ্গুলি পর্য্যন্ত উত্তোলন করেন নাই। তাহাদের নীরব এবং নিষ্ক্রিয় হাহাকার দিগন্তে বাহিয়া মিশিয়াছে।

ভ্যালেণ্টাইন বল এই শিল্প উচ্ছেদের কথা তাঁহার প্রণীত 'Jungle Life in India' নামক পুস্তকের ২২৪-২৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছেন। বীরভূম কোম্পানী নামক ইংরেজ কোম্পানীকে তদানীন্তন ভারত সরকার যেরূপ সর্ত্তে লৌহ-পণ্য প্রস্তুত করিবার অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা কখনই ন্যায়সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। শেষটা য়ুরোপ হইতে আমদানী পণ্যের প্রভাবে সেই বীরভূম কোম্পানীও উঠিয়া গেল। কল-বলের সাহায্যে এককালে যে ভারতের প্রাচীন লৌহ-শিল্প উচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে,—যে ভারতের অধিবাসীদিগকে প্রকৃতি যে সম্পদ দিয়াছেন—কলবলের সাহায্য এখন সেই ভারতের অধিবাসীদিগকে সেই সম্পদ প্রয়োজনে লাগাইতে বাধা দিলে বা আপত্তি করিলে চলিবে কেন? কল-বলের সহায়তায় য়ুরোপ ভারতীয় লৌহ-শিল্পকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এখন ভারতবাসী সেই কলবলের সাহায্যেই তাহাদের জাতীয়-শিল্পের পুনরুদ্ধার করিবার চেষ্টা পাইতেছে। ভারতবাসীর পক্ষে তাহা যে কর্ত্তব্য, তাহা ন্যায়তঃ অস্বীকার করা যায় না।

ইনি আরও বলিয়াছেন যে, বৃটিশ কারবারের স্বত্বাধিকারীরা ভারতে যাইয়া তাঁহাদের কারবারের শাখা স্থাপনা করিতেছেন, সে জন্যও বিলাত হইতে ভারতে লৌহ, বস্ত্র প্রভৃতি কম আসিতেছে। এ কথা সত্য। কিন্তু যেরূপভাবে এ দেশে বহু য়ুরোপীয় কারবার প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, সেরূপভাবে ঐ সকল য়ুরোপীয় ফার্ম্ম কানাডায়, দক্ষিণ-আফ্রিকায়, অথবা নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি বৃটিশ-উপনিবেশে কারখানা স্থাপন করিতে পারেন কি? আমাদের বোধ হয়, তাঁহারা তাহা পারেন না। ঐ সকল উপনিবেশে বিদেশীদিগের পক্ষে কলকারখানা স্থাপিত করিতে হইলে ঐ দেশের লোকের নিকট হইতে অধিক পরিমাণে মূলধন সংগ্রহ করিতে হয়। ডিরেক্টারদিগের মধ্যে কতকাংশকে ঐ দেশের লোক হইতে গ্রহণ করিতে হয়। নতুবা ঐ সকল দেশে বিদেশী কর্ত্তৃক কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয় না। এ দেশে কিন্তু ভারতীয়দিগের নিকট হইতে মূলধন সংগ্রহ না করিয়া, এবং ডিরেক্টার নির্ব্বাচিত না করিয়া পূর্ব্বে অনেক য়ুরোপীয় কোম্পানীর কারবার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং এখনও যে কার্য্যতঃ তাহা হইতেছে না, তাহাও বলা যায় না। ভারতে আসিয়া বিদেশীরা কারবার ফাঁদিবেন,—অথচ দেশীয়দিগকে লভ্যাংশ দিবেন না, ইহা অত্যন্ত অসঙ্গত ব্যবস্থা নহে কি? ইহাতে যেন সমস্ত দেশের লোককে কুলী এবং কেরাণীতে পরিণত করিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে। দেশের লোক ইহা প্রশান্তচিত্তে দেখিতে পারে না। কাজেই এ দেশের লোক বিদেশী মূলধন লইয়া বিদেশী কোম্পানী কর্ত্তৃক কারবারের প্রতিষ্ঠা বিশেষ সুনজরে দেখে না।

তাহার পর সম্প্রতি ভারতে শর্করা-শিল্পের পুনরুজ্জীবনের কথাও মিষ্টার ব্রক উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু এই পণ্যটি বিলাত হইতে ভারতে কখনই অধিক পরিমাণে আমদানী হয় নাই বলিয়া তিনি ঐ সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথাই বলেন নাই। তাঁহার আসল কথা, ভারতে বিলাতের বহির্ব্বাণিজ্যের হ্রাস। তাহা কোন স্বদেশ-প্রেমিক ইংরেজের সহানুভূতি লাভ করিতে পারে না। তাঁহার পক্ষে এইরূপ উক্তিই স্বাভাবিক।

মিষ্টার ব্রক বলিয়াছেন যে, আজ ভারতে ল্যাঙ্কাশায়ারের পণ্যের এই অবস্থা ঘটিয়াছে, কাল ভারতে অন্য পণ্য রপ্তানীকারকদিগের এই দশা ঘটিবে। ট্রেড-কমিশনার বলিয়াছেন যে, ভারতে যে শ্রমশিল্প পরিচালনের যন্ত্রপাতি অধিক আমদানী হইতেছে, তাহা দেখিয়া বেশ বুঝা যায় যে, অচির ভবিষ্যতে ঐ সকল যন্ত্রপাতির সাহায্যে যে সকল পণ্য ভারতে উৎপাদিত হইবে, তাহা ভারতে বিদেশজাত পণ্যের আমদানীকে সঙ্কুচিত করিয়া দিবে। ভারতে শ্রমশিল্প-সম্পর্কিত পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া তথায় লৌহ এবং ইস্পাত, রাসায়নিক দ্রব্য, রং এবং নানা প্রকারের ইঞ্জিনিয়ারী বিভাগের জিনিষ প্রভৃতির চাহিদা বাড়িয়াছে। ইহার পরিণাম যে অচির ভবিষ্যতে ভারতে বিদেশ হইতে আমদানী পণ্যের সঙ্কোচ সাধিত হইবে,—মিষ্টার ব্রক সেরূপ ইঙ্গিত করিতেও ভুলেন নাই। সার চার্লস্ আইনস্‌ক্ক্ও ঠিক এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। অনেকে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার ঐরূপ উক্তিতে অনেকটা অহেতুক নৈরাশ্যের ভাব প্রকটিত। মিষ্টার ব্রক বলেন যে, "অবস্থা বুঝিয়া বিশেষ প্রীত হইবার কোন কারণ সহজে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না।" সামন্ত রাজ্যগুলিতে শিল্পসেবার ব্যবস্থা হইতেছে, তাহাও তিনি গ্রেট-বৃটেনের পক্ষে আশাজনক মনে করেন না।

তিনি আরও বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমান সময়ে লোকের মনে যেরূপ রাজনীতিক ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে, আর্থিক ব্যাপারে যেরূপ জাতীয় ভাবের প্রসার ও তাহার প্রতিক্রিয়া ঘটিতেছে, ভারতে যেরূপ খনিজ এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ বিদ্যমান রহিয়াছে এবং যেরূপ মূলধন সঞ্চিত হইতেছে (যে মূলধন শিল্প-সম্পর্কিত কার্য্যে বিনিয়োগ করা লাভজনক ব্যবস্থা), আর যেরূপ বৎসরে গড়ে ৩০ লক্ষ করিয়া লোক বাড়িয়া যাইতেছে, তাহাতে উৎপাদন এবং কর্ম্মবৃদ্ধি অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়া উঠিতেছে। তাহার

* The native iron-smelting industry has been practically stamped out by cheap imported iron and steel, within the range of the railways, but it still persists in the more remote parts of the Peninsula and in some parts of the Central Provinces has shown signs of improvement.—Imp. Gazeteer 1907 vol iii p145.

উপর মন্দার জন্ম পণ্যমূল্য হ্রাস পাইতেছে। ভারতের কৃষিজ পণ্য আর পূর্ব্বের ন্যায় বিদেশে অধিক বিকাইতেছে না। য়ুরোপীয় মহাদেশে ভারতের পণ্য বরাবরই অধিক প্রেরিত হইত। এখন ঐ সকল দেশ আত্মনির্ভরশীল হইয়াছে,—তাহারা আর উহা লইতেছে না। এখন বহু দেশে অনুকল্প পণ্যের (substitutes) সন্ধান করা হইতেছে। বয়ন-শিল্পের রাসায়নিক উপকরণ, কৃত্রিম রবার প্রভৃতিও আবিষ্কৃত হইতেছে। সুতরাং ভারতের আর বহির্ব্বাণিজ্যের পূর্ব্ব অবস্থায় উপনীত হইবার সম্ভাবনা নাই। ভারতের বাণিজ্যের পাল্লা আর পূর্ব্বের ন্যায় অনুকূল রহিতেছে না। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ভারতের আমদানী অপেক্ষা রপ্তানী ৪৫ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা হইয়াছিল, ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে উহা ১৫ কোটি ১২ লক্ষ টাকায় নামিয়া আসিয়াছে। ভারতকে বিলাতে দেনা বাবদ বার্ষিক ৪ কোটি পাউণ্ড দিতে হয়। গত ৭ বৎসর কাল ধরিয়া ভারতকে সঞ্চিত সুবর্ণ বাহির করিয়া ২২ কোটি পাউণ্ড পরিমাণ ঐ দেনা দিতে হইয়াছে। এখন সুবর্ণ ফুরাইয়া আসিতেছে, এখন বিদেশে পণ্য রপ্তানী করিয়াই ভারতবাসীদিগকে ঐ দেনা শোধ দিতে হইবে। কাযেই ভারতবাসীর পক্ষে শিল্প-সেবা ব্যতীত অন্ত উপায় নাই।

এই প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য—ভারতের বাণিজ্য-সম্পর্কিত অবস্থা বিশেষ আশাপ্রদ নহে। বহির্বাণিজ্য যদি বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে কেন্দ্রী সরকারের শুল্ক বাবদ রাজস্বও বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু য়ুরোপ এবং অন্যান্য কতকগুলি রাজ্যে কৃষি এবং শিল্প-সম্পর্কিত ব্যাপারে জাতীয়তা-বুদ্ধি বৃদ্ধি পাওয়াতে ভারতীয় পণ্য যে বিদেশে আর অধিক পরিমাণে রপ্তানী হইবে, সে আশা অতি অল্প। সুতরাং বাণিজ্য-শুল্ক বাবদ ভারত সরকারের রাজস্ব কমিবেই। বাণিজ্য-শুল্ক বাবদ আয় এবার ৩ কোটি পাউণ্ড আন্দাজ হইবে। ইহাই সার জেম্‌স্ গ্রীগ অনুমান করিয়া গিয়াছেন। ইহা ভারত সরকারের সমস্ত আয়ের প্রায় অর্দ্ধেক। এখন বিদেশ হইতে ভারতে কলকব্জা এবং কার্পাসাদি আমদানী হইতেছে বলিয়া শুল্ক বাবদ এই পরিমাণ আয় হইতেছে। কিন্তু এই আয় ত চিরকাল থাকিবে না। কারণ, বহুকাল ধরিয়া যে এই কল-কব্জা প্রভৃতি এ দেশে আমদানী হইবে, তাহা মনে করা যাইতে পারে না। কাযেই আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যহ্রাসের ফলে শুল্ক বাবদ আয় কমিয়া যাইবেই। এরূপ অবস্থায় ভারত সরকারের জমা-খরচ মিলিবে কি করিয়া? ইহা অবশ্য একটা কঠিন সমস্যা। আমার মনে হয়, কর্তৃপক্ষ যদি সামরিক ব্যয় হ্রাস করিতে সম্মত না হন, তাহা হইলে এই সমস্যার সমাধান অসম্ভব। এই সামরিক ব্যয় কিরূপ দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। বিগত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে ১৯১৩-১৪ খৃষ্টাব্দে ভারতের সামরিক বরাদ্দ ছিল ২৯ কোটি টাকা। আর যুদ্ধের পর ১৯২১-২২ খৃষ্টাব্দে উহা দাঁড়ায় ৬৮ কোটি টাকা। কিছু কম একেবারে আড়াই গুণ বৃদ্ধি। ভারত হইতে ব্রহ্মদেশ বাহির হইয়া গেল, কিন্তু সামরিক ব্যয় কিছুমাত্র কমিল না। ১৯৩৩-৩৪ এবং ১৯৩৪-৩৫ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশ ভারতের সহিত সংযুক্ত ছিল, কিন্তু তখন সামরিক ব্যয় ৪২ কোটি কয়েক লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা সম্ভব হইয়াছিল,—কিন্তু এখন যখন এত বড় একটি বিশাল দেশ ভারতের অঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল, তথাপি ভারতের সামরিক ব্যয় কমিল না বরং বাড়িয়াই চলিয়াছে। ১৯৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দের বজেটে সামরিক ব্যয় বাবদ ৪৭ কোটি টাকার অধিক বরাদ্দ করা হইয়াছিল। গত বৎসর আসলে সামরিক ব্যয় কিছু কম হইয়াছিল বটে, কিন্তু এবার সামরিক ব্যয় কম করিয়া ধরা হয় নাই। বরং সমরাতঙ্কে কিছু বাড়িয়া যাইতে পারে। এ দিকে গত বৎসর ভারত সরকারের রাজস্ব হিসাবে ৮২ কোটি টাকার স্থানে ৮০ কোটি টাকা আদায় হইয়াছিল। আয় কম হইলে ব্যয় অধিক কি করিয়া বজায় রাখা চলিতে পারে? অতএব ব্যয়ও কম করা আবশ্যক। বিলাতী দেনার পরিমাণও হ্রাস করিবার চেষ্টা করা প্রয়োজন। ফলে ভারতের বহির্বাণিজ্যের প্রসার বৃদ্ধি করা সম্ভব যখন হইবে না, তখন ভারত-বাসীকে শিল্পকার্য্যে বিশেষ ভাবে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। নচেৎ ভারত কৃষিমাত্র-সম্বল দেশে পরিণত হইবে।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যারত্ন)।
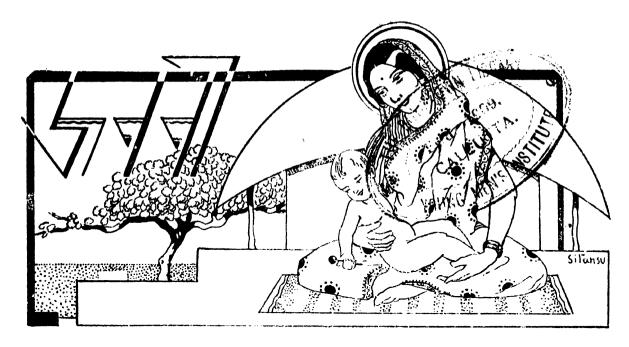
উপন্যাস

৩৮

মৃণালিনী হৃদয়ে যে চাঞ্চল্য অনুভব করিলেন, সেরূপ চাঞ্চল্য তিনি বহুদিন অনুভব করেন নাই। যে দিন বিনা-মেঘে বজ্রাঘাতের মত সুধীরের অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিত মৃত্যু-সংবাদ তাঁহাকে শুনিতে হইয়াছিল, সে দিন তাঁহাকে আপনার হৃদয়ের চাঞ্চল্য দমিত করিতে হইয়াছিল—সে কার্য্যে রেণুর সম্বন্ধে তাঁহার কর্ত্তব্যই তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিল। তিনি কর্ত্তব্যই বড় মনে করিয়া তাহা পালন করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাহার পূর্ব্বে তাঁহার ভগিনীর যে দিন মৃত্যু হয়, সে দিন তাহাতে আকস্মিকতার লেশমাত্র ছিল না; সেই শেষ দিনের জন্য সকলেই বহু দিন হইতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। কিন্তু আজ? বালক-বালিকারা খেলার জন্য যেমন বেলাবালুতে বালুর গৃহ নির্ম্মাণ করে এবং সমুদ্রের একটি তরঙ্গ তাহা মুছিয়া দিয়া যায়, তিনি দেবদত্তকে লইয়া আপনার যে ঘর রচনা করিয়াছিলেন, তাহা আজ তেমনই ভাবে মুছিয়া গিয়াছে—কিন্তু তাহার চিহ্ন যায় নাই—ভগ্নস্তূপের আকারে পতিত রহিয়াছে। আজ তিনি যেন সত্য সত্যই আপনাকে সংযত করিতে পারিতেছিলেন না।

কিন্তু তিনি অন্যান্য দিনেরই মত যখন স্নান করিয়া ঠাকুর-ঘরে প্রবেশ করিলেন, তখন তাহার পরিবেষ্টনে তিনি যেন আপনার অভ্যস্ত স্থৈর্য্যের সন্ধান পাইলেন। দেবতার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিবার সময় যেন ব্যঙ্গের বাতাসে তাঁহার হৃদয় হইতে বেদনার মেঘ দূর হইয়া গেল। তিনি আপনাকে আপনি বলিলেন—সুখে যাহার অধিকার নাই সে সুখের আশা করে কেন? তাঁহার অদৃষ্ট ত তাঁহাকে সুখসম্ভোগের জন্য প্রস্তুত করে নাই—সে কেবল মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে সুখের মৃগতৃষ্ণিকায় মুগ্ধ করিয়া সুখ-লাভের আশার অসারত্বই বুঝাইয়া দিয়াছে। তিনি শৈশবে পিতামাতার স্নেহে বঞ্চিতা; প্রৌঢ়ে তিনি স্বামীকে হারাইয়াছেন; তাঁহার একমাত্র ভগিনী দীর্ঘকাল রোগ ভোগ করিয়া সকল ভোগের অতীত লোকে গমন করিয়াছেন; ভগিনীর একমাত্র সন্তানকে তিনি আপনার সন্তানের প্রাপ্য স্নেহের অধিক স্নেহ দিয়াছেন—সে যে সুখী হয় নাই, তাহা তিনি জানেন। তথাপি তিনি আশা করিয়াছিলেন, তাহার পুত্রকে পুত্র করিয়া তিনি সংসারের সুখ লাভ করিবেন! তিনি প্রথমে কর্ত্তব্য জ্ঞান করিয়া তাহাকে লালন-পালনের ভার লইয়াছিলেন বটে, কিন্তু সেই কর্ত্তব্য যে কিরূপ স্নেহ-সরস হইয়াছিল, তাহা তিনি আজ যত বুঝিতে পারিয়াছেন, পূর্ব্বে কখন তত বুঝিতে পারেন নাই। তাই তিনি আপনাকে আপনি ব্যঙ্গ করিলেন—তিনিই ভুল করিয়াছেন। চলচ্চিত্রে যেমন চিত্রের পর

চিত্র দর্শকের চক্ষুর সম্মুখে চলিয়া যায়, আজ তাঁহার মানস-চক্ষুর সম্মুখে তেমনই ঘটনা পর ঘটনার স্মৃতি আত্মপ্রকাশ করিল। সে সবই দুঃখের ছবি।

তিনি পূজার ফুল গুছাইতে গুছাইতে একবার মনে করিলেন, তিনি যাহার সেবা-কার্য্যে সত্যই শান্তির সন্ধান পাইয়াছেন—তিনি কি তাঁহার সেবিকাকে আজ নূতন শিক্ষা দিলেন? তিনি কি তাঁহার কর্ত্তব্য ভুলিয়া যাইতেছিলেন?

ঠাকুর-ঘরের পরিবেষ্টনে যেমন তাঁহার চিত্তের সাঙ্কল্য অপনীত হইয়াছিল, ঠাকুরের স্মরণে তেমনই তিনি তাঁহার অভ্যস্ত ভাব পাইলেন। তিনি যখন পূজায় বসিলেন, তখন তাঁহার মন মেঘমুক্ত আকাশের মত—ভক্তির রবিকরোজ্জ্বল; তাহাতে আর কোন চিন্তাই রহিল না। কিন্তু আজ তাঁহার পূজার পর প্রণাম অন্য দিনের প্রণাম অপেক্ষাও দীর্ঘ হইল। তিনি প্রতিদিন প্রণামকালে যাহাদিগের মঙ্গল কামনা করেন, তাহাদিগের মঙ্গল কামনা করিয়া আজ দেবতার কাছে প্রার্থনা করিলেন—তিনি তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করুন, তিনি যেন আর মায়ায় বদ্ধ না হন—জীবনের অবশিষ্টকাল তাঁহার সেবায়ই কাটাইতে পারেন। তিনি যে দেবদত্তকে সংসারী করিয়া বধূকে দেবসেবার শিক্ষা দিয়া কোন তীর্থস্থানে যাইয়া—সংসারের সব আকর্ষণ হইতে দূরে দেবতার চিন্তায় কালাতিবাহিত করিবেন—এ কল্পনা তিনি পূর্ব্বেও করিয়াছিলেন। কিন্তু তখনও তাহা সুদূর ছিল; আজ একটি ঘটনায় যাহা দূর ছিল, তাহা একান্ত নিকটস্থ হইল। কল্পনা যখন সঙ্কল্পে পরিণত হইল, তখন তিনি মনে সম্পূর্ণ শান্তিলাভ করিলেন।

কি একটা কাযে ঠাকুর-ঘর হইতে বাহির হইয়া তিনি দেখিলেন, দেবদত্ত সেই ঘরের দ্বারপার্শ্বে বসিয়া আছে! তাহার মুখ ম্লান—চিন্তার ভাবে পূর্ণ। যে বয়সে মানুষ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয় না, সেই বয়সে তাহার মুখে চিন্তার ছায়া অত্যন্ত অস্বাভাবিক বোধ হয় এবং তাহা সহজেই লক্ষিত হয়।

মৃণালিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে ব'সে কেন, দেবু?"

দেবদত্ত বলিল, "আপনার জন্য।"

"কেন?"

অভিমানে দেবদত্তের বাক্যস্ফুরণে বিলম্ব হইল—তিনি কি বুঝিতে পারেন নাই, কেন সে আসিয়া বসিয়া আছে? আপনাকে সামলাইয়া লইয়া সে বলিল, "আমি অপরাধ করেছি, আমাকে ক্ষমা করুন।"

তাহার কথায় মৃণালিনীর অন্তরে স্নেহ উথলিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "আমি কি তোমার উপর রাগ করতে পারি?"

"সে কথা আপনি বলেছেন; কিন্তু বলেন নি যে, আপনি আমাকে ক্ষমা করেছেন।"

মৃণালিনী তাহাকে তুলিয়া তাহার মুখ চুম্বন করিয়া বলিলেন, "ক্ষমা কি আবার চাহিতে হয়?"

দেবদত্ত বলিল, "আপনি তা'ই বলুন, আমি অপরাধ করলেও আপনার কাছে ক্ষমা পা'ব—চাহিবার আগেই তা' পাব।"

"তা'তে কি তোমার সন্দেহ আছে, দেবু?"

"সন্দেহ ছিল না—থাকবেও না; কিন্তু আজ সন্দেহ হয়েছিল; তাই তা' ভঞ্জন না ক'রে কিছুতেই শান্ত হ'তে পারছিলাম না।"

তাহার পর সে বলিল, "আবার অপরাধ করলাম; ঠাকুর-ঘরের কায শেষ হয় নি—ছুঁয়ে দিলাম।"

মৃণালিনী হাসিয়া বলিলেন, "তুমি ত ছোঁও নি—আমিই তোমাকে ছুঁয়েছি।"

"আবার স্নান করতে হ'বে?"

"তা'তে কি?"

তিনি বলিলেন, "খেয়েছ?"

"না।"

"কি পাগল!"

তিনি ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেবুর খাবার দাও নি?"

ভৃত্য বলিল, "আমি খাবার নিয়ে গিয়েছিলাম, দাদাবাবু খেলেন না।"

"যাও, দেবু, খাও গে—পিত্ত পড়ছে।"

দেবদত্ত চলিয়া গেল; তাহার বক্ষে যে বেদনা গুরুভার প্রস্তরের মত ছিল, তাহা তখন অপসারিত হইয়াছে।

মৃণালিনী আবার স্নান করিতেই গমন করিলেন—ভাবিতে ভাবিতে যাইলেন, এ ছেলের উপর রাগ বা

অভিমান করিবারও উপায় নাই। কিন্তু ইহার বন্ধনই তাঁহাকে ছিন্ন করিতে হইবে। কেন তাহা করিতে হইবে, তাহা তিনি বুঝিয়াছেন।

সেই দিন কণা বিবাহের জন্য কতকগুলি জিনিষ দেখাইয়া রেণুকে লইয়া মৃণালিনীর নিকট উপস্থিত হইল। সে মৃণালিনীকে জিজ্ঞাসা করিল, "আবার ত আপনি বললেন না, দেবুকে জিজ্ঞাসা করবেন ?"

মৃণালিনী বলিলেন, "না। ও আর আপত্তি করবে না।"

তিনি কেন "আর" বলিলেন, তাহা কণা জিজ্ঞাসা করিল না—রেণু তাহা লক্ষ্য করিয়াছিল বটে, কিন্তু সে ও সে কথা আর বলিল না।

কণা বলিল, "বাঁচা গেল।"

মৃণালিনী বলিলেন, "না হয়, তুমিই একবার জিজ্ঞাসা কর।"

"আচ্ছা"—বলিয়া কণা দেবদত্তের বসিবার ঘরে প্রবেশ করিল। দেবদত্ত একখানা পুস্তকের পাতা উল্টাইতেছিল।

কণা বলিল, "তোমার বিয়ের সব ঠিক ক'রে ফেলছি। কি বল ?

দেবদত্তের মুখ সহসা যেন বিবর্ণ হইয়া গেল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "মা কি কিছু বলেছেন ?"

"না তিনি প্রথমে বলেছিলেন, তোমাকে জিজ্ঞাসা করবেন। আজ তিনি বললেন, তুমি আপত্তি করবে না।"

দেবদত্ত স্বস্তির শ্বাস ফেলিল, "তিনি যা' করবেন, তা'র উপর কি আমার কোন কথা থাকতে পারে ?"

"তাইত আমার শ্বশুর সে দিন বলছিলেন—আমাদের শাস্ত্রকাররা পিতাকে ধর্ম্ম ও স্বর্গ বলেছেন, আর বলেছেন—মা স্বর্গ হ'তে গরীয়সী।"

দেবদত্ত যেন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল। মা যদি স্বর্গ হইতেও গরীয়সী হয়েন, তবে যিনি মা না হইয়াও মাতার অধিক, তাঁহাকে কি মনে করিতে হয় ? সে আজ তাঁহার মনে ব্যথা দিয়াছে !

তিনি যে বলিয়াছেন, সে আর বিবাহে আপত্তি করিবে না, তাহাতে তাহার মনে হইল, তিনি সত্যই তাহাকে ক্ষমা করিয়াছেন। তাহা মনে করিয়া সে যেন অগাধ শান্তি লাভ করিল।

কণা বলিল, "তা'হ'লে আমরা সব ব্যবস্থা ক'রে ফেলছি।"

দেবদত্ত বলিল, "মা যা' বলবেন, তা'ই হ'বে।"

কণা যদি দেবদত্তকে ভালরূপ না জানিত, তবে সে হয়ত মনে করিত, এই মাতৃভক্তির সঙ্গে যুবকের হৃদয়ের স্বাভাবিক প্রেমের মিশ্রণও আছে। কিন্তু সে তাহা মনে করিতে পারে না। তাই সে মৃণালিনীর নিকটে আসিয়াই বলিল, "সত্যই, দিদিমা, আপনি যাদু জানেন। এমন ছেলে করেছেন যে, কেবল এক কথা—মা যা' বলবেন, তা'ই হ'বে।"

আকাশে যেমন বিদ্যুৎ চমকিয়া যায়—মৃণালিনীর মনে তেমনই বেদনা চমকিয়া গেল। সে দিন প্রভাতের ঘটনা ! কিন্তু তিনি তাহা বলিতে পারেন না—বলিলেন না। বিশেষ রেণু যদি তাহা শুনে, তবে ছেলের দারুণ অভিমানের কথা তাহাকে কিরূপ বেদনা প্রদান করিবে, তাহা অনুমান করিয়া তিনি স্থির করিলেন—তাঁহার সেই বেদনা তিনিই সহ্য করিবেন—আর কাহাকেও তাহা জানিতে দিবেন না।

তিনি হাসিয়া কণাকে বলিলেন, "মা, দিদিমা—এরা কি যাদু জানে ? যাদু কে জানে, তা' নাতজামাইকে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবে। দেবুর ত এখনও সেই যাদুকরী আসেন নি।"

কণা বলিল, "এ কথায় কিন্তু আমি বিশ্বাস করতে পারি না, দিদিমা। আপনি সকলকেই যাদু করেন—আপনার ব্যবহারে—"

মৃণালিনী বলিলেন, "সে দিন দেবুর একখানা বইতে সাপের কথা পড়ছিলাম। এক রকম সাপ তা'র দৃষ্টিতেই শিকার আকৃষ্ট করে। আমাকে কি সেই দলের বলতে চাও ?"

"তা' নয়, দিদিমা, দেবতারা তাঁ'দের আশীর্ব্বাদেই সকলকে আকৃষ্ট করেন।"

"আমাকে বুঝি দেবতা দেখেছ ? 'শালুক চিনেছেন—গোপাল ঠাকুর।' মানুষকে দেবতা বলতে নাই।"

তিনি উদ্দেশে দেবতাকে প্রণাম করিলেন।

কণা বলিল, "দেবতা কখন দেখিনি—কিন্তু আপনাকে দেখে দেবতার ধারণা করতে পারি। আমি বলে দিচ্ছি,

আপনি আমার মা'কে, আমাদের সকলকে যেমন মুগ্ধ করেছেন, বৌকেও তেমনই মুগ্ধ করবেন। দেবুর মত সে-ও বলবে 'মা যা' বলবেন তা'ই হ'বে'।"

মৃণালিনী হাসিয়া বলিলেন, "সে আর ক'দিন?"

"কেন, দিদিমা? মরণের কথা কি কেউ বল্‌তে পারে?"

"এমন ভাগ্য কি ক'রে এসেছি, দিদি, যে, এখনই পলাতে পারব? তবে সংসারের পাঁক ত অনেক দিন ঘাঁটলাম—এইবার ছুটী।"

"কিন্তু পাঁকের মধ্যে থেকেও যে আপনি কখন পাঁক মাখেন নি!"

মৃণালিনী কথাটা আর অগ্রসর হইতে দিলেন না;—বলিলেন, "এখন জিনিষ কি কি হ'ল, আর কি কি বাকি দেখ।"

তখন কণা ও রেণু তাঁহার সঙ্গে জিনিষগুলির আলোচনা করিতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরে মৃণালিনী বলিলেন, "আচ্ছা, রেণু, তোমার বৌমা'কে আননি কেন? তোমার মেয়ে যেন আর কাউকে কর্তৃত্ব করতে দেবে না।"

কণা বলিল, "কি ঝগড়া করবার আগ্রহ! দোষ আমার নয়—আপনার মেয়ের। আমি তা'কে আন্‌তেই চেয়েছিলাম—মা বললেন, আমাদের ফিরতে হয় ত দেরী হ'বে—বাবার চা ক'রে দিতে হ'বে।"

"তা' না হয়, তা'র আগেই যা'বে। সে বাড়ীর এক বৌ—তা'তে কনের দিদি। তা'কে আনিয়ে নেওয়া যাক'।"

তখন সেই জন্য গাড়ী পাঠান হইল।

এইরূপে দেবদত্তের বিবাহের আয়োজন হইল এবং নির্দ্দিষ্ট দিনে শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইল।

বিবাহের পূর্ব্ব হইতে পরে কয়দিন আর সকলের আনন্দে অতিবাহিত হইল বটে, কিন্তু তিন জনের তাহা হইল না।

মৃণালিনীর মনের চাঞ্চল্য কেহ বুঝিতে পারিল না বটে, কিন্তু সে চাঞ্চল্য অসাধারণ। কত দিনের কত কথা তাঁহার মনে পড়িতেছিল—তাঁহাকে ব্যথিত করিতেছিল। ভগিনীর কথা তাঁহার পুনঃ পুনঃ মনে পড়িতেছিল—দেবদত্ত তাহার স্নেহের অবলম্বন কন্যার পুত্র—একমাত্র সন্তানের একমাত্র সন্তান। আর সঙ্গে সঙ্গে সুধীরের কথা—সেই পূতচরিত্র, তাঁহার সোদরাধিক সুধীর—সে তাহার কন্যাকে কত ভালবাসিত এবং কন্যা যে তাহাকে ভুল বুঝিয়াছে, সেই বেদনা তাহাকে কিরূপ আহত করিয়াছিল, সে সব মৃণালিনী জানিতেন। আজ তাহারা কেহই নাই।

রেণুর মনে যে ব্যথা, তাহা কে বুঝিবে? তাহার জীবন কি কেবল দাবদাহই নহে? এক এক বার তাহার মনে হইতেছিল, অভিমানবশে সে ভুল করিয়াছে সে যদি দেবদত্তকে মাসীমা'কে না দিত, তবে হয়ত তাহার বেদনার দাবদাহ স্নেহের স্নিগ্ধ বর্ষণে নির্ব্বাপিত হইতে পারিত। সে সংসারে নিতান্ত নির্লিপ্ত ভাবেই জীবন অতিবাহিত করিয়াছে—সম্মুখে স্নিগ্ধ—স্বচ্ছ—সলিল থাকিতে যে ইচ্ছা করিয়া তৃষ্ণায় কাতর হয়, তাহার অবস্থা তাহারই মত। তাহার স্বামী, তাহার পুত্র—সে তাহার সংসার আপনার মনে করিতে পারিত। কণা ও অশোক তাহাকে মা বলিয়াই মনে করিয়াছে। পূর্ণিমা তাহাকে কন্যার মত স্নেহ দিয়াছেন। স্বামীর ব্যবহারে এক দিনের সেই অসতর্ক উক্তি ব্যতীত সে আর কোন ত্রুটি এই দীর্ঘকালে কখন পায় নাই। সেই অসতর্ক উক্তি যে তাঁহার সন্তানস্নেহের ফল, তাহা সে এখন আর সন্দেহ করে না। কিন্তু সেই ত্রুটির জন্য সে তাঁহার যে দণ্ডবিধান করিয়াছে, তাহাও অসাধারণ। যাঁহার সন্তানস্নেহ অতি প্রবল, তিনিই পুত্র দেবদত্তকে আপনার বলিবার অধিকারে বঞ্চিত হইয়াছেন। এই সব কথা সে যতই ভাবিয়াছে, ততই বেদনানুভব করিয়াছে।

দেবদত্তও চিন্তা হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে নাই। মৃণালিনীর অসীম স্নেহ যে তাহাকে অভিমানপ্রবণ করিয়াছে, তাহা সে তাঁহাকে যাহা বলিয়াছিল, তাহাতেই বুঝিতে পারিয়াছিল। সে দিনের সেই কার্য্যের জন্য দুঃখ সে মন হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই। তাহার পর সে যতই আপনার মনোভাবের বিশ্লেষণ করিয়াছে, ততই তাহার মনে হইয়াছে—সেরূপ অভিমানপ্রবণতা কখন মানুষকে সুখী করিতে পারে না। কিন্তু তাহাই যে তাহার প্রকৃতিতে পরিণতি লাভ করিয়াছে, তাহা সে বুঝিতে পারিয়াছিল। সেইজন্য সে চিন্তিত হইয়াছিল। সে নূতন জীবনে প্রবেশ করিল—এই জীবনে যে পর ছিল, তাহাকে

আপনার করিতে না পারিলে অসুখ অনিবার্য্য, যাহাকে আপনার করিতে হইবে, সেও ত অভিমানপ্রবণ হইতে পারে। দেবদত্ত এই সব কথা ভাবিতেছিল।

আর নীরেন্দ্র? সে তাহার পরিপূর্ণ সংসারের কেন্দ্রস্থলে থাকিয়াও সুখ পায় নাই—কিন্তু সে তৃপ্তি পাইয়াছে, তাহাই সে সানন্দে বরণ করিয়া লইয়া সুখের শূন্য স্থান পূর্ণ করিতে প্রয়াস করিয়াছে। রেণু সংসার তাহার কর্ত্তব্যক্ষেত্র মনে করিয়া কর্ত্তব্য পালন করিয়া আসিয়াছে—তাহাতে কোন রূপ সুখের সন্ধান বা কোনরূপ সুখ-লাভের আকাঙ্ক্ষা করে নাই। নীরেন্দ্র—স্বভাবতঃ দুর্ব্বল নীরেন্দ্র সে দৃঢ়তার অনুশীলন করিতে পারে নাই; তাই সে তাহার কর্ত্তব্যের মধ্যেই সুখের সন্ধান করিয়াছে এবং তাহাতেই অভ্যস্ত হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় সে আশা ত্যাগ করিতে পারে নাই। কণার ও অশোকের বিবাহের পর সে আশা করিয়াছিল, হয়ত রেণুর ভাবের পরিবর্ত্তন হইবে—এ বার—দেবদত্তের বিবাহেও সে আশা করিতেছিল, তাহা কি হইতে পারে না? তাহার অনেক আশাই হতাশায় পরিণত হইয়াছে—এ বারও কি তাহাই হইবে? কে তাহা বলিতে পারে? কিন্তু তবুও সে আশা ত্যাগ করিতে পারিল না।

দেবদত্তের বিবাহের উৎসব শেষ হইয়া গেল।

৩৭

বিবাহের পর সাংসারিক সব ব্যবস্থার কথা উঠিল। কণা বলিল, "দিদিমা, কমলা কি পড়বে?"

মৃণালিনী দৃঢ় ভাবেই বলিলেন, "না।"

"ও কিন্তু খুব ভাল পড়ছিল?"

"বেশ ত—নিজে পড়বে, দেবুর কাছে পড়বে।"

"দেবুর কি কলেজের পড়া প'ড়ে আবার সময় থাকবে।"

"দেবুর ত আর কলেজে পড়া হ'বে না।"

"কেন, দিদিমা?"

"পড়া যদি জ্ঞান লাভের জন্য হয়, তবে তা' অনিবার্য্য কাযের অবসরে অনায়াসে হ'তে পারে।"

কণা হাসিয়া বলিল, "তা' যে বুড়া বয়সেও হ'তে পারে, তা আপনিই দেখিয়েছেন।"

"যদি তা'ই হয়, তবে সে-ই ত ভাল। আমি যেমন ছেলের জন্য পড়েছি, কমলাও তেমনই পড়বে, আপনার ছেলেমেয়েদেরও পড়াতে পারবে। মা'র চাইতে ভাল শিক্ষক কি হ'তে পারে?"

"দেবুর পড়ায় যে আগ্রহ—ও কিন্তু পড়া ছাড়তে হ'লে দুঃখিত হ'বে।"

"পড়া ছাড়বে কেন? কলেজে পড়া বন্ধ করবে।"

"কেন?"

"আমি ওকে বিষয়ের কায শিখাবার চেষ্টা করেছি—কিন্তু সকল সময় ওর অবসর হয় নি। এখন ওকে সব বুঝে নিয়ে আপনি কায করতে হ'বে। যে ভার এতদিন বহেছি, আজ যখন মা'বার ডাক এসেছে, তখন তা' দুর্ব্বহই বোধ হচ্ছে।"

"আপনাকে এখন ছাড়বে কে?"

"ও কথা আর যেন ব'ল না, দিদি। কমলাকেও আমি সংসারের কায, ঠাকুরসেবা সব শিখিয়ে দিতে চাই।"

"সে ত ভালই। বিশেষ, এ বার দেখছি, আপনি বুড়া হয়েছেন। এই বিয়ের পরিশ্রমে আপনাকে যেন দশ বৎসর বেশী বয়সের মনে হচ্ছে।"

মৃণালিনী হাসিয়া বলিলেন, "বয়সের যে 'গাছ পাতর' নাই। যখন ভাবি, তখন আপনিই চমকে উঠি—কত দিন হয়ে গেল! আর সব চ'লে গেছে—একা প'ড়ে আছি।"

কি চিন্তা ও কি বেদনায় মৃণালিনীর বয়স যেন দশ বৎসর অধিক হইয়াছে মনে হইতেছিল, তাহা কি কণা অনুমান করিতে পারে? দেবদত্তের কথার জন্য তিনি রাগ করেন নাই—কিন্তু তাহার বেদনা হইতে ত তিনি অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন নাই! বাণ যদি একবার বিদ্ধ হয়, তবে তাহা উৎপাটিত করিলেও আহত স্থান অনেক সময় স্বাভাবিক অবস্থা পুনরায় প্রাপ্ত হয় না—অনেক সময় সেই আঘাতের ফলে সমস্ত দেহে স্বাস্থ্যের অভাব ঘটে।

কিন্তু কেবল দেবদত্তের কথাই নহে, তাহার সঙ্গে—আরও অনেক কথা আছে। তিনি যে দেবদত্তের বিবাহ দিয়া ধর্ম্ম-চর্চ্চায় জীবনের অবশিষ্টকাল যাপন করিবেন, তাহা তাঁহার কল্পনা ছিল—এখন সঙ্কল্প হইয়াছে। তিনি যে ভাবে জীবন যাপন করিয়াছেন, তাহাতে গৃহে থাকিয়াও যে সে কায করা যায় না, তাহা নহে; বিশেষ এই গৃহ তাঁহার নিকট যেমন দেবমন্দির, তেমনই দেবতার স্মৃতিপূত মন্দির। বধূরূপে বালিকাবয়সে তিনি এই গৃহে

আসিয়াছিলেন—জীবনের সব সুখ তিনি এই গৃহেই লাভ করিয়াছেন—এই গৃহেই তিনি জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখ ভোগ করিয়াছেন। তাঁহার জীবনের সব স্মৃতি এই গৃহের সহিত বিজড়িত। এই গৃহ তিনি ত্যাগ করিয়া যাইবেন। তাঁহার মনে হইয়াছিল, হয়ত তিনি গৃহে থাকিয়াই সংসারের সব কার্য্য ত্যাগ করিবেন—করিতে পারিবেন। কিন্তু দেবদত্তের সে দিনের কথায় দেবতা যেন তাঁহাকে তাঁহার ভুল বুঝাইয়া দিয়াছেন। তিনি মনে করিয়াছেন—আমাদিগের শাস্ত্রের যে উপদেশ "পঞ্চাশোর্দ্ধং বনং ব্রজেৎ" তাহার বিশেষ সার্থকতা আছে—সংসার গতিশীল, পরিবর্ত্তনশীল—কিন্তু মানুষ সকল সময় সেই গতির ও সেই পরিবর্ত্তনের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে না। তাই পরবর্ত্তীদিগকে শিক্ষা দিয়া কার্য্যোপযোগী করিয়া অবসর গ্রহণ করাই ভাল। তিনি তাহাই করিবেন।

কিন্তু স্থির করিলেই কায সহজসাধ্য হয় না। মৃণালিনীর পক্ষেও তাহা সহজসাধ্য হইতেছিল না। গৃহ-দেবতা—সে-ও তাঁহার স্বামীর দান, আর স্বামীর স্পর্শপূত দ্রব্যাদি—সে সব তিনি যে ভাবে রাখিয়া মহাযাত্রা করিয়াছিলেন, মৃণালিনী সেই ভাবেই রাখিবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন—এই সব ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। ইহার মধ্যে যে বেদনা আছে, তাহা কে অস্বীকার করিতে পারে? যখনই সে কথা তাঁহার মনে হইয়াছে, তখনই তিনি আপনাকে আপনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—যে দিন তাঁহাকে এ সব ত্যাগ করিয়া যাইতেই হইবে—তিনি থাকিবেন, মনে করিলেও এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিতে পারিবেন না—সে দিনও ত নিকটবর্ত্তী। তবে আর কেন? আর ইহা ত দেবদত্তের প্রতি তাঁহার স্নেহেরও পরীক্ষা। তিনি যদি তাহার প্রতি স্নেহবশে তাহাকে যাহা মৃত্যুর পরে দিবেন স্থির করিয়াছেন, তাহা মৃত্যুর পূর্ব্বেই দিতে না পারেন, তবে তাঁহার স্নেহও কার্পণ্য-দুষ্টই হইবে।

তিনি কোথায় যাইবেন এবং গৃহদেবতা সঙ্গে লইয়া যাইবেন কি না, এই দুইটি বিষয় তাঁহাকে বিশেষভাবে বিবেচনা করিতে হইয়াছিল।

গৃহদেবতা সম্বন্ধে তিনি পূর্ব্বেই কর্ত্তব্য স্থির করিয়াছিলেন। গৃহদেবতা গৃহেই থাকিবেন; তাঁহাকে তাঁহার গৃহ হইতে কোথাও লইয়া যাইবার অধিকার তাঁহার নাই। দেবদত্তকে যখন তিনি দেবসেবার অধিকারী করিয়াছেন, তখন সে ভার তাহাকেই গ্রহণ করিতে হইবে।

বাস্তবিক বিগ্রহ অবলম্বন করিয়া মৃণালিনী যে ধারণা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, সে ধারণায় তিনি—দেবতার আশীর্ব্বাদে—উপনীত হইয়াছিলেন।

তিনি যখন গৃহ হইতে যাইয়া কোথাও ধর্ম্মাচরণ করিবার কথা বলিতেন, তখন দেবদত্তের মনে হইত, তিনি কেন কোথাও যাইতে চাহিতেছেন? কবি গোল্ডস্মিথের ধর্ম্মযাজকের বর্ণনা তাহার মনে পড়িত—তিনি ত্যাগ ও ভগবানে নির্ভরশীলতার অনুশীলন করিয়া পরলোকের পথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন এবং এই জগতেই তাঁহার স্বর্গ আরম্ভ হইয়াছিল। সে কথা সে এক দিন মৃণালিনীকেও বলিয়াছিল। শুনিয়া মৃণালিনী বলিয়াছিলেন, "আমাদের কি সে সাধনা আছে? তুমি ত জনক রাজার কথা শুনেছ—তিনি রাজা হয়েও রাজর্ষি ছিলেন। তিনি আদর্শ। কিন্তু ক'জন আদর্শের মত হ'তে পারে? তা ছাড়া যা'কে আমরা 'স্থান-মাহাত্ম্য' বলি, সে-ও বিবেচনা করতে হয়। যে স্থান দেবতার রাজধানী—প্রতিদিন হাজার হাজার লোক—লক্ষ 'শালগ্রামে গড়া কোটি ভক্ত মন্ত্র পড়া' রত্নবেদীতে দেবতার পূজা ক'রে জীবন সার্থক মনে করে, সেখানে যে পরিবেষ্টন থাকে, তা' মানুষকে মায়ামুক্ত করে।"

তাহাতে দেবদত্ত বলিয়াছিল, "কিন্তু আপনি ত বাড়ীতেই সেই পরিবেষ্টনের সৃষ্টি করেছেন।"

"মানুষ মোহবদ্ধ। তোমার যদি 'মাথা ধরে' তবে সে স্থির থাকতে পারি না, দেবু।"

"কিন্তু আপনি যেখানে যা'বেন, সেখানেই কি আমাদের বিপদে আপদে স্থির থাকতে পারবেন?"

"তা' হয়ত পারব না। আশীর্ব্বাদ করি, অস্থির হ'বার কারণ যেন না হয়—তোমরা সকলেই যেন সুখে স্বচ্ছন্দে থাক। আমাকে আর কোন সংবাদ দিও না।"

"আপনি দেখবেন, আমার মাথা ধরবার আগেই আমি আপনার কাছে যা'ব।"

"না, দেবু, তা' ক'র না।"

কিন্তু তখন দেবদত্ত মনে করে নাই, সত্য সত্যই তিনি চলিয়া যাইবেন। মৃণালিনীও কবে যাইবেন মনে করেন নাই।

এখনও তিনি পূর্ব্বাহ্নে সে কথা কাহাকেও বলিলেন না ; কেবল আপনি প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

কিন্তু তাঁহার আয়োজন দেখিয়া দেবদত্তের মনে সন্দেহ হইল, সত্যই তিনি যাইবেন।

প্রায় ছয় মাসে মৃণালিনী একদিকে যেমন দেবদত্তকে সম্পত্তি সম্পর্কীয় কার্য্যভার বুঝাইয়া দিলেন, অপর দিকে তেমনই কমলাকে সংসারের কায সর্ব্বোপরি ঠাকুর-ঘরের কায শিখাইয়া দিলেন। দেবদত্তের তুলনায় কমলার শিক্ষায় বিলম্ব হইল—কারণ, সংসারের কাযে যত খুঁটিনাটি থাকে, বৈষয়িক ব্যাপারে তত থাকে না ; গৃহিণীর কায সহজসাধ্য নহে। বিশেষ যখন সেই কাযের মধ্যে দেবসেবার কায থাকে, তখন তাহার দায়িত্ব ও গুরুত্ব উভয়ই অধিক হয়। মৃণালিনী হাতে-হাতে সব কায কমলাকে শিখাইতেন—আর বলিতেন, "এখন এ সব তোমার ভাল লাগছে না, জানি—কিন্তু ঠাকুরের আশীর্ব্বাদ যদি লাভ কর, তবে ভাল লাগবে।" তাহাতে কমলা বলিয়াছিল, "আমার ত ভাল লাগে। বাড়ীতে পিসীমা আমাদের ঠাকুর-ঘরের কাযে সঙ্গে নিয়ে যেতেন—" মৃণালিনী বলিয়াছিলেন, "এ বুঝি তোমার বাড়ী নয় ?"—লজ্জা পাইয়া কমলা বলিয়াছিল, "আমার ভুল হয়েছে। পিসীমা বল্‌তেন, ঠাকুর-ঘরের কাযে যে সুশিক্ষা হয়, তা' আর কিছুতেই হয় না। তিনিই একদিন বলে-ছিলেন, মা যখন কণেবৌ আসেন, তখন একটু চঞ্চল ছিলেন, তাই তাঁ'র খুড়শাশুড়ী তাঁ'কে ঠাকুর-ঘরে নিয়ে যেতেন ; তিনি মা'কে প্রতিদিন 'মালা করাতেন,' বল্‌তেন, ওতে মনঃসংযোগ হয়। মা সে মালা আজও জপ করেন ; আবার তাঁ'র কাকীমা মরবার সময় তাঁ'র স্ফটিকের মালা মা'কেই দিয়ে গেছেন, বলে গেছেন, 'যদি বৃধ বৌরা কেউ জপ করবে না, তবে গঙ্গাসাগরে বিসর্জ্জন দেবার ব্যবস্থা ক'রবে।" শুনিয়া মৃণালিনী প্রফুল্ল মুখে বলিয়াছিলেন, "দেবতার সেবার ব্যবস্থা দেবতাই করেন—আমরা কিছুই নহি।"

যখন কয় মাসে মৃণালিনী দেখিলেন, দেবদত্ত যেমন তাহার কাযে, কমলা তেমনই তাহার কাযে অভ্যস্ত হইয়াছে, তখন তিনি এক দিন রেণুকে ও কণাকে আনাইলেন। তিনি বলিলেন, "এইবার আমার ছুটী।"

কণা বলিল, "সে কি ?"

"আমি যা'ব।"

"কোথায় ?"

"সেইটুকুই এখনও স্থির করতে পারি নি। কখন বাড়ী ছেড়ে যেতে পারি নি। এখন যা'দের ভার তা'দের দিয়ে একবার তীর্থদর্শনে যা'ব—যে স্থানে দেবতা চরণে আশ্রয় দিবেন, সেই স্থানেই থাকব।"

"কেন, দিদিমা, দেবতা কি তোমাকে এখান থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন ?"

"তাঁ'র ইচ্ছা নহিলে কি যেতে পারতাম ?"

"এখন যাওয়া হ'বে না। কমলার ছেলে না দেখে আপনি যেতে পারবেন না।"

মৃণালিনী হাসিয়া বলিলেন, "তোমরা আমার হয়ে দেখবে। রেণু রহিল, আমার ভাবনা কি ?"

"ও সব বদলীতে চলে না, দিদিমা।"

"কি বলব বল, তোমার দাদা থাকলে তোমাকেই বদলী দিয়ে যেতাম।"

"ও সব কথা রাখুন, যাওয়া হ'বে না।"

মৃণালিনী কেবল একটু হাসিলেন।

রেণু মাসীমা'র কথা শুনিল। সে যেন সকল আঘাতের জন্য প্রস্তুত হইয়াই ছিল। মাসীমা যাইলে তাহার বেদনায় সান্ত্বনালাভের—জুড়াইবার শেষ স্থানও যাইবে। কিন্তু সে সেই জন্য কখন তাঁহার ইচ্ছায় বাধা দিবে না। কারণ, সে জানিত, তিনি বিশেষ বিচার-বিবেচনা না করিয়া কোন কায করেন না। নিশ্চয়ই কোন বিশেষ কারণে তিনি এই সঙ্কল্প করিয়াছেন। তাই কণা যখন তাহার উপর অভিমান করিয়া বলিল, "একি, মা—তুমি কিছু বলবে না ? তুমি বারণ করলে তোমার মাসীমা কখন যেতে পারবেন না।" তখন রেণু বলিল, "এখন ত মা, তোমাদেরই অধিকার ; তোমরা যদি না পার—আমি কি পারব ?"

মৃণালিনী রেণুকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া কণাকে বলিলেন, "আমার মেয়ে কি ওর মেয়ের মত যে, মা'র কাযে বাধা দেবে ?" তিনি যে ভাবে রেণুকে আদর করিলেন, তাহাতে মনে হইল, রেণু যে আর ছোটটি নাই, তাহা তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন। স্নেহ কালের ব্যবধান ঘুচাইয়া দেয়।

যাহার যত আপত্তি সবই খণ্ডন করা গেল বটে, কিন্তু দেবদত্ত যখন আসিয়া বলিল, "মা, আপনি কি আমার উপর

রাগই করেছেন ?" তখন তাহার উত্তর দেওয়া তাঁহার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। শেষে তিনি বলিলেন, "আমি তীর্থদর্শনে যা'ব—তীর্থক্ষেত্রে বাস করব, তোমারই ত আগ্রহ ক'রে সে ব্যবস্থা করবার কথা, দেবু!"

দেবদত্ত বলিল, "আমি কোন কথা শুনব না। আমি আপনাকে যেতে দেব না। যদি আপনি যা'ন আমি বুঝব, আপনি আমাকে ক্ষমা করেন নি।"

"অমন কি বল্‌তে আছে ?"

মৃণালিনী দেবদত্তের মস্তকে করতল রক্ষা করিয়া বলিলেন, "এ কথা মনে রেখ না।"

দেবদত্তের মনে যে চাঞ্চল্য অনুভূত হইতেছিল, তাহা শান্ত করিবার জন্যই সে মৃণালিনীর কোলের উপর মাথা দিয়া শুইয়া পড়িল—"সে, হ'বে না, মা।"

মৃণালিনী তাহার কেশের মধ্যে সস্নেহে অঙ্গুলী চালন করিতে করিতে বলিলেন, "এখন বুঝতে পারছি, কমলা কেন ক'দিন থেকে কেবল বল্‌ছে, 'মা, যাওয়া হ'বে না।' সে তোমারই শিখান।"

"না, মা, তোমার বৌয়ের কান্নায় আমি যখন কোন সান্ত্বনাই দিতে পারলাম না, তখন বল্‌লাম, 'তুমি যে বল, মা আমার চাইতেও তোমাকে ভালবাসেন—দেখ দেখি, কেমন মা'কে রাখতে পার।' শিখাতে আর হয় নি।"

"আহা, ছেলেমানুষ ক'দিন কাঁদছে!"

"আপনি না গেলেই ত কান্না বন্ধ হয়।"—বলিতে বলিতে দেবদত্ত কাঁদিয়া ফেলিল।

মৃণালিনী তাহাকে বলিলেন, "গল্প আছে, এক জন জগন্নাথদর্শনে গিয়ে বাড়ীতে যে পুঁইমাচার কথা ভাবছিল, তা'-ই দেখেছিল। তোমরা কি চাও যে, আমি তীর্থে গিয়ে তোমাদের কান্না-মুখই দেখি ?"

বাস্তবিক মৃণালিনী যদি সঙ্কল্পের দৃঢ়তা রক্ষা করিতে না পারিতেন, তবে তাঁহার পক্ষে যাওয়া দুষ্কর হইত।

তাঁহার সঙ্কল্প বিচলিত হইবে না বুঝিয়া শেষে দেবদত্তই প্রস্তাব করিল—তিনি যদি তীর্থদর্শনে যাইতেই চাহেন, তবে তাহাতে সে আপত্তি করিবে না; কিন্তু তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে হইবে এবং সে তাঁহার সঙ্গে যাইবে।

এই প্রস্তাব যখন কথা তাঁহাকে জানাইল, তখন মৃণালিনী মনে করিলেন, পরের কথা পরে হইবে, এখন যাওয়া হউক। তবে তিনি বলিলেন, "দেবু আমার সঙ্গে যা'বে, সে কি কখন হ'তে পারে ?"

দেবদত্ত বলিল, "কেন হ'তে পারে না ?"

"এ বাড়ীর ভার, কমলার ভার, ঠাকুরসেবার ভার, তুমি কা'র উপর দিয়ে যা'বে ?"

কমলা বলিল, "আপনি যেমন ভাল হয় ব্যবস্থা করুন। আমিও সঙ্গে যা'ব।"

মৃণালিনী বলিলেন, "যত কথা বলেছি, সবই তাসের ঘর হ'ল—একটু বাতাসেই পড়ে গেল!"

"কেন ?"

"যে ঠাকুরের সেবা আমি এক দিন আর কাউকে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে পারিনি, সেই ঠাকুরের সেবার ভার আমি তোমাকে দিয়েছি। তুমি সে ভার ফেলে যেতে পারবে না, কমলা।"

শেষে মৃণালিনীর কথাই থাকিল—তাঁহার যাত্রার আয়োজন হইল। তাঁহার যে দাসী দীর্ঘকাল তাঁহার কাছে ছিল, তিনি তাহাকে নানা তীর্থ দর্শন করাইয়া আনিয়াছিলেন। তিনি তাহাকে কমলার কাছে রাখিয়া যাইবেন, স্থির হইল। সে বলিল, "মা, তোমার যে অসুবিধা হ'বে!"

মৃণালিনী উত্তর দিলেন, "কেবল কি নিজের সুবিধাই খুঁজব ? তীর্থেও অসুবিধা!"

শেষে সে একদিন মৃণালিনীকে বলিল, "কিন্তু, মা, ব'লে রাখছি, যদি সত্য সত্যই তীর্থবাসী হও, তবে যেন আমাকে ফেলে যেও না।"

মৃণালিনী বলিলেন, "ঠাকুর করুন, তোর কথাই ফলুক।"

যাত্রার "দিন দেখিবার" কথায় মৃণালিনী বলিলেন, "আমার জন্যও দিন দেখতে হবে ?"

দিন স্থির হইল।

সকলে যাইয়া মৃণালিনীকে ট্রেণে তুলিয়া দিয়া আসিলেন। আসিবার সময় দেবদত্ত অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিল না—আর রেণু যেন পাষাণ-প্রতিমার মত রহিল। তাহার মনে হইল—মা নাই, পিতা নাই, শেষ যিনি ছিলেন, সেই মাসীমাও চলিয়া যাইলেন। সে আজ একা—কেবল একা নহে, সংসারে লোক যাহাকে সব বলে, সেই সব থাকিতেও সে একা। অদৃষ্টের এ কি দারুণ উপহাস! [ক্রমশঃ

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

অর্কিড

অর্কিডের ফুলে কি-বিচিত্র বাহার, সে-পরিচয় অল্প-বিস্তর আমাদের জানা আছে।

একজন বিশেষজ্ঞকে আমরা প্রশ্ন করেছিলুম,—'অর্কিড' কথার বাঙলা প্রতিশব্দ কি? তিনি জবাব দিয়েছিলেন,—'পারিজাত' অর্থাৎ পরগাছা,—মানে, যে ফুল অন্য গাছের শাখায় আশ্রয় নিয়ে জন্মায়।

পাশ্চাত্য উদ্ভিদ-তত্ত্ববিদরাও এ কথার সমর্থন করেন। তাঁরা বলেন, অর্কিড আছে দু' জাতের। এক জাতের অর্কিড জন্মায় মাটির বুকে নিজের তরু-শাখায় ভর করে'; আর এক জাতের অর্কিড জন্মায় অন্য গাছের ডালে নিজের পত্র-পল্লবের গুচ্ছ তুলে, তাতে ভর করে'।

প্রথম-বিশেষজ্ঞ বুঝিয়ে দিয়েছিলেন পুরাণের গল্প তুলে যে, সে-পারিজাত নিয়ে ইন্দ্রের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের দারুণ যুদ্ধ হয়েছিল, সে-পারিজাতও ঐ এক-জাতের অর্কিড! এবং তাঁর মতের পোষকতা-স্বরূপ তিনি বলেছিলেন, ভালো অর্কিড জন্মায় পাহাড়ে জঙ্গলে দুর্গম প্রদেশে। কোথাও ফণীর ফণাচক্রে সে জঙ্গল সমাচ্ছন্ন; কোথাও বা হিংস্র ব্যাঘ্র-ভল্লুকের বিচরণ চলেছে দুর্নিবার রকম; কোথাও বা কুমীর ভরা জলার পারে অর্কিডের ফুল ফোটে।

অর্কিড সংগ্রহ করতে কত লোক যে প্রাণ দেছেন, তার হিসাব মেলে না! ইংরেজ বিশেষজ্ঞরাও এ কথা বলেন। তাঁরা বলেন, Men risked their lives in tropical regions to obtain rare varieties and new species of these much-prized plants. মণি-মুক্তার সন্ধানে জহুরীরা যেমন মরণকে তুচ্ছ করে' সমুদ্র-মন্থন করেন, অর্কিড-সন্ধানীরাও তেমনি অর্কিডের সন্ধানে বাঘের মুখে, সাপের মুখে, কুমীরের মুখে যেতে পশ্চাৎপদ হন না!

আজ পর্য্যন্ত সভ্যজগৎ এই অর্কিডের যে-সন্ধান যতদূর পেয়েছে, তাতে জানা যায়, অর্কিড আছে দু' হাজার বিভিন্ন জাতের। এ-সব ফুলের আকারে কি দারুণ বৈচিত্র্য, বলে শেষ করা যায় না! কোনো ফুল দেখতে হুবহু যেন প্রজাপতি! কোনোটা মাকড়শার মতো; কোনোটা বা ব্যাঙ্-টিকটিকির মতো!

নানা ঋতুতে এ ফুলের নানা রং হয়

দেয়ালগিরি অর্কিড

অর্কিড সংগ্রহের কাজে প্রাণ বিপন্ন করেন কারা? এবং প্রাণ বিপন্ন করার কি-বা হেতু? এ দুটি প্রশ্ন স্বভাবতঃ আমাদের মনে জাগে। এবং এ দুটি প্রশ্নের উত্তরে বলবো, প্রথমতঃ অর্কিড-সন্ধানে আগ্রহ বৈজ্ঞানিকের; আর্টিষ্টের; ফটোগ্রাফারের; সৌখীন পুষ্পবিলাসীর; ডাক্তারের এবং ব্যবসায়ীর। শৌর্য্য-সাহসে কীর্ত্তি রাখবার জন্য মানুষ এ-জগতে বহু অসাধ্য সাধন করেছে; দুর্লভ অর্কিড-সংগ্রহে কীর্ত্তি থাকবে, সেজন্যও অনেকে প্রাণ বিপন্ন করে

সারাজীবন পৃথিবীর নানা দুর্গম স্থান থেকে অর্কিড সংগ্রহ করে বেড়াচ্ছেন!

দিকে দিকে প্রকৃতি কি সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করে রেখেছে, সহর ছেড়ে বনে-পর্ব্বতে গেলে আমরা তার কিছু-কিছু পরিচয় পাই। অর্কিডকে প্রকৃতি বিচিত্র সুষমায় সাজিয়ে গোপন রেখেছে অতিদুর্গম প্রদেশে। দক্ষিন-আমেরিকা, বোর্ণিয়ো, নিউ-গিনি, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, হিমালয়-গিরি, আসাম, ব্রহ্মদেশ—এ সব জায়গার বন-পর্ব্বত জলা জঙ্গল থেকে বহু বিচিত্র অর্কিড পাওয়া গেছে।

ভালো জাতের অর্কিড প্রচুরভাবে জন্মায় রোগ-বীজাণ-পূর্ণ জলায়, সর্প-বিবরবেষ্টিত বনে-জঙ্গলে। তার কারণ,

প্রতিমার হাতে পানের খিলি

ইউলোফিয়া এল্জিজাবেথিয়া

সূর্য্যের আলো বা মানুষের চোখের দৃষ্টি এ দুটি বস্তুর আওতায় ভালো জাতের অর্কিড জন্মাতে পারে না।

আসাম থেকে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এক রকম অর্কিড পাওয়া গেছে। বিশেষজ্ঞরা তার নাম দেছেন—Cypripedium Fairrieanum. এর প্রথম ফুলটি লণ্ডনে বিক্রী হয়েছিল নগদ এক হাজার পাউণ্ড দামে।

আমেরিকার কলম্বিয়া প্রদেশে এক নিরালা নদীর বুকে ষ্টীমার চালিয়ে চলেছিলেন তরুণ একজন উদ্ভিদ-তত্ত্ববিদ। নদীর জলে তিনি দেখেন, চমৎকার এক-ঝাড় ফুল ভেসে চলেছে! তখনি সে ঝাড় তুলে পরীক্ষা করলেন। বুঝলেন, এ এক দুর্লভ জাতের অর্কিড। ষ্টীমার থামিয়ে তীরে নেমে ভদ্রলোক বহু গ্রাম নদী পর্ব্বত জলা পার হলেন, কত জঙ্গল ভেদ করে চললেন এবং দীর্ঘ দু'বৎসরের প্রাণপাত-সাধনায় তিনি এ অর্কিডের জন্মভূমির দেখা পেলেন। এ অর্কিডটির নাম মিলটোনিয়া ভেকসিলারিয়া। এ জাতের অর্কিডের প্রথম ফুল লণ্ডনে বিক্রী হলো ১৩৭৫ পাউণ্ড দামে।

অর্কিড-সংগ্রহে য়ুরোপ-আমেরিকায় অনেকে জীবিকা উপার্জ্জন করেন। সেখানকার অনেক ফার্ম্ম বহু অর্থব্যয়ে পৃথিবীর দিকে দিকে লোক পাঠান বিচিত্র অর্কিড সংগ্রহের কাজে। মাঝে মাঝে কৌতুক ঘটে চমৎকার! কালিফোর্ণিয়ায় অর্কিড সংগ্রহ করতে গিয়ে আমেরিকার এক দুর্গম গিরি-প্রান্তর থেকে ফার্ম্মের লোক ফুলের নক্সা এঁকে তাঁদের ফার্ম্মে পাঠালেন; তার পর ফুল পাঠালেন। বিলাতী অফিস দেখলেন, তাঁদের অর্কিডগুচ্ছে যে-ফুল ফুটলো, তার মূর্ত্তি একেবারে অন্য রকমের! তাঁদের বিস্ময়ের সীমা নেই! সংগ্রাহককে সে কথা লিখে জানাতে সংগ্রাহক বহু পল্লবগুচ্ছ পাঠালেন। দ্বিতীয় দফায় যে গুচ্ছ এলো তাতে যে ফুল ফুটলো, সে ফুলের চেহারা মিললো সংগ্রাহকের নক্সার ছবির সঙ্গে! বিশেষজ্ঞরা তখন এ রহস্য-আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হলেন এবং জানা গেল, কোনো কোনো জাতের অর্কিডে দু'জাতের ফুল ফোটে। এক-জাতের ফুল মেয়ে-ফুল; অপর জাতের ফুল পুরুষ-ফুল! এ দু'জাতের ফুলের চেহারায় আকাশ-পাতাল তফাৎ! একটি গাছে দু'রকম ফুল ফুটছে, এমন ব্যাপার বিলাতী

কার্য্য এর পূর্ব্বে কখনো চোখে দেখেননি বা দেখবার প্রত্যাশা তাঁদের মনে জাগেনি।

আর একবার অর্কিডের ফুল নিয়ে আর একরকম গোলযোগ ঘটেছিল।

সংগ্রাহক পাঠিয়েছিলেন ষ্টানহোপিয়ান নামে অর্কিড। ফুলের সঙ্গে সংগ্রাহকের পাঠানো নক্সার ফুলের এতটুকু মিল দেখা গেল না। দু'বছর ধরেও বিশেষজ্ঞের দল অর্থ বুঝতে পারলেন না! শেষে একদিন কি হলো, নাড়ানাড়ি করতে গিয়ে এক বালক ভৃত্যের হাত থেকে অর্কিডের টবটি পড়ে ভেঙ্গে চূর্ণ হয়ে গেল। বালক-ভৃত্যকে এজন্য লাঞ্ছনা-নিগ্রহ ভোগ করতে হলো অনেকখানি; তার পর কর্তৃপক্ষীয়েরা মাটীর চাঙ্গড় হাতে নিয়ে দেখেন, গাছের যে-দিকটা শিকড় ভেবে তাঁরা মাটীতে পুঁতেছিলেন, সেই শিকড়ের দিকে ছোট ছোট পল্লবের চিকন-বাহু—আর সেই বাহুমূলে রাশি-রাশি পুষ্পকলি! এ পুষ্পকলির চেহারা দেখতে নক্সার ফুলের মতো! তখন বোঝা গেল, গাছটি উল্টো পোঁতা হয়েছিল বলে অনুরূপ ফুল পাওয়া যায়নি! সোজাসুজি এ গাছ টবে বসাতে ফুল ফুটলো অজস্র এবং সে ফুলের চেহারা নক্সায়-আঁকা মূল ফুলের চেহারার সঙ্গে হুবহু মিলে গেল।

মাদাগাস্কারের নিবিড় জঙ্গলে ইউলোফিয়া এলিজাবেথিয়া নামের অর্কিড সংগ্রহ করতে গিয়ে অর্কিড-সন্ধানী হামেলিন এবং তাঁর বন্ধু বিপন্ন হয়েছিলেন সাংঘাতিক রকম। এ ফুল নিতে গেলে একটি ভীষণ বন-বিড়াল তার বন্ধুকে আক্রমণ করে। বিড়ালের ধারাল নখ এবং দাঁতের শরে জর্জ্জরিত হয়ে বন্ধুটি মারা যান; হামেলিন অতিকষ্টে প্রাণে বেঁচে অর্কিড সংগ্রহ করে আনেন।

নিউগিনির এক গোরস্থানে এক জন অর্কিড-সন্ধানী এক অপরূপ অর্কিডের সন্ধান পান। গাছ নিতে গেলে সেখানকার লোক মার-মুখী হয়ে তেড়ে আসে। পূর্ব্ব-পুরুষের কবর তারা কলুষিত হতে দেবে না! ভদ্রলোক তাদের ঘুষ দেন ছোট আয়না, টিনের বিবিধ খেলনা এবং এমনি টুকিটাকি বহু দ্রব্য। এ ঘুষে খুশী হয়ে তবে তারা ভদ্রলোককে সে অর্কিড আনতে দিয়েছিল।

অর্কিডের সুরভি-তত্ত্ব জটিল। কোনো জাতের অর্কিডের ফুল সুরভি বিতরণ করে শুধু প্রত্যুষে; কোনো ফুল গন্ধ দেয় শুধু দিনের বেলায়; কোনো ফুল শুধু রাত্রিকালে। মলয় দ্বীপে জন্মায় বালবোফাইলাম অর্কিড। তার ফুল গন্ধ দেয় ভোর পাঁচটা থেকে বেলা আটটা পর্য্যন্ত! উপরি-উপরি পাঁচ ছ'দিন গন্ধ দানের ব্যবস্থা বাহাল থাকে। তার পর সাত দিনের দিনে ফুলের রঙ বদলায়। এই রঙ-বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে গন্ধ-দানের সময়ের পরিবর্ত্তন ঘটে। পনেরো দিনের পর ফুলের বর্ণ হয় ঘন-নীল; তখন সে-ফুলে পচা মাছের দুর্গন্ধ এবং এ-দুর্গন্ধ বার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফুলের মৃত্যু ঘটে।

ডায়েক্রিয়াম্ বাইকোর্ণাটাম বলে এক-জাতের অর্কিড আছে। এর ফুল দেখতে ভারী অপরূপ! পাপড়িগুলি বাঁশীর মতো কুঁকড়ে থাকে; তার মধ্যে পিপীলিকার দল নিরাপদে আশ্রয় লাভ করতে পারে এবং পিপীলিকারা এ ফুলের পাপড়িতে পরম-সুখে বসবাস করে।

আর-এক জাতের অর্কিড আছে তার নাম আসিবেতো ক্রীশানথা অর্থাৎ ছত্র-ফুল। ছাতা মুড়ে ফেললে যেমন দেখায়, এ ফুলের বাহিরের পাপড়িগুলি থাকে তেমনি ভাবে, —বৃষ্টি পড়লে পাপড়ি তার কুঞ্চিত দেহ প্রসারিত করে দেয়। দেবামাত্র পাপড়িগুলি খোলা ছাতার আকারে ফুলটিকে বৃষ্টিপাত থেকে নিরাপদ রাখে। এমনি ভাবেই এ ফুল চিরকাল তার মধু এবং জীবন রক্ষা করে আসছে।

অষ্ট্রেলিয়ার নিবিড় জঙ্গল থেকে এক জাতের অর্কিড পাওয়া গেছে, তার ফুল দেখতে ঠিক যেন একটি প্রজাপতি! দেখলে মনে হয় যেন ডানা মেলে পেটের মধ্যে মাথা গুঁজে মস্ত একটি প্রজাপতি চোখের সামনে অবস্থান করছে।

অক্টোপাশের সংক্ষিপ্ত সংস্করণের মতো এক-জাতের অর্কিড ফুল আছে; পাপড়িগুলির মুখ যেন বিচ্ছিন্ন ভাবে ঝুলছে এবং সেগুলিকে প্রতিমার হাতের পানের খিলির মতো কে যেন বোঁটার সঙ্গে বেঁধে রেখেছে! এ ফুলটির বৈজ্ঞানিক নাম বালবোফীলাম্ বিনেন্ডিজ্কাই।

এ সব অর্কিড জন্মায় পাহাড়ে-জঙ্গলে বুড় বড় গাছের মগ্‌ডালে। আবার অন্য জাতের অর্কিড আছে—তার জন্ম সলিল-গর্ভে। প্রশান্ত মহাসাগরে এবং ভারত মহাসাগরে জলের বুকে প্রায় বারো ইঞ্চি নীচে সবুজ লতার ডোরে জেগে ওঠে এক-একটি ফুল—কত রঙে রঙীন—দেখলে বিস্ময়ের সীমা থাকে না!

সভ্য জগৎ এ সব ফুলের বীজ সংগ্রহ করে এখন তার চাষ বা কালচারের ব্যবস্থা করেছেন।

অর্কিডের বীজ যেমন মিহি, তেমনি হাল্কা! পাউডারের মতো! একটু জোর-বাতাস লাগলে সাম্‌লে রাখা দায়। ম্যাকসিনেলেরিয়া জাতের একটি ফুল থেকে বীজ পাওয়া গেছে প্রায় সতেরো লক্ষ! আঙ্গোগের জাতের অর্কিড ফুল থেকে বীজ মেলে প্রায় সাত কোটি চল্লিশ লক্ষ! এ বীজ থেকে এখন হাজার হাজার অর্কিড জন্মাচ্ছে। তবে মাটির বুকে জন্মায় না—এ বীজের স্থান রচনা করে দিতে হয় সযত্নে অন্য গাছের শাখায়-প্রশাখায়।

অর্কিডের বীজের চাষ হয় প্রথমে স্যাঁতানে জমিতে; তার পর উচ্চ-তাপে (high temperature) রাখ্‌তে হয়। তিন মাস পরে ছোট ছোট চারা অজস্র সবুজ বিন্দুর মতো দেখা দেয়। তখন সতর্কভাবে এই বিন্দুগুলি কোনো জোরালো গাছের শাখায় সযত্নে বসিয়ে দিতে হয়।

শুধু সৌখীন সমাজেই অর্কিডের ফুলের আদর তাদের রূপ আর সুরভির জন্য—তা নয়। বহু অর্কিডের বিভিন্ন গুণ আছে এবং সে গুণের জন্য শিক্ষিত সমাজে তাদের আদরের সীমা নেই। কতকগুলি অর্কিড ঔষধার্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। আমাদের ঘরেও এখন এসেন্স অফ ভ্যানিলার খুব আদর। এই ভ্যানিলা সংগৃহীত হয় ভ্যানিলা গ্রিফিথি আর হাবেনেরিয়া অর্কিড থেকে। ডেনড্রোবিয়াম অর্কিডের ডালপালা থেকে সিগারের সৌখীন পাউচ্ (pouch), সৌখীন সিগার-কেশ তৈরী হচ্ছে। তার উপর এর নির্য্যাস নিয়ে ফরাসী চিকিৎসকরা এখন যক্ষ্মা রোগের ঔষধ তৈরী করছেন।

অর্কিডের ফুলে আর এক বৈচিত্র্য আছে, যা অপূর্ব্ব। ঋতু-পর্য্যায়-ক্রমে বহু অর্কিডের ফুল রঙ্ বদলায়। একই গাছে গ্রীষ্মে এক রকম রঙের ফুল ফোটে; বর্ষায় আর এক রকম; শীতের সময় অন্য এক রকম। এবং এ-সব ফুল তাজা থাকে দীর্ঘকাল; এক মাস, দু'মাসেও এতটুকু মলিন বিবর্ণ হয় না। গাছ থেকে ফুল নিয়ে ফুলদানীতে রাখুন, তখনো তার শ্রী থাকবে তাজা এবং অমলিন।

প্রজাপতি ফুল

বাটন্-হোল্ অর্কিড

শ্রীপৃথ্বীরাজ মুখোপাধ্যায়।

তিনকড়ি মাষ্টার

[গল্প]
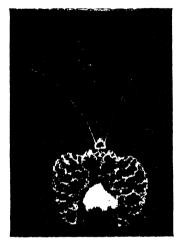
এত তাড়াতাড়ি করিয়াও তিনকড়ি পারিয়া উঠিল না। মোড়ের মাথায় আসিয়া কাপড়ের দোকানে ঘড়িটার দিকে তাকাইয়া দেখিল, এগারটা বাজিয়া পাঁচ মিনিট। এখান হইতে স্কুলটুকু পৌঁছিতে আরও পাঁচ মিনিট লাগিবে। সুতরাং আজও তাহার দশ মিনিট লেট্-য়্যাটেন্‌ডান্স্! না! আর সে পারে না। সময় যেন তাহার সঙ্গে কোমর বাঁধিয়া শত্রুতা লাগাইয়া দিয়াছে। আজ সে স্নানও করে নাই। স্নানের সময়টা বাঁচাইয়া, আধপেটা খাইয়া—খাওয়া ঠিক বলা যায় না—গিলিয়া, তুফান মেলের গতিতে ছুটিয়া আসিয়াছে। তবুও দশ মিনিট লেট্!

হাজিরা খাতায় নাম সহি করিতে গেলে, হেড্‌মাষ্টার বলিলেন, "আপনাকে স্কুলের চেয়ারে বসিয়ে রাখা, আমার সাধ্যে আর কুলাল না, তিনকড়ি বাবু। একে ত ম্যানেজিং কমিটি আপনার ওপর যে রকম খাপ্পা, তার ওপর নিত্যই যদি এই রকম—"

নিত্যকার একই সেই পুরাণো কথা। তাহার বিরুদ্ধে এই পরিচিত অভিযোগ শুনিয়া শুনিয়া তাহার কাণে চড়া পড়িয়া গিয়াছে। তিনকড়ি মন্থর পদবিক্ষেপে হেড্‌মাষ্টারের ঘর হইতে বাহির হইয়া তাহার ক্লাসে ঢুকিল।

একটা ছেলে বাঙ্গালা বইখানা হাতে করিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সার, 'পক্ষিগণ', 'ক্ষ'তে ঈ হবে ত, কিন্তু হ্রস্ব ই করেছে।" ঠাস্ করিয়া তাহার গালে এক চড় মারিয়া তিনকড়ি কহিল—"বেঞ্চির উপর দাঁড়িয়ে থাক্‌গে যা।" বলা বাহুল্য, ছেলেটি বেঞ্চির উপরও দাঁড়াইল না, বেঞ্চির নীচেও দাঁড়াইল না। তাহার প্রতি শিক্ষক মশা'য়ের এই বে-আইনী কার্য্য দেখিয়া ভাবিল যে, তাহার দোষ না থাকা সত্ত্বেও শিক্ষক যেখানে তাহার উপর স-উপদ্রব আইন অমান্য করিতে পারেন, সেখানে তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন দ্বারা নিরুপদ্রব আইন অমান্য করিবার অধিকারটা তাহার নিশ্চয়ই আছে। সুতরাং সে সটান গিয়া তাহার জায়গায় বসিয়া পড়িল।

চারিটার সময় স্কুলের ছুটী হইলে তিনকড়ি গেটের বাহিরে আসিয়া ময়লা খাকী-টুইল সার্টের বুকপকেট হইতে বহুদিনের সযত্ন সঞ্চিত বহুবিধ টুকরা কাগজ-পত্রের মধ্য হইতে একখানি সযত্নরক্ষিত খবরের কাগজের 'কাটিং' বাহির করিল এবং সেই বহুবার পঠিত কর্ম্মখালির ছোট্ট বিজ্ঞাপনটুকুর ভাঁজ খুলিয়া আবার তাহা মনে মনে পাঠ করিল।

টুইসনির বিজ্ঞাপন। সকালে ৩টি ছেলেকে দুই ঘণ্টা করিয়া পড়াইতে হইবে, মাহিনা ১২৲ টাকা। সকালে তিনকড়ির দুই জায়গায় দুইটি টুইসনি আছে। পাঁচ টাকা হিসাবে দুই জায়গায় দশ টাকা পায়। প্রত্যেক স্থানে দেড় ঘণ্টা করিয়া পড়াইবার কথা; কিন্তু দুই বাড়ীর পড়ানো সারিয়া ঘরে ফিরিতে তাহার প্রায়ই দশটা বাজিয়া যায়। সুতরাং একদিকে যেমন পুরা একটা ঘণ্টা সময়ও তাহার হাতে থাকে না, অপরদিকে তেমনই তিনটি কাজ তাহার মাথায় চাপিয়া থাকে; অর্থাৎ স্নান, আহার এবং স্কুলের এক মাইল পথ হাঁটা। তাই, খুব তাড়াহুড়া করিয়াও তিনকড়ি প্রায়ই স্কুলে লেট্ হইয়া পড়ে। কিন্তু উপায়ও নাই। সকালের টিউসনি ছাড়িলে, শুধু সন্ধ্যার টিউসনি আর স্কুলের মাহিনায় সংসার চলে না। আর দু'বেলার টিউসন রাখিয়া স্কুল ছাড়া—সে-ত একেবারেই অচল।

তাই তিনকড়ি চলিতে চলিতে ভাবিতে লাগিল, যদি এই পড়ানোটা পাওয়া যায়, তাহা হইলে সে দুই দিক দিয়া লাভবান হয়;—দু'টা করিয়া টাকাও বেশী আয় হয়, আর স্কুলে আসিতেও কোন দিন লেট্ হয় না। 'কিন্তু হইবে কি?—নীহাররঞ্জন দত্ত; নামটা শুনিয়া মানুষটিকে ত মোলায়েম বলিয়াই মনে হয়। কত লোক হয় ত উমেদার

হিসাবে হাজির হইবে, সুতরাং হওয়ার সম্ভাবনা—যা'ক্, দেখাই যাক'না, ভগবান্ কি করেন।

আধঘণ্টার মধ্যেই তিনকড়ি নীহারবাবুর বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল। তিনকড়ির ধারণাই ঠিক। নীহারবাবু লোকটি মোলায়েমই বটে। তিনকড়ির চাকুরী হইয়া গেল। তাহার অন্ধকার ভারী মনটা একটু উজ্জ্বল আর হাল্কা হইয়া উঠিল। ব্যবস্থা হইল, পরদিন হইতেই সে নীহারবাবুর ছেলে তিনটিকে পড়াইবে। কিন্তু এক বিষয়ে একটু সঙ্কট দেখা দিল। সকালের দুই জায়গায় টুইসনির গতমাসের বেতন এখনো সে পায় নাই। এমাসেরও দশ দিন হইয়া গিয়াছে। কায ছাড়িয়া দিলে এই এক মাস ১০ দিনের মাহিনা পাইবার আশাটাও হয় ত তাহাকে ছাড়িতে হইবে। হয় ত কেন, নিশ্চয়ই ছাড়িতে হইবে। কারণ, এ পর্য্যন্ত তাহার কাণে এ সংবাদটা পৌঁছায় নাই যে, কায চুকাইয়া দিবার পর কেহ তাহার পূর্ব্বের পাওনা চুকাইয়া পাইয়াছে। অথচ মাহিনা পাইবার অপেক্ষায় থাকিলে নূতন কাযটি হাতছাড়া হইয়া যায়। যাহা হইবার হইবে, নূতন কাযটি সে ত্যাগ করিতে পারে না। স্কুলে সে আর লেট্ হইবে না। ইহার জন্য গোটা ১০।১২ টাকা ক্ষতি হয়—হউক, সুতরাং পরদিন হইতেই তিনকড়ি নীহার বাবুর গৃহে নিয়মিত পড়াইতে সুরু করিয়া দিল।

এক মাস কাটিয়া গিয়াছে। স্কুলে তিনকড়ির আর কোন-দিনই লেট্ হয় না; এদিকটায় সে নির্ভয় এবং নিশ্চিন্ত হইয়াছে। এখন সে গায়-মাথায় তেল মাখিয়া স্নান করিবার সময় পায় এবং খাইতে বসিয়া কি খাইতেছে এবং তাহাতে নুণ-ঝাল ঠিক হইয়াছে কি না ইত্যাদি বুঝিবার অবকাশ পায়। কিন্তু এত দিন পরে, যে পথটাকে সে নিরাপদ ও নির্ভয় ভাবিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়াছিল, সেই পথ হইতেই বিপদ ও ভয়ের একটা প্রবল ঝঞ্ঝা আসিয়া হঠাৎ এক দিন তাহাকে কাঁপাইয়া দিল। টিফিনের পর সেক্রেটারী আসিয়া তাহাকে ডাকিয়া কহিলেন, "তিনকড়ি বাবু, আমাদের এ ছোট স্কুলে আপনার কাযের সুবিধা হবে না; আপনি অন্যত্র চেষ্টা দেখুন। লিখিত নোটীশ পাবেন এখন; আপাততঃ মুখের নোটীশটাই শুনে নিন।"

তিনকড়ির পায়ের তলা হইতে পৃথিবী সরিয়া যাইতে লাগিল। চারিদিক হইতে একটি কাল পর্দ্দা তাহার দৃষ্টিকে অবরুদ্ধ করিয়া জমিয়া উঠিল। তিনকড়ি কহিল, "আজ্ঞে, আমার ত আর লেট্—

"আহা-হা, লেট্ ত ছিল ভাল; এ যে লেটের বাবা! ক্লাসে পড়াশুনা একেবারে কিছু হয় না। আর কিছু দিন আপনার দ্বারা ক্লাস চল্লে, ছেলেগুলো বর্ণপরিচয় পর্য্যন্ত ভুলে বসবে।"

"আজ্ঞে, আমি ত—"

"যান, যান; আপনি আর কাটাতে চেষ্টা করবেন না। আজকালকার অধিকাংশ মাষ্টার মশাইরা ফাঁকিবাজ বটে; কিন্তু তাহলেও তাঁরা আট আনা ফাঁকি দেন, আট আনা কায করেন। কিন্তু আপনি ষোল আনাই ফাঁকি দিয়ে আসছেন। শুনলুম, ক্লাসে চুপ করে খালি বসে থাকেন আর আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবেন। মাসের পর মাস স্কুলের অর্থ হস্তগত করে পরমার্থিক চিন্তা করবার স্থান এ নয়।"

সকাল ছয়টা হইতে রাত দশটা পর্য্যন্ত ছুটাছুটি ও পরিশ্রম করিয়া তিনকড়ি মাসে পঞ্চাশটা টাকাও আয় করিতে পারিত না। সে টাকার আবার তিন ভাগের এক ভাগ যাইত বাসা-ভাড়ায়। সুতরাং বাকী ৩০।৩২ টাকায় কলিকাতা সহরে পাঁচ-সাতটি পোষ্যের ভরণপোষণের চিন্তা, পরমার্থিক নয় বটে, তবে তাহা যে পরম এবং আর্থিক, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।

সেক্রেটারী তাঁহার দৃষ্টির সব বিষটুকু নিঃশেষে তিন-কড়ির উপর ঢালিয়া দিয়া যাইতে যাইতে কহিলেন, "এই পরীক্ষার ফল থেকেই বোঝা যাবে এখন, আপনি ক্লাসে কি রকম পড়ান।"

তিনকড়ি ক্লাস থ্রী, ফোর আর ফাইভে বাংলা পড়ায়। আজই পরীক্ষার প্রোগ্রাম বাহির হইয়াছে, এই তিন ক্লাসের বাংলা পরীক্ষা লইবেন, শশাঙ্কবাবু।

আসন্ন পরীক্ষা তিনকড়ির মনে একটা বিভীষিকার সৃষ্টি করিয়া তুলিল। যে ভয়টা ছাত্রদেরই হয়, আজ তাহা শিক্ষকের অন্তর কাঁপাইয়া তুলিল। অধিকাংশ ছাত্রই যে ফেল হইবে, তাহা সে বেশ বুঝিত। অর্থের টানাটানি-জনিত সাংসারিক দুশ্চিন্তায় যে নিজেকে পর্য্যন্ত দেখিবার অবসর পায় না, সে ছাত্রদের পড়াশুনা দেখিবে কি করিয়া। অন্ন-চিন্তাই যাহার সব, অন্য চিন্তা তাহার কোথায়?

ছাত্রদের উপর তাহার রাগ হইল। সে না হয় পড়াইতে পারে নাই, কিন্তু তাহারা বাড়ীতে পড়াশুনা করে না কেন? তাহাদের অধিকাংশের বাড়ীতে ত মাষ্টার আছে। তাহারা ভাল করিয়া পড়াইয়া দিলেই ত হয়। যত দোষ, নন্দ ঘোষ। ১৮৲ টাকায় সে আর কত করিবে? সারা দিনের মধ্যে স্কুলের এই পাঁচটা ঘণ্টাই তাহার ক্লান্ত দেহ যা একটু বিশ্রাম পায়; তাহার মন কিন্তু তাহাও পায় না সুতরাং……

কয়েক দিন কাটিয়া গেল। আগামী সোমবার হইতে নীচের ক্লাসগুলার পরীক্ষা আরম্ভ হইবে। চারিটার পর স্কুল হইতে বাহির হইয়া, তিনকড়ি হন্ হন্ করিয়া নীহার-বাবুর বাসার দিকে চলিতে লাগিল। দুই দিন সেখানে পড়াইতে যায় নাই। ইচ্ছা করিয়া নয়; নীহার বাবুই বারণ করিয়াছিলেন; বলিয়াছিলেন—'ছেলেরা মাসীর বাড়ী যাবে, দু'দিন আর আসবেন না।' ছেলেরা আসিল কি না—সে খবরটাও লওয়া দরকার আর তাহা ছাড়া একটা বড় দরকার আছে। গতমাসের বেতন বার টাকা সে এখনো পায় নাই। এ-মাসেরও বার চৌদ্দ দিন হইয়া গেল। নীহারবাবু বলিয়াছেন,—দুটো দিন বাদে ছেলেরা ফিরিয়া আসিলে গতমাসের মাহিনাটা দিয়া দিবেন। টাকাটা আজ পাওয়া গেলেই ভাল হয়। দু'মাসের ঘর-ভাড়া জমিয়া গিয়াছে। উঠ্নার দোকানে অন্ততঃ গোটা পাঁচেক টাকা না দিলে আর সেখানে মাথা-গলানো যাইবে না। বারটা টাকা ত দিবে, তাহাতে আর কিই-বা হইবে, এ মাসের পাওনা হইতে কিছু লইয়া অন্ততঃ গোটা পনর যদি নীহারবাবু দেন, তাহা হইলে কোনমতে সে ধাক্কাটা সামলাইয়া লইতে পারে। নীহারবাবু লোক খুব সজ্জন, ভাল করিয়া ধরিয়া বসিলে দিতেও পারেন।

ভাবিতে ভাবিতে তিনকড়ি নীহারবাবুর বাটীর সম্মুখে আসিয়া পৌঁছিল; দেখিল, বৈঠকখানার দরজা খোলা; ভিতরে পাঁচ-ছয় জন লোক দাঁড়াইয়া, তন্মধ্যে গানের মাষ্টার সত্যবাবুও আছেন। তিনি নীহারবাবুর মেয়েদের গানের মাষ্টার, বিকালে এই সময়টাতে রোজ গান শিখাইতে আসেন। দু'একদিন সকালে আসিয়াছিলেন; তাহাতেই তিনকড়ি সত্যবাবুকে জানে। তিনকড়ি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলে সত্যবাবু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন,—"আপনার পিঠে ক'ঘা পড়লো মশাই?"

তিনকড়ি হেঁয়ালী কিছুই বুঝিল না। সত্যবাবু কহিলেন, "আরে, আপনারও নিশ্চয় কিছু পাওনা বাকী আছে ত? ইনি কিন্তু পলাতক!"

পলাতক! কে? নীহারবাবু?—তিনকড়ি থতমত খাইয়া নিজের মনেই প্রশ্ন করিল, আর ব্যাপারটা কিছুই বুঝিতে না পারিয়া সত্যবাবুর মুখেরদিকে ফ্যাল্-ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল।

একটি ভদ্রলোক, তিনি এই বাড়ীর বাড়ীওয়ালা, ভবানীপুরে থাকেন, তিনি একটি টানা নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "আপনাদের দশ-পনরর ওপর দিয়ে গেছে, আমার মশায়, তিনটি মাসের ভাড়া; প্রায় দুটি শ' টাকা!"

হেঁয়ালীর সমাধান হইল। তিনকড়ি বুঝিল, তাহার 'সজ্জন' নীহারবাবু কথঞ্চিৎ অসজ্জনতা করিয়া বাড়ীভাড়া ও অন্যান্য পাওনাদারদিগের পাওনা না দিয়া, রাতা-রাতি অদৃশ্য হইয়াছেন। কলিকাতা সহরে ইহা নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা; খুব আশ্চর্য্য হইবার ইহাতে কিছুই নাই।

তথাপি তিনকড়ির চক্ষুর সম্মুখে একপ্রকার ক্ষুদ্রকায় হরিদ্রাবর্ণের ফুল নিমেষে ফুটিয়া উঠিল এবং সে জানালার পাশের উপর বসিয়া পড়িল।

উঃ! চুলোয় যা'ক, বাড়ীওয়ালার দু'শো টাকা। তার দু'হাজার দশ হাজার আছে, দু'শো গেলে কোন ক্ষতি হবে না, কিন্তু আমার যে—! তিনকড়ির দেহ যেমন লুটাইয়া পড়িল, মনও তেমনি লুটাইয়া পড়িল। সকালে দু'জায়গায় দশ টাকা তাহার বাঁধা ছিল। এখন সে-ও গেল, এ-ও গেল। স্কুলের কাযও টল্মল্ করিতেছে। তরঙ্গোদ্বেলিত মরণের মহাসাগরে সে অবলম্বনস্বরূপ একগাছা তৃণেরও আশা দেখিল না। ডুবিয়া মরিতে পারিলেও সে অতলের স্নিগ্ধ-শয্যায় বিশ্রাম পায়। আর সে পারে না। সে কি করিবে!

ক্ষুদ্র দুর্ব্বল মাথার উপর ভাঙ্গিয়া-পড়া অনন্ত আকাশের চাপে নুইয়া পড়িয়া তিনকড়ি মাষ্টার মোড়ের মাথায় চায়ের দোকানে প্রবেশ করিল; কহিল—"খুব কড়া করে এক কাপ চা।" আজ আর সে বাসায় যাইবে না। পার্কে একটু বসিয়া, সন্ধ্যা হইলে একেবারে পর পর দু'জায়গায় পড়ানো শেষ করিয়া বাসায় ফিরিবে।

চা খাইতে খাইতে সে-দিনের খবরের কাগজখানা সে টানিয়া লইল। সম্মুখের পৃষ্ঠাতে বড় বড় অক্ষরের হেডিংয়ে

কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনের বিস্তারিত বিবরণ ছিল। সে নিতান্ত তুচ্ছ জ্ঞানে সে পাতা উল্টাইল। পরের পাতায় হিটলার ও চেম্বারলেনের প্রকাণ্ড ছবির সঙ্গে আসন্ন মহাযুদ্ধের জরুরী সংবাদ। কোনই দরকার নাই। সমস্ত জগৎ রসাতলে যাক্ কিম্বা থাক, তাহাতে তাহার কিছুই যায় আসে না। খেলাধূলার কথা—সম্পূর্ণ বাজে। ভাওয়াল মামলা—জাহান্নমে যাক্। সমস্ত কাগজখানার মধ্যে কর্ম্মখালির পাতাটাই একমাত্র আবশ্যকীয় ও মূল্যবান। তিনকড়ি সেই পাতাটা বাহির করিয়া আগ্রহের সহিত পড়িতে সুরু করিল।

অধিক রাত্রে বাসায় ফিরিলে, স্ত্রী নন্দরাণী মুখখানা ভার করিয়া শ্লেষের ভঙ্গীতে কহিল—"আজ বুঝি স্কুল থেকে বরাবর ছুটকীদের বাসায় গিয়েছিলে? পড়াতেও বোধ হয় আজ যাও নি?"

ছুটকী নন্দরাণীর মামাতো বোনের ডাকনাম; বয়সে তাহার অপেক্ষা দু'এক বৎসরের ছোট। তাহারই সহিত তিনকড়ির প্রথম বিবাহের কথা স্থির হয়। তাহার পর কি কারণে তাহা বন্ধ হইয়া যায়। ইহার ফলে তিনকড়ির মন একেবারেই ভাঙ্গিয়া পড়ে। সে তখন প্রথমে সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইবার সংকল্প করে এবং পরে আই, এ ফেল করে।

তাহার পর দীর্ঘ দশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। কিন্তু নন্দরাণীর বিশ্বাস, তিনকড়ি এখনও তাহার ভগিনীকে ভুলিতে পারে নাই এবং সময় ও সুবিধা পাইলেই তাহার ভগিনীপতি শ্যামলালের বাসায় গিয়া থাকে। কথাটার ভিতর হয় ত সত্য থাকিতে পারে; হয় ত তিনকড়ি সময় ও সুবিধা পাইলে শ্যামলালের বাসায় গিয়া থাকে। কিন্তু সে যাওয়ার ভিতর পূর্ব্বেকার কোন আকর্ষণ বা মোহ যে আর নাই, তাহাও সত্য।

প্রশ্নের উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া নন্দরাণী পুনরায় কহিল—"কেমন আছে ওরা সব? শ্যাম বুঝি বাসায় নেই? মফঃস্বলে গেছে। তা আমি ভাবলুম, রাত্তিরে ঐখানেই থাকবে, তাই এ-বেলা আর রান্না করিনি।"

"রান্না-বান্না করনি—"

"না।"

"ছেলেরা কি খেলে?"

"ও-বেলার জল-দেওয়া ভাত ছিল, তাই সব খেয়েছে। তুমি ওখান থেকেই খেয়ে এসেছ নিশ্চয়?"

"আমি ওখানে যাই নি।"

"যাও নি?"

"না।"

"তা হ'লে এত রাত পর্য্যন্ত—"

ক্রোধ, বিষাদ এবং গাম্ভীর্য্যভরা মুখে তিনকড়ি কহিল—"হাঁ; স্কুলের পর একটু কাযে যেতে হয়েছিল। তারপর পড়িয়ে আমাদের মৌলভী সাহেবের বাসায় গিয়েছিলুম।"

শ্লেষভরা কণ্ঠে নন্দরাণী কহিল—"মৌলভী সাহেবের বাসায়?"

"হ্যাঁ; এই টুপীটা আনতে"; বলিয়া তিনকড়ি হাতের একটা ফেজ টুপী তাকের উপর রাখিয়া দিল। তারপর জামা কাপড় ছাড়িয়া, ঢক্ ঢক্ করিয়া এক ঘটা জল খাইয়া শয্যায় গিয়া শুইয়া পড়িল।

নন্দরাণী ঘরের আলো নিভাইয়া দিয়া খানিকক্ষণ পর্য্যন্ত জানালার ধারে বসিয়া বাহিরের অন্ধকারের দিকে চাহিয়া রহিল; তাহার পর মেঝেরই একধারে একখানা কম্বল পাতিয়া শুইয়া পড়িল।

অনেক রাত পর্য্যন্ত উভয়েরই চোখে ঘুম আসিল না। এক জনের চিন্তা—স্বামীর সম্বন্ধে। তাঁহার অন্য নারীতে আসক্তি, অবৈধ প্রণয়, স্ত্রীর সহিত ছলনা প্রভৃতি। অপরের চিন্তা—সংসার সম্বন্ধে। কি করিয়া অভাব-অনটনের নিষ্ঠুর পেষণ হইতে নিজেকে রক্ষা করিবে। সকালের পড়ান দুইটা কি অশুভক্ষণেই ত্যাগ করিল। সেখানে এক মাস দশ দিনের মাহিনাটাও মারা গেল। স্কুলের কাযটাও যায়-যায়। গোটা বছর সে কিছুই পড়ায় নাই, সুতরাং ছেলেগুলো যে ফেল্ করিয়া বসিবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সুতরাং—দেখা যাক্, কতদূর কি হয়। কাল সকালে উঠিয়াই পার্ক সার্কাসে সে যাইবে। সকালে ঘণ্টা দেড়েক; কুড়ি টাকা। এই কাযটা যদি লাগিয়া যায়, তাহা হইলে আর কথাই নাই। একটু দূর। হউক—কুড়ি টাকা পাইলে একটা ট্রামের মান্থলী করিতে পারা যাইবে।

* * * *

"আপনি একটু বসুন, মিনিট পনর মধ্যেই সাহেব আসছেন।"

"ঘুমুচ্ছেন কি ?"

"না, গোসল কচ্ছেন ; আপনার কথা তাঁকে সব বলিছি।"

পার্ক সার্কাসে একটি ছোট্ট সুন্দর বাড়ীর সুসজ্জিত বৈঠকখানা। আগন্তুক একটি চেয়ার টানিয়া বসিয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ পরে একটি লুঙ্গী-পরা মুসলমান ভদ্রলোক ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিলেন—"আপনি ঐ টিউসনির জন্যে এসেছেন ত ?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"দেখুন, আমার ছেলেটি ছোট, সামান্য কিছু পড়ে। তবে বেশ যত্ন নিয়ে পড়াতে হবে।"

"সে আপনাকে বলতে হবে না। কাহে না হয় ফাঁকি দেওয়া যায়, কিন্তু খোদার কাছে ত আর ফাঁকি চলবে না।"

"সে ত ঠিক কথা। দেখুন, দশটা টাকা দিলে হাজার হাজার হিন্দু মাষ্টার পাওয়া যায়। কিন্তু আমি কুড়ি টাকা করে দেবো, তার মানে——

"সে আর আপনাকে কিছু বলতে হবে না, আমি বুঝতে পেরেছি। আপনার মেহেরবাণী হ'লে, আমি এক মাসের মধ্যেই আমার কাযের তারিফ্ আপনাকে দেখিয়ে দেবো।"

"তা ভাল ; আপনার নামটা কি ?"

"মহম্মদ একবাল হোসেন।"

উভয়ের মধ্যে আরও কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা হইবার পর এই স্থির হইল যে, একবাল হোসেন পরদিন হইতেই এখানে সকালে সাড়ে সাতটায় পড়াইতে আসিবেন। বেতন কুড়ি টাকা।

ফিরিবার পথে ট্রামে বসিয়া, অতীতের তিনকড়ি, বর্ত্তমানের একবাল হোসেন, জামার পকেট হইতে টুইসনির ছোট্ট বিজ্ঞাপনটুকু বাহির করিয়া আর একবার পাঠ করিল—'একটি নয় বছরের ছেলেকে সকালে এক ঘণ্টা করিয়া পড়াইবার জন্য একজন মুসলমান শিক্ষক দরকার। বেতন ২০৲। মহবুব রহমান, ৩৬ সি, পার্ক সার্কাস।'

গতকল্য চায়ের দোকানে চা খাইতে খাইতে বিজ্ঞাপনটি দেখিয়া সকলের অলক্ষ্যে তিনকড়ি ইহা ছিঁড়িয়া লইয়া পকেট-জাত করিয়াছিল।

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া কি ভাবিয়া তিনকড়ি বিজ্ঞাপনটা টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। তাহার মনের মধ্যে ঝড় বহিতেছিল। হঠাৎ সে একি কাণ্ড করিয়া বসিল! দারুণ অভাবের কশাঘাতে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া, সে যে-পথে ছুটিয়া আসিয়াছিল, এখন যখন চমক হইল, তখন থমকিয়া দাঁড়াইয়া সে গ্লানি ও লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতাটা তাহার বার বার মনে পড়িল,——

'বিপদে আমি না যেন করি ভয়।
দুঃখ তাপে ব্যথিত চিতে নাই বা দিলে সান্ত্বনা,
দুঃখে যেন করিতে পারি জয়।'

কবিতাটা তাহার মনে মনে অনেকটা বল সঞ্চয় করিল। সে ভাবিল, দুঃখের সহিত সংগ্রামে সে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন না করিয়া, এই যে ক্ষতবিক্ষত দেহে ক্রমাগত যুঝিয়া যাইতেছে, ইহাই তাহার ইহজীবনের বীরত্ব। এই বীরত্বের যদি পুরস্কার থাকে, তবে সে গর্ব্বিত-বক্ষে ভগবানের কাছ হইতে পরজন্মের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কড়ায়-গণ্ডায় আদায় করিয়া লইবে। দুঃখের সহিত সংগ্রামে সে কখনও দুর্ব্বলের মত অন্যায়ের পথ অবলম্বন করে নাই। কিন্তু কাল বিজ্ঞাপনটি পড়িবার পর কেন যে তাহার অন্যায় লোভ আসিল, কেন একটা অনুচিত উৎকট আগ্রহ আসিয়া তাহার মনকে নাচাইয়া দিল, কেন সে মিথ্যা কথা বলিয়া মৌলভী সাহেবের ফেজটুপীটা চাহিয়া আনিল, আর কেনই বা পার্ক সার্কাসে ছুটিয়া একবাল হোসেন নামের ছদ্ম আবরণে নিজেকে গোপন করিল—সেই সব কথা ভাবিয়া অন্তরে একটা তীব্র ব্যথা অনুভব করিতে লাগিল।

ট্রাম হইতে নামিতেই মোড়ের মাথায় শ্যামলালের সহিত দেখা হইল। শ্যামলাল কহিল—"দাদার যে আর দেখা পাবারই যো নেই! ক্রমেই দেখছি তুমি ডুমুরের ফুল হ'য়ে দাঁড়ালে।"

তিনকড়ি কহিল—"মরবার সময় নেই ভাই, তা তোমাদের ওদিকে যাব কি করে বল। অনেক কাল তোমাদের বাসায় যাওয়া হয় নি বটে, সব ভাল আছে ত ?"

"ভাগ্যিস্ দেখা হ'ল, তাই জিজ্ঞাসা করলেন। তাই ত দিদিকে বলছিলুম যে, এই কাছে বাসা এক দিন—

"তুমি কি আমাদের বাসায় গিয়েছিলে না কি ?"

"সেখান থেকেই ত আসছি। দিদি বললেন—একলার সংসার, কাযের ঝঞ্ঝাট, কি করে যাই বল। তোমার দাদা ত প্রায়ই যান।' আমি বল্লুম—'হাঁ, দাদা ত প্রায় রোজই যাচ্ছেন।"

তিনকড়ির অন্তরটা কাঁপিয়া উঠিল। উঃ! ভগবান! তুমি যাকে মার, কোন্ দিকে কি করে যে মার, মানুষের তা বুঝে ওঠা শক্ত। শ্যামলাল কহিল—"দাদা, চুপ করে রইলেন যে ?"

"তা তোমার দিদি কি বল্লেন শুনে ?"

"কিছু বল্লেন না, রান্না-ঘরের দিকে চলে গেলেন। দিদির মুখটা বিষম ভার-ভার দেখলুম; ঝগড়া-ঝাটি করেছেন না কি ?"

আরও দু'একটা কথাবার্ত্তার পর উভয়ে উভয়ের বাসার অভিমুখে চলিয়া গেল।

তিনকড়ি বাসার কাছ-বরাবর আসিয়া দূর হইতে দেখিল, তাহার কাবুলী মহাজন হায়দার খাঁ তাহার দীর্ঘ লাঠিগাছটার উপর ভর দিয়া তাহার বাসার সম্মুখে রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া আছে। আজ রবিবার, ও-মাসের দরুণ সুদের দুইটা টাকা আজ তাহাকে বিনা ওজরে দিবার কথা। কয়দিন নানা অজুহাতে তাহাকে বিদায় করিয়াছে, আজ আর কোন ওজর-আপত্তি চলিবে না। তাহার দীর্ঘ লাঠিগাছটিকে হয় ত টলানো সম্ভব, কিন্তু তদপেক্ষা দীর্ঘ হায়দার খাঁর দেহ, সুদের টাকা না পাইলে আজ এক পাও যে টলিবে না, তাহা তিনকড়ি বুঝিল। কিছু ভাবিবারও সময় নাই, যুক্তি খাটাইবারও অবকাশ নাই। কাছে আসিতেই হায়দার বজ্রকঠিন স্বরে কহিল—"বাব্বু, দো গণ্টা খাড়া হায়, রোপেয়া ল্যাও।"

তিনকড়ি ঢোঁক গিলিয়া কহিল—"তোমরা ওখানেই ত গিছলুম। আউর চার রোপেয়া আজ হামকো দিতেই হবে, বহুৎ জরুর দরকার হ্যায়। উস্ সে—তোমরা সুদকো দো রোপেয়া কাট লেকে, বাকী দো রোপেয়া হামকো দে দেও। সমঝা ?"

হায়দারের মুখে একটু প্রফুল্লভাব ফুটিয়া উঠিল। কর্জ্জের খাতাখানা তাহার কাছেই ছিল। পাশের গলির মধ্যে গিয়া, খাতায় লিখাইয়া লইয়া, হায়দার তিনকড়ির হাতে দুইটা টাকা দিয়া বলিল—"এ মাহিনাসে ডাই রোপেয়া সুদ চলে গা।" তিনকড়ি টাকা দুইটা পকেটে রাখিয়া মনে মনে ভাবিল, এখনকার বিপদ ত এড়াই, তারপর 'ডাই'এর ভাবনা পরে ভাবা যাবে। হায়দার আর একবার শুনাইয়া দিল—'ষোলো খা, আবি বিশ হুয়া; সমঝা ?"

বাসায় ঢুকিয়া তিনকড়ি দেখিল, নন্দরাণীর মুখখানা কালো হাঁড়ি হইয়াছে। বুঝিল, শ্যামলালই ঘটাইয়া গিয়াছে। এই রকমই হয়। দুঃসময়ে আঁধার যখন মানুষকে ঘিরিয়া ফেলে, তখন বিনা মেঘেই তাহার মাথার ওপর বজ্রাঘাত পড়ে! তবে সুবিধার মধ্যে এইটুকু যে, নন্দরাণীর খুব বেশী রাগ হইলে সে একেবারেই বাক্যালাপ বন্ধ করিয়া দিয়া নিজের মনে গুম্ হইয়া থাকে। মাঝারী-গোছের রাগ হইলেই সে ঝগড়া লাগাইয়া দেয়। আজ নন্দরাণীর রাগ চরমে উঠিয়াছে, সুতরাং তিনকড়ি দেখিল, ঝগড়া-ঝাটির কোন ভয় নাই। সে নীরবে স্নানাহার সারিয়া লইল। তাহার পর কাবুলীর টাকা দুইটি হইতে একটি টাকা হাতে লইয়া বাহির হইয়া পড়িল।

কাল হইতে স্কুলের পরীক্ষা সুরু হইবে। তাহার ক্লাসের ছেলেরা যাহাতে বেশী সংখ্যায় ফেল্ না করে, সে সম্বন্ধে একটু তদ্বিরের আবশ্যক। তদ্বির মানে—শশাঙ্কবাবু, যিনি ক্লাস থ্রী, ফোর, ফাইভের বাংলা পরীক্ষা লইবেন, তাঁহাকে একটু খুসী করা। শুধু মুখের কথায় খুসী করিতে যাওয়ায় বিশেষ ফল হয় না। তাই অনেক ভাবিয়া, যাহা করিতে হইবে, তাহা পূর্ব্ব হইতেই তিনকড়ি স্থির করিয়া রাখিয়াছিল। যে-কোন উপায়ে স্কুলের কাযটা তাহাকে বজায় রাখিতেই হইবে। স্কুলের কায গেলে, এই প্রবল স্রোতে তাহার নৌকা বানচাল হইয়া যাইবে।

তিনকড়ি বরাবর বাজারে গেল। দশ আনায় এক কুড়ি হাঁসের ডিম আর পাঁচ আনায় সওয়া সের পাটালি গুড় কিনিয়া সে শশাঙ্কবাবুর বাসায় গিয়া হাজির হইল।

হঠাৎ তিনকড়িকে এই অবস্থায় দেখিয়া শশাঙ্কবাবু কহিলেন, "ব্যাপার কি, তিনকড়ি বাবু ?"

মেজের একধারে ডিম আর গুড় রাখিয়া তিনকড়ি কহিল,—"ব্যাপার বিশেষ কিছুই নয়; এক বন্ধু দেশ থেকে এনেছেন। আমার স্ত্রীর অম্বলের মাদুলী হাতে, হেঁসেলে

ডিম ঢোকাবার উপায় নেই। তাই কতক দিলুম ভায়রা-ভাইয়ের বাড়ী পাঠিয়ে, আর কতক নিয়ে এলুম আপনার জন্যে। জানি, আপনি ডিমটা খুবই ভালবাসেন। এই ব্যাপার। আর শুধু ডিম দিতে নেই, তাই ওই যৎসামান্য একটু পাটালি গুড়। ওদের দেশের গুড় ভারি চমৎকার, টেস্ট্ করে দেখবেন একটু।”

অতঃপর অন্য কথা চলিল। আসল কথা পাড়িবার ধার দিয়াও তিনকড়ি গেল না। মুখ্য কথাটাকে গৌণের মধ্যে আনিয়া ফেলিবে, এই তাহার মৎলব। শেষকালে শশাঙ্ক বাবুই কথায় কথায় কহিলেন—“কাল থেকে ত স্কুলের পরীক্ষা সুরু হবে।”

তিনকড়ি কহিল,—“হ্যাঁ, পারা যায় না দাদা আর। স্ত্রীর অসুখের জন্যে মাথা খারাপ হ'য়ে যাবার যোগাড় হয়েছে।” বলিয়া তিনকড়ি যাইবার উদ্দেশ্যে উঠিয়া দাঁড়াইল; বলিল—“আমার ক'টা ক্লাসের বাংলা আপনার ওপরেই পড়েছে বোধ হচ্ছে। দেখবেন একটু দাদা, ছেলে-গুলো বেশী যেন ফেল না করে। সেক্রেটারী আমার ওপর যে রকম সদয়—একটু খুঁত্ পেলে আর রক্ষে নেই।” খুব সাধারণ ভাবেই তিনকড়ি কথা কয়টা বলিয়া চলিয়া আসিল।

স্কুলের আসন্ন বিপদে এখন কিন্তু সে অনেকখানি ভরসা পাইল। মনে মনে ভাবিল, ইহাতেই অনেকটা কায হইবে। এই পনর আনা পয়সাতেই তাহার পনর আনা রকম ফাঁড়া এ ক্ষেত্রে কাটিয়া যাইবে।

কিন্তু মানুষের যখন ভাগ্য খারাপ হয়, তখন মুঠোর কড়িও উড়িয়া যায়। পরদিন স্কুলের পরীক্ষা আরম্ভ হইলে দেখা গেল—এক অসাধারণ ব্যাপার। শশাঙ্ক বাবুর পরিবর্ত্তে সেক্রেটারী নিজেই ছেলেদের পরীক্ষা গ্রহণ করিতেছে। ব্যাপার দেখিয়া তিনকড়ি একেবারে থ হইয়া গেল। সংবাদ লইয়া জানিল, তাহার তিন ক্লাসের বাংলার পরীক্ষা এবার সেক্রেটারীই লইবেন। প্রথমটা তিনকড়ি একেবারেই দমিয়া গেল। তাহার পর তাহার মনে খুব ক্রোধের উদয় হইল। সে একেবারে মরিয়া হইয়া উঠিল এবং স্থির করিল, যে-সব ক্লাসের পরীক্ষার ভার তাহার উপর আছে, সেই-সব ক্লাসের ছেলেদের সে একধার হইতে ফেল করিবে।

স্কুলের পরীক্ষা শেষ হইয়া গিয়াছে। কয়দিন যাবৎ নির্ব্বাক থাকিয়া নন্দরাণীও তিনকড়ির সঙ্গে কথা কহিতে সুরু করিয়াছে। তবে সে কথা প্রায়ই এইরূপ ধরণের হয়:—

“এতই যদি ছুটকীর ওপর ভালবাসা; ত তাকেই বিয়ে ক'র্লে পার্তে।”

“কোন ভালবাসাই তার ওপর নেই। তাদের ওখানে কালে-ভদ্রে আমি যাই।”

“জলজ্যান্ত সে দিন শ্যাম এসে বলে গেল যে, তিনি প্রায়ই আমাদের ওখানে যান।”

“সংসারের অভাবের জ্বালায় আমি মরে যাচ্ছি, প্রেমের খেলা খেলবার মত মনও নেই, সময়ও নেই। তুমি বোঝ না নন্দ, না বুঝে শুধু মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা মার।—ভাল কথা, তোমার হাতের ভাঙ্গা রুলী-গাছটা আমায় দিতে হবে; পয়সা-কড়ি হ'লে একেবারে নতুন করে ড'গাছা গড়িয়ে দোবো।”

“ছুটকীকে কিছু গড়িয়ে দেবে বুঝি? কি গড়াবে?”

সঙ্গে-সঙ্গেই নন্দরাণীর মুখে অন্ধকার নামিয়া আসিল। তিনকড়ি মনে মনে ভাবিল,—সন্ন্যাসীই হব? তা হ'লে অভাবের জ্বালা থেকে নিষ্কৃতি পাই। কিন্তু সেটা দুর্ব্বলতা, সুতরাং মহাপাপ। তার ফল আবার পরজন্মে ভোগ ক'র্তে হবে। নাঃ—বীরের মত দুঃখ-যন্ত্রণা সহ্যই করে যাব, কণ্টককেই কণ্ঠের হার ক'র্ব। ভগবান ত অমর করে রেখে কষ্ট দিতে পারবে না। এক দিন তাঁকে মৃত্যু দিতেই হবে। পূর্ব্বজন্মে অনেক অন্যায় কায করে এজন্মে যদ্দূর ঠ'ক্বার ঠকছি, সুতরাং এজন্মে আর কোন এমন অন্যায় ক'র্ব না, যাতে পরজন্মে ঠক্তে হয়।

তারপর সে নন্দরাণীকে বুঝাইল, রুলীগাছটা বিক্রয় না করিলে আর উপায় নাই। আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশী; তার উপর আজকালকার লোকের কাছ হইতে যেটা পাওনা, প্রায়ই সেটাতে ফাঁকি পড়িতে হয়। চব্বিশ ঘণ্টা চরকীর মত ঘুরিয়া প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়াও দুটি ডালভাতের যোগাড় হইতেছে না।

তিনকড়ির এই সব কথার নিগূঢ় অর্থ হয় ত নন্দরাণী বুঝিল, নয় ত বা কিছুই বুঝিল না, নীরবে শুধুই শুনিয়া গেল।

পরীক্ষা শেষ হইয়া গিয়াছে; সুতরাং স্কুলে বিশেষ কোন

কায কাহারই ছিল না। বেলা আড়াইটার সময় স্কুল হইতে বাহির হইয়া তিনকড়ি একটা পার্কের মধ্যে প্রবেশ করিল। গাছতলার একখানা বেঞ্চে বসিয়া এক জন যুবক একান্ত মনে কিসের একখানা ছক পূরণ করিতেছিল। পাশে গিয়া বসিয়া তিনকড়ি জিজ্ঞাসা করিল—"কিসের ছক ওটা?"

"শব্দ-শৃঙ্খলের।"—বলিয়া যুবকটি ভাঁজ করিয়া পকেটের ভিতর তাহা গোপন করিল।

তিনকড়ি জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা, ওতে কিছু পাওয়া-টাওয়া যায়?"

"সমাধান ঠিক দিতে পারলেই পাওয়া যায়।"

"আপনি পেয়েছেন একবারও?"

"আমি এই প্রথম দিচ্ছি। তবে অনেকেই পেয়েছে এবং পাচ্ছে। সম্ভবতঃ এবার আমিও পাব, কারণ আমি যা দিচ্ছি, কোন ভুল নেই বলেই ত মনে হয়।"

"ভুল না হ'লে কত টাকা পাবেন?"

"নির্ভুলে হাজার। একটা ভুল হলে সাড়ে সাতশো, দুটো হ'লে পাঁচশো, তিনটে হ'লে আড়াইশো।" বলিতে বলিতে যুবকটি উঠিয়া গেল এবং অদূরের আর একটি খালি বেঞ্চে গিয়া বসিয়া পকেট হইতে তাহার ছকটি বাহির করিয়া পূরণ করিতে লাগিল।

তিনকড়ি একটা নূতন পথ পাইল। হাজার টাকা! দশশো! হাজারের তাহার দরকার নাই। পাঁচশো হইলেই সে এখন...............। একটা নূতন আশা উৎসাহের ধাক্কা তাহার জীর্ণ হৃদয়কে নাচাইয়া তুলিল। সে পার্ক হইতে বাহির হইয়া পড়িল। মোড়ে একটা হকার বসে। দুপুরবেলা সে বসে নাই; পাঁচটায় আসিবে। তিনকড়ির আর দেরী সহ্য হইতেছিল না। সে বরাবর হাঁটিয়া হ্যারিসন রোডের মোড়ে আসিল এবং এক আনা দিয়া একখানা 'মালা-গাঁথা' কিনিল।

পথে আসিতে আসিতে মোটামুটি দেখিয়া লইল, বিশেষ কিছু শক্ত ব্যাপার নয়। মালীর একটু সাধারণ জ্ঞান থাকিলেই মালা-গাঁথা সহজেই হইয়া যাইতে পারে। ভগবান কোন্ ফাঁকে যে কাহাকে দয়া করেন! তিনকড়ি আজ নতুন উৎসাহের জোরে দ্রুতবেগে হন্ হন্ করিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিল।

* * * *

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। তিনকড়ির হুঁস নাই। সে শব্দ-শৃঙ্খলের ভিতর একেবারে ডুবিয়া গিয়াছে। সমাধান বাহির করিতে একেবারেই সে তন্ময়।

সর *। (লজ্জা)—এ ত নিশ্চয়ই '**সরম**'

* **ত**। ('—' কে ছেলেরা ভয় করে)—কি হবে? কা'কে ছেলেরা ভয় করে? হয়েছে, হয়েছে! 'ভূত'—'ভূত'!—কিন্তু 'বেত'ও ত হ'তে পারে; বেতের ভয়ও ছেলেদের খুব। আচ্ছা, পরে ভাবা যাবে।

ল * **স**। (ও'টালেই সোজা)—এ এ-দিকেও সোজা। মাঝখানে 'র' বসে 'লরস'; ও'টালেই 'সরল'—অর্থাৎ সোজা।

ম *। (এই শব্দশৃঙ্খল প্রতিযোগিতা যাঁরা মাসে মাসে বার কচ্ছেন, তাঁদের উদ্দেশ্য খুব 'এই')—এটা কি হবে? তাঁদের উদ্দেশ্য—তাঁদের উদ্দেশ্য—তাঁদের উদ্দেশ্য—'মহৎ' না 'মন্দ'?—কোন্‌টা বসবে? নিজেদের কেউ কি মন্দ বলে? সুতরাং 'মন্দ' হ'বে না, 'মহৎ'ই হবে।

* **মা**। (যে গৃহে 'এ' না থাকে, সে গৃহ গৃহই নয়।)—এটা ত—এটা ত—এটা ত—'রমা'-ই হয়। অর্থাৎ লক্ষ্মী। যে গৃহে লক্ষ্মী না থাকে, সে গৃহ-ই নয়। 'রমা'-ই হবে। কিন্তু—কিন্তু—

তিনকড়ির মনে কথাটা ঠিক লাগিতেছে না। সন্ধ্যা উতরাইয়া গেল। ঘরে আলো জ্বলিল। পাড়ার ঘরে ঘরে শাঁক বাজিয়া উঠিল। তিনকড়ির মন শব্দ-সমাধানের অতল তলে নিমগ্ন। 'বীমা' হবে কি? জীবন বীমা? আজকাল ইনসিওরেন্সের প্রবল বন্যা। যে গৃহে কাহারো 'বীমা'—অর্থাৎ ইনসিওরেন্স করা না থাকে, সে গৃহ গৃহ-ই নয়। লক্ষ্মী বা তার পূজা-আচ্ছার বরঞ্চ কেউ আর ধার ধারে না। 'বীমা'ই হবে।

তত্রাচ মনটা সন্তুষ্ট হইল না। তিনকড়ি গভীর ভাবে চিন্তায় ডুবিয়া গেল। নন্দরাণী যখন খাইবার জন্য ডাকিল, তখন রাত দশটা। ছেলেরা খাইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তিনকড়ি তাড়াতাড়ি দুটি খাইয়া লইয়া শুইয়া পড়িল। শুইয়া ভাবিতে লাগিল, 'রমা' হবে, না 'বীমা' হ'বে। ভাবনার আর বিরাম নাই। হঠাৎ তাহার মাথায় আসিল,

'বামা'। বামা অর্থাৎ স্ত্রীলোক না থাকিলে গৃহ—গৃহই নহে। 'রমা'ও যে হ'তে না পারে তা'ও নয়। তাই ত! কোন্‌টা ঠিক লাগসই? রমা, না বামা?—ভাবিতে ভাবিতে তিনকড়ি ঘুমাইয়া পড়িল।

* * * *

গভীর রাত্রি। চারিদিক নিস্তব্ধ। সকলেই ঘুমাইতেছে। শুধু কুলুঙ্গীর ভিতর ছোট্ট টাইম্‌পীস ঘড়িটা টিক্ টিক্ শব্দ করিয়া স্তব্ধ অন্ধকারকে কতকটা সজাগ করিয়া রাখিয়াছে।

হঠাৎ তিনকড়ির চীৎকারে নন্দরাণীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল—'বামা, বামা, ঠিকই হবে।'

শ্যামলালের স্ত্রী ছুটকীর ভাল নাম বামাসুন্দরী। নন্দরাণী উঠিয়া বসিল। তিনকড়ি ঘুমন্ত অবস্থায় আবার বলিয়া উঠিল—"বামা—বামা!—যা'বার জো কি! ধরে ফেলেছি!"

রাগে, দুঃখে, জ্বালায়, নন্দরাণীর মাথাটা রি-রি করিয়া উঠিল। সে আর সহ্য করিতে পারিল না। বড় ঘটির এক ঘটি জল আনিয়া তিনকড়ির মাথায়, মুখে, কাণে ঢালিয়া দিল। ধড়্ মড়্ করিয়া তিনকড়ি উঠিয়া পড়িয়া কহিল—"এ কি করছ?"

"জল দিচ্ছি, ঠাণ্ডা হও। রাতটা কাটুক, ছুটকীকে আনতে পাঠাব এখন।" নন্দরাণী বোধ হয় আর এক ঘটি জল আনিতে উঠিয়া গেল।

তিনকড়ি ব্যাপার কিছুই বুঝিতে পারিল না। উঠিয়া, মাথা-মুখ মুছিয়া, ঘরের মেজের একধারে মাদুর পাতিয়া শুইয়া পড়িল।

সকাল বেলা স্ত্রীর নিকট হইতে অশেষ প্রকার লাঞ্ছনা, গঞ্জনা এবং উপহাস নীরবে সহ্য করিয়া তিনকড়ি অনাহারে স্কুলে আসিয়া পদার্পণ করিতেই, হেডমাষ্টার তাহার হাতে খামে-আঁটা একখানা পত্র দিলেন। তিনকড়ি জিজ্ঞাসা করিল—"চিঠি কিসের?"

"পড়ে দেখুন।"

তিনকড়ি পড়িতে লাগিল। তাহার মুখ রক্তশূন্য হইয়া উঠিল। সারা দেহ ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল। সে আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না। পাশের দেয়াল ধরিয়া একখানা চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িল।—চিঠিখানা তাহার বরখাস্তের নোটীশ।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে সেক্রেটারী তথায় আসিয়া কহিলেন—"মাইনের দিন এসে আপনার মাইনেটা নিয়ে যাবেন। কমিটীর কারো ইচ্ছে নয় আপনাকে রাখা। আপনার তিন ক্লাসের বাংলা পরীক্ষার ফলে দেখা গেল, প্রায় সবই ফেল। সুতরাং কিছুই যে পড়ানো হয় না, তা বেশ বোঝা গেল। তার পর, আপনি যে-সব ক্লাসের পরীক্ষা নিয়েছিলেন, তারাও অধিকাংশ ফেল্। অথচ তারা ভাল ছেলে, ফেল হবা মোটেই তাদের কথা নয়। এতে বোঝা যাচ্ছে, পরীক্ষা নেওয়াটা, সেটাও মনোযোগের সহিত নেন্ নি। যা-তা করে বেগার-ঠেলা গোছের কায সেরেছেন। সুতরাং আপনাকে আর কি করে......"

তিনকড়ির আর বেশী কিছু শুনিবার দরকার ছিল না,—শুনিবার মত অবস্থাও ছিল না। সে তখনি স্কুল হইতে বাহির হইয়া পড়িল। মনে করিল, শশাঙ্কবাবুর বাড়ী যাই। কিন্তু তাহার মত শশাঙ্কবাবুর যে চাকুরী যায় নাই, পরক্ষণেই এ খেয়ালটা তাহার হইল। চাকুরী শুধু তাহারই গিয়াছে। সে তখন পার্কে গিয়া সেই বেঞ্চিখানার উপর সটান শুইয়া পড়িল। স্কুলের একটা মস্ত চাপ তাহার মাথা হইতে সরিয়া গিয়াছে। আজ সে কতটা হাল্কা! কতটা স্বাধীন! ঐ আকাশ, এই বাতাস, এই আলো, ঐ সব গাছ-পালা, কাক-পাখী, লোক-জন—ইহারা তাহার কাছ হইতে কত দূরে সরিয়া গিয়াছিল; আজ যেন তাহারা সব আবার তাহার কাছে ফিরিয়া আসিল। আজ তাহার সম্মুখে—বন্ধনহীন অবাধ স্বাধীনতা। কিন্তু পিছনে চাহিতেই তাহার এই স্বাধীনতার সমস্ত সুখ নিমেষে মিলাইয়া গেল। সেখানে একটা দুঃখের নিষ্ঠুর সংসার তাহার অন্তরের আষ্টে-পৃষ্ঠে কঠিন বাঁধনে বাঁধিয়া, বন্ধন-রজ্জুর একটা প্রান্ত ধরিয়া বসিয়া আছে। চাকরী থাকা সত্ত্বেও যে সংসার চলিত না, এখন কি করিয়া যে......। আর সে ভাবিতে পারে না। সে মরিয়া হইয়া উঠিল। যাহা হইবার হইবে, আর সে দুর্ভাবনা করিবে না। শেষ পর্য্যন্ত কি হয়, হউক। দুর্ভাবনাকে সে আর কিছুতেই আমল দিবে না; ভুলিবে।—কেমন হ'লদে রংয়ের পাখীটা ও-গাছটার ঐ ডালে এসে বসলো! ওটা কি গাছ? কাক দুটো ঝগড়া বাধিয়েছে। খুব চালাক ওরা। কিন্তু কোকিল আবার ওদেরও ঠকায়। সুতরাং কাক ঠিক চালাক নয়, শয়তান। যেমন আমাদের সেক্রেটারী। নইলে গরীবের

কাষটা এমনি করে……। আবার ঐ সব ভাবছি? তিনকড়ি উঠিয়া বসিল। কি বিক্রী করছ হাঁ? চিনের বাদাম? এই দুপুর বেলা? না বাবা, পয়সা নেই; যাও।'—আচ্ছা, পার্কের এই সব নারকোল গাছের ডাবগুলো খায় কারা? নিশ্চয়ই মালীগুলো। মনুমেণ্টটা কি উঁচু! এক দিন গিয়ে দেখে আসতে হবে, অনেক দিন দেখা হয় নি।——আবার তিনকড়ি শুইয়া পড়িল।

সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সেই বেঞ্চের উপর তিনকড়ি শুইয়া রহিল। কত লোক আসিয়াছে, গিয়াছে—সে ফিরিয়া দেখে নাই বা বেঞ্চ ছাড়িয়া উঠে নাই। লোকে তাহাকে অসুস্থ মনে ভাবিয়া অন্য বেঞ্চে গিয়া বসিয়াছে। সন্ধ্যা হইয়া গেলে সে ধীরে ধীরে উঠিয়া পার্কের বাহিরে রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল।

সে দিন বারাকপুরে রেস্ ছিল। পথে অসংখ্য ফিরতি ট্যাক্সি-মোটর ছুটিয়া আসিতেছিল। তিনকড়ি ভাবিল, এক দিন পাঁচ-সাতটা টাকা নিয়ে গিয়ে রেস্ খেলতে হবে। টাকা পাওয়া যায় কোথা? সেক্রেটারী……দূর হোক! চুলোয় যাক! 'বামা'ই হবে। 'রমা' কিছুতেই হতে পারে না। সব ঘরেই যে লক্ষ্মী থাকবে, তা ত আর হতে পারে না। বামা সব গৃহে থাকার কথা। সুতরাং 'বামা'ই—

'আরে—আরে!—এই—এই—এই!! ভোঁক্! ভোঁক্!—ছ্-র্-র্-র্—ঘ্যাঁচ্!'

যাঃ! লোকটা গেল বুঝি! একেবারে মোটরের তলায় পিষে গেছে।

দেখিতে দেখিতে লোকে লোকারণ্য হইল।

এক জন বলিল—'একেবারে হয়ে গেছে!"

আর এক জন বলিল—"না, না—শ্বাস বইছে।"

"লোকটা বিদেশী বোধ হয়।"

"ঐ নোটবুকটা বোধ হয় ওরিই পকেট থেকে ছিটকে পড়েছে। খুলে দেখুন না মশাই, নাম-টাম যদি কিছু লেখা থাকে।"

"হ্যাঁ, এই যে রয়েছে—শ্রীতিনকড়ি চক্র——"

* * * * *

উহার পর তিন দিন কাটিয়া গিয়াছে। কিসের পর? তিনকড়ির মৃত্যুর? না। তিনকড়ির ত মৃত্যু হয় নাই। সে দিন সেই জনতার এক জন যে বলিয়াছিল, 'না না—শ্বাস বইছে' সে ঠিকই বলিয়াছিল। তিনকড়ি মরে নাই। না-মরাটা আশ্চর্য্যের নয়। তবে এ ব্যাপারটায় আশ্চর্য্যের এইটুকু যে, মোটরের মালিক অতগুলি লোকের মধ্য হইতে আহত তিনকড়িকে পুলিস আসিয়া পড়িবার পূর্ব্বেই কি অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় তাঁহার গাড়ীতে তুলিয়া লইয়া গাড়ী ছুটাইয়া দিয়াছিলেন। এমন কি, গাড়ীর নম্বরটা টুকিয়া লইতেও কাহারো খেয়াল বা সময় হয় নাই।

মোটরের মালিক এক জন বিশেষ ধনশালী লোক। তিনি তিনকড়িকে সে দিন বরাবর তাঁহার বালিগঞ্জের বাটীতে আনিয়া, সঙ্গে সঙ্গেই সহরের দুই জন নাম-করা ডাক্তার ডাকাইয়া চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। রাত দশটার পর তিনকড়ির জ্ঞান হয়। তখন তাহার কাছ হইতে বাসার ঠিকানা জানিয়া লইয়া সুধীরবাবু স-স্ত্রীক তথায় যান এবং নন্দরাণীকে তাহার বাটীতে আনয়ন করেন।

তাহার পর সাত দিন কাটিয়া গিয়াছে। তিনকড়ি অনেকটা সুস্থ হইয়াছে। ঘরের ভিতরেই একটু-আধটু চলা-ফেরা করিয়া বেড়াইতে পারে। কোথায়, কোন অঙ্গে, কোন্ হাড়ে আঘাত লাগিয়াছিল, সে সব আলোচনার দরকার নাই। আসল কথা—'মারে হরি ত রাখে কে; রাখে হরি ত মারে কে?' তবে তাহার একটা পায়ে আঘাতটা একটু বেশী লাগিয়াছিল। সে জন্য তাহাকে অল্প খোঁড়াইয়া চলা-ফেরা করিতে হয়। তবে ডাক্তাররা বলিতেছে, দু'এক মাস পরে এটুকু দোষ তাহার সারিয়া যাইবে। অপরাহ্ণ বেলায় তিনকড়ির ঘরে বসিয়া সুধীরবাবু প্রভৃতি এই সব আলোচনাই করিতেছিলেন।

সুধীরবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া তিনকড়ি কহিল—"সকল দুঃখ-কষ্ট, জ্বালা-যন্ত্রণার হাত এড়াতে বসেছিলুম। আমাকে বাঁচিয়ে, আবার সেই পথে টেনে এনে, কি ক্ষতি যে আমার করলেন, সুধীরবাবু!"

সহাস্য বদনে সুধীরবাবু বলিলেন—"কিন্তু 'বামা' কিছুতেই হ'ত না, কতকগুলো পয়সা আপনার বৃথাই যেত। তা থেকে কিন্তু বাঁচিয়েছি।"

আরও দিনকতক কাটিয়া যাইবার পর তিনকড়ি বেশ সুস্থ হইয়া উঠিল। পায়ের দোষটাও অনেকটা কমিল।

সঙ্গে-সঙ্গেই তাহার মনে তাহার চিরকালের চিন্তাগুলি একটির পর একটি আসিয়া জমিতে লাগিল। বাড়ীভাড়া তিন মাসের জমলো। পেসন্ন মুদীর উহ্নোর দোকানে কত যে হ'য়ে আছে, তার হিসেব ত ভুলেই গেছি। কাবলী হায়দার খাঁ কত দিন হয় ত দরজায় লাঠি ঠুকে গেছে। স্কুলের আর কোন আশা-ভরসাই নেই। বাগবাজারের টুইসানটা---

সুধীরবাবু ঘরে ঢুকিয়া কহিলেন—"কি ভাবছেন? 'বামা' হবে কি 'রমা' হবে?"

ম্লান দীপ্তিশূন্য চোখে সুধীরবাবুর দিকে চাহিয়া তিনকড়ি কহিল—"ঐ ভাবনা ভাবতে ভাবতেই ত মরণ-পথ থেকে বাঁচন-পথে গিয়ে পড়েছিলুম; আপনিই এত সব ব্যাপার ক'রে আবার আমার চিরকালের সেই মরণ-পথে টেনে আনলেন।"

"টেনে আনলুম কি সাধে? আমার নিজের যে স্বার্থ রয়েছে। আমার এই কল্‌কাতার বাড়ীর কামকর্ম্ম দেখবার শোনবার জন্যে এক জন খোঁড়া লোকের দরকার। পা-ওলা লোক রেখে দেখেছি, বাগে পেলেই টাকা-কড়ি নিয়ে পিট্‌টান দেয়। খোঁড়া হলে আর সেটি হবে না। ছুটতে পারবে না, সুতরাং ধরে ফেল্‌বো।"

"তা, আমাকেই বাহাল করবেন না কি?"

"বাহাল আমি সেই দিন থেকেই করেছি। তবে মাইনে বেশী দিতে পারবো না। রোজ একটি করে টাকা, অর্থাৎ মাসে ত্রিশটি টাকা; আর ফ্রী ফ্যামিলি-কোয়ার্টার উইথ্ সকলের খাওয়া-দাওয়া। কেমন রাজী ত?"

আনন্দ ও কৃতজ্ঞতায় তিনকড়ির চোখে জল ভরিয়া আসিল।

সুধীরবাবু বলিয়া যাইতে লাগিলেন—"তবে 'য়্যাপয়েণ্টমেণ্ট-লেটার' আর দেবো না, তার বদলে কিছু 'য়্যাডভান্স' করবো। ধরুন দেখি।"

একতাড়া নোট তিনকড়ির হাতে দিয়া সুধীরবাবু কহিলেন—"পাঁচশো। এটা কিন্তু আমি দান কচ্ছি না। সে পাত্রই আমি নই। এর জন্যে ফি মাসে মাইনে থেকে আট আনা করে কেটে নেওয়া হবে। দেনাপত্তরগুলো এতে শোধ করে দিন।"

জল আর চোখে জমিয়া থাকিতে পারিল না। তিনকড়ির দু'চোখ বাহিয়া তাহা গড়াইয়া পড়িল।

সুধীরবাবু কহিলেন—"তবে, 'বামা' যে হবেই না, এমন কথা নয়। 'বামা' 'রমা'—ও দুই-ই হ'তে পারে।"

একধারে জড়-সড় হইয়া বসিয়া, ঘোমটার ভিতর হইতে নন্দরাণী টিপি-টিপি হাসিতেছিল। কিন্তু চোখে তাহারও জল।

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়।

সবুজ আলোর পথ

পুষ্প-সৌরভ বহন করিয়া বাতায়ন-পথে ছুটে... ... গৃহাভ্যন্তর আমোদিত করিতেছিল। অনিলা টেবলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া শৈলর জন্য হরলিক্ প্রস্তুত করিতেছিল। বৈকালে মাথা ধরিয়াছিল বলিয়া সে স্নান করিয়াছিল। আর্দ্র চুলের রাশ নিবিড় কালো হইয়া পিঠ ছাড়িয়া জানুর কাছে আসিয়া পড়িয়াছিল এবং তাহারই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতকগুলা বাতাসে উড়িয়া তাহার মুখে আসিয়া পড়িতেছিল। বাঁ হাতে সেগুলা সরাইতে সরাইতে বিরক্ত হইয়া এক সময়ে অনিলা—'আঃ!' শব্দ উচ্চারণ করিয়া ফেলিল।

শৈল তাহার মুখের পানে অনিমেষ দৃষ্টি পাতিয়া শুইয়াছিল। হাসিয়া ফেলিয়া কহিল—"চুলগুলো ভারি দুষ্ট, না, অনু?"

অনিলা চমকিয়া উঠিল। এতখানি রোগের মাঝে বিকারের ঘোরে প্রলাপ-বাণীতে শৈল অনেক কথাই

আত্মীয়-স্বজনহীন প্রবাসে নিঃসহায় রোগশয্যাটা মনে উদয় হইবামাত্র শৈল কাঁদিয়া ফেলিল।

সুকুমার তাহার কৃশ দুর্ব্বল হাতখানার উপর ভালবাসার একটা মৃদু চাপ দিয়া কহিল, "এ কি পাগলামি কচ্ছেন? কোন অভাবই হতো না। যে দেখছিল, যার চেয়ে বেশী কেউ পারত না, সেই দেখতো।"

আগ্রহভরে ক্ষীণকণ্ঠে শৈল কহিল, "সে কে? কে আমায় দেখেছিল?" মনে মনে সে যেন কি একটা স্মরণ করিতে চেষ্টা করিল।

হাসিয়া রহস্যভরে সুকুমার কহিল, "তিনি হচ্ছেন আপনার ভয়ানক সম্মানিতা—এই যে, ছাই, বাংলায় কি বলে,—জীবন, হ্যাঁ হ্যাঁ—জীবনসঙ্গিনী।"

"লেখা—লেখা? আছে এখানে?" নদীর কালো জলে যেন চাঁদের আলো পড়িল। শৈলর মুখ ক্ষণিকের জন্য প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। কহিল, "হ্যাঁ, আমার মনে পড়ছে,

[উপন্যাস]

৩৩

কঠিন পীড়ায় চিকিৎসার যতখানি প্রয়োজন, তাহার চেয়ে বেশী প্রয়োজন পীড়িতের শুশ্রূষা, পরিচর্য্যা। সেবার সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি পীড়িতকে মৃত্যুর দিকে টানিয়া লইবার সুবিধা পায়।

লুব্ধনেত্র মেলিয়া মৃত্যু যেমন শৈলর পাশে দাঁড়াইয়া সুবিধা ও অবসরকে খুঁজিতেছিল, ঠিক তাহারই মত অতন্দ্র নেত্র মেলিয়া ক্লান্তি-হীন দেহে অনিলা সেবার দু'বাহু মেলিয়া শৈলর পাশে বসিয়াছিল

একুশটা দিন কাটিয়া গেল। পাতলা মেঘের আড়ালে চাঁদের মৃদু দীপ্তির মত চিকিৎসকের মুখে যে একটা আশার আনন্দ দেখা দিয়াছে, অনিলার সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টির কাছে তাহা [illegible] কি [illegible]!

সে দিন [illegible]—'[illegible]চ্!'

যাঃ! লোকটা গেল বুঝি! একেবারে মোটরের তলায় পিষে গেছে।

দেখিতে দেখিতে লোকে লোকারণ্য হইল।

এক জন বলিল—'একেবারে হয়ে গেছে!"

আর এক জন বলিল—"না, না—শ্বাস বইছে।"

"লোকটা বিদেশী বোধ হয়।"

"ঐ নোটবুকটা বোধ হয় ওরিই পকেট থেকে ছিটকে পড়েছে। খুলে দেখুন না মশাই, নাম-টাম যদি কিছু লেখা থাকে।"

"হ্যাঁ, এই যে রয়েছে—শ্রীতিনকড়ি চক্র——"

* * * * *

উহার পর তিন দিন কাটিয়া গিয়াছে। কিসের পর? তিনকড়ির মৃত্যুর? না। তিনকড়ির ত মৃত্যু হয় নাই।

কঠিন পীড়া ভোগ করিয়া আরোগ্যের পর রোগীর প্রথম হাঁটার মত অনিলার মনে হইল, তাহার পা দু'টা যেন শিথিল, দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। কোনমতে সেই কম্পিত চরণ দুটা টানিয়া সে কক্ষের বাহিরে গেল।

সুকুমার অনিলার এই অস্বাভাবিক চলার দিকে চাহিয়াছিল। দুয়ারের পর্দ্দাটা টানিয়া দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গুরুভার বস্তুর পতনশব্দে সে কক্ষের বাহিরে ছুটিয়া আসিল এবং [illegible] মত যে সন্দেহটা মনে আসিয়াছিল, বাহিরে আ[illegible] হাই প্রত্যক্ষ করিল। অনিলার মূর্চ্ছিত দেহটা মাটীতে পড়িয়াছিল

বিরত বিপন্ন দৃষ্টি[illegible]তস্ততঃ সঞ্চালন করিয়া সুকুমার

রাখে হরি[illegible]ত মারে কে?' তবে তাহার একটা পায়ে আঘাতটা একটু বেশী লাগিয়াছিল। সে জন্য তাহাকে অল্প খোঁড়াইয়া চলা-ফেরা করিতে হয়। তবে ডাক্তাররা বলিতেছে, দু'এক মাস পরে এটুকু দোষ তাহার সারিয়া যাইবে। অপরাহ্ণ বেলায় তিনকড়ির ঘরে বসিয়া সুধীরবাবু প্রভৃতি এই সব আলোচনাই করিতেছিলেন।

সুধীরবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া তিনকড়ি কহিল—"সকল দুঃখ-কষ্ট, জ্বালা-যন্ত্রণার হাত এড়াতে বসেছিলুম। আমাকে বাঁচিয়ে, আবার সেই পথে টেনে এনে, কি ক্ষতি যে আমার করলেন, সুধীরবাবু!"

সহাস্য বদনে সুধীরবাবু বলিলেন—"কিন্তু 'বামা' কিছুতেই হ'ত না, কতকগুলো পয়সা আপনার বৃথাই যেত। তা থেকে কিন্তু বাঁচিয়েছি।"

আরও দিনকতক কাটিয়া যাইবার পর তিনকড়ি বেশ সুস্থ হইয়া উঠিল। পায়ের দোষটাও অনেকটা কমিল।

পানে চাহিয়া তাহার লুপ্ত সংজ্ঞাকে ফিরাইয়া আনিতে প্রয়াস পাইতে লাগিল।

মাথায় বরফ দিতে দিতে অনিলা চোখ মেলিল। নিকটেই সেবারত সুকুমারকে দেখিয়া ত্রস্তে সে উঠিয়া পড়িতে উদ্যত হইল। অনিলার সঙ্কুচিত মুখের পানে চাহিয়া সুকুমার উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল, "আপনি আর একটু এইখানে হাওয়াতে যদি শুয়ে থাকেন, তবে আমি মিষ্টার রায়ের কাছে থাকব। নয় ত আমাকে এইখানেই দাঁড়াতে হবে।"

অনিলা সম্মতি দিল। তাহার উদ্বিগ্ন শ্রান্ত দেহটা একান্ত নির্জীবের মত হইয়া পড়িয়াছিল, উঠিবার সামান্য একবিন্দু শক্তি ছিল না।

ঘুম ভাঙ্গিয়া শৈল চারিদিকে চাহিতেছিল, সুকুমার ডাবের জল ফিডিংকাপ লইয়া শৈলকে খাওয়াইয়া রুমালে তাহার মুখখানা মুছাইয়া দিল।

শৈল সুকুমারের হাতটা ধরিয়া কহিল, 'তুমি যদি না থাকতে—"

সুকুমার একটু হাসিয়া কহিল, "তাতে তে বিশেষ কোন ক্ষতি হতো না।"

কঠিন পীড়ার পর, চিত্ত শিশুর মত সরল, অকুণ্ঠিত হইয়া পড়ে। শৈল কহিল, "আমার কি হতো, কে দেখত?" আত্মীয়-স্বজনহীন প্রবাসে নিঃসহায় রোগশয্যাটা মনে উদয় হইবামাত্র শৈল কাঁদিয়া ফেলিল

সুকুমার তাহার কৃশ দুর্ব্বল হাতখানার উপর ভালবাসার একটা মৃদু চাপ দিয়া কহিল, "এ কি পাগলামি কচ্ছেন? কোন অভাবই হতো না। যে দেখছিল, যার চেয়ে বেশী কেউ পারত না, সেই দেখতো।"

আগ্রহভরে ক্ষীণকণ্ঠে শৈল কহিল, "সে কে? কে আমায় দেখেছিল?" মনে মনে সে যেন কি একটা স্মরণ করিতে চেষ্টা করিল।

হাসিয়া রহস্যভরে সুকুমার কহিল, "তিনি হচ্ছেন আপনার ভয়ানক সম্মানিতা—এই যে, ছাই, বাংলায় কি বলে,—জীবন, হ্যাঁ হ্যাঁ—জীবনসঙ্গিনী।"

"লেখা—লেখা? আছে এখানে?" নদীর কালো জলে যেন চাঁদের আলো পড়িল। শৈলর মুখ ক্ষণিকের জন্য প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। কহিল, "হ্যাঁ, আমার মনে পড়ছে, আমার জ্বরের প্রথম রাত্রে বড্ড মাথার যাতনা হচ্ছিল, সেই তো মাথা টিপে দিচ্ছিল।"

শৈল আরও কত কি বলিতে যাইতেছিল, বাধা দিয়া সুকুমার কহিল,"মিষ্টার রায়, কি বলছেন? আপনাকে মৃত্যুর মুখ হতে ফিরিয়ে কে আন্‌লে জানেন? মিস্ বোস্।"

"মিস্ বোস্? অনিলা? সে কি এসেছে?"

সুকুমার শৈলকে ঔষধ সেবন করাইয়া কহিল, "কেন আসেননি, ট্রেণে আসতে বিলম্ব হবে বলে এতটা পথ একা তিনি মোটরে এসেছেন। আর সেই যে আপনার পাশে বসেছিলেন, ডাঃ বলেট যখন আজ বললেন—আপনি ভাল আছেন, জান্‌তে পেরে অনেক অনুরোধে তবে উঠে গেলেন। মিষ্টার রায়, সেবা যে কি জিনিষ, মিস্ বোসকে দেখে আমি তা উপলব্ধি করেছি।"

প্রত্যাসন্ন মৃত্যুর মুখ হইতে যে নারী তাহাকে রক্ষা করিল, অন্তরের কৃতজ্ঞতা তাহাকে জানাইবার জন্য শৈলর সারা চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। ব্যগ্রকণ্ঠে কহিল, "অনিলা কই? ডাক না তাকে?"

সুকুমার উত্তর দিল, "তিনি এইমাত্র মাথা ঘুরে পড়ে গেছেন। আমি জোর করে তাঁকে একটু বিশ্রাম করতে দিয়ে এসেছি।"

৩৪

সবুজ আলোয় কক্ষ ভরিয়াছিল। সন্ধ্যার বাতাস সদ্য ফোটা পুষ্প-সৌরভ বহন করিয়া বাতায়ন-পথে ছুটিয়া আসিয়া গৃহাভ্যন্তর আমোদিত করিতেছিল। অনিলা টেবলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া শৈলর জন্য হরলিক্ প্রস্তুত করিতেছিল। বৈকালে মাথা ধরিয়াছিল বলিয়া সে স্নান করিয়াছিল। আর্দ্র চুলের রাশ নিবিড় কালো হইয়া পিঠ ছাড়িয়া জানুর কাছে আসিয়া পড়িয়াছিল এবং তাহারই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতকগুলা বাতাসে উড়িয়া তাহার মুখে আসিয়া পড়িতেছিল। বাঁ হাতে সেগুলা সরাইতে সরাইতে বিরক্ত হইয়া এক সময়ে অনিলা—'আঃ!' শব্দ উচ্চারণ করিয়া ফেলিল।

শৈল তাহার মুখের পানে অনিমেষ দৃষ্টি পাতিয়া শুইয়াছিল। হাসিয়া ফেলিয়া কহিল—"চুলগুলো ভারি দুষ্ট, না, অনু?"

অনিলা চমকিয়া উঠিল। এতখানি রোগের মাঝে বিকারের ঘোরে প্রলাপ-বাণীতে শৈল অনেক কথাই

বলিয়াছে। সুস্থ হইয়াও তাহার সহিত অনেক কথাই কহে, অনেক গল্প করে; কিন্তু এমন ছেলেমানুষী স্বর বা ভাষা না-পীড়িত, না-সুস্থ, কোন অবস্থাতেই তাহার মুখ দিয়া ফুটিয়া উঠে নাই। এদিকে সে যেন বেশী সচেতন।

মনের সব কথা মুখ দিয়া না প্রকাশ করিলেও তাহার ছায়া মুখে আসিয়া পড়ে। অনিলা হরলিক্ লইয়া শৈলর কাছে আসিতেই শৈল তাহার আনত নেত্র—ঈষৎ আরক্ত মুখের পানে চাহিয়া তেমনই কোমল কণ্ঠে কহিল, "তোমার রাগ হলো, অনু ?"

শৈল অনিলাকে অনিলা বলিয়াই সম্ভাষণ করিত, আজ অকস্মাৎ সেই নামটা দুটি অক্ষরের মাঝে পর্য্যবসিত করিয়া অনিলার কুমারী-বুকে যেন বার বার একটা দোলা দিতেছিল। নিজের নামটাই যেন নিজের কাণে সুধা-বৃষ্টি করিল।

স্নিগ্ধ-সকৌতুক হাস্যে শৈল অনিলার মুখের পানে চাহিয়াছিল। কাজেই অনিলার আর নীরব থাকা হইল না। এই একান্ত পরমুখাপেক্ষী দুর্ব্বল ব্যক্তিটির মুহূর্ত্তগুলা সেবা, যত্ন, রঙ্গ, কৌতুক, হাস্য-পরিহাস লইয়া বন্ধুর স্থান—নিকটতম আত্মীয়ের স্থান অধিকার করিয়া আছে, এই বিশ্বাস সে জন্মাইয়া দিয়াছিল। কিন্তু আজ অকস্মাৎ অনিলার চোখে ধরা পড়ি—স্নেহ, সৌহার্দ্দ্য দিয়া যে সখ্যতার বন্ধন সে স্থাপিত করিয়াছিল, শৈল যেন তাহা অতিক্রম করিয়া আরও কিছু দাবী করিতে উদ্যত হইয়া উঠিয়াছে। এই মুহূর্ত্তে বাধা না দিলে হয় ত—হয় ত—অনিলা আর চিন্তা না করিয়া ভিতরে ভিতরে চঞ্চল হইয়া উঠিল।

সে কহিল,—"কি সব ছেলে-মানুষী বকছেন? নিন, খেয়ে ফেলুন। তখন তো একবার ধরলেন খাব না।"

তৎক্ষণাৎ শৈল কহিল, "ইস, এখন বুঝি আর—"

কৃত্রিম রাগ দেখাইয়া অনিলা কহিল, "তবে আমায় দিয়ে করালেন কেন? বললেন তো খাব?"

শৈল কহিল,—"তখন কি তুমি রাগ করেছিলে?"

অনিলা কহিল, "আমি রাগ করেছি? কে আপনাকে বল্লে?"

দুর্ব্বল দেহ-মনে বাহানাগুলা যেমন অদ্ভুত হয়, জেদগুলাও তেমনই দৃঢ় হইয়া উঠে। অনিলা বিপদ গণিল। আত্মগোপন করিবার যে দৃঢ় গাম্ভীর্য্যের বর্ম্মটা সে পরিয়াছিল, নিজেকে নিরাপদ করিতে, অকস্মাৎ তাহা খসিয়া পড়িল। হাসিয়া ফেলিয়া সে কহিল, "নাঃ, আপনার জালায় আর পারব না!"

শৈলও হাসিয়া ফেলিল। কহিল, "তোমায় বড্ড জালা দেই, না, অনু? আচ্ছা বল, তোমার মুখ কেন লাল হলো? তুমি আমায় আর আপনি বলতে পারবে না? কেমন এই না!"

রাগত কণ্ঠে অনিলা কহিল, "আমি জানি না।"

শৈল খপ করিয়া অনিলার হাতটা চাপিয়া ধরিল। কহিল, "এইবার আমায় ছুঁয়ে বল দিকি, কেমন জান কি না?"

তাহার আয়ত নেত্র উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। জনকের সুবৃহৎ তৈলচিত্রের পানে চকিতে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া অনিলা মাথা অবনত করিল।

শৈল তাহাকে সস্নেহে নিজের দিকে ঈষৎ আকর্ষণ করিয়া কহিল, "বল, অনু, আর তোমার আপত্তি রইল না—এ বাড়ী, এ ঘর আমরা দুজনে সমান অধিকারে ভোগ করব?"

মৃদু কণ্ঠে অনিলা কহিল, "না, কোন আপত্তি রইল না। কিন্তু আমার ভয় করে, তুমি কি আমাকে নিয়ে সুখী—"

"সুখী!" শৈল একটুখানি হাসিল। অনিলার দৃষ্টিতে সে হাসি বড় মধুর হইয়া ফুটিয়া উঠিল।

শৈল কহিল, "অনু, তোমার কাছ হতে আমি যা পেয়েছি বা পাচ্ছি, তাতে তোমাকে অদেয় জগতে আমার কোন কিছুই কি থাকতে পারে?"

"কিন্তু কৃতজ্ঞতার বিনিময় ভালবাসা নয়।"

শৈল কহিল, "এ কথা আগে খাটত। কিন্তু এখন নয়। সে দিন তোমার বাবার জন্যেই তোমায় চেয়েছিলুম, আজ তোমার জন্যই তোমায় চাইছি। তোমার মূল্য আমার নিজের মূল্যের চেয়ে আমার কাছে অনেক বেশী বোধ হচ্ছে।"

পুলকের শিহরণে অনিলার সারা দেহ কাঁপিয়া উঠিল। কুরূপা সে। অঙ্গহীনা সে। তথাপি সে স্বামীর কাঙ্ক্ষিত পত্নী হইতে পারিবে।

শ্রীমতী পুষ্পলতা দেবী।

সমাপ্ত

বৈষ্ণবমত-বিবেক

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীরূপ গোস্বামীর শেষ জীবন

শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরূপ

শ্রীরূপ পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অলৌকিক কৃপাশক্তি প্রাপ্ত হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিয়া যে কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন, শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর জীবন-কথা আলোচনাপ্রসঙ্গে তাহার কিয়দংশ আলোচিত হইয়াছে। শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট শ্রীযুগল ভজনের রসতত্ত্ব সম্বন্ধে যে উপদেশাবলী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাগ্রন্থের মধ্যখণ্ডের উনবিংশ পরিচ্ছেদে অতি সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। জীবের পক্ষে মানবজন্মলাভই দুর্লভ, কারণ, জীব সাধারণতঃ চৌরাশী লক্ষ যোনিতে বিভক্ত; তাহার মধ্যে স্থাবর ও জঙ্গম, এই দুই প্রকার ভেদ আছে—বৃক্ষাদি স্থাবর জীবসংজ্ঞাবাচ্য। জঙ্গমের মধ্যে তির্য্যক্, জলচর ও স্থলচর এই ত্রিবিধ ভেদ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। স্থলচর জাতির মধ্যে যত জীব পরিদৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে মনুষ্যজাতি অতি অল্প। বিশ্ববাসী মনুষ্যের মধ্যে শাস্ত্রবশ্য ও শাস্ত্রের অবশ্য, এই দুই শ্রেণী বিদ্যমান। কোনও না কোন প্রকার শাস্ত্রের দ্বারা যাহারা নিয়ন্ত্রিত তাহাদের মধ্যে বৌদ্ধ, খৃষ্টান, যবনাদি প্রধান। সুতরাং অল্প সংখ্যক বিশ্ববাসী বেদ মানিয়া থাকেন। যাঁহারা বেদ মানেন, তাঁহাদের মধ্যে আবার অধিকাংশ মুখেই বেদ মানেন—প্রত্যুত বেদনিষিদ্ধ পাপকার্য্য করেন এবং ধর্ম্মাচরণে বিশ্বাস করেন না। যাঁহারা বেদসম্মত সদাচারে ও ধর্ম্মাধর্ম্মে বিশ্বাসী, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বেদোক্ত যজ্ঞাদিকর্ম্মে নিবিষ্ট। এইরূপ কোটি কর্ম্মনিষ্ঠ মধ্যে এক জন জ্ঞানী দেখা যায়। সুতরাং মনুষ্যের মধ্যে জ্ঞানী ব্যক্তি অতীব দুর্লভ, জ্ঞানী ব্যক্তি শাস্ত্রার্থদর্শী এবং ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠ। এইরূপ—

> "কোটি জ্ঞানিমধ্যে হয় এক জন মুক্ত।
> কোটি মুক্তমধ্যে দুর্লভ এক কৃষ্ণভক্ত॥"

এই কৃষ্ণভক্ত স্বভাবতঃই নিষ্কাম, অতএব তিনি শান্ত; এবং ভুক্তিমুক্তি-সিদ্ধিকামী—ইহারা সকলেই অশান্ত; কারণ, কামনা বিসর্জ্জন না করিতে পারিলে কামনা পূরণের জন্য ছুটাছুটি করিতে হয় তা' সে মুক্তিকামনাই হউক বা সিদ্ধি-কামনাই হউক। সুতরাং প্রকৃত নিষ্কাম কৃষ্ণভক্ত যে অত্যন্ত দুর্লভ, ইহা বলাই বাহুল্য। শ্রীভাগবতেও শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তির দুর্লভত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। যথা—

> মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণ-পরায়ণঃ।
> সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষপি মহামুনে!॥
>
> শ্রীভাগবত—৬।১৪।৫

অর্থাৎ কোটি কোটি মুক্ত ও সিদ্ধ-পুরুষের মধ্যে এক জন নারায়ণ-পরায়ণ ভক্ত অতীব দুর্লভ।

ভক্তির দুর্লভত্ব প্রচার করিয়া কি প্রকারে শুদ্ধা ভক্তির সঞ্চার হয়, শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহা বুঝাইয়া ভক্তির রসস্বরূপতা উপলব্ধির উপায় বিধান করিয়াছেন। শুদ্ধা ভক্তি ও তাহার ফল প্রেম ভক্তির অনির্ব্বচনীয় রস শ্রীরূপের হৃদয়ে প্রতিভাত হইয়া শ্রীরূপকে রসস্বরূপের অনুপম আস্বাদনে চরিতার্থ করিল। শ্রীচৈতন্যদেব সকল উপদেশের সার উপদেশ শ্রীরূপকে দিয়াছিলেন এবং দিয়া বলিয়াছিলেন :—

> ইহার বিস্তার মনে করিহ ভাবন॥
> ভাবিতে ভাবিতে কৃষ্ণ স্ফুরয়ে অন্তরে।
> কৃষ্ণকৃপায় অজ্ঞ পায় রস-সিন্ধুপারে॥

শ্রীরূপ অবশ হইয়া ইহারই আলোচনা করিতেন, ইহারই চিন্তা করিতেন—ইহাতেই নিবিষ্টচিত্ত হইয়া আত্ম-হারা ও বাহ্য-জ্ঞানহীন হইয়া পড়িতেন। শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণলীলার অনুভবে ও ভক্তি-শাস্ত্র ও রসশাস্ত্রের ধ্যানে তন্ময় হইয়া যাইতেন, আর অনু-ভবানন্দে বিভোর হইয়া অলৌকিক কবিত্ব-ধারায় পরিষিক্ত

ভক্তিশাস্ত্র (ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু) রসশাস্ত্র (উজ্জ্বল নীলমণি) ও লীলাশাস্ত্র (শ্রীবিদগ্ধমাধব, ও ললিতমাধব, দানকেলি কৌমুদী) ও সিদ্ধান্ত শাস্ত্র (শ্রীলঘুভাগবতামৃত) ও লীলা-স্তবাবলী রচনায় সমাহিত হইতেন। যখন যে বিষয়ে সন্দেহ হইত—যখন যে ব্যাপারের মীমাংসা জটিল বলিয়া বোধ হইত—অমনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, গুরু ও প্রিয়তম সাধনসঙ্গী শ্রীপাদ সনাতনের নিকট বুঝিয়া লইতেন। এইরূপে ভ্রাতৃযুগল ভাবাবিষ্ট হইয়া শ্রীচৈতন্যদেবের অনুপ্রেরণায় শ্রীব্রজমণ্ডলের উদ্ধারে—শ্রীবিগ্রহ প্রকাশে—ভক্তিশাস্ত্রের রহস্য উদ্ঘাটনে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

শ্রীরূপ মথুরামাহাত্ম্যে শ্রীগোবিন্দদেব বিগ্রহের কথা দেখিয়া কোথায় সেই শ্রীগোবিন্দ বিরাজমান, কিরূপে তাঁহাকে শ্রীবৃন্দাবনে লোকলোচনের গোচরীভূত করিবেন, এই চিন্তায় বিভোর হইয়াছিলেন। বজ্রের স্থাপিত শ্রীগোবিন্দ আর লুক্কায়িত থাকিতে পারিলেন না। শ্রীরূপের হৃদয়ের অনুপম আকর্ষণে তাঁহাকে পূর্ব্বের সেই মনোহরবেশে আবার জনসাধারণকে দর্শন দানে ধন্য করিতে হইল। এই ঘটনার কথা শ্রীরাধাকৃষ্ণ গোস্বামী বিরচিত সাধন-দীপিকা গ্রন্থে এইরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। শ্রীরূপ যখন গোবিন্দদর্শনমানসে তন্ময়চিত্তে যমুনাতীরে কেশীঘাটের সন্নিকটে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন তাঁহার হৃদয়াধিদেব শ্রীনন্দনন্দন একটি পরম সুন্দর কিশোরবয়স্ক ব্রজবাসীর রূপ ধারণ করিয়া আসিয়া বলিলেন—"যে স্থানে এখন গোমাটিলা আছে, উহার নিম্নে মৃত্তিকামধ্যে শ্রীগোবিন্দ-দেব বিরাজমান—প্রতিদিন ঐস্থানে একটি গাভী দুগ্ধ বর্ষণ করিয়া থকে—ইহা দেখিয়া স্থান নির্ণয় করিতে পারিবে।" যখন ধ্যানে শ্রীরূপ তন্ময়—তখন স্বপ্নজাগরণের মধ্যবর্ত্তী অবস্থায় গোপবালকের এই কথা শুনিয়া তিনি চমকিত হইয়া চারিদিকে চাহিয়াই দেখেন—সে ব্রজবালক অন্তর্হিত হইয়াছেন। তখন শ্রীরূপ ভাবাবেশে আত্মহারা হইয়া কোনওরূপে শ্রীপাদ সনাতনকে এই কথা নিবেদন করিলেন। শ্রীপাদ সনাতন শ্রীরূপকে প্রকৃতিস্থ করিয়া ব্রজবাসিগণকে আহ্বান করিয়া ঐস্থানের মাটি খুঁড়িয়া শ্রীগোবিন্দদেবকে প্রাপ্ত হইলেন।

তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপুরীধামে বিরাজ করিতেছিলেন। দুই ভ্রাতা শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট লোক পাঠাইয়া পত্রের দ্বারা এই সংবাদ জানাইলেন। মহাপ্রভু শ্রীপুরুষোত্তম ধাম হইতে তাঁহার প্রিয়তম পার্ষদ কাশীশ্বর গোস্বামীকে শ্রীবৃন্দাবনে পাঠাইলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্গ ছাড়িতে হইয়াছিল বলিয়া ছোট হরিদাস আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের নিত্যসঙ্গী কাশীশ্বর গোস্বামী কিছুতেই শ্রীচৈতন্যদেবকে ছাড়িয়া শ্রীবৃন্দাবনে আসিতে চাহেন না—অথচ শ্রীচৈতন্যদেব তখন স্বীয় প্রিয় পরিকর সকলকেই লীলাসম্বরণের পূর্ব্বে শ্রীবৃন্দাবনে পাঠাইতেছেন। শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়াছেন। কাশীশ্বরকেও পাঠাইতে হইবে—অতএব তিনি শ্রীগৌরগোবিন্দ নামক এক বিগ্রহ যে তাঁহারই অভিন্নতনু, ইহা প্রমাণ করিয়া ঐ বিগ্রহ সহিত কাশীশ্বরকে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরূপসনাতনের নিকট পাঠাইয়া শ্রীগোবিন্দদেবের শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিবার আদেশ দিলেন।

শ্রীরূপ-সনাতন, শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট, সুবুদ্ধিরায়, ভূগর্ভ লোকনাথ, কাশীশ্বর প্রমুখ বৈষ্ণববৃন্দ পরমানন্দে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের প্রতিষ্ঠা করিলেন। আমরা পূর্ব্বেই শ্রীল মদনমোহনের প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ করিয়াছি। পঞ্চক্রোশী শ্রীবৃন্দাবনের প্রবেশ-পথে কেশীঘাটের সন্নিকটে শ্রীগোবিন্দদেব প্রকাশিত হইলেন—এবং পঞ্চক্রোশী শ্রীবৃন্দাবনের অন্তভাগে দ্বাদশাদিত্য টিলায় শ্রীল মদনমোহন অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইরূপে শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীমদনমোহন শ্রীবৃন্দাবনের দুই ঘাঁটি আগলাইয়া ভক্তজন-পরিপূর্ণ শ্রীবৃন্দাবনের গৌরব সমুজ্জ্বল করিলেন। শ্রীরূপ-সনাতনের মনোবাসনা এইরূপে পূর্ণ হইল।

চিরকুমার শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী পিতামাতার পরলোকান্তে শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া শ্রীচৈতন্যদেবের নিকট আট মাস অবস্থান করিয়াছিলেন। শ্রীভাগবতমূর্ত্তি শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর নিকট শ্রীভাগবতের শেষ পাঠ পড়াইয়া শ্রীভাগবতের মর্ম্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করাইয়া এই অপূর্ব্ব ভাগবত-পাঠককে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরূপসনাতনের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। প্রেমভাবপূর্ণ মধুময় কণ্ঠে রাগরাগিণীভূষিত করিয়া যে ভাবে তিনি শ্রীভাগবত পাঠ করিতেন, তাহা শুনিলে শ্রীভগবান শ্রোতার হৃদয়ে "সপ্ত অবরুদ্ধ" হইতেন। তাঁহার ভাগবতপাঠের বর্ণনায় দেখা যায়—

"রূপগোসাঞির সভাতে করে ভাগবত-পঠন।
ভাগবত পড়িতে প্রেমে আউলায় তাঁর মন॥
অশ্রুকম্প গদগদ প্রভুর কৃপাতে।
নেত্রকণ্ঠ রোধে বাষ্প, না পারে পড়িতে॥
পিকস্বর কণ্ঠ তাতে রাগের বিভাগ।
এক শ্লোক পড়িতে ফিরায় তিন চারি রাগ॥
কৃষ্ণের সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য যবে পড়ে শুনে।
প্রেমে বিহ্বল হয় তবে, কিছুই না জানে॥"

এহেন প্রেমিক রঘুনাথ শ্রীগোবিন্দ প্রকাশ হইবামাত্র আনন্দে আত্মহারা হইলেন এবং তিনি শ্রীগোবিন্দের মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন, ঐ মন্দিরের বিবরণ আমরা শ্রীজীবের জীবনকথার আলোচনার সময়ে প্রদান করিব।

এখন একটি বিষয়ে আলোচনা করার প্রয়োজন। শ্রীগোবিন্দদেব কোন্ সময়ে প্রতিষ্ঠিত হন। আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, শ্রীগোবিন্দদেবকে প্রাপ্ত হইয়াই শ্রীরূপ-সনাতন শ্রীশ্রীপুরীধামে শ্রীচৈতন্যদেবের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং শ্রীচৈতন্যদেবও ঐ সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র বিগ্রহপ্রতিষ্ঠার অনুমতিসহ শ্রীল কাশীশ্বর গোস্বামীকে শ্রীবৃন্দাবনে প্রেরণ করেন। এই সংবাদ শ্রীবৃন্দাবনে আসিলে শ্রীরূপ-সনাতন শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার আর বিলম্ব করেন নাই

...কে হারাইয়া বীণা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। বিদেশে একা সুশীল কি করিবে, কিছু বুঝিতে না পারিয়া স্থাণুর ন্যায় বসিয়া থাকে। প্রবাসী বাঙ্গালীরা উপযাচক হইয়া সুশীলকে সাহায্য করে।

বীণাকে লইয়া সুশীল যে দিন চলিয়া আসে, বীণার সে দিন মনে পড়িল, দু'বছর আগেকার কথা—যে দিন মণীন্দ্রের সঙ্গে সে এখানে আসে। তাহাদের দাম্পত্য-প্রেম-তরুর প্রথম পুষ্প মলয়,—সে আনিল অমরাবতীর সুখ! অনাগত অতিথিটির আগমন-প্রতীক্ষায় স্বামি-স্ত্রীর সে কি আনন্দ! অনাস্বাদিত সুখের আবেশে তাহাদের দিনগুলি কাটিয়া গিয়াছে যেন—এক একটা ঘণ্টার মত।

রেলে উঠিবার সময় পুত্রকে কোলে লইয়া, বীণা চাহিয়া রহিল তাহার সুখ-স্মৃতি-জড়িত সেই ছোট্ট কোয়ার্টারটির দিকে! কয় দিন আগেও সে বোঝে নাই, এমনই করিয়া সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া তাহাকে চলিয়া যাইতে হইবে। দুটি চোখের কোলে অশ্রু ভরিয়া আসিল। মায়ের চোখের উপর ছোট্ট একখানি হাত রাখিয়া মলয় ডাকিল—"মা!"

...দুরন্ত স্বামীশোকে বীণা দেখা দিয়াছে... তাহার বুকের মণি, চোখের তারা। সকল কাজে বীণার চোখ ও কাণ পড়িয়া থাকে ছেলের উপর!

হঠাৎ কুঞ্জ বাবুর ব্লড্-প্রেসার বাড়িয়া উঠায় স্ত্রী-পুত্র এবং বিধবা কন্যাকে ফেলিয়া তাঁহাকে চলিয়া যাইতে হইল অজানা দেশে—কন্যার অকালবৈধব্যে সুকুমারী দেবী এক রকম আধমরা হইয়াছিলেন। সংসারের ভার মেয়ের হাতে ছাড়িয়া দিয়া, তিনি পূজার ঘরটিকে আশ্রয় করিয়াছিলেন। স্বামী যখন অতর্কিতে এমন ভাবে চলিয়া গেলেন, তখন তিনি সেই যে ভূমিশয্যা লইলেন, আর উঠিয়া বসেন নাই। নানা অসুখ-বিসুখে তাঁহার দেহ ভাঙ্গিয়া ছিল। মনে যখন আঘাতের উপর আঘাত লাগিল, তখন জীর্ণ দেহ সে আঘাত আর সহ্য করিতে পারিল না।

তিন মাসের আড়াআড়িতে, পিতা-মাতাকে হারাইয়া বীণার বয়স যেন দশ বছর বাড়িয়া গেল।

মলয় এখন স্কুলে যায়। মামার খোকা-খুকী তাহার চেয়ে ছোট। দাদামহাশয় এবং দিদিমার কাছে তাহার আদর

যে গোস্বামীরা দুই বৎসর বিলম্বে বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার কার্য্য সম্পাদন করিবেন, ইহাও সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। আমাদের মনে হয়, বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা ১৫৫৪ শকেই হইয়াছিল ; পরে শ্রীল রঘুনাথ ভট্টের আদেশে তাঁহার শিষ্য কর্ত্তৃক মন্দির নির্ম্মিত হইলে পুনরায় শ্রীমন্দির-প্রতিষ্ঠার উৎসবান্তে শ্রীবিগ্রহকে এই নবনির্ম্মিত মন্দিরে যে তারিখে স্থাপন করা হয়—"সেবাপ্রাকট্য ও ইষ্টলাভে" সেই তারিখই প্রদত্ত হইয়াছে।

শ্রীগোবিন্দদেব প্রতিষ্ঠিত হইলে ভক্তগণ তাঁহার বামে শ্রীরাধাকে দর্শন করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইলেন। শ্রীপুরী-ধাম হইতে প্রতাপরুদ্রের জ্যেষ্ঠ পুরুষোত্তম জানা দুইটি শ্রীমূর্ত্তি প্রেরণ করিলেন। উহার একটি শ্রীরাধিকারূপে শ্রীল মদনমোহনের বামে প্রতিষ্ঠিত হইলেন এবং অপর মূর্ত্তি শ্রীললিতারূপে তাঁহার দক্ষিণে স্থাপিত হইলেন। স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া পূজারীরা এইরূপ বন্দোবস্ত করিলেন। তখন পুরুষোত্তম জানা শ্রীগোবিন্দের জন্য পুনরায় শ্রীরাধিকার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীগোবিন্দদেবের যে শ্রীরাধিকা—তিনি উড়িষ্যায় ভক্ত বৃহদ্ভানুর প্রতি অপার কৃপায় তাঁহারই আলয়ে অবস্থান করিয়া এইরূপে প্রকাশ পাইয়াছেন। শ্রীরূপ যখন গোবিন্দদর্শনমানসে তন্ময়চিত্তে যমুনাতীরে কেশীঘাটের সন্নিকটে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন তাঁহার হৃদয়াধিদেব শ্রীনন্দনন্দন একটি পরম সুন্দর কিশোরবয়স্ক ব্রজবাসীর রূপ ধারণ করিয়া আসিয়া বলিলেন—"যে স্থানে এখন গোমাটিলা আছে, উহার নিম্নে মৃত্তিকামধ্যে শ্রীগোবিন্দ-দেব বিরাজমান—প্রতিদিন ঐস্থানে একটি গাভী দুগ্ধ বর্ষণ করিয়া থাকে—ইহা দেখিয়া স্থান নির্ণয় করিতে পারিবে।" যখন ধ্যানে শ্রীরূপ তন্ময়—তখন স্বপ্নজাগরণের মধ্যবর্ত্তী অবস্থায় গোপবালকের এই কথা শুনিয়া তিনি চমকিত হইয়া চারিদিকে চাহিয়াই দেখেন—সে ব্রজবালক অন্তর্হিত হইয়াছেন। তখন শ্রীরূপ ভাবাবেশে আত্মহারা হইয়া কোনওরূপে শ্রীপাদ সনাতনকে এই কথা নিবেদন করিলেন। শ্রীপাদ সনাতন শ্রীরূপকে প্রকৃতিস্থ করিয়া ব্রজবাসিগণকে আহ্বান করিয়া ঐস্থানের মাটি খুঁড়িয়া শ্রীগোবিন্দদেবকে প্রাপ্ত হইলেন।

তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপুরীধামে বিরাজ করিতেছিলেন। দুই ভ্রাতা শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট লোক পাঠাইয়া পত্রের শ্রীপুরুষোত্তম জানা স্বপ্নাদেশে জানিতে পারিলেন যে, ইনিই শ্রীগোবিন্দদেবের পার্শ্ববিহারিণী শ্রীরাধিকা। তিনি এই শ্রীমূর্ত্তি শ্রীবৃন্দাবনে প্রেরণ করিলেন। ইনিই শ্রীগোবিন্দ-দেবের বামে প্রতিষ্ঠিতা হইয়া অদ্যাপি বিরাজ করিতেছেন।* এইরূপে শ্রীগোবিন্দদেব "শ্রীরাধা-সঙ্গনন্দিতা" হইয়া শ্রীবৃন্দাবনের যোগপীঠে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

শ্রীগোবিন্দদেবের প্রতিষ্ঠার সময়ে শ্রীরূপ "মুকুন্দমুক্তাবলী" নামে অতি সুন্দর একটি স্তব রচনা করিয়াছিলেন, এখন আবার শ্রীগোবিন্দদেবের বামে শ্রীরাধিকা মূর্ত্তিস্থাপনের পর শ্রীরূপ গোস্বামী পরমানন্দে বিভোর হইয়া তাঁহাকে অন্তর্দ্দশায় প্রত্যক্ষ করিয়া একটি সুন্দর স্তব রচনা করেন। ঐ স্তবটি "চাটু-পুষ্পাঞ্জলি" নামে সুবিখ্যাত। ইহাতে শ্রীরাধিকার অনুপম রূপের বর্ণনা করিয়া সখীভাবে তাঁহার সেবাধিকার প্রার্থনা করা হইয়াছে। পরবর্ত্তীকালে শ্রীল যদুনন্দন ঠাকুর এই সুন্দর স্তবটির বঙ্গভাষায় একটি সুমধুর পদ্যানুবাদ করেন।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু (এম-এ, বি-এল)।

---

* ... যখন শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীগোবিন্দদেব প্রকাশিত হইলেন- এবং ... শ্রীবৃন্দাবনের অন্তভাগে দ্বাদশাদিত্য টিলায় শ্রীল মদনমোহন অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইরূপে শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীমদনমোহন শ্রীবৃন্দাবনের দুই ঘাঁটি আগলাইয়া ভক্তজন-পরিপূর্ণ শ্রীবৃন্দাবনের গৌরব সমুজ্জ্বল করিলেন। শ্রীরূপ-সনাতনের মনোবাসনা এইরূপে পূর্ণ হইল।

চিরকুমার শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী পিতামাতার পরলোকান্তে শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া শ্রীচৈতন্যদেবের নিকট আট মাস অবস্থান করিয়াছিলেন। শ্রীভাগবতমূর্ত্তি শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর নিকট শ্রীভাগবতের শেষ পাঠ পড়াইয়া শ্রীভাগবতের মর্ম্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করাইয়া এই অপূর্ব্ব ভাগবত-পাঠককে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরূপসনাতনের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। প্রেমভাবপূর্ণ মধুময় কণ্ঠে রাগরাগিণীভূষিত করিয়া যে ভাবে তিনি শ্রীভাগবত পাঠ করিতেন, তাহা শুনিলে শ্রীভগবান শ্রোতার হৃদয়ে "সত্ত্ব অবরুদ্ধ" হইতেন। তাঁহার ভাগবতপাঠের বর্ণনায় দেখা যায়—

দেড় বছরের ছেলে মলয়কে লইয়া, সীঁথির সিঁদুর মুছিয়া বীণা যখন তাহার বাপের ঘরে ফিরিয়া আসিল, তখন কন্যাকে বুকে জড়াইয়া সুকুমারী দেবী কি কান্নাটাই না কাঁদিলেন, —কিন্তু বীণার পিতা কুঞ্জবিহারী বাবু এক ফোঁটা চোখের জল ফেলেন নাই। গম্ভীর মুখে গড়গড়ার নলটি তিনি মুখে তুলিয়া লইয়াছিলেন।

বছর তিনেক আগে সুন্দর, স্বাস্থ্যবান যুবার সঙ্গে, কুঞ্জবাবু কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। দূর সম্পর্কের এক ভাশুর ছাড়া, বীণার শ্বশুরকুলে আপন বলিতে আর কেহ ছিল না। বীণার স্বামী পশ্চিমে রেলে চাকুরী করিত। স্বামীর নিউমোনিয়া হওয়ায় বীণা পিতাকে সংবাদ দেয়। তিনি পরের চাকর, ছুটি পান নাই। পুত্র সুশীলকে পাঠান। সুশীল পৌঁছানোর দুটি দিন পরেই মণীন্দ্রকে অপূর্ণ আশা-আকাঙ্ক্ষা লইয়া অকালে চলিয়া যাইতে হয়।

স্বামীকে হারাইয়া বীণা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। বিদেশে একা সুশীল কি করিবে, কিছু বুঝিতে না পারিয়া স্থাণুর ন্যায় বসিয়া থাকে। প্রবাসী বাঙ্গালীরা উপযাচক হইয়া সুশীলকে সাহায্য করে।

বীণাকে লইয়া সুশীল যে দিন চলিয়া আসে, বীণার সে দিন মনে পড়িল, দু'বছর আগেকার কথা—যে দিন মণীন্দ্রের সঙ্গে সে এখানে আসে। তাহাদের দাম্পত্য-প্রেম-তরুর প্রথম পুষ্প মলয়,—সে আনিল অমরাবতীর সুখ! অনাগত অতিথিটির আগমন-প্রতীক্ষায় স্বামি-স্ত্রীর সে কি আনন্দ! অনাস্বাদিত সুখের আবেশে তাহাদের দিনগুলি কাটিয়া গিয়াছে যেন—এক একটা ঘণ্টার মত।

রেলে উঠিবার সময় পুত্রকে কোলে লইয়া, বীণা চাহিয়া রহিল তাহার সুখ-স্মৃতি-জড়িত সেই ছোট্ট কোয়ার্টারটির দিকে! কয় দিন আগেও সে বোঝে নাই, এমনই করিয়া সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া তাহাকে চলিয়া যাইতে হইবে। দুটি চোখের কোলে অশ্রু ভরিয়া আসিল। মায়ের চোখের উপর ছোট্ট একখানি হাত রাখিয়া মলয় ডাকিল—"মা!"

পুত্রের মাথা বুকে চাপিয়া ধরিয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বীণা বলিল,—"বাবা!"

সুশীল বলিল—বীণা, শীগ্‌গির গাড়ীতে ওঠো, এখনই গাড়ী ছাড়বে!

*   *   *   *

বাপ-মার কাছে ফিরিয়া আসার পর, পাঁচ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। শোকে মানুষ প্রথমেই আকুল হইয়া পড়ে, ক্রমে তাহা সহিয়া যায়। বীণার জীবনেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। পিতা-মাতা আর পুত্রের সুখ সুবিধা লইয়াই সে এখন ব্যস্ত।

বীণার জীবনে মণীন্দ্র আসিয়াছিল দেবতার মত। তাহার বুকের সিংহাসনে রাখিয়া গিয়াছে তাহার আশার ছাপ, আর দিয়া গিয়াছে জ্বলন্ত স্মৃতি মলয়কে—যাকে বুকে লইয়া দুরন্ত স্বামিশোকে বীণা ধৈর্য্য ধরিয়াছে। মলয় তাহার বুকের মণি, চোখের তারা। সকল কাযে বীণার চোখ ও কাণ পড়িয়া থাকে ছেলের উপর!

হঠাৎ কুঞ্জ বাবুর ব্লড্-প্রেসার বাড়িয়া উঠায় স্ত্রী-পুত্র এবং বিধবা কন্যাকে ফেলিয়া তাঁহাকে চলিয়া যাইতে হইল অজানা দেশে—কন্যার অকালবৈধব্যে সুকুমারী দেবী এক রকম আধমরা হইয়াছিলেন। সংসারের ভার মেয়ের হাতে ছাড়িয়া দিয়া, তিনি পূজার ঘরটিকে আশ্রয় করিয়াছিলেন। স্বামী যখন অতর্কিতে এমন ভাবে চলিয়া গেলেন, তখন তিনি সেই যে ভূমিশয্যা লইলেন, আর উঠিয়া বসেন নাই। নানা অসুখ-বিসুখে তাঁহার দেহ ভাঙ্গিয়া ছিল। মনে যখন আঘাতের উপর আঘাত লাগিল, তখন জীর্ণ দেহ সে আঘাত আর সহ্য করিতে পারিল না।

তিন মাসের আড়াআড়িতে, পিতা-মাতাকে হারাইয়া বীণার বয়স যেন দশ বছর বাড়িয়া গেল।

মলয় এখন স্কুলে যায়। মামার খোকা-খুকী তাহার চেয়ে ছোট। দাদামহাশয় এবং দিদিমার কাছে তাহার আদর

ছিল সকলের আগে, সে-ও তাঁহাদিগকে খুব ভাল বাসিত। তাঁহাদের মৃত্যুতে মলয় কাঁদিয়া অস্থির হইল। নিজের ব্যথা ভুলিয়া বীণা পুত্রকে সান্ত্বনা দিতে বসিল।

বীণা সবে স্নান সারিয়া উনুনে দুধের কড়া বসাইয়াছে। দেবকী ঘুম ভাঙ্গিয়া উপর হইতে নামিয়া আসিয়া রান্নাঘরের বারান্দায় চুল খুলিতে বসিল। ঝী সারদা আসিয়া বীণাকে বলিল— দিদিমণি, বাজারের পয়সা দাও।

বীণা বলিল—একটু দাঁড়াও।

—তবে আমি বাকী বাসন ক'খানা ধুয়ে নিই,—তোমার রান্নার দেরী হবে ব'লে আমি কাষ ফেলে বাজারে যাচ্ছিলুম।

বীণা দুধের কড়া নামাইয়া, চায়ের কেট্‌লিটা উনুনে চড়াইয়া দেবকীর কাছে আসিয়া বলিল—দাদা উঠেছে, বৌদি?

চুলে তেল দিতে দিতে দেবকী বলিল—কেন?

—বাজারের পয়সা চাই।

—পরশু তো একটা টাকা নিলে।

—সে সব খরচ হয়ে গেছে।

—ও মা! বলো কি? তুমি যে অবাক ক'রলে, ঠাকুরঝি?

বীণা কিছু বুঝিতে না পারিয়া ভ্রাতৃজায়ার মুখের দিকে চাহিল।

ভিজে হাতখানা মুছিতে মুছিতে সারদা আসিয়া বলিল —কৈ দিদিমণি, হয়েছে তোমার?

বীণা একবার তাহার দিকে চাহিয়া পরক্ষণে দোতলায় সুশীলের শয়ন-প্রকোষ্ঠের দ্বারে গিয়া দাঁড়াইল।

সুশীল তখনই ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়াছে। বীণাকে দেখিয়া সে বলিল—আমার উঠ্‌তে বড্ড দেরী হয়ে গেছে, নয়? কাল রাত্রে ছোট খোকাটার কান্নার জালায় এক তিল ঘুমুতে পারি নি, তাই ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। তোর চা হয়ে গেছে?

বীণা বলিল—না, জল চড়িয়েছি।

—ও! তবে আমি এখনি মুখটা ধুয়ে আসছি।

—তোমার কাছে একটু দরকারে এসেছি, দাদা!

—কি দরকার রে?

আঁচলের খুঁটটা আঙ্গুলে জড়াইতে জড়াইতে মুখখানি নীচু করিয়া বীণা বলিল, ঝি বাজারে যাবে, পয়সা চাই।

তার জন্যে অত ভয়ে-ভয়ে কথা বল্‌ছিস্ কেন? আমার কোটের পকেট থেকে নিলেই তো পারতিস্ এতক্ষণ?

—তোমার পকেট থেকে তো আমি পয়সা নিই নি কোন দিন।

—ঐ তোর দোষ! দাদার কাছে জোর ক'রে নেবার তোর অধিকার আছে। তা না, তুই অমন ভয়ে ভয়ে পয়সা চাইবি! কেন বল্ দিকি? মা-বাবা নেই ব'লে কি তুই এ-বাড়ীর পর হ'য়ে গেছিস্, ভাবিস?

বীণা কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া রহিল। সে জানে, এ-বাড়ীর সে পর নয়, তবু এ সঙ্কোচ তাহার কেন আসে, তাহা সে বুঝিতে পারে না।

দাদার এই স্নেহের ভৎসনা তার কাছে আজ নূতন নয়। এইটুকুর জোরেই সে মা-বাপকে হারাইয়াও এ সংসারে টিঁকিয়া আছে। দেবকীর তাচ্ছিল্যভাব বীণার দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারে না, শুধু স্নেহময় দাদার জন্য ইহা কোন দিন গায়ে মাখে না।

পকেট হইতে মণিব্যাগটা বাহির করিয়া সুশীল ভগিনীর হাতে দিয়া বলিল—এতে দশ টাকা আছে, এ মাসের আর দিন আষ্টেক বাকী, তোর বাজার-খরচ বোধ হয় এতেই হ'য়ে যাবে?

—অত টাকার আমার দরকার নেই, দাদা। তুমি একটা টাকা দাও, দেখি তাতে কটা দিন চালাতে পারি!

—না। এ দশ টাকা তোর কাছেই রাখ, সব সময় আমার কাছে কত চাইতে আস্‌বি! আসচে মাস থেকে বাবার মত মাইনের টাকা এনে তোর কাছেই দেবো। সংসারের যখন সব ভারই তোর মাথায়, তখন পয়সা হাতে না থাকলে চলবে কেন!

বীণা বলিল, না দাদা, ও সব ঝঞ্ঝাটে কায নেই। যখন যা দরকার হবে, আমি তোমার কাছ থেকে চেয়ে নেবো।

নীচে হইতে ঝী ডাকিল, দিদিমণি, আমি আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবো গো?

এই যে যাই… বলিয়া বীণা তাড়াতাড়ি নামিয়া গেল।

* * * *

সে দিন রবিবার। দেবকী যখন চায়ের আসরে আসিয়া বসিল, তখন তাহার মুখে প্রলয়-ঝড়ের আশু আবির্ভাবের চিহ্ন পরিস্ফুট। বাঁ-হাতে একখানি বিস্কুটে কামড় দিয়া, ডান-হাতে চায়ের পেয়ালা মুখের কাছে আনিয়া, স্ত্রীর দিকে চাহিয়া সুশীল বলিল—সকালেই যে তোমার মুখখানা এমন অন্ধকার দেখছি! ব্যাপার কি?

কন্যা সুষমাকে দুধ আর বিস্কুট সরাইয়া দিয়া গম্ভীর স্বরে দেবকী বলিল—তুমি তো আমার মুখ সব সময়ে অন্ধকারই ছাখো।

পেয়ালাটা নামাইয়া রাখিয়া সুশীল বলিল—আজ তুমি বড্ডো বিরক্ত হয়েচ ব'লে মনে হচ্ছে! কি হয়েছে?

হবে আবার কি!

—উঁহু! তোমার কথায় বেশ বোঝা যাচ্ছে, কিছু হয়েছে!

দেবকী জবাব দিল না।

মলয় চা খাইয়া উঠিয়া গেল।

সুশীল বলিল—মলয়কে বিস্কুট দিলে না?

দেবকী বলিল বিস্কুট আর নেই।

—নেই! তবে আমাকে দিলে কেন? ছোট ছেলে, ও খালি পেটে চা খেয়ে গেল!

ঝাঁজালো স্বরে দেবকী বলিল—অতো বুঝিনি যে মলয় একদিন বিস্কুট না পেলে মহাভারত অশুদ্ধ হ'য়ে যাবে! যত দরদ পরের জন্যে! নিজের ছেলেমেয়ের জন্যে যদি তার এক কণা থাকতো!

—কি ব'লছ, তুমি, দেবী! মলয় আমার পর?

—ও কেন পর হবে? পর আমি আর আমার ছেলে-মেয়ে!

তাই কি আমি ব'লেছি?

—ব'লবে আবার কি! তোমার ব্যবহারেই বোঝা যায়!

—আমার ব্যবহার?

—হ্যাঁ।

—তোমার এ কথার মানে বুঝতে পারলুম না?

—স্বামীর দিকে তীক্ষ্ণ চোখে চাহিয়া দেবকী বলিল—মানে খুবই সহজ। তিন-তিনটে ছেলে মেয়ে যার, তার কি উচিত নয় পয়সা-কড়ির দিকে দৃষ্টি দেওয়া! পাঁচ জনকে খাইয়ে উড়িয়ে পুড়িয়ে দিলেই তো আর চলবে না! তোমার আর কি! শেষে ছেলে-মেয়ের হাত ধ'রে আমাকেই পথে দাঁড়াতে হবে!

স্ত্রীর মুখের দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া সুশীল বলিল—ওঃ, এই কথা! পাঁচ জনের মধ্যে তো বীণা আর মলয়! তারা তোমার স্বামীর রোজগার খায় না!

বিদ্রূপের স্বরে দেবকী বলিল তবে তাঁরা কার রোজগার খান?

স্ত্রীর উপর সুশীল মনে মনে ভয়ানক বিরক্ত হইয়াছিল। বাহিরে সে ভাব প্রকাশ না করিয়া বলিল—ভবানীপুরে যে বাড়ীখানা ভাড়ায় আছে, বাবার মরণ-কালের কথা—তার আয় বীণার—যতদিন না মলয় উপায়-ক্ষম হবে।

—একটু নরম স্বরে দেবকী বলিল—তা না হয় বুঝলুম, কিন্তু খরচ-পত্রও তো কিছু হিসেবমত হয় না!

—খরচ হিসেব-মত হয় না?

—না।

—এ কথা আমি বিশ্বাস করিনে। বীণার মত মেয়ে কখনো বেহিসেবী খরচ করবে না…

—দেবকী হাসিল। ঠিক যেন তীক্ষ্ণ তীরের মত সে হাসি!

সুশীল বলিল—অমন করে হাসলে যে!

—হাসলুম কেন, শুনবে? তোমার কথা শুনে।

—আমি তো অন্যায় কথা কিছু বলিনি!

—তোমার যদি এমন বুদ্ধি না হবে, তাহলে কি আর বিধবা বোন ঘরের সর্ব্বময়ী হয়! আর যে স্ত্রী, সে তার হাত-তোলার বাঁদী! দেবকীর চোখে জল ভরিয়া আসিল।

সুশীল স্তব্ধ হইয়া স্ত্রীর দিকে চাহিয়া রহিল। চোখের জল মুছিতে মুছিতে দেবকী ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

বীণা আসিয়া বলিল—চা খাওনি, দাদা?

—একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ভগিনীর দিকে চাহিয়া সুশীল বলিল—এই যে খাই। চা মুখে দিয়াই কাপটি সে নামাইয়া রাখিল একেবারে ঠাণ্ডা জল!

বীণা বলিল—জুড়িয়ে গেছে বুঝি?

—হ্যাঁ।

—ব'সো, আমি এক্ষণি গরম চা তৈরী ক'রে আনছি।

বাধা দিয়া সুশীল বলিল—থাক্। আর তোকে এখন চা ক'রতে হবে না।

—বাঃ, তাই কি হয়! জল আমার গরমই আছে। বলিয়া বীণা চলিয়া গেল।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে গরম চা লইয়া ফিরিয়া আসিল।

চায়ে চুমুক দিয়া সুশীল বলিল—ভারী সুন্দর চা হয়েছে রে! তোর হাতের রান্না যেমন সুন্দর, চা-ও তৈরী করিস্ তেমনি চমৎকার!

—তবু মার মত রাঁধতে পারিনে, দাদা।

—কে বলেছে—তোর হাতের রান্না খেলে মনে হয় বুঝি মার হাতের রান্না খাচ্ছি!

গম্ভীর মুখে দেবকী আসিয়া পুত্রকে দুধ খাওয়াইতে বসিল। সুশীল একবার তাহার দিকে চাহিয়া পরে বীণার দিকে চাহিল—এই তার বোন্......দাদার সংসারে সুখ-সুবিধার জন্য জীবনপাত করিয়া খাটিয়া যায়—এক দণ্ড বিশ্রাম পায় না! পিতা-মাতার মৃত্যুর পর হইতে আজ আট বছর এ সংসার বীণা চালাইতেছে। কার কি চাই, কার অসুখে চাই বার্লি, কে পথ্য পাইবে সুজির রুটি—সকল দিকে কি লক্ষ্য! কোন দিন ভুল হয় না! ছেলে মলয়—এ সংসারের কাযে বীণা সেই ছেলেকে ভালো করিয়া দেখিবার অবসর পায় না। বীণার উপর দেবকী খুশী নয়। কিছু দিন হইতে আভাসে সে-কথা প্রকাশ করিতেছে। আজিকার কথাগুলি তাহারই প্রতিধ্বনি। ইহাতে সুশীল ব্যথা পায়—স্ত্রী হইয়াও দেবকী তা বোঝে না। বীণা তাহাদের যতখানি দেয়, তাহার প্রতিদানে তাহারা তাহাকে কি দিতেছে? একখানি নরুণ পাড় ধুতি আর গায়ে লংক্লথের মোটা একটা সেমিজ! সকলের শেষে বেলা তিনটার সময় বীণা আহার করে,—রাতে কিছুই খায় না। ইহা লইয়া সুশীল কত দিন কত অনুযোগ করিয়াছে, কিন্তু একটু হাসিয়া বীণা চিরদিন বলিয়াছে, রাতে আমার খিদে হয় না, দাদা!

আহা! সুশীলকে অন্যমনস্ক দেখিয়া বীণা বলিল—তুমি যে আজ নিজে বাজারে যাবে বলেছিলে, দাদা!

—ও, হ্যাঁ রে! দেখেছিস্—একেবারে ভুলে গেছি!—সুশীল উঠিয়া কামিজ গায়ে দিতে লাগিল।

বিরক্ত-মুখে দেবকী বলিল,—তোমার কি রকম আক্কেল, ঠাকুরঝি! একটা দিন ছুটি পায়—সংসারের সব এই একটা মানুষের মাথায়—তাকে একটু বিশ্রামও দেবে না এক দিন?

বীণা সঙ্কোচে মরিয়া গেল! বৌদি বলে কি! দাদাকে বিশ্রাম দিতে সে চায় না! দাদার আর মলয়ের মুখ চাহিয়াই সে বাঁচিয়া আছে!

সুশীল স্ত্রীকে বলিল—কি ব'লছো তুমি! বীণার দোষ কি! কাল আমিই ওকে বলেছিলুম, বাজারের কথা আমাকে মনে করিয়ে দিতে—সন্ধ্যে বেলা তোমার দাদাদের যে নেমন্তন্ন করেছো, সে কথা তুমি ভুলে গেছ? তারি আয়োজনে আমার বাজার যাওয়া!

* * * *

মলয় এখন বড় হইয়াছে। সিনিয়র কেমব্রিজ পাশ হওয়ার পর দেবকীর বড় দাদা বসন্ত বাবু সুশীলের কাছ হইতে তাহাকে চাহিয়া লইয়াছিলেন। সে-বার যখন দ্বিতীয়া কন্যা সুমিতার বিবাহ দিতে ছুটিতে কলিকাতায় আসেন, তখন মলয়কে দেখিয়া, তাহার সুশ্রী সুচারু মূর্ত্তি আর বুদ্ধি দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হন। সুশীলকে বলেন, মলয় পাশ করলে, ওকে তুমি আমার হাতে দিয়ো, সুশীল। আমার ছেলে নেই,—মলয়কে আমি বিলেত পাঠাবো। এমন বুদ্ধিমান ছেলে আমি খুব কম দেখেছি। ও ফিরে এলে, আমি ছোট খুকির সঙ্গে ওর বিয়ে দিয়ে, ওকে নিজের ক'রে নেবো। এ কথায় সুশীল সানন্দে রাজী হয়। তাহারও ইচ্ছা, মলয় মানুষ হয়—তাহার অভাগিনী বোন বীণার তখন সুখের সীমা থাকিবে না!

মলয় বেশ ভালো পাশ করিয়া বাহির হইল। পাঁচ পয়সার 'হরিলুট' দিয়া বীণা দেবতার উদ্দেশে ললাটে যুক্তকর ঠেকাইল। পুত্রের জন্মের পর, তাহার নামকরণ হইতে শিক্ষা দেওয়া লইয়া কত কথাই না মণীন্দ্র স্ত্রীকে বলিয়াছে। নিজে পিতৃমাতৃহীন ছিলেন, ভালো করিয়া পড়িতে পান নাই। ছেলেকে শিক্ষিত করিবেন। নিজের মনের আপশোষ পুত্রকে দিয়া মিটাইবেন। আজ সেই মলয় পাশ করিয়াছে! সুশীল বলিয়াছে, বসন্তবাবু তাহাকে বিলেত পাঠাইবে—বীণার কাছে তাহা কতখানি আনন্দের সেই জানে, আর জানেন অন্তর্যামী, কিন্তু যাহার জিনিস মলয়,

তাঁহার যে বড় সাধ ছিল, মলয়কে শিক্ষিত দেখিবেন। আজ কোথায় তিনি! বীণার চোখ দুটিতে অশ্রু আসিয়া পড়ে—সে তাড়াতাড়ি আঁচলে মুছিয়া মনে মনে বলে—ঠাকুর মলয়কে আমার দীর্ঘজীবী করো।

মলয়ের বিলেত যাইবার সমস্ত ব্যয়ভার বসন্তবাবু লইয়াছিলেন। অত দূরে পুত্রকে পাঠাইতে বীণার মন কিছুতেই সায় দিতেছিল না, কিন্তু ছেলের সুখের আশায় নিজের বেদনা চাপা দিয়া হাসিমুখে তাহাকে সে বিদায় দিয়াছিল।

এক বছরের উপর মলয় গিয়াছে। প্রতি মেলে মাকে চিঠি দেয়—সে সব চিঠিতে কত আশা, কত উৎসাহের কথা লেখা—পুত্রের পত্রগুলি রোজ রাত্রে শয্যায় বসিয়া বীণা পড়ে। মলয় কাছে নাই—তাহার এ চিঠিগুলি তাহাকে সন্তানের সঙ্গ দেয়!

সংসারের আয়-ব্যয় দেবকী নিজের হাতে লইয়াছে। বীণা শুধু খাটিয়া খালাস। ক'দিন হইতে তাহার জ্বর হইতেছে, কাহাকেও সে কথা বলে নাই।

সে দিন দ্বাদশী। উপবাসক্লান্ত দেহ কিছুতেই যেন শয্যা ছাড়িতে চায় না।

ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া, দেবকী নীচে আসিয়া দেখিল, উনুন জ্বলিয়া যাইতেছে—বীণা ওঠে নাই। রাগে তাহার দেহ জ্বলিয়া উঠিল। চড়া-গলায় সে বলিল, কি আশ্চর্যি! রোদে বাড়ী ভ'রে গেছে, এখনও চায়ের জল বসেনি! ছেলে-মেয়েগুলো ইস্কুল যাবে কি না খেয়ে! এখনও ঠাকুরঝি নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমুচ্ছে!

ভ্রাতৃজায়ার স্বর শুনিয়া বীণা ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া অপ্রতিভ কণ্ঠে বলিল—জানিনে কেন আজ কিছুতেই যেন উঠ্‌তে পারছিলুম না, বৌদি!

দেবকী বলিল—তা তো বুঝ্‌লুম! কিন্তু তুমি উঠ্‌তে পারছো না বল্‌লে তো আর আফিস, ইস্কুল শুনবে না, ভাই। তোমার কি বলো—এখন তো আর মলয় ইস্কুল যায় না! কাযেই এখন আর সকালে উঠ্‌বার তাগিদ্ নেই!

বিমর্ষ-কণ্ঠে বীণা বলিল—সে কি, বৌদি! সঞ্জীব, সুষমা কি আমার মলয়ের চাইতে কম!

তা কি ক'রে জান্‌বো বলো! তারা পড়তে বসেছে, এখনও পর্য্যন্ত একটু দুধ কি চা পেলে না—মলয় কি কোন দিন সকালে চা না খেয়ে পড়েছে?

দেবকীর স্বভাব বীণার জানা ছিল। তাহার সঙ্গে কথা-কাটাকাটিতে বীণার কোন দিনই রুচি নাই। মৃদু একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সে স্নান করিতে গেল।

* * *

ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়া গায়ে লাগিতে বীণা শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল। তখনও পূর্বদিকে শুকতারাটি নিবিয়া যায় নাই। যখন সে স্নান-আহ্নিক সারিয়া আসিয়া দাঁড়াইল, তখন তরুণ রবির সোনার কিরণে পৃথিবী ঝলমল করিতেছে। আই-সি-এস পরীক্ষা পাশ করিয়া মলয় আজ ফিরিয়া আসিতেছে। সুশীল গিয়াছে বোম্বে হইতে তাহাকে আনিতে। কত দিন পরে পুত্রের মুখ দেখিবে, এই আশায় রাত্রে বীণার ঘুম হয় নাই।

মলয় আসিয়া যখন জননীকে প্রণাম করিল, হর্ষে, গর্ব্বে তরুণ পুত্রের মাথাটি সেই বাইশ বছর আগের মতই বীণা বুকে চাপিয়া ধরিল। এই তাহার মলয়!—সেই দেড় বছরের শিশু! আজ সে——মায়ের দু'ফোটা চোখের জল ছেলের মাথায় ঝরিয়া পড়িল আশীর্ব্বাদের শান্তিবারির মত! সুশীল চাহিয়াছিল ভগিনীর দিকে। মাতা-পুত্রের এ মিলন তাহাকে অনেকখানি আনন্দবিহ্বল করিয়াছিল।

এক মাস পরে কন্যা অমিতার সঙ্গে মহা সমারোহে বসন্তবাবু মলয়ের বিবাহ দিলেন। বিবাহের পরে মলয় পশ্চিমে যাইবে—সেখানে তাহার চাকরি।

মলয় বলিল—মা, এবার তুমি আমার সঙ্গে চলো।

বীণা বলিল—বৌমাকেও নিয়ে যাবি তো?

—হ্যাঁ।

বীণার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল একটি সংসার—সে সংসারে বীণা কর্ত্রী—মলয় আর তাহার বধূ, আলো করিয়া থাকিবে দুটি মাণিকের মত তাহার সেই সংসার। আর মলয়ের খোকাখুকির কাকলী-ধ্বনি সেখানে আনিবে অমরাবতীর সুখ! আনন্দে বীণার চোখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

মলয় বলিল—মা, তোমার গোচ্‌গাছ ক'রে নাও আমাকে শিগ্‌গীর যেতে হবে।

হাসিয়া বীণা বলিল—আমার আবার গোছাবার কি আছে, বাবা! তুই যে দিন বলবি, সেই দিনই যাবো।

—তবু, তোমার যদি কোন জিনিষ-পত্তর নিতে হয়—তাই বলছিলুম।

পুত্রের দিকে চাহিয়া বীণা বলিল—আমার জিনিষ-পত্তর, ধন-দৌলত সবই তুই, মলয়!

বীণাকে ট্রেণে উঠাইতে সুশীল হাওড়া ষ্টেশনে আসিয়াছে। এক দিন শিশুপুত্রসহ পতিহীনা ভগিনীকে সে লইয়া আসিয়াছিল এইখানে—সে আজ কত দিনের কথা, তবু সুশীলের মনে হইতেছিল, সে যেন সে দিন! আজ সেই বীণা চলিয়াছে কৃতী পুত্রের সঙ্গে তাহার কর্ম্মস্থানে, তাহাকে ছাড়িয়া দিতে সুশীলের মনে যেমন বেদনা হইতেছিল, তেমনি আনন্দ! তাহার স্নেহের বোনটি পুত্রের উপায়ে আজ নূতন করিয়া সংসার বাঁধিতে যাইতেছে। ছেলের কাছে গিয়া সে সুখী হইবে—ইচ্ছা থাকিলেও পত্নীর ভয়ে ভগিনীর কষ্ট চোখে দেখিয়াও সে তাহা ঘুচাইতে পারে নাই।

ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। চোখে একরাশ বাষ্প লইয়া সুশীল গৃহে ফিরিল।

* * * *

অমিতা আই, সি, এস-এর স্ত্রী। নিজেও কলেজে লেখা-পড়া শিখিয়াছে। বিধবা শাশুড়ীর মত লইয়া চলিতে তাহার আত্মসম্মানে বাধে। বীণা কোন দিনই বধূকে কিছু বলে না। তাহাকে সে কন্যার মত ভালবাসে। মলয়ের অনুপস্থিতিতে তাহার বন্ধুদের সঙ্গে অমিতা যখন খেলা-ধূলায় বা চা-পানে রত থাকে, সে সময় বীণা সেখানে আসিলে অমিতা বিরক্ত হয়।

মলয়ের খোকা জন্ম লইল হসপিটালে। তাহাকে মানুষ করিতে আসিল এক গর্ভনেস্।

বীণা অবাক হইয়া বলে—মলয়! এ মেয়েটিকে আবার কেন রাখলি?

মলয় বলিল—খোকাকে দেখবে ব'লে।

বীণা বলিল—কি দরকার, বাবা! তোর মা কি ম'রে গেছে!

অমিতা আসিয়া বলিল—আপনি ছেলের নার্সিংএর কি জানেন?

বধূর দিকে চাহিয়া বীণা বলিল—সে কি, বৌমা! মলয়কে এত বড়টা করলে কে?

—হ্যাঁ! এই একটা প্রমাণ আপনার আছে বটে—কিন্তু পঁচিশ বছর আগেকার সে দিন আর এখন নেই।—অমিতা চলিয়া গেল।

মলয় বলিল—মা! তুমি ও-সবের মধ্যে না-ই গেলে। নিজের ঠাকুর-দেবতা নিয়ে থাক।

একটা উদ্গত নিশ্বাস চাপিয়া বীণা বলিল—তাই ত থাকি, বাবা!

বীণার কত সাধ যে, মলয়ের ছেলে, মলয়ের সংসার, সে নিজ হাতে মনের মত করিয়া গড়িয়া তুলিবে! প্রথম জীবনে কোন সাধই যে তাহার পূর্ণ হয় নাই; তাই জীবনের অপরাহ্নে সে পুত্র-পৌত্র লইয়া আনন্দে কাটাইবে ভাবিয়াছিল। বৈধব্যের পর এই দীর্ঘ দিন সে যে এই স্বপ্নই দেখিয়াছে।

মলয় ঠিক কথা বলিয়াছে। এখন তাহার একমাত্র সম্বল, আশা-আনন্দ ভগবানের চরণে দিয়া তাঁহারই সেবায় জীবন কাটানো। মলয়ের বৌ-ছেলে বেঁচে থাক—মলয় সুখী হউক!

ক্রমেই বীণা এ সংসারে একটা অনাবশ্যকমধ্যে দাঁড়ায়। শাশুড়ীর কোন কথা অমিতার পছন্দ হয় না। তাহার সংসার-নৌকার হালখানি সে নিজের হাতেই লয়। যে আশার জোরে বীণা এতদিন সকল দুঃখ মুখ বুজিয়া সহিয়াছে, তাহাতে নিরাশ হইয়া ভিতরে ভিতরে সে কাহিল হইয়া পড়িল।

এক দিন মলয়ের কাছে গিয়া বীণা বলিল—মলয়, আমাকে কাশী পাঠিয়ে দে, বাবা—

জননীর মুখের দিকে চাহিয়া মলয় বলিল—তুমি কাশী যাবে, মা?

—হ্যাঁ, বাবা।

—আচ্ছা, আমি তার বন্দোবস্ত করে দেবো।

কিছুদিন হইতে মলয়, মায়ের বিরুদ্ধে অমিতার কাছ হইতে নানা কথা শুনিতেছিল। তাহার মা'র এখানে থাকা অমিতার যে পছন্দ নয়, তাহা সে বুঝিয়াছে। মাকে সে ভালবাসে, স্ত্রীর কথায় মনে বেদনা পাইলেও

মুখে কোনদিন সে তাহা প্রকাশ করে নাই। আজ বীণা যখন নিজে হইতে কাশী যাইতে চাহিল, তখন মলয় একটা পথ দেখিতে পাইয়া মনে মনে আরামের নিশ্বাস ফেলিল। মা তাঁহার তীর্থস্থানে বিশ্বনাথের চরণে শান্তিতে থাকিবেন, অমিতার বিষাক্ত কথার খোঁচা হইতে সে-ও রক্ষা পাইবে।

মায়ের কাশী যাওয়ার ব্যবস্থা মলয় করিয়া দিল।

পৌত্রকে কোলে লইয়া তাহার মুখচুম্বন করিয়া তাহাকে চাকরের কোলে দিয়া, অমিতাকে বীণা বলিল—তাহ'লে আসি, বৌমা ?

কোন রকমে ব্যাপারের একটা প্রণাম করিয়া, অমিতা বলিল—আচ্ছা।

ট্রেণে উঠিয়া মলয়ের মাথার উপরে ডান হাতখানি রাখিয়া বীণা বলিল—আশীর্ব্বাদ করি, তুই সুখে থাক, বাবা! তোর মাকে যেন ভুলে যাস্‌নে—ম'রবার সময় যেন তোর মুখখানি দেখ্‌তে পাই!

গাড়ী ছাড়িয়া দিল। যতক্ষণ পুত্রকে দেখা যায়, বীণা চাহিয়া রহিল। মলয় দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেলে, তাঁহার দুই চোখের অশ্রুবাষ্পে সম্মুখের সব ঝাপ্‌সা হইয়া গেল।

শ্রীমতী প্রফুল্লময়ী দেবী।

শরণ্যের প্রতি

হে দেবতা, জানি অমোঘ নিয়মে
　　শাসিত চালিত বিশ্বলোক,
ব্যত্যয় তার কখনও হবে না
　　বৃথা আবেদন বৃথাই শোক।

আমি তুমি দোঁহে সমান শাসিত
　　সেই অন্যায় শাসন-বলে,
সমান অধীন মহারুদ্রের
　　সৃষ্টি-প্রলয়-চক্র-তলে।

তবু মূঢ় মন বুঝে না কখনো
　　বিপদে তোমারি শরণ যাচে,
যবে ভূকম্পে বাড়ী টলমল
　　শিশু ছুটে যথা মায়ের কাছে।

মনে পড়ে সেই কাদম্বরীর
　　শুক-শিশু যথা যাইল ছুটে,
ব্যাধেদের ভয়ে গলিত-পক্ষ
　　জীর্ণ পিতার পক্ষপুটে।

মন্বন্তরে তুমি আমি দুই-ই
　　ডুবে যাই ঘোর ধ্বংস-কূপে,
তুমি ত অমর ফিরে আস তাই
　　আবার বিশ্বে নবীনরূপে।

আমিও মরি না ফিরে এসে পুনঃ
　　দুর্দ্দিনে ডাকি—'বাঁচাও স্বামী',
যুগে যুগে এই চলে অভিনয়
　　তুমি ত্রাতা সাজো প্রার্থী আমি।

কতবার তুমি ডাকিয়া বলেছ
　　"মোর কাছে যাচ শরণ বৃথা—
আমি ত্রাতা নই, দাতা হ'তে পারি
　　সম দুঃখভাগী তোমার মিতা।"

সেই হও তুমি, জানি অশক্ত
　　নিরুপায় তুমি আমারি মত,
জলে ডুবে যে, সে ঢেউ চেপে ধরে
　　ভেলা বলি', সে-ত বিচার-হত।

ত্রাণ নাহি পাই প্রাণ নাহি পাই,
　　মিতা, আমি তব লভি প্রভাব,
দরদী হিয়ার সান্ত্বনা পাই;
　　এ মর-জীবনে তাহাই লাভ।

শ্রীকালিদাস রায়।

নূতন ফসল—কীটনাশক উদ্ভিদ

বর্ত্তমান সময়ে সাধারণ কৃষিকার্য্যে আর আশানুরূপ আয় হয় না। অনেক স্থলে সমস্ত বৎসর কঠিন পরিশ্রম করিয়াও কৃষক তাহার অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিতে পারে না। শিক্ষিত ভদ্রসন্তানগণ এখন কৃষিকার্য্য করিতে ইচ্ছুক। কিন্তু তাঁহারা অবস্থা দেখিয়া বিশেষ উৎসাহ অনুভব করেন না। আমাদিগের দেশে যে নূতন করিয়া ফসল পরিকল্পনা করা একান্ত আবশ্যক, তাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করেন। প্রচলিত সাধারণ ফসলাদি ব্যতীত নূতন নূতন ফসলের চাষ বাঙ্গালায় প্রবর্ত্তিত হওয়া উচিত। এই জন্য ব্যবসায়ে লাভযোগ্য কতকগুলি নূতন ফসলের চাষ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি। সম্প্রতি কীট নামক ফসল ব্যবসায়িকজগতে বিশেষ প্রাধান্যলাভ করায় অনেক দেশেই এরূপ ফসল উৎপাদনের চেষ্টা হইতেছে এবং বাঙ্গালায় তদ্রূপ চেষ্টা করিলে সাফল্য সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ নাই।

কীটরোগ প্রতীকারের উপায়

'মাসিক বসুমতী' ১৩৪৫, চৈত্র সংখ্যায় "মানবের মিত্র-কীট" প্রবন্ধে কীটের সাহায্যে শিল্পোন্নতির বিষয় আলোচিত হইয়াছে। এবার কীটের অনিষ্টকারী শক্তি-প্রতিবিধানের কথা বলিতেছি—

কীটকুল দ্বারা মানব সমাজের যে কি অপরিসীম অনিষ্ট সাধিত হয়, তাহা সকলে ইয়ত্তা করিতে পারেন না। কৃষি ও অরণ্যজাত ফসল নষ্ট করা ব্যতীত অন্যান্য বহুবিধ উপায়ে কীট মনুষ্যের সবিশেষ ক্ষতি করিয়া থাকে। মানব ও গৃহপালিত পশুপক্ষীর ব্যাধি ও তজ্জনিত মৃত্যুর জন্যও কীট-বংশ দায়ী। কীট দমনের প্রয়াস মানব চিরকালই করিয়া আসিতেছে। কিন্তু পূর্ব্বে কীটবিষয়ক জ্ঞান খুবই সীমাবদ্ধ ছিল বলিয়া কীটজনিত ক্ষতি প্রতীকারের উপায়ও সম্যক্‌রূপে উদ্ভাবিত হইতে পারে নাই। এখন কীট-শাস্ত্রের প্রভূত উন্নতির সহিত কীট-নাশের ও বিতাড়নের নানাবিধ পন্থা অবলম্বিত হইতেছে। এগুলিকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়; প্রথম জৈব উপায় (Biological method) কোন অনিষ্টকর কীট নিরাকরণের জন্য তাহার স্বাভাবিক কীট-শত্রুকে নিয়োজিত করা। দ্বিতীয় উপায়—বিশেষ বিশেষ ঔষধ প্রয়োগ। ঔষধগুলি রাসায়নিক কিম্বা উদ্ভিজ্জ পদার্থ। কীটের দেহে এই সকল ঔষধসংস্পর্শে তাহার মৃত্যু হয়, বা তাহাকে স্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য করে। আর্সেনিক, ক্লোরিণ, কার্ব্বলিক ও হাইড্রোসায়েনিক এসিড, নাইট্রো বেনজিন প্রভৃতি কীটনাশক ঔষধসমূহের মধ্যে প্রসিদ্ধ। ইহাদের ক্রিয়া ক্ষিপ্র, কিন্তু মূল্য অপেক্ষাকৃত অধিক এবং ব্যবহারেও মানুষ ও গৃহপালিত পশ্বাদির পক্ষে বিপদের সম্ভাবনা আছে। পক্ষান্তরে উদ্ভিজ্জ ঔষধের মূল্য কম, ব্যবহার আশঙ্কারহিত এবং প্রয়োগও সহজসাধ্য; এই জন্য বর্ত্তমান সময়ে সভ্যজগতে উদ্ভিজ্জ কীটনাশকের (Insecticidos) প্রচলন সমধিক।

কীটনাশক লতা-গুল্মাদি

আমাদিগের দেশে এখন কীট-পতঙ্গ বিনাশের জন্য বিশেষ করিয়া সাধারণতঃ কোন উদ্ভিদ ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু ভারতের অতুলনীয় উদ্ভিদ-সমষ্টির মধ্যে এরূপ অনেক গাছ থাকা খুবই সম্ভব। পুকুরে কোন কোন কাটা গাছ ফেলিয়া দিলে যেমন পুকুরের সমস্ত মাছ মরিয়া ভাসিয়া উঠে, সেই ভাবেই উদ্ভিজ্জ দ্বারা কীটনাশ সম্ভব। কিন্তু ভারতীয় কীটনাশক উদ্ভিদাদি সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কোন উল্লেখযোগ্য অনুসন্ধান হয় নাই। এ উদ্দেশ্যে প্রযোজ্য দুই চারিটি গাছের নাম মাত্র জানা আছে। তন্মধ্যে বঙ্গদেশে নিম্নলিখিতগুলি সুলভ—(১) ডহর করঞ্জা বীজ ও মূল—(Pongamia glabra ; (২) বননীল পাতা (Tephrosia

candida) এবং (৬) খারিণামূল (Milletia pachy carpa)।

আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে যে দুইটি উদ্ভিদের বিষয় বিশেষ করিয়া আলোচনা করিতেছি, সে দুইটি কিন্তু ভারতের আদিম অধিবাসী নহে। একটির নাম Insect flower বা কীট-পুষ্প (Chrysanthemum Cineraraefolium) এবং অন্যটির নাম Derris (মালয়ের ভাষায় নাম—টিউবা) নিয়ে এই দুইটি গাছের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও চাষ-প্রণালী দেওয়া হইতেছে।

কীট-পুষ্প

কীটপুষ্প Chrysanthemum বা Pyrethrum জাতীয়। এই জাতীয় গাছের মধ্যে চন্দ্রমল্লিকা ফুল আমাদিগের নিকট সুপরিচিত। উত্তরবঙ্গে গুল দাউদী (C. coronarium) নামক এই শ্রেণীর একটি ফসলের বিভিন্ন স্থানে চাষ হইতে দেখা যায়। কীটপুষ্পের চাষ প্রথমতঃ উত্তর-পারস্যে আরম্ভ হয়, পরে উহা ককেসস্ পর্ব্বত পর্য্যন্ত বিস্তারলাভ করে। তৎপরবর্ত্তী সময়ে ডালমেসিয়ার উপকূল অঞ্চলে Cineraraefolium জাতি আবিষ্কৃত হয়। কীটনাশক গুণে উহা আদিম পারসিক জাতি (C. rosea) অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর বলিয়া ইহারই চাষ আজকাল সর্ব্বত্র চলিতেছে।

কীট-পুষ্প

বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে কীট-পুষ্প ব্যবসায়-জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে থাকে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে ইহার চাষ জাপানে প্রবর্ত্তিত হয়। ব্যবসায়ের নানা ক্ষেত্রে নবীন জাপান যে অতুলনীয় কর্ম্মদক্ষতা দেখাইয়াছে, কীটপুষ্প উৎপাদনেও সে নৈপুণ্যের পূর্ণ পরিচয় দিয়াছে। বিগত ২৫ বৎসরের মধ্যে জগতের কীটপুষ্প উৎপাদকগণের মধ্যে জাপান শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। এখন সেখানে প্রায় ৭০ হাজার একর পরিমিত জমিতে বৎসরে কিঞ্চিন্ন্যূন ১০ হাজার টন কীটপুষ্প উৎপাদিত হইতেছে। কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে আফ্রিকার কেনিয়া অঞ্চলেও কীটপুষ্প চাষ আরম্ভ হইয়া সে দেশের অভাব পূরণের পর বৎসরে ১ লক্ষ পাউণ্ড কীটপুষ্প বিদেশে চালান দেওয়া সম্ভব হইতেছে। কেনিয়ায় যে ফুল জন্মিতেছে, তাহা অন্যান্য দেশজাত ফুল অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, ইংলণ্ডে উৎপাদিত প্রথম শ্রেণীর ফুলে মোট পাইরেথ্রিনের (Pyrethrin) পরিমাণ শতকরা ০·৪৪ হইতে ১·৫৮ ভাগ; কেনিয়ার ফুলে শতকরা ০·৭ হইতে ১·৩ ভাগ, পাইরেথ্রিন পাওয়া যায়; সুতরাং ইহা কেনিয়ার সাফল্যের পরিচায়ক। কেনিয়ার এই সাফল্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের প্রধান উদ্দেশ্য—উক্ত দেশের অনুরূপ জলবায়ু-মৃত্তিকার অভাব ভারতে নাই।

কলিকাতার উপকণ্ঠে আমরা উপর্য্যুপরি দুই বৎসর কীটপুষ্প উৎপাদন জন্য পরীক্ষা করিয়াছিলাম। অবশ্য কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানের জল-হাওয়া ও মাটী এই ফসল উৎপাদনের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী নয়। তথাপি পরীক্ষায় স্পষ্টই প্রতীয়মান হইয়াছিল যে, বিদেশীয় বীজ হইতে ইহার চাষ করা অসম্ভব নয়। বেলে, দোয়াস কিম্বা লাল কাঁকুরে মাটী (laterite) কীট-পুষ্পের পক্ষে সুযোগ্য মৃত্তিকা। ক্ষেত্রে যাহাতে জল দাঁড়াইতে না পারে, তাহা প্রথমেই দেখা দরকার; কারণ, আবদ্ধ জল থাকিলে ফসল রোগপ্রবণ হয় এবং ফুলের সংখ্যাও হ্রাস পায়। আচ্ছাদন-যুক্ত বীজ-ক্ষেত্রে বীজ ফেলিয়া চারা সুদৃঢ় অর্থাৎ প্রায় ছয় মাসের হইলে উহা তুলিয়া ক্ষেত্রে রোপণ করিতে পারা যায়। চারাগুলির মধ্যে ১৮ × ১৮ ইঞ্চ ব্যবধান থাকিবে। ১ বিঘা জমিতে ৫ হাজার ৫ শত হইতে ৬ হাজার চারা বসান যাইতে পারে। ক্ষেত্রে বসাইবার পর নিড়ানি ব্যতীত আর কোন বিশেষ পাট নাই; কীটপুষ্প কতক পরিমাণে অনাবৃষ্টিসহ। কলম হইতেও কীটপুষ্পের চাষ হইয়া থাকে, কিন্তু কলমের গাছ এক বৎসরের অধিক স্থায়ী হয় না। পক্ষান্তরে বীজের চারা হইতে ফুল তুলিয়া লইবার পর গোড়া পর্য্যন্ত ছাঁটিয়া দিলে আবার উহা হইতে নূতন শাখা-প্রশাখা বাহির হইয়া সময়ে ফুল প্রদান করে। এইরূপভাবে একই ক্ষেত্র হইতে ৮।১০ বৎসর ফসল পাওয়া যায়; কিন্তু শেষের দিকের ফুলগুলি তৎপূর্ব্ব বৎসরের ফুল অপেক্ষা নিকৃষ্ট হয়।

ফুল ফুটিতে আরম্ভ করিলেই তুলিতে হয়। স্থানীয় জল-বায়ুর প্রভাবেই ফুলের সংখ্যা ও শক্তি বৃদ্ধি হয়। এক বিঘা জমিতে প্রায় ২ মণ শুষ্ক ফুল পাওয়া যায়। ফুল তুলিয়া সঙ্গে সঙ্গে উত্তমরূপে শুষ্ক করিবার ব্যবস্থা করা উচিত। যদি ফুল সংগ্রহের সময় রৌদ্রে শুকাইবার অসুবিধা হয়, তাহা হইলে অবশ্য অগ্ন্যুত্তাপে কৃত্রিম উপায়ে শুষ্ক করিতে হয়; কিন্তু দৃষ্টি রাখা দরকার যে, তাপের মাত্রা ১৩০° ডিগ্রি ফারেণ-হিটের উর্দ্ধে না উঠিয়া যায়। কাঁচা ফুল শুকাইবার পর প্রায় তিন-চতুর্থাংশ কমিয়া যায়।

এখন জগতের বাজারে যে কীটপুষ্প আসে, তৎসমুদয় পারস্য, জাপান, যুগোশ্লাভিয়া, কেনিয়া প্রভৃতি দেশজাত। ভারতে স্থানে স্থানে এই ফসল প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু কুত্রাপি এখনও ব্যবসায়িক হিসাবে উৎপন্ন হইতেছে না। সম্প্রতি কাশ্মীরে বরামূলা, টাঙ্গামার্গ প্রভৃতি স্থানে ইহার চাষ আরম্ভ হইয়াছে এবং অনেকে মনে করেন যে, কাশ্মীরে ইহা প্রচুর পরিমাণে জন্মিবে।

টিউবা

টিউবা ডেরিস জাতীয় গাছ। মালয়দেশে ধীবরগণ এক জাতীয় ডেরিসকে টিউবা বলে (D. malaccensis) এবং উহা মৎস্য ধরার কার্য্যে ব্যবহার করে। টিউবা মূল কুটিয়া জলে প্রক্ষেপ করিলে কিছুকাল পরে মৎস্য সংজ্ঞাহীন হইয়া যায়, তখন উহাদিগকে ধরা সহজ হয়। টিউবা মূলের এই গুণই প্রথমে বৈজ্ঞানিকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দুই এক জাতীয় টিউবা অথবা ডেরিস উৎকৃষ্ট কীটনাশক বলিয়া অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে। মালয়ের অনেক স্থানে এখন টিউবা-বাগিচায় প্রধানতঃ **Derris elliptica** ও **D. malaccensis** জাতিদ্বয়ের চাষ হইয়া থাকে। জগতের বাজারে যে টিউবা মূল আসে, তাহার অধিকাংশই **Federated Malaya States**-জাত।

ভারতে ডেরিসের কতিপয় জাতি দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাদের কীটনাশক গুণ সম্বন্ধে এখন পর্য্যন্ত বিশেষ অনুসন্ধান হয় নাই। সুন্দরবনে এক জাতীয় ডেরিস জন্মিয়া থাকে, উহা 'মহাজনী লতা (D. uliginosa) নামে পরিচিত। পূর্ব্বোক্ত D. elliptica জাতি আসাম ও ব্রহ্মদেশের স্থানে স্থানে জন্মাইতে দেখা গিয়াছে। সম্প্রতি আসামের সরকারী বনবিভাগ নওগাঁও জিলায় সুলভ **D. ferruginea** জাতি লইয়া পরীক্ষামূলক চাষ আরম্ভ করিয়াছেন। উহার ফলাফল এ পর্য্যন্ত যতদূর প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে পরীক্ষা সাফল্যমণ্ডিত হইবে বলিয়াই আশা করা যায়।

ডেরিস মূলের রস (resin) সদৃশ পদার্থ কীটনাশের উপাদান। এই রঞ্জনের প্রধান উপাদান রটেনোণ (Rotenone) এবং ইহারই মাত্রার উপর ডেরিস মূলের উৎকর্ষতা বা অপকর্ষতা মুখ্যতঃ নির্ভর করে। আবার স্থান ও জল-বায়ুর পার্থক্যে টিউবা-মূলে রটেনোণ মাত্রার যথেষ্ট তারতম্য হইয়া থাকে। মালয়জাত টিউবায় ইহার মাত্রা শতকরা ১৫ হইতে ২৫ ভাগ। এস্থলে বলা আবশ্যক যে, রটেনোণ পূর্ব্বোক্ত রঞ্জনের প্রধান উপাদান হইলেও ইহার সহিত আরও ২।৩টি উপাদান আছে এবং সেগুলিও অল্প-বিস্তর কীটনাশক গুণযুক্ত। এই সকল উপাদান ইথারে দ্রবণীয়। সেই জন্য টিউবা-মূলের মোট ইথারে দ্রবণীয় অংশের উপরেও উহার গুণাগুণ নির্ভর করে।

পুষ্পিত ডেরিস শাখা

ডেরিস অল্প-বিস্তররূপে লতানিয়া গাছ, অন্ততঃ ইহার কাণ্ড ঋজু ও দৃঢ় হয় না। ভারতে অনেক স্থলেই ডেরিস জন্মাইতে পারা যায়। মহীশূর ও ত্রিবাঙ্কুরে ইহার চাষ আরম্ভ হইয়াছে। উৎপাদিত মূলের গুণও নিতান্ত কম নয়। এই সকল স্থানের মূলে শতকরা ৮ হইতে ১২ ভাগ রটেনোণ এবং ২৫ হইতে ৩০ ভাগ মোট ইথার-দ্রবণীয় অংশ পাওয়া গিয়াছে। বঙ্গ ও আসামে ডেরিস সহজেই উৎপাদন করিতে পারা যায়। অন্যান্য প্রধান ফসলের জমি বাদ দিয়া অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট জমিতেও ডেরিস চাষ চলিতে পারে। ডেরিসের মূলই ব্যবহারিক অংশ। ডেরিস চাষের জন্য আল্‌গা ও মূল বৃদ্ধির সহায়তা করে এরূপ মৃত্তিকা নির্দ্ধারণ করা দরকার। বেলে, দোয়াঁশ মাটী, নদীর চড়া প্রভৃতি ডেরিস চাষের

উপযুক্ত স্থান। প্রথমে লতা হইতে ৯—১২ ইঞ্চি পরিমিত ও ২।১টি গাঁটযুক্ত অংশ কাটিয়া লইয়া পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুতীকৃত চারার ক্ষেত্রে পুঁতিয়া রাখিতে হয়। কিছু দিনের মধ্যে গাঁট হইতে শিকড় বাহির হয় এবং তখন ঐ সমুদয় চারা ক্ষেত্রে বসাইতে পারা যায়। ক্ষেতে রোপণের সময় চারাগুলির মধ্যে ৩×৩ ফুট ব্যবধান থাকা দরকার। চারা তুলিয়া বসাইবার পর একবার জল-সেচন করিয়া দিলে উহারা ঠিক লাগিয়া যায় এবং পরে মাঝে মাঝে নিড়ানি ব্যতীত আর কোন পাট আবশ্যক হয় না।

গাছ মূলসংগ্রহের উপযুক্ত হইতে এক হইতে দেড় বৎসর সময় লাগে। ফসল তুলিবার পূর্ব্বে ১।৪টি গাছের মূল পরীক্ষা করিয়া দেখাই সমীচীন প্রথা। আগে কাণ্ডাংশ কাটিয়া ফেলিয়া পরে ক্ষেত্রে লাঙ্গল দিয়া অথবা মাটী কোপাইয়া সমস্ত মূল তুলিয়া ফেলিতে হয়। ডেরিস চাষের অন্য একটি প্রথা আছে; উহাতে সমস্ত মূল তোলা হয় না। আদি মূল (top-root) বাদ দিয়া কেবলমাত্র পার্শ্বস্থ শিকড়ই উঠাইয়া লওয়া হয় এবং উপরের কঠিন কাণ্ড ছাঁটিয়া দিয়া ১০৪টি শাখা বাড়িয়া লইয়া উহাদিগকে নোয়াইয়া মাটী চাপা দেওয়া হয়। পরে ঐ সমুদয় শাখায় শিকড় জন্মিয়া আবার নূতন গাছ হয়। জমি উপযুক্ত হইলে বিঘা প্রতি ৩ হইতে সাড়ে ৪ মণ মূল পাওয়া যাইতে পারে।

কীটনাশকরূপে প্রয়োগ

কীটপুষ্প ও ডেরিস মূল উভয়কেই শুষ্ক করিয়া বাজারে বিক্রয় করা হয়। কীট বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে ইহাদিগের ২।৩ প্রকার প্রয়োগ-বিধি প্রচলিত হইয়াছে। চূর্ণই তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ। বাজারে মশা, মাছি প্রভৃতি মারার যে নানা প্রকার পেটেণ্ট ঔষধ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের প্রায় সকলেরই উপাদানের মধ্যে এই দুইটি কীটনাশকের একটি বা অপরটি রহিয়াছে। চূর্ণ ব্যতীত ইহাদিগের তরলসারও প্রস্তুত হইয়া বিক্রয় হইতেছে। এরূপ সারপ্রস্তুতের জন্য সাধারণ কিম্বা গন্ধহীন কেরোসিন তৈলই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সহজ উপায়ে কীটনাশক সার তৈয়ারী করিতে হইলে কীটপুষ্প বা ডেরিস মূল উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া ২।৩ দিন কেরোসিন তৈলে ভিজাইয়া রাখা দরকার। তৎপরে উহা ছাঁকিয়া সার বাহির করিয়া লওয়া হয়। অবশ্য বড় বড় কারখানায় কীটনাশক সার-প্রস্তুতে অভিনব প্রণালী—বৈদ্যুতিক যন্ত্র প্রযুক্ত হয়।

এই দুইটি কীটনাশক উদ্ভিদের ব্যবসায়িক প্রাধান্যে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, পৃথিবীর বাজারে বৎসরে প্রায় পাঁচ কোটি পাউণ্ড কীটপুষ্প বিক্রয় হয়; ডেরিস মূলের চাহিদাও তদপেক্ষা কম নহে। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে এক মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রই ২ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা মূল্যের কীটপুষ্প ও ৩ লক্ষ টাকা মূল্যের ডেরিস-মূল আমদানী করিয়াছিল। অন্য সকল সভ্য দেশেও এই দুইটি কীটনাশক উদ্ভিদের প্রচলন ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। জাপান যেরূপ উদ্যম ও অধ্যবসায়ের ফলে কীটনাশক পুষ্পের ব্যবসায়ে প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছে, ভারতের পক্ষে তাহা অনুকরণযোগ্য। আমাদিগের ধনী ও ভূস্বামিবর্গ যদি এই দিকে মনোযোগ দেন, তাহা হইলে এই দরিদ্র দেশেও ধনাগমের একটি নূতন পথ প্রস্তুত হইতে পারে।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত।

এপার-ওপার

ওপারের পানে চাহি, কহিছে এপার,
"চিরকাল হয়ে আছ, রহস্য অপার!
তোমারে দেখিতে মোর, কৌতূহল জাগে,
দেখিতে নারিনু তোমা, বড় দুঃখ লাগে।
স্বপ্ন-মাখা রূপকথা, কত মনে করি,
নিরাশ হইনু ভাই, দেখিতে না পারি।"

ওপার কহিছে, "ভাই, যা কহিলে কথা,
আমারও যে মনে জাগে, সেইরূপ ব্যথা।
তুমিও আমার কাছে স্বপন কেবল,
অ-দেখারে দেখিতেই জাগে কৌতূহল।"

শ্রীবিনয়ভূষণ সেনগুপ্ত।

নক্ষত্র-জগৎ

এখন জানিতে পারা গিয়াছে যে, সূর্য্য একটি অতি সাধারণ রকমের নক্ষত্র। এই তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে কিন্তু মানুষের কম সময় লাগে নাই। ইহাতে বিস্ময়ের অবকাশ নাই। কারণ, অপর নক্ষত্রের তুলনায় সূর্য্য আমাদের এত কাছে আছে যে, উভয়ের মধ্যে বিশেষ সাদৃশ্য আমাদের চোখে ধরা পড়ে না।

প্রাচীন যুগের লোক পৃথিবীকে বিশ্বের স্থায়ী কেন্দ্র বলিয়া ভাবিত এবং সেই পৃথিবীর চারিদিকে অন্য যাহা কিছু সকলই ঘুরিতেছে বলিয়া মনে করিত। আলোকবিন্দু-রূপ নক্ষত্রের ভূমিকা-পটে সূর্য্য, চন্দ্র এবং গ্রহগণের গতি সেই যুগে মাপ করা হইত। প্রাচীনগণ ভাবিতেন, দ্যুগোলকের ভিতর পৃষ্ঠে তারকারাজি দৃঢ়ভাবে বদ্ধ হইয়া আছে এবং আমরা যেমন মানমন্দিরের গম্বুজকে নিম্নের জমির উপর ঘুরিতে দেখি, সেই ভাবে উহা পৃথিবীর উপরিভাগে থাকিয়া আবর্ত্তিত হইতেছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দুই এক জন মনীষী এই কথা প্রচার করিয়াছিলেন যে, আকাশ স্থির হইয়া আছে, উহার বাহ্য আবর্ত্তন পৃথিবীর নিজের গতির জন্য ঘটে। মধ্যযুগের অন্ধকারে তাঁহাদিগের মত চাপা পড়িয়া যায়। কোপার্নিকাস্ সূর্য্য-কেন্দ্রীয় মত প্রকাশ করার পরও বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানবিদ্ টাইকো ব্রাহী উহার বিপক্ষে প্রাচীন আপত্তি উত্থাপন করেন। আঠার শত বৎসর পূর্ব্বে আর্কিমেডিজ এরিস্টার্কাসের ভূভ্রমবাদ খণ্ডন করিবার উদ্দেশ্যে অনুরূপ যুক্তি দেখাইয়াছিলেন। যুক্তিটি এইরূপ :—

পৃথিবী শূন্যপথে ভ্রমণ করিতেছে, ইহা যদি সত্য হয়, তবে আকাশমার্গে নক্ষত্রসকলের বিন্যাস আমাদের চোখে কেবলই পরিবর্ত্তিত হইতে থাকিবে। উদ্যানের ভিতর ভ্রমণ করিবার সময় আমরা যেমন বৃক্ষাবলীর অবস্থানের অবিরাম পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করি, উক্ত পরিবর্ত্তন সেই প্রকার হইবে। দেখা যাইবে, একটি আর একটির পশ্চাতে একবার সরিয়া গেল, নূতন একটি কোন সময়ে বা দৃষ্টিপথে উদিত হইল, ইত্যাদি রূপ ঘটিতেছে। যেহেতু, তারকাবলীর সেরূপ কোন আপাত-পরিবর্ত্তন আকাশে পরিলক্ষিত হয় না, সুতরাং ধরিয়া লইতে হইবে, পৃথিবী ভ্রাম্যমান্ নহে। যুক্তিটি নির্ভুল। ভ্রম ঘটিয়াছে শুধু পর্য্যবেক্ষণের অসম্পূর্ণতায়। কাননচারী মানুষ যে পরিবর্ত্তন দেখিতে পায়, গোলাপ-কলিকার মধ্যে যে মক্ষিকা সঞ্চরণ করে, বাসস্থানের ক্ষুদ্রতার জন্য তাহা উহার দৃষ্টির বাহিরে থাকিবে। বিশ্বের উদ্যানে আমাদের পার্থিব জগৎ ক্ষুদ্রতম গোলাপ-কলিকা অপেক্ষাও ক্ষুদ্র। এরিস্টার্কাস সত্যই বলিয়াছিলেন, একটি গোলকের মধ্যে তাহার কেন্দ্র যে স্থান অধিকার করে, সূর্য্যের চারিদিকে পৃথিবীর কক্ষ ততটুকু স্থান জুড়িয়া আছে। খালি দৃষ্টিতে যাহা ধরা পড়ে নাই, বিজ্ঞান-যুগে শক্তিশালী দূরবীক্ষণের মধ্য দিয়া তাহা আবিষ্কার করা সম্ভবপর হইয়াছে। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম নক্ষত্রের আপাতগতি এবং সেই সঙ্গে উহার দূরত্ব নির্ণয় করা যায়। বর্ত্তমানে বৈজ্ঞানিক গণনায় নির্দ্দিষ্টভাবে স্থির হইয়াছে যে, সর্ব্বাপেক্ষা কাছের নক্ষত্র নিকটতম গ্রহ অপেক্ষা প্রায় দশ লক্ষ গুণ দূরে আছে। সৌরজগতের মধ্যে গ্রহগণ অতি দূরে দূরে ছড়াইয়া আছে। বিশ্বব্যাপী শূন্যস্থানের মধ্যে নক্ষত্রগণের পরস্পরের মধ্যকার দূরত্ব সেই তুলনায় আরও অনেক বেশী। পৃথিবীর পাঁচটি মহাদেশে যদি পাঁচটি ছোট ফল

ছড়াইয়া দেওয়া যায়—একটি এসিয়ায়, একটি য়ুরোপে, অপরটি আমেরিকায় এই ভাবে—এবং এক একটি ফলকে একটি করিয়া নক্ষত্র বলিয়া ধরা হয়, তবে নক্ষত্র-মধ্যবর্তী স্থানের দূরত্ব মহাদেশগুলির দূরত্বের সমান হইবে। উল্লিখিত দৃষ্টান্ত হইতে স্পষ্ট ধারণা করা যাইবে, আকাশে নক্ষত্র সকল কি হেতু আলোক-বিন্দুরূপে প্রতীয়মান হয় এবং সূর্য্যের ন্যায় কোন নক্ষত্রের গ্রহ থাকিলে কেনই বা তাহাকে নক্ষত্রদেহ হইতে পৃথক করা যায় না। এক একটি নক্ষত্র, এক একটি সূর্য্য, কেবল দূরে আছে বলিয়া ক্ষীণ-জ্যোতিঃ—কেপ্‌লার এ কথা জানিতেন। নক্ষত্রের আলোকই আবার গ্রহ-জগতের ক্ষীণতর আলোককে চাপা দিয়া থাকে। হাজার মাইল লম্বা, হাজার মাইল চওড়া এবং হাজার মাইল উচ্চ একটি খাঁচার মধ্যে পাঁচটি বোল্‌তা ছাড়িয়া দিয়া তাহাদের প্রত্যেকের বেগ শামুকের গতির শত ভাগের ভাগ করিয়া দিতে পারিলে, সুবিস্তৃত শূন্যে নক্ষত্রের গতিবেগ কিরূপ, তাহার আভাস মিলিতে পারে। দূরত্বের অনুপাতে বেগ অত্যন্ত কম হওয়ায়, সংঘাত তো দূরের কথা, একটি নক্ষত্রের পক্ষে অপর এক নক্ষত্রের নিকটবর্ত্তী হইয়া পড়িবার সম্ভাবনাও যে অল্প, সে কথা সহজেই অনুমেয়। কাছাকাছি স্থানে আকর্ষণ-বশে নক্ষত্রদেহ ছিন্ন না হইলে গ্রহের জন্ম হয় না। কাজেই আমাদের সূর্য্য-তারকাটির ন্যায় বিশ্বের কম নক্ষত্রের ভাগ্যে এ পর্য্যন্ত গ্রহের সম্পদ লাভ হইয়াছে।

আকাশের সকল নক্ষত্র আমরা সমান উজ্জ্বল দেখি না। কারণ, সত্যই উহাদের মধ্যে স্বাভাবিক (intrinsic) ঔজ্জ্বল্যের পার্থক্য আছে। দ্বিতীয় কারণ, সকল নক্ষত্র সমান দূরে অবস্থিত নহে। বলাই বাহুল্য, আমাদের অত্যুজ্জ্বল সূর্য্য দূরে সরিয়া গেলে নক্ষত্রের ন্যায় ক্ষীণ আলোক দিবে এবং দূরের নক্ষত্র কাছে আসিলে সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল দেখাইবে। অনেক নক্ষত্র প্রকৃতই সূর্য্যের অপেক্ষা উজ্জ্বল। লুব্ধক (Sirius) নামক জ্বলজ্বলে তারকাটির উজ্জ্বলতা সূর্য্যের ২৭ গুণ। সাধারণ ভাবে এই কথা বলা যায় যে, আকাশের সমস্ত ভাস্বর নক্ষত্রই স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্যে সূর্য্যকে ছাড়াইয়া যায়। খালি চোখে রাত্রিকালে আমরা যে সকল নক্ষত্র দেখি, তাহাদের সংখ্যা খুব যে বেশী, তাহা নহে। বলা হয় বটে—'অগণিত তারা নিবিড় নিশায়', কিন্তু গণনা করিলে দেখা যায়, ঐ সংখ্যা মাত্র দুই হাজার। শুধু চোখে দেখিবার মত আকাশে মাত্র ৪৭২০টি নক্ষত্র আছে। আমরা এককালে অর্দ্ধেক আকাশ দেখিয়া থাকি। এক ইঞ্চি দূরবীক্ষণের মধ্য দিয়া ২ লক্ষ ২৫ হাজার নক্ষত্র দৃষ্টিগোচর হয়। মাউণ্ট উইলসন মানমন্দিরের শত ইঞ্চি দূরবীক্ষণে ১৫০ কোটি নক্ষত্র দৃষ্টি-পথে আসে। শেষোক্ত সংখ্যা আকাশের নক্ষত্র-সমষ্টির শতকরা একভাগ মাত্র। সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষীণ যে নক্ষত্রকে আমরা খালি চোখে দেখিতে পাই, তাহার উজ্জ্বল-তাকে 'একক' দ্বারা ব্যক্ত করা হয়। ছয় মাইল দূরে থাকিয়া একটি বাতি যে পরিমাণ আলোক দিতে পারে, উহা হইতে সেই পরিমাণ আলোক আসিয়া পৃথিবীতে পৌঁছে। লুব্ধকের দীপ্তিসংখ্যা—১০৮০। এই নক্ষত্রটি আমাদের নিকট সর্ব্বোজ্জ্বল বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সূর্য্যকে লুব্ধকের স্থানে রাখিলে উহার দীপ্তিসংখ্যা মাত্র ৪০ হইবে। পূর্ব্ববর্ণিত ৪৭২০টি নক্ষত্রের মধ্যে অনেক-গুলির ক্ষেত্রে আপাত ঔজ্জ্বল্য ইহার বেশী, কতকগুলির আবার কম। আকাশের অধিকাংশ নক্ষত্রের উজ্জ্বলতা একক অপেক্ষা কম বলিয়া (দূরবীক্ষণের সাহায্য না লইয়া ঐগুলি দেখা যায় না) নক্ষত্রজগৎ হইতে প্রাপ্ত আলোকের দীপ্ত্যঙ্ক একযোগে—এক লক্ষ অর্থাৎ একটি বাতি এক শত ফুট দূরে থাকিয়া যে পরিমাণ আলোক দিতে পারে, তাহার সমান। পূর্ণচন্দ্র ২ কোটি ২৬ লক্ষ দীপ্তি-সংখ্যার আলোকের অধিকারী। কাজেই বলা যায়, একশ্চন্দ্র-স্তমোহন্তি ইত্যাদি। বুধগ্রহের নিজের আলোক নাই। কাছে আছে বলিয়া সূর্য্য হইতে প্রাপ্ত আলোকেই উহার দীপ্ত্যঙ্ক ১৩ হাজার পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। অর্থাৎ লুব্ধক অপেক্ষা উহাকে ১২ গুণ বেশী উজ্জ্বলও দেখা যায়। গ্রহ-গণের উজ্জ্বলতায় পরিবর্ত্তন ঘটে। নক্ষত্রের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ সেরূপ দৃষ্ট হয় না। অপেক্ষাকৃত কাছে অবস্থিত থাকিয়াও যে সকল নক্ষত্র সাধারণ অবস্থায় আমাদের দৃষ্টির অগোচর থাকে, বুঝিতে হইবে, তাহাদের অন্তর্নিহিত উজ্জ্বলতা অতিরিক্ত মাত্রায় কম। প্রক্সিমা (Proxima) এইরূপ একটি নক্ষত্র। উহা আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা কাছে আছে। তবু উহার প্রকৃত ঔজ্জ্বল্য সূর্য্যের বিশ হাজার ভাগের ভাগ বলিয়া সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। সূর্য্যের স্থানে উহাকে রাখিলে পৃথিবী প্লুটো

গ্রহ অপেক্ষা অনেক বেশী হিম হইয়া যাইবে। অন্যদিকে এমন অসংখ্য তারকা আছে—যাহাদের অন্তরের উজ্জ্বলতা লুব্ধক অপেক্ষা বেশী, কেবল দূরে অবস্থিত বলিয়া ক্ষীণ জ্যোতিঃ হইয়াছে। যে নক্ষত্রটি (S. Doradus) আপন ঔজ্জ্বল্যে সকলকে অতিক্রম করিয়াছে, তাহা সূর্য্য অপেক্ষা ৩ লক্ষ গুণ বেশী রশ্মি বিকিরণ করে। উহা সূর্য্যের সহিত স্থান পরিবর্ত্তন করিলে আমাদিগকে মুহূর্ত্তে ভস্মীভূত করিয়া দিবে এবং সমুদ্র, পাহাড়, মাটী প্রভৃতি যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে, সকলই উহার তেজে অল্পকালের মধ্যে বাষ্পে পরিণত হইবে।

নক্ষত্রের মূল উজ্জ্বলতা এবং দূরত্বের উপর যে উহার আপাত (apparent) ঔজ্জ্বল্য (আমাদের নিকট উহা যেরূপ উজ্জ্বল বলিয়া প্রতীয়মান হয়) নির্ভর করে, তাহা দেখা গিয়াছে। উহার আকার এবং যে পরিমাণ রশ্মি উহার দেহের প্রতি বর্গ-ইঞ্চি স্থান হইতে বাহির হয়, তাহার উপর মূল উজ্জ্বলতা নির্ভর করে। লুব্ধক সূর্য্য অপেক্ষা ২৭ গুণ বেশী উজ্জ্বল, তাহার কারণ ইহাও হইবে যে, উহা সূর্য্য অপেক্ষা ২৭ গুণ বড়। কিন্তু উহার পৃষ্ঠদেশের প্রতি বর্গ-ইঞ্চি স্থান সূর্য্যের সমান আলোক দেয়, অথবা উহা আকারে সূর্য্যের সমান; কিন্তু প্রতি বর্গ-ইঞ্চি স্থান হইতে ২৭ গুণ বেশী রশ্মি বিকিরণ করে। আকার ও রশ্মি বিকিরণের অন্য প্রকার উপযুক্ত সংযোগ হইতেও ঐরূপ হওয়া সম্ভবপর। নক্ষত্রের স্পেক্ট্রাম বা রশ্মিলেখার পরীক্ষার দ্বারা উক্ত প্রকার সমস্যাসমূহের এখন সমাধান করা যায়। নক্ষত্রদেহের প্রতি বর্গ-ইঞ্চি স্থান কি পরিমাণ রশ্মি ছড়াইয়া দিতেছে, রশ্মিলেখায় তাহার পরিচয় মিলে। উহা হইতে আবার নক্ষত্রের আকারের হিসাব পাওয়া যায়। রশ্মিলেখার প্রকৃতি তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে। বিভিন্ন প্রকার তাপমাত্রায় ভিন্ন ভিন্ন প্রকার রশ্মিলেখার উদ্ভব হয়। সকল রশ্মিলেখাকেই একটি শ্রেণীতে সাজান চলে। এই শ্রেণীর এক দিক্ হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত তাপমাত্রায় ক্রম-পরিবর্ত্তনের ফল প্রসারিত থাকে। যদি আমরা কোন নক্ষত্রকে ক্রমাগত উত্তপ্ত করিয়া যাইতে পারিতাম, তবে দেখা যাইত, উহার রশ্মিলেখা স্তরে স্তরে অগ্রসর হইতেছে। প্রকৃতপক্ষে এক শ্রেণীর নক্ষত্র (variables) এই ভাবে আপনা আপনি পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। ঐ ক্রিয়া লক্ষ্য করিলে প্রকৃতির গবেষণাগারে রশ্মিলেখার ক্রম-পরিবর্ত্তন ধরা যায়। যেহেতু, উত্তাপবৃদ্ধির অনুপাতে বিকীর্ণ রশ্মির পরিমাণ বাড়িয়া থাকে এবং তাপমাত্রা সমান হইলে প্রতি বর্গ-ইঞ্চি স্থান হইতে সম পরিমাণ শক্তি নির্গত হয়, সেই কারণে আমরা দুইটি নক্ষত্রের একই প্রকার রশ্মিলেখা দেখিলে উভয়কে সমান উত্তপ্ত বলিয়া ধরিতে পারি এবং রশ্মিলেখা ভিন্নরূপে হইলে তাপমাত্রার বিভিন্নতার কথা বুঝি। রশ্মিলেখার লোহিতাংশে নীচের দিকে ১৪ শত ডিগ্রী পর্য্যন্ত তাপমাত্রার হিসাব মিলিয়া থাকে, সর্ব্বাপেক্ষা শীতল নক্ষত্রগুলি এইরূপ উত্তপ্ত। লোহাকে গরম করিয়া সহজেই এতদূর উত্তপ্ত করা যায়। অনেক শীতল নক্ষত্র চোখে লাল ঠেকে বলিয়া ঐগুলি প্রায়ই লোহিত নক্ষত্র (red stars) বলিয়া বর্ণিত হয়।

নীহারিকায় পরিবেষ্টিত একটি তারকাপুঞ্জ (The stars of the Pleiades)

সূর্য্যের ন্যায় রশ্মিলেখা মাঝামাঝি স্থানে পরিদৃষ্ট হয়। উহা ৫ হাজার ৬ শত ডিগ্রী তাপমাত্রার পরিচয় দেয়। এই তাপমাত্রায় প্রতি বর্গ-ইঞ্চি স্থান হইতে ৫০ অশ্বশক্তি নির্গত হয়। রশ্মিলেখার দূরপ্রান্ত ৬০।৭০ হাজার ডিগ্রী তাপমাত্রার পরিচায়ক। এই তাপমাত্রায় প্রতি বর্গ ইঞ্চি স্থান হইতে প্রায় লক্ষ অশ্বশক্তি নির্গত হইয়া থাকে। অর্থাৎ ঐ শক্তির দ্বারা আটলাণ্টিক মহাসাগরের সমস্ত জাহাজ চালান যায়। এইরূপ ক্ষেত্রে নক্ষত্রসমূহের শক্তির চাপে ঐ সমস্ত নক্ষত্র সুবৃহৎ বুদ্‌বুদের মত হইয়াছে। দুইটি ভিন্নপ্রকার নক্ষত্রকে (S Doradus & Proximus) সূর্য্যের জায়গায় বসাইলে যে বিপ্লব ঘটিবে, পূর্ব্বে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। 'অতিকায়' শ্রেণীর একটি নক্ষত্রকে সূর্য্যের স্থানে আনিলে ফল আরও ভীষণ হইবে। তখন পৃথিবী উহার গহ্বরে চলিয়া যাইবে। এই শ্রেণীর তারকা পৃথিবীর সমগ্র কক্ষ অপেক্ষা বৃহৎ। আকাশের বৃহত্তম নক্ষত্র—'এণ্টারিসের' ব্যাস সূর্য্যের ৪৫০ গুণ অর্থাৎ প্রায় ৪০ কোটি মাইল। ছয় কোটি সূর্য্য উহাতে বাস করিলেও জায়গা খালি থাকিবে। একটি রকেট ঘণ্টায় পাঁচ হাজার মাইল বেগে চলিয়া দুই দিনে চন্দ্রজগতে পৌঁছিতে পারে। সূর্য্যের এক দিক্ হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পৌঁছিতে উহার এক সপ্তাহ লাগিবে। উল্লিখিত অতিকায় নক্ষত্রের পৃষ্ঠদেশ অতিক্রম করিতে হইলে ঐ রকেটকে নয় বৎসর ধরিয়া চলিতে হইবে। জ্যোতির্বিজ্ঞানবিদ্‌গণ উহার ঠিকই বিশেষণ দিয়াছেন—'অতিকায়' (giant)।

একটি যুগ্ম নক্ষত্র (Kruger 60) (যথাক্রমে বাম হইতে দক্ষিণে) ১৯০৮, ১৯১৫ ও ১৯২০ খৃষ্টাব্দে গৃহীত ফটোগ্রাফ
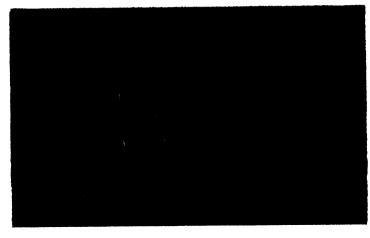
আকাশের এক ক্ষুদ্র অংশে নবম স্তরের (minth magnitude) বেশী উজ্জ্বল একটি নক্ষত্র মাত্র দেখা যাইতেছে (রেখা চারিটির মধ্যস্থলে)

আকাশের সমুদয় নক্ষত্রকে এক সারিতে আকারের ক্রমে সাজাইলে দেখা যাইবে, উহারা বর্ণের ক্রমেও আপনা হইতে সজ্জিত হইয়া গিয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ শ্রেণীর তারকার বর্ণ লোহিত। অপেক্ষাকৃত ছোটগুলির বর্ণে রক্তিমভাব কমিয়া গিয়াছে। যেগুলি সূর্য্যাপেক্ষা আকারে দশ হইতে কুড়ি গুণ বড়, তাহাদের ক্ষেত্রে নীল বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে। এই অতিতপ্ত নীল নক্ষত্রগুলির কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। পরে কিন্তু বর্ণ ফিরিয়া আবার লোহিতের দিকে গিয়াছে। 'খর্ব্বকায়' নক্ষত্রগুলি (dwarfs) লালবর্ণ। তিন শ্রেণীর নক্ষত্র এখানে লক্ষ্য করা গেল; অতিকায় নক্ষত্র—রক্তবর্ণ ও শীতল; মধ্যম আকৃতির নক্ষত্র—নীল এবং উত্তপ্ত; ক্ষুদ্রকায় নক্ষত্র—রক্তবর্ণ ও শীতল। আকৃতির ক্ষুদ্রতা এখানেই শেষ সীমায় পৌঁছে নাই। 'খর্ব্বকায়' লোহিত নক্ষত্রের মধ্যে যেগুলি সর্ব্বাপেক্ষা ছোট, সেগুলি শনি ও বৃহস্পতির আকারের। আকারে পৃথিবীর

রশ্মিলেখা বেগুনী অংশে থাকে বলিয়া উহাদের সাধারণ নাম নীল নক্ষত্র (blue stars)। রশ্মিলেখার চিত্রে জানা যাইতেছে, দূর সান্ধ্য-গগনের "নীল উজল তারাটি"র আসল রূপ মোটেই কাহারও বিরহিণী প্রিয়ার সদৃশ নহে। এই তারাটির স্নিগ্ধ-মধুর রূপে আমরা মুগ্ধ হই, কিন্তু তাহার অন্তরের জ্বালায় জগতের লোক নিমেষে দগ্ধ হইতে পারে। এমনই তাহার উত্তাপ।

আকারের হিসাব করিলে জানা যায়, যে সকল নক্ষত্র রক্তবর্ণ ও শীতল, সেইগুলি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। বিকীর্ণ

মত হইবে, এরূপ "খর্ব্বকায় শ্বেত নক্ষত্রও" (white dwarfs) আকাশে বিরাজ করে। উহাদের রশ্মিলেখায় দশ হাজার ডিগ্রী এবং তাহারও বেশী তাপমাত্রার পরিচয় মিলিয়া থাকে। বেশী উত্তপ্ত হইলেও ঐগুলি ছোট বলিয়া এমন ক্ষীণ-জ্যোতি যে, এ পর্য্যন্ত গুটিকয়েকের বেশী আবিষ্কৃত হয় নাই।

তাপমাত্রা ও আকারের ন্যায় নক্ষত্রের ভারও (mars) নির্ণয় করা যায়। পৃথিবীতে বস্তুর পরিমাণ ঠিক করিতে হইলে আমরা যেমন ওজন করি অর্থাৎ পৃথিবী ও দ্রব্য-বিশেষের মধ্যে যে আকর্ষণ আছে, তাহা নিরূপণ করি, একটি নক্ষত্রের মধ্যে কি পরিমাণ বস্তু আছে, তাহা নির্ণয় করিবার কাযেও সেই প্রকার উপায় অবলম্বন করা হয়। বেশীর ভাগ নক্ষত্র শূন্য-মার্গে একা একা চলিয়া থাকে। মাঝে মাঝে দুইটি একসঙ্গে জোট বাঁধিয়া শূন্যে পরিভ্রমণ করে। এইরূপ 'যুগ্ম' নক্ষত্রগণ (double star) পরস্পরকে যেরূপ আকর্ষণে আবদ্ধ রাখে, তাহা খুব প্রবল হওয়ায় একে অপরের কাছ-ছাড়া হইতে পারে না। যুগ্ম শ্রেণীয় (binary system) যুগল নক্ষত্র পরস্পরকে প্রদক্ষিণ করে এবং সেইরূপ ভাবে আপনাদের দেহ-ভার নির্ণয় করিবার সুবিধা যোগাইয়া দেয়। সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যে ভারের যে প্রকার বৈষম্য আছে, (সূর্য্য পৃথিবী অপেক্ষা ৩ লক্ষ ৩২ হাজার গুণ ভারী) যুগ্ম নক্ষত্রদিগের ক্ষেত্রে ততদূর পার্থক্য দেখা যায় না। নক্ষত্রযুগলের একটি অপরটির উপর কিরূপ শক্তি প্রয়োগ করিতেছে, তাহা লক্ষ্য করিয়া উভয়ের ভারের তুলনা করা চলে। কক্ষ (orbit) পরিমাপ করিতে পারিলে পৃথক্‌ভাবে প্রত্যেকের ওজন নিরূপণ করা যায়। উল্লিখিত শ্রেণীর দুই দুইটি নক্ষত্র কখন কখন আকারে, বর্ণে ও ঔজ্জ্বল্যে প্রায় সমান হয়। সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল ও উত্তপ্ত নক্ষত্রগুলিকে সাধারণতঃ সমানে সমানে জোট বাঁধিতে দেখা যায়। দুইটি নক্ষত্র তখন কাছাকাছি থাকে। উভয়ে গায়ে গায়ে লাগিয়া আছে, এমন দৃষ্টান্ত পর্য্যন্ত মিলে। এক সময়ে যে দুইটি এক দেহে মিশিয়া থাকে, অতি দ্রুত ঘূর্ণনের ফলে পরে সেই দেহ ছিন্ন হইয়া দ্বিধা বিভক্ত হয়—ইহাই সম্ভব। কোন কোন ক্ষেত্রে যুগ্মগঠন বিসদৃশ হইতে দেখা যায়। যেমন লুব্ধক একটি শ্বেতবর্ণের খর্ব্বকায় তাম্রকায়
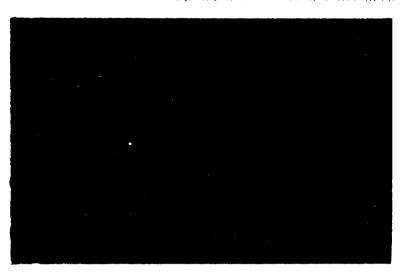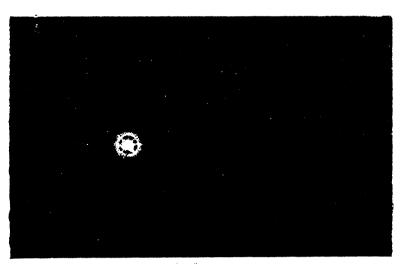
একই ক্ষেত্রে দ্বাদশ স্তরের কতকগুলি নক্ষত্র দেখা যাইতেছে

ঐ ক্ষেত্রে পঞ্চদশ স্তরের নক্ষত্র পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে

সহিত মিলিত হইয়াছে। তবে অনেক সময় আকারে পার্থক্য থাকিলেও ভার কাছাকাছি যায়। খর্ব্বকায় শ্বেত নক্ষত্রগুলি আকারে পৃথিবীর সমান বটে, কিন্তু ভারে সূর্য্যের মত। তাহার অর্থ এই যে, এই সকল নক্ষত্র সূর্য্য অপেক্ষা বহুগুণ ঘন বস্তুর দ্বারা গঠিত। সূর্য্যদেহের এক টন বস্তু গড়ে এক ঘন গজ স্থান অধিকার করিবে। কিন্তু খর্ব্বকায় শ্বেতনক্ষত্রের এক টন বস্তু রাখিতে অঙ্গুলি-পরিমিত স্থানেরও প্রয়োজন হইবে না, বিপরীত পক্ষে, এমন নক্ষত্রও আছে, যাহাদের প্রত্যেকের দেহের সমপরিমাণ বস্তু একটি জাহাজ না হইলে আঁটিবে না। পার্থিব জগতে খর্ব্বকায় শ্বেত নক্ষত্রের ন্যায় বস্তুর ঘন-গঠন সম্ভবপর নহে। শ্বেত নক্ষত্রের অন্তর্নিহিত রহস্যটি হইতেছে এই যে, উহার মধ্যস্থ পরমাণুগুলি চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। সূর্য্যের তাপমাত্রা ভিতরের দিকে ক্রমে বাড়িয়া গিয়া কেন্দ্রদেশে ৫।৬ কোটি ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। শ্বেত নক্ষত্রের কেন্দ্রদেশের তাপমাত্রা ইহা অপেক্ষা বহু বহু গুণ বেশী। এইরূপ তাপমাত্রায় সকল প্রকার পরমাণু সম্পূর্ণভাবে ভাঙ্গিয়া যায় এবং অতি অল্প সীমায় আবদ্ধ থাকিতে পারে। একটি অতি সাধারণ যুগ্মতারকার (Kruger 60) তিনটি ফটোগ্রাফ (৪১৩ পৃঃ) প্রদর্শিত হইল। ঐগুলি ১৯০৮, ১৯১৫ ও ১৯২০ খৃষ্টাব্দে গৃহীত হইয়াছে। অনেকবার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যুগ্ম নক্ষত্রের কক্ষ ঠিক করা যায় এবং তাহা হইতে উহার দুই অংশের ভারও নির্ণয় করা চলে। প্রদর্শিত যুগ্ম নক্ষত্রটির দুই অংশের ভার সূর্য্যের এক-চতুর্থাংশ ও এক-পঞ্চমাংশ বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে। একটি নীল তারকার (Plaskett's Star) দুই ভাগের ওজন সঠিক নিরূপিত হইয়াছে। দেখা গিয়াছে, প্রত্যেকটির ওজন সূর্য্যের প্রায় শতগুণ।

যুগ্ম তারকার ন্যায় ত্রয়ী শ্রেণীর নক্ষত্রও আকাশে দেখা যায়। কতকগুলি নক্ষত্র দল বাঁধিয়া আকাশপথে যাত্রা করিয়াছে—কালপুরুষ (Orion), সপ্তর্ষিমণ্ডল (Great Bear) প্রভৃতি এইরূপ তারকাপুঞ্জ (constellation) আমাদের সকলের পরিচিত। বলাই বাহুল্য, সুবিধার জন্য উহাদিগকে যে সকল বিশিষ্ট নামের সহিত জড়িত করা হইয়াছে, সেগুলির ভিতরের কোন অর্থ নাই। প্রত্যেক গুচ্ছের নক্ষত্রসমূহের মধ্যে গঠন প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়। কালপুরুষের একটি নক্ষত্র (Betelyeux) ব্যতীত অপরগুলি উজ্জ্বল্যে, ভারে, উষ্ণতায় এতদূর সমান যে, এক ঝাঁক পাখীর সহিত তুলনা করিয়া উহাদের পরস্পরের মধ্যে সাদৃশ্য বুঝাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। দলের একটিমাত্র নক্ষত্রই কেবল একক যাত্রী। সপ্তর্ষিমণ্ডলের সর্ব্বোজ্জ্বল নক্ষত্রটিও এইরূপ একাকী শূন্যে ভ্রমণ করে, যদিও অপর সকলে এক সঙ্গে আকাশ-পথে চলিয়া থাকে। বিখ্যাত 'বর্ত্তুলাকার' (globular) তারকামণ্ডলী অতি দূরে ছায়াপথের পরপারে অবস্থিত। ইহাদের প্রত্যেক গুচ্ছে শত শত নক্ষত্র আছে। তবুও নক্ষত্র-জগতে উহারা অপ্রধান। বহুসংখ্যক পরিবর্ত্তনশীল নক্ষত্র (cepheid variables) ঐ দলে দেখিতে পাওয়া যায়। শেষোক্ত প্রকার তারকার দীপ্তি নিয়মিত ভাবে পরিবর্ত্তিত হয়। নির্দ্দিষ্টকাল অন্তর প্রত্যেক নক্ষত্র দুই তিন গুণ বেশী উজ্জ্বল হইয়া উঠে। দেখিলে মনে হয়, ঠিক যেন কেহ একটি অগ্নিকুণ্ডে মাঝে মাঝে এক মুষ্টি করিয়া জ্বালানি কাঠ ঢালিয়া দিতেছে। ভিন্ন ভিন্ন নক্ষত্রের দীপন কাল কয়েক ঘণ্টা হইতে কয়েক দিন পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। দূরত্ব মাপ করিবার পক্ষে এই শ্রেণীর তারকার পর্য্যবেক্ষণ অতীব প্রয়োজনীয় বলিয়া অনুভূত হয়।

দূরবীক্ষণের পরীক্ষায় জানা যায়, নক্ষত্র সকল আকাশে সমভাবে ছড়াইয়া নাই। শূন্যমণ্ডলের কিছু দূর পর্য্যন্ত নক্ষত্রের সংবিভাগ (distribution) সমান দেখা গেলেও ইহা লক্ষ্য করা যায় যে, নক্ষত্র-সংখ্যা পরে ক্রমশঃ হ্রাস পাইয়াছে। তারকামণ্ডলী আকাশে সমান ভাবে ছড়াইয়া থাকিলে—চক্ষু অপেক্ষা দশগুণ বেশী শক্তিশালী দূরবীক্ষণের মধ্য দিয়া আকাশমণ্ডলে হাজার গুণ বেশী নক্ষত্র পরিদৃষ্ট হইত। প্রকৃতপক্ষে সেরূপ দেখা যায় না। প্রদর্শিত নক্ষত্রের তিনটি ফটোগ্রাফ এমন ভাবে তোলা হইয়াছে যে, সর্ব্ব স্থানে বিভাগের সমতা থাকিলে প্রথমটি অপেক্ষা দ্বিতীয়টিতে ৬৪ গুণ এবং দ্বিতীয়টি অপেক্ষা তৃতীয়টিতে আরও ৬৪ গুণ বেশী নক্ষত্র চোখে পড়িত। চিত্রে দেখা যাইতেছে, নক্ষত্রসংখ্যা এই হারে বাড়িয়া যায় নাই। উইলিয়ম হার্শেল ও জন হার্শেল (পিতা ও পুত্র) দুই জন আকাশে নক্ষত্রের বিস্তৃতি নির্ণয়ের প্রথম চেষ্টা করেন। পরে আরও অনেকে এই চেষ্টা করিয়াছেন। ফলে এখন

জানা গিয়াছে, ছায়াপথের নক্ষত্ররাজি উহার সমতল ক্ষেত্রের উপর (gallactic plane) যেরূপ ঘন হইয়া বিরাজ করিতেছে, অন্য কোন দিকে সেরূপ পরিলক্ষিত হয় না। সূর্য্য এই সমতল ক্ষেত্রের কেন্দ্র হইতে কিছু দূরে আছে। ছায়াপথের গঠনসমস্যা গ্যালিলিওর পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত রহস্যময় ছিল। দূরবীক্ষণের প্রয়োগ করিয়া গ্যালিলিও উহাকে তারকা-সমষ্টি বলিয়া চিনিতে পারেন, সে কথা আমরা অনেকে জানি। উহারও দুই হাজার বৎসর-পূর্ব্বে ডেমোক্রিটাস ও এনাকসাগোরাস ছায়াপথ তারকায় রচিত, এইরূপ অনুমান করিয়াছিলেন। আমাদের সূর্য্য ছায়াপথের তারকাগোষ্ঠীর একটি। সাধারণের ধারণা অন্যরূপ হইলেও দূরবীক্ষণের পরীক্ষায় ইহার সত্যতা প্রমাণিত হয়।

নক্ষত্রের দূরত্ব পরিমাপ করিবার কতকগুলি উপায় আছে। একটির বিষয় পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। উহাতে দশ আলোক-বৎসর (এক আলোক-বৎসর = আলোক এক বৎসরে যে পথ চলিতে পারে। আলোকের বেগ সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল) দূর পর্য্যন্ত কার্য্য চলে। অন্যান্য প্রণালী (Spectroscopic parallaxes, cepheid parallaxes etc.) বেশী দূরের নক্ষত্রের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়। 'প্রক্সিমা'র দূরত্ব সওয়া চার আলোক-বৎসর অর্থাৎ ২৫ লক্ষ কোটি আলোক-বৎসর বলিয়া জানা গিয়াছে। ডক্টর হাব্‌ল ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে নিকটতম কুণ্ডলিত নীহারিকায় যে পরিবর্ত্তনশীল নক্ষত্র আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার দূরত্ব দশ লক্ষ আলোক-বৎসর।

নক্ষত্রের গতিনিরূপণ কার্য্যে রশ্মিলেখার পরীক্ষা করা হয়। স্পেকট্রামের রেখার অপসারণ মাপ করিয়া উহার গতির প্রকৃতি ও পরিমাণ নির্ণয় করা যাইতে পারে। জ্যোতির্বিজ্ঞানের গবেষণায় সম্প্রতি এই তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে যে, নক্ষত্র-জগৎ স্থির হইয়া নাই। উহা সমগ্র ভাবে—গাড়ীর চাকা যেমন কেন্দ্রের চারিদিকে ঘুরিয়া থাকে—সেইরূপ একটি কেন্দ্রের চতুর্দ্দিকে ঘূর্ণিত হইতেছে। এই নক্ষত্র চক্র এত বৃহৎ যে, সূর্য্য প্রতি সেকেণ্ডে দুই শত মাইল বেগে চলিয়াও ২৫ কোটি বৎসরে একবারের বেশী ঘুরিতে পারিবে না। নক্ষত্রের বয়স হিসাব করিয়া জানা যায় যে, অনেকেই এ পর্য্যন্ত হাজার হাজার পাক খাইয়াছে।

আমরা খালি চোখে ৪ কোটি নক্ষত্রের মধ্যে কেবল একটি দেখি। অনেক নক্ষত্র একবারে অদৃশ্য হইয়া আছে অথবা ছায়াপথের মৃদু আভায় চাপা পড়িয়া গিয়াছে। বিশ্বের সমস্ত নক্ষত্র পৃথিবীর দুই শত কোটি লোকের মধ্যে ভাগ হইলে প্রত্যেকের ভাগে এক শতের কাছাকাছি পড়ে। কিন্তু ৪ লক্ষ লোকের ভিতর কেবল এক জনের পক্ষে দূরবীক্ষণের সাহায্য না লইয়া একটিমাত্র নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া সম্ভব হয়।

শ্রীকানাইলাল মণ্ডল (এম, এস-সি)।

আত্মজ্ঞান

(কবীর)

সলিলের মাঝে মৎস্য পিয়াসী,
শুনে হাসি পায় মনে,
ঘরের জিনিষ চোখে নাহি পড়ে—
ফিরিছে বনে বনে ?

কাশী বা প্রয়াগ যেখানেই যাও
মূর্খ সেবক ওরে
আপনার জ্ঞান বিনা সে সকলি
মিথ্যায় যায় ভরে।

শ্রীকমলকৃষ্ণ মজুমদার।

উপন্যাস

চতুর্থ প্রবাহ

দস্যুদলপতি 'মিড্‌নাইট' কে ?

রেল-ট্রেণের একটি তৃতীয় শ্রেণীর কামরার এক কোণে এক ব্যক্তি জড় সড় হইয়া বসিয়াছিল—যাহারা মনে করে, 'এই কামরায় অন্য কোন আরোহী না উঠিলেই আমি নিশ্চিন্ত'—এই আরোহীটি সেই প্রকৃতির। কোন ভদ্রলোককে সেই কামরায় উঠিবার চেষ্টা করিতে দেখিলে এই প্রকৃতির লোক তাঁহাকে খেঁকি কুকুরের মত দংশন করিতে উদ্যত হয়, এবং দরজার উপর ঝুঁকিয়া-পড়িয়া বলে, 'ঐ আগের কামরায় উঠুন, মশায়, সেখানে সকল বেঞ্চ একদম খালি!'—ইত্যাদি। বস্তুতঃ যে কারণেই হউক, অন্য কোন আরোহী সেই কামরায় আশ্রয় গ্রহণ করে নাই, সে একাকী সেই কামরায় বসিয়াছিল; বিশেষতঃ, ট্রেণখানিতে আরোহীরও তেমন অধিক ভীড় ছিল না। বাদামী রঙ্গের একটি জীর্ণ কোটে তাহার দেহ আচ্ছাদিত; কোটের বোতামগুলি প্রায় সমস্তই অদৃশ্য হইয়াছিল, এজন্য তাহার নিম্নস্থিত গাত্রাবরণ সুস্পষ্টরূপে দেখা যাইতেছিল; তাহাও মলিন, এবং তালি-দেওয়া। তাহার ট্রাউজার কর্দ্দমাক্ত। জুতা জোড়াটার গোড়ালী ক্ষয়িয়া গিয়াছিল, তাহাতে তালির উপর তালি; নূতন অবস্থায় তাহার রঙ্গ বাদামী কি কাল ছিল, তাহা বুঝিবার উপায় ছিল না। দেখিলে মনে হইত, অব্যবহার্য্য-বোধে কেহ তাহা পথপ্রান্তে ফেলিয়া দিয়াছিল, ট্রেণের এই আরোহী তাহা কুড়াইয়া-আনিয়া পদযুগলের গৌরববৃদ্ধি করিয়াছিল। সে বদনমণ্ডলে তিন চারি দিন ক্ষুর স্পর্শ না করায় নবোদ্গত ঘাসের ন্যায় খোঁচা-খোঁচা দাড়ি গোঁফ তাহার মুখে গজাইয়া উঠিয়াছিল। মুখে একটা সিগারেট গুঁজিয়া তখন পর্য্যন্ত সে তাহাতে অগ্নি-সংযোগ করে নাই। আরোহী মাথার মলিন টুপিটা কপালের উপর এভাবে টানিয়া দিয়াছিল যে, তদ্দ্বারা তাহার রক্তবর্ণ চক্ষুযুগল প্রায় ঢাকিয়া গিয়াছিল।

এই আরোহী ট্রেণের কামরার নিভৃত কোণটিতে জড়ের ন্যায় নিশ্চলভাবে বসিয়া থাকিতে থাকিতে ট্রেণখানি চলিতে আরম্ভ করিল। সে যখন বুঝিল, সেই কামরায় আর কোন আরোহীর আরোহণের সম্ভাবনা নাই, তখন সে হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং কোন দিক্ হইতে কেহ তাহাকে দেখিতে পায় কি না, তাহা পরীক্ষার জন্য তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারি দিকে চাহিয়া, ওভারকোটের পকেট হইতে অত্যন্ত সতর্কভাবে একটা 'অটোমেটিক' পিস্তল বাহির করিল। সে পিস্তলটা হাতে লইয়া নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিল, তাহা চালাইবার সময় কোন অসুবিধা ঘটিবে কি না, তাহাই বোধ হয় পরীক্ষা করিল; এবং কার্য্যকালে কোন বিঘ্ন ঘটিবে না ইহা বুঝিতে পারিয়া, প্রসন্নতা সূচক মুখভঙ্গি করিয়া পুনর্ব্বার তাহা পকেটে রাখিল।

যে বিবর্ণ ও ছিন্ন পরিচ্ছদে তাহার দেহ আবৃত ছিল, সে তাহার পকেট হাতড়াইয়া একটি ম্যাচ-বাক্স বাহির করিল। সে একটা কাঠি জ্বালিয়া তাহার মুখের সিগারেটটার অগ্রভাগে অগ্নিসংযোগ করিল, তাহার পর দুই একবার এরূপ উৎকট দম্ দিল যে, ধূমকুণ্ডলী তাহার মস্তকের ঊর্দ্ধে উঠিয়া ঘুরিতে লাগিল। এইবার সে নড়িয়া-চড়িয়া অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত চিত্তে কামরার সেই কোণটিতে বসিয়া পড়িল।

নৈশ অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া ট্রেণখানি গন্তব্য পথে ছুটিয়া চলিল। নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ মেঘরাশিতে আকাশ আচ্ছন্ন ছিল, সহসা মুষলধারায় বৃষ্টি আরম্ভ হইল, এবং বৃষ্টিধারা ঝর্ঝর শব্দে গাড়ীর জানালাগুলির কাচে আঘাত করিতে

লাগিল। সেই অবিশ্রান্ত বর্ষণে বাহিরের অন্ধকার নিবিড়তর হইয়া উঠিল। সেই অন্ধকার ভেদ করিয়া ট্রেণ চলিতে চলিতে অবশেষে তাহার বেগ ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিল, এবং ক্ল্যাপ্‌হাম-জংশন ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম্মে প্রবেশ করিয়া থামিয়া গেল। তখন আরোহী কামরার সেই কোণে বসিয়াই সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িল, এবং চশমা-জোড়াটার কাচ জামার 'কফে' ঘসিয়া লইয়া তাহা নাকের ডগায় স্থাপন করিল; তাহার পর সে সেই চশমার ভিতর দিয়া জানালার বৃষ্টি-ধারাসিক্ত কাচের দিকে চাহিয়া রহিল। এই ভাবে সে ঘড়ি দেখিবার চেষ্টা করিল; অবশেষে ঘড়ির উপর তাহার দৃষ্টি পড়িল। দেখিল—রাত্রি এগারটা বাজিতে তখন পাঁচ মিনিট মাত্র বিলম্ব আছে।

তাহার জ্যাকেটের পকেটে একখানি পত্র ছিল; সেই পত্রে পত্রলেখকের সহিত তাহার সাক্ষাতের সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল। সে জানিত, রাত্রি সাড়ে এগারটার সময় তাহাকে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া পত্রলেখকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে। সুতরাং নির্দ্দিষ্ট সময়ের কিছু পূর্ব্বেই গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইবে, তাহা সে বুঝিতে পারিল; তাহার মনে হইল, একটু আগে যাওয়া ভালই হইবে। ট্রেণখানি সেই ষ্টেশনে কয়েক মিনিট অপেক্ষা করিয়া, বংশীধ্বনি করিয়া পুনর্ব্বার সশব্দে চলিতে আরম্ভ করিল। আরোহীর আশঙ্কা হইয়াছিল, ক্ল্যাপ্‌হাম-জংশন ষ্টেশনে কোন না কোন আরোহী তাহার কামরায় উঠিয়া তাহার অসুবিধা ঘটাইবে; কিন্তু কোন আরোহী সেই কামরায় উঠিল না। ট্রেণ চলিতে আরম্ভ করিলে সে স্বস্তি বোধ করিয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইল।

সেই সময় কেহ তাহার মুখ দেখিলে বুঝিতে পারিত, তাহার মন আনন্দে ও উৎসাহে পূর্ণ হইয়াছিল। সে পূর্ব্ব কথা চিন্তা করিতেছিল; তাহার আনন্দের কারণ—চারি মাস পূর্ব্বে যে আশাকে সে অন্তরের নিভৃত কোণে স্থান দান করিয়াছিল, এত দিন পরে তাহা সফল হইয়াছে। সে সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরিয়া 'মিড্‌নাইট' নামক দস্যুদলপতির কৃপাকটাক্ষ লাভের চেষ্টা করিয়া আসিতেছিল; কিন্তু চেষ্টা সফল হইবে ইহা কোন দিন আশা করিতে পারে নাই। এত দিন পরে তাহার সেই আশা পূর্ণ হইয়াছে। মিড্‌নাইট তাহাকে সাক্ষাতের অনুমতি দান করিয়া, সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া যে পত্র লিখিয়াছিল, সেই পত্র সঙ্গে লইয়া এই দুর্য্যোগের রাত্রিতে সে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিয়াছে। সে জানিত, দস্যুদলপতি মিড্‌নাইটের দর্শনলাভ পরম সৌভাগ্যের বিষয়; কদাচিৎ কেহ তাহাকে দেখিতে পায়—ইহা সে জানিত।

ট্রেণের এই আরোহী অতঃপর পকেট হইতে একখান ময়লা লেফাপা বাহির করিল। সে সেই লেফাপা হইতে যে পত্রখানি খুলিয়া গভীর আগ্রহভরে পাঠ করিতে লাগিল, তাহা সে পূর্ব্বে বহুবার পাঠ করিয়াছিল; তথাপি তাহার পাঠের আগ্রহ প্রশমিত হয় নাই। পত্রখানি 'টাইপ'-করা, তাহার প্রারম্ভভাগে কোন প্রকার ভূমিকা ছিল না। পত্রখানি ইংরেজী ভাষায় লিখিত; তাহার বঙ্গানুবাদ এইরূপ;—

"আমি যে প্রতিষ্ঠানের পরিচালক, তাহাতে তুমি যোগদানের জন্য উৎসুক, এ সংবাদ আমি অবগত হইয়াছি। যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে আগামী বুধবার রাত্রি ১০টা ৫০ মিনিটের ট্রেণে ওয়াটার-লু ষ্টেশন হইতে যাত্রা করিয়া আমলি-হল্ট ষ্টেশনে নামিবে; ইহা রাত্রি সাড়ে এগারটার সময় সেই ষ্টেশনে থামিবে। ষ্টেশনের সেই প্ল্যাটফর্ম্মে তুমি একটি ক্ষুদ্র 'ওয়েটিংরুম' দেখিতে পাইবে; তুমি সেই স্থানে অপেক্ষা করিলে কিছু পরে আমার সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইবে। এই সঙ্গে যে টাকা পাঠাইলাম, তাহা তোমার পাথেয় ব্যয়নির্ব্বাহের পক্ষে যথেষ্ট হইবে।"

পত্রের নীচে মোটা মোটা অক্ষরে মিড্‌নাইটের নামস্বাক্ষর ছিল; আরোহীর পাথের ব্যয় বহনের জন্য পত্রমধ্যে সে পাঁচ পাউণ্ডের একখানি নোট পাঠাইয়াছিল। আরোহী পত্রখানি ভাঁজ করিয়া সতর্কভাবে লুকাইয়া রাখিল, এবং পুনর্ব্বার যখন এই পত্র মিড্‌নাইটকে দেখাইবার জন্য বাহির করিবার প্রয়োজন হইবে, তখন মনের অবস্থা কিরূপ হইবে ভাবিয়া সে বিচলিত হইল।

ডেপ্‌টফোর্ডের ফ্লাওার্শলেনের ক্ষুদ্র বাসায় সে দুই দিন পূর্ব্বে এই পত্র পাইয়াছিল। পত্র পাইবার পর পত্রপ্রেরকের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য সে কেবল যে উৎসুক হইয়াছিল এরূপ নহে, সে কি ভাবে দস্যুসর্দার কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইবে, তাহা ভাবিয়া অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল।

ডেপ্টফোর্ড-ব্রডওয়ের সন্নিহিত গ্রামসমূহে অপরাধীর

সংখ্যা অল্প ছিল না; ঐ সকল গ্রামের অধিবাসীরা সর্ব্বদা মিড্‌নাইট নামক দস্যুসর্দ্দার-পরিচালিত দস্যুদল ও তাহাদের দলপতি সম্বন্ধে নানা কথার আলোচনা করিত। দস্যুদলপতি মিড্‌নাইট তাঁহাদের নিকট দুর্জ্জেয় রহস্যের আধার বলিয়া বিবেচিত হইত। তাহার অদ্ভুত শক্তি সম্বন্ধে তাহাদের লোমাঞ্চকর ধারণা ছিল। ট্রেণের এই আরোহী স্পন্দিতবক্ষে মিড্‌নাইটের দস্যুবৃত্তির বিচিত্র কাহিনী শ্রবণ করিয়া, তাহার দলভুক্ত হইয়া তাহার আদেশে পরিচালিত হইবার জন্য বহুদিন হইতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়া আসিতেছিল। তাহার ধারণা ছিল, পুলিশ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও মিড্‌নাইট বা তাহার দলভুক্ত দস্যুগণকে কোন দিন গ্রেপ্তার করিতে পারিবে না; সুতরাং মিড্‌নাইট দ্বারা পরিচালিত হইয়া দস্যুবৃত্তি করিলে তাহাকে কখন ধরা পড়িতে হইবে না। সে মিড্‌নাইটের দলভুক্ত হইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেও তাহার চেষ্টা সফল হয় নাই। সে যখন নিরাশ হইয়া এই চেষ্টায় বিরত হইয়াছিল, সেই সময় মিড্‌নাইটের উক্ত পত্র পাইয়া তাহার মন আনন্দে ও উৎসাহে পূর্ণ হইয়াছিল। সে ভাবিল, আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাহার দীর্ঘকালের আশা পূর্ণ হইবে, সে মিড্‌নাইটের সম্মুখীন হইবে। তাহার উপদেশে পরিচালিত হইবে।

ট্রেণখানি বিভিন্ন ষ্টেশনে থামিয়া অবশেষে আম্‌লি হণ্ট ষ্টেশনে উপস্থিত হইল। ট্রেণ ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম্মে থামিলে উক্ত আরোহী তাহার কামরা হইতে নামিয়া পড়িল; ট্রেণের অন্য কোন আরোহী সেই ষ্টেশনে অবতরণ করিল না। সে সেই ষ্টেশনের ক্ষুদ্র প্ল্যাটফর্ম্ম অতিক্রম করিবার সময় চারি দিকে চাহিতে লাগিল। ষ্টেশনটি নির্জ্জন, জন-সমাগম-বর্জ্জিত; সেই গভীর নিশীথে তাহাই যে দস্যু-দলপতির সহিত সাক্ষাতের উপযুক্ত স্থান, এ বিষয়ে তাহার অণুমাত্র সন্দেহ হইল না।

দুইটি ধূমায়মান তেলের ল্যাম্প সেই ক্ষুদ্র ষ্টেশনের অন্ধকার অপসারিত করিবার চেষ্টা করিতেছিল; ষ্টেশনটি অতি ক্ষুদ্র বলিয়া রেলের কর্ত্তৃপক্ষ এই ষ্টেশনে গ্যাসের আলোকের ব্যবস্থা করেন নাই।

এই ক্ষুদ্র ষ্টেশনটি একটি বাঁধের উপর নির্ম্মিত হইয়াছিল। ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম্মে রৌদ্র-বৃষ্টির আক্রমণ হইতে আরোহিগণকে রক্ষা করিবার জন্য যে আচ্ছাদন ছিল, তাহাও অতি ক্ষুদ্র। তাহার বাহিরে বৃষ্টি-জলবিধৌত বিস্তীর্ণ প্রান্তর; আরোহী ট্রেণ হইতে অবতরণ করিবার বহু পূর্ব্বেই বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছিল, এবং খণ্ডবিখণ্ড মেঘস্তরের অন্তরাল হইতে শশধর যে ম্লান কিরণ-ধারা বিকীর্ণ করিতেছিলেন, সেই অপরিস্ফুট কৌমুদীরাশিতে বিস্তীর্ণ প্রান্তর প্লাবিত হইতেছিল।

ট্রেণের আরোহী প্ল্যাটফর্ম্মে দাঁড়াইয়া বৃষ্টিধারাসিক্ত নৈশ প্রকৃতির শোভা নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। ট্রেণ পুনর্ব্বার চলিতে আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে সে প্ল্যাটফর্ম্ম ত্যাগ করিল না। অবশেষে ট্রেণ প্ল্যাটফর্ম্ম হইতে তাহার গন্তব্য-পথে ধাবিত হইলে, সে দেখিল, সেই ষ্টেশনের এক মাত্র কর্ম্মচারী—যে একাধারে ষ্টেশন-মাষ্টার, টিকিট-কালেক্টার, এবং পোর্টার,- ষ্টেশন হইতে প্রস্থান করিল। আগন্তুক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চতুর্দ্দিকে চাহিয়া যখন বুঝিতে পারিল, আর জন-প্রাণীও ষ্টেশনে নাই, তখন সে সেই ষ্টেশনের 'ওয়েটিং-রুমে'র সন্ধানে চলিল। কয়েক মিনিট ধরিয়া অনুসন্ধানের পর সে সেই প্ল্যাটফর্ম্মের এক প্রান্তে একটি ক্ষুদ্র কক্ষ আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইল। সেই কামরা কাষ্ঠ-নির্ম্মিত; তাহাই সেই ষ্টেশনের 'ওয়েটিং-রুম'—ইহা বুঝিতে পারিয়া সে সেই কক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হইল। যে দুইটি তেলের ল্যাম্প হইতে সধূম আলোক নিঃসারিত হইয়া ষ্টেশনটি আলোকিত করিতেছিল, সেই আলোক ষ্টেশনের প্রান্তভাগে অবস্থিত 'ওয়েটিংরুম' পর্য্যন্ত বিকীর্ণ না হওয়ায় সেই স্থানের অন্ধকার অপসারিত হয় নাই। আগন্তুক সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন 'ওয়েটিং-রুমের' দ্বারের নিকট থমকিয়া দাঁড়াইল। সেই কক্ষে প্রবেশ করিতে তাহার বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠিল, এবং কি এক অজ্ঞাত ভয়ে তাহার গা ছম্-ছম্ করিতে লাগিল। তাহার পদদ্বয় যেন আর অগ্রসর হইতে চাহিল না।

সেই কক্ষে আলোক না থাকায় তাহা নিবিড় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন ছিল। আগন্তুক দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া স্পন্দিতবক্ষে কক্ষ-দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে দৃষ্টিপাত করিল; কিন্তু অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাইল না। একটা অপ্রীতিকর উগ্র গন্ধ তাহার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিল। পুরাতন কাগজ-পত্র পচিলে যেরূপ গন্ধ বাহির হয়, সেইরূপ গন্ধ বলিয়াই তাহার ধারণা হইল। আগন্তুক 'ওয়েটিং-রুমে' প্রবেশ করিবে কি না,

একাকী সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন কক্ষে প্রবেশ করিলে তাহাকে হঠাৎ বিপন্ন হইতে হইবে কি না, এই সকল কথা সে চিন্তা করিতেছিল, সেই সময় 'ওয়েটিং-রুমের' ভিতর হইতে কেহ নীরস স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কে ও? গ্র্যাণ্ট আসিয়াছ কি?"—কণ্ঠস্বর অনুচ্চ হইলেও অত্যন্ত তীব্র।

আগন্তুক এই প্রশ্ন শুনিয়া কম্পিত স্বরে বলিল, "হাঁ, আমি আসিয়াছি।"

'ওয়েটিং-রুমের' ভিতরের লোকটি মৃদুস্বরে বলিল, 'ভিতরে এস, গ্র্যাণ্ট!"

আগন্তুক কক্ষের ভিতর মাথা বাড়াইয়া অন্ধকারের দিকে চাহিয়া রহিল। কক্ষের ভিতর প্রবেশ করিতে তখনও তাহার সাহস হইল না।

তাহার কুণ্ঠিত ভাব লক্ষ্য করিয়া 'ওয়েটিং-রুমের' ভিতর হইতে প্রশ্ন হইল, "তুমি কি ভিতরে আসিতে ভয় করিতেছ? এরূপ কুণ্ঠিতভাবে দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া থাকিবার কারণ কি?"—কণ্ঠস্বরে সন্দিগ্ধ ভাব পরিস্ফুট।

আগন্তুক সংযত স্বরে বলিল, "ভয়? না, আমি ভয় পাই নাই।"

তাহার কথা শুনিয়া দস্যুদলপতি মিড্‌নাইট স্বাভাবিক স্বরে বলিল, "উত্তম, ভয়-তরাসে লোকগুলাকে আমি অকর্ম্মণ্য মনে করি; তাহাদিগকে কোন কার্য্যের ভার দেওয়া আমার বিবেচনায় অনুচিত। ঐরূপ লোককে আমার দলে গ্রহণ করি না। তাহারা কেবল অযোগ্য নহে; তাহাদের নির্ব্বুদ্ধিতায় বিপদেরও আশঙ্কা থাকে। এখন আমার কথা মন দিয়া শোন। আমি তোমাকে কোন কার্য্যের ভার দিতে চাই। যদি তুমি সেই কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন করিতে পার—তাহা হইলে প্রচুর পুরস্কার লাভ করিবে; সেই পুরস্কারের পরিমাণ এত অধিক যে, তাহা তোমার আশাতীত। তুমি স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট রিচার্ড ষ্ট্রীট্‌কে চেন?"

দস্যুদলপতি মিড্‌নাইটের এই প্রশ্নে গ্র্যাণ্ট হঠাৎ চমকিয়া উঠিল। প্রশ্নটি এরূপ আকস্মিক যে, তাহা শুনিয়া অবিচলিত থাকা তাহার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হইল। সে যথাসাধ্য চেষ্টায় মানসিক চাঞ্চল্য দমন করিয়া কুণ্ঠিতভাবে বলিল, "রিচার্ড ষ্ট্রীট্? ডিটেক্‌টিভ সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট ষ্ট্রীট্? হাঁ, আ—আমি তাহার নাম শুনিয়াছি বটে।"

মিড্‌নাইট রিচার্ড ষ্ট্রীটের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিয়া নীরস-স্বরে বলিল, "এই গোয়েন্দাটা আমাদের পক্ষে একটা আপদ হইয়া উঠিয়াছে; এই জন্য তাহাকে সাবাড় করা প্রয়োজন। তাহাকে হত্যা করিবার ভার তোমার হস্তে অর্পণ করিব এইরূপই সঙ্কল্প করিয়াছি। মিড্‌নাইট নামক সুপ্রতিষ্ঠিত কর্ম্মবীরগণের দলে কোন নূতন লোক নিযুক্ত করিবার সময় তাহার যোগ্যতা পরীক্ষার জন্য তাহার উপর এক একটি কার্য্যের ভার অর্পণ করা হয়। এই জন্য তোমার উপর এই ভার অর্পিত হইল। এই কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন করিয়া তোমাকে প্রতিপন্ন করিতে হইবে—তুমি 'মিড্‌নাইট' দলে যোগদানের অযোগ্য নহ, এবং তোমার দ্বারা এই দলের গৌরব-প্রতিষ্ঠা ক্ষুণ্ণ হইবার আশঙ্কা নাই। তোমার যোগ্যতা পরীক্ষার জন্যই আমি এই ব্যবস্থা করিলাম। তুমি এই ভার গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছ?"

গ্র্যাণ্ট মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা না করিয়া অবিচলিত স্বরে বলিল, "হাঁ, দলপতি! আমি প্রস্তুত, সম্পূর্ণ প্রস্তুত।"

মিড্‌নাইট বলিল, "উত্তম! তোমার হাতখানি বাড়াইয়া দাও।"

তাহার আদেশে গ্র্যাণ্ট অন্ধকারে তাহার দক্ষিণ হস্ত সম্মুখে প্রসারিত করিল। সে বুঝিতে পারিল, সেই মুহূর্ত্তে তাহার মুঠার ভিতর একখানি লেফাপা গুঁজিয়া দেওয়া হইয়াছে। লেফাপাখানি এরূপ অবলীলাক্রমে তাহার মুঠার ভিতর গুঁজিয়া দেওয়া হইল যে, গ্র্যাণ্টের ধারণা হইল, মিড্‌নাইট নিবিড় অন্ধকারেও সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পায়। সুস্পষ্ট দিবালোকে ও নিবিড় নৈশ অন্ধকারে তাহার দৃষ্টিশক্তির কোন ব্যতিক্রম হইলে সে অন্ধকারে গ্র্যাণ্টের হাত দেখিতে পাইত কি?

মিড্‌নাইট লেফাপাখানি গ্র্যাণ্টের মুঠার ভিতর গুঁজিয়া দিয়া বলিল, "কি ভাবে তোমাকে এই কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে সকল উপদেশ ঐ পত্রে অবগত হইবে। এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে-হইলে তোমার ভদ্রোচিত পরিচ্ছদের প্রয়োজন। তাহা ক্রয়ের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ এই লেফাপার ভিতর পাইবে। পত্রে যে উপদেশ প্রদান করা হইয়াছে তাহা তুমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিবে। দক্ষিণ ল্যাম্বেথ টিউব-ষ্টেশনের প্রবেশ-দ্বারে তামাকের একখানি ক্ষুদ্র দোকান আছে; তুমি প্রত্যহ সেই দোকানে

এমন করিয়া এক এক প্যাকেট 'ষ্টার-ৎষ্ট' মার্কা সিগারেট ক্রয় করিবে। সিগারেটের নামটি ভুলিও না। তোমার নম্বর ৩৪। তুমি সিগারেট চাহিবার সময় দোকানদারকে এই নম্বরটি প্রত্যহ বলিবে। রিচার্ড ষ্ট্রীটের সহিত সেরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, তাহাও এই পত্রে জানিতে পারিবে। শেষ কথা, এই আদেশ পালনে অবহেলা করিলে বা ইহার অবাধ্য হইলে যে দণ্ড তোমাকে গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা প্রাণদণ্ড। -- আমার কথা বুঝিতে পারিয়াছ ?"

গ্র্যাণ্ট বলিল, "হাঁ, বুঝিয়াছি।"

গ্র্যাণ্টের চক্ষুতে অন্ধকার সহ্য হইলে তাহার দৃষ্টিশক্তি প্রখর হইল ; সেই অন্ধকারে চাহিয়া সে তখন বুঝিতে পারিল, মিড্‌নাইটের দেহ পুরুষের পরিচ্ছদে মণ্ডিত ছিল।

মিড্‌নাইট ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল, "এখন তুমি চলিয়া যাও। বেড়ার ভিতর দিয়া বাহিরে যাইবার সময় তোমার টিকিটখান যথা নিয়মে দিয়া যাইবে। টিকিট দিতে তোমার কিছু বিলম্ব হইয়াছে, কারণ, ট্রেণ অনেক পূর্ব্বে চলিয়া গিয়াছে। তোমার টিকিট দিতে বিলম্ব হইয়াছে—ইহার একটা কারন বলিবে। কি বলিতে হইবে—তাহা তুমিই স্থির করিবে। তুমি ষ্টেশনের বাহিরে গ্রামের পথে গিয়া ডাইন দিকে ফিরিবে। দুই মাইল দূরে আর একটি ষ্টেশন আছে। সেই ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া তুমি একখান টিকিট কিনিয়া-লইয়া ট্রেণে চাপিয়া তোমার গন্তব্যস্থানে ফিরিয়া যাইবে।"

মিড্‌নাইট এই কথা বলিয়া নীরব হইলে গ্র্যাণ্ট পকেট হইতে পিস্তলটা নিঃশব্দে বাহির করিয়া লইল, এবং তাহার 'সেফ্‌টিক্যাচে' বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ স্থাপন করিয়া, বামহস্তের মুঠার ভিতর তাহার বৈদ্যুতিক টর্চ্চটা চাপিয়া ধরিল। তাহার পর সে রুদ্ধ নিশ্বাসে বলিল, "আমি যাঁহার সহিত এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিতেছি, তাঁহার মুখ দেখিবার জন্য আমার আগ্রহ হইয়াছে।"

মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার হাতের টর্চ্চটা দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া মিড্‌নাইটের মুখের উপর উজ্জ্বল জ্যোতিতরঙ্গ নিক্ষেপ করিল ; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহার হাত হইতে টর্চ্চটা খসিয়া-পড়িয়া নির্ব্বাপিত হইল।

ক্ষণকালের জন্য কাহারও মুখে কোন কথা নাই ; কিন্তু গ্র্যাণ্টের মুখ হইতে কোন কথা উচ্চারিত হইবার পূর্ব্বেই নিমেষের মধ্যে সে তাহার দক্ষিণ হস্তের প্রকোষ্ঠে এরূপ তীব্র বেদনা অনুভব করিল যে, তাহার হাত হইতে পিস্তলটা খসিয়া পড়িল। মিড্‌নাইট কয়েকটি অঙ্গুলি দ্বারা তাহার প্রকোষ্ঠ পরিবেষ্টিত করিলেও তাহাতে সে বলপ্রয়োগ করে নাই ; তথাপি গ্র্যাণ্টের মনে হইল -মিড্‌নাইটের অঙ্গুলি হইতে বিদ্যুৎপ্রবাহ নিঃসারিত হইয়া তাহার সমগ্র দেহে বৈদ্যুতিক প্রবাহ সঞ্চালিত করিল। তাহার শারীরিক সামর্থ্য মুহূর্ত্তের জন্য বিলুপ্ত হওয়ায় দেহ অসাড় হইয়া গেল। সে তাহার সম্মুখস্থ ব্যক্তির গাল লক্ষ্য করিয়া বামহস্ত দ্বারা সবেগে প্রহার করিল। কিন্তু তাহার মুষ্টিবদ্ধ হস্ত শূন্যে আঘাত করিয়া নিরাশ্রয়ভাবে নামিয়া আসিল ; তাহা কাহারও দেহ স্পর্শ করিতে পারিল না।

কিছুই বুঝিতে না পারিয়া গ্র্যাণ্ট তাহার আততায়ীকে উভয় হস্তে জড়াইয়া ধরিবার জন্য সম্মুখে লাফাইয়া পড়িল, কিন্তু তাহার প্রসারিত বাহুদ্বয় কাহারও দেহ স্পর্শ করিতে পারিল না, কেবল একটা পশমী কোটের সহিত তাহার মুখের সংঘর্ষণ হইল! সেই সময় ভায়োলেটের মৃদু মধুর সৌরভ বায়ুতরঙ্গে ভাসিয়া আসিয়া তাহার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিল। তাহা কি কোন বিলাসিনীর দেহ-সৌরভ ? সহসা একটা সন্দেহে তাহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে ভাবিল, দস্যুদলপতি মিড্‌নাইট গভীর নিশীথে লুণ্ঠনাদি কার্য্য করে, এজন্য সে দস্যু-সমাজে 'মিষ্টার মিড্‌নাইট' নামে পরিচিত ; কিন্তু অসীম শক্তিশালী দস্যুদলের এই অধিনায়ক কি পুরুষ, না পুরুষ-নামধারী ও পুরুষবেশী কোন—?

নিবিড় নৈশ অন্ধকারে সহসা পৃষ্ঠে দুঃসহ বেদনা অনুভব হওয়ায় মিড্‌নাইটের দলে নব-দীক্ষিত গ্র্যাণ্ট ওয়েটিং-রুমের দ্বারপ্রান্ত হইতে নির্জ্জন প্ল্যাটফর্ম্মে লাফাইয়া পড়িল বটে, কিন্তু সে বাহুদ্বয় প্রসারিত করিয়া আততায়ীর দেহ স্পর্শ করিতে পারিল না ; অন্ধকারে সে কবন্ধের ন্যায় উভয় হস্ত আকুঞ্চিত ও প্রসারিত করিতে লাগিল। সেই সময় সে সহসা তাহার মেরুদণ্ডে অসহ্য বেদনা অনুভব করিল, যেন কাহারও অদৃশ্য হস্ত অত্যুত্তপ্ত লৌহশলাকা তাহার মেরুদণ্ডে চাপিয়া ধরিল! সে যন্ত্রণায় অধীর হইয়া উর্দ্ধমুখে শ্বাস গ্রহণের চেষ্টা করিল, কিন্তু কে যেন উভয় হস্তে তাহার কণ্ঠনালি চাপিয়া ধরিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার শ্বাস রুদ্ধ হইল ; পুঞ্জ পুঞ্জ আলোক-স্ফুলিঙ্গ তাহার চক্ষুর সম্মুখে নৃত্য করিতে লাগিল।

তাহার বিস্ফারিত ও আতঙ্কবিহ্বল নয়নযুগল ললাটের উর্দ্ধে উঠিলে, তাহার চেতনা বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছিল। সে উভয় হস্ত উর্দ্ধে তুলিয়া আশ্রয় গ্রহণের চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার চেষ্টা সফল হইল না, সে তৎক্ষণাৎ সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন প্লাটফর্মে উপুড় হইয়া পড়িয়া গেল; সঙ্গে সঙ্গে তাহার চেতনা বিলুপ্ত হইল। তাহার দেহ তখন মৃতদেহের ন্যায় অসাড়, স্পন্দনরহিত! মিড্‌নাইট কে, সে পুরুষ কি নারী, তাহা তাহার অজ্ঞাত রহিল।

পঞ্চম প্রবাহ

ঘনীভূত রহস্য!

অভিনেত্রী-শিরোমণি বেটী সেমর বহুমূল্য সুদৃশ্য পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া একান্ত-মনে প্রসাধনে রত ছিল। পুরুষের মনোরঞ্জনের জন্য পূর্ব্বে আর কোন দিন এই তরুণীকে এরূপ আয়াস স্বীকার করিতে দেখা যায় নাই। প্রসাধন-টেবলে যে মুকুর ছিল, তাহাতে মুখ দেখিয়া সে মৃদু হাসিল। আর পনের মিনিটের মধ্যেই তাহাকে ডিক ষ্ট্রীটের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইতে হইবে। বেটী সেমুরের রহস্যময় জীবনের কোন কথা রূপবান্ যুবক ষ্ট্রীটের বিদিত ছিল না; এজন্য ষ্ট্রীটকে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইলেও তাহার সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতে বেটী কুণ্ঠা বোধ করে নাই।

বেটী সেমুর প্রসাধন শেষ করিয়া কোটে দেহ আবৃত করিল; তাহার পর সে দস্তানা জোড়াটা হাতে তুলিয়া লইয়াছে—সেই সময় তাহার পরিচারিকা একখানি পত্র লইয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইল।

বেটী পরিচারিকার হস্ত হইতে লেফাপাখানি গ্রহণ করিল। লেফাপার উপর যে হস্তাক্ষর ছিল, তাহা দেখিয়া তাঁহার মুখ ভয়ে চুণ হইয়া গেল। তাঁহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া পরিচারিকা সভয়ে বলিল, "কি হইল, মিস্! আপনি কি হঠাৎ অসুখ বোধ করিতেছেন?"

বেটী চেয়ারে বসিয়া-পড়িয়া পরিচারিকাকে বলিল, "না, ও কিছু নয়। তুমি একখান ট্যাক্সি ডাক।"

পরিচারিকা প্রস্থান করিলে বেটী লেফাপা হইতে পত্রখান বাহির করিয়া পাঠ করিল; তাহার মন নিরাশায় পূর্ণ হইল। পত্রখানি সে দুই বার পাঠ করিল; তাহার পর তাহা দলা পাকাইয়া মুঠার ভিতর চাপিয়া ধরিয়া নতনেত্রে মেঝের দিকে চাহিয়া রহিল। অতীত স্মৃতির দংশনে তাহার মানসিক অশান্তির সীমা রহিল না।

তাহার পরিচারিকা ট্যাক্সি আনিয়া সংবাদ দিলে বেটী উঠিয়া সিঁড়ি দিয়া নামিয়া চলিল; এবং অন্যমনস্ক ভাবে ট্যাক্সিতে উঠিয়া বসিল।

বেটী কার্লটোনিয়ানে উপস্থিত হইয়া দেখিল—ডিক্ ষ্ট্রীট বসিবার ঘরে তাহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন; তিনি উঠিয়া তাহার অভ্যর্থনা করিলেন। বেটী তাঁহার চক্ষুর চতুর্দ্দিকে কাল দাগ দেখিয়া বিস্মিত হইল। সে মুহূর্ত্তের জন্য কল্পনা করিতে পারিল না যে, যে ফটোগ্রাফখানি তিনি তাঁহার ডেস্কের দেরাজে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার দুশ্চিন্তার কারণ।

দুই চারিটি সাময়িক কথার পর ডিক বেটীকে সঙ্গে লইয়া সুপ্রশস্ত ভোজনাগারে প্রবেশ করিলেন। হোটেলের সর্দ্দার-খানসামা একটি জানালার নিকটস্থ টেবলে তাঁহাদিগকে বসাইয়া দিল।

বেটী হাতের দস্তানা অপসারিত করিল; সেই সময় ডিক্ তাহার হাতের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার মনে হইল, যাহার দেহ এরূপ সুগঠিত, ও নবনী-সুকোমল, সে কখন তস্করের কার্য্যে লিপ্ত ছিল, ইহা ধারণা করা অসাধ্য। কিন্তু তথাপি যে ফটোগ্রাফখানি তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল, তাহা অকাট্য প্রমাণ। সেই ফটোর নীচে যে নামই থাক, তাহা যে বেটী সেমুরের ফটো, এ বিষয়ে সন্দেহের কারণ ছিল না। ডিকের মন অত্যন্ত দমিয়া গেল।

বেটী ডিকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "তোমাকে এত বিষণ্ণ দেখিতেছি, ব্যাপার কি বল ত!"

ডিক ভোজ্য দ্রব্যের তালিকা (মেনু) হাতে লইয়া বলিলেন, "তোমার অনুমান সত্য।"

বেটী বলিল, "কিন্তু কেন, তাহাই জানিতে চাহিয়াছি।"

ডিক কোন কথা বলিলেন না, গভীর মনোযোগ সহকারে ভোজন-তালিকা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

বেটী বলিল, "রঙ্গালয়ের সেই দুর্ঘটনাই কি তোমার দুশ্চিন্তার কারণ?"

ডিক গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "তোমার অনুমান কতকটা সত্য বটে।"

তাঁহার উত্তর প্রত্যেক বারই দুই একটি কথায় শেষ হইল, অধিক কথা তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইল না।

বেটী সম্মুখে ঝুঁকিয়া-পড়িয়া এবং একখানি হাত টেবিলের উপর রাখিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "দুর্ঘটনাটা সত্যই কি অতি ভয়াবহ বলিয়া তোমার মনে হয় নাই? যাহারা এই কার্য্যের জন্য দায়ী, তোমরা বোধ হয় এখন পর্য্যন্ত তাহাদের সন্ধান করিয়া উঠিতে পার নাই?"

ডিক মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না; তবে ইহা যে মিড্‌নাইট দলের কীর্ত্তি, এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।"

বেটী ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল, "এই মিড্‌নাইট দলের লোক কাহারা, তাহা কি ধারণা করিতে পার নাই?"

ডিক নিরুৎসাহ চিত্তে বলিলেন, "সে ধারণা আর করিতে পারিলাম কৈ? এখন পর্য্যন্ত কিছুই জানিতে পারি নাই; যদি তাহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিতাম, অন্ততঃ যদি জানিতে পারিতাম, কে এই দস্যুদলের নেতৃত্ব করিতেছে, তাহা হইলে এই রহস্যভেদের জন্য আমি সাধ্যানুসারে অর্থব্যয়ের ত্রুটি করিতাম না।"

বেটী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ডিকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "কে এই দস্যুদলের নেতা, তাহাই জানিতে চাও?"

ডিক বলিলেন, "হাঁ। আমরা এইমাত্র জানি যে, মিষ্টার মিড্‌নাইট এই দস্যুদলের পরিচালক; কিন্তু তাহার সম্বন্ধে কোন কথা জানিতে পারি নাই।"

এই সময় এক জন পরিচালক তাঁহাদের আদেশ জানিতে আসিল। তাহাকে দেখিয়া ডিক ষ্ট্রীট নীরব হইলেন।

ভৃত্যটি তাঁহাদের ভোজন-টেবলের নিকট হইতে প্রস্থান করিলে ডিক বলিলেন, "মিঃ মিড্‌নাইটের মস্তিষ্ক এই দস্যুদল পরিচালিত করিতেছে। এই মিড্‌নাইট ইহাদের সকল শক্তির আধার। সেই আধারটিকে বিধ্বস্ত করিতে পারিলে দস্যুদল আপনা-হইতেই ভাঙ্গিয়া যাইবে। তাহাদিগকে চূর্ণ করিবার জন্য স্বতন্ত্রভাবে চেষ্টা করিতে হইবে না।"

বেটী কৌতূহলভরে বলিল, "এই দলের অধিনায়ক কে, তাহার সম্বন্ধে কিছুই ধারণা করিতে পার নাই? অর্থাৎ তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনও সূত্র আবিষ্কার করিতে পার নাই?"

ডিক বলিলেন, "না, তাহা পারি নাই; কোন দিন যে তাহা পারিব, এরূপও আশা করিতে পারিতেছি না।"

বেটী আর কোন কথা না বলিয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইল। তাহাকে চিন্তামগ্ন দেখিয়া ডিক ভাবিলেন, সহসা এরূপ কি কারণ ঘটিল যে, ভোজনে বসিয়া সদা-প্রফুল্ল বেটীর মন এইরূপ চিন্তাভারে ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল?

সুন্দরী বেটীর সহিত জীবনে পাঁচ ছয় বারের অধিক তাঁহার সাক্ষাতের সুযোগ হয় নাই; কিন্তু এই কয়েক বারের সাক্ষাতে সে তাঁহার মনের উপর যে অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা তিনি স্বীকার না করিলেও সেই প্রভাব অতিক্রম করিবেন, সে সাধ্য তাঁহার ছিল না। স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের 'মহাফেজখানা' (Record Department) হইতে যে ফটোখানি তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল, তাহা যে বেটীর ফটো, এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ হইলেও সেই ফটোর সহিত কি রহস্য বিজড়িত ছিল, তাহা তাঁহার ধারণা করা অসাধ্য। বেটীর সহিত তাঁহার পরিচয় হইবার পর—তাহার সম্বন্ধে তিনি যতটুকু তথ্য জানিতে পারিয়াছিলেন, তাহা হইতে তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, বেটী কখন তস্করের বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিল, এরূপ ধারণাকে মনে স্থান দেওয়া যাইতে পারে না। বেটীর প্রতি অবিচার করা তাঁহার সাধ্যাতীত। বেটী কখন চুরি করিয়া কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছিল, ইহা বিশ্বাসের অযোগ্য বলিয়াই তাঁহার মনে হইল।

কিন্তু যে রাত্রিতে অর্কিয়ম রঙ্গালয়ে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল সেই রাত্রিতে বেটী অল মার্কসের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিল, ইহা মিথ্যা নহে; ইহা যে সম্পূর্ণ সত্য—তাহার অকাট্য প্রমাণ ছিল। উক্ত ফটোগ্রাফের ন্যায় সেই প্রমাণ অভ্রান্ত। তিনি পথের উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোকে সুস্পষ্ট রূপে দেখিয়াছিলেন—বেটী নামজাদা জহরৎ-চোর কর্ণেল অল মার্কসের সহিত বন্ধুভাবে গল্প করিতে করিতে অক্সফোর্ড ষ্ট্রীট অতিক্রম করিতেছিল। নিজের চক্ষুকে তিনি অবিশ্বাস করিতে পারেন নাই; অথচ তিনি টেলিফোনে বেটীকে সে কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে তাহা অস্বীকার করিয়াছিল, অসঙ্কোচে মিথ্যা কথা বলিয়াছিল! সে মিথ্যা কথা বলিয়াছিল, ইহা অবিশ্বাস করিবার উপায়

ছিল না। অবিশ্বাস করিতে পারিলে তাঁহার মনে কি আনন্দই না হইত?

বেটীর সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় তাঁহার ইচ্ছা হইল, তিনি এই প্রসঙ্গের, আলোচনা করিবেন; কিন্তু কি ভাবে তিনি এই অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবেন, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। তাঁহাকে চিন্তাকুল দেখিয়া বেটী স্বয়ং কথাটা তুলিল।

বেটী বলিল, "সেই রাত্রিতে উক্ত দুর্ঘটনার পর আমি অক্সফোর্ড ষ্ট্রীট দিয়া যাইতেছিলাম, তোমার এরূপ ধারণা হইবার কারণ কি?"

সে টেবল হইতে মুখ তুলিয়া ডিককে এই কথা জিজ্ঞাসা করিতেই ডিকের সহিত তাহার দৃষ্টিবিনিময় হইল। ডিকের দৃষ্টি অচঞ্চল, সম্পূর্ণ স্থির; চারি চক্ষুর মিলন হইতেই বেটী কুণ্ঠিতভাবে চক্ষু অবনত করিল।

ডিক তাচ্ছিল্যভরে বলিলেন, "ওঃ, এই কথা? থিয়েটার দেখিয়া বাড়ী ফিরিবার সময় আমি তোমাকে দেখিতে পাইয়াছিলাম বলিয়াই মনে হইয়াছিল।"

বেটী বলিল, "তুমি আমাকে কোন্ সময় সে—দেখিতে পাইয়াছিলে বলিয়া তোমার মনে হইয়াছিল?"—সে মৃদুস্বরে এ কথা জিজ্ঞাসা করিল; ডিকের মনে হইল, তাহার কুণ্ঠা-বিজড়িত কণ্ঠস্বরে উদ্বেগেরও আভাস ছিল।

ডিক বলিলেন, "রাত্রি তখন প্রায় তিনটা, সম্ভবতঃ আরও কিঞ্চিৎ পরে।"

বেটী মাথা নাড়িয়া বলিল, "সে সময় আমি সেই পথে যাইতেছিলাম, অর্থাৎ আমাকে সেই পথে যাইতে দেখিয়াছিলে? অসম্ভব! আমি রাত্রি বারটার পূর্ব্বেই বাড়ী ফিরিয়া শয্যায় শয়ন করিয়াছিলাম।"

বেটী হাসিতে হাসিতে এ কথা বলিল বটে, কিন্তু সে ডিকের দৃষ্টি এড়াইবার জন্য অন্য দিকে চাহিল।

ডিক ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া টেবলের সম্মুখে ঝুঁকিলেন, এবং হাতখানি তুলিয়া বেটীর হাতের উপর রাখিলেন। তাঁহার করস্পর্শে তাহার অঙ্গুলীগুলি ঈষৎ কম্পিত হইল; কিন্তু সে ডিকের হাত হইতে হাতখানি সরাইয়া লইল না, অবনত-নেত্রে সে নিমীলিত করিল।

ডিক বলিলেন, "বেটী, আমি তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব। আমার প্রশ্নে তুমি বিরক্ত হইও না, সরলভাবে উত্তর দিও। তুমি—তুমি অল মার্কস্‌কে জান কি? অর্থাৎ তাহার সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে?"

ডিকের এই প্রশ্নে বেটী ঈষৎ চমকিয়া উঠিল, তাহা তিনি লক্ষ্য করিলেন; দেখিলেন, তাঁহার প্রশ্নে তাহার মুখ মলিন হইল।

বেটী অস্ফুট স্বরে বলিল, "কি নাম বলিলে? অল মার্কস্?"—নামটা উচ্চারণ করিতে যেন তাহার গলায় বাধিয়া গেল।

ডিক তাহার ভাবান্তর লক্ষ্য করিলেন, বলিলেন, "হাঁ, অল মার্কস্, সে সাধারণতঃ 'কর্ণেল' নামে পরিচিত; জহরত-চুরি তাহার পেশা।"

বেটী ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল, "তাহার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে—তোমার এরূপ ধারণার কারণ কি?"

ডিক বলিলেন, "কারণ, আমি যখন তোমাদের উভয়কে অক্সফোর্ড ষ্ট্রীটে যাইতে দেখিয়াছিলাম, সেই সময় তুমি তাহার সঙ্গে গল্প করিতেছিলে।"

ডিকের এই কথায় বেটীর চক্ষু হঠাৎ উজ্জ্বল হইল, এবং তাহাতে ক্রোধ পরিস্ফুট হইল। সে উত্তেজিত হইলেও তৎক্ষণাৎ আত্মসংবরণ করিয়া বলিল, "আমি তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সেই রাত্রে আমি অক্সফোর্ড ষ্ট্রীটে ছিলাম না, উহা তোমার ভ্রম মাত্র; কিন্তু ভ্রম-স্বীকারে তোমার অভিরুচি নাই!"

ডিক পূর্ণ দৃষ্টিতে বেটীর মুখের দিকে চাহিয়া দৃঢ় স্বরে বলিলেন, "না, আমি ভুল করি নাই। বেটী, তুমি সত্য কথা স্বীকার করিতে কেন কুণ্ঠিত হইতেছ? সত্য কথা স্বীকার না করিবার কারণ কি? থিয়েটার হইতে তুমি সোজা বাড়ী ফিরিয়াছিলে, এ কথা সত্য হইতে পারে; কিন্তু তুমি অল মার্কসের সহিত দেখা করিবার জন্য পুনর্ব্বার বাহিরে গিয়াছিলে;—আমার এ কথা সম্পূর্ণ সত্য।"

বেটীর মুখে হতাশ ভাব পরিস্ফুট হইল। সে কথা বলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কুণ্ঠিত ভাবে দুইবার "আমি"—"আমি" বলিয়া নীরব হইল।—তাহার পর উত্তেজিত স্বরে বলিল, "আমার কথা শুনিয়াও কেন আমাকে প্রশ্ন করিতেছ? আমার কথা কেন বিশ্বাস করিতে পারিতেছ না? ইহা আমার দুর্ভাগ্য ভিন্ন আর কি মনে করিতে পারি?"

ডিক বেটার এই প্রশ্নের কি উত্তর দিবেন, তাহা হঠাৎ স্থির করিতে পারিলেন না; কিন্তু তাঁহার মুখ হইতে কোন কথা বাহির হইবার পূর্ব্বেই খানসামা 'সুপ' লইয়া টেবলের নিকট উপস্থিত হইল।

খানসামা তাঁহাদের সম্মুখে 'প্লেট' রাখিয়া সম্ভ্রমভরে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনাদের জন্য আর কিছু আনিবার প্রয়োজন হইবে কি?"

সহসা অন্য দিক্ হইতে কে কর্কশ স্বরে বলিল, "তোমার মৃতদেহ পুষ্পাবৃত করিবার জন্য ফুলের মালার প্রয়োজন হইবে। তোমাকে আমি গ্রেপ্তার করিতে চাই।"

ডিক সবিস্ময়ে মুখ ফিরাইয়া বক্তার মুখের দিকে চাহিলেন। তিনি ইন্‌স্পেক্টর লুকাস্‌কে টেবলের অন্য ধারে দণ্ডায়মান দেখিলেন। খানসামা বিস্ফারিত নেত্রে ইন্‌স্পেক্টর লুকাসের মুখের দিকে চাহিল, তাহার দুই চক্ষু যেন কপালে উঠিল; চক্ষুতে আতঙ্ক পরিস্ফুট। তাহার চক্ষু-দুইটি অক্ষি-কোটর হইতে যেন ঠেলিয়া বাহির হইতেছিল।

লুকাস্ তাহার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া বলিল, "তুমি কোট পরিয়া লও; কিন্তু আমার চক্ষুর আড়ালে যাইতে পারিবে না। আমি তোমার পাহারায় থাকিব। বুঝিয়াছ? তোমাকে আমার সঙ্গে যাইতে হইবে। সে সময় পলায়নের চেষ্টা করিও না। আমার কাছে কোন রকম চালাকী খাটিবে না। আমার পকেটে পিস্তল আছে, ইহা স্মরণ রাখিও।"

ডিক ষ্টীট বিস্মিতভাবে বলিলেন, "ব্যাপার কি, লুকাস্? এরূপ ব্যবহারের কারণ কি?"

ইন্‌স্পেক্টর লুকাস্ বলিল, "ব্যাপার বড় চমৎকার! সৌভাগ্যক্রমে আমি ঠিক সময়ে আসিয়া পড়িয়াছি। যদি আমার এখানে আসিতে মিনিট দুই বিলম্ব হইত, তাহা হইলে আপনার মৃতদেহ এখানে পড়িয়া-থাকিতে দেখা যাইত, মিষ্টার ষ্টীট! এখানে আসিয়া আপনাকে জীবিত দেখিতাম না। এই 'সুপে' উগ্র বিষ মিশ্রিত করা হইয়াছে। ইহা পান করিবামাত্র আপনার মৃত্যু হইত।"

ডিক ষ্টীট আড়ষ্ট দেহে ইন্‌স্পেক্টর লুকাসের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন; তাঁহার মুখে কথা সরিল না। বেটী সেমুরের মুখ বিবর্ণ হইল; তাহার মূর্চ্ছার উপক্রম হইল।

[ক্রমশঃ]
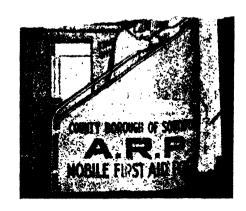
বাসের মতই রাস্তায় অন্য গাড়ীর সম্পর্ক এড়াইয়া চলিয়া বেড়ায়। যেখানে আহতরা পড়িয়া আছে সেখানে এ বাস ছুটিয়া যায়, পক্ষ বিস্তার করিয়া বসে, চিকিৎসা তখনি সুরু হইয়া যায়। এ হাসপাতালে দুইটি কক্ষ, একটিতে স্ত্রী ও অপরটিতে পুরুষ রোগী-দের স্থান। ইহার পিছনে ঔষধপত্র রাখিবার ভাঁড়ার আছে। দোতলায় নার্স ও ডাক্তারদের নিবাস।

অতিকায় টাইপমেশিন

ডাইনোসোরাসের যুগ বহুদিন হইল অতীত হইয়াছে; কিন্তু মানুষ তাহার স্মৃতি এখনো বোধ করি ভুলিতে পারে নাই। তাই সে
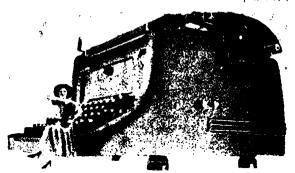
তরুণীর আকারের সহিত যন্ত্রের প্রকার তুলনীয়

মাঝে-মাঝে বহু পরিশ্রমে এমন এক উদ্ভট সৃষ্টি করিয়া বসে যে, বিরাটত্ব ব্যতীত তাহার কোনো বিশেষত্বই চোখে পড়ে না। এইরূপ একটি অতিকায় টাইপরাইটার যন্ত্র নিউ ইয়র্কের বিশ্ব-প্রদর্শনীতে দেখান হইতেছে। দূর হইতে বিদ্যুতের সাহায্যে এ যন্ত্রে টাইপ করা হয়। এ যন্ত্রটির একমাত্র বৈশিষ্ট্য এই যে, উচ্চতায় এটি একটি দোতলা বাড়ীর সমান। ৯ ফুট লম্বা এবং ১২ ফুট চওড়া কাগজে এ যন্ত্র লিখিয়া চলে। সে অক্ষর আকারে তিন ইঞ্চি। যন্ত্রটিতে রিবন লাগে পাঁচ ইঞ্চি চওড়া। এটির ওজন ১৪ টন (এক টন=২৭ মণ) এবং এটিকে নির্ম্মাণ করিতে লাগিয়াছে তিনটি বছর সময়। এ যন্ত্রে সংবাদ ছাপিয়া সাধারণ্যে প্রদর্শিত হইতেছে।

স্বয়ংক্রিয় টাইপরাইটার

চিঠিতে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট অংশ থাকে, যেগুলি সেই ধরণের স চিঠিতেই চলে। যেমন, বিল তাগাদার স্মারকলিপি লিখিবা ধাঁচ এক চিরন্তন ব্যাপার। যদি এই অংশগুলির জন্ম প্রতিবা পরিশ্রম করিতে না হয়, রাইটারে একটা চাবি টিপিয়া দিলেই

স্বয়ংক্রিয় টাইপরাইটার

এই অংশটুকু ছাপা হইয়া যায়, তাহা হইলে অনেক সময় বাঁচে। এই উদ্দেশ্যে একটি টাইপরাইটার বাজারে বাহির হইয়াছে। তাহার কতকগুলি অতিরিক্ত চাবি আছে। এর এক একটি টিপিলে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট কথাগুলি আপনি ছাপা হইয়া যায়।

ঘুমপাড়ানিয়া মাসী

খোকাকে দোল দিতে-দিতে মা সুর করিয়া বলেন, "খোকন ঘুমুলো পাড়া জুড়োলো"—সব মেয়ের জীবনেই এটা ঘটে, যাহার জীবনে ঘটে না, তাহাকে আমরা বলি অভাগী। কিন্তু বৈদ্যুতিক মোটরের সাহায্যে খোকনকে দোল দেওয়া হইল, রেডিও সুর তুলিল, 'খোকন ঘুমুলো পাড়া জুড়োলো'—বেশ মজার ব্যাপার নয়? এই ধরণের একটি যন্ত্র সম্প্রতি বাজারে বাহির হইয়াছে। খোকন যদি জাগিয় গোলযোগ করে, ইহার সাহায্যে দূরবর্ত্তিনী কর্ম্ম বা ক্রীড়ানিরত মা তাহাকে দোল দিয়া পাড়া বা গৃহের জুড়াইবার পথ মুক্ত করিবেন। এ যন্ত্রটির অন্য ব্যবহারও আছে। বিছানায় শুইয় চা তৈরি করিয়া আনা, আগুন জ্বালান প্রভৃতি কাযে এই দূর নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রকে লাগান চলিবে।

ক্ষুদে মোটর

সম্প্রতি বৈদ্যুতিক মোটর-নির্ম্মাতাদের এক প্রতিযোগিতা হই গিয়াছে। সব চেয়ে ছোট একটা মোট নির্ম্মাণ ছিল এ প্রতিযোগিতার বিষয় সুইজারল্যাণ্ডের এক অধিবাসী প্রথ হইয়াছেন। তাঁহার মোটরটি একটি দেশলাই-এর মাথার আকারের। কি তাহা হইলেও সেটি প্রতি মিনিটে ৩০০ পাক পর্য্যন্ত ঘুরিতে পারে। তাহা বিদ্যুৎ খোরাক হইল ৫/১০০০ ওয়াট মোটরটি প্ল্যাটিনম দিয়া নির্ম্মিত। চুলে মত একগাছি তামার তারে ৩০ পাক জড়াইয়া ইহার কয়েল প্রস্তুত করা হইয়াছে।

ক্ষুদে মোটর—পাশে দেশলাই-এর কাঠির মাথা

দোলার নীচে মোটর—দূর হইতে এটিকে চালান হয়। মেয়েটির হাতে বেতার সেটটি দেখা যাইতেছে

কাঠের আগুনে বাসের গমন

রোম নগরে দারুণ তৈলাভাব। বিগত আবিসিনিয়া-যুদ্ধে রোমের এ দৈন্য ভাল করিয়াই প্রকাশ পাইয়াছিল। তাই রোমের

কাঠের আগুনে চল্‌তি বাস

বৈজ্ঞানিকমহল বহু পরীক্ষার পর একপ্রকার বাস-ইঞ্জিন বাহির করিয়াছেন। এ গাড়ী কাঠের আগুনে চলে। গাড়ীর পিছনে উনান আছে। সেথানে নির্দ্দিষ্ট আকারে কাঠ কাটিয়া দেওয়া হয়। নানা রাসায়নিক প্রয়োগে এ কাঠকে কার্ব্বন ডায়কৃসাইডে পরিণত করা হয়। এই বাষ্পের জোরে বাস চলিতে থাকে। শোনা যাইতেছে, মাত্র ৩০ সেণ্ট (এক সেণ্টে প্রায় এক আনা) খরচে এ বাস সারাদিন চলিবে।

স্বয়ংক্রিয় মালগ

মালগাড়ী চালানয় বড় হাঙ্গামা। বছরের পর বছর সাইডিং এ ফেলিয়া তাহার মাল নামাইতে হয়, ফলে বিলম্ব, অসুবিধা। তাই, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের রেল-কর্ত্তৃপক্ষ এক ধরণের মালগাড়ী চালাইতেছেন। যাত্রীগাড়ীর সহিত সমান তালে পা ফেলিয়া টাইম টেব্‌লের বাঁধা সময়ে এ গাড়ী ছুটিবে। এই গতিশীলতার মূলে আছে মালগাড়ীতে স্বয়ংক্রিয় মাল-বোঝাই-এর ব্যবস্থা। গাড়ী প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে থামিবা মাত্র পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট একটি বিশেষ গাড়ীর দরজা আপনা হইতেই খুলিয়া যায়, এবং সেই ষ্টেশনের জিনিষ যে বাক্সে আছে সেটি প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে নামিয়া আসে। এমনি গাড়ীতে মাল বোঝাই করাও সহজ ব্যাপার। দুইটি হুকে বাক্সটি লাগাইয়া দিলেই মালগাড়ী তাহাকে টানিয়া লয়, দরজাও বন্ধ হইয়া যায়। এ ব্যবস্থার ফলে মালগাড়ী চলিবে অবাধ গতিতে। তাহার জন্য স্বতন্ত্র লাইনের প্রয়োজন হইবে না।
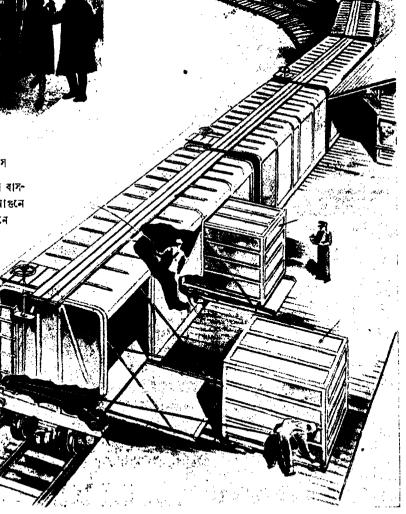
স্বয়ংক্রিয় ভারোত্তোলন ব্যবস্থা—একটিতে মাল বোঝাই ও অপরটিতে খালাসের ব্যাপার দেখা যাইতেছে

মোটরগাড়ী পরীক্ষার অভিনব স্থান

ইটালীয় ফিয়াট গাড়ীর এককালে খুব চাহিদা ছিল। সম্প্রতি আবার তাহার উপর সরকারী নজর পড়িয়াছে। সে যাহাই হউক,

ছাদের উপর পরীক্ষাক্ষেত্র ও পাক দেওয়া পথ

এই ফিয়াট কোম্পানীর কারখানায় যে উপায়ে নূতন গাড়ী পরীক্ষা করা হয়, তাহা বিচিত্র এবং অভিনব। কারখানা বাড়ী দুই ভাগে বিভক্ত। এই দুইখানি বাড়ীর মুখ জুড়িয়া ছাদের উপর গাড়ী পরীক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। এ পথ চওড়ায় ৭৮ ফুট ৯ ইঞ্চি এবং ইহার প্রতিটি অংশ ১৪২৩ ফুট দীর্ঘ। মোটরের গতি-বেগ যাহাতে কমাইতে না হয়, সেজন্য বাঁকের মুখগুলি গোল করিয়া রচিত হইয়াছে। ডান দিকে যে ঘোরান পথের ছবি, তাহাতে গাড়ী চড়াইয়া দেওয়া হয়। গাড়ী যেমন উপরে যাইতে থাকে, অমনি তাহাকে গড়িয়া তুলিবার জন্য শিল্পীর দল লাগিয়া যায়। শেষ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ গাড়ীখানি ছাদে গিয়া পৌঁছায়।

সৌন্দর্য্য সৃষ্টির বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা

বর্ত্তমান যুগে রমণীকে সুন্দর ও শোভন করিবার বহু প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে। মুখের কোথাও কুঞ্চনরেখা দেখা দিলে, সৌন্দর্য্য

বৃদ্ধি কল্পে বহু প্রসাধনাগারে যন্ত্র সাহায্যে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া থাকে। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সমগ্র মুখমণ্ডলের কুঞ্চনরেখা অন্তর্হিত হইয়া যায়। নয়নপল্লবের কেশরাজিকেও তড়িৎশক্তির সাহায্যে চমৎকার ভাবে কুঞ্চিত করিবার ব্যবস্থা আছে। এই সঙ্গে যে চিত্র প্রদত্ত হইল,

বৈজ্ঞানিক উপায়ে চক্ষুর পক্ষ্মরাজিকে কুঞ্চিত করা হইতেছে

তাহাতে দেখা যাইবে যে, তরুণীর নয়নপল্লবের কেশরাজি এক ক্ষুদ্র বৈদ্যুতিক শক্তিচালিত ক্ল্যাম্পের সাহায্যে হিল্লোলিত করিবার ব্যবস্থা হইতেছে।

ক্ষুদ্রের দম্ভ

নিয়মিত কক্ষ-পথে চলি' গ্রহপতি
নিয়ন্ত্রণ করিতেছে সময়ের গতি;
দাম্ভিক ঘটিকা-যন্ত্র বকে—"টিক্ টিক্
আমি বিগড়া'লে সূর্য্য চলিবে বেঠিক!"

শ্রীঅদ্বৈতকুমার সরকার।

ইতিহাসের অনুসরণ

অন্ধকূপ-হত্যা

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

মিষ্টার হলওয়েল তাঁহার শেষ বিস্তারিত পত্রে মিসেস্ ক্যারির অন্ধকূপে আবদ্ধ থাকিবার কথা লিখিয়াছেন। কি আশ্চর্য্য! বড় বড় যোদ্ধা অন্ধকূপে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মরিল, কিন্তু এই সুন্দরী কোমলতনু রমণী বাঁচিয়া গেলেন! এই নারী এমনই সাধ্বী যে, স্বামীকে ছাড়িতে অসম্মত হইয়া অন্ধকূপে প্রবেশ করিয়াছিলেন! কিন্তু 'London Chronicle'এর দুইটি তালিকায় এই মিষ্টার ক্যারি যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন বলিয়া লিখিত হইয়াছে (Hill vol III p 72, 104)। হলওয়েলের "India Tracts" গ্রন্থে তিনি এই মিসেস্ ক্যারির সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন বলিয়া বর্ণিত আছে। এই মহিলা তখন কলিকাতায় বাস করিতেছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, তখন তাঁহার বয়স ছিল ১৫ বৎসর মাত্র এবং তাঁহার মাতা, ভগিনী আরও অনেক নারী ও শিশু অন্ধকূপে নিহত হইয়াছিল। কিন্তু হলওয়েল প্রমুখ প্রত্যক্ষদর্শিগণ এ কথা সমর্থন করেন নাই। হলওয়েল ও ল' বলেন, এই রমণীকে নবাবের অন্তঃপুরে লইয়া যাওয়া হয়; কিন্তু এই রমণী সে কথা স্বীকার করেন নাই। মিস্ ক্যারি নামে এক জন কুমারী ফল্তার জাহাজে আশ্রয় লইয়াছিলেন বলিয়া বহু পত্রে উল্লিখিত আছে (Hill vol III p 26, 107)। হলওয়েল তাঁহার তালিকায় জাহাজের নাবিকগণের মধ্যে ক্যারি নাম উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, Ormeর তালিকার নাবিকগণের মধ্যে কোন ক্যারির নাম নাই। উল্লিখিত 'লণ্ডন ক্রণিকেল' পত্রিকায় প্রকাশ পাইয়াছিল, William Baillie (of Council); Lt. Pickard; Lt. Bishop; Ensign Blagg; Carse; Sea-captain Parnel; Stephenson; Parker; Cary ইঁহারা সকলেই কলিকাতা অধিকারকালে যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন, কিন্তু হলওয়েল ইঁহাদিগকে অন্ধকূপের বন্দী ও নিহতের তালিকায় ফেলিয়াছেন।

'মুতাক্ষরীণে' দেখা যায়, নবাব কর্তৃক দুর্গ অধিকারকালে যে কয় জন স্ত্রীলোক দুর্গে ছিলেন, তাঁহাদিগকে ফলতায় পৌঁছাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। 'মুতাক্ষরীণ'কার লিখিয়াছেন—"এই সময়ে ইংরেজদিগের স্ত্রীলোকগণের মধ্যে কয়েক জন বিবি মির্জা আমিরবেগের হস্তে পড়েন। এই ভদ্রলোক সৈন্যাধ্যক্ষ মিরজাফর খাঁর অনুচর। মির্জা শিক্ষিত ও ভদ্রজনোচিত সংযম ও শিষ্টাচারের সহিত তাঁহাদিগকে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন; কেহ তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। পরে রাত্রিকালে তিনি তাঁহার প্রভু মিরজাফর খাঁকে সকল কথা জানাইলে তিনি তাঁহাকে একটি ভাউলিয়া বা দ্রুতগামী নৌকা দেন, সেই নৌকায় বিবিদিগকে উঠাইয়া ......অল্পক্ষণের মধ্যে তিনি তাঁহাদিগকে ১২ ক্রোশ দূরবর্ত্তী ড্রেক সাহেবের জাহাজে তুলিয়া দেন। ইহার পর ইংরেজগণ মির্জাকে পুরস্কার দিতে চাহিলে, তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া বলেন, তিনি ভদ্রলোক! ভদ্রলোকের যাহা কর্ত্তব্য, তিনি তাহাই করিয়াছেন।" সুতরাং অন্ধকূপে যে স্ত্রীলোক ও শিশু আবদ্ধ ছিল, এ কথা ভিত্তিহীন। হলওয়েলের শেষ পত্রে অন্ধকূপে নিহত ব্যক্তিদিগের তালিকায় ৫২ জনের নাম আছে, কিন্তু তাঁহার অর্থে নির্ম্মিত অন্ধকূপের স্মৃতিফলকে ৪৮ জনের নাম ছিল। ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে সহসা স্বদেশগামী জাহাজে বসিয়া হলওয়েল দেশস্থ বন্ধুকে সুদীর্ঘ বিস্তারিত পত্র কেন লিখিয়াছিলেন! কয়দিন পরেই তো বন্ধুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইত—তবে এ পত্র কেন?

হলওয়েল তাঁহার তৃতীয় ও চতুর্থ পত্রে অন্ধকূপের বন্দিগণের মধ্যে কালা ও শাদা উভয় শ্রেণীর লোকের উল্লেখ করিয়াছেন। Captain Grant বলেন, এই দুই শত বন্দীর মধ্যে য়ুরোপীয়, পর্ত্তুগীজ ও আর্ম্মেনীয় ছিল। কিন্তু Mr. William Davisকে ৩০শে জানুয়ারী ১৭৫৭ তারিখে লিখিত Mrs. Masseyর পত্র হইতে জানা যায়, দুর্গ অধিকারের পর আর্ম্মেনীয়দিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। Mr. John Cooke এক জন প্রত্যক্ষদর্শী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। সিরাজ কর্তৃক কলিকাতা অধিকারের সম্বন্ধে তিনি যে সাক্ষ্য প্রদান করেন, তাহাতে স্পষ্টই বলেন, "নবাব দুর্গ অধিকার করিয়া দুর্গে এত অল্প সৈন্য

দেখিয়া বিস্মিত হন। Mr. Drakeএর প্রতি ছিল নবাবের সমধিক ক্রোধ। হলওয়েলকে তাঁহার নিকট হস্ত-পদবদ্ধ অবস্থায় আনা হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার বন্ধনমুক্তির আদেশ দেন এবং সৈনিকোচিত অভয় বাক্যে বলেন যে, দুর্গবাসিগণের কেশাগ্র স্পর্শ করা হইবে না! তাহার পর নবাব মুক্ত প্রাঙ্গণে দরবার করেন। কৃষ্ণদাসকে (তাঁহাকে দুর্গ অবরোধ কাল হইতেই দুর্গে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছিল) দরবারে আনা হইলে তিনি প্রকাশ্যে তাঁহাকে সম্মানসূচক পরিচ্ছদ শিরোপা প্রদান করেন। আর্ম্মেনীয় ও পর্ত্তুগীজগণকে মুক্তি দেওয়া হইলে তাহারা গৃহে ফিরিয়া যায়।"

ইহা হইতে দুর্গে তখন পর্ত্তুগীজ বা আর্ম্মেনীয় ছিল বলিয়া মনে হয় না। এদিকে ৫৬ অথবা ৩৬ জন ওলন্দাজ যদি পূর্ব্বেই পলায়ন করিয়া থাকে, তাহা হইলে অন্ধকূপের বন্দীর সংখ্যা ক্রমশঃ নানা প্রমাণে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া যাইতেছে।

তাহার পর প্রশ্ন হইতেছে—অন্ধকূপের আয়তন। হলওয়েলের মতে ইহার আয়তন ১৮´×১৮´=৩২৪ বর্গফুট। Mr. Cookএর মতে ইহার আয়তন ১৮´×১৪´; কেহ কেহ ইহার আয়তন বলিয়াছেন ১৬´×১৬´; কিন্তু C. R. Wilson প্রমাণ করিয়াছেন (Old Fort William in Bengal vol II p 245) অন্ধকূপের আয়তন ছিল ১৮´×১৪´-১০´´। অবশ্য মিষ্টার R. R. Bayne অন্ধকূপের দৈর্ঘ্য ১৭ ফুটের অধিক বলেন নাই (Old Fort William in Bengal vol II p 203)। যদি অন্ধকূপের আয়তন হয়, ১৮´×১৪´-১০´´ =২৬৭ বর্গফুট এবং তাহাতে যদি ১৩৬ জন লোককে ঠাশা হয়,—প্রত্যেকের জন্য কিছু কম ১.১৫ বর্গফুট স্থান থাকে। এটুকু জায়গায় কোন মানুষ দাঁড়াইয়া থাকিতেও পারে না যে!

নবাব কেন ইংরেজদিগকে অন্ধকূপে আবদ্ধ করিয়াছিলেন? সে সম্বন্ধে হলওয়েল দ্বিতীয় পত্রে বলিয়াছেন—"আমাদের বাধা প্রদানে এবং তাহাতে নবাবের যে ক্ষতি হইয়াছিল, তাহাতে নবাব ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে এবং অন্যান্য বন্দিগণকে লইয়া ১৬৫ বা ১৭০ জনকে নির্ব্বিচারে অন্ধকূপ নামক দুর্গের একটি ক্ষুদ্রায়তন কারাকক্ষে আবদ্ধ রাখিতে আদেশ দিলেন।" পরের পত্রে এ দায়িত্ব তিনি নবাবের স্কন্ধ হইতে তাঁহার জমাদার ও বরকন্দাজগণের স্কন্ধে চাপাইয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, "আমাদের এতগুলি লোককে মুক্ত অবস্থায় ছাড়িয়া রাখা অনুচিত বোধে নবাব সাধারণভাবে আমাদিগকে সেই রাত্রে বন্দী করিতে বলিয়াছিলেন।" হলওয়েলের চতুর্থ পত্রে তিনি বলিতেছেন, "নবাব সৈনিকোচিত অভয় দানে বলিয়াছিলেন, আমাদের কোন অনিষ্ট হইবে না।" Cookeএর সাক্ষ্যেও এই কথা আছে। তবে হলওয়েলকে নবাব বন্দী করিলেন কেন, আমরা উপসংহারে তাহার আলোচনা করিব।

হলওয়েল তাঁহার প্রথম পত্রে বলিয়াছেন, নবাবের সৈন্যগণ জানালা ও দরজার মধ্য দিয়া নিরস্ত্র বন্দীদিগের উপর গুলীবর্ষণ করিয়াছিল, ইহার পরিবর্ত্তে তৃতীয় পত্রে বলিতেছেন, তাহারা অপমানসূচক গালিবর্ষণ করিয়াছিল। শেষ পত্রে বলিয়াছেন, অপমানের পরিবর্ত্তে বৃদ্ধ জমাদার জল আনিয়া দিল। আরও দুই একটি পত্রে এই গুলী মারার বিবরণ আছে। পরিশেষে কাশিমবাজার কুঠীর অধ্যক্ষ Law সাহেবের বিবরণে হলওয়েলের এই কাহিনীর একটি সামঞ্জস্যের প্রয়াস হইয়াছে। "যাহাতে রক্ষিগণ গুলী করিয়া এই হতভাগ্য বন্দিগণের সমস্ত দুঃখের অবসান করে, এই আশায় মুসলমানগণকে উদ্দেশ করিয়া বন্দিগণ অকথ্য গালাগালি দিতে লাগিল। তাহার পর এক জন তাহার সঙ্গীর বেল্ট হইতে একটি পিস্তল লইয়া যে সকল মুসলমান জানালার নিকট দিয়া যাইতেছিল, তাহাদিগকে গুলী করিল; কিন্তু পিস্তলে গুলী ছিল না, ফাঁকা আওয়াজ হইল। রক্ষিগণ ভীত হইয়া জানালার মধ্যে বন্দুকের নল চালাইয়া বহুবার গুলীবর্ষণ করিল। এই গুলী বুকে পাতিয়া লইবার জন্য কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল।" এ কাহিনী কিন্তু অপর কোন প্রত্যক্ষদর্শী বলেন নাই। ইহা ব্যতীত হলওয়েল তাঁহার শেষ পত্রে বহু বিষয় পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়াছেন। মিসেস্ ক্যারি এবং Leech নামক এক জন কর্ম্মকারের কাহিনী তিনি Siren জাহাজে বসিয়াই সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, ৩রা জুলাইয়ের চন্দননগরের পত্রে লিখিত হইয়াছে, মুসলমানগণ নিরস্ত্রকে হত্যা করে না। পরে আরও অনেক পত্রে লিখিত হইয়াছে, দুর্গ অধিকারকালে নবাবের সৈন্যগণ যাহাকে সম্মুখে পাইল, কাটিয়া ফেলিল; কিন্তু নবাবের নিষেধে সেই হত্যাকাণ্ড নিবারিত

হয়। বহু স্থানে বহু ইংরেজ স্বীকার করিয়াছেন, মুসলমানগণ স্ত্রীলোকের অসম্মান করে নাই। নবাব যদি দুর্গস্থ আর্মেনীয় ও পর্তুগীজদিগকে মুক্তি দিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি রমণী ও শিশুদিগকে বন্দী করিয়াছিলেন, ইহা কি বিশ্বাসযোগ্য ?

আমাদের মনে হয়, মিসেস ক্যারি বা কোন রমণী বা শিশু অন্ধকূপে বন্দী হয় নাই। হয় ত মিষ্টার হলওয়েলই এই অন্ধকূপ-হত্যা কাহিনীর মূল বক্তা। তাঁহার শিক্ষায় ও তাঁহার পথানুবর্ত্তী হইয়া অপর সকলে এই কাহিনী পল্লবিত করিয়াছিল।

অন্ধকূপ হত্যার কথা এই সকল পত্র ব্যতীত কোন সরকারী পত্রে আলোচিত হইয়াছে কিনা দেখা যাউক। ২২শে আগষ্ট ১৭৫৬ তারিখে ফলতায় ফিনিক্স জাহাজে ইংরেজ কাউন্সিলের যে পরামর্শ-সভা বসে, তাহাতে গভর্ণর ড্রেক, উইলিয়ম্ ওয়াট্‌স্, মেজর কিলপ্যাট্রিক এবং মিঃ হলওয়েল উপস্থিত ছিলেন, এই সভার বিবরণের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

"Major Kilpatrick on the 15th instant wrote a complimentary letter to the Nabob Surajed Dowla complaining a little of the hard usage of the English Honorable Company, assuring him of his good intentions notwithstanding what had happened, and begging in the meantime, till things were cleared up, that he would treat him at least as a friend, and give orders that our people may be supplied with provisions in a full and friendly manner."—(Long's Selections from unpublished Records of Government etc. Vol I p 75)

এই বিবরণ হইতে বুঝা যায়, যে নবাব অন্ধকূপ-হত্যার নায়ক, তাঁহাকে মেজর কিলপ্যাট্রিক এইরূপ পত্র লিখিতে পারেন না। ১৩ই জুলাই ফলতার কাউন্সিল হইতে মাদ্রাজে ফোর্ট সেণ্ট জর্জ্জে যে পত্র লেখা হইয়াছিল, তাহাতে অন্ধকূপ-হত্যার নামোল্লেখ নাই। ১৭ই সেপ্টেম্বর ফলতার কাউন্সিল হইতে কোর্ট অব ডিরেক্টরে যে পত্র লেখা হয়, তাহাতে লেখা হইয়াছিল—"The fort surrendered upon promise of their civil treatment of the prisoners."

এই পত্রে অন্ধকূপ-হত্যার নামোল্লেখ নাই। যদিও এই পত্রের স্বাক্ষরকারিগণের মধ্যে স্বয়ং হলওয়েল এক জন (Hill vol I p. 214—19)। সিরাজকে ক্লাইভ যে শেষ পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে অন্ধকূপ-হত্যার উল্লেখ নাই। ৯ই ফেব্রুয়ারী ১৭৫৭ তারিখের আলিনগরের সন্ধিতে অন্ধকূপ-হত্যার উল্লেখ নাই এবং মীরজাফরের সহিত ৩রা জুন যে সন্ধি হইয়াছিল, তাহাতেও অন্ধকূপ-হত্যার উল্লেখ নাই।

এখন দেখা যাক, সমসাময়িক দেশীয় ঐতিহাসিকগণের ইতিহাস হইতে কি জানিতে পারি! তিন জন মুসলমান ঐতিহাসিকের মধ্যে 'রিয়াজের' রচয়িতা গোলাম হোসেন সলেমী লিখিয়াছেন, "সিরাজ রমজান মাসে ইংরেজদিগকে রণক্ষেত্রে পরাজিত করিলেন; ইংরেজ সরদার তথা হইতে নৌকাযোগে বাহিরে পলায়ন করিলেন। সিরাজ সমগ্র কলিকাতা লুণ্ঠন পূর্ব্বক তাহার আলিনগর নাম দিলেন এবং তৎপর রাজা মাণিকচাঁদকে বহু সৈন্যসহ নগররক্ষার্থ নিয়োজিত করিলেন। তিনি ইংরেজের নৌকাগমনাগমনের পথপার্শ্বে মাখওয়া ও বজবজ নামক স্থানে থানা সংস্থাপন করিয়া রমজান মাসের শেষে মুর্শিদাবাদে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।"—(৺রামপ্রাণ গুপ্তের অনুবাদ)। সুতরাং দেখা যাইতেছে, 'রিয়াজে' অন্ধকূপ-হত্যার কোন উল্লেখ নাই।

'মুতাক্ষরীণের' রচয়িতা সৈয়দ গোলাম হোসেন খাঁ লিখিয়াছেন, "অল্পক্ষণের মধ্যেই অনায়াসে তিনি (সিরাজ) অচিরে ইংরেজদিগের নগরটি অধিকার করিয়া ফেলিলেন; এবং ড্রেক সাহেব ব্যাপার অত্যন্ত সঙ্গীন বুঝিয়া সমস্ত ফেলিয়া রাখিয়া পলাইয়া গেলেন, যাইবার সময় সঙ্গিগণকে খবর দিয়াও গেলেন না। তিনি একটি জাহাজে আশ্রয় লইলেন। যাহারা রহিল, তাহারা নায়কবিহীন অবস্থায় হতাশ হইয়া পড়িল; কিন্তু আত্মসম্মান-বোধে উদ্দীপিত হইয়া তাহাদের অধিকাংশ যতক্ষণ গুলী-বারুদ ছিল, ততক্ষণ যুদ্ধ করিয়া বীরের ন্যায় মরণকে আলিঙ্গন করিল, বাকী কয়েক জন দুর্ভাগ্যক্রমে বন্দী হইল। কোম্পানীর কুঠী এবং প্রধান প্রধান ইংরেজ, হিন্দু এবং আর্ম্মেনীয় বণিকগণের গৃহে যে প্রচুর অর্থ ও দ্রব্যসম্ভার ছিল, নবাব-সৈন্যগণের মধ্যে যাহারা অতিশয় দুরাত্মা, তাহারা তাহা লুণ্ঠন করিয়া লইল। এই ঘটনা আলিবর্দ্দী খাঁর মৃত্যুর ঠিক ৭২ দিন পরে ১১৬৯ হিজিরার রমজান মাসের

২২শে তারিখে ঘটিয়াছিল। কাশীমবাজার কুঠীর অধ্যক্ষ মিষ্টার ওয়াট্স্ কলিকাতার অপর কয়েক জনের সহিত বন্দী হইয়া আটক ছিলেন।" সুতরাং এই বিবরণেও অন্ধকূপ-হত্যার উল্লেখ নাই।

'মুজাফ্ফরনামা'র বর্ণনাও 'মুতাক্ষরীণের'ই অনুরূপ—"শত্রুগণকে বাধা দেওয়া অসম্ভব, সন্ধিস্থাপনের আশা নাই দেখিয়া ইংরেজ-ভদ্রলোকগণ জাহাজে উঠিয়া সমুদ্রাভিমুখে পাড়ি দিলেন; কতকগুলি ইংরেজ-সেনা পলায়নের পথ বন্ধ দেখিয়া আত্মসম্মান-বোধে যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিল। অল্প কয়েক জন দুরদৃষ্ট বশতঃ বন্দী হইল।" ইহাতেও কিন্তু অন্ধকূপ-হত্যার উল্লেখ নাই।

সমসাময়িক ইংরেজ-ঐতিহাসিকদিগের মধ্যে Orme, Holwell এবং Ivesএর নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা সকলেই অন্ধকূপ-হত্যার উল্লেখ করিয়াছেন। Orme এবং Ives, হলওয়েল প্রমুখ অন্ধকূপ-হত্যার বন্দিগণের নিকট হইতে যাহা শুনিয়াছেন বা যে সব ঐতিহাসিক উপাদান পাইয়াছেন, তাহারই উপর ভিত্তি করিয়া ইতিহাস রচনা করিয়াছেন।

নবাব অথবা তাঁহার কোন কর্ম্মচারী কোনও পত্রে কখনও অন্ধকূপ-হত্যার কোন উল্লেখ বা ইঙ্গিত করেন নাই।

এখন দেখা যাক, এই সকল ঐতিহাসিক উপাদান হইতে কি সত্য উদ্ধার করা যাইতে পারে।

১। অন্ধকূপ-হত্যা যদি সত্যই ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে নবাব সে জন্য দায়ী কি না?

২। অন্ধকূপ-হত্যা আদৌ ঘটিয়াছিল কি না?

৩। অন্ধকূপ-হত্যা ঘটিয়া থাকিলে তাহার প্রকৃত গুরুত্ব কতটুকু?

এই তিনটি প্রশ্ন সমাধানের প্রয়াস পাইতেছি।

প্রথম প্রশ্নের উত্তর অতি সহজ—হলওয়েল স্বয়ং স্বীকার করিতেছেন, নবাব অন্ধকূপ-হত্যা সম্বন্ধে কিছুই জানিতেন [illegible] প্রথম হইতে বন্দিগণের প্রতি নবাবের ব্যবহার পর্য্যালোচনা করিলে এ বিষয়ে স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। আমরা নানা প্রমাণ হইতে দেখিয়াছি, নবাব দুর্গে আসিয়া সম্পূর্ণরূপে দুর্গবাসীকে অভয় প্রদান করিয়াছেন। বন্দী কৃষ্ণদাসকে শিরোপা দিয়াছেন, আর্ম্মেনীয় ও পর্ত্তুগীজগণকে মুক্তিপ্রদানের অনুমতি করিয়াছেন, সেই সঙ্গে বহু ইংরেজকেও ছাড়িয়া দিয়াছেন; তবে তিনি হলওয়েল প্রমুখ কয়েক জনকে বন্দী করিলেন কেন? রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাস ঘসেটী বেগমের বহু ধন-রত্ন লইয়া কলিকাতায় পলাইয়া আসিয়া ইংরেজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস কলিকাতায় দুর্গে বন্দী ছিলেন। নবাবের সন্দেহ হয়, কৃষ্ণদাসের সমস্ত ধন-রত্ন ইংরেজগণ অপহরণ করিয়াছেন, হলওয়েল তাহার সন্ধান জানেন। এক জন ফরাসী তাঁহার পত্রে এই ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন:—

"They (i. e. the English) embarked the money deposited by the Begum of Mati Jil and Raja Balv, as well as immense sums which their merchants and private people had put in their charge, thinking that they and their fortunes would be safe with them. It is said that all the money which they are carrying off amounts possibly to more than 4 krors."—(Hill Vol I p 179-80)

নবাব হলওয়েলকে সেই অর্থের সন্ধান জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু তিনি তাহার সন্ধান জানিতেন না। তাঁহার কথায় নবাবের প্রত্যয় হয় নাই; কাযেই নবাব তাঁহাকে বন্দী করেন। হলওয়েল তাঁহার তৃতীয় পত্রে নবাবকে নির্দ্দোষ বলেন; কিন্তু হতভাগ্য নবাবের মৃত্যুর পর এই হলওয়েলই নিজ অর্থে অন্ধকূপ-হত্যার স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে লেখেন—"By the tyrannic violence of Surajud Dowla Suba of Bengal." হলওয়েল তো দূরের কথা, স্বয়ং Clive আলমগীর সানীকে যে পত্র লেখেন, তাহাতেও তিনি স্বয়ং সিরাজকে এই হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী করেন। সিরাজের জীবদ্দশায় Clive জগৎ শেঠকে যে পত্র লেখেন, তাহাতে অন্ধকূপ-হত্যা নবাবের কর্ম্মচারীদিগের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়াই অভিযোগ করিয়াছিলেন।

সুতরাং সুবিধাবাদী ক্লাইভ ও হলওয়েল সিরাজের স্কন্ধে এই কলঙ্ক চাপাইবার জন্য প্রয়াস পাইলেও বহু প্রমাণে এই স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, অন্ধকূপে হত্যা ঘটিয়া থাকিলেও নবাব সে-বিষয়ে কিছুই জানিতেন না।

আধুনিক অনেক ঐতিহাসিকের ধারণা, অন্ধকূপ হত্যা

মোটেই ঘটে নাই। তাঁহারা প্রমাণসকলের অসামঞ্জস্য, পরস্পর-বিরোধী উক্তি এবং হলওয়েলের স্বভাবগত মিথ্যা ভাষণের উল্লেখ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। কিন্তু মনে হয়, ঘটনাটি একেবারে কাল্পনিক নহে, কিছু একটা ঘটিয়াছিল। ইহার কারণ, Watson, Clive প্রভৃতি নবাবকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার কলিকাতা আক্রমণের ফলে কয়েক জন ইংরেজ নৃশংসভাবে নিহত হইয়াছিল বলিয়া আভাস আছে। জগৎ শেঠকে Clive যে পত্র লেখেন, তাহাতে তিনি ১২০ জনের অন্ধকূপে নিহত হওয়ার উল্লেখ করেন। এ সম্বন্ধে নবাবের পক্ষ হইতে কোন প্রতিবাদ হয় নাই। 'মুতাক্ষরীণ'-রচয়িতা ও 'মুজাফ্‌ফর-নামা' রচয়িতা "দুরদৃষ্টবশতঃ" বা "দুর্ভাগ্যক্রমে" কয়েক জনের বন্দিদশায় থাকিবার উল্লেখ করায়, নিতান্ত কয়েক দিনের জন্য বন্দী থাকা অপেক্ষা একটু গুরুতর কিছু বুঝাইতে চাহিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। হলওয়েল অনেক কিছু মিথ্যা উক্তি করিয়াছেন বলিয়া এই ঘটনাটা একেবারেই মিথ্যাভাষণ বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। Cook, Grant প্রভৃতি কয়েক জনের উক্তি হইতে অন্ধকূপের ঘটনা একেবারেই মিথ্যা বলিয়া মনে হয় না। মিথ্যা দীর্ঘকাল অপ্রকাশ থাকে না; কিন্তু অন্ধকূপ-হত্যা বলিয়া যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা অতি সামান্য ব্যাপার। কয়েক জন আহত মুমূর্ষুর সহিত কয়েক জন জীবন্ত সুস্থ ব্যক্তিকে কোন একটি ঘরে আবদ্ধ রাখা হইয়াছিল। আহত ব্যক্তিগণ পিপাসায় ও অত্যধিক উত্তাপে চিকিৎসার অভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল, ইহাই হলওয়েল ও তাঁহার অনুচরবৃন্দ ঢক্কানিনাদ করিয়া জগতে মহা নৃশংস ঘটনা বলিয়া প্রচার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইহা অপেক্ষা কত নৃশংস ব্যাপারই না এই সভ্য যুগের সভ্য জাতিগণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত হইতেছে। বিষয়টি এতই গুরুত্বহীন যে, কোন সরকারী কাগজপত্র বা সন্ধি প্রভৃতিতে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন হয় নাই। কেবল যেখানে সিরাজের কলঙ্ক উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিবার আবশ্যক হইয়াছে, তখনই এই কাহিনী পল্লবিত করা হইয়াছে। উদ্দেশ্য—নবাবের সহিত কলহ বাধাইবার দায়িত্ব বিলাতের কর্তৃপক্ষের নিকট লঘু করিবার প্রয়াস। ইংরেজ কোম্পানী বা গভর্নমেন্টের ব্যয়ে অন্ধকূপ-হত্যার কোন স্মৃতিফলক বা স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। মিঃ হলওয়েল নিজ ব্যয়ে অন্ধকূপ-হত্যার যে স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, Customs House নির্ম্মাণ সময়ে তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। কয়েক জন ইংরেজের আন্দোলন প্রশমনজন্য লর্ড কর্জন ভারতের অর্থে এই অলীক কলঙ্কস্তম্ভটির পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। অসহযোগ আন্দোলন সময়ে ক্রমান্বয়ে কয়েক জন হিন্দু-যুবক এই স্মৃতিস্তম্ভটি ভাঙ্গিবার অভিযান করিয়া সাদরে কারাবরণ করিয়াছিলেন। ইহাই অন্ধকূপ-হত্যার রহস্য-সমাধান।

অন্ধকূপ-হত্যার স্মৃতিস্তম্ভ

শ্রীত্রিদিবনাথ রায় (এম্-এ, বি-এল)।

লোভের ফল

(রূপকথা)

এক যে ছিলেন রাজা, তাঁর নামটি ছিল দিগ্বিজয় সিং। যেমন জমকাল নাম, তেমনই অগাধ তাঁর ধন-দৌলত। তাঁর হাতীশালে আট ন'শো হাতী, ঘোড়াশালে হাজার হাজার ঘোড়া, কিল্লায় লাখ লাখ ফৌজ; আর তাঁর কোষাগারে হীরা, জহরৎ, মণি-মুক্তা, চুণী-পান্নার পাহাড়! যেমন রাজা, তেমনই তাঁর রাণী। রাণীর নাম গুণবতী। তিনি ছিলেন রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী। তাঁরা ছিলেন প্রজার মা-বাপ। তাঁদের প্রজাদের কোন দুঃখ-কষ্ট ছিল না।

কিন্তু রাজা-রাণীর দুঃখ—তাঁদের ছেলে-মেয়ে ছিল না। রাজা-রাণী বুড়া বয়সেও ছেলে-মেয়ের মুখ দেখ্‌তে পেলেন না। কত যাগ, যজ্ঞ, তন্ত্র-মন্ত্র; রাণী কত রকম কবচ, মাদুলী ধারণ করলেন, সব বিফল হ'ল, রাণীর ছেলে-মেয়ে কিছুই হ'ল না।

রাণী রাজসংসারে তাঁর ছোট ভাইটিকে প্রতিপালন করছিলেন। রাণীর ভাই, কাযেই সে রাজার শালা। তার আসল নামটি কি, তা কারও জানা ছিল না। রাজা তার নাম রেখেছিলেন ষাঁড়ের গোবর। কিন্তু রাজা-রাণী আদর ক'রে তাকে গোবরা ব'লে ডাক্‌তেন। রাজসংসারে গোবরার আদরের সীমা ছিল না। রাণীর আদরে গোবরা দিন দিন কোলা ব্যাঙের মত ফুলে উঠেছিল। সকলে বলাবলি ক'রত, রাজা কি বুড়া বয়সে গোবরাকে 'পুষ্যিপুত্তুর' করবেন? রাজার সভাপণ্ডিত বিদ্যাভূষণজী বলতেন, "শালা কি কখন পুষ্যিপুত্তুর হ'তে পারে? শালাকে চিরদিন শালা হ'য়েই থাকৃতে হয়—তা হোক না কেন সে রাজার শালা।"

প্রজারাও রাজার শালা ষাঁড়ের গোবরকে 'গোবরা' ব'লে ডাকে, এ দুঃখ তার প্রাণে সয় না। সে তার দিদি-রাণীকে বল্‌ল, "প্রজারা, রাজবাড়ীর দাস-দাসী, পাইক, নকীব, বরকন্দাজ, হাতীর মাহুত, ঘোড়ার সহিস, গরুর রাখাল, সকলেই আমাকে গোবরা ব'লে ডাকে, দিদি! এ দুঃখে পরাণ আমি আর রাখ্‌ব না, গলায় কলসী বেঁধে গঙ্গায় আমি ডুবে মরবো; তখন মজাটা তুমি দেখ্‌তে পাবে! রাজাকে আমি শিক্ষা না দিয়ে যদি মরি, তা হ'লে আমি গোবরা নাম থেকেই খারিজ!"

ছোট ভাইটির কথা শুনে রাণী বল্‌লেন, "এ-ও কি একটা কথা, ভাই? এ-সব তুই বল্‌ছিস্‌ কি? তুই অভিমানভরে জলে ডুবে মরলে আমার এ ধন-দৌলত, বিষয়-সম্পত্তি ভোগ করবে কে? তুই আর আক্ষেপ করিস্‌ নে, তোর এ দুঃখ আমি দূর করব।"

রাণী রাজাকে ভাইএর দুঃখের কথা জানিয়ে তার সকল দুঃখ দূর করবার জন্য তাঁকে অনুরোধ করলেন; বল্‌লেন, রাজা যদি তাঁর ছোট ভাইটির মনের কষ্ট দূর না করেন, তা হ'লে তিনি গোসা-ঘরে গিয়ে দরজায় খিল দিয়ে অনাহারে প্রাণ বিসর্জ্জন করবেন।

রাজার হুকুমে রাজ্য জুড়ে পরদিন ডঙ্কা পড়লো—রাজার শালা ষাঁড়ের গোবরকে এখন থেকে সকল লোক 'শালা-রাজ' ব'লে ডাকবে। এ হুকুম যে তামিল না করবে, তাকে ছ'মাসের জন্য ফাটকে আটক থাক্‌তে হবে, তার উপর আরও ছ'মাস ফাউ!

সেই দিন থেকে ষাঁড়ের গোবর হ'ল 'শালা-রাজ'।

২

রাজার পাত্র-মিত্ররা রাজসভায় ব'সে আছেন। শালা-রাজাকে রাজসভায় হাস্‌তে হাস্‌তে আস্‌তে দেখে পাত্র-মিত্ররা সকলে উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লে, 'আসুন, আস্‌তে আজ্ঞা

হোক শালা-রাজ! আপনি মহারাজার হুকুমে নূতন নামে কায়েম-মোকাম হ'য়েছেন শুনে আমরা সবাই সুখের সাগরে সাঁতার দিচ্ছি।'

এই কথা ব'লে রাজসভার পাত্রমিত্র সকল লোক সাঁতার দেওয়ার ভঙ্গীতে হাত-পা নাড়তে লাগ্‌লেন।

শালা-রাজ বল্‌লে, "হাঁ, রাজা আমার ঘাড়ে একটা নূতন নাম চাপিয়ে দিয়েছেন। এটা ঠিক নাম নয়, খেতাব। এ খেতাব উপার্জ্জন করতে তেলের বদলে আমাকে একটু জল খরচ করতে হয়েছে; সে জলও দু'ফোঁটা চোখের জল। এই খেতাবের অর্থ কি আপনাদের জানা আছে?"

মন্ত্রী বল্‌লেন, "ঐ ত সভায় রাজপণ্ডিত বিদ্যাভূষণ্ডী মশায় ভুঁড়ি প্রকট ক'রে ব'সে আছেন; উনিই শালা-রাজের অর্থ করুন।"

সভাপণ্ডিত বিদ্যাভূষণ্ডী নাকের ছ্যাঁদায় এক এক টিপ নস্যি গুঁজে সজল নেত্রে বল্‌লেন, 'শালা-রাজ অর্থ যুবরাজ, অর্থাৎ ভবিষ্যৎ রাজা। রাজার ত ছেলে-মেয়ে নেই, উনিই হবেন ভবিষ্যতে এ রাজ্যের রাজা। এজন্য উনি শালা-রাজ কি না যুবরাজ; রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারী।"

সভাপণ্ডিতের টিকির ও টীকার বাহারে শালারাজ ভারী খুসী! পাত্র-মিত্র সকলেই ধন্য ধন্য করতে লাগ্‌লেন।

রাজা দিগ্বিজয় সিং খুব দাতা ছিলেন। তিনি দেশের গরীব-দুঃখীদের দুঃখ নিবারণের জন্য দান করতেন; কারও মা-বাপের শ্রাদ্ধ হচ্ছে না, কেউ খরচ-পত্র ক'রে মেয়ের বিয়ে দিতে পারছে না, কারও রোগের চিকিৎসা চল্‌ছে না, বা কারও ঘর পুড়ে গিয়েছে; রাজা দিগ্বিজয় সিংএর কাছে গিয়ে একবার হাত পাত্‌লে তার সকল অভাব ঘুচ্‌ত। রাজা প্রজাদের কাছে যে কর সংগ্রহ করতেন, তার তিন গুণ দান করায় তাঁর ধনাগার ক্রমশঃ খালি হয়ে গেল।

রাজা বড় শোলোক ভাল বাস্‌তেন; এজন্য তিনি ঘোষণা করলেন, যে পণ্ডিত নূতন শোলোক তাঁকে শুনিয়ে যেতে পারবেন, তাঁকে শিরোপা দেওয়া হবে। যাঁর শোলোক যত ভাল হবে, তিনি তত বেশী টাকা পাবেন।

রাজ্য জুড়ে রাজার এই ঘোষণা শু'নে বড় বড় পণ্ডিত নূতন নূতন শোলোক রচনা ক'রে রাজাকে শুনিয়ে যেতেন। রাজা খুসী হ'য়ে অনেক টাকা দিয়ে তাঁদের বিদায় করতে লাগ্‌লেন। এজন্য রাজার ধনভাণ্ডার আরও শীঘ্র খালি হ'তে লাগ্‌ল।

রাজার এই রকম দান-খয়রাৎ দেখে শালা-রাজ দিন দিন মনের আগুনে জ্বল্‌তে লাগ্‌ল। সে ভাব্‌ল, রাজা ত বুড়ো হ'য়েছেন, আর কত কালই বা বাঁচবেন? তিনি চোখ বুজ্‌লে এই সোনার রাজপাট ত তারই ভোগে লাগ্‌বে; কিন্তু দানখয়রাতে রাজা রাজভাণ্ডার খালি করলে সে আর কি নিয়ে সুখভোগ করবে? রাজার দান কি ক'রে বন্ধ করা যায়, এ কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে তার আহার-নিদ্রা বন্ধ হ'য়ে গেল। সে কোন উপায় স্থির করতে পারল না। দুশ্চিন্তায় দিন দিন সে শুকিয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল।

শালা-রাজের এক বন্ধু ছিল, তার নাম ভোম্‌রা। ভোম্‌রা শালা-রাজকে সকল সময় কু-পরামর্শ দিত। শালা-রাজের মনের কথা শুনে ভোম্‌রা মাথা নেড়ে হেসে বল্‌লে, "এই কথা? দান-খয়রাৎ করা রাজার বহুকালের কু-অভ্যাস; রাজা বেঁচে থাক্‌তে তার এ অভ্যাস বন্ধ হবে না। রাজার ধন-দৌলত ফুরিয়ে গেলে তার রাজ্যপাট নিয়ে কি তুমি ধুয়ে খাবে? তোমার কোন লাভ হবে না, তোমার দুঃখও ঘুচ্‌বে না। রাজা জানে, তার ছেলে-মেয়ে নেই, তাই নাম কিন্‌তে যথা-সর্ব্বস্ব দু'হাতে উড়িয়ে দিচ্ছে। রাজার এই অভ্যাস বন্ধ করবার যে উপায় আছে, তা করতে কি তোমার সাহস হবে, ভাই গোবরা?"

শালা-রাজ বল্‌লে, "উপায়টা কি, বল ভাই ভোমরা; আমাকে তা' করতেই হবে।"

ভোম্‌রা বল্‌লে, "উপায় সহজ; কিন্তু কাযটা শেষ করা কঠিন। আমি বলি কি, রাজাটাকে এক দিন সাবাড় কর। রাজার গলা কেটে ধড়টা এক দিকে, আর মুণ্ডটা অন্য দিকে ফেলে দাও। তার পর তুমিই রাজা হবে, আর আমি হব তোমার মন্ত্রী। তোমার সকল দুঃখ-কষ্ট দূর হবে। তখন মনের সুখে হাতে প্রজাদের মাথা [illegible]

কিন্তু রাজাকে খুন করা ত সহজ কায নয়। নিজের হাতে খুন করতে গিয়ে যদি তাকে ধরা পড়তে হয়, তা হ'লে হয় ফাঁসে, না হয় শূলে তার প্রাণ যাবে। কে রাজসিংহাসনে বস্‌বে? এ রাজ-ঐশ্বর্য্যই বা ভোগ করবে কে?

গোব্‌রার মিতে ভোম্‌রার মাথায় অনেক ফন্দী-ফিকির আস্‌ত। সে বল্‌লে, "নিজের হাতে যখন ও-কায করতে পারবে না, তখন এক কায কর। রাজার নাপিত হরবোলা পরামাণিককে কিছু টাকা দিয়ে বশ কর; সে রাজাকে কামাতে সুরু ক'রে ক্ষুরখানা যখন রাজার গলার কাছে আন্‌বে, সেই সময় সেই ক্ষুর ফস্ ক'রে রাজার গলার নালীতে বসিয়ে এমন জোরে পোঁচ দেবে যে, তাতেই গলা দু'-ফাঁক হ'য়ে যাবে; রাজা অক্কা পাবে, তুমি তার রাজ্য লাভ করবে। তোমার দিদি মনের দুঃখে কাঁদাকাটি করবে বটে, কিন্তু সে কথা ভাব্‌লে ত আর চল্‌বে না; রাজ্যলাভ করতে হ'লে অনেক ফন্দী-ফিকির না করলে চলে না।"

শালা-রাজ বল্‌লে, "নাপিত-বেচারারও যে প্রাণ যাবে, তার প্রাণরক্ষার উপায় কি?"

ভোম্‌রা বল্‌লে, "হরবোলা নাপিত বল্‌বে—'রাজাকে কামাতে কামাতে দৈবাৎ হাত পিছ্‌লিয়ে ক্ষুরখানা রাজার গলায় ব'সে যাওয়ায় গলাটা কাটা গিয়েছে। বড় বড় লোককে কামাতে বস্‌লে ঐ রকম ছোট-খাট ভুল এক আধ দিন হ'য়েই থাকে। হাত সাম্‌লাতে পারিনি, সে দোষ কি আমার?'—তা এই অপরাধে হরবোলার যদি শাস্তি হয়-ই, তবে বড় জোর তার ফাঁসি হবে। তার বেশী ত আর কিছু হবে না। যদি তার প্রাণ যায়, তার বৌ, তার ছেলে-মেয়েদের প্রতিপালনের জন্য কিছু টাকা দিও—তা'হ'লে সব গোল মিটে যাবে।"

বন্ধু ভোম্‌রার এই পরামর্শ খুব ভাল ব'লেই শালা-রাজের ধারণা হ'ল। রাজার নাপিত হরবোলা পরামাণিক শালা-রাজকে এক দিন কামাতে ব'সেছে; শালারাজ তাকে এ-কথা সে-কথা বল্‌তে বল্‌তে শেষে রাজার গলায় ক্ষুর দেওয়ার প্রস্তাব ক'রল। সে কথা শুনেই পরামাণিকের চক্ষু চড়ক-গাছ! ভয়ে তার সর্ব্ব-শরীর থর-থর ক'রে কাঁপতে লাগ্‌ল। ক্ষুরখান তার হাত থেকে খ'সে প'ড়ল। কিন্তু শালারাজ তাকে নানা রকম ভরসা দিয়ে এক হাজার টাকা শিরোপার লোভ দেখা'ল। পরামাণিক লোভে প'ড়ে মাথা চুল্‌কাতে লাগ্‌ল; শেষে শালারাজের প্রস্তাবেই তাকে রাজী হ'তে হ'ল। স্থির হ'ল, রাজাকে কামাতে ব'সে সে ক্ষুর চালিয়ে তাঁর গলা কাটবে।

রাজা দিগ্বিজয় সিংএর রাজধানী দিক্‌নগরের পাশে ছোট একখান গ্রাম, এই গ্রামের নাম গরীবপুর। গরীবপুরের প্রায় সকল লোকই গরীব; কারও ঘরের চালে খড় নাই, কারও দু'বেলা অন্ন জোটে না; কারও 'নুন আন্‌তে পান্ত ফুরোয়, পান্ত আন্‌তে নুন!' কিন্তু দুর্গতি তলাপাত্রের মত গরীব বামুন গরীবপুরে আর এক জনও ছিল না। বামুনের ছেলে সে, না ছিল তার বিদ্যাবুদ্ধি, না ছিল পরিশ্রমের শক্তি; অথচ সংসারে তার অনেকগুলি ছেলে-মেয়ে। কি ক'রে পরিবার প্রতিপালন করবে—দুর্গতি ঠাকুর তার কোন উপায় স্থির করতে পারত না। এদিকে ঠাকুরের ব্রাহ্মণীটি ছিল 'দজ্জাল।' ব্রাহ্মণী উঠ্‌তে বস্‌তে গাল্ দিয়ে তাকে তুলোধুনা ক'রে ছাড়ত। যখন তখন সে ঠাকুরকে শুনিয়ে শুনিয়ে বল্‌ত, "আ মোলো যা অলপ্‌পেয়ে মিন্‌ষে! খেতে পরতে দিতে পারবি-নে ত বিয়ে-থাওয়া করেছিলি কেন? গরু চরাতে পারিস্ নে? না হয় পুরুতগিরি শিখ্‌তে হয়। যজমানের বাড়ীতে গিয়ে 'নমো-নিত্যং' ব'লে দু'টো ফুল ফেলে ষষ্ঠী, সুবচনী, মনসা পূজো ক'রে, চাল-কলাগুলা গামছায় বেঁধে আন্‌লেও ত কোন রকমে দু'বেলা চ'লে যায়; সে-টুকু মুরোদও নেই তোর? বেহায়া মিন্‌ষে!"

গিন্নীর কথা শুনে দুর্গতি ঠাকুর হাত-মুখ নেড়ে বল্‌লে, "বামুনের ছেলে আমি, গরু চরাব কি? মাঠে মাঠে গরু চড়িয়ে বেড়ান কি সোজা কায? আর ষষ্ঠী, সুবচনী পূজো করতেও একটু বিদ্যে চাই; মন্তরগুলাও জানা চাই। তা' বিদ্যে ত আমার পেটে গজ্‌গজ্ করছে! ও সব কায আমাকে দিয়ে হবে-টবে না। কিছু না জোটে, ভিক্ষে-সিক্ষে ক'রে পেট ভরাও।"

বাম্‌নী মাথা ঝাঁকিয়ে বল্‌লে, "তুমি থাক্‌তে ভিক্ষে করতে যাব আমরা? ও-কথা মুখে আন্‌তে লজ্জা হয় না? লজ্জা-সরমের মাথা খেয়ে ব'সে আছ! তা ভিক্ষে করতে না পার, রাজবাড়ীতে যাও; শুনেছি, রাজাকে নূতন শোলোক শুনাতে পারলেই শিরোপা পাওয়া যায়। রাজা নূতন নূতন শোলোক শুনে অনেক পণ্ডিতকে বিস্তর টাকা শিরোপা দিয়েছেন। ও পাড়ার নারায়ণী ঠাকুরঝির দেওর নিধিরাম ঠাকুর রাজাকে নূতন শোলোক শুনিয়ে সে দিন

না কি একশ টাকা শিরোপা পেয়েছে। রাজাকে একটা নূতন শোলোক শুনোলে তুমিই বা কোন্ বিশ পঞ্চাশ টাকা না পাবে? তাতেই আমাদের দু'চার মাস চ'লে যাবে। তুমি রাজবাড়ী যাও, এত কষ্ট আর সহ্য যায় না।"

দুর্গতি ঠাকুর মুখ ভার ক'রে বল্লে, "তুমি খাসা পরামর্শ দিলে ব্রাহ্মণি! নূতন শোলোকই যদি রচনা করতে পারতাম, তা হ'লে ত এতদিন টোল খুলে ব'স্তাম; গুরু-মশায়-গিরি ক'রে টাকাটা-শিকেটা রোজগার হ'ত। ও-পাড়ার তোমার ঠাকুরঝির দেওর নিধে ঠাকুরের কথা ছেড়ে দাও; সে জয়রাম শিরোমণির টোলে বার বছর মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ মুখস্ত ক'রেছিল। সে মাথা খাটিয়ে শোলোক রচনা কর্‌তে পারে ব'লে আমিও তা' পারব? না নয় তাই!"

ব্রাহ্মণী চক্ষু ঘুরিয়ে বল্লে, "তোমাকে রাজার কাছে যেতেই হবে। পথে যেতে যেতে যা-হয় একটা শোলোক বানিয়ে নিও। রাজার কাছে গিয়ে তা বল্‌তে পারলেই কিছু শিরোপা পাবে। যাও, বেরিয়ে পর এক্ষুণি।"

কি করে ঠাকুর? পরদিন সকাল বেলা সে সর্ব্বশরীরে গঙ্গামৃত্তিকার ছাপ দিয়ে, টিকিতে একটা ফুল গুঁজে, পুরাণো পৈতৃক নামাবলীখান গায়ে জড়িয়ে 'দুর্গা শ্রীহরি' ব'লে বাড়ী থেকে বেরিয়ে প'ড়ল।

দুর্গতি ঠাকুর গাঁয়ের পথ ধ'রে রাজবাড়ীর দিকে চল্‌তে চল্‌তে কত কি ভাব্‌তে লাগ্‌ল; কিন্তু কোন শোলোকই তার মাথায় এল না। রাজাকে কি নূতন শোলোক শুনিয়ে খুসী করবে—এ কথা ভাব্‌ছে, এমন সময় সে দেখ্‌লে, একটা প্রকাণ্ড ষাঁড় গাঁয়ের সেই সরু পথটি জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। ষাঁড়টা পথ ছেড়ে স'রে না দাঁড়ালে সেই পথে এগিয়ে যাওয়া অসম্ভব। ষাঁড়টা খানিক আগে পথের ধারে কারও ক্ষেতে গিয়ে ফসল খেয়েছিল। সেখানে তাড়া খেয়ে এসে সেই গলি জুড়ে দাঁড়িয়েছিল; কিন্তু তখনও তার মুখ দিয়ে টোপে টোপে লালা ঝর্‌ছিল, আর সে সাম্‌নের এক পায়ের খুর দিয়ে সেই স্থানের মাটী খুঁড়্‌ছিল। দুর্গতি ঠাকুর হাত তু'লে 'হেই, হেই' শব্দে ষাঁড়টাকে পথ থেকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা কর্‌তেই ষাঁড় শিং নেড়ে আপত্তি জানালে, এবং মাটীতে লালা ফেলে খুব জোরে খুর ঘষ্‌তে লাগ্‌ল। তা' দেখে হঠাৎ দুর্গতি ঠাকুরের মুখ থেকে বেরিয়ে প'ড়ল—

"খুর ঘর্ষণং খুর ঘর্ষণং
তাতে চিড়িক্-চিড়িক্ পানি,
তোমার যা মনের কথা
তা' ত আমি জানি।

তুমি আমাকে শিং দিয়ে গুঁতোবে ভেবেছ—তা' কি আমি বুঝ্‌তে পারি নি?"

তারপর ঠাকুর আপন মনে বল্লে, "বাহবা, এই ত খাসা শোলোক তৈয়েরী হয়েছে। যাই, এই শোলোকটাই রাজাকে শুনিয়ে কিছু শিরোপার যোগাড় করি।"

৪

দুর্গতি তলাপাত্র রাজবাড়ীর দেউড়ীতে এসে দেউড়ীর প্রহরীকে বল্লে, "আমি মহারাজকে নূতন শোলোক শুনোতে এসেছি, শীঘ্র পথ ছাড়। আমি রাজসভায় যাব।"

রাজার হুকুম ছিল—যে পণ্ডিত তাঁকে নূতন শোলোক শুনাতে আস্‌বেন, রাজার কাছে যাওয়ার জন্য তখনই তাঁকে পথ ছেড়ে দিতে হবে।

দুর্গতি ঠাকুর অবাধে রাজসভায় প্রবেশ ক'রে রাজাকে বল্লে, "মহারাজের জয় হোক! আমি আপনাকে নূতন শোলোক শুনোতে এসেছি, আপনি মন দিয়ে শুনুন—

খুর ঘর্ষণং খুর ঘর্ষণং
তাতে চিড়িক্-চিড়িক্ পানি,
তোমার যা মনের কথা
তা' ত আমি জানি।

কেমন মহারাজ, এ নূতন শোলোক নয় কি?"

রাজা শোলোক শুনে হেসেই লুটোপুটি! রাজাকে হাস্‌তে দেখে সভার সকল লোক 'হা-হা, হী-হী, হো-হো'—নানা সুরে—নানা ভঙ্গিতে হাস্‌তে লাগ্‌লেন। রাজসভায় হাসির তুফান উঠ্‌ল।

রাজা হাসি বন্ধ ক'রে বল্‌লেন, "এ কি শোলোক? এই শোলোক শুনিয়ে তুমি শিরোপা চাও, ঠাকুর? এই তোমার সম্বল?"

দুর্গতি ঠাকুর বল্লে, "আজ্ঞে মহারাজ, শোলোক নয় কেন? মিলটা কেমন মধুর, তা লক্ষ্য ক'রেছেন কি? আর রসেরই বা অভাব কি?"

রাজা খাতাঞ্চীকে হুকুম দিলেন—"দাও ঠাকুরকে দশ টাকা শিরোপা। এ রকম শোলোক শুনে দশ টাকার বেশী শিরোপা দেওয়া যায় কি ? কি বল মন্ত্রি ?"

মন্ত্রী বল্‌লেন, "সভা-পণ্ডিত বিদ্যাভূষণজী বিচার ক'রে বলুন—এ শোলোকের মর্য্যাদা দশ টাকার বেশী হ'তে পারে কি ?"

বিদ্যাভূষণজী মাথা নেড়ে বললেন, "দশ পয়সাও নয়, মহারাজ ! তবে মহারাজের টাকা, খয়রাতের জন্যই রাজ-কোষে সঞ্চিত আছে ; কিন্তু দশ টাকা খুবই বেশী !"

দুর্গতি ঠাকুর বল্‌লে, "মহারাজ, আমার এ শোলোকের মহিমা বুঝ্‌তে পারে—এ রকম বুদ্ধিমান লোক রাজসভায় এক জনও নেই। আমার এ শোলোক অমূল্য।"

রাজা বল্‌লেন, "তোমার নাম, ঠিকানা আমার খয়রাতি সেরেস্তায় রেখে যাও, ঠাকুর ! আমি বিবেচনা ক'রে যদি বুঝ্‌তে পারি, তোমার এই উদ্ভট শোলোকের সত্যই কোন মূল্য আছে, তা' হ'লে পরে এই শোলোকের শিরোপা সম্বন্ধে অন্য আদেশ দেওয়া হবে। এখন ঐ দশ টাকা নিয়েই স'রে পড়, ঠাকুর !"

দুর্গতি ঠাকুর বিষণ্ণ মুখে শিরোপার দশ টাকা করচে গুঁজে রাজসভা ত্যাগ ক'রল। ব্রাহ্মণী শুনে কি ব'লবে ?

সে বাড়ী ফিরে ব্রাহ্মণীকে সকল কথা জানালে ব্রাহ্মণী বল্‌লে, "তোমার যেমন পাথরচাপা কপাল, তেমনি দক্ষিণা পেয়েছ ; দুঃখ ক'রে আর ফল কি ?"

৫

পরদিন রাজার নাপিত হরবোলা পরামাণিক রাজাকে কামা'তে এল। সেই দিনই সে রাজার গলায় ক্ষুরের ফলাখানা বসিয়ে-দিয়ে তাঁকে হত্যা করবে—স্থির ক'রে রাজার একখান খুব ধারাল ক্ষুর বেছে-নিয়ে তাঁকে কামা'তে বসল। কিন্তু রাজার গলা কাটা ত সহজ কাম [illegible] রাজার গালে ক্ষুর চালায়, আবার ক্ষুরে আরও বেশী ধার দেওয়ার জন্য তা' শানে ঘষে, ও তাতে মধ্যে মধ্যে জলের ছিটে দেয়। রাজার দাড়ী কামান আর শেষ হয় না।

রাজা মুখ বুজে চুপ্-চাপ্ বসে থাকতে না পেরে বল্‌লেন, "একটা নতুন শোলোক শুন্‌বে পরামাণিক ! সে বড় চমৎকার শোলোক ; তোমাকে ঐ ভাবে ক্ষুর ঘষ্‌তে দেখে শোলোকটা তোমাকে শুনোতে ইচ্ছা হচ্ছে। শোন পরামাণিক—

ক্ষুর ঘর্ষণং ক্ষুর ঘর্ষণং
তাতে চিড়িক্-চিড়িক্ পানি,
তোমার যা মনের কথা—
তা' ত আমি জানি। -

এ শোলোকের মানে বুঝ্‌তে পেরেছ, পরামাণিক ?"

পরামাণিক বল্‌লে, "আমি মুরুখ্যু মানুষ মহারাজ, বুঝিয়ে না দিলে আমি ও শোলোকের মানে নিজের বুদ্ধিতে বুঝ্‌তে পারি ?"

রাজা বল্‌লেন, "ক্ষুর ঘসা বন্ধ রেখে তবে শোন—এ শোলোকের মানে।—'ক্ষুর ঘর্ষণং ক্ষুর ঘর্ষণং, তাতে চিড়িক্-চিড়িক্ পানি'—মানে কি না, ক্ষুর ঘস্‌চো, ক্ষুর ঘস্‌চো, আর তাতে জলের একটু একটু ছিটে দিচ্ছ, কেন এ কায করছো ?—তোমার যা' মনের কথা, তা' ত আমি জানি। এ খুব সোজা কথা ; তোমার মনের কথা আমি টের পেয়েছি ; বুঝেছ পরামাণিক !"

রাজার কথা শুনে পরামাণিক ভয়ে ক্ষুর ফেলে-রেখে রাজার দুই পা জড়িয়ে ধ'রে বল্‌লে, "মহারাজ, আমাকে রক্ষা করুন ; আমার কোন দোষ নেই। ঐ শালা-রাজই আমাকে মজিয়েছে ; আমাকে হাজার টাকার লোভ দেখিয়ে বল্‌লে—"

রাজা গম্ভীর স্বরে বল্‌লেন, তোমার যা মনের কথা তা' ত আমি জানি। এক হাজার টাকার লোভ দেখিয়ে শালা-রাজ তোমাকে কি বল্‌লে পরামাণিক ! কথাটা তোমার মুখেই শুনতে চাই।"

পরামাণিক বল্‌লে, "ভয়ে বলি, কি নির্ভয়ে বলি মহারাজ !"

রাজা বল্লেন, "নির্ভয়ে বল।"

পরামাণিক বল্‌লে, "শালা-রাজ বল্‌ছিল—মহারাজ দান-খয়রাৎ ক'রে রাজ-ভাণ্ডারের বিল্‌কুল টাকা নষ্ট করছেন ; তা বন্ধ করতে হ'লে আপনাকে হত্যা করাই দরকার, মহারাজ ! এই জন্যে শালা-রাজের হুকুম হ'ল, ক্ষুর দিয়ে আপনার দাড়ী কামাবার সময় ক্ষুরখান আপনার

গলায় বসিয়ে পোঁচ দিতে হবে; ক্ষুর চালাবার কৌশলে যদি আপনাকে সাবাড় করতে পারি মহারাজ, তাহ'লে আমি এক হাজার টাকা বকশিস্ পাব। কিন্তু মহারাজকে আমি কি হত্যা করতে পারি? শালা-রাজের হুকুম মনে পড়ায় আমি শানে জলের ছিটে দিয়ে ক্ষুর ঘষ্‌তে-ঘষ্‌তে ভাব্‌ছিলাম—কি ক'রে তার সেই ফন্দীটা কাঁচিয়ে দেওয়া যায়; এমন সময় মহারাজ শোলোকটা শুনিয়ে দিলেন। মহারাজ কি ক'রে আমার মনের কথা জান্‌লেন, তা বলতে পারি নে; কিন্তু সকল কথাই মহারাজকে ব'লেছি। আমার অপরাধ মাফ্ করুন, মহারাজ।"

রাজা মন্ত্রীকে বল্‌লেন, "ডাক গরীবপুরের সেই দুর্গতি ঠাকুরকে, সে আমাকে নূতন শোলোক শুনিয়ে দশ টাকার বেশী শিরোপা পায় নি। তার শোলোকেই আমার প্রাণ রক্ষা হয়েছে। কি ক'রে সে পরামাণিকের মনের কথা জানতে পারল—তা' আমি তার মুখে শুনতে চাই।"

রাজার বরকন্দাজ দুর্গতি ঠাকুরের বাড়ীতে হাজির। সে ঠাকুরকে বললে, "ঠাকুর, মহারাজকে শোলোক শুনিয়ে শিরোপা নিয়ে এসেছ; এখন তোমার শোলোকের গুঁতোয় মহারাজের প্রাণ যায়; তোমার তলপ হয়েছে, রাজসভায় তাড়াতাড়ি চল, ঠাকুর!"

দুর্গতি তল্পিতল্পা ভয়ে কাঁপ্‌তে-কাঁপ্‌তে রাজসভায় হাজির হ'লে মহারাজ তাকে বল্‌লেন, "তুমি যে শোলোকটি আমাকে শুনিয়ে গিয়েছিলে, তা' কি ক'রে তোমার মনে উদয় হয়েছিল, সে কথা আমি জান্‌তে চাই। তোমার সেই শোলোক সত্যই অমূল্য।"

দুর্গতি ঠাকুর বল্‌লে, "মহারাজ, সে কথা ভয়ে বলি, কি নির্ভয়ে বলি?"

রাজা বল্‌লেন, "যা সত্য কথা, তা নির্ভয়ে বল্‌তে পার।"

দুর্গতি ঠাকুর রাজাকে বল্‌লে, "আমি যখন মহারাজকে নূতন শোলোকে খুশী ক'রে শিরোপা নিতে আসি, তখন কোন শোলোকই আমি ঠিক করতে পারি নি। আমি মুরুখ্যু মানুষ, শোলোকের কি ধার ধারি? পথে আস্‌তে আস্‌তে দেখি—একটা পেল্লাই বড় ষাঁড় পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে এক এক ঝলক লাল ফেল্‌ছে, আর সম্মুখের এক পায়ের খুর দিয়ে মাটী খুঁড়ছে। ষাঁড়টাকে পথ থেকে সরিয়ে দিতে গেলাম ত' সে শিং নেড়ে আমাকে গুঁতোয় আর কি? তার ভাব-ভঙ্গি দেখে আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল,—

খুর ঘর্ষণং খুর ঘর্ষণং
　　তাতে চিড়িক্-চিড়িক্ পানি,
তোমার যা মনের কথা
　　তা' ত আমি জানি।"

রাজা বললেন, "তোমার শোলোকে আমার ভারী উপকার হয়েছে ঠাকুর, এমন উপকারী শোলোক অন্য কেউ কোনও দিন আমাকে শুনাতে পারে নি। তুমি যে দশ টাকা শিরোপা পেয়েছ, তা' নিতান্ত সামান্য; তোমার সেই শোলোকের জন্য আজ আমি নগদ দু'হাজার টাকা পুরস্কার মঞ্জুর করলাম; আর যত দিন তুমি বেঁচে থাক্‌বে—রাজ-সংসার থেকে মাসে পঞ্চাশ টাকা মাসোহারা পাবে। তোমার সকল অভাব আমি দূর ক'রব।"

তার পর রাজার বিচারে শালা-রাজকে শূলে চড়াবার হুকুম হ'ল। এই হুকুম শু'নে রাজ্যের সকল লোক বল্‌তে লাগ্‌ল,—

"রাজার শালা লোভের ফলে
　　শূলে দিল প্রাণ,
এক শোলোকে মগের হ'ল
　　দুঃখের অবসান।"

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

ডুবুরীর বিপদ

(সাগরগর্ভস্থ রাক্ষসের কাহিনী)

আমরা বুড়া হইয়াছি; কিন্তু আমরা যখন তোমাদের অপেক্ষাও শিশু ছিলাম, সেই ষাট বাষট্টি বৎসর পূর্ব্বে সন্ধ্যার পর আমাদের পল্লীগ্রামের ক্ষুদ্র খ'ড়ো ঘরের দাওয়ায় শয়ন করিয়া ঠাকুর-মায়ের স্নেহকোমল কণ্ঠে কত রাক্ষস-খোক্কসের গল্প, দৈত্য-দানা[illegible] ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর রূপকথা শুনিতে শুনিতে নিদ্রাভিভূত হইত[illegible]। আমাদের মেয়েরা এখন ঠাকুর-মা হইয়াছে, তাহাদের শি[illegible] নাতী নাতিনীরা তাহাদের নিকটও ঐরূপ গল্প শুনিবার জন্য আবদার করে; তাহারা মাইকেলের 'মেঘনাদ বধ' ও বঙ্কিম বাবুর 'বিষবৃক্ষ' পড়িয়াছে; 'মেয়েদের ব্রতকথা'-গুলিরও কিছু কিছু তাহাদের জানা আছে; কিন্তু সেই 'সাত ভাই চম্পা জাগো রে, কেন

বোন পারুল ডাকো রে!' বা 'জীয়ন-কাটী মরণ-কাটী'র সেই সুমিষ্ট ছড়া—

"ছাঁদন-বাঁধন জীয়ন-বাঁচন হাস্তের পরশ-বাও,
কোথায় আছ জীয়ন-কাটী আমার হাতে আও।"

—আমাদের ঠাকুর-মায়ের এই সকল অপরূপ কাহিনী তাহারা জানে না। সন্ধ্যার স্তিমিত দীপালোকে তাহা শুনিতে শুনিতে ভয়ে বিস্ময়ে আমাদের নিঃশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিত। আমরা ক্ষুধা-তৃষ্ণা-ভরা এই সুখ-দুঃখের পৃথিবী হইতে যে কল্পনালোকে প্রবেশ করিতাম, সেখানে 'তালপাতার সিপাই' ও 'পক্ষীরাজ ঘোড়া' আমাদের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে বিচরণ করিত, এবং 'সাপে-কাটা' রাজপুত্রকে বাঁচাইবার জন্য স্তম্ভিত হৃদয়ে সাপের বিষ ঝাড়াইবার মন্ত্র শুনিতাম,

"হিম শিম্-শিম্ যম রাজা, যমপুরে কেন সোর?
মরা লাস তাজা হয়—পবনে করে জোর!"

এ কালে কি তোমরা এ সকল 'কাহিনী' শুনিতে পাও? এ কালের ছেলে-মেয়েরা লেখা-পড়া শিখিয়াছে; তাহারা বড় জোর ইংরেজী পরীর গল্প পাঠ করিয়া 'দুধের তৃষ্ণা ঘোলে' মিটাইতেছে। 'মাসিক বসুমতী'তে 'ছোটদের আসরে' মধ্যে মধ্যে সেকালের রাজা-রাণীর, দৈত্য-দানার গল্প প্রকাশিত হইতেছে, সেগুলি খাঁটি সেকেলে ঠাকুর-মার 'রূপকথা' না হইলেও তাহা তোমাদের ভালই লাগে; অনেক ছেলে মেয়ে ঐ সকল গল্পের আশায় মাসের শেষ দিনের প্রতীক্ষা করে তাহাও আমরা জানি।

কিন্তু তোমরা বোধ হয় জান, ইংরেজীতে একটা কথা আছে—'সত্য ঘটনা কাল্পনিক কাহিনী অপেক্ষা অধিকতর বিস্ময়জনক।' আজ তোমাদিগকে সেই রকম কয়েকটি সত্য ঘটনার বিবরণ শুনাইব। এই সকল বিবরণ দুই এক মাস পূর্ব্বে লণ্ডনের কোন প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। লেখক লিখিয়াছেন—এই সকল ঘটনা সম্পূর্ণ সত্য, কোন কথা কাল্পনিক নহে। গভীর সমুদ্র-গর্ভে মৃত্যুর সহিত মানুষের যুদ্ধের এই সকল বিবরণ, ঠাকুর-মার রূপকথার যে রাক্ষস 'হাউ-মাউ-খাঁউ, মনিষ্যির গন্ধ পাঁউ' বলিয়া পাতাল-পুরীর নির্জ্জন রাজ-প্রাসাদের প্রতি-কক্ষে সাত সমুদ্র তের নদীর পারের কোন্ অজানা রাজ্যের রাজপুত্রকে খুঁজিয়া বেড়াইত, তাহার লোমহর্ষণ কাহিনী অপেক্ষা অল্প বিস্ময়কর বা অল্প ভয়ঙ্কর নহে। আমার এই সকল ঘটনার বিবরণে আকাশ-জোড়া অদ্ভুত কল্পনার খেলা নাই বটে, কিন্তু বিপদ-সঙ্কুল গভীর সাগর-তলে শোণিত-লোলুপ সামুদ্রিক রাক্ষসের সহিত একালের মানুষের যে ভীষণ যুদ্ধের বিবরণ আছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে তোমাদের সর্ব্বাঙ্গ ভয়ে শিহরিয়া উঠিলেও সেই সকল নির্ভীক বীরের দুঃসাহস তোমরা প্রার্থনীয় মনে করিবে।

তোমরা জান, অনেক সমুদ্রেই শুক্তি পাওয়া যায়; মুক্তা-ব্যবসায়ীরা মুক্তা সংগ্রহের জন্য সমুদ্র-গর্ভে ডুবুরী নামাইয়া এই সকল ঝিনুক সংগ্রহ করে। ঝিনুকের গর্ভে যে সকল মুক্তা পাওয়া যায়, তাহাদের কোন কোনটির মূল্য হাজার হাজার টাকা, তাহা রাজ-মুকুটের গৌরব বৃদ্ধি করে। কিন্তু এই সকল শুক্তি ব্যতীত এক জাতীয় সামুদ্রিক শামুক সংগ্রহের জন্যও অনেক শামুক-ব্যবসায়ী ডুবুরীগণকে সমুদ্র-গর্ভে নামাইয়া থাকে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বাজারে এই সকল সামুদ্রিক শামুক-নির্ম্মিত বিভিন্ন শিল্পদ্রব্যের চাহিদাও অল্প নহে। নানা প্রকার মূল্যবান শিল্পদ্রব্য নির্ম্মাণের জন্য উৎকৃষ্ট শামুকের খোলার প্রয়োজন হয়। এই সকল শামুকের খোলা কচ্ছপের খোলার অনুরূপ, এবং চশমার মূল্যবান ফ্রেম প্রভৃতি নানা প্রকার দ্রব্য ইহা দ্বারা নির্ম্মিত হইয়া থাকে। এই জন্য ডুবুরীরা গভীর সমুদ্রে ডুবিয়া উৎকৃষ্ট শামুক সংগ্রহ করে।

যে সকল ডুবুরী উত্তর কুইন্সল্যাণ্ডের সমুদ্র গর্ভে ডুবিয়া শামুক সংগ্রহ করে, তাহাদিগকে সমুদ্র-গর্ভে অনেক সময় বিপন্ন হইতে হয়। তাহারা সাধারণতঃ নরভুক হাঙ্গর কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া থাকে। কিন্তু এই সকল হাঙ্গর ব্যতীত আর এক জাতীয় ভীষণ প্রকৃতির হাঙ্গর আছে, তাহারা 'বাঘা হাঙ্গর' (Tiger shark) নামে পরিচিত। এই সকল হাঙ্গরের আকার যেরূপ বৃহৎ, স্বভাবও সেইরূপ ভীষণ উগ্র। বাঘের মতই তাহারা হিংস্র। জলের ভিতর ডুবুরীকে দেখিতে পাইলেই বাঘা হাঙ্গর তাহাকে আক্রমণ করে। অতি অল্পসংখ্যক ডুবুরীই ইহাদের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া প্রাণ বাঁচাইতে পারে।

এই সকল হিংস্র হাঙ্গরকে ভয় দেখাইবার জন্য ডুবুরীরা জলে ডুবিবার পূর্ব্বে নানা কৌশল অবলম্বন করে। অনেকে সাদা রঙ দিয়া হাত-পা রঞ্জিত করে। এই রঙ সমুদ্রের জলে ধুইয়া যায় না। ডুবুরীরা হাঙ্গরের আক্রমণে আত্মরক্ষা করিবার জন্য তীক্ষ্ণধার ছোরা, বর্শা প্রভৃতি অস্ত্র সঙ্গে লইয়া থাকে। থর্সডে দ্বীপের সন্নিহিত সমুদ্র-গর্ভে নামিয়া শামুক সংগ্রহ করিতে গিয়া অনেক ডুবুরীকে বাঘ হাঙ্গরের আক্রমণে প্রাণ হারাইতে হইয়াছে। তাহাদের নাম ঐ দ্বীপের মৃত্যুর রেজিষ্ট্রী-বহিতে লিখিয়া রাখিতে হইয়াছে।

১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথমে টুমিয়া নামক এক জন ডুবুরী উক্ত অঞ্চলের সমুদ্রগর্ভে শামুক সংগ্রহ করিতেছিল। সেই স্থানটি কুক্-টাউন হইতে প্রায় এক শত মাইল দূরে অবস্থিত। একখানি জাহাজের কাপ্তেন ওয়াকেম্বা একদল ডুবুরীকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন; টুমিয়া সেই দলে যোগদান করিয়া সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করিয়াছিল। জাহাজখানি ব্যারো-পয়েণ্ট নামক স্থানে নঙ্গর করিলে টুমিয়া অন্য দুই জন ডুবুরীকে সঙ্গে লইয়া একখানি জেলে-ডিঙ্গীতে জাহাজ হইতে কয়েক শত গজ দূরে গমন করিয়া সমুদ্রে নামিয়াছিল।

টুমিয়া সমুদ্রগর্ভে কিছুকাল কাষ করিতে করিতে একটা বাঘা হাঙ্গর কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইল; সেই হাঙ্গরটার শরীর প্রায় ষোল ফিট দীর্ঘ, অর্থাৎ প্রায় দশ এগার হাত লম্বা একটা তালগাছের মত!

টুমিয়া যেখানে কাষ করিতেছিল—সেই স্থানের সমুদ্রের গভীরতা প্রায় কুড়ি হাত। টুমিয়া সমুদ্রের তলায় দাঁড়াইয়া শামুকের সন্ধানে চারি দিকে চাহিতেছিল, সেই সময় সেই বাঘা হাঙ্গরটা চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। হাঙ্গরটা 'ঢুলী করিয়া' আসিয়া তাহার ডান দিকের ঘাড় কামড়াইয়া একখণ্ড মাংস ছিঁড়িয়া লইল। টুমিয়া বে-কায়দায় পড়িয়া তাহার ছোরা ব্যবহার করিতে না পারায় প্রাণের দায়ে জলের উপর উঠিতে লাগিল; তাহা দেখিয়া হাঙ্গরটাও তাহার অনুসরণ করিল।

টুমিয়া জলের প্রায় ৮ হাত নীচে থাকিতেই হাঙ্গরটা পুনর্ব্বার তাহাকে দাঁত দিয়া চাপিয়া ধরিল। এবার সে টুমিয়ার বাঁ কাঁধ

কামড়াইয়া ধরিয়াছিল। তাহার দংশন-যন্ত্রণায় টুমিয়া অত্যন্ত কাতর হইল, এবং জীবনের আশা ত্যাগ করিল।

টুমিয়ার এক জন সঙ্গী ডিঙ্গী হইতে স্বচ্ছ জলের ভিতর তাহার এই বিপদ দেখিতে পাইল। সে তৎক্ষণাৎ জলে লাফাইয়া-পড়িয়া তাহার তীক্ষ্ণধার বর্শা দ্বারা এরূপ জোরে হাঙ্গরটার পিঠে আঘাত করিল যে, বর্শার দীর্ঘ ফলা হাঙ্গরটার দেহে প্রবেশ করিল। হাঙ্গরটা এই ভাবে আহত হওয়ায় টুমিয়াকে ছাড়িয়া দিল। টুমিয়া তৎক্ষণাৎ জলের উপর ভাসিয়া উঠিল। তাহাকে দেখিয়া অন্য ডুবুরী তাহাকে তাড়াতাড়ি ডিঙ্গীর উপর তুলিয়া লইল; টুমিয়ার অবস্থা তখন শোচনীয়। তাহার চিকিৎসার জন্য তাহাকে অবিলম্বে কুক্‌-টাউনের হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হইল। সে এক মাসের মধ্যেই সারিয়া-উঠিয়া পুনর্ব্বার ডুবুরীর কায আরম্ভ করিয়াছিল। যে ডুবুরী তাহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিল, আহত বাঘা হাঙ্গর তাহাকে আক্রমণ করিবার পূর্ব্বেই সে তাড়াতাড়ি জলের উপরে উঠিয়া তাহার ডিঙ্গীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। ক্রুদ্ধ হাঙ্গরটা লাঙ্গুলের আঘাতে সমুদ্রের জল তোলপাড় করিতে করিতে অদৃশ্য হইয়াছিল।

বর্শার দীর্ঘ ফলা হাঙ্গরটার দেহে প্রবেশ করিল

যে সকল ডুবুরী পরিচ্ছদ-মণ্ডিত হইয়া গভীর সমুদ্রে প্রবেশ করে, হাঙ্গরগুলা তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে সাহস করে না। ঐ সকল ডুবুরীর শিরস্ত্রাণের ভিতর হইতে বায়ু নির্গত হওয়ায় জলে বুদ্‌বুদ উঠিয়া থাকে; হাঙ্গরগুলা সেই বুদ্‌বুদ দেখিয়া ভয় পায়। তথাপি সময়ে সময়ে ঐ সকল ডুবুরীকে হাঙ্গরের সহিত যুদ্ধ করিতে হয়। যুদ্ধে অনেকেরই প্রাণ যায়।

১৯০০ খৃষ্টাব্দে টরেস প্রণালীতে ১৫ ফুট দীর্ঘ একটা হাঙ্গরের সঙ্গে গ্রে নামক এক জন ডুবুরীর ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল। সেই হাঙ্গরটা ছিল নরভুক হাঙ্গর।

গ্রে সমুদ্রে নামিয়া যেখানে শামুক সংগ্রহ করিতেছিল, সমুদ্র সেখানে অগভীর। গ্রে দুই দিন নির্ব্বিঘ্নে শামুক সংগ্রহ করিল; তৃতীয় দিন প্রভাতে সে সমুদ্রে নামিয়াই একটা প্রকাণ্ড হাঙ্গরকে সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিল। হাঙ্গরটা গ্রেকে দেখিবামাত্র আক্রমণ না করিয়া তাহার সম্মুখে কয়েকবার ঘোরাঘুরি করিল। হাঙ্গরটা কয়েক গজ দূরে থাকিয়া লাঙ্গুল আন্দোলন করিতে করিতে সবুজ চক্ষুর ভীষণ দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া গ্রের আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। ঘরের দেওয়ালস্থিত বড় বড় টিক্‌টিকি অদূরস্থ কীটপতঙ্গ শিকারের পূর্ব্বে ঐরূপ করে। কিন্তু হাঙ্গরটা কি ভাবিয়া গ্রেকে আক্রমণ না করিয়া দূরে চলিয়া গেল। তখন গ্রে কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়া শামুক সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইল।

কিন্তু তাহাকে অধিককাল কায করিতে হইল না; এবার হাঙ্গরটা দূর হইতে দ্রুতবেগে তাহাকে আক্রমণ করিতে আসিল। গ্রে তৎক্ষণাৎ ছোরা বাহির করিয়া শত্রুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। হাঙ্গর তাহার মাথার উপর আসিবামাত্র সে হাঙ্গরটার দেহ ছোরা দ্বারা বিদ্ধ করিল। ক্রুদ্ধ হাঙ্গর তখন লাঙ্গুল আন্দোলিত করিয়া তদ্দ্বারা এরূপ বেগে গ্রের স্কন্ধে আঘাত করিল যে, এক আঘাতেই গ্রে জলের ভিতর লুটাইয়া পড়িল।

কিন্তু গ্রে যেরূপ সাহসী, সেইরূপ বলবান্; সে মাটীতে ভর দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; তাহা দেখিয়া হাঙ্গরটা মুখব্যাদান করিয়া তাহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল। গ্রে বিদ্যুদ্বেগে এক পাশে সরিয়া গিয়া হাঙ্গরটার পাঁজরে ছোরার আঘাত করিল। এইভাবে পুনঃ পুনঃ আঘাতে হাঙ্গরের দেহ ক্ষত-বিক্ষত হইল, এবং তাহার দেহশোণিতে সমুদ্রের জল বহুদূর পর্য্যন্ত [illegible] হইয়া গেল। ক্রোধে হাঙ্গরটা সবেগে লাঙ্গুল আস্ফালন করিয়া সেই স্থানের জলে উত্তাল-তরঙ্গের সৃষ্টি করিল, এবং মুখব্যাদান করিয়া গ্রের একখানি হাত গিলিতে উদ্যত হইল। গ্রে তাড়াতাড়ি সরিয়া গিয়া তাহার সঙ্গিগণকে ইঙ্গিত করিলে তাহার সঙ্গীরা তাহার দেহ-সংলগ্ন রজ্জু আকর্ষণ করিয়া তাহাকে তাড়াতাড়ি নৌকায় তুলিয়া লইল। শিকার পলায়ন করে দেখিয়া হাঙ্গরটা তাহার অনুসরণ করিতেই বিশালদেহ একদল

হাঙ্গর সেই স্থানে উপস্থিত হইল। সেই হাঙ্গরগুলা একযোগে আহত হাঙ্গরটাকে আক্রমণ করিল, এবং তাহার ক্ষত-বিক্ষত দেহের রক্তের আস্বাদন পাইয়া, তীক্ষ্ণধার দন্ত দ্বারা তাহার দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া আহার করিল। সেই সময় তাহাদের লাঙ্গুলের আন্দোলনে ও আস্ফালনে সমুদ্র-বক্ষে যেন তুফান আরম্ভ হইয়াছিল!

উত্তর কুইন্সল্যাণ্ডের সমুদ্রে এক জাতীয় মৎস্য দেখিতে পাওয়া যায়—তাহাদের নাম হীরা মাছ। (Diamond fish) এই সকল মৎস্য অতি বৃহদাকার; এক একটি আট হাত পর্য্যন্ত দীর্ঘ হইয়া থাকে। ইহাদের প্রত্যেকটির দেহের ওজন পঞ্চাশ হইতে এক শত মণ!

এই সকল মৎস্য হিংস্র নহে, এবং ডুবুরীগণকে আক্রমণও করে না; তথাপি ডুবুরীরা ইহাদিগকে মহাশত্রু বলিয়া মনে করে। কারণ, এই সকল মৎস্যের মাথায় কতকগুলি বাঁকা শিং আছে। পরিচ্ছদে ডুবুরীরা সমুদ্রে নামিয়া কায আরম্ভ করিলে যে 'লাইফ লাইন' (শ্বাস-প্রশ্বাসের নল) তাহাদের পরিচ্ছদ হইতে নৌকা পর্য্যন্ত প্রসারিত থাকে—এই মৎস্যগুলি সেই নল লইয়া খেলা করিতে থাকিলে সেই নলে তাহাদের বাঁকা শিং বাধিয়া যায়, তাহার পর চলিয়া যাইবার সময় নল-সংলগ্ন শিং সহজে খুলিয়া লইতে না পারায়, ভয় পাইয়া পুচ্ছদ্বারা সেই নল প্রবল বেগে আকর্ষণ করে। প্রচণ্ড আকর্ষণ সহ্য করিতে না পারায় নল ছিঁড়িয়া যায়; তখন হতভাগ্য ডুবুরীর আর প্রাণরক্ষার উপায় থাকে না, সমুদ্র-গর্ভেই জীবিত অবস্থায় তাহার সমাধি হয়। এই ভাবে বহু ডুবুরী প্রাণ হারাইয়াছে।

সে এক পাশে সরিয়া গিয়া হাঙ্গরটার পাঁজরে ছোরার আঘাত করিল

এই প্রসঙ্গে তোমাদিগকে ফিড্‌লার নামক এক জন ডুবুরীর কথা বলিব। 'জেনেট' নামক একখানি জাহাজ টরেস্ প্রণালীর উত্তর-পূর্ব্ব অংশে শামুক সংগ্রহ করিতেছিল; ফিড্‌লার এই জাহাজে চাকুরী করিত। এক দিন শামুক সংগ্রহ করিবার জন্য সে সমুদ্র-গর্ভে নামিলে তাহার দলের লোক তাহাকে জাহাজে টানিয়া তুলিবার জন্য জাহাজস্থিত 'ডুবা কলের' (diving-apparatus) কাছে দাঁড়াইয়া তাহার সঙ্কেতের প্রতীক্ষা করিতেছিল। কিছুকাল পরে তাহার 'জীবন-নলে' (life-line) প্রচণ্ড বেগে একটা হ্যাচ্‌কা টান পড়িল; কিন্তু উহা ডুবুরীর ইঙ্গিত হইতে পারে না, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া তাহারা ফিড্‌লারকে টানিয়া তুলিবার চেষ্টা করিল না। তাহারা আরও কিছুকাল অপেক্ষা করিল; কিন্তু ফিড্‌লার আর ইঙ্গিত করিল না। তখন তাহারা তাহার বিপদের আশঙ্কা করিয়া জীবন-নল টানিয়া তুলিতে লাগিল; কিন্তু তাহারা নলের অন্য প্রান্তে মানুষের ভার বুঝিতে পারিল না। কিছুকাল পরে মুড়া ছেঁড়া নল উঠিয়া আসিল, ফিড্‌লার নিরুদ্দেশ!

তখন আর একজন ডুবুরী তাড়াতাড়ি সমুদ্রে নামিয়া পড়িল। সে জলের ভিতর বহু অনুসন্ধানেও ফিড্‌লারকে দেখিতে পাইল না। ফিড্‌লার সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হইয়াছিল। সকলেরই ধারণা হইল, হীরা মাছের শিং 'লাইনে' জড়াইয়া গিয়াছিল, মাছটা 'লাইন' ছিঁড়িয়া চলিয়া গিয়াছে; তাহার পর কোন হাঙ্গর বা অন্য কোন মাংসাশী জলজন্তু তাহাকে ভক্ষণ করিয়াছে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার কি, তাহা জানিতে পারা যায় নাই। সমুদ্র-গর্ভে এইভাবে মৃত্যু কিরূপ লোমহর্ষণ-কাণ্ড, তাহা তোমরা বুঝিতেই পারিতেছ।

হীরা মাছ জীবন-নল ছিঁড়িয়া দিলেও এ পর্য্যন্ত কেবল এক জন লোককে প্রাণ লইয়া ভাসিয়া উঠিতে দেখা গিয়াছিল। তাহার নাম রগসন। সে ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে 'গ্রেট বেরিয়ার রীফের' উত্তরপ্রান্তে নামিয়া শামুক সংগ্রহ করিতেছিল। সে যেখানে নামিয়াছিল, সেই স্থানে সমুদ্রের গভীরতা ৫৬ হাত। সে কায করিতেছিল—সেই সময় একটা প্রকাণ্ড হীরক মৎস্য তাহার জীবন-নল ছিঁড়িয়া দিয়া পলায়ন করে। রগসন তৎক্ষণাৎ জীবন-নলের বায়ু-নিঃসারণের পথ বন্ধ করিয়া দিলে রুদ্ধ বায়ুতে তাহার পরিচ্ছদ রবারের বলের মত ফুলিয়া উঠিল, এবং রগসন সোলার মত জলের উপর ভাসিয়া উঠিল। তাহাকে তাড়াতাড়ি জাহাজে তুলিয়া লওয়া হইল বটে,

কিন্তু তখন তাহার চেতনা থাকিলেও নিদারুণ অবসাদে পরদিন তাহার মৃত্যু হইল।

ডুবুরীদের আর এক শত্রু 'শয়তান মাছ'—'ডেভিল্‌স ফিস্।' এগুলি কাঁকড়ার ন্যায় দাঁড়াবিশিষ্ট, গোলাকার জীব। এগুলি 'অক্টোপাস্' বা 'অষ্টপদ' নামেও প্রসিদ্ধ। সময়ে সময়ে ছোট ছোট 'অক্টোপাস' জেলেদের জালে বাধিয়া উঠিয়া আসে, তাহাদের আকার বড় কাঁকড়া অপেক্ষা বৃহৎ নহে; কিন্তু আমরা যে 'অক্টোপাসের' কথা বলিতেছি—সেগুলি অতি ভীষণ জানোয়ার। এক একটির আকার যেন ধান রাখিবার বড় মড়াই, অথবা গ্যাসপূর্ণ বৃহদাকার বেলুন!

'মানাথা' নামক জাহাজের ডুবুরী ও'ব্রায়েন ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে টরেস্ প্রণালীর দক্ষিণ প্রান্তস্থ অক্সফোর্ড উপসাগরে এইরূপ এক বিরাট অক্টোপাসের কবলে পড়িয়া তাহার সহিত প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছিল। সেই লোমহর্ষণ কাহিনী শুনিলে তোমরা স্তম্ভিত হইবে। সেই অক্টোপাসটা সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতীয় শয়তান মাছ।

'মানাথা' জাহাজ শামুকের সন্ধানে থর্সডে দ্বীপে উপস্থিত হইলে সেই জাহাজের ডুবুরীরা সংবাদ দিল—অক্সফোর্ড উপসাগরের নিকট একটি ক্ষুদ্র মগ্নশৈলের পাদদেশে বিস্তর উৎকৃষ্ট জাতীয় শামুক সংগ্রহ হইতে পারে। সেই স্থানে সমুদ্রের গভীরতা প্রায় ৪৮ হাত। কিন্তু সেই সকল ডুবুরীকে সেই মগ্নশৈলের পাদদেশে নামিয়া শামুক তুলিতে বলা হইলে তাহারা এই আদেশ পালনে অসম্মত হইল। তাহারা বলিল, সেই মগ্নশৈলের নীচে একটি প্রকাণ্ড গুহা আছে সেই গুহায় একটা ভয়ঙ্কর রাক্ষস বাস করে। তাহারা শামুক তুলিবার জন্য সেখানে নামিলেই রাক্ষসটা তাহাদিগকে ধরিয়া খাইয়া ফেলিবে। কে সেখানে প্রাণ দিতে যাইবে? একজন ডুবুরী বলিল—সে এক দিন শামুকগুলি পরীক্ষা করিবার জন্য সেই মগ্নশৈলের পাদমূলে নামিয়াছিল। সে শামুকগুলি হাতে লইয়া পরীক্ষা করিতেছিল, সেই সময় রাক্ষসটা অদূরবর্তী গুহা হইতে জাহাজের কাছি অপেক্ষা মোটা এক জোড়া শুঁড় বাহির করিল, এবং চারি পাঁচ মণ ভারী একটা প্রকাণ্ড সামুদ্রিক মৎস্যকে সেই গুহার নিকট সাঁতরাইতে দেখিয়া, সেই শুঁড়-জোড়াটা দিয়া ধরিয়া চক্ষুর নিমেষে তাহাকে তাহার গুহার ভিতর টানিয়া লইল।

ডুবুরী স্বয়ং ইহা দেখিয়াছিল, এ কথা বলিলেও জাহাজের মালিক ও অন্যান্য লোক তাহার কথা বিশ্বাস করিল না; পরীর গল্প মনে করিয়া তাহার কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিল। কিন্তু গুহাবাসী সেই রাক্ষসের ভয়ে কোন ডুবুরী সমুদ্রগর্ভে মগ্নশৈলের পাদদেশে নামিতে সাহস করিল না।

তখন জাহাজের মালিক কাপ্তেন বার্টরে সেই ডুবুরীদিগকে ভীরু ও অকর্ম্মণ্য মনে করিয়া তাঁহার জাহাজ হইতে বিদায় করিলেন, এবং নূতন ডুবুরী সংগ্রহের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোন ডুবুরী সেই রাক্ষসের ভয়ে গুহার নিকট নামিতে চাহিল না। অবশেষে কাপ্তেন বার্টরে পাঁচ হাত লম্বা একটা জোয়ান আইরিস্ ডুবুরীর সন্ধান পাইলেন; তাহারই নাম ও'ব্রায়েন। ও'ব্রায়েন কাপ্তেন বার্টরেকে বলিল, "ঐ রাক্ষস-টাক্ষসের কথা সব বাজে, আমি ও-কথা বিশ্বাস করি না। আমি ঐ গুহার সম্মুখে গিয়া শামুক সংগ্রহ করিয়া আনিব।"

পরদিন প্রভাতে ও'ব্রায়েন সর্ব্বাঙ্গে ডুবুরীর পোষাক আঁটিয়া মহা উৎসাহে সমুদ্রগর্ভে নামিয়া পড়িল। সে সেই গুহার অদূরে দাঁড়াইয়া শামুকগুলি পরীক্ষা করিতেছিল; সেই সময় তাহার মনে হইল—কেহ তাহার কাঁধে হাত বুলাইতে আরম্ভ করিয়াছে! প্রথমে সে ভাবিল, সামুদ্রিক শৈবালরাশি ভাসিয়া আসিয়া তাহার কাঁধে ঠেকিয়াছে। সে সরিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিল; কিন্তু এক পাও দূরে যাইতে পারিল না। তাহার নড়িবার পর্য্যন্ত সামর্থ্য রহিল না!

ও'ব্রায়েন তখন সেই গুহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই ভয়ে তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল। সে দেখিল—ওরে বাবা!
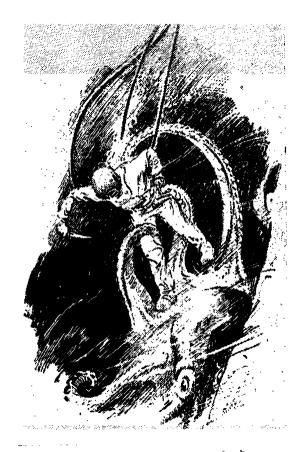
রাক্ষসটা একটা শুঁড় দিয়া ও'ব্রায়েনের ডাইন উরু জড়াইয়া ধরিয়াছে

ধান রাখিবার প্রকাণ্ড মড়াইএর বেড়ের মত গোলাকার বিরাট-দেহ একটা অক্টোপাস্ তাহার গুহা হইতে দেহের কিয়দংশ বাহির করিয়া শুঁড় দিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়াছে! রাক্ষসটা তাহাকে গুহার ভিতর টানিয়া লইয়া গিয়া ভক্ষণ করিবে—এইরূপ চেষ্টা! কৃষ্ণবর্ণ প্রকাণ্ড তাহার দেহ, সর্ব্বাঙ্গ চটচটে আটাল। সেই দেহ গুহার ভিতর বহুদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত। তাহার সেই সুগোল বিশাল দেহ বেষ্টন করিয়া চারি দিকেই কতকগুলি শুঁড়। দড়ি চারিহারা করিয়া পাকাইলে যেরূপ মোটা দেখায়, শুঁড়গুলি দেখিতে সেইরূপ! হাতীর শুঁড়ের মত স্থূল ও মাংসল, আগার দিকটা ক্রমশঃ সরু। প্রত্যেক শুঁড় প্রায় চোদ্দ হাত দীর্ঘ!

রাক্ষসটার চক্ষু দুইটি যেন মোটর-লরীর সম্মুখের একজোড়া বড় আলো! উভয় চক্ষুর ব্যবধানে বাজের ঠোঁটের মত বাঁকা এক বিরাট চঞ্চু; ক্ষুধার্ত্ত রাক্ষস তাহা প্রতি মুহূর্ত্তে খুলিতেছিল ও বন্ধ করিতেছিল।

রাক্ষসটার ভীষণ ক্রূর চক্ষুর দিকে চাহিয়া ভয়ে ও'ব্রায়েনের মূর্চ্ছার উপক্রম হইল। রাক্ষসটা একটা শুঁড় দিয়া ও'ব্রায়েনের ডাইন ঊরু সজোরে জড়াইয়া ধরিল। ও'ব্রায়েন তখন বুঝিতে পারিল, তাহার শুঁড় কৃষ্ণবর্ণ তীক্ষ্ণধার কণ্টকরাশি দ্বারা আচ্ছাদিত, যেন ত্রিশির মনসার কাঁটা! সেই কণ্টকরাশি তাহার ঊরুতে বিদ্ধ হইয়াছিল। রাক্ষসটার অন্য শুঁড়গুলি ক্রমাগত সবেগে আন্দোলিত হইয়া জলরাশি আলোড়িত করিতে লাগিল।

ঐরূপ অবস্থায় পড়িলে তোমরা কি করিতে? সমুদ্রের প্রায় ৫০ হাত জলের নীচে একটা বিকটাকার রাক্ষস চৌদ্দ পনের হাত লম্বা শুঁড় দিয়া তোমার ঊরু জড়াইয়া ধরিয়া, তোমাকে মুখে পুরিবার জন্য মৃত্যু-গহ্বরে আকর্ষণ করিতেছে—দেখিয়া ভয়ে মূর্চ্ছা যাইতে না? কিন্তু এই জোয়ান আইরিশটা স্বপ্নেও কোন দিন এরূপ ভয়ানক বিপদে না পড়িলেও আতঙ্কে হতবুদ্ধি হইল না; সে মাথা ঠাণ্ডা করিয়া সেই রাক্ষসটার কবল হইতে মুক্তিলাভের উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। সে প্রথমে তাহার নৌকার বন্ধুগণকে ইঙ্গিতে জানাইল—তাহাকে টানিয়া নৌকায় তুলিতে হইবে। তাহার পর সে তাহার তীক্ষ্ণধার দীর্ঘ ছোরা বাহির করিয়া রাক্ষসটা যে শুঁড় দিয়া তাহার ঊরু জড়াইয়া ধরিয়াছিল—সেই শুঁড়ে ছোরার ফলা সবেগে বিঁধাইয়া দিয়া, করাত চালাইবার মত ছোরা চালাইয়া সেই শুঁড়টা কাটিতে লাগিল। ও'ব্রায়েন তাহার শুঁড় কাটিতে আরম্ভ করিলে জানোয়ারটা তাহার পেটের ভিতর সঞ্চিত একটা থলে হইতে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ কালী জালা জালা বাহির করিতে লাগিল! সেই গাঢ় কালীতে ও'ব্রায়েনের চতুর্দ্দিকস্থ জলরাশি অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রির মত কাল হইয়া গেল। কালীগোলা জলের ভিতর দাঁড়াইয়া ও'ব্রায়েন কিছুই দেখিতে পাইল না।

কিন্তু ও'ব্রায়েন প্রাণের মায়া ত্যাগ করিতে না পারিয়া অন্ধকারে হাত চালাইয়া দেহের সকল শক্তি প্রয়োগে তাহার ঊরুতে বিজড়িত সেই শুঁড়ের ডগা প্রায় দুই হাত কাটিয়া ফেলিয়া তাহার কবল হইতে মুক্তিলাভ করিল। তাহার সঙ্গীরা তাড়াতাড়ি তাহাকে নৌকার উপর টানিয়া তুলিতে লাগিল।

শিকার হাত-ছাড়া হয় দেখিয়া রাক্ষসটা তাহার অন্যান্য শুঁড় ঊর্দ্ধে প্রসারিত করিয়া ও'ব্রায়েনের সর্ব্বাঙ্গ জড়াইয়া ধরিল; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে ও'ব্রায়েনের হাত দুইখানি মুক্ত ছিল। সে কালীতে অন্ধকারাচ্ছন্ন সমুদ্রের ভিতর রাক্ষসটার সঙ্গে আবার ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ করিল। সে উভয় হস্তে ছোরা চালাইয়া রাক্ষসের সেই শুঁড়গুলিও কাটিতে লাগিল। যে রজ্জু-সাহায্যে তাহার সঙ্গীরা তাহাকে টানিয়া তুলিতেছিল, সেই রজ্জুতে ভয়ানক টান পড়ায় তাহা মট্-মট্ করিতে লাগিল, ছিঁড়িয়া পড়ে আর কি? কারণ, রাক্ষসটা তাহাকে সবলে আকর্ষণ করিয়া নীচে নামাইবার চেষ্টা করিতেছিল।

অবশেষে ও'ব্রায়েনেরই জয় হইল। রাক্ষস যে শুঁড় দিয়া তাহার কোমর জড়াইয়া ধরিয়াছিল, ও'ব্রায়েনের ছুরিকাঘাতে সেই শুঁড় দ্বিখণ্ডিত হওয়ায় ও'ব্রায়েন মুক্তিলাভ করিতেই তাহাকে নৌকার উপর উত্তোলন করা হইল। নৌকায় উঠিয়া সে অজ্ঞান হইয়া পড়িল। কিন্তু অতি কষ্টে তাহার প্রাণরক্ষা হইল।

পরদিন একটা প্রকাণ্ড মাছ ধরিয়া তাহার পেট চিরিয়া পেটের ভিতর ডিনামাইট স্থাপন করা হইল, এবং সেই অবস্থায় মাছটাকে জাহাজ হইতে জলে নামাইয়া দেওয়া হইল। কিন্তু রাক্ষসটা সেই টোপ স্পর্শও করিল না; সুতরাং তাহাকে হত্যা করিবার চেষ্টা বিফল হইল। অতঃপর আর কোন ডুবুরী শামুক সংগ্রহের জন্য সেই রাক্ষসের এলাকায় নামিতে সাহস না করায় জাহাজের মালিক কাপ্তেন বার্টের অগত্যা সেই স্থান ত্যাগ করিলেন।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

প্রতিদান

যাহারে আমি গো ঘৃণা ক'রে চলি সে যে বাসে মোরে ভালো
কুটীরেতে যার নিবাই প্রদীপ দেখায় সে মোরে আলো;
ধূধূ মরুময় মনের তলে
শৌর্য্যে যাহার ঈর্ষা জ্বলে,—
যাহার ধনের কুৎসা রটাই সে মোরে ভাবে না দীন,
মোর গুণ-গাথা পথে মাঠে ঘাটে গেয়ে চলে নিশিদিন।
কাঁটা দিয়ে যারে কটু কথা বলি তীক্ষ্ণ শায়ক-সম
মধু বাণী ঢালি মোর পরাণেরে করে যেত অনুপম;
হিংসা দ্বেষের জ্বালায় জ্বলি
তরু লতা যার কুঞ্জে দলি
থোকা থোকা ফুলে নিতুই সে মোর ডালাটি যে দেয় ভ'রে;
আমি দিই তার কুটীর ভাঙিয়া সে চলে আমায় গড়ে।

কাঁটা কত দিই ছড়ায়ে যাহার চলিবার পথ-মাঝে
পায়েতে আমার আঁচড় লাগিলে বক্ষেতে তার বাজে;
শুনি যার মিঠে করুণ বাঁশী
টুটে যায় মোর মুখের হাসি
মোর শুধু ছবি হাসি-মুখে আঁকে এমনি চিত্রকর
ভ্রমেও কখন নিমিষের তরে ভাবে না আমারে পর।
ধূলা মাটী-ভরা পাথরে পাথরে বাঁধ তুলি যার কূলে
ধুয়ে মুছে দেয় শত ক্রন্দনে মনের দুয়ার খুলে;
অতি দীন হীন ভাবি গো যারে,—
হিয়া-সুধা ঝরে লক্ষ ধারে:
বন-তুলসীর বিকট গন্ধ নিতু যারে করি দান,
ধূপের সুবাস কোথা হ'তে এনে' ছেয়ে দেয় মন-প্রাণ।

শ্রীসত্যনারায়ণ দাশ (বি-এ)।

শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব

(২)
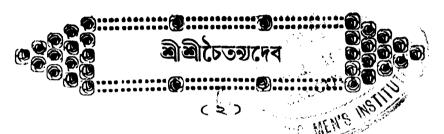
শৈশবলীলা

"দিদি, খোকাকে আমার কোলে দেও।"

প্রতিবেশিনী দুই বাহু বাড়াইয়া শচীদেবীর ক্রোড় হইতে শিশু নিমাইকে বুকে তুলিয়া লইলেন। শচীদেবী রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেলেন।

এই দেব-শিশু সাধারণ শিশু অপেক্ষা দীর্ঘকায়, 'কনক-কান্তি জিনি অঙ্গের লাবণী', ভাবে ঢলঢল নীলোৎপল আঁখি। সারাদেহ যেন নবনীতকোমল করকমল ও চরণতলে আরক্তিম আভাবিভাসিত, —ঈষৎ আঘাতেই যেন অলক্তক-ধারা গড়াইয়া পড়িবে।

এই দেব-শিশুকে কোলে লইবার জন্য সকলেই ব্যাকুল হইতেন।

প্রতিবেশিনী শিশুকে বুকে লইয়া অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দরসে অভিভূত হইলেন। শিশুর বিম্বাধরে হাসির ঝিলিক স্ফুরিত হইল। ব্রাহ্মণীও সে হাসি দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন।

কুটীর-অঙ্গনে প্রথম রৌদ্রের লীলায়িত রশ্মিরেখা উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। গাছের শাখায় পাখীর কূজন।

ব্রাহ্মণীর কোলে সহসা শিশু কাঁদিয়া উঠিল। তিনি তাহাকে থামাইবার জন্য কত রকম আদর করিতে লাগিলেন, কিন্তু ক্রন্দন থামিল না।

এমন সময় দ্বারপ্রান্তে ভিখারিণী উচ্চ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "হরেকৃষ্ণ! মা গো, দুটি ভিক্ষে পাই।"

শিশুর ক্রন্দন থামিয়া গেল। প্রতিবেশিনী ব্রাহ্মণী অবাক-বিস্ময়ে শিশুর মুখের দিকে চাহিলেন। ভিখারিণীর "হরেকৃষ্ণ" ধ্বনি শুনিবামাত্র শিশুর অশ্রুসজল নয়নযুগল যেন আনন্দ-দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল হইল।

শচীদেবী ভিখারিণীকে ভিক্ষা দিয়া আবার রন্ধনাগারে প্রবেশ করিলেন।

প্রতিবেশিনী ব্রাহ্মণী শিশুকে কোলে লইয়া দাওয়ার উপর বেড়াইতে লাগিলেন।

অল্পক্ষণ পরে শিশু আবার কাঁদিয়া উঠিল। সে ক্রন্দন আর থামিতে চাহে না। রমণী কত চেষ্টা করিলেন, কিন্তু শিশু কোন মতেই শান্ত হইল না।

শচীদেবী তখন রন্ধন করিতেছিলেন। তিনি প্রতিবেশিনীকে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি, ভাই, হরি হরি বল। দেখ্‌বে, খোকা অমনি কান্না বন্ধ করবে।"

প্রতিবেশিনী তাহাই করিলেন। হরিনাম শুনিবামাত্র শিশুর কান্না তখনই থামিয়া গেল। ব্রাহ্মণী এমন ব্যাপার কখনও দেখেন নাই। কচি শিশু হরিনাম শুনিবামাত্র অমনই শান্ত হয়! এ কি বিচিত্র, বিস্ময়কর ব্যাপার!

এমন ঘটনা প্রায়ই দেখা যাইত।

"শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত"-রচয়িতা লিখিয়াছেন—

"তাবত কান্দেন প্রভু কমললোচন।
হরিনাম শুনিলে রহেন ততক্ষণ॥
পরম সঙ্কেত এই সভে বুঝিলেন।
কান্দিলেই হরিনাম সভেই লয়েন॥

* * * *

'হরি হরি বলি যদি ডাকে সর্ব্বজনে।
তবে প্রভু হাসি চান শ্রীচন্দ্রবদনে॥'

শচীমাতা শিশুকে অঙ্গনে নামাইয়া দিলে শিশু এত দ্রুত হামাগুড়ি দিয়া চলিত যে, তাহার উপর বিশেষ দৃষ্টি না রাখিলে, দ্রুতগতিতে কোথায় পলায়ন করিবে, তাহার নিশ্চয়তা ছিল না।

জননী সন্তানের বিচিত্র গমনভঙ্গী দেখিয়া আনন্দে পুলকিত হইতেন। সেই ননীর পুতুল আনন্দ-নির্ঝর শিশুর প্রতি নির্ণিমেষ নেত্রে চাহিয়া চাহিয়া মাতৃহৃদয়ে যে বাৎসল্য-রসের সঞ্চার হইত, তাহা বর্ণনাতীত।

পদকর্ত্তা বাসুদেব বলিতেছেন :—

"এক মুখে কি কহিব গোরা চাঁদের লীলা।
হামাগুড়ি যায় নানা রঙ্গে শচীবালা॥
লালা মুখ ঝরঝর দেখিতে সুন্দর।
পাকা বিম্ব-ফল জিনি সুন্দর অধর॥"

আবার শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত বলিয়াছেন :—

"জানুগতি চলে প্রভু পরম সুন্দর।
কটিতে কিঙ্কিণী বাজে অতি মনোহর ॥"

নামকরণ

শ্রাবণের বারিধারা ঝর ঝর ধারে আকাশের বুক চিরিয়া নামিয়া আসিতেছিল। সৌদামিনীর চকিত লীলা এবং পরক্ষণেই বজ্রের গুরুগর্জ্জনে চারিদিক্ কাঁপিয়া উঠিতেছিল। শচীদেবী নিদ্রিত পুত্রের শয্যাপার্শ্বে শঙ্কিত-চিত্তে বসিয়াছিলেন। গৃহকর্ম্ম তখন আর বিশেষ বাকি ছিল না।

সুপ্ত মুখের স্বর্ণকমলে প্রদীপের আভা বিম্বিত হইতেছিল, গভীর নিদ্রায় শিশু নিমগ্ন। কিন্তু মাঝে মাঝে হাসির বিজলী-দীপ্তিতে আনন বিভাসিত হইতেছিল। জননী নিবদ্ধ দৃষ্টিতে সন্তানের প্রতি চাহিয়া আত্মহারা। তাঁহার মনে হইতেছিল, ঘরের অন্ধকারের মেঘান্তরালে আকাশের চাঁদ যেন তাঁহার প্রসারিত শয্যায় শায়িত হইয়া আঁধারে-আলোকে মিলন-মাধুর্য্য সৃষ্টি করিয়াছে। মেঘ-বারি বিদ্যুৎ-ব্যাকুল আকাশে যেন চাঁদের স্থান নাই। তাঁহারই কুটীরে চাঁদের সমাগম! মুগ্ধ দৃষ্টিতে শচীমাতা দেখিলেন, সৌদামিনী যেন তাঁহার নয়নানন্দ পুত্রের সর্ব্বাঙ্গে তরঙ্গায়িত।

জননী অতি সন্তর্পণে সন্তান-কপোলে চুম্বনরেখা মুদ্রিত করিয়া দিলেন। তাঁহার সর্ব্বদেহে আনন্দ-শিহরণ জাগিয়া উঠিল। নিদ্রিত শিশুর মুখেও যেন হাসির জ্যোৎস্না-প্লাবন বহিয়া গেল।

এমন সময় জগন্নাথ মিশ্র মৃদুপদসঞ্চারে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই বিচিত্র দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন। স্বামীর আগমন শচীদেবী বুঝিতে পারিলেন না।

স্বামী পার্শ্বে উপবেশন করিবামাত্র শচীদেবীর সম্মোহ-ভাব কাটিয়া গেল। তিনি মৃদুস্বরে বলিলেন, "খোকার [illegible] বয়স হ'ল, তা ঠিক আছে? অন্নপ্রাশন, নাম-করণের সময় এখনো হয় নি কি?"

জগন্নাথ মিশ্রের নয়নের দৃষ্টি তখন সুষমা-লীলান্বিত নিদ্রিত দেহকে যেন অভিষেক করিতেছিল। তিনি মৃদুস্বরে বলিলেন, "ঠিক বলেছ, ব্রাহ্মণি! কালই জ্যোতিষী ডেকে নামকরণের দিন স্থির করব।"

আকাশে তখনও মেঘগর্জ্জনের সঙ্গে বৃষ্টির ধারা যেন এক অপূর্ব্ব সঙ্গীত রচনা করিয়া চলিয়াছে।

পরদিবস দৈবজ্ঞ আসিলেন। নামকরণের দিন স্থির হইল। শুভ দিনে, শুভ ক্ষণে নামকরণের অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইল। প্রতিবেশিনীগণ ও আত্মীয় পুরমহিলারা "নিমাই" নাম রাখিবার পরামর্শ দিলেন। নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি, দৈবজ্ঞের সিদ্ধান্ত অনুসারে বিশ্বম্ভর ও প্রতিবেশিনীগণের মতে নিমাই এই দুইটি নামই রাখিবার প্রস্তাব করিলেন।

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতকার লিখিয়াছেন

"এ শিশু জন্মিলে মাত্র সর্ব্বদেশে দেশে।
দুর্ভিক্ষ ঘুচিল, বৃষ্টি পাইল কৃষকে ॥
জগৎ হইল সুস্থ ইহান্ জনমে।
পূর্ব্বে যেন পৃথিবী ধরিলা নারায়ণে ॥
অতএব ইহান্ 'শ্রীবিশ্বম্ভর' নাম।
কুলদীপ কোষ্ঠীতেও লিখিল ইহান্ ॥
'নিমাঞি' যে বলিলেন পতিব্রতাগণ।
সেহো নাম দ্বিতীয় ডাকিব সর্ব্বজন ॥"

নামকরণ-পর্ব্ব সমাপ্ত হইলে, শিশুর ভবিষ্যৎ প্রকৃতি জানিবার জন্য সকলেই আগ্রহান্বিত হইলেন।

সমবেত নারীগণ শঙ্খ ও উলুধ্বনি করিতে লাগিলেন। ধান্য, দূর্ব্বা, পুঁথি, কড়ি, স্বর্ণ-রজতাদি আনিয়া শিশুর সম্মুখে রাখা হইল। শিশু কোন্ দ্রব্য প্রথম স্পর্শ করিবে, তাহা প্রত্যক্ষ করিবার জন্য সকলেই উদ্গ্রীব হইলেন।

শত শত কৌতূহলী দৃষ্টির সম্মুখে শিশু শ্রীমদ্ভাগবত পুঁথিখানি দুই হস্তে আঁকড়িয়া ধরিলেন। সমবেত নর-নারী এই দৃশ্যে চমৎকৃত হইলেন।

"সকল ছাড়িয়া প্রভু শ্রীশচীনন্দন।
ভাগবত ধরিয়া দিলেন আলিঙ্গন ॥"

উত্তরকালে এই শিশু পরম পণ্ডিত, পরম বৈষ্ণব হইবেন, পাণ্ডিত্যের খ্যাতিতে জগৎ বিমুগ্ধ হইবে, এই ভাবী সম্ভাবনায় সকলেই উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। ধান্য, দূর্ব্বা, কড়ি, স্বর্ণ, রৌপ্য শিশুর চিত্তে আকাঙ্ক্ষা জাগাইল না। ইহাতে জগন্নাথ মিশ্র বিন্দুমাত্র নিরানন্দ অনুভব করিলেন না। শচীদেবীও অণুমাত্র অপ্রসন্ন হইলেন না।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার লিখিয়াছেন—

"পতিব্রতাগণে জয় দেই চারিভিত।
সভেই বোলেন বড় হইব পণ্ডিত॥
কেহ বোলে, শিশু হৈব পরম বৈষ্ণব।
অল্পে সর্ব্ব-শাস্ত্রের পরম অনুভব॥"

তখন সমবেত নারীগণের কোলে কোলে শিশু ফিরিতে লাগিলেন। শচীমাতা সানন্দে পুত্রমুখ চুম্বন করিয়া হৃদয়ের অতুল্য আনন্দ—তৃপ্তি অনুভব করিলেন।

বাল্যক্রীড়া

সুগঠিত দেহ, সুঠাম, সুন্দর শিশু ক্রমে হাঁটিতে শিখিলেন।

চঞ্চলগতি শিশু হাসিতে হাসিতে দ্রুত চরণক্ষেপে অঙ্গন পার হইয়া কখন কোথায় যাইবেন, এই দুশ্চিন্তায় জননী সর্ব্বক্ষণ তাঁহার দিকে দৃষ্টি রাখিতেন। কিন্তু শিশুকে ধরিয়া রাখা দায়; হয় তিনি পথে বাহির হইয়া পড়েন, নচে ত ধুলায় গড়াগড়ি দিয়া সোণার অঙ্গ মলিন করেন, শচীদেবী আলুথালু বেশে ছুটিয়া পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া অঙ্গমার্জ্জনা করিয়া দেন।

দুরন্ত শিশুর ভয় ডর ছিল না। একদিন গৃহপ্রাঙ্গণে একটি সর্প দেখিয়া শিশু তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। শচীমাতা সেই দৃশ্য দেখিয়া ভয়ে শিহরিয়া উঠিলেন। এমন দুঃসাহসী সন্তানকে বিশ্বাস নাই। কিন্তু সাপটি শিশুকে দংশন না করিয়া পলাইয়া গেল।

এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত লিখিয়াছেন—

"একদিন এক সর্প বাড়ীতে বেড়ায়।
ধরিলেন সর্প প্রভু বালক-লীলায়॥
কুণ্ডলী করিয়া সর্প রহিল বেড়িয়া।
ঠাকুর থাকিলা সর্প উপরে শুইয়া॥

*　　　*　　　*

'গরুড় গরুড়' করি ডাকে সর্ব্বজন।
পিতামাতা আদি ভয়ে করেন ক্রন্দন॥
প্রভুরে এড়িয়া সর্প পলায় তখন।
পুন ধরিবারে যান শ্রীশচী-নন্দন॥
ধরিয়া আনিয়া সভে করিলেন কোলে।
'চিরজীবী হও' করি নারীগণ বোলে॥"

শিশু নিমাইকে লইয়া শচীমাতা সদাই বিব্রত। চঞ্চলমতি শিশু কখন্ কোন্ সময় বাড়ী হইতে অন্যের অলক্ষ্যে বাহির হইয়া যাইবেন, নগরের লোকারণ্যের মধ্যে হারাইয়া যাইবেন, এই দুশ্চিন্তায় শচীদেবী সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকিতেন।

একদিন সকলের অলক্ষ্যে শিশু পথে বাহির হইয়া পড়িলেন; শিশুর সোণার অঙ্গে আবার স্বর্ণালঙ্কার।

"অঙ্গদ বলয়া শোভে সুবাহুযুগলে।
চরণে নপুরা খাড়ু বাঘনখ গলে॥
সোণার শিকলি পিঠে পাটের থোপ্না।"

অপরাহ্নের ম্লান আলোক তখন ঘনাইয়া আসিতেছিল। শিশু আনমনে চলিতেছিলেন।

স্বর্ণালঙ্কারভূষিত সুন্দর শিশু দেখিয়া পথচারী দুই জন চোরের লোভ জন্মিল। তাহাদিগের এক জন নিমাইকে কোলে তুলিয়া লইল। আর এক জন দোকান হইতে সন্দেশ কিনিয়া আনিয়া শিশুর হাতে দিল।

নবদ্বীপের পথে অসংখ্য লোক চলিয়াছে। কেহ বুঝিতেও পারিল না যে, জগন্নাথ মিশ্রের পুত্রকে চোর অলঙ্কারের লোভে চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছে।

এদিকে নিমাইকে না দেখিতে পাইয়া বাড়ীর সকলে শশব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। শচীমাতা কাঁদিতে লাগিলেন। চারিদিকে শিশুর সন্ধানে লোক ছুটিল। কিন্তু কোথাও সন্ধান মিলিল না। তখন জগন্নাথ মিশ্র চারিদিক্ অন্ধকার দেখিলেন। গৃহে ক্রন্দনের রোল উঠিল।

এদিকে যে চোর শিশুকে কোলে লইয়া অলঙ্কার লোভে দূরে পলাইতেছিল, শিশুর অঙ্গস্পর্শে তাহার হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব শিহরণ সঞ্চারিত হইতে লাগিল। তাহার সমস্ত অন্তর প্রগাঢ় স্নেহরসে অভিষিক্ত হইল।

এই সুকুমার দেহ, আনন্দ-পুত্তলী শিশুকে হত্যা করিয়া অলঙ্কার চুরি করিবার প্রবৃত্তি তাহার চিত্ত হইতে সহসা যেন বিলীন হইয়া গেল। যে শিশুর অঙ্গস্পর্শে তাহার অন্তর এমন অপূর্ব্ব পুলকরসে স্পন্দিত হইয়া উঠিতেছে, তাহার নবনীত-কোমল দেহ হইতে অলঙ্কার কখনই সে উন্মোচন করিতে পারিবে না।

চোর তখন সন্ধ্যার অন্ধকারে শিশুকে লইয়া ফিরিয়া আসিতে লাগিল। না, সে শিশুকে তাহার গৃহে ফিরাইয়া

দিয়া আসিবে। আজ হইতে সে ঘৃণিত পাপ কার্য্য আর করিবে না।

ঘুরিতে ঘুরিতে চোর শিশুক্রোড়ে জগন্নাথ মিশ্রের বাড়ীর কাছে আসিল। দূর হইতে জনতার আচরণ ও আলোচনা হইতে সে বুঝিল, শিশুটি এই গৃহেরই হইবে। তখন সে শিশুকে নামাইয়া দিয়া তাড়াতাড়ি পথের অন্ধকারে আত্মগোপন করিল। সঙ্গী চোরও তাহার অনুগমন করিল।

জগন্নাথ মিশ্র পুত্রের সন্ধান না পাইয়া যখন হা-হুতাশ করিতেছিলেন, সেই সময় শিশু নিমাই দৌড়াইয়া গিয়া পিতার গলদেশ নবনীত-কোমল বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করিলেন। তাঁহার অপ্রত্যাশিত আগমনে সকলে বিস্ময়ানন্দে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। সকলেই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, নিমাই কাহার সঙ্গে কোথায় গিয়াছিলেন। কেমন করিয়াই বা ফিরিয়া আসিলেন?

নিমাই মধুরকণ্ঠে উত্তর করিলেন, পথে বাহির হইয়া তিনি গঙ্গার দিকে যাইতেছিলেন। এমন সময় এক জন তাঁহাকে কোলে করিয়া অনেক দূর লইয়া গিয়াছিল। তাহারা দুই জনে তাঁহাকে এখানে রাখিয়া গিয়াছে।

শৈশবকাল হইতেই নিমাইয়ের অপূর্ব্ব নৃত্যলীলার ছন্দভঙ্গী-বিকাশ সকলকে বিস্মিত করিত। শৈশবে নিমাইকে শচীমাতা কাপড় পরাইয়া মাথার চূড়া বাঁধিয়া সোণার ফুল আঁটিয়া দিতেন।

বালক নানা ভঙ্গীতে নৃত্য করিতেন; সেই ললিতলীলার প্রতি ছন্দে মাধুর্য্যরস ঝরিয়া পড়িত। শচীমাতা ও অন্যান্য নারীগণ করতালি দিতে দিতে সেই নৃত্যচ্ছন্দ উপভোগ করিতেন।

প্রতিদিন সন্ধ্যায় শচীমাতা নিমাইকে বুকে করিয়া ঘরে লইয়া আসিলে বালক তাঁহার সহিত খেলা করিতেন।

চৈতন্যমঙ্গল বলিয়াছেন:—

ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে, ক্ষণে খটা করে।
ক্ষণে কোলে ক্ষণে দোলে হিয়ার উপরে॥
শচীমার স্তনযুগে দু পা রাখিয়ে।
সোণার লতিকা দোলে যেন বায়ু পেয়ে॥"

হাতে-খড়ি

শুভদিনে জগন্নাথ মিশ্র পুত্রের হাতে-খড়ি দিয়া বিদ্যারম্ভ করাইলেন। বর্ণপরিচয় করিতে নিমাইয়ের বেশীক্ষণ লাগিল না। দুই তিন দিনেই বালক লিখিতে শিখিলেন। সকলে সবিস্ময়ে এই প্রতিভাধর বালকের মেধার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইলেন।

"দৃষ্টিমাত্র সকল অক্ষর লিখে যায়।
পরম বিস্মিত হই সর্ব্বজনে চায়॥
দিন দুই তিনে লিখিলেন সর্ব্বফলা।
নিরন্তর লিখেন কৃষ্ণের নাম-মালা॥"

কিন্তু প্রতিভার পরিচয় প্রকট হইলেও পাঠে নিমাইয়ের অনুরাগ প্রকাশ পাইল না। চঞ্চল বালক কেবল ক্রীড়া লইয়াই ব্যস্ত। সমবয়স্ক শিশুদিগের সহিত সারাদিন খেলায় নিমগ্ন দেখিয়া শচীমাতাও সময় সময় চিন্তিত হইতেন।

খেলার উত্তেজনায় অনেক সময় বালকের ক্ষুধা তৃষ্ণা বোধ থাকিত না। রৌদ্রতাপে সর্ব্বদেহে ঘাম ঝরিতেছে—মুখ শুকাইয়া গিয়াছে, কিন্তু নিমাইয়ের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই।

শচীদেবী ক্রীড়াসক্ত পুত্রকে অনেক সময় ধরিয়া আনিতেন। ধূলা-কাদা মুছাইয়া দিয়া বলিতেন, "তোর কি ক্ষিধে পায় না, নিমাই? এমন করে তুই আমায় দুখ দিস্ কেন, বাবা?"

মাতার কাতর কণ্ঠের এই স্নেহের ভর্ৎসনা শুনিয়া বালক মাতার কণ্ঠদেশ বেষ্টন করিয়া ধরিয়া বলিতেন, "না, মা, চল, বড় ক্ষিধে পেয়েছে।

লেখাপড়া ছাড়িয়া বালক সর্ব্বদা খেলায় মত্ত থাকিতেন বলিয়া জগন্নাথ মিশ্র তাড়না করিতেন। নিমাই মাতার নির্ভয় ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। শচীদেবী স্বামীকে শান্ত করিতেন।

[ক্রমশঃ।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

অর্থনীতিক কথা

অর্থনীতিক কার্য্য-পদ্ধতির পরিকল্পনা

অর্থনীতিক সমস্যা এ দেশে কিরূপ জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ হইয়াছে, তাহা আজ আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না! এ দেশের লোকের ক্রমবর্দ্ধমান দারিদ্র্য জাতির সর্ব্বনাশ করিতেছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অর্দ্ধ শতাব্দীরও অধিক কাল পূর্ব্বে বাঙ্গালার শিক্ষিত ব্যক্তিরা লক্ষ্য করিয়াছিলেন—আমরা যে ভাবে পণ্য সম্বন্ধে পরমুখাপেক্ষী হইতেছি তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে আমাদিগের দুর্দ্দশার সীমা থাকিবে না। তাই কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে "হিন্দু মেলায়" মনোমোহন বসু মহাশয়ের যে গান গীত হয়, তাহাতে দুঃখ প্রকাশ করিয়া লিখিত হইয়াছিল, দেশের—

"তাঁতী কর্ম্মকার করে হাহাকার;
সুতা জাঁতা ঠেলে অন্ন মেলা ভার।"

আর

"দেশালাই কাঠি তাও আসে পোতে।
প্রদীপটি জ্বালিতে—খেতে শুতে যেতে
কিছুতে লোক নয় স্বাধীন।"

মহাদেব গোবিন্দ রাণাড়ে মহাশয় বলিয়াছিলেন, রাজনীতিক দাসত্ব লোকের দৃষ্টি অধিক আকর্ষণ করে বটে, কিন্তু অর্থনীতিক দাসত্ব তদপেক্ষা ভয়ানক। আমাদিগের রাজনীতিক দাসত্ব যে আমাদিগের অর্থনীতিক দাসত্বের অন্যতম কারণ, তাহাতে অবশ্যই সন্দেহ নাই। কিন্তু রাজনীতিক দাসত্ব সত্ত্বেও আমরা অর্থনীতিক স্বাধীনতা যতটুকু রক্ষা করিতে পারি, তাহাও রক্ষার চেষ্টা আমরা করি নাই এবং করি নাই বলিয়াই আজ আমাদিগের দারুণ দুর্দ্দশা।

কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে (১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে) যে সকল বিষয় আলোচিত হয়, সে সকলের মধ্যে ভারতের ক্রমবর্দ্ধনশীল দারিদ্র্য অন্যতম। তদবধি কংগ্রেসের বহু অধিবেশনে এই বিষয় আলোচিত হইয়াছে বটে, কিন্তু কংগ্রেস প্রত্যক্ষভাবে এই দারিদ্র্যের দূরীকরণ-চেষ্টা করেন নাই। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের অধিকাংশ প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব স্বীকার ও লাভ করায় এই কার্য্যের জন্য আয়োজন হইয়াছে এবং ইহার জন্য যে সমিতি গঠিত হইয়াছে, তাহা National Planning Committee নামে অভিহিত। জাতীয় অর্থনীতিক উন্নতিসাধনের জন্য সর্ব্বপ্রথমে রুশিয়ার নবগঠিত সরকার চেষ্টা করেন। তাঁহারা অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে লইয়া এই জন্য যে সমিতি করেন, তাহার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সত্য সত্যই বিশ্বের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে। এই পরিকল্পনা অনুসারে কায করিয়া রুশিয়া অসাধ্য-সাধন করিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। রুশিয়ার দৃষ্টান্তে অন্যান্য দেশও এইরূপ পরিকল্পনা করিয়াছে। ফ্রান্সের ও তুর্কীর পরিকল্পনাও উল্লেখযোগ্য। যাহাতে নিয়মবদ্ধ ভাবে কায করিয়া অল্প দিনে দেশের অর্থনীতিক উন্নতি করা যায়, তাহাই এই সব পরিকল্পনার উদ্দেশ্য।

এ দেশে কংগ্রেস পরিকল্পনা করিবার জন্য যে সমিতি গঠিত করিয়াছেন, তাহার কর্ম্মের বিপুলত্ব যে অসাধারণ, তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। সংপ্রতি যে ইহার সম্পাদককে রাজনীতিক মতের জন্য পদত্যাগ করিতে হইয়াছে, ইহা একান্ত পরিতাপের বিষয়। কারণ, রাজনীতিক মতের সহিত সম্বন্ধ না রাখিয়া এই সমিতিকে স্বাধীনভাবে কায করিতে না দিলে, উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত।

এই সমিতি বিজ্ঞানানুমোদিত পন্থায় এ দেশের অর্থনীতিক অবস্থার আলোচনা করিয়া আবশ্যক ব্যবস্থা করিতে উপদেশ দিবেন এবং রোগের নিদান নির্ণয় করিয়া বিধান করিবেন।

সংপ্রতি বোম্বাইয়ে এই সমিতির যে অধিবেশন হইয়া গিয়াছে, তাহাতে প্রাথমিক কর্ম্মের আলোচনা অগ্রসর হইয়াছে এবং কর্ম্মপদ্ধতিও কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছে।

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, আর্থিক ব্যবস্থা ও শিক্ষা সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে বিবেচনার জন্য সমিতি ২৭টি শাখা-সমিতি গঠিত করিয়াছেন।

ইহার মধ্যে ৯টি প্রাদেশিক সরকার এবং প্রধান সামন্তরাজ্যসমূহের কয়টি এই সমিতির সহিত সহযোগ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। অবশিষ্ট প্রদেশদ্বয়ে কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব লাভ করেন নাই। কিন্তু এই দুইটির মধ্যে পঞ্জাব সরকার, বিলম্বে হইলেও, সমিতিতে যোগ দিতে সম্মত হইয়াছেন এবং শীঘ্রই সমিতিতে প্রতিনিধি মনোনীত করিবেন। কেবল বাঙ্গালার সরকারই সমিতিতে যোগ দেন নাই। বোধ হয়, এইরূপ কর্ম্মের জন্যই বাঙ্গালার অর্থ-সচিব বলিয়াছিলেন—বাঙ্গালার সচিবরা অন্য কোন প্রদেশের অনুকরণ করেন না; তাঁহারা আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেন।

ইহা যে বাঙ্গালার দুর্ভাগ্যদ্যোতক, তাহাতে অবশ্য সন্দেহ থাকিতে পারে না। বাঙ্গালার সচিবদিগের এই কার্য্যে অনেকেরই ঈশপের উপকথার মন্দুরাস্থিত সারমেয়ের কথা মনে পড়িবে; সে অশ্বের আহার্য্যপাত্রে শয়ন করিয়া থাকিত—আপনি সে আহার্য্য ভক্ষণ করিতে পারিত না, অশ্বদিগকেও আহার করিতে দিত না। বাঙ্গালার সচিবরা এইরূপ জনহিতকর কোন কার্য্যের ব্যাপক ব্যবস্থা করেন নাই। অথচ বাঙ্গালায় সচিবের সংখ্যা অকারণ অধিক এবং সচিবরা কংগ্রেসের নির্দ্দিষ্ট বেতনের বহুগুণ অধিক বেতন গ্রহণ করেন।

বাঙ্গালায় সেচের প্রয়োজন কত অধিক, তাহা সেচ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞরা ব্যক্ত করিয়াছেন এবং তাঁহারা দেখাইয়াছেন, সেচের সুবিধার অভাবে কৃষিকার্য্যের অবনতি ঘটিতেছে; আর তাহার ফলে ম্যালেরিয়ার বিস্তার ঘটিতেছে। অতি অল্প দিন পূর্ব্বে বাঙ্গালার "ডিরেক্টার অব পাবলিক হেল্থ" বলিয়াছেন, বাঙ্গালার লোকসংখ্যা প্রায় ৫ কোটি আর বাঙ্গালায় বৎসরে ৩ কোটি হইতে ৪ কোটি লোক ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত এবং প্রায় ৫ লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়; অথচ সরকারের কুইনাইন সম্বন্ধে (অর্থাৎ সিনকোনার চাষের এবং কুইনাইন প্রস্তুত ও বিতরণ করার) কোন পদ্ধতি নাই! অর্থনীতিক হিসাবে এই ব্যাধির আক্রমণের ফলও

ভয়াবহ—ইহার জন্ম লোক ২০০,০০০,০০০ দিন অসুস্থ থাকে এবং কায করিতে অক্ষম হয়। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে সরকারের আদমশুমার রিপোর্টে স্বীকৃত হইয়াছে, বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর নানা অনিষ্টের মূল—ম্যালেরিয়া। এই অবস্থায়ও আজ পর্য্যন্ত এ দেশে সিনকোনার চাষ বৃদ্ধির উল্লেখযোগ্য চেষ্টা হয় নাই! বাঙ্গালায় সিনকোনা চাষের উপযুক্ত জমির অভাব নাই।

একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায়, দেশের প্রকৃত উন্নতিকর কার্য্যের কোন ব্যাপক পরিকল্পনা সরকার করেন নাই। তাঁহারা দৈনন্দিন কায শেষ করিয়া—"দিনগত পাপক্ষয় করিয়াই" সন্তুষ্ট। বর্ত্তমান শাসন-পদ্ধতিতে প্রাদেশিক সরকার-সমূহকে কিছু অধিক অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে এবং তাঁহারা—যোগ্যতা, ইচ্ছা ও আন্তরিকতা থাকিলে—দেশের কল্যাণকর কার্য্য করিতে পারেন। সেরূপ অনেক কার্য্য আবার প্রদেশের সীমায় সীমাবদ্ধ নহে—সে জন্য একাধিক প্রদেশের একযোগে কায করা প্রয়োজন। দৃষ্টান্তস্বরূপ কচুরীপানার উচ্ছেদসাধনের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

এই সকল বিবেচনা করিলে প্রাদেশিক পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র দেশসম্পর্কিত পরিকল্পনার প্রয়োজন সহজেই উপলব্ধ হয়। সেই জন্য আমরা এই "ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং কমিটীর" কার্য্যফল সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিব। যে সব প্রদেশের প্রাদেশিক সরকার এই সমিতিতে যোগ দিয়াছেন, সে সব প্রদেশে যে সমিতির নির্দ্ধারণ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে ও যৌথভাবে পালিত হইবে, তাহা মনে করিবার কারণ আছে।

যত দিন দেশের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও শিল্পের উন্নতি সাধিত না হইবে—সেচের সুব্যবস্থায় কৃষির উন্নতি সাধিত ও জলনিকাশের উপযুক্ত ব্যবস্থা না হইবে, তত দিন যে দেশের লোকের দুর্গতির অবসান না হইয়া তাহা উত্তরোত্তর বির্দ্ধিতই হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এ দেশে সংস্কারের চেষ্টা ব্যতীত এই সকল কল্যাণকর কার্য্যে যে অগ্রসর হওয়া যায় না, তাহা স্বীকৃত হইয়াছে।

বাঙ্গালার ভাগ্যে যাহাই হউক, হয়ত আপাততঃ ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ এই পরিকল্পনাসমিতির নির্দ্ধারণফলে উপকৃত হইবে এবং তখন বাঙ্গালাকেও বাধ্য হইয়া সেই পরিকল্পনায় অবহিত হইতে হইবে। বিলম্বিত হইলেও যে তাহা হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না।

এইরূপ পরিকল্পনার প্রয়োজন সকল সভ্য দেশেই স্বীকৃত হইয়াছে—ভারতবর্ষে তাহার প্রয়োজন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

রেশম-শিল্প

বর্ত্তমান পঞ্জাবে প্রতি বৎসর ৫০ লক্ষ টাকার রেশম বাহির হইতে আমদানী হয়। কিরূপে পঞ্জাব প্রদেশকে রেশম সম্বন্ধে স্বাবলম্বী করিতে পারা যায়, পঞ্জাব সরকারের শিল্প-বিভাগ সেই বিষয় বিবেচনা করিতেছেন। পঞ্জাবের কাঙ্গড়া উপত্যকায় রেশমের চাষ সম্বন্ধে পরীক্ষা সাফল্যলাভ করিয়াছে এবং সেই জন্ম শিল্প-বিভাগের বিশ্বাস হইয়াছে, পঞ্জাবে রেশমের চাষের বিশেষ উন্নতি সাধিত হইতে পারে। তুঁত গাছের চাষ বৃদ্ধি করা এই জন্ম সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন; কারণ, এই গাছের পত্রই রেশম-পোকার খাদ্য। বন অঞ্চলে, পর্ব্বত-পাদদেশে ও খালের কূলে ইহার চাষ সুবিধাজনক। সেই জন্ম তুঁত গাছের চাষের অধিক জমি পাইবার চেষ্টায় শিল্প-বিভাগ বন-বিভাগের ও সেচ-বিভাগের সহযোগ গ্রহণে সচেষ্ট হইয়াছেন। এই কার্য্যে শিল্প-বিভাগের বিশেষ অবহিত হইবার কারণ—পঞ্জাবে রেশমের চাষ সাফল্যলাভের সম্ভাবনা যেমন অধিক, উৎপন্ন রেশম প্রয়োজনাতিরিক্ত হইবার সম্ভাবনা তেমনই অল্প। শিল্প-বিভাগের পরীক্ষাফলে লোক এখন তুঁত গাছের চাষে লাভ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়াছে। বিভাগ কর্ত্তৃক নিযুক্ত বিশেষজ্ঞদিগের তত্ত্বাবধানে পাঠানকোট ও পালমপুর অঞ্চলে পোকার চাষ ও রেশম সূতা প্রস্তুত করা হইতেছে। তুঁত গাছের চাষ ও রোগশূন্য রেশম পোকা রেশমের চাষের জন্ম সর্ব্বপ্রধান উপকরণ। ভারত সরকার ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে রেশম-শিল্পের উন্নতির জন্য অর্থ দিয়াছেন। সেই অর্থে পালমপুরে পোকার গোলা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দেখা গিয়াছে, আমদানী পোকায় যে ব্যয় হয়, তাহার তুলনায় "বীজ-পোকা" উৎপন্ন করিতে অল্প ব্যয় হয়। বিশেষ স্থানীয় "বীজে" যে পোকা হয়, তাহা আমদানী পোকা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। পঞ্জাব সরকারের শিল্প-বিভাগের বিশ্বাস, আর এক বা দুই বৎসরের মধ্যে এই "গোলায়" সমগ্র প্রদেশের আবশ্যক "বীজ-পোকা" উৎপন্ন করা যাইবে।

ভারত সরকার রেশম-শিল্পের উন্নতিকল্পে যে ব্যয় বরাদ্দ করিয়াছিলেন—তাহার অংশ বাঙ্গালাতেও দেওয়া হইয়াছিল। মোট ৫ বৎসরে ভারত সরকার যে ১ লক্ষ টাকা দিবেন, স্থির করিয়াছিলেন, ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে তাহার মধ্যে বাঙ্গালা সরকার ৪১ হাজার ৩ শত ৪৭ টাকা পাইয়াছিলেন। ঐ টাকা ২ বাবদে ব্যয়িত হইবে নির্দ্দিষ্ট ছিল :—

(১) বিভাগের তত্ত্বাবধানে রোগশূন্য "বীজ-পোকা" উৎপাদন ও লোককে প্রদান—৩৮,৮৪৭ টাকা।

(২) রেশম-কীট রোগবর্জ্জিত করিবার জন্য "ডিস-ইনফেক্টাণ্টের" উপযোগিতা পরীক্ষা—২ হাজার ৫ শত টাকা।

এই সময় বাঙ্গালা সরকারের শিল্প-বিভাগের ডিরেক্টার টারিফ বোর্ডের রিপোর্ট উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছিলেন, অনেকে যে মনে করেন বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে রেশম-শিল্পে মহীশূরই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে তাহা নহে। যাহাকে তুঁতপোকার রেশম বলা হয়, তাহা এখনও বাঙ্গালায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উৎপন্ন হয়। বর্ত্তমানে বাঙ্গালার মুর্শিদাবাদ ও মালদহ জিলা দুইটিতেই এই রেশম অধিক উৎপন্ন হয়। বীরভূম ও বাঁকুড়া দুইটি জিলায় যে রেশম উৎপন্ন হয়, তাহা এই জাতীয় নহে এবং তাহাকে তসর-রেশম বলা হয়।

বাঙ্গালার এই রেশমশিল্প এক সময়ে বহুবিস্তৃত এবং বিশেষ লাভজনক ছিল।

আলিবর্দ্দী খাঁ যখন বাঙ্গালার নবাব-নাজিম, তখন মুর্শিদাবাদের শুল্ক-বিভাগের হিসাবে বার্ষিক ৮৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার রেশমের উল্লেখ দেখা যায়। বিভিন্ন য়ুরোপীয় ব্যবসায়ী যে রেশমের ব্যবসা করিত, তাহা এই হিসাবের অন্তর্ভুক্ত ছিল না—কারণ, তাহা হয় শুল্ক হইতে অব্যাহতি পাইত, নহেত হুগলীতে তাহার উপর শুল্ক আদায় হইত। ইংরেজ ব্যতীত ফরাসী, ডাচ ও আর্ম্মাণীরা কাশিমবাজারে রেশমের ব্যবসা করিত এবং বার্ণিয়ার বলেন,

প্রত্যেক কুঠীতে শত শত লোক কায করিত। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের হিসাবেও দেখা গিয়াছিল—রেশম-শিল্পে ১০ হাজার ৬ শত লোক জীবিকা অর্জ্জন করিত, রেশমের মূল্য সাধারণতঃ বাৎসরিক ১৬ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা ছিল এবং ৫০ হাজার বিঘা জমিতে তুঁত গাছের চাষ হইত। এই সময়েও বার্ষিক ৬ লক্ষ টাকার রেশমী কাপড় বয়ন করা হইত। ইহা এই শিল্পের পূর্ব্বসমৃদ্ধির অবশেষ। কারণ, ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের দ্বাদশ বৎসর পরে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ত্তারা নির্দ্দেশ প্রদান করেন—বাঙ্গালায় রেশম উৎপাদনে উৎসাহ প্রদান করিয়া রেশমী বস্ত্র বয়ন যাহাতে অল্প হয়, তাহাই করিতে হইবে এবং যাহারা রেশমী সূতা প্রস্তুত করে, তাহাদিগকে কোম্পানীর কুঠীতে আসিয়া কায করিতে বাধ্য করিতে হইবে। এই সূত্রপ্রস্তুতকারীদিগকে এত উৎপীড়িত করা হইতে লাগিল যে, তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ আপনাদিগের অঙ্গুষ্ঠ কাটিয়া ফেলিয়া সূত্র প্রস্তুত করিতে অক্ষম হইল। এইরূপে দেশের রেশম-শিল্পের অবনতি হইতে লাগিল। রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিয়াছেন—"The factories demanded raw produce; the people of India provided the raw produce; forgot their ancient manufacturing skill; lost the profits of manufacture" ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্স রেশম শিল্পের উন্নতির জন্য আমদানী রেশমী কাপড়ের উপর চড়া শুল্ক স্থাপন করায় বাঙ্গালার রেশমী বস্ত্রের—বিশেষ "কোরার" রপ্তানী হ্রাস হয়। বাঙ্গালায় রেশম উৎপাদন ও রেশমী কাপড় বয়ন এখন মরণাহত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহার উন্নতিসাধনের উপায় নির্দ্ধারণার্থ কমিটী নিযুক্ত করা হইয়াছে, কিন্তু কমিটীর নির্দ্ধারণানুসারে কায হয় নাই। লেফ্রয়ের বিস্তৃত রিপোর্টেও বাঙ্গালার রেশম ও রেশমী বস্ত্রশিল্প কোনরূপে উপকৃত হয় নাই। বিশেষ বাঙ্গালায় রেশমকীট রোগশূন্য করিবার উপায় এখনও অবলম্বিত হয় নাই—আবিষ্কৃত হইয়াছে কি না, তাহাও বলা যায় না।

অথচ বাঙ্গালা তুঁত গাছের চাষের বিশেষ উপযোগী। বর্ত্তমানে দুইটি সামন্ত রাজ্যেই রেশমের ও রেশম-শিল্পের উন্নতিসাধনের সমধিক চেষ্টা হইতেছে। মহীশূর ও কাশ্মীর এই কার্য্যে অর্থব্যয় ও উদ্যম প্রয়োগ করিয়াছে ও করিতেছে। আর যে বাঙ্গালা সমগ্র ভারতে এই দুই কার্য্যে অগ্রণী ছিল, সেই বাঙ্গালায় ইহাদিগের অবনতিই ঘটিতেছে। যে পঞ্জাবে পূর্ব্বে রেশমের চাষ ছিল না বা উল্লেখযোগ্য ছিল না, সেই পঞ্জাবে যাহা হইতেছে, তাহাও কি বাঙ্গালায় হইয়াছে?

চিকিৎসকেরা আজকাল যেমন ঔষধে রোগ আরোগ্য করিতে না পারিলে শেষে স্বাস্থ্যকর স্থানে গমনের ("চেঞ্জ") ব্যবস্থা দেন, তেমনই এখন কোন শিল্পের অবনতির কথা হইলেই তাহাকে রক্ষা শুল্ক দিয়া সাহায্যের বিধানদানের প্রস্তাব হয়। কিন্তু ঐ ব্যবস্থা যে সর্ব্বব্যাধিহর নহে, তাহাতে সন্দেহ নাই। রেশম সম্বন্ধেও ঐ ব্যবস্থা হইয়াছে এবং যে ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাতে ঈপ্সিত ফললাভ না হওয়ায় আমদানী রেশমের ও রেশমী কাপড়ের উপর শুল্কের মাত্রা বাড়াইবার প্রস্তাব হইতেছে। কিন্তু কি জন্য বাঙ্গালার রেশম—যে বাঙ্গালার রেশমী বস্ত্র বিদেশে রপ্তানী করিয়া বাঙ্গালী অর্থার্জ্জন করিত—সেই বাঙ্গালার রেশম ও রেশমী বস্ত্র আজ জাপানী ও ইটালিয়ান পণ্যের সহিত প্রতিযোগিতায় সাফল্যলাভ করিতে পারিতেছে না, তাহা বিবেচনা করিয়া প্রতীকারোপায় অবলম্বিত হইতেছে না—অর্থাৎ নিদান-নির্ণয় করিয়া বিধান-দান হইতেছে না। সার জর্জ্জ বার্ডউডের কথায় বলা সহজ—"Indian native gentlemen and ladies should make it a point of culture never to wear any clothing or ornaments but of native manufacture and strictly native design, constantly purified by comparison with the best examples." কিন্তু কেবল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দ্বারা কোন বৃহৎ শিল্প রক্ষিত হইতে পারে না এবং জনগণ অল্পমূল্যের পণ্য ক্রয় করিবেই। এই সব বিবেচনা করিয়া বাঙ্গালার রেশম-চাষের ও রেশম-শিল্পের উন্নতিসাধন করিতে হইবে।

দেশলাই শিল্প

লক্ষ্ণৌ হইতে সংবাদ আসিয়াছে, দেশলাই প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে কাঠের চাহিদা বৃদ্ধির জন্য যুক্ত প্রদেশের সরকার, সরবরাহ বৃদ্ধির উপায় দ্বিগুণ করিতেছেন। বর্ত্তমানে বৎসরে ব্যবহারোপযোগী ৬ লক্ষ বর্গ ফুট কাঠের প্রয়োজন; অথচ উহার অর্দ্ধেক পরিমাণ কাঠ পাওয়া যায়। অর্থাৎ অবশিষ্ট অর্দ্ধেকের জন্য আমাদিগকে বিদেশের মুখাপেক্ষী হইতে হয়। বিদেশ হইতে শিল্পের উপকরণ আনিতে হইলে যেমন পণ্যোৎপাদনের ব্যয় অধিক হয়, তেমনই যুদ্ধাদি কারণে সরবরাহ বন্ধ হইতেও পারে। লোকের নিত্যব্যবহার্য্য পণ্যের উৎপাদক শিল্পের পক্ষে তাহা বিপজ্জনক।

এ দেশে উপযুক্ত কাঠের সরবরাহের অভাব যে বহুদিন হইতে অনুভূত হইয়া আসিয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য। যে স্বদেশী আন্দোলন বাঙ্গালার দান, তাহার ফলে হিন্দুস্থানের নানা স্থানে যখন দেশলাইএর কারখানা স্থাপিত হয়, তখন এই বিষয় বহু বার আলোচিত হইয়াছিল এবং কাঠের অভাবেই কোন কোন কারখানা অচল হইয়াছিল। কিন্তু তখনও সরকারের বনবিভাগ এ বিষয়ে আবশ্যক মনোযোগ প্রদান করেন নাই। ঠিক এইভাবেই এরোপ্লেন প্রস্তুত করিতে যে স্প্রুস কাঠের প্রয়োজন হয়, তাহা আমেরিকা হইতেই আমদানী হয়। সেই কাযের জন্য এ দেশের কোন কাঠ ব্যবহৃত হইতে পারে কি না, বনবিভাগ সে বিষয়ে পরীক্ষা করিয়াছেন, মনে হয় না। অথচ সেই গাছ এ দেশে হইতে পারে কি না, তাহা পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

স্বদেশী আন্দোলনেরও বহু পূর্ব্বে কলিকাতায় একাধিক দেশলাইএর কল প্রতিষ্ঠিত হয়। যতদূর মনে পড়ে, তাহাতে প্রথম কল কলিকাতা উল্টাডাঙ্গায় ও দ্বিতীয় কল গঙ্গার পরপারে সালকিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং তাহার পর রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিদিগের নেতৃত্বে কোন্নগরে "ওরিয়েণ্টাল" কারখানা এবং কলিকাতা টালিগঞ্জে সার রাসবিহারী ঘোষ মহাশয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় একটি কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সকলের কোনটই যে স্থায়ী অর্থাৎ লাভজনক হয় নাই, অল্প মূল্যে উপযোগী কাঠের অভাবই তাহার সর্ব্বপ্রধান কারণ। বাঙ্গালার কলগুলিতে বাক্সের জন্য গেঁয়ো কাঠ ও কাঠির জন্য পিটুলী কাঠ ব্যবহৃত হইয়াছিল। তাহার পর কাশ্মীর হইতে কাঠি আনাইবার চেষ্টাও হইয়াছিল। কিন্তু গেঁয়ো ও পিটুলী কাঠ এবং সিমুল কাঠ ব্যবহারোপযোগী করা যায় কি না, সে বিষয়ে বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরীক্ষা হয় নাই। কিন্তু

বাঙ্গালায় কোন কোন কারখানায় ব্যবহার্য্য যন্ত্রও এ দেশে প্রস্তুত করা হইয়াছে।

জার্ম্মাণ-যুদ্ধের পূর্ব্বে গড়ে বৎসরে ১৪৫৬০০০০ "গ্রোস" বাক্স দেশলাই বিদেশ হইতে এ দেশে আমদানী হইত। তাঁহার মূল্য ৮৮ লক্ষ ২১ হাজার টাকা ধরা যাইতে পারে। তাহার পর কিন্তু আমদানী দেশলাইয়ের মূল্য বৎসরে ১ কোটি ৭৬ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা পর্য্যন্ত হইয়াছিল। তাহার পর রক্ষাশুল্ক প্রতিষ্ঠার ফলে ১৯৩২-৩৩ খৃষ্টাব্দে আমদানী মালের মোট মূল্য ৫২ হাজার টাকা হইয়াছিল।

অর্থনীতিক কারণে রক্ষাশুল্ক চিরস্থায়ী করায় আপত্তি অসঙ্গত নহে। উহাতে সরকারের আয় হ্রাস হয় এবং ঐ জন্য স্বদেশে উৎপন্ন পণ্য যে অধিক মূল্যে বিক্রীত হয়, তাহা বিদেশী প্রতিযোগিতার অভাবে বাড়িতেও পারে। বর্দ্ধিত মূল্য পণ্যব্যবহারকারী দেশের লোককেই দিতে হয়। কিন্তু যে পণ্যের আবশ্যক উপকরণ দেশে পাওয়া যায় না, তাহা দেশে রাখিতে হইলে দেশের লোককে এই ক্ষতি স্বীকার করিতেই হয়। সেই ক্ষতি হইতে অব্যাহতিলাভ করিবার একমাত্র উপায়—দেশেই আবশ্যক উপকরণ লাভ অর্থাৎ তাহা উৎপন্ন করা। তাহাতে সাফল্যলাভ করিলে বিদেশী প্রতিযোগিতাও প্রহত করা যায়।

শিল্প-কমিশনের রিপোর্টে যে সকল শিল্প প্রাদেশিক শিল্প-বিভাগের সাহায্য পাইতে পারে, সে সকলের একটি তালিকা প্রদত্ত হইয়াছিল। সেই সকল শিল্পের মধ্যে দেশলাই শিল্প অন্যতম। উহাতে—শিল্পপ্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষজ্ঞ, কাষ্ঠ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ও সাধারণ বিশেষজ্ঞের সাহায্য প্রদানের কথা বলা হয়। ইম্পিরিয়াল ফরেষ্ট অফিসারই কাষ্ঠ সম্বন্ধে সাহায্য প্রদান করিবেন, বলা হয়।

ঐ রিপোর্টেই বলা হয়, সরকারের বনবিভাগ যে সব পুস্তিকা প্রচার করেন, সে সকলে অনেক সময় মূল্যবান তথ্যসমাবেশ থাকে। কিন্তু কয় বৎসর পূর্ব্বে দেশলাই শিল্পের জন্য ভারতীয় কাষ্ঠের উপযোগিতা সম্বন্ধে যে পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছিল, একাধিক সাক্ষী তাহার সম্বন্ধে অভিযোগ উপস্থাপিত করিয়া বলিয়াছেন—পরীক্ষামূলক অভিজ্ঞতার অভাবে অসমগ্র ও অসম্পূর্ণ অনুসন্ধানফলে যে মত প্রকাশ করা হয়, তাহার অনুসরণ অনেক স্থানে বিপজ্জনক হয়।

বাঙ্গালায় দেশলাই শিল্পের অসাফল্য বিবেচনা করিয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়া বাঙ্গালা সরকারের বনবিভাগ কি ভারত সরকারের বিশেষজ্ঞদিগের সহযোগে বাঙ্গালায় দেশলাই কাঠীর ও বাক্সের উপযোগী কাষ্ঠ সম্বন্ধে অনুসন্ধানে ও পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইতে পারেন না? এ দেশে ৬০।৭০ বৎসর পূর্ব্বেও গৃহস্থরা পাটকাঠির মুখে গন্ধক লিপ্ত করিয়া তাহা "দেশলাইয়ের" মত ব্যবহার করিতেন। তবে সে জন্য অঙ্গারের অগ্নিরক্ষার প্রয়োজন হইত; কখন বা চকমকি ঠুকিয়া শোলা জ্বালাইয়া তাহা হইতে ঐ কাঠী জ্বালান হইত। তাহার পরই বিলাত হইতে "ব্রায়েণ্ট এণ্ড মে'র" দেশলাই আমদানী আরম্ভ হয়। হেমচন্দ্র তাঁহার "দেশলাইয়ের স্তবে" "নমামি বিলাতি অগ্নি দেশলাইরূপী" বলিয়া যে স্তব আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন—

> "নমামি ফর্ফর শব্দ নাসিকা-পীড়ন,
> ধনীর নিকটে তুচ্ছ কাঙ্গালের ধন।
> সন্ধ্যার সোণার কাঠী, জ্যোছনার ছবি,
> ব্রহ্মার পঞ্চম মুখ, ব্রায়েণ্টের রবি।"

ব্রায়েণ্টের দেশলাই অধিক মূল্যে বিক্রীত হইত। তাহার পর সুইডেন হইতে অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যের দেশলাই আমদানী আরম্ভ হয় এবং তাহার পর জাপানী দেশলাই আরও অল্প মূল্যে বিক্রয় হইতে থাকে।

জাপানী দেশলাইয়ের মূল্যের স্বল্পতাই এ দেশে দেশলাই শিল্প প্রতিষ্ঠার অন্যতম অন্তরায় হইয়া উঠে। সেই জন্যই এ দেশে দেশলাই শিল্পের জন্য রক্ষা-শুল্কের ব্যবস্থা হইয়াছে এবং সেই ব্যবস্থা যে ফলোপধায়ী হইয়াছে, তাহা আমরা আমদানী হ্রাসের হিসাবে বুঝিতে পারিয়াছি। কিন্তু এখনও আমাদিগকে দেশলাইয়ের জন্য কতকাংশে বিদেশের আমদানীর উপর নির্ভর করিতে হইতেছে। এই অবস্থার প্রতীকারচেষ্টা করা প্রয়োজন এবং আমরা এই শিল্পে সম্পূর্ণরূপে স্বাবলম্বী হইতে পারি কি না, তাহার জন্য পরীক্ষা প্রয়োজন।

দেখা যাইতেছে, সমগ্র ভারতে যে দেশলাই উৎপন্ন হইতেছে, তাহার জন্য যে কাঠ প্রয়োজন, তাহারই অদ্ধাংশ দেশে পাওয়া যাইতেছে। যদি দেশের দেশলাইয়ের অবশিষ্ট প্রয়োজনও দেশেই উৎপন্ন পণ্যে মিটান হয়, তবে কাঠের প্রয়োজন আরও বর্দ্ধিত হইবে।

সমগ্র হিন্দুস্থানের হিসাবে কাষ্ঠ সম্বন্ধে প্রয়োজনের অর্দ্ধেক এখন এ দেশেই মিলিতেছে। বাঙ্গালার হিসাব দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, বাঙ্গালার অবস্থা আরও শোচনীয়। অথচ দেশলাইয়ের মত দীন-দরিদ্রেরও নিত্যব্যবহার্য্য এবং অপরিহার্য্য পণ্যে কেবল সমগ্র দেশই নহে, পরন্তু প্রত্যেক প্রদেশ স্বাবলম্বী হয়, ইহাই বাঞ্ছনীয়। তাহার সর্ব্বপ্রধান কারণ, অন্য প্রদেশ হইতে পণ্যের উপকরণ কাঠ বা কাঠী আনিতে রেলভাড়া যাহা পড়ে, তাহাতে পণ্যের মূল্য কিছু বর্দ্ধিত হয় এবং দরিদ্রের পক্ষে সেই "কিছু" উপেক্ষণীয় নহে। যাহারা দুই বেলা পূর্ণাহার পায় না এবং বৎসরের পর বৎসর সেই অবস্থায় কালাতিপাত করিতে বাধ্য হয়, তাহাদিগের বিষয় যে সরকারের সর্ব্বপ্রধান বিবেচ্য, তাহা লর্ড কার্জ্জন স্বীকার করিলেও তাহাই যে সর্ব্বক্ষেত্রে সরকারের অবলম্বিত নীতি হইয়াছে, এমন বলা যায় না। সরকার দেশলাইএর রেলভাড়াও হ্রাস করেন নাই।

বাঙ্গালায় হিমালয় হইতে সুন্দরবন পর্য্যন্ত নানা স্থানে নানারূপ বৃক্ষ জন্মে এবং নানারূপ বৃক্ষের চাষও হইতে পারে। সুতরাং বাঙ্গালায় দেশলাই কাঠীর ও বাক্সের উপযোগী কাষ্ঠ সম্বন্ধে পরীক্ষা করিলে সাফল্যলাভের সম্ভাবনা থাকিতে পারে।

চাউলের আমদানী শুল্ক

মাদ্রাজে মিষ্টার সন্তানম মায়াভরমে এক সম্মিলনে ভারতে আমদানী চাউলের উপর শুল্ক-প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ এ দেশের কথায় বলিয়াছেন:—

> "চির কল্যাণময়ী তুমি ধন্য,
> দেশ বিদেশে বিতরিছ অন্ন।"

সেই দেশে বিদেশ হইতে চাউল আনিয়া যে দেশের লোকের প্রয়োজন মিটাইতে হয়, তাহা প্রথম দৃষ্টিতে অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হইলেও সম্ভবই হইয়াছে। যে বাঙ্গালা হইতে নানা দেশে চাউল রপ্তানীর

কথা বার্ণিয়ার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, সেই বঙ্গদেশেও আর উৎপন্ন চাউলে প্রদেশবাসীর অন্ন-সংস্থান হয় না। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে মিষ্টার লতিফ তাঁহার ভারতের চাউল রপ্তানী ব্যবসা সম্বন্ধে যে পুস্তিকা রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি দেখান—১৯২০ খৃষ্টাব্দে ভারতে উৎপন্ন চাউলের মোট পরিমাণ—৩ কোটি ১৬ লক্ষ ৪০ হাজার টন আর দেশের লোকের জন্ম চাউলের প্রয়োজন—৩ কোটি ৩৫ লক্ষ ১০ হাজার টন। বাঙ্গালায় এখন ব্রহ্ম হইতে চাউল আমদানী হয়।

মিষ্টার সন্তানম এই শুল্ক-প্রতিষ্ঠার কারণ নির্দ্ধারণে নিম্নলিখিত কয়টি যুক্তিও উপস্থাপিত করিয়াছেন :—

(১) খাদ্য শস্য সুলভ থাকা জাতির পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। কাযেই আমরা আমাদিগের ব্যবহার্য্য চাউলের জন্য পরমুখাপেক্ষিতার পরিমাণ বর্দ্ধিত করিতে পারি না। তাহাতে ক্ষতি হইবে।

(২) ব্রহ্ম আর ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত নহে। বিশেষ ব্রহ্ম প্রভৃতি ধান্যোৎপাদক দেশ ভারতবর্ষের সম্বন্ধে যেরূপ ব্যবহার করিতেছে, তাহা বিবেচনা করিয়া আমাদিগকে আমাদিগের অর্থনীতিক সম্বন্ধ স্থির করিতে হইবে।

(৩) ভারতের এই কৃষিশিল্প পণ্যের উপযুক্ত অর্থাৎ লাভজনক মূল্যের উপর সাফল্যের জন্য নির্ভর করে; সুতরাং যাহাতে চাউলের মূল্য উৎপাদকদিগের পক্ষে লাভজনক হয়, সে ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন।

খাদ্য শস্যের উপর শুল্ক প্রতিষ্ঠিত হইলে লোকের অসুবিধা ঘটে বটে, কিন্তু এখনও আমদানী চাউলের পরিমাণ এত অল্প যে, আমদানী শুল্ক প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহাতে লোকের বিশেষ অসুবিধা ঘটিবে না—প্রস্তাবক এই যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন।

মিষ্টার সন্তানম যে সব যুক্তি উপস্থাপিত করিয়াছেন, সে সকল যে অবজ্ঞা করা যায়, এমন নহে। কিন্তু তিনি মূল্য হ্রাসের যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহার সহিত আমরা একমত হইতে পারি না। একান্ত প্রয়োজনীয় কৃষিজ-পণ্যের মূল্যও নানা কারণে বৃদ্ধি পায় এবং লোকের পণ্য-ক্রয়ের ক্ষমতা অর্থাৎ আর্থিক অবস্থা সে সকলের অন্যতম। লোকের আর্থিক অবস্থা বিবেচনা না করিয়া কৃত্রিম উপায়ে কৃষিজ পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির চেষ্টা করায় সকল ক্ষেত্রে সুফল ফলে না। বিশেষ খাদ্য-শস্যের মূল্যবৃদ্ধির পূর্ব্বে নানা বিষয় বিবেচনা করিয়া তবে কায করা কর্ত্তব্য।

অন্যান্য দেশের স্বদেশী সরকার ধান্যের চাষের উন্নতি-সাধন জন্য যে চেষ্টা করিয়াছেন, এ দেশের সরকারসমূহ যদি সেই চেষ্টা করেন, তবে যে ফসল বৃদ্ধি করা যায় এবং তাহা হইলে বিদেশ হইতে চাউল আমদানী করিবার আর প্রয়োজন হয় না, এবং সেই অবস্থায় আমদানী চাউলের উপর শুল্ক প্রতিষ্ঠা করিলেও চাউলের মূল্য বৃদ্ধি হয় না—তাহা অনায়াসে অনুমান করা যায়।

আমরা বাঙ্গালার বিষয় বিবেচনা করিলে দেখিতে পাই, বাঙ্গালায় এখনও কৃষিকার্য্যের উপযোগী অনেক জমি "পতিত" আছে বা থাকে। বাঙ্গালায় যে ৩ কোটি ৩৪ লক্ষ ৭৭ হাজার ৫ শত ২২ একর জমি আবাদের উপযুক্ত, তাহার শতকরা ৭২ ভাগে চাষ হয় এবং অবশিষ্ট জমি "পতিত" থাকে। এই "পতিত" জমির পরিমাণ নানা জিলায় নানারূপ। বাখরগঞ্জ, ফরিদপুর, ঢাকা, ত্রিপুরা, পাবনা, নোয়াখালী ও রংপুর জিলাগুলিতে "পতিত" জমি না-ই বলিলেই হয়। মধ্য ও পশ্চিম-বঙ্গে এবং উত্তর-বঙ্গের কোন কোন জিলায়ও আবাদযোগ্য অনেক জমি পতিত থাকে। হাওড়া, মালদহ, ২৪ পরগণা, বাঁকুড়া, নদীয়া, জলপাইগুড়ী, যশোহর, মেদিনীপুর, খুলনা, দার্জ্জিলিং এবং রাজসাহী, বগুড়া, চট্টগ্রাম ও মুর্শিদাবাদে অনেক জমি "পতিত" থাকে।

বলা বাহুল্য, ভিন্ন ভিন্ন কারণে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে জমি "পতিত" থাকে। কোন কোন স্থানে জমির উর্ব্বরতা অল্প হওয়ায় জমি মধ্যে মধ্যে "পতিত" রাখিতে হয়। সে সব জমিতে সার দিয়া ও ফসলের পরিবর্ত্তন করিয়া অবস্থার পরিবর্ত্তন করা যায়। ইটালীতে যেভাবে ধান্যের চাষের উন্নতি সাধিত হইয়াছে, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং সেই প্রথার স্থানোপযোগী অনুসরণে যে এ দেশে ধান্যের ফলন বর্দ্ধিত করা যায়, তাহা ইটালীর দৃষ্টান্ত দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। এমন কি, স্পেনও যে তাহার যুদ্ধবিব্রততার পূর্ব্বে এ দেশে চাউল রপ্তানী করিয়াছিল, তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়, সন্দেহ নাই।

সর্ব্বত্র একই উপায়ে আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ বর্দ্ধিত করা যায় না বটে, কিন্তু বাঙ্গালায় যে একটি কারণই জমির উর্ব্বরতাহানির প্রধান কারণ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। জলের অভাবে—নদী, নালা, পুষ্করিণী, বাঁধ নষ্ট হইয়া যাওয়ায়—চাষের জমির পরিমাণ হ্রাস হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ম্যালেরিয়ার প্রকোপবৃদ্ধিতে গ্রামের পর গ্রাম উজাড় হইয়া গিয়াছে ও যাইতেছে। চাষের সঙ্গে সঙ্গে যে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ-হ্রাস হয় এবং সেচের অভাবে জমির উর্ব্বরতাহানি হয়, তাহা ডাক্তার বেণ্টলী বাঙ্গালার ব্যাপারে বুঝাইয়া গিয়াছেন। যাঁহারা সরকারের জরিপ-রিপোর্টে নদীয়া ও যশোহর জিলা দুইটির সংযোগসীমায় অবস্থিত গ্রামগুলির বিবরণ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, এই সকল এককালে জনবহুল গ্রাম এখন জনবিরল এবং লোকাভাবে সেই অঞ্চলে জমি "পতিত" থাকে।

বাঙ্গালায় যে পরিমাণ জমি এখন "পতিত" হইয়াছে, তাহাতে সেই জমিতে চাষ করিতে পারিলে যে বাঙ্গালার আবশ্যক চাউল বাঙ্গালায়ই উৎপন্ন করিয়া কিছু রপ্তানী করাও যায়, তাহাতে সন্দেহের কারণ থাকিতে পারে না। কিন্তু কার্য্যতঃ কিছুই হইতেছে না। সে জন্য সরকারের দায়িত্ব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সমগ্র হিন্দুস্থানে বাঙ্গালায় সেচ-ব্যবস্থা যত উপেক্ষিত হইয়াছে, তত আর কোন প্রদেশে হয় নাই। এখনও সেই অবস্থার পরিবর্ত্তন করা হইতেছে না। সার উইলিয়ম উইলকক্স সেচ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ছিলেন—মিশর তাঁহার কার্য্যফলে স্বর্ণপ্রসূ হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তুর্কী ইরাকের মরুভূমিতে সেচের ব্যবস্থার জন্য তাঁহার উপদেশই গ্রহণ করিয়াছিল; কিন্তু অর্থাভাবে সেই উপদেশ অনুসারে কায করিতে পারে নাই। তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আসিয়া অনুসন্ধান করিয়া বাঙ্গালায় সেচ-ব্যবস্থার যে পরিকল্পনা প্রদান করিয়াছিলেন, বাঙ্গালায় সরকার তাহার আলোচনা পর্য্যন্ত করেন নাই। বাস্তবিক বাঙ্গালায় যে বহু জমি "পতিত" থাকে, সেচের ও সার-প্রয়োগের ব্যবস্থা হইলে সে সকল আর পতিত থাকিবে না; পরন্তু সে সকলের কতক ভাগে বিজ্ঞানসম্মত বহুলোৎপাদিকা কৃষিপদ্ধতিও অবলম্বিত হইতে পারে।

সে সব জমিতে যে "আবাদ করলে ফলত সোনা"—তাহা যে সময় সে সব জমিতে আবাদ হইত, তখন বুঝা গিয়াছে। বাঙ্গালা যখন বিদেশে এবং ভারতের অন্যান্য অংশে চাউল রপ্তানী করিত, তখন বাঙ্গালা সুজলাই ছিল। যে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা এখন সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয়, সেই পশ্চিমবঙ্গের বর্ণনায় বার্ণিয়ার বলিয়াছিলেন, রাজমহল হইতে সাগর পর্য্যন্ত বহু খালে লোকের ব্যবহার্য্য জল সরবরাহ হয় এবং সেই জলপথে পণ্যের আমদানী-রপ্তানী হইয়া থাকে। সার উইলিয়ম্ উইলকক্স এমন মতও প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, বাঙ্গালার বহু নদী বাঙ্গালার অধিবাসীদিগের খনিত খাল।

নদী ব্যতীত বাঙ্গালায় পুষ্করিণীতে ও বাঁধে জল সঞ্চয় করিয়া সেচের যে ব্যবস্থা ছিল তাহা বাঁকুড়া জিলার বিষ্ণুপুরে যেমন দেখা যায়, তেমন আর কোথাও নহে। ইতিহাসে দেখা যায়, অতীতকালে বাঙ্গালার বর্দ্ধমান অঞ্চল হইতে অভিজ্ঞ শ্রমিক লইয়া যাইয়া মাদ্রাজে সেচের খাল খনন করান হইয়াছিল। বাঙ্গালায় তখন লোকের সেচ বিষয়ে নৈপুণ্যখ্যাতি ভারতে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়াছিল।

সেই বাঙ্গালা আজ সেচের ব্যবস্থার অভাবে বাঙ্গালীর অন্নের অভাব ঘুচাইতে পারিতেছে না! এই অবস্থার পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন প্রবল হইলেও পরিবর্ত্তনের চেষ্টা যে বাঙ্গালার সচিবদিগের দ্বারা হইতেছে না, তাহা যে সচিবদিগের প্রশংসার কথা নহে—নিন্দার বিষয় কি না, তাহা দুর্দ্দশাগ্রস্ত বাঙ্গালার অধিবাসীরাই বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

হাতেগড়া কাগজ

এ দেশে কাগজের ব্যবহার নূতন নহে। তালপত্রে ও ভূর্জ্জপত্রে লিখিবার পদ্ধতির পরেই কাগজ প্রস্তুত আরম্ভ হয়। ডাক্তার কেরী প্রথম শ্রীরামপুরে কাগজের কল প্রতিষ্ঠিত করেন। বলা বাহুল্য, তখন কাগজের কল বর্ত্তমান সময়ের মত উন্নতি লাভ করে নাই এবং তখনও কাগজের জন্য কাঠের মণ্ডের ব্যবহার আরম্ভ হয় নাই। ১৮২০ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে কেরী কাগজের উপাদান মিশাইবার জন্য বাষ্পচালিত এঞ্জিন ব্যবহার আরম্ভ করেন। ঐ কল প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে তিনি যে এ দেশের "কাগজী" সম্প্রদায়ের লোক লইয়াই কাগজ প্রস্তুত করিতেন, তাহা ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার গভর্ণমেণ্টকে লিখিত পত্রে দেখা যায়—

"When we commenced paper making several years ago, having then no machinery we employed a number of native papermakers to make it in the way to which they had been accustomed. We now make our paper by machinery."

এই কাগজ প্রস্তুতকারীদিগকে "কাগজী" বলা হইত। হুগলী, হাওড়া ও মুর্শিদাবাদ জিলায় অনেক "কাগজী" বাস ও ব্যবসা পরিচালন করিত। তাহারা যে সব যন্ত্র ব্যবহার করিত; সে সকল ব্যবহার করিয়া বর্ত্তমান কালের কলের সহিত প্রতিযোগিতা করা সম্ভব নহে। এই সকল কাগজীর অধিকাংশই মুসলমান ছিল। কিন্তু এ দেশে কাগজের ব্যবহার যে মুসলমানদিগের আগমনের পূর্ব্ববর্ত্তী তাহা সেকালের তুলট কাগজের পুঁথীতে বুঝিতে পারা যায়। তখন তুলা কাগজের উপকরণরূপে ব্যবহৃত হইত বলিয়াই উহার নাম "তুলট" হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। তাহার পূর্ব্বে বৃক্ষের বল্কলে লিখন হইত এবং ভূর্জ্জপত্র ও শাচিপাত বৃক্ষের বল্কল ঐ কার্য্যে ব্যবহৃত হইত। তালপত্রের ব্যবহার বহু দিন প্রচলিত ছিল।

এখনও চীনে ও জাপানে বৃক্ষের বল্কল হইতে কাগজ প্রস্তুত হয়। যে বৃক্ষের বল্কল এই কার্য্যে ব্যবহৃত হয়, তাহা এক প্রকার তুঁত গাছ। ব্রহ্মের সান অঞ্চলেও ইহা জন্মে।

এখনও ভারতবর্ষের কোন কোন স্থানে এবং বাঙ্গালার কোন কোন জিলায় হাতেগড়া কাগজ প্রস্তুত হয়। সেগুলি হরিতাল দিয়া হরিদ্রাবর্ণ করা হয় এবং সেই জন্য উহা কীটদষ্ট হয় না।

বাঙ্গালায় স্বদেশী আন্দোলনের সময় বিবাহাদির পত্রের জন্য এই কাগজ ব্যবহার পদ্ধতি হইয়া উঠে এবং তাহার ফলে মৃতপ্রায় শিল্পে সামান্য জীবনলক্ষণ দেখা যায়। এখনও কেহ কেহ উহার অনুকরণে প্রস্তুত হরিদ্রাবর্ণ কাগজ ঐরূপ পত্রের জন্য ব্যবহার করিয়া থাকেন।

আমেরিকায় ও য়ুরোপেও হাতেগড়া কাগজ ব্যবহৃত হয় এবং বিলাতে ইহা প্রয়োজনীয় দলিলাদির জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু এ দেশের কাগজ বিদেশে রপ্তানী করিবার সম্ভাবনা আছে কি না, তাহা এখনও পরীক্ষিত হয় নাই। সে পরীক্ষা করিতে হইলে প্রথমে এ দেশে হাতে কাগজ প্রস্তুত করিবার জন্য যে সকল যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, সে সকলের উন্নতিসাধন করিতে হইবে।

কিন্তু যে দ্রব্যের বিক্রয় কেবল খেয়ালের উপর নির্ভর করে তাহার উৎপাদনে অতিরিক্ত মনোযোগ দানের সার্থকতা আছে কি না, তাহা বিবেচ্য। বিক্রয় সম্বন্ধে নিশ্চিত হইতে না পারিলে সে বিষয়ে সচেষ্ট হইবার কোন প্রয়োজন দেখা যায় না।

সম্প্রতি ভারতীয় মিউজিয়মে এই কাগজের ২ প্রকার নমুনা প্রদর্শিত হইয়াছে। ভারতবর্ষ, নেপাল ও ব্রহ্ম হইতে এই সব নমুনা সংগৃহীত হইয়াছে। নেপালেই নানাবিধ কাগজ প্রস্তুত হয়। এই সঙ্গে যদি ইংলণ্ড ও আমেরিকায় ব্যবহৃত হাতেগড়া কাগজের নমুনাও দেখান হইত, তবে এই শিল্পের উন্নতিতে কোন লাভ আছে কি না, তাহা বিচার করিবার সুবিধা হইত।

সুভাষিণী নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "তা করেছে, কিন্তু তাতে অন্নবস্ত্রের দুঃখ ঘুচবার সম্ভাবনা দেখ্‌ছি না।"

নিরুপমা বলিলেন, "দেশের অবস্থা তাই হয়েছে। উনি মগের মুলুকে কংগ্রেসের এক জন হোম্‌রা-চোমরা লোক ছিলেন। আমি কতবার বলেছি, তোমরা ছাই করবে। কংগ্রেস দেশের কোন্ দুঃখ দূর করতে পেরেছে? কিছু না ভাই! সব বাজে। আমি বলেছি, এই যে, ছেলেরা বিয়ে করতে চায় না, বলে নিজের পায়ে না দাঁড়াতে পারলে বিয়ে করবে না; কিন্তু তাতে বাঙ্গালী হিন্দু জাতটা মরে যাবে না? ক্রমেই ত কমে যাচ্ছে। ৫০ বছর পরে বাঙ্গালী আর দেখ্‌তে পাওয়া যাবে? আমাদের দেশের লোক কোথায় যে চলেছে, কে জানে!"

সুভাষিণীর বুক ঠেলিয়া আর একটা দীর্ঘশ্বাস বাহির হইল। তিনি বলিলেন, "তোর ছেলে বিনয় এখন কি করছে, ভাই।"

"সে ত এলাহাবাদ থেকে এম্, এস্-সি পাশ করেছে। চাকরী সে করবে না, উনিও করতে দেবেন না। রেঙ্গুনে একটা ব্যবসা ফেঁদে বসেছিল। কেরোসিন তেলের একটা এজেন্সি অনেক কষ্টে উনি জোগাড় করে দিয়েছেন, আর কাঠ চালানীর কণ্ট্রাক্টও পেয়েছে। তবে ও-দেশে আর থাকা চল্‌বে না ব'লে কলকাতায় ব্যবসা তুলে এনেছে। মন্দ হবে না বলেই ত মনে হয়। সেখানেই বছরে বিশ হাজার টাকা লাভ হচ্ছিল। থাক্, সে পরের কথা। বালীগঞ্জে একটা বাড়ীও তৈরী হয়েছে।"

সুভাষিণী বলিলেন, "তা গৃহ-প্রবেশের সময় আমাদের ত একটা খবরও দিতে হয়।"

নিরুপমা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "গৃহ-প্রবেশ এখনো হয় নি, ভাই। একটি গৃহলক্ষ্মী ঠিক করে তবে নতুন বাড়ীতে যাব, এই আমার মনের কথা। এখন মা লক্ষ্মী মুখ তুলে চাইলেই হয়।"

সুভাষিণী সখীর দিকে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে চাহিলেন। বিভাও তাহার নবাগতা মাসীমার মুখে কৌতূহলভরে চাহিয়া-দেখিল।

নিরুপমা বলিলেন, "তোরা ত বাঁড়ুজ্জে, আমরা মুখুজ্জে। কুল, শীল, মিল ঠিকই আছে। বিভাকে আমার বিনয়ের হাতে তুলে দিবি?"

সুভাষিণী বিস্ময়ে চমকিয়া উঠিলেন। লক্ষপতির গৃহিণীর পদে বিভার স্থান হইবে?

নিরুপমা বলিলেন, "আজ সকালেই আমাদের কথাবার্ত্তা হয়ে গেছে। তোদের যদি অমত না থাকে, বিভা মা আমার ঘর উজ্জ্বল করে থাক্‌বে।"

বিভার আরক্ত মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া নিরুপমা গাঢ়-স্বরে বলিলেন, "আমার ছেলে মেয়েদের মান-ইজ্জত কি ক'রে রাখ্‌তে হয়, তা ভাল করেই জানে। তোমার কোন অমর্য্যাদা হবে না, মা।"

সুভাষিণী অশ্রুপূর্ণনেত্রে সখীকে দুই বাহুর দ্বারা বেষ্টন করিয়া বলিলেন, "ওর কি এমন ভাগ্য হবে!"

"মা!" বলিয়া নরেন্দ্রপ্রসাদ সেখানে আসিল।

"প্রণাম কর, নরু। তোর সইমা।"

নতশীর্ষ নরেন্দ্রের মাথায় হাত রাখিয়া নিরুপমা বলিলেন, "তোমায় সাত বছরের দেখেছিলাম। মার কোল-জোড়া হয়ে শুধু নয়, দেশের ভাল ছেলে হয়ে বেঁচে থাক। কাল একবার আমাদের ওখানে যেও। তোমার এক ভাই তোমার সঙ্গে আলাপ করবার জন্য ভারী ব্যস্ত হয়ে আছে।"

নিরুপমা হাতের একটি পুঁটুলি হইতে কি খুলিতে লাগিলেন। একটা হস্তিদন্ত-নির্ম্মিত কৌটা আবিষ্কৃত হইল।

নিরুপমা সখীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আজকে খুব ভাল দিনই আছে। আমি তৈরী হয়েই এসেছি। একেবারে পাকা আশীর্ব্বাদ করেই যাব।"

একগাছি সুদীর্ঘ ও সুন্দর মুক্তার মালা তিনি কম্পিত-দেহা বিভার গলদেশে পরাইয়া দিলেন।

"শাঁখটা একবার বাজিয়ে দে, ভাই।"

বিভা নত হইয়া নিরুপমার পদধূলি গ্রহণ করিল।

সুভাষিণী বলিলেন, "ছেলের মত না নিয়ে, তাকে মেয়ে না দেখিয়ে একেবারে আশীর্ব্বাদ করে ফেল্‌লে, ভাই।"

হাস্যমুখে নিরুপমা বলিলেন, "তার মোটেই দরকার হবে না। আমার ছেলে খুব ভাল করেই জানে, তার মা তার জন্য যাকে ঘরে নিয়ে যাবে, সে কখনই মন্দ হতে পারে না। এখন খুব জোরে শাঁখটা বাজা, ভাই। নিয়ে আয় আমিই বাজাচ্ছি।"

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।
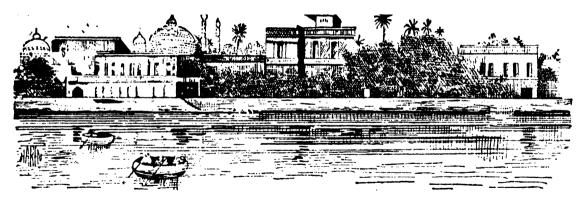
জুগোশ্লাভিয়া

জুগোশ্লাভিয়ার যিনি বর্ত্তমান রাজা, তাঁহার বয়স পনের বৎসর মাত্র। আগামী ১৯৪১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্যের যাবতীয় কার্য্য তিন জন রিজেণ্টের দ্বারা নির্ব্বাহিত হইবে, এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে।

এই কিশোর রাজার দেহ ব্যায়ামপুষ্ট এবং সুগঠিত। জুগোশ্লাভিয়ার রাজবংশের প্রথম প্রতিষ্ঠাতাকে লোক "ব্লাক জর্জ্জ" বলিয়া অভিহিত করিত। বর্ত্তমান রাজা দেখিতে তাঁহার অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহের ন্যায়। অশ্বারোহণে তিনি যেমন দড়, সন্তরণেও ঠিক তেমনই তাঁহার পারদর্শিতা আছে। বন্দুক-চালনাতেও তিনি অব্যর্থ-লক্ষ্য বলিয়া সুপরিচিত। তিনি ব্যবহার্য্য রেডিও-যন্ত্র নিজের হাতে তৈয়ারও করিয়াছেন। এই কিশোর-নরপতি উদ্যান-রচনাতেও পরম আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান কিশোর রাজা দ্বিতীয় পিটার নাম গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি "সোকল" বা শ্লাভ ব্যায়াম-প্রতিষ্ঠানের ব্যবহৃত পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া জনসাধারণের সম্মুখে দেখা দিয়া থাকেন। রাজসভায় উপস্থিত হইবার সময় তিনি যে পরিচ্ছদ ধারণ করেন, সেই অবস্থার প্রতিকৃতি প্রত্যেক সরকারী প্রতিষ্ঠানে, তাঁহার নিহত পিতা রাজা প্রথম আলেকজান্দারের চিত্রের পার্শ্বে দোদুল্যমান।

রাজা দ্বিতীয় পিটার রাজার অশ্বারোহী রক্ষিসেনাদলের সামরিক কর্ম্মচারিবৃন্দকে প্রীতিসম্ভাষণ জ্ঞাপন করিতেছেন

বর্ত্তমান যুবরাজ টমিশ্লাভের বয়স একাদশ বৎসর। ছয় বৎসর বয়স হইতে এই বালক অগ্নিনির্ব্বাপক বিভাগের প্রেসিডেণ্টের পদ অলঙ্কৃত করিয়া আসিতেছেন। এইরূপ সম্মান লাভ কোন্ বালকের অদৃষ্টে সাধারণতঃ ঘটিয়া থাকে?

গ্রীষ্মকালে ব্লেড সহরই রাজধানীর সম্মান লাভ করিয়া থাকে। রাজ্যের অন্যতম পরিচালক প্রিন্স পল "ব্রডো কাস্‌ল" নামক স্থানে গ্রীষ্ম যাপন করিয়া থাকেন। মন্ত্রিগণ এবং

অন্যান্য কূটনীতিকরা বেলগ্রেড ত্যাগ করিয়া গ্রীষ্মকালে ব্লেড সহরেই সমবেত হন।

বালক রাজা যে ভূখণ্ডের অধীশ্বর, পূর্ব্বে তাহা "সার্ব্ব, ক্রোট্শ এবং শ্লোভেন্স্‌দের রাজধানী" নামে অভিহিত হইত। এই রাজ্যে প্রধানতঃ দক্ষিণ-শ্লাভ জাতীয় লোকেরই বাস। তাহাদিগের সংখ্যা ১ কোটি ৫৬ লক্ষ ৩০ হাজার। অবশিষ্ট জনসাধারণের মধ্যে জার্ম্মাণ, মাগিয়ার্স, আল্‌বেনিয়ান্ এবং অন্যান্য জাতির লোক বিদ্যমান।

জুগোশ্লাভিয়ার বিভিন্ন ধর্ম্মমত প্রচলিত। গোঁড়া সার্ব্বদের সংখ্যা লোকসংখ্যার অনুপাতে শতকরা ৪৯। রোমান-ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের সংখ্যা শতকরা ৩৭, মুসলমান ১১ জন। ইহা ব্যতীত জনসংখ্যার বাকি অংশ অন্যান্য ৬ প্রকার বিভিন্নধর্ম্মাবলম্বী।

ভৌগোলিক হিসাবে জুগোশ্লাভিয়ার আয়তন ৯৬ হাজার বর্গ মাইল—গ্রেটবৃটেন অপেক্ষা সামান্য বড়। সাতটি বিভিন্ন দেশের সহিত ইহার সীমান্ত প্রদেশের সম্বন্ধ বিদ্যমান। জুগোশ্লাভিয়ার তীরভূমি এড্রিয়াটিক সাগরের প্রায় হাজার মাইল স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

এই রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন নাম পূর্ব্বে ছিল। শ্লোভেনিয়া, ক্রোশিয়া, সার্ব্বিয়া, ভয়ভোডিনা, বস্‌নিয়া, হার্শেগোভিনা, ডালমাশিয়া, মন্টিনিগ্রো এবং ম্যাসিডোনিয়া। এখন আর তাহাদিগের অস্তিত্ব নাই। এখন সমগ্র রাজ্যটি নয়টি প্রদেশে বিভক্ত। ইদানীং রাজ্যের আটটি নদীর নামে প্রদেশগুলির নামকরণ হইয়াছে, যথা—দ্রাভা, ড্রিনা, ডুনাভ (ড্যানিয়ুব,) মোরাভা, সাভা, ভার্ডার, জাবাস্, জেটা এবং প্রিমোর্জ্জি। এতদ্ব্যতীত আমেরিকার কলম্বিয়ার ন্যায় বেলগ্রেড প্রদেশ।

প্রতি বৎসর ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে কিশোর রাজার জন্ম-দিন উপলক্ষে জুগোশ্লোভিয়ার সর্ব্বত্র উৎসবের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। ব্লেড দ্বীপে সেই সময় পল্লী অঞ্চল হইতে কৃষককুল এবং গ্রামবাসীরা বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া ধর্ম্মমন্দিরে উপাসনা করিতে আইসে।

ধর্ম্মমন্দির-প্রত্যাগতা ক্রোশীয় নারীগণের গতিভঙ্গী

এখন যেখানে ব্লেড হ্রদ অবস্থিত, কিংবদন্তী অনুসারে তথায় তৃণশ্যামল ক্ষেত্র বিদ্যমান ছিল। দ্বীপটিকে একটি পাহাড় বলা যাইতে পারে। এই পাহাড়ের উপর একটি ধর্ম্ম-মন্দির অবস্থিত। এখানে মেষপাল নির্ভয়ে চরিয়া বেড়াইত।

শ্লোভান কিংবদন্তী অনুসারে শুনা যায়, মেষপালকে ধর্ম্মমন্দিরের ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে দেখিয়া শূন্য হইতে এক দৈববাণী হইল, ধর্ম্ম-মন্দিরের চারিদিকে প্রাচীর তুলিয়া দেওয়া হউক। কিন্তু কেহই সে কথায় কর্ণপাত করিল না।

একদা প্রভাতে সকলে জাগ্রত হইয়া দেখিল, যেখানে বিস্তীর্ণ তৃণশ্যামল ক্ষেত্র ছিল, তথায় এক হ্রদের আবির্ভাব হইয়াছে। শুধু পাহাড় ও তাহার শীর্ষদেশে অবস্থিত মন্দিরটি হ্রদমধ্যে জাগিয়া রহিয়াছে। অতঃপর

পাহাড়ের উপর প্রাচীর-বেষ্টিত রাগুসা সহর

জাগ্রেবের বাজারে ক্রোশীয় কৃষকের বিক্রেয় বিবিধ প্রকার ফল দুগ্ধ প্রভৃতি

দক্ষিণ-সার্ব্বিয়ার টেটোভো বাজারে আনীত বাঁধা কপি

জাগ্রেবের বাজারে হাতের তৈয়ারী সূচিশিল্পজাত দ্রব্যাদি

প্রান্তরচারী পশুর দল হ্রদের ব্যবধান উল্লঙ্ঘন করিয়া ধর্ম্ম-মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারে নাই।

জুগোশ্লাভিয়ার অনেক স্থানের নামে সঙ্গীতের মাধুর্য্য আছে। পুরাতন লাইবাচ নামক স্থানের নাম এখন লুবল্‌জানা। এই নাম উচ্চারণ কালে সঙ্গীতের ন্যায়ই মধুর বোধ হয়।

সাল্‌জবার্গে একটি দুর্গ আছে। এই দুর্গটি পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া

অতীত কীর্ত্তিপূর্ণ এক বিস্তৃত উপত্যকা-ভূমিতে লুবল্‌জানারা নীড় বাঁধিয়া বাস করে। প্রাগৈতিহাসিক যুগে এখানে একটি বৃহৎ হ্রদ বিদ্যমান ছিল বলিয়া কথিত আছে। কনষ্টান্স ও জেনেভা হ্রদ-তীরবর্ত্তী বাসভবন সমূহের ন্যায় এখানে বহু বাসভবন ছিল। লুবল্‌জানা যাদুঘরে সেই সকল ভবনের ভগ্নাবশেষ সংগৃহীত আছে।

এখানে একটি উৎস আছে। উহার জল যেমন সুপেয় তেমনই রোগনাশক বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই উৎসটি ইতিহাস-

সেরাজেভোর মুসলমানপ্রধান অঞ্চল

রহিয়াছে। দরিদ্রগণ এই দুর্গে বাস করিয়া থাকে। এই সহরের মাঝখানে এক দ্বাদশতল অট্টালিকা আছে। উপর তলায় একটি পানালয়। সহরের মধ্যে অনেকগুলি কেতাবের দোকান দেখিতে পাওয়া যাইবে। রেস্তোঁরা-গুলিতে লুবল্‌জানার অধিবাসীরা প্রাতরাশ ব্যতীত, সকল সময়েই আহার্য্য গ্রহণ করিয়া থাকে।

বৎসরে এখানে একবার মেলা বসে। জুগোশ্লাভ-ফটোগ্রাফারগণ বহু পরিমাণ আলোক-চিত্র প্রদর্শনীতে প্রদান করিয়া থাকে।

প্রসিদ্ধ। এক সময়ে রোমানগণ এই উৎসের জল সাগ্রহে সংগ্রহ করিত।

লুবল্‌জানা হইতে জেজেল্‌জ-সহর এক শত মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে প্রতি বৎসর একটি করিয়া মেলা হয়। অসংখ্য লোক মেলা দেখিতে আইসে। একটা প্রাচীন গির্জ্জার চারিদিকে শিবির সন্নিবিষ্ট হয়। বহু দোকানী পশারী ছোট ছোট অস্থায়ী ঘর তুলিয়া নানাবিধ দ্রব্যের বিকিকিনি করিয়া থাকে।

গ্রাম্য-সুন্দরীদিগের ভিড়ও অল্প নহে। তাহারা কৃষ্ণবর্ণ

ট্রাউজারের পকেট হইতে মুদ্রা বাহির করিয়া নানাবিধ দ্রব্য ক্রয় করিতেছে, এ দৃশ্য উপভোগ্য। গ্রাম্যনারীরা রুমালে দ্রব্যাদি বাঁধিয়া লইয়া যায়।

বহুবিধ রসাল ফল এ দেশে দেখিতে পাওয়া যাইবে। স্থানীয় কুলজাতীয় ফলগুলির যেমন সুগন্ধ, তেমনই মিষ্ট রস। এই কুল বিদেশে রপ্তানী হয় না। কর্ম্মঠ শ্লোভেনেস্‌গণ কুলের রস হইতে এক প্রকার সুপেয় পানীয় প্রস্তুত করিয়া থাকে। নারীরাও এই কার্য্যে বিশেষভাবে পুরুষ-

জাগ্রেবের প্রধান স্কোয়ারে জেলাসিকের ব্রোঞ্জমূর্ত্তি বিদ্যমান। উনবিংশ শতাব্দীর এই ক্রোটবীরের হাতের তরবারি ঊর্দ্ধে উত্থিত। উক্ত স্কোয়ারের চারিদিকে আধুনিক সরকারী অট্টালিকাসমূহ রচিত হইয়াছে। মধ্যস্থলে কৃষকদিগের বাজার। শীতকাল ব্যতীত অন্য ঋতুতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ছাতার নীচে নানাবিধ চিত্তাকর্ষক দ্রব্য বিক্রয়ার্থ সংরক্ষিত। ব্লাউজ, রুমাল, টেবলক্লথ, নানাবিধ পরিচ্ছদ দেখিতে পাওয়া যাইবে। সবই কৃষকনারীদিগের স্বহস্ত-

দক্ষিণ জুগোশ্লাভিয়ায় শুষ্ক তাম্রকূটপাতার সংগ্রহ

দিগের সহায়তা করে। শ্লোভেনী নারীরা লেস্‌ বয়ন কার্য্যে বিশেষ পারদর্শিনী। জুগোশ্লাভিয়ায় ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করিবার ব্যাপক ব্যবস্থা আছে। প্রত্যেক বড় সহরে ত বটেই, অনেক ছোট গ্রামেও ইংরেজী শিক্ষার প্রসারকল্পে অনেক প্রতিষ্ঠান আছে।

বহু জুগোশ্লাভ আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া এবং অন্যান্য বৃটিশ উপনিবেশে গিয়া বসবাস করিতেছে। কিন্তু প্রাচীন বয়স্ক কৃষক অথবা কৃষিক্ষেত্রের অধিকারীরা ইংরেজী-ভাষা-ভাষী দেশকে আমেরিকা বলিয়া মনে করিয়া থাকে।

প্রস্তুত। ক্রোশিয়ার পুরুষ ও নারীরা সকলেই ঐতিহাসিক পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া থাকে।

জাগ্রেবারগণ খেলার বিশেষ ভক্ত। ছাত্র-ছাত্রী, শিল্পী, ধাত্রী সকলেই ক্রীড়াপ্রাঙ্গণে খেলা করিয়া থাকে। সপ্তাহে একদিন বনভোজন তাহাদিগকে করিতেই হইবে।

জুগোশ্লাভিয়ার ম্যাজিসিয়ান বা ঐন্দ্রজালিক পৃথিবীর ঐন্দ্রজালিকগণের মধ্যে প্রথম আসন লাভ করিয়াছে। মিউনিকে যে প্রতিযোগিতা হইয়াছিল, তাহাতে ১৬টি বিভিন্ন দেশের শ্রেষ্ঠ ঐন্দ্রজালিকগণ যোগ দিয়াছিল।

জুগোশ্লাভিয়ার ঐন্দ্রজালিক তাহাতে জয়মাল্য লাভ করে।

ক্রোট-সঙ্গীতজ্ঞগণ গ্রেট-বৃটেনে গিয়া সমালোচকদিগের নিকট প্রচুর প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। জুগোশ্লাভিয়ায় ৮ শত ৫৬টি স্বতন্ত্র সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান আছে।

জুগোশ্লাভিয়ায় বেলগ্রেড্, জাগ্রেব এবং লুবলজানায় তিনটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় আছে। তাহা ছাড়া স্কোপল্জিতে যে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান আছে, তাহার উত্তীর্ণ ছাত্রগণকে "ফ্যাকলটি অব্ লেটার্স" উপাধি দেওয়া হয়। সুবোটিকায় একটি আইন কলেজ বিদ্যমান, তাহার উত্তীর্ণ ছাত্রগণকে আইন-বিশারদ উপাধি প্রদত্ত হইয়া থাকে। জাগ্রেব বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত প্রাচীন ঐতিহ্যের স্মৃতি বিজড়িত। এই বিশ্ববিদ্যালয়-সংলগ্ন যে পুস্তকালয় আছে, তাহাতে ৩ লক্ষ ৮০ হাজার গ্রন্থ সংরক্ষিত আছে। বেলগ্রেড বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। এই বিদ্যালয়ের একটি বিভাগ ভৌগোলিক প্রতিষ্ঠান নামে সুপরিচিত।

সমুজ্জ্বল বেশভূষায় নববিবাহিত দম্পতি

জুগোশ্লাভিয়ার সুন্দরী সূক্ষ্ম চিকণের কার্য্যে নিরত

স্পিলিটে সামুদ্রিক বিষয়ের একটি প্রতিষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যাইবে।

জাগ্রেবের জীবনধারা এবং ভাস্কর্য্য-শিল্পে অষ্ট্রীয়ার প্রভাব সুস্পষ্ট। পুরাতন সহরে বৃক্ষত্বকনির্ম্মিত গৃহরাজি, ভিয়েনা অপেরা গৃহের আদর্শে রচিত রঙ্গালয়, বড় বড় কফিখানা প্রভৃতি দেখিলেই অষ্ট্রীয়ার প্রভাবাদর্শ দর্শকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিবে।
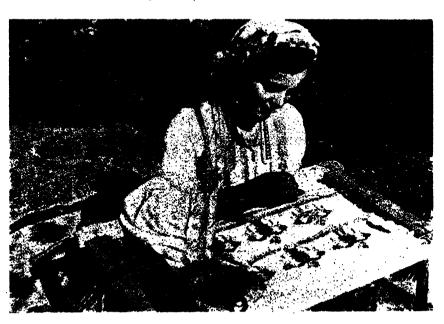
বেলগ্রেডের নেজ-মিহেল নামক রাজপথটিতে পথচারীর ভিড় অসম্ভব, কিন্তু গাড়ীর সংখ্যা অল্প। নাগরিক-বেশভূষায় সজ্জিত লোকের তুলনায় এখানে পল্লীগ্রামের

আগুনে পোড়ান ভুট্টা-ভক্ষণরত বালকের দল

সাভা নদীর উপর দিয়া যে সেতু আছে, তাহা অতিক্রম করিলে আবার জনতার ভিড় আরম্ভ হয়। প্রকাণ্ড ক্ষেত্রে ক্রীড়াপ্রাঙ্গণ। তথায় বিভিন্ন স্থানের প্রতিযোগীরা ক্রীড়ায় যোগ দিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যাইবে।

কিশোর রাজার জন্মতিথি উপলক্ষে এইরূপ ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা হইয়া থাকে। এইরূপ উৎসব সময়ে কিশোর রাজা স্বয়ং ক্রীড়ার ফল দেখিবার জন্য ক্রীড়াক্ষেত্রে উপস্থিত থাকেন।

মুসলমান বেদিয়ারা ভেড়া জবাই করিতে চলিয়াছে

জুগোশ্লাভিয়ায় ৬ শত ২৯টি ফুটবল-ক্লাব আছে। এই সকল ক্লাবের সদস্য-সংখ্যা ২২ হাজার। ইহারা সকলেই ক্রীড়ায় যোগ দিয়া থাকে। টেনিস-ক্লাবের সংখ্যা ৪৫টি। ইহা ছাড়া সন্তরণ, নৌকায় দাঁড়টানা, মুষ্টিযুদ্ধ, স্কী, সাইকেল চালনা, তরবারি ক্রীড়া এবং টেবল টেনিস্ খেলার জন্যও ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠান আছে। মহিলাদের একটি ক্রীড়াসমিতিও আছে। মহিলাদের ২৮টি ক্লাব বিদ্যমান। যে দেশের লোক-সংখ্যার চারি ভাগের তিন ভাগ কৃষক, যে দেশে এক শতাব্দী পূর্ব্বেও ক্রীড়া সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল, সেই দেশের এই প্রকার ক্রীড়ানুরাগ বিস্ময়কর নহে কি?

জাতীয় পরিচ্ছদধারী লোকের সংখ্যাই সমধিক। কয়েক মিনিট ধরিয়া পথ চলিবার পর জনতার বাহিরে আসিবার সুযোগ ঘটে। তখন দর্শক রাজপ্রাসাদ, প্রিন্স পলের যাদুঘর প্রভৃতির সংলগ্ন শান্ত উদ্যানে আসিয়া আনন্দ উপভোগ করিতে পারেন।

সহরের মধ্যে দুইটি প্রবলস্রোতা নদীর সঙ্গমস্থলে প্রমোদোদ্যান অবস্থিত। এই নদী দুইটির উপত্যকাভূমি

ডালমাসিয়ার কৃষক নর-নারী মাসিক-পত্র পড়িতেছে

মণ্টিনিগ্রোর কৃষকদিগের সজ্জিত অশ্ব

জুগোস্লাভিয়ার রাজার অশ্বারোহী রক্ষী

বাজার-প্রত্যাগতা ক্রোশীয় নারী

ডালমাসিয়ার তরুণীর শিরোভূষা

মন্টিনিগ্রোর ভূতপূর্ব্ব রাজা নিকোলাসের যান-চালক

গৃহ-নির্ম্মাণ কার্য্যে সাহায্যকারিণী ক্রোশীয় নারী

ডালমাসিয়ার কিশোরী দ্রাক্ষাফল হইতে সুরা প্রস্তুত করিতেছে

পশ্চিমের প্রধান পথ হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, একটি পাহাড় হইতে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মহাযুদ্ধের প্রথম অগ্নিগোলক-সমূহ নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। এখানে একটি দুর্গ আছে, তাহার নাম সিংগিডিউনম্। খৃষ্ট জন্মের তিন শত বৎসর পূর্ব্বে কেলটনের আমলে এই দুর্গের নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ হয়, এখন এই দুর্গে টেলিভিসন করিবার জন্য একটি টাওয়ার দেখিতে পাওয়া যাইবে। পূর্ব্বে এখানে একটি ধর্ম্ম-মন্দির ছিল, কিন্তু বারুদে আগুন লাগিয়া তাহা ধ্বংস হইলে পুনরায় একটি ধর্ম্ম-মন্দির সেই স্থানে নির্ম্মিত হইয়াছে। তুর্কদিগের যুগের একটি দুর্গ এখন পশুশালায় পরিণত। সেই পশুশালায় একটি প্রতিমূর্ত্তি আছে। ফরাসীদিগের উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য উহা নির্ম্মিত হইয়াছিল।

ব্লেড হ্রদ—দূরে গিরিশিরে সহস্র বৎসরের পুরাতন দুর্গ

সেরাজেভো বাজারের দৃশ্য

যে মিউজিয়ামে রাজা আলেকজান্দারের স্মৃতিচিহ্নাবশেষগুলি রক্ষিত হইয়াছে, তাহা এই প্রমোদোদ্যানের মধ্যেই অবস্থিত। নিহত রাজার ব্যক্তিগত ব্যবহার্য্য যাবতীয়

হস্তরচিত চিকণের কাযযুক্ত ক্রোশীয় নারীর পরিচ্ছদ

ফল ও সব্জীপূর্ণ ঝুড়িসহ গ্রাম্য-নারীর দল

লিখিবার ... অসমাপ্ত পত্র, কলম, পাঁজনে চশমা সবই এখানে সুসজ্জিত। গত ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে রাজা প্যারিসে যাইবার সময় যে সকল দ্রব্য যে ভাবে রাখিয়া গিয়াছিলেন, সবই যথাযথ ভাবে সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। যে যানারোহণে তিনি যাইতেছিলেন, মার্শেলে যে যানের উপর তাঁহাকে হত্যা করা হয়, রক্তসিক্ত সেই যান প্রভৃতি পার্শ্ববর্তী কক্ষে সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে।

য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের পর বেলগ্রেড নূতন করিয়া গঠিত হইয়াছে। সেণ্টমার্ক গির্জ্জার সম্মুখে একটি প্রকাণ্ড অট্টালিকা তৎসংলগ্ন উদ্যান রচিত হইয়াছে। অনেক নূতন নূতন রাজপথ সহরের

দ্রব্যাই মিউজিয়ামে সংরক্ষিত হইয়াছে। রাজা যে সকল পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন, হত্যাকালে তাঁহার অঙ্গে যে পরিচ্ছদ ছিল, তাঁহার প্রিয় চড়িবার ঘোড়ার চর্ম্মাবৃত দেহ,

মধ্য দিয়া বিসর্পিত হইয়াছে। 'থিয়েটার স্কোয়ার' এবং শ্লাভিজাকে সুসংস্কৃত করা হইয়াছে, ড্যানিয়ুব নদের তটদেশে এবং সাভার অপর পারে সিগানলিজায় প্রকাণ্ড ক্রীড়াক্ষেত্র

নির্ম্মিত হইতেছে। প্রত্যেক ক্রীড়াপ্রাঙ্গণে ৫০ হাজার লোকের বসিবার উপযোগী আসন বিরাজিত।

সাভা নদীর পঙ্কোদ্ধার কার্য্যের জন্য মাটী তুলিবার কল অনবরত মৃত্তিকা উত্তোলন করিতেছে। সেই মৃত্তিকারাশি নদীতটের সন্নিকটে নিম্নভূমিতে নিক্ষিপ্ত হইয়া ক্রমেই উচ্চ হইয়া উঠিতেছে। পরিণামে তথায় প্রকাণ্ডাকার বাসোপযোগী অট্টালিকা নির্ম্মিত হইবে, কর্তৃপক্ষ সেইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন।

টেলিফোন কোম্পানীর কার্য্য বাড়িয়া গিয়াছে। আপাততঃ এগার হাজার বাড়ীতে টেলিফোনের সংযোগ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু তাহা পর্য্যাপ্ত নহে। প্রত্যহই হাজার হাজার লোক টেলিফোন চাহিতেছে, কিন্তু কোম্পানী তাহাদিগের অভাব পূর্ণ করিতে পারিতেছেন না। এখানে টেলিফোনের জন্য অতিরিক্ত মাশুল দিতে হয়।

পূর্ব্বে যাযাবর সম্প্রদায় তাহাদিগের শিক্ষিত ভল্লুক লইয়া পথে পথে ফিরিত। কিন্তু এখন সে দৃশ্য কোথাও দেখিতে পাওয়া যাইবে না। কারণ, কর্তৃপক্ষের আদেশে তাহাদিগের কার্য্য বন্ধ হইয়াছে।

বেলগ্রেডের বিমান-বন্দর কর্ম্মব্যস্ততার লীলা-ক্ষেত্র। বিগত দুই বৎসর ধরিয়া য়ুরোপের যাবতীয় বৃহৎ বিমান-পথের সহিত বেলগ্রেডের যোগসূত্র রাখিবার চেষ্টা চলিতেছে। গ্রীষ্মকালে এক দিনেই বেলগ্রেড হইতে লণ্ডন এবং লণ্ডন হইতে বেলগ্রেডে গতায়াত করা চলে।

স্কোপল্‌জি সহর সার্ব্ব-সম্রাট ষ্টীফেন ডুসানের প্রতিষ্ঠিত। এই সহরের লোকসংখ্যা ৮০ হাজার। সার্ব্বগণের সংখ্যাই সমধিক। তবে তুর্ক, ইহুদী, আলবেনিয়া, সিনকার্‌স্ এবং যাযাবরদিগের সংমিশ্রণ জাত লোকও আছে। ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে ডুসান্ এইখানে রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। এখন স্কোপল্‌জি দক্ষিণ সার্ভিয়ার ভার্ডার প্রদেশের ধনতান্ত্রিক কেন্দ্র স্থান। ডুসান প্রাসাদ নদীর অপর পারে পাহাড়ের উপর অবস্থিত। জার ডুসান যখন প্রবল শক্তিমান্ হইয়া উঠিয়াছিলেন, তখন তিনি সমগ্র বলকান্ মালভূমির সার্ব্বভৌম কর্ত্তা ছিলেন। ১৩৩৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তিনি কনষ্টাণ্টিনোপলে অভিযান কালে ভীষণ জ্বর-রোগে আক্রান্ত হন এবং পার্ষদগণের বাহুর আশ্রয়েই তিনি প্রাণত্যাগ করেন

ওপ্লেনাজ গির্জ্জার অভ্যন্তরে নিহত রাজা আলেকজান্দারের সমাধি

রাজধানী হইতে ৪০ মাইল দূরে এই দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। জার ডুসানের বীর বাহিনী ইহাতে হতোদ্যম হইয়া অভিযান করিবার সংকল্প পরিত্যাগ করে। ডুসানের অকাল-মৃত্যু না ঘটিলে হয় ত য়ুরোপের মানচিত্র ভিন্ন আকার ধারণ করিত। এই অঞ্চলে আফিমের চাষ প্রচুর পরিমাণে হইয়া

ধ্বংসাবশেষ ডায়োক্লিশিয়ান প্রাসাদে ক্রোশীয় বিশপের প্রস্তর-মূর্ত্তি

থাকে। স্কোপল্‌জি উহার কেন্দ্র স্থান। বৎসরে এই অঞ্চলে ৩ লক্ষ পাউণ্ড ওজনের অহিফেন উৎপাদিত হইয়া থাকে। সরকার পক্ষ হইতে আফিমের চাষ নিয়ন্ত্রিত হইয়া বর্ত্তমানে ২ লক্ষ পাউণ্ডের অধিক উৎপাদিত হয় না। কৃষককুল অহিফেনের পরিবর্ত্তে অন্য প্রকার চাষ করিতেছে।

স্কোপল্‌জিতে প্রতি রবিবারে বিবাহের উৎসব লাগিয়াই আছে। বিবাহযোগ্যা কন্যার সংখ্যা অফুরন্ত। বিবাহকালে বেদিয়াগণ বাদ্যধ্বনি করিয়া থাকে। সাধারণতঃ দুইটি কি তিনটি যন্ত্রযোগে উৎসব বাদ্য ধ্বনিত হইলেও, কখনও কখনও এক জন লোকও শুধু ঢাক বাজাইয়া নিয়ম রক্ষা করিয়া থাকে। এক এক দিনে চারি পাঁচটি দম্পতিকে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইতেও দেখা যাইবে।

পূর্ব্বকালে প্রাচ্য দেশের সহিত প্রতীচ্য দেশের বাণিজ্য সম্বন্ধ ছিল। স্কোপল্‌জিতে সেজন্য সে যুগে পথের ধারে পান্থনিবাসও সংস্থাপিত হইত। স্কোপল্‌জির ভিতর দিয়া পূর্ব্বযুগের বাণিজ্য-পথ প্রস্তুত ছিল। বর্ত্তমানে প্রাচীনকালের পান্থনিবাস কারাগার হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। গাঁটকাটা, ডাকাত, অহিফেন-চোর প্রভৃতিকে এইখানে অবরুদ্ধ করিয়া রাখা হয়।

রাগুসার ধনী বণিকসঙ্ঘ অধিকাংশ পান্থনিবাস নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ১২ শত বৎসর ধরিয়া এই পথে বাণিজ্য-দ্রব্যসম্ভার গতায়াত করিত।

দক্ষিণ-সার্ভিয়ায় অরিড হ্রদ বিদ্যমান। এক সময়ে এই অঞ্চলে শিক্ষার প্রসার ছিল। আলবানিয়া এবং গ্রীক্ সীমান্তের সন্নিকটে সেণ্ট-নাউম্ মঠ বিরাজিত। এই মঠের সংলগ্ন অনেকগুলি কক্ষ পর্য্যটকদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে। মঠের সংলগ্ন একটি হোষ্টেলের একাংশ রাজপরিবারের জন্য সংরক্ষিত। রাজা আলেকজান্দার রাণীর সহিত মাঝে মাঝে নির্জ্জন বাসের জন্য এখানে আসিতেন।

মঠের সন্ন্যাসীরা সার্ভ-ভাষা ব্যতীত অন্য ভাষায় কথা বলিতে পারেন না।

অরিড হ্রদের দৈর্ঘ্য ১৮ মাইল। জলের গভীরতা হাজার ফুট। এই হ্রদের জল কখনও জমিয়া যায় না।

এমন স্ফটিক-স্বচ্ছ জল কদাচিৎ দেখা যায়। কথিত আছে, হ্রদের জলে প্রাগৈতিহাসিক যুগের মৎস্য আছে বলিয়া উহার জল অত স্বচ্ছ।

বস্‌নিয়া যাইতে হইলে জেনিকা অতিক্রম করিতে হয়, ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ক্রুপ এখানে ইস্পাত প্রস্তুতের এক কারখানা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে পোলাণ্ড হইতে জুগোস্লাভিয়ার রেলপথের জন্য রেল সমূহ আমদানী করা হইত। এখন জুগোস্লাভিয়ায় রেল নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

কাকাক্‌ পার হইবার পর রেলপথ পাহাড় ভেদ করিয়া চলিয়াছে। এই পথে ১ শত ২৮টি সুড়ঙ্গ আছে। প্রত্যেক ষ্টেশনে শাদা ফেজটুপী-পরিহিত বালকের দল কক্ষদেশে মুরগী চাপিয়া ধরিয়া রেলগাড়ীর বাতায়নের কাছে আসিয়া স্ব স্ব মুরগীর গুণগান করিতে থাকে। এই অঞ্চলে কুক্কুটের বিশেষ প্রসিদ্ধি আছে।

বিস্তীর্ণ প্রান্তরে গৃহপালিত মেষ, ছাগ, মহিষের ভিড় দেখিতে পাওয়া যাইবে। এই অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে ভুট্টা, লঙ্কা প্রভৃতি উৎপাদিত হইয়া থাকে। সূর্য্যমুখী ফুলও প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে।

বস্‌নিয়ার প্রধান সহরের নাম সেরাজেভো। এখানে ৮৮টি গম্বুজ আকাশ ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। তন্মধ্যে ৬০টি মস্‌জেদে জনসমাগম অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে। বাজারে যত জনসমাগম হয়, তাহার মধ্যে ফেজধারীর সংখ্যাই অধিক। অনেকের শিরোভূষণ দেখিয়া মনে হইবে, তাহারা মুসলমান। কিন্তু তাহা সত্য নহে। আস্ত্রাকান টুপীগুলি দেখিতে ফেজের ন্যায়। বস্তুতঃ রঙ্গীন বস্ত্র উষ্ণীষের আকারে শিরোদেশে ধারণ করায় উহা ফেজের মত দেখায়। প্রকৃতপক্ষে খৃষ্টান গ্রামবাসীরা ঐরূপ ধরণের শিরোভূষণ ব্যবহার করিয়া থাকে।

মার্কিন পরিব্রাজক মিঃ ডগ্‌লাস্‌ চ্যাণ্ডলার সেরাজেভো পরিভ্রমণে গমন করিয়াছিলেন। তিনি এই মুসলমান-প্রধান সহরে আসিয়া দরবেশগণের নৃত্যোৎসব দেখিবার বাসনা করেন। কিন্তু যে মুসলমান ভদ্রলোক এই নৃত্যোৎসবের অয়োজন করিয়াছিলেন, তিনি বিদেশী কোন সাংবাদিক বা পরিব্রাজককে উৎসব দর্শনে অনুমতি প্রদান করেন নাই। কারণ, ইতঃপূর্ব্বে কেহ কেহ এইরূপ পবিত্র

বস্‌নিয়ার বিবাহের শোভা-যাত্রা

গ্রীষ্মকালে ক্রোশীয় নারীদিগের পরিচ্ছদ

ধর্ম্মোৎসব দর্শনে বিদ্রূপ-হাস্য করিয়াছেন বলিয়া, বিদেশীর পক্ষে উহা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

পথে ভ্রমণকালে তিনি অনেকগুলি কিশোরী মুসলমান-ছাত্রীর দেখা পাইয়াছিলেন। তাহারা ছুটীর পর গাছের ফুল সংগ্রহ করিয়া ফিরিতেছিল। তাহাদের ঝুড়ির মধ্যে অবগুণ্ঠনযুক্ত শিরোভূষণ ভাঁজ করিয়া রাখিয়াছিল। প্রশ্নের উত্তরে তাহারা বলিয়াছিল, "আমরা যখন সহরের মধ্য দিয়া গৃহে ফিরিব, তখন অবগুণ্ঠনে মুখ আবৃত করিব। ভদ্রঘরের মুসলমান যুবতীরা ফুলের ঝুড়ি মাথায় ... যাইতেছে দেখিলে লোক নিন্দা করিবে। অনেকে আমা-দিগের মুখ দেখিয়া চিনিতে পারিবে।"

সার্ব্বকুমারীর মুদ্রাখচিত শিরোভূষা (এখন যাদুঘরে রক্ষিত)

বিবাহ-দিবসে পুষ্পশোভিত পান-পাত্রে জলপান

এ যুগে অবগুণ্ঠন ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইতেছে। নারী-প্রগতি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অবগুণ্ঠনের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইবে। ভদ্রঘরের নারীরা রাজপথে বাহির হইবার সময় এখন যে অবগুণ্ঠন ব্যবহার করিতে-ছেন, তাহা এমন সূক্ষ্ম যে, মুখাবয়ব তাহার অন্তরাল হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়।

সেরাজেভো সহরের পথের যেখানে আর্কডিউক ফার্দ্দিনান্দ আততায়ীর হস্তে নিহত হইয়াছিলেন, তথায় একটি ফটোগ্রাফের দোকান আছে। এই দোকানের বাহিরের প্রাচীরগাত্রে একটি কৃষ্ণপ্রস্তরের ফলক দেখিতে পাওয়া যাইবে। তাহাতে লেখা আছে, "এই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থানে, সেণ্টভিটস্ উৎসব দিনে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জুন তারিখে গেভ্রিলো প্রিন্‌সিপ আমা-দিগের স্বাধীনতার স্বপ্ন দর্শন করিয়া-ছিলেন।"

শিল্প-বিদ্যালয়সমূহে ফেজটুপীধারী বালক ও পুরুষগণ কফির পেয়ালা, সিগারেটের বাক্স, ফুলদানী প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। কাঠের জিনিষের উপর রূপার তার জড়াইয়া শিল্পীরা সুন্দর ও মনোহর দ্রব্যাদি প্রস্তুত করে।

সার্ব্ব-ক্রোশিয়ান্ ভাষা অতি মিষ্ট। একবার সার্ব্বভৌম শ্লাভ কংগ্রেসে সার্ব্ব-ক্রোশিয়ান্ ভাষাকেই সর্ব্বোত্তম শ্লোভানিক ভাষা বলিয়া বহুমতে স্বীকৃত হইয়াছিল।

পরিব্রাজক মিষ্টার চ্যাণ্ডলার একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পার্শ্ব দিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহার হাতে ক্যামেরা ছিল।

বিদ্যালয়ের তখন ছুটি হইয়া গিয়াছিল। বালক-বালিকাগণের মধ্যে মুসলমান ও খৃষ্টান উভয় ছাত্র-ছাত্রীই ছিল। তাহারা ক্যামেরা দেখিয়া ছবি তুলিয়া লইতে বলে। মিষ্টার চ্যাণ্ডলার ছবি তুলিবার পর "ষ্ট্যাডোল্ড্" শব্দ উচ্চারণ করিয়া ফেলেন। তিনি দুই একটি সার্ব্ব শব্দ আয়ত্ত করিয়াছিলেন। "ষ্ট্যাডোল্ড" শব্দের অর্থ আইসক্রীম। বালক-বালিকারা তখন ধরিয়া লইল যে, তিনি তাহাদিগকে আইস্ক্রীম খাওয়াইতে চাহেন। তাহারা চীৎকার করিতে লাগিল। বিব্রত হইয়া চ্যাণ্ডলার অবশেষে বালক-বালিকা পরিবৃত হইয়া একটি দোকানে গেলেন। সেখানে আইস্ক্রীম বিক্রীত হইতেছিল। সকলে এক একটি আইস্ক্রীম পাইবার পর তবে চীৎকার বন্ধ হইয়াছিল। সেরাজেভোতে থিয়েটার দেখিবার সখ ক্রমেই বাড়িতেছে। রাজা দ্বিতীয় পিটারের ন্যাশনাল থিয়েটারের বর্ত্তমান পরিচালক এক জন কৃতবিদ্য যুবক। তিনি কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জন গ্রাজুয়েট। ইদানীং এখানে পশ্চিম-যুরোপীয় ও ইংরেজী নাটকের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। রঙ্গালয়টিকে ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। পূর্ব্বে উহার যে আকার ছিল, তাহার তিন গুণ আয়তন

আইসক্রীমপ্রার্থী বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী

এড্রিয়াটিক সমুদ্রে ধৃত সুবৃহৎ মৎস্য

বেলগ্রেভের জুগোশ্লাভ তরুণী পশম হইতে সূতা কাটিতেছে

জুগোশ্লাভ নারীদিগের পনির রক্ষা

বক্ষোদেশ ভেদ করিয়া শত শত সুড়ঙ্গ ভেদ করিয়া যখন হার্সিগোভিনায় উপস্থিত হওয়া যায়, তখনই এই বৈসাদৃশ্য দর্শককে বিস্ময়-বিমূঢ় করিয়া তুলে।

হার্সিগোভিনার মানুষ জীবন ধারণের উপযোগী শস্যাদি কি করিয়া সংগ্রহ করে, এই মরু অঞ্চল দেখিয়া সেই প্রশ্নই সাধারণতঃ দর্শকের মনকে সংশয়-সঙ্কুল করিয়া তুলে। কিন্তু একটু অবহিত হইলেই বুঝা যাইবে যে, নদীর জলস্রোত এই উপত্যকাভূমির উপর দিয়া যখন প্রবাহিত হয়, তখন পলি পড়িয়া জমিকে উর্ব্বরা করিয়া তুলে। কৃষককুল প্রভূত পরিশ্রমে যে শস্যোৎপাদন করে, তাহাতেই কোন মতে তাহারা জীবন ধারণ করিয়া থাকে।

জীবিকার্জ্জনের আর একটি উপায় আছে। অতিকায়

বৃদ্ধি করা হইয়াছে। নাটক দর্শনের স্পৃহা জনসাধারণের মধ্যে ক্রমেই বাড়িতেছে।

বস্‌নিয়া অঞ্চল তৃণশ্যামল, কিন্তু হার্সিগোভিনা মরুময় বলিলেই চলে। বস্‌নিয়া হইতে রেলে চড়িয়া, পাহাড়ের

বিষধর সর্প ধরিয়া দিলে প্রত্যেকটির জন্য অর্দ্ধ ডলার মুদ্রা উপার্জ্জন করা যায়। অনেকে সর্পশিকার করিয়া অর্থোপার্জ্জন করে। সিরোকি ব্রিজেগ্ নামক স্থানে একটি রাসায়নিক প্রতিষ্ঠান আছে। সাপের বিষের থলি যদি

অব্যাহত থাকে, তবেই অর্দ্ধ ডলার মুদ্রা কর্ত্তৃপক্ষ প্রত্যেক সর্পের জন্ম প্রদান করিবেন। সাপ ধরিবার উপযুক্ত যন্ত্রও আছে। সেই ফাঁদের সাহায্যে লোক সাপ ধরিয়া ফেলে। উল্লিখিত রাসায়নিক প্রতিষ্ঠান সর্প-বিষ নিষ্কাশিত করিয়া তদ্দ্বারা সর্পদংশনের প্রতিষেধক ঔষধ তৈয়ার করিয়া থাকেন।

লোকোরম্ একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ। ঘন অরণ্যসমাকুল বর্ত্তুলাকার এই দ্বীপে সিংহবিক্রম রাজা রিচার্ড, এক সময় পোত বানচাল হইয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন। এই দ্বীপ এক

সেরাজেভো নারী দোলার জন্ম কাষ্ঠ বাছাই করিতেছে

সময় নেপোলিয়নের অধিকারে ছিল। মেক্সিকোর ম্যাক্সিমিলিয়ান এক সময় ইহার অধিকারী হইয়াছিলেন। হ্যাপস্‌বার্গ রুডলফ্‌ও কোন এক সময়ে ইহার মালিক হয়েন। বর্ত্তমানে জুগোশ্লাভিয়া এই দ্বীপের মালিক এবং এখানে একটি বন্দর স্থাপিত হইয়াছে। এই স্বাস্থ্যনিবাসে পীড়িত বালক-বালিকাগণ স্বাস্থ্যসঞ্চয়ের জন্ম আসিয়া থাকে। যাহাদিগের ফুস্‌ফুসের দোষ আছে এবং যে সকল বালক-বালিকা চিররুগ্ন, এখানকার বাতাসে তাহারা বিশেষ উপকৃত হইয়া থাকে।

জুগোশ্লাভিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় একটি নূতন উপাধির সৃষ্টি করিয়াছে। যাঁহারা দেশপর্য্যটনে কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন, তাঁহাদিগকে এই উপাধি প্রদান করা হইয়া থাকে। এই উপাধির নাম—"পর্য্যটন-অধ্যাপক।" এই উপাধি লাভ করিতে হইলে বিভিন্ন ভাষায় পারদর্শিতা থাকা দরকার। ভূগোল, ইতিহাস এবং নৃতত্ত্বে তাঁহাদিগকে কৃতিত্ব দেখাইতে হইবে।

মন্টিনিগ্রোর অন্তর্গত কনেভল উপত্যকা-ভূমি "সুন্দর নরনারীর উপত্যকাভূমি" বলিয়া পরিচিত। এখানকার নরনারীরা সুন্দর মনোহর পরিচ্ছদে ভূষিত থাকে। তাহারা

যুগোশ্লাভিয়ার কৃষক-কন্যা

যেমন পরিচ্ছন্ন, তেমনই অমায়িক। তাহাদিগের অঙ্গ-সৌষ্ঠব চমৎকার। এখানে কাযের বালাই নাই—প্রত্যহই যেন অবসর-জীবনের কথা মনে করাইয়া দেয়।

কোটর উপসাগর সর্ব্বদাই যেন সূর্য্যালোকবর্জ্জিত বলিয়া মনে হইবে। এখানকার দৃশ্য কোন সময়েই প্রসন্নতা-ব্যঞ্জক নহে বলিয়া পর্য্যটকগণ বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তথাপি দর্শকগণ যেন এই উপসাগরের অজ্ঞাত আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়। স্থানীয় লোকদিগের মুখে শুনা যায় যে, সুদূর অতীতে এই উপসাগর কোন কোন নগরকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছিল। অনেকে জাল ফেলিয়া নানা প্রকার

জুগোশ্লাভিয়ার বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা অক্ষর লিখিতে শিখিতেছে

বুলগেরিয়ার নিস্ সহরের বাজারের দৃশ্য

মূল্যবান দ্রব্যও না কি উপসাগরের সলিল হইতে তুলিয়া আনিয়াছে।

যুগোশ্লাভিয়ার এক জন গ্রন্থকার তাঁহার রচিত গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি সলিলমধ্যে—সমুদ্রগর্ভে প্রাসাদ সমূহের অস্পষ্ট ছায়া দেখিয়াছেন।

কিংবদন্তী অনুসারে জানা যায় যে, রিসান্ উপসাগরে রিজিনিয়ম্ সহর সমাহিত হইয়া রহিয়াছে। এই জন্যই সমুদ্রের এই অংশকে এক সময়ে কোটর উপসাগর নামে অভিহিত করা যাইত। ইলিরিয়ান্ রাণী টিউটা এই রিজিনিয়ম্ নগরে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। যীশু-খৃষ্টকে যে দিন ক্রুশে বিদ্ধ করা হয়, সেই দিন ভীষণ ভূমি-কম্প হইতে থাকে। সমগ্র নগর তখন ঘনান্ধকারে আচ্ছন্ন হয়। অন্ধকারের অবকাশে সমুদ্র নগরটি গ্রাস করিয়া ফেলে। তদবধি উহা সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত রহিয়াছে। এইরূপ কাহিনী শুনিয়া মানুষের কল্পনা উদগ্র হইয়া উঠে।

কোটর সহর হইতে আরম্ভ করিয়া মাউণ্ট লভ্‌সেনের শৃঙ্গমালার উপর দিয়া যে আঁকাবাকা মোটর-পথ প্রস্তুত, তাহা ধরিয়া গমন করিলে মন্টিনিগ্রোতে উপনীত হওয়া যায়। যুগোশ্লাভিয়ার এই অংশের অধিবাসীরা এক সময়ে দৈহিক পরিশ্রম নারীর কার্য্য বলিয়া অবজ্ঞা করিত। কিন্তু এখন তাহারা কায়িক শ্রম অমর্য্যাদাকর বলিয়া মনে করে না।

মন্টিনিগ্রোর শেষ রাজা নিকোলা নেগুসি প্রাসাদে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সে যুগে রাজদরবারের তেমন আড়ম্বর ছিল না। প্রাসাদের প্রশস্ত বারান্দায় বসিয়া তিনি অধিকাংশ রাজকার্য্য সম্পাদন করিতেন। রাজার নিকট অবারিত দ্বার ছিল। যে কোন লোক আবেদন-পত্র সহ রাজার নিকট দরবার করিতে পারিত।

মন্টিনিগ্রো বিশ্বের এত সুদূরে ও একান্তে অবস্থিত যে, তত্রত্য অধিবাসীরা যুদ্ধের সংবাদ অথবা মন্টিনিগ্রোর পরি-বর্ত্তন সম্বন্ধে কিছুই অবগত নহে। এমন কি, সম্প্রতি রাজার নিকট দরবার করিতে হইলে, পূর্ব্বে রাজানুমোদনের প্রয়োজন, ইহা শুনিয়া বহু কৃষক বা কৃষিক্ষেত্রের অধিকারী সে সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। তাহারা সম্মিলিত যুগোশ্লাভিয়ার কোন সংবাদ রাখে না। বেলগ্রেডে যে কিশোর রাজা বাস করেন, তাহাও তাহারা জানে না।

যুগোশ্লাভিয়ায় যতগুলি বন্দর আছে, তদপেক্ষা আরও অনেক বেশী বন্দর তাহার প্রয়োজন। যুগোশ্লাভিয়ার সমুদ্রতটব্যাপ্ত সৈকতভূমির পরিমাণ এক হাজার মাইল। চারিটি মাত্র রেলপথে এই বিস্তীর্ণ তটভূমিতে আগমন করা যায়। সুসাক্, স্পিলিট্, মেটকভিক্ এবং

সেরাজেভোর মস্‌জেদ সংলগ্ন গম্বুজ

গ্রজ্-ড্রোভ্‌নিক বন্দরে ষ্টীমারসমূহ হইতে মাল নামান হয় এবং মাল বোঝাই হইয়া তাহারা অন্যত্র গমন করে।

রাব্ নামক দ্বীপে একটি উৎস আছে। এই উৎসের জলধারার উৎপত্তি যুগোশ্লাভিয়ার এক নদী হইতে হইয়াছে। কোন ঐন্দ্রজালিক নলের মধ্য দিয়া লবণাক্ত সলিলরাশি অতিক্রম করিয়া জলধারা উৎসমুখে নিঃসৃত

হইতে থাকে। রাব্ দ্বীপের অধিবাসীরা সেই সুমিষ্ট জল পান করিয়া জীবন-ধারণ করিয়া থাকে।

শ্লানোর সন্নিহিত একটি গুহার মুখে অবিশ্রান্ত ঝড় বহিয়া থাকে। সেই ঝড়ের গতিবেগ এত অধিক যে, সন্নিহিত বৃক্ষরাজি তাহার প্রভাবে অনুক্ষণ কম্পিত হয় এবং বৃক্ষশীর্ষ বায়ুবেগে নত হইয়া পড়ে।

মেলেট নামক দ্বীপটি রহস্যপূর্ণ। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে দ্বীপের অধিবাসীরা এক বৎসর ধরিয়া ভীষণ শব্দ শ্রবণ করিয়াছিল—যেন ভূগর্ভ হইতে কামান অনবরত গর্জ্জন করিতেছে। অষ্ট্রিয়া অতঃপর দ্বীপবাসীদিগকে সেখান হইতে সরাইয়া দিবার আয়োজন করিয়াছিল। সেই সময় অকস্মাৎ সেই শব্দ থামিয়া যায়। ভিয়েনা হইতে বহু বৈজ্ঞানিক আসিয়া সেই ভীম গর্জ্জনের তত্ত্বান্বেষণ করিতে থাকেন, কিন্তু হেতু সম্বন্ধে প্রত্যেকে বিভিন্ন অভিমত পোষণ করেন। কেহই প্রকৃত কারণ নির্ণয় করিতে পারেন নাই।

মেলেটের পূর্ব্বনাম মেলিটা। খৃষ্টপূর্ব্ব ৩ শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে এই দ্বীপের কথা শুনা যায়। রোমক যুগে এই দ্বীপে রাজনীতিক কারণে নির্ব্বাসিতদিগকে বন্দী করিয়া রাখা ... ১৩৭০ খৃষ্টাব্দে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে ভীষণ তর্ক-যুদ্ধ আরম্ভ হয়—মাল্টা অথবা মেলিটায় সেণ্ট পলের ধ্বংস হইয়াছিল কি না।

সমুদ্রপথে সিবেনিক অভিমুখে অগ্রসর হইলে, সহরের মধ্যে অবস্থিত রাজা আলেকজাণ্ডার-প্রতিষ্ঠিত উচ্চ বিদ্যালয়ের সুদৃশ্য অট্টালিকা দৃষ্টিগোচর হইবে। পাহাড়ের উপর অবস্থিত মর্ম্মর-প্রস্তররচিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানটি যেন শিক্ষা দেবতার আশিস বাহু প্রসারিত করিয়া রাখিয়াছে।

৫ শত বৎসরের পুরাতন ক্রোশীয় পল্লী-ভবন

সিবেনিক বন্দরটি ও এত বৃহৎ যে, এখানে বৃহৎ রণতরী-বহর অনায়াসে আত্মগোপন করিয়া থাকিতে পারে। বন্দরের অনতিদূরে একটি এলুমিনিয়ম কারখানা ও কল প্রতিষ্ঠিত। অমিস্ সহরটিতে এক সময়ে দস্যু-তস্করের প্রধান আড্ডা ছিল। এইখানে যে গির্জ্জা আছে, তাহার বেদি-পীঠতলে বহু মূল্যবান ধন-রত্ন গুপ্ত থাকিত। একদা রাত্রিকালে একখানি জাহাজের কয়েক জন নাবিক একটি মৃতদেহ বহন করিয়া পুরোহিত-অনুমতি ক্রমে এই গির্জ্জায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। গভীর নিশীথে এই কপট মৃত্যুর ভাণকারী উঠিয়া গির্জ্জার দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া যাবতীয় দ্রব্য লুণ্ঠন করিয়া পলায়ন করে।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

ভারতে জাতীয় আন্দোলনে বাঙ্গালী

এ দেশের ইতিহাস সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে' লিখিয়াছিলেন :—
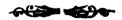
(১) "ভিন্ন দেশীয় ইতিহাস-বেত্তাদিগের গ্রন্থে দুই স্থানে প্রাচীন ভারতবর্ষীয়দিগের যুদ্ধাদির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম, মাকিদনীয় আলেকজণ্ডর বা সেকন্দর দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিয়া ভারতবর্ষে আসিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। রচনাকুশল যবনানী লেখকেরা তাহা পরিকীর্ত্তিত করিয়াছেন। দ্বিতীয়, মুসলমানেরা ভারতবর্ষ জয়ার্থ যে সকল উদ্যম করিয়াছিলেন, তাহা মুসলমান-ইতিবৃত্তলেখকেরা বিবরিত করিয়াছেন। কিন্তু প্রথমেই বক্তব্য যে, এরূপ সাক্ষীর পক্ষপাতিত্বের গুরুতর সম্ভাবনা। মনুষ্য চিত্রকর বলিয়াই চিত্রে সিংহ পরাজিতস্বরূপ লিখিত হয়। যে সকল ইতিহাসবেত্তা আত্মজাতির লাঘব স্বীকার করিয়া সত্যের অনুরোধে শত্রুপক্ষের যশঃ কীর্ত্তন করেন, তাঁহারা অতি অল্পসংখ্যক। অপেক্ষাকৃত মূঢ়, আত্মগরিমাপরায়ণ মুসলমানদিগের কথা দূরে থাকুক, কৃতবিদ্য, সত্যনিষ্ঠাভিমানী ইউরোপীয় ইতিহাসবেত্তারা এই দোষে এইরূপ কলঙ্কিত যে, তাঁহাদিগের রচনা পাঠ করিতে সময় সময় ঘৃণা করে।"

(১ম খণ্ড, প্রথম সংখ্যা)

(২) "মার্শমান, ষ্টুয়ার্ট প্রভৃতি প্রণীত পুস্তকগুলিকে আমরা সাধ করিয়া ইতিহাস বলি, সে কেবল সাধপুরাণমাত্র!"

(৩য় খণ্ড, দশম সংখ্যা)।

এই উক্তি এত সত্য যে, সার ভার্নি লভেটের মত ইংরেজ লেখকের ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস (History of the Indian Nationalist Movement) বলিয়া উল্লেখিত পুস্তকে যে সব ইচ্ছাকৃত ভ্রম ও সত্যবিকৃতি আছে, সে সকলের জন্য বিস্মিত হইবার কোন কারণ থাকিতে পারে না। ইংরেজের ব্যক্তিগত গুণের ও শাসনব্যবস্থার প্রশংসাকীর্ত্তন এবং তাঁহাদিগের "সুশাসনে" থাকিয়াও স্বায়ত্ত-শাসন লাভের আগ্রহজন্য ভারতবাসীকে দোষ দেওয়া সে সব রচনার উদ্দেশ্য। সুতরাং সে সকলে নির্ভর করা নিরাপদ নহে।

কিন্তু আমাদিগের দেশীয় ব্যক্তিরা যখন সমসাময়িক ইতিহাসের কথায় ও প্রাদেশিকতার প্রভাবে বা কোন প্রদেশের অধিবাসীদিগের প্রতি বিদ্বেষবশে সত্যের অপলাপ করেন, তখন সত্যসত্যই বিশেষ বেদনানুভব করিতে হয়।

দুঃখের বিষয়, কিছুদিন হইতে আমরা বাঙ্গালার বাহিরের নানা প্রদেশের শিক্ষাভিমানী ব্যক্তিদিগের রচনায় এই ভাব বিশেষ লক্ষ্য করিতেছি। কংগ্রেসের নির্দ্দেশে ডাক্তার পট্টভী সীতারামিয়া নামক এক ব্যক্তি কংগ্রেসের ইতিহাস রচনা করিয়াছেন। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় ও তাহার পুষ্টিসাধনে বাঙ্গালীর অসাধারণ কৃতিত্ব অস্বীকার করাই সেই "ইতিহাসের" উদ্দেশ্য। তাহার পর অল্পদিন পূর্ব্বে সিমলায় এক সভায় মিষ্টার ভুলাভাই দেশাই বাঙ্গালার সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা যদি অজ্ঞতাপ্রসূত হয়, তবে তিনি কৃপার পাত্র হইলেও, এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে,—"Fools rush in where angels fear to tread"; আর তাহা যদি ইচ্ছাকৃত সত্য-বিকৃতি হয়, তবে তাহা কখনই ক্ষমা করা যায় না।

তিনি বলিয়াছিলেন :--

"১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের (অর্থাৎ সিপাহী-বিদ্রোহের) পর হইতে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ এমন কি ১৯১৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আপনারা যদি আপনাদিগের সে সময়ের সাহিত্য ও ইতিহাস এবং ভারতবাসীদিগের মনোভাব পরীক্ষা করেন, তবে দেখিতে পাইবেন, বৃটিশের প্রতিষ্ঠিত সুশাসন সম্বন্ধে সকলেরই সুদৃঢ় ধারণা ছিল। কিরূপে কখন সেই ধারণার উদ্ভব হইল, কেহ তাহা বিবেচনাও করিত না; সকলেই তাহা আশীর্ব্বাদরূপে স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। যে বাঙ্গালা ভাষা ভারতবর্ষের অন্য বহু ভাষা অপেক্ষা অধিক সমৃদ্ধ, সেই বাঙ্গালা ভাষায় ১৮৬০ ও ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্ত্তীকালে রচিত বহু কবির কবিতায় বৃটিশ-শাসনের প্রশংসাই কীর্ত্তিত হইয়াছে।"

মিষ্টার ভুলাভাই দেশাই বাঙ্গালার এক বর্ণও জানেন না।—সন্ধ্যার পর তিনি যখন বন্ধুবর্গকে লইয়া দিবসের শ্রমাপনোদন করেন, তখন কি কেহ তাঁহাকে

ব্যঙ্গ করিয়া বাঙ্গালাসাহিত্যের এইরূপ পরিচয় প্রদান করিয়াছিল ?

অনারেবল রবার্ট পামার ভারতবর্ষ বিষয়ক পুস্তকে লিখিয়াছেন—"The I. C. S. men if asked when Indian history began would say 'With Clive, I suppose'" অর্থাৎ যাহারা ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে চাকরীয়া, তাহাদিগকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, ভারতবর্ষের ইতিহাস কোন্ সময় হইতে আরম্ভ হয় ?—তবে তাহারা উত্তর দিবে—"ক্লাইবের সময় হইতে।" তেমনই মিষ্টার দেশাইএর বিশ্বাস, গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনের পূর্ব্বে বাঙ্গালায় কবিরা জাতীয়তার বিষয়ে অবহিত ছিলেন না—কেবল বৃটিশ-শাসনে প্রতিষ্ঠিত শান্তির প্রশংসা-কীর্ত্তনই করিতেন।

তিনি যদি সত্যসন্ধ হইতেন, তাহা হইলে অবশ্যই জানিতে পারিতেন, গান্ধীজী জন্মগ্রহণ করিবার বহু পূর্ব্বে বাঙ্গালায় জাতীয়ভাবের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল এবং বাঙ্গালার গোমুখীমুখে যে ভাবধারা প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহাই ভাগীরথীর পাবনী-ধারার মত জাতিকে শাপমুক্ত করিয়াছে। বাঙ্গালী ভগীরথের মত সাধনা করিয়া এই ভাব আনিয়াছিল এবং মহাদেব যেমন তাঁহার জটাজালমধ্যে ভাগীরথীর ধারা ধারণ করিয়া তাহা শান্ত করিয়াছিলেন, বাঙ্গালা তেমনই সেই ভাব ধারন করিয়া তাহা অপেক্ষাকৃত অল্প-প্রস্তুত প্রদেশসমূহের পক্ষে ব্যবহার্য্য করিয়াছিল। বোম্বাই সেই সকল প্রদেশের অন্যতম।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্যিক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কথায় লিখিয়াছেন—দেশবাৎসল্য "পরম ধর্ম্ম"—"মহাত্মা রামমোহন রায়ের কথা ছাড়িয়া দিয়া রামগোপাল ঘোষ ও হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে বাঙ্গালাদেশে দেশবাৎসল্যের প্রথম নেতা বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর গুপ্তের দেশবাৎসল্য তাঁহাদিগেরও কিঞ্চিৎ পূর্ব্বগামী। ঈশ্বর গুপ্তের দেশ-বাৎসল্য তাঁহাদিগের মত ফলপ্রদ না হইলাও তাঁহাদিগের অপেক্ষা তীব্র ও বিশুদ্ধ।" তিনি লিখিয়াছিলেন :—

"ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে দেখ দেশবাসিগণে,
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।
কতরূপ স্নেহ করি দেশের কুকুর ধরি—
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।"

জাতীয় মহাসমিতি বা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হইবার প্রায় ১০ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় যে "হিন্দু মেলার" বার্ষিক অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছিল, তাহার বিবরণে দেখা যায়, ঐ মেলা উপলক্ষে যে সকল সঙ্গীত রচিত হইয়াছিল, সে সকলে বৃটিশ শাসনের গুণকীর্ত্তন হয় নাই, পরন্তু একদিকে যেমন সেই শাসনে দেশের পরমুখাপেক্ষিতার জন্য আক্ষেপোক্তি ছিল, অন্যদিকে তেমনই ভারতের জয়গান গীত হইয়াছিল।

আক্ষেপের ভাব মনোমোহন বসুর গানে সপ্রকাশ। ১২৮০ বঙ্গাব্দে বারুইপুরে মেলার জন্য তিনি যে গানটি রচনা করেন, তাহাই সংস্কৃত আকারে তাঁহার 'হরিশ্চন্দ্র' নাটকে সন্নিবিষ্ট হয়। উহাতেই ভারতবাসীর বর্ণনা—"অন্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তাজ্বরে জীর্ণ, অপমানে তনুক্ষীণ।"—

"তাঁতি, কর্ম্মকার করে হাহাকার
সূতা জাঁতা টেনে অন্ন মেলা ভার—
দেশী বস্ত্র অস্ত্র বিকায় ন কো আর
হ'লো দেশের কি দুর্দ্দিন।
* * * *
ছুঁই সূতো পর্য্যন্ত আসে তুঙ্গ হ'তে
দীয়াসলাই কাটি—তাও আসে পোতে ;
প্রদীপটি জ্বালিতে, খেতে, শুতে, যেতে ;
কিছুতেই লোক নয় স্বাধীন।"

ঐ সময়ই মনোমোহন বাবুর আর একটি গানে আবকারী শুল্কের নিন্দা করা হয়—

"মাদকতা-কর-ছলে রাজ্যময়
মদ্যের বিপণি নিত্য বৃদ্ধি হয় ;
সে গরলে দগ্ধ ভারত নিশ্চয়—
হাহাকার রব নিরন্তর।"

এই মেলা উপলক্ষে প্রথম ভারতবাসী সিভিল সার্ভিসে চাকরীয়া সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "জয় ভারতের জয়" সঙ্গীত রচিত হয়। গানটি পরে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। যে ভাবে উহা প্রথম "হিন্দু মেলায়" গীত হয় আমরা সেই ভাবে উহা উদ্ধৃত করিলাম :—

"মিলে সব ভারত-সন্তান
একতান মনঃপ্রাণ,
গাও ভারতের জয়গান।

"ভারতভূমির তুল্য আছে কোন্ স্থান ?
কোন্ অদ্রি হিমাদ্রি সমান ?
ফলবতী বসুমতী, স্রোতস্বতী পুণ্যবতী,
শত খনি রত্নের নিদান।

"হোক্ ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয়, কি ভয় ?
গাও ভারতের জয়।

"রূপবতী সাধ্বী সতী ভারত-ললনা
কোথা দিবে তাদের তুলনা ?
শর্ম্মিষ্ঠা, সাবিত্রী, সীতা, দময়ন্তী পতিব্রতা
অতুলনা ভারত-ললনা।
হোক্ ভারতের জয়,
ইত্যাদি।

"বশিষ্ঠ, গৌতম, অত্রি মহামুনিগণ
বিশ্বামিত্র, ভৃগু তপোধন।
বাল্মীকি, বেদব্যাস, ভবভূতি, কালিদাস,
কবিকুল ভারত-ভূষণ।
হোক্ ভারতের জয়,
ইত্যাদি।

"বীর যোনি এই ভূমি বীরের জননী
অধীনতা আনিল রজনী ;
সুগভীর সে তিমির ব্যাপিয়া কি র'বে চির ?
দেখা দিবে দীপ্ত দিনমণি।
হোক ভারতের জয়,
ইত্যাদি।

"ভীষ্ম দ্রোণ ভীমার্জ্জুন নাহি কি স্মরণ
পৃথ্বীরাজ আদি বীরগণ ?
ভারতের ছিল সেতু যবনের ধূমকেতু,
আর্ত্তবন্ধু দুষ্টের দমন।
হোক ভারতের জয়,
ইত্যাদি।

"কেন ডর, ভীরু, কর সাহস আশ্রয়,
যতোধর্ম্মস্ততো জয় !
ছিন্ন ভিন্ন হীনবল ঐক্যেতে পাইবে বল,
মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিতে কি ভয় ?
হোক ভারতের জয়,
ইত্যাদি।"

এইরূপ ভাব যে তখন শিক্ষিত বাঙ্গালীর চিত্ত অধিকার করিয়াছিল, তাহা সুদূর আগ্রায় কর্ম্মরত কবি গোবিন্দচন্দ্র রায়ের প্রসিদ্ধ কবিতা "কতকাল পরে" প্রভৃতিতে সপ্রকাশ। গোবিন্দচন্দ্রের এই কবিতা অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে বাঙ্গালার গ্রামে গ্রামে গীত ও শ্রুত হইত।—

"কত কাল পরে বল, ভারত রে,
দুঃখ-সাগর সাঁতারি, পার হ'বে ?
* * * *
নিজ বাস-ভূমে পরবাসী হ'লে
পর দাস-খতে সমুদায় দিলে ;
নিজ অন্ন পরে কর-পণ্যে দিলে—
পরিবর্ত্ত-ধনে দুরভিক্ষ নিলে।
* * * *
পর-হাতে দিয়ে ধন রত্ন সুখে
বহ লৌহবিনির্ম্মিত হার বুকে।
* * * *
পর ভাষণ, আসন, শাসন রে ;
পর পণ্যে ভরা তনু আপন রে।
পর-দীপশিখা নগরে নগরে
তুমি যে তিমিরে—তুমি সে তিমিরে।
* * * *
যদি কেহ দেয় সরগের সুখে,
তবু শ্লাঘ্য নহে স্ববশের দুখে।
বন-বর্ব্বরও স্ববশত্ব খুঁজে,
তবু ভারত সে সব নাহি বুঝে।

ইহার কত দিন পরে ইংরেজ রাজনীতিক ক্যাম্পবেল ব্যাণ্ডারম্যান বলিয়াছিলেন—সুশাসনও কখন স্বায়ত্ত শাসনের স্থান গ্রহণ করিতে পারে না,—তাহা স্মরণ করিলেই বাঙ্গালার সেই ভাবের অগ্রবর্ত্তিতা সপ্রকাশ হয়।

মার্কিণের রাজনীতিক ব্রায়েন ভারতবর্ষ পরিভ্রমণের ফলে লিখিয়াছিলেন, ইংরেজ ভারতের বহু উপকার করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহার জন্য যে মূল্য আদায় করিয়াছেন, তাহাও অসাধারণ। গোবিন্দচন্দ্র সেরূপ লাভ-ক্ষতি খতাইয়া কথা বলেন নাই ; তিনি তাঁহার জন্মভূমি হিন্দুস্থানের মনীষীদিগের সেই পুরাতন কথাই স্মরণ করিয়া তাহার প্রতিধ্বনি করিয়াছিলেন :—

"সর্ব্বং পরবশং দুঃখম্
সর্ব্বমাত্মবশং সুখম্।"

পরবশ্যতাই দুঃখের কারণ।

যে জাতি এই ধারণাভ্রষ্ট হয়, সে আপনার বৈশিষ্ট্য হারাইয়া অধঃপতনের পথে দ্রুত অগ্রসর হয়। ইংরেজ কখন আপনার স্বাধীনতা হারায় নাই, তাই সে আয়ার্লণ্ডের স্বায়ত্ত-শাসন লাভের চেষ্টায় বিস্ময়ানুভব করিয়া তাহার দেশপ্রেম সম্বন্ধে লিখিয়াছে—"that form of patriotism which causes a small poverty-stricken state

to prefer to govern itself, however badly, rather than form an integral part of a great and powerful empire." কিন্তু সেই ভাবের অনুশীলন করিয়াছিল বলিয়াই আয়ার্লণ্ড স্বায়ত্ত-শাসনের সাধনায় সর্ব্ববিধ লাঞ্ছনা সহ্য করিতে পারিয়াছিল এবং তাহার সেই সাধনা ব্যর্থ হয় নাই।

কোন জাতি যতক্ষণ তাহার স্বাধীনতা না হারায়, ততক্ষণ সে তাহার আত্মচেতনা পায় না; যখন সে সেই আত্মচেতনা লাভ করে, তখনই তাহার অন্তরে জাতীয়তা বহ্নিশিখার মত জ্বলিতে থাকে।

হিন্দুস্থানে এই স্বাধীনতার অভাব সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালায় অনুভূত হইয়াছিল এবং সেই জন্য জাতীয়তা সর্ব্বাগে বাঙ্গালায় আত্মপ্রকাশ করে। বাঙ্গালার হিন্দুদিগের মধ্যেই ইহা দেখা দেয় এবং বাঙ্গালার হিন্দুরাই সেই বহ্নিশিখা সযত্নে—ত্যাগের ইন্ধনে ও সাধনার ঘৃতে পুষ্ট রাখিয়াছেন—

"যথা অগ্নিহোত্র দ্বিজ দীপ্ত রাখে অগ্নি নিজ,
চিরদীপ্ত র'বে হুতাশন।"

এই স্থানে একটি কথার আলোচনা প্রয়োজন। মুসলমানের পক্ষে বাঙ্গালা জয় সহজসাধ্য হয় নাই বটে, কিন্তু শেষে বাঙ্গালা জিত হইয়াছিল। সেই জন্য কেহ কেহ বাঙ্গালার হিন্দুর ইংরেজ-শাসনে জাতীয় আন্দোলনের কারণ সন্ধান করিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন।

কিন্তু তাঁহাদিগের একটি বিষয় বিবেচনা করিবার অবকাশ হয় নাই। পরবশ্যতা দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়—রাজনীতিক ও অর্থনীতিক। মহাদেব গোবিন্দ রাণাড়ে সত্যই বলিয়াছেন, রাজনীতিক পরবশ্যতা সহজে লক্ষিত হয় বটে, কিন্তু অর্থনীতিক পরবশ্যতা রাজনীতিক পরবশ্যতা অপেক্ষা অনিষ্টকর। যে কারণে চিতা ও চিন্তা উভয়ের মধ্যে চিন্তাকেই দহনকার্য্যে প্রাধান্য প্রদান করা হইয়াছে, সেই কারণেই অর্থনীতিক পরবশ্যতা রাজনীতিক পরবশ্যতা অপেক্ষা অধিক অনিষ্টকর বিবেচিত হয়।

মুসলমান-শাসনে হিন্দুর এই অর্থনীতিক পরবশ্যতা ছিল না; বাঙ্গালার অর্থ বাঙ্গালায় অধিক ব্যয় হইত এবং শাসন-নীতির দ্বারা তখন দেশের শিল্প ও বাণিজ্য বিনষ্ট হয় নাই। সেই জন্য বাঙ্গালার হিন্দু পরাধীনতার অনুভূতি হইতে আংশিক মুক্ত ছিল। তাহার পর রাজনীতিক পরবশ্যতা। নবীনচন্দ্র সেন পলাশীর সন্ধিকালের কথায় বাঙ্গালী হিন্দুর মনের ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন:—

"জানি আমি যবনেরা ইংরাজের মত
ভিন্ন জাতি; তবু ভেদ আকাশ-পাতাল।"

মুসলমানরা এ দেশে দীর্ঘকাল বাসহেতু এবং বাঙ্গালার বহু মুসলমান হিন্দুবংশোদ্ভূত বলিয়া—

"নাহি বৃথা দ্বন্দ্ব জাতি-ধর্ম্মের কারণে।
অশ্বত্থ-পাদপজাত উপবৃক্ষ মত,
হইয়াছে যবনেরা প্রায় পরিণত।"

মুসলমানরা প্রবল বন্যার মত আসিলেও হিন্দুর উপর তাহাদিগের প্রভাব সম্বন্ধে ঐতিহাসিক হাণ্টার যথাযথ লিখিয়াছেন—"Hinduism was for a time submerged, but never drowned by the tide of Mahammadan conquest."

কোথাও কখন কোন মুসলমান-শাসক বা কর্ম্মচারী যে হিন্দুদিগের সম্বন্ধে অনাচার অনুষ্ঠিত করেন নাই, এমন নহে। কিন্তু বিরাট হিন্দু-সমাজে তাঁহারাও সংযত হওয়াই সুবুদ্ধির কায বলিয়া বিবেচনা করিতেন। তাই হিন্দু মুসলমান বিজেতাকে প্রাপ্য কর প্রদান করিত এবং তাহার সমাজ ও সংস্কার কোনরূপে আক্রান্ত হইতে দিত না। বেণুবনমধ্য হইতে দৃষ্ট মন্দিরে আরত্রিকের বাদ্য উত্থিত হইত—ধূপ-ধূনার গন্ধ পবন আমোদিত করিত; গ্রামের হরিসভায় কথক মহাশয় পুরাণ-কথা শুনাইয়া আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের ক্ষয় বুঝাইয়া দিতেন—সহজে লোক ধর্ম্ম ও নীতিতে আকৃষ্ট হইত; পাঠশালায় গুরুমহাশয় ছাত্রদিগকে যে শিক্ষা প্রদান করিতেন, তাহা প্রকৃত জাতীয় শিক্ষা, কারণ, তাহাতে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোক নিজ নিজ ব্যবসার জন্য প্রস্তুত হইত; গ্রামের নিম্ন-প্রবাহিনী তটিনীতে মৎস্যজীবী জাল বাহিতে বাহিতে গাহিত—

"সাধ আছে মনে
গঙ্গা ব'লে প্রাণ ত্যজিব জাহ্নবী-জীবনে;"

গ্রামের বাহিরে ক্ষেত্রে কৃষক কায করিতে করিতে গান গাহিত—

"মন, তুমি কৃষিকায জান না—
এমন মানব-জনম রইল পতিত
আবাদ করলে ফলত সোণা;"

গোচরে রাখাল-বালক ধবলী, শ্যামলী, লালী গোকুল চরাইয়া গোকুলের স্মৃতি জাগাইয়া তুলিত ; বার-মাসে তের পার্ব্বণে গ্রামের হিন্দুরা সমবেত হইয়া দেবতার লীলা-কীর্ত্তন শুনিয়া তৃপ্ত হইতেন। বাঙ্গালার গ্রাম তখন স্বায়ত্ত-শাসন-শীল সমাজ ছিল। সেই গ্রাম্য-সমাজ প্রতীচীর মনীষীদিগের বিস্ময়োৎপাদন করিয়াছে এবং মেন হইতে বেডেন পাওয়েল পর্য্যন্ত সেই প্রশংসাস্নিগ্ধ বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। সেই "সমাজে" বিচার হইতে ব্যবস্থা সবই গ্রামের প্রধানরা করিতেন। সেই জন্য রাজনীতিক পরবশ্যতাও তথায় অনুভূত হইত না বলিলেই হয়।

ইংরেজের শাসনে এই অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হয়। ইংরেজ-শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বের অবস্থা অতি ভয়ানক ছিল। ইংরেজ তখনও দেশের শাসনভার প্রাপ্ত হয় নাই। কিন্তু মুসলমান শাসক উপলক্ষ মাত্র। সেই অবস্থায় ইংরেজ বণিক্‌রা—ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইংরেজ কর্ম্মচারীরা যে কোন উপায়ে ধনী হইবার চেষ্টা করিয়া দেশে নানারূপ উপদ্রব করিতেছিল। ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে পাটনায় যাইবার পথে ওয়ারেন হেষ্টিংশ যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহা তিনি গভর্ণরকে লিখেন। তাঁহার বর্ণনা এইরূপ :—

তিনি দেখিয়া বিস্মিত হন, নদীতে তিনি যত নৌকা দেখিতে পান, সকলগুলিতেই কোম্পানীর পতাকা উড্ডীন —নদীর কূলেও নানা স্থানে ঐ পতাকা উড়িতেছে। (তখন কোম্পানীর ব্যবসায় শুল্ক দিতে হইত না, এই অবস্থায় কোম্পানীর ইংরেজ কর্ম্মচারীরা অসাধুভাবে ঐ পতাকা উড্ডীন করিয়া কোম্পানীর নামে ব্যবসা করিত।) প্রায় প্রত্যেক গ্রামে তিনি দেখিতে পায়েন—ইংরেজ ব্যবসায়ী ও তাহাদিগের লোকের অত্যাচারভয়ে ভীত লোক পলায়িত —দোকানপাট বন্ধ। "It was the old tale of masterful adventurors working their mad will on neighbours too weak, timid or indolent to withstand them." এক দিকে সভ্যতার নির্ম্মম শক্তি, অপর দিকে বিদেশীর বহু দিনের অত্যাচারে ভীত জনগণ। বাঙ্গালার জনগণ সর্ব্বস্বান্ত হইবার মত হইয়াছিল। "The people of Bengal were as sheep waiting to be shorn by men who would certainly shear them to the skin."

বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্টি ভবানন্দ সেই সময় বাঙ্গালার দুরবস্থার বর্ণনা করিয়াছিলেন :—

"দেখ, যত দেশ আছে—মগধ, মিথিলা, কাশী, কাঞ্চী, দিল্লী, কাশ্মীর, কোন্ দেশের এমন দুর্দ্দশা, কোন্ দেশে মানুষ খেতে না পেয়ে ঘাস খায়? কাঁটা খায়? উইমাটী খায়? বনের লতা খায়। কোন্ দেশে মানুষ শিয়াল কুক্কুর খায়, মড়া খায়? কোন্ দেশের মানুষের সিন্দুকে টাকা রাখিয়া সোয়াস্তি নাই, সিংহাসনে শালগ্রাম রাখিয়া সোয়াস্তি নাই, ঝি-বউয়ের পেটে ছেলে রেখে সোয়াস্তি নাই?"

এই বর্ণনায় অরাজকতার সময়ে বাঙ্গালার রাজনীতিক ও আর্থিক অবস্থার কথা যেরূপে চিত্রিত হইয়াছে, তাহা অতুলনীয়।

ইহার পর ইংরেজ শাসনের আরম্ভ। ইংরেজ তখনও বণিক্—রাজার কর্ত্তব্য পালনের দায়িত্ব স্বীকার করে নাই। ইংরেজের বৈশিষ্ট্য, সে মনে করে, তাহার শিক্ষা, তাহার সভ্যতা, তাহার শাসন-পদ্ধতি অন্য সব শিক্ষা, সভ্যতা ও শাসন-পদ্ধতি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। এই বৈশিষ্ট্য সুশিক্ষিত ইংরেজের বিচারবুদ্ধিও বিভ্রান্ত করে। নহিলে মেকলে কখন বলিতে পারিতেন না—সমগ্র প্রাচীর সাহিত্যের তুলনায় য়ুরোপের যে কোন পুস্তকাগারের একটিমাত্র সেল্‌ফের একটি তাকের পুস্তক অধিক মূল্যবান। এ দেশের প্রাচীন সভ্যতা বহু পরীক্ষার ফলে যে সব প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করিয়াছিল, সে সব দেশের অবস্থার উপযোগী হইলেও ইংরেজের নিকট রক্ষার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইল না। সে সকলের উচ্ছেদে দেশের লোক রাজনীতিক পরবশ্যতা অনুভব করিল।

আর আর্থিক পরবশ্যতা? তাহার আরম্ভ পূর্ব্ব হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল। এ দেশের শিল্প নষ্ট হইতেছিল এবং তাহার স্থানে বিলাতে শিল্প প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হইতেছিল। ইংলণ্ড আইন করিয়া তথায় এ দেশের কার্পাস ও রেশমী বস্ত্রের আমদানী বন্ধ করিয়াছিল এবং ইংলণ্ডের পণ্য ভারতবর্ষের বাজার পূর্ণ করিতেছিল। দেশের লোকের রুচিরও পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছিল ও হইতেছিল।

সর্ব্বাগ্রে বাঙ্গালায় কেন জাতীয়ভাবের উদ্ভব হইয়াছিল ;

তাহার কারণ সম্বন্ধে আলোচনার পূর্ব্বে সে সম্বন্ধে লালা লজপত রায় মহাশয়ের উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। স্বদেশী আন্দোলনের সময় বাঙ্গালার কথায় তিনি বারাণসীতে কংগ্রেসের অধিবেশনে বলিয়াছিলেন—ভগবানের বিধানে বাঙ্গালা যে এ দেশে নূতন রাজনীতিক দিবালোক বিকাশের কার্য্যভার লাভ করিয়াছে, সে জন্য তিনি বাঙ্গালাকে অভিনন্দিত করিয়া বলেন,—বাঙ্গালাই সর্ব্বাগ্রে ইংরেজী শিক্ষালাভ করিয়াছিল বলিয়া এই সম্মান বাঙ্গালারই প্রাপ্য ছিল। "I think the honour was reserved for Bengal, as Bengal was the first to benefit by the fruits of English education" এই ইংরেজী শিক্ষা অল্পদিনের জন্য শিক্ষিত বাঙ্গালীকে উদভ্রান্ত করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার মোহমুক্তির বিলম্ব হয় নাই যে সময় লালা লজপত রায় পূর্ব্বোক্ত উক্তি করিয়াছিলেন, সেই সময়েই গোপালকৃষ্ণ গোখলে মহাশয় বড় লাটের ব্যবস্থাপক সভায় বাঙ্গালীর প্রশংসা কীর্ত্তন করিয়া বলিয়াছিলেন, বাঙ্গালা যতদিন অসন্তুষ্ট থাকিবে, ততদিন হিন্দুস্থানে সন্তোষ স্থাপিত হইবে না। বাঙ্গালায় তখন অসন্তোষ প্রবলভাবেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তাহার নিদাননির্ণয়চেষ্টায় সার ভ্যালেন্টাইন চিরল স্থির করেন, অর্থনীতিক কারণেই সেই অসন্তোষের উদ্ভব। আর রাজনীতিক অবস্থার পরিবর্ত্তন ব্যতীত সেই অর্থনীতিক অবস্থার পরিবর্ত্তন সম্ভব নহে।

সেই অর্থনীতিক অবস্থার প্রতি যে দেশের লোকের দৃষ্টি পূর্ব্বেই আকৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বে উল্লেখিত মনোমোহন বসু মহাশয়ের সঙ্গীতেই সপ্রকাশ।

যে সময় মনোমোহন বাবুর ঐ সঙ্গীত রচিত হয়, সেই সময়েই যে বাঙ্গালার শিক্ষিত সমাজে ঐ ভাব বিস্তার লাভ করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভোলানাথ চন্দ্র মহাশয় সে সময়ের এক জন প্রসিদ্ধ ইংরেজী লেখক। তিনি সাহিত্যিক খ্যাতিসম্পন্ন ছিলেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণমোহন মল্লিক বাঙ্গালার বাণিজ্যের ইতিহাস ('A Brief History of Bengal Commerce') নামক তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাহারই আলোচনা-প্রসঙ্গে ভোলানাথ বাবু 'মুখার্জ্জিস্ ম্যাগাজিন' পত্রে কতকগুলি প্রবন্ধ লিখেন। ঐ সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবামাত্র বঙ্কিমচন্দ্র, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি সুধীগণের মনোযোগ আকৃষ্ট করে। তাহাতে ভোলানাথ বলেন—

সত্য কথা বলিতে হইলে বলিতে হয়, ইংরেজ আমাদিগকে কৃষিজীবীতে পরিণত করিতে চাহেন। আমাদিগের মধ্যে বড় লোক বা ধনীর উদ্ভব তাঁহাদিগের পক্ষে রাজনীতিকোচিত কায হইবে না। ভারতীয়দিগের মধ্যে মনীষা ও ধন থাকিলে যে ফল ফলিবে, তাহা তাঁহারা ভয়ের কারণ বলিয়া বিবেচনা করেন।

তিনি বিদেশী পণ্যের প্রতি ভারতবাসীর অস্বাভাবিক অনুরাগের তীব্র নিন্দা করিয়া আক্ষেপ করেন, বিলাতী পণ্য আমাদিগের শয্যাকক্ষ হইতে পূজা ও শ্রাদ্ধাদির উপকরণমধ্যেও স্থান লাভ করিয়াছে; এমন কি, সুদূর পল্লীগ্রামের হাটেও ইহা উপনীত হইয়াছে।

তিনি বলেন, আমরা ইচ্ছা করিলে এই দুর্দ্দশার প্রতীকার করিতে পারি। আজ যাহা বিদেশীবর্জ্জনের নামে অসহযোগ আন্দোলনের অংশ হইয়াছে, তিনি বঙ্গ-বিভাগের মত উত্তেজক কারণ উদ্ভূত হইবার পূর্ব্বেই তাহার উপযোগিতা বর্ণনা করিয়াছেন :—

"It would be no crime for us to take to the only but most effectual weapon—moral hostility—left us in our last extremity. Let us make use of the most potent weapon by resolving to non-consume the goods of England."

তখনই দেশে শিক্ষিত লোকের কার্য্যের অভাব অনুভূত হইতেছে; ভোলানাথ তাঁহাদিগকে ব্যবসার ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে উপদেশ এবং দেশের লোককে বিদেশী পণ্য বর্জ্জন করিয়া স্বদেশী পণ্য ব্যবহারে উৎসাহিত করেন। তিনি বলেন—"Moral opposition is unmatched in its omnipotonce and efficacy." ভারতবাসীর সংবাদপত্রগুলিকে তিনি অনুরোধ করেন, যে নীতিতে আমাদিগের রাজনীতিক পরাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনীতিক পরাধীনতা সংযুক্ত হয়, তাঁহারা যেন সর্ব্বপ্রযত্নে সেই নীতি ত্যাগের জন্য চেষ্টা করেন।

স্মরণ রাখিতে হইবে, ইহা ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের কথা। তখনও কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

আমরা যে "হিন্দু মেলার" কথা বলিয়াছি, তাহারই এক অধিবেশনে মনোমোহন বসু বলেন :—

"স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিলে এই বোধ হয়, আজ আমরা একটি অভিনব আনন্দ-বাজারে উপস্থিত হইয়াছি। সারল্য আর নির্ম্মৎসরতা আমাদের মূলধন, তদ্বিনিময়ে ঐক্যনামা মহাবীজ ক্রয় করিতে আসিয়াছি। সেই বীজ স্বদেশক্ষেত্রে রোপিত হইয়া সমুচিত যত্নবারি এবং উপযুক্ত উৎসাহ-তাপ প্রাপ্ত হইলেই একটি মনোহর বৃক্ষ উৎপাদন করিবেক। এত মনোহর হইবে যে, যখন জাতি-গৌরবরূপ তাহার নবপত্রাবলীর মধ্যে অতি শুভ্র সৌভাগ্য-পুষ্প বিকশিত হইবে, তখন তাহার শোভা ও সৌরভে ভারতভূমি আমোদিত হইতে থাকিবে। তাহার ফলের নাম করিতে এক্ষণে সাহস হয় না, অপর দেশের লোকেরা তাহাকে 'স্বাধীনতা' নাম দিয়া তাহার অমৃতাস্বাদ ভোগ করিয়া থাকে। * * * আমাদিগের অবলম্বিত অধ্যবসায় থাকিলে অন্ততঃ 'স্বাবলম্বন' নামা মধুর ফলের আস্বাদনেও বঞ্চিত হইব না।"

যখন বিবেচনা করা যায়, ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে কংগ্রেসে বলা হয় নাই—স্বরাজ বা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন ভারতবাসীর কাম্য, তখন রাজনীতিক আন্দোলনে ও আদর্শে বাঙ্গালা কত অগ্রগামী, তাহা বুঝিতে আর বিলম্ব হয় না।

বঙ্গবিভাগ উপলক্ষ করিয়া যে আন্দোলন বাঙ্গালায় উদ্ভূত হইয়া সমগ্র ভারতে ব্যাপ্তিলাভ করিয়াছিল, তাহা অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের পূর্ব্ববর্ত্তী। কিন্তু তাহাও বাঙ্গালায় তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী নীলকরদিগের অত্যাচারের প্রতিবাদসৃষ্ট আন্দোলনের পর। সেই আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য—অহিংসা। কিন্তু তাহার ব্যাপ্তি দেখিয়া ইংরেজ শাসকরাও বিস্মিত—স্তম্ভিত হইয়াছিলেন।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ১৭ই সেপ্টেম্বর বাঙ্গালার তৎকালীন ছোট লাট সার জন পিটার গ্রাণ্ট তাঁহার "মিনিটে" লিখিয়াছিলেন :—

"আমি যমুনা নদীর তীরবর্ত্তী সিরাজগঞ্জ হইতে এখনই ফিরিয়া আসিতেছি। আমি ঢাকার রেলপথ সংক্রান্ত ব্যাপারের জন্য তথায় গিয়াছিলাম—নীলের ব্যাপারের সহিত আমার তথায় গমনের কোন সম্বন্ধ ছিল না। মাথাভাঙ্গা নদী হইয়া গঙ্গায় পতিত হইয়া যাওয়াই আমার অভিপ্রেত ছিল; কিন্তু কুমার নদে পৌঁছিয়া যখন দেখিতে পাইলাম, অপেক্ষাকৃত হ্রস্ব পথে যাওয়া যায়, তখন আমরা কুমার ও কালীগঙ্গার পথেই অগ্রসর হই। এই দুইটি জলপথ নদীয়া ও যশোহর এবং পাবনা জিলার কতকাংশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত। নানা স্থানে প্রজারা উপস্থিত ছিল। তাহাদিগের একমাত্র প্রার্থনা—সরকার আদেশ প্রচার করুন, তাহাদিগকে নীলের চাষ করিতে হইবে না। ঐ দুই নদী-পথে যখন আমি প্রত্যাবর্ত্তন করি, তখন উষাকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আমার ষ্টীমার ৬০।৭০ মাইল পথ অতিক্রম করে; সেই সময় নদীর উভয় কূল জনগণে পূর্ণ ছিল। নদীতীরবর্ত্তী গ্রামসমূহের স্ত্রীলোকরাও স্বতন্ত্র দলে উপস্থিত ছিলেন। যে সব পুরুষ গ্রামে ও দুইটি গ্রামের মধ্যবর্ত্তী স্থানে উপস্থিত ছিল, তাহারা নিশ্চয়ই উভয় কূলের দূরবর্ত্তী গ্রামসমূহ হইতেও আসিয়াছিল। ভারতে সরকারের আর কোন কর্ম্মচারী যে কখন ১৪ ঘণ্টাকাল এইরূপ বিচারপ্রার্থী জনতার মধ্য দিয়া ষ্টীমারে পথাতিবাহিত করিয়াছেন, তাহা আমার মনে হয় না। ইহারা সকলেই সুশৃঙ্খলভাবে অবস্থিত ও সম্ভ্রমশীল; কিন্তু ইহাদিগের আন্তরিকতা অসাধারণ। লক্ষ লক্ষ নরনারী শিশুর এইরূপ কার্য্য যে অর্থহীন, ইহা মনে করা নির্ব্বোধের কার্য্য হইবে। আপনারাই দলবদ্ধ হইয়া কার্য্য করিবার এই যে ক্ষমতা, ইহা বিশেষ ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখা সঙ্গত।"

"The organization and capacity for combined and simultaneous action in the cause"—তখন ছোট লাটের নিকট বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল।

বাঙ্গালায় রাজনীতি ও সাহিত্য অঙ্গাঙ্গীভাবে অগ্রসর হইয়াছিল এবং একের উপর অন্যের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। নীলকরদিগের বিরুদ্ধে যে আন্দোলনের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা সাহিত্যের সহায়তায় পুষ্ট হইয়াছিল। দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' সেই আন্দোলনের সাহিত্য। এই নাটকের ভূমিকায় গ্রন্থকার লিখিয়াছিলেন :—

"তোমাদিগের (ইংরেজ নীলকরদিগের) ধনলিপ্সা কি এতই বলবতী যে, তোমরা অকিঞ্চিৎকর ধনানুরোধে ইংরাজ জাতির বহুকালার্জ্জিত বিমলযশস্তামরসে কীটস্বরূপ ছিদ্র করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ? এক্ষণে তোমরা যে সাতিশয়

অত্যাচার দ্বারা বিপুল অর্থলাভ করিতেছ, তাহা পরিহার কর; তাহা হইলে অনাথ প্রজারা সপরিবারে অনায়াসে কালাতিপাত করিতে পারিবে। তোমরা এক্ষণে দশমুদ্রা ব্যয়ে শতমুদ্রার দ্রব্য গ্রহণ করিতেছ, তাহাতে প্রজাপুঞ্জের যে ক্লেশ হইতেছে, তাহা তোমরা বিশেষ জ্ঞাত আছ; কেবল ধনলোভপরতন্ত্র হইয়া প্রকাশ করণে অনিচ্ছুক। তোমরা কহিয়া থাক যে, তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ বিদ্যাদানে অর্থ বিতরণ করিয়া থাকেন এবং সুযোগক্রমে ঔষধ দেন; এ কথা যদিও সত্য হয়, কিন্তু তাঁহাদের বিদ্যাদান পয়স্বিনী ধেনু-বধে পাদুকাদানাপেক্ষাও ঘৃণিত এবং ঔষধ বিতরণ কালকূটকুম্ভে ক্ষীরব্যবধান মাত্র। শ্যামচাঁদ-আঘাত-উপরে কিঞ্চিৎ তাপিণ তৈল দিলেই যদি ডিস্পেন্সারি করা হয়, তবে তোমাদের প্রত্যেক কুঠীতে ঔষধালয় আছে, বলিতে হইবে।"

অত্যাচার অনাচার দুর্নীতি দূর করিবার জন্য সাহিত্য ব্যবহারের দৃষ্টান্ত 'নীলদর্পণে' প্রকট হইয়াছে। ইহার সম্বন্ধে ইংরেজ লেখক ফ্রেজার লিখিয়াছেন :—

"The play * * marks the grave dangers that must be faced when England gives India, in consideration of her political servitude, the fullest possible freedom of thought, of conscience, and of expression of her needs and aspirations."

দেশের স্বাধীনতালোপের অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যে সেই অনুভূতি প্রকাশ পাইতে থাকে। সেই জন্য বাঙ্গালী কবিরা টডের মহাগ্রন্থ 'রাজস্থান' হইতেও উপকরণ সংগ্রহে বিরত হন নাই। রঙ্গলালের কবিতায় সেই ভাব উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল :—

"স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে
কে বাঁচিতে চায়?
দাসত্ব-শৃঙ্খল, বল, কে পরিবে পায় রে
কে পরিবে পায়?"

হেমচন্দ্রের কবিতা তূর্য্যনাদ :—

"কারে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেছি আমি?
গোলামের জাতি শিখেছে গোলামী—
আর কি ভারত সজীব আছে?"

নীলকরের অত্যাচার-বিরোধী আন্দোলন হইতে বঙ্গবিভাগের প্রতিবাদ আন্দোলন পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর সব আন্দোলন বাঙ্গালীর সাহিত্যিক প্রতিভার দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল। শেষোক্ত আন্দোলনে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের, রজনীকান্ত সেনের, সর্ব্বোপরি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দান যে অসাধারণ, তাহা বলা বাহুল্য।

স্বদেশী আন্দোলনে যিনি বহু কর্ম্মীর পুরোভাগে ছিলেন, সেইরূপ কোন বাঙ্গালী বলিয়াছিলেন, বাঙ্গালায় রাজনীতিক আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য, তাহা বাঙ্গালীর প্রতিভার সহানুভূতি ও সাহায্য পাইয়াছে—যাহার সহিত প্রতিভার সামঞ্জস্য থাকে না, সেরূপ আন্দোলন বাঙ্গালায় ব্যাপ্তি লাভ করিতে পারে না—স্থায়ী হয় না। সেই জন্যই নীলকরের অত্যাচারের প্রতিবাদে পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলন যেমন, বঙ্গবিভাগ সম্পর্কিত বয়কট আন্দোলন তেমনই বাঙ্গালায় ব্যাপ্তি লাভ করিলেও ১৯১৯ খৃষ্টাব্দ হইতে পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলন বাঙ্গালীর চিত্ত জয় করিতে পারে নাই। সে আন্দোলনে কোন নাটক, কোন কবিতা, কোন সঙ্গীত স্থায়িত্বের শক্তি লইয়া সৃষ্ট হয় নাই।

বাঙ্গালী কবিরা যখন জাতীয়তার তূর্য্যধ্বনি করিয়াছেন, তখন অন্যান্য প্রদেশে জাতীয়তার স্ফুরণ হয় নাই। বাঙ্গালা হইতে অগ্নি সংগ্রহ করিয়া অন্যান্য প্রদেশ যজ্ঞকুণ্ডে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়াছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

আজ অন্যান্য প্রদেশে যাহারা বাঙ্গালার নিকট সেই ঋণ অস্বীকার করিতে প্রচেষ্ট, তাহাদিগের হীন অকৃতজ্ঞতার কালিমা সপ্তসিন্ধুর সম্মিলিত সলিলেও কখন প্রক্ষালিত হইতে পারে না।

"বন্দে মাতরম"ও কংগ্রেসের পূর্ব্বের রচনা এবং তাহার পশ্চাতে বাঙ্গালী হিন্দুর অর্দ্ধশতাব্দীরও অধিক কালের জাতীয়তার সাধনা ছিল।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

রাজমাতা মেরীর দুর্ঘটনা

গত মে মাসের শেষ মঙ্গলবার লণ্ডনের উইম্বলডন পার্ক-রোড ও ওয়েষ্ট হিল-রোডের সংযোগস্থলে রাজমাতা মেরীর সুবৃহৎ ডেম্লার গাড়ীর সহিত একখান ভারি মোটর-লরীর সংঘর্ষণ হওয়ায় ডেম্লারখানি উল্টাইয়া যায়, এবং তাহার কাচগুলি চূর্ণ হয়। ডেম্লার-কারে রাজমাতা মেরী ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন।

লরীর ড্রাইভার এলবার্ট কুপারকে আহত হইতে হয় নাই। সে তাড়াতাড়ি লরী হইতে নামিয়া ডেম্লার-কারের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিতে পায়, রাজমাতার গাড়ীর অর্দ্ধাংশ ফুটপাথের উপর উঠিয়া পড়িয়াছে। ডেম্লারের সোফার এবং এক জন আর্দালী

রাজমাতা মেরী

সেই চূর্ণপ্রায় গাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিয়া চীৎকার করিয়া বলে, "রাণীকে কি করিয়া গাড়ী হইতে বাহির করিব ?"—কুপার সভয়ে শুনিল—এই রাণী অন্য কোন দেশের রাণী নহেন, "তিনি রাজমাতা মেরী !"

তাহারা দেখিল, রাজমাতা ও তাঁহার সঙ্গিনীগণ স্তূপীকৃত খণ্ড-বিখণ্ড কাচের ভিতর পড়িয়া আছেন। রংমিস্ত্রী পার্সি হুলিশ রঙ্গমাখা একখানি সিঁড়ি আনিয়া চূর্ণপ্রায় রাজকীয় 'ডেম্লার-কারে'র সহিত সংযোজিত করিলে রাজমাতা মেরী তাহার সাহায্যে বাহিরে আসিয়াছিলেন। সেই সময় তিনি অস্ফুটস্বরে বলিতেছিলেন, 'ও ডিয়ার ! ও ডিয়ার !'

তাঁহার মুখমণ্ডল তখন বিবর্ণ। তিনি অবিলম্বে একটি গৃহে নীত হইলে সঙ্গিনী ও সোফার প্রভৃতির সংবাদের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কাহারও কোন ক্ষতি হয় নাই জানিয়া, তিনি আর একখানি মোটর আনিবার আদেশ করেন।

অন্য একখানি কার আনীত হইলে রাজমাতা সদলে মার্লবরো-হাউসে প্রত্যাগমন করিলেন। সেই প্রাসাদের বাহিরে সমবেত বহু উৎকণ্ঠিত ব্যক্তি অভিবাদন করিলে তিনি তাহাদিগকে প্রত্যভিবাদন করিলেন। তাঁহার কার প্রাসাদের দেউড়িতে প্রবেশের সময় ফটোগ্রাফারগণ তাঁহার ছবি তুলিয়াছিল। তিনি তখন গাড়ীর ভিতর সোজা হইয়া বসিয়া ছিলেন, তাঁহার সম্ভ্রমপূর্ণ ভাবের ব্যতিক্রম লক্ষিত হয় নাই।

কিন্তু ৭২ বৎসর বয়স্কা রাজমাতা সাহসের সহিত এইভাবে আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিলেও লোক-লোচনের অন্তরালে গমন করিয়া একবারে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন।

রাজমাতা আহত হইয়াছিলেন, তাঁহার বাম-চক্ষুর এক স্থান ফুলিয়া উঠিয়াছিল। সে জন্য তাঁহাকে কয়েক দিন কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল।

পৃথিবীর সকল স্থান হইতে তিনি সহানুভূতিপূর্ণ টেলিগ্রাম ও পত্র পাইয়াছিলেন। জাপান-সম্রাট হিরোহিটোও তাঁহাকে সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। গ্লসেষ্টার ও কেণ্টের ডিউক ও ডচেস, লর্ড হেয়ারউড প্রভৃতি তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদিগকে কয়েক মিনিট মাত্র তাঁহার নিকট থাকিতে দেওয়া হইয়াছিল। ডাক্তাররা দুই সপ্তাহের জন্য তাঁহার বাহিরে যাওয়া বন্ধ করিয়াছিলেন। তজ্জন্য তিনি গত ১৩ই জুন বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফাইন আর্ট ইন্‌ষ্টিটিউটে'র দ্বার উদ্ঘাটন করিতে পারেন নাই।

রাজমাতার জ্যেষ্ঠ-পুত্র ডিউক অফ উইণ্ডসর মার্লবরো হাউসে ছয় বার টেলিফোন করিয়াছিলেন, কিন্তু রাজমাতা তাঁহার শয়ন-কক্ষে টেলিফোন প্রবেশ নিষিদ্ধ করায় ডিউক তাঁহার মাতাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন নাই। লণ্ডনে ও প্যারিসে জনরব প্রচারিত হইয়াছিল, ডিউক অফ উইণ্ডসর মাতাকে দেখিবার জন্য লণ্ডনে যাত্রা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন; রিপোর্টারগণ ডিউকের ইংলণ্ড-যাত্রার সংবাদ সংগ্রহের জন্য ব্যস্ত হইয়াছিল, কিন্তু ডিউক ইংলণ্ডে আসেন নাই।

বিনাযুদ্ধে ড্যান্‌জিগ্‌ অধিকার ?

হিটলারের সহকারিগণ ঘোষণা করিতেছেন, তাঁহারা "বিনাযুদ্ধে ড্যান্‌জিগ্‌ রাইচের অধিকারভুক্ত করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন।"

এই ঘোষণা হইতে প্রতিপন্ন হইয়াছে, ভন রিবেনট্রপ কূটনীতির সাহায্যে ড্যান্‌জিগকে পোল্যাণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার ফন্দী স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু এজন্য কোন্‌ পন্থা অবলম্বিত হইবে, তাহা এখনও কেহ জানিতে পারে নাই; তবে প্যারিসের

অভিজ্ঞ মহলে প্রকাশ, রিবেনট্রপ এংলো-পোলিশ চুক্তি বাতিল করিবার একটি কৌশল আবিষ্কার করিয়াছেন।

কৌশলটির মর্ম্ম এই, ড্যানজিগ-সিনেটে এই মর্ম্মে একটি ঘোষণা প্রচার করা হইবে যে, এই স্বাধীন নগরটি রীচের অন্তর্ভুক্ত করা হউক, এবং একদল শক্তিশালী জার্ম্মাণ-সৈন্য ড্যানজিগে অভ্যর্থিত হউক।

এই ঘোষণা কার্য্যে পরিণত হইলে পোল্যাণ্ড যদি নিষ্ক্রিয়ভাবে বসিয়া থাকে, এবং প্রতিবাদে অস্ত্র উত্তোলন না করে, তাহা হইলে একটি রাজ্যাংশ বিনা-রক্তপাতে জার্ম্মাণীর অন্তর্ভুক্ত হইবে।

কিন্তু পোলরা যদি রিবেনট্রপের এই কৌশলের সমর্থন না করিয়া

হার ভন্ রিবেনট্রপ

ড্যানজিগে সৈন্য প্রেরণ করে, তাহা হইলে জার্ম্মাণরা ড্যানজিগের সীমান্তভাগে শিবির স্থাপন করিয়া নিরীহের ন্যায় ড্যানজিগের নিরপেক্ষতা লক্ষ্য করিতে থাকিবে; কিন্তু তাহারা স্থানীয় নাজীদিগকে আন্দোলন পরিচালিত করিবার জন্য উত্তেজিত করিবে। বার্লিন্ তখন পোল্যাণ্ডকেই আক্রমণকারী নামে অভিহিত করিবে, এবং পোলরা ড্যানজিগের অধিবাসীবর্গের প্রতি কিরূপ ভীষণ অত্যাচার করিতেছে, তাহার কাহিনী সৃষ্টি করিয়া চতুর্দ্দিকে তাহা প্রচার করিবে। অতঃপর তাহারা এই মন্তব্য প্রকাশ করিবে যে, শান্তিস্রষ্টা চেম্বারলেন য়ুরোপকে ধ্বংসমুখ হইতে রক্ষা করিবার জন্য পোলদিগকে হাত গুটাইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিতে আদেশ করুন।

চেম্বারলেন হার হিটলারের মনোরঞ্জনের জন্য পোলদিগকে এই অনুরোধ করিলে পোলরা যদি তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করে, তাহা হইলে ড্যানজিগ রিবেনট্রপের এই কূটনীতি-বলে বিনা রক্তপাতে জার্ম্মাণীর কুক্ষিগত হইবে। কিন্তু রিবেনট্রপের এই কৌশল সফল হইবে কি না, য়ুরোপের রাজনীতিকগণ তাহা অনুমান করিতে পারেন নাই; তবে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীকে মন্ত্রিত্ব ত্যাগের পূর্ব্বে আর একবার অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইবে। তাঁহার নিত্যসঙ্গী ছত্র খুলিয়া তাহার অন্তরালে তিনি আত্মরক্ষা করিতে পারিবেন কি?

সম্রাটের রাজদর্শনে যাত্রা

ইংলণ্ডের রাজা ষষ্ঠ জর্জ্জ এবং রাজমহিষী এলিজাবেথ কানাডা ও য়ুনাইটেড্ ষ্টেট্স্ ভ্রমণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমনের পূর্ব্বেই পুনর্ব্বার তাঁহাদের প্রবাস-যাত্রা সম্বন্ধে বৃটিশ রাজনীতিকগণের মধ্যে আন্দোলন আলোচনা আরম্ভ হওয়ায় অনেকেই বিস্মিত হইয়াছেন।

গত জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে বৃটিশ সাম্রাজ্যের কর্ণধারগণের প্রধান আড্ডা ডাউনিং ষ্ট্রীট হইতে রেডিওযোগে ঘোষণা করা হইয়াছিল, রাজা ষষ্ঠ জর্জ্জ এবং রাজমহিষী এলিজাবেথ

সম্রাট-সাম্রাজ্ঞী

বেলজিয়াম-রাজধানী ব্রুসেল্স নগরে যাত্রা করিবেন; তাঁহাদের যাত্রার দিন পর্য্যন্ত স্থির হইয়া গিয়াছে। বিস্ময়ের বিষয় এই, এজন্য সম্রাট-সাম্রাজ্ঞীর স্বদেশে প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিবারও প্রয়োজন অনুভূত হয় নাই! তাঁহাদের স্বদেশে প্রত্যাগমনের পর এই সংবাদ প্রচারিত হইলেই বোধ হয় শোভন হইত।

ইতিমধ্যে, বেলজিয়মের বৃটিশ দূত সার রবার্ট ক্লাইভকে এই মর্ম্মে উপদেশ প্রদান করা হইয়াছে, তিনি বেলজিয়মের রাজা লিওপোল্ডের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে জানাইবেন, গ্রেট্ বৃটেনের রাজা ও রাজমহিষী আগামী শরৎকালে বেলজিয়ম দর্শনের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন। সম্রাট-সাম্রাজ্ঞী বেলজিয়মস্থিত বৃটিশ দূতের মারফৎ এই নিমন্ত্রণ পাইয়াছিলেন কি না, এবং তাঁহাদের প্রবাসযাত্রার পূর্ব্বে কি পরে তাঁহারা নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, তাহা জনসাধারণের অজ্ঞাত।

সম্রাট-সাম্রাজ্ঞী আগামী ২৪এ অক্টোবর বেলজিয়মে যাত্রা করিবেন, এবং সে দেশে চারি দিন বাস করিবেন, ইহাও স্থির

হইয়া গিয়াছে। সম্রাট-সাম্রাজ্ঞীর বেল্‌জিয়ম ভ্রমণ সম্বন্ধে নানা আলোচনা চলিতেছে। বেল্‌জিয়মরাজের গ্র্যাণ্ড চেম্বারলেন বাকিংহাম প্রাসাদের লর্ড চেম্বারলেন লর্ড ক্ল্যারেনডনের সহিত এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিতেছেন।

সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ্জ সাম্রাজ্ঞী সহ বেল্‌জিয়ম-রাজ লিওপোল্ডকে দর্শনদান করিতে যাইতেছেন; রাজা লিওপোল্ড কি ইংলণ্ডে
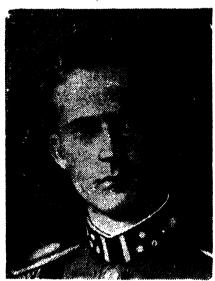
লিওপোল্ড (বেল্‌জিয়মের রাজা)

আসিবেন? ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় বেল্‌জিয়মকে প্রচণ্ড ধাক্কা সামলাইতে হইয়াছিল; এবার জার্ম্মাণী যুদ্ধ-ঘোষণা করিলে এবারও কি বেল্‌জিয়মের সেই অবস্থা হইবে? রাজায় রাজায় এই মিলন, তাহারই পূর্ব্বাভাস কি না, কে বলিবে?

পোল্যাণ্ডের বর্ত্তমান অবস্থা

য়ুরোপে পুনর্ব্বার মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবে কি না, ড্যানজিগের ভাগ্যের উপর এই প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করিতেছে। এডলফ হিট্‌লারের তর্জ্জনীসঙ্কেতে ৪০ হাজার সশস্ত্র নাজী-সৈন্য জার্ম্মাণীর পোল-সীমান্তে উপস্থিত হইয়া ব্যূহনির্ম্মাণ করিয়াছে। তাহারা যে কোন মুহূর্ত্তে পোল্যাণ্ড আক্রমণ করিতে পারে। দিয়া-শলাইয়ের একটি কাঠী জ্বালিয়া বারুদ-স্তূপে নিক্ষেপ করিতে হিট্‌লার কতখানি সময় লইবেন, তাহা কেহই অনুমান করিতে পারিতেছেন না।

পোল্যাণ্ডের বিপদের প্রধান কারণ, হিট্‌লার পোলগণের নিকট ড্যানজিগের দাবী করিলে, এবং পোল্যাণ্ডের সীমাপ্রান্ত দিয়া মোটর চালাইবার জন্য একটি রাস্তানির্ম্মাণের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে পোলরা তাঁহার এই উভয় দাবীই সরাসরি অস্বীকার করিয়াছে।

হিটলার ড্যানজিগের দাবী করিয়াছেন, ইহা কি ড্যানজিগে তাঁহার প্রয়োজন আছে এই জন্য? অর্থাৎ কেবল কি গায়ের জোরে? না, ড্যানজিগের উপর জার্ম্মাণীর কোন বৈধ অধিকার আছে?

এই প্রশ্নের উত্তর পাইতে হইলে পোল্যাণ্ডের অতীত যুগের ইতিহাস খুলিয়া দেখিতে হইবে। ১০০৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ড্যানজিগ পোলদিগের অধিকারভুক্ত ছিল। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়ার রাণী ক্যাথেরাইন সর্ব্বপ্রথম পোল্যাণ্ড ভাগ-বাটোয়ারা করিয়াছিলেন, সেই সময়েও ড্যানজিগ পোলদিগের হস্তে অর্পণ করা হইয়াছিল; কিন্তু তাহার ১৯ বৎসর পরে রুশিয়ার প্রতিকূলতাচরণের জন্য ড্যানজিগ প্রুসিয়ার অধিকারভুক্ত হয়। কিন্তু প্রুসিয়া পোলদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া সমগ্র পোল্যাণ্ড অধিকার করে; পরে তাহা রুসিয়ার অধিকারভুক্ত হইয়াছিল।

বিগত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের পর ভার্সাই সন্ধির সর্ত্তানুসারে পোল্যাণ্ডকে স্বাধীন করিয়া দেওয়া হয়। এই সময় পোল্যাণ্ডের যে সকল অংশ জার্ম্মাণীর অধিকারভুক্ত ছিল, তাহার প্রায় সমস্তই জার্ম্মাণীর নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া পোলদিগকে প্রদান করা হয়। এতদ্ভিন্ন, ইহার যে অংশ রুসিয়া গ্রাস করিয়াছিল, তাহাও রুসিয়ার কবল হইতে উদ্ধার করিয়া পোলদিগকে প্রদান করা হইয়াছিল; কিন্তু পোল্যাণ্ডের সীমান্ত-ভূমি সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই। প্রকৃত পক্ষে ইহার প্রাকৃতিক কোন সীমা নাই। এতদ্ভিন্ন, পোল্যাণ্ডের পক্ষে সমুদ্রপথও মুক্ত নহে। ইহার এক দিকে রুসিয়া, অন্য দিকে জার্ম্মাণী;—এখন দুই ডিক্টেটারের কৃপা-কটাক্ষে পোল্যাণ্ডের অবস্থা সঙ্কটজনক! পোলরা যদি এক পক্ষের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, বা অপর পক্ষে যোগদান করে, তাহা হইলে তাহার অস্তিত্ব রক্ষা করা কঠিন হইবে। কিন্তু যদি পোল্যাণ্ড স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারে, তাহা হইলে য়ুরোপ ফ্যাসিষ্ট বা কম্যুনিষ্টদিগের প্রভাব হইতে মুক্ত থাকিবে, অনেকেই এরূপ আশা করিতেছেন। এইরূপ বিবেচনা করিয়াই বৃটেন ও ফ্রান্স গত মার্চ্চ মাসে পোল্যাণ্ডকে জার্ম্মাণীর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছিল।

কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় রুসিয়া কি করিবে, তাহাই অনেকের চিন্তার বিষয়। বৃটেন ও ফ্রান্স উভয়েই রুসিয়ার বহু দূরে অবস্থিত; অথচ জাপান পূর্ব্ব দিক্ হইতে রুসিয়াকে আক্রমণ করিয়া বিপন্ন করিতে পারে। এ অবস্থায় জার্ম্মাণীর সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না। বিশেষতঃ, রুসিয়ার কাঁচা মালের প্রতি জার্ম্মাণীর লোভ আছে। কিন্তু ষ্টেলিন জীবিত থাকিতে রুসিয়া জার্ম্মাণীর সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইবে কি না সন্দেহের বিষয়।

হিট্‌লার যদি য়ুরোপে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন, তাহা হইলে তাঁহাকে হয় পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতা হরণ করিতে হইবে, না হয় পোল্যাণ্ড ধ্বংস করিতে হইবে। পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতা বর্ত্তমান থাকিতে বিংশ শতাব্দীতে য়ুরোপে নবীন নাজী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করা কঠিন হইবে।

পোল্যাণ্ডের সামরিক শক্তি উপেক্ষার যোগ্য নহে। বর্ত্তমানে ইহার সৈন্যসংখ্যা ২ লক্ষ ৬৬ হাজার। উচ্চপদস্থ সামরিক কর্ম্মচারী-সংখ্যা ১৮ হাজার; এবং ইহার বিমান-বাহিনীতে ৮ হাজার সৈন্য নিয়োজিত। ইহার নৌ-সৈন্যের সংখ্যা ৬ হাজার। পোল্যাণ্ড

৩০ লক্ষ অধিবাসীদের সামরিক শিক্ষা প্রদান করিয়াছে; এখনও তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে।

য়ুরোপের অন্যান্য দেশ অপেক্ষা পোল্যাণ্ডে জনসংখ্যা অধিক বর্দ্ধিত হইতেছে, এবং তাহাদের স্থানাভাব একটা সমস্যার বিষয় হইয়াছে। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে পোল্যাণ্ডের জনসংখ্যা ২ কোটি ৬৫ লক্ষ ছিল; কিন্তু ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে ইহার জনসংখ্যা ৩ কোটি ৪৫ লক্ষ হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে জার্ম্মাণের সংখ্যা সাড়ে সাত লক্ষ, রুসিয়ান ১৫ লক্ষ, এবং য়ুক্রেনিয়ান ৫০ লক্ষ। সম্প্রতি ৭০ লক্ষ পোল দেশান্তরে বাস করিতেছে, এবং তাহাদের অনেকেই মার্কিণ যুক্তরাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। আর যে অধিক সংখ্যক পোল বিদেশে আশ্রয় লাভ করিবে, তাহার সম্ভাবনা অল্প।

বস্তুতঃ, পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতার উপর য়ুরোপের শক্তির সমতা নির্ভর করিতেছে। হিটলার যদি তাহা নষ্ট করিবার সঙ্কল্প করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে তাঁহার পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতা ধ্বংস করা প্রয়োজন।

ইটালীতে নাজী-প্রভাব

জার্ম্মাণীর কর্ত্তৃপক্ষ ইটালীর পররাষ্ট্রসচিব কাউণ্ট গালিজো সিয়ানোকে জানাইয়াছেন—ইটালীতে জার্ম্মাণীর ও ইটালীর যে মিলিত ফৌজ বর্ত্তমান আছে, তাহাদিগকে পরিচালিত করিবার জন্য তাঁহারা কেবল যে প্রধান প্রধান সেনানায়ক ও সাধারণ সামরিক কর্ম্মচারী প্রভৃতি পাঠাইবেন একপ নহে, যুদ্ধের জন্য যে সকল সমরোপকরণের প্রয়োজন হইবে, তাহাও জার্ম্মাণ সরকার ইটালীতে প্রেরণ করিবেন। তাহা সংগ্রহের জন্য ইটালীর কর্ত্তৃপক্ষকে কষ্টভোগ করিতে হইবে না।

কাউণ্ট সিয়ানো

নাজীদলপতিরা ইটালীকে এ কথাও জানাইয়াছেন যে, ইটালীকে উভয় দেশের সৈন্যমণ্ডলীর জন্য খাদ্যসামগ্রী ও (তুলা, রেশম, চর্ম্ম প্রভৃতি) সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল সরবরাহ করিতে হইবে। জার্ম্মাণ সৈন্যরা তাহা ভক্ষণ ও ব্যবহার করিয়া উভয় দেশের স্বার্থ রক্ষা করিবে। কাউণ্ট সিয়ানোকে এ কথাও বলা হইয়াছে যে, ইটালী কৃষিপ্রধান দেশ, সুতরাং তাহার উৎপন্ন দ্রব্য সৈন্যগণের ভোগে লাগিবে, ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক; কিন্তু নাজীরা এই ভাবে ইটালীর ভাগ্যনিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা করায় ইটালীর রাজনীতিকগণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। জার্ম্মাণরা চতুর্দ্দিক্ হইতে ইটালীতে আসিয়া ইটালী গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে; কিন্তু পাছে বন্ধু হিটলার কিছু মনে করেন এবং বন্ধুত্ব কাঁচিয়া যায়, এই ভয়ে মুসোলিনী জার্ম্মাণীর এই প্রকার মোড়লীর প্রতিবাদ করিতে সাহস করিতেছেন না।

হিটলার তাঁহার বন্ধুকে প্রকারান্তরে বলিতেছেন, 'মোর বুদ্ধি তোর কড়ি, আয় দু'জনে ফলার করি।' কিন্তু কেবল বুদ্ধি নহে, বলও জার্ম্মাণীর; সুতরাং এই ফলারের পরিণাম কি, য়ুরোপের রাজনীতিকগণ তাহা এখনও ধারণা করিতে পারিতেছেন না। দেশে স্থানাভাব বশতঃ ইটালীয়ানগণ উপনিবেশে প্রেরিত হইতেছে, ইটালীয় সরকার তাহাদের সকল ব্যয়ভার বহন করিতেছেন; এবং জার্ম্মাণরা উড়িয়া আসিয়া তাহাদের পরিত্যক্ত স্থানগুলি জুড়িয়া বসিয়া ইটালীর প্রতি প্রেম প্রকাশ করিতেছে!

জার্ম্মাণী কি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত?

য়ুরোপে যুদ্ধের আশঙ্কা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে; সে জন্য লণ্ডনের ডাউনিং ষ্ট্রীটে দুশ্চিন্তার সীমা নাই। এডলফ্ হিট্লার বিনা-

হিট্লার

রক্তপাতে য়ুরোপের গণতন্ত্রাবলম্বী রাজ্যগুলিকে লাঞ্ছিত করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন।

হিটলারকে কেন্দ্র করিয়া যাঁহারা উপগ্রহের ন্যায় বিরাজ করিতেছেন, তাঁহারা সংবাদ প্রচার করিতেছেন যে, হিটলারের বিশ্বাস,

তিনি য়ুরোপকে যুদ্ধে বিব্রত না করিয়াও যুদ্ধজয়ের সাফল্য অর্জ্জন করিতে পারিবেন।

তিনি কিছু দিন পূর্ব্বে সুস্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন, "বৃটেনের সহিত যুদ্ধ এড়াইয়াও আমরা রীচ্‌কে নবভাবে গঠিত করিতে পারিব, আমি এখনও এরূপ আশা করিতেছি।"

হিটলারের এই উক্তি বার্লিন হইতে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী চেম্বারলেনের নিকট প্রেরিত হইলে লণ্ডনে ইহা সত্য বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে; জার্ম্মাণীর সেনাপতি জেনারেল ওয়াল্‌দার ভন রীসেনাউ (Walther von Reichenau) লণ্ডনেই ইহার সমর্থন করিয়াছেন।

ভন রীসেনাউ 'অলিম্পিক গেম কন্‌ফারেন্সে' যোগদানের জন্য এই সময় লণ্ডনে আসিয়াছিলেন, এবং সমর বিভাগের আফিসের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার সেই চেষ্টা সফল হয় নাই। তবে তিনি সমর বিভাগের কয়েক জন পদস্থ কর্ম্মচারীর সহিত বন্ধুভাবে যোগদান করিয়া তাঁহাদিগকে নিশ্চিন্ত করিবার জন্য বলিয়াছিলেন, "জার্ম্মাণী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয় নাই। এখন দুই বৎসরের মধ্যে আমরা যুদ্ধ করিতে পারিব না। যদি আমাদিগকে কোন প্রকার অসহ্য উত্তেজনার বশীভূত হইতে না হয়, তাহা হইলে সম্ভবতঃ আমরা সম্পূর্ণ ভাবেই যুদ্ধ এড়াইয়া চলিব।"

নেভিল চেম্বারলেন

সেনাপতি ভন রীসেনাউ এই সকল কথা বলিয়া লণ্ডনবাসিগণকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, এখন তাড়াতাড়ি যুদ্ধ বাধিবার কোন সম্ভাবনা নাই; এ অবস্থায় যুদ্ধের জন্য তাহাদের প্রস্তুত হইবার প্রয়োজন নাই।

কিন্তু লণ্ডনের সমর বিভাগের কর্ম্মচারিগণের ধারণা—যদি যুদ্ধ আরম্ভ হয়, তাহা হইলে ১লা আগষ্টের পূর্ব্বে তাহার সম্ভাবনা নাই; কিন্তু য়ুরোপের চতুর্দ্দিকে যে অশান্তির ঘনঘটা লক্ষিত হইতেছে, তাহার অবস্থা বিবেচনায় পররাষ্ট্র বিভাগের নেতৃবর্গের ধারণা হইয়াছে, ৩০এ আগষ্ট বা তাহার দুই এক দিন অগ্র-পশ্চাৎ যুদ্ধ আরম্ভ হইতে পারে।

জার্ম্মাণীর প্রধান লক্ষ্য ড্যানজিগ; কিন্তু হিটলার কোন্ দিন তাহা আক্রমণ করিবেন, তাহা ধারণাতীত। তবে ড্যানজিগ আক্রমণের উপর যুদ্ধারম্ভ নির্ভর করিতেছে, এ বিষয়ে সকলেই নিঃসন্দেহ; অথচ হিটলারের ভাবভঙ্গি দেখিয়া কিছুই বুঝিবার উপায় নাই।

রুসিয়ার নৌ-বলের অবস্থা

গত জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে রুসিয়ার বাল্‌টিক নৌ-বহর ফিনল্যাণ্ড উপসাগরে যে বার্ষিক রণাভিনয় প্রদর্শন করিয়াছে, তাহা গৌরবের পরিচায়ক নহে। দুর্জ্জয় শক্তির বিরাট স্তম্ভ মনে করিয়া ইংরেজ ও ফরাসী বর্ত্তমান সময়ে যে রুসিয়ার সহিত সন্ধি-বন্ধনে আবদ্ধ হইবার জন্য উৎসুক, এবং মহাপরাক্রান্ত হিটলারও যাহাকে মিত্ররূপে লাভ করিবার জন্য লালায়িত, বিশাল নৌ-শক্তির অধিকারী জাপান যাহার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী, সেই সোভিয়েট-সরকারের নৌ-বাহিনী জলযুদ্ধে য়ুরোপীয় কোন শক্তির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে অসমর্থ—এ কথা কি সহসা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয়?

কিন্তু প্রধান শক্তিসমূহের মধ্যে ষ্টেলিনের নৌ-শক্তি যে সর্ব্বাধিক দুর্ব্বল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই নৌ-শক্তির মেরুদণ্ড জারের আমলের তিনখানি জাহাজ; পরে তাহাদের সংস্কার সাধিত হইলেও ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে তাহারা স্প্যানীস্ উপকূলে বোম্বেটে-বিতাড়ন কার্য্যেরও অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। তবে সোভিয়েট-সরকারের সবমেরিণগুলির অবস্থা অপেক্ষাকৃত উন্নততর।

অনুসন্ধানের ফলে রুসিয়ার নৌশক্তির পরিমাণ জানিতে পারা গিয়াছে। জারের আমলের উক্ত তিনখানি যুদ্ধ-জাহাজ ব্যতীত তাহার ছয়খানি ক্রুজার আছে; চারিখানি নূতন, এবং দুইখানি সেকেলে (antiquated)। এতদ্ভিন্ন, ২০খানি আধুনিক ও ১৭ খানি মান্ধাতার আমলের ডেষ্ট্রয়ার আছে। তবে যে ১৭০খানি সবমেরিণ আছে, তাহাদের অধিকাংশই নূতন।

এডল্‌ফ হিটলারের ক্ষুদ্র নৌ-বাহিনী ইহাদের তুলনায় অনেক অধিক শক্তিশালী। সোভিয়েট জাহাজগুলি কিছু দিন পূর্ব্বে অ্যাল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জের (Aaland Isles) উপর দৃষ্টি রাখিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিল; কিন্তু ফিনগণের আশঙ্কা—হঠাৎ যুদ্ধ আরম্ভ হইলে জার্ম্মাণী এই সকল সোভিয়েট জাহাজ আক্রমণ করিয়া হস্তগত করিতে পারে।

বর্ত্তমান সোভিয়েট নৌ-সেনাপতি ৩৭ বৎসর বয়স্ক এডমিরাল নিকোলাই কুজনেজফ্‌ সম্প্রতি একখানি ডেষ্ট্রয়ারে আরোহণ করিয়া তাঁহাদের নৌ-বাহিনী পরিদর্শন উপলক্ষে ২৩ হাজার ২ শত ৫৬ টন ভারবাহী 'অক্টোবর রেভোলিউসন' নামক যুদ্ধ-জাহাজখানি পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি কি উদ্দেশ্যে উহা পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা জানিতে পারা যায় নাই।

গত দেড় বৎসরের মধ্যে পর পর পাঁচ জন নৌ-সেনাপতি সোভিয়েট নৌ-বাহিনীর ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কুজনেজফ্‌ পঞ্চম নৌ-সেনাপতি। দেড় বৎসরের মধ্যে পাঁচ জন নৌ-সেনাপতির পরিবর্ত্তন শুভ লক্ষণ নহে।

ছয় সপ্তাহ পূর্ব্বে ভূতপূর্ব্ব নৌ-সেনাপতি ফ্রিনোভস্কি পদচ্যুত হইলে কুজনেজফ্‌ এই পদ লাভ করেন। কুজনেজফ্‌ সুদক্ষ নাবিক; ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে তিনি নৌ-বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায়

উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তাহার পর কিছুকাল তাঁহাকে প্রশান্ত মহাসাগরীয় নৌ-বাহিনীর কর্তৃত্বভার প্রদত্ত হইয়াছিল।

গত জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে একটি সামরিক মিশন মার্কিণ যুক্তসাম্রাজ্য হইতে রুসিয়ায় প্রত্যাগমন করিয়াছে; নৌ-বাহিনীর ভাইস-কমিশার (Naval Vice-Commissar) এড্‌মিরাল ইসাকফ্‌ এই মিশনের পরিচালন-ভার লাভ করিয়াছিলেন।

এড্‌মিরাল ইসাকফ্‌ আট মাস আমেরিকায় অবস্থান করিয়া সোভিয়েট ডকগুলিকে কার্য্যোপযোগী করিবার জন্ম বিস্তর কল-কব্জার বরাত দিয়া আসিয়াছেন, এবং সোভিয়েট সরকার আশা করিতেছেন, তাঁহারা শীঘ্রই তাঁহাদের নৌ-বাহিনীকে শক্তিশালী করিতে সমর্থ হইবেন; কিন্তু শীঘ্র যুদ্ধ আরম্ভ হইলে তাঁহারা এই ক্রটি সংশোধনের সুযোগ পাইবেন কি না সন্দেহ!

হিটলারের নূতন সঙ্কল্প

ফুয়েরার হিটলার একটি নূতন সঙ্কল্প স্থির করিয়াছেন। য়ুরোপের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে বহু গবেষণার পর তিনি তাঁহার প্রধান উপদেষ্টৃগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—গত সেপ্টেম্বর মাসে তিনি য়ুরোপে সমরানল প্রজ্বলিত করিতে উদ্যত হইলে তাঁহারা তাঁহাকে তাহাতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া অত্যন্ত নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়াছিলেন; কারণ, বৃটেনের তখন অত্যন্ত বিশৃঙ্খল অবস্থা, তাহার সেই অবস্থায় জার্ম্মাণীর বোমাবর্ষী এরোপ্লেন সমূহ এক রাত্রিতেই লণ্ডনের বন্দর, পোর্টস্‌মাউথ, ও অন্যান্য প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ধ্বংস করিয়া আসিতে পারিত।

ফ্রান্সও সেই সময় আত্মরক্ষা বিষয়ে পশ্চাৎপদ ছিল, শত্রুপক্ষের বিমান-ধ্বংসের আয়োজন শেষ করিতে পারে নাই। কিন্তু বর্ত্তমানে অবস্থা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, বিশেষতঃ, বৃটেনের শত্রুপক্ষকে বাধাদানের শক্তি ভীষণভাবে বর্দ্ধিত হইয়াছে।

হিটলার বলিয়াছেন, এই সকল কারণে তাঁহাকে নূতন কার্য্যধারার অনুসরণ করিতে হইয়াছে। তাঁহার প্যারিসস্থিত এজেণ্টগণ সংবাদ দিয়াছেন, প্রধান মন্ত্রী এডুয়ার্ড ডালাডিয়ারের বর্ত্তমান অবস্থা আদৌ নিরাপদ নহে; অবিলম্বে যুদ্ধ আরম্ভ হইতে পারে, এই ভয়ে তিনি চাকুরী বজায় রাখিয়াছেন, সুতরাং ফ্রান্সের বর্ত্তমান রাজনীতিক অবস্থা এরূপ শোচনীয় যে, তাহা চিন্তার অতীত।

হিটলার স্থির করিয়াছেন—কয়েক মাস অথবা আরও দীর্ঘকাল তিনি নিশ্চেষ্ট থাকিবেন, এবং ফ্রান্সে পুনর্ব্বার ঘরোয়া বিবাদ আরম্ভের প্রতীক্ষা করিবেন। তিনি আশা করেন—এই সময়ের মধ্যে তিনি লণ্ডন ও প্যারিস, এবং লণ্ডন ও ওয়ারসর মধ্যে ঔদাসীন্য সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইবেন।

গত ১৮ই জুন জার্ম্মাণীর প্রোপাগাণ্ডা-সচিব যোসেফ গোয়েবলস্‌ ড্যানজিগে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহার স্বর বিলক্ষণ নরম ছিল। সেই বক্তৃতায় হিটলারের সঙ্কল্প পরিবর্ত্তনের আভাস ছিল। গোয়েবলস্‌ ড্যানজিগবাসিগণকে 'ফুয়ারের' প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া ধৈর্য্যের সহিত প্রতীক্ষা করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। তাঁহার এই বক্তৃতায় ড্যানজিগবাসী নাজীগণের প্রচণ্ড উৎসাহ শিথিল হইয়া গিয়াছে।

এ অবস্থায় হিটলার যে, যে-কোন মুহূর্ত্তে ড্যানজিগ আক্রমণের আদেশ দান করিবেন, এ ধারণা ড্যানজিগবাসিগণের মনে স্থান পাইতেছে না; আর কত দিন তাহাদিগকে ধৈর্য্যের সহিত প্রতীক্ষা করিতে হইবে—তাহারও নিশ্চয়তা নাই। সুতরাং ড্যানজিগ আক্রমণে যদি বিলম্ব থাকে, এবং হিটলার ড্যানজিগ গ্রাসের জন্য অন্য পন্থা অবলম্বন করেন, তাহা হইলে অবিলম্বে যুদ্ধ আরম্ভ হইবে, এরূপ অনুমানের কারণ নাই।

ও-দিকে গণতান্ত্রিক রাজ্যসমূহের নেতৃবর্গ হিটলারের সঙ্কল্প ব্যর্থ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। ফরাসী প্রধান মন্ত্রী ডালাডিয়ার শান্তিসচিব নেভিল চেম্বারলেনের সহিত পরামর্শ করিয়া আলজিরিয়া হইতে জার্ম্মাণীতে লৌহ রপ্তানীর পরিমাণ হ্রাস করিবার আদেশ প্রদান করিয়াছেন।

ডালাডিয়ার

ফরাসী অধিকৃত উত্তর আফ্রিকায় বিপুল পরিমাণে লৌহ সঞ্চিত আছে, এবং তাহা অতি সহজেই সংগৃহীত হইয়া থাকে। আলজিরিয়ায় যে সকল বৃহৎ লৌহখনি আছে, তাহাদের মধ্যে কুয়েনজা খনিই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ; এই খনি ভূমধ্যসাগরের উপকূলের অদূরে অবস্থিত। এই খনি হইতে জার্ম্মাণরা প্রতি বৎসর প্রায় দশ লক্ষ টন খনিজ লৌহ সংগ্রহ করিতেছিল; কিন্তু ডালাডিয়ার সংপ্রতি এই মর্ম্মে আদেশ প্রদান করিয়াছেন যে, জার্ম্মাণীতে উহার রপ্তানীর পরিমাণ শতকরা ৭৫ ভাগ হ্রাস করিতে হইবে।

আলজিরিয়া হইতে জার্ম্মাণীতে লৌহের রপ্তানীর পরিমাণ এই ভাবে হ্রাস করায় জার্ম্মাণীর যুদ্ধাস্ত্র-নির্ম্মাণে প্রচণ্ড বাধা উপস্থিত হইবে; কারণ আলজিরিয়ার খনিজাত লৌহ অতিশয় উৎকৃষ্ট বলিয়া জার্ম্মাণী এত দিন এই লৌহেই যুদ্ধাস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া আসিয়াছে! যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে যুদ্ধাস্ত্র নির্ম্মাণে এই প্রকার বাধা উপস্থিত হওয়ায় হিটলারকে উৎকণ্ঠিত হইতে হইয়াছে।

বিবস্ত্রা নারী-প্রদর্শনী

য়ুরোপ ও আমেরিকা সভ্য মহাদেশ, সুতরাং ধর্ম্মপ্রাণ ভারতের অশিক্ষিত জনসাধারণ যাহা কল্পনা করিতেও লজ্জা বোধ করে, য়ুরোপ ও আমেরিকায় তাহা গৌরবের বিষয়! আমাদের স্মরণ আছে—বহুদিন পূর্ব্বে আফগানিস্তানের এক যুবরাজ ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন; তিনি যখন লণ্ডনে কোন সম্ভ্রান্ত ইংরেজ রাজপুরুষের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই সময় একদিন রাত্রিকালে লণ্ডনস্থ অভিজাতবর্গের নাচের মজলিসে তাঁহার নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। তিনি দেখিলেন, যুবকগণ যুবতীদিগকে

ভুজবন্ধনে আবদ্ধ করিয়া উদ্দাম নৃত্য আরম্ভ করিয়াছে। এই দৃশ্যে তিনি মর্ম্মাহত হইয়া নাচের মজলিস ত্যাগ করিয়াছিলেন। লণ্ডনের দৈনিক সংবাদপত্র সমূহে তাঁহার রুচির নিন্দা করিয়া কঠোর মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল! কিন্তু সত্যই কি তাঁহার শিষ্টাচারের আদর্শ নিন্দনীয়?

অনেকেই জানেন, সংপ্রতি মার্কিণ যুক্তরাজ্যের নিউ-ইয়র্ক নগরে যে বিশ্ব-প্রদর্শনী (World fair) আরম্ভ হইয়াছে, এ-কালে তাহা অতুলনীয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই প্রদর্শনীর জন্য মার্কিণের তিন কোটি পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছে। প্রদর্শনীর এক স্থানে বিবস্ত্রা নারীগণকে প্রদর্শন করা হইতেছে। এই সকল নারীকে দেখাইবার জন্য যে টিকিট হইয়াছে, তাহার নিম্নতম মূল্য এক শিলিং। এ পর্য্যন্ত ৯০ হাজার লোক টিকিট কিনিয়া এই সকল বিবস্ত্রা নারীর উলঙ্গিনী মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া ধন্য হইয়াছে। এই সকল দর্শকের অধিকাংশই পুরুষ। এই সকল বিবস্ত্রা নারীর নাম দেওয়া হইয়াছে '১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের উলঙ্গিনী কুমারী।' ইহারা সকলেই পরমা সুন্দরী তরুণী।

রাণী এলিজাবেথের কাউন্টি সেরিফ মরিস্ এ ফিজ্ জেরাল্ড যে সময় এই বিবস্ত্রা কুমারীগণকে প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে দেখিতে গিয়াছিলেন, সে সময় তিন শত দর্শক নির্ব্বাক বিস্ময়ে তাহাদিগকে সন্দর্শন করিতেছিল। সেরিফ এই দৃশ্য দেখিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, "কি অশ্লীল!" তাঁহার এই মন্তব্যে কোন কোন তরুণী লজ্জাবনতমুখী হইয়া স্বল্পবাসে তাহাদের দেহ-শোভা আচ্ছাদিত করিয়াছিল। কিন্তু সেরিফের রুচির নিন্দা করা হইয়াছিল কি না, তাহা প্রকাশিত হয় নাই। ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথ সম্ভবতঃ প্রদর্শনীর এই অংশ দেখেন নাই।

টিয়েনসিনে ইংরেজের লাঞ্ছনা

জাপানের কর্ত্তৃত্বাধীন আত্মমর্য্যাদাহীন চীনসরকারের শুল্কবিভাগের কোন কর্ম্মচারী কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে নিহত হওয়ায় জাপানীরা ইংরেজের আশ্রিত চারি জন চীনাম্যানকে হত্যাকারী সন্দেহে তাহাদিগকে চীন-সরকারের হস্তে অর্পণ করিতে আদেশ করে, কিন্তু স্থানীয় ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদের এই দাবী অগ্রাহ্য করায় উত্তরচীনস্থ জাপানী সৈন্যরা বৃটিশ ও ফরাসী অধিকারগুলি অবরুদ্ধ করিয়া সেই সকল স্থানের অধিবাসিগণকে অনাহারে শুকাইয়া মারিবার চেষ্টা করিতেছে! এবং যে টিয়েনসিন গত ১৯০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ইংরেজের অধিকৃত, সেই স্থানেই জাপানীরা সর্ব্বপ্রথমে এই প্রকার দুর্ব্ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছে। এই অবরুদ্ধ স্থানে প্রবেশের জন্য যে সকল পথ ও সাঁকো আছে, সৈন্যরা সেই স্থানে পাহারা দিয়াছে; যাহারা ইংরেজ ও ফরাসীর অধিকার-সীমায় প্রবেশ করিতেছিল, তাহাদিগকে আটক করিয়া খানাতল্লাস করিয়াছে; গাড়ীগুলিও পরীক্ষার জন্য আটক করা হইয়াছে।

এই বৃটিশ অধিকারে ৪ হাজার বৈদেশিক, ৪২ হাজার চীনাম্যান্, এবং মেসিন গান সহ একদল পদাতিক সৈন্য বাস করিতেছে। এই বিরোধে ফরাসীদের সংস্রব না থাকিলেও উভয় সীমার কোন পার্থক্য না থাকায় ফরাসীগণকেও সঙ্কটে পড়িতে হইয়াছিল।

বৃটিশপক্ষ হইতে প্রস্তাব করা হয়—একজন বৃটিশ, এক জাপানী ও একজন আমেরিকান দ্বারা উক্ত চারি জন আসামী বিচার করা হউক, কিন্তু জাপানীরা এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছে।

জাপানীরা দিন দিন ইংরেজের প্রতি অধিক অত্যাচার করিতেছে; এবং অপমানও অধিকতর তীব্র (insult more pointed) হইতেছে। জাপানীরা জার্ম্মাণ ও ইটালীয়ানগণকে ছাড়িয়া দিয়া ইংরেজগণের পরিচ্ছদাদি খানাতল্লাস করিতেছে। একজন ইংরেজের নিকট চাইনিজ ব্যাঙ্কনোট ছিল এই সন্দেহে—তাহার জুতা মোজা খুলিয়া তাহার দেহ খানাতল্লাস করা হয়। মিউনিসিপালিটীর ভূতপূর্ব্ব চেয়ারম্যান মিঃ ই, সি, পিটারকে কুলীদের সঙ্গে দাঁড় করাইয়া তাঁহার পরিচ্ছদ খানাতল্লাস হইয়াছিল। আর একটি ইংরেজ যুবতীকে আক্রমণ করিয়া এরূপ কদর্য্য ভাষায় গালাগালি দেওয়া হয় যে, যুবতী মর্ম্মাহত হইয়া মাটিতে পড়িয়া যায়; কয়েক জন জার্ম্মাণ তাহাকে তুলিয়া লইয়া ইংরেজ-সীমায় রাখিয়া আসে।

জাপানীরা খাদ্যদ্রব্যপূর্ণ গাড়ী আটক করিবে না বলিয়াছিল; কিন্তু চীনা খাদ্যদ্রব্যবিক্রেতারা অত্যাচারের ভয়ে ইংরেজের সীমা-মধ্যে প্রবেশ করিতে সাহস না করায় খাদ্যদ্রব্য দুর্ম্মূল্য হইয়াছে।

দুই জন চীনাম্যান বেড়ার বাহিরে দাঁড়াইয়া খাদ্যদ্রব্যপূর্ণ ঝুড়ি ইংরেজদের দিতেছিল দেখিয়া জাপানী শান্ত্রীরা তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে গুলী করিয়া হত্যা করিয়াছিল। ইংরেজ পরিবার-বর্গের দুর্দ্দশার সীমা ছিল না, তাহারা যৎসামান্য রুটি ও নোনা হেরিং মাছ ভিন্ন অন্য কিছুই খাইতে পান নাই।

জাপানের বৃটিশ-বিরোধী কর্ম্মপন্থা

বৃটিশ নৌ-বহরের এড্‌মিরাল সার রোজার কিয়েস্ সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন, "জার্ম্মাণী ও ইটালীর সাহায্য লাভ করিয়া জাপানীরা টিয়েন্‌সিনে যেরূপ ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছে, তাহা প্রকৃতই বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণার সহিত তুলনীয়।" কিন্তু বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষের ধারণা এইরূপ যে, ঐ সকল ব্যাপারে যুদ্ধারম্ভের সম্ভাবনা নাই। বস্তুতঃ, এক পক্ষ যদি নীরবে অন্য পক্ষের সকল দুর্ব্ব্যবহার সহ্য করে, তাহা হইলে বিরোধের কোন সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু বে-সরকারী ভাবে ইহা স্বীকার করা হইয়াছে যে, য়ুরোপের বর্ত্তমান সঙ্কটজনক অবস্থায় প্রাচ্য মহাদেশে বৃটেন জাপানের দুর্ব্ব্যবহারের জন্য সরাসরিভাবে কোন সামরিক প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতে পারিতেছে না; সুতরাং চীনদেশে জাপানীদের কার্য্যে বৃটিশ সম্ভ্রম পুনর্ব্বার ক্ষুণ্ণ হইতেছে।

জাপানীরা চীনদেশে তাহাদের কার্য্যে বৃটিশ সহযোগিতার দাবী করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহারা জানে, কার্য্যতঃ ইহা ঘটিয়া উঠিবে না। এই জন্য তাহারা চীনদেশ হইতে বৃটেনকে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত করিবার ইহা একটা উপলক্ষ বলিয়া ধারণা করিয়াছে। তাহারা আশা করিতেছে—অতি ধীরে তাহাদের এই চেষ্টা সফল হইবে, এবং এজন্য ধৈর্য্যধারণের প্রয়োজন; কিন্তু তাহারা জানে, তাহাদের ধৈর্য্যের অভাব নাই। কিন্তু বৃটিশসিংহ কত-দিন ধৈর্য্য ধারণ করিয়া জাপানীদের ধৃষ্টতা সহ্য করিবে, সিংহের গর্জ্জন ও লাঙ্গুল আস্ফালন দেখিয়া তাহা অনুমান করা অসাধ্য।

মুসোলিনীর কন্যা কি বিতাড়িতা ?

সিনর মুসোলিনীর কন্যা এবং ইটালীর পররাষ্ট্র-সচিব কাউণ্ট সিয়ানোর পত্নী কাউণ্টেস্ এডা সিয়ানো কিছু দিন পূর্ব্বে দক্ষিণ আমেরিকায়

কাউণ্টেস এডা

যাত্রা করিয়াছেন। সাধারণের বিশ্বাস ছিল, দেশভ্রমণই তাঁহার উদ্দেশ্য; কিন্তু এতদিন পরে কাউণ্টেস্ সিয়ানোর স্বদেশ-ত্যাগের প্রকৃত

ইটালীর যুবরাজ অম্বার্টো

উদ্দেশ্য জানিতে পারা গিয়াছে। রোমের পদস্থ কর্ম্মচারিগণ জানিতে পারিয়াছেন, কাউণ্টেস্ এডা স্বেচ্ছায় দক্ষিণ আমেরিকায় যাত্রা করেন নাই; ইটালীর বর্ত্তমান যুবরাজ অম্বার্টোর সহিত বিরোধের জন্যই তাঁহাকে অনির্দ্দিষ্ট কাল নির্ব্বাসনদণ্ড গ্রহণ করিতে হইয়াছে।

যুবরাজ অম্বার্টো সরকারী ভাবে মুসোলিনীকে জানাইয়াছিলেন, তাঁহার কন্যা এডাকে রোম হইতে এরূপ কোন স্থানে প্রেরণ করিতে হইবে, যে স্থানে গমন করিয়া তিনি কোন প্রকার ষড়যন্ত্র করিতে না পারেন। যদি মুসোলিনী তাঁহার কন্যাকে এইভাবে স্বদেশ হইতে বহিষ্কৃতা না করেন, তাহা হইলে যুবরাজ পত্নীসহ বেল্‌জিয়মে গমন করিয়া সেই দেশেই আশ্রয় গ্রহণ করিবেন, এবং স্বদেশ-প্রত্যাগমনের কথা তিনি বিস্মৃত হইবেন।

রাজ-পরিবারের সহিত রাজ্যের উচ্চপদস্থ অমাত্যের পরিবারের এই বিরোধের ফল অপ্রীতিকর হইতে পারে, এবং রাজ্য মধ্যে তাহা

মুসোলিনী

আন্দোলন আলোচনার সৃষ্টি করিবে, এই আশঙ্কায় মুসোলিনী তাঁহার আদরিনী কন্যাকে দক্ষিণ আমেরিকায় প্রেরণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন, এবং তাঁহারই আদেশে এডাকে স্বদেশ ত্যাগ করিতে হইয়াছে। এডাকে অন্য কোন দেশে না পাঠাইয়া দক্ষিণ আমেরিকায় প্রেরণের প্রধান কারণ, সেই স্থানে ইটালীর প্রভাব প্রতিপত্তি ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে, এবং জার্ম্মাণীর প্রভাব বর্দ্ধিত হইতেছে। এডা ব্যক্তিগত প্রভাব প্রতিপত্তি দ্বারা সে দেশে ইটালীর গৌরব পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া বিপুল সম্মানের অধিকারিণী হইবেন, এবং কি কারণে তিনি নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন, তাঁহার স্বদেশবাসীরা তাহা বিস্মৃত হইবে। কিন্তু যুবরাজ অম্বার্টো কিরূপে বুঝিতে পারিবেন, এডা দক্ষিণ আমেরিকায় অবস্থানকালে তাঁহার চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইবার অভ্যাস ত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করিবেন ?

চীনদেশে ইংরেজের সঙ্কট

সার আর্কিবোল্ড কার চীন দেশের বৃটিশ-দূত। গত এপ্রিল মাসে তিনি চীন গণতন্ত্রের অধিনায়ক চিয়াং কাইসেকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। এজন্ত তাঁহাকে ফরাসী ইণ্ডো-চায়না হইতে চীনের নূতন খিড়কীর পথে চুংকিং-এ গমন করিতে হইয়াছিল। চিয়াং কাইসেককে নৈতিক সাহায্য দানে উৎসাহিত করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল।

জাপানী সংবাদ-পত্রসমূহ প্রচার করিয়াছিল, সার আর্কিবোল্ড সেনাপতি চিয়াং কাইসেক ও তাঁহার পত্নীর জীবনরক্ষার জন্য এই পথে তাঁহাদের সঙ্গী হইয়াছিলেন।

সার আর্কিবোল্ডের চুংকিং-এ অবস্থানকালে জাপানী এরোপ্লেন হইতে স্থানীয় বৃটিশ কন্সল-ভবনে বোমা বর্ষিত হইয়াছিল কিন্তু

সার হারবার্ট ফিলিপস

তিনি অক্ষত দেহে কন্সল-ভবন ত্যাগ করিয়া সমুদ্রকূলে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

এক সপ্তাহ পরে সার আর্কিবোল্ড সাংহাইএর আন্তর্জ্জাতিক উপনিবেশে উপস্থিত হইয়া যে সময় জার্ডিন মেথিসনের ভবনে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় চীন দেশের পুলিশ ও ভিন্ন দেশীয় ডিটেক্‌টিভগণ তাঁহার আফিস-কক্ষের বাহিরে পাহারায় ছিল। জাপানীরা তাঁহার সম্বন্ধে বিরুদ্ধ-মনোভাব পোষণ করায় কয়েকখানি পত্র তাঁহাকে ভয় প্রদর্শন করিয়াছিল। তাঁহার প্রাণহানির আশঙ্কায় স্থানীয় পুলিশ তাঁহাকে গুলীতে অভেদ্য অঙ্গাবরণ পরিতে অনুরোধ করিয়াছিল। কিন্তু তিনি এই প্রস্তাবে সম্মত না হওয়ায় তাঁহার মোটরকারের জানালায় গুলীনিরোধক কাচ লাগান হইয়াছিল। সাংঘাইএর পথে ভ্রমণের সময় মোটর-কার ও মোটর-সাইকেল তাঁহার গাড়ীর অনুসরণ করিয়া পাহারা দিত।

সাংঘাইএ বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন দিন দিন প্রবল হইয়া উঠিতেছে। ইহার ফলে আর এম, টিঙ্কলার নামক একজন ইংরেজকে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে হইয়াছে। মিঃ টিঙ্কলার লং-চং মিলের কর্ম্মচারী ছিলেন। এই মিলটি ইংরেজের সম্পত্তি।

কতকগুলা ভাড়াটে আন্দোলনকারী লাঠা-সোটা লইয়া উক্ত মিলের একজন চীনা-সর্দ্দারকে আক্রমণ করিয়াছিল। মিঃ টিঙ্কলার তাহাদের কবল হইতে সর্দ্দারকে উদ্ধারের চেষ্টা করেন; শান্তি ভঙ্গের আশঙ্কায় একদল জাপানী সৈন্য আসিলে উভয় পক্ষে দাঙ্গা বাধিয়া উঠে। সেই সময় টিঙ্কলারকে ছুরিকা দ্বারা সাংঘাতিক ভাবে আহত করিয়া গ্রেপ্তার করা হয়।

একজন ইংরেজ কর্ম্মচারীর প্রতি এই প্রকার আচরণের প্রতিবাদের জন্য বৃটিশ কন্সল জেনারেল সার হারবার্ট ফিলিপ্‌স জাপানী কন্সল-জেনারেলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সাংঘাইএ বৃটিশ-বিরোধী আন্দোলন রহিত করিবার দাবী করেন। এদিকে আহত টিঙ্কলার জেনারেল হাসপাতালে অস্ত্রোপচারের টেবলেই মারা যান।

তাঁহার মৃত্যুর পর জাপানী কন্সল জেনারেল, সার হারবার্ট ফিলিপ্‌সের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে বলেন, বৃটিশের ঔদ্ধত্যই টিঙ্কলারের মৃত্যুর জন্য দায়ী।

টিঙ্কলারের সমাধির উপর লিখিত হইয়াছে, "বর্ত্তমানে বাহুবলেরই প্রাধান্য।"

কিন্তু বাহুবলের প্রাধান্য কি কেবল চীন দেশেই প্রবর্ত্তিত?

গত জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের এক সন্ধ্যায় উত্তর চীনের রাজধানী নান্‌কিং নগরের জাপানী কন্সল-ভবনে ২০ জন পদস্থ রাজকর্ম্মচারী ভোজনে বসিয়াছিলেন। জাপান-পরিচালিত সরকারের এই সকল কর্ম্মচারীর মধ্যে নানকিং-এর মেয়র, শিক্ষা ও বিচার বিভাগের মন্ত্রী, আইন সভার সভাপতি প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ইহারা ভোজসভায় মদ্যপান করিবার অব্যবহিত পরেই সেই কক্ষের মেঝের উপর পড়িয়া যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন।

ডাক্তারগণ কন্সল-ভবনে আসিয়া বমনকারক ঔষধ প্রয়োগে তাঁহাদের উদরস্থ বিষ বমন করাইয়া তাঁহাদের প্রাণরক্ষা করেন।

মদ্যে বিষ মিশাইবার অভিযোগে একজন চীনাম্যানকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

চীনারা এখন নানাভাবে জাপানীদিগকে বিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু প্রবাসী ইংরেজগণের সঙ্কটত্রাণের কোন লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না।

এ-ভাবে বসিয়া দুই হাত পূর্ব্ববৎ প্রসারিত রাখিয়া অপর পা এধারে-ওধারে ঘুরান্। এক মিনিটকাল এ ভাবে থাকিয়া অপর পা লইয়া এই প্রণালীর পুনরাবৃত্তি করিবেন। এ ব্যায়াম করা চাই পাঁচ বার।

এ-কয়টি ব্যায়ামে মেদ ঝরিয়া স্থূলত্ব ঘুচিয়া দেহ বেশ সুঠাম-সুললিত ছাঁদে গড়িয়া উঠিবে।

রূপচর্য্যা

রুজ, স্নো, পাউডারে রূপ-লাবণ্য রক্ষা করা যায় না। রূপ-লাবণ্যের মূল উৎস দেহ-মনের স্বাচ্ছন্দ্য। যদি দেহ সুস্থ এবং মন স্বচ্ছন্দ থাকে, তাহা হইলে রঙ কালো হইলেও দেহে লাবণ্য-শ্রীর অভাব ঘটিবে না। স্নিগ্ধ মনোরম কান্তির গুণে যে-কোনো রঙের নারীকেও লোকে শ্রীমতী বলিবে।

মনের স্বাস্থ্য বা স্বাচ্ছন্দ্য রক্ষা করিতে গেলে ক্রোধ, লোভ, অহঙ্কার এবং হিংসা—এ ক'টা রিপুকে বশে রাখিতে হইবে; মনের উপর আধিপত্য করিতে দিলে চলিবে না। মনে যদি সারাক্ষণ গুমট লাগিয়া থাকে, তাহা হইলে গোলাপের মতো গায়ের বর্ণও দু'দিনে কালি হইয়া যায়; নিটোল দেহ ছন্দভঙ্গ হয়।

দেহের স্বাস্থ্য ভালো রাখিতে হইলে আহারে ও আচারে বিধি নিয়ম মানিয়া চলিতে হইবে। যা-খুশী খাদ্য গ্রহণ করা দোষের। পুষ্টির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া খাদ্য এবং পানীয় গ্রহণ করিতে হইবে।

তরী-তরকারী, শাক-শব্জী এবং টাটকা তাজা ফল নিত্য খাওয়া চাই। মশলাদার তরী-তরকারী স্বাস্থ্য-হানির মূল। আমাদের দেশে সিদ্ধ তরী-তরকারী খাওয়ার রীতি নাই। সে-তরকারী মুখে রুচিবে না। রুচিলে ছিল ভালো! না রুচিলেও কোনো মতে রুচি-রক্ষার জন্য সামান্য মশলা দিবেন। মাখন, দুধ, মাছ ও ডিম—খাদ্য-হিসাবে ভালো। লুচি বর্জ্জন করিয়া চলিবেন—বিশেষ করিয়া ময়দার লুচি। আটার রুটী স্বাস্থ্য-রক্ষার পক্ষে বিশেষ অনুকূল। রুটি খাইতে যদি কষ্ট হয়, আটার লুচি খাইবেন।

যে-খাদ্যই খান, সর্ব্বাংশে তাহা হজম হওয়া চাই। হজমের প্রধান বিঘ্ন—যখন-তখন যে-দিন-যেমন-খুশী খাওয়া অর্থাৎ খাওয়ার অনিয়ম; তাড়াতাড়ি খাওয়া —যেন পাপ চুকাইতেছেন; মশলাদার তরী-তরকারী; অতি-ভোজন; অতিরিক্ত চা বা কফি-পান; ক্লান্তি এবং মানসিক অবসাদ ও গ্লানি। যে-সব লোকের সঙ্গ-সাহচর্য্য বিরক্তিকর মনে হয়, এমন লোকের সঙ্গে কিম্বা একেবারে অজানা লোকজনের সঙ্গে ভোজন করিবেন না, "বিঘ্ন" হইবে—হজমে গোলযোগ ঘটিবে।

খাওয়ার সময় খুশী-মনে গল্প-স্বল্প করিয়া খাওয়া উচিত। তাহাতে হজমের সুবিধা হয়। রাত্রে কখনো পেট ঠাসিয়া ভোজন করিতে নাই। খাইবার সময় মনের কোণে এতটুকু রাগ পুষিয়া রাখিবেন না। মিষ্টান্ন যত কম খান, মঙ্গল।

এ-বিধি মানিয়া চলিলে খাদ্য-পরিপাকে ব্যাঘাত ঘটিবে না। পরিপাক যদি সহজ-সরল হয়, তাহা হইলে যৌবন ও রূপ-লাবণ্য রক্ষার জন্য মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই! স্নো-রুজ-পাউডারে রূপ-লাবণ্য বাড়ে না। স্বাস্থ্য ভালো না থাকিলে স্নো-রুজ-পাউডারে মুখের যা চেহারা হয়…

সে-কথা নাই বলিলাম! আয়না কখনো মিথ্যা বা চাটু-বাক্য বলিবে না। আয়নাকে জিজ্ঞাসা করিবেন—আয়না বলিয়া দিবে, মুখের সে-চেহারা কেমন!

আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি

তিয়ানসীন্—

গত জুন মাসের মধ্যভাগে অকস্মাৎ সমগ্র বিশ্বের বিষয় দৃষ্টি উত্তর-চীনের তিয়ান্সীন বন্দরে নিবদ্ধ হইয়াছিল। এই সময় ঐ বন্দরের বৃটিশ অধিকৃত অঞ্চলের কর্ত্তৃপক্ষের সহিত জাপানী কর্ত্তৃপক্ষের মনোমালিন্য অকস্মাৎ চরমে পৌছায়। সঙ্গে সঙ্গে জাপানী সৈন্য বৃটিশ অঞ্চল অবরোধ করে, ঐ অঞ্চলের বেষ্টনী-তারে বিদ্যুৎপ্রবাহ সঞ্চালিত হয়, অঞ্চলবাসীর খাদ্য-সামগ্রীর সরবরাহ বন্ধ হয়, ঐ অঞ্চলে প্রবেশ ও বহির্গমনের সময় অত্যন্ত অপমানকরভাবে বৃটিশদিগের দেহ তল্লাস হইতে থাকে। মদমত্ত বৃটিশসিংহের লাঙ্গুল এইরূপ শোচনীয়ভাবে আকর্ষণ করা হইতেছে দেখিয়া কেহ ব্যথিত হয়, কেহ শুষ্ক সহানুভূতি প্রকাশ করে, কেহ বা কৌতুক বোধ করে। এক পক্ষ কাল বাদ-প্রতিবাদ, আবেদন-নিবেদন, কোন কিছুতেই জাপান কর্ণপাত করে নাই। বৃটিশ জনমত ক্ষুব্ধ হইল, বৃটিশ পার্লামেণ্টে বীরপুরুষগণ নিষ্ফল ক্রোধে দন্তে দন্ত পেষণ করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ চেম্বারলেন ও লর্ড হ্যালিফ্যাক্স পুনঃ পুনঃ আশ্বাস প্রদান করিয়া সকলকে শান্ত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। অবশেষে বৃটিশ মর্য্যাদা রক্ষা পাইয়াছে—জাপান গভর্ণমেণ্ট তিয়ান্সীন্ সম্পর্কে বৃটিশ প্রতিনিধির সহিত আলোচনা করিতে সম্মত হইয়াছেন।

তিয়ানসীন

তিয়ান্সীনের ঘটনাটি সংক্ষেপে এইরূপ—গত এপ্রিল মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে জাপানের অধিকৃত চীনা অঞ্চলের শুল্ক-বিভাগের নব নিযুক্ত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ডাঃ চেং অজ্ঞাত ব্যক্তির হস্তে নিহত হন। বৃটিশ এবং জাপানী কর্ত্তৃপক্ষ একযোগে এই বিষয়ে তদন্ত করিয়া কয়েক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেন। জাপানী কর্ত্তৃপক্ষ বলেন, ধৃত ব্যক্তিগণের মধ্যে চারি জন ডাঃ চেং এবং আরও তিন জন জাপানীর হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত ছিল। এই চারি জন চীনা জাপানী কর্ত্তৃপক্ষের অমানুষিক প্রহারের ফলে স্বীকারোক্তিও করিয়াছিল। গত জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে তিয়ান্সীনের বৃটিশ অধিকৃত অঞ্চলের (কন্সেশন্) কর্ত্তৃপক্ষ স্থানীয় অধিবাসীদিগকে এক ঘোষণায় জানান, বৃটিশ কন্সেশনের নিরপেক্ষতা যদি কেহ ভঙ্গ করে, তাহা হইলে তাহাকে জাপানী কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে অর্পণ করা হইবে। এইরূপ ঘোষণা করিলেও বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ ডাঃ চেংএর আততায়ী সন্দেহে ধৃত চীনাদিগকে জাপানী কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে অর্পণ করিতে অস্বীকার করেন। বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষের বক্তব্য এই—জাপানী কর্ত্তৃপক্ষের প্রহারের ফলে ধৃত ব্যক্তিগণের স্বীকারোক্তি ব্যতীত তাহাদিগের বিরুদ্ধে কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নাই; বস্তুতঃ তাহারা পূর্ব্বের স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করিয়াছে। তিয়ান্সীনের বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষের
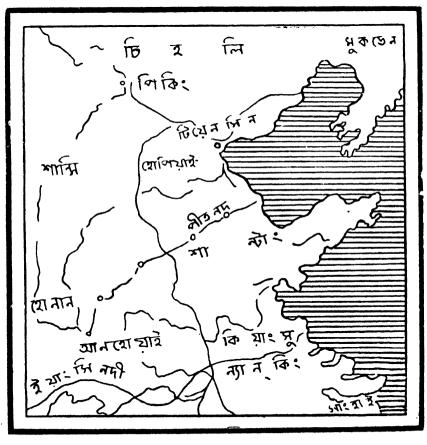
এই "ঔদ্ধত্য" জাপানের অসহ্য বোধ হয়; সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশ কনসেশন্ অবরুদ্ধ হয়।

তিয়ানসীনে হাই নদীর তীরে বৃটিশ ও ফরাসী কন্‌সেশন পরস্পরের সহিত সংলগ্ন। কাজেই, "অপরাধ" বৃটিশ কর্তৃপক্ষের হইলেও বৃটিশ ও ফরাসী উভয় কন্‌সেশনই অবরুদ্ধ হইয়াছিল। ঐ অঞ্চলে প্রবেশের দুইটি মাত্র পথ ব্যতীত অন্য সমস্ত পথ বন্ধ হইয়াছিল। হাই নদীতে সামরিক আইন প্রবর্ত্তিত হইয়া, উন্মুক্ত পথের দিকে সতর্ক দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। শেষ মুহূর্ত্তে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট আপোষ মীমাংসার জন্য প্রস্তাব করিয়াছিলেন। এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া জাপান সরকার বলিয়াছিলেন, পূর্ব্ব-এশিয়া সম্পর্কিত নূতন ব্যবস্থায় বৃটেন্ জাপানের সহিত সহযোগিতা করিতে সম্মত না থাকিলে অবরোধ উন্মুক্ত হইবে না।

লর্ড হ্যালিফ্যাক্স

তিয়ানসীনের কন্সাল জেনারেল মিঃ জেমিসন

ডাঃ চেংএর আততায়ীর গ্রেপ্তার সম্পর্কে বৃটেন্ ও জাপানের বিরোধ তিয়ান্‌সীন্ অবরোধের আশু কারণ হইলেও উহাই প্রকৃত ও একমাত্র কারণ নহে। সুদূর প্রাচীতে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতেই বৃটেন্ "দুকূল রাখিয়া" চলিতে চেষ্টা করিতেছে। বৃটেন জাপানের সহিত প্রকাশ্যে কোন বিরোধ করে নাই বটে; কিন্তু চীনে জাপানের অধিকৃত অঞ্চলগুলি স্বীকার করিয়া লয় নাই। পূর্ব্বে চীন সরকারের সহিত বাণিজ্য সম্পর্কে বৃটেনের যে চুক্তি ছিল, জাপানের অধিকৃত চীনা অঞ্চলেও বৃটেন সেই সকল চুক্তির সর্ত্ত এখনও বলবৎ রাখিতেছে। জাপান কিন্তু একাধিক বার বলিয়াছে, চীনের এই পরিবর্ত্তিত অবস্থায় পূর্ব্বের চুক্তিগুলি আর প্রযোজ্য নহে। বৃটেনের এই অস্পষ্ট নীতি—বস্তুতঃ চীনের জাতীয় সরকারের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন নীতির জন্য জাপান অসুবিধায় পড়িয়াছে। বিশেষতঃ সম্প্রতি বৃটেন্ চিয়াং-কাই সেকের সরকারের সহিত তাহার পূর্ব্বের সম্বন্ধ "ঝালাইয়া" লইয়াছে এবং চিয়াং-কাই-সেককে ঋণদান করিয়াছে। ব্রহ্মদেশের মধ্য দিয়া চিয়াং এখন অস্ত্র-শস্ত্র পাইতেছেন। বৃটেন এখন তাহার প্রাচ্য সাম্রাজ্য সম্পর্কে চিয়াং-কাই-সেকের গভর্ণমেণ্টকে জাপান ও সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে রক্ষাব্যূহরূপে ব্যবহার করিতে চেষ্টা করিতেছে। সাধারণভাবে ইহাই বৃটেনের বিরুদ্ধে জাপানের উষ্মার কারণ।

তিয়ান্‌সীনে বৃটেন্ ও জাপানের মধ্যে সঙ্ঘর্ষ আরম্ভ হইবার বিশেষ কারণ আছে। বৃটিশ ও ফরাসী কন্‌সেশনে জাপান-বিরোধী প্রচারকার্য পরিচালনার কেন্দ্রস্থল বলিয়া জাপান বহু দিন হইতে অভিযোগ করিতেছিল। এই অভিযোগের মূলে যে কোন সত্য নাই, তাহা নহে। বৃটিশ ও ফরাসী কন্‌সেশনের অধিবাসীরা কতক পরিমাণে ব্যক্তি-স্বাধীনতা উপভোগ করিত। জাপানী পুলিশ এই অঞ্চলে প্রবেশ করিতে পারিত না। এই অঞ্চলের চীনা বিদ্যালয়গুলিতে জাতীয় সরকার কর্তৃক নির্দ্দিষ্ট পুস্তক অধীত হইত। জাপানের অধিকৃত অঞ্চলে এই সকল পুস্তক বহু পূর্ব্বেই ভস্মীভূত হইয়াছিল—উত্তর চীনের জাপ-প্রভাবান্বিত গভর্ণমেণ্ট সেখানে নূতন পুস্তকের তালিকা সরবরাহ করিয়াছিলেন। অবরোধের পূর্ব্ব পর্য্যন্তও বৃটিশ ও ফরাসী কনসেশনে চীনা সংবাদপত্র মুদ্রিত হইত; জাপানের "সেনসর" বিভাগ এই সকল সংবাদপত্র সম্পর্কে কোন কর্তৃত্ব করিতে পারিত না।

এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজনৈতিক কারণ ব্যতীত, তিয়ান্‌সীনের বৃটিশ ও ফরাসী কর্তৃপক্ষের সহিত জাপানের মনোমালিন্যের প্রধান কারণ অর্থনৈতিক। বৎসরাধিক কাল পূর্ব্বে জাপান পিকিংএ ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নামক একটি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করিয়াছে এবং এই ব্যাঙ্কের নোটকে জাপানের অধিকৃত নগরগুলিতে এক মাত্র আইনগ্রাহ্য মুদ্রা (legal tender) বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। গ্রামাঞ্চলে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগরে—যেখানে জাপানের

তিয়ানসীনের সেনাপতি ব্রিগেডিয়ার সার জন লরী

প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত নহে, সেখানে ফেডারেল ব্যাঙ্কের নোট চালাইবার চেষ্টা হয় নাই। তিয়ানসীন ফেডারেল ব্যাঙ্কের এলাকার মধ্যে অবস্থিত। বৃটিশ কনসেশনের ব্যাঙ্কগুলি জাপানী ফেডারেল ব্যাঙ্কের নোটের প্রচলন অননুমোদন করে নাই বটে, কিন্তু উহার প্রচলনে উৎসাহ প্রদান করে নাই। ঐ অঞ্চলে চীনের জাতীয় সরকারের মুদ্রা গৃহীত হইত। ফরাসী কনসেশনের কর্তৃপক্ষ কিন্তু বৃটিশের ন্যায় "অনুকূল রাখিবার" নীতি গ্রহণ করেন নাই—তাঁহারা ফেডারেল ব্যাঙ্কের নোট গ্রহণ করিতে স্পষ্ট অস্বীকার করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন, পিপিং ফেডারেল ব্যাঙ্কের নোট প্রচলন করিবার এই চেষ্টা ধনবিজ্ঞানসম্মত নহে; নোটের প্রচলনের জন্য যে অনুপাতে স্বর্ণ মজুত রাখা প্রয়োজন, তাহা রাখিতে জাপানী ফেডারেল ব্যাঙ্ক সমর্থ হয় নাই। এইভাবে মুদ্রা-প্রকরণ সম্পর্কিত বিশৃঙ্খলা চলিতেছিল; ইহার পর গত জানুয়ারী মাসে জাপান গভর্ণমেণ্ট এই মর্ম্মে আদেশ দেন যে, চীনের জাতীয় সরকারের মুদ্রা শতকরা ৪০ ভাগ কম মূল্যে গৃহীত হইবে। বৃটিশ, ফরাসী ও মার্কিন্ সরকার এই আদেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়া বলেন যে, ইহাতে বাণিজ্যের অত্যন্ত ক্ষতি হইবে। ইহার পর, বৃটেনের একটি কার্য্যে জাপানের অসন্তুষ্টি অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়—চীনের জাতীয় গভর্ণমেণ্টের মুদ্রা-প্রকরণকে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে বৃটেন্ এক কোটি পাউণ্ডের একটি "ষ্টেবিলাইজেশন ফণ্ড" স্থাপন করে; অথচ জাপান এই জাতীয় সরকারের মুদ্রা-প্রকরণের অবসান কামনা করিতেছিল। এই সময়ই জাপান বৃটিশ ও ফরাসী কনসেশনের পার্শ্বে তার লাগাইয়াছিল—তিয়ানসীন্ অবরোধের সময় এই তারেই বিদ্যুৎ-প্রবাহ সঞ্চালিত হইয়াছিল। সেই সময়ই কনসেশনের পার্শ্ববর্ত্তী কয়েকটি স্থানে জাপান মেসিন-গান্ বসাইবার মঞ্চ নির্ম্মাণ করে এবং কনসেশনে প্রবেশের ৬টি ফটকের সম্মুখে তল্লাসী-গৃহ নির্ম্মাণ করে। এই সকল গৃহে জাপানী পুলিস মোতায়েন থাকিত, তাহারা কন্সেশনে গমন ও নির্গমনেচ্ছু ব্যক্তিদিগের পাসপোর্ট পরীক্ষা করিত, তাহাদিগের মালপত্র তল্লাস করিত।

গত বৎসর হইতে জাপানের সহিত তিয়ান্সীনের বৃটিশ ও ফরাসী কর্তৃপক্ষের পূর্ব্ববর্ণিত যে সকল অর্থনৈতিক সঙ্কট চলিতেছিল, তাহা হইতেই বুঝা যায়, সম্প্রতি তিয়ান্সীনে যাহা ঘটিল, তাহা আকস্মিক নহে—বহু পূর্ব্ব হইতেই ইহার ক্ষেত্র প্রস্তুত হইতেছিল।

সুদূর প্রাচীর যুদ্ধ—

জুন মাসে সুদূর প্রাচীর যুদ্ধে কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে নাই। জাপানী বিমান চীনের নূতন রাজধানী চুংকিংএ বোমা বর্ষণ করিয়াছে; হোপী ও সান্সী প্রদেশে যে যুদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে জাপান অল্প বিস্তর ক্ষতিগ্রস্তই হইয়াছে। কিছু দিন হইতে জাপানী সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা করিতে পারে নাই। কেহ কেহ মনে করেন, যুদ্ধক্ষেত্রের এই হৃত মর্য্যাদা পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যেই জাপান তিয়ানসীন সম্পর্কে এইরূপ কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে। জাপানের গতিবিধির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিলে মনে হয়, জাপান এখন নূতন অঞ্চল অধিকার অপেক্ষা তাহার অধিকারভুক্ত অঞ্চল সম্পর্কে সুব্যবস্থা করিতে অধিকতর মনোযোগী হইয়াছে এবং চিয়াং-কাই-সেকের গভর্ণমেণ্টের সহিত বহির্জ্জগতের সংযোগ সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করিতে সচেষ্ট হইয়াছে। এই দুই উদ্দেশ্যে জাপান সম্প্রতি চীনের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলের তিনটি বন্দর—সোয়াটো, ফুচাও ও ওয়েনচাও—অধিকার করিয়াছে। পূর্ব্বের ব্যবস্থা অনুসারে বিভিন্ন প্রতীচ্য শক্তি এই সকল বন্দরে স্বাধীনভাবে বাণিজ্য করিতে পারিত। এই সুযোগে চীনের গরিলা বাহিনীগুলি এই বন্দরের পথে অস্ত্রশস্ত্র লাভ করিয়াছে। জাপান এক দিকে এই অস্ত্রপ্রাপ্তির পথ রুদ্ধ করিল, অন্য দিকে চীনের উপকূলে আপনার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিল। ক্যাণ্টন সে পূর্ব্বেই অধিকার করিয়াছে; এখন ক্যাণ্টন ও সাংহাইর মধ্যবর্ত্তী তিনটি বৃহৎ বন্দরেও তাহার অধিকারভুক্ত হইল।

জাপ-মঙ্গোলিয়ান্ সংঘর্ষ—

কিছু দিন হইতে মঙ্গোলিয়ান্ সাধারণতন্ত্রের সীমান্তে জাপানী সৈন্যের সহিত বিরোধ চলিতেছে। এই বিরোধ সম্পর্কে উভয় পক্ষ পরস্পরকে দোষারোপ করিতেছে এবং দুই পক্ষের ক্ষতির পরিমাণ সম্পর্কে উভয়ই অতিরঞ্জিত সংবাদ প্রকাশ করিতেছে। মঙ্গোলিয়ান্ সাধারণতন্ত্র সোভিয়েট রুশিয়ার আশ্রিত কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র। চীনে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে সোভিয়েট রুশিয়া চীনকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিতেছে। এই সম্পর্কে গোপন নীতি অবলম্বিত হয় নাই; এই সাহায্য দান সম্পর্কে স্পষ্ট ভাষায় স্বীকারোক্তি করিয়া সোভিয়েট রুশিয়া বলিয়াছে যে, অত্যাচারী শক্তি কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া যে সকল জাতি স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছে, সোভিয়েট রুশিয়া তাহাদিগকে সাহায্য করিতেছে এবং করিবে। সোভিয়েট রুশিয়া কর্তৃক প্রদত্ত এই সাহায্য প্রধানতঃ মঙ্গোলিয়ান সাধারণতন্ত্রের মধ্য দিয়া আসিয়া থাকে। কাযেই মনে হয়, অধুনা মঙ্গোলিয়ান্ সীমান্তে জাপানের সহিত যে বিরোধ আরম্ভ হইতেছে, উহা সীমান্ত-সংক্রান্ত সাধারণ বিরোধ নহে। চিয়াং-কাই-সেকের গভর্ণমেণ্টকে বহির্জ্জগতের সহিত বিচ্ছিন্ন করিবার যে নীতি জাপান এক্ষণে বিশেষভাবে অনুসরণ করিতেছে, সেই নীতির অনুসরণেই বর্ত্তমান বিরোধের সৃষ্টি। এই বিরোধে জাপান বিশেষ লাভবান হইবে না; কারণ, তাহার এই বিরোধ মঙ্গোলিয়ান্ সাধারণতন্ত্রের সহিত নহে—বস্তুতঃ সোভিয়েট রুশিয়ার সহিত। সম্প্রতি সোভিয়েট প্রিসিডিয়ামের চেয়ারম্যান্ মঃ মলোটভ ঘোষণা করিয়াছেন,—We will defend the

মঃ লিটভিনফ

frontiers of the Mongolian People's Republic with the same determination as our own frontiers. এ সোভিয়েট রুশিয়া সুদূর প্রাচীতে বিপুল সমরায়োজন করিয়া মাঞ্চুকো সীমান্তে তিন লক্ষ জাপানী সৈন্যকে সর্ব্বদা সন্নদ্ধ রাখিয়াছে, মঙ্গোলিয়ান সাধারণতন্ত্রের সহিত বিরোধে প্রবৃত্ত হইয়া বস্তুতঃ জাপান সেই "অতিকায়" সোভিয়েট রুশিয়ার সহিতই বিরোধ করিতেছে। কাজেই, আমরা আশা করিতে পারি, গত বৎসর সোভিয়েট-মাঞ্চুকো সীমান্তের বিরোধ সম্পর্কে মিঃ সিগেমিৎস যেরূপ মঃ লিটভিনফের নিকট নতজানু হইয়াছিলেন, এই বৎসর এই সীমান্ত-বিরোধেও হয়ত জাপানকে সেইরূপ নতজানু হইতে হইবে।

ড্যান্‌জিগ ও সমরাশঙ্কা—

তিয়ানসীনের পর এখন সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়াছে বাল্‌টিক সাগরের দক্ষিণ উপকূলবর্ত্তী ড্যান্‌জিগ বন্দরের প্রতি। গত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে এই বন্দরটি জার্ম্মাণীর অধিকারভুক্ত ছিল। এই স্থানের অধিবাসীর শতকরা ৯৫ জন জার্ম্মাণ। প্রায় দুই শত বৎসর পরে পোলণ্ড যখন গত মহাযুদ্ধের পর পুনরায় স্বতন্ত্র অস্তিত্ব প্রাপ্ত হয়, তখন সে সমুদ্রে প্রবেশের জন্য একটি পথ দাবী করিয়াছিল, মিত্রশক্তি তখন ড্যানজিগ বন্দরকে সর্ব্বশক্তির ব্যবহারের উদ্দেশ্যে সংরক্ষিত রাখিবার জন্য জাতি-সঙ্ঘকে উহার পরিচালনা ভার প্রদান করিয়াছিলেন। ভিস্‌চুলা পোলণ্ডের সর্ব্বপ্রধান নদী; এই নদীর মোহনায় অবস্থিত ড্যানজিগ বন্দরের অর্থনীতিক ও সামরিক গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক। কাজেই, এই বন্দরের অধিকাংশ অধিবাসী জার্ম্মাণ হইলেও উহা জার্ম্মাণ রাইখের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। পক্ষান্তরে ইহাকে পোলণ্ডে প্রবিষ্ট না করাইয়াও পশ্চিমাদের কার্য্য করা হইয়াছে। পোলণ্ড রাজ্যের কিয়দংশ যাহাতে সমুদ্রোপকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, তদুদ্দেশ্যে ড্যানজিগ ও পোমারানিয়ার মধ্যবর্ত্তী অঞ্চল পোলণ্ডকে প্রদত্ত হইয়াছিল। এই অঞ্চলের নামই পোলিস্ করিডর (Polish Corridor)। জার্ম্মাণীতে হিটলারের উদ্ভব হইবার পর হইতেই ড্যানজিগে নাজী আন্দোলন আরম্ভ হয় এবং তিন বৎসরের মধ্যেই—১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে—ড্যান্‌জিগে নাজী-প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময় হইতে জাতিসঙ্ঘ ড্যান্‌জিগ সম্পর্কে হস্তক্ষেপ একপ্রকার ত্যাগ করিয়াছেন বলিলেই চলে।

পোলণ্ড সম্প্রতি ড্যানজিগ হইতে ২০ মাইল দূরে ডিনিয়া নামক একটি নিজস্ব বন্দর প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। ড্যানজিগে নাজী-প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার পর তথায় ইহুদী-নির্য্যাতনের নীতি অবলম্বিত হয়। এইজন্য ইহুদী ব্যবসায়ীদিগের কল্যাণে ডিনিয়া বন্দরের গুরুত্ব সত্বর বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্ব্বে এই ডিনিয়া ও ড্যানজিগ বন্দরের পথে পোলণ্ডের শতকরা ৮৫ ভাগ বাণিজ্য পরিচালিত হইত। মেমেল্ জার্ম্মাণ রাইখের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় পোলণ্ড এই দুইটি বন্দরের প্রতি অধিকতর নির্ভরশীল হইয়াছে। পূর্ব্বে মেমেল বন্দর লিথুনিয়ার অন্তর্ভুক্ত থাকিলেও পোলণ্ড উহাকে অবাধে ব্যবহার করিতে পারিত।

ড্যানজিগ ও "পোলিস্ করিডরের" প্রতি জার্ম্মাণীর লোলুপ দৃষ্টি বহু দিন হইতে পতিত হইয়াছে। স্থলপথে পূর্ব্বে প্রুসিয়ার সহিত জার্ম্মাণ রাজ্যের সংযোগ স্থাপন করিতে হইলে এই দুইটি অঞ্চল জার্ম্মাণ রাইখের অন্তর্ভুক্ত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। পোলিস্ করিডর বস্তুতঃ পোল্ অঞ্চল; ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে পোলণ্ডের পোমার্জ্জ প্রদেশ প্রুসিয়ার অধিকারভুক্ত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ঐ অঞ্চল পোলণ্ডেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই অঞ্চলের অধিকাংশ অধিবাসীই পোল্। কাজেই, "পোলিস্ করিডর"কে বলপূর্ব্বক জার্ম্মাণ রাইখের অভ্যন্তরে আনয়ন করিতে চেষ্টা করিলে অশান্তির অগ্নি প্রজ্বলিত হইবে, ইহা অনুমান করিয়া রাজনীতিজ্ঞগণ বলিয়াছেন,—Polish Corridor is a perpetual powder magazine. কিন্তু ড্যান্‌জিগ সম্পর্কে সকলের ধারণা ছিল, উহা অনায়াসে জার্ম্মাণ রাইখের অধিকারভুক্ত হইবে। বহু পূর্ব্বেই ড্যানজিগ সম্পর্কে রাজনীতিজ্ঞগণ বলিয়াছেন,—Danzig is essentialy a German city, completely in the hand of Nazis and bound inevitably to be scooped into Hitler's Reich.

ড্যান্‌জিগ

যে ড্যানজিগের অধিবাসীর শতকরা ৯৫ জন জার্ম্মাণ, যেখানে

১৯৩৩ খৃষ্টাব্দ হইতে নাজী-প্রভুত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত, সেখানে হিটলার বহু পূর্ব্বেই জার্ম্মাণীর অধিকার বিস্তার করিতে সচেষ্ট হইবেন, ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু তিনি জানিতেন, ড্যানজিগ, ও "পোলিস করিডরের" সহিত পোলণ্ডের স্বার্থ গভীরভাবে বিজড়িত রহিয়াছে; বস্তুতঃ ড্যানজিগের উপর তাহার অর্থনৈতিক সম্পদ ও রাষ্ট্রনৈতিক নিরাপত্তা নির্ভর করিতেছে। কাষেই, ড্যানজিগ সম্পর্কে অকস্মাৎ বলপূর্ব্বক কোন ব্যবস্থা করিতে প্রয়াস পাইলে অনর্থের সৃষ্টি হইতে পারে এই জন্য হিটলার এত দিন অপেক্ষা করিতেছিলেন। গত মার্চ্চ মাসে জেকোশ্লো-ভেকিয়ার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবার পর পোলণ্ড এখন তিন দিকে জার্ম্মাণীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। ভূতপূর্ব্ব জেকোশ্লো-ভেকিয়া রাষ্ট্রের মোরাভিয়া প্রদেশ ও তাহার সন্নিহিত স্থানগুলি এখন জার্ম্মাণ রাইখের অন্তর্ভুক্ত। ইহার ফলে মধ্য য়ুরোপে পোলাণ্ড ও জার্ম্মাণ আজ প্রতিবেশী দেশে পরিণত হইয়াছে। এই অঞ্চলে পাঁচ শত মাইলব্যাপী পোলাণ্ড সীমান্তের অপর পার্শ্বেই জার্ম্মাণীর রাজ্য। এই অঞ্চলের অধিকাংশই সমতল; কাযেই পোলণ্ডের পক্ষে এই সীমান্ত সুরক্ষিত করা দুষ্কর। জার্ম্মাণীর আশ্রিত রাজ্য শ্লোভেকিয়াও পোলণ্ডের প্রতিবেশী দেশ; অবশ্য এই অঞ্চলে কার্পেথিয়ান্ পর্ব্বতমালা অবস্থিত। উত্তর সীমান্তে জার্ম্মাণীর পূর্ব্বপ্রুসিয়া বহুকাল হইতেই পোলণ্ডের প্রতি মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছে। তাহার পর, জেকোশ্লোভেকিয়া গ্রাস করিয়া আজ জার্ম্মাণী এই সুদীর্ঘ পোল সীমান্ত বিপন্ন করিবার সুবিধা পাইয়াছে। এই জন্যই জেকোশ্লোভেকিয়া গ্রাস করিবার পরই জার্ম্মাণী অত্যন্ত তৎপরতার সহিত রুমানিয়ার সহিত বাণিজ্য-চুক্তি করে এবং তাহার পর ড্যানজিগ ও পোলিস করিডরের প্রতি মনোযোগী হয়। গত ২৮শে এপ্রিল হার হিটলার যখন রাইখষ্ট্যাগে বক্তৃতা করেন, তাহার পূর্ব্বেই তিনি পোলণ্ডের নিকট ঐ দুইটি অঞ্চল সম্পর্কে প্রস্তাব উপাপন করিয়া তাহার উত্তর পাইয়াছিলেন। হিটলারের এই বক্তৃতা এবং ইহার উত্তরে পোল পররাষ্ট্রসচিব কর্ণেল বেকের ঘোষণার কথা জ্যৈষ্ঠ মাসের 'মাসিক বসুমতী'তে আলোচিত হইয়াছে। কর্ণেল বেকের ঘোষণা শ্রবণ করিয়া মনে হইয়াছিল, হয়ত পোলণ্ড জার্ম্মাণীর সহিত আপোষ করিতে আগ্রহান্বিত হইবে। কিন্তু পরবর্ত্তী ঘটনায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, পোলণ্ড ড্যানজিগ সম্পর্কে তাহার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ-রক্ষার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

সম্প্রতি ক্রমাগত সংবাদ আসিতেছে, ড্যানজিগে জার্ম্মাণীর অস্ত্র-শস্ত্র প্রবেশ করিতেছে এবং জার্ম্মাণ রাইখথ্ য়েরের (জার্ম্মাণীর সামরিক বিভাগ) কর্ম্মচারিগণ তথায় অভিযান করিতেছেন। ড্যানজিগের উপর দিয়া জার্ম্মাণীর সামরিক বিমান ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ড্যানজিগের নাজীগণ জার্ম্মাণ রাইখে প্রবিষ্ট হইবার জন্য অধৈর্য্য হইয়া উঠিয়াছে। সকলের মনে এই আশঙ্কার সৃষ্টি হইয়াছে যে, জার্ম্মাণী হয় ত এইবার বলপূর্ব্বক ড্যানজিগ অধিকার করিয়া লইবে। এদিকে পোলণ্ড তাহার স্বার্থরক্ষার জন্য দৃঢ়তা প্রকাশ করিতেছে। পোলণ্ডের রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও রাজ্যগত অখণ্ডতা রক্ষার জন্য বৃটেন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কাযেই, জার্ম্মাণী যদি বলপূর্ব্বক ড্যানজিগ অধিকার করিয়া লইবার প্রয়াস পায়, তাহা হইলে য়ুরোপব্যাপী সমরাগ্নি প্রজ্বলিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে, জার্ম্মাণী কি য়ুরোপব্যাপী সমরে প্রবৃত্ত হইতে সত্যই প্রস্তুত? এই প্রশ্নের উত্তরে দৃঢ়তার সহিত বলা যাইতে পারে, সামরিক শক্তিতে জার্ম্মাণী বলীয়ান্ ইহা সত্য; কিন্তু ব্যাপক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার মত অর্থনৈতিক সামর্থ্য তাহার নাই। অল্পকাল পূর্ব্বেও জার্ম্মাণীর আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্বন্ধে যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে জানা যায়, তাহার খাদ্য-সামগ্রীর অত্যন্ত অভাব; সপ্তাহে জনপ্রতি সিকি পাউণ্ডের অধিক মাখন সেখানে মিলে না, ভাল মাংস এবং ডিমেরও একান্ত অভাব। অষ্ট্রীয়া ও জেকোশ্লোভেকিয়া গ্রাস করিলেও এই দুইটি দেশ পরিপাক করিয়া উহা হইতে পুষ্টি আহরণ করিতে জার্ম্মাণী এখনও সমর্থ হয় নাই। গর্ব্বিত চেক্ জাতি এখনও নির্ব্বিবাদে জার্ম্মাণীর নিকট মস্তক অবনত করিতে চাহিতেছে না। অষ্ট্রীয়ার বিভিন্ন প্রধান নগরে প্রায়ই শ্রমিক বিক্ষোভ প্রদর্শিত হইতেছে। সম্প্রতি জার্ম্মাণীর বহির্বাণিজ্য কিরূপভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে, তাহা গত মাসের 'মাসিক বসুমতী'তে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই সকল অর্থনৈতিক বিপর্য্যয়ের জন্য এক দিকে যেমন জার্ম্মাণী ব্যাপক যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে সমর্থ নহে, তেমনই অন্য দিকে রাজ্যাভ্যন্তরের অসন্তোষ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে জাতিকে সর্ব্বদা উত্তেজনার মধ্যে রাখা তাহার বিশেষ প্রয়োজন। হিটলার জাতিকে উত্তেজিত রাখিবার নীতিতে অত্যন্ত অভিজ্ঞ। এতদিন এই উত্তেজনা নিষ্ফল হয় নাই;—১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের উত্তেজনার ফলে সার প্রদেশ লাভ হইয়াছে; ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে রাইনলণ্ডে সৈন্য সন্নিবিষ্ট হইয়াছে ও স্পেনের অন্তর্দ্বন্দ্বে জার্ম্মাণ সৈন্য লিপ্ত হইয়াছে; ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে চতুর্ব্বার্ষিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে; ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে অষ্ট্রীয়া কুক্ষিগত হইয়াছে, শেষভাগে সুডেটেন্ অঞ্চল অধিকৃত হইয়াছে; ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে জেকোশ্লোভেকিয়ার অবশিষ্টাংশ উদরস্থ হইয়াছে। এখন আবার জার্ম্মাণ জাতির উত্তেজনার প্রয়োজন; তাই ড্যানজিগ সম্বন্ধে এই আয়োজন।

সকল অবস্থা বিবেচনা করিলে মনে হয়, জার্ম্মাণী এখন ব্যাপক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে প্রস্তুত নহে। তাহার আশা, বৃটেন্ ও পোলণ্ড সন্ত্রস্ত হইয়া নতি স্বীকার করিবে। বৃটেনের পক্ষে অবশ্য ইহা অসম্ভব নহে এবং বৃটেন্ যদি পুনরায় জার্ম্মাণ-ঔদ্ধত্যের নিকট মস্তক অবনত করে, তাহা হইলে পোলণ্ডও নিতান্ত অসহায় হইয়া জার্ম্মাণীর দাবী মানিয়া লইতে বাধ্য হইবে। বৃটেন্ যদি এবার সত্যই দৃঢ়তা অবলম্বন করে—সম্প্রতি লর্ড হ্যালিফ্যাক্স অত্যাচারী শক্তিগুলির সম্পর্কে যাহা বলিয়া-ছেন তাহাতে যদি আন্তরিকতা থাকে, তাহা হইলে জার্ম্মাণীর দম্ভ নিষ্প্রভ হইয়া আসিবে। জার্ম্মাণীর সংবাদপত্রগুলির ভাষায় ড্যানজিগে যে "স্নায়ুর যুদ্ধ" চলিতেছে, সেই যুদ্ধে জয়ী হইয়াই জার্ম্মাণী তৃপ্ত থাকিবে। তবে এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন, যুদ্ধ আপাততঃ নিবারিত হইলেও স্থায়িভাবে যুদ্ধ নিবারিত হওয়া অসম্ভব; কারণ, জার্ম্মাণীর আভ্যন্তরীণ অবস্থা যেরূপ, তাহাতে অধিক দিন জাতিকে উত্তেজনার উপকরণ যোগাইতে না পারিলে তথায় অন্তর্বিপ্লব নিশ্চিত। বাহ্বাস্ফোট ও সৈন্যদিগের সদম্ভ কুচকাওয়াজের দ্বারা যথেষ্ট উত্তেজনা লাভ যখন আর সম্ভব হইবে না—তখন জার্ম্মাণী নিতান্ত বাধ্য হইয়াই যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবে।

ইঙ্গো-সোভিয়েট আলোচনা—

প্রায় তিন মাস হইতে চলিল, ইঙ্গ-সোভিয়েট আলোচনা চলিতেছে; এখনও কতকাল উহা চলিবে, তাহা বুঝা যাইতেছে না। এই আলোচনা সম্পর্কে কোন সঠিক সংবাদ সাধারণ্যে প্রকাশিত হয় না। তবে সাংবাদিকদিগের অনুমান—বৃটেন্ এখন রুশিয়ার উত্তর-পশ্চিম সীমান্তস্থিত রাষ্ট্রগুলি সম্পর্কে আশ্বাস দিতে প্রস্তুত হইয়াছে; এখন হলাণ্ড, বেলজিয়াম, লাক্সেমবার্গ, সুইজারলণ্ড প্রভৃতি রাষ্ট্রগুলির নিরাপত্তা সম্পর্কে আলোচনা চলিতেছে। সোভিয়েট-রুশিয়া নাকি এই সকল রাষ্ট্রকে নিরাপত্তার আশ্বাস দিতে ইতস্ততঃ করিতেছে। সাংবাদিকদিগের অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া এই বিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে। আমরা সাধারণভাবে ইঙ্গ-সোভিয়েট আলোচনা সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি।

বৃটেনের পক্ষ হইতে এই আলোচনা অত্যন্ত সতর্কভাবে পরিচালিত হইতেছে; কারণ, বৃটেন সোভিয়েট রুশিয়ার সহিত এইরূপ কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে চাহে না, যাহাতে জার্ম্মাণী ক্রুদ্ধ হইয়া ইঙ্গ-জার্ম্মাণ বাণিজ্য-সম্বন্ধ ছিন্ন করিতে পারে। জার্ম্মাণীর ব্যবসাক্ষেত্রে ইংরেজ ব্যবসায়ীদিগের স্বার্থ বিজড়িত রহিয়াছে; বৃটেন সেই স্বার্থ বাঁচাইয়া চলিতে চাহিতেছে। জার্ম্মাণী যখন গত মার্চ্চ মাসে প্রাগ আক্রমণ করে, তখন ইঙ্গ-জার্ম্মাণ বাণিজ্য আলোচনা স্থগিত রাখা হইয়াছিল। ইহার পর, হিটলারের রাইখষ্ট্যাগের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া লর্ড হ্যালিফ্যাক্স প্রীত হন এবং ঘোষণা করেন যে, পুনরায় ইঙ্গ-জার্ম্মাণ বাণিজ্য আলোচনা আরম্ভ হইবে। সম্প্রতি মিঃ ষ্ট্যানলি কমন্স সভায় এক বক্তৃতায় নাজী বিরোধী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অবলম্বনের বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য করেন।

মিঃ ষ্ট্যানলী

মঃ মলোটভ

সোভিয়েট রুশিয়া এখন বৃটেন ও ফ্রান্সের নিকট হইতে আপনার মনের মত সর্ত্ত আদায় করিয়া লইবার প্রকৃষ্ট সুযোগ লাভ করিয়াছে; কারণ, জার্ম্মাণী ও ইটালী আজ তাহার দ্বারস্থ। ফ্যাসিষ্ট শক্তি জার্ম্মাণী ও ইটালী কম্যুনিষ্ট সোভিয়েট রুশিয়ার দ্বারস্থ হইতে পারে, ইহা বিশ্বাস করা দুষ্কর। কিন্তু রাজনীতি দুজ্ঞের্য়; ইহাতে নীতিবাদের স্থান নাই—আপন আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্য সকলেই ব্যস্ত। নতুবা দুই বৎসর পূর্ব্বে ব্রেজিলে কম্যুনিষ্ট বিদ্রোহীদিগের নিকট জার্ম্মাণীর অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছিল কেন? জার্ম্মাণী ও ইটালী কি ভাবে সোভিয়েট রুশিয়ার সহিত সখ্য স্থাপন করিতে চাহিতেছে, তাহার প্রমাণস্বরূপ মঃ মলোটভের এক বক্তৃতার মর্ম্মানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। সোভিয়েট প্রেসিডিয়ামের চেয়ারম্যান মঃ মলোটভ বলিতেছেন, "আমরা বৃটেন ও ফ্রান্সের সহিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি বলিয়া জার্ম্মাণী ও ইটালীর সহিত বাণিজ্য-সম্বন্ধ ছিন্ন করিব, ইহার কোন কারণ নাই। গত বৎসর জার্ম্মাণীর আগ্রহে আমরা তাহার সহিত বাণিজ্য-চুক্তি সম্পর্কে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম; এই সময় জার্ম্মাণী আমাদিগকে ২০ কোটি মার্ক ঋণ এবং বাণিজ্য-সম্পর্কে অন্যান্য সুবিধা দিতে সম্মত হইয়াছিল। যাহা হউক, তখন মতদ্বৈধের জন্য বাণিজ্য-চুক্তির আলোচনা পরিত্যক্ত হয়।" তাহার পর মঃ মলোটভ গুরুত্বপূর্ণ উক্তি করিয়াছেন —To judge by certain signs it is not out of the question that negotiations may be resumed. তিনি আরও জানাইয়াছেন যে, ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের জন্য ইটালীর সহিত সোভিয়েট রুশিয়ার ব্যাণিজ্য চুক্তি হইয়াছে।
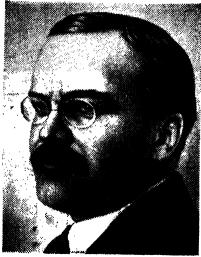
এই জন্যই সোভিয়েট রুশিয়া আজ বৃটেন্ ও ফ্রান্সকে লইয়া এইরূপভাবে "খেলিতেছে"। সে জানে, আপাততঃ জার্ম্মাণী ও ইটালীর নিকট হইতে তাহার আশঙ্কা করিবার কিছুই নাই। পোলণ্ডের বাণিজ্যক্ষেত্রে ফরাসী ধনিকদিগের গভীর স্বার্থ-সম্বন্ধ রহিয়াছে; রুমানিয়া ও গ্রীসের সহিত বৃটেনের স্বার্থ-সম্বন্ধ বিদ্যমান। অথচ, সোভিয়েট রুশিয়া যদি বৃটেন্ ও ফ্রান্সের পক্ষে না থাকে, তাহা হইলে বিপৎকালে এই সকল দেশকে যথোপযুক্ত সাহায্য দান করা তাহাদিগের পক্ষে সম্ভব নহে। মিষ্টার লয়েড জর্জ্জ কিছু দিন পূর্ব্বে কমন্স সভায় বলিয়াছিলেন,—সোভিয়েট রুশিয়ার সহিত বৃটেন্ যদি চুক্তিবদ্ধ না হয়, তাহা হইলে পূর্ব্ব-য়ুরোপের রাষ্ট্রগুলিকে বৃটেন্ ও ফ্রান্সের আশ্বাস দান বাস্তবক্ষেত্রে অর্থহীন হইবে। সোভিয়েট রুশিয়া বুঝিয়াছে যে, য়ুরোপের ফ্যাসিষ্ট ও গণতান্ত্রিক—উভয় শ্রেণীর রাষ্ট্রের পক্ষেই তাহার সহিত মিত্রতার মূল্য অত্যন্ত অধিক। এই জন্যই সে আজ বৃটেন্ ও ফ্রান্সের সহিত এত "দর কসাকসি" করিতে সাহসী হইয়াছে।

শ্রীঅতুল দত্ত।

প্রগতিশীল দল
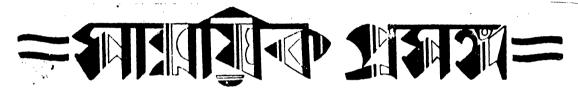
৯ই আষাঢ় হইতে তিন দিন বোম্বাই সহরে কংগ্রেসের বামপন্থী এবং আমূল পরিবর্ত্তনকামী দল 'ফরওয়ার্ড ব্লকের' বৈঠক বসিয়াছিল। এই বৈঠকে অগ্রগামী দলের যে কার্য্য-তালিকা বিধি-ব্যবস্থা নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহার সার মর্ম্ম এইরূপ :—

(১) ধর্ম্মাচরণ বিষয়ে সকলেরই সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিবে, কিন্তু তাই বলিয়া ধর্ম্মবিশ্বাসকে রাজনীতিক বিষয়ের উপর প্রভাব বিস্তারের সুযোগ দেওয়া চলিবে না।

(২) প্রাদেশিকতা, সাম্প্রদায়িকতা এবং উৎকোচ দান ও গ্রহণ-দোষ দমন করিতে হইবে।

(৩) কংগ্রেসকে নিহিত স্বার্থের প্রভাব হইতে এবং কংগ্রেস-মন্ত্রীদিগের ঔদ্ধত্যপূর্ণ প্রভুত্ব হইতে মুক্ত করিতে হইবে।

(৪) কংগ্রেসকে গণতান্ত্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং আমূল সংস্কারপন্থী করিতে হইবে।

(৫) কৃষক এবং কর্ম্মীরা আর্থিক ব্যাপারে মুক্তি পাইবার জন্য যে চেষ্টা পাইতেছে, তাহার সহায়তা করিতে হইবে এবং কংগ্রেস ও অন্য সমস্ত সাম্রাজ্যবিরোধী প্রতিষ্ঠানকে সমভাবাপন্ন করিতে হইবে।

(৬) রাজন্যবর্গের রাজ্যে প্রজারা স্বাধীনতালাভের জন্য যে প্রচেষ্টা করিতেছে, তাহার সহায়তা করিতে হইবে।

(৭) ফেডারেশনের প্রতিকূলে প্রবল চেষ্টা করিতে হইবে।

(৮) নিখিল ভারতে স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গঠন করিতে হইবে।

(৯) ভারতবাসীরা যাহাতে সাম্রাজ্যবাদমূলক যুদ্ধে যোগদান না করে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(১০) বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন, জাতীয় মুক্তির জন্য পুনরায় প্রবল প্রচেষ্টা করিতে হইবে।

এই পরিকল্পনার কয়েকটি দফা কংগ্রেসের মতের বিরোধী। জমিদারী প্রথার উচ্ছেদসাধন এবং ধনিকের উচ্ছেদসাধন সর্ব্বস্বত্ববাদ হইতেই গৃহীত। কিন্তু এখন ঐরূপ চেষ্টা করিতে গেলে তাহার ফল যে কখনই ভাল হইবে না, একথা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। রুশিয়ায় এই ব্যবস্থা সুফল প্রসব করে নাই, বরং উহার ফল সে দেশবাসীর অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক হইয়াছে। এই কার্য্যসূচি চালাইতে হইলে এই জাতীয় দল কর্ম্মক্ষেত্রে কেবল শত্রু-বৃদ্ধিই করিবেন এবং তাহার ফলে বহু বাধা-বিঘ্নের সহিত সংঘর্ষ সুনিশ্চিত। এক সঙ্গে বহু কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিলে সাফল্যলাভ সুদূরবর্ত্তী হয়। অগ্রগামী দলের কার্য্যসূচি তারুণ্য-সুলভ উচ্ছ্বাসে উদ্বেলিত। বাস্তব ব্যাপার বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার বাধা তাঁহারা গ্রাহ্য করেন না। কংগ্রেস-মন্ত্রীদিগের ঔদ্ধত্যপূর্ণ প্রভাব হইতে কংগ্রেসকে মুক্ত করিবার প্রয়াস অবশ্যই প্রশংসনীয়; তাঁহারা যদি কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলকে সাম্রাজ্যবাদের প্রভাব-মুক্ত করিতে পারেন, তাহাতে দেশের প্রভূত উপকার সংসাধিত হইয়া গণতন্ত্রের গৌরব সমুজ্জ্বল হইবে।

শাসন-সংস্কার আইনে যে ভাবে ফেডারেশন পরিকল্পিত হইয়াছে, আমরা অবশ্যই তাহার সমর্থন করিতে পারি না। তবে উহা বিশেষভাবে পরিবর্ত্তিত হইলেও যে গ্রহণযোগ্য হইবে না, এমন কথাও বলি না। কোন সংগ্রামে যোগদান করা না করা বিষয়ে দেশের লোকের স্বাধীনতা কতখানি আছে—তাহাও ভাবিয়া দেখা উচিত। বিগত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় পঞ্চনদ হইতে কিরূপ ভাবে সৈন্যসংগ্রহ করা হইয়াছিল—তাহাও ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য। কেবল একটা মতের কুহকে চলিলে সাফল্যলাভ সম্ভবপর নহে। বাস্তবতার সহিত পরিচিত হইয়া কায করাই সমীচীন।

মহাত্মাজী ও সুভাষচন্দ্রের মতভেদ

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু গতবার কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইবার পর হইতেই শুনা যাইতেছে যে, তাঁহার সহিত মহাত্মাজীর প্রবল মতভেদ বিদ্যমান। কিন্তু কি লইয়া তাঁহাদের মতভেদ, তাহা প্রকাশ পায় নাই। অনেকে মনে করিয়াছিলেন, ফেডারেশন বা যুক্তরাষ্ট্রতন্ত্র লইয়া

উভয়ের মতভেদ ঘটিয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের পত্রব্যবহারেও সে কথা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় নাই। তবে সুভাষ বাবু চরম পত্র দিয়া তাহার পরই ব্যাপকভাবে আইন-ভঙ্গ আন্দোলন করিবার যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, মহাত্মা গান্ধী সে প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। মহাত্মাজী বলেন যে, কংগ্রেসের যাহা চরম লক্ষ্য, তৎসম্বন্ধে তাঁহার সহিত কার্য্যতঃ সুভাষ বাবুর মতের কোন ভিন্নতা নাই। সম্প্রতি মার্কিণের 'নিউইয়র্ক টাইমস্' পত্রের প্রতিনিধির সহিত মহাত্মা গান্ধীর যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা মহাত্মাজীর 'হরিজন' পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহাদের কথাবার্ত্তা প্রসঙ্গে অনেক তথ্যই জানিতে পারা গিয়াছে। 'নিউইয়র্ক টাইম্‌সের' প্রতিনিধি মহাত্মাজীকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন—"স্বাধীনতা বলিতে আপনি কি বুঝেন?" উত্তরঃ—"স্বাধীনতা অর্থে আমি ভারত হইতে বৃটিশ শক্তির সরিয়া যাওয়া বুঝি। বৃটিশ জাতি ভারতবাসীর তুল্য অংশীদাররূপে এদেশে থাকেন তাহাতে আপত্তি নাই। উভয়ে সমান স্বাধীনতা ভোগ করিবে, কিন্তু এক পক্ষ ইচ্ছা করিলেই সেই সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দিতে পারিবে।" গান্ধীজীর ইহাকে ঔপনিবেশিক অবস্থা (Dominion Status) বলিতে আপত্তি নাই বটে, তবে তিনি বলেন যে, ভারতের ন্যায় অতি বিশাল ও বহু জনের বাস-ভূমির সহিত বৃটিশ উপনিবেশের পার্থক্য আছে। সেইজন্য ভারতের ঐরূপ অবস্থাকে ঔপনিবেশিক অবস্থা বলা যাইতে পারে না। তবে যদি ভারতকে প্রকৃত স্বাধীনতা দেওয়া হয়, তাহা হইলে তিনি কথার মারপ্যাঁচ লইয়া ঝগড়া করিবেন না বলিয়াছেন। মার্কিণ সাংবাদিক বলিয়াছিলেন,—"কিন্তু কংগ্রেসে সুভাষ বসু এবং তাঁহার দলভুক্ত বহু সদস্য রহিয়াছেন, তাঁহারা বৃটিশ সাম্রাজ্যের সহিত সম্বন্ধ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া পূর্ণ স্বাধীনতা পাইতে চাহেন।" উত্তরে মহাত্মাজী বলেন,—"উহা আসলে কেবল একটা সংজ্ঞাগত পার্থক্যমাত্র। এই বিষয়ে আমি এবং সুভাষ বাবু ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করি সত্য, কিন্তু আসলে তাঁহার সহিত আমার মতের ভিন্নতা আছে, ইহা স্বীকার করি না। আমি যেরূপ তুল্য অংশীদারভাবে থাকিবার কথা বলিয়াছি, তাহাতে সুভাষ বাবু আপত্তি করিবেন না। কিন্তু তাঁহাকে আজ যদি সে কথা জিজ্ঞাসা করা যায়, তাহা হইলে তিনি বলিবেন—'এখন তিনি সে কথা বলিতে পারেন না, কারণ, বৃটিশ জাতি এখনই সে প্রস্তাবে সম্মত হইবার পাত্র নহেন।' তিনি যদি আমার সহিত ঐ প্রসঙ্গে কথা বলিতেন—তাহা হইলে ঐ কথা লইয়া আমি তাঁহার সহিত বিরোধ করিতাম না, আমি আমার ধাতু ও প্রকৃতি অনুসারেই কথা বলি।" ইহাতে মনে হয় যে, তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে মতভেদ কেবল পরিমাণগত, বিষয়গত বা বিষয়ের মূলগত (fundamental) নহে। কিন্তু সুভাষ বাবুর সহিত পত্রব্যবহারে মহাত্মাজী বলিয়াছিলেন যে, সুভাষ বাবুর সহিত কোন কোন বিষয়ে মতভেদ মূলগত। সেটা কি তবে রাজেন্দ্রপ্রসাদকে প্রতিষ্ঠার জন্য? না বাঙ্গালী সভাপতি পরিহারের জন্য?

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর প্রস্তাব

৬ই আষাঢ় বুধবার বোম্বাই সহরে কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতির বৈঠক বসিয়াছিল। সেই বৈঠকে কংগ্রেসে দুর্নীতি নিবারণকল্পে কতকগুলি প্রস্তাব গৃহীত এবং সেই প্রস্তাবগুলি নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটীতে পেশ করা হইয়াছিল। ৯ই আষাঢ় বোম্বাই সহরে গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক ময়দানে নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশন হইয়াছিল। এই অধিবেশনে কংগ্রেস কমিটীতে অনেক বাদবিতণ্ডা হইয়া গিয়াছে। কংগ্রেসে দুর্নীতি দমনকল্পে অনেকগুলি প্রস্তাবও গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু আসলে উহাতে কংগ্রেসের দুর্নীতি কমিবে কি বাড়িবে, তাহা বুঝা দায়।

নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটীতে এই মর্ম্মে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, যে সকল লোক বিলাতী বস্ত্রের বা বিলাতী জিনিষের ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিবে অথবা যাহারা মদ খাইবে, তাহারা কোন কংগ্রেস কমিটীর সদস্য নির্ব্বাচিত হইতে পারিবে না। মাতালকে কোন কংগ্রেস কমিটীর সদস্য নির্ব্বাচিত করিতে নিষেধ করা হইলে তাহার অর্থ বুঝা যায়। কিন্তু গেঁজেল, সিদ্ধি-খোর, চণ্ডু-খোর প্রভৃতিকেও বা বাদ দেওয়া হইল কেন? এই প্রস্তাব অধিকাংশ সদস্যের ভোটে গৃহীত হইলেও সর্ব্বসদস্য-সম্মতিক্রমে গ্রাহ্য হয় নাই। কতকগুলি সদস্য ইহাতে

আপত্তি করিয়া তর্ক তুলিয়াছিলেন। যাঁহারা বিলাতী বস্ত্র—বিলাতী জিনিষের ব্যবসা করেন, তাঁহারা এবং মাতালরা কি একই পর্য্যায়ভুক্ত? নৈতিক দৃষ্টিতে ইঁহারা কি তুল্য-মূল্য? বিলাতী দ্রব্য ব্যবসায়ীর যদি কংগ্রেসের সাধারণ সদস্য হইতে বাধা না থাকে, তবে তাঁহাদিগকে কংগ্রেস কমিটীর সদস্য হইতে আপত্তি করিলে চলিবে কেন? আর একটি প্রস্তাব লইয়াও বিশেষ বিতণ্ডা হইয়াছিল। প্রস্তাবটি এই—যাঁহারা কোন সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের সদস্য থাকিবেন, তাঁহাদিগকে কংগ্রেসের কোন কার্য্যনির্ব্বাহের পদ প্রদান করা হইবে না। এই প্রস্তাব সম্বন্ধে আপত্তি হইয়াছিল, কিন্তু সে আপত্তি ভোটে টিকে নাই। এই প্রস্তাব দ্বারা হিন্দু সভা, আর্য্য লীগ, আকালি লীগ প্রভৃতির সভ্যগণকে কংগ্রেসের কোন বিশিষ্ট পদ প্রদান করা হইবে না স্থির করা হইয়াছে। কিন্তু সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান কাহাকে বলে, ইহার সংজ্ঞা নির্দ্দেশ আবশ্যক। নতুবা সম্প্রদায়বিশেষের প্রতি অবিচারে স্বেচ্ছাচার প্রকট হইবে। যে সকল সঙ্ঘ ন্যায় অনুসারে সকল সম্প্রদায়ের সহিত সম ব্যবহারের দাবী করেন, তাহাদিগকে কখনই সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান বলা যায় না। অতএব যে সকল সঙ্ঘ সম্প্রদায়বিশেষের ন্যায়সঙ্গত স্বার্থরক্ষার জন্য গঠিত, তাহাদিগকে সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান বলা নিতান্তই অন্যায়—অশোভন। সকলেরই স্ব স্ব ব্যক্তিগত এবং সম্প্রদায়গত ন্যায্য স্বার্থরক্ষা করিবার অধিকার আছে—তাহা থাকাও আবশ্যক। কোন প্রতিষ্ঠানেরই সেই ন্যায্য স্বাধীনতার সঙ্কোচ করা সঙ্গত নহে।

আর একটা প্রস্তাবে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী এবং প্রাদেশিক কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলীর সম্বন্ধ নির্দ্ধারণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, কংগ্রেসী দলের কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলীর এবং প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা থাকা আবশ্যক। তাহা না থাকিলে কংগ্রেসের প্রভাব নষ্ট হইবে। শাসনকার্য্য পরিচালন ব্যাপারের কোন বিষয়েই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির মন্ত্রীদিগের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা সঙ্গত নহে। তবে যদি কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলী কোন ক্ষেত্রে ক্ষমতার অপব্যবহার করেন অথবা কোনরূপ অসুবিধা বোধ করেন, তাহা হইলে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর কার্য্যকরী সমিতি সে বিষয়ে গোপনে মন্ত্রীদিগকে সমজাইয়া দিতে পারিবেন। আর যদি শাসন-নীতির দিক দিয়া মন্ত্রিমণ্ডলীর সহিত প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর মতভেদ ঘটে, তাহা হইলে সে বিষয়ের নিষ্পত্তির ভার পার্লামেণ্টারী সব-কমিটীর হাতে দিতে হইবে। প্রকাশ্যে এই সকল বিষয়ের আলোচনা করা যাইতে পারিবে না। এই প্রস্তাব লইয়া বিতর্ক হয় নাই। এই প্রস্তাবটি পড়িয়া সার চার্লস ইলিয়টের washing the dirty linens of officials in public কথাটি মনে পড়ে। কংগ্রেস ক্রমশঃ ব্যুরোক্রেসীর ক্ষুণ্ণ-মার্গই ধরিতেছেন। সর্দ্দার প্যাটেল প্রস্তাব করিয়াছিলেন—প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর মঞ্জুরী না লইয়া কংগ্রেসের পক্ষ হইতে আইনভঙ্গ আন্দোলন চালান যাইতে পারিবে না। এই প্রস্তাবটি লইয়া এক প্রহরকাল তর্ক চলিয়াছিল। বামপন্থীরা ইহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। এই প্রস্তাবের প্রতিকূলে ৬০টি—স্বপক্ষে ১ শত ৩০টি ভোট হওয়ায় প্রস্তাবটি গ্রাহ্য হইয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় সম্প্রতি ভারতবাসীদিগের সম্বন্ধে যে প্রতিকূল বিধি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে; সিংহল হইতে ভারতবাসী শ্রমিক বিতাড়নের ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইয়াছে; তাহার কথাও এই বৈঠকে আলোচিত হইয়াছিল। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু দুই সপ্তাহ পরে সিংহলে যাইয়া এ বিষয়ের একটা মীমাংসার প্রয়াস পাইবেন স্থির হইয়াছে। সিংহল সরকার কি বলেন, তাহা তখন বুঝা যাইবে।

বাঙ্গালায় মুসলমান রাজত্ব

কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের সংশোধক বিলের আলোচনা প্রসঙ্গে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সদস্য খাঁ বাহাদুর আবদুল করিম বলিয়াছেন—এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য—বাঙ্গালায় মুসলমান রাজত্ব প্রতিষ্ঠা। বাঙ্গালার ইতিহাসে দেখা যায়, বৃটিশ জাতি মুসলমানদিগের নিকট হইতে বাঙ্গালা বিহার এবং উড়িষ্যার দেওয়ানী লইয়াছিলেন। এখন তাঁহারা সেই ভার আবার বাঙ্গালার পূর্ব্ব অধিস্বামীদিগকে ফিরাইয়া দিতেছেন। খাঁ বাহাদুর এই কল্পনা লইয়াই মসগুল থাকুন। আজ বাঙ্গালা প্রদেশে মুসলমান সচিবরা অবাধে যাহা করিয়া যাইতেছেন—তাহা বিশ্ববাসী বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে দেখিতেছেন।

কিন্তু আইন-মতে এই সচিবগণ সরকার নহেন, তাঁহারা সরকারের পরামর্শদাতা মাত্র। এই সামান্য অধিকার লাভে যাঁহারা স্পর্দ্ধা-গর্ব্বে আত্মহারা—আমরা 'বাদশা বনেছি' বলিয়া আহ্লাদে আটখানা হইয়াছেন, তাঁহাদের সে উন্মাদনাটি সত্যই হাস্যোদ্দীপক নহে? কিন্তু যে সকল প্রদেশে হিন্দুরা মন্ত্রিত্ব পাইয়াছেন, 'তাঁহারা ত' এইরূপ গৌরব-গর্ব্বে বিভ্রান্ত হন নাই? পার্থক্য এইখানে।

জাতীয় পতাকা ও বন্দে মাতরম

গত ১লা জুলাইএর (১৬ই আষাঢ়) 'হরিজন' পত্রে জাতীয় পতাকা এবং জাতীয় সঙ্গীত বন্দে মাতরম্ সম্বন্ধে মহাত্মাজীর নির্দ্দেশ পড়িয়া আমরা বিস্মিত—স্তম্ভিত হইয়াছি। তাঁহার উক্তির মর্ম্ম—যে সময়ে অসহযোগ আন্দোলন প্রবল ছিল, সে সময়ে জাতীয়তার প্রতীকস্বরূপ জাতীয় পতাকা সকলেই উত্তোলন করিতে চাহিতেন—সম্মান প্রদর্শন করিতেন। আলিভ্রাতৃদ্বয়ও বহু বক্তৃতায় এই জাতীয় পতাকার প্রশংসা করিয়াছিলেন। সাম্রাজ্য-বাদের শোষণে নিপীড়িত অহিংস জাতির ইহা ছিল শান্তিপূর্ণ বিদ্রোহের প্রতীক। চরকা ও খাদির সেবায় সম্মিলিত দেশবাসীর বিপুল গঠনকার্য্যে আত্মনিয়োগের ইহা ছিল নিদর্শন। ইহা সেই সময় সর্ব্ব সম্প্রদায়ের মিলনেরই প্রতীক ছিল। তখন ইহার সার্থকতা পূরা মাত্রায় বিদ্যমান ছিল। এখন ইহা লইয়া বিবাদ উপস্থিত—অনেক স্থানে পতাকা উত্তোলনে আপত্তি হইতেছে। ত্রিবর্ণরঞ্জিত এই জাতীয় পতাকা এখন সাম্প্রদায়িক বিরোধের প্রতীকে পরিণত হইতেছে। এরূপ অবস্থায় কোন মিশ্র সভায় বা সম্মেলনে—যেখানে একজন লোকও ইহাতে আপত্তি করিবেন বা করিতে পারেন, সেখানে এই পতাকা উত্তোলন করা যাইতে পারিবে না। সমস্যা সমাধানের ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যকর অহিংস মনোভাব। জাতীয় পতাকা সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, প্রয়োজনানুরূপ পরিবর্ত্তনের পর জাতীয় সঙ্গীত 'বন্দে মাতরম্' সম্বন্ধেও তিনি এইরূপ বিধি-নিষেধের ব্যবস্থা দিয়াছেন। মহাত্মাজী বলিয়াছেন, কি জন্য—কখন এই সঙ্গীত রচিত হইয়াছিল, তাহা বিচার্য্য নহে। বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনকালে ইহা বাঙ্গালায় হিন্দু-মুসলমানের সমরসঙ্গীতরূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। ইহা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ধ্বনি। মহাত্মাজী বলিয়াছেন, তিনি যখন বালক ছিলেন, যখন তিনি বঙ্কিম বাবু এবং আনন্দ মঠের নাম পর্য্যন্ত শুনেন নাই, তখন 'বন্দে মাতরম্' গান শুনিয়া তিনি যেন মন্ত্রমুগ্ধবৎ হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে যাহা সোণা ছিল, এখন তাহা পিতল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সোণা যখন পিতলের দরে বিকায়, তখন সোণা বিক্রয়ার্থ বাজারে উপস্থিত করা উচিত নহে। জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে 'বন্দে মাতরম্' গীত লক্ষ লক্ষ লোকের হৃদয়-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। বাঙ্গালার ভিতরে এবং বাহিরে ইহা লক্ষ লক্ষ লোকের হৃদয়ে প্রগাঢ় জাতীয় ভাব উদ্দীপিত করে। যত দিন জাতি থাকিবে, তত দিন এই পতাকা এবং এই সঙ্গীত থাকিবে। তবে কোন মিশ্র সভায় এক ব্যক্তিও যদি ইহাতে আপত্তি করে, তাহা হইলে এই সঙ্গীত তথায় গীত হইবে না। ইহাই মহাত্মাজীর উক্তির সার মর্ম্ম।

আমরা মহাত্মাজীর এই উক্তি এবং যুক্তি শুনিয়া বিস্মিত। তিনি বলিয়াছেন, জাতীয় পতাকায় এবং 'বন্দে মাতরম্' গীতে কোন প্রকার দোষ নাই বটে,—কিন্তু উহাকে তিনি বিবাদের কারণ করিতে চাহেন না। কিন্তু যাঁহারা ইহাকে বিবাদের কারণ করিতেছে, তাহারা তাহা কেন করিতেছে, তাহাও এই উপলক্ষে চিন্তা করা কর্ত্তব্য নহে কি? যাহারা বিবাদের হেতু না থাকিলেও বিবাদ বাধায়, তাহাদের কথা শুনিয়া যদি সকল বিষয় ত্যাগ করিতে হয়, তাহা হইলে একে একে সকল বিষয় প্রতিপক্ষের অনুগ্রহের উপর ছাড়িয়া দিয়া সম্পূর্ণ রিক্ত হইয়া বসিতে হইবে। যেখানে পশ্চাৎস্থিত কোন ছায়ার প্ররোচনায় ব্যক্তিবিশেষ বা সম্প্রদায়বিশেষ অন্যের সহিত কলহ করিতে প্রবৃত্ত হয়, সেখানে কলহের সম্ভাবিত বিষয় ছাড়িয়া দিলেই কি কলহ পরিহার করা সম্ভবে? যাহারা অবিচলিত চিত্তে স্বার্থসিদ্ধির আশায় নানা ছলে বিরোধ বাধাইবার প্রয়াস পায়, তাহাদের মনস্তুষ্টি সম্পাদন সম্ভবপর কি? মহাত্মাজী হয়ত মনে করিয়াছেন যে, বিবাদের কারণ অন্যপক্ষ খুঁজিয়া না পাইলে বিবাদে ক্ষান্ত হইবে। কিন্তু ইহা তাঁহার বিষম ভুল। রাজনীতি ব্যাপার আর ধর্ম্মের ব্যাপার এক নহে। মানুষ ন্যায়ের দৃষ্টিতে ধর্ম্মের ব্যাপার দেখে, কিন্তু রাজনীতিক ব্যাপার দেখে স্বার্থের দৃষ্টিতে। ধর্ম্মে একটা

পরকালের ভয় বা বিধাতার শাস্তির ভয় থাকে। রাজনীতিতে সে ভয় থাকে না। থাকে কেবল পরাজয়ের ভয়। কাযেই যাহারা রাজনীতিক ক্ষেত্রে একটা কু-অভিসন্ধিযুক্ত, তাহারা যতক্ষণ প্রবল বাধা না পায়, ততক্ষণ তাহারা প্রতিপক্ষের উপর নির্ম্মম হইয়া কায করে। সেইজন্য ধর্ম্মের ক্ষেত্রে যে নীতি সফল হয়, রাজনীতি ক্ষেত্রে সে নীতি সফল হইতে পারে না।

জাতীয় পতাকা ও সঙ্গীত সম্বন্ধে মহাত্মাজীর সিদ্ধান্ত ও নির্দ্দেশ পড়িয়া মনে হয়, এই বিষয়েও তাঁহার নীতি নিষ্ফল হইয়াছে অনুমান করিয়া তিনি এ ক্ষেত্রেও পশ্চাদাবর্ত্তন করিলেন। ইহাতে প্রতিপক্ষ-দল উৎসাহ পাইবে, স্বপক্ষ ভগ্নোৎসাহ হইবে। ইহা তাঁহার পরাজয়েরই লক্ষণ। কিন্তু সেই পরাজয় স্পষ্ট স্বীকার করিতে তিনিও কুণ্ঠিত হইয়াছেন।

ফেডারেশন সম্বন্ধে মহাত্মাজীর অভিমত

গান্ধীজী মার্কিণ-সাংবাদিকের নিকট বলিয়াছেন, ফেডারেশন সম্বন্ধে তাঁহার সহিত কর্ত্তৃপক্ষের কোন কথাবার্ত্তাই চলিতেছে না। অবশ্য কখনও এ সম্বন্ধে কোন কথা হইয়াছিল কি না, তাহা তিনি বলেন নাই। তিনি বলিয়াছেন—"যত দিন কংগ্রেস অথবা মুসলমানগণ কিম্বা রাজন্যবর্গ উহা মানিয়া না লইতেছেন, ততদিন উহা প্রবর্ত্তিত হইবে না, ইহাই আমার নিশ্চিত বিশ্বাস। আমার মনে হয়, বৃটিশ রাজনীতিকবর্গ অনিচ্ছুক এবং অসন্তুষ্ট ভারতবর্ষের স্কন্ধে ফেডারেশন চাপাইয়া দিবেন না। পরন্তু তাঁহারা পক্ষগণকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিবেন। অন্ততঃ ইহাই আমার আশা। যদি ভারতের স্কন্ধে ইহা চাপাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহা বড়ই দুঃখজনক হইবে। মনে মনে রুষ্ট এবং প্রতিকূল লোকসমাজে সম্মিলিত রাষ্ট্রতন্ত্র গড়িয়া তোলা সম্ভবে না। যদি কোন পক্ষই ফেডারেশন না চাহে, তাহা হইলে দেশের লোকের উপর উহা চাপাইয়া দেওয়া ঘোর নির্ব্বুদ্ধিতাসূচক হইবে।" মহাত্মাজীর মতে তিন পক্ষের কোন এক পক্ষ সম্মত না হইলে বৃটিশ রাজনীতিকদের উহা ভারতবাসীর স্কন্ধে চাপাইয়া দেওয়া ঘোর নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক হইবে। অর্থাৎ এক পক্ষ সম্মত হইলেই তাঁহারা ভারতবাসীর উপর উহা চাপাইয়া দিবেন। গান্ধীজী কি বর্ত্তমান রাজনীতিক পরিস্থিতি দেখিয়া বুঝিতে পারিতেছেন না যে, এই ব্যাপারে তিন পক্ষের মধ্যে এক পক্ষকে রাজী করা কঠিন হইবে না। কংগ্রেসের আপত্তি যে কারণে, মুস্লেম লীগ বা মুসলমান নেতাদিগের আপত্তির কারণ ঠিক সেই কারণে নহে। পঞ্জাবের সার সেকেন্দার হাইয়াৎ খাঁ সে দিন বোম্বাইয়ের এক জলযোগের সভায় মুসলমানদিগের আপত্তির কারণ কি, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, ভারত-শাসন আইনে সরকার যেরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে কেন্দ্রী সরকারে হিন্দুদিগের বলাধিক্য হইবেই। কারণ, হিন্দুরা সংখ্যায় অধিক। হিন্দুর প্রভাব তাঁহাদের অসহ্য। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে তুষ্ট করা কি কর্ত্তৃপক্ষের পক্ষে কতকটা সহজ হইবে না? এরূপ ক্ষেত্রে অসন্তুষ্ট এবং বিক্ষুব্ধ ভারতের উপর সরকার যে ফেডারাল গভর্ণমেণ্ট চাপাইয়া দিবেন না,—এ ধারণা যে গান্ধীজীর কেন হইল, তাহা বুঝা গেল না। ভারতের স্কন্ধে ফেডারেশন চাপাইবার জন্য এখনও ভিতরে ভিতরে কম চেষ্টা হইতেছে না। সার সেকেন্দার এই কথাগুলি এই সময়ে কেন বলিলেন, তাহাও ভাবিয়া দেখা উচিত। সুভাষ বাবু বলিতেছেন, কনষ্টিটিউশ্যানাল এসেম্ব্লি কর্ত্তৃক ফেডারেশনের পরিকল্পনা না করিলে তাহা গ্রাহ্য হইতে পারে না। কিন্তু সুভাষ বাবুর কথা যে কর্ত্তারা কোনমতেই শুনিবেন না, ইহা নিশ্চিত।

মহাজনী আইন

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে মহাজনী আইনের পাণ্ডুলিপি গৃহীত হইয়া গিয়াছে। এখন বঙ্গীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদে ইহার আলোচনা হইবে। বঙ্গীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদে এই পাণ্ডুলিপিখানি যে গ্রাহ্য হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বাঙ্গালার লাট সাহেবও সম্ভবতঃ এই পাণ্ডুলিপিখানিকে আইনে পরিণত করিতে সম্মতি দিবেন। অতঃপর বাঙ্গালী হিন্দুদিগের পক্ষে আর মহাজনী ব্যবসায় করা সম্ভব হইবে না। কারণ, এই আইন প্রবর্ত্তনের পর মহাজনদিগের পক্ষে খাতকদিগের নিকট হইতে পাওনা টাকা আদায় করা কঠিন হইবে। মহাজনদিগের সুদের হার

নিয়ন্ত্রণ করাই এই আইনের উদ্দেশ্য। কিন্তু কার্য্যতঃ পাণ্ডুলিপিতে কেবল সুদের হার নিয়ন্ত্রণ করাই হয় নাই। সুদের হার নিয়ন্ত্রণের নামে মহাজনদিগকেও সংহার করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। মহাজনদিগের মধ্যে অধিকাংশই হিন্দু—ইহাদের মধ্যে মাড়োয়ারী, ভাটিয়া প্রভৃতির মত বাঙ্গালীও আছেন। মুসলমানদিগের মধ্যে কাবুলীরা অত্যধিক সুদে টাকা ধার দেয়। এখন টাকা আদায়ের অসুবিধা হেতু অনেকেই আর মহাজনী করিবে না। আলোচ্য আইনে বন্ধকী ঋণের সুদ বার্ষিক শতকরা ৮৲ টাকা এবং বেবন্ধকী ঋণের সুদ বার্ষিক শতকরা ১০৲ টাকা পর্য্যন্ত ধার্য্য করা হইয়াছে। ইহাতে মহাজন সম্পত্তি বন্ধক না রাখিয়া ঋণ দিতে সম্মত হইবে না। এ দেশের অধিকাংশ মাড়োয়ারী মহাজনই প্রকারান্তরে মহাজনীর দালালি করিয়া থাকেন। তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে সরকারের জানিত ব্যাঙ্ক হইতে অল্প সুদে টাকা লইয়া সেই টাকা অধিক সুদে খাতকদিগকে ধার দেন। তাঁহারা আর এই কার্য্য করিবেন না। এখন কথা হইতেছে যে, তাঁহারা এই কার্য্য না করিলে মফস্বলে নিত্য অভাবগ্রস্ত কৃষীবলের সুবিধা হইবে কি? য়ুরোপীয়রা এবং সরকারের জানিত ব্যাঙ্কগুলি হয় ত সে কায করিতে সম্মত হইতে পারেন। কিন্তু তাহার ফল কোন পক্ষেরই সুবিধাজনক হইবে না। কৃষীবলও মহাজনের নিকট যে সুবিধা পাইত, তাহা পাইবে না—ব্যাঙ্কগুলিও মফস্বলে যাইয়া কাহার কি আছে না আছে দেখিয়া,—কে সৎ, কে অসৎ, তাহার সন্ধান লইয়া টাকা দাদন করিতে পারিবে না। শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু ব্যবস্থাপক সভায় এই প্রকার পক্ষপাতমূলক আইনের অপকারিতা বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন,—কিন্তু যাঁহারা স্বার্থান্ধ, তাঁহাদিগকে বুঝান যায় না। কাযেই এই আইনে কৃষিঋণের সমাধান আদৌ সম্ভবপর নহে। মহাজন যে টাকা পূর্ব্বে ধার দিয়াছেন, তাহার সুদের হার সাব্যস্ত হইয়া গিয়াছে। তাহার সুদও কমিবে এবং সামান্য কিস্তিবন্দী হিসাবে মহাজন পুরুষানুক্রমে টাকা ওয়াশীল লইতে বাধ্য হইবেন। এই আইনে মহাজনকে ফাঁকিবার সর্ব্বপ্রকার কৌশলই বৈধ বলিয়া বিধিবদ্ধ হইতে চলিয়াছে। এখন বঙ্গীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদেও যে ইহার দোষাবহ ব্যবস্থাগুলি সংশোধিত হইবে, সে আশা দুরাশা। কারণ, সেখানেও এই দলই প্রবল।

কংগ্রেসে বিবাদ

কংগ্রেসের মধ্যে একটা প্রবল বিবাদের সম্ভাবনা। বিবাদ বাধিয়াছে বলাও যাইতে পারে। বোম্বাই সহরে ৯ই আষাঢ় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর যে অধিবেশনের আরম্ভ হয়, তাহার তৃতীয় দিনে এই মর্ম্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল যে, পূর্ব্বে কোন প্রদেশের রাষ্ট্রীয় সমিতির অনুমতি না লইয়া সেই প্রদেশে সত্যাগ্রহ আন্দোলন উপস্থিত করিতে পারা যাইবে না। এই অধিবেশন প্রারম্ভে সভাপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলিয়াছিলেন, "কোন কংগ্রেস-কর্ম্মী যদি ইচ্ছা করিয়া কংগ্রেসের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করেন এবং নিয়ম পালনে বাধা দেন, তাহা হইলে কংগ্রেসের এবং দেশের স্বার্থরক্ষার জন্য তাঁহার উপর শাস্তিদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে।" এই প্রস্তাব আলোচনা কালে কংগ্রেসের বামপন্থী দলের সহিত দক্ষিণপন্থী দলের বিলক্ষণ বাক্‌যুদ্ধ হইয়াছিল। বামপন্থীরা মনে করেন যে, প্রস্তাবটি দক্ষিণাচারীদিগের একটা ধাপ্পাবাজি মাত্র; দেশের হিতসাধনকল্পে এই প্রস্তাব উপস্থিত করা হয় নাই; বামপন্থীদিগকে দাবাইয়া রাখাই এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু ঐ প্রস্তাবের আলোচনা কালে সে কথা বলিয়াছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ সদস্যের ভোটে সত্যাগ্রহবর্জ্জন প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছে, বামপন্থীদিগের মধ্যে অনেকেই কংগ্রেস কমিটীর বাহিরে আসিয়া গণতান্ত্রিক নিয়ম অনুসারে এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিবেন মনে করিয়াছিলেন। সেই জন্য সুভাষ বাবু ২৪শে আষাঢ় এই প্রস্তাবের প্রতিকূলবাদীদিগকে উহার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ সুভাষ বাবুকে তার করিয়াছিলেন—বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটীর প্রেসিডেণ্ট হিসাবে তিনি যেন এই আন্দোলন বন্ধ করেন। কিন্তু সুভাষ বাবু সে টেলিগ্রাম পান নাই বলিয়াছেন। বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন,—"সুভাষ বাবুর প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ঐ প্রস্তাব নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটীতে গ্রাহ্য হইয়াছে। এখন উহার প্রতিকূলতা করিলে নিয়মানুবর্ত্তিতা লুপ্ত করা হইবে এবং তাহার ফলে কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলা ভঙ্গ হইবে।" ইহার উত্তরে সুভাষ বাবু বলিয়াছেন—"কংগ্রেসে গৃহীত

প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বাহিরে আন্দোলন এবং প্রচার-কার্য্য চালাইবার অধিকার প্রতিকূলবাদীদিগের আছে। এ অধিকার গণতন্ত্রসম্মত। অতএব তিনি ঐ অধিকার ত্যাগ করিবেন না।" ফলে এই ব্যাপার লইয়া বামপন্থীদিগের সহিত দক্ষিণপন্থীদিগের বিবাদ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ যে কথা বলিয়াছেন, তাহা কেবল গণতন্ত্রের ঘোর বিরোধী নহে, পরন্তু তাহা ঘোর স্বৈরাচারিতা-সূচক। কংগ্রেসের কার্য্য যে সাধারণের এবং বিরুদ্ধবাদীদিগের সমালোচনার বহির্ভূত হইবে, ইহা কোন মতেই সঙ্গত হইতে পারে না। কোন প্রস্তাব যদি কতকগুলি লোকের মতে অসঙ্গত বোধ হয়, তাহা হইলে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে প্রতিবাদিগণ তাহাদের মতের বৈধতা প্রদর্শনের জন্য সভা করিয়া প্রচারকার্য্যচালাইতে পারেন। সকল গণশাসিত দেশেই এইরূপ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত আছে। সংখ্যাধিক সম্প্রদায় যে সর্ব্ব সময়ে অভ্রান্ত হইবেন, ইহা মনে করা অতিশয় ভুল। এরূপ স্থানে সংখ্যাল্প সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত সেই আন্দোলন বন্ধ করিয়া দিবার ব্যবস্থা ঘোর স্বৈরিতা-সূচক। স্বরাজীদল গয়া কংগ্রেসে সরকারী ব্যবস্থা পরিষদ প্রভৃতিতে প্রবেশ করিবার প্রস্তাবে পরাজিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে কি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এবং পণ্ডিত মতিলাল নেহরু তাঁহাদের কাউন্সিল প্রবেশ প্রস্তাবের যুক্তিযুক্ততা প্রচারে বিরত হইয়াছিলেন? কোন পক্ষের ন্যায্য অধিকার ক্ষুণ্ণ করা শোভন ও সঙ্গত নহে। বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রমুখ দক্ষিণপন্থীরা আপনাদের সুবিধার জন্য বোম্বাইয়ে যে সত্যাগ্রহ নিরোধক প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহার আলোচনা বন্ধের জন্য তাঁহারা যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে যেন তাঁহারা কি একটা ব্যাপার গোপন করিবার প্রয়াসই পাইতেছেন বলিয়া সন্দেহ হয়। কারণ, উভয় পক্ষ যদি প্রকাশ্যে যুক্তিতর্ক প্রয়োগে বিষয়টির বিচার করিতেন, তাহা হইলেই সন্দেহের নিরসন হইত—কার্য্যটাও গণতন্ত্রসম্মত হইত। যাঁহারা দেশের স্বাধীনতাকামী বলিয়া স্পর্দ্ধা করেন, তাঁহারা যদি এইভাবে কংগ্রেসকর্ম্মীদিগেরও স্বাধীনতা হরণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দেহ হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু সে জন্য দায়ী কংগ্রেসের বর্ত্তমান কার্য্যকরী সমিতি। মহাত্মাজী পূর্ব্বে বহুবার কংগ্রেসে গণতন্ত্রাধিকার প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, বিলাতী পার্লামেণ্টে যেমন নানা মতাবলম্বী লোক আছে, কংগ্রেসে তাহাই থাকিবে। যখন যে মতাবলম্বী দল নির্ব্বাচনে প্রাধান্য লাভ করিবেন, সেই দলই কংগ্রেস পরিচালনা করিবেন। কোন দলের মতপ্রকাশে বাধা দিবার প্রয়োজন আছে, এমন কথা ত তিনি প্রকাশ্যে কখনও বলেন নাই। তবে রাজেন্দ্র-বল্লভ এণ্ড কোম্পানী আপনাদের খেয়াল অনুসারেই কাষ করিতেছেন, মহাত্মাজীও তাঁহাদের প্রভাবে আত্মহারা।

কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট ও প্রবাসে ভারতবাসী

ডাক্তার রাজেন্দ্রপ্রসাদ ভারতের ৮টি কংগ্রেস-শাসিত প্রদেশের মন্ত্রিমণ্ডলীকে বৃটিশ-শাসিত ডোমিনিয়নে এবং উপনিবেশে,—বিশেষতঃ দক্ষিণ-আফ্রিকায় এবং সিংহলে—ভারতবাসীর উপর যে নির্য্যাতন হইতেছে, তাহার জন্য বড়লাটের নিকট প্রতিবাদ করিতে বলিয়াছেন বলিয়া সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। ভারতবাসীদিগের সহিত পক্ষপাতপূর্ণ ব্যবহারের এবং নির্য্যাতনের অবসান জন্য কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলী যাহাতে ভারত সরকারকে এবং বিলাতী সরকারকে পীড়াপীড়ি করিয়া ধরেন, তিনি সে জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। যদি বড়লাট ঐ কার্য্যে সাড়া না দেন অথবা বিলাতী সরকারকে ভারতবাসীদিগকে নিগ্রহ করিবার গুরুত্ব উপলব্ধি করাইবার চেষ্টা না করেন, তাহা হইলে এই ব্যাপারটি নিখিল ভারতীয় সমস্যায় পরিণত করা হইবে। তিনি দক্ষিণ-আফ্রিকায় প্রবাসী ভারতবাসীদিগকে আন্দোলন সমভাবে পরিচালন করিতে বলিয়াছেন এবং তাঁহাদের কার্য্যে নিখিল ভারতের সমর্থন জ্ঞাপন করিয়াছেন। ভারতবাসীদিগের এই অবমাননা ভারতবাসীরা কখনই ভুলিবে না বলিয়া তিনি বৃটেনকে জানাইয়াছেন। এই সংবাদ যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আমরা ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদের এই কার্য্যের সম্পূর্ণ সমর্থন করি। প্রবাসী ভারতবাসীদিগের উপর অত্যাচার ভারতবাসীর উপরই অত্যাচার, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যদি তিনি তাঁহার ঐ পরামর্শগুলি বিহারপ্রবাসী বাঙ্গালীদিগের সম্বন্ধে প্রয়ো-

করিবার জন্য বিহারের মন্ত্রিমণ্ডলীকে অনুরোধ করিতেন, তবে আমরা তাঁহার তথাকথিত কার্য্যের আরও সমর্থন করিতে পারিতাম। তাহা হইলেই তাঁহার এই কার্য্যে ঐকান্তিকতা আরও প্রকাশ পাইত। অধিকন্তু যে সকল বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চল সাম্রাজ্যবাদীদিগের রাজনীতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিহারের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, সেগুলি বাঙ্গালাকে ফিরাইয়া দিবার জন্য যদি নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটীকে এবং বিহারের মন্ত্রিমণ্ডলীকে আন্দোলন করিবার জন্য অনুরোধ করিতেন, তাহা হইলেই তাঁহার উদ্দেশ্যের আন্তরিকতা প্রকট হইত। বাঙ্গালার ঐ সকল অঞ্চল খনিজ-সম্পদে পূর্ণ বলিয়া উহা বিহারের কুক্ষিগত করিয়া রাখিবার চেষ্টা রাজনীতিক সাধুতার সূচনা করে না।

কোন্ পথে ?

গত ২৩শে আষাঢ়ের 'হরিজন' পত্রের প্রবন্ধে মহাত্মা গান্ধী বর্ত্তমান সময় ব্যাপক অহিংস আন্দোলন চালাইবার উপযোগী নহে, এই কথাই বিশেষভাবে বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, বর্ত্তমান সময়ে যদি বহুসংখ্যক লোককে লইয়া অহিংসার নামে কোন ব্যাপক আন্দোলন আরম্ভ করা যায়, তাহা অচিরাৎ হিংসাপূর্ণ হইয়া উঠিবে। হিংসার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারেন অহিংসভাব যাঁহার মধ্যে বিকাশ লাভ করিয়াছে, এরূপ এক জনকে পাওয়া গেলে তাহার হুদ্দার মধ্যে তিনি যেখানে হিংসা আছে, তাহার প্রতিকারের উপায় স্থির করিয়া দিতে পারিবেন। নিজের অসম্পূর্ণতার কথা তিনি বার বার বলিয়াছেন। "আমি পূর্ণ অহিংসার দৃষ্টান্ত নহি। আমি এখনও বিকাশ লাভ করিতেছি। আমার মধ্যে যতটুকু অহিংসা বিকাশ লাভ করিয়াছে, এ পর্য্যন্ত যে অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহাকে আঁটিয়া উঠিবার পক্ষে তাহা যথেষ্ট বটে। কিন্তু এখন আমি চারিদিক হিংসা-পরিবেষ্টিত দেখিয়া আপনাকে অসহায় মনে করিতেছি।" মহাত্মাজী কি প্রকারান্তরে স্বীকার করিতেছেন যে, অহিংস অসহযোগ আন্দোলন বিফল হইয়াছে? দেশের সর্ব্বসাধারণ বা অধিকাংশ লোকই যে পূর্ণমাত্রায় অহিংসভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিতে পারে, মনুষ্য-প্রকৃতি সম্বন্ধে যাঁহার কিছুমাত্র জ্ঞান আছে, তিনি তাহা মনে করিতে পারেন না। সাধারণ মানুষের পক্ষে ক্রোধই স্বাভাবিক —ক্রোধই হিংসার জনক। মহাত্মাজীর উক্তির ভাবার্থ—জোর করিয়া কোন পক্ষকে কোন কার্য্য করিতে বাধ্য করা অহিংসার লক্ষ্য নহে। উহা মানুষের হৃদয়ের পরিবর্ত্তন সাধন দ্বারা প্রতিপক্ষকে নিজ ভুল বুঝাইয়া স্বেচ্ছায় স্বমতে আনিবার অমোঘ উপায়। ধর্ম্মশাস্ত্র মতে তাহা সম্ভব সত্য, কিন্তু সে প্রকার অহিংস প্রকৃতি ত মানব সমাজে কস্মিনকালেও সুলভ হয় নাই। মহাত্মাজী স্বয়ং কথায়, কায়ে এবং চিন্তায় হিংসাবর্জ্জিত বলিয়াই তাঁহার ভক্ত-সমাজে বিদিত। কিন্তু তিনি নিজেই বলিয়াছেন, "তিনি অহিংসার উদাহরণস্বরূপ নহেন। তিনি এখন অহিংসার পথে অগ্রসর হইতেছেন—এখনও সম্পূর্ণ অহিংস হইতে পারেন নাই।" কিন্তু তিনি যতটা এই পথে অগ্রসর হইয়াছেন, এই অহিংস পথে রাজনীতিক্ষেত্রে ততটা অগ্রসর আর কেহ হইতে পারিয়াছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই। যে প্রকার পূর্ণ সাত্ত্বিকতা স্বার্থসর্ব্বস্ব সাম্রাজ্যবাদী হৃদয়কে বিগলিত করিয়া নূতন ভাবে গড়িয়া তুলিতে সমর্থ—যে প্রকার সাত্ত্বিক ভাব স্বার্থপরতাকে কালিমামুক্ত করিয়া পরার্থপরতায় পরিণত করিতে পারে—মরলোকে বিনা কঠোর সাধনায় সেরূপ প্রশান্ত অহিংসার অবস্থা লাভ করা সম্ভবে বলিয়া মনে হয় না! এরূপ অবস্থায় অহিংস আন্দোলন ব্যাপক ভাবে পরিচালনা করা অসম্ভব, ইহাই মহাত্মাজীর উক্তির নির্গলিতার্থ। তিনি বলিয়াছেন, বর্ত্তমান সময়ে যদি ব্যাপক ভাবে অহিংস প্রতিরোধ আন্দোলন আরম্ভ করা হয়, তাহা হইলে অধিকাংশ স্থলে উহা বিশৃঙ্খল ভাবে এবং কোথাও কোথাও বা শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে পরিচালিত হইয়া হিংসার উদ্ভব করিবে। তাহা হইলে কংগ্রেসের অপযশ ঘটিবে, কংগ্রেসের প্রচেষ্টার সর্ব্বনাশ সাধন করিবে এবং বহু গৃহ বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে।" সেই জন্যই মহাত্মাজী কংগ্রেসওয়ালাদিগের সমস্ত শক্তি সংগঠনমূলক কার্য্যে নিয়োগ করিতে এবং কি সামন্ত রাজ্যে কি বৃটিশ সাম্রাজ্য-বাদের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ এবং অন্য গণ-আন্দোলন বন্ধ করিয়া দিতে চাহিতেছেন। তিনি রাজনীতিক বন্দীদিগকে উপবাস করিয়া বর্ত্তমান অবস্থার জটিলতা বৃদ্ধি করিতে নিষেধ করিয়াছেন। ফলে তিনি এখন প্রকারান্তরে স্বীকার করিতেছেন, যে তাঁহার অহিংস অস্ত্রগুলি বশিষ্ঠের ব্রহ্মদণ্ডাহত

বিশ্বামিত্রের অস্ত্রের ন্যায় নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে। এখন যতদিন ভারতের আপামর সাধারণ সকল লোক সাত্ত্বিক বলে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং শুকদেব গোস্বামীর মত নির্ব্বিকার ও আত্মজয়ী না হইতে পারিতেছেন, ততদিন ভারতবাসী আর ব্যাপক ভাবে রাজনীতিক আন্দোলন উপস্থিত করিতে পারিবে না। গান্ধীজীর মজবুত নৌকায় চড়িয়া শেষটা মাঝ দরিয়ায় এই বিপত্তি! এখন উপায়?

প্রধান মন্ত্রীর গর্ব্ব

বাঙ্গালার প্রধান মন্ত্রী মৌলভী ফজলুল হক ডাক দিয়া বলিতেছেন যে, বাঙ্গালার মুসলমানগণ অকর্ম্মণ্য ত নহেন, অযোগ্যও নহেন। ভাল কথা। তাঁহারা অধিক অকর্ম্মা বা অযোগ্য, এ কথা ত অন্য কেহই বলেন না। যদি কেহ বলেন, তাহা হইলে সে কথা তাঁহারাই পরোক্ষভাবে বলেন। কারণ, তাঁহারা অন্য সম্প্রদায়ের সহিত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়া কায লইতে নিতান্তই নারাজ। তাঁহাদের সেরূপ নারাজ হইবার কারণ কি? ফজলুল হক ছাহেব তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারেন কি? সাহিত্যে, ইঞ্জিনিয়ারীং বিদ্যায়, চিকিৎসাবিজ্ঞানে, জড়বিজ্ঞানে, রসায়নে এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক অনেক কার্য্যে বঙ্গীয় মুসলমানগণ অন্য সম্প্রদায়কে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাজিত করিয়া কতদূর অধিক কৃতিত্ব প্রকটিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহাও হিসাব করিয়া দেখাইতে হইবে। কেবল বাক্যে জগৎ জয় করা যায় না।

সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারায় আপত্তি

সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা যে ভারতে সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তি সুদৃঢ় করিবার জন্য পরিকল্পিত হইয়াছে, তাহা এখন বোধ হয় কাহারও বুঝিতে বাকী নাই। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে মহাত্মাজী পুণা জেলে কারারুদ্ধ অবস্থায় ম্যাকডোনাল্ডী সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার প্রতিবাদকল্পে উপবাস আরম্ভ করিয়াছিলেন। সেই উপবাস-মাহাত্ম্যে সুফলের পরিবর্ত্তে কুফল ফলিয়াছে। কারণ, ডক্টর আম্বেদকরকে তুষ্ট করিতে যাইয়া তিনি বাঙ্গালার সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা ম্যাক্‌ডোনাল্ডের পরিকল্পনাকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। সেই পরামর্শ-সভায় তিনি এক জন বাঙ্গালী রাজনীতিককেও ডাকেন নাই। মিষ্টার র‍্যামজে ম্যাক্‌ডোনাল্ড যতটা করিতে সাহস পান নাই, তিনি অনায়াসে তাহা করিয়া দিয়াছেন। সেই জন্য মিষ্টার ম্যাক্‌ডোনাল্ড গান্ধীজীর ঐ প্রস্তাব পাইয়াই লুফিয়া লইয়াছিলেন। এই সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার ফলে বাঙ্গালা রসাতলে যাইতে বসিয়াছে, পঞ্জাব পরিত্রাহি ডাক ছাড়িতেছে। এখন ইহা থামাইতে না পারিলে আর রক্ষা নাই। সেই জন্য আগামী আগষ্ট মাসে কলিকাতায় সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারাবিরোধী সম্মেলনের আয়োজন হইতেছে। গতবার দিল্লীতে ও তৎপূর্ব্বে কয়েক স্থানে এই সম্মেলনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা ব্যবস্থা যে কেবল গণতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিরোধী তাহাই নহে, পরন্তু জাতির উন্নতিলাভের পক্ষেও ঘোর বিঘ্ন, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। প্রতিবাদে কোন ফল না হইতে পারে, কিন্তু আমরা যে উহা স্বীকার করিয়া লই নাই, সে কথা বুঝাইবার জন্য প্রতিবাদ-সভা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। আমরা এই সভার সাফল্য কামনা করি।

নরেন্দ্রমণ্ডলী ও ফেডারেশন

বোম্বাই সহরে নরেন্দ্রমণ্ডলীর বৈঠকে তাঁহারা ফেডারেশনে যোগদানের পক্ষপাতী নহেন বলিয়া প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। ২৮শে আষাঢ়ের শিমলার সংবাদে প্রকাশ, পঞ্জাব প্রদেশের নরেন্দ্রগণ বলিয়াছেন, বোম্বাই সভায় গৃহীত প্রস্তাব রাজন্যগণ গ্রাহ্য করিতে বাধ্য নহেন। শাসন-সংস্কার আইনে যে ভাবে সম্মিলিত রাষ্ট্রতন্ত্র সংগঠনের ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছে, তাহাতে নরেন্দ্রগণের স্বার্থরক্ষার জন্য সামান্য কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া দিলেই তাঁহারা উহা গ্রহণ করিতে পারেন। আমাদের ধারণা, সামন্তরাজগণ উহা শেষে গ্রহণ করিবেন। বৃটিশ সরকারও উহা ভারতের স্কন্ধে চাপাইয়া দিবেন। ফলে ফেডারেশন পরিহার করা সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না। ইহার পরিণতি দেখিবার জন্য আমরা সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছি।

প্রায়োপবেশন

দমদমা এবং আলিপুর জেলে ৮০ জন রাজনীতিক বন্দী ২২শে আষাঢ় হইতে প্রায়োপবেশন করিতেছেন। এই সংবাদে বাঙ্গালার বহু গৃহে ঘোর উৎকণ্ঠার সঞ্চার হইয়াছে। রাজনীতিক বন্দিগণ চোর-ডাকাতের সমশ্রেণীর নৈতিক অপরাধে অপরাধী নহেন। বুদ্ধির ভ্রমে বা উত্তেজনার আতিশয্যে কুপথে চালিত হইয়া তাঁহারা অপরাধ করিয়া বসিয়াছেন। কিন্তু সে জন্য তাঁহারা অনুতপ্ত হইলেও যদি ক্ষমা না করা হয়, তাহাতে সরকার এবং সরকারের পরামর্শ-দাতারা নিন্দাভাজন হন। সরকারের যে সকল পরামর্শদাতা কার্য্যক্ষেত্রে উদারতা প্রদর্শনে অসমর্থ হইয়া সঙ্কীর্ণতাকে আশ্রয় করিয়া কার্য্য করিয়াছেন, ইতিহাস কখনই তাঁহাদের কলঙ্ককে ঢাকিতে পারে নাই। মহাত্মাজীও এই ব্যাপারে তুষ্ণীম্ভাব ধরিয়া আছেন। তিনি রাজবন্দীদিগকে ব্যাপক ভাবে উপবাস করিতে নিষেধ করিয়া কর্ত্তব্য-দায় হইতে অব্যাহতি লইয়াছেন। কুমারী মীরা গুপ্তা মহাত্মাজীকে প্রায়োপবেশনকারীদিগের প্রতি সহানুভূতিসূচক প্রায়োপ-বেশনে প্রবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু মহাত্মাজী সে প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। তিনি এখন বলিতেছেন, প্রায়োপবেশন সকল ক্ষেত্রেই মন্দ, কাহাকেও উহা করিতে পরামর্শ দেওয়া উচিত নহে। কিন্তু তিনি মাঝে মাঝে উপবাস করেন কেন? তিনিই কি উপবাসের একমাত্র আদি এবং অকৃত্রিম অধিকারী? মহাত্মাজী কখন্ কি ভাবে বিভোর হইয়া কি বলেন, তাহা বুঝা কঠিন। ২৬শে আষাঢ় বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে কৃষক-প্রজাদলের নেতা মৌলভী সামসুদ্দীন আহম্মদ, শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু এবং শ্রীযুত প্রতুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় রাজনীতিক বন্দী-দিগের সহিত ব্যবহার সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার খণ্ডন সার নাজিমুদ্দীন করিতে পারেন নাই। রাজনীতিক বন্দীরা তাঁহাদের কৃতকর্ম্মের জন্য অনুতপ্ত হইয়াছেন এবং অনুশোচনা করিতেছেন; সুতরাং তাঁহাদের প্রতি শাস্তিদান-মূলক ব্যবস্থা বহাল রাখা কোন মতেই সভ্যজনোচিত কর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। এই বিষয়ের আলোচনা-কালে ইংরেজ-বণিক্‌দিগের নির্ব্বাচিত সদস্য মিষ্টার কার্টিস মিলার যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় যে, অনেক ইংরেজও মনে মনে সরকারের ঐ নীতির সমর্থন করেন না। রাজনীতিক বন্দীদিগের মুক্তি প্রস্তাবের অনুকূলে ৮৯টি ভোট হইয়াছিল। ইহাতেই বাঙ্গালার গভর্ণর বুঝিতেছেন, জনমত কোন্ দিকে প্রবল। কারণ, বর্ত্তমান বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে ইহা অপেক্ষা জনমতের প্রকাশক ভোট আর অধিক হইবার সম্ভাবনা নাই। যাঁহারা মন্ত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া দল রাখিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা যে ঠিক কতখানি জনমত প্রকাশ করেন, তাহা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি-মাত্রই মনে মনে জানেন। সম্প্রতি এই প্রায়োপবেশনকারী বন্দীদিগের সংখ্যা ৮৯ জন হইয়াছে। সত্য বটে, মহাত্মাজী রাজনীতিক বন্দীদিগকে অনশন করিতে এবং দেশের লোককে রাজনীতিক বন্দীদিগের জন্য উদ্বিগ্ন হইতে নিষেধ করিয়াছেন। তাঁহার হৃদয় ৮৯ রাজনীতিক বন্দীর মৃত্যুপণ অনশন সংবাদে নির্ব্বিকার থাকিতে পারে,—কিন্তু বাঙ্গালার লোক ত সেরূপ অবিচলিত থাকিতে পারে না। আমরা তাঁহাদের জন্য উদ্বিগ্ন। তাঁহাদের কৃতকার্য্যের যথেষ্ট শাস্তি হইয়াছে। তাঁহাদের প্রতি এখন আর কঠোর ব্যবস্থা করিলে দেশের লোকের মনে দারুণ অসন্তোষের সঞ্চার স্বাভাবিক। আশা করি, বাঙ্গালার নবীন লাট সত্বর রাজবন্দিগণকে মুক্তিদানের ব্যবস্থা করিবেন।

রাজদ্রোহ নহে

২৫শে ও ২৬শে আষাঢ়—কলিকাতার দুই জন প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট 'দৈনিক বসুমতী'র বিরুদ্ধে আনীত দুইটি রাজদ্রোহ মামলার রায় প্রদান করিয়া সম্পাদক ও প্রকাশককে অব্যাহতি দিয়াছেন। হাইকোর্ট সুস্পষ্টভাবে অভিমত দিয়াছেন, মন্ত্রীরা 'সরকার' নহেন। তাঁহারা গভর্ণরের বা সরকারের বেতনভুক্ পরামর্শদাতা মাত্র। সাধারণ কর্ম্মচারীর ন্যায় তাঁহারা গভর্ণরের মনঃপুত কর্ম্মচারী না হইলে প্রাদেশিক গভর্ণর তাঁহাদিগকে বরখাস্ত করিতে পারেন। হোয়াইট পেপারে এবং সাইমন কমিশনের রিপোর্টে (৯২ প্যারাগ্রাফে) তাহা স্পষ্ট ভাষাতেই বলা আছে। বর্ত্তমানে যে শাসন-সংস্কার আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা ঐ দুইটিকে বনিয়াদ করিয়াই রচিত। সুতরাং মন্ত্রীরা গভর্ণমেণ্ট নহেন—তাঁহাদের কার্য্যের

বিরুদ্ধ সমালোচনা করিলে রাজদ্রোহ হইতে পারে না। সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয়, এইরূপ রাজদ্রোহের মামলা উপস্থিত করিতে হইলে সরকারের সর্ব্বপ্রধান আইনজ্ঞ—এড্‌ভোকেট জেনারেলের পরামর্শ লইয়া মামলা রুজু করিতে হয়। কিন্তু এই দুইটি মামলা রুজু করিবার সময় কি তাঁহার অভিমত লওয়া হয় নাই? বোধ হয়, গাত্রদাহের জন্য ব্যস্ততায় হকাই মন্ত্রিমণ্ডলী এড্‌ভোকেট জেনারেলের অভিমত লইবার প্রয়োজনানুভব—সময়ের অপব্যবহার করেন নাই। এই দুইটি মামলা সম্বন্ধে কতকগুলি বিষয় জানিবার জন্য চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট হাইকোর্টের যে অভিমত চাহিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, এই মামলা দায়ের করিবার পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে এডভোকেট জেনারেল প্রভৃতির মত লওয়া হইয়াছে বলিয়াই তাঁহার বিশ্বাস ছিল। সেই বিশ্বাস অনেকেরই হইয়াছিল এবং সেই জন্য অনেকেরই মামলার বৈধতা সম্বন্ধে বিবেচনায় ভুল হইয়াছিল। আরও বিস্ময়ের বিষয়, 'দৈনিক বসুমতীর' বিরুদ্ধে আনীত দুইটি মামলা ঠিক একই ধরণের—সম্পাদক প্রকাশকও অভিন্ন। এরূপ ক্ষেত্রে মামলা দুটি এক সঙ্গে বিচারের প্রার্থনা মঞ্জুর করা হয় নাই কেন? একটি মামলার বিচারফল দেখিয়া অপর মামলাটি দায়ের করিলে অথবা পুলিস-কোর্টে এক সঙ্গে দুইটি মামলার বিচার করিলে মামলা চালাইবার জন্য 'দৈনিক বসুমতীর' এত অর্থ অনর্থক ব্যয় হইত না;—মন্ত্রিমণ্ডলীর খেয়াল চরিতার্থ করিবার জন্য সরকার-পক্ষেরও অল্প অর্থের অপব্যয় হইত। অথচ সচিবসঙ্ঘে ৭ জন আইন-পাশ-করা উকিল বিরাজমান। তাঁহাদের কি এই সম্বন্ধে কোন সন্দেহও হয় নাই? যখন তাঁহারা জানেন যে, তাঁহাদের প্রদত্ত পরামর্শ অনুসারে কার্য্য করা এবং না করা প্রাদেশিক গভর্ণরের সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন,—তাঁহাদিগকে বরখাস্ত করিতে হইলে ব্যবস্থা পরিষদ ভাঙ্গিয়া দিতে হয় না, বা পুনর্নির্ব্বাচন করিতে হয় না,—তখন তাঁহারা যে সরকার, এই ধারণা তাঁহাদের মনে গজাইয়া উঠিল কেন? বিলাতের মন্ত্রিমণ্ডলীকে (Cabinet) সরকার বলে সত্য—কিন্তু আইনে উহার স্থান নাই। উহার ক্ষমতা একটা প্রথা দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে। (The British Cabinet is a custom of the constitution) তথাপি ঐ মন্ত্রিমণ্ডলীকে বিদায় করিয়া দিতে হইলে সম্রাটকে দুইটি পন্থা অবলম্বন করিতে হয়। সম্রাট যদি মনে করেন, মন্ত্রীদের কার্য্যে লোকমত প্রতিবিম্বিত হইতেছে না, তাহা হইলে তিনি মন্ত্রীদিগকে বিদায় দিতে পারেন। তখন আবার কমন্স সভার সদস্য নির্ব্বাচন করিতে হয়। এখন এই নীতিই অনুসৃত হইয়া থাকে। প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে সম্রাট মন্ত্রিমণ্ডলী ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন। দ্বিতীয় পন্থা অতি বিপজ্জনক। এদেশের আইনে সে ব্যবস্থার অনুরূপ ব্যবস্থা নাই। সুতরাং আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। বিলাতে মন্ত্রিমণ্ডলী শাসন-সৌধের মূল খিলান। উহার উপরেই শাসন-সৌধ নির্ভর করে। বিলাতী মন্ত্রিমণ্ডলী বিলাতী শাসনযন্ত্রের নিয়ন্তা। সেই জন্যই গভর্ণমেণ্ট নামে অভিহিত। হকাই মন্ত্রিমণ্ডলী কি সেই নজীরে আপনাদিগকে গভর্ণমেণ্ট মনে করিয়া আত্মপ্রসাদে গর্ব্বোস্ফীত হইতেছিলেন? যাঁহাদের গাত্রদাহ প্রশমন জন্য—অবিবেচনার জন্য 'দৈনিক বসুমতীর' এই অর্থব্যয় ও হয়রাণী হইল, বাঙ্গালার গভর্ণর তাঁহাদিগকে একটু সমঝাইয়া দিবেন কি? না হকাই মন্ত্রিমণ্ডলী এইবার একটা রাজদ্রোহের নূতন আইন রচিবেন? আমরা 'দৈনিক বসুমতী'র জয়লাভে বিশেষ আনন্দিত।

ব্যায়ামবীরের আমেরিকা যাত্রা

নদীয়া-শান্তিপুরের অধিবাসিগণের অনেকেই এখন ম্যালেরিয়ার আক্রমণে কঙ্কালসার—জীবন্মৃত; বয়স চল্লিশ বৎসর পূর্ণ না হইতেই অকাল-বার্দ্ধক্যভারে কুব্জপৃষ্ঠ—ন্যুব্জদেহ। এই শান্তিপুরে যে একদিন আশানন্দ ঢেঁকি মাথার উপর ঢেঁকি ঘুরাইয়া দস্যুদলকে চূর্ণ করিতেন, সে কাহিনী এখন উপকথায় পরিণত হইলেও শান্তিপুরের পূর্ব্ব-গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য যাঁহারা প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রফেসর শ্যামসুন্দর গোস্বামী অন্যতম। তিনি বাঙ্গালার যুবকসম্প্রদায়কে দৈহিক বলে বলবান—আত্মনির্ভরশীল করিবার প্রয়াসে তরুণ শিক্ষার্থিগণের প্রধান কেন্দ্র কলিকাতায় যোগবল ও দৈহিক শক্তির অনুশীলনের ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। আগামী ৮ই আগষ্ট আমেরিকার পিট্‌সবার্গে নিউইয়র্কের 'ন্যাচুরোপ্যাথিক সমিতির' ৪৩তম বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে বহু দেশের ব্যায়াম-বিশারদগণের

সমাগম হইবে। শ্রীযুত শ্যামসুন্দর গোস্বামীও সমিতির এই অধিবেশনে নিমন্ত্রিত হইয়া তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য শ্রীমান্ দীনবন্ধু প্রামাণিক সহ আমেরিকায় যাত্রা করিয়াছেন। ইঁহাদের শক্তিচর্চ্চা সম্বন্ধে ১৩৪২ সালের 'মাসিক বসুমতী'তে কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রফেসর গোস্বামী এই সুযোগে আমেরিকার প্রধান প্রধান নগরের দৈহিক শক্তি-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলি পরিদর্শন—অনুশীলন এবং ভারতীয় যোগসাধনা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবেন। আমেরিকা হইয়া তিনি ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইটালী, জার্ম্মাণী প্রভৃতি দেশ পরিভ্রমণ করিয়া, সেই সকল

প্রফেসর শ্যামসুন্দর গোস্বামী
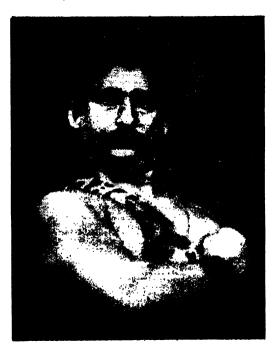
দেশের দৈহিক শক্তিচর্চ্চার প্রতিষ্ঠানগুলি দেখিবেন, ও যোগসম্বন্ধে বক্তৃতা করিবেন।

আজ ভারতের বড় দুর্দ্দিন উপস্থিত। কি আমেরিকা, কি য়ুরোপ—সর্ব্বত্র নানা ভাবে ভারতের বিরুদ্ধে অত্যন্ত হীন 'প্রোপাগাণ্ডা' চলিতেছে; সাহিত্যে, ইতিহাসে, উপন্যাসে, কবিতা ও চিত্রে, এমন কি, 'ফিল্‌মে' পর্য্যন্ত ভারতবাসীকে অসভ্য, বর্ব্বর, পশুর অধমরূপে চিত্রিত করা হইতেছে। মিস্ মেয়োর নানা সংস্করণ মহা উৎসাহে ভারতের নর্দ্দামা হইতে দুর্গন্ধময়, দুঃসহ, দূষিত পঙ্করাশি আহরণ করিয়া দেশ-বিদেশের বায়ুস্তর কলুষিত করিতেছে; অসঙ্কোচে মিথ্যাকে সত্য বলিয়া প্রচার করিতেছে। এ সময় প্রফেসর গোস্বামী ভারতের দৈহিক ও যৌগিক শক্তির প্রকৃত পরিচয় প্রদান করিয়া যদি আমেরিকা ও য়ুরোপের মনস্বী সমাজকে ভারতের প্রতি আকৃষ্ট করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার দেশভ্রমণ সফল ও জীবন-সাধনা সার্থক হইবে।

ডাক-মাশুলের তুলনা

সরকার অসম্ভব উচ্চ হারে ডাক-মাশুল নির্দ্ধারণ করিয়া সৎসাহিত্যের আধারে সার্ব্বজনীন শিক্ষা-বিস্তারের —জ্ঞান-প্রসারের পথে যে পর্ব্বতসম বাধার সৃষ্টি করিয়াছেন, 'মাসিক বসুমতী'তে সে কথা বহুবার আলোচিত হইয়াছে। এই সকল আলোচনা অবশ্যই অরণ্যে রোদনতুল্য ব্যর্থ—নিরর্থক। এই অসম্ভব ডাকমাশুল বৃদ্ধির ফলে সরকারী ডাক-বিভাগের কার্য্য বহু পরিমাণে কমিয়াছে; কিন্তু সময় নির্দ্ধারণ অনুসারে কর্ম্মচারিগণের বেতনের হার ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিয়াছে। মাশুলবৃদ্ধির জন্য পার্শেল, প্যাকেট, ভিঃ পিঃ রেজেষ্টারী, মণিঅর্ডারের সংখ্যা কমিলেও প্রায় ৩ গুণ মাশুল-নির্দ্ধারণের ফলে সরকারী ডাকবিভাগের আয় না কমিয়া বাড়িয়াছে! ইংরেজ ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মুখপত্র 'ক্যাপিটাল'ও পুস্তকাদির উপর উচ্চ হারে ডাকমাশুল নির্দ্ধারণের বিরুদ্ধে যুক্তিপূর্ণ প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। কোন সরকারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে দেশের জ্ঞানবিস্তারে বাধা দেওয়া শোভন ও সঙ্গত নহে। পোষ্ট আফিস জনসাধারণের উপকারের জন্যই প্রতিষ্ঠিত; পোষ্ট আফিসের মারফতেই পুস্তকাদি ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রেরিত হয়। কিন্তু দরিদ্র দেশবাসীর পক্ষে পোষ্ট আফিসের সুবিধা গ্রহণ করা বর্ত্তমান সময়ে অসম্ভব। যে দেশের পনর আনা লোক দরিদ্র, সেই দেশের বুক-পোষ্টের প্রথম পাঁচ তোলার মাশুল তিন পয়সা, পরবর্ত্তী প্রত্যেক আড়াই তোলার মাশুল এক পয়সা, তাহার উপর প্রত্যেক ভিঃ পিঃ, এমন কি, দুই পয়সা মূল্যের সংবাদপত্র বা দুই আনা মূল্যের ক্ষুদ্র পুস্তকের ভিঃ পিঃর বাধ্যতামূলক রেজেষ্টারী ফিঃ তিন আনা এবং সর্ব্বনিম্ন মণিঅর্ডারের হার দুই আনা। অর্থাৎ দুই আনা মূল্যের পুস্তকের সর্ব্বসমেত ভিঃ পিঃ মাশুল সাত আনা নির্দ্ধারিত হইয়াছে! পক্ষান্তরে—ভারতবাসীর অপেক্ষা প্রত্যেক মার্কিণবাসীর আয় গড়ে ২২ গুণ অধিক হইলেও সে দেশে বুক-পোষ্টের ডাকমাশুলের হার প্রত্যেক ৪০ তোলায় দেড় সেণ্ট বা তিন পয়সা মাত্র। কিন্তু দারিদ্র্যনিপীড়িত ভারতে ভিঃ পিঃ—রেজেষ্টারী না করিয়া কেবল বুক-পোষ্টে ৪০ তোলা ওজনের পুস্তক পাঠাইতে চারি আনা এক পয়সা লাগে। আর ধনকুবের আমেরিকায় তিন পয়সা! ভারতে শিক্ষিতের সংখ্যা অল্প—তাহার উপর এই অত্যধিক হারে ডাক-মাশুল নির্দ্ধারণের ফলে সহর হইতে পল্লীবাসীর ভিঃ পিঃ-তে পুস্তক ক্রয় করা সম্ভবপর কি? আবার বুক-পোষ্টে পুস্তক পাঠাইলে প্রায়ই ডাকঘরে হারাইয়া যায়। প্যাক্

করিবার সময় একটু অসাবধান হইলেই ডাকঘরের কৃপায় বুকপোষ্ট বেয়ারিং হয়।

আনরেজিষ্টার্ড পার্শেলের মাশুলও সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়াছে। পূর্ব্বে ২০ তোলা পর্য্যন্ত পার্শেল দুই আনায় যাইত, এখন ৪০ তোলা পর্য্যন্ত চারি আনায় যায় বটে, কিন্তু চারি আনার কম পার্শেলের মাশুল নাই। সামান্য মূল্য দেয় হইলেও ভিঃ পিঃতে পাঠাইলে রেজেষ্টারী ও দ্বিগুণ মণিঅর্ডার ফিঃ মাশুলের উপর অতিরিক্ত লাগে।

দরিদ্র দেশের সর্ব্বস্তরে যে জনশিক্ষার স্রোত অনায়াসে প্রবাহিত হইতেছিল, অত্যধিক হারে মাশুল নির্দ্ধারণের ফলে তাহার গতিরোধ সম্ভব হইয়াছে। দেশের নেতৃবৃন্দ—কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলী আত্মপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ব্যস্ত—এদিকে দৃক্‌পাত করিবার অবকাশ তাঁহাদের নাই। অত্যধিক ডাকমাশুল শিক্ষাবিস্তারের কতটা অন্তরায় হইয়াছে, দলগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যস্ত মডারেটগণ—যাঁহারা কংগ্রেসী সদস্য নামে অভিহিত—তাঁহারাও ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় সে সম্বন্ধে কোন আলোচনা—প্রতিবাদ করা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন না। কারণ, ডাকমাশুল বৃদ্ধির সহিত বোম্বাই-এর বিপুল বিত্তশালী ব্যবসায়ী-সম্প্রদায়—কলের মালিকগণের কোনরূপ লাভ-ক্ষতির সম্পর্ক নাই। সুতরাং অদূর ভবিষ্যতেও দরিদ্র দেশবাসিগণ যে সুলভে সৎগ্রন্থ পাঠে জ্ঞানসঞ্চয়—আনন্দলাভ করিতে পারিবেন, এমন আশা করা যায় না।

শরৎচন্দ্র রায়চৌধুরী

হাইকোর্টের স্বনামধন্য ব্যবহারাজীব শরৎচন্দ্র রায়চৌধুরী ৭২ বৎসর বয়সে ৩২শে জ্যৈষ্ঠ পরলোক গমন করিয়াছেন। গৃহস্থ-গৃহে জন্মিয়া তিনি আত্মশক্তিবলে উচ্চ শিক্ষা ও প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। আইন-শাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, ঐকান্তিক দেশানুরাগ, বন্যায় ও ভূমিকম্পে মুক্ত-হস্তে দান তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস

একনিষ্ঠ সাহিত্যসাধক জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস ৬৭ বৎসর বয়সে গত ৫ই বৈশাখ লোকান্তরিত হইয়াছেন। শ্রীচৈতন্য-দেবের সন্ন্যাসগ্রহণ-সময়ে যে নরসুন্দর শ্রীমন্মহাপ্রভুর চাঁচর চিকুর-মুণ্ডনে ভক্তগণের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়া জাতি-ব্যবসায় চিরতরে পরিহার করিয়াছিলেন, জ্ঞানেন্দ্র-মোহনের প্রতিভা—সাধনা প্রভাবে সেই সম্মানিত বংশ সমুজ্জল হইয়াছে। প্রথম জীবনে তিনি ইন্‌স্পেক্টর-জেনারেলের বিশ্বাসভাজন কেরাণীরূপে তাঁহার সহিত যুক্ত-প্রদেশের বহু স্থানে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার বাহিরে যে সকল বাঙ্গালী প্রতিভা ও মনীষার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, সেই সময় তিনি তাঁহাদের জীবনকাহিনী সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সরকারী কার্য্য হইতে অকালে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি সাহিত্যসাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। পরিভ্রমণকালে সংগৃহীত উপাদান হইতে তিনি 'বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী' গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া সাহিত্যানুরাগী সম্প্রদায়—জাতীয় সংবাদপত্র সমূহের উচ্চ প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি 'মেঘনাদবধকাব্যে'র ভূমিকা ও কতকগুলি স্কুলপাঠ্য পুস্তক লিখিয়া যশোলাভ করিয়াছিলেন। 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান' প্রণয়ন তাঁহার অমর কীর্ত্তি। একক তাঁহার ২০ বৎসরের নীরব সাধনায় এই বিরাট অভিধান সুষ্ঠু অর্থসহ বিপুল শব্দসম্ভারে সঙ্কলিত—

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস

সুসম্পাদিত হইয়াছে—যথাযথ অর্থ-সমাবেশে সমৃদ্ধ হইয়াছে। সেই সকল শব্দ প্রাচীন সাহিত্যে—কাব্যে কোন্ অর্থে ব্যবহৃত, এই অভিধানে তিনি তাহারও নির্দ্দেশ দিয়াছেন। ইহা তাঁহার অতুল্য পাণ্ডিত্য—অনন্যসাধারণ পরিশ্রমের ফল—জাতীয় সাহিত্যে অমূল্য দান। স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হইলেও তিনি এই বিরাট গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ সম্পাদন—নূতন পরিশিষ্ট সন্নিবেশ করিয়া গিয়াছেন। একাধিকবার এলাহাবাদে সুপ্রতিষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান প্রেস পরিদর্শনকালে তাঁহার সৌজন্যে—প্রীতিমধুর আলাপনে আনন্দ লাভ করিয়াছি—সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সাহিত্য-সেবায় অনুরাগ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। এইরূপ নীরব কর্ম্মী—ঐকান্তিক সাহিত্য-ভক্ত বর্ত্তমান যুগে বিরল।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট 'বসুমতী' রোটারী মেসিনে শ্রীশশিভূষণ দত্ত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৮শ বর্ষ] শ্রাবণ, ১৩৪৬ [৪র্থ সংখ্যা

গীতা-বিচার

১৬

মোক্ষপ্রাপ্তির উপায় কি? ইহা অষ্টম অনুপ্রশ্ন। গত বারে এই সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা হইয়াছে

পরমেশ্বরে আত্মসমর্পণ করিতে পারিলেই সেই মোক্ষ সকল মানবেরই হইতে পারে। ইহাই গত প্রবন্ধের শেষ কথা।

তবে আবার বিচার কেন? এই প্রশ্ন সকলেরই মনে আসিতে পারে, কিন্তু ১৩৪৪ সালের চৈত্র মাসে গীতাবিচারের যে প্রথম প্রবন্ধ এবং ১৩৪৫ সালের আষাঢ় মাসে 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য' এই শ্লোক সম্বন্ধে যে আলোচনা আছে, তাহা স্মরণ করিলেই এ প্রশ্নের উত্তর হইয়া যাইবে।

এখানে যে 'পরমেশ্বরে আত্মসমর্পণের' উল্লেখ আছে, তাহা সেই আষাঢ় মাসের প্রবন্ধোক্ত 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ' এই গীতাবচনের সমান কি না? যদি সমান হয়, তাহা হইলে সেই অর্থ কি? যদি সমান না হয়, তাহা হইলে গীতা-সিদ্ধান্ত ও গত প্রবন্ধের শেষ কথার মিল থাকে না। অতএব এই সমান অসমানের মীমাংসার জন্য বা সেই সব স্থানে উত্থাপিত সমস্যার সমাধানের জন্য অদ্যকার বিচার।

সমান অর্থ—দুই প্রকার—

(১) পার্থসারথি—শ্রীকৃষ্ণই যদি পরমেশ্বর হ'ন, তাহা হইলে 'মামেকং শরণং ব্রজ' এবং পরমেশ্বরে আত্মসমর্পণ এক হইতে পারে।

(২) পার্থসারথি—যদীয় অভেদ দর্শন দ্বারা পরমেশ্বরের এবং 'মাং' এই অস্মৎ শব্দার্থের পার্থক্য লুপ্ত করিয়াছেন, সেই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' পরমেশ্বর হইলে পরমেশ্বরে আত্মসমর্পণ ও 'মামেকং শরণং ব্রজ'ও এক হইতে পারে।

প্রথম অর্থে পার্থ-সারথিই তত্ত্ব, দ্বিতীয় অর্থে পার্থ-সারথি অতত্ত্ব 'খোসা' মাত্র। কারণ, পার্থ-সারথি মায়িক, পরিচ্ছিন্ন ও রূপবান্, তাঁহার অভেদদর্শন সেই মায়িক পরিচ্ছিন্ন, রূপবান্‌কে লইয়া নহে; তাঁহার অভেদ-দর্শনে ভূমা অপরিচ্ছিন্ন মায়াতীত এক আত্মতত্ত্বেই হইয়াছিল।

প্রথম অর্থ শ্রীধরস্বামীর সম্মত *। দ্বিতীয় অর্থ—ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের সম্মত †। পাদটীকায় উদ্ধৃত উভয় ব্যাখ্যা এস্থলে একই তাৎপর্য্যে গ্রহণ করা অসম্ভব না হইলেও—পরস্পরের সিদ্ধান্তভেদ সুস্পষ্ট অনুভূত হওয়ায়—অর্থদ্বয় বলিয়াছি।

শ্রীধরস্বামীর 'বিধি-কৈঙ্কর্য্যং' কথাটি বৈধী ভক্তির অপকৃষ্টতা এবং রাগানুগা ভক্তির উৎকর্ষ খ্যাপন করিয়াছে—ইহাই প্রচলিত বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত। সেই সিদ্ধান্তে শ্রীকৃষ্ণই যে পরমতত্ত্ব, সে বিষয়ে দ্বিমত নাই। কিন্তু তিনি পার্থসারথি রূপধারী নহেন। তাঁহার রূপ-বর্ণনা—

'বর্হাপীড়াভিরামং মৃগমদতিলকং কুণ্ডলাক্রান্তগণ্ডং
কঞ্জাক্ষং কম্বুকণ্ঠং স্মিতসুভগমুখং স্বাধরে ন্যস্তবেণুম্।
শ্যামং শান্তং ত্রিভঙ্গং রবিকরবসনং ভূষিতং বৈজয়ন্ত্যা
বন্দে বৃন্দাবনস্থং যুবতিশতবৃতং ব্রহ্ম গোপালবেশম্॥'
চূড়ায় ময়ূরপিচ্ছ কস্তূরীতিলক ভালতলে।
নয়ন কমলসম কুণ্ডল পরশে গণ্ডস্থলে॥
বদনে ঈষৎ হাস্য কি সুন্দর মুরলী অধরে।
কম্বুকণ্ঠ বৈজয়ন্তী মালা আর পীতাম্বর ধরে॥
গোপাল ত্রিভঙ্গবেশী ব্রহ্ম বৃন্দাবন ধামে।
প্রণমি গোপিকাশত পরিবৃত শান্তিময় শ্যামে॥

চৈতন্যদেব এই রূপের উপাসক,—অর্জ্জুনের শ্রীকৃষ্ণ সেইরূপে অর্জ্জুনের নয়নপথে আবির্ভূত হন নাই। অর্জ্জুন নিজ রথে দেখিয়াছিলেন—

কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্ত-
মিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন
সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে॥

অর্জ্জুন দেখিতেন—মস্তকে কিরীট, চূড়ায় ময়ূরপিচ্ছ নহে, চক্র ও গদা করে—দেখিতেন বেণু নহে,—আর দেখিতেন, তিনি চতুর্ভুজ,—ব্রজধামের এ রূপ নহে—ব্রজধামে তিনি দ্বিভুজ। সহস্রবাহু বিশ্বরূপদর্শনে কম্পিত-কলেবর—অর্জ্জুন ভয়জড়িত কণ্ঠে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, হে সহস্রবাহু বিশ্বরূপ—আমার সদা প্রত্যক্ষ সেই চতুর্ভুজরূপে দর্শন দেও—তোমার সেই কিরীটী, চক্রগদাধর রূপ দেখিতেই আমি অভিলাষী।

শ্রীধরস্বামী এইরূপ অর্থই তাঁহার টীকায় করিয়াছেন *।

সখ্যভাবে তিনি পার্থসারথি, মাধুর্য্যে ব্রজের গোপাল, এই ভাবে ইহার মীমাংসা করিলে মূলতঃ প্রভেদ হয় না—এ বিষয়ে অধিক বিচার এ প্রবন্ধে নিষ্প্রয়োজন।

অর্থাৎ পার্থসারথিই হউন আর ব্রজের গোপালই হউন—তিনিই পরমেশ্বর, আর সেই অপরূপ রূপে যিনি 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য' একনিষ্ঠ শরণাপন্ন বা আত্মসমর্পণ করেন, তিনি সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া থাকেন—মুক্তি-প্রাপ্ত ব্যক্তিই সর্ব্বপাপমুক্ত। এই হইল সমান অর্থের পক্ষ।

পরমেশ্বর নিরাকার, শ্রীকৃষ্ণ সাকার,—এই ভাবিয়া যদি পরমেশ্বরে আত্মসমর্পণ এবং 'মামেকং শরণং ব্রজ' এই বচনোক্ত শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণকে পৃথক্ করা হয়, তাহা হইলেই অসমান অর্থ আসে, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু বিচার গীতাসিদ্ধান্তের অনুযায়ী, সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ হইতে পারে না। অতএব উপরি-উল্লিখিত সমান পক্ষের যে কোন একটি অর্থ গ্রহণীয়।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, পরিচ্ছিন্ন সাকার শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর হইলে—'ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি' 'অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ' 'বাসুদেবঃ

* ততোঽপি গুহ্যতমমাহ সর্ব্বেতি। মদ্ভক্ত্যৈব সর্ব্বং ভবিষ্যতীতি দৃঢ়বিশ্বাসেন বিধিকৈঙ্কর্য্যং ত্যক্ত্বা মদেকশরণো ভব—এবং বর্ত্তমানঃ কর্ম্মত্যাগনিমিত্তং পাপং স্যাদিতি মা শুচঃ, শোকং মাকার্ষীঃ যতস্ত্বাং মদেকশরণং সর্ব্বপাপেভ্যোঽহং মোক্ষয়িষ্যামি। ১৮।৬৬

† কর্ম্মযোগনিষ্ঠায়াঃ পরমরহস্যমীশ্বরনিষ্ঠামুপসংহৃত্যাথেদানীং কর্ম্মত্যাগনিষ্ঠাফলং সম্যগ্দর্শনং সর্ব্ববেদান্তবিহিতং বক্তব্য-মিত্যাহ সর্ব্বধর্ম্মান্ সর্ব্বে ধর্ম্মাশ্চ সর্ব্বধর্ম্মাঃ, তান্ ধর্ম্মশব্দেনাত্রা ধর্ম্মোঽপি গৃহ্যতে, নৈষ্কর্ম্ম্যস্য বিবক্ষিতত্বাৎ নাবিরতো দুশ্চরিতাদ্ বিমুচ্যত ইতি 'ত্যজ ধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চে'ত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিভ্যঃ সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য সন্ন্যস্য সর্ব্বকর্ম্মাণীত্যেতন্মামেকং সর্ব্বাত্মানং সর্ব্বভূতস্থ-মীশ্বরম্ অচ্যুতং গুরুং জন্মমরণবিবর্জ্জিতমহমেকমেবেত্যেবমেকং শরণং ব্রজ, ন মত্তোঽন্যদস্তীত্যবধারয়েত্যর্থঃ। অহং ত্বামেবং নিশ্চিত-বুদ্ধিং সর্ব্বপাপেভ্যঃ সর্ব্বধর্ম্মাধর্ম্মবন্ধনরূপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি স্বাত্ম-ভাবপ্রকাশী করণেন উক্তঞ্চ—নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতেত্যতো মা শুচঃ শোকং মাকার্ষীঃ। ১৮।৬৬।

* কিরীটবন্তং গদাবন্তং চক্রহস্তঞ্চ ত্বাং দ্রষ্টুমিচ্ছামি যথা পূর্ব্বং দৃষ্টোঽসি তথৈব, অতঃ হে সহস্রবাহো, হে বিশ্বমূর্ত্তে, ইদং বিশ্বরূপমুপসংহৃত্য তেনৈব কিরীটাদিযুক্তেন চতুর্ভুজেন রূপেণ ভব আবির্ভব। তদনেন শ্রীকৃষ্ণমর্জ্জুনঃ পূর্ব্বমপি কিরীটাদি-যুক্তমেব পশ্যতীতি গম্যতে।

সর্ব্বমিতি' ইত্যাদি গীতাবচন অসঙ্গত হয় না কেন? সাকার শ্রীকৃষ্ণ কাহারও মনোমধ্যে থাকিতে পারেন না, ধ্যানগম্য বলিলেও সর্ব্বভূতের মনে তাঁহার স্থান কৈ? শ্রীকৃষ্ণের রূপ ধ্যান করে না, তাঁহার কথা জানে না, এমন অসংখ্য জীব বর্ত্তমান। বৈষ্ণবাচার্য্য ইহাতে বলেন, এ প্রশ্নই সঙ্গত নহে, কারণ —শ্রীকৃষ্ণ সাকার পরমেশ্বর বটেন, কিন্তু তাঁহার এই আকার প্রাকৃত নহে, সত্বরজস্তমোগুণাত্মিকা প্রকৃতি হইতে সে সাকার উদ্ভূত নহে,—পঞ্চভূত—প্রকৃতির পরম্পরা-সঞ্জাত কার্য্য, শ্রীকৃষ্ণের আকার পঞ্চভূত —ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্ব্যোম হইতে হইলে তাহা প্রাকৃতই হইত। কিন্তু তাঁহার আকার অপ্রাকৃত চিন্ময়। সূর্য্য ও সূর্য্যকিরণ উভয়ই তেজ হইলেও সূর্য্য যেমন ঘনীভূত তেজ, সেইরূপ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড—তাঁহার কিরণস্থানীয় চিৎপ্রকাশ, আর তিনি স্বয়ং ঘনীভূত চিৎ। 'যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভাঃ' উপনিষদুক্ত অদ্বৈত ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণেরই দেহজ্যোতিঃ, বলা বাহুল্য, এই জ্যোতিঃশব্দের অর্থ চিৎপ্রকাশ। অতএব পরিচ্ছিন্ন বহু প্রতীয়মান রূপধারী হইলেও বাস্তব পক্ষে তিনি অপরিচ্ছিন্ন সর্ব্বব্যাপী; পরিচ্ছিন্ন চিৎপ্রকাশের তিনিই উৎস।

এই মত সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য, তাহা পরে বলিব; এখন এই মতে যে 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য' ইহার অর্থ বিধিকৈঙ্কর্য্য ত্যাগ, এ বিষয়ে আলোচনা প্রথমে করিতেছি,—

বিধিকৈঙ্কর্য্য পরিত্যাগ শব্দের অর্থ যদি বিধিবাক্যের বশ্যতা স্বীকার না করা হয়, তাহা হইলে—তাহা কি শাস্ত্রদ্রোহেরই স্বরূপ নহে?

যিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন—

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥

শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগের এত দোষ যিনি প্রদর্শন করিলেন, তিনিই শাস্ত্রবিধি ত্যাগেরই ব্যবস্থা দিতেছেন, ইহা কি সম্ভবপর?

যদি সম্ভবপর না হয় তো বিধিকৈঙ্কর্য্য পরিত্যাগ শব্দের অর্থ কি?

(১) কেহ কেহ বলেন, কাম্য-কর্ম্মে বিধি আছে, অধিকারে বিধি আছে—'শুষ্যচ্ছস্যমঞ্জরীকঃ কারীর্য্যা যজেত' 'শ্যেনেনাভিচরন্ যজেত' ইত্যাদি।

অর্থাৎ যখন বৃষ্টির অভাবে যাহার শস্যমঞ্জরী শুষ্ক হইতেছে, তখন সেই ব্যক্তি বৃষ্টি কামনা করিয়া কারীরী যাগ করিবে, ইত্যাদি কাম্যবিধি। শত্রুমারণার্থে 'শ্যেন' যাগ করিবে, ইত্যাদি অভিচারবিধি। অভিচারবিধি কাম্য হইলেও অন্য কাম্যবিধির ন্যায় কেবল নিজ ইষ্টসিদ্ধির জন্য ইহা নহে, ইহাতে পরের বিশেষ অনিষ্ট, মৃত্যু পর্য্যন্ত আছে বলিয়া পাপজনক—এই কারণে অপর কাম্যকর্ম্মবিধি হইতে ইহাকে পৃথক্ করিয়া ধরিয়াছি। যাহারা বিধিকিঙ্কর, যাহারা তাৎপর্য্য বিচার না করিয়া কেবল বিধি দেখিয়াই তাহার দাসত্ব করিয়া থাকেন, অবিচারে সেই বিধি পালন করেন, তাঁহারা বিধিকিঙ্কর—তাঁহাদিগের সেইরূপ ভাবের নাম—বিধিকৈঙ্কর্য্য। ইংরেজের চাকুরিজীবী অনেক বাঙ্গালীর (এখন হিন্দুর মধ্যে কম হইলেও) এইরূপ কৈঙ্কর্য্য আছে, ট্যাঁস ফিরিঙ্গি হইতে সকল 'কটা চামড়া' ব্যক্তিমাত্রকেই সেলাম করেন, ইহাই কৈঙ্কর্য্য।

বিধির দোষগুণ বিচার শাস্ত্রেই আছে। কাম্যবিধি বিষয়ে দোষকীর্ত্তন শাস্ত্রেই আছে।

কর্ম্মণা মৃত্যুমৃষয়ো নিষেদুঃ প্রজাবন্তো দ্রবিণমীহমানাঃ।
(শ্রুতি)

ধনাভিলাষী পুত্রবান্ ঋষিগণ কর্ম্ম দ্বারা মৃত্যু—অর্থাৎ সংসার প্রাপ্ত হইয়াছেন—পুনর্জ্জন্ম, জরা, মরণ, দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হ'ন নাই। অভিচারনিষেধ শ্রুতিতেই আছে—'ন হিংস্যাৎ সর্ব্বভূতানি'। মনু প্রভৃতি স্মৃতিকর্ত্তারা অভিচারকে গোহত্যাদি উপপাতক মধ্যে গণনা করিয়াছেন —'অভিচারো মূলকর্ম্ম চ।' অতএব এ সব বিষয়ে বিধি থাকিলেও তাহার বশবর্ত্তী হইতে নাই, অপর শাস্ত্র দ্বারা তাহার স্বরূপ বিশ্লেষণ করা আছে। সুতরাং 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য' বা 'বিধিকৈঙ্কর্য্যং ত্যক্ত্বা'র অর্থ—'কাম্যকর্ম্ম ও নিষিদ্ধকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া'—বিধিবাক্য মাত্রের বশবর্ত্তী না হওয়া বা কর্ম্মের অবাধ্য হওয়া উহার অর্থ নহে।

(২) অন্য অর্থ এই যে—

কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ॥

সর্ব্বকর্ম্মফল ত্যাগই ত্যাগ শব্দের অর্থ—ইহা গীতারই

উক্তি। অতএব 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য' ইহার অর্থ সর্ব্বকর্ম্ম-ফল ত্যাগ—ইহা বিধিকৈঙ্কর্য্যের পরিত্যাগ নামেও কথিত হইতে পারে। বৈধকর্ম্ম মাত্রেরই ফল আছে, ইহা শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত। এই ফলে আসক্তিই বিধির দাসত্ব। ফল-ত্যাগই বিধির সহিত আন্তরিক সখ্য। ইহা শাস্ত্রদ্রোহ নহে, বিধিবাক্যের অবাধ্যতা নহে, বিধিকে অধিকতর আপন করিয়া লওয়া। ফলের আকাঙ্ক্ষায় বিধিপালন এবং বেতন গ্রহণ করিয়া প্রভুর আজ্ঞাপালনে কোন প্রভেদ নাই, কিন্তু বিধির নিকট প্রত্যাশা না রাখিয়া শাস্ত্রবাক্য বলিয়া যে অনুরাগ তাহাই প্রকৃত ভালবাসা, আন্তরিক সখ্য—এই ভাবে বিধির সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া আমারই শরণাপন্ন হইতে আজ্ঞা করিয়াছেন স্বয়ং ভগবান্। ইহাই প্রকৃত আত্মসমর্পণ। এই ভগবান কে? তাহার বিচার গীতাবিচার প্রসঙ্গে পূর্ব্বে অনেক কিছু প্রকাশ করা আছে—পরেও কিছু বলিব।

এক্ষণে আপত্তি এই—এইরূপই যদি 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরি-ত্যজ্য' ইহার অর্থ হয়, তাহা হইলে—

'অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।'

এই উত্তরার্দ্ধ অসঙ্গত হয়। কর্ম্মফলত্যাগে তো পাপের আশঙ্কা নাই, দুঃখেরও কারণ নাই, পক্ষান্তরে বৈধকর্ম্ম পরিত্যাগে অর্থাৎ বিধির অবাধ্য হওয়াতেই পাপের আশঙ্কা ও দুঃখের সম্ভাবনা আছে, তাহারই জন্য অর্জ্জুনের প্রতি ভগবানের আশ্বাস প্রদান সঙ্গত হয়। অতএব সর্ব্বধর্ম্ম ত্যাগ অর্থে সর্ব্ব কর্ম্মফল ত্যাগ নহে—বিধিবোধিত কর্ম্ম ত্যাগ উহার অর্থ।

উত্তর—

এই যে উত্তরার্দ্ধ, ইহাতে 'সর্ব্বপাপেভ্যঃ' আছে, অর্থাৎ কেবল বৈধ কর্ম্ম ত্যাগজনিত পাপের কথা এখানে নাই। ইহা হইতে এবং 'মা শুচঃ' এই শেষ বাক্য হইতে প্রকৃত তাৎপর্য্য স্পষ্টীকৃত। অর্জ্জুন যুদ্ধে অপ্রবৃত্তির কারণস্বরূপে গীতার প্রথমাধ্যায়ে বলিয়াছেন,—

'পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ' আর বলিয়াছেন—

'কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্ত্তিতুম্।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জ্জনার্দ্দন॥'

পাপের কথা বলিবার পরে দ্বিতীয় অধ্যায়ে অর্জ্জুন বলিয়াছেন,—

'ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাদ্ যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্।
অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্॥'

এমন কিছুই দেখি না, যাহা আমার এই ইন্দ্রিয়-শোষক শোক অপনোদন করিতে পারে, এমন কি—পৃথিবীতে নিষ্কণ্টক সমৃদ্ধরাজ্য ও দেবগণের আধিপত্য লাভেও নহে।

এই যে অর্জ্জুনের পাপ-ভীতি ও শোক, তাহা হইতে উদ্ধারের আশ্বাস ভগবান এই স্থলে দিয়াছেন, পরমেশ্বরে আত্মসমর্পণ করিলে ইহা অপনীত হইয়া থাকে। হে অর্জ্জুন, শত্রুজয়ে যে রাজ্যলাভ—সমরে মরণে স্বর্গলাভের কথা যে তোমাকে বলিয়াছি, তাহা সাধারণ নিয়মে, তুমি সেই সাধা-রণের গণ্ডী অতিক্রম কর, এরূপ ফলের আকাঙ্ক্ষা তোমাকে করিতে হইবে না,—যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের বিহিত ধর্ম্ম, বিধির অনুগামী ফলের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া, বিধিপালন দ্বারা আমার শরণাপন্ন হও—পাপভয়ও থাকিবে না, শোকেরও অবসান হইবে। বিধিপালন দ্বারা আমার শরণাপন্ন হওয়ার অর্থ—আমি শাস্ত্রবাক্য দ্বারা বিধিদাতা, সেই বিধি ভাল কি মন্দ, সে বিচার তোমার অন্তরে উঠিবে না, আমারই শরণাপন্ন হইবে, আমাকেই সর্ব্বরক্ষক, মঙ্গলময় সর্ব্বেশ্বরস্বরূপ বিশ্বাসে আত্মসমর্পণ, আত্মবিতরণই পরম গতি—ইহাই কর। অতএব কর্ম্মফল ত্যাগ হইতে পাপ না হইলেও কর্ম্ম করাতে, যুদ্ধধর্ম্ম পালন করাতে তোমার আশঙ্কিত যে পাপ এবং শোক, আমাতে আত্ম-সমর্পণ করিলে তাহা হইতে নিস্তার আমিই করি, ইহাই বচনের অর্থ। এই যে অর্জ্জুনের প্রতি উপদেশ, ইহা যে তাঁহাতে আত্মসমর্পণকারী সকল ব্যক্তির পক্ষেই খাটিবে, ইহা বলা বাহুল্য।

শঙ্কর-ভাষ্যের অনুসরণে জ্ঞাননিষ্ঠের উৎকর্ষ জ্ঞাপ-নার্থ—এই বচন, ইহা স্বীকার করিলে বলিতে হয়—কর্ম্ম-মার্গ ত্যাগের উপদেশে পরিব্রজ্যা (চতুর্থাশ্রম) উপদিষ্ট হইয়াছে। ইহাও বিধির অবাধ্যতা বা শাস্ত্রদ্রোহ নহে। বৈরাগ্যযুক্তের পক্ষে যাহা বিহিত, তাহাই উপদিষ্ট হইয়াছে।

'যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ'—প্রব্রজিতের (সন্ন্যাসীর) কর্ম্মমার্গে অধিকার নাই। শাঙ্কর ভাষ্য-সম্মত

অর্থে এই ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়—অধিকন্তু আত্ম-সমর্পণ অর্থে অভেদ দর্শন। ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণের নিত্য মূর্ত্তি বিষয়ে যে বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত আছে, তাঁহার অপ্রাকৃত চিদ্ ঘনরূপ সূর্য্যের ন্যায় এবং যিনি তাঁহার কিরণস্থানীয় চিৎপ্রকাশে অপরিচ্ছিন্ন সর্ব্বব্যাপক এ বিষয় যে বিচার হইতে পারে, এখন তাহাই প্রদর্শন করিতেছি। সূর্য্যমণ্ডল ও সূর্য্যকিরণের বা প্রকাশের দৃষ্টান্তে শ্রীকৃষ্ণরূপ ও অপরিচ্ছিন্ন চিৎপ্রকাশ সাধিত হয় না, কারণ, তেজ সাবয়ব, চিৎ অর্থাৎ জ্ঞান সাবয়ব নহে, সাবয়ব তেজোমণ্ডল সূর্য্যের সহিত চিৎ বা জ্ঞান-স্বরূপের সাধর্ম্ম্য কোথায় যে দৃষ্টান্ত হইবে?—তেজ, অবয়ব-সংযোগ বিশেষ বশত ঘন ও শিথিল হইতে পারে, নিরবয়-বের সেরূপ সংযোগই সম্ভবে না, যাহাতে ঘনতা ও শিথিলতা আসিতে পারে। বিশেষতঃ সূর্য্যমণ্ডল কেবল সাবয়ব তেজ নহে, তাহাও নানা বস্তুসংমিশ্রণে গঠিত, তাহার কিরণ কেবল তেজঃ, শ্রীকৃষ্ণের রূপকে অন্য বস্তুসংযোগে উৎপন্ন বলিলে, তাহাকে অপ্রাকৃত বলা যায় কিরূপে?

নিত্যমূর্ত্তি অস্বীকার করিয়া মায়িক মূর্ত্তি মানিয়া —এ দোষ পরিহার করিতে হইলে—শাঙ্কর অদ্বৈত-বাদের আশ্রয় লইতে হয়, বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত রক্ষা হয় কৈ? চিদচিদুভয়াত্মক ব্রহ্মবাদ বা শাক্ত-সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে পরিচ্ছিন্ন সাকার ও অপরিচ্ছিন্ন নিরাকার উভয়ই রক্ষিত হয় এবং সেই যে আকার তাহা মায়িক বা মিথ্যা ইহাও স্বীকার করিতে হয় না। যে রূপ ভৌতিক তাহাই প্রাকৃত, প্রাকৃত অর্থে নৈসর্গিক, যাহা ভূতেরও পূর্ব্ববর্ত্তী—কারণে সূক্ষ্ম রূপ অবস্থিত,—তাহাই অপ্রাকৃত—তাহা অনৈসর্গিক। পরমেশ্বরে সেই প্রকার রূপ থাকিতে পারে, মহত্তত্ত্বোপাধিক পরমেশ্বর বিষ্ণুর অর্জ্জুন-সকাশে প্রকট রূপও সেই প্রকার অপ্রাকৃত হইলেও তাহা তাঁহারই উপাধিতে বাস্তব ভাবে অবস্থিত, অতএব অদ্বৈতবাদীর মতে তাহা যেরূপ অসত্য, চিদচিদ্ ব্রহ্মবাদে সেরূপ নহে। ব্রহ্মের অচিদংশে তাহা সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত, অতএব সৎ, সত্য; মিথ্যা নহে। ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ বশতঃ তিনি সেই রূপে প্রকট হইয়াছিলেন। রূপ পরিচ্ছিন্নরূপে দৃশ্যমান হইলেও রূপধারী অপরিচ্ছিন্ন, তাঁহার সর্ব্বব্যাপকতা ও সর্ব্বস্বরূপতা লইয়াই অদ্বৈত জ্ঞান বাস্তব, রূপকে আশ্রয় করিয়া দ্বৈতজ্ঞানও হইতে পারে, তবে রূপকে আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মের যে পরিচ্ছিন্নত্ব-মাত্র জ্ঞান—ব্রহ্ম পরিচ্ছিন্ন, জীবও পরিচ্ছিন্ন, অপরিচ্ছিন্নতা ব্রহ্মেরও নাই জীবেরও নাই—এই যে ভ্রমজ্ঞান, ইহাই মোহ বা অজ্ঞান। বাস্তবপক্ষে প্রকৃতিপুরুষাত্মক ব্রহ্ম হইতে জীব ও জড়ের ভেদ নাই। যেমন মৃত্তিকা হইতে ঘটের ভেদ থাকে না, সেইরূপ। ব্রহ্মের বা আত্মার যে পরিচ্ছিন্নমাত্রত্বজ্ঞান তাহাই অজ্ঞান, সেই অজ্ঞান-নিবর্ত্তক জ্ঞানই মোক্ষের হেতু। এইরূপ জ্ঞান ভগবৎ-কৃপা-সাপেক্ষ, জ্ঞাননিষ্ঠের পক্ষেও ভগবৎ-কৃপা না হইলে বিশুদ্ধ ধ্যানাদি হয় না, ধ্যানাদির উৎকর্ষ না হইলে অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মদর্শনও হয় না। প্রাচীন আচার্য্য বলিয়াছেন বটে—ধ্যান মানস-ক্রিয়া, তাহা করা না করা বা অন্যরূপে করা কর্ত্তার ইচ্ছাধীন,—* অন্য ধ্যানে তাহা হইলেও সাকার ঈশ্বর-ধ্যানে (শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীদুর্গা—প্রভৃতি ধ্যানে) এ কথা সাধারণতঃ বলা যায় না, উচ্চাঙ্গের ধ্যানকর্ত্তার পক্ষে খাটিতে পারে, কিন্তু যাহার প্রতি ভগবৎ-কৃপা না হয়,—সে ব্যক্তি উচ্চাঙ্গের ধ্যান-কর্ত্তা হইতে পারে না। এই নিরাকার ধ্যান † তো আরও কঠিন, গীতায় অর্জ্জুনের বাক্যে আছে—

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্॥

হে কৃষ্ণ! মন নিতান্ত চঞ্চল, মানুষের ভাববৈপরীত্য-সাধক, দুর্জ্জেয় এবং দৃঢ় তাহাকে বশ করা—বায়ুকে ধরিয়া রাখার ন্যায় অতীব দুষ্কর অর্থাৎ অসম্ভব। ইহার উত্তরে ভগবান্ বলিয়াছেন—

* ধ্যানং চিন্তনং মানসং যদ্যপি মানসং তথাপি কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা বা কর্ত্তুং শক্যং পুরুষতন্ত্রত্বাৎ। সমন্বয়সূত্র (বেদান্তদর্শন ১।১।৪ শাঙ্কর ভাষ্য)।

† নিরাকার ধ্যান—প্রাণময় কোষ হইতে আরম্ভ বিজ্ঞানময় কোষ পর্য্যন্ত যে নিরাকার ধ্যান, সাকার ধ্যান তদপেক্ষা কঠিন, আনন্দময় স্থানে যে নিরাকার ধ্যান, তাহা সাকার ধ্যান অপেক্ষা কঠিন। প্রাণময় কোষে ইন্দ্রিয়বৃত্তিসংশ্রিত জ্ঞানের ধ্যান নিরাকার ধ্যান, মনোময় কোষে মনোবৃত্তিসংশ্রিত জ্ঞানের ধ্যান নিরাকার ধ্যান, বিজ্ঞানময় কোষে বুদ্ধিবৃত্তিসংশ্রিত জ্ঞানের ধ্যান নিরাকার ধ্যান; এই সব ধ্যানেই জ্ঞানই বিষয়, জ্ঞেয় বিষয় হয় না। ইহার পরে আনন্দকে অর্থাৎ ঐকৈক আনন্দাবস্থায় শান্তিকে আশ্রয় করিয়া মনকে যে নির্ব্বিষয় করা, তাহাই বাস্তব নিরাকার ধ্যান, ইহাই সাকার ধ্যান অপেক্ষা কঠিন। এতৎ সম্বন্ধে আরও কিছু শেষাংশে দ্রষ্টব্য।

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেনৈব কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে॥

ভগবান বলিলেন, হে মহাবাহু কৌন্তেয়, মনকে বশ করা যে দুঃসাধ্য তাহা ঠিক বটে, তবে অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা তাহাকে বশ করিতে হয়।

বলা বাহুল্য, ভগবৎ-কৃপা ব্যতীত এই অভ্যাস ও বৈরাগ্য হয় না। অতএব ভগবৎ-কৃপা ও ধ্যানাদি পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিয়া অভীষ্ট পথে সাধককে অগ্রসর করে। কেবল চিৎস্বরূপের কৃপা সম্ভবে না, কেবল অচিতের কৃপা মৃন্ময় গাভীর ন্যায় প্রয়োজন সাধনে অক্ষম। ছবি বা পুত্তলীতে চিত্রিত হাস্যরেখার ন্যায় তাহা ভঙ্গীমাত্র, অন্তরের যোগ তাহাতে থাকে না; সেইরূপ জ্ঞান সম্বন্ধশূন্য কৃপা-বৃত্তি চেতনাহীন চিত্ররেখা মাত্র। জ্ঞান বা চিৎ সম্বন্ধযুক্ত হইলেই তাহা কার্য্যকরী হয়, সেই কৃপা হইতেই ধ্যানে নিষ্ঠা জন্মে; রোগীর তিক্ত ঔষধ সেবনের ন্যায় সাধককে প্রথমে সাধনা আশ্রয় করিতে হয়। সেই সাধনা ধীরে ধীরে পরমেশ্বরের কৃপা উন্মেষণ করে, সেই কৃপা ক্রমে সাধককে উচ্চ অধিকারীর আসনে স্থাপন করে। এই যে সাধনার প্রথমারম্ভ, তাহা পরমেশ্বরের সর্ব্বমানবের প্রতি যে সাধারণ কৃপা, তাহারই ফল। সেই কৃপা হইতে শাস্ত্রোপদেশ, সাধনা-শাস্ত্রোপদেশকে আশ্রয় করিয়াই উদ্ভূত। আদি শাস্ত্র শ্রুতি। জগতে যত কিছু সাধনা আছে, তৎসমস্তের মূলই শ্রুতি। বিদেশীয়গণ তাহাদিগের অবলম্বিত সাধনার মূলে যে শ্রুতি, তাহা স্বীকার না করিলেও তাহাই যে একমাত্র সত্য—সাধনা-প্রণালীর অনুশীলন করিলেই তাহা বুঝা যায়। এক্ষণে সে প্রসঙ্গের অবতারণা করিব না। কেবল ইহাই বলিতে চাহি, মোক্ষের মূল কারণ ভগবৎ-কৃপা। সেই কৃপালাভের শ্রেষ্ঠ উপায় আত্মসমর্পণ, ইহাই গীতার সিদ্ধান্ত। অধিকার অনুসারে আত্মসমর্পণের প্রারম্ভিক পদ্ধতি বিভিন্ন, কেহ মাতৃভাবে, কেহ সখিভাবে, কেহ কান্তভাবে আত্মসমর্পণ করে—কেহ তাঁহাকে মহামায়া বলে—কেহ বলে পুরুষোত্তম,—কেহ দেখে তাঁহাকে 'করালবদনাং ঘোরাং' বা 'দশভুজে দশপ্রহরণধারিণী', কেহ দেখে তাঁহাকে 'কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তং' কেহ দেখে 'বর্হাপীড়াভিরামং' গোপালবেশধারী নটবর শ্যামসুন্দর, এই সকল সাকারোপাসনা যোগমার্গে অধিকতর সহজ অবলম্বন। জ্ঞানমার্গেও ইহার স্থান অল্প নহে,—কিন্তু উভয়মার্গই (জ্ঞানমার্গই হউক আর যোগমার্গই হউক) ভক্তি-আলোকে উজ্জ্বল হইলেই তাহা সুগম হয়, ভক্তি ব্যতীত উভয় পথই দুর্গম। এ তত্ত্বের সূচনা গীতাতেই আছে—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ।
ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া লভ্য অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ।

অতএব 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য ইহার অর্থ শাক্ত শৈব ধর্ম্মত্যাগ বা সমস্ত শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ বর্জ্জন নহে। আটটি অনুপ্রশ্ন ১৩৫ আষাঢ় সংখ্যায় উল্লিখিত ছিল—তাহার সংক্ষিপ্ত বিচার সমাপ্ত হইল। নবম অনুপ্রশ্ন সেইস্থানে উল্লিখিত না হইলেও—তাহার বিচার প্রয়োজনীয়। আগামী বারে সেই প্রয়োজনীয় বিচারের সহিতই 'গীতা-বিচার' সমাপ্ত হইবে। তবে ভক্তের অবশ্য জ্ঞাতব্য সাকার ও নিরাকার ধ্যান বিষয়ে বিশেষ কিছু বলিবার আকাঙ্ক্ষা এই অন্তভাগে পূর্ণ করিতেছি।

জাগ্রদবস্থায় কোন বিষয়বিশেষকে অবলম্বন না করিয়া যে চেতনাস্বরূপ জ্ঞান অনুভূত হয়, তাহাই ইন্দ্রিয়-সংশ্রিত, ইন্দ্রিয় শব্দের অর্থ কোন ইন্দ্রিয়বিশেষ নহে—পঞ্চেন্দ্রিয়,—ইহার সাধারণবৃত্তি আলোচন। 'অস্তি হ্যালোচনং জ্ঞানং প্রথমং নির্ব্বিকল্পকম্'।—চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আর ইন্দ্রিয়কেও স্ব স্ব গ্রহণীয় শব্দস্পর্শ প্রভৃতিতে প্রবর্ত্তিত না করিয়া অনুভূত যে জ্ঞান বা তাহার ধ্যান, ইহা প্রাণ-কোষের আলম্বনেই হয়। এই ধ্যান সাকার ধ্যান অপেক্ষা অনেক সহজ। এই ধ্যানের বিষয় যাহা, তাহা চেতনা হইলেও চিৎস্বরূপ ব্রহ্ম নহেন—ব্রহ্ম সর্ব্বাশ্রয়, এবং চেতনা ইন্দ্রিয়াশ্রিত, ইহাই প্রতিক্ষণপরিণামী বৌদ্ধগণের ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ শ্রীভগবানকে আশ্রয় করিয়া প্রতিষ্ঠিত। প্রাণ-কোষ হইতে সাকার ধ্যানের আরম্ভও হয় না।

ইহার অভ্যন্তরে যে মনোময় কোষ আছে, সাকার ধ্যানের আরম্ভ সেইখানে, নিরাকার ধ্যানের তাহা দ্বিতীয় কক্ষ। স্থিরচেতনার প্রথম আলোকপাত মনোময় কোষে। নিরাকার ধ্যানের নিশ্চলতা—এখানে ক্ষণেক হইলেও—

সাকার ধ্যান এখানেও তদপেক্ষা কঠিন; শাস্ত্রোক্ত ধ্যানের যথাযথ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিন্যাস ও তৎপ্রতি অচঞ্চল মনস্থাপন মনোময় কোষেও হয় না, সেই জন্যই কঠিন। বিজ্ঞানময় কোষে সাকার ধ্যানের প্রতিষ্ঠা হয়, তখন সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন সাকার ধ্যানে সামর্থ্য লাভ হয়। অন্তঃকরণ এইরূপ শক্তি-সম্পন্ন হইলে তখন আনন্দকে আশ্রয় করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা নিভৃত কক্ষে যে ধর্ম্ম দ্বারা মনঃপ্রবেশ—বিজ্ঞানরূপ বুদ্ধিমাত্রে পরিণতি, তাহাতেই মন নির্ব্বিষয় হয়। এই যে মনের নির্ব্বিষয়তাসম্পাদক ধ্যান, তাহাই সাকার ধ্যান অপেক্ষা কঠিন। অধিকারানুসারে অবলম্বনীয় দুই পথেই ভক্তি প্রধান সহায়। অধিকারপরীক্ষা স্বয়ংসাধ্য নহে,—উপযুক্ত গুরুগম্য। অধিকার অর্থে রুচি নহে—সত্ত্ব, রজ এবং তম এই তিন গুণের মধ্যে কাহার উপর কোন্ গুণের প্রভাব বর্ত্তমান এবং তাহার বল কত, এইরূপ বিচার করিবার শক্তি যাঁহার আছে,—তিনিই পরীক্ষা করিয়া অধিকার স্থির করিতে সমর্থ, এরূপ পরীক্ষার সুযোগ না ঘটিলে শাস্ত্রীয়পথে থাকিয়া কুলাচার, মন্ত্রজপ বা নাম-সঙ্কীর্ত্তনে রত থাকিতে হয়,—তদ্দ্বারা ইষ্টদেবতার কৃপায় ভক্তিলাভ হইয়া থাকে।

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন।

পুরাতন-চিঠি

বাক্‌স খুলিতে সখি, খুঁজিয়া পেয়েছি আজ
তোমারি সে লেখা চিঠিখানি
আজ এতদিন পরে কে বা তার দাম দিবে
কতটুকু কি বা নাহি জানি।

হারাণো স্মৃতির হেথা নাই নাই কোনো দাম
রাখিতে চাহে না কেহ পুরাণো' স্মৃতির মান—
সকলে এ কথা নিয়ে আমারি সে অগোচরে
কত ভাবে করে কাণাকাণি।
এতদিন পরে সখি, তোমার হাতের লেখা
পেয়েছি, পেয়েছি চিঠিখানি!
আজ শুধু মনে পড়ে গণ্ডকী-নদীর তীরে
কিশোরী তোমার কত কথা।
আমার জীবন-পাতে বড় করে লেখা আছে
কাছে পেয়ে না-পাওয়ার ব্যথা।

জানি বৃথা কবিতায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া মরা
নিস্ফল বেদনায় ফুলে ফুলে গান করা;
তুমি কোথা' আমি কোথা' কে বা দিবে উত্তর
স্মৃতির প্রলেপ-রেখা টানি।
এতদিন পরে আজ ফিরিয়া পেয়েছি সখি,
তোমারে এ ভাঙ্গা বুকে, রাণী?
ব্যাপিকার ব্যাপকতা শেষ হয়ে গেছে কবে,
একটি গোলাপ গেছে ঝ'রে;
সিনেমার ছবি প্রায় ছোট বড় কত কথা
আমারে পাগল আজো করে।

কে এসেছে তার স্থানে তাতে আসে যায় কি বা;
বেঁচে আছ তুমি হেথা কি বা রাত কি যে দিবা।
রাবণের চিতা-বুকে জ্বালিয়া রয়েছি আমি
কবে সে নিভিবে নাহি জানি।
সেদিন তোমারে যেন পাশে পাই প্রিয়-সখি,
এইটুকু আশা রাখি, রাণী!

শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্য-পুরাণতীর্থ।

[উপন্যাস]

৭০

ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। মৃণালিনীর মনে হইল, তিনি যে চেষ্টায় আপনাকে তাঁহার জীবনের সব বন্ধন হইতে বিচ্ছিন্ন করিলেন—সে চেষ্টায় তাঁহার হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে; কিন্তু সে চেষ্টা যে তিনি করিয়াছেন, তাহা অন্তরের প্রেরণায়। তিনি ভাবের আবেগে বা উত্তেজনায় তাহা করেন নাই। তাঁহার মনে হইয়াছে, দেবতা তাঁহাকে যাহা দেন নাই, তিনি তাহা পাইবার চেষ্টা করিয়াছেন—ভুল করিয়াছেন। তাই তিনি সেই ভুল ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। যে দীর্ঘকাল তিনি সংসারে থাকিয়াও আপনাকে বন্ধনহীন মনে করিয়া আসিয়াছিলেন, সেই দীর্ঘকালের মধ্যে কি তাঁহারও অজ্ঞাতে—অপ্রত্যাশিত বন্ধনের উদ্ভব হয় নাই? রেণুর পুত্রকে তিনি যে গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে কি নারীর স্বাভাবিক স্নেহের জন্যই নহে? আর তাহার ফল কি ভালই হইয়াছে? রেণু যদি দেবদত্তকে তাহার জন্মগত অধিকারে আপনার অঙ্কেই রক্ষা করিত, তবে হয়ত সে তাহার তাপতপ্ত জীবনে শান্তি পাইত। সে যে তাহা পায় নাই, তাহা তিনি জানেন

তবুও যদি তীর্থযাত্রার আকর্ষণ না থাকিত, তবে হয়ত তাঁহার দৌর্ব্বল্য তাঁহাকে অভিভূত করিত। কারণ, বিদায়কালে তিনি দেবদত্তের নয়নে যে অশ্রু দেখিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহাকে ব্যথিত করিতেছিল।

তিনি যখন দীর্ঘ দিনের দীর্ঘ স্মৃতি লইয়া তন্ময় ছিলেন, তখন ট্রেণ দ্রুত পথ অতিক্রম করিতেছিল। কিন্তু ট্রেণের গতি কখন চিন্তার গতির সমান হয় না। দেবদত্ত গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কি ভাবিতেছে—সে তাঁহাকে নির্ম্মম মনে করিয়াছে কি না, এই সব কথা তাঁহার মনে হইতে লাগিল। বুঝি তাঁহারও অজ্ঞাতে একটি দীর্ঘশ্বাস নির্গত হইল

তাহার পর মৃণালিনী দেবতাকে উদ্দেশে প্রণাম করিয়া স্নেহভাজনদিগের কল্যাণ কামনা করিয়া শয়ন করিলেন

নীরেন্দ্র ও কণার শ্বশুর উভয়ে মৃণালিনীর জন্য তীর্থ-ভ্রমণের ব্যবস্থা লিখিয়া দিয়াছিলেন। সে ব্যবস্থা যে সর্ব্বতোভাবে পালিত হইল, তাহা নহে; কারণ, কোন কোন স্থানে যাইয়া মৃণালিনী তীর্থের আকর্ষণে ব্যবস্থা-নির্দ্দেশ অতিক্রম করিলেন। কিন্তু কোথাও দীর্ঘ দিনের জন্য নির্দেশ অতিক্রম করিতে পারিলেন না; কারণ, সকলেই বলিয়া দিয়াছিলেন—নির্দ্দিষ্ট দিনে নির্দ্দিষ্ট স্থানে তিনি সকলের সংবাদ পাইবেন এবং তাঁহারাও তথা হইতে তাঁহার সংবাদ পাইবার আশা করিবেন। তবে সে কথা মনে করিয়া মৃণালিনী মনে মনে হাসিয়াছেন—বলিয়াছেন, যদি সংবাদ দিবার ও সংবাদ পাইবার জন্য এত ব্যাকুলতা থাকে, তবে তিনি কিরূপে তীর্থবাসী হইবার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে পারিবেন?

স্থানে স্থানে তাঁহার বিলম্বের আরও কারণ ছিল। তিনি মনে করিয়া আসিয়াছিলেন—যে স্থানে মনে হইবে, দেবতা চরণে স্থান দিবেন, তিনি সেই স্থানেই জীবনের শেষ কাল অতিবাহিত করিবেন।

হরিদ্বারে আসিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল—গঙ্গার অবতরণ-স্থান কি শান্তিপ্রদ! মনে হইয়াছিল, এই স্থানেই কি গঙ্গা তাঁহাকে আশ্রয় দিবেন? কিন্তু তখনও বহু তীর্থে গমন করা হয় নাই। তিনি মনে করিয়াছিলেন—কে জানে কোথায় স্থান পাইব?

তীর্থের পর তীর্থ দর্শন করিয়া উত্তর ভারতের প্রধান তীর্থগুলির পর মৃণালিনী দক্ষিণ ভারতের তীর্থদর্শনে গমন করিলেন। দক্ষিণ ভারতের মন্দিরসমূহের বিশালতাই সে সকলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, সেই বিশালতার জন্যই তাহারা দর্শকদিগকে যেন স্তম্ভিত করে। সেতুবন্ধ রামেশ্বর হইতে আরম্ভ করিয়া একের পর এক তীর্থ দর্শন করিয়া তিনি শ্রীক্ষেত্রে উপনীত হইলেন। দক্ষিণ ভারতের বহু তীর্থস্থানের আর এক বৈশিষ্ট্য—দেবতাকে লইয়াই নগর। শ্রীক্ষেত্র তেমনই জগন্নাথের রাজধানী। যাহারা সমুদ্র-দর্শনের বা স্বাস্থ্যসঞ্চয়ের জন্য তথায় গমন করে, তাহারাই যেন তথায় অনধিকার-প্রবেশ করে। তথায় যাইয়া মৃণালিনী পত্র লিখিলেন, তিনি আপাততঃ কিছুদিন তথায় থাকিবেন।

তথায় তিনি কণার পত্র পাইলেন—তাঁহাকে তাহার একটি অনুরোধ রাখিতেই হইবে; অনুরোধ তাহার একার নহে—অমলার ও কমলার তাহাতে "ঢেরা সহি" আছে—যদি তিনি তাহাদিগের সহিত সম্বন্ধ বর্জ্জন করিতেই চাহেন, তবে আসিয়া "পিসীমা'র" মন্দির-বাড়ীতে বাস করুন—তাহারা প্রতিশ্রুতি দিতেছে, যখন তখন যাইয়া তাঁহার "যোগ ভঙ্গ" করিবে না; তিনি নিকটে থাকিলেই তাহারা সুখী হইবে।

মৃণালিনী সে পত্রের উত্তর দিলেন:—

দিদিমণি,

তোমার পত্র পাইলাম। তুমি যদি অমলার ও কমলার "ঢেরা সহির" কথা না লিখিতে, তাহা হইলেও মনে করিতাম, তুমি একটা ষড়যন্ত্রের মুখপাত্র। অমলার আর কমলার কথা লিখিয়াছ—সুনীলের নামটি কি লজ্জায় লিখ নাই? তোমরা যে আমার কত বড় প্রলোভন, তাহা তোমরা বুঝিতে পার না। দূরে থাকিলে উপায় নাই বলিয়া প্রলোভন সম্বরণ করা যায়—নিকটে যে তাহা পারা যায় না, দিদি! পিসীমা'র ঠাকুর-বাড়ীতে থাকিলে যে প্রলোভন সম্বরণ করা দুঃসাধ্য হইবে! সন্ন্যাসীর সংসারী হইবার গল্প জান ত? তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন—ঈশ্বরচিন্তা করিবেন। সম্বল লোটা, কম্বল আর কৌপীন। ইন্দুরে কৌপীন কাটে বলিয়া ইন্দুর তাড়াইতে বিড়াল পুষিলেন; তাহার পর বিড়ালের ছানাদিগের দুগ্ধের জন্য গোপালন; গোপালনের জন্য চাকর রাখা, এইরূপে শেষে বিবাহ করিয়া সংসারী হইলেন—থাকিল কেবল 'বাবাজী' নাম।

তুমি লিখিয়াছ, দেবু এত রাগ করিয়াছে যে, পত্র লিখিল না। দেবু যদি আমার উপর রাগ করিত, তবে আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারিতাম; জগন্নাথের দয়ার জন্য "আটকে বাধিতাম"। কিন্তু আসিবার সময় তাহার চোখে যে জল দেখিয়াছিলাম, তাহাই ভুলিতে পারিতেছি না।

তোমরা যখন ডাকিয়াছ, তখন যাইতেই হইবে—কারণ, তোমরাও কম নহ। তবে জগন্নাথ কবে ছুটি দিবেন, তাহা তিনিই জানেন।

তুমি সকলের সংবাদ দিও।

ইহার পর তিনি লিখিয়াছিলেন—

তুমি মা'কে লইয়া এক বার বেড়াইয়া যাইবে?

কিন্তু সেটুকু কাটিয়া দিয়া তাহার পর লিখিয়াছিলেন—

ঠাকুর তোমাদিগের সকলের কল্যাণ করুন।

পত্র পাইয়া সুনীল একখানা পরকলার সাহায্যে যে অংশ কাটিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাহার পাঠোদ্ধার করিয়া কণাকে বলিল, "চল, তুমি আর আমি যাই। এই পত্রেই বুঝা যাইতেছে, তিনি মায়া কাটাইতে পারেন নাই।

প্রস্তাব শুনিয়া কণার শাশুড়ী বলিলেন, "বেশ ত! আমরা বুঝি যেতে জানি না?"

শেষে স্থির হইল, কণা ও সুনীলই যাইবে; কণার শিশুরা তাহাদিগের পিতামহীর নিকটে থাকিবে।

কণা বলিল, "আমি দিদিমাকে নিয়ে আসব।" সে বিষয়ে সকলেরই বিশেষ আগ্রহ লক্ষিত হইল, কেবল রেণু মনে করিল, হয় ত কণার যাওয়া ব্যর্থ হইবে। মাসীমা কত বিচার বিবেচনা করিয়া কোন কায করিতেন, তাহা

তাহার অজ্ঞাত ছিল না। কাযেই তিনি যখন তীর্থস্থানে বাস করিবেন বলিয়া গিয়াছেন, তখন আর ফিরিবেন কি না, সে বিষয়ে রেণুর যথেষ্ট সন্দেহ ছিল।

কণার উৎসাহ দেখিয়া অশোকের শাশুড়ী বলিলেন, "দেখ, যদি তাঁ'কে আন্‌তে পার। তিনি আমাদের কাছে থাকবেন, সে সৌভাগ্য কি আমাদের হ'বে? কিন্তু যেন অম্‌নি ফিরে এস না। জান ত সেকালের যাত্রার সেই কথা—

'যাবি তোরা মানে মানে,
ফিরে আসবি অপমানে;
দেখে মোরা মরব প্রাণে।'

দেবদত্ত কিছু বলিল না বটে, কিন্তু তাহার মন আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। মৃণালিনীর যাইবার সহিত তাহার এক দিনের একটি অসতর্ক মুহূর্ত্তে উক্ত কথার যে সম্বন্ধ আছে, সে বিশ্বাস সে কিছুতেই দূর করিতে পারে নাই। তাহার মনে হইতেছিল, তিনি বলিয়াছেন বটে, তিনি তাহাকে ক্ষমা করিয়াছেন, কিন্তু সে সেই ক্ষমার শান্তি পায় নাই; তিনি যদি ফিরিয়া আইসেন, তবেই সে সেই শান্তি লাভ করিবে। সেই জন্য কণার যাইবার প্রস্তাবে সে বিশেষ উৎসাহ অনুভব করিল। আশা অতি সামান্য ভিত্তির উপর প্রাসাদ রচনা করে, তাই মৃণালিনীর পত্রের যে অংশের পাঠোদ্ধার সুনীল করিয়াছিল, সেই অংশে নির্ভর করিয়া সে-ও আশা করিয়াছিল, তাহাদিগকে দেখিবার জন্য যখন মৃণালিনীর এখনও আগ্রহ আছে, তখন কণা যাইলে তাঁহাকে আনিতে পারিবে। তাহার পর তিনি আসিলে সে আর তাঁহাকে যাইতে দিবে না। সে বিষয়ে সে কমলার সহিত পরামর্শও করিয়াছিল।

দুই দিন পরেই সুনীলের ও কণার ফিরিবার কথা। সে দিন দেবদত্ত কমলাকে লইয়া ষ্টেশনে গিয়াছিল। কিন্তু যখন সে দেখিল, মৃণালিনী আইসেন নাই, তখন তাহার হতাশা এমন অভিমানের উদ্ভব করিল যে, সে তাঁহার সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসাও করিল না। কিন্তু তাহার মুখভাব লক্ষ্য করিয়া কণাই বলিল, "দিদিমা এত তাড়াতাড়ি এলেন না—তবে বলেছেন, আস্‌বেন।"

দেবদত্ত মনে করিল, সে কথা কেবল প্রত্যাখ্যানের মৃদু রূপ।

কিন্তু সে ভুল বুঝিয়াছিল।

তাঁহাকে বিস্মিত করিবে বলিয়া সুনীল ও কণা কোন সংবাদ না দিয়াই তাঁহার নিকট গমন করিয়াছিল। চির-দিনের অভ্যাস প্রায় স্বভাবের মতই প্রবল হয়। তাই কয়দিন তিনি শ্রীক্ষেত্রে থাকিবেন, তাহা স্থির না থাকিলেও তিনি একটি পরিচ্ছন্ন গৃহ ভাড়া লইয়াছিলেন। সন্ধান করিয়া সুনীল যখন সেই গৃহে উপনীত হইল, তখন মৃণালিনী মঙ্গলারতি দর্শন করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন।

দ্বারে "দিদিমা"—ডাক শুনিয়া তিনি ঘর হইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে?"

কণা উত্তর দিল, "কি সর্ব্বনাশ, এর মধ্যেই আমাদের ভুলে গেছেন?"

মৃণালিনী তখন বুঝিয়াছেন, কে ডাকিতেছে। তিনি ব্যস্ত হইয়া বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "ভুল্‌বার কি উপায় রেখেছ?"—কণার সঙ্গে সুনীলকে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "এ যে মেঘ না চাইতেই জল! যুগল যদি এল, তবে বৃন্দাবনে দেখা দিল না কেন?"

তিনি মনে করিয়াছিলেন, দেবদত্তও আসিয়াছে; তাই আর কাহাকেও না দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর সব?"

সুনীল বলিল, "দেবু? তা'কে ত আপনিই ক'রে এসেছেন 'বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি।' তাই সে আপনাকে ধ'রে নিয়ে যেতে আমাদের পাঠিয়েছে।"

"তা' ভাল হয়েছে।"

তিনি বলিলেন, "স্নান কর—মন্দিরে যা'বে ত?"

কণা বলিল, "যা'ব না? আপনি কি গেছলেন?"

"কেন এক বার গেলে কি আর যেতে নাই?"

পাণ্ডার "ছড়িদার" সুনীল ও কণার গাড়ীতেই আসিয়াছিল। মৃণালিনী তাহাকে বলিলেন, "গাড়ী দাঁড়াতে বল—আমরা মন্দিরে যা'ব।"

মন্দিরে যাইবার সময় তিনি কণাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুরের ভোগ খা'বে? না—"

সুনীল বলিল, "ভোগই খা'ব।"

"নিরামিষ কি ভাল লাগবে?"

"খুব ভাল লাগবে।"

মন্দির হইতে আসিবার পথেই মৃণালিনী কলিকাতায় সকলের সংবাদ লইলেন।

তখনই কণা বলিল, "খোঁজ আমি দেব কেন? আপনি ত আমাদের ফেলে পালিয়েছেন!" তাহার কণ্ঠস্বরে অভিমানের সুর বাজিয়া উঠিল।

মৃণালিনী বলিলেন, "দিদি, আর কত দিন ধ'রে রাখতে পারবে? ডাক যে এসেছে।"

"যত দিন পারি। আপনার কি সত্যই আমাদের কথা মনে পড়ে না?"

"তীর্থস্থানে এসেও কি মিথ্যা কথা বলাবে, দিদি?—মনে পড়ে না—এমন কৃপা যে ঠাকুর এখনও করেন নি।"

"সে কৃপায় আর কায নাই, দিদিমা।"

"এই বুঝি তোমরা দিদিমাকে ভালবাস?"

"আমাদের ভালবাসা ত দৌরাত্ম্য। কিন্তু আপনারা যদি তা' না সইবেন, তবে আমরা যা'ব কোথায়?"

মৃণালিনী সুনীলকে দেখাইয়া বলিলেন, "কেন, দিদি, দৌরাত্ম্য করার লোক ত পেয়েছ।"

সুনীল বলিল, "দিদিমা, ও সত্ত্বে ত আমাকে নাতিনীটি দেন নি!"

"ঐ ত সত্ত, ভাই। গোড়াতেই সাত পাক -চৌদ্দ পাকে সে বাঁধন খুলা যায় না।"

কণা ও সুনীল যতই তাঁহার যাইবার কথা বলিল, ততই মৃণালিনী তাহা এড়াইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় দিন সুনীল ও কণা কলিকাতায় যাইবে। কণা বলিল, "দিদিমা, এখন আসল কথার কি, তা'ই বলুন।"

মৃণালিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

"হাঁসের গায়ে জল পড়লে সে যেমন তা'তে গা' ভিজতে দেয় না, আপনি তেমনই আসল কথাটা ঝেড়ে ফেল্‌ছেন। আপনাকে না নিয়ে ত আমরা যা'ব না।"

"কেন, দিদি?"

"সবাই আপনার যা'বার আশা করে আছেন।"

"জগন্নাথ যে দিন যেতে দেবেন, সেই দিনই যা'ব, দিদি; বুড়ীকে কি অত তাড়া দিতে হয়?"

"কিন্তু আমি যে বড়-মুখ ক'রে ব'লে এসেছি, দিদিমা, আপনাকে নিয়ে যা'ব!"

"আমি কি যা'ব না, বলছি, দিদি?"

কণার চক্ষু অশ্রুতে পূর্ণ হইল। সে ধরা গলায় বলিল, "ভগবান দর্পহারীই বটেন। আমি আপনার যে স্নেহের গর্ব্ব নিয়ে এসেছিলাম, তা'ই তিনি চূর্ণ ক'রে দিলেন।" বলিতে বলিতে কণা কাঁদিয়া ফেলিল। মৃণালিনী ইতঃপূর্ব্বে কখন তাহার কোন আবদার অপূর্ণ রাখেন নাই। কাযেই আজ এই প্রথম প্রত্যাখ্যান তাহার পক্ষে বড়ই বেদনার কারণ হইল।

তাহার ক্রন্দন দেখিয়া মৃণালিনীর চক্ষুও অশ্রুতে ভরিয়া আসিল। মায়ার এ কি বন্ধন! তিনি কণাকে আপনার বুকে টানিয়া আনিয়া লইয়া বলিলেন, "দিদি, তোমরা যখন বলছ, আমি যা'ব। এ প্রতিশ্রুতি আমি তোমাকে দিচ্ছি।"

কণা কিন্তু এই কথায় সন্তুষ্ট হইতে পারিল না।

যাইবার সময় কণা যখন আবার কাঁদিল, তখন মৃণালিনী তাহার মুখখানি তুলিয়া তাহার মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন, "দিদি, যা'বার সময় কি কাঁদতে হয়? যে দিন যাত্রা করি, সে দিন দেবুর চোখে যে অশ্রু দেখেছিলাম—তা' আমি কিছুতেই ভুলতে পার্‌ছি না; তা'র উপর আবার তোমার এই অশ্রুধারা!"

কণা বলিল, "আপনি আমাকে বিদায় ক'রে দিলেন—কিন্তু আমি কোন্ মুখে আপনার দেবুকে বল্‌ব, 'দিদিমা এলেন না'? সে যে আপনারই জন্য ষ্টেশনে এসে থাকবে, তা' আমি জানি। সে কি মনে করবে?"

এই কথা মৃণালিনীকে নিরুত্তর করিল।

তিনি বহুক্ষণ ভাবিলেন।

তাহার পর পাণ্ডার "ছড়িদার" যখন আসিল, তখন তিনি মন্দিরের আরত্রিকের জন্য গমন করিলেন। আরত্রিকের পর রত্নবেদীতে প্রণাম করিয়া তিনি যখন মুখ তুলিলেন, তখন তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে যেন দেবদত্তের মুখ ভাসিয়া গেল। তিনি দেবদর্শন করিয়া ফিরিলেন—ভাবিতে ভাবিতে আসিলেন; কণার কথা বার বার তাঁহার মনে হইতে লাগিল—দেবদত্ত কি মনে করিবে? সে কি সত্যই বড় ব্যথা পাইবে?

রাত্রিতে তাঁহার সুনিদ্রা হইল না; নিদ্রাও স্বপ্নবহুল।

তিনি প্রাতে মন্দিরে যাইয়া দেবদর্শন করিয়া দেবতার

নিকট নিবেদন জানাইলেন—তিনি যেন তাঁহার এই দৌর্ব্বল্য দূর করিয়া তাঁহাকে চরণে স্থান দেন।

গৃহে ফিরিয়া তিনি, পরিচারকদিগকে নির্দ্দেশ দান করিলেন, তিনি সন্ধ্যায় কলিকাতা যাত্রা করিবেন,—আপাততঃ তাঁহার বাসার সব ব্যবস্থা থাকিবে; তিনি তাহার পর যেরূপ নির্দ্দেশ দিবেন, তাহাই পালিত হইবে।

তিনি মনে করিলেন, কলিকাতায় যাইয়া সকলকে বুঝাইয়া আবার তীর্থস্থানে আসিবেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে যাহারা এক বার অভ্যস্ত হইয়াছে, তাহারা আর তাহা পূর্ব্বের মত অনুভব করিবে না।

যে বৃদ্ধ সরকার তাঁহার সহিত গিয়াছিলেন, তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া মৃণালিনী কলিকাতা যাত্রা করিলেন।

ট্রেণ ছাড়িয়া দিল—পাণ্ডা বিদায় লইলেন।

মৃণালিনী ভাবিলেন, এ কি ভগবানের পরীক্ষা? তিনি ফিরিয়া যাইবেন মনে করিয়া বাহির হয়েন নাই; কিন্তু তাঁহাকে ফিরিয়া যাইতে হইতেছে। কে তাঁহাকে ফিরাইয়া লইয়া যাইতেছেন?

সে রাত্রিতেও মৃণালিনীর সুনিদ্রা হইল না এবং তাঁহার মনে কেবল অশান্তিরই উদ্ভব হইতে লাগিল।

৪১

সমস্ত দিন দেবদত্ত তাহার অবসাদের ভাব হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে নাই—আহারেও যেন তাহার রুচি ছিল না। শেষ রাত্রি হইতে সে অসুস্থতা অনুভব করিতে লাগিল। কমলা বলিল, "ডাক্তার বাবুকে টেলিফোন করি।"

দেবদত্ত বলিল, "এখন টেলিফোন ক'রে কায নাই; বুড়া মানুষ ব্যস্ত হ'য়ে আস্‌বেন; সকালে যা' হয় করা যা'বে।"

কিন্তু তাহার অসুস্থতা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল দেখিয়া কমলা ব্যস্ত হইয়া ডাক্তার বাবুকে এবং সঙ্গে সঙ্গে রেণুকে ও তাহার পিত্রালয়ে সংবাদ দিল।

সংবাদ পাইয়া সকলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলেরই মনে উদ্বেগ ও আশঙ্কা—শেষ রাত্রিতে বিসূচিকার বিকাশ আরম্ভ হইলে তাহা প্রায়ই সাংঘাতিক হয়।

ডাক্তার বাবু রোগীকে পরীক্ষা করিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন।

দেবদত্ত বলিল, "ডাক্তার বাবু, একটা কায করুন—এম্বুলেন্স আনতে ফোন করুন।"

ডাক্তার বাবু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

"আমি বুঝতে পার্‌ছি, আমার কলেরাই হয়েছে। আমি হাসপাতালে যা'ব।"

"কলেরা কি না, তা' বুঝবার সময় এখনও হয় নি। কিন্তু যদি তা'-ই হয়, তবে তোমার হাসপাতালে যা'বার কি প্রয়োজন?"

"আমি আর কাউকে বিপন্ন কর্‌তে পারি না।"

"কি বল্‌ছ? যদি তোমার ইচ্ছা হয়, আর আমরা দরকার মনে করি, তবে তোমার জন্য পাঁচ জন ডাক্তার দশ জন 'নার্স' আনাই কি অসম্ভব হ'বে?"

"আমি কাউকে বিব্রত করতে চাই না · সে—"

ডাক্তার বাবু এই বাড়ীর বহু দিনের চিকিৎসক। তিনি বাড়ীর সব কথা জানিতেন। তিনি বলিলেন, "তোমাকে পাগলামী করতে দেওয়া হ'বে না। তুমি হাসপাতালে গেছ শুনলে, তোমার মা কি মনে করবেন?"

নীরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "তাঁ'কে কি টেলিগ্রাফ ক'রে দেব?"

উত্তেজিত হইয়া দেবদত্ত বলিল, "না! না! তিনি আমাকে ছেড়ে গিয়ে শান্তিতে আছেন—তাঁ'কে বিরক্ত করা হ'বে না।"

ডাক্তার বাবু তিরস্কারের ভাবে দেবদত্তকে বলিলেন, "তুমি কি আমাদের কি করতে হ'বে—না হ'বে, তা' বল্‌বে? আমরা যা' দরকার মনে করব, তা'ই করব।" তিনি নীরেন্দ্রকে বলিলেন, "আমি ত এখনও রোগটাই কি তা' বল্‌তে পারি না। আর একটু দেখে, কর্ত্তব্য স্থির করা হ'বে।"

রেণু স্তম্ভিতবৎ বসিয়া ছিল।

কমলার মুখ আশঙ্কায় যেন রক্তশূন্য হইয়া গিয়াছিল। তাহার পিতা তাহাকে অভয় দিতেছিলেন—"ভয় কি, মা?" বৃদ্ধা দাসী বলিল, "এ মা'র পুণ্যের সংসার—কোন ভয় পেও না, বৌদিদি।"

দেবদত্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিতে লাগিল—তাহাকে হাসপাতালে পাঠাইতে হইবে—সে কাহাকেও বিপন্ন বা বিব্রত করিবে না।

ডাক্তার বাবু দৃঢ়ভাবে তাহাতে আপত্তি জ্ঞাপন করিলেন।

প্রবীণ ব্যক্তিদিগের প্রতি কোনরূপ অসম্মান প্রকাশ করা—মৃণালিনীর শিক্ষায়—দেবদত্তের প্রকৃতিবিরুদ্ধ হইয়াছিল। তাই ডাক্তার বাবুর দৃঢ়তায় সে বলিল, "যদি আমাকে হাসপাতালে পাঠা'তে আপনার একান্তই আপত্তি থাকে—তবে আপনি কলেরা নার্স আনিয়ে নিন।"

ডাক্তার বাবু বলিলেন, "তোমাকে কে বল্‌লে, তোমার কলেরা হয়েছে?"

"যদি দরকার না হয়, তাঁ'দের প্রাপ্য দিয়ে বিদায় ক'রে দিলেই হ'বে। আপনি টেলিফোন ক'রে দিন।"

"আচ্ছা, বাপু, তা'ই করছি। তোমার সেবা করবার কি লোকের অভাব আছে?"

তিনি রেণুকেও বাল্যাবধি দেখিয়াছেন; রেণুর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি কি বল? এক দাগ ঔষধ দাও।"

তিনি টেলিফোন করিবার জন্য পার্শ্বের কক্ষে গমন করিলেন।

রেণু পুত্রের শয্যাপার্শ্বস্থ টেবলের উপর হইতে ঔষধের শিশি লইয়া এক দাগ ঔষধ গ্লাসে ঢালিয়া দিল। তাহা পান করিয়া দেবদত্ত বলিল, "আপনি আর কলেরার রোগীর কাছে থাকবেন না?"

রেণুর মাতৃ-হৃদয়ের উৎকণ্ঠা তাহাকে তাহার অভ্যস্ত সংযমচ্যুত করিল। সে বলিল, "আমি—আমিও থাক্‌ব না?"

"যা'কে একান্ত অসহায় অবস্থায় বুকে স্থানদান করা হয় নি—তা'র জন্য বিপদ বরণ করা কেন?"

দীর্ঘকালের সঞ্চিত অভিমান, আজ রোগের ও উৎকণ্ঠার দৌর্ব্বল্যে সংযমের বন্ধন ছিন্ন করিয়া আত্মপ্রকাশ করিল।

বলিয়াই দেবদত্তের মনে হইল—কেন তাহার সংযমের শৈথিল্য ঘটিল?

আর রেণু? তাহার মনে হইল, তাহার দৃষ্টিতে পৃথিবীর আলো নিবিয়া গেল—আর তাহার অন্তরে যে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল, তাহা নিবাইবার কোন উপায় নাই।

সেই সময় ডাক্তার বাবু টেলিফোন করিয়া রোগীর ঘরে ফিরিয়া আসিলেন এবং রেণুর দেহ কম্পিত হইতেছে দেখিয়া বলিলেন, "স্ত্রীলোকের ধাতুতেই 'হিষ্টিরিয়া' থাকে। তোমার মাসীমা ছাড়া আমি ত আর কোন স্ত্রীলোককে 'হিষ্টিরিয়া'-বর্জ্জিত দেখলাম না। রোগীর পাশে ব'সে কাঁপতে হ'বে না—চল, তোমাকে অন্য ঘরে রেখে আসি।"

তিনি উঠিয়া রেণুকে ধরিলেন। রেণু কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিল। ডাক্তার বাবু তাহাকে ধরিয়া অন্য কক্ষে একখানি কৌচের উপর বসাইয়া নীরেন্দ্রকে ডাকিলেন—"তুমি এসে এঁকে দেখ। আমি রোগীর কাছে যাই।"

নীরেন্দ্র যখন সে কক্ষে আসিল, তখন রেণু সংজ্ঞা হারাইয়াছে—কৌচের উপর যেন এলাইয়া পড়িয়াছে।

ডাক্তার বাবু বলিলেন, "কিছু করতে হ'বে না। আপনিই জ্ঞান হ'বে।"

তিনি রোগীর ঘরে প্রবেশ করিলেন।

ততক্ষণে কণা ও সুনীল আসিয়াছে—সঙ্গে সুনীলের পিতামাতাও আসিয়াছেন। তাঁহারা রোগীর ঘরের দ্বারে আসিলেই ডাক্তার বাবু বলিলেন, "রোগীর ঘরে আর এসে কায নাই। আমি ত দেখছি, রোগী ভালই আছে। ভয় পাবার কোন কারণ নাই।"

কণা জিজ্ঞাসা করিল, "দিদিমা'কে টেলিগ্রাম করা হয়েছে?"

"না। তা'র বোধ হয়, কোন দরকার হ'বে না।"

কণার শাশুড়ী বলিলেন, "জগন্নাথ তা'-ই করুন।"

তিনি উদ্দেশে জগন্নাথকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "তবুও তাঁ'র জিনিষ; ভাল হয়েছে, এ সংবাদটা দিতে হ'বে।"

ডাক্তার বাবু বলিলেন, "তা' দিবেন। অসুখটা বাড়তে পারত। ছেলে মানুষ হ'লেও বৌমা'টির বুদ্ধি খুব ভাল—সংবাদ দিতে বিলম্ব ক'রে নি। আরও আগে সংবাদ দিতেই চেয়েছিল—রোগী নিজে বারণ করেছেন—আমি বুড়া মানুষ, রাত্রিতে ঘুম ভাঙ্গাবেন না! আরে, বুড়াদের তোমরা যা' ভা'ব, তা'রা তা' নয়—যা'কে মা'র পেট থেকে বার করেছি, তা'র ভাবনা ডাক্তারকে রোগীর ভাবনাই নয়—তা'তে আরও কিছু আছে।"

সকলে অন্য কক্ষে গমন করিলে ডাক্তার রেণুর কথা স্মরণ করিয়া ভৃত্যকে বলিলেন, "পাশের ঘরের ঐ দরজাটা বন্ধ করে দে; আর সদর দরজায় গিয়ে দ্বারবানকে বলে আয়, দু'জন নার্স আসবেন—তাঁ'দের নীচের ঘরে বসিয়ে আমাকে খবর দিবে।"

ভৃত্য চলিয়া গেল।

প্রায় একই সময়ে দুইখানি মোটর গাড়ী আসিয়া গৃহের সম্মুখে স্থির হইল। একখানি হইতে দুই জন শুশ্রূষাকারিণী—শুশ্রূষাকারিণীর বেশে অবতরণ করিয়া দ্বারবানকে বাড়ীর নম্বর জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাকে গাড়ীর ভাড়া চুকাইয়া দিতে বলিলেন। ভৃত্য তাঁহাদিগকে বাড়ীর ভিতরে লইয়া গেল।

দ্বারবান গাড়ীর ভাড়া চুকাইয়া দিতে না দিতে দ্বিতীয় মোটর গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। তাহা হইতে মৃণালিনী অবতরণ করিলেন।

দ্বারবান নমস্কার করিবার পূর্ব্বেই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "দ্বারবানজী, কা'রা এলেন?"

দ্বারবান বলিল, "দাদাবাবুর অসুখ—ডাক্তার বাবু ওঁদের আনিয়েছেন।"

মৃণালিনী আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না—অতি দ্রুত অগ্রসর হইয়া শুশ্রূষাকারিণীদ্বয়কে পশ্চাতে ফেলিয়া যাইলেন। তিনি আর কাহাকেও লক্ষ্য করিলেন না—একেবারে দেবদত্ত যে ঘরে ছিল, সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। তিনি দেবদত্তের জন্য জগন্নাথের যে প্রসাদী মালা আনিয়াছিলেন, অঞ্চল হইতে তাহা বাহির করিয়া দেবদত্তের মস্তকে স্পর্শ করাইয়া উপাধান-তলে রক্ষা করিলেন এবং তাহার পর ডাকিলেন, "দেবু!"

দেবদত্ত চাহিয়া দেখিল, তাহার দৃষ্টিতে অসীম তৃপ্তি।

মৃণালিনী দেবদত্তের মস্তকে হস্ত বুলাইতে বুলাইতে ডাক্তার বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে, ডাক্তার বাবু?"

ডাক্তার বাবু বলিলেন, "ভাবিয়ে তুলেছিলেন বটে; কিন্তু অল্পে অল্পেই গেছে। কলেরাই বল্‌তে হয়, তবে খুব মৃদু প্রকৃতির।"

ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল—শুশ্রূষাকারিণী দুই জন আসিয়াছেন। ডাক্তার বাবু কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই মৃণালিনী বলিলেন, "তাঁদের 'ফীস' আর গাড়ী-ভাড়ার টাকা দিয়ে বিদায় ক'রে দাও; কোন দরকার নাই।"

ডাক্তার বাবু বলিলেন, "ছেলের জিদ্, হাসপাতালে যা'বেন—কাউকে বিব্রত করবেন না।"

মৃণালিনী বুঝিলেন, কি অভিমানে দেবদত্ত উহা বলিয়াছে।

ডাক্তার বাবু বলিলেন, "এখন আপনার ধন আপনি বুঝে নিন।"

মৃণালিনী মুখ নত করিয়া দেবদত্তের মস্তক চুম্বন করিলেন; তাহার পর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কমলা কোথায়?"

বৃদ্ধা দাসী দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া ছিল; সে বলিল, "বৌদিদি আমাকে কি করবেন জিজ্ঞাসা করেছিলেন—আমি বলেছিলাম, 'মা বিপদের সময় ঠাকুর-ঘরের দোরে পড়ে ঠাকুরকে ডাক্‌তেন।' বৌদিদি তাই শুনে, ঠাকুর-ঘরের দোরেই পড়ে আছেন—ঠাকুরকে ডাকৃছেন। তাঁ'র মা সেখানে ব'সে আছেন। আমি ডেকে দিচ্ছি।"

মৃণালিনী বলিলেন, "না, তা'কে ডেক না। যখন সে তা'র মনের মধ্য থেকে বল পা'বে, তখন সব ভয় কেটে যা'বে—আমি গিয়ে তা'কে ডাক্‌ব।"

ডাক্তার বাবু মুগ্ধ হইয়া মৃণালিনীর কথা শুনিতে লাগিলেন।

ততক্ষণে রেণুর মূর্চ্ছাভঙ্গ হইয়াছে। সে সংজ্ঞালাভ করিয়া সম্মুখে নীরেন্দ্রকে দেখিতে পাইল। সে বলিল, "আজ তুমি সব শুনেছ। আমার এক অনুরোধ—শেষ ভিক্ষা—আমাকে বিদায় দাও। আমার নারীত্ব আমার মাতৃত্বকে যে পীড়া দিয়েছে, আমি আজ আর তা' সহ্য করতে পারছি না। আমাকে বিদায় দাও।"—রেণু আর কিছু বলিতে পারিল না—সে যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল।

নীরেন্দ্র বলিল, "আমার আর কিছু বলবার অধিকার নাই। কিন্তু তুমি কোথায় যা'বে?"

"তা' কিছুই বল্‌তে পারি না। জানি, আমি যত দিন বেঁচে থাকব, তত দিন শান্তি পা'ব না, তত দিন এ জ্বালা জুড়াবে না। তবে প্রথমে মাসীমা'র কাছে যা'ব।"

সম্মুখের দালান হইতে আহ্বান আসিল—"রেণু! মা!"—রেণু চমকিয়া উঠিল, সেই চিরস্নেহস্নিগ্ধ আহ্বান—এ যে মাসীমা'র কণ্ঠস্বর!

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

সম্পূর্ণ

কালিদাস-বন্দনা

রাজে উত্তরে দুর্নিরীক্ষ্য গিরি হিমালয় তুঙ্গ রুদ্র,
দক্ষিণে শোভে দুষ্প্রধর্ষ্য দিগন্ত-লীন নীল সমুদ্র,
মহাভারতের অঙ্ক আলোকি', ভাতি দশ দিশি জ্যোতিঃপুঞ্জে,
হে অমর কবি, তুমি বিরাজিছ, সিপ্রা-শীকর-সিক্ত কুঞ্জে।
হিরণ্যময় সুমেরু তুল্য, উর্জ্জস্বল ভুবনানন্দী,
যশ-রস-ঘন বিরাট পুরুষ, কবি কালিদাস তোমারে বন্দি।

পরিবর্ত্তন চলেছে নিত্য, যুগ দেশ লোক রুচি বিভিন্ন
তুমি শাশ্বত, তুমি সনাতন তোমাতে নাহিক ক্ষয়ের বিন্দু,
সবিতাকে মান-যন্ত্রে আরোপি' করে ভাস্বর বিশ্বকর্ম্মা
কবিতাতে তুমি প্রাণ আরোপিয়া করিলে তাহারে বিশ্বধর্ম্মা
সৃজিয়াছ অভিরূপ-ভূয়িষ্ঠা নবীন কোশল, নব অবন্তী,
তুমি মহাকাল, তব জটাজাল চির অনিন্দ্য সুধাস্যন্দী।

কত শতাব্দী গিয়াছে চলিয়া, ভেঙ্গেছে গড়েছে ভারতবর্ষ,
তুমি অনন্ত যুগের সুহৃদ্, মৃত্যু ও জরা করে না স্পর্শ।
জয়-মুখরিত তব জয়-রথ, যাত্রা মন্দাক্রান্তা ছন্দে,—
পুণ্য পদবী সুরভিত করি', পারিজাত হোম হবির গন্ধে।
ভাব-ভাবুকের তুমি হিমালয়, রস-রসিকের ক্ষীরোদ তুল্য
অলকাধিপতি পারে না ক দিতে তোমার স্নিগ্ধ শ্লোকের মূল্য।

বিশ্বরূপ যে তোমাতে নেহারি, হয়ে বিস্মিত মৌন মুগ্ধ—
পৃথু ত তুমিই দোহন করেছ উর্ব্বীর রস, সুরভি-দুগ্ধ।
স্বরগ হইতে সবলে এনেছ তুমি লাবণ্য-সুধার ভাণ্ড
চরণে তোমার শুণ্ড বুলায় যত দিঙ্‌নাগ গজ প্রকাণ্ড।
তুমি আমাদের প্রাণের প্রতীক, দেশের প্রতীক, দেশের সর্ব্ব,
তুমি আমাদের শ্রেষ্ঠ কৃষ্টি, তুমি গৌরব, তুমিই গর্ব্ব।

সিপ্রা তোমার গাহনে ধন্য, উজ্জয়িনীর ধূলি পবিত্র,
তোমার আদরে নগ নদ নদী লভি প্রতিষ্ঠা, হয়েছে তীর্থ।
সর্ব্বশুক্লা সরস্বতীর ধ্যানৈশ্বর্য্য লভেছ বক্ষে,
নিরঞ্জনের অঞ্জন তুমি পেয়েছ তোমার দিব্য চক্ষে।
হিরণ্যময় সুমেরু তুল্য উর্জ্জস্বল ভুবনানন্দী
যশ-রস-ঘন হে মহামানব, কবি কালিদাস তোমারে বন্দি!

তোমার যুগেতে জন্ম লভিলে, হইত এ মর জীবন ধন্য,
তব দর্শনই নিত্যোৎসব, লোভনীয়তর কি আছে অন্য?
আকাঙ্ক্ষা মোর হ'ত না কখনো হইবারে তাল-বেতাল সিদ্ধ,
কর্ণাট-ধরাধিপের প্রাসাদ তুচ্ছ করিত সবল চিত্ত।
দাবী বত্রিশ-সিংহাসনের, ছত্র চামর সরায়ে হস্তে
তব পরিহিত কাব্য-পাদুকা আগ্রহে তুলি নিতাম মস্তে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

পতঞ্জলি ও মহাভাষ্য

পাণিনি, কাত্যায়ন, যাস্ক প্রভৃতি শব্দ প্রাচীন যুগের গ্রন্থকারগণের ব্যক্তিগত নাম নয়। এই শব্দগুলি তাঁহাদের বংশ-পরিচায়ক মাত্র। যেমন চাণক্য বা কৌটিল্য বিষ্ণুগুপ্তের ব্যক্তিগত নাম নয়, কিন্তু বংশ-পরিচায়ক উপাধি মাত্র। যস্কের অপত্য এই অর্থে—যাস্কশব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে (১)। যদিও অপত্যশব্দ পুত্র কন্যার বাচকরূপে অমরকোষে (২) পঠিত হইয়াছে, তথাপি ব্যাকরণ-মহাভাষ্যকার পতঞ্জলির মত,—এই বিষয়ে অমরসিংহের অনুকূল নয়। যাহার দ্বারা পূর্ব্ব-পুরুষগণের পতন হয় না,—তাহাকেই মহাভাষ্যকার অপত্য বলিয়াছেন (৩)। এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে বংশের পরবর্ত্তী যে কোন সন্তান পূর্ব্বপুরুষের অপত্য হইতে পারে। অপত্যশব্দের অমরকোষ-প্রদর্শিত অর্থ মহাভাষ্যের বিরুদ্ধ হওয়ায় গ্রহণীয় নয়, ইহা নিঃসন্দেহ।

পাণিনির গণপাঠে শিবাদির মধ্যে যস্কশব্দ অধুনা দেখিতে পাওয়া না গেলেও "যস্কাদিভ্যো গোত্রে" (২।৪।৬৩)—এই সূত্রে পাণিনি যস্কশব্দের উল্লেখ করিয়াছেন। এই সূত্রের অর্থ এই যে, যস্ক প্রভৃতি শব্দের উত্তর অপত্য অর্থে যে প্রত্যয় হয়, সেই প্রত্যয়ের সেই অপত্যের বহুত্ব বুঝাইলে লুক্ হয়। যস্কবংশীয় এক অথবা দুই ব্যক্তি বুঝাইলে যাস্ক এইরূপ প্রয়োগ হইবে, কিন্তু যখন যস্কবংশীয় বহু ব্যক্তি বুঝাইবে, সে স্থলে যাস্ক এইরূপ প্রয়োগ হইবে না, যস্কশব্দের উত্তরবর্ত্তী অপত্যার্থক অণ্ প্রত্যয়ের লুক্ হইয়া যস্ক এইরূপ প্রয়োগ হইবে। এই সূত্রের বিষয়ে কোন বিশেষ কথা আলোচ্য না থাকায় মহাভাষ্যে এই সূত্র ব্যাখ্যাত হয় নাই।

পাণিনি সূত্রপাঠে ও গণপাঠে যে সকল ঋষির নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই গ্রন্থকার ছিলেন, এমন নহে। পাণিনি শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে ব্যাকরণ লিখিয়াছেন। তাঁহার সময়ে যে সকল সংস্কৃত শব্দ প্রচলিত ছিল, তিনি সেই সকল শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয় বিভাগ করিয়া তাহাদের তৎকাল-প্রচলিত অর্থের বোধের উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে যে সকল ঋষির নাম উল্লেখ করার প্রয়োজন হইয়াছে, তিনি সেই সকল ঋষির নাম উল্লেখ করিয়াছেন। এখানে বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য বিষয় এই যে, পাণিনি বংশপ্রবর্ত্তক যস্কঋষির নাম জানিতেন সুতরাং সেই বংশ তাঁহার অবিদিত ছিল না; সেই যস্কবংশের কোন এক বিশেষ ব্যক্তি, যিনি এই নিরুক্ত প্রণয়ন করিয়াছেন, তিনি পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন, এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

নিরুক্তকার যাস্ক যে পাণিনির পরবর্ত্তী, তাহার প্রমাণ আমরা নিরুক্তের মধ্যেই দেখিতে পাই। যাস্ক নিরুক্তের প্রথম অধ্যায়ের ১৭শ খণ্ডে "পরঃ সন্নিকর্ষঃ সংহিতা" (১,৪।১০৯) পাণিনির এই সূত্রটি অবিকল উদ্ধৃত করিয়াছেন (৪)। এস্থলে এ বিষয়ে এই তর্ক উঠিতে পারে,—যাস্ক পাণিনির

(১) যস্কস্যাপত্যং যাস্কঃ। শিবাদ্যণ্ (শিবাদিভ্যোঽণ্ ৪।১।১১২) সিদ্ধান্তকৌমুদী—অপত্যাধিকার। অধুনা মুদ্রিত কাশিকাতেও শিবাদিগণে যস্ক শব্দ দেখিতে পাওয়া যায় না।

(২) আত্মজস্তনয়ঃ সূনুঃ সুতঃ পুত্রঃ স্ত্রিয়াং ত্বমী। আহুর্দ্দুহিতরং সর্ব্বেঽপত্যং তোকং তয়োঃ সমে। অমরকোষ—মনুষ্যবর্গ।

(৩) অপত্যশব্দঃ ক্রিয়ানিমিত্তো ন তু আত্মজপর্য্যায়ঃ। "ন পতন্ত্যনেনেত্যপত্যম্" ইতি ব্যুৎপত্তেঃ "পঙ্‌ক্তিবিংশতি" ইতি সূত্রে (৫।১।৫৯) ভাষ্যকৃতা দর্শিতত্বাদ্ বাহুলকাৎ করণে যৎপ্রত্যয়ঃ। যন্নিমিত্তং যস্যাপতনং তত্তস্যাপত্যমিতি ফলিতোঽর্থঃ, তথাচ পৌত্রাদিরপি পিতামহাদীনামপতনে হেতুরিতি তেষামপত্যং ভবতি। প্রসিদ্ধং চ ব্যবহিতোঽপি পিতামহাদীনামুদ্ধর্ত্তেতি জরৎকার্ব্বাদ্যুপাখ্যানেষু "অপত্যং পৌত্রপ্রভৃতী"তি সূত্র (৪।১।১৬২) মপ্যত্রানুগুণম্। অমরস্য সূত্রভাষ্যাদিবিরোধ উপেক্ষ্যঃ।"—তত্ত্ববোধিনী-অপত্যাধিকার। প্রৌঢ়মনোরমা এবং শব্দেন্দুশেখরেও এইরূপ কথাই বলা হইয়াছে। পদমঞ্জরী ৪.১।৯৩ সূত্রেও এই বিষয় বিবৃত আছে। পুত্রা অপত্যমিত্যপতনাদপত্যম্।—মহাভাষ্য ৫।১।৫৯।

(৪) যাস্ক কেবল পাণিনির সূত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা নয়; তিনি শৌনকের ঋক্-প্রাতিশাখ্য হইতেও এই বিষয়ে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন—"পদপ্রকৃতিঃ সংহিতা" (ঋক্‌প্রাতিশাখ্য ২।১)। যাস্ক এ বিষয়ে আরও একটি প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন—"পদপ্রকৃতীনি সর্ব্বচরণানাং পার্ষদানি।"

যাস্ক এই সকল প্রমাণ উদ্ধৃত করিলেও, এই প্রমাণগুলি

সূত্র উদ্ধৃত করেন নাই, এই সূত্রটি পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী কোন বৈয়াকরণের; পাণিনি অবিকৃতভাবে সেই সূত্র নিজের ব্যাকরণে গ্রহণ করিয়াছেন। যাস্ক পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী হইতে এই সূত্র উদ্ধৃত করেন নাই; কিন্তু পাণিনি যে ব্যাকরণ হইতে এই সূত্র গ্রহণ করিয়াছেন, যাস্ক সেই ব্যাকরণ হইতেই এই সূত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন।

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই,—ইহা একটি নির্ম্মূল কল্পনা; এই কল্পনার অনুকূলে কোন প্রমাণ নাই। পাণিনি যে এইরূপ অন্য ব্যাকরণের সূত্র অবিকল উদ্ধৃত করিতে পারেন, প্রথমে তাহার প্রমাণ আবশ্যক; এইরূপ আরও দুই একটি সূত্র পাণিনি পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যাকরণ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন—ইহা প্রমাণিত করিতে পারিলে, পূর্ব্বোক্ত সূত্রটি সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ সেইরূপ সম্ভাবনা করা যাইতে পারিত। কিন্তু এই বিষয়ে অন্য কোন উদাহরণ কেহ দেখাইতে পারিবেন, এমন সম্ভাবনা নাই; সুতরাং পূর্ব্বোক্ত কল্পনাটি প্রমাণাভাববশতঃ উপেক্ষণীয়।

নিরুক্তকার যাস্ক পাণিনির পরবর্ত্তী হইলেও মহাভাষ্যকার পতঞ্জলির পূর্ব্ববর্ত্তী; মহাভাষ্যে এই নিরুক্তের কোন কোন কথা দেখিতে পাওয়া যায়। নিরুক্তকার লিখিয়াছেন,—তাদ্যেতানি চত্বারি পদজাতানি, নামাখ্যাতে চোপসর্গনিপাতাশ্চ (১।১।৮)। মহাভাষ্যে এই কথা ইহা অপেক্ষা একটু মার্জ্জিত ভাষায় বলা হইয়াছে,—"চত্বারি পদজাতানি নামাখ্যাতোপসর্গনিপাতাশ্চ" (মহাভাষ্য পস্পশাহ্নিক)। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই, নিরুক্তকার যে কথা বলিতে দুইটি সমাস-যুক্ত পদ ব্যবহার করিয়াছেন, মহাভাষ্যকার একটি সমাস-যুক্ত পদের দ্বারাই সেই বস্তু ব্যক্ত করিয়াছেন। ইহা দ্বারা পতঞ্জলি যে যাস্কের পরবর্ত্তী, তাহা প্রমাণিত হইতেছে; পরবর্ত্তী কালেই প্রতিপাদনের পদ্ধতি ক্রমশঃ মার্জ্জিত হইয়া থাকে। এই চারি প্রকার পদবিভাগের কোন প্রকার ইঙ্গিত আমরা পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে দেখিতে পাই না।

নিরুক্তকার বলিয়াছেন,—"তত্র নামান্যাখ্যাতজানীতি শাকটায়নো নৈরুক্তসময়শ্চ।"—সমস্ত নাম অর্থাৎ প্রাতিপদিক আখ্যাত (=ধাতু) হইতে উৎপন্ন—ইহা শাকটায়ন(৫) (=একজন ঋষি বৈয়াকরণ) (বলিয়াছেন) এবং ইহা নিরুক্তবিদ্‌গণের সম্মত। মহাভাষ্যকার এই কথার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন,—

নাম চ ধাতুজমাহ নিরুক্তে ব্যাকরণে শকটস্য চ তোকম্।
(৩।৩।১)।

এই শ্লোকের পতঞ্জলি নিজেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"নাম খল্বপি ধাতুজম্। এবমাহুর্নৈরুক্তাঃ। বৈয়াকরণানাং চ শাকটায়ন আহ—ধাতুজং নামেতি।"

এস্থলেও মহাভাষ্যকারের ভাষা নিরুক্তকারের ভাষা অপেক্ষা মার্জ্জিত। নিরুক্তকার প্রথমে (নিরুক্ত ১।১।১১) তিঙ্‌বিভক্তিযুক্ত শব্দ এই অর্থে "আখ্যাত" শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন (৫ক) কিন্তু উদ্ধৃত স্থলে "আখ্যাতজানি" এই অংশে তিঙ্‌বিভক্তিযুক্ত পদের অংশ-বিশেষ যে ধাতু, তাহা বুঝাইবার অভিপ্রায়ে 'আখ্যাত' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। এখানে নিরুক্তকারের উক্তি অস্পষ্ট; মহাভাষ্যকার "নাম চ ধাতুজমাহ নিরুক্তে"—এইস্থলে 'ধাতু' শব্দের প্রয়োগ করিয়া অস্পষ্টতার পরিহার করিয়াছেন।

বার্ষ্যায়ণি একজন অতিপ্রাচীন আচার্য্য ছিলেন, এই বার্ষ্যায়ণির কোন গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই; বোধ হয় তাঁহার গ্রন্থ সর্ব্বথা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এই বার্ষ্যায়ণির গ্রন্থ নিরুক্তকারের সময়ে বিদ্যমান ছিল। নিরুক্তকার লিখিয়াছেন,—"ষড়্ ভাববিকারা ভবন্তীতি বার্ষ্যায়ণি-

আকর স্থান নির্দ্দেশ করেন নাই কিংবা এই সকল গ্রন্থকারের নামও নির্দ্দেশ করেন নাই। এখানে আর একটি প্রণিধানযোগ্য বিষয় আছে; যাস্কের সময় ব্যাকরণশাস্ত্র সুপরিপুষ্ট অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। তিনি নিরুক্তশাস্ত্রকে ব্যাকরণের পূর্ণতাসম্পাদক বলিয়াছেন,—"তদিদং বিদ্যাস্থানং (নিরুক্তং) ব্যাকরণস্য কাৎস্নর্যম্।" এই উক্তির দ্বারা নিরুক্তকে ব্যাকরণশাস্ত্রের পরিশিষ্টরূপে প্রতিপাদন করা হইয়াছে। তিনি নিরুক্তে (১।১২।৩) বৈয়াকরণদের মত প্রদর্শন করিয়াছেন এবং অবৈয়াকরণকে নিরুক্তশাস্ত্রের উপদেশের অযোগ্য বলিতেও কুণ্ঠিত হ'ন নাই। অন্য দিকে পাণিনির সূত্রে কিংবা কাত্যায়নের বার্ত্তিকে নিরুক্তসম্বন্ধে সূক্ষ্ম ইঙ্গিতও লক্ষ্য করা যায় না। কেবল মহাভাষ্যে (৩।৩।১) নিরুক্তের নাম উল্লিখিত আছে, দেখিতে পাওয়া যায়।

(৫) এই শাকটায়নের উল্লেখ পাণিনির সূত্রে (৮।৩।১৮, ৮।৪।৫০) আছে। পরবর্ত্তীকালে শাকটায়ন নামক এক জন জৈন বৈয়াকরণ ব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে। ভট্টোজিদীক্ষিত এই পরবর্ত্তী শাকটায়নকে প্রৌঢ়মনোরমাতে "অভিনব শাকটায়ন" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

(৫ক) পূর্ব্বাপরীভূতং ভাবমাখ্যাতেনাচষ্টে ব্রজতি পচতীত্যুপক্রমপ্রভৃত্যপবর্গপর্য্যন্তম্ (নিরুক্ত ১।১।১১)

র্জায়তেঽস্তি বিপরিণমতে বর্দ্ধতেঽপক্ষীয়তে বিনশ্যতীতি।" এই কথাই মহাভাষ্যকারও বলিয়াছেন,—ষড়্ ভাববিকারা ইতি হ স্মাহ বার্ষ্যায়ণিঃ, জায়তেঽস্তি বিপরিণমতে বর্দ্ধতে ঽপক্ষীয়তে বিনশ্যতীতি—মহাভাষ্য ১।৩।১। এখানে যাস্ক ও পতঞ্জলির উক্তির বিশেষত্বটি প্রণিধানযোগ্য। যাস্কের উক্তি পড়িলে মনে হয়, তিনি বার্ষ্যায়ণির গ্রন্থ দেখিয়াছিলেন,—তাঁহার সময়ে বার্ষ্যায়ণির গ্রন্থ প্রচলিত ছিল। পতঞ্জলি "ইতি হ স্মাহ" এই শব্দ-বিন্যাসের দ্বারা বার্ষ্যায়ণিমতের পরম্পরাগত প্রসিদ্ধি সূচিত করিয়াছেন। ইহা হইতেই মনে হয়, পতঞ্জলি পরম্পরাগত প্রসিদ্ধি হইতে বার্ষ্যায়ণির মত জানিতে পারিয়াছিলেন, নিজে বার্ষ্যায়ণির গ্রন্থ দেখেন নাই। যাস্ক পাণিনির পরবর্ত্তী হইলেও বার্ত্তিককার কাত্যায়নের পরবর্ত্তী নহেন। পাণিনি অরণ্য শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে অরণ্যানী শব্দ সিদ্ধ করিয়াছেন (৬)। যাস্ক অরণ্যের পত্নী এই অর্থে অরণ্যানী শব্দ নিষ্পন্ন করিয়াছেন। (নিরুক্ত ৫।২৯—অরণ্যানী—অরণ্যস্য পত্নী) পাণিনি একই সূত্রে ইন্দ্র, বরুণ, ভব, শর্ব্ব প্রভৃতি শব্দের সহিত অরণ্যশব্দের পাঠ করিয়াছেন। ইন্দ্রের স্ত্রী এই অর্থে ইন্দ্রাণী শব্দ সিদ্ধ হয়,—এইরূপ বরুণানী প্রভৃতি শব্দও বরুণ প্রভৃতির স্ত্রী অর্থে নিষ্পন্ন হয়। এই সকল শব্দের সহিত পঠিত অরণ্য শব্দ হইতে যে অরণ্যানী শব্দ সিদ্ধ হয়, তাহাও অরণ্যের স্ত্রী এই অর্থে সিদ্ধ হওয়া যুক্তিসঙ্গত। অরণ্যানী শব্দের যাস্ক যে অর্থ প্রদর্শন করিয়াছেন, পাণিনির সময়েও সেই অর্থেই অরণ্যানী শব্দ ব্যবহৃত হইত, ঐ অর্থই সে সময়ে অরণ্যানী শব্দের প্রচলিত অর্থ ছিল। তাহা না হইলে পাণিনি ইন্দ্র প্রভৃতি শব্দের সহিত সাধারণভাবে একই সূত্রে অরণ্য শব্দের গ্রহণ না করিয়া, অরণ্যানী-শব্দের সিদ্ধির জন্য ভিন্ন সূত্র প্রণয়ন করিতেন। কোন নিয়মিত অর্থে একটি শব্দ চিরকাল ব্যবহৃত হয়, এমন নহে। কোন একটি প্রাচীন ভাষার আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়—এমন অনেক শব্দ সে ভাষায় আছে—যে সকল শব্দ পূর্ব্বে যে অর্থে ব্যবহৃত হইত, এখন আর সে অর্থে ব্যবহৃত হয় না। বৈদিক ভাষায় ধী-শব্দ কর্ম্ম অর্থে (৭) ব্যবহৃত হইত। এখন এই কর্ম্ম অর্থে ধী-শব্দের প্রয়োগ হয় না। শক্তি-শব্দ বেদে কর্ম্ম অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে (৮); পাণিনির সূত্রে আয়ুধ-বিশেষ বুঝাইবার উদ্দেশে এই শক্তি-শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে (৯); বিষ্ণু পুরাণে এই শক্তি-শব্দের সামর্থ্য অর্থে প্রয়োগ দেখা যায় (১০)। নিঘণ্টুতে শিল্প-শব্দ কর্ম্মনামের মধ্যে পঠিত হইয়াছে (১১)। পাণিনি এই শিল্প-শব্দ কলা-কৌশল অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন (১২)।

কেবল বৈদিক শব্দই লৌকিক সংস্কৃতে অন্য অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা নহে। লৌকিক সংস্কৃতেও শব্দের অর্থ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, এরূপ উদাহরণ বিরল নয়। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে ব্যবায়-শব্দ ব্যবধান অর্থে প্রযুক্ত দেখিতে পাওয়া যায় (১৩)। পূর্ব্বমীমাংসাসূত্রেও এই ব্যবধান অর্থে বিপূর্ব্বক ইণ্ ধাতুর প্রয়োগ (১৪) আছে। পরবর্ত্তী সংস্কৃত ভাষায় ব্যবায়-শব্দের অন্য অর্থে ব্যবহার দেখা যায়, সে অর্থটি অষ্টাধ্যায়ীর অর্থ হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত,—স্ত্রীপুরুষের যৌন-সংযোগ (১৫)। পাণিনি মতি-শব্দের ইচ্ছা অর্থে (১৬) প্রয়োগ করিয়াছেন। পরবর্ত্তী কালে বুদ্ধি

---

(৬) অষ্টাধ্যায়ী ৪।১।৪৯। পাণিনি-সূত্রের বর্ত্তমান পাঠ অবলম্বনে এখানে এই আলোচনা করা হইল। এ সম্বন্ধে অন্য প্রকারের বিশেষ আলোচনা প্রবন্ধান্তরে করা হইবে।

(৭) নিঘণ্টু ২ অধ্যায়।

(৮) নিঘণ্টু ২ অধ্যায়।
স্তোমেন হি দিবি দেবাসো অগ্নিমজীজনঞ্ছক্তিভী রোদসি প্রাম্।
তমূ অকৃণ্বংস্ত্রেধা ভুবে কং স ওষধীঃ পচতি বিশ্বরূপাঃ॥
—ঋক্‌সংহিতা ৮।৪।১১।৫
শক্তিভিঃ=কর্ম্মভিঃ।—নিরুক্ত ৭।২৮।১

(৯) অষ্টাধ্যায়ী ৪।৪।৫৯; শকাতেঽনয়া প্রহর্ত্তুমিতি শক্তিঃ।—পদমঞ্জরী ৪।৪.৫৯; এই সূত্রে প্রহরণম্ (৪।৪.৫৭) এই শব্দের অনুবৃত্তি আছে। প্রহরণ-শব্দের অর্থ আয়ুধ,—প্রহরণমায়ুধং প্রক্রিয়তেঽনেনেতি কৃত্বা;—পদমঞ্জরী ৪.৪।৫৭।

(১০)। শক্তয়ঃ সর্ব্বভাবানামচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ।
যতোঽতো ব্রহ্মণস্তাস্তু সর্গাদ্যা ভাবশক্তয়ঃ॥
বিষ্ণুপুরাণ—প্রথম অংশ ৩।২

(১১) নিঘণ্টু ২ অধ্যায়।

(১২) অষ্টাধ্যায়ী ৪।৪।৫৫; শিল্পং কৌশলম্—কাশিকা। কৌশলমিতি ক্রিয়াভ্যাসপূর্ব্বকো জ্ঞানবিশেষঃ।—পদমঞ্জরী।

(১৩) অষ্টাধ্যায়ী ৮।৩।২; ৩৮।

(১৪) জৈমিনিপ্রণীত মীমাংসাসূত্র ২।১।৪৯।

(১৫) ব্যবায়ো গ্রাম্যধর্ম্মো না মৈথুনং নিধুবনং রতম্। অমর-কোষ, দ্বিতীয় কাণ্ড, ব্রহ্মবর্গ, ৫৭।

(১৬) অষ্টাধ্যায়ী ৩।২।১৮৮;

অর্থে মতি-শব্দের ব্যবহার হইয়াছে (১৭)। এইরূপ উদাহরণ আরও বহু আছে। এই জন্য বৈয়াকরণগণ বলিয়াছেন, "সর্ব্বে সর্ব্বার্থবাচকাঃ।"—সকল শব্দই সকল অর্থের বাচক।

শব্দের অর্থের এই পরিবর্ত্তনশীলতার জন্য বার্ত্তিককার কাত্যায়নের সময়ে অরণ্যানী শব্দের অর্থ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল। এই জন্য বার্ত্তিককার অরণ্যানী শব্দের সম্বন্ধে বার্ত্তিক প্রণয়ন করিয়াছেন। বার্ত্তিককার কাত্যায়নের সময় অরণ্যানী শব্দের অর্থ ছিল মহারণ্য; এখনও সেই অর্থেই অরণ্যানী শব্দের ব্যবহার হয়। পাণিনি তাঁহার অষ্টাধ্যায়ীতে কোন প্রসঙ্গেই কোন দার্শনিক বিষয়ের সুস্পষ্টভাবে অবতারণা করেন নাই। কাত্যায়নের বার্ত্তিকে আমরা দার্শনিক বিষয়ের চর্চ্চা দেখিতে পাই; কাত্যায়নের প্রথম বার্ত্তিকেই শব্দ, অর্থ এবং এই উভয়ের সম্বন্ধের নিত্যতা (১৮) স্বীকৃত হইয়াছে। যাস্কের গ্রন্থের আরম্ভেই (১৯) একটি দার্শনিক বিচারের অবতারণা করা হইয়াছে এবং সেই প্রসঙ্গে শব্দের নিত্যতার উল্লেখ করা হইয়াছে। কাত্যায়ন নানাস্থানে নানাপ্রসঙ্গে পাণিনির সূত্রের উপর নানাপ্রকার বিচারের অবতারণা করিয়াছেন; যাস্কও নিরুক্তে নানাপ্রসঙ্গে নানাপ্রকার বিচারের অবতারণা করিয়াছেন (২০)। এই প্রকারের বিচারপদ্ধতি পাণিনির পরবর্ত্তী কালে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী সূত্রযুগের গ্রন্থ। যাস্কের নিরুক্ত পরবর্ত্তী ব্যাখ্যাযুগের গ্রন্থ। এই দিক্ দিয়াও যাস্ককে পাণিনির পরবর্ত্তী বলিতে কোন প্রকার আপত্তি দেখা যায় না।

অধ্যাপক ম্যাক্সম্যুলার খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে উৎপন্ন কাশ্মীরদেশীয় সোমদেব ভট্টের কথাসরিৎসাগরের গল্পের উপর নির্ভর করিয়া পাণিনি ও কাত্যায়নকে সমসাময়িক বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কথাসরিৎসাগরের গল্পের ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে মূল্য অনেক কম। কাত্যায়ন পাণিনি-সূত্রের উপর ন্যূনাধিক ৪০০০ বার্ত্তিক প্রণয়ন করিয়াছেন। আমরা যেরূপ অরণ্যানী শব্দের বিষয়ে অর্থ পরিবর্ত্তন দেখাইয়াছি, এইরূপ আরও অনেকস্থলে দেখা যায়,—পাণিনি যে অর্থে যে শব্দ নিষ্পন্ন করিয়াছেন, কাত্যায়ন সকল স্থলে সেই শব্দ সেই অর্থে নিষ্পন্ন করেন নাই, ভিন্ন অর্থে নিষ্পন্ন করিয়াছেন। পাণিনির সূত্র অনুসারে যে শব্দ যে আকারে সিদ্ধ হইতে পারিত, কাত্যায়ন কোন কোন স্থলে শব্দের সেই আকারেরও পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছেন। পাণিনির ন্যায় বৈয়াকরণ,—যাঁহাকে মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি 'প্রমাণভূত আচার্য্য' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন,—তাঁহার গ্রন্থের এই সকল ত্রুটি তাঁহার সমসাময়িক অন্য একজন বৈয়াকরণ সংশোধন করিয়া দিয়াছেন, ইহা কোনরূপেই মনে করিতে পারা যায় না। এ বিষয়ে এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত যে, ভাষার স্বাভাবিক গতি অনুসারে এইরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল; কাত্যায়ন তাৎকালিক ভাষার পর্য্যালোচনা করিয়া সেই সকল পরিবর্ত্তন অনুসারে পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর সংস্কার করিয়া গিয়াছেন। বহু পরবর্ত্তী কালে কাশিকাকার ভাষার এইরূপ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া সংস্কারের চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু সেই সংস্কার বৈয়াকরণসম্প্রদায়ে গৃহীত হয় নাই।

যদি কাত্যায়ন পাণিনির সমসাময়িক হইতেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহার সমকালে রচিত অসম্পূর্ণ পাণিনি-ব্যাকরণের সংস্কার সাধন না করিয়া নিজে স্বতন্ত্র ব্যাকরণ প্রণয়ন করিতেন। কাত্যায়নের সময়ে পাণিনির ব্যাকরণ সর্ব্বজনমান্য হইয়াছিল। কাত্যায়ন বুঝিয়াছিলেন, তিনি স্বতন্ত্র ব্যাকরণ প্রণয়ন করিলে, সে ব্যাকরণ সুধীসমাজে আদৃত নাও হইতে পারে; যদি সে ব্যাকরণ তাৎকালিক সুধীসমাজে আদৃত না হয়, তাহা হইলে, তাঁহার পরিশ্রম বৃথা যাইতে পারে।

(১৭) অমরকোষ, প্রথমকাণ্ড, ধীবর্গ, ১।

(১৮) সিদ্ধে শব্দার্থসম্বন্ধে।—(কাত্যায়ন-বার্ত্তিক মহাভাষ্য পস্পশাহ্নিকে উদ্ধৃত।) আচার্য্য ভর্তৃহরি বলিয়াছেন, সূত্র, বার্ত্তিক এবং ভাষ্যের প্রণেতা যে তিনজন ঋষি পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি—ইঁহাদের সকলের মতেই শব্দ, অর্থ এবং এই উভয়ের সম্বন্ধ নিত্য। দ্রষ্টব্য—বাক্যপদীয় ১। ২৩

(১৯) নিরুক্ত—১।২

(২০) নিরুক্ত ১।১২—এই স্থলে সমস্ত নাম ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, নিরুক্ত শাস্ত্রের এই সিদ্ধান্ত যুক্তিদ্বারা সমর্থিত হইয়াছে।

নিরুক্ত ১।১৫—এই স্থলে বেদ-মন্ত্রের অর্থ আছে, মন্ত্রগুলি নিরর্থক শব্দসমষ্টি নহে,—এই সিদ্ধান্ত বিচারদ্বারা স্থির করা হইয়াছে। এই বিষয়ের বিচার পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনের সূত্রে এবং শাবরভাষ্যাদিতেও করা হইয়াছে। নিরুক্ত ৭।৪—এই স্থলে দেবতাসম্বন্ধে বিচার করা হইয়াছে।

পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত সর্ব্বজন-মান্য পাণিনিব্যাকরণের সংস্কার করিলে তাঁহার সেই সংস্কারগুলি পাণিনিব্যাকরণের সঙ্গে সঙ্গে সুধীসমাজে আদৃত হইবে। এই জন্য তিনি পাণিনি-ব্যাকরণের সংস্কার করিয়াছেন, স্বতন্ত্র ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন নাই। অতএব পাণিনি এবং কাত্যায়ন সমসাময়িক, অধ্যাপক ম্যুলারের এই সিদ্ধান্ত কথাসরিৎসাগরের গল্পের মতই ঐতিহাসিক-মূল্যহীন। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলির কাল সম্বন্ধে বিদেশীয় ও ভারতীয় অনেক পণ্ডিতই আলোচনা করিয়াছেন। অধ্যাপক গোল্ডষ্টুকার খৃষ্টপূর্ব্ব ১৪০ হইতে ১২০ অব্দ পতঞ্জলির সময় নির্দ্দেশ করিয়াছেন (২১)। অধ্যাপক ম্যাকডোনেলের মতে পতঞ্জলি খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর দ্বিতীয় অর্দ্ধে বিদ্যমান ছিলেন এবং তিনি বলিয়াছেন, পতঞ্জলি খৃষ্টাব্দের আরম্ভের পরবর্ত্তী কোন প্রকারেই হইতে পারেন না (২২)। খৃষ্টপূর্ব্ব ১৫০ হইতে ১৪০ অব্দ পতঞ্জলির কাল, ইহা ঐতিহাসিক ভিন্‌সেণ্ট এ স্মিথ নানা প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন (২৩)। অধ্যাপক কীথের মতে পতঞ্জলির সময় খৃষ্টপূর্ব্ব ১৫০ অব্দ (২৪)। অধ্যাপক বেলভেলকারও পতঞ্জলির সময় খৃষ্টপূর্ব্ব ১৫০ অব্দই স্বীকার করিয়াছেন (২৫)।

শুঙ্গবংশের প্রথম রাজা পুষ্যমিত্র খৃষ্টপূর্ব্ব ১৮৫ অব্দে মৌর্য্যবংশের অন্তিম অকর্ম্মণ্য রাজা বৃহদ্রথকে বধ করিয়া রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। পুষ্যমিত্রের পুত্র যুবরাজ অগ্নিমিত্র পিতার মৃত্যুর পরে খৃষ্টপূর্ব্ব ১৪৯ অব্দে রাজসিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, পুষ্যমিত্রের রাজত্বকাল খৃষ্টপূর্ব্ব ১৮৫ হইতে ১৪৯ অব্দ পর্য্যন্ত ৩৭ বৎসর। যদি তিনি রাজ্যারম্ভের বৎসরের শেষভাগে সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া থাকেন এবং মৃত্যুর বৎসরে যদি তিনি বৎসরারম্ভের পরেই পরলোকগত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে, পুষ্যমিত্রের রাজ্যকাল এক-আধ বৎসর কম হইতে পারে।

পুষ্যমিত্র নিরুপদ্রবে রাজ্য-শাসন করিতে পারেন নাই। তাঁহার রাজ্যলাভের ২০ বৎসর পরে সম্ভবতঃ ১৬৫ খৃষ্টপূর্ব্ব অব্দে কলিঙ্গের জৈন রাজা খারবেল তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করেন। এই আক্রমণে খারবেল বিশেষ কিছুই সুবিধা করিতে না পারিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ইহার চারি বৎসর পরে খারবেল পুনরায় পুষ্যমিত্রের রাজ্য অতর্কিতে আক্রমণ করেন এবং তিনি এবার পুষ্যমিত্রকে ক্ষতিগ্রস্ত করিতে সমর্থ হ'ন—ইহা খারবেল কর্ত্তৃক উৎকীর্ণ একটি শিলালিপিতে বর্ণিত আছে। ইহার পরে খৃষ্টপূর্ব্ব ১৫৫-১৫৩ অব্দে কাবুল ও পাঞ্জাবের গ্রীক রাজা মেনাণ্ডার (Menander) পুষ্যমিত্রের রাজ্য আক্রমণ করেন। পুষ্যমিত্র এই গ্রীক রাজাকে ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত করেন। ইহার পাঁচ বৎসর পরে পুষ্যমিত্র পরলোক গমন করেন। পুষ্যমিত্র তাঁহার রাজত্বকালে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, এ কথা ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়।

আমরা মহাভাষ্যে পুষ্যমিত্রের নামের উল্লেখ পাঁচবার দেখিতে পাই। প্রথমে ১।১।৬৮ সূত্রের ভাষ্যে (২৬) 'পুষ্যমিত্র-সভা'—শব্দটি দেখা যায় এবং পুষ্যমিত্র যে একজন রাজা, ইহাও সেই প্রকরণের পর্য্যালোচনার দ্বারা বুঝিতে পারা যায়। পুষ্যমিত্রসভা—এই শব্দের পর মহাভাষ্যে 'চন্দ্রগুপ্ত-সভা' এই শব্দটি উল্লিখিত হইয়াছে এবং চন্দ্রগুপ্ত যে একজন রাজার নাম ইহাও সেস্থলে বলা হইয়াছে। ইহার পরে ৩।১।২৬ সূত্রের মহাভাষ্যে (২৭) পুষ্যমিত্রের নামের উল্লেখ তিনবার দেখিতে পাওয়া যায় (২৮)। বর্ত্তমানে

(২১) Professor Goldstucker's Panini (2nd Edn) P, 180.

(২২) A History of Sanskrit Literature (Macdonell) fourth impression, P.431.

(২৩) The Early History of India (4th Edn.) P, 228.

(২৪) A History of Sanskrit Literature (Dr. A. . Keith) P, 428.

(২৫) System of Sanskrit Grammar (1915) P, 32.

(২৬) স্বং রূপং শব্দস্যাশব্দসংজ্ঞা।

(২৭) হেতুমতি চ।

(২৮) যজ্ঞ্যাদিষু চাধিপর্য্যাসো বক্তব্যঃ। পুষ্যমিত্রো যজতে যাজকা যাজয়ন্তীতি। তত্র ভবিতব্যং পুষ্যমিত্রো যাজয়তে যাজকঃ যজন্তীতি।............নাবশ্যং নজিৰ্হবিপ্ৰক্ষেপণ এব বর্ত্ততে, কিং তর্হি। ত্যাগেঽপি বর্ত্ততে। অহো যজত ইত্যুচ্যতে যঃ স্বং ত্যাগং করোতি। তং চ পুষ্যমিত্রঃ করোতি যাজকাঃ প্রয়োজয়ন্তি।

লট্ (৩।২।১২১) এই সূত্রের মহাভাষ্যে "ইহ পুষ্যমিত্রং যাজয়ামঃ" এই উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়।

মহাভাষ্যে এই ভাবে পুষ্যমিত্রের নামের অনেকবার উল্লেখ দেখিয়া এবং বর্ত্তমানকালের ক্রিয়াপদের সহিত তাঁহার নামের প্রয়োগ দেখিয়া পুরাতত্ত্ববিদ্গণ মহাভাষ্যকার পতঞ্জলিকে পুষ্যমিত্রের সম-সাময়িক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

সম্প্রতি দুই জন বিশিষ্ট ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে আমাদের নিকট একটি আশঙ্কা উত্থাপন করিয়াছেন।

ইঁহাদের আশঙ্কা এই :—যাঁহারা মহাভাষ্যকারকে পুষ্যমিত্রের সম-সাময়িক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, মহাভাষ্যে পুষ্যমিত্রের নামের উল্লেখই তাঁহাদের একমাত্র অনুকূল প্রমাণ; কিন্তু কেবল এই প্রমাণকে অবলম্বন করিয়া মহাভাষ্যকারকে পুষ্যমিত্রের সম-সাময়িক বলা যায় না। মহাভাষ্যে পুষ্যমিত্রের নামের ন্যায় ১।১।৬৮ সূত্রে চন্দ্রগুপ্তের নামেরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; আবার এই সূত্রের কাশিকাবৃত্তিতেও ঠিক এই ভাবেই পুষ্যমিত্র ও চন্দ্রগুপ্ত উভয়ের নামের উল্লেখ আছে। আমরা যেরূপ কাশিকাকার জয়াদিত্যকে (২৯) "পুষ্যমিত্রসভা" এই প্রত্যুদাহরণ দেখিয়া পুষ্যমিত্রের সমসাময়িক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে পারি না, সেইরূপ মহাভাষ্যকারকেও পুষ্যমিত্রের সম-সাময়িক বলিয়া সিদ্ধান্ত করা উচিত নহে। বিশেষতঃ "চন্দ্রগুপ্ত-সভা" এই প্রত্যুদাহরণও মহাভাষ্যে উক্ত সূত্রে আছে। কিন্তু কেহ চন্দ্রগুপ্তের নাম দেখিয়া মহাভাষ্যকারকে চন্দ্রগুপ্তের সম-সাময়িক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে সাহসী হ'ন নাই। কারণ, মহাভাষ্যকারকে চন্দ্রগুপ্তের সম-সাময়িক বলিলে, তাঁহার পুষ্যমিত্রের নাম জানার কোন সম্ভাবনা থাকে না। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, পতঞ্জলি চন্দ্রগুপ্তের সম-সাময়িক না হইয়াও, চন্দ্রগুপ্ত এক জন পূর্ব্ববর্ত্তী প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন বলিয়া তাঁহার নামের উল্লেখ করিয়াছেন; এইরূপ পতঞ্জলি পুষ্যমিত্রের সম-সাময়িক না হইয়াও তাঁহার সময়ে পুষ্যমিত্রের নাম প্রসিদ্ধ ছিল বলিয়া পুষ্যমিত্রের নামের উল্লেখ করিতে পারেন; সুতরাং পুষ্যমিত্রের নামের উল্লেখ থাকায় মহাভাষ্যকারকে তাঁহার সম-সাময়িক বলিয়া নিঃসন্দেহে নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না; কিন্তু যেমন চন্দ্রগুপ্তকে পতঞ্জলির পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, সেইরূপ পুষ্যমিত্র সম্বন্ধেও বলা যাইতে পারে।

এই আশঙ্কার উত্তরে বক্তব্য এই;—যাঁহার গ্রন্থে পুষ্যমিত্রের নামের উল্লেখ আছে, তাঁহাকে চন্দ্রগুপ্তের সম-সাময়িক কোন প্রকারেই বলা যায় না, এই জন্য পতঞ্জলিকে চন্দ্রগুপ্তের পরবর্ত্তী বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার গ্রন্থে অনেকবার পুষ্যমিত্রের নামের উল্লেখ থাকায় পুষ্যমিত্রের সহিত তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল, ইহা স্বভাবতই মনে হয়। ভাষ্যকার ৩।২।১২১ সূত্রের উদাহরণ-স্বরূপ যথাক্রমে তিনটি বাক্য প্রদর্শন করিয়াছেন;—
[১] "ইহ বসামঃ" (এখানে আমরা বাস করিতেছি);
[২] "ইহাধীমহে" (এখানে আমরা অধ্যয়ন করিতেছি);
[৩] "ইহ পুষ্যমিত্রং যাজয়ামঃ" (এখানে আমরা পুষ্যমিত্রকে যাজন করিতেছি অর্থাৎ পুষ্যমিত্রকে যজ্ঞ করাইতেছি)। এই উদাহরণ তিনটি যেরূপ ক্রমিকভাবে বিন্যস্ত আছে, তাহাতে মনে হয়, ভাষ্যকার পুষ্যমিত্রের যজ্ঞের সময়ে সেই যজ্ঞস্থলে উপস্থিত ছিলেন এবং সেই যজ্ঞের ঋত্বিকের কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। ৩।১।২৬ এবং ৩।২।১২১ এই দুই সূত্রে যে ভাবে বর্ত্তমানকালের লট্-বিভক্তির দ্বারা পুষ্যমিত্রের যজ্ঞের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, মহাভাষ্যের এই অংশ পুষ্যমিত্রের যজ্ঞের সময়ে রচিত হইয়াছিল।

কাশিকাকার জয়াদিত্য চন্দ্রগুপ্ত ও পুষ্যমিত্রের নাম-সংবলিত প্রত্যুদাহরণ দুইটি মহাভাষ্য হইতে আহরণ করিয়াছেন, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমরা দেখিতে পাইতেছি; কিন্তু মহাভাষ্যকার পুষ্যমিত্রের নাম-সংবলিত উদাহরণ এবং প্রত্যুদাহরণগুলি অন্য গ্রন্থ হইতে আহরণ করিয়াছেন, ইহার কোন প্রমাণ নাই। যদি কেহ এরূপ কল্পনা করেন,—মহাভাষ্যকার এই সকল উদাহরণ এবং প্রত্যুদাহরণ অন্য গ্রন্থ হইতে আহরণ করিয়াছেন,—

---

(২৯) বামন ও জয়াদিত্য নামক দুইজন বৌদ্ধ পণ্ডিত সম্মিলিতভাবে কাশিকাবৃত্তি প্রণয়ন করেন। প্রথম, দ্বিতীয়, পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ের বৃত্তি জয়াদিত্যবিরচিত; অবশিষ্ট অংশের বৃত্তি বামনের প্রণীত—ইহা প্রাচীন বৈয়াকরণসমাজে প্রসিদ্ধ ছিল।

প্রথমদ্বিতীয়পঞ্চমষষ্ঠা জয়াদিত্যকৃতবৃত্তয়ঃ। ইতরা বামনকৃতা বৃত্তয় ইত্যভিযুক্তাঃ।—শব্দরত্ন—সংখ্যৈকবচনাচ্চ বীপ্সায়াম্।

তাহা হইলে তাঁহার সেই কল্পনা যে সম্পূর্ণ নির্মূল কল্পনা হইবে, তাহাতে কোন সংশয় নাই; যেহেতু, মহাভাষ্যের পূর্ব্ববর্ত্তী সেরূপ কোন গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় নাই। পাশ্চাত্ত্যগণের লিখিত ইতিহাসে পুষ্যমিত্রের যজ্ঞের উল্লেখ থাকিলেও তাহার কোন সময় নির্দ্দিষ্ট করা হয় নাই। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, যুবরাজ অগ্নিমিত্র পুষ্যমিত্রের মৃত্যুর পর খৃষ্টপূর্ব্ব ১৪৯ অব্দে রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। তাহা হইলে, সেই বৎসর পুষ্যমিত্র স্বর্গারোহণ করেন, ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। মেনাণ্ডারের আক্রমণের কথা মহাভাষ্যকার উল্লেখ করিয়াছেন (৩০)। মহাভাষ্যকার যেভাবে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, মেনাণ্ডারের আক্রমণের সময়ে মহাভাষ্যকার জীবিত ছিলেন এবং মেনাণ্ডারের আক্রমণের পরে মহাভাষ্য রচিত হইয়াছিল, কিন্তু ঐ আক্রমণের প্রত্যক্ষদর্শী তিনি ছিলেন না। আমরা এ পর্য্যন্ত যতদূর প্রমাণ পাইতেছি, তাহাতে ইহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে বলা যাইতে পারে, পুষ্যমিত্রের জীবিতকালে ১৫৩ হইতে ১৪৯ খৃষ্ট পূর্ব্ব অব্দের মধ্যে মেনাণ্ডারের আক্রমণের পরে মহাভাষ্য রচিত হইয়াছিল এবং সেই সময়ের মধ্যেই পুষ্যমিত্রের যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

পতঞ্জলি যে সময়ে মহাভাষ্যের রচনা করেন, তাহার অনেক পূর্ব্ব হইতে তিনি বিদ্যমান ছিলেন, ইহা নিঃসন্দেহ। আমরা যে অলৌকিক পাণ্ডিত্য মহাভাষ্যে দেখিতে পাই, সেই পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিতে পতঞ্জলির সময় লাগিয়াছিল, সহসা সে পাণ্ডিত্য অর্জ্জিত হয় নাই,—ইহা অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। পতঞ্জলি শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় অতি অল্পবয়সে অলৌকিক পাণ্ডিত্যের অধিকারী হইয়াছিলেন, এরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না এবং কোন প্রাচীন কিংবদন্তীও ইহার সমর্থন করে না। মহাভাষ্যের ন্যায় বিশাল গ্রন্থ—যাহা অন্ততঃ একখানি বাল্মীকি রামায়ণের সমান (৩১)—যাহার প্রতিপত্রে অলৌকিক পাণ্ডিত্য এবং প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা যে পরিণত বয়সের রচনা, ইহা আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারি।

পুষ্যমিত্র যবন মেনাণ্ডারকে ভারতভূমি হইতে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত করিয়াছিলেন, ইহা ইতিহাসের পাঠকগণ অবগত আছেন। মেনাণ্ডারের বিতাড়নের পরে কখনও কোন পাশ্চাত্ত্যদেশীয় রাজা স্থল-পথে ভারত আক্রমণ করেন নাই, ইহাও ইতিহাস আমাদের বলিয়া দিতেছে। মেনাণ্ডারের বিতাড়নের পরে যখন পুষ্যমিত্রের রাজশক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সেই সময়েই পুষ্যমিত্র যজ্ঞ করিয়াছিলেন, আনন্দ উৎসবের সেই সময়ই মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানের যোগ্য অবসর—ইহা বুঝিতে কষ্ট হয় না।

(৩০) পরোক্ষে চ লোকবিজ্ঞাতে প্রয়োক্তুর্দর্শনবিষয়ে (কাত্যায়ন-বার্ত্তিক)। পরোক্ষে চ লোকবিজ্ঞাতে প্রয়োক্তুর্দর্শনবিষয়ে লঙ্ বক্তব্যঃ। . অরুণদ্ যবনঃ সাকেতম্। অরুণদ্ যবনো মধ্যমিকাম্। (মহাভাষ্য ৩।২।১১১)

অনুভূতত্বাৎ পরোক্ষোঽপি প্রত্যক্ষযোগ্যতামাত্রাশ্রয়েণ দর্শনবিষয় ইতি বিরোধাভাবঃ।—কৈয়ট।

যে ব্যাপারটি পরোক্ষ অথচ লোকপ্রসিদ্ধ এবং যিনি শব্দপ্রয়োগ করিতেছেন, তাঁহার প্রত্যক্ষের যোগ্য অর্থাৎ তিনি সেই ব্যাপারের সময়ে চেষ্টা করিলে সে ব্যাপারটি প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেন, এরূপ স্থলে লঙ্ হয়। যবন সাকেত অবরোধ করিয়াছিল। যবন মধ্যমিকা অবরোধ করিয়াছিল। ডঃ কীলহর্ণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, মধ্যমিকা চিতোরের নিকটবর্ত্তী একটি প্রাচীন নগরী ছিল (দ্রষ্টব্য—Indian Antiquary VII P 266) ইয়োরোপীয় ঐতিহাসিকগণ "সাকেত" শব্দের অর্থ উত্তর অযোধ্যাপ্রদেশ লিখিয়াছেন।

এই উদাহরণ দুইটি মহাভাষ্য হইতে "কাশিকা"য় অবিকল উদ্ধৃত হইয়াছে।

(৩১) আমরা অধ্যয়ন-কালে পরম পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় ৺শিবকুমার শাস্ত্রী অধ্যাপক মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি, মহাভাষ্যের গ্রন্থসংখ্যা ২৪০০০ অর্থাৎ ২৪০০০ অনুষ্টুপ্‌ছন্দের শ্লোকে যত অক্ষর মহাভাষ্যও সেই পরিমাণ অক্ষরে নিবদ্ধ। বাল্মীকি রামায়ণকে চতুর্বিংশতিসাহস্রী সংহিতা বলা হয়, ইহা অভিজ্ঞগণের সুবিদিত; তবে বাল্মীকি-রামায়ণে অনুষ্টুপ্‌ছন্দের শ্লোক ব্যতীত অন্য ছন্দের শ্লোকও অনেক আছে।

মহাভাষ্যের গ্রন্থ-সংখ্যা সম্বন্ধে এই প্রসিদ্ধি, কাশীর প্রাচীন পণ্ডিতসমাজে কিংবদন্তীরূপে চলিয়া আসিতেছিল। প্রাচীন সময়ে শাস্ত্রগ্রন্থগুলি হাতে লিখিয়া রাখা হইত; লেখকের পারিশ্রমিক লিখিত অক্ষরের সংখ্যা অনুসারে প্রদত্ত হইত; অন্ততঃ কাশীতে এই রীতি অদ্যাবধি চলিয়া আসিতেছে। মহাভাষ্যের গ্রন্থ-সংখ্যা এই কারণে স্থিরীকৃত হইয়াছিল। অতএব ইহাতে অবিশ্বাস করিবার কোন হেতু নাই। সে কালে এই সংখ্যানির্ণয় অতি সহজসাধ্য ছিল। কোন একখানি লিখিত পুস্তকের এক পৃষ্ঠায় কত পঙ্‌ক্তি আছে এবং প্রত্যেক পঙ্‌ক্তিতে কত অক্ষর আছে, তাহা জানিতে পারিলে, অক্ষরসংখ্যাকে পঙ্‌ক্তিসংখ্যার দ্বারা গুণ করিলে এক পৃষ্ঠার অক্ষর সংখ্যা জানা যায়; সেই এক পৃষ্ঠার অক্ষর সংখ্যাকে সমগ্র গ্রন্থের পৃষ্ঠার সংখ্যার দ্বারা গুণ করিলে গ্রন্থের অক্ষরসংখ্যা নির্ণীত হইতে পারে। যদিও ইহা মোটামুটি হিসাব, তাহা হইলেও আসল সংখ্যার সহিত ইহার বেশী পার্থক্য হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

পুষ্যমিত্রের ন্যায় সে সময়ের সুপ্রতিষ্ঠিত প্রধান নরপতির যজ্ঞে মহাভাষ্যকার ঋত্বিগ্‌রূপে বৃত হইয়াছিলেন। পতঞ্জলির পাণ্ডিত্য-প্রতিষ্ঠা সে সময়ে সুবিদিত হইয়াছিল, ইহা তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সাধারণ-ভাবে বিচার করিলে, ইহাই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, সে সময়ে পতঞ্জলি প্রৌঢ়বয়সে উপনীত হইয়াছিলেন। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, পতঞ্জলি খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম হইতে বিদ্যমান ছিলেন এবং ঐ শতাব্দীর মধ্য-ভাগে মহাভাষ্য রচিত হইয়াছিল।

পতঞ্জলির মহাভাষ্য-প্রণয়ন সম্বন্ধে আচার্য্য ভর্ত্তৃহরি লিখিয়াছেন,—পূর্ব্বে এই পাণিনীয় ব্যাকরণে "সংগ্রহ" নামক বহু বিস্তৃত নিবন্ধ ছিল। কালক্রমে সেই বহু বিস্তৃত গ্রন্থের পঠন-পাঠনে বৈয়াকরণসম্প্রদায়ে উদাসীনতা দেখা দিয়াছিল। সেই সময়ের বৈয়াকরণেরা বিস্তৃত গ্রন্থ অপেক্ষা সংক্ষেপের পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছিলেন। বৈয়াকরণসম্প্রদায়ের এইরূপ আলস্যের ফলে "সংগ্রহে"র পঠন-পাঠন লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। তখন নিখিলশাস্ত্রদর্শী ভগবান্ পতঞ্জলি সকল ন্যায়ের (যুক্তির) মূলতত্ত্ব সমূহের সংগ্রহরূপে মহাভাষ্য রচনা করেন। এই মহাভাষ্য-অর্থ-গাম্ভীর্য্যে অতলস্পর্শ, কিন্তু ললিত-পদ-বিন্যাসের সৌষ্ঠবে সরল বলিয়া প্রতীয়মান হয় (৩২)।

ভগবান্ পতঞ্জলি "সংগ্রহে"র অনুসরণে মহাভাষ্য রচনা করিয়াছেন এবং অনেক স্থলে তিনি "সংগ্রহে" প্রতিপাদিত বিষয়কে সংক্ষিপ্ত করিয়া লিখিয়াছেন,—ইহা বাক্যপদীয়ের পূর্ব্ববর্ণিত বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যায় (৩৩)।

সকল ন্যায়ের (যুক্তির) মূলতত্ত্ব সমূহ এই গ্রন্থে নিবদ্ধ থাকায় এবং অর্থ-গাম্ভীর্য্য ও ভাষাসৌষ্ঠবে এই গ্রন্থ অতুলনীয় হওয়ায়, ইহার উৎকর্ষ সূচিত করার উদ্দেশ্যে ইহার নামের সহিত "মহৎ" শব্দের যোগ করিয়া ইহাকে মহাভাষ্য নামে অভিহিত করা হয় (৩৪)। বাক্যপদীয়ের টীকাকার পুণ্যরাজ, মহাভাষ্যের মহত্ত্বের এই ভর্ত্তৃহরি-প্রতিপাদিত কারণ স্পষ্টরূপে বিবৃত করিয়াছেন। ইহা যে অতি সুসঙ্গত কারণ, ইহা সকলেরই সহজে হৃদয়ঙ্গম হয়। নাগেশ ভট্ট মহাভাষ্যপ্রদীপোদ্দ্যোতে এই মহাভাষ্য নামের অনুরূপ কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—মহাভাষ্য গ্রন্থ ব্যাখ্যা হইলেও অন্য ভাষ্য অপেক্ষা ইহার একটি বৈলক্ষণ্য আছে। অন্য ভাষ্যে কেবল ব্যাখ্যা আছে। এই ভাষ্যে ব্যাখ্যা আছেই; তদ্ব্যতীত মহাভাষ্যকার আবশ্যকস্থলে নিজেও শব্দ-সিদ্ধির জন্য স্বতন্ত্রভাবে বচন রচনা করিয়াছেন। মহাভাষ্যকারের এইরূপ স্বতন্ত্রভাবে প্রণীত বচনগুলিকে "ইষ্টি" বলা হয়। এই বৈলক্ষণ্যের জন্য অন্য ভাষ্য অপেক্ষা এই ভাষ্যের মহত্ত্ব আছে; এই জন্য ইহাকে মহাভাষ্য বলা হইয়া থাকে (৩৫)।

বৈয়াকরণ-সম্প্রদায়ে সূত্রকার পাণিনি এবং বার্ত্তিককার কাত্যায়ন অপেক্ষা মহাভাষ্যকার পতঞ্জলির অধিক প্রামাণ্য স্বীকৃত হইয়া থাকে (৩৬)। এখানে প্রসঙ্গক্রমে ইহা বলা অনুচিত হইবে না যে, সূত্রকার অপেক্ষা বার্ত্তিক-কারেরও প্রামাণ্য অধিক বলিয়া স্বীকার করা হয়।

এই প্রসঙ্গে আমরা মহাভাষ্য-সম্বন্ধে আর একটি কথার

(৩২) প্রায়েণ সংক্ষেপরুচীনল্পবিদ্যাপরিগ্রহান্।
প্রাপ্য বৈয়াকরণান্ বৈ সংগ্রহেঽস্তমুপাগতে॥
কৃতেঽথ পতঞ্জলিনা গুরুণা তীর্থদর্শিনা।
সর্ব্বেষাং ন্যায়বীজানাং মহাভাষ্যে নিবন্ধনে॥
অলব্ধগাধে গাম্ভীর্য্যাদুত্তান ইব সৌষ্ঠবাৎ।

—বাক্যপদীয় ২।৪৮৪-৪৮৫

(৩৩) এতেন সংগ্রহানুসারেণ ভগবতা পতঞ্জলিনা সংগ্রহ-সংক্ষেপভূতমেব প্রায়শো ভাষ্যমুপনিবদ্ধমিত্যুক্তং বেদিতব্যম্।

—পুণ্যরাজটীকা বাক্যপদীয় ২।৪৮৫

(৩৪) অতএব সর্ব্বন্যায়বীজহেতুত্বাদেব মহচ্ছব্দেন বিশেষ্য মহাভাষ্যমিত্যুচ্যতে লোকে। অথ মহত্ত্বমেব বিশেষণদ্বারেণা-স্যোপপাদয়িতুমাহ—অলব্ধগাধে……।

—পুণ্যরাজটীকা—বাক্যপদীয় ২।৪৮৫

(৩৫) ব্যাখ্যাত্বেঽপ্যন্যেষ্ট্যাদিকথনেনাব্যাখ্যাতৃত্বাদিতরভাষ্য-বৈলক্ষণ্যম্ মহত্ত্বম্।

—মহাভাষ্যপ্রদীপোদ্দ্যোত—কৈয়ট-কৃত টীকার উপক্রমস্থিত ৫ম শ্লোকের ব্যাখ্যা।

(৩৬) যথোত্তরং হি মুনিত্রয়স্য প্রামাণ্যম্।-কৈয়ট ১।১।২৯
উত্তরোত্তরস্য বহুলক্ষ্যদর্শিত্বাৎ। স্পষ্টং চেদং ধিক্কিৃত্যো (৩।১।৮০) রিতি সূত্রে ভাষ্যে।—মহাভাষ্যপ্রদীপোদ্দ্যোত। এতচ্চ ধিক্কিৃত্যোর্ চেতি সূত্রে ভাষ্যে ধ্বনিতম্।—লঘুশব্দেন্দুশেখর —সর্ব্বনামপ্রকরণ। পূর্ব্ববর্ত্তী মুনি অপেক্ষা পরবর্ত্তী মুনির অধিক প্রয়োগের জ্ঞান ছিল, ইহা নাগেশ ভট্ট স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন। পরবর্ত্তী কালে ভাষার যে অধিক পরিপুষ্টি হইয়াছে, ইহা যেন তাহারই প্রতিধ্বনি।

উল্লেখ করিতেছি। প্রাচীন সময়ে মহাভাষ্য "চূর্ণি" বা "চূর্ণিন্" এইরূপ আর একটি নামে প্রসিদ্ধ ছিল। ভর্তৃহরির মহাভাষ্য-টীকার যে খণ্ডিত অংশ বার্লিন লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে, তাহাতে মহাভাষ্যকারকে "চূর্ণিকার" বলিয়া তিনবার উল্লেখ করা হইয়াছে (দ্রষ্টব্য—ডাঃ কীলহর্ণ সম্পাদিত মহাভাষ্য-দ্বিতীয়খণ্ড-ভূমিকা—২২ পৃষ্ঠা পাদটীকা)। কলিকাতা হইতে নব প্রকাশিত "যুক্তিদীপিকা" নামক সাংখ্যকারিকার প্রাচীন ব্যাখ্যাতেও মহাভাষ্যকারকে "চূর্ণিকার" শব্দে অভিহিত করিয়া স্থলবিশেষে মহাভাষ্য হইতে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

গৌতম-সূত্রের বাৎস্যায়ন-প্রণীত ভাষ্যের উদ্দ্যোতকর-রচিত ব্যাখ্যাকে বার্ত্তিক বলা হয়; এইরূপ পূর্ব্ব-মীমাংসার শাবরভাষ্যের ভট্টকুমারিল-রচিত ব্যাখ্যার নাম বার্ত্তিক। বৃহদারণ্যকের শাঙ্কর-ভাষ্যের সুরেশ্বরপ্রণীত ব্যাখ্যার নামও বার্ত্তিক। এইরূপ অন্যান্য স্থলেও দেখিতে পাওয়া যায়, ভাষ্যের ব্যাখ্যার জন্যই "বার্ত্তিক" গ্রন্থ রচিত হইয়াছে (৩৭)

(৩৭) স্বল্পাক্ষরমসন্দিগ্ধং সারবদ্ বিশ্বতোমুখম্।
অস্তোভমনবদ্যঞ্চ সূত্রং সূত্রবিদো বিদুঃ।
—শিশুপালবধের দ্বিতীয় সর্গের

"অনুৎসূত্র-পদন্যাসা"—ইত্যাদি পদ্যের ব্যাখ্যায় মল্লিনাথের টীকায় উদ্ধৃত পরাশরোপপুরাণের বাক্য—১৮ অঃ।
লঘূনি সূচিতার্থানি স্বল্পাক্ষরপদানি চ।
সর্ব্বতঃ সারভূতানি সূত্রাণ্যাহুর্ম্মনীষিণঃ।
ভামতী ১।১।১ সূত্রের অবতরণিকার ব্যাখ্যায় উদ্ধৃত।

বার্ত্তিকের লক্ষণ—
উক্তানুক্তদুরুক্তাদিচিন্তা যত্র প্রবর্ত্ততে।
তং গ্রন্থং বার্ত্তিকং প্রাহুর্ব্বার্ত্তিকজ্ঞা মনীষিণঃ।

বৃহদারণ্যক—সম্বন্ধবার্ত্তিক ২য় শ্লোকের আনন্দগিরিব্যাখ্যায় উদ্ধৃত পরাশরোপপুরাণের বাক্য—১৮ অঃ।

ভাষ্যের লক্ষণ—
সূত্রস্থং পদমাদায় বাক্যৈঃ সূত্রানুসারিভিঃ।
স্বপদানি চ বর্ণ্যন্তে ভাষ্যং ভাষ্যবিদো বিদুঃ।
—শিশুপালবধের টীকায় পূর্ব্বোক্ত স্থলে মল্লিনাথ-কর্ত্তৃক উদ্ধৃত পরাশরোপপুরাণের বাক্য—১৮ অঃ।

কিন্তু মহাভাষ্যে কাত্যায়নের বার্ত্তিকেরই প্রধানভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে এবং সেই প্রসঙ্গে আনুষঙ্গিকভাবে সূত্রও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এক্ষেত্রে দেখা যায়, ভাষ্যের ব্যাখ্যা বার্ত্তিক নহে, কিন্তু বার্ত্তিকের ব্যাখ্যাই ভাষ্য। কদাচিৎ কোন স্থলে পতঞ্জলি পাণিনি-সূত্রের উপরও স্বতন্ত্রভাবে ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। মহাভাষ্যে সমগ্র পাণিনি-সূত্রের ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয়া যায় না। যে সূত্রে বিশেষ কোন বিচার্য্য বিষয় ভাষ্যকারের লক্ষ্য হয় নাই, তিনি সে সূত্রের উল্লেখই করেন নাই (৩৮)।

পাণিনির সমগ্র অষ্টাধ্যায়ীতে আটটি অধ্যায় আছে এবং প্রত্যেক অধ্যায়ে চারিটি পাদ আছে। মহাভাষ্যে এই পাদগুলির ব্যাখ্যাকে বিভিন্ন আহ্নিকে বিভক্ত করা হইয়াছে। এই আহ্নিকগুলির মধ্যে প্রথম আহ্নিকের নাম "পস্পশা।" এই "পস্পশা" শব্দটি স্পর্শনার্থক যঙন্ত স্পশ্ ধাতুর কর্ত্তৃবাচ্যে অচ্ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন হইয়াছে; এই শব্দটি স্বভাবতঃ স্ত্রীলিঙ্গ। ইহার প্রকৃতি-প্রত্যয়-লভ্য অর্থ,—যে অধিকভাবে স্পর্শ করে। এই পস্পশাহ্নিককে ব্যাকরণশাস্ত্রের ভূমিকারূপে গণ্য করা হয়। ইহাতে কোন সূত্রের ব্যাখ্যা নাই। পাণিনিব্যাকরণের সহিত সম্বন্ধ কতকগুলি বিষয়ের আলোচনা এই আহ্নিকে আছে। যে বিষয়গুলি এই আহ্নিকে আলোচিত হইয়াছে, সেগুলি অনেক স্থলে সাধারণভাবে ভাষা-তত্ত্বের অনুশীলনের পক্ষেও উপযোগী হইতে পারে। প্রাচীন ভারতের চিন্তা ভাষার দিক্ দিয়া কত দূর অগ্রসর হইয়াছিল, তাহার পরিচয় সমগ্র মহাভাষ্যে আছে। পস্পশাহ্নিকের মূল্যও এই দৃষ্টিতে অল্প নহে। আমরা পরবর্ত্তী প্রবন্ধে পস্পশাহ্নিকের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করিবার প্রয়াস পাইব।

শ্রীহারাণচন্দ্র শাস্ত্রী।

(৩৮) কাশিকা-বৃত্তিতে সমগ্র পাণিনি-সূত্রেরই ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়।

ঝড়ো হাওয়া

১

"দাদু!"

"এ কি! বাসন্তী, তুই কার সঙ্গে এলি? মা এসেছে না কি?"

"না, দাদু, আমি একা এসেছি।"

বাসন্তী তাহার মাতামহের পদধূলি লইয়া তখন সোজা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

অম্বিকাচরণ দৌহিত্রীর ম্লান মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া বলিলেন, "শ্যামবাজার থেকে এই ভর সন্ধ্যেবেলা একা টালীগঞ্জে এলি! একটু ভয় হ'ল না?"

মৃদু হাসিয়া বাসন্তী বলিল, "কিসের ভয়, দাদু? পথে ত বাঘ-ভালুক নেই যে খেয়ে ফেল্‌বে!"

অম্বিকাচরণ কথার স্বরে একটু রসিকতার খাদ মিশাইয়া বলিলেন, "তার চেয়েও সাংঘাতিক জানোয়ার এই কলকাতা সহরে ঘুরে বেড়ায়। বিশেষতঃ তোদের যা বয়স, তাতে সেই ভয়টাই বেশী। যাক্, তোর মা, বাবা যে তোকে একা ছেড়ে দিলে?"

একবার চারিদিকে চাহিয়া তরুণী বাসন্তী বলিল, "ছেড়ে কেউ দেয় নি। আমি আর সেখানে থাক্‌ব না। তাই তোমার কাছে চ'লে এলাম্। তুমি আমায় আশ্রয় দিতে পার্‌বে না?"

এমন সময় দরোয়ানের সহিত বাড়ীর ভৃত্য একটা ট্রাঙ্ক লইয়া বাহিরের ঘরে প্রবেশ করিল।

অম্বিকাচরণ ভৃত্যকে বাক্সটা ভিতরে লইয়া যাইতে আদেশ দিয়া দরোয়ানকে বলিলেন, "হরি বাবুকে ট্যাক্সি-ভাড়াটা দিয়ে দিতে বলে দেও।"

বাসন্তী তাহার ক্ষুদ্র মুদ্রাধার খুলিয়া টাকা দিতে যাইতেছিল। অম্বিকাচরণ তাহাকে ধমক দিয়া নিবৃত্ত করিলেন।

কিন্তু তাঁহার মুখে চিন্তার ছায়া পড়িল। তাঁহার জামাতার উদ্ধত, ক্রোধপ্রবণ স্বভাব এবং প্রচণ্ড রক্ষণশীলতার কথা তাঁহার অগোচর ছিল না। বর্ত্তমান যুগের ভাবধারার সহিত মিলিয়া মিশিয়া চলিবার মত শিক্ষা-দীক্ষার অভাব যে তাহার আছে, তাহাও তিনি ভাল করিয়াই জানিতেন। কিন্তু সন্তানদিগের প্রতি বাৎসল্য রসের অভাব যে মাত্রা ছাড়াইয়া যাইতে পারে, ইহা তিনি পূর্ব্বে অনুমান করিতে পারেন নাই। সে কি কন্যার প্রতি অশোভন রূঢ় ব্যবহার করিয়াছে? অথবা বাসন্তী তাহার পিতার মত উদ্ধত স্বভাবের অধিকারিণী হইয়াছে বলিয়া যুগধর্ম্মের প্রভাবে এমন একটা কাষ করিয়া বসিল?

মুহূর্ত্তের মধ্যে এই ভাবের চিন্তা অম্বিকাচরণের মস্তিষ্কে উদিত হইল। তিনি সংক্ষেপে বলিলেন, "তোর দিদিমণির সঙ্গে দেখা করবি চল্।"

বাসন্তী তাঁহার অনুসরণ করিল।

চিন্তিত ভাবে অম্বিকাবাবু বলিলেন, "তোর মা, বাবাকে বলে এসেছিস্ যে, এখানে আস্‌ছিস্?"

"বাবাকে কিছু বলিনি। মাকে বলে এসেছি।"

অদূরে পত্নীকে আসিতে দেখিয়া অম্বিকাচরণ হাঁকিয়া বলিলেন, "শুনছ! দেখ কে এসেছে।"

গিরিবালা দৌহিত্রীকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ওমা, তুই হঠাৎ এ সময়ে?"

বাসন্তী উত্তর দিবার পূর্ব্বেই অম্বিকাচরণ বলিলেন, "আজ-কালকার মেয়ে, লেখাপড়া শিখ্‌ছে কি না। তাই মা-বাবার সঙ্গে বোধ হয় ঝগড়া ক'রে চলে এসেছে।"

বাসন্তী বলিল, "আজকালকার মেয়েরা লেখাপড়া শেখে বলেই বুঝি ঝগড়া করে, দাদু? আর এ যুগের মা-বাপ কিছু করে না?"

তাহার কথার অন্তরালে অভিমান উচ্ছ্বসিত হইয়া

উঠিয়াছে মনে করিয়া অম্বিকাচরণ বলিলেন, "ব্যাপারটা কি খুলেই বল্ না, ভাই!"

গৃহিণী বলিলেন, "তোমরা ও-ঘরে চল। হাটের মাঝে ও-সব কথার আলোচনা বন্ধ কর। আয়, বাসি, এ-দিকে আয়।"

নিজের ঘরে আসিয়া গিরিবালা বলিলেন, "কি হয়েছে রে?"

বাসন্তী যাহা বলিল, তাহাতে প্রকাশ পাইল, সে তাহার সতীর্থ এবং সমবয়স্কাদিগের সঙ্গে কয়েকটি সমাজ-উন্নতিকর প্রতিষ্ঠানে যখন তখন যোগ দেয় বলিয়া তাহার পিতা তাহাকে শাসন করিয়াছেন। সম্প্রতি ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে। দুর্ভাগ্যক্রমে বাসন্তী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই। এই সকল ব্যাপারে ক্রুদ্ধ পিতা তাহাকে বাড়ীর বাহিরে পা বাড়াইতে নিষেধ করিয়াছেন। সে কাল বন্ধুদিগের সঙ্গে বায়স্কোপ দেখিতে গিয়াছিল, অবশ্য পিতার অনুমতি না লইয়া। তাই তিনি বলিয়া দিয়াছেন, সে বাড়ীতে তাহার মত অবাধ্য মেয়ের স্থান হইবে না। শুধু তাহাই নহে, চপেটাঘাতে তাহার কপোল আরক্তিম হইয়াছিল। তাই সে এখানে চলিয়া আসিয়াছে। আগামী ডিসেম্বর মাসে অতিরিক্ত পরীক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। সে প্রাইভেটে সেই ম্যাট্রিক পরীক্ষা না দিয়া ছাড়িবে না।

অম্বিকাবাবু ও গিরিবালা মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

গিরিবালা নাতিনীকে কাছে বসাইয়া বলিলেন, "কাযটা তোমার ভাল হয় নি, বাসি। মা-বাপের কথা শোনা দরকার। তারা যে কায পছন্দ করে না, তা কি করা উচিত?"

"কিন্তু, দিদিমণি, যুগের হাওয়া বদলে গেছে, সেটাও ত মানতে হবে। ঘোম্‌টা টেনে ঘরের মধ্যে মেয়েরা বসে থাকবে, কোথাও যেতে পাবে না, তোমার মেয়ে-জামাইয়ের এ যুক্তি এ যুগে অচল। আমি তেমন বন্ধন মেনে নিতে পারব না।"

গিরিবালা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দৌহিত্রীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তা বলে হুটহুট করে পুরুষদের সঙ্গে মেশাও ত সব সময় নিরাপদ নয়, ভাই!"

বাসন্তী হাসিয়া বলিল, "পুরুষদের সাম্‌নে বেরুলেই কি মেয়েরা খারাপ হয়ে যাবে, তুমি মেয়ে-মানুষ হয়ে এমন কথা ভাবতে পার, দিদিমণি?"

তার পর গম্ভীরভাবে সে বলিল, "আমার আঠারো বছর বয়স হয়েছে। এখন কি ছোট ছেলে-মেয়ের মত আমাকে তাড়না করা উচিত?"

অম্বিকাবাবু এতক্ষণ নীরব ছিলেন। এবার বলিয়া উঠিলেন, "গতিক ভাল নয়। স্বাধীন জেনানার যুগ। সব দিক্ মানিয়ে চলাই উচিত। কিন্তু তবু, ভাই, তুমি বাড়াবাড়ি করেছ, এটা বল্‌তেই হবে।"

বাসন্তী তিক্ত কণ্ঠে বলিল, "তোমরা ত তাই বলবেই। পুরুষ মানুষ কি না! মেয়েদের দিক্‌টা একবারও ভেবে দেখ্‌তে তোমাদের রুচি নেই।"

গিরিবালা বলিলেন, "ও-সব আলোচনা এখন থাক্। তুই ত এখনো গা ধুস্‌নি দেখ্‌ছি। যা, বাথরুমে গিয়ে গা, হাত, পা ধুয়ে আয়।"

২

অম্বিকাচরণের ললাটে চিন্তার রেখা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল।

গৃহসংলগ্ন ফুলের বাগানে তিনি পাদচারণা করিতে লাগিলেন। অপরাহ্ণের আকাশে মেঘ জমিয়া উঠিয়াছিল। বায়ু স্তব্ধ—গাছপালার অঙ্গে বিন্দুমাত্র আন্দোলন নাই।

কাল তিনি কন্যার নিকট হইতে যে পত্র পাইয়াছিলেন, তাহাতে সে লিখিয়াছিল, বাসন্তীকে যেন তিনি অবিলম্বে শ্যামবাজারে পাঠাইয়া দেন। জামাতা এত রাগিয়া গিয়াছে যে, বাসন্তী যদি ফিরিয়া না যায়, তাহা হইলে তাঁহার জামাতা ভবিষ্যতে আর তাহাকে গৃহে স্থান দিবে না। সে না কি তাহার কন্যার কোন প্রকার দায়িত্ব অতঃপর গ্রহণ করিবে না। মায়ের প্রাণ, কন্যার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া ব্যাকুল হইয়াছে। সে জন্য পত্রপাঠ বাসন্তীকে পাঠাইয়া দিবার জন্য সংক্ষেপে লিখিয়া দিয়াছিল।

কিন্তু অম্বিকাচরণ কি করিবেন? বাসন্তীকে তিনি পাঠাইতে চাহিয়াছিলেন, অনেক উপদেশ ও মিষ্ট কথা বলিয়াছিলেন। তথাপি সে পিতার কাছে কোন মতেই যাইবে না। পিতা হইয়া যিনি যুবতী, প্রাপ্তবয়স্কা কন্যার

গণ্ডে চপেটাঘাত করিতে পারেন, দুর্ব্বাক্য প্রয়োগে বিচার বিবেচনা ও ভদ্রতা রক্ষার প্রয়োজন অনুভব করেন না, তাঁহার কাছে সে কখনই সাহায্যপ্রার্থিনী হইতে পারে না।

যদি দাদু ও দিদিমণি তাহাকে আশ্রয় না দেন, সে অন্য কোথাও চলিয়া যাইবে। বিশাল পৃথিবীর এক কোণে কি তাহার স্থান হইবে না? যেমন করিয়া হউক, সে নিজের জীবিকার্জ্জনের পথ করিয়া লইতে পারিবে।

এমন কবুল জবাবের পর তিনি আর কি করিতে পারেন? বলপূর্ব্বক তাহাকে তাহার পিতার কাছে পাঠাইবার যুক্তি তিনি স্বীকার করেন না। সেরূপ শিক্ষা তিনি পান নাই। মনুষ্যত্বের অধিকার সম্বন্ধে তিনি সর্ব্বদা সচেতন। নারীর উপর কোন প্রকার বল-প্রয়োগেরই তিনি পক্ষপাতী নহেন। মাতৃজাতির প্রতি প্রচণ্ড শ্রদ্ধা তাঁহার সমগ্র জীবনের কার্য্যধারায় সুপরিস্ফুট। তিনি নিজের সন্তানকে কোন দিন সামান্য রূঢ় কথা পর্য্যন্ত বলেন নাই, সহধর্ম্মিণীকে কখনও বড়-গলা করিয়া কোন আদেশ দিতে তিনি কখনও কল্পনা পর্য্যন্ত করেন নাই।

বাসন্তীকে যদি তিনি বলিতেন, এখানে তিনি তাহাকে আশ্রয় দিতে পারিবেন না, তাহা হইলে পিতার ন্যায় দ্বিতীয় রিপুর বশীভূত কন্যা হয় ত তাঁহার আশ্রয় ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইত। তিনি কি তাহা পারেন? নানাপ্রকার অবাঞ্ছনীয় বিপদপূর্ণ বাহিরের প্রলোভনময় জগতে তরুণী ভদ্রঘরের কন্যার কি অবস্থা ঘটিতে পারে, তাহা কি তিনি জানেন না? তখন তাঁহারই নিষ্কলঙ্ক বংশের নামে যে কুৎসার পঙ্কপ্রলেপ পড়িবে, তাহা কি তিনি সহ্য করিতে পারিবেন?

কাযেই তিনি কন্যাকে লিখিয়া দিয়াছেন, ইচ্ছা হয় তাহারা স্বয়ং আসিয়া বাসন্তীকে বুঝাইয়া পড়াইয়া অনায়াসে লইয়া যাইতে পারে, কিন্তু তিনি তাহাকে বলপূর্ব্বক পাঠাইয়া দিতে অসমর্থ।

হয় ত কন্যা-জামাতা এজন্য তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হইবে; কিন্তু তিনি নিরুপায়।

আকাশের বুক চিরিয়া বিদ্যুতের দীপ্তি ঝলসিয়া গেল। গুরুগর্জ্জনে চারিদিক্ কাঁপিয়া উঠিল।

বৃষ্টি আসন্ন। অম্বিকাবাবু তাড়াতাড়ি বাড়ীর দিকে চলিলেন। এমন সময় ডাক পিয়ন আসিয়া তাঁহার হাতে একখানি চিঠি দিয়া গেল।

খামে-লেখা চিঠির উপরের শিরোনামার অক্ষর দেখিয়া তিনি বুঝিলেন, কন্যার নিকট হইতে উহা আসিয়াছে।

তাঁহার বলিষ্ঠ হৃদয় একবার যেন শিহরিয়া উঠিল।

কোথাও না দাঁড়াইয়া সোজা তিনি অন্দরে প্রবেশ করিলেন। নিজের শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, গৃহিণী নাতিনীর সহিত কি আলোচনা করিতেছেন।

"কার চিঠি গো?"

"আর কার!—সুরমা লিখেছে দেখ্‌ছি।"

তিনি খাম ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। পত্রে লেখা ছিল—

"বাবা,

বাসন্তীকে আমরা গিয়া আনিতে পারিব না। তাহার উপর এত চটিয়া গিয়াছেন যে, মেয়ের নাম মুখে আনিতে চাহেন না। বলিয়াছেন, এখানে তাহার স্থান হইবে না। মেয়েদের হুটমুট বাহিরে যাওয়া মোটেই পছন্দ করেন না। ইঁহাদের বংশে এমন ব্যাপার কখনও হয় নাই। বয়সের মেয়ে যখন তখন মিটিং করিতে যাইবে, তাহা এ বাড়ীতে থাকিয়া চলিবে না। এমন কথাও বলিয়াছেন, 'তোমার বাপের বাড়ী এত দিন মেয়েকে রাখিয়া এই রকম শিক্ষা হইয়াছে।' আমরা দেশে ছিলাম, তাই মেয়ের লেখাপড়ার জন্য আপনার কাছে রাখিয়াছিলাম। ওখানকার শিক্ষায় এই রকম ধিঙ্গী হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস। এখন যাহা ব্যবস্থা হয় করুন। আমার মরণ হইলে ভাল ছিল। ইতি

প্রণতা সুরমা।"

গিরিবালা স্বামীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কন্যার চিঠি পড়িলেন। তাঁহার আনন আরক্ত হইল। তীব্র কণ্ঠে তিনি বলিলেন, "এখন সব দোষ আমাদের ঘাড়ে চাপাচ্ছে! মেয়ের লেখা-পড়া হবে না বলে, তখন কত যুক্তি। আমরা কি মেয়েকে বাইরে গিয়ে দলে মিশ্‌তে শিক্ষা দিয়েছি না কি? মা, বাপ যদি স্নেহ-ভালবাসা দিয়ে সন্তানকে নিজের মত করে গড়ে তুল্‌তে না পারে, সে দোষ কার?"

"মা কি লিখেছে দেখি" বলিয়া বাসন্তী তাহার দাদুর নিকট হইতে পত্রখানা লইয়া পড়িতে লাগিল।

অম্বিকাচরণ বলিলেন, "চল্, দিদি তোকে রেখে আসি। তোর বাবা খুব রেগে গেছে। পরিণামটা ভাবতে হবে ত?"

"কিসের পরিণাম, দাদু? বিয়ে? আমি বিয়ে করব না। নিজের পায়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করব। সেখানে আমায় যেতে বলো না। আমি কোন মতেই সে আবহাওয়ার মধ্যে থাকতে পারব না।"

মাতামহী বলিলেন, "এ তোর অন্যায় কথা, বাসি। বাবা যদি ছেলে-মেয়েকে একটু শাসনই করে, অমনি রণসাজে সেজে দাঁড়াতে হবে বুঝি? লেখা-পড়া শিখে মানুষ ভদ্র হয়, নম্র হয়। এ কি কুশিক্ষা তোদের হচ্ছে?"

বাসন্তীর মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল। সে বলিল, "তুমিও ঐ কথা বল্‌বে, দিদিমণি? তোমরা তোমাদের সন্তানদের সঙ্গে ঐ রকম ব্যাভার করতে না কি? মেয়ে-ছেলের যখন বয়স হয়, তখন তারাও মানুষ, এই রকম ভেবে তাদের সঙ্গে মানুষের মত ব্যাভার করতে হয়। জীবনে কোন দিন তা পেয়েছি? তোমরা ত সবই জান।"

পাঁচ বৎসর বয়স হইতে বাসন্তী তাঁহাদিগের কাছেই মানুষ হইয়াছিল। মেয়ে-জামাই দুই বৎসর হইল সন্তানদিগের শিক্ষার জন্য কলিকাতায় বাড়ী করার পর, বাসন্তী সেখানে গিয়াছে।

অম্বিকাচরণ ও গিরিবালার মনে যুগপৎ সে সকল কথা উদিত হইল। গিরিবালা বলিলেন, "তা হোক্‌, লক্ষ্মী ভাই, মার কাছে চলে যা। তোর মার অবস্থাটা একবার ভেবে দেখ্‌। তা ছাড়া আমাদের উপর ওদের রাগ আরো বেড়ে যাবে।"

দৃঢ়স্বরে বাসন্তী বলিল, "আমি সব বুঝি, দিদিমণি। বাবা আমায় তাড়িয়ে দিয়েছেন। কই, তিনি ত আমায় নিয়ে যাবার কথা বলেন নি। বরং মা লিখেছে, সেখানে আমার স্থান হবে না। বেশ ত আমি যাব না। মেয়ে-জামাই তোমাদের ওপর রাগ করবে। তোমাদের অসুবিধা বুঝতে পারছি। আমার ব্যবস্থা আমি নিজেই করে নেব, দেখো।"

বাসন্তী ধীরে ধীরে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

স্বামী ও স্ত্রী নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

বেলা বারটার পর ক্লান্তদেহে অম্বিকাবাবু গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। কলিকাতা সহরের নানাস্থানে তাঁহার অনেকগুলি বাড়ী ভাড়া খাটিত। মাঝে মাঝে তিনি স্বয়ং ভাড়াটিয়াদিগের সুখ-সুবিধার তত্ত্ব লইতেন। বাড়ীর সরকার বা দরোয়ানের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকা তাঁহার স্বভাব ছিল না।

গৃহে ফিরিয়াই তিনি ডাকিলেন, "বাসন্তি!"

তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া গিরিবালা কাছে আসিয়া বলিলেন, "বাসন্তী বাড়ী নেই।"

"কোথায় গেল সে?"

"তুমি বাইরে যাবার পর সে বেরিয়েছে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কোথায় যাচ্ছিস্‌?' বল্লে, সে না কি ছেলে মেয়ে পড়ান ঠিক করেছে। সেখানে যাচ্ছে। কত বারণ করলাম, শুন্‌লে না। এ মেয়ে নিয়ে বড় বিপদ হ'ল দেখ্‌ছি।"

অম্বিকাচরণের মুখমণ্ডলে অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যের ছায়া ঘনাইয়া উঠিল। না, সত্যই বাসন্তী বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছে। তাহার লেখা-পড়ার সমস্ত ভারই ত তিনি বহন করিবেন, তবে পরের ছেলে-মেয়ে পড়াইয়া টাকা উপার্জ্জনের কি প্রয়োজন তাহার হইল? পথে-ঘাটে এমন ভাবে বাহির হওয়ার সার্থকতাই বা কি? স্বাধীনতার নামে ইহাকে কেহ যদি উচ্ছৃঙ্খলতা বলে, তাহা হইলে তাহাকে দোষ দিবার যুক্তি কোথায়?

অম্বিকাচরণ এইরূপ চিন্তার ভারে পীড়িত, এমন সময় গিরিবালা বলিয়া উঠিলেন, "তোমার নাতনী এবার এলেন।"

ঠিক সেই সময় বাসন্তী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

গম্ভীর স্বরে অম্বিকাচরণ বলিলেন, "এত বেলা পর্য্যন্ত কোথায় যাওয়া হয়েছিল?"

দাদা মহাশয়ের প্রশান্ত আননে চির-প্রসন্ন হাস্যের এমন অভাব বাসন্তী কোন দিনই দেখে নাই। কিন্তু দ্বিধাশূন্য স্বরে সে বলিল, "চাকরী ঠিক করে এলাম, দাদু!"

"চাকরী? কোথায়? আর প্রয়োজনই বা কি?"

"দাদু, আজ তুমি ভয়ঙ্কর গম্ভীর হয়েছ। এক জায়গায় পড়ান ঠিক করে এলাম। দুটি ছোট মেয়েকে পড়াতে হবে, গান শেখান এবং সেলাইয়ের কাযও—"

বাধা দিয়া অম্বিকাচরণ বলিলেন, "তোমার ত এমন দৈন্য দশা হয়নি যে, এই ভাবে ছেলে-মেয়েকে পড়াতে

হবে। এতে তোমার বাবার মাথা হেঁট হবে, আমারও মাথা উঁচু থাকবে না, তা জান?"

মৃদু হাসিয়া বাসন্তী বলিল, "এতে তোমাদের মাথা হেঁট হবে কেন বুঝলাম না। স্বাধীন ভাবে এবং ভাল কাযে টাকা রোজগার করলে দোষ হয়, এমন শিক্ষা ত তোমরা আমাদের কখনো দেও নি!"

অম্বিকাচরণের ওষ্ঠপ্রান্তে কি বাসন্তী মৃদু হাস্যের দীপ্তি লক্ষ্য করিয়াছিল?

অম্বিকাবাবু বলিলেন, "না, তা আমি কোন দিন মনে করি না। কিন্তু এক জন অভাবগ্রস্ত পুরুষ বা মেয়ের জন্য ছেলে-পড়ানর কায তুমি কেড়ে নিয়েছ। তোমার তাতে কোন অধিকার নেই।"

বাসন্তী এবার দ্বিধা-জড়িত কণ্ঠে উত্তর করিল, "কিন্তু আমার—আমারও ত টাকার দরকার।"

"না, তোমার দাদু বেঁচে থাকতে সে দরকার তোমার কোন দিন হ'ত না। তুমি অন্যায় করেছ। আর এক জন সত্যিকারের অভাবগ্রস্তের মুখের গ্রাস তুমি কেড়ে নিয়েছ। কে তোমাকে এ কায জোগাড় করে দিলে?"

মৃদুস্বরে বাসন্তী বলিল, "আমার এক বন্ধু।"

"বন্ধু? কে সে? কোথায় তার সঙ্গে আলাপ হ'ল?"

মাতামহের আননে অসন্তোষের ভ্রূকুটি লক্ষ্য করিয়া বাসন্তী হাসিয়া উঠিল। সে বলিল, "দাদু, তুমি বুঝি ভেবেছ পুরুষ বন্ধু? একটি মেয়ে আমার বন্ধু, সেই জোগাড় করে দিয়েছে। আর পুরুষ যদি বন্ধু হয়, তাতেই বা কি দোষ হ'তে পারে বুঝলাম না!"

গিরিবালা এতক্ষণ নীরবে উভয়ের আলোচনা শুনিতেছিলেন। এবার তিনি গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "পুরুষ মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতানো আজকালকার রেওয়াজ হয়েছে শুনছি। কিন্তু ভাই, তার পরিণামটা যে শুভ হয় না, তার দৃষ্টান্ত খবরের কাগজ খুলে পড়লেই প্রায় রোজই দেখা যাবে।"

বাসন্তীর অন্তরে তর্ক-প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিল। সে বলিল, "তোমরা সেকেলে; দিদিমণি। তাই তোমরা সবই খারাপ দেখ। এ যুগের মেয়েরা তোমাদের যুগের মেয়েদের মত কূপমণ্ডুক হয়ে থাকতে চায় না। আমাদের দেশ ছাড়া কোথাও এমন নেই। সাগরপারের কোন দেশে মেয়েরা ঘোমটা টেনে বসে থাকে না, তা জান?"

গিরিবালা হাসিয়া বলিলেন, "জানি রে, বাসি, জানি। তোদের মত পাশের পড়া পড়িনি, কিন্তু ও-সব দেশের কথা পড়িনি, এখন মূর্খ ভাবলি কি করে?"

তার পর বাসন্তীর চিবুকে হাত রাখিয়া তেমনই ভাবে হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আমরা সেকালের ছবি, মাঝের যুগের ছবিও ভাল করে দেখেছি। আবার একালের ব্যাপারও দেখছি। সুতরাং তিন কালের খবর বলতে পারি। তোর দাদুরও বন্ধু-বান্ধব অনেক ছিলেন, আজও আছেন। আমাদের সময়ে অর্থাৎ তোদের মত যখন বয়সকাল ছিল, তখন ওঁর বন্ধুদের সঙ্গে বসে গল্পও করেছি, আবার তাঁদের সঙ্গে ওঁকে নিয়ে থিয়েটারেও গেছি। কিন্তু বন্ধুত্ব কারও সঙ্গে হয় নি। বড় ভাই, ছোট ভাই, এই রকম সম্পর্কই ছিল।"

অম্বিকাচরণ বলিলেন, "সে ওরা বুঝবে না। ওরা পুরুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে—প্রগতির পথে চলবে। কেমন না, দিদি?"

"ঠিকই ত। নিজেদের সামলে নিয়ে চলতে পারলে, পুরুষের সঙ্গে বন্ধুত্বে দোষ কি?"

গিরিবালা হাসিয়া উঠিলেন। মৃদু স্বরে নাতিনীকে বলিলেন, পুরুষরা বন্ধুত্ব পাতাতে চায় কাদের সঙ্গে জানিস্? যাদের রূপ, যৌবন আছে। বুড়ীর সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চায় কি? পুরুষরা মানুষকে চায় না—চায় যে সব মেয়ের দেহে রূপ, যৌবন আছে। বন্ধুত্বের মর্ম্মটুকু ঐখানে।"

অম্বিকাবাবু বলিলেন, "মেয়েদের বেলাও তাই, সেটাও বল। তারাও চায় কাঁচা বয়সের ছেলেদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে। আমাদের মত বুড়ো বন্ধু তাদের আছে? কই, দিদি, তুই ত আমার সঙ্গে আজও বন্ধুত্ব পাতাতে পারিস্নি! দোষ দিচ্ছি না। ওটা যৌবনের খেয়াল।"

বাসন্তী আরক্ত বদনে বলিয়া উঠিল, "যাও! তোমরা বড় দুষ্টু!"

৪

কিন্তু বাসন্তী তাহার পড়ান ছাড়িল না।

শুধু তাহাই নহে। ঘন ঘন বাহিরে যাওয়া-আসা তাহার বাড়িয়াই গেল। মেয়ে পড়াইতে যাওয়া ত নিত্যকর্ম্ম,

তাহা ছাড়া এখানে-সেখানে প্রায় প্রত্যহই সভা-সমিতিতে যোগ দিবার জন্য অসময়েও সে বাহিরে যাইতে লাগিল।

পাড়ার প্রত্যক্ষদর্শীরা সমালোচনা করিতে ছাড়িবে কেন? অপ্রিয় মন্তব্যের গুঞ্জনধ্বনিও অম্বিকাচরণের কাণে আসিতে লাগিল। প্রকাশ্যে কেহই তাঁহার নিকট এ বিষয়ে আলোচনা করিতে সাহস করে নাই সত্য, কিন্তু তৃতীয় পক্ষের মারফতে রসাল আলোচনার আভাস তিনি পাইতে লাগিলেন।

বাসন্তীর যে বান্ধবী তাহার চাকরী করিয়া দিয়াছিল, সে মেয়েটিও প্রায় বাসন্তীর কাছে আসিত।

শ্যামবাজার হইতে কন্যা মাঝে মাঝে বাসন্তীর বাহিরে যাওয়ার সংবাদ পাইয়া, পিতা ও মাতাকে পত্র লিখিত। এমন যুক্তিও আসিত যে, তাঁহারা যদি বাসন্তীকে তাঁহাদিগের আশ্রয় ত্যাগ করিবার জন্য বলেন, তখন বাধ্য হইয়া সে তাহার পিতার আশ্রয় গ্রহণ করিবে। কারণ, যতই স্বাধীনচেতা হউক না কেন, কোন মেয়েই নিরাপদ আশ্রয় ত্যাগ করিয়া, বিঘ্নবহুল, অনিশ্চিত অবাঞ্ছনীয় আশ্রয়ের মধ্যে যাইতে চাহিবে না।

কিন্তু অম্বিকাচরণ ও গিরিবালা সে যুক্তি কল্যাণদায়ক হইবে বলিয়া মনে করিলেন না। বিভীষিকাপূর্ণ আবর্ত্তের মধ্যে প্রিয়জনকে ঠেলিয়া দেওয়া বিচারসহ নহে। বাঞ্ছনীয় ত হইতেই পারে না।

বেলা ১২টা বাজিয়া গিয়াছে। তখনও বাসন্তীর দেখা নাই। গিরিবালা স্বামীর কাছে আসিয়া বলিলেন, "কি করা যায় বল ত? এমন দস্যি, খেয়ালী মেয়েকে নিয়ে ত আর পারা যায় না।"

অম্বিকাচরণ ধূমপান করিতে করিতে ঠিক এই কথাই ভাবিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহার মনে এ কথাও জাগিয়াছিল যে, পাঁচ বৎসর হইতে ১৫।১৬ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বাসন্তী তাঁহারই প্রভাবে মানুষ হইয়াছিল।

সোজা হইয়া বসিয়া তিনি বলিলেন, "দেখ, স্রোত যখন প্রবলবেগে বহে চলে, তখন কোন বাধাই মানে না। বিশেষতঃ আমাদের কাছে ও স্বাধীন ভাবেই মানুষ হ'য়েছে। তবে ওর দেহে সুরমা ও তোমার রক্তও ত আছে। বাসন্তী খুবই খেয়ালী মেয়ে সত্য, কিন্তু এক দিন খেয়ালের স্বপ্ন ওর ভাঙ্গবেই।"

চিন্তিত ভাবে গিরিবালা বলিলেন, "সে কবে? এদিকে মেয়ের ধিঙ্গিপনার কথা ত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। বিয়ে ওর হওয়া কঠিন। অন্য মেয়েগুলোরও ওর জন্য বিয়ে হ'বে না, দেখো।"

অম্বিকাচরণের মনে যে সেরূপ দুশ্চিন্তার উদয় হয় নাই, তাহা নহে। কিন্তু যে নিজের গতি-পথ হইতে নিজে সরিয়া না দাঁড়ায়, তাহাকে জোর করিয়া কি ফিরান যায়? মানব-মনোবৃত্তির বিশেষজ্ঞগণ ত সেই কথাই বলিয়া থাকেন।

নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অম্বিকাচরণ বলিলেন, "চল্‌বার পথ যদি ঠিক না হয়, এক দিন বাধা পাবেই। তত দিন অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় কি?"

গিরিবালা বলিলেন, "কিন্তু সে বাধা সাংঘাতিক হয়ে দাঁড়াবে না, কে বল্‌তে পারে? মেয়েছেলে ত, পুরুষ নয়। ঘটনাক্রমে যদি পা পিছ্‌লে পড়ে যায়—সারা গায় কাদা লেগে যাবে। তখন সাত সাগরের জল দিয়ে ধুলেও ত ময়লার দাগ উঠ্‌বে না!"

অম্বিকাচরণ নতমস্তকে ভাবিতে লাগিলেন। সমগ্র জীবনে এমন ঝটিকার আবর্ত্তে তিনি কখনও পড়েন নাই। কন্যা-জামাতা তাঁহার বাড়ীতে আসা ছাড়িয়া দিয়াছে। স্নেহের পুত্তলীদিগকে কয় মাস তিনি দেখিতেও পান নাই। অভিমানবশে তিনিও শ্যামবাজারের দিকে আর যান নাই।

প্রাচীরগাত্রে দুর্গতিহারিণীর যে চিত্রপট দুলিতেছিল, সেই দিকে নিবিষ্টভাবে একবার চাহিলেন। জগজ্জননীর প্রসাদে শত শত দুর্নিমিত্ত হইতে তিনি রক্ষা পাইয়াছেন। ভক্ত সন্তানের কাতর প্রার্থনা কি তাঁহার চরণতলে পৌঁছিবে না? এই ভীষণ, প্রলয়ঙ্কর ঝড় কি থামিবে না? মেঘনম্র আকাশের বিদ্যুৎবর্ষী ঐ মেঘজাল ছিন্ন করিয়া কি দীপ্ত তপনের রৌদ্র ঝলমল করিয়া উঠিবে না? মা! মা!

মুখ ফিরাইয়া তিনি দেখিলেন, গৃহিণী পাশে নাই। কার্য্যান্তরে চলিয়া গিয়া থাকিবেন।

আষাঢ়ের আকাশে সত্যই তখন মেঘমালা ছুটাছুটি করিতেছিল।

অম্বিকাচরণ নির্নিমেষ নেত্রে সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন।

৫

মোটর দ্রুত ছুটিতেছিল।

অপরাহ্ণের ছায়া ঘনাইয়া আসিয়াছে। এতক্ষণ বৃষ্টি হইতেছিল। আকাশে এখনও মেঘ থম্ থম্ করিতেছে। আবার ধারাবর্ষণ আরম্ভ হইবার বিশেষ সম্ভাবনা।

অম্বিকাচরণ বিশেষ কাযে এক বন্ধুর সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। প্রায় জনহীন পথে তিনি মোটরে ফিরিতেছিলেন।

বাসন্তীর জন্য তাঁহার মনে শান্তি ছিল না। একটি পাত্রের সন্ধান পাইয়াছিলেন, যদি তাহারা মেয়ে দেখিয়া পছন্দ করে, বাসন্তীর অনিচ্ছাসত্ত্বেও সেই পাত্রে তিনি বাসন্তীকে সমর্পণ করিবার বিশেষ চেষ্টা দেখিবেন। মেয়ে বড় করিয়া বিবাহ দিবার যে প্রথা ইদানীং সমাজে নানা কারণে প্রবেশ করিতেছে, তাহার ফল কয়েক বৎসরে যে ভাবে দেখা দিয়াছে, তাহাতে অভিভাবকদিগকে আর নিশ্চিন্ত ভাবে থাকিবার উপায় নাই, ইহা তিনি বিশেষ ভাবেই বুঝিয়াছিলেন। এজন্য মেয়েদের উপর দোষ চাপাইলে চলিবে কেন?

ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট-রচিত একটি নূতন প্রশস্ত পথের মধ্য দিয়া মোটর চলিতেছিল। এদিকে এখনও বসতি ঘন হয় নাই। অনেক নূতন বাড়ী নির্ম্মিত হইতেছে। মাঝে মাঝে দুই একটি বাড়ীতে বসতির চিহ্ন দেখা যাইতেছে।

একটি প্রকাণ্ড পার্ক পথের ধারে নির্ম্মিত হইয়াছে। বায়ুসেবীরা বৃষ্টির জন্য সম্ভবতঃ পার্কে বেড়াইতে আসে নাই। অথবা বৃষ্টি আসন্ন দেখিয়া নিরাপদ গৃহে আশ্রয় লইয়াছে।

তখন সন্ধ্যা গাঢ় হয় নাই। প্রদোষান্ধকার মেঘে আরও মলিন হইয়াছিল বটে, কিন্তু ছায়ানিবিড় হয় নাই।

সোফার বিশ্বনাথ বলিল, "তেল ফুরিয়েছে। একটু দূরে পাম্পিং-ষ্টেশন। ওখান থেকে কিন্‌তে হবে, না হলে বাড়ী পৌঁছান যাবে না।"

অম্বিকাচরণ বলিলেন, "বেশ, তুমি তেল নিয়ে এস। আমি পার্কের মধ্যে একটু ঘুরে দেখি। এই গেটের কাছে এসে হর্ণ দিও।"

চিরসহচর মোটা লাঠিখানা লইয়া অম্বিকাচরণ নামিয়া পড়িলেন। বাদলার জন্য প্রকৃতির আহ্বান বোধ হয় তাঁহাকে একটু ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল।

পার্কের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি অনতিবিলম্বে সুস্থ হইলেন।

বিশ্বনাথ এখনও ফিরে নাই। তিনি পার্কের বাঁধানো পথে পদচারণা করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন। পার্কের উত্তর দিকে আর একটি সমান্তরাল রাস্তা। উহা অতিক্রম করিতে পারিলে ট্রামরাস্তায় পড়া যায়।

উদ্যানমধ্যে তিনি জন-প্রাণীর দেখা পাইলেন না।

সহসা আর্দ্র বাতাসে যেন কাহার রুদ্ধ এবং বিপন্ন চীৎকার ভাসিয়া আসিল।

স্বর লক্ষ্য করিয়া অম্বিকাচরণ দৌড়িলেন। প্রৌঢ়ত্বের শেষ সীমায় পৌঁছিলেও আবাল্য ব্যায়ামপুষ্ট দেহ যেন যৌবনের শক্তিতে পূর্ণ হইয়া উঠিল। প্রত্যহ প্রত্যূষে ছাদে উঠিয়া অন্যের অলক্ষ্যে এখনও তিনি ব্যায়াম ও লাঠিচালনার অভ্যাস বজায় রাখিয়াছেন। এক সময়ে মুষ্টিযোদ্ধা বলিয়া বন্ধু-মহলে তাঁহার সুনামও ছিল।

দূরে অস্পষ্ট আলোকে তিনি দেখিলেন, দুই জন পুরুষ দুইটি নারীকে কবলিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। খুব সম্ভব, দুর্বৃত্তরা নারী দুইটির মুখ চাপিয়া ধরিয়াছে। নহিলে আর চীৎকার উঠিতেছে না কেন?

অম্বিকাচরণের শরীরের সমস্ত রক্ত দ্রুততালে বহিতে লাগিল। তিনি প্রাণপণ বেগে দৌড়াইয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন।

সম্ভবতঃ দুর্বৃত্তরা তাঁহার পদধ্বনি শুনিতে পায় নাই। কারণ, তাঁহার পায়ে রবার ও ক্যানভাসের কেডস্ ছিল। সম্মুখের লোকটি তাঁহার দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া একটি নারীকে আয়ত্তে আনিবার চেষ্টা করিতেছিল। অম্বিকাচরণ প্রচণ্ড শক্তিতে তাহার দেহে পদাঘাত করিলেন। লোকটা অতর্কিত ভাবে আক্রান্ত হইয়াই টলিতে টলিতে সম্মুখে ফিরিয়া দাঁড়াইল। অমনই দীর্ঘকালের অভ্যস্ত প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত তাহার গণ্ডদেশে পতিত হইল। "বাপ্!" বলিয়া সে লুটাইয়া পড়িল।

দ্বিতীয় ব্যক্তি তাহার শিকার ছাড়িয়া অম্বিকাচরণের দিকে ছুটিয়া আসিল। অমনই ক্ষিপ্রগতিতে অম্বিকা বাবু তাহার জানুদেশ লক্ষ্য করিয়া হাতের মোটা লাঠির একটা প্রচণ্ড আঘাত করিলেন। টালীগঞ্জ ব্যায়াম সমিতির লাঠিখেলার শ্রেষ্ঠ, প্রসিদ্ধ শিক্ষকের সে আঘাত

ব্যর্থ হইবার নহে। সে লোকটাও ভূমিশয্যা গ্রহণ করিল।

মুখের বাঁধন খুলিতে খুলিতে প্রথমা নারী স্খলিতচরণে অম্বিকাচরণের কাছে ছুটিয়া আসিল।

"কে রে! বাসন্তি, তুই?"

মাতামহের বুকের উপর পড়িয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বাসন্তী কাঁদিয়া ফেলিল।

"ওটি কে? ও! তোর সেই বন্ধু?"

উভয়ের উভয় কর দৃঢ় হস্তে ধারণ করিয়া, বগলে লাঠিটা চাপিয়া ধরিয়া অম্বিকাচরণ নিঃশব্দে চলিলেন। পথে কোন কথা বলিবার মত মানসিক অবস্থা তাঁহার ছিল না।

তরুণীযুগল অতিকষ্টে পথ চলিতে লাগিল।

দূরে গেটের কাছে মোটরের শৃঙ্গধ্বনি হইল।

বাসন্তীর সঙ্গিনী রাণী এতক্ষণে অনেকটা সুস্থ হইয়াছিল। সে অর্দ্ধস্ফুট কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "পাজি বদমাইসটা আমার ব্লাউজটা একেবারে ছিঁড়ে ফেলেছে। হাতটা এমন মুচ্‌ড়ে দেছে! ওঃ—"

বাসন্তী তখনও ফোঁপাইতেছিল। তাহারও প্রায় অনুরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছিল।

অম্বিকাচরণ বলিলেন, "এত জায়গা থাকতে তোরা এদিকে এমন ভাবে এসেছিলি কেন?"

বাসন্তী বলিল, "আমাদের নারীসঙ্ঘের একটা মিটিং এদিকে ছিল। বৃষ্টির জন্য আটকা পড়েছিলাম। আর সকলের বাড়ী এই অঞ্চলে। আমরা পার্কের ভেতর দিয়ে ট্রামরাস্তা ধরব বলে যাচ্ছিলাম। এমন সময়—"

গম্ভীর ভাবে অম্বিকাচরণ বলিলেন, "দৈবাৎ এ রাস্তায় আমি এসেছিলাম। হঠাৎ বাগানে ঢুকেছিলাম। নইলে অবস্থাটা কি রকম হত?"

উভয় তরুণীরই দেহে শঙ্কাজনিত কম্পন-বেগ অনুভূত হইল।

"আমরা প্রায় এদিকে আসি। এমন হবে, কে জানত!"

রাণীর দিকে মুখ ফিরাইয়া অম্বিকাচরণ বলিলেন, "মন্দ দিক্‌টাও ভেবে দেখা বুদ্ধির লক্ষণ। ভাল-মন্দ নিয়েই জগৎ। বিশেষতঃ মানুষ-জানোয়ারের অত্যাচারই সব চেয়ে ভয়ঙ্কর। তোমরা ছেলেমানুষ, খালি ভাল দিক্‌টাই দেখে এসেছ। সেটা ঠিক নয়।"

বাসন্তী তখনও কাঁপিতেছিল। মাতামহ সস্নেহে তাহাকে বলিলেন, "আর ত ভয়ের কারণ নেই। কিন্তু মেয়েছেলে যদি পুরুষের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জগতের সব কাজ করতে চায়, তবে তাকে সকলের আগে শক্তিচর্চ্চা করতে হবে। আমাদের হিন্দুর উপাস্য দেবতাদের মধ্যে, কালী, দুর্গা শক্তির প্রতীক, তা ভেবে দেখো। দেবীচৌধুরাণী তোমাদের চেয়েও বড় বড় কাজে মাথা দিয়েছিলেন। কিন্তু কি রকম শিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন, সেটা মনে রাখ্‌তে হবে।"

"দাদু!—"

"কি, ভাই?"

"তুমি আমাকে ক্ষমা করবে?"

"ক্ষমা? দোষ ত তোমাদের চেয়ে আমাদেরই বেশী। তাই আমার প্রস্তাব, এখন থেকে কোন কাজে নামবার আগে, শক্তিসাধনা কর। শুধু ঝড়ো হাওয়ার সঙ্গে ছুটলে চলবে না। ঝড়ো হাওয়ার ধাক্কায় যাতে পথে পড়ে না যাও, তার মত শক্তি আয়ত্ত করতে হবে। চল রাণি, গাড়ীতে উঠে বসো। বাসন্তি, তুই ওর কাছে বস্।"

বিশ্বনাথ একবার সবিস্ময়ে তাহাদিগের দিকে চাহিল। পরক্ষণে মোটর ছুটিয়া চলিল।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

বৃদ্ধি

অঙ্কুর কাঁদিছে গোপনে,
পেতে চায় পূর্ণ পরিণতি;
কুঁড়ি চায় ফুটিতে কাননে,
ফুল হয়ে পেতে প্রজাপতি।

পরমায়ু কাঁপিছে হতাশে,
মনে মনে করিছে বারণ;
সকলেই বাড়িছে কি আশে,
বৃদ্ধি যে ক্ষয়ের কারণ।

শ্রীশৈলেন গঙ্গোপাধ্যায়, (এম্‌-এ, বি-টি)।

[উপন্যাস]

ষষ্ঠ প্রবাহ

সার্জেণ্ট কলিন্স্ প্রত্যাগত !

বেটী সেমুর, বিপুল চেষ্টায় আত্মসংবরণ করিয়া ভগ্নস্বরে বলিল, "সুপ বিষ-মিশ্রিত !"—তাহার বিস্ফারিত নেত্রে ভীষণ আতঙ্ক পরিস্ফুট !

ইন্স্পেক্টর লুকাস বেটীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "হাঁ মিস্, অত্যন্ত উগ্র বিষ মিশাইয়া এই সুপ বিষাক্ত করা হইয়াছে ; ঐ সুপ এক চামচ পান করিলেই চেয়ার হইতে পতন এবং সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু !"

খানসামাটা তখন এক পাশে দাঁড়াইয়া ভয়ে থর-থর করিয়া কাঁপিতেছিল। ইন্স্পেক্টর লুকাস তাহার আতঙ্ক-বিহ্বল শুষ্ক মুখের দিকে চাহিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিল ; তাহার পর কঠোর স্বরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ঐ সুপে তুমি কি মিশাইয়াছিলে ?"

খানসামা ইন্স্পেক্টরের প্রশ্নের উত্তরে কোন কথা না বলিয়া অবজ্ঞাভরে অন্য দিকে মুখ ফিরাইল।

ইন্স্পেক্টর বলিল, "সুপে তুমি যে বিষই মিশাও, সেই বিষের শিশি এখনও তোমার পকেটে আছে ; উহা আমি তোমাকে পকেটে রাখিতে দেখিয়াছি।"

গোলমাল শুনিয়া সর্দ্দার-খানসামা সেই স্থানে উপস্থিত হইল। সে গোলমালের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ডিক তাহাকে সংক্ষেপে সকল কথা বলিলেন।

তাঁহার কথা শুনিয়া সর্দ্দার-খানসামা সভয়ে বলিল, "কি সর্ব্বনাশ ; এ যে ভয়ানক ব্যাপার !"

ডিক বলিলেন, "তুমি ঠিকই বলিয়াছ, এ ভয়ানক ব্যাপারই বটে ! কিন্তু সুপটা পান করিলে তাহার ফল আরও অধিক ভয়ানক হইত।—এই খানসামাটা কত দিন পূর্ব্বে এখানে কাযে নিযুক্ত হইয়াছে ?"

সর্দ্দার-খানসামা বলিল, "উহাকে এখানে চাকরীতে নিযুক্ত করা হয় নাই। আজ সকাল হইতে উহাকে এখানে কায করিতে দেখিতেছি ; ইহার পূর্ব্বে কোন দিন উহাকে দেখি নাই। আমাদের এক জন কায়েমী খানসামা অসুস্থ হইয়াছে ; সে একখান চিঠি দিয়া উহাকে এখানে পাঠাইয়া দিয়াছে। সে লিখিয়াছে—অসুখের জন্য সে কাযে আসিতে পারিল না, এই পত্রবাহক তাহার পরিবর্ত্তে এখানে কায করিবে। সেই পত্র অনুসারে উহাকে এখানে কায করিতে দেওয়া হইয়াছে।"

ডিক অপরাধী খানসামাকে বলিলেন, "কাহার আদেশে তুমি এই সুপে বিষ মিশাইয়াছিলে ? বিষের শিশিই বা তুমি কোথায় পাইয়াছিলে ?"

খানসামাটা তাঁহার প্রশ্ন শুনিয়া দাঁত বাহির করিয়া হাসিবার চেষ্টা করিল, তাহার পর মাথা নাড়িয়া বলিল, "আমার কাছে কোন প্রশ্নের উত্তর মিলিবে না।"—তখন তাহার সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার ভাব !

বেটীর মুখ তখনও ম্লান ; তাহার সর্ব্বাঙ্গ থর-থর করিয়া কাঁপিতেছিল। ডিক তাহার অবস্থা লক্ষ্য করিয়া, সে মনে কিরূপ আঘাত পাইয়াছে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারিলেন ; এই জন্য একখান ট্যাক্সি আনাইয়া তাহাকে বাড়ীতে পাঠাইয়া দেওয়াই সঙ্গত মনে করিলেন। বেটী এই প্রস্তাবে আপত্তি করিল না। ডিকের আদেশে কয়েক মিনিটের মধ্যে একখানি ট্যাক্সি আনীত হইল। ডিক বেটীর সঙ্গে দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া তাহাকে ট্যাক্সিতে তুলিয়া দিলেন। ট্যাক্সি তাহাকে লইয়া প্রস্থান

করিলে তিনি নিরুৎসাহ চিত্তে ভোজন-কক্ষে ফিরিয়া আসিলেন।

ডিক, বেটীকে ট্যাক্সিতে তুলিয়া দিয়া যদি আরও দুই তিন মিনিট দ্বারপ্রান্তে অপেক্ষা করিতেন, তাহা হইলে কার্লটোনিয়ানের বাহিরে একটি লোককে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিতেন, এবং তাহার কার্য্যপ্রণালী লক্ষ্য করিলে তিনি বিস্মিত হইতেন। বেটী ট্যাক্সিতে উঠিয়া সেই স্থান ত্যাগ করিবার অব্যবহিত পরেই সেই লোকটি অন্য একখানি ট্যাক্সি সংগ্রহ করিয়া, কিছু দূরে থাকিয়া বেটীর ট্যাক্সির অনুসরণ করিল।

ডিক ইন্‌স্পেক্টর লুকাসকে সঙ্গে লইয়া ক্যানন রোর থানায় উপস্থিত হইলেন। তিনি অপরাধী খানসামাটাকে থানার গারদ-ঘরে আটক রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া ইন্‌স্পেক্টর লুকাসের সঙ্গেই স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে ফিরিয়া আসিলেন। অপরাধী খানসামার পকেটগুলি পরীক্ষা করায় তাহার একটি পকেট হইতে সবুজবর্ণের একটি ক্ষুদ্র শিশি বাহির হইল। শিশিটার ছিপি খুলিয়া তাহার অভ্যন্তরস্থ দ্রব্যের ঘ্রাণ গ্রহণ করায় খানসামাটার দুরভিসন্ধি সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা গেল; কারণ, শিশিটি হাইড্রো-সিয়ানিক এসিডে পূর্ণ ছিল। ডিককে যে সুপ প্রদান করা হইয়াছিল, তাহার কিয়দংশ তিনি একটি শিশিতে ঢালিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি আফিসে ফিরিয়া, তাহার উপাদান বিশ্লেষণ করিবার উদ্দেশ্যে তাহা রাসায়নিক গবেষণাগারে প্রেরণ করিলেন।

ইন্‌স্পেক্টর লুকাস রিচার্ড ষ্ট্রীটের আফিসে বসিয়া গম্ভীর ভাবে কি ভাবিতে লাগিল; তাহার পর বলিল, "কোন দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে, এরূপ সন্দেহ আমার মনে পূর্ব্বেই উদিত হইয়াছিল। আজ সকালে দুই বার তাহারা আমাকে বিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু আমি তাহাতে বিস্মিত হই নাই; কারণ, পূর্ব্বেও একাধিক বার তাহাদের এরূপ চেষ্টার পরিচয় পাইয়াছি। আমার মনে হইতেছিল, এই সকল দস্যু শীঘ্রই হয় ত আপনারও জীবন বিপন্ন করিবার চেষ্টা করিবে। এখন দেখিতেছি, আমার অনুমান মিথ্যা নহে।"

ডিক বিস্মিত ভাবে ইন্‌স্পেক্টরের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আজ তাহারা দুই বার তোমার জীবন বিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল? দুশ্চিন্তার বিষয় বটে!"

ইন্‌স্পেক্টর লুকাস বলিল, "হাঁ, দুই বার।—আমি বাসা হইতে পথে বাহির হইয়াছি, সেই সময় একখান মোটর-কার দ্রুতবেগে আমার পাশ দিয়া চলিয়া গেল। আমাকে দেখিবামাত্র সেই কারের আরোহী আমাকে লক্ষ্য করিয়া রিভলবারের গুলী বর্ষণ করে।"—ইন্‌স্পেক্টর তাহার কোটের আস্তিন গুটাইয়া হাতখানি ডিকের সম্মুখে তুলিয়া ধরিলে ডিক দেখিলেন, পিস্তলের গুলীতে তাহার প্রকোষ্ঠের ত্বক্ বিদীর্ণ হইয়াছিল; কিন্তু ক্ষত গভীর হয় নাই।

ইন্‌স্পেক্টর বলিল, "পিস্তলের গুলীর আঘাতে এই ক্ষত হইয়াছে। আমার আততায়ী যে গাড়ীতে ছিল, সেই গাড়ীর নম্বর তৎক্ষণাৎ টুকিয়া লইয়াছিলাম। গাড়ীর নম্বর XY ১০৩২। কিন্তু উহা যে ঝুটা নম্বর, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ; কারণ, যাহাতে ধরা পড়িতে হয়, এরূপ কাঁচা কায উহারা কখন করিয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। 'মিড্‌নাইট' দলের দস্যুরা যে অসাধারণ সতর্ক, ইহার বহু পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। আমরা তাহাদের সম্বন্ধে যাহা জানি, তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক জানিতে পারিয়াছি, এইরূপ সন্দেহ করিয়াই বোধ হয় তাহারা আতঙ্কাভিভূত হইয়াছে। তাহারা হোয়াইট হলে দ্বিতীয় বার আমাকে বিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। আমি পথ পার হইবার জন্য পথের ধারে দাঁড়াইয়া সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, সেই সময় এক জন লোক আমার পিঠে এরূপ জোরে ধাক্কা দিল যে, আমি একখানি চলন্ত বাসের সম্মুখে পড়িলাম। মুহূর্ত্ত মধ্যে আমি সেই বাসের চাকায় পিষ্ট হইতাম, কিন্তু বাসের ড্রাইভার অত্যন্ত চতুর ও চট্‌পটে বলিয়া, বিশেষতঃ, বাসখানির 'ব্রেক্' অতি উৎকৃষ্ট থাকায় মুহূর্ত্ত মধ্যে বাসের গতিরোধ করা সম্ভব হইয়াছিল; নতুবা লণ্ডনের পথে সংঘটিত আর একটা দুর্ঘটনার বিবরণ স্থানীয় দৈনিক পত্রিকা সমূহে প্রকাশিত হইত, সন্দেহ নাই। এই সকল কথা বলিয়া আপনাকে সতর্ক করিবার জন্যই কার্লটোনিয়ানে গমন করিয়াছিলাম।"

ডিক ষ্ট্রীট ইন্‌স্পেক্টর লুকাসের সকল কথা স্তব্ধভাবে শুনিয়া বলিলেন, "আমি কার্লটোনিয়ানে গিয়াছিলাম, এ সংবাদ তুমি কিরূপে জানিতে পারিয়াছিলে?"

ইন্‌স্পেক্টর বলিল, "আপনি আপনার 'ব্লটিং প্যাডে' যে 'নোট' রাখিয়া গিয়াছিলেন, সৌভাগ্যক্রমে তাহা আমার দৃষ্টি অতিক্রম করে নাই।"

ডিক চিন্তিত ভাবে বলিলেন, "কিন্তু আমি কার্লটোনিয়ানে যাইতেছিলাম, এ সংবাদ দস্যুরা কিরূপে জানিতে পারিল? ইহা অত্যন্ত বিস্ময়ের বিষয়! এ সংবাদ যে তাহারা জানিতে পারিয়াছিল, এ বিষয়ে আমার অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এ সংবাদ তাহারা জানিতে না পারিলে আমাকে হত্যা করিবার জন্য কি পূর্ব্ব হইতেই তাহারা ঐ প্রকার যোগাড়-যন্ত্র করিতে পারিত? তাহাদের এই ষড়যন্ত্র যে আকস্মিক নহে, ইহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না।"

ইন্‌স্পেক্টর লুকাস্ বলিল, "আপনি কার্লটোনিয়ানে যাইবেন, এ সংবাদ কাহারও নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন কি?"

ডিক ষ্ট্রীট সবেগে মাথা নাড়িয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "না, এ সংবাদ কাহারও নিকট প্রকাশ করি নাই। গত কল্য আমি এই আফিস হইতে টেলিফোন-যোগে কার্লটোনিয়ানে সংবাদ দিয়া আমাদের ভোজনের ব্যবস্থা করিয়াছিলাম।"

ইন্‌স্পেক্টর লুকাস ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কুণ্ঠিত ভাবে বলিল, "তাহা হইলে কি মি—মিস্ সেমুরই কথাটা কা—কাহারও নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন?"

ডিক ষ্ট্রীট ইন্‌স্পেক্টর লুকাসের মন্তব্য শুনিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিলেন, এবং অত্যন্ত গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "মিড্‌নাইটের দলভুক্ত কোন দস্যুকে তিনি এই সংবাদ দিয়া থাকিবেন—এইরূপই—কি—তোমার অনুমান, ইন্‌স্পেক্টর?"

তিনি ঈষৎ উত্তেজিত ভাবে আরও কোন কথা বলিতে উদ্যত হইয়াছিলেন; কিন্তু হঠাৎ তাঁহার স্মরণ হইল—বেটীই তাঁহার নিকট প্রস্তাব করিয়াছিল—সে তাঁহার সহিত 'লঞ্চ' করিবে।—তিনি হঠাৎ নীরব হইলেন।

সেই দিন তিনি বেটী সেমুরের সহিত কার্লটোনিয়ানে ভোজন করিবেন, এ সংবাদ বেটী ভিন্ন আর কেহই জানিত না; কিন্তু তিনি বুঝিতে পারিলেন, দস্যুদলের কেহ না কেহ এই সংবাদ জানিতে পারিয়াছিল; ইহা হইতে কিরূপ সিদ্ধান্ত হইতে পারে, তাহা চিন্তা করিয়া তাঁহার মন অত্যন্ত দমিয়া গেল। তিনি ভাবিলেন—তবে কি মিড্‌নাইটের দলেরই কেহ বেটীর নিকট এই সংবাদ অবগত হইয়া তাঁহাকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছিল? না, তাঁহার বিরুদ্ধে এই পৈশাচিক ষড়যন্ত্র কার্য্যে পরিণত করিবার ভার বেটী স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছিল?

এ সকল কথা বিশ্বাস করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। অবিশ্বাস্য বোধে তিনি মন হইতে ইহা বিতাড়িত করিতে পারিলে শান্তিলাভ করিতেন; কিন্তু কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ বিচার করিয়া তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন—তাহা তাঁহার মনকে অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত ও চঞ্চল করিয়া তুলিল।

তিনি বেটীকে ভাল বাসিয়াছিলেন; তাঁহার নবীন যৌবনের সেই প্রেম অত্যন্ত উদ্দাম; প্রচণ্ড ঝটিকার ন্যায় তীব্র তাহার বেগ, এবং ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ মহাসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গরাশির ন্যায় তাহা তাঁহার হৃদয়-তটে পুনঃ পুনঃ প্রতিহত হইয়া তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছিল; তাঁহার মনের সেই ভাব তিনি বেটীর নিকট গোপন করিতে পারেন নাই। বেটী তাঁহার প্রকৃত মনোভাব জানিতে পারিয়াছে, এই চিন্তা তাঁহার অসহ্য হইয়া উঠিল; এবং ইহা তাঁহার প্রকৃতির দুর্ব্বলতার নিদর্শন, এই ধারণায় তিনি আপনাকে অসহায় ও আত্মরক্ষায় অসমর্থ মনে করিয়া অত্যন্ত বিচলিত হইলেন।

ইন্‌স্পেক্টর লুকাস তাঁহাকে বিচলিত দেখিয়া তাঁহার মন অন্য দিকে আকৃষ্ট করিবার জন্য বলিল, "মিস্ত্রীরা নূতন কাবোর্ডটা আজও দিয়া যায় নাই দেখিতেছি! এই শ্রেণীর লোকগুলার কর্ত্তব্যজ্ঞানের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। এ রকম আলসে লোকের হাতে কোন কাযের ভার দেওয়াই ভুল। আমরা যে সময় স্কুলে পড়িতাম—সেই সময় আমাদের মূলমন্ত্র ছিল—"

সেই সময় সেই কক্ষের রুদ্ধ দ্বারে কেহ করাঘাত করায় ইন্‌স্পেক্টর লুকাসের মূলমন্ত্র মুখের বাহিরে আসিল না, জিহ্বাগ্রে আসিয়া পথ খুঁজিতে লাগিল। এক জন কন্‌ষ্টেবলকে সেই কক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিয়া ডিক স্বস্তি বোধ করিলেন।

কন্‌ষ্টেবল ডিককে অভিবাদন করিয়া বলিল, "একটি ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন, হুজুর!"

হুজুর বলিলেন, "কে তিনি? তাঁহার নাম জানিতে পারিয়াছ?"

কন্‌ষ্টেবল বলিল, "ভদ্রলোকটি হুজুরের পরিচিত; তাঁহার নাম মিষ্টার ট্রেসি।"

"তাঁহাকে এখানে পাঠাইয়া দাও।"—এই কথা বলিয়া ডিক কন্‌ষ্টেবলটিকে বিদায় করিয়া প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে ইন্‌স্পেক্টর লুকাসের মুখের দিকে চাহিলেন।

মিষ্টার ট্রেসি পুলিশ-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ডিক ষ্ট্রীটের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন শুনিয়া লুকাস ডিককে বলিল, "মিষ্টার ট্রেসি কি উদ্দেশ্যে আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন কি? পুলিশের কার্য্যে অকর্ম্মণ্যতার আরোপ করিয়া সে দিন 'মেগাফোনে' যে সম্পাদকীয় প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা পুলিশের পক্ষে অত্যন্ত অসম্মানজনক; ঐ প্রকার অশিষ্ট, আপত্তি-কর প্রবন্ধ ভবিষ্যতে আর প্রকাশিত না হয়, এজন্য 'মেগাফোনের' প্রধান সম্পাদককে সতর্ক করা হইয়াছিল। আমার বিশ্বাস, মিষ্টার ট্রেসি তাঁহার পক্ষ হইতে আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে আসিয়াছেন।"

কিন্তু ফ্র্যাঙ্ক ট্রেসি অত্যন্ত ব্যগ্র ভাবে ডিক ষ্ট্রীটের আফিস-কক্ষে প্রবেশ করিয়া যেরূপ ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন, তাহা লক্ষ্য করিয়া ইন্‌স্পেক্টর লুকাস বুঝিতে পারিল, সে মিষ্টার ট্রেসির আগমনের যে কারণ অনুমান করিয়াছিল, তাহা সত্য নহে। মিষ্টার ট্রেসির ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া ডিককেও অত্যন্ত বিস্মিত হইতে হইল।

মিষ্টার ট্রেসি ডিকের ডেস্কের উপর ঝুঁকিয়া-পড়িয়া, তাঁহার হাতে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়া রুদ্ধ নিশ্বাসে বলিলেন, "লর্ড! সংবাদটা তাহা হইলে সম্পূর্ণ মিথ্যা? আপনাকে সুস্থ দেখিয়া কি আনন্দই যে হইল!"

ডিক গভীর বিস্ময়ে বিস্ফারিত নেত্রে ট্রেসির মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনার এই অস্বাভাবিক উচ্ছ্বাসের কারণ বুঝিতে পারিলাম না! কোন্ সংবাদ সম্পূর্ণ মিথ্যা? আমাকে সুস্থ দেখিতে পাইবেন না, এরূপ অনুমানের কি কোন কারণ ছিল?"

ট্রেসি বলিলেন, "নিশ্চিতই ছিল, এবং সেই অনুমান মিথ্যা প্রতিপন্ন হওয়ায় অন্য কেহ আমার মত সুখী হইবে কি না, তাহা জানি না। আজ সকালে 'মেগাফোন' আফিসে আপনার সম্বন্ধে একটা বড় অশুভ সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল; সংবাদটার মর্ম্ম—হঠাৎ আপনার মৃ—মৃত্যু হইয়াছে!—সংবাদটা যে সময় পাওয়া যায়, তখন আমি আফিসে ছিলাম না, আফিসে আসিতেই—এই সংবাদ সত্য কি না—সরেজমিনে উপস্থিত হইয়া তাহা জানিবার জন্য আমার উপর ভার পড়িল।"

অনন্তর তিনি একখান চেয়ারে বসিয়া-পড়িয়া ললাটের ঘর্ম্মরাশি অপসারিত করিলেন; তাহার পর বলিলেন, "সংবাদটা শুনিয়া আমি কত দূর মর্ম্মাহত হইয়াছিলাম, তাহা আমার প্রকাশ করিবার শক্তি নাই!"

ইন্‌স্পেক্টর লুকাস মুখব্যাদান করিয়া ট্রেসির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ডিক অতিকষ্টে হাস্য সংবরণ করিলেন।

ষ্ট্রীট ট্রেসিকে বলিলেন, "সংবাদটিতে মৌলিকত্বের অভাব নাই; সংবাদটা পাঠাইয়াছিল কে?"

ফ্র্যাঙ্ক সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "তাহা জানিতে পারা যায় নাই; আফিসে আসিয়া শুনিলাম, কে এক জন টেলিফোনে এই সংবাদ জানাইয়াছিল।"

এতক্ষণ পরে ইন্‌স্পেক্টর লুকাসের মুখে কথা ফুটিল। সে গাল চুল্‌কাইয়া বলিল, "হুম্! সংবাদটা যাহারা পাঠাইয়াছিল, তাহারা মিষ্টার ষ্ট্রীটের মৃত্যু সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়াছিল। আমি যে হঠাৎ সুপের পেয়ালায় বিষ আবিষ্কার করিয়া ষড়যন্ত্রটা বিফল করিয়া দিব—ইহা তাহারা পূর্ব্বে ধারণা করিতে পারে নাই; এজন্য হত্যাকাণ্ডের পূর্ব্বেই সংবাদটা পাঠাইয়া তাহারা আশা করিয়াছিল, উঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সংবাদপত্রে টাট্‌কা সংবাদটা বাহির হইয়া যাইবে!—আমার মৃত্যু-সংবাদ আপনারা জানিতে পারেন নাই?"

ট্রেসি বলিলেন, "না, আপনার সম্বন্ধে কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই, ইন্‌স্পেক্টর!"

ইন্‌স্পেক্টর ক্ষুব্ধস্বরে বলিল, "হাঁ, না পাওয়াই সম্ভব। এই মিড্‌নাইটের দল আমাকে বোধ হয় কীট-পতঙ্গের ন্যায় তুচ্ছ মনে করে! যে লোকটি 'ফোনে' আপনাদের এই সংবাদ জানাইয়াছিল, সেই ব্যক্তি কিরূপে উঁহার মৃত্যু হইল, তাহার বিশেষ বিবরণ জানায় নাই?"

ফ্র্যাঙ্ক ট্রেসি বলিলেন, "টেলিফোনে যে সংবাদ দিয়াছিল—সে পুরুষ নহে, স্ত্রীলোক।"

ট্রেসির কথা শুনিয়া হঠাৎ ডিকের মাথা ঘুরিয়া উঠিল,

তিনি চেয়ার হইতে পড়িতে পড়িতে সাম্‌লাইয়া লইলেন। তাঁহার বুকের ভিতর যেন হাতুড়ি পড়িতে লাগিল। তাঁহার মুখ সহসা মৃতের মুখের ন্যায় বিবর্ণ হইল, এবং তাঁহার সকল চিন্তা ধূম্রাকার ধারণ করিয়া তাঁহার মস্তিষ্কে ভীষণ বিপ্লব উপস্থিত করিল; তিনি হঠাৎ মুখ তুলিয়া সম্মুখে চাহিতেই দেখিলেন—ইন্‌স্পেক্টর লুকাস্ নির্নিমেষ নেত্রে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহার মানসিক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতেছিল। সুতরাং তিনি তৎক্ষণাৎ সতর্ক হইলেন, এবং মনের ভাব গোপন করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কতদূর কৃতকার্য্য হইলেন, তাহা বুঝিতে পারিলেন না; সম্মুখে একখানা আরসি থাকিলে বোধ হয় কতকটা বুঝিতে পারিতেন।

ডিক মনে করিলেন, তাঁহার সন্দেহ সত্য হইলে তাহা তিনি যথাসাধ্য চেষ্টায় গোপন করিবেন, এবং বেটী সেমুর যদি সত্যই অপরাধিনী হয়, তাহা হইলে তাঁহার কর্ত্তব্য-বহির্ভূত হইলেও তাহাকে এই কলঙ্কজনক ব্যাপারে জড়াইবেন না, সাধ্যানুসারে তাহার সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখিবেন।

ইন্‌স্পেক্টর লুকাস্ মৃদুস্বরে বলিল, "সংবাদটা স্ত্রীলোকের নিকট পাওয়া গিয়াছিল? বটে! স্ত্রীলোকটা কে, তাহা অনুমান করা কঠিন।"

অনন্তর সে ডিকের মুখের উপর স্থিরদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "আমাদের সহকারী কমিশনরের ধারণা, কোন স্ত্রীলোক এই 'মিড্‌নাইট' দলের অধিনায়িকা। তাঁহার এ কথা আমি হাসিয়াই উড়াইয়া দিয়াছি; কারণ, কোন স্ত্রীলোক অত বড় শক্তিশালী দস্যুদল পরিচালিত করিবে, ইহা বিশ্বাস করা আমার অসাধ্য হইয়াছিল; কিন্তু এখন মনে হইতেছে, তাঁহার কথাটা হয় ত সত্য। চিন্তার কথা বটে! নারীর অসাধ্য কর্ম্ম কিছুই নাই।"

ফ্র্যাঙ্ক বলিলেন, "সে যাহাই হউক, আমাদের আফিসে স্ত্রীলোকের কণ্ঠ হইতেই সংবাদটা পাওয়া গিয়াছিল। সেই স্ত্রীলোকটি বেলা বারটার কয়েক মিনিট পূর্ব্বে আমাদের সংবাদ-বিভাগের সম্পাদককে ডাকিয়া এ সংবাদ জানাইয়াছিল।"

ডিক স্তব্ধভাবে এই সকল কথা শুনিতেছিলেন; তাঁহার কোন কথা বলিবার ইচ্ছা হইতেছিল, কিন্তু তিনি কি বলিবেন, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। আরও বিপদ, ইন্‌স্পেক্টরটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়াছিল। সে কি তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়াছিল?

কন্‌ষ্টেবল পুনর্ব্বার সেই কক্ষে প্রবেশ করিল; ডিক যেন একটা বিষম সঙ্কট হইতে মুক্তিলাভ করিলেন।

কন্‌ষ্টেবল বলিল, "মিস্ত্রীদের লোক নূতন কাবোর্ডটা আনিয়াছে, হুজুর!"

ইন্‌স্পেক্টর লুকাস্ বলিল, "এখানে তাহা পাঠাইতে বল, এই কামরাতেই থাকিবে।"

এই প্রকার বাধা উপস্থিত হওয়ায় ডিক খুসী হইলেন; তাঁহার আশা হইল, সেই সুযোগে তিনি তাঁহার বিক্ষিপ্ত চিত্ত সংযত করিতে পারিবেন।

দুই জন লোক অত্যন্ত পরিশ্রান্ত ভাবে সেই ভারী কাবোর্ড লইয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। তাহারা কাবোর্ডটা দেওয়ালের গায়ে ঠেস দিয়া রাখিয়া, হাঁপাইতে হাঁপাইতে কপালের ঘাম মুছিতে লাগিল; তাহার পর রসিদে ডিকের স্বাক্ষর গ্রহণ করিয়া সেই কক্ষ ত্যাগ করিল।

ক্ষণকাল পরেই তাহাদের এক জন সেই কক্ষে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "কাবোর্ডের চাবিটা রাখিয়া যাইতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম, কর্ত্তা!"—সে ডিকের ডেস্কের উপর চাবিটা রাখিয়া তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিল।

গোলমাল মিটিলে ইন্‌স্পেক্টর লুকাস্ পুনর্ব্বার পূর্ব্ব-কথার 'খেই ধরিয়া' বলিল, "ভাল কথা, মেরী ড্রিউর নাম কখন শুনিয়াছেন?"

কথাটা শুনিয়াই ডিক চমকিয়া উঠিলেন, এবং তাঁহার ডেস্কের রুদ্ধ দেরাজের দিকে চাহিলেন; বেটী সেমুরের ফটোখানি তখনও সেই দেরাজে সঞ্চিত ছিল।

ডিক ভাবিলেন, "লুকাস্ কি এ কথা জানে?"

হঠাৎ লুকাসের সহিত তাঁহার দৃষ্টিবিনিময় হইল। ডিকের মনে হইল, লুকাসের দৃষ্টিতে তীব্র বিদ্রূপ প্রচ্ছন্ন ছিল।

ডিক দৃষ্টি অবনত করিলে লুকাস্ বলিতে লাগিল, "এই মেরী ড্রিউ অদ্ভুত রহস্যময়ী নারী—নারী বলিলাম, কিন্তু তাহাকে তরুণী বলাই সঙ্গত। সে অসাধারণ সুন্দরী। আমি নিশ্চিত বলিতে পারি, তাহার অপেক্ষা অধিকতর

সুন্দরী আপনি জীবনে কখন দেখেন নাই। কি উজ্জ্বল তাহার চক্ষু! আকর্ণবিস্তৃত সুনীল চক্ষু দুটি যেন শরতের স্বচ্ছ নীলাকাশ! দেখুন মিষ্টার ষ্ট্রীট, সেই তরুণীর কথা স্মরণ হইলেই আমার বুকের ভিতর কবিত্ব-স্রোত উদ্বেলিত হইয়া উঠে। আপনি বিশ্বাস করিবেন কি না জানি না, পাঠ্যাবস্থায় স্কুলের 'একসারসাইজে'র খাতায় আমার কবিতা লিখিবার অভ্যাস ছিল; এজন্য আমার সহপাঠীরা আমাকে 'সেলী' বলিয়া ঠাট্টা করিত! পুলিশে চাকরী লইয়া আমার 'কাব্য'-রোগ সারিয়া গিয়াছে। কিন্তু অভ্যাসটা বজায় রাখিলে আজ হয় ত স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে গোয়েন্দাগিরি করিতে হইত না। সে কথা যাক্। হাঁ, মেরী ড্রিউর কথা বলিতেছিলাম; ঘন ক্ষীরের মত তাহার দেহের বর্ণ। কিন্তু সয়তান আসিয়া তাহার হৃদয়টি অধিকার করিয়াছিল, তবে তাহাতে কিছু যায় আসে না; কারণ, হৃদয় অদৃশ্য পদার্থ, বিশেষতঃ নারীর হৃদয়! কেহই তাহার স্বরূপ ধারণা করিতে পারে না। সে যখন আসামী হইয়া আদালতে আসামীর কাঠরায় দাঁড়াইল, তখন সকলেরই মনে হইল—সে পরী; তাহার রূপে জজের এজ্‌লাস আলোকিত হইল। তাহার অপরাধের বিচারের সময় আমি এজলাসে উপস্থিত ছিলাম কি না। তাহার রূপের দুই একটা স্ফুলিঙ্গ আমার চক্ষুতেও পড়িয়াছিল। কিন্তু তাহার সেই অতুলনীয় রূপরাশি বুড়া জজকে ভুলাইতে পারে নাই; তাহার কঠোর শাস্তি হইয়া গেল। জজ তাঁহার রায়ে লিখিলেন, 'এ নারী পিশাচী'!"

ডিক ষ্ট্রীট লুকাসের বক্তৃতায় বাধা দিয়া ভর্ৎসনার সুরে বলিলেন, "তোমার এই লম্বা বক্তৃতার উদ্দেশ্য কি?"

ইন্‌স্পেক্টর লুকাস্ বলিল, "কোন একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে আমি এ সকল কথা বলিতেছি না। সেই পুরাতন কথা স্মরণ হওয়ায় আমি তাহারই আলোচনা করিতেছিলাম। কারাগার হইতে মুক্তিলাভের পর মেরীর কি হইল, তাহা কেহই জানিতে পারে নাই। দুই এক বার নহে, পাঁচ পাঁচ বার তাহাকে জেল খাটিতে হইয়াছিল! শেষবার মুক্তিলাভ করিয়া সে যেন বাতাসে মিশিয়া গিয়াছিল! এক দম্ ফেরার! যদি সে মিড্‌নাইটের দলে যোগদান করিয়া থাকে, তাহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ নাই; তবে আমার অনুমান, এবার সে কোন নূতন পেশা অবলম্বন করিয়াছে। বস্তুতঃ, তাহার ন্যায় অভিনয়-কুশলা নারী কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়।"

ডিক বিরক্তিভরে বলিলেন, "দেখ ইন্‌স্পেক্টর, যদি আপাততঃ তোমার হাতে কোন কায না থাকে, তাহা হইলে কোণের ঐ সকল কেতাব ও নথিপত্রগুলি নূতন কাবোর্ডটার ভিতর গুছাইয়া রাখিতে পার।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিল, "তাহাতে আর আপত্তি কি? কিন্তু কাবোর্ডটা ত এখন পর্য্যন্ত খুলিয়া দেখা হয় নাই। ভিতরটা কি রকম করিয়াছে দেখি।"

ইন্‌স্পেক্টর লুকাস্ ডিকের ডেস্কের উপর হইতে কাবোর্ডের চাবিটা তুলিয়া লইয়া কাবোর্ডের নিকট উপস্থিত হইল, এবং তাহার ডালা খুলিয়া ফেলিল।

বিষধর সর্প কোন পথিকের পদপ্রান্তে আসিয়া, হঠাৎ ফণা তুলিয়া ফোঁস্ করিয়া তাহাকে ছোবল মারিতে উদ্যত হইলে সেই পথিক যেমন আর্ত্তনাদ করিয়া পশ্চাতে লাফাইয়া পড়ে, ইন্‌স্পেক্টর লুকাস্‌ও সেইভাবে পশ্চাতে লাফাইয়া পড়িয়া আর্ত্তস্বরে বলিল, "সর্ব্বনাশ!"

তাহার আর্ত্তনাদ শুনিয়া ডিক ও ফ্র্যাঙ্ক উভয়েই তাড়াতাড়ি চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

ডিক জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি?"

ইন্‌স্পেক্টর লুকাস্ কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "কাবোর্ডের সম্মুখে আসিয়া ভিতরে চাহিয়া দেখুন।"

ডিক কাবোর্ডের অভ্যন্তরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া শোণিতরঞ্জিত ও মলিন ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড দেখিতে পাইলেন; তিনি তাহা টানিতেই তাহার অন্তরাল হইতে একটি লোকের মাথা বাহির হইল। লোকটি কাবোর্ডের ভিতর জড়সড় ভাবে উপুড় হইয়া পড়িয়াছিল। দেহে প্রাণ ছিল না।

ডিক মৃত ব্যক্তির মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই চিনিতে পারিলেন, সে সার্জ্জেণ্ট কলিন্স!

লুকাস্ ভগ্নস্বরে বলিল, "মিড্‌নাইটদলের কীর্ত্তি!"

হতবুদ্ধি ইন্‌স্পেক্টরের মুখ হইতে আর কোন কথা বাহির হইল না। ডিক ষ্ট্রীট স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

[ক্রমশঃ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

ইতিহাসের অনুসরণ

বঙ্গীয় ইতিহাসের বিস্মৃত পৃষ্ঠা

কাল সর্ব্বভুক। কালের বিশাল জঠরে সকল পার্থিব পদার্থই বিলীন হয়! অনেক বিষয়ের স্মৃতি বিলুপ্ত হয় না বটে, কিন্তু কাল-সহচরী বিস্মৃতি আসিয়া ক্রমশঃ সেই স্মৃতিটুকুও গ্রাস করে। তাহার পর আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। এইরূপে কত দেশের কত ঐতিহাসিক কাহিনীর স্মৃতিটুকু পর্য্যন্ত বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইয়াছে, তাহা গণনা করিয়া স্থির করা যায় না। কিন্তু অতীত ইতিহাসকে উদ্ধার করিতে হইলে সেই বিস্মৃত কাহিনীকে আবার জাগাইয়া তুলিতে হয়। ভস্মীভূত দেবায়তনে যে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহার উদ্ধার সাধন করিতে হইলে, উহার ভস্মরাশি ঘাঁটিয়া তাহার মধ্যে বিগ্রহের যাহা কিছু অবশেষ পাওয়া যায়, তাহা জোড়া দিয়া যেমন সেই দগ্ধীভূত বিগ্রহের স্বরূপ কিরূপ ছিল লোক তাহা বুঝিবার চেষ্টা করে, সেইরূপ বিস্মৃতির তমোময় গহ্বরে যাহা বিলীন হইয়া গিয়াছে, তাহাতে অনুসন্ধানের বর্ত্তিকা জ্বালিয়া প্রত্নতত্ত্ববিশারদগণ তাহার সন্ধান করেন। এই উপায়ে অনেক বিস্মৃতপ্রায় কাহিনীর পুনরুদ্ধার সাধন হইয়াছে। সামান্য যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহা রক্ষা করিয়া অবশিষ্ট যাহা পাইবার সম্ভাবনা আছে, তাহার জন্য অনুসন্ধানই প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানকারীদিগের কর্ত্তব্য। যেটুকু পাওয়া গিয়াছে, তাহা বর্জ্জন করা বিধেয় নহে।

বাঙ্গালার অনেক ঐতিহাসিক কাহিনী এখন অতীতের বিস্মৃতি-জালে সমাচ্ছন্ন। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে দ্বিতীয় পাল-সাম্রাজ্যের অধিপতি দ্বিতীয় মহীপালদেব বাঙ্গালার একাংশে আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। প্রথম মহীপাল-দেবের পিতা দ্বিতীয় বিগ্রহপালদেবের শাসনকালে পাল-সাম্রাজ্য কম্বোজ জাতিকর্ত্তৃক আক্রান্ত এবং পর্য্যুদস্ত হইয়া-ছিল। মহীপালদেব পিতার সামান্য অধিকারের অধিকারী হইয়া স্বীয় বাহুবলে পিতামহের অধিকৃত রাজ্যগুলি পুনধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার খাত মহীপাল দীঘি আজ সহস্র বৎসর ধরিয়া তাঁহার স্মৃতি সমুজ্জ্বল রাখিয়া আসিতেছে। মহীপালের রাজত্বকাল তাঁহার কীর্ত্তিমালায় দীপ্তিমান। ১০২৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম মহীপালদেবের জীবনান্ত ঘটে। তাঁহার পরই তদীয় পুত্র নায়পালদেব উত্তরাধিকারসূত্রে পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইঁহার রাজত্বকালে কর্ণদেব গৌড়রাজ্য আক্রমণ করিয়া তাহার কিয়দংশ অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। তৎপরে নায়পালদেবের পুত্র তৃতীয় বিগ্রহ পালদেব পুনরায় তাঁহার পৈতৃক রাজ্য অধিকৃত করিয়া লইতে সমর্থ হইয়া-ছিলেন। পালরাজগণ বৌদ্ধ ছিলেন। তবে বৌদ্ধরাজ-গণের মধ্যে প্রায় কেহই হিন্দু-বিদ্বেষী ছিলেন না। কিন্তু কাহারও কাহারও ধাতুতে গোঁড়ামির ভাগটা কিছু বেশী মাত্রায় ছিল, এবং তাহার কোন না কোন পুত্রে তাহা ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সাজাহানের প্রকৃতিতে যে গোঁড়ামী অর্দ্ধ বিকশিত অবস্থায় দেখা দিয়াছিল, ঔরঙ্গজেবের চরিত্রে তাহা পূর্ণ বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্কীর্ণতা দুর্যোধনেই প্রকাশ পাইয়াছিল। সেইরূপ তৃতীয় বিগ্রহ-পালের চরিত্রে যে ধর্ম্মান্ধতা কিয়ৎ পরিমাণ দেখা দিয়াছিল, তাহা তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিতীয় মহীপাল-দেবের প্রকৃতিতে বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়াছিল। জনশ্রুতিমতে তৃতীয় বিগ্রহপাল দেবের রাজত্বকালে বারেন্দ্রী-খণ্ডে কৈবর্ত্ত বিদ্রোহ নামে একটি বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়া-ছিল বা হইবার লক্ষণ প্রকটিত করিয়াছিল। তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় মহীপালের রাজত্বকালে এই কৈবর্ত্ত বিদ্রোহ ভীষণাকার ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার রাজ্যের একটা অতি বিস্তীর্ণ অংশ গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছিল। এই দ্বিতীয় মহীপালের রাজত্বকালের ইতিহাস প্রায় সমস্তই বিস্মৃতি কর্ত্তৃক গ্রস্ত হইয়া গিয়াছিল। ছিল কেবল কয়েকটি স্থানীয় প্রবাদ। তাহাও এত বিক্ষিপ্ত যে, তাহার উপর নির্ভর করা যায় না। স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল হইতে সন্ধ্যাকর নন্দী লিখিত 'রামচরিত'খানি উদ্ধার করিয়া না আনিলে ঐ বিস্মৃতি-তিমির-সমাচ্ছন্ন

ঐতিহাসিক ঘটনাবলির উপর কোনরূপ আলোক সম্পাত করা সম্ভব হইত না। তাহা হইলেও এই যুগের ইতিহাস এখনও অনেকাংশে অজ্ঞাত রহিয়াছে। এই সময়ের ইতিহাস যে লিখিত হয় নাই, তাহা নহে। লামা তারানাথের বৌদ্ধ ধর্ম্মের ইতিহাসের শেষভাগ পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, 'রামচরিতের' ন্যায় আরও কয়েকখানি প্রাচীন ঐতিহাসিক গ্রন্থে এই সময়ের কাহিনী বর্ণিত ছিল। মগধবাসী পণ্ডিত ক্ষেমেন্দ্র ভদ্র প্রণীত একখানি গ্রন্থে রামপালের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত সমস্ত ঐতিহাসিক ঘটনার কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে এই গ্রন্থ আজিও পাওয়া যায় নাই। শাস্ত্রী মহাশয় ১৯০০ খৃষ্টাব্দে এসিয়াটিক সোসাইটীর কার্য্যবিবরণে 'রামচরিতে'র কথা প্রথম প্রকাশ করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে এই সময়ের ইতিহাস অনেকটা অজ্ঞাত ছিল। কিন্তু 'রামচরিত' রাঘব-পাণ্ডববীরের ন্যায় একখানি দ্ব্যর্থবোধক কাব্য। ইহার প্রতি শ্লোকই এক পক্ষে দশরথাত্মজ রামচন্দ্রের কথা এবং অন্য পক্ষে তৃতীয় বিগ্রহ পালদেবের তৃতীয় পুত্র রামপাল দেবের কথা-রূপে ব্যাখ্যা করা যায়। সেইজন্য সন্ধ্যাকর নন্দী উহার একটি টীকাও লিখিয়া গিয়াছেন। মূলগ্রন্থ অপেক্ষা টীকার মূল্যই অধিক। কারণ, মূলগ্রন্থখানি 'রামপাল দেব'কে প্রশংসা করিয়া লেখা। রামপালের সহিত দাশরথি রামকে একই শ্লোকে প্রশংসা করা; সুতরাং ইহার মূল শ্লোকের ঐতিহাসিক মূল্য অধিক নাই। তবে উহার টীকায় অনেক ঐতিহাসিক কথার উল্লেখ করিয়া মূলের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। সেইজন্য ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে মূল অপেক্ষা টীকার মূল্য অনেক বেশী। রাখালবাবু তাঁহার বাঙ্গালার ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে, "মূলগ্রন্থ অপেক্ষা টীকার অক্ষর প্রাচীন বলিয়া মনে হয়।" 'রামচরিতে'র প্রথম তিন অধ্যায়ে রামপালের রাজত্বকালের ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে। ইহাতে উত্তর-বঙ্গের বা বরেন্দ্রীখণ্ডের কৈবর্ত্ত বিদ্রোহ কি কারণে উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহার কথা নাই। রামপালদেব কি ভাবে উহা কতকটা দমন করিয়াছিলেন, তাহার কথা আছে। ঐতিহাসিকের নিকটে তাহার মূল্য কম নহে।

উত্তর-বঙ্গের কৈবর্ত্ত বিদ্রোহ বাঙ্গালার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। উহা রাজশক্তির বিরুদ্ধে প্রজাশক্তির অভ্যুত্থান। তাহা কি কারণে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা বাঙ্গালী ভুলিয়া গিয়াছিল বা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিল। কেবল কতকগুলি জনশ্রুতিকে অবলম্বন করিয়া উহার ক্ষীয়মাণা স্মৃতি কোনরূপে আত্মরক্ষা করিতেছিল। 'রামচরিত' উহার উপর কিছু আলোকপাত করিয়াছে। এই কৈবর্ত্ত বিদ্রোহের দাপটে রামপাল দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া অন্যের সাহায্য ভিক্ষার জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়াছিলেন। * যে কারণে প্রজাসাধারণ বিদ্রোহী হইয়াছিল, সেই কারণের অপগম না করিলে এরূপ ব্যাপক প্রজা-বিদ্রোহের উপশান্তি করা সম্ভব হয় না। আমরা রামপাল-চরিতের টীকায় দেখিতে পাই যে, রাষ্ট্রকূটবংশীয় শিবরাজ দেব যখন গঙ্গা পার হইয়া বিদ্রোহ দমনের জন্য গিয়াছিলেন, তখন তিনি জনসাধারণকে শান্ত করিবার উদ্দেশ্যে দেব-ব্রাহ্মণাদির ভূমিরক্ষার জন্য প্রজাগণকে "ইহা কোন্ বিষয় ইহা কোন্ গ্রাম" ইত্যাদি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। † মহাপ্রতীহার শিবরাজ দেব অবশ্য বিপুল বাহিনী লইয়া গঙ্গা পার হইয়াছিলেন। তথাপি যখন তিনি জনসাধারণকে তুষ্ট করিবার জন্য ঐরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তখন বুঝিতে হইবে—প্রজাসাধারণকে তিনি এই আশ্বাস দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, অতঃপর রামপালদেব রাজা হইলে দেবতা-ব্রাহ্মণের ভূম্যাদি অপহৃত হইবে না, এবং যাহা অপহৃত হইয়াছে, তাহা প্রত্যর্পিত হইবে। জিজ্ঞাসার ঐরূপ উদ্দেশ্য না হইলে উহার কোন অর্থ হয় না। ইতিহাসে দেখা যায় যে, কৈবর্ত্তরাজ ভীমকে পরাজিত করিবার জন্য রামপাল দেবকে বহু সামন্ত এবং সপত্ন রাজার সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। কৈবর্ত্ত বিদ্রোহে প্রজাশক্তির পরাক্রম দর্শনে রামপালকে অত্যন্ত হতাশ হইতে হইয়াছিল।‡ সেই জন্যই তাঁহাকে সাহায্যলাভার্থ কিয়দ্দিন দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে হইয়াছিল।

এই তথ্য হইতে বরেন্দ্রীখণ্ডের কৈবর্ত্ত বিদ্রোহ নামক ব্যাপক প্রজাবিদ্রোহের কারণ অনেকটা অনুমান করা যায়। তৃতীয় বিগ্রহপাল দেব এবং তাঁহার পুত্র দ্বিতীয়

* রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত বাঙ্গালার ইতিহাস, ১ম ভাগ ২৮২ পৃষ্ঠা।

† রামচরিত ১।৪৮ টীকা

‡ রামচরিত ১।৪০ টীকা

মহীপালদেব দেবতা-ব্রাহ্মণাদির ভূসম্পত্তি অপহরণ করিতে আরম্ভ করেন,—বিশেষতঃ প্রজাবর্গের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করায় তাহারা বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিল। দ্বিতীয় মহীপাল যে সুনীতির পথ ছাড়িয়া কুনীতির পথ ধরিয়াছিলেন, 'রামচরিত' পাঠে তাহাও প্রতীতি হয়। তবে এই অত্যাচারের প্রকৃতি কি ও তাহার পরিমাণ কত দূর ব্যাপক হইয়াছিল, তাহা এখন আর বুঝিবার উপায় নাই। সন্ধ্যাকর নন্দী পাল-রাজবংশের অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি স্বয়ং বৌদ্ধ ছিলেন। সেই জন্য সম্ভবতঃ তৃতীয় বিগ্রহপালের এবং দ্বিতীয় মহীপালের আচরণ তাঁহার মনে তেমন বিরুদ্ধ ভাবের সঞ্চার করে নাই। তথাপি তিনি দ্বিতীয় মহীপালের দুর্নীতিজনিত কার্য্যের যথেষ্ট নিন্দা করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন, ইহাও মনে করা যাইতে পারে যে, 'রামপাল' দ্বিতীয় মহীপাল দেবের অনিষ্টকর কার্য্যের প্রতিবিধান করিয়াছিলেন বলিয়া এতই জনপ্রিয় হইয়াছিলেন যে, লোক তাঁহাকে সীতাপতি রামচন্দ্রের সহিত তুলনা করিতেও কুণ্ঠা বোধ করে নাই। বৈদ্যদেবের প্রশস্তি রচয়িতা মনোরথও ঐ উপমা ব্যবহার করিয়াছেন। * ইহাতে এইরূপ ধারণা করা যাইতে পারে যে, রাজা রামপাল অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়াছিলেন। তিনি হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়কে সমজ্ঞান করিতেন।

সন্ধ্যাকর নন্দী পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের অধিবাসী ছিলেন এবং তাঁহার পিতা প্রজাপতি নন্দী রামপালের মহাসান্ধিবিগ্রহিকের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন; সুতরাং এই বিদ্রোহের প্রকৃত অবস্থা অবগত হওয়া সন্ধ্যাকরের পক্ষে যতদূর সম্ভব ছিল, বোধ হয় আর কোন ঐতিহাসিকের পক্ষেই সেরূপ ছিল না। কিন্তু এই অবস্থায় রামপালের পক্ষপাতী হওয়াই তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক। এই সকল কারণে মনে করা যাইতে পারে যে, দ্বিতীয় মহীপাল দেবের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়াই বরেন্দ্রীখণ্ডে কৈবর্ত্ত বিদ্রোহ নামক সার্ব্বজনীন প্রজা-বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল। এই বিদ্রোহের নায়করূপে যে বাঙ্গালী-বীর দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, ইদানীং কোন কোন ঐতিহাসিক লেখক তাঁহাকে বাঙ্গালার জাতীয় বীর বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন এবং বলিতেছেন যে, ইনি চিতোরের বীর-চূড়ামণি প্রতাপের, স্কটল্যাণ্ডের জাতীয় বীর রবার্ট ব্রুসের, পোল্যাণ্ডের মহাবীর কোসিয়াস্কোর এবং ফ্রান্সের জোয়ান অব আর্কের ন্যায় এক জন জাতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত বীর। * কিন্তু এই মহাবীরের অনুষ্ঠিত কার্য্যের সকল বিবরণ এখনও আমরা জানিতে পারি নাই। সেই জন্য এই উক্তি অতিরঞ্জিত কি না, এবং অতিরঞ্জিত হইলে কতখানি অতিরঞ্জিত, তাহা জানিবার উপায় নাই। তবে উহা যে অবিশ্বাস্য, এ কথাও বলা সঙ্গত নহে। যে পুরুষশার্দ্দূল প্রথম অবস্থায় এই বিদ্রোহের পরিচালনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম দিব্য বা দিব্যোক। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক রাখাল বাবু তাঁহার বাঙ্গালার ইতিহাসের প্রথম খণ্ডে লিখিয়াছেন, "দিব্য বরেন্দ্রের কৈবর্ত্ত বিদ্রোহের অধিনায়ক। ইনি রামচরিতে দিব্বোক নামে অভিহিত হইয়াছেন। দিব্বোক বোধ হয় গৌড় অধিকার করিয়া বঙ্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং সেই সময়ে জাতবর্ম্মা তাঁহাকে পরাজিত করিয়াছিলেন। জাতবর্ম্মা যে দিব্যকে পরাজিত করিয়াছিলেন, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না; বিশেষতঃ সেই পরাজয়ের ফলে দিব্যকে কোন অধিকার ত্যাগ করিতে হইয়াছিল, এরূপ কোন প্রমাণসম্বন্ধে ইতিহাস নির্ব্বাক্।"

দিব্যোক সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যে সকল নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, আমি এই স্থানে তাহারই উল্লেখ করিব। উত্তরবঙ্গে দিনাজপুর জিলার পত্নীতলা (পেত্নীতলা?) থানায় দিব্যের গ্রাম নামে একটি গ্রাম আছে। গ্রামের মধ্যে দিব্যের দীঘি নামে একটি দীর্ঘিকা আজিও দিব্যের নাম ঘোষণা করিতেছে। গ্রাম ও জলাশয় যে দিব্যের নাম বহুকাল ধরিয়া বহন করিয়া আসিতেছে, ঐ অঞ্চলে তাহার প্রমাণের অভাব নাই। তবে ঐ গ্রামটি দিব্যের জন্মস্থান কি না, তাহা আজ পর্য্যন্ত জানিতে পারা যায় নাই। জলাশয়টি বহুকাল হইতে দিব্যের নাম বহন করিয়া আসিতেছে। ঐ জলাশয়ের মধ্যে গ্র্যানিট পাথরের একটি সুগঠিত স্তম্ভ আজিও বিদ্যমান রহিয়াছে। স্তম্ভটি কাহার দ্বারা এবং কি

* রাখাল বাবুর ইতিহাস, ১ম খণ্ড ২৯০ পৃষ্ঠা।

* Calcutta Review Vol 69 No I p 80 and 81.

উপলক্ষে প্রতিষ্ঠিত, এ পর্য্যন্ত কেহই তাহা অনুসন্ধান করেন নাই। স্তম্ভটি উচ্চতায় ৪১ ফুট, ইহার বেড় ১১ ফুট এবং ইহা অতি সুদৃশ্য। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার মৈত্র ঐ স্তম্ভটি দিব্যের স্তম্ভ হওয়াই সম্ভব বলিয়া অনুমান করেন, এবং এ বিষয়ে ঐতিহাসিকদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। গ্রামটি দিব্যের, জলাশয়টি দিব্যের, এখন ঐ জলাশয়ের মধ্যস্থিত স্তম্ভটি যে অন্য লোকের হইবে, ইহা মনে হয় না। অবশ্য ঐ স্তম্ভগাত্রে কোন লেখা পাওয়া গিয়াছে কি না তাহা আমাদের অজ্ঞাত,—'কলিকাতা রিভিউ' পত্রের লেখক সুস্পষ্টরূপে ইহার উল্লেখ করেন নাই। জলাশয়টি দিব্যের, সুতরাং জলাশয়ের মধ্যস্থ স্তম্ভটি দিব্যের এইরূপ সিদ্ধান্ত করাই স্বাভাবিক। কারণ, এক জনের জলাশয়ের মধ্যভাগে ঐরূপ বহু ব্যয়সাধ্য একটি প্রস্তরস্তম্ভ নির্ম্মাণের জন্য অন্য কাহারও আগ্রহ হইতে পারে বলিয়া মনে হয় না। ঐতিহাসিকরথিবৃন্দ কোন্ প্রমাণ-বলে উহা দিব্যোকের স্তম্ভ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—তাহা আমরা জানিতে না পারিলেও বিজ্ঞ ঐতিহাসিকদিগের সিদ্ধান্তই প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে পারি। কিন্তু কি কারণে উক্ত জলাশয়ের মধ্যে এই স্তম্ভটি নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। প্রায়ই দেখা যায় যে, স্তম্ভগাত্রে কিছু না কিছু লেখা থাকে,—ইহাতে কোন লিপি উৎকীর্ণ আছে কি না, তাহা পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দিগের সিদ্ধান্তে নির্ভর করিয়া স্থানীয় অধিবাসীবর্গ কয়েক বৎসর যাবৎ দীর্ঘিকার তীরে ঐ স্তম্ভের পার্শ্বে মহাসমারোহে দিব্যের স্মৃতি-তর্পণ করিয়া আসিতেছেন।

ইহা ভিন্ন দিব্যোক যে এক জন বিশিষ্ট সাহসী এবং যশস্বী লোক ছিলেন, তাহার নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। বর্ম্মণ রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠাতা জাতবর্ম্মদেবের পৌত্র ভোজবর্ম্মদেব-প্রদত্ত একটি তাম্রশাসন কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বিক্রমপুরের বেলাভ গ্রামে পাওয়া গিয়াছে। উহাতে প্রসঙ্গত দিব্যোকের যশ এবং শৌর্য্যের পরিচয় উৎকীর্ণ আছে। তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, তিনি বেণ রাজার পুত্র পৃথুর গৌরবের প্রতিযোগিতা দ্বারা এবং দিব্যোকের যশ ও শৌর্য্যকে পরিম্লান করিয়া স্বীয় রাজকীয় যশের ও শৌর্য্যের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। প্রশস্তিটি ভোজবর্ম্মদেবের। তাহাতে বর্ণিত হইয়াছে, যে পৃথুর নাম অনুসারে বসুন্ধরা পৃথিবী নামে খ্যাত
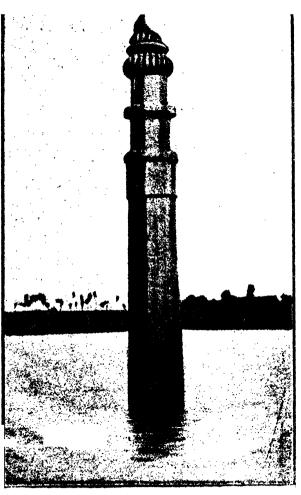
দিব্যোক্ স্তম্ভ

হইয়াছে, সেই পৃথুর গৌরবের বা মহিমার সহিত তিনি সার্থকভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছিলেন, এবং স্বীয় যশ দ্বারা দিব্যোকের যশ এবং শৌর্য্যকে পরাভূত করিয়াছিলেন। এই বর্ণনা হইতে প্রতীতি হইতেছে যে, ঐ সময় দিব্যোকের যশের এবং শৌর্য্যের খ্যাতি বিশেষ প্রবল হইয়াছিল। জাতবর্ম্মদেব তৃতীয় বিগ্রহপাল

দেবের সমকালীন লোক। সুতরাং ভোজবর্ম্মদেবের তাম্রলিপি দিব্যের রাজত্বকালের অধিক দিন পরে উৎকীর্ণ হয় নাই। তখন দিব্যের কাহিনী লোকের মনে জাগরূক ছিল। তাঁহার যশ এবং শৌর্য্যের খ্যাতি কাল-কুহেলিকায় আচ্ছন্ন হইয়া বৃহত্তর বলিয়া মনে হয় নাই। দিব্যের খ্যাতি যে অখ্যাতি বা কুখ্যাতি ছিল না, বরং সুখ্যাতিই ছিল, তাহা ভোজবর্ম্মদেবের এই প্রশস্তি হইতেই প্রতীয়মান হয়। ভোজবর্ম্মদেব দিব্যের সুখ্যাতিকে অতিক্রান্ত করিয়া অধিকতর খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার পক্ষে বিশেষ প্রশংসার কথা। সন্ধ্যাকর নন্দী দিব্যকে "উপধি-ব্রতী" অর্থাৎ কপট ধার্ম্মিক বলিয়াছেন। রাবণ যেমন রামের বীরত্বের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, সেইরূপ দিব্য রামপাল দেবের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সন্ধ্যাকর নন্দীর কাব্যখানি দ্ব্যর্থক কাব্য। উহাতে রামপাল দেবকে সীতাপতি রামচন্দ্রের সহিত তুলনা করিয়া বর্ণনা করিলে দিব্যকে রাবণের সহিত তুলনা করিয়া বর্ণনা করিতেই হইবে। সুতরাং একই শ্লোকে উভয় রামকে বুঝাইতে হইলে দিব্যকে ধার্ম্মিক বলা চলে না। এই অবস্থায় দিব্যকে রাক্ষসরাজের সমপর্য্যায়ে ফেলিতে হইলে তাঁহাকে ভণ্ড ও কপট না বলিলে ঐ কাব্য লেখাই চলিতে পারে না। এ ক্ষেত্রে কাব্যানুরোধেই তাঁহাকে সত্যকে পরিহার করিতে হইয়াছিল বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু ভোজবর্ম্মদেবের প্রশস্তি-রচয়িতার সে অসুবিধা ছিল না। তাই তিনি ভোজবর্ম্মদেবের চরম সুখ্যাতি এই বলিয়া করিয়াছেন যে, ভোজবর্ম্মা নিজ অধিকতর ভাস্বর খ্যাতি এবং শৌর্য্য দ্বারা দিব্যকের খ্যাতি এবং শৌর্য্যকে রাহুগ্রস্ত দিবাকর-দ্যুতির ন্যায় পরিম্লান করিয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং ভোজবর্ম্মদেব তথা রামপালদেবের রাজত্বকালে দিব্যের যশোভাতি যে মাধ্যন্দিন ভাস্করের ন্যায় সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব এ ক্ষেত্রে সন্ধ্যাকর নন্দীর বর্ণনা অনুসারে দিব্যকে 'উপধিব্রতী' মনে না করিয়া প্রশস্তি-কারের মতকে অধিকতর প্রামাণ্য মনে করা যাইতে পারে।

দ্বিতীয় মহীপালদেবের উৎপীড়ন-তাড়িত বরেন্দ্রীর প্রজাবর্গ উৎপীড়নের দায় হইতে নিস্তার পাইবার জন্য দিব্যকে বরেন্দ্রীর রাজা নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন। সেই হেতুই 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রের লেখক মিষ্টার অখণ্ড লিখিয়াছেন যে, দিব্য জনসাধারণের প্রতিনিধিরূপে রাজা হইয়াছিলেন। য়ুরোপীয় লেখকগণ প্রায়ই বলিয়া থাকেন যে, প্রাচ্য দেশের প্রজাগণ স্বৈর-শাসনই বুঝে, তাহারা গণ-শাসনের মর্য্যাদা বুঝে না। তাঁহাদের সে ধারণা ভুল। কারণ, দেখা যায় যে, যখনই কোন রাজা, রাজার বৈধ কর্ত্তব্য পথ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া উন্মার্গগামী হইয়াছেন, তখনই এ দেশের প্রজারাই তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়াছে। দিব্যের রাজধানীর নাম ছিল "ডমরনগর।" সন্ধ্যাকর নন্দী উহাকে উপনগর বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইহাতে নন্দী মহাশয়ের দিব্যের উপর যেন একটু বিদ্বেষ সূচিত হয়। পুরাতন প্রবাদ এবং নবাবিষ্কৃত প্রশস্তি উভয়ই এক-বাক্যে দিব্যকে ধার্ম্মিক বলিয়া যখন নির্দ্দেশ করিয়াছে, তখন তাহা অগ্রাহ্য করা যায় না। তিনি কুপথগামী, কুনীতিসেবী এবং কুকর্ম্মাশ্রয়ী বৌদ্ধ নরপালদিগের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিয়া বাঙ্গালায় প্রজাশক্তির প্রভাব দেখাইয়া দিয়াছিলেন এবং উৎপীড়িত হিন্দুরা যাহাতে নিস্তার পায়, তাহার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন,—সেজন্য তিনি বঙ্গবাসীর কৃতজ্ঞতার পাত্র।

রাজ্যলাভের পর দিব্য আর অধিক দিন জীবিত ছিলেন না। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা রুদোক গৌড়রাজ্যের বা বরেন্দ্রীর অধীশ্বর হইয়াছিলেন। রুদোক বীর ছিলেন, কিন্তু ভ্রাতার ন্যায় ধার্ম্মিক ছিলেন না। রুদোকের সহিত দ্বিতীয় সুরপালের সংগ্রাম হইয়াছিল। রুদোকও অধিক দিন জীবিত ছিলেন না। তাঁহার দেহান্তে রুদোকের পুত্র (দিব্যের ভ্রাতুষ্পুত্র) উত্তর-বঙ্গের রাজা হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় মহীপাল দেবের তৃতীয় ভ্রাতা রামপাল দেবও বারং-বার ভীমের সহিত সংগ্রাম করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। রামপাল প্রজাবৃন্দকে সুশাসন দ্বারা সন্তুষ্ট করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া তবে তাহাদের সাহায্যে কৈবর্ত্ত-রাজ ভীমকে পরাজিত এবং বন্দী করিতে সমর্থ হন। ভীম পরাজিত হইলেও কৈবর্ত্তসেনা সম্পূর্ণ ভগ্নোৎসাহ হয় নাই। তাহারা হরি নামক জনৈক অধিনায়কের নেতৃত্বাধীনে রাজা রামপালের সহিত বহুবার যুদ্ধ করিয়াছিল। অবশেষে রামপালের পুত্র রাজ্যপাল দেব বিশেষ বীরত্ব প্রকাশ পূর্ব্বক হরিকে সংগ্রামে পরাভূত করিয়াছিলেন। হরির পরাজয়ের পর দ্বিতীয়

মহীপাল দেবের ভ্রাতা রামপাল দেব সমগ্র বরেন্দ্রীতে আধিপত্য স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন। রাজা রামপাল রমাবতী নামক একটি নগরী স্থাপন এবং জগদ্দল বিহার নামক একটি বৌদ্ধবিহার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

পাল-রাজবংশের প্রবর্ত্তক গোপালদেবকে উপযুক্ত লোক মনে করিয়াই দেশের লোক তাঁহাকে গৌড়ের সিংহাসনে স্থাপিত করিয়াছিল। তাহার প্রায় সাড়ে তিন শত বৎসর পরে সেই গোপালদেবের বংশধর দ্বিতীয় মহীপাল দেব অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারী এবং দেব-দ্বিজে হিংসাপরায়ণ বলিয়া নিন্দিত হইয়াছিলেন। সেই জন্য দেশের লোকই তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার চেষ্টা করিয়া প্রায় সফলকাম হইয়াছিল, এবং রামপালকে প্রজাশক্তির প্রভাব এমনভাবে বুঝাইয়া দিয়াছিল যে, তিনি প্রজা ও সামন্তগণের দ্বারে দ্বারে ত্রুটি স্বীকার করিয়া সাহায্য ভিক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। দিব্য যদি যথেচ্ছাচারী পালরাজগণের স্বেচ্ছাচারে বীরত্বের সহিত বাধা না দিতেন, তাহা হইলে হয় ত সমস্ত উত্তর এবং মধ্য-বঙ্গ বৌদ্ধ-প্রধান হইয়া পড়িত। তিনি যদি অধিক দিন জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে হয় ত তাঁহার রাজ্যের সুব্যবস্থা করিয়া যাইতে সমর্থ হইতেন।

সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত পাঠে জানা যায় যে, দিব্য দ্বিতীয় মহীপালের এক জন অতি উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি বর্ষীয়ান্ এবং ধার্ম্মিক বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন; এরূপ অবস্থায় তিনি প্রভুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়াছিলেন কেন? ইহাতে সহজে সন্দেহ হয় যে, দ্বিতীয় মহীপালের অত্যাচারপীড়িত প্রজামণ্ডলীকে রক্ষা করিবার জন্যই তিনি ঐরূপ করিয়াছিলেন। তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া বিদ্রোহী হইলে ধার্ম্মিক বলিয়া খ্যাতিলাভ করিতে পারিতেন না। ইহাতে স্বতই অনুমিত হয় যে, মহীপাল দেবের পীড়নফলেই উত্তর-বঙ্গে কৈবর্ত্ত বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল। এই বিস্মৃত ইতিহাসের উপর অধিকতর আলোকপাত না হইলে সকল কথা ঠিক জানা সম্ভব হইবে না।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যারত্ন)।

আমার খুকু

যেদিন আমার বুকে এলো খুকু—
ঝক্কি বেড়ে গেল অনেকটুকু!
ঘরের কোনো কাজে না দিই হাত—
কোথা দে' যায় আমার দিবস-রাত!
বেলা-শেষে নিত্য সে চুল-বাঁধা,
দু'চারটে বা চপ্-কাটলেট রাঁধা,—
সকালে স্নান, দুপুরবেলায় ঘুম,
নভেল এবং গল্প-পড়ার ধুম
ঘুচে গেছে! সময় কোথা ভাই?
কখন যে নাই, কখন-বা ভাত খাই!

সারা-ক্ষণই বাঁধা খুকুর ফাঁদে,
দুধ তোলে ওই—কখন বা সে কাঁদে!
কাঁথা-কানি ঘেঁটে সময় কাটে,—
শুকোলো কি? সূয্যি বসে পাটে!
কাজল-নাতা? কালমেঘ কৈ? মধু?
অয়েল-ক্লথটা দে না ভাই রামসদু!
এ-ঘর ছাড়ি, উপায় নাহি তার,—
ভুলেছি সিনেমা-থিয়েটার।
ঘুম ভুলেছি—ঘুম সে-আরামের।
খুকুর কাজের মেটে না আর জের!

ওঁর কাছে গে' বসবো ক্ষণেক-তরে,
হাসি-আদর নেবো বুকে ভরে'!
এমন খুকু, আয় না তারো ছুটি!
ওকে নিয়ে কেবল হুটোপুটি!
হাঁচে-কাশে, আমার পরাণ দোলে!
ভাবনা যাবে খুকু ডাগর হোলে!
কদ্দিনে যে ডাগর হবে খুকু—
ঘুচ্‌বে আমার মনের ধুকুপুকু!
খুকু আমার সব নিয়েছে কেড়ে—
খুকুর লাগি ওঁকেও আছি ছেড়ে!

তবু আমার খুকুর পানে চেয়ে
কি-সুখে যে মনটা ওঠে ছেয়ে!
হারাই ভুবন—দুঃখ তাতে নাই!
বুকে খুকু—বিশ্ব-ভুবন পাই।

শ্রীমতী লতিকা দেবী।

অচল টাকা

বাড়ীর ভিতরকার দাওয়ায় এদিক্ হইতে ওদিক্ পর্য্যন্ত ক্ষিতীশ একা পায়চারি করিতেছিল। স্ত্রী বা ছেলে-মেয়েদের কেহই এখনও জাগে নাই। ভোরের ধূসরতার এক কোণে খানিকটা তরল সোণালী লাগিয়াছে, বুঝি বা তাহাতেই উৎফুল্ল হইয়া দূরে একটা পাখী আকাশ কাঁপাইয়া চীৎকার করিতেছে। এক দিন ছিল, যে দিন পাখীর ঐ উচ্ছ্বসিত কাকলীর সঙ্গে সুর মিলাইয়া তাহার অন্তর পুলক-চঞ্চল হইয়া উঠিত; কিন্তু আজ মনে হইতেছে, বিশ্বের সমস্ত সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে ঐ পাখীটার কণ্ঠরোধ করিতে পারিলেই যেন এই বিচিত্র সৃষ্টির সামঞ্জস্য বজায় থাকে।

ঘুম-জড়িত চোখে বাহিরে আসিয়া অশোকা বলিল,—"মা গো, এতখানি বেলা হ'য়ে গেছে, আর তুমি আমায় ডেকে দাও নি!"

ক্ষিতীশ জবাব দিল, "ইচ্ছে ক'রেই দিই নি। আরো একটু বরং নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমুলে পারতে।"

কথাটার তাৎপর্য্য অশোকা ঠিক বুঝিল না, বুঝিবার জন্য কোন আগ্রহও প্রকাশ করিল না। কোন কথা না বলিয়া সে মুখে-হাতে জল দিয়া গৃহকর্ম্মে মন দিল। রান্নাঘর ধোয়া ও নিকানো শেষ করিয়া যখন সে ঘুঁটে ও কয়লার ঝুড়ি তুলিতেছে, সেই সময় ক্ষিতীশ বলিল,—"মিথ্যে ও-গুলোকে নষ্ট করছো। আজ হাতে এমন একটা—হ্যাঁ, সত্যিই যাকে একটিও পয়সা না থাকা বলে—সেই অবস্থাই আজ আমার হ'য়েছে। আজ একেবারেই নিঃস্ব আমি। সেইটে ভেবে কায করা ভালো।"

অশোকা হাঁ করিয়া স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া বলিল,—"ও মা, কিছু না হবে তো কাল যে তোমায় দশবার বলেছি, আমার হাত একেবারে খালি হ'য়ে গেছে। তুমি বল্লে, আচ্ছা, সে যোগাড় করা যাবে।"

ক্ষিতীশ বলিল,—"যখন বলেছিলুম, তখন নিশ্চয়ই আশা ছিল, কিন্তু—"

—"বেশ—" বলিয়া অশোকা মুখখানাকে ভারী করিয়া রান্নাঘরে চলিয়া গেল এবং একটু পরেই ক্ষিতীশ দেখিল, ছোট জানালা ও ঘুলঘুলি দিয়া তাল-তাল ধোঁয়া বাহিরে আসিতেছে।

ঘরের ভিতর হইতেই অশোকা উঁচু গলায় যেন আপনার মনেই বলিল,—"ঘরে যে ক'টা চাল আছে, ছুটো ফ্যানে-ভাতে চড়িয়ে দিতে তো হবে! ছেলেগুলোকে তো উপোস্ রাখ্‌তে পার্‌বো না!"

ক্ষিতীশ শুষ্ক হাসি টানিয়া বলিল,—"উপোস করাটা কারু পক্ষে আরামের ব্যাপার নয়; না ছেলেদের, না তাদের বাপ-মায়ের। কিন্তু, নিরুপায়ের ওপর কোনো জোরই খাটে না যে!"

উনুন ধরাইয়া যথারীতি চা তৈরী করিয়া এক-কাপ স্বামীর হাতে দিয়া অশোকা অত্যন্ত নরম সুরে বলিল, "হ্যাঁ গা, তা অমরবাবু তো তোমার খুব বন্ধু! সময়ে-অসময়ে কতবার তো দিয়েছেনও। তাঁর কাছে একবার গেলে না কেন?"

পেয়ালায় চুমুক দিয়া ক্ষিতীশ বলিল, "সে-রাস্তাও বন্ধ হ'য়ে গেছে বোধ হয় চিরদিনের জন্যেই। শেষ মাসের এই ক'টা দিনের জন্যে আমি চেয়েছিলুম পাঁচটা টাকা, সে দেবেও বলেছিল। কিন্তু, কাল এই পথ দিয়ে যেতে-যেতে সেই কাবুলীটাকে আমার দরজার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে দেখে নিশ্চয় তার মাথা ঘুরে গেছে। তার ফলে বিকেলে ছ'বার তার বাড়ী গিয়ে দেখা পেলুম না, শেষবার দেখা যদি বা পেলুম, টাকা পেলুম না। সে বল্লে, আর্থিক অবস্থা তার হঠাৎ এত বেশী খারাপ হ'য়ে পড়েছে যে, কহতব্য নয়, ইত্যাদি।"

হতাশার ভিতর হইতেও এক ধরণের উৎসাহের ভাব জাগে। তেমনই উৎসাহের সুর টানিয়া অশোকা বলিল, —"নাই বা দিলে গো! ওরা না দিলে দিন কি আর আমাদের চল্‌বে না?"

ক্ষিতীশ নীরবে চায়ে চুমুক দিতে দিতে হঠাৎ হাসিয়া

বলিল,—"তা, চা-পর্ব্বটা তো চল্‌লো এক রকম। ঘরে চাল পর্য্যন্ত আছে শুন্‌ছি, কিন্তু তার পর? ডাল, তেল, বাজার, ছেলেদের এটা-সেটা, সেগুলো কোত্থেকে চল্‌বে?"

শোবার ঘরের ভিতর হইতে অশোকা বলিল, "ওগো আমার বাক্সে অনেক দিনের একটা টাকা পড়ে আছে।"

—"টাকা?"

ক্ষিতীশ যেন আনন্দে লাফাইয়া উঠিল।

ঘরের ভিতরে টাকা-বাজানোর শব্দ হইল। সঙ্গে সঙ্গে অশোকা বলিল,—"ও হরি! এ আবার অচল যে!"

ক্ষিতীশ কাছে আসিয়া টাকাটা তুলিয়া লইয়া বলিল, —"একেবারে অচল না কি? তাই তো! ধারের চিড়্‌চিড়ে-গুলো পোঁছা। আওয়াজটাও ঢ্যাব্‌ঢেবে। তাই তো ভাবি, অচল না হ'লে আমার ঘরে গোটা একটা টাকা এত দিন অ-চল হ'য়ে ব'সে আছে? দেখ, দেখ, আর কোথাও কিছু নেই তোমার?"

অশোকা মুখভার করিয়া বলিল,—"আবার কোথায় কি থাক্‌বে? কোনো দিন আমায় কিছু দাও কি না?"

ক্ষিতীশ তখনও ঘুরাইয়া ফিরাইয়া টাকাটা পরীক্ষা করিতেছিল। অনেকক্ষণ পরে হঠাৎ সে বলিল, "আচ্ছা, একবার দেখি, যদি চালাতে পারি!"

বলিয়া সে দেয়ালে পেরেকে টাঙ্গানো চটের ছোট থলিটা নামাইয়া লইল।

ঘরের ভিতর হইতে অশোকা হাঁকিয়া বলিল,—"চাল বোধ হয় দুটি কম হবে গো। কিছু বেশী করে এনো, ভিখিরি এলে একমুঠো দিতে কুলোবে না।"

ক্ষিতীশ মনে-মনে হাসিয়া চটি পায়ে দিয়া রাস্তায় নামিতে যাইবে, এমন সময় পাঁচ বছরের মেয়েটি কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া বাপের জামাটা চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "আমার সেই ঘাড়-নড়া পুতুলটা, বাবা! রোজই তুমি বল, এনে দেবে, আজ কিন্তু আমার চাই, হ্যাঁ।"

ক্ষিতীশ মুহূর্ত্তমাত্র স্তব্ধের মত দাঁড়াইয়া মেয়ের চিবুক ধরিয়া কলের পুতুলের মতই ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "আচ্ছা।"

রাস্তায় চেনা-অচেনা বহু লোক তাহারই মত বাজারে চলিয়াছে। কিন্তু, উহারা সত্যই বাজার করিয়া ফিরিবে, আর সে ফিরিবে শূন্য থলিটি লইয়া, টাকাটা কোন রকমেই চলিতে পারে না, খুব সম্ভব মেকী এটা, তবু জানিয়া—বুঝিয়া এমন করিয়া বাজারে যাওয়ার কি অর্থ থাকিতে পারে? জানিয়া বুঝিয়া মেকী টাকা চালাইতে যাওয়া আইনতঃ গুরুতর অপরাধ, কিন্তু তদপেক্ষা বেশী অপরাধ যে, তাহার মত অক্ষম লোকের পক্ষে আরও কতকগুলি নিরীহ প্রাণীর ভার মাথায় তুলিয়া লওয়া, এ-কথাটা কয় জনই বা বুঝিবে?

খানিকটা পথ আসিয়া তাহার মনে হইল, নাঃ, বাড়ী ফিরিয়া যাওয়াই বরং ভালো। ভিতরের এই একান্ত কুৎসিত রিক্ততাটা লোকের চোখে নগ্ন করিয়া ধরিতে যাওয়ার কোনো প্রয়োজনই তো নাই। জিনিষ কিনিবার পর টাকাটা চলিল না বলিয়া জিনিষ ফিরাইয়া দিয়া চলিয়া আসার মত কুৎসিত লজ্জার ব্যাপার আর কি আছে? বরং উপবাস করা ঢের ভালো। কাল রাত্রে অমরের কাছে ঘণ্টা দুই ধর্না দিবার পরও যখন ব্যর্থ হইয়া ফিরিতে হইল, তখন তো এই সঙ্কল্পটাই সে মনে-মনে অটুট করিয়াছিল,—হ্যাঁ, উপবাসই সে করিবে। এক দিন উপবাসে মানুষ মরে না। আর মরিলেও লাভ বই এতটুকু ক্ষতি নাই তো!

অথচ, আজ রাত্রিশেষেই এ কি করিতে চলিয়াছে? কি দুর্ব্বল আর অনিশ্চিত মানুষের মন! ছোট মেয়েটা যখন পুতুলের আবদার ধরিল, তখন তাহার বেয়াদবীর জন্য গালে জোরে একটা চড় বসাইয়া দিয়া চলিয়া আসাই উচিত ছিল, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহাকে চিবুক ধরিয়া আদর না করিয়া তো পারিল না!

যেন অনেকটা নিশ্চেতন অবস্থাতেই সে পথ চলিতে ছিল। এক সময় একটা সরু গলির ভিতর ঠেলাঠেলিতে সম্বিৎ ফিরিয়া পাইয়া দেখিল, ইতিমধ্যেই কখন সে বাজারের ভিতরে আসিয়া পড়িয়াছে। যেন জোরে ঝাঁকানি দিয়া নিজের মনকে খানিকটা সজাগ করিয়া লইয়া সে একটা তরকারীর দোকানের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

দোকানী অপর এক জন খরিদ্দারকে জিনিষ দিতে দিতেই তাহাকে বলিল, "আসুন বাবু, আসুন, কি দোব বলুন তো?"

ক্ষিতীশ বলিল, "এক সের আলু দাও, আর পটোল—"

আলু ওজন করিয়া দোকানী ক্ষিতীশের থলিতে

গালিয়া দিল ও ক্ষিতীশ কিছু বলিবার আগেই কতকগুলি পটল দাঁড়িতে চাপাইয়া বলিল, "পটোল কত বলুন দেখি? আধ সের?"

ক্ষিতীশ বলিল, "আচ্ছা, পটোল এখন থাক্। আগে তুমি টাকাটার ভাঙ্গানী দাও।"

দোকানী টাকাটা হাতে লইয়া চটের থলির তলায় রাখিতে যাইতেছিল, হঠাৎ থামিয়া এক মুহূর্ত্ত টাকাটা ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া বলিল, "টাকাটা বদলে দিন্, বাবু।"

ক্ষিতীশ রুদ্ধনিশ্বাসে বলিল, "কেন হে, কি খারাপ হ'লো?" বলিতে বলিতে টাকাটা হাতে লইয়া যেন এই সর্ব্বপ্রথম টাকার চেহারাটার প্রতি নজর পড়িল, এমনই ভাব দেখাইয়া বলিল, "এই যাঃ! কর্‌লে তো? আর তো আমি কিছু সঙ্গে আনিনি! তা'হ'লে আবার দেখছি, বাড়ী ফিরে যেতে হয়—"

দোকানী একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "আর কিছু নেই না কি আপনার কাছে? তবে আর কি হবে, কালই তা'হ'লে মনে করে দিয়ে যাবেন যেন। তা'হ'লে আলু হ'লো এক সের, আর কি চাই বলুন। পটোল, বেগুন, একটা টাট্‌কা দার্জ্জিলিঙের ফুলকপি দেব কি?"

"না, তুমি শুধু কিছু পটোল আর বেগুন আধসের ক'রেই দাও।"

দোকানী পটোল ও বেগুন ওজন করিয়া ক্ষিতীশের থলিতে ঢালিয়া দিল এবং অপর ক্রেতার দিকে মন দিবার আগে শুধু বলিল, "দশ পয়সা হ'ল, কাল দয়া করে দিয়ে যাবেন যেন—"

"নিশ্চয়! সে কথা আবার বলতে হয় হে!"

সেখান হইতে খানিকটা ফাঁকা জায়গায় সরিয়া আসিয়া ক্ষিতীশ লম্বা নিশ্বাস ছাড়িল। এক দিকে যেমন তাহার মন কুণ্ঠায়—গ্লানিতে কালো হইয়া উঠিতে লাগিল, অপর দিকে আবার একটা অনির্ব্বচনীয় স্বস্তির অনুভূতি অনেকখানি নিশ্চিন্ত আরামের ভাব আনিয়া দিল। তাহার পাশের সেই লোকটা কেমন এক রকম করিয়া তাহার পানে তাকাইতেছিল। কে জানে, কিছু বুঝিল কি না! বুঝুক্, উপায় নাই। সমস্যাটার কিন্তু চমৎকার মীমাংসা হইয়া গেল! টাকাটা পুরাপুরি অক্ষত রহিল, অথচ, সংসারের অর্দ্ধেক চাহিদা মিটিয়া গেল।

পরিচিত একটা গোলদারী দোকানে আসিয়া সে চাল, ডাল ও চিনির ফরমাস্ দিল এবং টাকাটা দোকানীর বাক্সের উপর ফেলিয়া দিল। পাশের একটা বাট্‌খারায় লাগিয়া টাকাটা যে শব্দ তুলিল, তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া দোকানী মুহূর্ত্তমাত্র তাহার দিকে চাহিয়াই বলিল, "টাকাটা বদ্‌লে দিতে হবে, বাবু!"

ক্ষিতীশের মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল, "কেন হে? কি অপরাধ হ'লো টাকাটার?"

দোকানীও বেশ ভারিক্কী মেজাজে জবাব দিল, "অপরাধ একটু আছে বই কি, বাবু! এ টাকা চালাতে গেলে আমাদের জেল খাটতে হবে।"

ক্ষিতীশ ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিল, "সত্যি না কি? তবে কায নেই আর জেল খেটে। দাও—"

টাকাটা তুলিয়া লইয়া সে রাস্তায় নামিয়া পড়িল। মনে হইল, আর নয়, এইবার সোজাসুজি বাড়ী যাওয়া যাক্। এবং এই অভিশপ্ত টাকাটা আর ঐ ভালোমানুষ তরকারীওয়ালাকে ঠকাইয়া যে তরকারীগুলো কিনিয়াছে, সব এই রাস্তার ধারে ঢালিয়া দিয়া যেমন রিক্ত হস্তে বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছিল, তেমনই রিক্ত অবস্থাতেই ফিরিয়া যাওয়া উচিত। এই টাকাটা যদি হঠাৎ আজ আত্মপ্রকাশ না করিত, তাহা হইলে তো এত ব্যাপার ঘটিত না! ঐ দোকানদার যে জেলে যাওয়ার কথাটা বলিল, ওটা নিশ্চয় তাহাকেই উদ্দেশ করিয়া। ইংরেজীতে যাহাকে বলে transferred epithet, অনেকটা তাই আর কি!

রাস্তার ওদিকে একটা বড় গোলদারী দোকান নূতন খুলিয়াছে। ক্ষিতীশ সেটা পার হইয়া চলিয়া গিয়া আবার কি ভাবিয়া ফিরিয়া আসিল এবং সোজা সেখানে আসিয়া ঢুকিল। নূতন দোকান, দোকানী অতিরিক্ত খাতির করিয়া তাহার অভ্যর্থনা করিল। তাহার কথা মত সব জিনিষ দেওয়া হইলে পর ক্ষিতীশ অত্যন্ত অন্যমনস্কতার ভাণ করিয়া টাকাটা দোকানীর হাতে দিল এবং বাজারের থলিটার দিকে হঠাৎ অকারণেই মনোযোগী হইয়া পড়িল।

দোকানদার যখন বলিল, "বাবু, এই টাকাটা—" ক্ষিতীশ তখন যেন চকিত হইয়া বলিল, "এ্যাঁ, কি হ'লো টাকাটার? খারাপ না কি? এই সেরেছে! আমার কাছে যে আর—"

দোকানদার তাহার মুখের কথাটা কাড়িয়া লইয়া বলিল, "আজ্ঞে, তাতে আর হ'য়েছে কি? জিনিষ নিয়ে যান্ না, দামটা কাল-পরশু যখন এদিকে আস্বেন, দিয়ে যাবেন! আপনাদের মত ভদ্রলোকের কথাই আমাদের কাছে লক্ষ টাকা, আর ঐ তো হচ্ছে আমাদের ব্যবসার মূলধন! আর এক কায করতে পারেন, টাকাটা না-হয় আমার কাছেই থাক্। যা আপনি বলবেন—"

"তাই থাক্"—বলিয়া ক্ষিতীশ মস্ত বড় একটা আরামের নিশ্বাস নিরুদ্ধ করিতে করিতে রাস্তায় নামিয়া পড়িল।

বাড়ীতে আসিয়া ক্ষিতীশ যখন বাজারের থলি ও জিনিষগুলি স্ত্রীর কাছে নামাইয়া দিল, তখন তাহার মনে হইতেছিল, এইমাত্র সে একটা অসাধ্য সাধন করিয়া আসিয়াছে। তাহার স্ত্রীর চোখে-মুখে যে হাসিটুকু ফুটিয়াছিল, ক্ষিতীশের মনে হইল, সে-হাসিতে বেশ একটুখানি গৌরবের দীপ্তি রহিয়াছে। সে-হাসিতে তাহার নিজের মনের গ্লানি যেন আরও অনেকখানি বাড়িয়া গেল।

বাড়ীর পিছনেই খানিকটা খোলা জায়গায় অযত্ন-রক্ষিত একটু বাগান। একধারে কয়েকটা বেলা, জুঁই, ক্রিসেন্থিমাম, দোপাটী অত্যন্ত এলোমেলো ভাবে বসানো। তাহারই গা ঘেঁসিয়া লাউ-কুমড়া গাছ লতাইয়া ছাতে উঠিয়াছে, এবং উহার দক্ষিণেই একটা পেয়ারা গাছের তলায় কতকগুলি খড়ের আটি জড় করিয়া রাখা।

বাড়ীর ভিতর হইতে এই জায়গাটায় আসিয়া ক্ষিতীশ যেন খানিকটা স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িল। সঙ্গে-সঙ্গে কত কথাই এলোমেলো ভাবে মনের ভিতর ভিড় করিয়া আসিতে লাগিল।

সামান্য মাহিনার কেরাণীগিরিই সংসারের ভিত্তি। অভাব-অনটন লাগিয়াই আছে। কিন্তু আজকার মত অবস্থা তাহার কোন দিন হয় নাই। হাতে টাকা না থাকিলে যেখান হইতে হউক দু' পাঁচ টাকা কর্জ্জ করিয়া—কখনও বা হাতের অবশিষ্ট অর্থকেই প্রাণপণে আঁকড়াইয়া ধরিয়া মাসের শেষের এই অত্যন্ত শ্লথ দিনগুলিকে ঠেলিয়া-ঠেলিয়া অতীত করিয়া দিয়াছে। কিন্তু এমন অবস্থায় পড়িতে তো কোন দিন হয় নাই? আজ সকালেও যদি সে কর্জ্জের চেষ্টায় বাহির হইত, তাহা হইলেও হয় তো দুই-একটা টাকা মিলিতে পারিত। কিন্তু কাল তাহার ধনী বন্ধু অমরের ব্যবহারের পর সে আর বন্ধু-বান্ধব কাহারও কাছে হাত পাতিবে না বলিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল। সে প্রতিজ্ঞাটাকে রাত্রিশেষেই এমন করিয়া বিসর্জ্জন দিবার একেবারেই প্রবৃত্তি হইল না।

না, ও প্রতিজ্ঞা সে কখনও ভাঙ্গিবে না। ফল যাহা হয় হউক, শেষ পর্য্যন্ত সে একবার দেখিবে, দিন সত্যই কাটে কি না?

বাড়ীর ভিতর হইতে অশোকা আসিয়া বলিল,—"হাঁ গা, তা ছেলেদের খাবারটা অমনি নিয়ে এলে না! আবার কতবার যাবে?"

ক্ষিতীশ নিস্পৃহভাবে জবাব দিল,—"আবার যে যাবো, তা কে-ই বা বললে?"

—"তবে?"

—"তবে আবার কি? কেন মিছে ভেবে সারা হচ্ছো! চুপ্‌চাপ্ হাত গুটিয়ে বসে থাকো দেখি, দেখ্‌বে, বেলা ঠিক বেড়ে চলেছে, সূর্য্যদেব ঠিক পশ্চিমে ঢলে প'ড়েছেন, এবং সন্ধ্যার পর রাত্রিও এসেছে। অর্থাৎ মাসের ২৫শে তারিখটাও কেটে গেছে এক রকম ক'রে।"

অশোকা বলিল,—"তোমার মাথা খারাপ হ'তে আর দেরী নেই। সূর্য্যদেবের না খেলে চলে, কিন্তু মানুষের চলে না। তোমার চললেও আমার ছেলেদের চল্‌বে না।"

ক্ষিতীশ মুখের একটা অদ্ভুত ভঙ্গী করিয়া বলিল,—"চলবে না বুঝি? আহা! কিন্তু, ঐ 'আহা' ছাড়া আর আমার কোনো উপায় নেই, তা বলে রাখ্‌ছি! অচল টাকাটাও দোকানী-ব্যাটা নিয়ে রেখেছে। লোকটা আস্ত ঘুঘু। যাও, নিজের কায করো গে। আমার আপিসের বেলা হচ্ছে।"

ক্ষিতীশ যথাসময়ে আপিসে গেল। যাইবার সময় বেশ খানিকটা শাসনের সুর ঢালিয়া বলিল,—"আজ যে বাজার হ'য়েছে, তাতেই কাল পর্য্যন্ত চলা চাই, তা বলে' রাখ্‌ছি!"

অশোকা 'হাঁ—না' কোন কথাই বলিল না। স্বামীর কথার ধরণে সে একেবারে স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। রাগ মাত্রা ছাপাইয়া গেলে মানুষ কখনও হিতাহিত জ্ঞান হারাইয়া বসে,

কখনও বা পাষাণের মত নিশ্চল হইয়া পড়ে, কোন আঘাতেই সে প্রতিঘাত করে না। অশোকার আজ সেই অবস্থা।

ছেলেদের খাওয়াইয়া দিয়া সে রান্নাঘরে শিকল তুলিয়া শোবার ঘরে আসিয়া শুইয়া পড়িল। অনেকক্ষণ আগেই সে মনে মনে ঠিক করিয়া ফেলিয়াছিল, আজ সে খাইবে না। স্বামী কথায় কথায় বলে, না খাইলে মানুষ মরে না সে-ও দেখাইবে, না খাইয়া না মরিয়া সে সংসারের বোঝা টানিতে পারে কি না।

শুইয়া শুইয়া সে ভাবিতে লাগিল, গরীব হওয়াতে কাহারও নিজের কোন হাত নাই। কিন্তু নিজের অকর্ম্মণ্যতার দায়িত্ব স্ত্রীদের মাথায় চাপাইয়া দেওয়া স্বামীদের কত বড় অন্যায়, আর কতখানি স্বার্থপরতা! মেয়েদের এমন করিয়া অকর্ম্মণ্য করিয়া তৈরী করার জন্য দায়ী তো ভগবান নন, অভিভাবক পুরুষের দলই তো বেশী দায়ী। ছেলেবেলা হইতে বাপেরা কেন মেয়েদের এমন করিয়া গড়িয়া তোলেন না, যাহাতে স্বামীর সংসারে এভাবে বোঝা হইয়া না থাকিয়া সত্য-সত্যই ইহারা একটা সবল অবলম্বন হইয়া দাঁড়াইতে পারে! স্বামীরাও কেন সে শিক্ষা দেয় না স্ত্রীদের? সেজন্য স্বামীরাই দায়ী নহে কি?

ছোট মেয়ে টুনী মায়ের চিবুক ধরিয়া দেয়ালের দিকে ফিরাইয়া দিয়া বলিল, "দেখ্‌ছো, মা, তোমার আদুরে ছেলের কাণ্ডখানা!"

কাণ্ড এমন কিছুই নয়, দু'বছরের ছেলে মণ্ট দেয়ালে টাঙ্গানো ক্যালেণ্ডারখানা অনেকবার টানিয়া টানিয়া খুলিতে না পারিয়া শেষে তাহার পাতা ছিঁড়িতে সুরু করিয়াছিল। মায়ের চোখ সেদিকে পড়িতে ছেলে দু'হাতে দুখানা ছেঁড়া কাগজ লইয়া খিল খিল করিয়া হাসিতে লাগিল। মা ক্লান্ত বিরক্তির সহিত বলিল, "মরুক্‌ গে হতভাগা ছেলে, আমি আর পারি নে!"

নিরুপায় টুনী তখন মণ্টুর সহিত আপোষের চেষ্টায় বলিল,—"আমায় একখানা দে, ভাই!"

মণ্টু অমনই আর একখানা পাতা ছিঁড়িয়া দিদির হাতে দিল।

অশোকা এবার অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল,—"মেরে গুঁড়িয়ে না দিলে তোদের হবে না, না? কেন মরছো ওটাকে ছিঁড়ে?"

টুনু ভালমানুষ। শুষ্কমুখে সরিয়া আসিয়া হাতের কাগজখানা মায়ের হাতে দিল।

তাহার ভয় চকিত মুখের পানে চাহিয়া অশোকার রাগ পড়িয়া গেল। কাগজটা লইয়া বলিল, "আয় টুনু তোকে ফানুস্‌ ক'রে দিই।"

তৎক্ষণাৎ মণ্ট, ও পল্টু দু'জনে আসিয়া মায়ের পিঠের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল, "আমাদেরও ফানুস্‌ করে দাও, মা!"

"আচ্ছা, রাখ্‌ সব আমার কাছে।"

কাগজগুলি ছেলেমেয়ের হাত হইতে লইয়া গুছাইয়া রাখিতে গিয়া এতক্ষণে যেন অশোকার খেয়াল হইল। মা গো, ক্যালেণ্ডারখানা ছিঁড়িয়া একবারে তছ্‌নছ্‌ করিয়াছে। মোটে আজ মাসের ২৫শে তারিখ। কিন্তু ইহার পরের কতগুলি পাতা ইহারা ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে। দেয়ালের গায়ে মস্ত বড় ইংরেজী অক্ষরে 'এক' লেখা রহিয়াছে।

নিজের মনে মনে অশোকা না হাসিয়া পারিল না। আশ্চর্য্য! এখনো মাসের পাঁচ দিন বাকী, আর ইহারা কি না মাসকাবার করিয়া পয়লা তারিখটাকে টানিয়া বাহির করিয়াছে! একটা অবরুদ্ধ নিশ্বাস অশোকার বুকের ভিতর ঘুরিয়া ঘুরিয়া গুমরাইতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে মাথার ভিতর কি যে অসম্ভব কল্পনা রঙের জাল বুনিতে সুরু করিল! সত্য-সত্যই যদি মাসের শেষের এই কয়টা দিন না থাকিত, কিম্বা থাকিলেও এমনই করিয়া যথেচ্ছায় তাহাদিগকে পার করিয়া দিয়া নূতন মাসটিকে পরমানন্দে অভিনন্দন করা চলিত!

মাথার ভিতরটা কেমন ঝিম্‌ ঝিম্‌ করিতে লাগিল। আরও পাঁচ দিনের পরে যে তারিখটির শুভাগমন হইবে, তাহাকে ঐ চোখের সাম্‌নে দেখিয়া তাহার মনে হইল, সে যেন স্বপ্নই দেখিতেছে! কি ভাস্বর স্নিগ্ধতা ঐ অক্ষরটিতে। কৃষ্ণপক্ষের শেষ দিনগুলির ও-পারে উহা যেন তৃতীয়ার শীর্ণ চাঁদখানি। শীর্ণ বটে, কিন্তু তাহারই সুনিশ্চিত সম্ভাবনায় সে চির গরিমাময়!

মিথ্যা যদি কোন রকমে সত্য হইতে পারিত, তাহা হইলে ক্ষিতীশকে সেদিন খালি-হাতে বাড়ী ফিরিতে হইত

না। একেবারে অনেকগুলি টাকা লইয়া সে আজ বাড়ী ফিরিত। কিন্তু মিথ্যা—মিথ্যাই রহিয়া গেল। কাগজে-লেখা তারিখটা ছিঁড়িয়া নিশ্চিহ্ন করিলে কি হয়, দিনের গতি ঠিক সেই কুৎসিত কচ্ছপের গতিতেই চলিল।

সুতরাং ক্ষিতীশ রিক্ত হস্তেই বাড়ী ফিরিল। বারম্বার তাহার মনে হইতেছিল, কাল তবু ঘরে অচল টাকাটাও ছিল, আজ সে একেবারেই নিঃসম্বল!

আপিসে কায করিতে করিতে অনেকবার ইতস্ততঃ করিয়া শেষে এক সময় সঙ্কল্প করিয়াছিল, পাশের সহ-কর্ম্মীটির নিকট অন্ততঃ গোটা দুই টাকা হাওলাৎ চাহিবে। উহার অবস্থা তো ভালই, অন্ততঃ তাহার নিজের তুলনায় অনেক ভালো তো বটেই। পাশের লোকটি কতকগুলি কাগজপত্রে কি সব লিখিতেছিল, তাহার লেখা শেষ হইলেই কথাটা পাড়িবে বলিয়া ক্ষিতীশ উন্মুখ হইয়া বসিয়াছিল। সহকর্ম্মী কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া তাহাকে বলিল, "আচ্ছা, ক্ষিতীশবাবু, বল্‌তে পারো, ভি-পি ক'দিন পর্য্যন্ত ফেলে রাখে?"

ক্ষিতীশ প্রথমটা বেশ একটু হতবুদ্ধি হইয়া পরে জবাব দিল, "৭ দিন। কেন বলুন্ তো?"

"আর বলো কেন, ভাই? ম্যাড্রাস্ থেকে খানিকটা সিল্কের ভি-পি আজ ৫ দিন হ'ল এসেছে। তা, এমনি অবস্থা হ'য়েছে যে, ওটা আর ছাড়াতে পার্‌ছি নে!"

একটা গভীর দীর্ঘশ্বাসকে বুকের ভিতর মথিত করিয়া ক্ষিতীশ নিজের খাতাটার চোখ নামাইয়া লইল। মনে মনে সে বলিল,—উহার সিল্ক কিনিবার টাকা নাই, ওই তো ওর মর্ম্মান্তিক দুঃখ, আর আমার……কিম্বা, হয় তো অভাবের বোধটুকু দু'জনেরই সমান!

নিজের মনেই সে যেন একটা স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিল। যাক্, চাহিয়া না পাওয়ার নিদারুণ লজ্জার হাত হইতে সে বাঁচিয়া গেল। হ্যাঁ, প্রাণ যায় যাক্, মানটা বাঁচাইতেই হইবে। মানব-সভ্যতার ইহাই তো চরম কথা!

পরের দিন সকালে ক্ষিতীশ বিছানায় পড়িয়া পড়িয়া ভাবিতেছিল, মাসের ২৫শে তারিখটা কাটিল বটে, কিন্তু ভোরের ঐ নিষ্কলুষ আলোর মুখোস্ পরিয়া যে দিনটি জন্মগ্রহণ করিল, তাহার চেহারা আরও কুৎসিত, আরও ভয়ঙ্কর। আজ তাহার নিঃস্বতার মধ্যে কোথাও এতটুকু খাদ পর্য্যন্ত নাই। অশোকা কখন উঠিয়া গিয়াছে, কি যে করিতেছে, কে জানে! জানিবার সাহসটুকু পর্য্যন্ত ক্ষিতীশের নাই।

ছেলেরা তখনও ঘুমাইতেছে। তাহারা জাগিয়া উঠার সঙ্গে সঙ্গে কি যে হইবে, ক্ষিতীশ কল্পনাও করিতে পারিল না।

সে ধীরে ধীরে যেন অনেকটা সন্তর্পণে বিছানা হইতে উঠিয়া মুখে হাতে জল দিয়া কাহাকেও একটি কথাও না বলিয়া চটী পায়ে দিয়া বরাবর রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল।

বাহিরে সুন্দর পৃথিবী তাহাকে যেন হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে, রাস্তার দুধারের দেবদারু গাছগুলিতে কচি-পাতার বিজয়-নিশান উড়িতেছে। ও-দিকের শিরীষ গাছটাতে ঝুম্‌কো ফুলের সমারোহ লাগিয়াছে। ক্ষিতীশের মনে হইল,—কিছু না, কিছু না, সত্যই কিছু না। পৃথিবীর অন্তরের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে আনন্দের যে ঝরণাধারা বহিতেছে, তাহার কাছে তাহার নিজের অত্যন্ত তুচ্ছ দুঃখদৈন্যের কোন স্থানই নাই! স্বার্থপরতার গণ্ডী ছাড়াইয়া একবার এখানে আসিয়া দাঁড়াইলে মনে হয়, জীবনের এই গণা দিনগুলির এক-একটি কত মহার্ঘ, আর কত দুষ্প্রাপ্য! ইহার প্রতি পল—অনুপলটিকে পর্য্যন্ত মানুষ রুদ্ধ নিশ্বাসে আঁকড়াইয়া ধরিয়া সার্থকতার রস সংগ্রহ করিতেছে যে!

কিন্তু, সুস্থতাও অনেক সময় বিকারের রূপান্তর। মনের এই উদার উন্মুক্ততা ক্ষিতীশের পক্ষে একটা বিকার মাত্র। কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই মন তাহার কুণ্ডলী পাকাইয়া আবার ঘরের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আশ্রয় খুঁজিতে লাগিল। অথচ, বাড়ীতে যাইতেও সাহস নাই। তাই, একান্ত উদ্দেশ্যহীন ভাবে সে পথ চলিতে সুরু করিল।

পাছে পরিচিত লোকজনের সহিত—বিশেষতঃ বাজারের সেই দোকানদারগুলির সহিত হঠাৎ দেখা হইয়া যায়, সেজন্য সে বাজারের দিকের রাস্তা ছাড়িয়া অন্য পথ ধরিল। এদিকে খানিকটা গেলেই বেশ শান্ত জনবিরল পল্লী। ঐখানে কোনও গাছের তলায় ঘুরিয়া ফিরিয়া হয় তো সময়টাকে ঠেলিয়া দেওয়া চলিবে। আপিস থাকিলে তবু সময়টা এক রকম কাটে, কিন্তু আজ রবিবার। সুতরাং ঐ নির্জ্জন গাছতলায় বসিয়া বসিয়া নিষ্করুণ সময়ের নির্ম্মম পদধ্বনিগুলি গণিয়া যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নাই।

খানিকটা আসিয়াই কিন্তু তাহার মনে পড়িল—সম্মুখের ঐ মোড়টা ঘুরিয়াই তো অমরের বাড়ী! ওখান দিয়া একবার ঘুরিয়া আসিলে কেমন হয়? সেদিন হয় তো সত্যই কিছু ছিল না তাহার হাতে! নহিলে সে যে—

তাহা ছাড়া, বর্ত্তমানের অবস্থার কথাটা যদি তাহার কাছে ভাল করিয়া গুছাইয়া বলিতে পারা যায়—গত কল্য যেভাবে সে সংসার চালাইয়াছে—শুনিলে নিশ্চয়ই অমর লজ্জিত না হইয়া পারিবে না।

অপমান? হ্যাঁ! বাল্যে একদিন যে সত্যই অভিন্ন হৃদয় সুহৃৎ ছিল। তাহার কাছে আবার অপমান কিসের? এদিকে, রাস্তায় এখনি যদি সেই দোকানীটার সহিত দেখা হইয়া যায় এবং সে যদি হঠাৎ একটা অপমানের কথা বলিয়া বসে!

বাড়ীতে হয় তো এতক্ষণ—ক্ষুধার্ত্ত ছেলেগুলিকে লইয়া অশোকা—

না, ধর্না দিতেই হইবে অমরের দুয়ারে! তাহা ছাড়া কোন উপায় নাই।

মনে মনে সঙ্কল্প স্থির করিয়া সে হন্ হন্ করিয়া অমরের বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া পড়িল।

হঠাৎ নজর পড়িয়া গেল, হাত কয়েক দূরে একটা লোকের প্রতি। এবং সঙ্গে সঙ্গে সে মুখ ঘুরাইয়া উল্টা দিকে চলিতে সুরু করিল। কি মুস্কিল! নূতন গোলদারী দোকানের সেই লোকটা এদিকে কেমন করিয়া আসিল? তাহারই খোঁজে আসিয়াছে না কি? নিশ্চয় লোকটা তাহাকে দেখিতে পাইয়াছে এবং ক্ষিতীশ যে সোজা যাইতে যাইতে হঠাৎ এমন করিয়া উজানবাহী হইল, সেটুকুও তাহার দৃষ্টি এড়ায় নাই।

কিন্তু, না, এমন করিয়া লুকাচুরি করার অর্থই বা কি? বরং সোজা বুক ফুলাইয়া চলিতে পারিলে সংসারে অনেক বিপদকেই ঠেলিয়া যাওয়া চলে।

সুতরাং ক্ষিতীশ আবার মুখ ঘুরাইয়া পূর্ব্বপথ ধরিল। লোকটা ততক্ষণে একেবারে তাহার সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছে। উঃ কি বদমায়েস লোকটা! ক্ষিতীশ অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া পাশ কাটাইয়া যাইতেছিল, সে কিন্তু তাহাকে ডাকিয়া বলিল, "নমস্কার বাবু! এই দিকে বাড়ী না কি আপনার?"

অগত্যা ক্ষিতীশকে ছোট করিয়া জবাব দিতেই হইল,—"হ্যাঁ।"

ইহাতে হাসিবার কি ছিল কে জানে, লোকটা কিন্তু একমুখ হাসিয়া বলিল, "আজ্ঞে, আমিও এই পাড়াতেই থাকি যে!"

যাক্, বাঁচা গেল। লোকটা তাহা হইলে অসম্মানসূচক কিছুই বলিল না। ক্ষিতীশ একটা স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া দুই পা আগাইয়া গিয়াছে, এমন সময় লোকটা ডাকিয়া বলিল, "দোকানে একবার যেন যাবেন, বাবু! কালকের সেই টাকাটা—"

ক্ষিতীশের বুকের ভিতরটা ধড়াস্ করিয়া উঠিল। লোকটা ততক্ষণে ক্ষিতীশের কাছে সরিয়া আসিয়া বলিল, "হ্যাঁ, সেটা কালই চলে গেছে, বাবু! রাত্রি দশটায় দোকান বন্ধ করছি, এমন সময় একটি ভদ্রলোক এলেন দশ টাকার নোটের ভাঙ্গানী নিতে। একেবারে নাছোড়-বান্দা। ভাঙ্গানী নেই বলাতেও তিনি ছাড়লেন না। শেষে ঝেড়ে-ঝুড়ে দেখা গেল, সেই টাকাটা নিয়ে কুল্লে দশটি খুচ্‌রো টাকা পড়ে আছে। তাই দিলুম। ভদ্রলোক টাকাগুলো একবার মাত্র গুণে নিয়েই হন্তদন্ত হ'য়ে ছুটলেন। একবার বাজিয়েও দেখ্‌লেন না।…তা যাক্, যাবেন তো ওদিকে, অমনি খুচ্‌রো বাকীটা নিয়ে আস্‌বেন।"

সে নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল। এবং ক্ষিতীশ খানিকক্ষণ থ হইয়া রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া রহিল।

এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস রাস্তার ধারের কৃষ্ণচূড়া গাছটার ফুলের গোছাগুলিতে দোল্ দিয়া গেল। কিন্তু সে দিকে নজর দিবার ক্ষিতীশের একেবারেই সময় ছিল না। সে তখন বাড়ীর দিকে মুখ ঘুরাইয়া রুদ্ধশ্বাসে পা চালাইয়া দিয়াছে।

'খুচ্‌রো বাকী' মানে আট আনারও বেশী। নিঃস্ব কেরাণীর তাহাতেই আজিকার দিন চমৎকার চলিয়া যাইবে যে! কিন্তু, তার পর? কাল? কে ভাবিতে চায় সে কথা! ক্ষুধার্ত্ত ছেলেগুলি আজকার মত শান্ত হইবে, অশোকার মেঘাচ্ছন্ন মুখের ফাঁকে হয় তো এক ফালি হাসিও ফুটিয়া উঠিবে। কাল যদি সে আবার ঘনান্ধকারে ঢাকিয়া যায়,—তাহার জন্য এখন হইতে কে ভাবিয়া মরিবে?

সত্যই অসাধ্যসাধন করিল ঐ টাকাটা!

ধন্য, ধন্য তুমি বন্ধু! নিজে অচল হইয়াও যে আমার এই অচল সংসারের চাকাটাকে দুই দিন ধরিয়া সচল করিয়া রাখিলে!

শ্রীপ্রফুল্লকুমার মণ্ডল।

ভূতুড়ে বাঘ

(শিকার-কাহিনী)

ব্রহ্মদেশের মান্দালয়-প্রবাসী ইংরেজ জে, এ, রবিন লণ্ডনের কোন প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকায় একটা ভূতুড়ে বাঘের এক 'আষাঢ়ে গল্প' প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, ইহা অনতিরঞ্জিত, খাঁটি সত্য ঘটনার বিবরণ। পাঠকগণের মনোরঞ্জনের জন্য শ্রাবণ-সংখ্যা 'মাসিক বসুমতী'তে আমরা এই কৌতুকাবহ আষাঢ়ে গল্পের অনুবাদ প্রকাশ করিলাম। কিন্তু পাঠকগণ ইহা খাঁটি সত্য ঘটনা বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিবেন কি? 'মাসিক বসুমতী'র ব্রহ্ম-প্রবাসী, বিশেষতঃ মান্দালয়স্থ পাঠকগণ এই গল্পটি পাঠ করিয়া যদি মন্তব্য প্রকাশ করেন—ব্রহ্মদেশের বৌদ্ধ যতিগণের বিরুদ্ধে ইহা 'প্রোপাগাণ্ডা' মাত্র, তবে তাঁহাদের সেই মন্তব্যে আমরা বিস্মিত হইব না। বস্তুতঃ, এই গল্পের সহিত সত্যের কতটুকু সম্বন্ধ আছে—তাহার বিচার তাঁহারাই করিতে পারিবেন। কিন্তু লণ্ডনের একখানি শ্রেষ্ঠ মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত, পদস্থ ইংরেজ লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতালব্ধ ঘটনার এই বিবরণ বিনা প্রমাণে কাল্পনিক বলিয়া সিদ্ধান্ত করাও সঙ্গত নহে। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা সাধারণতঃ জীবহিংসা করেন না, তথাপি সংসারবিরাগী কোন প্রাচীন বৌদ্ধ যতি মাংস-লোভে ব্যাঘ্রচর্ম্মে দেহ আবৃত করিয়া ব্যাঘ্রের ছদ্মবেশে ছাগের খোঁয়াড়ে প্রবেশ করিয়াছেন, এবং ছাগগুলিকে হত্যা করিয়া, ও গোপনে নিভৃত আরণ্য আশ্রমে লইয়া গিয়া তাহাদের মাংসে ক্ষুধা-নিবৃত্তি করিয়াছেন, ইহা অনতিরঞ্জিত সত্য ঘটনা বলিয়া বিশ্বাস করা যায় কি না, পাঠকগণ তাহাও ভাবিয়া দেখিবেন।

মিঃ রবিন লিখিয়াছেন, "দুইটি ইংরেজ যুবক উত্তর-ব্রহ্মের কোন একটি নগরের ডাক-বাঙ্গলোর প্রশস্ত বারান্দায় বসিয়া তর্ক বিতর্ক করিতেছিল। তাহাদের মধ্যে ট্রেভর হপ্‌কিন্স অপেক্ষাকৃত অধিক বয়স্ক। প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে সে ব্রহ্মদেশে আসিয়া কোন কাঠের কারখানায় চাকরী গ্রহণ করিয়াছিল। দ্বিতীয় যুবক আর্থর লেস্‌লি আলোচ্য ঘটনার অল্প দিন পূর্ব্বে তাহার বাল্যবন্ধু হপ্‌কিন্সের সহিত মিলিত হইয়াছিল। হপ্‌কিন্স যে কাঠের কারখানায় চাকরী করিতেছিল, লেস্‌লিও সেই কারখানায় চাকরী লইয়া ইংলণ্ড হইতে ব্রহ্মে আসিয়াছিল। হপ্‌কিন্স একটি ব্যাঘ্র শিকারের চেষ্টা করিতেছিল; কিন্তু তাহার চেষ্টা বিফল হওয়ায় লেস্‌লি উত্তেজিত স্বরে বলিল, 'যে ব্যক্তি বাঘটার সন্ধান বলিয়া দিবে, তুমি তাহাকে মোটা-রকম বকশিস্ দিতে প্রস্তুত আছ; তথাপি স্থানীয় অধিবাসীরা তোমাকে কোনরূপ সাহায্য করিল না, শিকারের সন্ধানে বাঘটাকে কোথায় কখন ঘুরিয়া-বেড়াইতে দেখা যায়, তাহাও তোমাকে বলিতে তাহারা সম্মত হইল না, এই কথা কি তুমি আমাকে বিশ্বাস করিতে বল?'

হপ্‌কিন্স বলিল, 'আমি তোমাকে সত্য কথাই বলিয়াছি। পার্ব্বত্য অঞ্চলের এই সকল অধিবাসী ঘোর কুসংস্কারাচ্ছন্ন। আমি যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে মনে হয়, আমি যে বাঘটার সন্ধান করিতেছি, সেটি সাধারণ বাঘ নহে; তাহার সহিত কোন জটিল রহস্য বিজড়িত আছে।'

লেস্‌লি আবেগ ভরে বলিল, 'তোমার এই 'জটিল রহস্য' কথাটির অর্থ কি? তুমি কি আমাকে বল নাই যে, বাঘটা স্থানীয় অধিবাসিগণের হাঁস, মুরগী, ছাগল ধরিয়া লইয়া যাইতেছে? বাঘটা গ্রামে আসিয়া এইরূপ উপদ্রব করায় তাহাকে মারিবার চেষ্টা করা হইতেছে; এজন্য গ্রামবাসিগণের ত আনন্দ হইবারই কথা। তাহারা কি এই চেষ্টায় বাধা দিতে পারে?'

হপ্‌কিন্স বলিল, 'হাঁ, এই চেষ্টায় বাধা না দেওয়াই ত তাহাদের উচিত; কিন্তু আমি যখন গ্রামের ভিতর গিয়া গ্রামবাসিগণের নিকট বাঘটার গতিবিধির সন্ধান জানিবার চেষ্টা করিলাম, তখন অন্য লোক দূরের কথা গ্রামের মোড়ল মাং-থিট স্পষ্টভাবেই আমাকে জানাইল, সে আমাকে এ বিষয়ে কোনও-রকম সাহায্য করিতে পারিবে না। আমি এ দেশের ভাষা ভাল বুঝিতে না পারিলেও তাহাদের কথা শুনিয়া এটুকু বুঝিতে পারিয়াছি যে, এই বাঘটা ঠিক সাধারণ বাঘ নহে; তাহারা বলে—উহা একটা 'নাট' অর্থাৎ ব্যাঘ্রদেহধারী ভূত! কেহ এই 'ভূতুড়ে বাঘ' শিকারের চেষ্টা করিলে গ্রামের কোনও লোক তাহাকে কোনরূপ সাহায্য করিবে না। এই সকল লোকের ভূতের ভয় অত্যন্ত অধিক; ভূতের যাহাতে রাগ হয়, এরূপ কোন কাজে প্রবৃত্ত হইতে তাহাদের সাহস হয় না।'

লেস্‌লি উত্তেজিত স্বরে বলিল, 'রাবিস্! দেখ ওল্ড চ্যাপ, আমি যে অনভিজ্ঞ যুবক, ইহা আমার জানা আছে; কিন্তু লোকের আপত্তি সত্ত্বেও এই বাঘটাকে আমি মারিবার চেষ্টা করিব। আমার ইচ্ছা, আমি বা-হানকে সঙ্গে লইয়া গ্রামে যাই, এবং বাঘটার সম্বন্ধে সকল কথা জানিবার চেষ্টা করি; ইহাতে তোমার আপত্তি আছে কি? চাকরদের মধ্যে কেবল তাহারই ইংরেজীভাষা জানা আছে, এজন্য সে দোভাষীর কাজ করিতে পারিবে।'

হপ্‌কিন্স বলিল, 'বেশ ভাল কথা। তোমার ইচ্ছা হয় কাল তুমি তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইও; কিন্তু তোমার চেষ্টা সফল হইবে বলিয়া মনে হয় না। এই লোকগুলা অত্যন্ত একগুঁয়ে। তাহারা তোমাকে সাহায্য করিবে না।'

পরদিন প্রভাতে খাকী-সার্ট ও হাফপ্যাণ্টে সজ্জিত হইয়া

লেস্‌লি গ্রামের অভিমুখে যাত্রা করিল। সেই গ্রাম ডাক-বাঙ্গলো হইতে প্রায় চারি মাইল দূরে অবস্থিত। বা-হান লেস্‌লির বন্দুক লইয়া তাহার অনুসরণ করিল। বা-হান গ্রামের মোড়ল মাং-থিটের গৃহে উপস্থিত হইয়া মাং-থিটকে দেখাইয়া দিলে লেস্‌লি দেখিল—সে চারি জন গ্রামবাসীর সহিত আলাপ করিতেছিল। লেস্‌লি তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইল।

লেস্‌লি বুঝিতে পারিল—ট্রেভর হপ্‌কিন্সের কথা সত্য। লেস্‌লি মাং-থিটকে বাঘের কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে কথাটা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করিল। তখন লেস্‌লি পাঁচ টাকার একখান নোট বাহির করিয়া মাং-থিটকে বক্‌শিস প্রদান করিলে মাং-থিট তাহাকে জানাইল, সেই গ্রামের দুই মাইল দূরে এক জন সাধুর বাস; সাধু তাহার কুটীরে একাকী বাস করে। এই সাধুকে সকলেই অত্যন্ত সম্মান করে। সাধু গ্রামের লোকদের বলিয়াছে—বাঘটা 'নাট' অর্থাৎ ভূত; কেহ যেন তাহার শত্রুতা না করে। যদি গ্রামের লোক বাঘটার অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে তাহাদের বিপদের সীমা থাকিবে না। তাহাদিগকে নানা প্রকার দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিয়া মরিতে হইবে।

মাং-থিট স্বীকার করিল—বাঘটার দৌরাত্ম্য অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু সে ব্যাঘ্র-শিকারে লেস্‌লিকে বা অন্য কোন শ্বেতাঙ্গকে কোন প্রকার সাহায্য করিতে অসম্মতি প্রকাশ করিল।

অতঃপর লেস্‌লি সেই সাধুর সহিত সাক্ষাতের সঙ্কল্প করিয়া মাং-থিটের নির্দ্দেশানুসারে বন-পথ ধরিয়া তাহার কুটীরের নিকট উপস্থিত হইল। বা-হান তাহার সঙ্গে চলিয়া সাধুর যে কুটীর দেখিতে পাইল, তাহা মোটা মোটা বাঁশের বেড়া দ্বারা পরিবেষ্টিত। সেই বেড়ার মাথায় দুর্ভেদ্য কাঁটাতারের আচ্ছাদন।

সাধুর কুটীর কি কারণে ঐরূপ সুরক্ষিত করা হইয়াছিল, লেস্‌লি তাহা বুঝিতে পারিল না। তদ্দ্বারা বন্য জন্তুর আক্রমণ নিবারণের কোন সম্ভাবনা ছিল না; কারণ, বেড়াটি এরূপ উচ্চ ছিল না যে, কোন হিংস্র জন্তু তাহা লঙ্ঘন করিতে পারিত না। অথচ দস্যুভয় নিবারণের জন্যও তাহার প্রয়োজন ছিল না; কারণ, দস্যুর লোভ হইতে পারে, এরূপ কোন মূল্যবান্ দ্রব্য সেই দরিদ্র সাধুর কুটীরে ছিল বলিয়া লেস্‌লির ধারণা হইল না।

সেই কুটীরের সম্মুখস্থ আঙ্গিনায় লেস্‌লি একটি প্রৌঢ় বর্ম্মীজকে উপবিষ্ট দেখিল; লোকটি মাটীতে বসিয়া একখানি পুস্তক পাঠ করিতেছিল। বা-হান তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহাকে সম্বোধন করিলে সে মুখ তুলিয়া সক্রোধে ভ্রূভঙ্গি করিল; কিন্তু লেস্‌লিকে দেখিবামাত্র সে ক্রোধ সংবরণ করিল। সে বুঝিতে পারিল, একজন 'বোজি' (শ্বেতাঙ্গ) যখন তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে, তখন নিশ্চিতই তাহার বিশেষ কোন কারণ আছে। এজন্য সে লেস্‌লির সহিত সদ্ব্যবহার করাই সঙ্গত মনে করিল। দেশীয় ব্যক্তিরা স্বেচ্ছায় য়ুরোপীয়ের প্রতি অসদ্ব্যবহার করে না।

সাধু কোন কথা না বলিয়া লেস্‌লি ও বা-হানকে তাহার নিকটে যাইবার জন্য ইঙ্গিত করিল। অতঃপর সে উভয়কে তাহার কুটীরে লইয়া গেল, এবং বংশনির্ম্মিত চেয়ারে লেস্‌লিকে বসিতে অনুরোধ করিল। সে স্বয়ং একখানি মাদুরে উপবেশন করিল। বা-হান উপবেশনের অনুমতি না পাওয়ায় দাঁড়াইয়া রহিল। সে সাধারণ ভৃত্য মাত্র, অবজ্ঞার পাত্র।

লেস্‌লি আর সময় নষ্ট না করিয়া তৎক্ষণাৎ কাজের কথা পাড়িল; সে বা-হানকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, 'বাঘটা গ্রামের লোকের যথেষ্ট ক্ষতি করিতেছে, তথাপি এই লোকটা কি কারণে গ্রামের লোকগুলিকে বাঘ মারিতে নিষেধ করিয়াছে, তাহা উহাকে জিজ্ঞাসা কর।'

লেস্‌লির কথা শেষ হইবামাত্র সাধু বিশুদ্ধ ইংরেজী ভাষায় লেস্‌লির প্রশ্নের উত্তর দিল। সাধুকে বিশুদ্ধ ইংরেজী ভাষায় কথা বলিতে শুনিয়া লেস্‌লির বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

সাধু বলিল, 'বোজি একটা ইতর চাকরকে দিয়া আমাকে প্রশ্ন করিতেছেন—ইহা আমি অনাবশ্যক মনে করি। আমি গ্রামের লোকগুলাকে অনেক কথাই বলিয়াছি, এবং যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছি, তাহা সফল হইয়াছে; এজন্য তাহারা আমাকে অত্যন্ত সম্মান করে; আমি সাধারণের অবজ্ঞাভাজন হই—ইহাই কি 'বোজি'র ইচ্ছা?'

সাধুর ভাবভঙ্গিতে ও কথায় ঔদ্ধত্যের পরিচয় পাইয়া লেস্‌লি অত্যন্ত বিরক্ত হইল। সে নীরস স্বরে বলিল, 'তুমি ও-ভাবে আমাকে কথা বলিও না; আমি সোজা কথার সোজা জবাব চাই, ইহা জানিয়া রাখ সাধু!'

লেস্‌লির কথায় বৃদ্ধ সাধুর মুখ হইতে বিদ্রূপের হাসি অন্তর্হিত হইল। সে সহজ স্বরে বলিল, আমি দরিদ্র সন্ন্যাসী; পৃথিবীর সহিত সকল সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়াছি। যদি আমার ব্যবহারে তুমি মনে আঘাত পাইয়া থাক, সেজন্য আমি দুঃখিত। তুমি যে বাঘের কথা বলিতেছ, সেটা সাধারণ বাঘ নহে; উহা একটি প্রেতাত্মা—ব্যাঘ্র-দেহ ধারণ করিয়াছে। এই জন্যই উহা পবিত্র। আমি গ্রামবাসীদিগকে সতর্ক করিবার জন্য বলিয়াছি—যে কেহ উহাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিবে, বা ঐরূপ চেষ্টায় কোনরূপ সাহায্য করিবে, তাহাকে অত্যন্ত যাতনা ভোগ করিয়া মরিতে হইবে। ভগবানের দৃষ্টিতে সকল লোকই সমান। যদি মহাপরাক্রান্ত 'বোজি' (শ্বেতাঙ্গ) সেই বাঘটাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে তাহাকেও সেই দণ্ডই ভোগ করিতে হইবে; 'বোজি' বলিয়া দণ্ড লঘু হইবে—এরূপ আশা করিও না।'

বৃদ্ধের দম্ভে লেস্‌লি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া বা-হানের আশঙ্কা হইল—ক্রুদ্ধ লেস্‌লি হয় ত বৃদ্ধ সাধুর উপর ঘুসি চালাইবে! এই জন্য সে তাড়াতাড়ি সরিয়া গিয়া বৃদ্ধকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইল, এবং বিনীত ভাবে লেস্‌লিকে বলিল, 'এখানে আমাদের আর বিলম্ব করিয়া কোন ফল নাই হুজুর, আমাদের চলিয়া যাওয়াই ভাল।'

সাধুর সহিত তর্ক-বিতর্ক নিষ্ফল বুঝিয়া লেস্‌লি সাধুর কুটীর ত্যাগ করিল। বা-হানও তাহার অনুসরণ করিল। লেস্‌লিকে ভগ্ন-মনোরথ হইয়া প্রস্থান করিতে দেখিয়া সাধুর মুখে অবজ্ঞার হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিল। সেই দৃষ্টি অত্যন্ত কুটিল।

কিন্তু লেস্‌লি সাধু কর্ত্তৃক এই ভাবে প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় তাহার জিদ বাড়িয়া গেল, এবং সে এই জটিল রহস্যভেদে কৃতসঙ্কল্প হইল। সে ভাবিল—এই বৃদ্ধ 'রাস্‌কেল' গ্রামবাসিগণের ভক্তিভাজন হইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে, তবে যে বাঘ জনসাধারণকে নিত্য ক্ষতিগ্রস্ত করিতেছে—তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য তাহার

ঐরূপ আগ্রহের কারণ কি? সাধু কোন গূঢ় উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়াই এই প্রকার ব্যবহার করিতেছে—এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া লেস্‌লি গোপনে সাধুর গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইল।

অতঃপর লেস্‌লি তাহার মনের কথা জানাইবার জন্য হপ্‌কিন্সকে একখানা পত্র লিখিল, এবং পত্রখানি বা-হানের হাতে দিয়া, অবিলম্বে তাহা হপ্‌কিন্সের নিকট লইয়া যাইবার জন্য তাহাকে আদেশ করিল। বা-হান লেস্‌লিকে একাকী সেই অরণ্যে রাখিয়া যাইতে অনিচ্ছুক হইলেও তাহার আদেশ অগ্রাহ্য করিতে সাহস করিল না; সুতরাং তাহাকে হপ্‌কিন্সের নিকট যাইতে হইল। লেস্‌লি বা-হানের নিকট হইতে তাহার বন্দুকটা ফেরত লইয়া পথের ধারে গাছের একটা শুষ্ক গুঁড়ির উপর বসিয়া রহিল। তখন সন্ধ্যা-সমাগমের অধিক বিলম্ব ছিল না।

এ দিকে লেস্‌লিকে বাঙ্গলোতে ফিরিতে না দেখিয়া হপ্‌কিন্স উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। কিন্তু বা-হান লেস্‌লির সঙ্গে ছিল বলিয়া হপ্‌কিন্স লেস্‌লির সন্ধানে গ্রামে গমন না করিয়া তাহার প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। তাহার মনে হইল, বা-হান বিলক্ষণ বুদ্ধিমান্ ও বলবান ভৃত্য; সুতরাং সে সঙ্গে থাকিতে তাহার বন্ধু কোন বিপদে পড়িবে—এ আশঙ্কা হপ্‌কিন্সের মনে স্থান পাইল না। হপ্‌কিন্স দুশ্চিন্তা ত্যাগ করিয়া তাহার কার্য্যে মনঃসংযোগ করিল।

কিন্তু ক্রমে সন্ধ্যা ছয়টা বাজিয়া গেল; তখন পর্য্যন্ত লেস্‌লি বা বা-হান বাঙ্গলোয় প্রত্যাগমন না করায় হপ্‌কিন্স আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিল না। সে পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিয়া, তাহার বন্দুক ও কিছু টোটা সঙ্গে লইয়া, এবং বৈদ্যুতিক টর্চ্চটা পকেটে ফেলিয়া বন্ধুর সন্ধানে গ্রামের অভিমুখে যাত্রা করিল।

হপ্‌কিন্স গ্রামের মোড়ল মাঙ-খিটকে লেস্‌লির কথা জিজ্ঞাসা করিলে, লেস্‌লি বাঙ্গলোয় প্রত্যাগমন করে নাই শুনিয়া সে বিস্মিত হইল। সে বলিল, লেস্‌লি বা-হানের সহিত কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে জঙ্গলে বৃদ্ধ সাধুর সহিত দেখা করিতে গিয়াছিল। হপ্‌কিন্স এই সংবাদে বন্ধুর বিপদাশঙ্কায় উৎকণ্ঠিত চিত্তে সাধুর কুটীরে চলিল। মাং-খিট স্বেচ্ছায় তাহার অনুসরণ করিল। তখন অন্ধকার গাঢ় হইয়াছিল। গভীর অরণ্যে হপ্‌কিন্স মাং-খিটকে তাহার সঙ্গে যাইতে দেখিয়া খুসী হইল। টর্চ্চের উজ্জ্বল আলোকে তাহারা আরণ্য পথে অগ্রসর হইল।

সাধুর কুটীরে তাহাদের সন্ধান না পাওয়ায় হপকিন্সের আতঙ্ক বর্দ্ধিত হইল; কিন্তু হপ্‌কিন্স সাধুর কুটীর হইতে কিছু দূরে আসিয়া অরণ্যে লেস্‌লির কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইল।

লেস্‌লি কিছু দূরে টর্চ্চের আলোকচ্ছটা দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল, 'হালো, ট্রেভর আসিয়াছ কি?'

হপ্‌কিন্স সবিস্ময়ে বলিল, 'জোভ্! কোথায় তুমি?'

লেস্‌লি বলিল, 'জঙ্গলের ভিতর বসিয়া চন্দ্রোদয়ের প্রতীক্ষা করিতেছি। ভয়ের কোন কারণ নাই ওল্ড চ্যাপ্! আলোটা দেখাও, আমি পথ দেখিয়া তোমার কাছে যাই; পরে সকল কথা বলিব।'

হপ্‌কিন্স লেস্‌লির সকল কথা শুনিয়া বলিল, 'আমার বাঙ্গলো ত্যাগ করিবার সময়-পর্য্যন্ত বা-হান তোমার পত্র লইয়া আমার সঙ্গে দেখা করে নাই। তাহার বিলম্বের কারণ বুঝিতে পারিতেছি না। সে অকারণে পথে বিলম্ব করিবে বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং বেচারার ভাগ্যে কি ঘটিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। দুশ্চিন্তার বিষয় বটে!'

সেই গভীর অরণ্যে বা-হানকে খুঁজিয়া বাহির করা অসাধ্য বুঝিয়া তাহারা বাঙ্গলোয় ফিরিয়া চলিল। হপ্‌কিন্স আশা করিল—বাঙ্গলোয় ফিরিয়া তাহারা হয় ত সেখানে বা-হানকে দেখিতে পাইবে।

তাহারা তিন জন চলিতে চলিতে কিছু দূরে অস্ফুট আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইল।

হপ্‌কিন্স উচ্চৈঃস্বরে বলিল, 'বা-হান তুমি কি? কোথায় তুমি?'

অতঃপর সুস্পষ্ট আর্ত্তনাদ তাহাদের কর্ণগোচর হইল। তাহারা সেই শব্দের অনুসরণ করিয়া প্রায় পঞ্চাশ ফিট যাইবার পর পথের ধারে জঙ্গলের নিকট বা-হানকে উপুড় হইয়া পড়িয়া থাকিতে দেখিল। তাহার পরিধেয় বস্ত্র রক্তে লাল! হপ্‌কিন্স এক হাতে বন্দুক ও অন্য হাতে টর্চ্চ লইয়া তাহার প্রসারিত দেহের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। সে সভয়ে দেখিল—একখান তীক্ষধার ছোরা তাহার ঘাড়ে আমূল বিদ্ধ; কণ্ঠ প্রায় দ্বিখণ্ডিত!

বা-হান তখনও জীবিত ছিল। হপ্‌কিন্স ছোরাখানি ধীরে ধীরে তাহার ঘাড় হইতে টানিয়া বাহির করিল। তাহার পর রুমাল দিয়া তাহার ঘাড়ে পটী বাঁধিয়া দিল। হপ্‌কিন্স মাং-খিটকে জল আনিতে বলিলে মাং-খিট দুইখানি বৃক্ষপত্র দ্বারা ঠোঙ্গা করিয়া তাহাতে জল লইয়া আসিল। হপ্‌কিন্স সেই জল অল্প পরিমাণে বা-হানের মুখের ভিতর ঢালিয়া দিতে লাগিল।

বা-হানের তখন শেষ অবস্থা! তখন তাহাকে স্থানান্তরিত করিবার চেষ্টা করিলে মৃত্যু নিশ্চয়, ইহা বুঝিতে পারিয়া হপ্‌কিন্স নিজের কোট খুলিয়া লইয়া, তাহা ভাঁজ করিয়া বালিশের মত বা-হানের মাথার নীচে রাখিল।

প্রায় দশ মিনিট পরে বা-হান চক্ষু মেলিয়া চাহিল। সে কিছু বলিবার চেষ্টা করিতেছিল দেখিয়া হপ্‌কিন্স তাহার মুখের কাছে কাণ পাতিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। বা-হান বহু চেষ্টায় অস্ফুটস্বরে বলিল, 'যতি!' তাহার মুখে আর কোন কথা বাহির হইল না; সে চক্ষু মুদিত করিল। তাহার পর অন্তিম হিক্কা; সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রাণবিয়োগ হইল।

বৃদ্ধ সাধুই বা-হানকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করিয়াছে—ইহা বুঝিতে পারায় ইংরেজ-দ্বয় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল। কিন্তু সাধুকে স্বহস্তে শাস্তি দেওয়া সঙ্গত হইবে না বুঝিয়া তাহারা মাঙ্-খিট্‌কে মৃত দেহের পাহারায় রাখিয়া গ্রামে উপস্থিত হইল, এবং আট মাইল দূরবর্ত্তী থানায় সংবাদ দেওয়ার জন্য দুই জন গ্রামবাসীকে সেখানে পাঠাইয়া, পুলিশের সার্কল-ইন্‌স্পেক্টরকে ঘটনা-স্থলে আসিবার জন্য অনুরোধ করিতে বলিল।

ইন্‌স্পেক্টর সেখানে আসিবার পূর্ব্বে কিছুই করিবার ছিল না; এজন্য তাহারা উভয়েই বাঙ্গলোয় প্রত্যাগমন করিল। গভীর রাত্রিতে তাহারা শয্যায় শয়ন করিল বটে, কিন্তু তাহাদের নিদ্রা হইল না। হপ্‌কিন্স তাহার বিশ্বস্ত ভৃত্যের মৃত্যুর জন্য আপনাকেই দায়ী মনে করিয়া অত্যন্ত বিচলিত হইল। তাহার মনে হইল, লেস্‌লিকে বা-হানের সঙ্গে না পাঠাইলে হতভাগ্য ভৃত্যকে এই ভাবে নিহত হইতে হইত না।

বা-হানের হত্যাকাণ্ডে লেস্‌লিও অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইল। সাধু কি উদ্দেশ্যে তাহাকে হত্যা করিয়াছিল, তাহা সে স্থির করিতে পারিল না; তবে সাধু তাহার ভবিষ্যদ্বাণী সফল করিবার জন্য এই গর্হিত কার্য্য করিয়াছিল—ইহা সে বিশ্বাস করিতে পারিল না। সাধু গ্রামের লোকগুলিকে সতর্ক করিবার জন্য বলিয়াছিল, ভূতুড়ে বাঘটার যে অনিষ্ট-চেষ্টা করিবে, তাহার মৃত্যু হইবে। লেস্‌লি অবশেষে সিদ্ধান্ত করিল—গ্রামবাসিগণকে ভয় প্রদর্শনের জন্যই সাধু এই কার্য্য করিয়াছিল। গ্রামের লোকরা জানিতে পারিয়াছিল—লেস্‌লি বা হানকে সঙ্গে লইয়া বাঘটাকে মারিবার চেষ্টা করিতেছিল। লেস্‌লি ইংরেজ, তাহাকে হত্যা করা সহজ নহে; এই জন্য বা-হানকে হত্যা করিয়া সাধু গ্রামের লোকদের বুঝাইতে চাহিয়াছিল, আর যেন কেহ বাঘটাকে শিকার করিবার চেষ্টা না করে, সেই চেষ্টার ফল—মৃত্যু।

সার্কল পুলিশ-ইন্‌স্পেক্টর প্রৌঢ় মগ। তাহার নাম ইউ-উয়ো। পরদিন প্রভাতে সে বাঙ্গলোয় আসিয়া উভয় ইংরেজের বিবৃতি গ্রহণ করিল, এবং হত্যাকারীর সন্ধান করিয়া তাহাকে ফৌজদারী সোপরদ্দ করিবে বলিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল। ইংরেজদ্বয় তাহার নিকট সাধু সম্বন্ধে কোন কথা প্রকাশ করিল না। তাহাদের ইচ্ছা ছিল, সাধুকে গোপনে পরীক্ষা করিবে।

সেই দিন সন্ধ্যার সময় হপ্‌কিন্স ও লেস্‌লি এক একটি বন্দুক, কিছু টোটা, এবং বিজলি-বাতি লইয়া বাঙ্গলো ত্যাগ করিল। তাহারা গ্রামে প্রবেশ না করিয়া গ্রাম ঘুরিয়া একটি বৃহৎ খোঁয়াড়ের নিকট উপস্থিত হইল। স্থানীয় অধিবাসিগণের অধিকাংশ ছাগ সেই খোঁয়াড়ে আবদ্ধ থাকিত। উহা গ্রামবাসিগণের সাধারণ খোঁয়াড়।

এই খোঁয়াড়ের পার্শ্বে একটি বৃহৎ বৃক্ষ ছিল। ইংরেজদ্বয় সেই বৃক্ষে আরোহণ করিল।

সেই বৃক্ষের দুইটি শাখায় উভয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলে লেস্‌লি হপ্‌কিন্সকে বলিল, 'যদি ভূতুড়ে বাঘ আজ এই খোঁয়াড়ে ছাগল ধরিতে আসে—তাহা হইলে এক গুলীতে তাহার দেহ হইতে ভূত ছাড়াইব।'

উভয়ে গাছের উপর বসিয়া রহিল; সময় আর কাটে না। দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিয়া তাহারা বিরক্ত হইয়া উঠিল। তথাপি তাহারা আশা করিল, বাঘটা শীঘ্রই সেই খোঁয়াড়ে প্রবেশ করিবে; কিন্তু দীর্ঘকালেও তাহাদের আশা পূর্ণ হইল না। মশকের ফৌজ তাহাদের পিঠে চটের মত পুরু কোটের উপর সুতীক্ষ্ণ সঙ্গীন বিদ্ধ করিতে লাগিল।

অবশেষে রাত্রি প্রায় এগারটার সময় চন্দ্রোদয় হইল; খণ্ড-চন্দ্রের মৃদু আলোকে স্তব্ধ বনভূমি প্লাবিত হইতে লাগিল। ক্রমশঃ আরও দুই ঘণ্টা অতীত হইল; কিন্তু বাঘের দেখা নাই। বৃক্ষশাখায় উপবিষ্ট ক্লান্ত শিকারীদ্বয় অধীর হইয়া উঠিল। রাত্রি প্রায় ১টার সময় হপ্‌কিন্স অদূরে খস্‌-খস্‌ শব্দ শুনিতে পাইল; সে সেই শব্দের প্রতি লেস্‌লির দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। দুই এক মিনিট পরে তাহারা স্পন্দিত বক্ষে দেখিল—একটি বৃহৎ ব্যাঘ্র অদূরবর্ত্তী ফাকা যায়গার ভিতর দিয়া অতি ধীরে সেই খোঁয়াড়ের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। শিকারীদ্বয় বৃক্ষশাখায় বসিয়া তাহার গতি লক্ষ্য করিতেছিল, বাঘ তাহা জানিতে পারিল না।

বাঘটা খোঁয়াড়ের নিকট উপস্থিত হইবামাত্র হপ্‌কিন্স হাতের টর্চ্চের 'সুইচ্‌' টিপিয়া তাহার উজ্জল প্রভা বাঘের চক্ষুর উপর নিক্ষেপ করিল। সেই আলোকে বাঘের চক্ষু ধাঁধিয়া গেল। লেস্‌লি সেই মুহূর্ত্তে বাঘের মস্তক লক্ষ্য করিয়া তাহার বন্দুক উদ্যত করিল।

সেই সময় অতি অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিল! বাঘটা সুতীব্র আলোক-সম্পাতে ভয় পাইলেও অদূরবর্ত্তী জঙ্গলের ভিতর পলায়ন না করিয়া, বা হতবুদ্ধি হইয়া সেই স্থানেই বসিয়া না থাকিয়া, পশ্চাতের দুই পায়ে ভর দিয়া মানুষের মত সোজা হইয়া দাঁড়াইল, এবং দ্রুতপদে অদূরবর্ত্তী বৃক্ষের আড়ালে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

এই দৃশ্যে হপ্‌কিন্স যেন বজ্রাহত হইল; কারণ সে আর কখনও কোন বাঘকে মানুষের মত দুই পায়ে ভর দিয়া দৌড়াইতে দেখে নাই। কিন্তু লেস্‌লি কোন কথা না বলিয়া বৃক্ষশাখা হইতে তাড়াতাড়ি নীচে নামিতে লাগিল। সে নীচে নামিয়াই দ্রুতবেগে বাঘের অনুসরণ করিল। হপ্‌কিন্স তাহার নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য তাহাকে উচ্চৈঃস্বরে গালি দিতে দিতে অবিলম্বে নীচে নামিয়া পড়িল। লেস্‌লি বিপন্ন হইলে তাহাকে সাহায্য করিবে—এইরূপই তাহার উদ্দেশ্য ছিল।

লেস্‌লি উচ্চৈঃস্বরে বলিল, 'শীঘ্র আমার অনুসরণ কর, ট্রেভর, আমি এখনই উহাকে পাক্‌ড়াইব। শীঘ্র এস।'

হপ্‌কিন্স তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া দেখিল—লেস্‌লি দুই হাতে বাঘটাকে জড়াইয়া ধরিয়াছে। কিন্তু বাঘ কোথায়? লেস্‌লি যাহাকে জড়াইয়া ধরিয়াছিল সে মানুষ! হপ্‌কিন্সও মুহূর্ত্ত মধ্যে লেস্‌লির পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া লোকটাকে ধরিয়া ধরাশায়ী করিল; তাহার মুক্তিলাভের চেষ্টা বিফল হইল।

লেস্‌লি উত্তেজিত স্বরে বলিল, "আমি এই রকমই মনে করিয়াছিলাম। এ আমাদের বন্ধু সেই ভণ্ড সাধু!' সে সাধুর মুখের উপর টর্চ্চের আলোক নিক্ষেপ করিল; এবং ঘুসি মারিবার লোভ সে অতিকষ্টে সংবরণ করিল।

সাধু যে স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, তাহার অদূরে একখানি বৃহৎ নির্ম্মুক্ত ব্যাঘ্রচর্ম্ম পড়িয়া ছিল; তাহা দেখিয়া হপ্‌কিন্স ও লেস্‌লি তৎক্ষণাৎ সাধুর চালাকী বুঝিতে পারিল। সাধু কি কারণে গ্রামবাসিগণকে সেই ভূতুড়ে বাঘটাকে শিকার করিতে নিষেধ করিয়াছিল, তাহাও তাহাদের বুঝিতে বিলম্ব হইল না।

হপ্‌কিন্স তাহার বন্দুকের নল ঊর্দ্ধমুখ করিয়া আকাশের দিক গুলী বর্ষণ করিল। সেই শব্দে আকৃষ্ট হইয়া গ্রামবাসীরা দ্রুতবেগে সেই স্থানে উপস্থিত হইল। গভীর রাত্রিতে ছাগলের খোঁয়াড়ের নিকট কি কারণে বন্দুকের আওয়াজ হইল, তাহা জানিবার জন্য তাহাদের কৌতূহল হইয়াছিল। গ্রামবাসীরা ভূতুড়ে বাঘের মুরুব্বি সাধুকে সেই স্থানে উপস্থিত দেখিয়া তাহার অভিসম্পাতের ভয়ে দূরে সরিয়া গেল। কিন্তু হপ্‌কিন্স দুই চারি কথায় তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিল, বাঘ তাহাদের হাঁস, মুরগী, ছাগল প্রভৃতি ধরিয়া লইয়া যাইত বলিয়া তাহাদের যে ধারণা ছিল—তাহা ভুল ধারণা; সেই সাধুই তাহাদের ঐরূপ ক্ষতির জন্য দায়ী। সে বাঘের চামড়ায় সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া বাঘ সাজিয়া ঐ কার্য্য করিত। তাহার কথা শুনিয়া তাহারা হপ্‌কিন্স ও লেস্‌লিকে সাহায্য করিতে আসিল, এবং খোঁয়াড় হইতে রজ্জু সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা সাধুকে বাঁধিয়া ফেলিল।

সার্কল পুলিশ-ইন্‌স্পেক্টর ইউ-উয়ো সেই রাত্রিতে থানায় না

ফিরিয়া কার্য্যানুরোধে গ্রামের মোড়ল মাও-খিটের গৃহে অবস্থান করিতেছিল। সে নিদ্রাভঙ্গে সকল কথা শুনিয়া সাধুকে তাহার নিকট উপস্থিত করিতে বলিল। সাধু মাও-খিটের গৃহে নীত হইলে ইন্‌স্পেক্টর প্রাথমিক তদন্ত আরম্ভ করিল।

সাধুর চালাকী ধরা পড়িলেও সে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ বা চাঞ্চল্য প্রকাশ করিল না; তাহাকে শান্ত ও সংযত দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইল। পুলিশ-ইন্‌স্পেক্টর তাহার কৈফিয়ৎ চাহিলে সে হাত তুলিয়া বিশুদ্ধ ইংরেজী ভাষায় বলিল, 'আমাকে জেরা করিবার প্রয়োজন নাই; তুমি যে সকল কথা জানিতে চাও তাহা আমি নিজের ইচ্ছাতেই তোমার নিকট প্রকাশ করিতেছি।'

তাহার কথা শুনিয়া লেসলি সবিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিল। চতুর সাধু কি কারণে তাহার বক্তব্য ইংরেজী ভাষায় বলিতে চাহিল, লেসলি তাহা তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিল। তাহার ধারণা হইল—গ্রামবাসীরা সাধুকে অত্যন্ত ভক্তি ও সম্মান করিত, সাধু তাহার কুকর্ম্মের কথা স্বয়ং তাহাদের নিকট প্রকাশ করিলে তাহাকে অতম্ভ অপদস্থ হইতে হইবে, ইহা বুঝিতে পারিয়াই মাতৃভাষায় তাহার বক্তব্য বিষয় বিবৃত করা সে সঙ্গত মনে করে নাই। গ্রামবাসীরা ইংরেজী ভাষা জানিত না। সাধুর ভয় হইয়াছিল—গ্রামবাসীরা তাহার ভণ্ডামীর পরিচয় পাইলে ক্রুদ্ধ হইয়া সেই স্থানেই তাহাকে লাঠী-পেটা করিবে, এবং তাহার প্রাণরক্ষা করা কঠিন হইবে।

বর্ম্মী ইন্‌স্পেক্টর সাধুর অদ্ভুত কথা শুনিয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সর্ব্বজনের ভক্তিভাজন সাধু যে এত বড় ভণ্ড, ইহা তাহার ধারণা করিবার শক্তি ছিল না। ইন্‌স্পেক্টরকে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া সাধু বলিতে আরম্ভ করিল, 'যে কুকুরটা ঐ দুটো 'বোজির' (শ্বেতাঙ্গ) খানা পাকাইত, আমিই তাহাকে হত্যা করিয়াছি, ইহা সম্পূর্ণ সত্য। হ্যাঁ, আমি স্বীকার করিতেছি, আমিই তাহাকে হত্যা করিয়াছি; কারণ সে আমার সঙ্কল্প ব্যর্থ করিতে পারিত। যে 'বোজি' আমার আশ্রমে আসিয়াছিল, সে ঐ কুকুরটাকে সঙ্গে লইয়া আমার আশ্রম ত্যাগ করিলে আমি গোপনে উহাদের অনুসরণ করিয়াছিলাম। কিছুকাল পরে দেখিলাম, ঐ নির্ব্বোধ শ্বেতাঙ্গ ছোকরা একখান পত্র লিখিয়া চাকরটাকে সেই পত্রসহ অন্যত্র পাঠাইয়া দিল। ...অতঃপর আমি চাকরটার অনুসরণ করিয়া আমার ছোরা দ্বারা তাহাকে হত্যা করিলাম। সেই স্থান হইতে প্রায় এক শত গজ দূরে চাকরটাকে মাটীতে পুতিবার জন্য গর্ত্ত খুঁড়িতেছিলাম, সেই সময় ঐ দুটো 'বোজি' চাকরটাকে মৃতপ্রায় অবস্থায় ধরাশায়ী দেখিতে পাইল।

'আমার মাংস ভক্ষণের প্রয়োজন হওয়ায় আমি প্রতি সপ্তাহে এক দিন বা দুই দিন বাঘের চামড়ায় সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া বাঘের ছদ্মবেশে ছাগলের খোঁয়াড়ে প্রবেশ করিতাম, এবং এক একটা ছাগলকে হত্যা করিয়া লইয়া যাইতাম। গ্রামবাসীরা কয়েকবার আমাকে সেই অবস্থায় দেখিতে পাইয়াছিল; এই জন্য, পাছে তাহারা আমাকে গুলী করিয়া হত্যা করে, বা ফাঁদে আবদ্ধ করে, এই ভয়ে আমি ভবিষ্যদ্বাণী প্রচার করিলাম যে, বাঘটা সাধারণ বাঘ নহে, ও একটা ভূত, ব্যাঘ্র-দেহ ধারণ করিয়াছে; যদি কেহ উহার কোন অনিষ্ট করে, তাহা হইলে তাহার সর্ব্বনাশ হইবে, তাহার মৃত্যু সুনিশ্চিত। ঐ দুই জন শ্বেতাঙ্গ আমার ভবিষ্যদ্বাণী বিশ্বাস না করিয়া গুপ্ত রহস্য ভেদের চেষ্টা করে। উহারা ঐরূপ চেষ্টা না করিলে গ্রামের লোকরা কোনও দিন আমাকে সন্দেহ করিতে পারিত না। ব্যাঘ্র-চর্ম্মে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া ছাগবধ করিতাম, ও তাহার মাংস ভোজনে ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতাম; এই কার্য্যে নির্ব্বোধ, কুসংস্কারান্ধ গ্রামবাসীরা কোন দিন বাধাপ্রদান করিত না।'

এই পর্য্যন্ত বলিয়া সাধু ইংরেজদ্বয়ের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিল, এবং তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, 'তোমরা আমার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াও আমার প্রতি গ্রামের লোকের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস নষ্ট করিতে পারিতে না, কারণ আমি দীর্ঘকাল হইতে তাহাদিগকে সদুপদেশ দিয়াছি। আমার উপদেশে তাহারা উপকৃত হইয়াছিল। গ্রামের সকল লোক আমাকে শ্রদ্ধাভক্তি ও সম্মান করিত, এবং কোন কারণেই তাহা শিথিল হইত না। আমি যত দিন জীবিত থাকিব, তত দিন তাহাদের শ্রদ্ধাভক্তিতে বঞ্চিত না হই, ইহাই আমার কামনা। আমি তাহাদের শ্রদ্ধাভক্তিতে বঞ্চিত হইয়া বাঁচিয়া থাকিতে চাহি না।'

এই কথা বলিয়া বৃদ্ধ তাহার পরিচ্ছদের ভিতর হইতে কি একটা জিনিস বাহির করিয়া তাড়াতাড়ি তাহা মুখে পূরিল! সে যে ঐ কার্য্য করিবে, এরূপ সন্দেহ কাহারও মনে স্থান পায় নাই; এজন্য কেহই তাহাকে বাধা দান করিবার সুযোগ পাইল না। সে যে দ্রব্য মুখে পূরিল, তাহা সম্ভবতঃ কোন প্রকার তীব্র বিষ। কারণ, সে তাহা মুখে পুরিয়া গিলিবামাত্র অসাড় দেহে মাটীতে পড়িয়া গেল। যখন তাহাকে ধরিয়া উত্তোলন করা হইল, তখন তাহার দেহে প্রাণ ছিল না। তাহার বস্ত্রাঞ্চলে সংরক্ষিত বিষ সে গলাধঃকরণ করিবামাত্র প্রাণ হারাইল। সম্ভবতঃ এই সুতীব্র বিষ সে সর্ব্বদাই নিজের কাছেই রাখিত; কি কারণে সে তাহা সর্ব্বদা সঙ্গে রাখিত, অন্য লোকের তাহা জানিবার সম্ভাবনা ছিল না।

ভণ্ড সাধুর জীবনের ইতিহাস জানিবার জন্য সকলেরই আগ্রহ হইয়াছিল; বিশেষতঃ, সে কিরূপে বিশুদ্ধ ইংরেজী ভাষায় অনর্গল কথা বলিতে শিখিয়াছিল, এবং কি কারণে সে সেই নির্জ্জন অরণ্যে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া একাকী সেখানে বাস করিত, ছাগমাংস ভোজনের ইচ্ছা হইলে কেনই বা সে ব্যাঘ্রচর্ম্মে আবৃত হইয়া খোঁয়াড়ে প্রবেশ করিয়া ছাগল, ভেড়া হত্যা করিত—এ সকল ব্যাপার দুর্ব্বোধ্য রহস্য। যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও কেহ এই রহস্য ভেদ করিতে পারে নাই। তাহার আত্মহত্যার পর সরকারের পক্ষ হইতে এই ব্যাপারের তদন্ত করা হইয়াছিল; কিন্তু সরকারী তদন্তেও রহস্যান্ধকারে বিন্দুমাত্র আলোক-সম্পাত হয় নাই। তাহার জীবন ও মৃত্যু সমান রহস্য-তমসাচ্ছন্ন! সেই রহস্যভেদের সম্ভাবনা নাই।" এই স্থানেই মিঃ রবিনের বর্ণিত কাহিনী শেষ হইয়াছে।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব

(৩)

মমতার আকুলতা

রাত্রি গভীর হইয়াছে। কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকারে চারিদিক আচ্ছন্ন। শচীমাতা নিদ্রিত পুত্র নিমাইয়ের পার্শ্বে তখনও বসিয়াছিলেন। সারাদিনের পরিশ্রমে দেহ ক্লান্ত হইলেও নিদ্রিত সন্তানের দিকে চাহিয়া চাহিয়া তাঁহার প্রাণ তৃপ্ত হইতেছিল না।

অনেকগুলি সন্তানের জননী হইলেও বিশ্বরূপ ও বিশ্বম্ভর ব্যতীত তাঁহার বুক জুড়াইবার আর কেহ নাই। বিশ্বরূপ এখন বড় হইয়া পাঠাভ্যাস করিতেছেন, কিন্তু শিশু নিমাইকে লইয়াই তাঁহার চিন্তার অবধি নাই। এমন সুদর্শন, এমন রঙ্গপ্রিয়, এমন অপূর্ব্ব বুদ্ধিমান্ সন্তান আর কাহার আছে? তাঁহার মনে সর্ব্বদাই আশঙ্কা, এই দেবদুর্লভ শিশুর পাছে কোন অনিষ্ট হয়। তাই তিনি সতর্ক স্নেহ-দৃষ্টির আবরণে তাঁহাকে রক্ষা করিতে চাহেন।

এই অনুপম শিশুর প্রতি কার্য্যে, প্রতি চপল ভঙ্গিতে এমন বৈচিত্র্য, এমন অসাধারণত্ব বিকশিত যে, স্নেহময়ী জননীর প্রাণ সকল সময়েই সন্তানের জন্য উদ্বেগে ব্যাকুল হয়।

শুধু তাহাই নহে। প্রায় প্রতি রজনীতে—নির্জ্জন মুহূর্ত্তে, তাঁহার শঙ্কিত চিত্ত কত বিচিত্র অনুভূতির আবেশে আরও উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠে। তাঁহার মনে হয়, কাহারা যেন তাঁহার নিদ্রিত পুত্রের চারিপাশে নিঃশব্দে আনাগোনা করিতেছে। যেন কত উজ্জ্বল ছায়া-মূর্ত্তি তাঁহার নিমাইয়ের পার্শ্বে ভিড় করিয়া রহিয়াছে।

নয়ন মার্জ্জনা করিয়া তিনি আবার পুত্রের দেহে হাত রাখিয়া চারিদিকে চাহিতে থাকেন। কই? কোথাও ত কিছু নাই। তবে কি তাঁহার চিন্তা-শ্রান্ত মস্তিষ্কের বিকার মাত্র?

এইরূপ অনুভূতি নিমাইয়ের জন্মকাল হইতে তাঁহার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। প্রথমতঃ তিনি ভীত হইতেন। কিন্তু নিত্য অনুরূপ অবস্থার ফলে তাঁহার মনে সাহসের সঞ্চার হইয়াছিল।

আজ তাঁহার নয়নে নিদ্রা ছিল না। নিদ্রিত পুত্রের সুন্দর আননের সুষমা দেখিয়া তিনি বিভোর হইয়াছিলেন।

চারিদিক্ গাঢ় নীরবতায় পূর্ণ। সমগ্র নবদ্বীপ তখন নিদ্রার ক্রোড়ে সুপ্ত। পার্শ্বের কক্ষে জগন্নাথ মিশ্রের নাসিকাগর্জ্জন শুনা যাইতেছিল।

সহসা তাঁহার মনে হইল, সুপ্ত সন্তানের চারিদিকে যেন দিব্য জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি-সমূহের আবির্ভাব হইয়াছে।

শচী দেবী চমকিয়া উঠিলেন। অমনই তাঁহার চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইয়া গেল। তাঁহার মনে হইল, নিমাইকে তাঁহার পিতার পার্শ্বে শয়ন করাইলে এ সকল দৃশ্যের অভিনয় বন্ধ হইয়া যাইবে। কে জানে, এই সকল ব্যাপারে নিমাইয়ের কোন অকল্যাণ হইবে কি না?

শঙ্কাকাতর মাতৃহৃদয় আর বাধা মানিল না। তিনি স্বামীকে ডাকিলেন। জগন্নাথ মিশ্র পার্শ্বের কক্ষ হইতে বলিলেন, "কি বলছ?"

মাতার আহ্বানে নিমাইও তখন নিদ্রাভঙ্গে শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়াছিলেন।

শচীদেবী বলিলেন, "নিমাইকে তোমার ঘরে নিয়ে যাও।"

মাতাকে চুম্বন প্রদান করিয়া নিমাই স্বচ্ছন্দ লঘুগতিতে বারান্দা দিয়া পিতার ঘরে চলিলেন।

সহসা শচীমাতার কাণে যেন অতি মধুর নূপুর-ধ্বনি বাজিয়া উঠিল। বিস্ময়াভিভূতা শচীদেবী দ্বারপ্রান্তে আসিয়া দেখিলেন, জগন্নাথ পুত্রের হাত ধরিয়া কক্ষে প্রবেশ করিতেছেন।

জননীও সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। নিমাই পিতার শয্যায় শয়ন করিয়াই ঘুমাইয়া পড়িলেন।

শচীদেবী দেখিলেন, পুত্রের পায় নূপুর ত নাই! তবে কোথা হইতে এমন মধুর নূপুরধ্বনি অনুরণিত হইল? সবিস্ময়ে তিনি স্বামীর মুখের দিকে চাহিলেন। জগন্নাথ মিশ্রও নূপুরধ্বনি শুনিতে পাইয়াছিলেন।

পতি ও পত্নী নিদ্রিত পুত্রের পার্শ্বে বসিলেন।

জগন্নাথ বলিলেন, "বড় আশ্চর্য্য! আমিও নূপুরধ্বনি শুনেছি। আমাদের ছেলের দেহে কি গোপাল বিরাজ করেন?"

শচীদেবী উদ্বিগ্নভাবে বলিলেন, 'কি জানি! তা যিনিই থাকুন, আমার ছেলের কোন অকল্যাণ না হলেই হল।"

মিশ্র বলিলেন, "আজ নূতন নয়। আর একদিন আমি নিমাইকে আমার পুঁথি আন্‌তে ও-ঘরে পাঠিয়েছিলুম। তখনো ঘরে নূপুরের রুনু-ঝুনু শুনেছিলুম। তোমাকেও সে কথা বলেছিলুম। বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার!" নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে শচীদেবীর মুগ্ধনেত্রে আনন্দাশ্রু উথলিয়া উঠিল।

মিশ্র বলিলেন, "দেখ, ঘরে দামোদর আছেন। এ হয় ত তাঁরই লীলা। তুমি ভাল ক'রে রোজ তাঁর পরমান্ন ভোগ দেবে, বুঝেছ?"

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত বলিতেছেন:—

"মিশ্র বোলে, 'শুন বিশ্বরূপের জননি!
ঘৃতপরমান্ন গিয়া রান্ধহ আপনি॥
ঘরে যে আছেন দামোদর শালগ্রাম।
পঞ্চগব্যে সকালে করাব তাঁকে স্নান॥
বুঝিলাঙ তিঁহো ঘরে বুলেন আপনি।
অতএব শুনিলাঙ নূপুরের ধ্বনি॥"

স্বামীর কথা শুনিয়াও শচীদেবীর উদ্বেগ দূর হইল না।

বিচিত্র চাপল্য

জগন্নাথ মিশ্র বাহিরের ঘরে বসিয়াছিলেন। রৌদ্র তখনও খুব প্রখর হয় নাই। এমন সময় একজন ব্রাহ্মণ কৃষ্ণনাম জপিতে জপিতে তথায় আসিলেন। ব্রাহ্মণের পরিব্রাজকের বেশ। জগন্নাথ তাঁহাকে সমাদরে আহ্বান করিলেন।

পরিচয়ে জানিলেন, নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া ব্রাহ্মণ নবদ্বীপে আসিয়াছেন। তিনি ষড়ক্ষর গোপাল মন্ত্রের উপাসক। চিত্তবিক্ষোভে গৃহত্যাগ করিয়া তিনি তীর্থ-দর্শনে বাহির হইয়াছেন।

ব্রহ্মণ্যতেজঃ-সমন্বিত ভক্তপ্রবরকে জগন্নাথ মিশ্র আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য দ্বারা তাঁহার সেবার ব্যবস্থা করিলেন। ব্রাহ্মণের স্বহস্তে পাকের জন্য উপকরণ আনিয়া দিলেন।

পূজান্তে অন্ন-ব্যঞ্জন রন্ধন করিয়া পরিপাটিরূপে ভোগ সাজাইয়া ব্রাহ্মণ স্তিমিত নেত্রে ইষ্টদেবতার ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন।

সহসা ধূলিধূসরিত দেহে নিমাই সেখানে উপস্থিত হইয়া সজ্জিত ভোগ-পাত্র হইতে অন্ন লইয়া মুখে দিলেন। বিপ্র তাহা দেখিয়া

"'হায় হায়' করি ভাগ্যবন্ত বিপ্র ডাকে।
অন্ন চুরি করিলেক চঞ্চল বালকে।"

ব্রাহ্মণের চীৎকার শুনিয়া মিশ্র তথায় আসিলেন এবং পুত্রকে মারিতে গেলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন, "আপনি শান্ত হোন্। ছোট ছেলেকে মারবেন না।"

"বিপ্র বোলে, মিশ্র! তুমি বড় দেখি আর্য্য।
কোন্ জ্ঞান বালকের মারিয়া কিবা কার্য্য?
ভাল মন্দ জ্ঞান যার থাকে মারি তারে।
আমার শপথ যদি মারহ উহারে॥"

কিন্তু ক্ষুধার্ত্ত অতিথির মধ্যাহ্নের অন্ন নষ্ট হইল দেখিয়া মিশ্র মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। অতিথি বলিলেন, "আপনি দুঃখ করবেন না। ফল-মূল যদি ঘরে কিছু থাকে, তাই এনে দিন, তাতেই আমার তৃপ্তি হবে!"

জগন্নাথ মিশ্র তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারেন না। ব্রাহ্মণ-গৃহে দ্বিপ্রহরে ব্রাহ্মণ অতিথি শুধু ফল-মূল খাইয়া থাকিবেন, ইহাতে তাঁহার গার্হস্থ্য ধর্ম্ম ক্ষুণ্ণ হইবে। তিনি বিপ্রকে আবার অন্ন-ব্যঞ্জনাদি পাক করিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিলেন। নহিলে তাঁহার তৃপ্তি হইবে না।

অতিথি স্বীকৃত হইলেন। সমস্ত স্থান পরিষ্কার করিয়া রন্ধনের আয়োজন হইল। বিপ্র আবার পাক করিতে বসিলেন।

চঞ্চল বালক পুনরায় ব্রাহ্মণের অন্ন নষ্ট করিতে পারেন, এই আশঙ্কায় শচীদেবী পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া প্রতিবেশীর গৃহে গমন করিলেন।

ব্রাহ্মণ পুনরায় অন্ন-ব্যঞ্জন রন্ধন করিয়া ইষ্টদেবতাকে নিবেদন করিবার জন্য ধ্যানমগ্ন হইলেন।

শচীদেবী প্রতিবেশিনীর গৃহে গিয়া পুত্রকে ক্রোড় হইতে নামাইয়া অন্য রমণীগণের সহিত নানা আলোচনায়

মগ্ন হইলেন। নিমাই অদূরে বসিয়া খেলা করিতে লা।

গল্প-গুজবে রমণীরা যখন আত্মবিস্মৃতপ্রায়, সেই সুযোগে নিমাই সেখান হইতে পলায়ন করিলেন।

এদিকে ব্রাহ্মণ ইষ্টদেবতাকে ধ্যান করিবার পর যেমন নয়ন উন্মীলিত করিয়াছেন, অমনই তিনি সবিস্ময়ে দেখিলেন, সেই বালক তাঁহার নিবেদিত অন্ন-ব্যঞ্জন হইতে এক গ্রাস অন্ন তুলিয়া হাস্যমুখে আহার করিতেছেন।

বিপ্র হায় হায় করিয়া উঠিলেন। জগন্নাথ মিশ্র এবং অন্যান্য সকলে তথায় দৌড়িয়া আসিয়া নিমাইয়ের কীর্ত্তি দেখিলেন। এবার মিশ্র আর আত্মসংবরণ করিতে না পারিয়া পুত্রকে তাড়া করিয়া গেলেন। নিমাই দৌড়াইয়া আর একটি ঘরে পলাইয়া গেলেন। জগন্নাথ তাঁহাকে প্রহার করিবার জন্য ধাবিত হইলেন।

বাধা দিয়া অতিথি বলিলেন, "ছেলে মানুষকে মারবেন না। আজ শ্রীকৃষ্ণ আমার অদৃষ্টে অন্ন মাপেন নি। মানুষ চেষ্টা করলে কি হবে বলুন? কিছু ফল-মূল আনুন, তাই নিবেদন করে গ্রহণ করব।"

জগন্নাথ মাথা নত করিয়া রহিলেন।

ঠিক এই সময় বিশ্বরূপ তথায় আসিলেন। এই কান্তিমান্ প্রিয়দর্শন কিশোর ব্রাহ্মণতনয়কে দেখিয়া অতিথি মুগ্ধদৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এটি কার ছেলে?"

সমবেত প্রতিবেশিগণের এক জন বলিলেন যে, বিশ্বরূপ জগন্নাথ মিশ্রেরই জ্যেষ্ঠ পুত্র।

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "অতি চমৎকার ছেলে।"

তখন কিশোর বিশ্বরূপ বলিলেন, "দু'বার আপনার আহার্য্য নষ্ট হয়েছে। এজন্য মনে বড় দুঃখ পেয়েছি। আপনি যদি দয়া ক'রে আর একবার রন্ধন করেন। তাহ'লে আমরা কৃতার্থ হব।"

অতিথি বলিলেন, "বাবা! আজ বিধাতার ইচ্ছে নয়, আমি অন্ন গ্রহণ করি। কিছু ফল এনে দেও, তাতেই আমার যথেষ্ট হবে। সব দিন ত আমাদের মত লোকের অন্ন জোটে না। তাতে দুঃখ করবার কিছু নেই।"

কিন্তু বিশ্বরূপ কোন কথা শুনিলেন না। তিনি সকাতরে ব্রাহ্মণকে আর একবার রন্ধনের জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ তাহাতে সম্মত হইলেন না দেখিয়া বিশ্বরূপ তাঁহার চরণ ধারণ করিলেন।

তখন অতিথি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না।

পুনরায় রন্ধনের আয়োজন হইল।

নিমাই যে ঘরে আত্মগোপন করিয়াছিলেন, চারিদিক্ হইতে তাহার নির্গমন-পথ বন্ধ করিয়া মাঝের দরজায় জগন্নাথ মিশ্র পাহারায় বসিলেন।

নিমাই তখন ভূমিতলে নিদ্রামগ্ন।

অতিথির পাক শেষ হইতে বেলা গড়াইয়া গেল। যাহারা পাহারা দিতেছিলেন, বসিয়া বসিয়া তাঁহারা ক্লান্তিভারে তন্দ্রাচ্ছন্ন।

ব্রাহ্মণ পুনর্ব্বার অন্ন সাজাইয়া ইষ্টদেবকে ধ্যান করিতে লাগিলেন।

ধ্যানভঙ্গের পর ব্রাহ্মণ স্তব্ধ-বিস্ময়ে দেখিলেন, তন্দ্রাচ্ছন্ন জগন্নাথ মিশ্র প্রভৃতির অগোচরে সেই অনুপমকান্তি বালক তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া।

নিমাই স্মিতমুখে মধুর কণ্ঠে বলিলেন, "তুমি আমায় ডাক্‌ছিলে?"

অতিথির বিস্ময় চরম সীমায় পৌঁছিয়াছিল। তিনি ভাবিলেন, কে এই প্রিয়দর্শন বালক?

আজ বারংবার অন্ননিবেদনের সময় কেন ইনি দর্শন দিয়া অন্নগ্রহণ করিতেছেন? এমন মোহন রূপ, দিব্যদ্যুতি ত তিনি কাহারও দেহে দেখেন নাই!

নিমাই মধুর হাসি হাসিয়া বলিলেন, "আবার আমি এসেছি। কাকেও বলো না তুমি, বুঝেছ?"

ব্রাহ্মণের দেহ অকস্মাৎ স্বেদ-কম্প-পুলকে শিহরিয়া উঠিল। ভাবাবেশে তিনি ঢলিয়া পড়িলেন।

"পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছা বিপ্র যায় ভূমিতলে।
পুনঃ উঠে পুনঃ পড়ে মহাকুতূহলে॥"

নিমাই সেই অবকাশে আবার সকলের অগোচরে ঘরের মধ্যে গিয়া ভূমিশয্যা গ্রহণ করিলেন।

এদিকে—

"সর্ব্ব অঙ্গে সেই অন্ন করিয়া লেপন।
কান্দিতে কান্দিতে বিপ্র করেন ভোজন॥
নাচে, গায়, হাসে, বিপ্র করয়ে হুঙ্কার।
'জয় বাল-গোপাল' বলয়ে বার বার॥

বিপ্রের হুঙ্কারে সভে পাইলা চেতন।
আপনা সংবরি বিপ্র কৈলা আচমন॥
নির্ব্বিঘ্নে ভোজন করিলেন বিপ্রবর।
দেখি সভে সন্তোষ হইলা বহুতর॥"

জলক্রীড়া

প্রত্যুষে গঙ্গাস্নানের পর আলুলায়িত কুন্তলে শচীদেবী গৃহকর্ম্ম করিতেছিলেন। নিমাই পড়িতে গিয়াছেন, পাঠশেষে ক্ষুধার্ত্ত বালক আসিয়া খাইতে চাহিবেন, মাতা তাই ব্যস্তভাবে রন্ধনাদির উদ্যোগে মন দিলেন।

প্রাঙ্গণে কলরব শুনিয়া তিনি ঘরের বাহিরে আসিলেন।

কয়েক জন সিক্তবসনা বালিকা প্রাঙ্গণে জটলা করিতেছিল। শচীমাতা সহাস্য বদনে বলিলেন, "কি গো, মা-লক্ষ্মীরা! তোমরা ভিজে কাপড়ে এমন অসময়ে যে?"

পুরোবর্ত্তিনী বলিল, "আপনার নিমায়ের জ্বালায় আমাদের স্নান করা দায় হয়ে উঠেছে, শচীমা?"

তেমনই প্রসন্ন হাস্যসহকারে শচীদেবী বলিলেন, "কেন? কি হ'ল, বাছা?"

অপর বালিকা ঝাঁঝাল স্বরে বলিল, "আমাদের গায়ে জল ছিটিয়ে দেয়।"

আর এক জন বলিল, "কাপড় নিয়ে লুকিয়ে রাখে।"

তৃতীয়া বালিকা বেশ গম্ভীরভাবে বলিল, "শুধু তাই? ব্রতের জন্য ফল-ফুল এনে ঘাটে রাখবার যো নাই, নিমাই আর তার দলের ছেলেরা সব ছড়িয়ে ফেলে দেয়, রোজ এম্‌নি ক'রে আমাদের বিরক্ত করে তোমার ছেলে।"

আর একটি বালিকা শচীদেবীর কাছে আসিয়া বলিল, "আমার মুখে, কাণে কুলকুচো করা জল ফেলেছে!"

শচীদেবীর নিকট প্রায়ই এইরূপ অভিযোগ আসিত। তিনি একে একে তাহাদের চিবুক স্পর্শ করিয়া মিষ্ট স্বরে বলিলেন, "নিমাই বাড়ী আসুক, তাকে এবার থেকে বেঁধে রাখ্‌ব। যাতে সে আর তোমাদের বিরক্ত করতে না পারে তার ব্যবস্থা করবো। তার ওপর তোমরা রাগ করো না, মা-লক্ষ্মীরা!"

বালিকার দল পরিতুষ্ট হইল। যাইবার সময় দলের পুরোবর্ত্তিনী বালিকাটি বলিল, "তাই বলে নিমাইকে যেন মারবেন না, শচীমা!"

বালিকারা প্রায় সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "না, না, নিমাইকে মারলে আমরা মনে ব্যথা পাব, শচী-মা!"

"শচীর চরণ-ধূলি লই সভে শিরে।
তবে চলিলেন পুনঃ স্নান করিবারে॥"

শচীদেবীর নিকট অভিযোগের ব্যবস্থা যাহাই হউক, জগন্নাথ মিশ্র মহাশয়ের কাছে বয়স্ক ব্রাহ্মণগণের অভিযোগ গুরুতর। কয়েক জন বিপ্র আসিয়া তাঁহাকে জানাইয়া গেলেন, একপাল বালখিল্য সঙ্গী লইয়া মিশ্রনন্দন তাঁহাদিগকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছেন। নির্ভীক্ বালকের দল গঙ্গার জলে সাঁতার দিতে দিতে এমনভাবে পা ছুড়িতে থাকে যে, চরণাহত জল স্নানান্তে পূজাকালে ছিটকাইয়া তাঁহাদিগের গায় লাগে। কাহারও শিবলিঙ্গ অন্তর্হিত হয়, কাহারও পুষ্প, চন্দন, দূর্ব্বা, নৈবেদ্য সবই বালকের দল নষ্ট করিয়া দেয়। নিমাই জল দিয়া কাহারও ধ্যানভঙ্গ করেন, কাহারও উত্তরীয় অকস্মাৎ অদৃশ্য হইয়া যায়। এরূপ উৎপাত অবিরত চলিতেছে।

এই দৌরাত্ম্যের বর্ণনা শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এইরূপ :—

"কেহ বোলে, 'পুষ্প, দূর্ব্বা, নৈবেদ্য, চন্দন।
বিষ্ণু পূজিবার সজ্জ বিষ্ণুর আসন॥
আমি করি স্নান, হেথা বৈসে সে আসনে।
সব খাই পড়ি' তবে করে পলায়নে'॥"

বিপ্রগণের এই অভিযোগ শুনিয়া জগন্নাথ মিশ্র আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি যষ্টিহস্তে সক্রোধে গঙ্গার দিকে চলিলেন।

নবদ্বীপের নিম্নে তরঙ্গ-ভঙ্গ-চঞ্চল গঙ্গার বিশাল জলস্রোত। গঙ্গাতটে সারি সারি স্নানের ঘাট—অসংখ্য নরনারী স্নান করিতেছেন, পূজা-তর্পণে সকলে ব্যস্ত।

পুত্রের সন্ধানে জগন্নাথ মিশ্র চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন। কিন্তু কোথাও সেই সোণার বরণ নিমাইকে দেখিতে পাইলেন না। এক ঘাটে নিমাইয়ের সমবয়স্ক অনেকগুলি বালক স্নান করিতেছিল—সাঁতার দিতেছিল।

তিনি তাহাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "নিমাই কোথায়?"

বালকদল কলকোলাহল করিয়া বলিয়া উঠিল, "নিমাই ত আজ আসেনি!"

বালিকারা পুনরায় স্নান করিতে আসিয়া তাহাদিগকে বলিয়া দিয়াছিল, জগন্নাথ মিশ্র আসিতেছেন ! জগন্নাথ ত তাহা জানিতেন না।

তিনি বলিলেন, "নিমাই আসে নি ?"

এক জন বালক সাহস করিয়া বলিল, "লেখাপড়া শেষ হবার পর নিমাই ত আপনাদের বাড়ীর দিকেই চলে গেছে।"

কিন্তু জগন্নাথ মিশ্র এত সহজে সন্ধানে বিরত হইলেন না।

"চারিদিকে চাহে মিশ্র হাতে বাড়ি লইয়া।
তর্জ্জ-গর্জ্জ করে বড় লাগ না পাইয়া ॥"

মিশ্রবরকে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও বিচলিত দেখিয়া, স্নান শেষে কয়েক জন ব্রাহ্মণ তাঁহার কাছে আসিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে ক্রোধ সংবরণ করিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

"ভয় পাই বিশ্বম্ভর পলাইয়া ঘরে।
ঘরে চল তুমি, কিছু বোল পাছে তারে ॥
আর বার আসি যদি চপলতা করে।
আমরাই ধরি দিব তোমার গোচরে ॥"

জগন্নাথ মিশ্র তখন শান্ত চিত্তে গৃহে ফিরিলেন।

বাড়ী আসিয়া তিনি দেখিলেন, পত্নী শচীদেবী নিমাইকে তেল মাখাইতেছেন। পূর্ব্বের স্নানের কোন চিহ্ন নিমাইয়ের দেহে নাই। পাঠশালার পড়ুয়ার ন্যায় দেহের স্থানে স্থানে কালীর দাগ—যে বস্ত্র পরিধান করিয়া পুত্র পাঠাভ্যাস করিতে গিয়াছিলেন, অঙ্গে সেই শুষ্ক বস্ত্র, আঙ্গিনার উপর পুঁথি।

তৈল মাখিয়া নিমাই গঙ্গার দিকে দৌড়িলেন।

জগন্নাথ মিশ্র এবং শচীদেবী তখন ভাবিতেছিলেন, এ কি ব্যাপার ! বালিকারা ও বিপ্রগণ যাহা বলিয়া গেলেন, তাহা ত মিথ্যা নহে ! তবে ?

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতকার লিখিয়াছেন—

"যে যে কহিলেন কথা সেহো মিথ্যা নহে।
তবে কেন স্নান-চিহ্ন কিছু নাহি দেহে ?
সেই মত অঙ্গে ধূলা, সেই মত বেশ।
সেই পুঁথি, সেই বস্ত্র, সেই মত কেশ ॥"

ভাবিতে ভাবিতে উভয়ের দেহ বিস্ময়ানন্দে শিহরিয়া উঠিল।

[ক্রমশঃ ।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

উন্মেষ

কাব্য-মুকুল জাগে অন্তরে বাহিরে ফোটে না ছন্দ,
আখরে তাহারে পারি না সাজাতে তাই মনে জাগে দ্বন্দ।
ফাল্গুনী নিশা হারাইয়া যায়, রাখিতে তাহারে পারি না পাতায়,
অন্তরে মোর মুকুল ফুটিল বাহিরে এল না গন্ধ ;
হিয়ার সায়রে জাগিল কমল বৃথা হলো মকরন্দ ॥

বিশ্বের বীণ মর্ম্মের সাথে মর্ম্ম মিলেছে মোর,
মানসে মানসী আসিয়াছে আজি নাই যে উপমা ওর।
চরণে যে তার বাজে কিঙ্কিণী, লেখনী বলিছে চিনি চিনি চিনি'
কিন্তু যে তার ফোটেনি বরণ অভাগা লেখনী মোর ;
প্রথম প্রভাতে চেয়েছি আঁকিতে এল যে তামসী ঘোর ॥

কাজল আকাশে বাদল নেমেছে রাগিণী হয়েছে সুরু,
শীর্ণ লতিকা মুঞ্জরি ওঠে লভে আশ্রয়-তরু।
কেয়ার সুবাস ভরা বন-পথে, চলি উন্মনা দূর নদী-তটে,
ভাবের রাজ্য যেন ফুটে ফুটে মন করে দুরু দুরু ;
আকাশে স্বনিছে বাদলের মেঘ সুগভীর গুরু গুরু ॥

স্বপন দেখিছে রজনীগন্ধা সবুজ পত্র-দলে,
নয়ন দেখিছে আষাঢ়-সন্ধ্যা নব জলধর-কোলে।
কত দেখি মোর বাতায়ন পরে, দূর হতে ঐ দূর প্রান্তরে,
শৈলশিখরে স্বর্ণ-প্রদীপ ধ্রুব-তারাখানি জ্বলে ;
অন্তরে মোর কবিতা-উৎস থেকে থেকে উচ্ছলে ॥

শ্রীমতী শোভা দেবী।

সুরের মায়া

গল্প

মাঘ মাসের শেষে যে এমন সৃষ্টিছাড়া বৃষ্টি হয়, তাহা কস্মিনকালেও জানা ছিল না। বরদাসুন্দরী দেবী আজ তিন চারি দিন কোথাও বাহির হইতে পান নাই। তাঁহার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া উঠিয়াছে। শেষে আর থাকিতে পারিলেন না, ড্রাইভারকে ডাকিয়া গাড়ীখানা বাহির করিতে আদেশ দিয়া ফেলিলেন। বেশী দূর না হয়, একবার মালতীর ওখান হইতে ঘুরিয়া আসিবেন। সন্ধ্যার দিকে তখন সামান্য ক্ষণের জন্য বৃষ্টিটা ধরিয়াছিল। আকাশ কিন্তু মেঘাবৃত হইয়াই ছিল, থাকিয়া থাকিয়া দমকা বাতাস দিতেছিল। দামী গাড়ী লেশমাত্র শব্দ না করিয়া নিস্তরঙ্গ অবাধগতিতে পথে যাইতেছিল, বরদাসুন্দরী উৎসুক হইয়া ভাবিতেছিলেন, আজ মালতীর কাছ হইতে কৌশলে জানিয়া লইবেন, তাহার মেয়ে অশোকার কোর্টশীপ্ কত দূর। পরের হাঁড়ীর খবর লইবার কল্পনামাত্রই তাঁহার অবসাদগ্রস্ত মনকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিল। মালতীদের বাড়ীর গেটের সম্মুখে গাড়ী থামিল। বাগানের আইভি-লতা ও রজনীগন্ধা গাছগুলির উপর বৃষ্টিবিন্দু ঝলমল করিতেছে। একটি সজল সুঘ্রাণ উঠিতেছে। গেটের কাছে খুব উজ্জ্বল একটা বিজলীবাতি জলিতেছে। মোটর হইতে নামিয়া বরদাসুন্দরী ভিতরে প্রবেশ করিলেন। সম্মুখের হলঘরে পর্দা ফেলা। নেটের পর্দার স্বচ্ছ আবরণ ভেদ করিয়া ভিতরের নীলাভ আলো বিচ্ছুরিত হইতেছে। এস্রাজের সুরের সহিত সুর মিলাইয়া কে গাহিতেছে—

"আবার শ্রাবণ হয়ে এলে ফিরে
মেঘ-আঁচলে নিলে ঘিরে।"

বরদাসুন্দরী যদিও কোন কালে সুররসিক নহেন, তথাপি মেঘাবৃত আকাশ এবং সজল বাতাসের সহিত মিশিত হইয়া মেঘ-মল্লারের করুণ সুর তাঁহার মন্দ লাগিল না। সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে উঠিতে তিনি মনে মনে কহিলেন, "না, অশোকা মেয়েটা গান বেশ গায়। গলাটা মিষ্টি।"

মালতী—তাঁহার সখী এবং এ বাড়ীর গৃহিণী, তখন জানালার কাছে একটা চেয়ারে বসিয়া উলের সোয়েটার বুনিতেছিলেন।

পরস্পরের স্বাগত সম্ভাষণ শেষ হইবার পর বরদাসুন্দরী কহিলেন, "তোমার ভাই অধ্যবসায় খুব। আমি তো মোটে উল কাঁটা নিয়ে অতক্ষণ বসতে পারিনে। সে-দিন অনাথসদন থেকে দিতে এসেছিল। তারা বলে, আপনারা অবসর সময়ে সোয়েটার, জাম্পার, স্কার্ফ এই সব বুনে দিন। আমরা বিক্রী করে লাভটা অনাথসদনে দিই। তা আমার ভাই অত ধৈর্য্য নেই। বসে বসে এক-মনে ঘর গুণে-গুণে বুনে যাও, অত পারিনে।"

মালতী ক্ষীণ হাস্যে কহিলেন, "এগুলো অনাথসদনেরই। বুনছি। কি করবো, মানুষে যখন চিন্তা করে, তখন হাতে একটা লোকদেখানো কায চাই। সেটার আড়ালে আত্মগোপন করা যায়।"

বরদাসুন্দরী চাপিয়া বসিলেন, "কিসের এত চিন্তা, ভাই, তোমার? একটি তো মোটে মেয়ে। মেয়ে সুন্দরী, গুণবতী। অমন গলা—অমন লেখাপড়া!"

প্রত্যুত্তরে মালতী কিছু বলিলেন না। শুধু একটুখানি ম্লান হাস্যে তাঁহার নিঃশব্দ অধরোষ্ঠ রঞ্জিত হইল। আঙ্গুলগুলি

ক্ষিপ্র নিপুণতায় উল এবং কাঁটা লইয়া যেন খেলা করিয়া চলিল। খোলা জানালা দিয়া অশোকার গানের কথাগুলি তখন সুরসহযোগে ভাসিয়া আসিতেছিল—

"আবার শ্রাবণ হয়ে এলে ফিরে
মেঘ-আঁচলে নিলে ঘিরে।
সূর্য্য হারায় হারায় তারা।
আঁধারে পথ হয় যে হারা।
ঢেউ দিয়েছে নদীর নীরে"……

সহসা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া মালতী কহিলেন, "না ভাই, এর চেয়ে সেকেলে হিঁদু-বাড়ীর যে প্রথা—ঘটক এলো, পাত্রের সন্ধান দিলে, সব দিক দেখে-শুনে ভালো দেখে মা-বাপে একটা বেছে বিয়ে দিয়ে দিলে নিশ্চিন্দি। সে ঢের ভালো। আর আমাদের যেন হয়েছে সংশয়ের বেড়া-আগুনের মধ্যে বাস। বুঝবার অহঙ্কার করি, অথচ কিছুই বুঝে উঠ্‌তে পারিনে।"

বরদাসুন্দরী জিজ্ঞাসুভাবে তাঁহার দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া ব্যাপারটা নিজে সম্যক্‌রূপে বুঝিবার চেষ্টা করিয়া অবশেষে বলিলেন, "কেন কি হয়েছে? অজিতকে কি অশোকার পছন্দ হয়নি? আমরা তো প্রতিদিন আশা করছি—কবে অজিত আর অশোকার বাক্‌দান উৎসবে যোগ দেব।"

মালতীর ইচ্ছা ছিল না বরদাসুন্দরীর কাছে কোন কথা বলেন। কারণ, তাঁহার কাছে কোন কথা বলা মানেই গোটা সহরটিতে অচিরাৎ সে খবর রাষ্ট্র হওয়া। কিন্তু ঝোঁকের মাথায় একবার যখন বলিতে সুরু করিয়াছেন, থামিতে পারিলেন না। বলিলেন, "সেই তো ঠিক হয়ে আছে। কিন্তু সভ্য সমাজের অতিসভ্য বিধান—ছেলে-মেয়েরা পরস্পরের মত জানাবে। ওরা কিন্তু হাঁ বলে না, না-ও বলে না। একটা অনিশ্চিত উদ্বেগের মধ্যে দিনগুলো কেটে যাচ্ছে। কিছুই ধরা-ছোঁওয়া যাচ্ছে না। ভারি অশান্তিতে আছি।"

বরদাসুন্দরী একাধারে ভরসা ও আশ্বাস দিয়া কহিলেন, "ও ঠিক হয়ে যাবে। যত দিন যাচ্ছে, মানুষের মন ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হচ্ছে কি না। এই দেখ না, আমাদের সময়ে আমরা মোটামুটি যা বুঝতাম—যা ভাবতাম—সে কথার যে মানে ধরতাম, আমাদের ছেলেমেয়েরা তার চেয়ে অনেক বেশী বোঝে, অনেক ভাবে এবং অনেক রকম মানে বার করে। তা ভাবনা কিছু নেই। অশোকার যেমন সুন্দর এস্রাজে হাত আর যা মিষ্টি গলা, শীগ্‌গীর সব ঠিক হয়ে যাবে। অজিতের সামনে গান-টান করে তো?"

মালতী হাসিয়া বলিলেন, "তা করে বই কি। গান মাঝে মাঝে করে।"

অতঃপর আরও কিছুক্ষণ বসিয়া বরদাসুন্দরী বিদায় লইলেন; আজ যখন বাহির হইয়াছেন, আরও দুই-এক বাড়ী বেড়াইয়া খবরাখবর লইয়া ফিরিবেন। তিনি চলিয়া গেলেন, কিন্তু মালতী বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। বরদা-সুন্দরী-কথিত স্থূল ও সূক্ষ্মের উপমাটি তাঁহার ভারি মনে লাগিয়াছিল। মনে মনে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেন, ঐ কথাটার ভিতরেই সমস্ত সমস্যাটা নিহিত রহিয়াছে। আধুনিক ছেলেমেয়েরা একটা কথার এত রকম মানে বাহির করে এবং প্রত্যেকটি কথা চিরিয়া-চুনিয়া বিশ্লেষণ করিয়া এমন একটা ব্যাপার করিয়া তুলে যে, নিজেদের মনের ভাব নিজেদের পক্ষে সঠিক করিয়া জানাও একটা বৃহৎ কাণ্ড হইয়া দাঁড়ায়।

তার পর ঐ গানের কথা। বরদাসুন্দরী তাড়াতাড়ি করিয়া যে প্রশ্ন করিলেন, অশোকা অজিতের সামনে গান-টান গায় তো? ঐ প্রশ্নটা শুনিয়া প্রথমে হাসি পাইয়াছিল বটে, কিন্তু যখন নিজেরই অতীত জীবনের বিস্মৃত দিনগুলির কথা মনে পড়িয়া গেল, তখন হাসির পরিবর্তে মুখে একটা গাঢ় তন্ময়তার ভাব ফুটিয়া উঠিল। খোলা জানালা দিয়া ঝড়ের রাতের এলোমেলো বাতাস আসিতেছে। বাতাসে আসন্ন বৃষ্টির আহ্বান-ধ্বনি; অলস-শিথিল অঙ্গুলী হইতে উল এবং কাঁটাগুলি কখন স্খলিত হইয়া পড়িয়া গিয়াছে।

মালতীর নয়ন সম্মুখে তাঁহার অতীত দিনগুলি কত বৎসরের উজান ঠেলিয়া বাস্তব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আজ যেমন তাঁহার মেয়ে অশোকার মনের কথা জানিতে না পারিয়া তিনি ব্যাকুল হইয়াছেন, তেমনই এক দিন তাঁহার তরুণ মনের রহস্যঘন আলো-ছায়ার খেলা বুঝিয়া উঠিতে না পারিয়া তাঁহার নিকটতম আত্মীয়জনরা উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিল।

অশোকার বাবা কমলকৃষ্ণ চ্যাটার্জ্জি—আজ যিনি রিটায়ার্ড সিভিলিয়ান, আপন লাইব্রেরীর কোণে এবং ক্লাবে বিলিয়ার্ড খেলিয়া দিনের অধিকাংশ সময় কাটান—এক দিন তিনি অভিমানী ভীরু লাজুক যুবক ছিলেন। তন্বী তরুণী মালতীকে দেখিয়া তাহার দেহে সমস্ত অস্তিত্ব তাঁহার প্রবল আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু লাজুক ভীরু প্রকৃতি। মনের কথা মুখে আনিতে দেয় না। অভিমান আসিয়া বাধা দেয় প্রতি পদে। যাহাকে জানাইবেন মনের কথা—সে যদি জানিতে না চায়, যদি তাহারও মনে অনুরূপ তরঙ্গ না উঠে, তবে সে লজ্জা রাখিবার যে জায়গা হইবে না। কথা বলিতে বলিতে চোখে জল আসিয়া পড়ে, সামান্য কিছু জিজ্ঞাসা করিতে হইলে গলার সুর কাঁপিয়া যায়, বিহ্বল মনের অনেক ভাষা তুটি চোখের তারা ব্যক্ত করিয়া দেয়; কিন্তু তবু মুখ ফুটিয়া কিছু বলেন না। তু'জনে দেখা হয় চায়ের নিমন্ত্রণে। দেখা হয় সন্ধ্যার স্নিগ্ধতায় বাড়ীর বাগানে—যেখানে গ্রীষ্মের দিবাবসানে পারিবারিক মজলিস বসে। দেখা হয় টেনিস খেলার সঙ্গিরূপে। দেখা হয় আরও ছোট-খাট নানা ছল-ছুতায়। কিন্তু তু'জনেই তু'জনের সম্বন্ধে সমান আশঙ্কা-ধর্ম্মী—সমান ভীরু। এদিকে আত্মজনরা ক্রমে অধীর হইয়া উঠিতেছেন। ব্যবহারিক দিক্ দিয়া এ সম্বন্ধ তাঁহাদের কাছে একান্ত বাঞ্ছনীয় মনে হয়। তাই তাঁহারা নানা প্রকারে সুবিধা করিয়া দেন—তু'জনের একত্র নিভৃতে আলাপনের। তবু যদি তাহারা স্পষ্ট করিয়া কিছু বলে!

সে দিনটা এমনই মেঘাচ্ছন্ন দিন ছিল। মালতী একা ঘরে বসিয়া আনমনে একটা বইয়ের পাতা উলটাইয়া যাইতেছিল, কমলকৃষ্ণ ঘরে ঢুকিলেন ঢুকিয়া বাহির হইয়া যাইতেছিলেন; —'আপনি! আপনার দাদার সঙ্গে একটু দরকার ছিল।'

'তিনি তো নেই, বাইরে বেরিয়েছেন। বসুন না। বোধ হয় এখনই বৃষ্টি আস্‌বে।'

কমলবাবু বসিলেন। তু'জনেই নিঃশব্দ। নিকটেই একখানা বই ছিল, কমলবাবু দ্রুত তাহার পাতা উল্‌টাইয়া যাইতেছিলেন। একটু লক্ষ্য করিলেই বোঝা যাইত, তাঁহার হাত কাঁপিতেছে। মনে মনে বারংবার একটা কথার পুনরাবৃত্তি করিতেছিলেন—'নিষ্ঠুর, আর কত দিন এমন অবরুদ্ধ প্রতীক্ষায় কাটান যায়। যে কথা আমার মনে রাত্রিদিন তরঙ্গ তুলিতেছে, সে কথার একটুখানি আভাস কি তোমার চোখের দৃষ্টিতেও ঘনাইয়া নাই?'

কিন্তু সকলের চেয়ে আশ্চর্য্য! মুখে কমলবাবু বলিতে-ছিলেন, 'আপনি আজকের কাগজটা দেখেন নি? ইউ-রোপের রাজনীতি আজ প্রকাণ্ড একটা ধাপ্পাবাজী হয়ে দাঁড়িয়েছে মাত্র। স্পেনে—'

কিন্তু ইউরোপের রাজনীতির বিষয়ে সম্পূর্ণ উপেক্ষা দেখাইয়া, মালতী ছল ছল চোখে মেঘের অন্তরাল ছিন্ন করিয়া, আকাশে যে একটা উজ্জ্বল তারা ক্রমশঃ আত্মপ্রকাশ করিতেছে, সেই দিকে চাহিয়াছিল। আজ তাহার মন এত ভারাক্রান্ত হইয়াছিল, তাহার একটু কারণ ছিল। কাল রাত্রিতে মা বলিতেছিলেন তাহার বাবাকে—'কমল তো পষ্টাপষ্টি কিছু ব'লছে না। আমার কেমন যেন মনে হয়, মেয়েরও এতে বেশ ইচ্ছে নেই। কমলের চেয়ে ঐ যে জিতেন ছেলেটি আজকাল খুব আসা যাওয়া করে, আমেরিকা থেকে পাশ ক'রে এসেছে—ডেনটিষ্ট ডাক্তার—ঐ তাকেই হয় তো…' লজ্জায় মালতী বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল শুনিতে শুনিতে। সারাদিন সে যাহার কথা ভাবে, যাহাকে কল্পনার রঙে রাঙাইয়া কত ভাবে নিত্য নূতন সাজে সাজায়, তাঁহার কথা সে নিষ্করুণ বহির্জগতে কেমন করিয়া প্রকাশ করিবে? কেমন করিয়া বলিবে, তিনি ছাড়া আর কাহাকেও এ জীবনে সে আসনে বসানো যায় না। উপযাচিকা হইয়া এমন কথা তো সে প্রাণ গেলেও বলিতে পারিবে না। ইহাতে তাহার ভাগ্যে যাহাই ঘটুক!

কমলবাবু উঠিলেন, একবার বন্ধ কাচের শার্সীর নিকট গেলেন। একবার মালতীর অতি নিকটে দাঁড়াইলেন। তাঁহার সমস্ত অস্তিত্ব যেন উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে, কি একটা কথা বলিবার জন্য। এমন সময় মালতীর হাত হইতে বইটা সশব্দে মাটীতে পড়িয়া গেল। ঐটুকু শব্দে একটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সম্ভাবনার বুদ্‌বুদ্ ফাটিয়া গেল।

কমলবাবু হঠাৎ চমকিত হইয়া উঠিলেন। আবার ফিরিয়া নিজের আসনে আসিয়া বসিলেন। তার পর মনে হইল, বইটা তাঁহার তুলিয়া দেওয়া উচিত। আবার আসন হইতে উঠিয়া আসিয়া ভূমিতে পতিত বইখানা তুলিয়া টেবলের উপর রাখিলেন। ঝুঁকিয়া পড়িয়া বই তুলিবার সময় মালতীর চুল বাতাসে উড়িয়া হয় তো তাঁহার কপোল

স্পর্শ করিয়াছিল—হয় তো কেশের মৃদু সুগন্ধের মাদকতা তাঁহার মনকে ছুঁইয়াছিল—কিছুই নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। কিন্তু কমলবাবু হঠাৎ ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। বাহির হইয়া বারান্দার রেলিংয়ে ভর দিয়া দাঁড়াইলেন। কতক্ষণ দাঁড়াইয়াছিলেন—দশ মিনিট··· পনেরো মিনিট দু'ঘণ্টা কিছুই তাঁহার স্মরণ নাই।

ঘরের ভিতর হইতে গানের সুর ভাসিয়া আসিতেছিল। বোধ হয় মালতী বই রাখিয়া দিয়া বাজনায় আসিয়া বসিয়াছিল। গানের শেষ চারি লাইন সে ঘুরাইয়া ফিরিয়া বার বার গাহিতেছিল—

'ফুল হয়ে ছিনু যবে নিলে না চয়ন করি
ও চরণ পাব বলে মলিন হইয়া ঝরি।
তোমার আকাশ মাঝে চাঁদ হতে চাহি না যে
শুকতারা হয়ে আমি দিগন্তে ঠাঁই লব।'

আজ মালতীর মনে যে কথা এবং যে ভাব ক্রমাগত আনাগোনা করিতেছিল, তাহারই সহিত গানের ঐ চারি লাইনের যেন অর্থসঙ্গতি ছিল। তাই তাহার মনের সমস্ত নিরুদ্ধ আবেগকে সে ঐ সুরের ভাষায় মুক্তি দিয়াছিল। পূর্ব্ব রাত্রিতে মাতা-পিতার কথোপকথনের যে অংশটুকু সে শুনিয়াছিল, সে-কথা বার বার মনে পড়িয়া যাইতেছিল। অধীর আত্মীয়-স্বজনরা আর তো অপেক্ষা করিবে না। কিন্তু সে তাঁহাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করিবে না, করিতে চায়ও না। সে শুধু এক জনকে তাহার অভিযোগের ডালি—অভিমানের ডালি উজাড় করিয়া দিয়া বারংবার বলিবে—

'ফুল হয়েছিনু যবে নিলে না চয়ন করি।'

কখন গান থামিয়া গিয়াছে। কিন্তু গানের সুর কমলকে সাহসী করিয়া তুলিয়াছে। সমস্ত সঙ্কোচ আপনা আপনি কখন্ শ্লথ হইয়া ঝরিয়া গিয়াছে। মালতীর পিছনে আসিয়া তিনি দাঁড়াইয়াছিলেন।

কহিলেন, 'মালতী, রবীন্দ্রনাথের 'রাত্রে ও প্রভাতে' কবিতা পড়োনি! সারা রাত্রির মিলন-পূর্ণিমার মাদকতা ভোর বেলায় স্বচ্ছ শান্ত শুকতারার পুণ্য দীপ্তিতে মিশে যায়। একটাকে বাদ দিয়ে আর একটা পাওয়া যায় কি? আমি কিন্তু······'

মালতী কম্পিত স্বরে বাধা দিয়াছিল, 'তুমি কিন্তু কি······'

'কিছু না। কিন্তু চাঁদ না উঠ্‌লে যে সমস্ত রাত্রি আকাশ অন্ধকার থাকে। আমার সারা জীবন কি তেমনই অন্ধকারে প্রতীক্ষা ক'রেই কাটবে?'

ইহার পর দু'জনে দু'জনকে নিবিড়ভাবে জানিয়াছিল। বৃথা সরম-সঙ্কোচের ব্যবধান-ছায়া ফেলে নাই। কিন্তু সেই সঙ্কোচটুকু—যাহা এত স্বচ্ছ অথচ এত অলঙ্ঘনীয়—সেটুকু ঐ গানের সুরের মধ্যবর্ত্তিতা ছাড়া কাটিত কি?

* * * *

অতীত দিনের সে সমস্ত কথা মনে পড়িতে মালতীর মুখে এখনও সলজ্জ আভা ছায়া ফেলিল। ঈষৎ হাসিয়া তিনি নিজেকে অপরাধী করিয়া মনে মনে বলিলেন, "নিজেদের কথাগুলো ভুলে বসে থাকি। যখন মনে পড়ে যায়, তখন বুঝ্‌তে পারি, অশোকা ও অজিতকে তাড়া দিয়ে লাভ নেই। ওদের ব্যবহারে অধৈর্য্য দেখানোও ভুল।"

এমন সময় জানালা দিয়া দেখা গেল, অজিতের ছোট মোটরখানা গেট দিয়া ঢুকিল। ঈষৎ উদ্বিগ্ন হইয়া সেলাই রাখিয়া মালতী উঠিলেন। নীচে নামিয়া অজিতের চা-জলখাবারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। নীচের হলঘরে অশোকা তখনও গান করিতেছিল—

"সূর্য্য হারায় হারায় তারা,
আঁধারে দিক্ হয় যে হারা।"

অজিত বিশেষ শব্দ না করিয়া গায়িকার একান্ত নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। দ্বারের বাহিরে মালতী রুদ্ধনিঃশ্বাসে অল্পক্ষণের জন্য দাঁড়াইলেন। হঠাৎ গান থামিয়া গেল। অজিত রুদ্ধস্বরে কহিল, "অশোকা, অন্ধকারে আমারও যে সমস্ত একাকার হয়ে গেছে। তুমি কি আলো দেখাবে না? যে কথা কতবার মুখে এসেছে, কিন্তু ব'ল্‌তে পারিনি, আজ তাদের তোমার কাছেই নিবেদন করে দিলাম সব সঙ্কোচ ছেড়ে।"

অশোকার ভীরু কম্পিত হাতখানি তাহার হাতে আসিয়া মিলিল। মালতী একটা শান্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া দ্বারের নিকট হইতে সরিয়া গেলেন। সুরের মায়া অশোকার জীবনের সন্ধিস্থলেও কায করিয়াছে।

শ্রীমতী আশালতা সিংহ।

অর্থনীতিক কথা

হাতের তাঁত

মাদ্রাজের সরকার সম্প্রতি হাতের তাঁতশিল্প নিখিল-ভারত শিল্প বিবেচনা করিয়া তাহার উন্নতিসাধনের ব্যবস্থা করিবার জন্য অন্যান্য প্রাদেশিক সরকারকে অনুরোধজ্ঞাপক পত্র লিখিয়াছেন এবং ভারত সরকারকে বলিয়াছেন, তাঁহারা হাতের তাঁত-শিল্পের উন্নতিসাধনকল্পে যে অর্থসাহায্য কয় বৎসর করিয়াছেন, তাহা বন্ধ না করেন।

এই শিল্পে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ১ কোটি লোকের কায ও অন্নসংস্থান হয় এবং দেশের অর্থনীতিক কার্য্যে ইহার স্থান কৃষির পরই বলা যাইতে পারে। এ দেশে যে বস্ত্র ব্যবহৃত হয়, এখনও তাহার শতকরা ২৭ ভাগ হাতের তাঁতে বয়ন করা এবং এ দেশে বৎসরে ১৫ কোটি গজ কাপড় এই তাঁতে উৎপন্ন হয়। এ দেশের কাপড়ের কলে বৎসরে ৩২৬ কোটি ২০ লক্ষ গজ কাপড় উৎপন্ন হয় এবং বিদেশ (প্রধানতঃ ইংলণ্ড ও জাপান) হইতে ৯৪০ কোটি ৬০ লক্ষ গজ কলের কাপড় আমদানী হয়। অথচ এই শিল্পে সরকার এ পর্য্যন্ত আবশ্যক মনোযোগ দেন নাই। যখন "টারিফ" নীতি নির্দ্ধারিত হয়, তখন সরকার কাপড়ের কলের প্রতিবাদ আশঙ্কা করিয়া এই শিল্পের সাহায্য প্রয়োজন স্বীকার করেন নাই। কিন্তু কলের কাপড়ের প্রতি-যোগিতায় তাঁতের কাপড়ের দাম কমাইতে হইয়াছে; সুতরাং তন্তুবায়ের লাভ-হ্রাস অনিবার্য্য হইয়াছে।

হিসাব করিয়া দেখিলে হাতের তাঁতের তুলনায় কাপড়ের কলে দেশের উল্লেখযোগ্য সুবিধা নাই। কারণ, কলের তাঁত দ্রুত চলিলেও হাতের তাঁতে নির্দ্দিষ্ট সময়ে যে বস্ত্র উৎপন্ন হয়, তাহা কলের তাঁতের তুলনায় অল্প নহে। বিশেষ হাতের তাঁতের কাপড় কলের কাপড় অপেক্ষা স্থায়ী হয়। মূল্যের অল্পতাই যে সকল ক্ষেত্রে একমাত্র বিবেচ্য বিষয়, তাহাও নহে। কারণ, বিদেশী কাপড়ের উপর যে আমদানী শুল্ক আছে, তাহা বর্জ্জন করিলে বিদেশী কাপড় এ দেশের কলের কাপড় অপেক্ষাও স্বল্প মূল্যে বিক্রীত হইতে পারে। কিন্তু যে কারণে, সেরূপ প্রস্তাব হইতে পারে না, সেইরূপ কারণেই যে শিল্পে ১ কোটি লোকের অন্নসংস্থান হয়, তাহা উপেক্ষা করা যায় না। যদি কাপড়ের কলের জন্য রক্ষাশুল্ক প্রতিষ্ঠিত না হইত, তবে তন্তুবায় হাতের তাঁতে কাপড় বয়ন করিয়া মাসিক ১৫ হইতে ২০ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারিত।

গত ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকার হাতের তাঁত-শিল্পের উন্নতিসাধনকল্পে ৫ বৎসর বৎসরে ৫ লক্ষ টাকা দিবার ব্যবস্থা করেন। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাস হইতে পরবর্ত্তী মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত ৫ মাসে যে ২ লক্ষ টাকা প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহা ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে নিম্নলিখিতরূপে বণ্টন করা হয়:—

বাঙ্গালা	···	···	৩৫,৫০০ টাকা
যুক্তপ্রদেশ	···	···	৩২,০০০ „
মাদ্রাজ	···	···	২৬,৫০০ „
বিহার ও উড়িষ্যা	···	···	২৩,০০০ „
বোম্বাই	···	···	১৭,৫০০ „
পঞ্জাব	···	···	১৭,০০০ „
ব্রহ্ম	···	···	৭,৫০০ „
মধ্য প্রদেশ	···	···	৭,৫০০ „
আসাম	···	·	৭,৫০০ „
দিল্লী	···	·	২,০০০ „
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত		·	১,০০০ „

পরবৎসর বাঙ্গালার জন্য হাজার টাকা বরাদ্দ হয় যে বৎসর প্রথম সাহায্য প্রদত্ত হয়, সেই বৎসর বিহার ও উড়িষ্যার শিল্প-সচিব মোমিন সম্মিলনে যে হিসাব দেন, তাহা বিশেষ উৎসাহ-প্রদ। ঐ প্রদেশে ১ লক্ষ ৬০ হাজার তাঁত চালাইয়া প্রায় ৪ লক্ষ লোক অন্নের উপায় করে। তাহারা যে কাপড় উৎপন্ন করে, তাহার মূল্য ৪ কোটি টাকা এবং তাহা প্রদেশের লোকের প্রয়োজনীয় বস্ত্রের এক তৃতীয়াংশ।

হাতের তাঁতে যে সহজে উন্নতিসাধন করা যায়, তাহা শত বর্ষেরও অধিক কাল পূর্ব্বে শ্রীরামপুরে ঠক্ঠকি তাঁতের প্রবর্ত্তনে প্রতিপন্ন হয়। এ দেশের তন্তুবায়রা পুরুষানুক্রমে বয়নের কার্য্যে যে দক্ষতা অর্জ্জন করিয়াছে, তাহাও তাহার মূলধনের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। মোট ৩০ টাকা মূলধন লইয়া তন্তুবায় হাতের তাঁতে মাসিক ১৫ হইতে ২০ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারে। হাতের তাঁত যে কলের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারে, তাহা বোম্বাইয়ে ও আমেদাবাদে এই শিল্পের দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে।

বাঙ্গালায় কাপড়ের কলের সংখ্যা বোম্বাইয়ের তুলনায় অল্প। সুতরাং বাঙ্গালায় হাতের তাঁত-শিল্পের বিস্তার ও উন্নতিসাধন যেমন অধিক সম্ভব, তেমনই অধিক প্রয়োজন। কিন্তু ৫ বৎসর কেন্দ্রী সরকারের অর্থসাহায্য লাভ করিয়াও বাঙ্গালায় এই শিল্পের উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয় নাই। অথচ অসহ-যোগ আন্দোলনের সুযোগে বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলওয়ালারা বাঙ্গালার এই শিল্পের যথেষ্ট অনিষ্ট করিয়া আপনারা লাভবান হইয়াছে। বাঙ্গালার হাতের তাঁতে ঢাকা, টাঙ্গাইল, ফরাসডাঙ্গা,

শান্তিপুর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কেন্দ্রে মিহি কাপড় বয়ন করা হয় এবং তন্তুবায়রা তাহাতেই অভ্যস্ত। অসহযোগ আন্দোলনের সময় তাহাদিগকে এ দেশের কল হইতে সরু সূতা সরবরাহ করিবার কোন ব্যবস্থা না করিয়া বিদেশ হইতে আমদানী সরু সূতা বর্জ্জনের নির্দ্দেশ দানে বাঙ্গালার এই শিল্পের অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছে।

এখন বাঙ্গালার কোন কোন কল হইতে হাতের তাঁতের জন্য সূতা সরবরাহ করা হইতেছে বটে, কিন্তু তাহা আবশ্যক পরিমাণ নহে। সেই জন্য বাঙ্গালায় কেবল সূতা-সরবরাহের জন্য কল প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন।

কেন্দ্রী সরকারের সাহায্য পাইয়া বোম্বাই সরকার যে পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, তাহা উল্লেখযোগ্য। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে সমিতি গঠিত হয়;—

(১) কিস্তিতে মূল্য শোধের ব্যবস্থায় বা অন্য পদ্ধতিতে উন্নত প্রণালীর যন্ত্রাদি সরবরাহ;

(২) সঙ্গত মূল্যে পণ্য-পোকরণ (সূত্রাদি) সরবরাহ

(৩) যে সকল কাপড় উন্নত প্রকারের ও যাহা সহজে বাজারে বিক্রয় করা যায়, সেইরূপ বস্ত্র বয়ন জন্য তন্তুবায়দিগকে উপদেশ প্রদান

(৪) সস্তা প্যাটার্ন করা ও কাপড় বাজারে বিক্রয়ের মত করার ব্যবস্থা

(৫) হাতের তাঁতের কাপড় তন্তুবায়ের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া বিক্রয় করা বা কতক মূল্য দিয়া বিক্রয়ের জন্য দোকানে রাখা।

অন্যান্য দেশে সরকার এই শিল্পের জন্য যে সব ব্যবস্থা করিয়াছেন, সে সকলের মধ্যে আমরা আজ রুমানিয়ার ব্যবস্থার উল্লেখ করিতেছি:—

রুমানিয়ায় হাতের তাঁতের কাপড় সম্বন্ধীয় সমস্যা সরকার সমাধান করিয়াছেন। তথায় রাজধানীতে মহিলাদিগের একটি পরিদর্শন সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। হাতের তাঁতে উৎপন্ন বস্ত্র, কার্পেট বা গালিচা, বুটিদার ও ঐরূপ অন্যান্য প্রকারের কাপড় ইত্যাদি ঐ সমিতির নিকট প্রেরিত হয়। পূর্ব্বোক্ত সমিতি দ্রব্যাদির মূল্য স্থির করিয়া দিলে সে সকল শিল্প-বিভাগের দ্বারা বিক্রয়-কক্ষে রক্ষিত হয়। সঙ্গত লাভ রাখিয়া দ্রব্যের মূল্য নির্দ্দিষ্ট হয় এবং সপ্তাহে ২ দিন ঐ স্থানে দ্রব্য বিক্রীত হয়।

এ দেশে কোথাও এইরূপ কোন ব্যবস্থা নাই। কাযেই তন্তুবায়ের দারিদ্র্যের সুযোগ লইয়া মহাজনরা অনেক সময় যে দামে কাপড় ক্রয় করে, তাহাতে তাহার লাভ থাকা ত পরের কথা—কোন কোন ক্ষেত্রে ক্ষতিই হয়।

বাঙ্গালায় যে কেন্দ্রী সরকারের সাহায্যে উল্লেখযোগ্য উন্নতি লক্ষিত হয় নাই, আমাদিগের বিশ্বাস, সমবায় বিভাগকে টাকা ব্যয়ের ভার প্রদান তাহার অন্যতম কারণ। গত কয় মাসে এই বিভাগের অজস্র ত্রুটির ও বিভাগের অধীন বহু প্রতিষ্ঠানে তহবিল তছরূপের বহু দৃষ্টান্ত আদালতেও যে ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে এই টাকা কিরূপে ব্যয়িত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান হওয়া প্রয়োজন। বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের যে সকল সভ্য এই বিভাগের অজস্র ত্রুটি সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিবের নিকট সন্তোষজনক উত্তর পায়েন নাই, তাঁহারা কি এই অনুসন্ধানের জন্য প্রস্তাব উপস্থাপিত করিবেন?

বাঙ্গালায় হাতের তাঁত-শিল্পের উন্নতিসাধন যে অন্য কোন কোন প্রদেশের তুলনায় অধিক প্রয়োজন, তাহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সে জন্য সরকারের যে যোগ্যতার ও তৎপরতার পরিচয় প্রয়োজন, বর্ত্তমান সচিবসঙ্ঘের নিকট সেই যোগ্যতা ও তৎপরতা লাভের উপায় কি?

পাটের বিপদ

প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দীকাল বাঙ্গালা পাট উৎপন্ন করিয়া প্রভূত অর্থ পাইয়াছে। সাধারণতঃ পাট বিক্রয় করিয়া কৃষক বার্ষিক ২৫ হইতে ৫০ কোটি টাকা প্রাপ্ত হয়। এই জন্যই ইহাকে স্বর্ণের আঁশ বলা হইয়া থাকে। কৃষক যে টাকা পাটের মূল্য হিসাবে প্রাপ্ত হয়, তাহাই সব নহে। কারণ, কৃষকের নিকট হইতে পাট কিনিয়া ফড়িয়া ও মহাজনও লাভ করে। পাট কতকাংশ বিদেশে রপ্তানী হয়, কতক এ দেশেই চট ও থলিয়া বয়নে ব্যবহৃত হয়। কলিকাতার উপকণ্ঠে গঙ্গার কূলে ৮৮টি পাটকলে বর্ত্তমানে কায চলিতেছে। এই সকল কলে ২ শত কোটিরও অধিক টাকা খাটিতেছে এবং সহস্র সহস্র শ্রমিক কায পাইতেছে।

পাট প্রধানতঃ বাঙ্গালায় উৎপন্ন হয়—বাঙ্গালার ভূমি ও জলবায়ু পাটের বিশেষ উপযোগী। বিশেষ পাট জলে পচাইয়া ধৌত করিবার সময় পাটপচা জলে দাঁড়াইয়া যে ভাবে কায করিতে হয়, সে ভাবে কায করিতে অন্যান্য দেশের শ্রমিকরা সম্মত হয় না। পাট বাঙ্গালার প্রায় একচেটিয়া পণ্য। সেই জন্য প্রয়োজনে সকল দেশকেই বাঙ্গালার মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়। সেই কারণে এবং বর্ত্তমান কালে সকল দেশই প্রয়োজনীয় দ্রব্য সম্বন্ধে স্বাবলম্বী হইতে আগ্রহশীল বলিয়া অন্যান্য দেশে দ্বিবিধ চেষ্টা চলিতেছে:—

(১) পাটের পরিবর্ত্তে অন্য দ্রব্য ব্যবহার

(২) অন্য দেশে পাটের চাষ করা

বিশেষ জার্ম্মাণ যুদ্ধের সময় পাটের অভাবে থলিয়ার জন্য জার্ম্মাণী কাগজ ব্যবহার করিয়াছিল। তখনও কাগজের থলিয়ায় পাটের থলিয়ার কায ভাল হইত না—তাহা জল লাগিলে সহজে নষ্ট হইয়া যাইত। বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় হয়ত সে ত্রুটি বর্জ্জন করা যায়। কিন্তু তাহা হইলেও পাট কাগজের তুলনায় স্বল্পমূল্য। পাট ব্যতীত কোন কোন আঁশেও চট ও থলিয়া হইতে পারে। কিন্তু সে সকলও পাটের তুলনায় অধিক মূল্যবান।

সেই জন্য পাটের পরিবর্ত্তে অন্য কোন দ্রব্য ব্যবহার অপেক্ষাও অন্য দেশে পাট চাষে বাঙ্গালার অধিক ক্ষতির সম্ভাবনা।

সংপ্রতি সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, একটি জাপানী প্রতিষ্ঠান ব্রেজিলে পাট-চাষ করিতেছে। এই আমেজোনিয়া ইণ্ডাষ্ট্রী কোম্পানী ব্রেজিলের প্যারা ষ্টেটে পাট-চাষে সাফল্য লাভ করিয়াছে। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে তথায় ৫ শত টন পাট উৎপন্ন হইয়াছে। শুনা যাইতেছে, জাপানী ও ব্রেজিলিয়ান সম্মিলিত কোম্পানী পাট চাষের বিস্তার সাধন করিবে। কোম্পানীর মূলধন দুই দেশের লোক যোগাইবে। এই কোম্পানীর সহিত প্যারা ষ্টেটের সরকারের যে

চুক্তি হইয়াছে, তাহাতে পরীক্ষার জন্য ৩ বৎসরকাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—২৫ হাজার একর জমিতে চাষ আরম্ভ হইবে। এই ৩ বৎসর-কাল ইহার উপরে কোনরূপ কর আদায় করা হইবে না এবং জাপানী শ্রমিকদিগকে বিনা ভাড়ায় গতায়াতের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইবে।

ইটালী আবিসিনিয়ায় পাট-চাষ হয় কি না, সে সম্বন্ধে পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। কিন্তু ব্রেজিলে যে চেষ্টা হইতেছে, তাহাই অধিক আশঙ্কার বিষয়। বেলজিয়ম পূর্ব্বে কঙ্গোয় পাটচাষের চেষ্টা করিয়াছিল বটে, কিন্তু সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। তাহার কারণ সে দেশের লোক পাটপচা জলে দাঁড়াইয়া পাট কাচিতে সম্মত হইবে না। কাযেই যত দিন পাট কাচিবার কোন যন্ত্র আবিষ্কৃত না হয়, তত দিন তথায় পাটচাষের সম্ভাবনা নাই।

কিন্তু জাপানী শ্রমিকরা যে ভাবে ক্ষেত্রে সার হিসাবে মানুষের মল দিয়া তাহা নগ্নপদে জমির সহিত মিশায়, তাহাতে মনে করা অসঙ্গত নহে, তাহারা বাঙ্গালার শ্রমিকের মত পাট কাচিতে পারিবে। কেবল তাহা তাহাদিগের স্বাস্থ্যভঙ্গ না করিলে হয়।

মার্কিণে পাটের চট ও থলিয়ার পরিবর্ত্তে তুলার সূতার চট ও থলিয়া ব্যবহারের চেষ্টা হইতেছে। আমেরিকায় যে তুলা উৎপন্ন হয়, তাহার সম্যক ব্যবহারজন্য তথায় এই চেষ্টা হইতেছে। আপাততঃ ঐ থলিয়ার পণম চালান দেওয়া হইবে।

ইকুয়েদরে কোকো চালানের জন্য পাটের থলিয়া ব্যবহৃত হয়। এই সব থলিয়া প্রধানতঃ ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ড হইতে চালান যায়। কিন্তু এই সব থলিয়ার শতকরা ৫০ টাকা শুল্ক দিতে হয়। ঐ শুল্ক হইতে অব্যাহতিদানের অনুরোধ ব্যর্থ হইয়াছে। কারণ, সরকার তথায় স্থানীয় শণের থলিয়ার ব্যবহার প্রচলিত করিতে সচেষ্ট। যেরূপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে আর ৫ বৎসরের মধ্যে শণের থলিয়া পাটের থলিয়ার স্থান অধিকার করিবে।

জার্ম্মাণীতে পাটের ব্যবহার হ্রাস করিবার জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বিত হইতেছে—পাটের সহিত শণ প্রভৃতি মিশান ও "জেল" পাট নামক কৃত্রিম পাটের ব্যবহার। ঐ "পাট" খড় হইতে প্রস্তুত করা হইতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ইহার উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা হইবে। বর্ত্তমানে ইহার মূল্য পাটের মূল্যের তিন গুণ। সেই জন্য ইহার সহিত অল্প আঁশ মিশাইবার ব্যবস্থা হইবে। জার্ম্মাণীর বিশেষজ্ঞরা আশা করেন, যত অধিক পরিমাণে এই কৃত্রিম "পাট" উৎপন্ন করা যাইবে, তত মূল্যহ্রাস সম্ভব হইবে।

ইটালীর সর্ব্বাপেক্ষা বড় পাটকলে ১০ হাজার টেকো ও ৫ শত ৫০ খানি তাঁত চলে। সেই কলে গত বৎসর অন্যান্য উপকরণ ব্যবহার করায় ব্যবহৃত পাটের পরিমাণ ৮ হাজার টন কমিয়াছে।

নেদারল্যাণ্ডে এবং তুর্কীতেও পাটের ব্যবহার হ্রাসের চেষ্টা চলিতেছে।

পোল্যাণ্ডও এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছে।

এই সকল সংবাদ হইতে বুঝিতে পারা যায়, সর্ব্বত্র পাটের ব্যবহার হ্রাসের প্রবল চেষ্টা চলিতেছে। বর্ত্তমানে সমগ্র প্রাচীর ও প্রতীচীর গগনে যুদ্ধের মেঘ দেখা দিয়াছে। সেই জন্যও প্রত্যেক দেশ পাট সম্বন্ধে স্বাবলম্বী হইবার বিশেষ চেষ্টা করিতেছে।

এই অবস্থায় বাঙ্গালাকে দুই দিকে চেষ্টা করিতে হইবে:—

(১) পাটের চাহিদা হ্রাস অনিবার্য্য জানিয়া পাটের পরিবর্ত্তে অন্যান্য ফসলের ব্যবহার। সে জন্য আবশ্যক পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইতে আর বিলম্ব করা উচিত নহে। কিন্তু বাঙ্গালা সরকারের কৃষি-বিভাগ পাটচাষ সঙ্কোচের সময় যেরূপ কার্য্য করিয়াছেন, তাহাতে এ বিষয়ে তাঁহাদিগের উপর কত দূর নির্ভর করা সঙ্গত, তাহা বিশেষ বিবেচ্য। বাস্তবিক তাঁহারা পাটচাষ সঙ্কোচের পরামর্শ দিয়া কৃষককে তাহার অবশিষ্ট জমিতে কি চাষ হইবে, সে সম্বন্ধে সদুপদেশ দিতে পারেন নাই এবং পরামর্শ দিলেও তাহার কোন ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই।

(২) কিসে পাটের মূল্য হ্রাস করিয়াও কৃষকের লাভ রাখা যায় সেই ব্যবস্থা করা। কিছু দিন পূর্ব্বে কৃষি-বিভাগ "কাকিয়া বোম্বাই" নামক এক প্রকার পাটচাষের বিশেষ প্রশংসা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। লর্ড জেটলাণ্ড বলিয়াছিলেন, এই পাট প্রতি একর জমিতে সাধারণ পাট অপেক্ষা ২ মণ অধিক উৎপন্ন হয় এবং ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ২ লক্ষ একর জমিতে ইহার চাষ হইতেছিল। তিনি হিসাব করিয়া বলিয়াছিলেন, বাঙ্গালায় কেবল এই পাটের চাষ হইলে পাটে বাঙ্গালার বার্ষিক আয় প্রায় ৪ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইবে। ইহার অল্প দিন পরেই না কি আর এক প্রকার পাটের সন্ধান পাওয়া গিয়াছিল, তাহাতে ফসল আরও অধিক হয়।

এই সব কথা যে শ্রুতিসুখকর, তাহাতে অবশ্য সন্দেহ থাকিতে পারে না।

কিন্তু যদি ইহাই হয় এবং পাট ক্ষেত্র হইতে কল পর্য্যন্ত লইবার ব্যবস্থা প্রয়োজনানুরূপ হয়, তবে এখনও কেন বলিতে হয়—"While the Indian villager has to maintain the glorious phantasmagoria of an imperial policy, while he has to support legions of scarlet soldiers, golden chuprassises, purple politicals, and green commissions, he must remain the hunger-stricken, over-driven phantom he is?"

পাট সম্বন্ধে বাঙ্গালার অধিক অবহিত হইবার সময় আসিয়াছে।

ভারতে রেলের এঞ্জিন

এ দেশে প্রায় ৫০ হাজার মাইল রেলপথ রচিত হইয়াছে বলিয়া ইংরেজ গর্ব্ব করিয়া থাকেন। এ দেশে রেলপথ বিলাতের রেলপথের দ্বিগুণ এবং বিলাতে রেলে যাত্রী ও মাল চলাচল আরম্ভ হইবার মাত্র ২২ বৎসর পরে এ দেশে রেলপথ রচিত হয়। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের ২০শে এপ্রিল বোম্বাই হইতে টানা পর্য্যন্ত ২০ মাইল রেলপথে ট্রেণ চলাচল হয়। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, আজও এ দেশে ট্রেণের এঞ্জিন প্রস্তুত হয় না এবং আমরা বহু ব্যয়ে বিদেশ—বিশেষতঃ ইংলণ্ড হইতে এঞ্জিন আমদানী করিয়া থাকি। এই পরমুখাপেক্ষিতার ফল যে সময় সময় কিরূপ অসুবিধাজনক হইতে পারে, তাহা গত জার্ম্মাণ যুদ্ধের সময় বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

আবার এই জন্য কত টাকা এ দেশ হইতে বিলাতে যায়, তাহাও সহজে অনুমান করা যায়। কয়দিন মাত্র পূর্ব্বে বিলাত হইতে সংবাদ আসিয়াছে, ভারতের একটিমাত্র রেলপথ (নর্থ-ওয়েষ্টার্ণ) বিলাতের কারখানায় যে ৪৩টি "সুপারহিটেড বয়লার" প্রস্তুত করিতে দিয়াছে,

তাহার মূল্য ১০ লক্ষ টাকা। গত ৫ বৎসরে ভারতের রেল কোম্পানীগুলি বিলাতের কারখানা হইতে যে এঞ্জিন, বয়লার ও এঞ্জিনের অংশ ক্রয় করিয়াছে, তাহার মোট মূল্য ৩ কোটি টাকা।

বিলাতের মত এ দেশে এঞ্জিন প্রস্তুত করিবার কারখানা স্থাপিত হইলে এ দেশ তিন প্রকারে লাভবান হইত—এঞ্জিনের মত অতি প্রয়োজনীয় যন্ত্রের জন্য আমাদিগকে পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইত না; লাভ হিসাবে প্রভূত অর্থ বিদেশে যাইত না এবং সেই অর্থে এ দেশে রেলের উন্নতিসাধন এবং যাত্রী ও মালের ভাড়া হ্রাস করাও সম্ভব হইতে পারিত; কারখানাসমূহে বহু লোক কায করিয়া অর্থার্জন করিত এবং তাহাতে বেকারের সংখ্যা হ্রাস হইত; ইহাতে রেলযাত্রীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতে পারিত।

কিন্তু এ বিষয়ে ভারতবর্ষের স্বার্থ অবজ্ঞাতই হইয়াছে। এ বার রেলের ষ্ট্যাণ্ডিং অর্থসমিতির অধিবেশনে রেলের চীফ-কমিশনার এ দেশে এঞ্জিন নির্ম্মাণ করিবার বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। আবার প্রাচীতে ও প্রতীচীতে যুদ্ধ আসন্ন বলিয়া বিবেচনা হইতেছে বলিয়াই এ বিষয়ে সরকার আবার দৃষ্টিক্ষেপ করিয়াছেন কি না, তাহা আমরা বলিতে পারি না। তবে এ দেশের লোক যে বহু দিন হইতে এ দেশেই এঞ্জিন প্রস্তুত করিতে বলিতেছেন এবং সরকার সে বিষয়ে মনোযোগ দেন নাই, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিছু দিন পূর্ব্বে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলপথে একটি দুর্ঘটনা ঘটায় বিচারক মতপ্রকাশ করিয়াছিলেন, প্যাসিফিক এঞ্জিন ব্যবহারের ফলেই উহা ঘটিয়াছিল। সেই জন্য ঐ এঞ্জিন এ দেশে ব্যবহারের উপযোগী কি না, তাহা বিচার করিবার জন্য এক সমিতি গঠিত হইয়াছিল। সম্প্রতি সেই কমিটীর রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে সমিতির সদস্যরা এ দেশে এঞ্জিন প্রস্তুত করিবার বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, "ভারতবর্ষে ভারতবর্ষের রেলের জন্য এঞ্জিন নির্ম্মাণের কথা আমরা বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি। সেরূপ কার্য্যে বিলাতের পরামর্শদাতা এঞ্জিনিয়ারদিগেরও দায়িত্ব থাকিবে না—তাঁহারা কেবল প্রার্থিত পরামর্শ দিবেন। অর্থাৎ প্রয়োজন হইলে বিলাতের বিশেষজ্ঞগণের পরামর্শ লইয়া এ দেশেই এঞ্জিন প্রস্তুত করা হইবে।" তাঁহারা বলিতেছেন, এই কাযের জন্য এ দেশে নক্সা প্রস্তুত করিবার লোক ও এঞ্জিনিয়ার রাখা প্রয়োজন হইবে; কিন্তু এ দেশের শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতিসাধন যখন সরকারের নীতিরূপে গৃহীত হইয়াছে, তখন সেইরূপ কায করা প্রয়োজন। যে সব নূতন ধরণের এঞ্জিন নির্ম্মাণে পরামর্শদাতা এঞ্জিনিয়ারের প্রয়োজন, সেরূপ এঞ্জিন নির্ম্মাণ না করিয়া যে সব এঞ্জিন ব্যবহার করা হইয়াছে, প্রথমে সেই সব এঞ্জিন নির্ম্মাণ করাই সঙ্গত হইবে।

এই মত যে যুক্তির দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এ দেশে যে এঞ্জিন নির্ম্মিত হইতে পারে, তাহাও প্রতিপন্ন হইয়াছে। বম্বে-বরোদা ও সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া রেলের যে কারখানা আজমীরে অবস্থিত, তাহা ঐ রেলের সাধারণ ও অসাধারণ মেরামতি কাযের জন্যই বিশেষভাবে সজ্জিত হইলেও তাহাতে প্রতি বৎসর কয়খানি করিয়া "মিটার গেজ" এঞ্জিন নির্ম্মাণ করা হয়। এই সকল এঞ্জিনের অনেক অংশই ঐ কারখানায় প্রস্তুত করা হয়, আর কতকগুলি অংশমাত্র বিদেশ হইতে আনিয়া এঞ্জিন সম্পূর্ণ করা হয়। আমরা বলিয়াছি, এই কারখানা এঞ্জিন প্রস্তুত করিবার জন্যই কল্পিত নহে। কাজেই যদি ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলের জামালপুর কারখানার মত কারখানায় এঞ্জিনের অংশ নির্ম্মাণের যন্ত্র আনা হয়, তবে ঐগুলিতে অনায়াসে এঞ্জিন নির্ম্মাণ করা যাইবে। সরকারের এ বিষয়ে অমনোযোগই এত দিন এই কায না হইবার জন্য দায়ী।

অথচ এইরূপ ব্যাপারে পরমুখাপেক্ষিতার ফল কিরূপ বিপজ্জনক হয়, তাহা জার্ম্মাণ যুদ্ধের সময় প্রত্যক্ষ করা গিয়াছিল। তখন কয় বৎসরে রেলে যে অভাব আত্ম-প্রকাশ করিয়াছিল, তাহা দূর করিতে বাজেটে অনেক টাকা বরাদ্দ করিতে হইয়াছিল।

কিন্তু তাহার পর যে ২০ বৎসর অতীত হইয়াছে, ইহার মধ্যে দেশের লোক বহু বার এ দেশে এঞ্জিন প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করিতে বলিলেও সরকার সে বিষয়ে কর্ণপাত করেন নাই। এক কালে ম্যাঞ্চেষ্টারের বস্ত্রশিল্পের জন্য যেমন সরকার এ দেশে কাপড়ের উপর শুল্ক স্থাপিত করিয়াছিলেন এবং তাহার পূর্ব্বে যেমন বিলাতের জাহাজ-নির্ম্মাতাদিগের স্বার্থরক্ষার্থ এ দেশে প্রস্তুত জাহাজের বিলাতে প্রবেশ নিষিদ্ধ হইয়াছিল ও তাহার কৈফিয়তে বলা হইয়াছিল, এ দেশের নাবিকরা বিলাতে যাইয়া বিলাতের সমাজের নৈতিক অবস্থা দেখিয়া আসিলে ভারতবর্ষে আর ইংরেজের সম্ভ্রম থাকিবে না, তেমনই কি বিলাতের এঞ্জিনের কারখানাগুলির স্বার্থরক্ষার্থ সরকার এ দেশে কারখানায় এঞ্জিন প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থায় বিরত হইয়াছেন?

এ দেশে মালগাড়ী প্রস্তুত করা সম্বন্ধে যাহা হইয়াছে, তাহাতে লোকের মনে এই সন্দেহের উদ্রেক হওয়া অসম্ভব বলা যায় না। জার্ম্মাণ যুদ্ধের সময় বিলাতের কারখানাগুলিতে যখন অতিরিক্ত কায করিয়া সমর-সরঞ্জাম প্রস্তুত করা হইতেছিল এবং সেই জন্য তথায় মালগাড়ী প্রস্তুত করিয়া বিপদসঙ্কুল সাগরপথে তাহা ভারতে প্রেরণ অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল, তখন ভারত সরকার এ দেশে মালগাড়ী নির্ম্মাণের কার্য্যে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হইতে না হইতে তাঁহারা আবার বিলাত হইতে মালগাড়ী আমদানী করিতে আরম্ভ করায় এ দেশের কারখানাগুলির বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল।

তাই মালগাড়ী প্রস্তুত করিবার কারখানাগুলির পক্ষে সার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বলিয়াছিলেন—

"সরকার বর্ত্তমানে যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার রহস্য ভেদ করা যায় না। তাঁহারাই এ দেশে এই শিল্পপ্রতিষ্ঠায় উৎসাহ প্রদান করেন—দেশের লোকের অনেক টাকাও তাঁহারা এই জন্য ব্যয় করিয়াছেন। অথচ যখন শিল্প এমন সবল হইল যে, অতিরিক্ত সাহায্য না পাইলেও তাহা বিদেশী শিল্পের প্রতিযোগিতা প্রহত করিতে পারে, তখনই তাঁহারা বিপরীত নীতির অনুসরণ করিতেছেন!"

তিনি বলিয়াছিলেন, সরকারের প্রতিশ্রুতিতে নির্ভর করিয়াই লোক এই শিল্পে অর্থ প্রযুক্ত করে—অথচ সেই প্রতিশ্রুতিই রক্ষিত হয় নাই।

সরকারের ভাবগতি দেখিয়া সার রাজেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, এ দেশের লোক যেন দেখেন, এই শিল্প সম্বন্ধে ব্যবস্থা পরিষদ যে নীতি অবলম্বন করিতে নির্দ্দেশ দান করিয়াছেন, রেলওয়ে বোর্ড তাহা যথাযথ ভাবে পালন করেন।

যুদ্ধ শেষ হইলে বিলাতের কারখানার অধিকারীরা কোনরূপ আন্দোলন আরম্ভ করায় ভারত সরকারকে নীতিপরিবর্তন করিতে হইয়াছিল কি না, তাহা কে বলিতে পারে?

এত দিনেও ভারতের রেল প্রতিষ্ঠানগুলি যে তাহাদিগের সকল প্রয়োজন সম্বন্ধে স্বাবলম্বী হইতে পারে নাই, তাহার জন্ম তাহারা দায়ী নহে—সে দায়িত্ব এ দেশের সরকারের। এ দেশে সরকারই আজ অধিকাংশ রেলের অধিকারী ও পরিচালক। তাহাতে এ সম্বন্ধে সরকারের দায়িত্বের গুরুত্ব আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে।

আজ যদি আসন্ন যুদ্ধের সম্ভাবনায় ভারত সরকার এ দেশে রেলের এঞ্জিন প্রস্তুত করিবার কর্ত্তব্যে অবহিত হন এবং মালগাড়ী প্রস্তুত করিবার কারখানাগুলিকে পুনরায় গাড়ী সরবরাহ করিতে আহ্বান করেন, তবে তাঁহারা যেন মনে রাখিয়া কায করেন—যুদ্ধের সম্ভাবনা তিরোহিত হইলে বা যুদ্ধ শেষ হইলে তাঁহারা আবার নীতিপরিবর্তন করিয়া বিলাতের কারখানার অধিকারীদিগের স্বার্থরক্ষার্থ এ দেশের কারখানাগুলির কায কমাইয়া দিলে চলিবে না। তাহাতে দেশের লোকের মনে অসন্তোষ অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিবে।

চিটাগুড় ও সুরাসার

এ দেশে চিনির উপর যে আমদানী-শুল্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতে শর্করা-শিল্পের যে উন্নতি হইয়াছে, তাহার ফলে শর্করা সম্বন্ধে এ দেশের পরমুখাপেক্ষিতা দূর হইয়াছে, বলা যাইতে পারে। শুল্কের সুযোগে বিহার ও যুক্তপ্রদেশই সর্ব্বাপেক্ষা উপকৃত হইয়াছে। বাঙ্গালা যে সেই সুযোগ যথাযথ ভাবে গ্রহণ করিয়া তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারে নাই, তাহা দুঃখের বিষয়। কারণ, পূর্ব্বে শর্করা-শিল্পে বাঙ্গালার বিশেষ প্রসিদ্ধি ছিল এবং বাঙ্গালা হইতে অন্যান্য প্রদেশে যেমন পারস্য, আরব প্রভৃতি অন্যান্য দেশেও তেমনই শর্করা রপ্তানী হইত। পর্য্যটক বার্ণিয়ার ইহার উল্লেখ করিয়াছিলেন।

সে যাহাই হউক, বিহারে ও যুক্তপ্রদেশে ইক্ষুর চাষ বৃদ্ধি ও চিনির কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে একটি সমস্যারও উদ্ভব হইয়াছে। চিনি প্রস্তুত হইলে যে "মাৎগুড়" বা "চিটাগুড়" পড়িয়া থাকে, তাহা কিরূপে ব্যবহার করা যায়? এই দুই প্রদেশের চিনির কারখানায় বৎসরে প্রায় ৩ লক্ষ টন "চিটাগুড়" থাকে। ব্যবহারের কোন উপায় না থাকায় প্রায় ২ লক্ষ টন কারখানার তাক্ত জলের সহিত মিশাইয়া দেওয়া হইত। কিন্তু উহা নিকটস্থ মাঠে ও নদীতে পড়ায় দুর্গন্ধে লোক বিরক্ত হইত এবং পানীয় জলও দূষিত হইত। কাযেই এই চিটাগুড় কিরূপে লাভজনক কার্য্যে প্রযুক্ত হইতে পারে, সে সম্বন্ধে পরীক্ষা হয়। চিটাগুড় পূর্ব্বে তামাকের জন্ম ব্যবহৃত হইত—কিন্তু তাহাতে অধিক গুড় ব্যবহৃত হইতে পারে না—আবার চুরুট ও সিগারেট এখন "গুড়কের" স্থান অধিকার করিতেছে। গবাদি পশুর খাদ্যরূপে কতকটা গুড় ব্যবহৃত হইতে পারে। রাস্তা নির্ম্মাণে ও সাররূপে ইহা ব্যবহারের কথাও উঠিয়াছে।

এই গুড় হইতে সুরাসার প্রস্তুত করিয়া তাহা মোটর গাড়ীতে পেট্রোলের সহিত মিশাইয়া ব্যবহার করা যায়।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে হায়দ্রাবাদে পরীক্ষাফলে দেখা যায়, মহুয়া ফুল হইতে যে সুরাসার প্রস্তুত করা যায়, তাহার মূল্য পেট্রোলের মূল্যের অর্দ্ধেক এবং তাহা মোটরে পেট্রোলের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইতে পারে। কিন্তু সে বিষয়ে চেষ্টা আর অধিক অগ্রসর হয় নাই।

এ বার বিহারের ও যুক্তপ্রদেশের সরকারদ্বয় একযোগে যে পরীক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহাতে প্রতিপন্ন হইয়াছে, চিটাগুড় হইতে মোটরে ব্যবহারোপযোগী সুরাসার প্রস্তুত করা যায়। এই প্রদেশদ্বয়ে প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ গ্যালন সুরাসার এইরূপে প্রস্তুত করা সম্ভব। তবে প্রথমেই ঐ পরিমাণ সুরাসার প্রস্তুত না করিয়া যে পরিমাণ প্রদেশদ্বয়েই ব্যবহৃত হইতে পারে, তাহাই প্রস্তুত করা হইবে, স্থির হইয়াছে। আপাততঃ ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ব্যয়ে চিটাগুড় হইতে সুরাসার প্রস্তুত করিবার কারখানা প্রতিষ্ঠা করা হইবে। পরে, কি পরিমাণ সুরাসার বিক্রয় করা যায়, তাহা দেখিয়া আরও কারখানা স্থাপিত করা চলিবে। ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রে কারখানা স্থাপিত হইলে চারি দিকে সুরাসার যোগাইবার সুবিধা অধিক হইবে।

বর্ত্তমানে এইরূপে প্রস্তুত সুরাসারের যে মূল্য হিসাব করা হইয়াছে, তাহা বিহারে ও যুক্তপ্রদেশে পেট্রোলের মূল্যতুলনায় অল্প হইলেও সকল প্রদেশ সম্বন্ধে তাহা বলা যায় না। কারণ, চিটাগুড়ের মূল্য মণপ্রতি ৪ আনা, (১ গ্যালন সুরাসার উৎপন্ন করিতে যে চিটাগুড় ব্যবহার করিতে হয়, তাহার মূল্য ২ আনা ৬ পাই হয়।) গুড় হইতে সুরাসার প্রস্তুত করিবার ব্যয় প্রতি টনে ৩ আনা ধরিলে উহার সঙ্গে সুরাসার প্রেরণের ব্যয় ১ আনা ৬ পাই ধরিতে হয়। ইহার উপর শুল্ক আছে। বর্ত্তমানে পেট্রোলের উপর যে শুল্ক আছে, যদি এই সুরাসারের উপরও সেই শুল্ক ধার্য্য করা হয়, তবে ১ গ্যালন সুরাসারের মূল্য ১ টাকা ৩ আনা হয়। বিহারে ও যুক্তপ্রদেশে পেট্রোলের মূল্য ইহা অপেক্ষা অধিক। সুতরাং বিহারে ও যুক্তপ্রদেশে যে সুরাসার ব্যবহৃত হইবে, তাহাতে সরকার লাভবান হইতে পারিবেন।

এই সুরাসার কি জন্ম ব্যবহৃত হইবে? পেট্রোলের সহিত মিশাইয়া মোটরে ব্যবহার করা ব্যতীত ইহার অন্য কোন ব্যবহার এখন করা যাইবে না। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, পেট্রোলের সহিত শতকরা ২০ ভাগ সুরাসার মিশাইয়া তাহা ব্যবহার করায় মোটরের কোন ক্ষতি হয় না। সেই জন্ম এই প্রদেশদ্বয়ের সরকার ঐরূপ মিশ্রণ বাধ্যতামূলক করিবার জন্ম আইন করিতে প্রস্তুত আছেন।

এ দেশে ব্রহ্ম প্রভৃতি বিদেশ হইতেই অধিক পেট্রোল আমদানী হয়। সে অবস্থায় যদি ভারতবর্ষকে পেট্রোল বিষয়ে আংশিকরূপেও স্বাবলম্বী করা যায়, তবে তাহা লাভ বলিতে হইবে।

কিন্তু বিহারের ও যুক্তপ্রদেশের সরকারদ্বয় যে ব্যবস্থা করিতেছেন, তাহাতে সকল সমস্যার সমাধান হইবে না। কারণ:—

(১) বিহার ও যুক্তপ্রদেশ—প্রদেশদ্বয়ে যে প্রথায় ৯০ লক্ষ টন পেট্রোল প্রতি বৎসর ব্যবহৃত হয়, তাহার মধ্যে ১৮ লক্ষ গ্যালন সুরাসার পেট্রোলের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা যাইবে। সে জন্ম ৩০ হাজার টন চিটাগুড় ব্যবহৃত হইবে—৩ লক্ষ টনের

[উপন্যাস]

প্রথম পরিচ্ছেদ

শীতকাল। কয়েক দিন বৃষ্টির পর বৈকালের দিকে সবে মাত্র একটুখানি সূর্য্য দেখা দিয়াছে।

যতীন এইমাত্র কলেজ হইতে ফিরিয়াছে, তখনও জামা-কাপড় ছাড়া হয় নাই, তবু কয় দিনের পর রৌদ্র দেখিয়া তিন লম্ফে ছাদে গেল। সিঁড়ি দিয়া উঠিতে উঠিতে আপন মনেই বলিল, "ক'দিনের বৃষ্টিতে মুড়ির মত মিইয়ে গেছি।"

অপসৃয়মান সূর্য্যরশ্মির আভায় সমস্ত আকাশ গোলাপী হইয়া উঠিয়াছে, কেবল দক্ষিণ দিকের কোণে মিশ-কালো এক টুকরা মেঘ মত্তহস্তীর মত শুঁড় তুলিয়া কি যেন একটা ধরিতে উদ্যত হইয়াছিল।

যতীন মুগ্ধ হইয়া দিক্ হইতে দিগন্তরে দৃষ্টি সঞ্চালিত করিয়া দেখিতেছিল। সহসা তাহার দৃষ্টি পড়িল একটি তরুণীর উপর; বাতায়নের কাছে দাঁড়াইয়া সে-ও যতীনের মত প্রাকৃতিক শোভা উপভোগ করিতেছে।

মেয়েটি গৌরী নয়, কিন্তু সুরূপা। মুখখানি চমৎকার ঢলঢলে, রংটি উজ্জ্বল শ্যাম, কিন্তু পড়ন্ত রৌদ্র তখন মুখে লাগায় বেশ ফর্সাই লাগিতেছিল। মেয়েটির হাতে কয়েকখানা বই-খাতা দেখিয়া বুঝা যায়, স্কুল বা কলেজের ছাত্রী।

মেয়েটির পরিধানে একখানি চাঁপাফুল রংয়ের আলপাকা সাড়ী, একটি পুঁতির কায-করা সিঁদুরে-লাল সিল্কের জামা। চুলগুলি অনাবদ্ধ, দক্ষিণ আকাশের মতই অন্ধকার করিয়া সমস্ত পৃষ্ঠ এবং অংসদেশ ছাইয়া আছে।

যতীন মুগ্ধ হইয়া গেল। এই মেয়েটিকে সে কয়েকবার গলির ভিতরে এবং বেথুন কলেজের বাসে উঠা-নামা করিতে দেখিয়াছে। মেয়েটির অপরূপ সৌন্দর্য্য না থাকুক, যতীন প্রত্যেক বারেই মুগ্ধ হইয়াছে।

তরুণীর দৃষ্টিও এই সময় যতীনের উপর পড়িল; এবং মেসের এক যুবককে তাহার দিকে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া সে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া সরিয়া গেল। যতীনও নামিয়া আসিল, আপন মনেই মৃদু কণ্ঠে বলিল, "বাঃ, ঐ বাড়ীর মেয়ে! হেমেনের ঘরের ও পিঠে তা'হ'লে ওদের বাড়ী—দেখতে হ'ল ত!"

নীচে আসিলে মেসের চাকর কুঞ্জলাল চা ও জল-খাবার আগাইয়া দিল। একটা প্লেটে দুটি পাণ রাখিয়া বলিল, "এখন তা'হলে যাই, বাবু?"

যতীন সম্মতি দিয়া পরিতোষ পূর্ব্বক আহার করিয়া পাণ চিবাইতে চিবাইতে পা দুলাইয়া দুলাইয়া ভাবিতে লাগিল, কি করিয়া ঐ তরুণীর সহিত আলাপ করা যায়। বাড়ীর কর্ত্তা কে এবং কি প্রকৃতির মানুষ? সহজে তাঁহাকে বশীভূত করা যায় কি না?

আরে কি সর্ব্বনাশ,—প্রথম প্রশ্ন জাতিটা কি?—সাধে কি আর এ দেশে পূর্ব্বরাগের পথ বন্ধ করা হয়! যাহাদের পায়ে পায়ে বিধি-নিষেধ জড়ান, তাহাদের কোন বিষয়ে কি স্বাধীনতা দেওয়া চলে? ধর্ম্ম, জাতি, কুল, গোত্র, এতগুলা প্রতিবন্ধক তাহাদিগকে প্রতিপদে বাধা দিতেছে। না, বাঙ্গালার সমাজে পূর্ব্বরাগের স্থান নাই!

ভাবিয়া ভাবিয়া যতীন দিশাহারা হইয়া উঠিল, মনে মনে স্থির করিল, সে হাল ছাড়িয়া দিবে না, দেখাই যাক না, কি দাঁড়ায়।

পরদিন সকালেই হেমেন্দ্রের ঘরে যতীন গেল। বন্দি

সেখানে কোন সূত্র পাওয়া যায়, বিপরীত দিকে তরুণীর বাড়ী।

যতীনরা সুবর্ণ বণিক্। মেসের মধ্যে এক হেমেন্দ্রই তাহার স্বজাতি। কিন্তু তথাপি তাহার সহিত যতীনের মৌখিক আলাপ ছাড়া হৃদ্যতা ছিল না। হেমেন্দ্র অত্যন্ত রাগী এবং আত্মস্বার্থপরায়ণ; সে জন্য মেসের কোন অধিবাসীর সহিত তাহার ভাব ছিল না। হেমেন্দ্রও কাহারও সহিত পরিচয় করিতে উদ্গ্রীব ছিল না, কাজেই সে কতকটা—'একঘরে' মত ছিল।

আজ নিজ প্রয়োজনে একটা তুচ্ছ অছিলা লইয়া যতীন তাহার কাছে গেল। দুয়ার ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া যতীন স্তব্ধ হইয়া গেল। দুয়ারের দিকে পিঠ করিয়া খোলা জানালার কাছে কোলের উপর বই লইয়া হেমেন্দ্র বসিয়া আছে এবং বিপরীত দিকের জানালায় সেই তরুণী দাঁড়াইয়া। উভয়েই নির্নিমেষে চাহিয়া আছে—দু'জনেই তন্ময়—দু'জনেই নির্ব্বাক্!

যতীনের আগমন হেমেন জানিতে পারে নাই,—কিন্তু মেয়েটির দৃষ্টি তাহার উপর পড়িবামাত্র সে সশব্দে জানালা বন্ধ করিয়া দিল।

হেমেন্দ্র চকিত দৃষ্টিতে পশ্চাতে চাহিয়া দেখিল। যতীনকে দেখিয়া সে সঙ্কোচে এতটুকু হইয়া গেল।

যতীন শ্লেষের হাসি হাসিয়া বলিল, "মাপ করবেন, হেমেন্দ্রবাবু, বড় অসময়ে এসে পড়েছি। আমি যাচ্ছি, আপনি আলাপ করুন।" বলিয়া সে উত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়া চলিয়া গেল।

ঘরে ঢুকিয়া সে তক্তপোষে চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িল। আপন মনে বলিল, "দুত্তোর, বাধা কমে না, আরও বাড়ে। হেমেনটা আবার মাঝে দাঁড়াল!"

সে আর্শীখানা টানিয়া মুখের উপর ধরিল, প্রতিচ্ছবি দেখিয়া সে ক্ষুব্ধ হইল। যতীন কালো; শ্যামবর্ণ নয়,—কালো; মুখখানি সুশ্রী বটে, কিন্তু একবার বসন্ত হইয়া মুখে সে তাহার বিজয়শ্রীস্বরূপ আট-দশটা চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছিল। এই সঙ্গে মনে পড়িল, হেমেন্দ্রের অপূর্ব্ব সুন্দরকান্ত আকৃতি,—চমৎকার দীপ্ত-শ্রী! যতীন ক্ষুব্ধ হইয়া ভাবিল, মানুষ কালো হয় কেন?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইহার পর কয়েক দিন কাটিয়া গেল।

একদিন সন্ধ্যার দিকে যতীন দেখিল, মেস-ম্যানেজারের দুয়ারের কাছে দাঁড়াইয়া একটা ব্যাগে কতকগুলা কাপড় পুরিতে পুরিতে হেমেন্দ্র কি কথা বলিতেছে; পরক্ষণেই সে ব্যস্ত হইয়া নামিয়া গেল।

যতীন সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। এমন অকস্মাৎ অন্তর্দ্ধানের কারণ কি? প্রতিবেশি-দুহিতার সহিত পবিত্র পলায়ন নয় ত?

কিন্তু যতীন নিজের হাস্যকর শঙ্কায় নিজেই লজ্জিত হইল। তাই যদি হয়, যতীনের তাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি কতটুকু? যাহার সহিত যতীনের মৌখিক পরিচয় পর্য্যন্ত নাই, তাহার সম্বন্ধে এ শিরঃপীড়ার তাহার আবশ্যক কি?

রাত্রে মেস-ম্যানেজারের নিকট শুনিল, হেমেন্দ্রের পিতা সাংঘাতিক পীড়িত, সংবাদ পাইয়া হেমেন্দ্র বাড়ী গিয়াছে। যতীন কিন্তু কথাটা সঠিক বিশ্বাস করিল না।

দিন পাঁচ ছয় পরে গলির মুখে বেথুন কলেজের বাস দাঁড়াইয়া আছে এবং সেই তরুণী অধিরোহণ করিতেছে দেখিয়া যতীনের দেহে যেন প্রাণ আসিল। তবে সত্যই হেমেন দেশে গিয়াছে।

আনন্দে যতীনের মনটা আজ হাল্কা হইয়া গিয়াছিল। মেসে আসিয়া সে প্রত্যহের অপেক্ষা দেড়গুণ জলযোগ করিয়া হেদোর ধারে বেড়াইতে গেল। বিপরীত দিকের বেথুন কলেজের দিকে চাহিয়া সে ভাবিতে লাগিল, এই-খানে তরুণী নিত্য আসে। কি পড়ে? কি জানি! হয় ত আই-এ। কি কি সাবজেক্ট লইয়াছে? কি জানি! গণিত লইয়াছে কি? যতীন নিজে গণিত লইয়াছে, তাই গণিতের প্রতি তাহার বড় মমতা।

কতক্ষণ সে উন্মনা হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইল, তাহার পর এক সময় সম্বিৎ পাইয়া দেখিল, অগ্রহায়ণের হিমে তাহার মাথা ভিজিয়া গিয়াছে।

যতীন নিজের বুদ্ধিহীনতার জন্য খুব হাসিল, তাহার পর তাড়াতাড়ি করিয়া মেসে ফিরিয়া আসিল।

মেসে আসিয়া সে বই লইয়া বসিল। যতীন মেধাবী ছাত্র, বরাবর তাহার রেকর্ড ভালই আছে। এখন বই

খুলিতেই তাহার মনে হইল, যদি কেহ তাহার রূপহীনতা ঢাকা দিতে পারে ত সে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ!

যতীন বইগুলির উপর মমতার সহিত হাত বুলাইতে লাগিল। ইহারাই তাহার সম্বল। ইহারই কয়েক দিন পরে হেমেন আসিয়া উপস্থিত হইল, খালি পা দেখিয়াই তাহার পিতৃবিয়োগ হইয়াছে বুঝা গেল। মেসের সকল অধিবাসী আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া সহানুভূতির সহিত জিজ্ঞাসাবাদ করিতে লাগিল।

হেমেন্দ্র মলিন-মুখে বলিল, "এ মেসের চার্জ্জ বেশী, আমি আর দিতে পারব না। মিছে আর এক মাসের মত ঘরটা আট্‌কে রেখে কি হবে।" একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "এ মেসের সঙ্গে আমার তিন বছরের সম্বন্ধ—আজ শেষ হ'য়ে গেল।"

যতীন বড় পরদুঃখ-কাতর, সে হেমেনের জন্য ব্যথিত হইল, এবং হেমেনের সহিত তাহার জিনিস-পত্র গুছানর কাযে সাহায্য করিতে লাগিল।

রাত্রে সে মেস-ম্যানেজারকে বলিল, "আমি আমার ঘর বদ্‌লে হেমেন বাবুর ঘরে যেতে চাই।"

ম্যানেজার বিস্মিত হইলেন; বলিলেন, "কেন, আপনার ঘর দক্ষিণ-দুয়ারী। ও-ঘর ছাড়তে চাইছেন কেন? হেমেন বাবুর ঘর ত ভাল নয়।"

যতীন বলিল, "তা হোক্, ওটা বেশ একটেরে—নির্জ্জন। ওখানেই আমার পড়াশুনার বেশ সুবিধা হবে।"

মেসের অধিবাসী তাহার একটি বন্ধু হাসিয়া বলিল, "তাই, না ওখানে সোণার খনি আছে? কি হে?"

যতীনও হাসিল; বলিল, "কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, হেমেনবাবু ঐ ঘরে তিন বছর থেকেও অর্থাভাবে এ মেস ছাড়তে বাধ্য হলেন।"

ছেলেটি যতীনের অন্তরঙ্গ, নাম মনোজ। সে বলিল, "সকলের কি আর বরাত সমান!"

যতীন বলিল, "তা হ'তে পারে! কিন্তু আমি এখনও স্বর্ণখনির সন্ধান পাই নি। তা ছাড়া, স্বর্ণখনি খোঁজবার কি অবসর আছে? মাথার ওপর পরীক্ষা এগিয়ে এলো যে!"

মনোজ বলিল, "পরীক্ষাকে ত তোমার বড়ই ভয়। তুমি মেধাবী, প্রত্যেক বারই পরীক্ষা-সাগর সহজেই ডিঙ্গিয়ে গেছ। ও তোমার কাছে বিভীষিকা নয়। যার মাথা আছে, তার চিন্তা নেই।"

যতীন আত্ম-প্রশংসা শুনিয়া লজ্জিত হইয়া বলিল, "পরীক্ষা ভাল করে পাশ করায় বিশেষ কোন কৃতিত্ব নেই, ওটা চান্স। খুব ভালো করে পাশ করলেই যে উত্তরকালে সে খুব বড় পণ্ডিত হবে, তার কোনও মানে নেই। দেখ না কেন, রবীন্দ্রনাথ আর শরৎচন্দ্র, এঁরা বাঙ্গালা সাহিত্যকে তাঁদের অবদানে অমর করে রাখলেন, কিন্তু দুজনেই স্কুল-পালান ছেলে।"

তাহার পর সেই রাত্রেই যতীন তাহার জিনিস-পত্র তুলিয়া আনিয়া হেমেনের ঘরে রাত্রিযাপন করিল।

খুব ভোরে উঠিয়া যতীন প্রত্যাশাপন্নমুখে সম্মুখের বাড়ীর দিকে চাহিয়া রহিল। ও-বাড়ীর জানালা তখন বন্ধ দেখিয়া সে জানালা খুলিয়া সম্মুখে বসিয়া ক্ষৌরকার্য্যে প্রবৃত্ত হইল।

একদিকের গাল কামান হইয়াছে, সহসা সম্মুখের বাড়ীর জানালা খোলার শব্দ পাইয়া যতীন চমকিয়া চাহিতে গেল,—কিন্তু হাতের ঠিক রাখিতে পারিল না, অকস্মাৎ এক চাক্‌লা মাংস ক্ষুরের সঙ্গে উঠিয়া আসিল।

বিপরীত দিকে লক্ষ্য হইল—সেই তরুণী অত্যন্ত অপ্রসন্ন চোখে চাহিয়া আছে।

চোখো-চোখি হইতে সে সশব্দে জানালা বন্ধ করিয়া দিল।

যতীন তখন আর বড় ও-দিকে লক্ষ্য করিতে পারিল না, রক্তে তাহার মুখ ভাসিয়া যাইতেছিল। যতীন উঠিয়া ক্ষতের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইল। মৃদুকণ্ঠে সে বলিল, "প্রথম দর্শনেই রক্তপাত হ'ল!"

মেসের অধিবাসীরা তাহার গালের ক্ষত দেখিয়া বলিল, "ক্ষুরের কাটা—ওকে বিশ্বাস নেই, যতীনবাবু। একবার ডাক্তারের কাছে যান।"

যতীন বলিল, "রক্ত বন্ধ হয়েছে আর গিয়ে কি হবে?"

মনোজ ছাড়িল না, বলিল, "না, না, ও-সব বিষয়ে কুড়েমি ভাল নয়। একবার যাও।"

অগত্যা যতীন ডাক্তারের কাছে গিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া ফিরিল।

মনোজ ক্ষুব্ধ হইয়া বলিল, "গালে হয় ত একটা দাগ হয়ে যাবে।"

যতীনের মনেও সেই আশঙ্কা হইতেছিল। বলিল, "একেই ত দাগে মুখখানা মার্কামারা, আবার একটা হ'ল।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কয়েকদিন পরে যতীন একদিন সন্ধ্যায় বেড়াইয়া ফিরিতেছিল, অকস্মাৎ খুব জোরে বৃষ্টি আসায় তাড়াতাড়ি পথিপার্শ্বের এক রোয়াকে উঠিয়া বৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতেছিল। এমন সময়ে ভিতর হইতে আহ্বান আসিল, "ভেতরে আসুন না, মশায়। ওখানে দাঁড়িয়ে ভিজবেন কেন?"

যতীন ভিতরে গেল। এ বাড়ী সেই পূর্ব্ব-বর্ণিতা তরুণীর।

ঘরে তক্তপোষে ঢালা বিছানা, গোটা দুই তাকিয়া, অদূরে একটা টেবলের উপর আলো বসান। দু'টি গা-আলমারী, একটিতে রাশীকৃত পুরাতন 'দৈনিক বসুমতী' ধূলায় আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। দেওয়ালে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ও সপ্তম এডওয়ার্ডের ছবি, একদিকে একখানা ওয়াটারলুর যুদ্ধ-চিত্র। যতীন মনে মনেই বলিল, "উনবিংশ শতাব্দী!"

ঘরে একটি বৃদ্ধ বসিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, "বসুন, বসুন, ভিজে গেছেন? কোথা থেকে যে এমন বৃষ্টিটা এলো! ছাতি না নিয়ে পথে বেরুন ঠিক নয়, মশাই।"

যতীন বলিল, "বৃষ্টি হবে তা বুঝতে পারিনি। যা হোক্, ভিজিনি।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "আপনাকে প্রায়ই দেখি। সাম্‌নের মেসে থাকেন, না?"

যতীন সবিনয়ে জানাইল, সে ঐ মেসের অধিবাসীই বটে।

বৃদ্ধ বলিলেন, "দোষ নেবেন না। আমরা বুড়-মানুষ, পরিচয় না নিয়ে থাকতে পারি না। এখনকার দিনে এ সব দোষের হয়েছে।—আমাদের সময়ে অপরিচিত লোক দেখলেই জিজ্ঞেস করা হ'ত—আপনারা?—অর্থাৎ কি জাত, নিবাস, নিজের নাম, ঠাকুরের নাম ইত্যাদি। এ-কালে ঠাকুরের নাম জানতে চাইলে অনেক ছেলেই হয় ত উল্টে জিজ্ঞাসা ক'রবে, কি ঠাকুর?" বলিয়া বৃদ্ধ হাসিতে লাগিলেন।

যতীনও হাসিল; বলিল, "অন্ততঃ আমি তা বল্‌ব না।—আপনার সকল প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি। আমার নাম যতীন্দ্রনাথ দত্ত। পিতার নাম শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার দত্ত, বাড়ী মেদিনীপুরে।" কথা বলিতে বলিতে যতীন সম্মুখে একখানা বই পাইয়া উহার মলাট খুলিতেই দেখিতে পাইল, মেয়েলী অক্ষরে লেখা "স্বাহা সেন, দ্বিতীয় বার্ষিক আর্টস্, বেথুন কলেজ।" যতীনের বুকের মধ্যে চমক খাইয়া উঠিল, সেই তরুণীর বই না কি? সেন,—তাহাদের স্বজাতি না কি?

বৃদ্ধ ঈষৎ গর্ব্বের সহিত বলিলেন, "ও আমার মেয়ের বই।"

যতীনের বুকের মধ্যে দোল খাইতে লাগিল, সেই মেয়েটি নিশ্চয়।

বৃদ্ধ প্রশ্ন করিলেন, "বাবাজিরা?"—

যতীন হাসিয়া বলিল, "ঐ দেখুন, একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে ভুলেই গেছি। আমরা সপ্তগ্রামী সুবর্ণ বণিক্।"

বৃদ্ধ উৎসাহে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, "এঁ্যা—এঁ্যা, তাই না কি? আমরাও ত তাই! বাঃ, আমাদের স্বজাতি তাহ'লে! তা বাবাজির কি করা হয়? দেশেই মা-বাবা সব থাকেন বুঝি?"

যতীন বলিল, "হাঁ। আমি এ'বছর বি-এ দেব।"

তখন বাহিরে ঝম-ঝম রম-রম করিয়া খুব জোরে বৃষ্টি নামিয়াছে। বৃষ্টির শব্দ শুনিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, "এই যে বৃষ্টিটা হচ্ছে, এ ধানের যা সর্ব্বনাশ ক'র্‌বে। কথায় আছে—'যদি বর্ষে আগণে রাজা যান মাগনে।' ধান আর এক আঁজলাও ঘরে তুলতে হবে না।"

যতীন জানাইল—সে-ও তাহা জানে, যেহেতু তাহাদের ধান-জমী আছে। বৃদ্ধ অনুসন্ধিৎসু ভাবে অনেক প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, এবং যতীনও স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অনেক পরিচয় দিল।

"বাবা, বড্ড বৃষ্টি পড়ছে, বালাপোষখানা গায়ে দিন।" বলিতে বলিতে সেই তরুণী একখানা বালাপোষ লইয়া ভিতরে আসিল।

এমন করিয়া যতীন আজ স্বাহাকে তাহার সম্মুখে দেখিতে পাইবে, তাহা সে কল্পনাও করিতে পারে নাই।

স্বাহা উজ্জ্বল শ্যামাঙ্গীই বটে। চোখ দুটি স্নিগ্ধ—হরিণীর মত ভীরু, বড় বড় কালো তারা দুটি জলিতেছে। চোখের পল্লব এত বড় ও ঘন যে, মনে হয়, গালের উপর নামিয়া আসিয়াছে। নাসিকা সুতীক্ষ্ণ ও উন্নত,—মেয়েদের মধ্যে কদাচিৎ এমন সুগঠন নাসা দেখা যায়। ললাট নাতিক্ষুদ্র, ভ্রূদুটি যুগ্ম নয় বটে, কিন্তু শিল্পীর হাতের তুলির টানের মত সূক্ষ্ম, সুন্দর ও সৌষ্ঠবময়। ওষ্ঠের অপেক্ষা নিম্নোষ্ঠ ঈষৎ পুরু, বাম গণ্ডে একটা টেপা টোল-খাওয়া দাগ। মাথায় বৃহৎ কবরী।

তাহার পরিধানে একখানি ধানের শীষ রংয়ের সাড়ী, একটা নস্যি রংয়ের গরম জামা, তাহার হাত ও গলায় মুগার সূতার কারুকার্য্য। কাণে দুটি লাল পাথরের দুল, হাতে পলপ্যাঁচ শাঁখার কোলে দুগাছি লাল কাচের চুড়ী এবং চারগাছি ছিলাকাটা সোনার চুড়ী, গলায় সরু বিছাহার, তাহাতে হরতন লকেট।

তাহার সমস্ত দেহ ঘিরিয়া যেন সৌন্দর্য্যের প্লাবন আসিয়াছে। যতীন মুগ্ধ হইয়া গেল।

স্বাহা প্রথমে যতীনের মুখ লক্ষ্য করে নাই, দৃষ্টি পড়িবামাত্র সে ভূত-দেখার মত চমকাইয়া উঠিল।

যতীন তাহা স্পষ্ট অনুভব করিয়া মনে মনে হাসিল; আপন মনেই বলিল, "বেচারী! ভয় পেয়ে গেছে! কিন্তু আর ত ভয় নেই, ঈশ্বরের দয়ায় আমরা স্বজাতি। সহজেই তোমাকে আমি পেতে পারি!" কিন্তু পরক্ষণেই অত্যন্ত ক্ষোভের সহিত তাহাকে স্মরণ করিতে হইল, হেমেন্দ্রও তাহাদের স্বজাতি!

হীরালাল বাবু কন্যার হাত ধরিয়া কাছে বসাইলেন, বলিলেন, "মা, ইনি এই মেসেরই বাসিন্দা—

কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই স্বাহা ঘাড় হেলাইয়া বলিল, "জানি।"

যতীনের ঠোঁটের উপর একটু হাসি খেলা করিতে লাগিল, মনে মনে বলিল, "তা আর জানো না! রক্তদর্শন করেছিলে!"

তাহার পর বৃষ্টি থামিলে যতীন উঠিল।

হীরালাল বাবু তাহাকে সময় হইলেই আসিতে অনুরোধ করিলেন। যতীন সবিনয়ে জানাইল, সে আসিবে।

তাহার পর সে হীরালাল বাবুর পদধূলি লইয়া এবং স্বাহাকে নমস্কার করিয়া তাহার অন্ধকারাচ্ছন্ন মুখের পানে চাহিয়া পথে নামিয়া পড়িল।

মনে মনে সে বলিল, "বুড়ো-বুড়ীকে ভক্তি ও সৌজন্যে আর তোমাকে ভালবাসায় মুগ্ধ করব। তবু কি তুমি প্রসন্ন হবে না, স্বাহা! আমার রূপের অভাব কি আমার ভালবাসা তোমায় ভোলাতে পারবে না?"

পত্নী বসুমতীকে কন্যার অসাক্ষাতে হীরালাল বাবু বলিলেন, "আজ যে ছেলেটির সঙ্গে আলাপ হ'ল, মনে হ'ল যেন ভগবানের দান। কি অমায়িক, কি নম্র, আজকালকার দিনে এমন ছেলে দেখা যায় না। এক জাত শুনে যাবার সময় দণ্ডবৎ করে গেল। যে রকম বললে, অবস্থা ভালই, ছেলেটি নিজেও বি-এ পড়ছে—"

বসুমতী বলিলেন, "খুকির সঙ্গে হয় না?"

হীরালাল বাবু বলিলেন, "আমার ত দেখেই তাই মনে হ'ল। তবে ছেলেটি কালো।"

বসুমতী বলিলেন, "হীরের আংটীর বাঁকা-সোজা নেই। তা ছাড়া, খুকিও ত সুন্দর নয়।"

হীরালাল বাবু বলিলেন, "বলেছি মধ্যে মধ্যে আসতে। দু'দিন ব্যবহার করে দেখি ছেলেটি কেমন। এক দিনেই কিছু বোঝা যায় না। যদি ভালো বলেই মনে হয়, তখন ওর বাপকে চিঠি লিখব, কি বল?"

বসুমতীর মুখ ম্লান হইয়া গেল; বলিলেন, "বাপ-মায়ের রাজী হওয়া শক্ত, খুকি যে আঠার বছরের হ'ল।"

হীরালাল বাবুও বিমর্ষ হইয়া গেলেন; একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "দেখি, আগে ছেলেটি কেমন, তারপর পরের কথা দেখা যাবে।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ইহার পর যতীন প্রায়ই সে-বাড়ীতে যাইতে লাগিল। যতীন দাবা খেলিতে জানিত, ইহাকেই উপলক্ষ করিয়া হীরালাল বাবুর সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়া গেল। সম্মুখে পরীক্ষা, কিন্তু অধিকাংশ মেধাবী ছেলের যা হয়, যতীনেরও তাই ছিল। সে সারাক্ষণ বইমুখো হইয়া থাকিত না, খুব অল্প সময় সে পড়িত; কিন্তু যাহা পড়িত, তাহাই কণ্ঠস্থ হইয়া

যাইত। এইজন্যই দাবা খেলার সময়াভাব তাহার ঘটে নাই।

ক্রমে দুই-চারি দিনের মধ্যেই বসুমতীও তাহার সহিত কথা বলিতে লাগিলেন। তিনি হীরালাল বাবুর দ্বিতীয় পক্ষের বনিতা। হীরালাল বাবু বৃদ্ধ বটে, কিন্তু বসুমতীর বয়স বত্রিশ-তেত্রিশের বেশী হইবে না। সেজন্য প্রথম প্রথম তিনি যতীনকে একটু সমীহ করিয়া অর্দ্ধাবগুণ্ঠন দিতেন, কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই আর তাহা রহিল না, যতীন এই অসম দম্পতির পুত্রতুল্য হইয়া উঠিল। স্বাহা কোন সময়েই যতীনের সম্মুখে স্বেচ্ছায় বাহির হইত না, কিন্তু বসুমতী যখন সদা-সর্ব্বদা তাহাকে ভিতরে ডাকিয়া গল্প করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন আর তাহার আড়াল আবডাল রহিল না। এক দিন রুষ্টমুখে সে বলিল, "যখন-তখন যতীন বাবুকে ভেতরে ডাক কেন, মা? আমার ভাল লাগে না।"

মা হাসিয়া বলিলেন, "পেটে ত ছেলে ধরিনি, তাই দেখ্‌ছি, পরের ছেলে ফাঁকি দিয়ে আপনার করতে পারি কি না।"

রাগে স্বাহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। মায়ের কথার মধ্যে যেন একটা গূঢ় ইঙ্গিত ছিল। স্বাহা বলিল, "বেশ ত, তোমার ছেলে নিয়ে তুমি বাইরে বস তবে। চব্বিশ ঘণ্টা বাইরের লোক ভেতরে বসে থাকলে আমার অসুবিধা হয়।"

বসুমতী আরও হাসিয়া বলিলেন, "আমি কুলের বউ, বাইরের ঘরে বসতে যাব কেন রে? তোর আবার অসুবিধা কিসের? যদি আমার পেটের ছেলেই হত—"

স্বাহা শ্লেষের হাসি হাসিয়া বলিল, "তাহ'লে অন্ততঃ একটু সুন্দর হত! তোমার, মা, রুচি নেই। পরের ছেলেই যদি নিজের করতে চাইছ, তাহ'লে অন্ততঃ একটু সুন্দর দেখে করতে হয়। ঐ কষ্টিপাথর আর ডায়মণ্ডকাটা মুখ তোমার এত ভাল লাগল!"

বসুমতী রাগিয়া বলিলেন, "আ খেলে যা, মেয়ে! তোর ত বড় সুন্দর মুখ! তুই বুঝি আরমানী বিবির মত ফর্সা?"

স্বাহা বলিল, "আরমানীর বিবির মত না হলেও, মা, যতীন বাবুর রংয়ের সঙ্গে আমার তুলনা কোর না। ওঁর রংয়ের কাছে আমি সত্যিই সুন্দরী।" বলিয়া সে সবিদ্রূপ কটাক্ষে মায়ের দিকে চাহিয়া চলিয়া গেল।

এইভাবে যখন দিন যাইতেছিল, তখন হীরালাল বাবু এক দিন যতীনের কাছে স্বাহার সহিত তাহার বিবাহের প্রস্তাব করিয়া ফেলিলেন।

যতীন আনন্দে কথা কহিতে পারিল না। নতমুখে কোঁচার খুঁটটা পাকাইতে লাগিল। হীরালাল বাবু বলিলেন, "একটা কথা কিন্তু ভাবছি, বাবা। তুমি একালের ছেলে, বড় মেয়ে বিয়ে করতে তোমার আপত্তি না থাকতে পারে, কিন্তু তোমার মা-বাবা কি এটায় রাজী হবেন?" একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ব্যথিত কণ্ঠে কহিলেন, "আমিই কি কোন দিন আঠার বছরের মেয়ে ঘরে রাখব ভেবেছিলুম।"

আজ বহু দিনের স্মৃতির অতল হইতে তিনি তাঁহার শোকের পরিচ্ছেদ উদ্ধৃত করিয়া ম্লান মুখে বলিলেন, "বড় মেয়েটির আট বছর বয়সে বিয়ে দিয়েছিলুম। বছর ঘুরল না সে বিধবা হ'ল।" একটু মৌন থাকিয়া বলিলেন, "বেশী দিন দুঃখ ভোগ করেনি সে—বছর পাঁচ পরেই চলে গেল! মেজ মেয়েটির দশ বছরে বিয়ে দিলুম, ছেলেটি আঠার বছরের। শাশুড়ী যা ছিল বজ্জাতের একশেষ,—মেয়েটার লাঞ্ছনার সীমা রইল না। দগ্ধে দগ্ধে মেয়েটা মরে গেল! আমি একবার চোখেও দেখ্‌তে পেলুম না। স্বাহার বড় মা তখন বেঁচেছিলেন। দুটো মেয়ের দু'রকম দুর্দ্দশা দেখে তিনিও চলে গেলেন।"

অনেকক্ষণ হীরালাল বাবু কথা কহিলেন না; হয়ত বা স্বর্গগতা প্রথমা পত্নী ও কন্যাদ্বয়ের মুখ বহুদিন পরে মনে পড়ায় লজ্জা পাইতেছিলেন। তাহার পর এক সময় যেন সচেতন হইয়া বলিলেন, "তোমাদের বাড়ীর ঠিকানাটা দিও ত, বাবা! তোমার বাবাকে একখানা চিঠি লিখব।"

যতীন আঁতকাইয়া উঠিল। সর্ব্বনাশ! পিতাকে জানাইলে তাহার পরিণতি কি হইবে, তাহা যতীনের জানা ছিল। তাই যথাসম্ভব সহজ গলায় বলিল, "বাবাকে কিছু জানাবেন না। বাবা ও-সব খুবই মানেন,—তা হ'লে এ হতেই পারবে না।"

হীরালাল বাবু উদ্বিগ্ন হইয়া বলিলেন, "তাহ'লে কি হবে? তাঁকে না জানিয়ে ত আর কিছু হতে পারবে না।"

যতীনও ভাবিতেছিল, বলিল, "তা ত হয়ই না। কিন্তু এখন থাক্, পরে জানালেও চলবে।" একটু চুপ করিয়া

বলিল, "বরং এক কায করলে হয় না! একেবারে বিবাহ করে দেশে যাব। আমাকে ত আর ফেলতে পারবেন না।"

হীরালাল বাবু বিষণ্ণ হাসি হাসিলেন; কন্যার বিবাহ দিয়া তিক্ত অভিজ্ঞতা তিনি লাভ করিয়াছেন। বলিলেন, "বাবাজি, তুমি ভুলে যাচ্ছ যে, তুমি তাঁদের সন্তান,—তোমাকে যত শীঘ্র ক্ষমা করতে পারবেন, পরের মেয়েকে ততটা পারবেন না। শেষে আমার মেয়ে যদি কষ্ট পায়?"

যতীন একটু বেগের সহিত বলিল, "কষ্ট? আমার মায়ের কাছে? অসম্ভব!—তা ছাড়া আমি যাঁর দায়িত্ব নেব, তাঁর সম্বন্ধে আমার কর্ত্তব্য আমি পালন করব। এ বিশ্বাস আমাকে করতে পারেন।"

হীরালাল বাবু বলিলেন, "সে তো খুবই ভাল কথা। তবে তোমার মা-বাপকে না জানিয়ে কোন কিছু করা আমার মত নয়।"

যতীন ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "বেশ, আমি নিজেই জানাব।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পরদিন রবিবার। যতীন সকালেই সে-বাড়ী গেল।

ভিতরের দালানে স্বাহা তাহার জুতাগুলিতে ক্রীম মাখাইতেছিল, যতীনকে দেখিয়া একটু জড়সড় এবং একটু রুষ্ট হইল। নিজের ঘরে লোকে যাহা ইচ্ছা কায করে, কিন্তু তাই বলিয়া বাহিরের লোক দেখে এমন ইচ্ছা কাহারও হয় না। যতীনের কিন্তু সে দিকে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ ছিল না। সে দালানের একদিকে পা ঝুলাইয়া বসিয়া ডাকিল, "মা কৈ?"

বসুমতী রান্নাঘরে ছিলেন; হাত ধুইয়া মুছিতে মুছিতে বাহিরে আসিয়া সস্নেহ দৃষ্টিতে যতীনের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমাকে ডাকছিলে, বাবা?"

যতীন বলিল, "থিয়েটার দেখ্‌তে যাবেন, মা?"

যাত্রা-থিয়েটার দেখার সখ বসুমতীর অত্যধিক, সঙ্গীর অভাবে বড় একটা যাইতে পারেন না। প্রীত-কণ্ঠে বলিবেন, "যাব বৈ কি, বাবা। তুমি নিয়ে যাবে?"

যতীন সম্মতি দিল।

বসুমতী বলিলেন, "আমি ও-সব খুবই ভালবাসি, কিন্তু হয়ে উঠে না। উনি বেতো মানুষ, কিছুতেই যেতে স্বীকার করেন না।"

যতীন বলিল, "তাহ'লে আপনারা প্রস্তুত থাকবেন। আজ আত্মদর্শন হবে।"

বসুমতী বলিলেন, "তাহ'লে একটু দাঁড়াও, বাবা, কর্ত্তার মতটা একবার নিই, আর টাকা বের করে আনি। এখন টিকিট করবে ত?"

স্বাহা বলিল, "আমি যাব না, মা! শুধু তোমার টিকিট করতে দাও।"

মা গমনোদ্যত হইয়াছিলেন, ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, "যাবি না কেন?"

স্বাহা বলিল, "কেন আবার, এমনি।"

বসুমতী রাগিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "এমনি মানে? সব বিষয়ে কি একগুঁয়েমী? আমি একা যাব না কি? তোকে যেতেই হবে।"

স্বাহা খুব রাগিয়া ছিল; হয়ত মাকে দুই চারিটা উত্তরও দিত, কিন্তু বাহিরের লোক যতীন বসিয়া আছে বলিয়া সে আত্মসম্বরণ করিয়া চুপ করিয়া গেল। বসুমতী চলিয়া গেলেন।

তিনি গেলে যতীন ব্যথিত ভাবে বলিল, "মা না বুঝলেও আপনার অনিচ্ছার কারণ আমি বুঝেছি। কিন্তু আমার কাছে বসে ত আর দেখতে হবে না,—মা নিশ্চয়ই ভেতরে বসবেন।"

যতীনের এই অহেতুকী অভিমানের কথা শুনিয়া স্বাহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। সে ক্রুদ্ধ কণ্ঠেই বলিল, "আমার আর ছাই কথা বলারও যো নেই। যাব না বলেছি বলে ঘরে-পরে কৈফিয়ৎ দিতে হবে। বেশ— আমি যাব—টিকিট করুন।"

সে ক্ষিপ্রপদে চলিয়া গেল।

যতীন স্তব্ধ হইয়া গেল। তাহার উচ্ছ্বসিত যৌবনের সমস্ত প্রেমসম্ভার সে যাহাকে অঞ্জলি দিবার জন্য আহরণ করিয়া আনিয়াছে, সে যে পাষাণ-প্রতিমা! তাহাতে ত আজিও প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয় নাই—সে কি বরদাত্রী হইতে পারিবে?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ইহারই দুই-চারি দিন বাদে যতীন এক দিন মনোজের ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, সে একাগ্রমনে পড়িতেছে। যতীন দুয়ারটা বন্ধ করিয়া দিতে সে পিছন ফিরিয়া চাহিয়া বলিল, "ওকি, দোর বন্ধ করলি কেন?"

যতীন বলিল, "দরকার আছে। তুই কি খুব ব্যস্ত না কি, বইয়ে ডুবে মরছিস?"

মনোজ বলিল, "কি করি বল, মাথাটা ত আর তোর মত নয় যে, সামনে পরীক্ষা ঝুলছে, আর দাবা খেলে সময় নষ্ট করব। বোস্, বোস্—"

যতীন বলিল, "বোসব বলেই ত এলুম, কিন্তু তোর মত ভাল ছেলের সময় নষ্ট করতে ভয় করছে যে!—"

মনোজ বলিল, "বোস্—বোস্, ও-বাড়ীটির মোহিনীর মায়ায় বদ্ধ হয়ে ত আমায় একেবারে ভুলেই গেছিস। আজ বুঝি ঝগড়া হয়েছে?"

যতীন তাহার পৃষ্ঠে সজোরে মুষ্ট্যাঘাত করিয়া বলিল, "শোন্—শোন্, তোর সঙ্গে কথা আছে।"

মনোজ উঠিয়া বসিয়া বলিল, "তাই বল, ভাই। তোর পাথুরে হাতের কিল আর মারিসনি।" যতীন হাসিল; বলিল, "শোন্ বলছি, ওদের বিষয় তোকে বেশী কিছু বলা হয়নি।—জানিস্, হীরালাল বাবু তাঁর মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে চান—"

মনোজ হাত উল্টাইয়া বলিল, "আহা! কি নতুন কথাই শোনালি! তা না হলে কি তুই শুধু-শুধুই ও-বাড়ী আঁকড়ে পড়ে আছিস্! কিন্তু মেয়েটির মত পেয়েছিস্? বয়স্থা, কলেজে-পড়া আধুনিক মেয়ে—"

যতীন বলিল, "সব বলছি। আসল কথা কি জানিস, আমাদের সমাজে বড় মেয়ে আজও একেবারে অচল। কলকাতার বাসিন্দারাই বারো-তেরোর বেশী বয়সের মেয়ে রাখতে ভরসা পায় না, আর আমাদের বাড়ী মফঃস্বলে। স্বাহার বয়স আঠার বছর। হীরুবাবু অন্য দুটি মেয়ের বাল্যবিবাহ দিয়ে বড় দুঃখ পেয়ে এ মেয়ের বিবাহ দেননি—আবার এখন মেয়ে এত বড় হয়েছে যে, সমাজের মধ্যে সৎপাত্র পাওয়াও ওঁর পক্ষে কঠিন। কিন্তু কথা হচ্ছে, আমার মা-বাবাও যে রাজী হবেন, সে আশা আমি স্বপ্নেও করি না। তোর কাছে তাই বুদ্ধি নিতে এলুম। কি করি বল ত?"

মনোজ একটু ভাবিয়া বলিল, "সমস্যা বটে! আমাদের বামন-কায়েতের ঘরে চলে, কিন্তু তোদের সমাজে চলে না। মা-বাপের মত না দেওয়া আশ্চর্য্য নয়।"

যতীন বলিল, "যদি একেবারে বিয়ে করে নিয়ে যাই? তখন ত আর আট্‌কাবার উপায় থাকবে না।"

মনোজ বলিল, "সর্ব্বনাশ! তুই কি একেবারে ক্ষেপে গেলি না কি? বউটার অবস্থা একবার ভাব ত? তোর গোঁয়ার্ত্তুমী ঢাকা পড়ে যাবে, দোষ পড়বে বউয়ের ঘাড়ে। সকলের কাছে গঞ্জনা পেলে কি করে বাঁচবে!"

যতীন একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "সে-ও সত্যি। তা ছাড়া, আমি ত পড়ি, ও থাকবে এখন দেশে। সেখানে যদি শান্তি না পায়, তাহলে সত্যিই বড় কষ্ট পাবে বটে।"

মনোজ বলিল, "বরঞ্চ এক কায কর, মায়ের কাছে সব খুলে বল, তিনি যদি স্বীকার করেন, ভালই, নইলে এদিকে আর মায়া বাড়াস্‌নি। লুকোচুরি ভাল নয়, তার পরিণাম কখন ভাল হয় না।"

যতীন একটু ভাবিয়া বলিল, "মা যে রাজী হবেন না, এ ত জানা কথাই, কিন্তু তাহ'লে?"

মনোজ বলিল, "আশা ছেড়ে দিও।"

যতীন দৃঢ়ভাবে বলিল, "বলা সহজ, করা শক্ত।"

মনোজের দুই চক্ষু কৌতুকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, ঠোঁট কামড়াইয়া হাসি চাপিয়া বলিল, "তাই না কি? প্রেমটা তাহ'লে খুব ঘন পাক হয়েছে বল্?"

যতীনের মানসপটে ভাসিয়া উঠিল স্বাহার কয়দিনের পূর্ব্বের রূঢ় আচরণ। তথাপি বলিল, "সেটা ঠিক জানি না। অন্ততঃ আমি নিজের কথা জোর করেই বলতে পারি—"

মনোজ বলিল, "এ কথার মানে? ওদিক্ থেকে কোন রকম আশঙ্কা আছে না কি? তোর সঙ্গে কি রকম ব্যবহার —এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর, না গেরস্তর মেয়ের মত?"

যতীন অন্যমনে মৃদুকণ্ঠে বলিল, "অনুকূল নয়। তবে সেটা লজ্জা বা কি, তা বুঝতে পারি না।"

মনোজ তখন কুরিয়া-কুরিয়া প্রশ্ন করিতে লাগিল, আর প্রথম প্রণয়ের যাহা লক্ষণ—যতীন অনর্গল বলিয়া গেল—কোথাও ঢাকিল না, লুকাইল না।

মনোজ বলিল,—"যতীন, তুই চোখে রঙীন কাচের চশমা পরেছিস। মেয়েটির ব্যবহার আদৌ ভাল নয়, বরং সময় সময় রূঢ় হয়ে উঠেছে। ওটা কৌমার্য্যের লজ্জা নয়, ওটা নিরুপায় বিরক্তি। এ মেয়ের জন্যে সব হারাসনি, যতীন!"

যতীন বলিল, "মনোজ, তোর কথা হয় ত সত্যি, কিন্তু মেয়েদের সম্বন্ধে বলা হয়, 'দেবাঃ ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ'—। তা ছাড়া মেয়েদের বাইরে দেখে বোঝা যায় না, ওরা একটা প্রকাণ্ড প্রহেলিকা। ভালবাসা দিয়ে ওদের ঠিক বোঝা যায়।"

মনোজ বলিল, "তবে ভালবেসেও বুঝতে পাচ্ছিস না কেন? বয়স্থা মেয়ে উনি, আঠার বছর বয়স পর্য্যন্ত মনের কাচে যে অন্যের ছায়া পড়েনি, তাই বা কে জানে।"

যতীন শিহরিল। হেমেন্দ্রের মুখ তাহার স্মৃতিপথে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। একটু মৌন থাকিয়া বলিল, "পড়েও যদি থাকে, মনোজ, সেটা ছায়াই,—কায়া নয়। দাম্পত্য-প্রেমের সঙ্গে তার তুলনা চলে না।"

মনোজ ইহা লইয়া তর্ক করিল না, বলিল, "কি জানি, ভাই, ঐ কাঁচা জিনিসটাতে আমার বড় আস্থাও নেই। সতীশ মিত্তির,—মনে আছে,—বৌদির দাদা?"

যতীন স্বীকার করিল।

মনোজ বলিল, "তার কি? কলেজ কেরিয়ার সব ভালই ছিল। তখন এক মেয়ের সঙ্গে প্রেমে পড়েন। তার পর অসহযোগ আন্দোলন সূচনায় জেলে গেলেন, ছ'মাস বাদে যখন ফিরে এলেন, তখন প্রণয়িনী অধৈর্য্য হয়ে একটা বিয়ে করে ফেলেছেন। অথচ পূর্ব্বে বৌদির মা, বাপ, আত্মীয়-স্বজন মাথা খোঁড়া-খুঁড়ি করেও তার মত বদলাতে পারেন নি। সতীশ বাবু ভাবতেন, ও-মেয়ের বুঝি জোড়া নেই! কিন্তু পরিণামটা ভাব তো! আজ মনঃ-ক্ষোভের সঙ্গে কি লজ্জাও সমান নয়? কাচকে তিনি হীরে মনে করেছিলেন, সেই লজ্জাই তাঁর এখন সবচেয়ে বেশী।"

যতীন যেন নিরুৎসাহ হইয়া গেল। তথাপি বলিল, "সবাই কি সমান হয়, মনোজ! সতীশ মিত্তিরের ফিয়াঁসী ত সুরমা চ্যাটার্জ্জী? একের নম্বর স্মার্ট,—কে না চেনে তাকে!"

মনোজ চুপ করিয়া রহিল।

যতীন পরামর্শ লইতে আসিয়া বাধা পাইল, এবং প্রশ্ন অমীমাংসিতই রহিয়া গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সরস্বতী পূজার ছুটীতে যতীন বাড়ী গেল। ইচ্ছা দিন-তিনেক থাকিবে। বাড়ীতে তখন মা একা, বৌদি ও বোনেরা সকলেই অনুপস্থিত।

মা বলিলেন, "ক'দিনের ছুটী, এলি যে বড়?"

যতীন হাসিল, বলিল, "বাড়ী আস্‌তে ইচ্ছে কচ্ছিল। তিন দিন ছুটী রবিবার নিয়ে।"

পরদিন কথা-প্রসঙ্গে মা বলিলেন, "যদুবাবুরা বড় ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন, মেয়েটি বড় হয়ে উঠেছে।"

যতীন জানিত, ঐ মেয়েটির সহিত তাহার অনেক দিন হইতে সম্বন্ধ স্থির হইয়া আছে। তবুও বিস্ময়ের ভাণ করিয়া বলিল, "যদুবাবুর মেয়ে ঐ খুদীটা? ও মা, সেটা যে এইটুকুন!"

মা বলিলেন, "ঐটুকুন কেন হবে? এগার উৎরে বারয় পড়ল বুঝি!"

যতীন বলিল, "তাহ'লেই ত এইটুকুন হলো। সেই ছিঁচকাদুনে নাকখ্যাদা মেয়েটা ত? না, মা, আমি ওটাকে বিয়ে করব না।"

শৈল ছেলের মুখপানে চাহিয়া হাসিতেছিলেন। কৌতুক অনুভব করিয়া বলিলেন, "ছোট বেলায় কাঁদ্‌ত বলে কি আজও কাঁদে? এখন সে মেয়ে দিব্বি সুন্দরী হয়েছে।"

যতীন বলিল, "তা ত হ'ল, ওদিকে যে সর্দ্দা আইন পাশ হয়ে যাচ্ছে। বিয়ে করে গুষ্টিশুদ্ধ জেলে যাব না কি?"

শৈল বলিলেন, "আইনের কথা রেখে দে। সর্দ্দা আইন ভারতবর্ষে পঁচিশ বছরের মধ্যে চলছে না। ধরবে কে? পুলিশ ত? পুলিশ ত তোদের মত অত বিলাতী শিক্ষা পাচ্ছে না,—তাদের কুসংস্কারও ঘোচেনি। তাদের ষোল আনা মত, ছোট ছেলেমেয়ের বিয়ে দেবার। তারা নিজেরাই ছোট ছেলে-মেয়েদের বিয়ে দেবে, ধরবে কে কাকে? ঠক বাচতে গাঁ উজোড় হবে।"

কথাটা যতীনের অযৌক্তিক লাগিল না। কিন্তু সে উস-খুস করিতে লাগিল। অবশেষে বলিল, "আমি খুদীটাকে তা বলে বিয়ে করব না, তা বলে দিচ্ছি। অজ-মুখ্যু আমার পোষাবে না।"

শৈল বলিলেন, "তোর নিজের হাত সে। কচি বাঁশ নোয়াতে বেশী দেরী লাগে না। শেখাতে কতক্ষণ!"

যতীন বলিল, "বিয়ে হলেই মেয়েরা লেখাপড়ার হাত থেকে চিরতরে ছুটী নেয়, আর ওদের শেখান যায় না। তা ছাড়া, ঘরের বউ যদি বই নিয়ে বসে থাকে, তোমরা কি তাতে খুসী হও, না তার সুখ্যাতি করো?"

শৈল হাসিতে লাগিলেন।

যতীন কিন্তু এ প্রসঙ্গ এইখানেই থামিতে দিল না, এতখানি উপক্রমণিকা সে বৃথাই করে নাই। ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে বলিল, "দেখ মা,"—কিন্তু মাকে সে কি করিয়া সকল কথা বলিবে ভাবিতে লাগিল।

শৈল বলিলেন, "কি রে, কি বল্‌ছিলি?"

যতীন পুনরায় ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। অবশেষে নতমুখে সসঙ্কোচে স্বাহার কথা জানাইল।

শৈল খুঁটিয়া খুঁটিয়া প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। যতীন স্বাহার বয়সটা বলিল না; কিন্তু সে যে আই-এ পড়ে, তাহা বলিল। শৈল চিন্তিতমুখে বলিলেন, "তাহ'লে সতের আঠারর কম বয়স হবে না—কি বলিস্?"

যতীন নিম্নকণ্ঠে বলিল, "ঐ রকমই হবে।"

শৈল হু'চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিলেন, "তুই কি পাগল হলি, বাবা! আঠার বছরের বউ ঘরে এনে সমাজে মুখ দেখাব কেমন করে! বামুন-কায়েতের ঘরে এ সব চলে—ওদের মেয়েদের বয়সের ধরা-বাঁধা এখন নেই; কিন্তু আমাদের ত তা নয়।"

যতীন মাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিল; কিন্তু শৈল তাহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না! বলিলেন, এ কথা ওঁকে আমি বলতে পারব না, বাবা। রেগে আগুন হয়ে উঠবেন যে। যা হবার নয়, তা বলবই বা কোন্ মুখে? বড় বৌমা তের বছরের ছিল, তাই পাঁচ জনে পাঁচ কথা বলেছে।"

অবশেষে নিরুপায় হইয়া যতীন বলিল, "বেশ, মত না দিতে পারো দিও না; কিন্তু যদুবাবুদের জবাব দিয়ে দিও। আমি ওঁর মেয়েকে বিয়ে ক'র্‌ব না। আর এখন আমাকে বিয়ে-বিয়ে করে জ্বালাতনও কোর না, আমি উপার্জ্জন না করে বিয়ে ক'র্‌ব না।"

ট্রেণে বসিয়া যতীন ভাবিল, দূর হউক, মনোজ যা বলিয়াছিল, তাই ভাল। মায়া বাড়াইয়া লাভ নাই। সে হীরালালবাবুকে স্পষ্টই বলিয়া দিবে, ইহা হইবার নয়। কিন্তু কলিকাতায় পৌঁছিয়া তাহার মতটা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। সে কিছুতেই স্বাহার আশা ছাড়িতে পারিবে না। মা-বাবাকে সে চেনে,—তাঁহাদিগের রাগ ক্ষণস্থায়ী; সমাজকে যতীন চেনে,—সে শক্তের ভক্ত, নরমের যম; সে দরিদ্রকে দণ্ড দেয়, ধনীর বেলা নির্ব্বাক্ থাকে।

হীরালালবাবুকে বলিল, "আমি অনেক ভেবে দেখলুম, এখন বিবাহ হ'লে আপনার মেয়ের ভিন্ন পরিস্থিতির মধ্যে কষ্ট হতে পারে। আমি ত এখন পড়ি, সুতরাং এখন দেশেই গিয়ে থাকতে হবে। তার চেয়ে হু'জনেই যেমন পড়ছি পড়ি, আমি উপার্জ্জন করতে আরম্ভ করে বিবাহ করব।"

হীরালালবাবু স্বীকার করিলেন।

হীরালালবাবু যদিও স্বীকার করিলেন, কিন্তু যতীন স্বস্তি পাইল না। তাহার মনে হইতে লাগিল, সে যেন চোরা-বালিতে দাঁড়াইয়া আছে, এবং স্পষ্ট অনুভব করিতেছে, তাহার দুইখানি পা'ই নিরালম্বশূন্যতার মধ্যে ডুবিয়া যাইতেছে। যে দিকটা সে ধরিবে বলিয়া হাত বাড়াইতেছে, সেই দিকটাই দূরে সরিয়া যাইতে চায়। হীরালালবাবু আশা দিলে কি হইবে, স্বাহার উপর যতীনের ভরসা বড় হাল্কা। যতীন তাহাকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসে, কিন্তু প্রাণ দিয়া বিশ্বাস করিতে পারে না।

[ক্রমশঃ।

শ্রীমতী মায়াদেবী বসু।

বৈষ্ণবমত-বিবেক

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীরূপের গ্রন্থাবলী

শ্রীজীব গোস্বামী "লঘুতোষণীতে" তাঁহার গুরু ও পিতৃব্য শ্রীরূপের গ্রন্থাবলীর একটি তালিকা প্রদান করিয়াছেন। যথা—

"তয়োরনুজস্তষ্টেষু কাব্যং শ্রীহংসদূতকং।
শ্রীমদুদ্ধবসন্দেশশ্ছন্দোঽষ্টাদশকং তথা ॥
স্তবস্যোৎকলিকাবলী গোবিন্দবিরুদাবলী।
প্রেমেন্দুসাগরাখ্যাশ্চ বহবঃ সুপ্রতিষ্ঠিতাঃ ॥
বিদগ্ধললিতাপ্রাখ্যমাধবং নাটকদ্বয়ং।
ভাণিকাদানকেল্যাহ্বা রসামৃতযুগং পুনঃ ॥
মথুরামহিমা পদ্যাবলী নাটকচন্দ্রিকা।
সংক্ষিপ্তশ্রীভাগবতামৃতমেতে চ সংগ্রহাঃ ॥

শ্রীল সনাতন ও শ্রীরূপের মধ্যে অনুজ শ্রীরূপ এই সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। (১) হংসদূত নামক কাব্যগ্রন্থ (২) উদ্ধব-সন্দেশ (৩) অষ্টাদশ লীলাছন্দঃ (৪) স্তবমালা বা স্তবের উৎকলিকাবলী (৫) গোবিন্দবিরুদাবলী (৬) প্রেমেন্দুসাগর—এইরূপ তৎকৃত বহু স্তব সর্ব্বত্র বিখ্যাত। (৭) বিদগ্ধমাধব ও (৮) ললিতমাধব নামক নাটকদ্বয় (৯) দানকেলিকৌমুদী নামক ভাণিকা (একাঙ্ক নাটিকা) (১০) ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও (১১) উজ্জ্বলনীলমণি নামক—রসামৃতদ্বয়, (১২) মথুরা-মহিমা (১৩) পদ্যাবলী (কবিতাসংগ্রহ গ্রন্থ) (১৪) নাটক-চন্দ্রিকা (নাট্যলক্ষণ নির্দ্দেশক গ্রন্থ) (১৫) শ্রীলঘুভাগবতামৃত।

"সাধনদীপিকা" গ্রন্থে শ্রীরাধাকৃষ্ণ গোস্বামী শ্রীরূপের গ্রন্থাবলীর যে তালিকা দিয়াছেন, তাহাতে উপরি-উক্ত গ্রন্থ কয়েকখানি ছাড়া চারিখানি নূতন গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়। যথা—(১) শ্রীকৃষ্ণ-জন্মতিথির বিধান (২) বৃহৎ শ্রীকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা (৩) লঘুগণোদ্দেশদীপিকা (৪) প্রযুক্তাখ্যাতচন্দ্রিকা। এই কয়খানি গ্রন্থ ব্যতীত শ্রীল রূপ গোস্বামী শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অষ্টকালীন লীলার স্মরণ-মননের জন্য যে একাদশটি শ্লোক রচনা করেন, তাহা অবলম্বন করিয়াই উত্তরকালে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী—"শ্রীগোবিন্দ লীলামৃত" নামে গ্রন্থ রচনা করেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বলিতেছেন—

"রূপ গোসাঞি কৈল যতেক কে করু গণন ?
* * * *
লক্ষ গ্রন্থে কৈল ব্রজবিলাসবর্ণন ॥"

—মধ্য/১ম

এখন জিজ্ঞাস্য—শ্রীরূপ কি বাস্তবিকই "লক্ষ গ্রন্থ" রচনা করিয়াছিলেন? যদি "লক্ষ গ্রন্থ" কথাটির লক্ষ শব্দটি সংখ্যাবাচক না হয়, তবে লক্ষ শব্দের অর্থ কি?

যতদূর মনে হয়, তাহাতে ঐ কথাটি লইয়া যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের একদল "গ্রন্থ" শব্দে "যাহা গ্রন্থন করা যায়—" এই অর্থে গ্রন্থ শব্দের দ্বারা শ্লোকটি বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। অপর একশ্রেণী "লক্ষ" শব্দের দ্বারা "বহু" এই অর্থ বুঝাইতে চাহিয়াছেন। আমাদের মনে হয়—শ্রীরূপ স্থূলতঃ ব্রজলীলা সম্বন্ধে প্রায় লক্ষ শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন। যাহা হউক, শ্রীরূপের স্তবাবলীর মধ্যে অনেকগুলি অধুনা বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা—দুই একখানি গ্রন্থও যে বিলুপ্ত হইয়াছে অথবা এখনও অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে—এরূপ সন্দেহ স্বাভাবিক। বর্ত্তমানে শ্রীরূপের যে গ্রন্থগুলি পাওয়া যায়, অতি সংক্ষেপে তাহার বিবরণ নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল।

১। হংসদূত—কালিদাসকৃত "মেঘদূত" বিরহ-কাব্যের মধ্যে দূতপ্রেরণ উপলক্ষ করিয়া রচিত কাব্যের মধ্যে বোধ হয় সর্ব্ব-প্রথম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই কাব্যেও শ্রীরাধিকার বিরহ প্রশমনার্থে হংসকে দূতরূপে প্রেরণ করা হইতেছে। এই খণ্ডকাব্য মেঘ-দূতের ন্যায় মন্দাক্রান্তাছন্দে রচিত। ইহাতে ১৪২টি শ্লোক আছে। পদ্যগুলি অতীব মধুর এবং উচ্চাঙ্গের কবিত্বগুণসম্পন্ন। এই কাব্যখানি শ্রীরূপসনাতনের শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত সমাগমের পূর্ব্বে রচিত বলিয়া অনুমান হয়। কারণ, এই কাব্যের মঙ্গলাচরণে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের কোনও নমস্কার পরিদৃষ্ট হয় না। শ্রীশ্রীচণ্ডীর সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার শ্রীগোপাল চক্রবর্ত্তী এই গ্রন্থের একখানি টীকা রচনা করিয়াছেন। টীকাটিতে মূল গ্রন্থের রসবিশ্লেষণ বেশ সরল ও প্রাঞ্জল। উক্ত টীকা এখনও মুদ্রিত হয় নাই।

২। উদ্ধবসন্দেশ—এই গ্রন্থখানিতেও মন্দাক্রান্তাছন্দে বিরচিত ১৩১টি শ্লোক আছে। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গোপীদিগের বিরহে ব্যাকুল হইয়া গোপীগণের বিরহযাতনা যে তাঁহার অপেক্ষাও তীব্রতর ইহা অনুভব করিয়া গোপীদিগকে সান্ত্বনা দিবার জন্য প্রিয়তম সখা উদ্ধবকে শ্রীবৃন্দাবনে প্রেরণ করিলেন। উদ্ধব শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া গোপীদিগকে দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদিগের অলৌকিক অনুরাগ সন্দর্শনে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। এই সকল ব্যাপার অতি সুললিত পদ্যে প্রসন্ন ও গম্ভীর ভাবে এই গ্রন্থে রচিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানিও শ্রীরূপের সহিত শ্রীচৈতন্যদেবের সমাগমের পূর্ব্বে লিখিত। কারণ, ইহাতেও সাধুজনসম্মত রীতি অনুসারে শ্রীগৌরগোবিন্দের বন্দনা নাই।

এই দুইখানি গ্রন্থ আলোচনা করিলে শ্রীরূপের চরিত্রের একটি অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়। অনেকের বিশ্বাস, শ্রীরূপসনাতন যখন গৌড়েশ্বর হুসেন শাহার কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন—তখন তাঁহারা

যবনভাবাপন্ন ছিলেন—এই জন্যই পরবর্ত্তীকালে সনাতন আপনাকে "নীচজাতি নীচসঙ্গী" বলিয়া অনুতাপ-সূচক মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিরূপ মহানুভবতার ফলে এই প্রকার দৈন্যের উদ্ভব, তাহা আমরা শ্রীপাদ সনাতনের জীবন-কথা প্রসঙ্গে আলোচনা করিয়াছি। শ্রীরূপ ও সনাতন শ্রীচৈতন্যদেবের সংস্পর্শে আসিবার পূর্ব্বেও কিরূপ ভক্তিরসের রসিক ছিলেন—শ্রীরূপের এই গ্রন্থদ্বয়ে তাহা বিশেষ ভাবেই প্রতিপন্ন হইয়াছে। তাঁহারা খাঁটি সোণা—জন্মাবধিই উজ্জ্বল ও ভক্তিরসে কোমল—শ্রীচৈতন্যদেবের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহাদের ঔজ্জ্বল্য ও রসময়ত্ব আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। শ্রীরূপ বাল্যকাল হইতে কিরূপ উচ্চশ্রেণীর কবিত্বের অধিকারী ছিলেন, এই গ্রন্থদ্বয়েই তাহারও পরিচয়ের অভাব নাই। শ্রীচৈতন্যদেবের ঐন্দ্রজালিক স্পর্শে এই কবিত্ব-শক্তি সমধিক বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

৩। সময়ের ক্রম অনুসারে বিচার করিতে হইলে হংসদূত ও উদ্ধবসন্দেশের পরেই শ্রীরূপের সুবিখ্যাত সংগ্রহগ্রন্থ "পদ্যাবলী" সঙ্কলিত হইয়াছিল বলিয়া ধারণা হইতে পারে। যদিও এই গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীমুখোদ্গীর্ণ শ্লোক সংগৃহীত হইয়াছে—তথাপি ইহার প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বন্দনা নাই। এই জন্যই এই সংগ্রহগ্রন্থখানি হংসদূতের বা উদ্ধবসন্দেশের পরবর্ত্তী এবং বিদগ্ধমাধব, ললিতমাধবাদি গ্রন্থের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়াই অনুমান হয়। এই গ্রন্থখানিতে ৩৯২টি শ্লোক আছে, তন্মধ্যে প্রায় ৪০টি শ্লোক শ্রীরূপের স্বরচিত। অবশিষ্ট শ্লোক-সমূহের মধ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের রচিত ১০টি শ্লোক। শ্রীল সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ৭টি, শ্রীল রঘুনাথ দাসগোস্বামীর ৩টি, শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামীর ১টি, শ্রীল সনাতন গোস্বামীর ১টি, শ্রীল ঈশ্বর পুরীর ৩টি, শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীর ৭টি, শ্রীল পুরুষোত্তম দেবের ৭টি, শ্রীল রঘুপতি উপাধ্যায়ের ৮টি, শ্রীল রামানন্দ রায়ের ১টি, মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের ৩টি, অবিলম্ব সরস্বতীর ১টি, লক্ষ্মীধরের ৪টি, শ্রীধর স্বামীর ৩টি, বিষ্ণুপুরীর ২টি, উমাপতি ধরের ২টি, কেশব ছত্রীর ১টি, আচার্য্য শ্রীল রামানুজের ১টি ও রামচন্দ্র দাসের ২টি শ্লোক পরিলক্ষিত হয়। এতদ্ব্যতীত অমরুর, কবি রাজশেখরের সমসাময়িক অপরাজিত ভট্টের, গোবিন্দ রাজ বা গোবিন্দ ভট্টের, গোবর্দ্ধন আচার্য্যের, আনন্দাচার্য্যের, মাধব সরস্বতীর, কবিশেখরের, সুবন্ধুর, সর্ব্বানন্দের, ভট্টনারায়ণের ও অন্যান্য বহু অপ্রসিদ্ধ কবির শ্লোকও এই গ্রন্থে সংরক্ষিত হইয়াছে। সংগ্রহকর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণমহিমা শ্রীকৃষ্ণভজন-মাহাত্ম্য, কৃষ্ণভক্তমাহাত্ম্য, ও শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের নানাবিধ লীলা-ব্যঞ্জক বিষয়ে শ্লোকগুলিকে সুবিন্যস্ত ও শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছেন। এই জন্য গ্রন্থখানি ভক্তজনের অতীব প্রিয় এবং সুখপাঠ্য। শ্রীরূপ গোস্বামী প্রাচীন ভক্তগণের প্রিয় এই সকল শ্লোক বহু অনুসন্ধানে সংগ্রহ করিয়া এই সুললিত ভক্তজনকণ্ঠহার গ্রথিত করিয়াছেন। বর্দ্ধমানের মাড়গ্রামবাসী শ্রীনিত্যানন্দবংশোদ্ভব শ্রীল বীরচন্দ্র গোস্বামী এই গ্রন্থের একখানি সুন্দর টীকা রচনা করিয়াছেন। টীকাখানিতে কবিগণের পরিচয় না থাকিলেও শ্লোকের অর্থ পরিস্ফুটরূপে বিবৃত হইয়াছে। এই জন্য আধুনিক হইলেও টীকাখানি সর্ব্বত্র সমাদৃত।

৪। "শ্রীলঘুভাগবতামৃতম্"। এই গ্রন্থখানি শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত, বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও অবতারতত্ত্ব সম্বন্ধে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। শ্রীরূপ তদীয় অগ্রজ ও গুরু শ্রীল সনাতন গোস্বামীর শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতের সার সিদ্ধান্ত এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিলেও এই গ্রন্থের একটি অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য আছে। গ্রন্থখানি প্রধানতঃ শ্রীকৃষ্ণামৃত ও ভক্তামৃত এই দুই ভাগে বিভক্ত। শ্রীকৃষ্ণামৃতে সর্ব্বাবতারথনি স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অসংখ্য অবতারের বিষয় বিবৃত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্ব অবতারের অবতারী। অসংখ্য অবতার তাঁহারই স্বাংশ এবং জীবগণ পরমাত্মার তটস্থ শক্তিস্বরূপ এবং শ্রীভগবানের বিভিন্নাংশস্বরূপ। স্বয়ং ভগবান হইতে অসংখ্য অবতার আবির্ভূত হইয়া থাকেন। এই গ্রন্থে সেই অবতারগণের শ্রেণীবিভাগ স্থান পাইয়াছে। এই শ্রেণীবিভাগ অতীব সুপ্রণালী-নিবদ্ধ। ইহাতে সর্ব্বপ্রথমে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ স্বরূপ নিরূপিত হইয়াছে। প্রথমে স্বয়ংরূপ ও তদেকাত্মরূপ। তদেকাত্মরূপ আবার দ্বিবিধ, বিলাস ও স্বাংশ। অতঃপর আবেশ ও প্রকাশের 'মর্ম্ম' বিবৃত হইয়াছে, ইহার পরে অবতার-তত্ত্ব, অবতার লক্ষণ প্রভৃতি বিষয় শাস্ত্রসিদ্ধান্ত অবলম্বনে সুন্দরভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শ্রীভগবদবতার প্রধানতঃ ত্রিবিধ:—পুরুষাবতার, গুণাবতার ও লীলাবতার। পুরুষাবতার তিনটি—প্রথম মহত্তের স্রষ্টা কারণার্ণবশায়ী, দ্বিতীয় গর্ভোদকশায়ী—সর্ব্ব অবতারের মূল, তৃতীয় ব্যষ্টি-জীবের অন্তর্য্যামী ক্ষীরোদকশায়ী। সত্ত্ব, রজঃ ও তম—এই তিন গুণের অধিষ্ঠাতৃরূপে বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও রুদ্র এই তিন গুণাবতার। অনন্তর ২৫টি লীলাবতারের ও চতুর্দ্দশ মন্বন্তরের মন্বন্তরাবতারের ও চারি যুগের যুগাবতারের পরিচয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণামৃতখণ্ড শেষ হইয়া ভক্তামৃতখণ্ড আরম্ভ হইয়াছে। এই খণ্ডে শ্রীরূপ শাস্ত্রপ্রমাণের দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, আরাধনার মধ্যে শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা শ্রেষ্ঠ এবং তদপেক্ষা তাঁহার ভক্তগণের আরাধনা শ্রেষ্ঠতর, তাঁহার মার্কণ্ডেয়াদি ভক্তগণের মধ্যে প্রহ্লাদ শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষাও পাণ্ডবগণ তাঁহার প্রিয়তম। পাণ্ডবগণের অপেক্ষা যাদবগণ অধিকতর প্রিয় এবং যাদবগণের মধ্যে উদ্ধব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। উদ্ধবের অপেক্ষাও ব্রজদেবীগণ শ্রেষ্ঠা এবং তন্মধ্যে শ্রীরাধিকা সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠা। ফলতঃ এই গ্রন্থখানিকে সমগ্র পুরাণশাস্ত্রের পরিভাষা বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। পণ্ডিতবর শ্রীমৎ বলদেব বিদ্যাভূষণ "সারঙ্গরঙ্গদা" নামে একটি টীকা রচনা করিয়াছেন এবং পণ্ডিত বৃন্দাবনচন্দ্র তর্কালঙ্কার "রসিকরঙ্গদা" নামে ইহার অপর একটি টীকা রচনা করিয়াছেন।

৫-৬। অতঃপর শ্রীরূপের শ্রীবিদগ্ধমাধব ও শ্রীললিতমাধব এই দুইখানি সুবিখ্যাত নাটক বিরচিত হয়। আমরা পূর্ব্বেই শ্রীরূপের শ্রীপুরীধামে অবস্থিতিকালের সময়ে এই নাটক দুইখানির উৎপত্তির ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্যের সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। ফলতঃ লৌকিক কাব্যের কবিগণের মধ্যে যেমন কালিদাস সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, অলৌকিক প্রেমবার্ত্তার কবিগণের মধ্যে সেইরূপ শ্রীরূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শ্রীরূপ শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাশক্তি লাভ করিয়াই এই নাটক দুইখানির রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ১৪৩৯ শকে পুরীধামে শ্রীল স্বরূপ দামোদর, শ্রীরামানন্দ রায় প্রমুখ রসজ্ঞ ভক্তগণের সভায় এই নাটক দুইখানির আলোচনা হওয়ায় এইরূপ উপলব্ধি হয় যে, সেই সময়েই নাটক দুইখানির রচনার কার্য্য প্রকৃতপক্ষে শেষ হইয়াছিল। তথাপি ১৫৮৯ সম্বতে বা ১৪৫৪ শকে (খৃষ্টাব্দ ১৫৩২) শ্রীগোকুলে বিদগ্ধমাধব

নাটক* এবং ১৪৫৯ শকে (১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে) ভদ্রবনে ললিতমাধব নাটক সম্পূর্ণ † হইয়াছিল।

বিদগ্ধমাধবে দেখা যায় যে, ব্রহ্মকুণ্ড-তীরবর্ত্তী গোপেশ্বর মহাদেবের স্বপ্নাদেশে এই নাটক রচিত হয় এবং কেশিতীর্থের উপকণ্ঠে নানা দেশ হইতে সমাগত ভক্তমণ্ডলীর সমক্ষে এই নাটক প্রথম অভিনীত হয়। "বিদগ্ধ" শব্দের অর্থ—চতুঃষষ্টিকলাবিলাসসমন্বিত; সুতরাং যে নাটকে এবম্বিধ রসিকশেখর মাধবের লীলাবিলাস বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই বিদগ্ধমাধব। এই নাটকের ৭টি অঙ্কে শ্রীশ্রীরাধামাধবের নানাবিধ লীলা বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের মিলন প্রধানতঃ বর্ণিত হইলেও বেণুবাদন, বেণুহরণাদির চমৎকারিত্বও বর্ণিত হইয়াছে। বিদগ্ধমাধবে যে অনুপম কবিত্বশক্তি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার পরিচয় প্রদান করা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে; তথাপি পাঠকবর্গের অবগতির জন্য এখানে দুইটি মাত্র শ্লোক উদ্ধৃত করা হইল। প্রথম শ্লোকটিতে শ্রীকৃষ্ণনামের মহিমা বর্ণিত হইয়াছে। শ্লোকটি এই,—

> তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে
> কর্ণক্রোড় কাড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্।
> চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং
> নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী॥

—বিদগ্ধমাধব ১।১২

সুকবি যদুনন্দন ঠাকুর "রাধাকৃষ্ণলীলারসকদম্ব" নামে এই নাটকের বঙ্গভাষায় পদ্যানুবাদ করেন। তাহাতে এই শ্লোকটির যে অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে, পাঠকবর্গের আস্বাদনের জন্য তাহাই নিম্নে প্রকাশিত হইল—

> মুখে লইতে কৃষ্ণনাম　　নাচে তুণ্ড অবিরাম
> 　　আরতি বাড়ায় অতিশয়।
> নাম সুমাধুরী পিয়ে　　ধরিবারে নারে হিয়ে
> 　　অনেক তুণ্ডের বাঞ্ছা হয়॥
> 　　কি কহব নামের মাধুরী!
> কেমন অমিয়া দিয়া　　কে জানি গঢ়ল ইহা
> 　　কৃষ্ণ এই দু আখর করি॥
> আপন মাধুরীগুণে　　আনন্দ বাঢ়ায় কাণে
> 　　তাতে কাণ অর্ব্বুর জনমে।
> বাঞ্ছা হয় লক্ষ কাণ　　যবে হয় তার নাম
> 　　মাধুরী করিয়ে আস্বাদনে॥
> চিত্তে কৃষ্ণ নাম যবে　　প্রবেশ করায় তবে
> 　　বিস্তারিতে হৈতে হয় সাধ।
> সকল ইন্দ্রিয়গণ　　করে অতি আহ্লাদন
> 　　নাম করে প্রেম উনমাদ॥

এই শ্লোকটি শুনিয়া নামসাধনের আদর্শ মহাজন শ্রীল হরিদাস ঠাকুর বলিয়াছিলেন—

> "কৃষ্ণ নামের মহিমা-শাস্ত্র সাধু মুখে জানি।
> নামের মাধুরী ঐছে কাঁহা নাহি শুনি॥"

ইহাতেই এই শ্লোকটির অপূর্ব্বত্ব ও নামমাধুর্য্য প্রকাশের সামর্থ্য ও সার্থকতা প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনির মহিমাবর্ণনায় শ্রীরূপ যে ওজস্বিনী কবিতাটি রচনা করিয়াছেন, তাহা শব্দসম্পদে ও অর্থগৌরবে অতি উচ্চস্থান অধিকারের যোগ্য। সে কবিতাটির সৌন্দর্য্য পাঠকগণ উপভোগ করুন।

> রুন্ধন্নম্বুভৃতশ্চমৎকৃতিপরং কুর্ব্বন্ মুহুস্তুম্বুরং
> ধ্যানাদন্তরয়ন্ সনন্দনমুখান্ বিস্মাপয়ন্ বেধসম্।
> ঔৎসুক্যাবলিভির্ব্বলিং চটুলয়ন্ ভোগীন্দ্রমাঘূর্ণয়ন্
> ভিন্দন্নণ্ডকটাহভিত্তিমভিতো বভ্রাম বংশীধ্বনিঃ॥

—বিদগ্ধমাধব (১।২৩)

অর্থাৎ—

শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি আকাশে জলদাবলীর গতিরোধ করিয়া—গায়কশ্রেষ্ঠ তুম্বুরুর মুহুর্ম্মুহু চমৎকৃতি উৎপাদন করিয়া—সনন্দাদি ঋষিগণকে ধ্যানত্যাগ করাইয়া, বিধাতাকে বিস্মিত করিয়া ঔৎসুক্য-পরম্পরা দ্বারা ধৈর্য্যশালী বলিকেও চঞ্চল করিয়া পৃথিবীধারী অনন্তদেবের মস্তক ঘূর্ণিত করাইয়া, ব্রহ্মাণ্ডকটাহ ভেদ করিয়া—সর্ব্বদিকে পরিভ্রমণ করিতেছে।

অতঃপর ললিতমাধব নাটকখানির আলোচনা কালে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পুরলীলায় শ্রীবৃন্দাবনলীলার মাধুর্য্য প্রকটিত করিবার চেষ্টাই এই নাটকের সর্ব্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য। পুরলীলায় মহিষীগণ যে তত্ত্বতঃ শ্রীবৃন্দাবনলীলার স্বয়ং ভগবান নন্দনন্দনের স্বকীয়া শক্তি হইতে অভিন্না—ইহাই এই নাটকে প্রতিপন্ন করিয়া প্রকাশ্যে ও আভাসে—শ্রীবৃন্দাবনলীলার পরমচমৎকারিতারই পরিচয় প্রদান করিবার জন্য এই নাটকখানি রচিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্রীবৃন্দাবনলীলা যে প্রচ্ছন্ন ভাবে শ্রীদ্বারকালীলায় অবস্থিত, ব্রজ-লীলার উপাসকগণের সেই প্রতীতির উৎপাদন এবং পুরলীলার উপাসকগণের চিত্তে পুরলীলার মধ্যে ব্রজলীলার অনুপম মাধুর্য্য-বৈশিষ্ট্য সঞ্চারিত করিয়া দিবার মহৎ উদ্দেশ্যও এই নাটকে বিদ্যমান। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের পুরলীলার উপাসক এবং যাঁহারা শ্রীভাগবতে বর্ণিত ব্রজলীলার পরকীয়া-ভাবের উপাসক—এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যে তত্ত্বতঃ কোনও ভেদ নাই এবং বিবাদেরও যে কোনও কারণ নাই, ইহা শ্রীরূপ গোস্বামী এই নাটকখানিতে অপূর্ব্ব কৌশলে প্রতিপাদন করিয়াছেন। ফলতঃ এই দুইখানি নাটক লীলাসিদ্ধান্তের খনি হইলেও সিদ্ধান্তাংশে ও নাটকীয় বৈচিত্র্যে ললিতমাধবের চমৎকারিত্ব অনুপম। এই সিদ্ধান্ত অব্যাহত রাখিবার জন্য পরম প্রতিভাশালী শ্রীরূপ এই নাটকখানির অভিনবত্ব প্রকটিত করিয়াছেন।

---

* নন্দসিন্ধুরবাণেন্দু সংখ্যে সম্বৎসরে গতে।
বিদগ্ধমাধবং নাম নাটকং গোকুলে কৃতম্॥ নন্দ=৯, সিন্ধুর (হস্তী)=৮ বাণ=৫ ইন্দু ১ অঙ্কের বামাগতিতে ১৫৮৯ সম্বৎ।

† নন্দেষু বেদেন্দুমিতে শকাব্দে শুক্রস্য মাসস্য তিথৌ চতুর্থ্যাং।
দিনে দিনেশস্য হরিং প্রণম্য সমাপয়ং ভদ্রবনে প্রবন্ধম্॥
নন্দ=৯, ইষু=৫, বেদ=৪, ইন্দু=১ শুক্রমাস=জ্যৈষ্ঠ মাসে, ১৪৫৯ শকে জ্যৈষ্ঠমাসে, চতুর্থী তিথিতে রবিবারে এই গ্রন্থ সমাপ্ত হয়।

ললিতমাধবের আখ্যান ভাগের পরিকল্পনায় শ্রীরূপ যে কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা না করিলে ললিতমাধবের উদ্দেশ্য সংসাধিত হইত না। আমরা এস্থানে ললিতমাধবের সুদীর্ঘ আখ্যান সম্বন্ধে আলোচনা না করিয়া যে প্রকারে শ্রীরূপ পুরলীলাকে ব্রজলীলায় পরিণত করিলেন, তাহার কৌশলটিরই মাত্র উল্লেখ করিব। শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রজধাম পরিত্যাগ করিয়া কংসবধার্থে মথুরায় গমন করিলেন, তখন ব্রজলীলার রঙ্গমঞ্চ যেন একখানি যবনিকার দ্বারা আবৃত হইয়া গেল। দ্বারকার রঙ্গমঞ্চে তখন ব্রজের রঙ্গমঞ্চের প্রধান প্রধান পাত্রকে ছদ্মবেশে ভিন্ন নামে উপস্থিত করা হইল। এই নূতন রঙ্গমঞ্চে নূতন নামে যেন সেই পূর্ব্বের অভিনয়ই চলিতে লাগিল। শ্রীবৃন্দাবনের পরিবর্ত্তে সেখানে নববৃন্দাবন রচিত হইল। চন্দ্রাবলী সেখানে রুক্মিণী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন, শ্রীরাধিকা দ্বারকায় সত্রাজিত-নন্দিনী সত্যভামারূপে আবির্ভূতা হইলেন, ললিতা জাম্ববতী হইয়া আসিলেন। ব্রজের কাত্যায়নীব্রতপরা কুমারীদিগকে কামাখ্যা দেবীর আদেশে নরকাসুর অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণ নরকাসুরকে বধ করিয়া তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিয়া আনিলে তাঁহারাই দ্বারকায় অষ্টোত্তরশতাধিক ষোড়শ-সহস্র মহিষীতে পরিণত হইলেন। এইরূপে ব্রজের সমস্ত শক্তিকে দ্বারকার নববৃন্দাবনে আনয়ন করিয়া দ্বারকালীলার প্রবৃত্তিই ললিতমাধবের বৈশিষ্ট্য, এমন কি, নন্দ-যশোদাকেও অবশেষে দ্বারকায় আনয়ন করা হইয়াছে। এই নাটকের পঞ্চম অঙ্কে দেবর্ষি নারদের স্বগত উক্তির দ্বারা এই তত্ত্ব আরও বিশদরূপে ব্যক্ত হইয়াছে, যথা—

"নারদ।—(ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া স্বগত) নিশ্চয়ই এই সকল পুররমণীও ব্রজরমণী তত্ত্বাংশে সমান হইলেও দেহাদির দ্বারা ভিন্না। মধ্যে মায়া (যোগমায়া) কর্ত্তৃক ইহারা অভিন্না হন, সম্প্রতি ব্রজধামে সেই সকল ব্রজরমণী প্রেমমূর্চ্ছিতা হইয়া আছেন, কিন্তু যোগমায়া কর্ত্তৃক বিরহকালেও যাহাতে প্রিয়সঙ্গসুখ লাভ হইতে পারে, সেইজন্য সে স্থানকে অর্থাৎ ব্রজকে আচ্ছাদন করিয়া পুররমণীগণকে স্বীয় স্বীয় অভেদ অভিমানের আবেশের দ্বারা দীর্ঘ স্বপ্নের ন্যায় হইয়াছে। যাহারা উদ্ধবাগমনে ও কুরুক্ষেত্র যাত্রায় নিবৃত্তের ন্যায় হইয়াছিল, তাহারা সমানচরিত্রা হইলেও এই অষ্টোত্তর একশত ষোড়শ সহস্র হইতে পৃথক্। যাহা হউক, এখন সে রহস্য উদ্ঘাটনে প্রয়োজন নাই।"

নাটকের আখ্যান ভাগের মূল রহস্য দেবর্ষি নারদের এই উক্তির মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। সুতরাং ললিতমাধবেও যে পুরলীলার আবরণে মূলতঃ মহামাধুর্য্যময়ী ব্রজলীলারই বর্ণনা হইয়াছে, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

কিন্তু এই নাটকের তৃতীয় অঙ্কে বিপ্রলম্ভের বা বিরহের যে সুস্পষ্ট বর্ণনা পরিদৃষ্ট হয়, অন্য কুত্রাপি তাহা সুদুর্লভ। যুগলভজনশীল ভক্তগণের পক্ষে এই স্থান পাঠে ধৈর্য্য রক্ষা করা অসম্ভব। শ্রীভক্তিরত্নাকরে দেখা যায় যে, শ্রীরূপ এই গ্রন্থখানির রচনা শেষ করিয়া শ্রীমৎ দাসগোস্বামীকে পড়িতে দেন। তিনি এই নাটকখানি পড়িতে পড়িতে বিরহদশার প্রাবল্যে উন্মত্তবৎ হইয়া পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছিত হইতে থাকেন। তিনি এই নাটকখানি বুকে করিয়াই একরূপ দিবানিশি যাপন করিতেন—এইজন্য তাঁহার নিকট হইতে এই নাটকখানি ফিরাইয়া লওয়া সম্ভবপর হইল না। শ্রীরূপ এই জন্য দানকেলিকৌমুদী নামক একাঙ্কের একখানি মিলনলীলাপ্রধান ভাণিকা রচনা করিয়া উহা দাসগোস্বামীকে পাঠ করিতে দিয়া ললিতমাধব নাটকখানি শোধন করিবার জন্য চাহিয়া লন। দানকেলিকৌমুদীর সমাপ্তি স্থানে এই শ্রীরূপ যে তাঁহার প্রিয়সুহৃৎ শ্রীল রঘুনাথ দাসগোস্বামীর জন্যই এই নাটকখানি রচনা করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়।

কিন্তু তথাপি রসতত্ত্বের চরমপ্রকাশে শ্রীবৃন্দাবনের অনাবৃত লীলাই শ্রীশ্রীরাধামাধবের লীলাসমূহের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ললিতমাধব নাটকের শেষ শ্লোকেই তাহা সুব্যক্ত হইয়াছে। যথা—

যা তে লীলাপদপরিমলোদ্গারি বন্যাপরীতা
ধন্যা ক্ষৌণী বিলসতি বৃতা মাথুরী মাধুরীভিঃ।
তত্রাস্মাভিশ্চটুলপশুপীভাবমুগ্ধান্তরাভিঃ
সংবীতস্ত্বং কলয় বদনোল্লাসি বেণুর্বিহারম্॥

অর্থাৎ—

সমস্ত মাধুরীর সারভূতা মাধুর্য্যরসময়ী মহামাধুরীতে পরিপূর্ণা—তোমার লীলাবিহারের মধুময় গন্ধবিস্তারকারিণী ভূমণ্ডলের মধ্যে যে ধন্য শ্রীবৃন্দাবন-ভূমি বর্ত্তমান, যেস্থানে আমরা চটুলা গোপীগণ ভাবমুগ্ধ অন্তরে তোমার সহিত নিঃসঙ্কোচে যে ক্রীড়া করিয়া থাকি, তাহা অন্যত্র অসম্ভব; অতএব সেই স্থানে আমাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া তুমি তোমার অনুপম বংশীধ্বনি করিয়া বিরাজিত থাক।

কাব্যমাধুর্য্যে ও রসবস্তুর সন্নিবেশে এই নাটকখানির আর কোথাও তুলনা আছে বলিয়া মনে হয় না। শ্রীমান্ গ্রন্থকার নিজেই এই নাটকের শেষে বলিয়াছেন যে, তিনি "চতুঃষষ্টি কলা ও সমস্ত নাটকলক্ষণের অলঙ্কারের দ্বারা ললিতমাধবকে বিভূষিত করিয়াছেন"—সুতরাং নাটকীয় কলার ও লক্ষণের পরিপূর্ণতম আদর্শ যে এই নাটকে বিদ্যমান, তাহাতে সন্দেহ নাই। সাহিত্যদর্পণে নাটকের যে লক্ষণাদি প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা ভরত মুনির অভিমতের অনুরূপ নহে এবং ততটা সুসঙ্গত বলিয়াও গ্রন্থকার মনে করেন নাই। এই জন্য রসতত্ত্ববিদ্ শ্রীরূপ গোস্বামী ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রের এবং রসসুধাকরের অভিমতের অনুসরণ করিয়াই একখানি সম্পূর্ণাঙ্গ নাটকের উদাহরণরূপেই ললিতমাধব নাটকখানি রচনা করেন। নাট্যশাস্ত্রের সমস্ত লক্ষণাদি বিশ্লেষণ করিয়া তিনি "নাটক-চন্দ্রিকা" নামক নাট্যশাস্ত্রের একখানি গ্রন্থও রচনা করেন। যাঁহারা নাটকলক্ষণের ও নাটকীয় কলার বিশ্লেষণ ও বিচার করিয়া ললিতমাধবের মাধুর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে এই নাটক চন্দ্রিকা গ্রন্থখানির সহিত মিলাইয়া এই নাটকখানি পরীক্ষা করিতে হইবে। নাটক চন্দ্রিকায় যাবতীয় নাটকলক্ষণের উদাহরণে গ্রন্থকারও প্রধানতঃ এই গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা "নাটক-চন্দ্রিকার" বিষয় পরে আলোচনা করিব। সংক্ষেপে ললিতমাধবের কাব্য-মাধুর্য্যের ও নাটকীয় কলার পরিচয় প্রদান সম্ভবপর নহে। তুলনামূলক আলোচনায় ললিতমাধবের উৎকর্ষের বিকাশের মত শক্তি-সামর্থ্য আমার নাই। অতি প্রাচীন কাল হইতে ললিতমাধব রচনার সময় পর্য্যন্ত ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রের ধারার অনুসরণ করিলে ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রের পরিস্ফুরণের বহু স্তর আবিষ্কৃত হইতে পারে। ললিতমাধবের

সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণ করা বা তাহার কাব্য-মাধুরীর পরিচয় প্রদান করা আমার পক্ষে অসম্ভব হইলেও তৎসম্বন্ধে দুই একটি কথা না বলিলেও গ্রন্থের বিবরণ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায় ; এই জন্য বাধ্য হইয়াই এখানে দুই একটি কথার আলোচনা করিতে হইল।

শ্রীনন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ অখিল রসামৃতের খনি হইলেও তিনি লীলা-শক্তির চমৎকারিতা সম্পাদনের উদ্দেশ্যে নিজে সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও সে মাধুর্য্যের অনুভব করিতে সাধারণতঃ অসমর্থ। কিন্তু শ্রীরাধিকা অহৈতুকী প্রীতির অলৌকিক শক্তিবলে তাঁহার অনুপম মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া যে অভূতপূর্ব্ব উন্মাদনায় অভিভূত হইয়া পড়েন, তাহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ নিজে বিস্মিত হন। শ্রীরাধিকার ভাব দেখিয়া তিনি নিজেও এই অভূতপূর্ব্ব মাধুর্য্য আস্বাদন করিবার জন্য একান্ত আগ্রহান্বিত হইয়া উঠেন। নিত্য-নবীন চিরমধুর শ্রীকৃষ্ণের এই ভাবটিকে শ্রীরূপ ললিতমাধবের অষ্টম অঙ্কে যেরূপে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা দেখিলেই তাঁহার সৌন্দর্য্যজ্ঞানের রসানুভূতির ও কলা-পারিপাট্যের চূড়ান্ত নিদর্শন পাওয়া যায়।

সমস্ত সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের স্বাভাবিক প্রকাশভূমি শ্রীবৃন্দাবন। দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা তাহারই প্রতিচ্ছবিরূপে দ্বারকায় অপূর্ব্ব নব-বৃন্দাবন নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই অপরূপ মাধুর্য্যনিলয়ে সাক্ষাৎ রসবস্তু দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকারূপে বিরাজমান, তাঁহারা দুই জনে এই নববৃন্দাবনে মাধুর্য্যের ও সৌন্দর্য্যের কমনীয়তায় মুগ্ধ হইয়া ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ এই সকল অনবদ্য মাধুর্য্যসার উপভোগ করিতে করিতে মণিকুট্টিমে নিজরূপ প্রতিবিম্বিত দেখিয়া বলিতেছেন :—

"কোঽয়ং মাধুর্য্যেণ মমাপি মনোহরণ, মণিকুড্যমবষ্টভ্য পুরো বিরাজতে ?"

(পুনর্নিভাল্য)

হন্ত ! কথমত্রাহমেব প্রতিবিম্বিতোঽস্মি ? (ইতি সৌৎসুক্যম্)

"অপরিকলিতপূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী—
স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্য্যপূরঃ।
অয়মহমপি হন্ত ! প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ
সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব ॥"

অর্থাৎ—"কে এই মাধুর্য্যের দ্বারা আমারও মনোহরণ করিয়া মণিভিত্তি অবলম্বন করিয়া সম্মুখে বিরাজ করিতেছে ? (পুনরায় ভাল করিয়া দেখিয়া) এ কি ! আমিই যে মণিভিত্তিতে প্রতিবিম্বিত হইয়াছি !

(এই বলিয়া ঔৎসুক্যসহকারে)

এই চমৎকারকারী অদৃষ্টপূর্ব্ব কোন্ মাধুর্য্যসার গরীয়ান্ হইয়া আমার অগ্রে প্রকাশ পাইতেছে ? অহো ! আমিও ইঁহাকে দেখিয়া লুব্ধ-চিত্ত হইয়া সানন্দে শ্রীরাধিকার ন্যায় ইঁহাকে উপভোগ করিবার জন্য কামনা করিতেছি।"

নিজ মাধুর্য্যকে আস্বাদন করিবার জন্য নিজের এই লোভ জগতের রসশাস্ত্রে ইহার আর দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত নাই। স্বয়ং রস-স্বরূপের এই রসলীলার গভীরতায় আশ্রয় ও বিষয়জাতীয় ভেদ একেবারে লুপ্ত হইয়া এক অপূর্ব্ব ঐক্য প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত ব্যক্ত হইয়াছে। সাধারণ মানবের পক্ষে এই ভাব-সমুদ্রের অন্তস্তল স্পর্শ করাও সম্ভবপর নহে। এই অভূতপূর্ব্ব অলৌকিক অনুভূতি শ্রীরূপের মত অনুপম প্রতিভাশালী ভক্ত-চূড়ামণির পক্ষেই সম্ভবে, অপরে তাহার কি বুঝিবে ? কিন্তু আমরা বাহ্যদৃষ্টিতে এই মাত্র বুঝি যে, ইহা সম্পূর্ণ অভিনব, সম্পূর্ণ অলৌকিক—ইহার আর কোথাও তুলনা নাই। শ্রীরূপের কাব্য-মাধুরীর বিশ্লেষণ করিতে যে শক্তি ও প্রতিভার প্রয়োজন, তাহা কি আর কখনও জগতে দেখা দিবে ? *

মুদ্রিত ললিতমাধবে যে টীকাটি পরিদৃষ্ট হয়, তাহা বাঙ্গালীর গৌরব বৈষ্ণবাচার্য্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কৃত বলিয়া আমরা শুনিয়া আসিয়াছি। কিন্তু ঐ টীকার মধ্যে টীকাকারের পরিচয়সূচক কিছুই না থাকায় এ সম্বন্ধে সুনিশ্চিত-রূপে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভবপর নহে। প্রাচীন অনেক বৈষ্ণবের মুখে শুনা গিয়াছে যে, শ্রীল যদুনন্দন ঠাকুর এই নাটকেরও একখানি সুললিত পদ্যানুবাদ করেন। কিন্তু আমরা বহু অনুসন্ধানেও এযাবৎ তাহার সাক্ষাৎ পাই নাই।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু (এম-এ, বি-এল)।

* বসুমতী সাহিত্য-মন্দির হইতে প্রকাশিত মৎসম্পাদিত শ্রীললিতমাধব নাটকের ভূমিকা হইতে অনেকাংশ গৃহীত।

বর্ত্তমান ও অতীত

অতীতের পানে চাহি কহে বর্ত্তমান,
"হে অতীত, অন্ধকারে পেলে তুমি স্থান।
সরমে ঢাকিয়া তুমি রেখেছ বদন,
আমারে লইয়ে হের, চলিছে ভুবন।
শত-মুখে, আমারেই গাহে সব জয়,
অতলের তলে তুমি, খুঁজিছ আশ্রয়।"
অতীত কহিল ধীরে, নত করি মাথা,
"আমাতেই ভর করি কহিতেছ কথা !

কেন এত গর্ব্ব আজ, করিতেছ ভাই,
কাল যে আমারি পাশে, হবে তব ঠাঁই ॥

শ্রীবিনয়ভূষণ সেনগুপ্ত

বৃটেন শান্তিকামী কেন ?

গ্রেট-বৃটেন এখন মনে-প্রাণে শান্তিবাদী হইয়া উঠিয়াছে। অল্প দিন পূর্ব্বে মার্কিনের কয়েকখানি সংবাদপত্রে যে মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার মর্ম্ম এই যে, গ্রেটবৃটেন কেশরী হইলেও এখন হবিষ্যাশী বৈষ্ণবে পরিণত হইয়াছে। নতুবা জার্ম্মাণীর এই বাহ্বাস্ফোটে তাহার বিচলিত না হইবার কারণ কি ? বৃটেন সেই অতীত কালের পশুরাজ থাকিলে য়ুরোপে এখন যে সকল কাণ্ড ঘটিতেছে তাহা দেখিয়া গভীর গর্জ্জনে সে ধরারণ্য কাঁপাইয়া তুলিত, তাহার সেই ভৈরব নিনাদে জার্ম্মাণ শ্যেন আতঙ্ক-বিহ্বল হইত, দিগ্‌দন্তীর দন্ত খসিয়া পড়িত,—এবং কৈলাসে শিবের শিরঃপীড়া উপস্থিত হইত। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে পশুরাজটি নিরীহ গৃহ-মার্জ্জারের মত মিউ-মিউ রব তুলিয়া একবার হিট্‌লারের নিকট, একবার মুসোলিনীর সকাশে,—একবার বা ডালাডিয়ারের সান্নিধ্যে এবং কখনও বা ষ্টালিনের সম্মুখে উপস্থিত হইতেছে। এই প্রকার ব্যবহারে সিংহের স্বভাব মার্জ্জারের প্রকৃতিতে পরিণত হইয়াছে, ইহাই তাঁহাদের মন্তব্যের মর্ম্ম। যাঁহারা এই মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন,—তাঁহারা যে সঙ্গত কথা বলিয়াছেন—ইহা স্বীকার করিবার উপায় নাই। কারণ, বলবানের পক্ষে মানসিক উত্তেজনাবশতঃ কোন একটা উৎকট কাণ্ড সংঘটিত হইতে দেওয়া কঠিন নহে. কিন্তু ঐরূপ কাণ্ড বাধাইয়া পরে তাহা প্রত্যাহার করা অতীব কঠিন কার্য্য। সেই জন্ত বলবান ব্যক্তি যদি হঠকারিতা প্রকাশ না করিয়া ধীর পন্থা অবলম্বন করে, তাহা হইলে তাহা সমাজ-স্থিতির কারণ হইয়া থাকে। সুতরাং সেজন্ত বৃটিশ জাতির বর্ত্তমান প্রতিনিধি মিষ্টার চেম্বারলেনের নিন্দা করা সকলে সঙ্গত মনে করিবেন না।

মুসোলিনী

হিটলার

সিংহের একটা অনমনীয় ভাব বা জেদ থাকে। বৃটিশ জাতির তাহা অন্যতম বিশেষত্ব। ভারতের দক্ষিণাপথে এবং আমেরিকায় ফরাসীদিগের সহিত সংগ্রামে বৃটিশ-সিংহের সেই অনমনীয় ভাব এবং স্বভাবসিদ্ধ জেদের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। কেহ কেহ বলিতেছেন, এখন তাঁহাদের ঐ প্রকার জেদ যথেষ্ট হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। এই জন্তই বৃটিশ-কেশরী ইটালীর হুঙ্কারে এবং জার্ম্মাণীর ঝঙ্কারে কেশর-কম্পনও করিতেছে না, কিন্তু এই অনুযোগ সত্য নহে। সিংহ পশুরাজ হইলেও পশুবলই তাহার প্রধান সম্বল নহে। যেখানে পশুরাজের প্রতিদ্বন্দ্বি-সংখ্যা অধিক, সেখানে তাহাকে যথেষ্ট বিচার বিবেচনা করিয়া কায করিতে হয়। প্রথমতঃ রাজনীতি-ক্ষেত্রে কেবল স্বার্থ লইয়াই কাড়াকাড়ি, ঐ ক্ষেত্রে পরার্থপরতার স্থান অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। অপরের স্বার্থানুরোধে আজ-কাল কেহ হাঙ্গামায় মাথা বাড়াইতে চাহে না। সুতরাং বৃটিশ-সিংহকে হুঙ্কার ছাড়িবার পূর্ব্বে ব্যাপারটা বিশেষভাবে ভাবিয়া দেখিতে হয়। কেশরীকে ইদানীং একাকী কোন সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে হয় নাই। কোন সহযোগীর সাহায্য না লইয়া ইংরেজ জাতি সাধারণতঃ কোন সংগ্রামে অবতরণ করেন না। কোন বৃহৎ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইলে তাঁহাদের সাহায্যে সেই সহযোগীকে শক্তিশালী হওয়া চাই। তাহার পর বৃটিশ-সিংহ ত সত্য সত্যই পশু নহেন,—তিনি নরসিংহ, মানুষের—শুধু মানুষের নহে,—সভ্য মানুষের বিচার-বুদ্ধি তাঁহার আছে। কাযেই তিনি বিবেচনা করিয়া সকল কায করিবেন; যদি যুদ্ধ না করিয়া চলে, তাহা হইলে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া লক্ষ লক্ষ পরিবারে শোকের আগুন জ্বালাইবার, কোটি কোটি টাকা ভস্মস্তূপে পরিণত করিবার জন্তই কি তিনি যুদ্ধে নামিবেন ? তিনি হঠকারিতার সহিত তাহা করিতে পারেন না। তাই তিনি যাহাতে যুদ্ধ না করিতে হয় সেজন্ত

বিশেষভাবে চেষ্টা করিতেছেন। যদি রুশিয়ার সহিত মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া সম্ভব হয়, তাহা হইলে তাহাও করিবার জন্ত বৃটিশসিংহ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, কিন্তু রুষ ঋক্ষ তাহাতে সম্মত হইতেছেন কৈ? সোভিয়েট রুষিয়া তাহাতে সম্মত হইয়াও হইতেছেন না। অবশ্য এ কথা সত্য যে, বৃটিশ-কেশরী প্রথমে রুষ-ভল্লুকের সহিত বন্ধুত্ব করিতে অসম্মত ছিলেন। এখনও গ্রেটবৃটেনের বহু লোক বিশেষতঃ টোরী এবং ধনিকদিগের মধ্যে অনেকে রুষ-ভল্লুকের প্রণয়-প্রার্থী নহেন। কারণ, কি রাজনীতিক্ষেত্রে কি জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের ব্যাপারে, রুষিয়া যে নীতির অনুসরণ করিতেছে, সে নীতি বৃটিশ জাতি পছন্দ করেন না,—সে নীতি তাঁহারা এড়াইয়া চলিতে চাহেন।

নেভিল চেম্বারলেন

রুজভেল্ট

রুষিয়ার সহিত ঘনিষ্ঠতা করিলে পাছে ইংরেজ জাতির সেই নীতির ছোঁয়াচ লাগে, সেই ভয়েই বৃটিশ জাতি রুশিয়ার নিকটে ঘেঁসিতে চাহেন নাই। কিন্তু Adversity makes us acquainted with strange bedfellows—গরজ বড় বালাই। তাই চেম্বারলেন রুষিয়ার সহিত মিত্রতা করিতেও সম্মত হইয়াছেন। গণতন্ত্রের অস্তিত্ব ও মর্য্যাদা রক্ষার জন্ত স্বেচ্ছাচারী রুষিয়ার সাহায্য গ্রহণ। রুষিয়া যে গণশাসিত রাজ্য নহে, এ কথা মার্কিণের সমর-বিদ্যা-বিশারদ George Fielding Eliot স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছেন। * সত্য কথা বলিতে কি, য়ুরোপের আসল গণশাসন একেবারেই নাই। যাহা আছে তাহা মিশ্র-গণশাসন। * রুষিয়ায় একেবারে নিছক স্বৈর-শাসন। যাহা হউক, রুষিয়া এখন কোন্ দিকে ঝুঁকিবে, তাহারও নিশ্চয়তা নাই। হিটলার বেশ জানেন যে, ইংরেজ, ফরাসী এবং রুষিয়ায় যদি মৈত্রীবন্ধন ঘটে, তাহা হইলে তাঁহাদের সেই মিলন জার্ম্মাণীর পক্ষে সাঙ্ঘাতিক হইবে। বাক্যবীর মুসোলিনীর ভিতরের বল কতখানি, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। রুষিয়াও বুঝে যে, গ্রেটবৃটেন বা ফ্রান্সের সহিত তাহার যদি উপস্থিত কোন প্রকার সন্ধি হয়, তাহা হইলে সেই সন্ধি কত দিন স্থায়ী হইবে, তাহার নিশ্চয়তা নাই। রুষিয়ার সহিত ঐ দুই দেশেরই বার্ত্তিক পরিকল্পনা অনেকটা ভিন্ন। বর্ত্তমান সময়ে সমস্ত সভ্য জাতির মধ্যে বার্ত্তিক ক্ষেত্রে একটা নিরন্ত্র সংগ্রাম চলিতেছে। রুষিয়া ছিল কৃষিপ্রধান,—হইতেছে শ্রমশিল্পপ্রধান। শ্রম-শিল্পপ্রধান জাতিরা—অর্থাৎ যে সকল জাতি পূর্ব্ব হইতে পৃথিবীর বাজার দখল করিয়া বসিয়া আছে তাহারা—এ ব্যাপার অনুকূল দৃষ্টিতে দেখিতে পারে না। অর্থার্জ্জনের ক্ষেত্রে কেহই নূতন প্রতিদ্বন্দ্বীর কামনা করে না। বিশেষতঃ রুষিয়া যেরূপ ভাবে তাহার বার্ত্তিক পরি-কল্পনা করিয়াছে ও করিতেছে, বৃটিশ-বার্ত্তিক-ব্যবস্থাপনার সহিত তাহার সামঞ্জস্যবিধানের সম্ভাবনা নাই। এদিকে জার্ম্মাণীও নিশ্চেষ্ট নহে। জার্ম্মাণী রুষিয়ার সহিত মিত্রতা করিবার জন্ত বিলক্ষণ সচেষ্ট, বহির্দৃষ্টিতেও তাহা সুস্পষ্ট। পূর্ব্বে হিটলার রুসিয়ার যেরূপ নিন্দা করিতেন, ইদানীং কিছুকাল হইতে তাঁহার মুখে আর সেরূপ নিন্দা শুনিতে পাওয়া যাইতেছে না। কেবল তাহাই নহে, কার্পেথিয়ান ইউক্রেনের দিকে জার্ম্মাণী যে সৈন্য-সমাবেশ করিয়াছিল—যে উদ্যোগ আয়োজন করিতেছিল, তাহা আচম্বিতে রহিত হইয়াছে, ইহা নিশ্চিতই অকারণ নহে। বিশেষতঃ সংবাদ আসিয়াছে, রুষ-সরকার লিটভিনফকে সরকারী চাকুরী হইতে অবসর দান করিয়াছেন। রুষিয়া ইহুদীদিগকে

* Russia is a dictatorship because of a lack of political, racial and economic co-herence, and because her people have never known any other from of Government.—Current History, June 15, 1939.

* In Europe today, democracy is a phrase, not a act—The Living Age.

রাজ-সরকার হইতে বিতাড়িত করিতেছেন। রুষিয়ার শাসন-বিভাগ হইতে ইহুদীগণ অপসারিত হইলেই হিটলার বলিবেন যে, রুষিয়াকে আর বলসেভিক বলা যায় না। সেখানে যাহারা বলসেভিক ছিল, তাহাদিগকে অপসারিত করা হইয়াছে। অতএব রুষিয়ার সহিত প্রীতিসংস্থাপনের অনুকূলে আর যখন কোন বাধা নাই, তখন তাহা কর্ত্তব্য বটে। ইহার পরই সংবাদ আসিয়াছে যে, জার্ম্মাণীর সহিত রুষিয়ার আর্থিক বিষয়ে সন্ধির আলোচনা চলিতেছে। সে জন্য জার্ম্মাণী হইতে এক দল লোক রুষিয়াতেও গিয়াছে। সংবাদটা যখন গোপন না রাখিয়া প্রকাশ হইতে দেওয়া হইয়াছে, তখন ব্যাপারটা কতক দূর অগ্রসর হইয়াছে বলিয়াই বিশ্বাস করা যাইতে পারে। এখন পর্য্যন্ত কোন সন্ধিই সম্ভব হয় নাই। তবে এখন "দড়ি আগে ছেঁড়ে কিংবা কড়ি আগে পড়ে" তাহাই প্রধান সমস্যা। আগে রুষো-জার্ম্মাণ সন্ধি হয়, কি ইঙ্গ-ফ্রেঞ্চ-রুষ চুক্তি হয়, তাহাই দ্রষ্টব্য। এখন যদি রুষিয়া, বৃটিশ এবং ফ্রান্সের সহিত সামরিক চুক্তি না করে, তাহা হইলে পোলাণ্ডের সকল আস্ফালনই শেষ হইবে। কারণ, ইংরেজ যত দিন রুষিয়াকে সহায়-স্বরূপ না পাইতেছেন, তত দিন তাঁহারা যুদ্ধ আরম্ভ করিতে পারিতেছেন না। তাঁহাদিগকে একবার সাপের গালে চুম্বন এবং আর একবার ভেকের গালে চুম্বন দান করিয়া উভয়কেই শান্ত রাখিতে হইতেছে।

লিটভিনফ

মার্কিণের জনসাধারণ এই যুদ্ধে গ্রেট বৃটেন এবং ফ্রান্সের সহিত একই অক্ষদণ্ডে সংযুক্ত হইয়া ঘুরিবার ইচ্ছা একেবারেই প্রকাশ করিতেছেন না। তাঁহারা গ্রেট বৃটেনকে ময়্যাল সাপোর্ট (নৈতিক সমর্থন) দিতে সম্মত বটেন, কিন্তু 'ম্যাও ধরিতে' সম্মত নহেন। কাযেই সমস্যাটা সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইতেছে। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট এত চেষ্টা করিয়াও ত মার্কিণের সিনেটে নিরপেক্ষতা নিয়মের ব্যতিক্রম করিতে পারিলেন না। মার্কিণের জনসাধারণের শতকরা স-চৌদ্দজন মাত্র য়ুরোপে যুদ্ধ বাধিলে তথায় মার্কিণ হইতে সৈন্য পাঠাইতে সম্মত। অবশিষ্ট সকলেই উহার ঘোর বিরোধী। কাযেই বলা যাইতেছে যে, মার্কিণ তফাতে দাঁড়াইয়া রণরঙ্গ দর্শনেরই পক্ষপাতী। বলা বাহুল্য, বৃটিশ জাতি এই moral supportএর উপর নির্ভর করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে চাহেন না।

আর একটা কথা। য়ুরোপে যাহাদের যুদ্ধে লিপ্ত হইবার কথা উঠিয়াছে, তাহাদের মধ্যে গ্রেট বৃটেনই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ধনবান এবং বলবান। ঝড় উঠিলে বড় গাছেই অধিক ঝাপটা লাগে। সুতরাং যুদ্ধে লিপ্ত হইলে গ্রেট বৃটেনেরই অধিক ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। এবার ত জার্ম্মাণীর উপনিবেশ নাই যে, তাহা গ্রেট বৃটেনের ভাগে পড়িবে। গ্রেট বৃটেনের বাহুবলের মধ্যে তাহার নৌবল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ঐ প্রকার শক্তিশালী নৌবল য়ুরোপে আর কোন জাতির নাই। কিন্তু রণবিমান হইতে বিস্ফোরকপূর্ণ বোমা নিক্ষেপ করিয়া সেই নৌশক্তি কতখানি ক্ষীণ করা যাইতে পারে, এখনও তাহার পরীক্ষা হয় নাই। যুদ্ধোপযোগী বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য নির্ম্মাণে জার্ম্মাণ জাতির মস্তিষ্ক অসাধারণ উর্ব্বর। এ বিষয়ে তাহারা অপ্রতিদ্বন্দ্বী বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অবশ্য বিশেষজ্ঞদিগের অভিমত এই যে, রণবিমানের সাহায্যে নৌশক্তি প্রতিহত করা সম্ভবপর নহে। কিন্তু এখনও ইহা পরীক্ষা-সাপেক্ষ। ভবিষ্যৎ য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধে তাহার পরীক্ষা হইবে। তবে এ কথা সত্য যে, কেবল রণবিমান থাকিলেই তদ্দ্বারা বিশাল নৌবহর বিধ্বস্ত করা আদৌ সম্ভব নহে। এবং অসীম শক্তিশালী বিস্ফোরক ব্যতীত সুদৃঢ় রণতরীর উল্লেখযোগ্য কোন ক্ষতি করা সম্ভব হইতেই পারে না। বিগত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধে জার্ম্মাণী জেপেলিন ও বিষবাষ্পপূর্ণ শক্তিশালী নূতন প্রকারের বোমা ব্যবহার করিয়া সকলকে বিস্মিত করিয়াছিল,—এবার আবার তাহারা রণক্ষেত্রে তাহাদের আবিষ্কৃত নূতন একটা কিছু আমদানী করিয়া বিশ্ববাসীর বিস্ময় ও বিভীষিকা উৎপাদন করিবে কি না, কে বলিতে পারে? যদি তাহারা তাহা পারে, তাহা হইলে তাহারা শেষ পর্য্যন্ত জয়যুক্ত হউক আর নাই হউক, শত্রুপক্ষের বিশেষ ক্ষতি করিতে পারিবে, এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে। গ্রেটবৃটেনকেই সেই ক্ষতি সহ্য করিতে হইবে। যাহার অধিকার এবং বাণিজ্য পৃথিবীর সকল অংশেই বিস্তৃত, আচম্বিতে এইরূপ একটা যুদ্ধের সম্মুখীন হওয়া তাহার পক্ষে সঙ্গত নহে। জার্ম্মাণী প্রত্যক্ষ ভাবে বৃটেনের কোন ক্ষতিই করিতেছে না। বিগত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে তাহার অধিকারভুক্ত উপনিবেশগুলি সে বৃটেনের নিকট ফিরাইয়া চাহিতেছে। কিন্তু এই অজুহাতে সে ত বৃটিশ জাতির সহিত যুদ্ধ করিতে চাহিতেছে না। য়ুরোপের পূর্ব্বদিকে সে তাহার অধিকার বিস্তার করিতে চাহিতেছে। বর্ত্তমানে তাহাতে জার্ম্মাণীর বিশেষ কোন লাভও লক্ষিত হইতেছে না। সমরোপকরণ নির্ম্মাণোপযোগী সকল ধাতুই যে ঐ অঞ্চলে মিলিতেছে এরূপও নহে। তবে জার্ম্মাণী ঐ পথ দিয়া এসিয়ার দিকে যাইতে চাহে। বৃটিশ জাতির তাহাতে আপাততঃ কোন ক্ষতি নাই। বরং যুদ্ধ করিতে হইলে জয় হউক আর পরাজয়ই হউক, বৃটেনের ক্ষতি অন্য সকল শক্তি অপেক্ষা অধিক হইবে। সেই জন্য বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী চেম্বারলেন জার্ম্মাণীকে শান্ত করিয়া যুদ্ধ এড়াইবার চেষ্টা করিতেছেন। সে জন্য অনেক বিবেচক ব্যক্তি চেম্বারলেনকে নিন্দার পাত্র বলিয়া মনে করেন না। গ্রেটবৃটেনের পক্ষে এই সময়ে শান্তিকামী হওয়া সমীচীন বলিয়াই বহু রাজনীতিকের ধারণা।

এখন জিজ্ঞাস্য, শীঘ্রই যুদ্ধ বাধিবে কি না? এ কথার উত্তর দেওয়া কঠিন। কারণ, অনেক বড় বড় রাজনীতিক বলিতেছেন যে, বর্ত্তমান বৎসরে যদি য়ুরোপে বড় রকম যুদ্ধ বাধে, তাহা হইলে শীঘ্রই তাহা বাধিবে, নতুবা শীঘ্র আর যুদ্ধ বাধিবে না। যত দূর বুঝা যাইতেছে, তাহাতে মনে হয়, গ্রেটবৃটেন সহসা যুদ্ধ ঘটিতে দিবে

না। কিন্তু এ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা কোন রাজনীতিকের পক্ষেই সম্ভব নহে। হিট্লার এখন আপোষে ড্যানজিগ অধিকার করিতে চাহিতেছেন। সে বিষয়ে তিনি সিদ্ধকাম হইবেন কি না সন্দেহ। তিনি যদি হঠকারিতা করেন, তাহা হইলে যুদ্ধ বাধিতেও পারে। যদি যুদ্ধ বাধে, তাহা হইলে পর্টুগাল গ্রেটবৃটেন ও ফ্রান্সের দিকে থাকিবে, স্পেন কোন পক্ষেই যোগ দিবে না। কারণ, এত দীর্ঘকাল গৃহ যুদ্ধ করিবার পর তাহার আর যুদ্ধে রুচি নাই। এবং সে শক্তিও আছে কি না সন্দেহের বিষয়। আবার অনেকের ধারণা, এবার যুদ্ধ না বাধিবার সম্ভাবনাই অধিক। জার্ম্মাণীর এবং ইটালীর অর্থবল নাই। তাহার পর তাহাদের মৈত্রী-বন্ধন কত দৃঢ় হয়, তাহাও বুঝা যাইতেছে না। ইটালী এখনও আবিসিনিয়াকে আয়ত্তের মধ্যে আনিতে পারে নাই। সামরিক শাসনের ন্যায় স্বৈর-শাসনেও ইটালীর কতকগুলি লোক অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিতেছে।

আবার একটা অদ্ভুত সংবাদ প্রকাশ পাইয়াছে। সম্প্রতি জার্ম্মাণীর ডক্টর হোলটাটের সহিত বৃটিশ রাজকর্ম্মচারী মিষ্টার আর এস হাডসনের একটা কথা-বার্ত্তা হইয়া গিয়াছে। সেই উপলক্ষে সংবাদপত্রে প্রকাশ পায় যে, গ্রেটবৃটেন জার্ম্মাণীকে এক শত কোটি পাউণ্ড ঋণ দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, তবে তাহাতে সর্ত্ত এই হইয়াছে যে, জার্ম্মাণীকে যুদ্ধসজ্জার সঙ্কোচসাধন করিতে হইবে। এই সংবাদটি সংবাদপত্রের সাহায্যে কতকটা বিকৃত ভাবে চারি দিকে প্রচার করা হয়। মিষ্টার হাডসন গ্রেটবৃটেনের আর্থিক বাণিজ্যের সচিব। কথাটা তিনি একেবারে অস্বীকার করেন নাই। তবে তিনি কথাটা একটু অন্য ভাবে বলিয়াছেন। ডক্টর হোলটাট মিষ্টার হাডসনের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে আসেন। মিষ্টার হাডসন তাঁহার সহিত ব্যক্তিগত ভাবে কথাবার্ত্তা কহিয়াছিলেন, সরকারী লোক হিসাবে কথাবার্ত্তা বলেন নাই। তাঁহারা উভয়ে বাণিজ্যের, পৃথিবীব্যাপী আর্থিক অবস্থার এবং অন্যান্য কথার আলোচনা করিয়াছিলেন। কথার প্রসঙ্গে মিষ্টার হাডসন বলেন যে, জার্ম্মাণী যদি বাহুবলে য়ুরোপের উপর প্রাধান্য বিস্তার করিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে বৃটেন এবং তাহার মিত্রশক্তিবর্গ জার্ম্মাণীর সেই কার্য্যে বাধা দিবে। কিন্তু জার্ম্মাণী যদি শান্তভাবে শান্তির পথে থাকিয়া মন্ত্রণাপূর্ব্বক কার্য্য করে, তাহা হইলে গ্রেটবৃটেন এবং তাঁহার মিত্রশক্তিবর্গ জার্ম্মাণী যাহাতে সর্ব্ববিষয়ে সুবিধা পায়, যথা—পণ্য প্রস্তুত করিবার উপকরণ সংগ্রহে সুবিধা প্রভৃতি—তাহার সুব্যবস্থা করা হইবে এবং জার্ম্মাণীকে এই সামরিক ভাব ছাড়িয়া শান্তির সময়ের উপযোগী শিল্প-সেবা করিবার ক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিবার জন্য সাহায্য করা যাইবে তবে জার্ম্মাণী একেবারে নিরস্ত্র না হউন, তাঁহাকে অস্ত্র-সঙ্কোচ করিতেই হইবে। এ কথা সরকারপক্ষ হইতে কেহ বলিতেছেন না। বৃটেনের প্রধান মন্ত্রী মিষ্টার চেম্বারলেন কমন্স সভায় দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন যে, তিনি এ বিষয়ের বিন্দুবিসর্গও অবগত নহেন। সম্ভবতঃ ইংলণ্ডের টোরি এবং ধনিক দলের কেহ কেহ রুশিয়ার সহিত মিত্রতা না করিয়া বরং কোনরূপে জার্ম্মাণীকে নিরস্ত্র করা কর্ত্তব্য বলিয়াই মনে করেন। সেই জন্য আর্থিক বাণিজ্য-সচিব মিষ্টার হাডসন ঐ কথা বলিয়াছিলেন। এক শত কোটি পাউণ্ড ঋণ দিবার কথাটা মিথ্যা বলিয়াই মনে হয়। মিষ্টার হাডসন একেবারেই যে একটা অসম্ভব প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাও মনে হয় না। ইহাতে বুঝা যায় যে, বৃটিশ রাজনীতিকগণ যেন-তেন-প্রকারেণ আসন্ন যুদ্ধ পরিহার করিবার জন্য সচেষ্ট রহিয়াছেন।

জাপান রোম-বার্লিন অক্ষদণ্ডে (Axis) গ্রথিত হইতে অসম্মত হইয়াছে। তাহার প্রধান কারণ, জাপানকে য়ুরোপীয় রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে হইলে অর্দ্ধ পৃথিবী ঘুরিয়া আসিতে হয়। এই সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে হইলে পথিমধ্যে তাহাদের বিশ্রামের ও কয়লাদি লইবার স্থানের অভাব। ৫ শত হইতে সাড়ে ৭ শত মাইল দূরে আসিয়া কোন রণতরীবহর কাজ করিতে পারে সত্য,—কিন্তু তাহা অপেক্ষা অধিকতর দূরে যাইতে সমর্থ নহে। তাই জাপান ঐ প্রস্তাবে সম্মত হয় নাই। ফলে হিটলার মনে মনে বুঝিতেছেন যে, একমাত্র ইটালীর সাহায্যে নির্ভর করিয়া সম্মিলিত ইঙ্গ-ফরাসী শক্তির সহিত সংগ্রাম করিতে যাওয়া তাঁহার পক্ষে সঙ্গত হইবে না। এই জন্যই হিটলার তর্জ্জন-গর্জ্জনের সাহায্যে যতটুকু কার্য্যোদ্ধার করা যায়, তাহার অধিক আর কিছু করিবেন না—পক্ষান্তরে জার্ম্মাণী খুব বাড়াবাড়ি না করিলে ইংরেজ জাতিও কিছুই করিবেন না। সুতরাং যুদ্ধ না হইবার সম্ভাবনাই অধিক। তবে তাড়া দিয়া কার্য্যোদ্ধারের চেষ্টা করিলে চা'লের দোষে যুদ্ধ হয় ত বাধিতেও পারে। কিন্তু সে পরের কথা।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যারত্ন)।

প্রাণ

সোণার ফসলে ভরা প্রতি মানবের প্রতি প্রাণ,—
যা কিছু ঐশ্বর্য্য ওগো সে প্রাণ সকলি করে দান।
বহুমূল্য মাণিকের খনি—এই প্রাণ,—চিন তুমি তারে,
জ্ঞানের প্রদীপ জেলে খুঁজে তারে লও বারে বারে।
দুঃখ দৈন্য নিরাশার যে আঘাত লভিতেছ তুমি,
দূর হবে সব তাহা খুঁজে যদি লও চিত্ত-ভূমি।
অনন্ত বৈভব-জ্যোতি বক্ষে এই রাজে দিনমান,
আঁধার যাতনা যত স্পর্শে তার হয় অবসান।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার পাল।
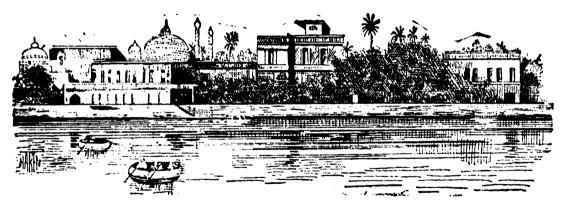
সমুদ্রবক্ষে তিন বৎসর

ক্ষুদ্র তরণীতে আরোহণ করিয়া সমুদ্র-পর্য্যটন বর্ত্তমান যুগে য়ুরোপ ও আমেরিকাতে তরুণ-তরুণী-সমাজে প্রায় নিত্য ঘটনায় পরিণত হইয়াছে মিসেস্ এডিথ বাউয়ার ট্রাউট তাঁহার স্বামি-সহ "ইগড্রাসিল" নামক একখানি জাহাজ নির্ম্মাণ করিয়া সমুদ্র-বিহারে তিন বৎসর কাল যাপন করিয়াছিলেন, তাঁহারা ফ্লোরিডার জ্যাকসন ভিলি হইতে ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে উল্লিখিত পোতে আরোহণ করিয়া নিউজিল্যাণ্ডের দ্বীপ-পুঞ্জ অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। পানামা খাল পার হইয়া তাঁহারা প্রথমতঃ গ্যালাপাগোস্ দ্বীপ-পুঞ্জে গমন করেন। তাহার পর দক্ষিণ সমুদ্রের দিকে তাঁহাদিগের পোত চালনা করেন। বহুতর ক্ষুদ্র দ্বীপ দর্শনের পর, ভারত সমুদ্রপথে উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহারা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই যুবক-দম্পতি এইরূপে তিন বৎসর সমুদ্র-বক্ষে যাপন করিয়া ৩৮ হাজার মাইল পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। মাসিক বসুমতীর পাঠকগণ এই সমুদ্রভ্রমণ-কাহিনী পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করিতে পারিবেন।

এঞ্জিনীয়ার বুম্যানের সাহায্যে মিঃ ট্রাউট "ইগড্রাসিল" পোত নির্ম্মাণ করিতেছেন

ট্রাউট-দম্পতি "ইগ্ড্রাসিল" পোতখানি স্বহস্তে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। উহা দৈর্ঘ্যে ৩৭ ফুট, প্রস্থে ১৪ ফুট; মাস্তল ব্যতীত উচ্চতায় ৫ ফুট হইবে। মিসেস্ এডিথ বাউয়ার ট্রাউটের স্বামী আটলাণ্টার "জর্জ্জিয়া টেক্নোলজি স্কুলের" সহকারী অধ্যাপক ছিলেন। সমুদ্রভ্রমণের নেশায় তিনি সমুদ্রে ভ্রমণের উপযুক্ত উল্লিখিত পোত নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার পত্নীও এই কার্য্যে তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বে তাঁহাদিগের কাহারও সমুদ্র-বক্ষে নৌ-পরিচালন-নৈপুণ্য ছিল না। কিন্তু মিসেস্ ষ্ট্রাউট তাঁহার প্রদত্ত বিবরণে লিখিয়াছেন, "বাহমাস্ দ্বীপপুঞ্জে পোত নীত হইলে গ্রীষ্মকালীন প্রবল ব্যাত্যায় আমরা পাল তোলা ও নামান সম্বন্ধে যাবতীয় অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিলাম।"

মিসেস ষ্ট্রাউট জীবনে এই নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া বিশেষ উৎসাহ সহকারে স্বামীকে পোত পরিচালন ব্যাপারে সাহায্য করিয়াছিলেন। পোতের আরোহী বা পরিচালক তাঁহারা দুই জন মাত্র। মিঃ ষ্ট্রাউট পোতাধ্যক্ষ এবং তাঁহার পত্নী নাবিক। উভয়ের তৎপরতা ও কর্ম্মদক্ষতায় ক্ষুদ্র তরণীখানি সমুদ্রযাত্রায় বাহির হইয়াছিল। রাত্রিকালে পত্নী অনেক সময় সতর্ক-প্রহরীর কার্য্য করিতেন।

জ্যামেকা দ্বীপে আসিয়া তাঁহারা দেখিলেন, তাঁহাদিগের পোতের নাম কেহ উচ্চারণ করিতে পারে না, মনে রাখা ত দূরের কথা। অথচ যাহাতে সকলে সহজে "ইগ্‌ড্রাসিল" বাণান ও উচ্চারণ করিতে পারে, এই মনে করিয়াই তাঁহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক জাহাজের ঐ নামকরণ করিয়াছিলেন। উহার অর্থটিও নামের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া রাখা হইয়াছিল।

নর্স (Norse) পৌরাণিক কাহিনীতে "ইগ্‌ড্রাসিলকে" জীবনতরু বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সেই কাহিনীতে এই তরুর মূল ও শিকড়গুলি নরকে নামিয়া গিয়াছে, শাখা-প্রশাখা স্বর্গে গিয়া মিশিয়াছে বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সমুদ্রবক্ষে ক্ষুদ্র পোতের আরোহীদিগের জীবন কখনও সুখের—কখনও দুঃখের। পুরাণ-বর্ণিত "ইগ্‌ড্রাসিল" বৃক্ষের পতনে বিশ্বের সমাপ্তি অবশ্যম্ভাবী। লেখিকা মিসেস্ ষ্ট্রাউটও তাঁহার বিবরণের এক স্থানে লিখিয়াছেন, "আমাদের 'ইগ্‌ড্রাসিল' কোন পাহাড়ে প্রতিহত হইলে সম্ভবতঃ আমাদের জীবনেরও পরিসমাপ্তি হইত।"

সেণ্ট জন নদের উপর সমুদ্রযাত্রার পূর্ব্বে "ইগ্‌ড্রাসিল" পোত

তাঁহারা পর্ব্বত-সমাকুল জ্যামেকায় আসিয়া যেন নন্দন-কাননের আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন। সমুদ্র-পথে ঝটিকার বেগ অথবা বাতাসের নিস্তব্ধতা উভয় প্রকার অবস্থার মধ্য দিয়া পোত-চালনার পর ষ্ট্রাউট্-দম্পতি যখন জ্যামেকায় পৌছিয়াছিলেন, তখন পরম আনন্দে তাঁহারা বিশ্রাম লাভ করিয়াছিলেন। এখানে আসিয়া তাঁহারা তাজা ফলও সংগ্রহ করিয়াছিলেন। জুলাই মাসের শেষের দিকে জ্যামেকায় অবস্থান করিয়া আবার প্রবল ঝটিকার প্রতীক্ষা করা তাঁহারা সঙ্গত মনে করেন নাই। তাই তাঁহারা তাড়াতাড়ি নঙ্গর উঠাইয়া পানামা খালের অভিমুখে পোত-চালনা করিয়াছিলেন।

খালের ভিতর দিয়া গমনকালে বর্ষা আসিয়া

পড়িয়াছিল। তাঁহারা খাল অতিক্রম করিয়া গ্যালাপ্যাগোজ দ্বীপপুঞ্জের অভিমুখে গমন করেন। সেখানে বৃষ্টির পরিবর্ত্তে তাঁহারা সূর্য্যালোকদীপ্ত দ্বীপসমূহ দর্শন করেন।

পানামা উপসাগরটির দুর্নাম ছিল। এখানে প্রায়ই অকস্মাৎ ঝড় উঠিয়া থাকে। ঝটিকার বেগে আকাশে যখন কাল মেঘমালা ছুটাছুটি করিতে থাকে, তাহা দেখিয়া কবির চিত্ত বিমুগ্ধ হইতে পারে, কিন্তু যখন সমুদ্রগামী অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারাও তাঁহাদিগকে যাত্রা-পথে সহ্য করিতে হইয়াছিল।

গ্যালাপ্যাগোজ দ্বীপপুঞ্জে পৌছিবার পর তাঁহারা ঝড়-বৃষ্টির আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। তাঁহারা পূর্ব্বে এই দ্বীপপুঞ্জের যে বিবরণ পড়িয়াছিলেন, তাহাতে ধারণা ছিল যে, দ্বীপগুলি জনমানব-সমাগম-বর্জ্জিত এবং নিতান্ত অনুর্ব্বর। সেখানে পৌছিয়া তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন,
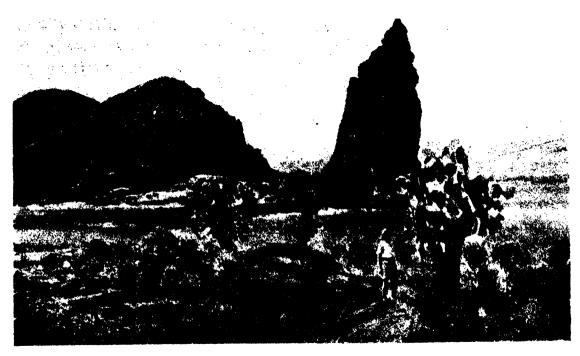
সান্সালভেডর দ্বীপে মিসেস্ ট্রাউট একটি ক্যাক্টস্ বৃক্ষ দেখিতেছেন

পোত পুনঃ পুনঃ ঝটিকাহত হইতে থাকে, তখন কাহারও পক্ষে সে সৌন্দর্য্য উপভোগের প্রবৃত্তি হয় না।

দিনের মধ্যে বারবার বড় পাল খাটান এবং খুলিয়া ফেলা ঐ প্রকার অবস্থায় ট্রাউট-দম্পতির পক্ষে সম্ভবপর নহে বলিয়া তাঁহারা অনেক সময় এক প্রান্ত খুলিয়া রাখিয়া দিতেন। আবহাওয়ার অনিশ্চিত অবস্থায় এইভাবে পাল খুলিয়া রাখা বিপজ্জনক হইলেও, তাঁহারা জানিতেন যে, তাঁহাদিগের তরণীখানি যেরূপ সুদৃঢ় ভাবে নির্ম্মিত এবং নূতন, তাহাতে সহসা উহার কোন ক্ষতি হইবার আশঙ্কা নাই। এই অবস্থায় বহু রাত্রি তাঁহাদিগকে বিনিদ্র অবস্থায় যাপন করিতে হইত। অনেক সময় সত্যই দ্বীপগুলি বৃক্ষলতাদিবর্জ্জিত—অনুর্ব্বর। কিন্তু ১৫টি দ্বীপে পোত নঙ্গর করিয়া তাঁহারা কেবল একটি দ্বীপে লোক-সমাগমের চিহ্ন দেখিতে পান নাই।

মার্চ্চেনা বা বিণ্ডলো দ্বীপে তাঁহারা মাছধরা নৌকা দেখিতে পান। জেলেরা একজাতীয় কড মৎস্য ধরিতে-ছিল। দ্বীপে বহু মনুষ্যপদচিহ্নও তাঁহারা আবিষ্কার করেন। তন্মধ্যে উচ্চ গোড়ালিযুক্ত জুতার চিহ্নও দেখিতে পান। বার্থোলোমিউ দ্বীপে উঠিয়া তাঁহারা বহু সদ্যঃপদচিহ্ন দেখিয়াছিলেন। কিছু পূর্ব্বে একখানি মার্কিণ প্রমোদ-তরী এবং অন্য স্থানের লোকরা তিনখানি নৌকা লইয়া এখানে আসিয়াছিল। এই দ্বীপে বিশেষ জনসমাগমের

পরিচয় তাঁহারা পাইয়াছিলেন। সাণ্টাক্রুজ এবং সেমুর-দ্বীপের মধ্যে যে সকল স্থানে পোত নঙ্গর করিবার স্থান আছে, তাঁহারা তথায় জনসমাগমের কোন পরিচয় পান নাই। এই দ্বীপে এক জাতীয় পাখী আছে, তাহারা যে কোন প্রকার শব্দ অনুকরণ করিতে পারে। ষ্ট্রাউট-দম্পতি সেই পাখী দেখিয়া মুগ্ধ হন।

সাণ্টাফি বা ব্যারিংটন দ্বীপটিতে জেলেরা আড্ডা গাড়িয়া থাকে। এখানে তাহারা শিকার-লব্ধ মৎস্যগুলিকে রৌদ্রে শুখাইয়া লয়। ষ্ট্রাউট-দম্পতি এই দ্বীপে জনসমাগমের বহু নিদর্শন দেখিয়াছিলেন।

সাণ্টাক্রুজ দ্বীপে মিসেস্ ষ্ট্রাউট ও তাঁহার স্বামী খৃষ্টমাস পর্ব্ব যাপন করিয়াছিলেন। একাডেমী উপসাগরের তট-ভূমিতে অনেক লোক বসবাস করিতেছে। এই দ্বীপের উচ্চ পাহাড়ের শীর্ষদেশে বহু পদচিহ্ন সুস্পষ্ট হইলেও পাহাড়ের শিখরে কোনও নারীর পদচিহ্ন পরিলক্ষিত হয় নাই। মিসেস্ ষ্ট্রাউটই সর্ব্বপ্রথম নারীহিসাবে উহার শৃঙ্গে আরোহণ করিয়াছিলেন।

সাণ্টামারিয়া দ্বীপের "পোষ্ট অফিসের" চিঠিপত্র সমুদ্রগামী জাহাজ তীরবর্ত্তী স্তম্ভের উপরিস্থিত একটি কাঠের পিপায় রাখিয়া যায়। ইহাই এ দ্বীপের লেটারবক্স। মিসেস্ ষ্ট্রাউট দেশের পত্রাদি আসিয়াছে কি না দেখিবার জন্য সেই পিপার কাছে গিয়া দেখিতে পান যে, পূর্ব্বে কোনও অবিবেচক ব্যক্তি সেই পিপা লক্ষ্য করিয়া বন্দুকের গুলী ছুড়িয়াছিল—উহাতে ছিদ্র হইয়া রহিয়াছে।

ইসাবেলা দ্বীপে পৌছিয়া তাঁহারা "টোসে কোভ্" দেখিতে পাইলেন। পাহাড়ের গাত্রে অনেক প্রমোদতরণীর নাম লেখা আছে। তাঁহাদিগের আগমনের পূর্ব্বে ঐ সকল পোত এই স্থানে আসিয়াছিল। লবণাক্ত জলপূর্ণ একটি জলাশয়ের ধার পর্য্যন্ত বহু পদচিহ্ন তাঁহারা আবিষ্কার করেন। অনেক পরিত্যক্ত পরিচ্ছদও তাঁহাদিগের দৃষ্টি-পথে পতিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে নারীর ব্যবহৃত পরিচ্ছদও ছিল।

ইসাবেলা দ্বীপে মিসেস্ ষ্ট্রাউট

এলিজাবেথ্ উপসাগরের সন্নিহিত পেন্‌গুইন গুহায় পৌছিয়া তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন, কোনও দর্শক এইস্থানে পূর্ব্বে আগমন করেন নাই। ষ্ট্রাউট-দম্পতি প্রাণ ভরিয়া উক্ত স্থানের বিচিত্র প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং আরণ্য জীবনের

সৌন্দর্য্য উপভোগ করিয়াছিলেন। একটি জলায় সমুদ্রসিংহগুলি তাঁহাদিগের অনধিকার প্রবেশে বিরক্ত হইয়া গাছের শিকড় হইতে জলে লাফাইয়া পড়িল কিন্তু ইগুয়ানা বা গোধাজাতীয় প্রাণীরা তাঁহাদিগের আগমনে বিন্দুমাত্র দৃক্‌পাত করিল না—পরম নিশ্চিন্তমনে রৌদ্র পোহাইতে লাগিল। সবুজবর্ণের কচ্ছপের দলও জলে নামিল না দেখিয়া তাঁহারা দাঁড়ের দ্বারা তাহাদিগকে আঘাত করিলেন। তখন তাহারা জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

পানামা খালের মধ্যে "ইগ্‌ড্রাসিল"

এই দ্বীপগুলি তাঁহাদিগের নিকট অত্যন্ত মনোরম বলিয়া মনে হইয়াছিল। এজন্য শীঘ্র তাঁহারা প্রকৃতির অনবদ্য সৌন্দর্য্য দর্শনের আকাঙ্ক্ষা দমন করিতে পারিলেন না, কিন্তু পানীয় জলের অভাব হইতেছে দেখিয়া অগত্যা তাঁহারা পশ্চিমাভিমুখে মারকুইসাস্ দ্বীপপুঞ্জের দিকে যাত্রা করিলেন। তথায় পানীয় জল মিলিবে, কিন্তু উহার দূরত্ব সেই স্থান হইতে ৩ হাজার ৩ শত মাইল। তখন তাঁহাদিগের পোতে মাত্র ৩০ গ্যালন পানীয় জল অবশিষ্ট ছিল। কিন্তু তাঁহাদিগের যাত্রাপথে বাতাসের গতিবেগ সমভাবে ছিল, এজন্য তাঁহারা ক্লান্তি অনুভব করিতে লাগিলেন। তবে মাঝে মাঝে তাঁহারা উত্তেজনার বস্তুও দেখিতে পাইতেন। তিমি মাছ প্রায়ই পোতের কাছে আসিয়া উঠিয়া আরোহী দুই জনের প্রতি বেশ যত্নসহকারে দৃষ্টি রাখিয়া পাশে পাশে চলিতে থাকিত। তাহাদিগের গায়ের দুর্গন্ধে বা নিশ্বাস-প্রশ্বাসে তাঁহারা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতেন।
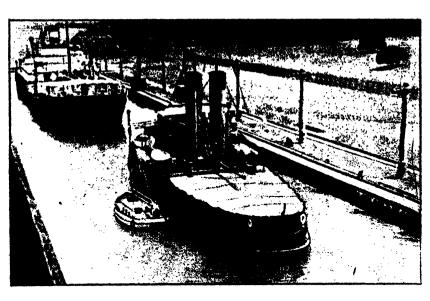
মিসেস্ ষ্ট্রাউটের আগমনে নিঃশঙ্কচিত্ত সামুদ্রিক গোধা বা ইগুয়ানা

একটা তিমি মাছ সাঁতার দিবার সময় পোতের সংস্পর্শে আসিয়াছিল। অমনই যেন বিরক্তিভরে পোতটিকে

মোয়ালা দ্বীপে তাল গাছের উপর মিঃ ষ্ট্রাউট

সমুদ্রবক্ষে শুশুকের ঝম্প

পোতে এক জন নারী আছেন, তখন তাহাদিগের মধ্যে বিশেষ উত্তেজনার সঞ্চার হইল। কারণ, এতকাল যত প্রকার ছোট পোত এই দ্বীপে আসিয়াছে, একখানিতেও পুরুষ ব্যতীত কোন নারী কখনও তাহারা দেখে নাই। অবশ্য বড় বড় প্রমোদ-তরণীতে, সৌখীন মার্কিণ-মহিলার দেখা তাহারা পাইয়াছিল।

মার্কুইসাস দ্বীপের অধিবাসীরা মিষ্ট দ্রব্যের বিশেষ ভক্ত। নারীরা সৌখীন পরিচ্ছদেরও বেশ সমাদর করিয়া থাকে। দ্বীপবাসীরা শিশু-সন্তানদিগকে খুব ভালবাসে। এজন্য খাদ্যদ্রব্য কিছু পাইবামাত্র বয়স্কগণ তখনই তাহা শিশুদিগকে খাইতে দেয়।

উয়াহুকা দ্বীপ হানানাই উপসাগরে অবস্থিত। এইখানে আসিবার পর মিসেস্ ষ্ট্রাউট্ একখানি বড় কেক্ প্রস্তুত করিয়া সেখানকার সর্দ্দারের জন্য উপহার প্রেরণ করেন। সর্দ্দারটি তখন দুই মাইল দূরবর্ত্তী আর একটি উপসাগরের কাছে বাস করিতেছিলেন। সুতরাং উপত্যকা-ভূমির মালিক কেক্‌টি লইয়া একটি বড় বাক্সের মধ্যে তালাচাবি বন্ধ করিয়া রাখেন। তাহার পর উহা সর্দ্দারের কাছে কি ভাবে লইয়া যাইতে হইবে, সে সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ উপদেশ প্রদান করেন। এই অঞ্চলে অগ্নিপক্ক দ্রব্যের অত্যন্ত

একপাশে জোর করিয়া ঠেলিয়া দিয়া বিপরীত দিকে চলিয়া গেল।

শুশুক, কালো মাছ প্রভৃতি তাঁহাদিগের গমনপথে মাঝে মাঝে দেখা দিত। ইহাতে মিসেস্ ষ্ট্রাউট বিশেষ কৌতুক অনুভব করিতেন। এই ভাবে চলিতে চলিতে পানীয় জল নিঃশেষ হইবার কিছু পূর্ব্বেই তাঁহারা মার্কুইসাস দ্বীপে পৌঁছিলেন।

দ্বীপের দেশীয়া নারীরা যখন জানিতে পারিল, ইগ্‌ড্রাসিল

অভাব। এমন কি, রুটী পর্য্যন্ত কোথাও পাওয়া যায় না। যেখানে কোন চীন দেশীয় লোক আছে, তথায় রুটী মিলিতে পারে।

মার্কুইসাস্ দ্বীপবাসীরা অত্যন্ত ভদ্র ও সদালাপী, শিষ্টাচার সম্বন্ধে তাহাদিগের জ্ঞান প্রচুর। টাইপি-ভাই নামক দ্বীপে ষ্ট্রাউটদম্পতি বৃদ্ধ হাকা-হাউএর বাড়ীতে গিয়া তাহার সহিত দেখা করেন। লোকটির ব্যবহার অত্যন্ত ভদ্রতাসূচক। উপত্যকা-ভূমি পরিভ্রমণের পর বৃদ্ধের গৃহে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহারা দেখিলেন যে, বৃদ্ধের পত্নী তাঁহাদিগের প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে। তাহার সম্মুখে এক ঝুড়ি পেঁপে। দ্বীপে পেঁপে দুষ্প্রাপ্য। দেশীয়রা উহা খায় না। কিন্তু মার্কিণগণের প্রিয় খাদ্য জানিয়া অতিকষ্টে তাহারা উহা তাঁহাদিগের জন্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল একদিন স্থানীয় এক জন ব্যবসায়ীর পত্নীর সহিত মিসেস্ ষ্ট্রাউটের দেখা হয়। তাহার নাম টাউপু। সে একটা ঝুড়ি বুনিতেছিল। মিসেস্ ষ্ট্রাউটের নিকট ঝুড়ির বুননের নক্সাটা খুব ভাল লাগিয়াছিল। তিনি টাউপুর কাছে বয়ন-পদ্ধতিটা শিখিয়া লয়েন। টাউপু ফরাসী ও মার্কুইসিয়ান ভাষা জানিত। মিসেস্ ষ্ট্রাউট ইংরেজী ভাষা ব্যতীত অপর কোন ভাষা জানিতেন না। কিন্তু তিনি ঝুড়ি বুনিতে আরম্ভ করিয়া উহা শেষ করিলে সেই গ্রামের প্রত্যেক নারী সে সংবাদ পাইয়াছিল।
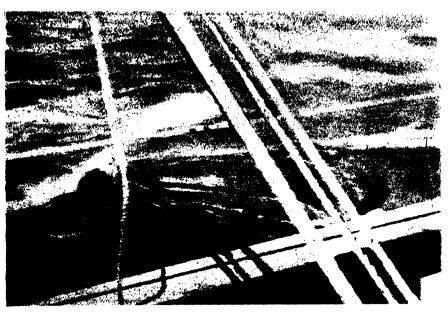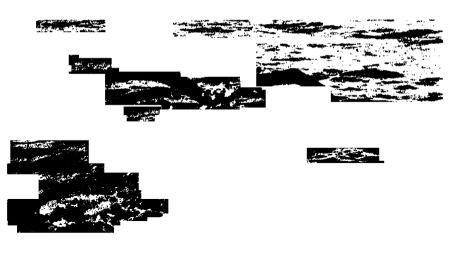
ইগ্‌ড্রাসিল পোতের পার্শ্বে ভাসমান তিমি মৎস্য

সমুদ্রের উপর আলবাট্রস্ পক্ষী

কোন শ্বেতাঙ্গ মহিলা টাউপুর বয়নপদ্ধতি পছন্দ করিয়াছেন বলিয়া আনন্দিত হইয়া সে তালপাতার রচিত একটি টুপী তাঁহাকে উপহার দিয়াছিল। উহা বুনিতে তাহার এক সপ্তাহ লাগিয়াছিল।

এইখানের সকল দ্বীপ ষ্ট্রাউট-দম্পতি পদব্রজে পরিভ্রমণ

মার্কুইসাস্ দ্বীপবাসী পুরুষ আহার্য্য প্রস্তুত করিতেছে

মার্কুইসাস দ্বীপপুঞ্জে প্রচুর পরিমাণে ফল পাওয়া যায়। কিন্তু ডিম্ব অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য। কারণ, দ্বীপবাসীরা ডিম্ব অপেক্ষা মুরগীর মাংসের ভক্ত। তাই ডিম কদাচিৎ বিক্রয় করে।

লবণাক্ত জলে মাছ ধরিবার জন্য বড় বড় বড়শী ষ্ট্রাউটদম্পতি সঙ্গে আনিয়াছিলেন। হাকা-হেটাও দ্বীপবাসীরা ঐ বড়শীর বিনিময়ে তাঁহা-দিগের জন্য ডিম সংগ্রহ করিয়া আনিত।

ফিজিদ্বীপে ফাঁপা গাছের গুঁড়িতে মুগুরের আঘাত করিয়া খৃষ্টানগণকে গির্জ্জায় যাইতে আহ্বান করা হইতেছে

মার্কুইসাস্ দ্বীপ-পুঞ্জের বয়স্কগণ ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদিগকে ভয় দেখাইবার জন্য বলিয়া থাকে, "শ্বেতাঙ্গরা তোমা-দিগকে ধরিয়া লইয়া যাইবে।" মিসেস্ ষ্ট্রাউট যখন বড় ক্যামেরা লইয়া হাকাহেটাও দ্বীপের পর্ব্বতচূড়ার ছবি তুলিবার জন্য তীরে নামিয়াছিলেন, তখন বালকরা তাঁহাকে দেখিয়া ছোট ছোট শিশু-দিগকে ভয় দেখাইল যে, তাহাদিগকে মেমসাহেব ক্যামেরায় ভরিয়া আমে-রিকায় লইয়া যাইবেন।

করেন। পাথরের দেবমূর্ত্তিগুলিকে অধিবাসীরা "টিকি" বলিয়া থাকে। এই দেবতাগুলি বৃহদাকার। স্থানীয় অধিবাসীরা "টিকি"কে অতি পবিত্র বলিয়া মনে করে।

ইহাতে শিশুগণ ভীত হইয়া তাঁহার নিকট হইতে পলায়ন করিল।

টুয়ামোটস্ দ্বীপেও ষ্ট্রাউটদম্পতি দ্বীপবাসীদিগের

গ্যালাপ্যাগোস্ দ্বীপে কাঠের পিপা হইতে মিসেস্ ষ্ট্রাউট চিঠির সন্ধান করিতেছেন

শিশুক্রোড়ে মার্কুইসাস্ দ্বীপের তরুণী

ইগ্‌ডাসিলের অনতিদূরে কৃষ্ণ মৎস্যসমূহের খেলা

মার্কুইসাস্ দ্বীপের টাউপু টুপী তৈয়ার করিতেছে

ইগ্‌ড্রাসিল পোতে মিসেস্ ষ্ট্রাউট

কাম্বারল্যাণ্ড দ্বীপের সন্নিকটে ইগ্‌ড্রাসিল পোত
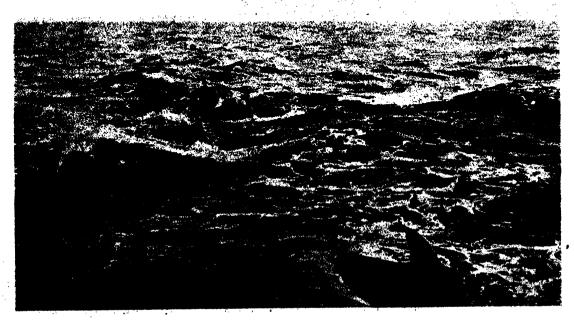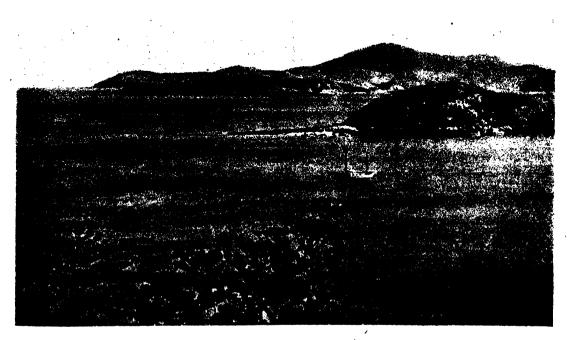
ভদ্রতা ও শিষ্টাচার দেখিয়া প্রীত হইয়াছিলেন। মিসেস্ ষ্টাউট দর্শনার্থীদিগকে আম্র উপহার দিয়াছিলেন। তাহারাও তাঁহাকে নারিকেল, শঙ্খ এবং মোরগশাবক উপহার দিয়া শিষ্টাচার দেখাইয়াছিল।

নিউজিল্যাণ্ডের উত্তরদ্বীপস্থ লাইট হাউস্ বা আলোকস্তম্ভ

টাহিটী দ্বীপে পৌছিয়া তাঁহারা ডাকের প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন। তথা হইতে তাঁহারা সামোয়া দ্বীপে গমন করেন। এখানকার অধিবাসীরা প্রতীচ্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসিলেও, জাতীয় রীতিনীতি পরিত্যাগ করে নাই। কিন্তু বিবাহ কালে কন্যা শাদা পরিচ্ছদ পরিধান করে। তবে কাহারও পায় জুতা থাকে না।

যাত্রিসহ সামোয়ান খেয়া-নৌকা

ফিজি দ্বীপে চকলেট ও মিছরিখণ্ডের বিনিময়ে মিসেস্ ষ্টাউট নানাজাতীয় শঙ্খ ও ঝিনুক সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই অঞ্চলে আলোকচিত্রের বিনিময়ে তাঁহাদিগকে খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিতে হইত। দেশীয় নরনারী, বালক-বালিকারা ফটোগ্রাফের অত্যন্ত অনুরাগী।

মোয়ালা দ্বীপবাসীরা ইংরেজী ভাষা শিখিবার বিশেষ পক্ষপাতী। ইংরেজী মাসিকপত্র তাহারা পড়িতে ও দেখিতে খুব ভালবাসে। মাটুকু দ্বীপে কয়েক সপ্তাহ তাঁহারা বাস করিয়াছিলেন। কলা কিনিবার প্রয়োজন হওয়ায় এক সপ্তাহের মধ্যে একটি কদলীও তাঁহারা পান নাই। অবশেষে কতিপয় রমণীকে ভেলভেটের জ্যাকেট

খৃষ্টমাস দ্বীপের নারিকেল-ভোজী কাঁকড়া

ফিজি দ্বীপের বালকবালিকারা জলে খেলার নৌকা ভাসাইয়া দিতেছে

তিনি মিঃ ষ্ট্রাউটের সহোদরা কি না। তাঁহার মত আকারের ফিজীয় তরুণীদিগকে বিবাহযোগ্যা বলিয়া তাহারা মনে করে না। তাহাদিগের ধারণা, এত অল্প বয়সের মেয়ের বিবাহ হওয়া সঙ্গত নহে।

অক্টোবর মাসে তাঁহারা নিউজিল্যাণ্ড অভিমুখে যাত্রা করেন। সমুদ্রপথে এইবার তাঁহাদিগকে প্রবল ঝটিকা ও বৃষ্টির সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। কিন্তু লক্ষ্য অভিমুখে শীঘ্র পৌঁছিবার জন্য তাঁহারা অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন। যত বাধাই উপস্থিত হউক না কেন, তাঁহারা জাহাজ চালাইলেন।

হোয়াংগারোয়ায় অল্পকাল পোত বাঁধিয়া তাঁহারা একবার চারিদিকে চাহিলেন। ১ শত ৫০ বৎসর পূর্ব্বে "বয়েড্" নামক বৃটিশ জাহাজ যেখানে পুড়িয়া গিয়াছিল, সেই স্থানটি তাঁহাদিগের দৃষ্টিপথে পতিত হইল।

উত্তর অন্তরীপ অভিমুখে যাত্রা করিবার সময় তাঁহাদিগের মনেও শঙ্কা জাগিয়াছিল, ক্যাপ্টেন কুকের অদৃষ্টে যে দৈবদুর্ব্বিপাক ঘটিয়াছিল, তাঁহাদিগের অদৃষ্টেও তাহাই ঘটিবে না কি? দশ দিন ধরিয়া ক্যাপ্টেন কুককে এই স্থানে বাধ্য হইয়া অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল।

উত্তর অন্তরীপের নিকট আসিয়া তাঁহারা "জোসেফ কন্‌রাড্" নামক জাহাজ দেখিতে পাইলেন। জাহাজের যাবতীয় নাবিক তাঁহাদিগের পোতের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়াছিল। মার্কিণ-পতাকা-শোভিত একখানি

দেখাইবার পর, উহার বিনিময়ে তাঁহারা প্রচুর কদলী ও নানাবিধ ফল এবং শাক-শব্জী পাইয়াছিলেন। ভেলভেটের জামা এই দ্বীপবাসিনীরা কখনও দেখে নাই।

ফিজিয়ান নারীরা মিসেস্ ষ্ট্রাউটকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,

ক্ষুদ্র পোতকে তাহারা এখানে দেখিতে পাইয়া বিস্ময়াভিভূত হইয়াছিল।

রাত্রিকালে তাঁহারা "মিলফোর্ড" নামক খাঁড়ির মধ্যে প্রবেশ করেন। প্রভাতে কুহেলিকার আবরণে চারিদিক্

সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। তাঁহারা সুসময়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

প্রভাতে চারিদিক্ পরিষ্কার হইলে তাঁহারা পার্ব্বত্য সুষমা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। জলপ্রপাতের দৃশ্য আরও মনোরম। বাতাস এখানে এত প্রবল যে, প্রপাতের জলকণাসমূহ পাহাড়ের চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া সূর্য্যকিরণে ঝলমল করিতে লাগিল।

রাত্রিকালে বাতাসের অবস্থা নৌযাত্রার অনুকূল বুঝিয়া তাঁহারা চন্দ্রালোকে সে স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন

আলোক-চিত্র গ্রহণের পূর্ব্বে মাকু ইসান্ কিশোরী

করিলেন। "ড্যাগ্‌স্ সাউণ্ডে" তাঁহারা অতঃপর আশ্রয় লইলেন। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ জাহাজ "এচেরণ" এখানে জরীপ করিবার জন্য আসিয়াছিল। ক্যাপ্টেন কুক এই পথেই যাত্রা করিয়াছিলেন।

পিকার্স গিল্ বন্দরে ট্রাউট-দম্পতি নানাজাতীয় মাছ দেখিয়াছিলেন। তাহারা জলে খেলা করিয়া বেড়াইতেছিল। এই দ্বীপে এক জাতীয় মক্ষিকা আছে। তাহাদিগের দংশন-জ্বালা অত্যন্ত তীব্র। ট্রাউট-দম্পতি পূর্ব্ব হইতে এই মক্ষিকার কথা জানিতেন তাই তাঁহারা ডাঙ্গায় শিবির স্থাপন না করিয়া জলের উপর পোতে অবস্থান করিতেন।

সে স্থান ত্যাগ করিয়া তাঁহারা পুইসেগুর লাইট নামক দ্বীপ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তথায় একটি আলোকস্তম্ভ বা লাইট-হাউস্ ছিল। মিসেস্ ট্রাউট উহা দেখিবার জন্য পোত ভিড়াইলেন। অতি নির্জ্জন স্থান। দ্বারে আঘাত শুনিয়া ভিতর হইতে কেহ বলিল, "ভিতরে আসুন।"

এক ব্যক্তি রেডিওবার্ত্তা প্রেরণ করিতেছিল। সে তাঁহাদিগকে আসিতে দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। সে ভাবিয়া-

মিসেস্ ট্রাউটের ধৃত প্রকাণ্ড মৎস্য

ছিল, বোধ হয় তাহারই অন্য সহকর্ম্মী আসিয়াছে। কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে ট্রাউট-দম্পতিকে দেখিয়া লোকটার বিস্ময় চরম সীমায় উঠিল। তিন মাসের মধ্যে সে বহির্জ্জগতের কোন নরনারীকে দেখে নাই।

নিউজিল্যাণ্ডের এই অঞ্চলে ট্রাউটদম্পতি যখন প্রবেশ করেন, তখন মার্চ্চ মাস। শীতের আমেজ তাঁহারা মার্চ্চের শেষেও অনুভব করিলেন। নিউজিল্যাণ্ডের ব্লাফ্ হইতে ডুনেডিন পর্য্যন্ত সমুদ্রতটভূমি মরুভূমি সদৃশ এবং মনুষ্য-আবাস শূন্য। সেজন্য তাঁহার ডুনেডিন, লিটল্‌টন্ এবং

ওয়েলিংটনে অধিক দিন যাপন করেন নাই। কিন্তু উল্লিখিত জনপদগুলিতে তাঁহারা সমাদরে অভ্যর্থিত হইয়াছিলেন।

নিউজিল্যাণ্ডে আসিতে তাঁহাদের তুই বৎসর লাগিয়াছিল। সমগ্র নিউজিল্যাণ্ড পরিদর্শনের পর তাঁহারা সংকল্প করিলেন, অতঃপর তাঁহারা গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। প্রশান্ত মহাসাগর পার হইয়া উত্তমাশা অন্তরীপের পথে গৃহে ফিরিবেন।

টাস্মান্ সমুদ্রপথে তাঁহারা ব্রিস্বেন অভিমুখে ধাবিত হইলেন। পথে তাঁহাদিগের পোত ঝটিকাবর্ত্তের মধ্যে পড়িয়াছিল। দিনরাত কঠোর পরিশ্রম করিয়া তাঁহারা সেই ঝটিকাবর্ত্তের আক্রমণ হইতে উদ্ধার লাভ করেন।

ব্রিসবেন সহরে আসিয়া তাঁহারা কিছুকাল বিশ্রাম করেন। তার পর "গ্রেট বেরিয়ার" অভিমুখে পোত চালনা করেন। এই পথ অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। কুইন্স্ল্যাণ্ডের তীরভূমিতে নারিকেল বৃক্ষ আদৌ নাই। থারস্‌ডে দ্বীপ মুক্তা-সংগ্রহের জন্য প্রসিদ্ধ।

অষ্ট্রেলিয়ার ডারউইন সহরে যখন তাঁহারা পৌঁছিলেন, তখন গ্রীষ্মকাল। চারিদিক্ শুষ্কপ্রায়। ছোট ছোট পুষ্করিণীতে বিবিধ জাতীয় হংস তাঁহারা দেখিতে পাইলেন।

অষ্ট্রেলিয়ার উত্তরাংশ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড উঁই ঢিবি সমাচ্ছন্ন। ডারউইনেও উঁই ঢিবিগুলি দেখিয়া ষ্টাউট-দম্পতি বিশেষ কৌতূহল অনুভব করিয়াছিলেন। উঁই ঢিবিগুলি দেখিতে সমাধিস্তম্ভের মত।

বর্ষার প্রারম্ভেই তাঁহারা অষ্ট্রেলিয়া ত্যাগ করেন। অনুকূল বাতাসে তাঁহারা খৃষ্টমাস দ্বীপ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই দ্বীপের দৈর্ঘ্য ১৩ মাইল। সমুদ্রবক্ষ হইতে ইহার উচ্চতা ১২ শত ফুট। এই দ্বীপে লতাগুল্ম ও অরণ্যের বাহুল্য তাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছিলেন।

নিউজিল্যাণ্ডের উপকূলবর্ত্তী প্রস্তরস্তূপ

খৃষ্টমাস দ্বীপে রেলপথ আছে। অবশ্য ১১ মাইলের অধিক রেলপথ সৃষ্ট হয় নাই। রেলগাড়ীর এঞ্জিনে কয়লার পরিবর্ত্তে কাষ্ঠ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এখানে প্রচুর কাষ্ঠ আছে। চীনা কুলীরা এখানে শ্রমিকের কার্য্যে নিযুক্ত আছে। এই দ্বীপে "ফস্ফেট" কারখানা আছে। সেইজন্য খৃষ্টমাস দ্বীপে জনসংখ্যার প্রাবল্য।

ফস্ফেটের সন্ধান পাইয়া গ্রেটবৃটেন ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে

বোরাবোরা দ্বীপের বালক স্থানীয় নৌকা বাহিতেছে

খৃষ্টমাস দ্বীপের পথে মোটর গাড়ী
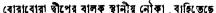
এই দ্বীপ গ্রেটবৃটেনের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লয়েন। ফস্‌ফেট্ এখানকার রাজা বলিলেই হয়। পুরুষরা ফস্‌ফেট্ সংগ্রহে সকল সময়ে ব্যস্ত। পাছে খাদ্যদ্রব্য এবং আসবাবপত্র ফস্‌ফেট্ মিশ্রণে নষ্ট হয়, সেজন্য নারীরা অতিমাত্রায় সতর্ক।

এই দ্বীপে ৬ মাইল দীর্ঘ একটি মোটরপথ নির্ম্মিত হইয়াছে। ষ্ট্রাউটদম্পতি খোলা মোটরে এই পথ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। মোটরচালক মালয়-ভাষাভাষী। তাঁহারা সে ভাষা জানিতেন না। আকার-ইঙ্গিতে চালক তাঁহাদিগের কথা বুঝিয়া কায করিত।

এই দ্বীপে তাঁহারা এক জাতীয় ভীষণ কাঁকড়া দেখিয়াছিলেন। বর্ষাকালে এই কাঁকড়া এমন সর্ব্বভুক্ হইয়া উঠে যে, যদি ঝোপ-জঙ্গলে দৈবাৎ কোন মানুষ নিদ্রাচ্ছন্ন থাকে, তবে তাহাকেও আক্রমণ করিতে কুণ্ঠিত হয় না। যদি কোন লোক দ্বীপমধ্যে পথ হারায়, তবে এই কাঁকড়ার আক্রমণে তাহার প্রাণ পর্য্যন্ত যাইতে পারে। কাঁকড়ারা গাছে উঠিয়া নারিকেল পর্য্যন্ত খায়। কোকোস্ এবং কিলিং দ্বীপে এই জাতীয় কাঁকড়া প্রচুর পরিমাণে ছিল। এখন তথায় কদাচিৎ দুই একটা কাঁকড়ার দর্শন মিলে। কিন্তু খৃষ্টমাস্ দ্বীপে এই কাঁকড়া প্রচুর।

খৃষ্টমাস দ্বীপে পারাবত প্রচুর। চীনারা ফাঁদ পাতিয়া পারাবত ধরিয়া তাহার মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে। এখানকার চীনারা রন্ধন-বিদ্যায় অত্যন্ত পটু। শ্বেতাঙ্গ মনিব-পত্নীগণের রান্নার কৌশল দেখিয়া তাহারা উহা

ডাসেন দ্বীপের পেঙ্গুইন পাখীর ঝাঁক

আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে। এই দ্বীপ দেখিবার জন্য বড় কেহ এখানে আসে না। কারণ কোন যাত্রিজাহাজ এখানে আসে না। ফস্‌ফেট সংগ্রহের জন্য জাপানী জাহাজ এখানে আসে। ফস্‌ফেট কোম্পানীর জাহাজ মাল লইয়া সিঙ্গাপুরে গমন করিয়া থাকে।

ষ্টাউটদম্পতি খৃষ্টমাস দ্বীপে এক সপ্তাহকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। মিসেস্ ষ্টাউট্ এখানকার দৃশ্য দর্শনে মুগ্ধ হন। ফস্‌ফেট কোম্পানীর শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারীরা তিন বৎসরের মধ্যে এ স্থান ত্যাগ করিতে পারেন না। ৬ জন শ্বেতাঙ্গ মহিলা এখানে আছেন।

উক্ত দ্বীপ ত্যাগ করিয়া তাঁহারা কোকোস্ দ্বীপে যাত্রা করেন। দ্বীপের গবর্ণর তাঁহাদিগকে সমাদরে অভ্যর্থনা করেন। ক্যাপ্টেন উইলিয়ম্ কিলিং নামক একজন বৃটন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাযে নিযুক্ত ছিলেন। ১৬০৯ খৃষ্টাব্দে তিনি এই সকল দ্বীপ আবিষ্কার করেন। কিন্তু ১৮২৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দ্বীপগুলি গ্রেটবৃটেনের অধিকারভুক্ত হয় নাই। জে ক্লু নিস্-রস কয়েক জন নাবিক সহ ঐ সময়ে দ্বীপ অধিকার করেন। এখানে প্রচুর নারিকেল উৎপাদিত হয়। তিনি সেই নারিকেল-শস্য সংগ্রহ করিতে থাকেন। বহু মালয়বাসী শ্রমিককে আনিয়া তিনি ক্রমে এই ব্যবসায়ের প্রসার বৃদ্ধি করেন। রস-পরিবার তদবধি এই সকল দ্বীপের নারিকেল ব্যবসায়ের ও দ্বীপের মালিক।

এই দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে দুইটি দ্বীপে নিয়মিত মনুষ্য-আবাস আছে। হোম্ দ্বীপে গবর্ণর রস্ ১১ শত মালয়-বাসীসহ বাস করেন। হোম দ্বীপের অপর নাম "নিউ সেলিমা"। ডাইরেক্‌শন দ্বীপটি "ইষ্টারণ্ এক্‌স্‌টেনসন টেলিগ্রাফ" কোম্পানীকে ইজারা দেওয়া হইয়াছে।

ডাইরেকসন্ দ্বীপটি এত ক্ষুদ্র যে, ১৫ মিনিটের মধ্যে যে কোন লোক সমগ্র দ্বীপটি পরিভ্রমণ করিয়া আসিতে পারে। সমুদ্রবক্ষ হইতে এই দ্বীপের সর্ব্বোচ্চ স্থান ৫ ফুটের অধিক উচ্চ নহে। সমগ্র দ্বীপটি নারিকেল বৃক্ষে পরিপূর্ণ।

স্থান অল্প বলিয়া টেলিগ্রাফ কোম্পানীর কোন কর্ম্মচারীই এখানে সস্ত্রীক বাস করিতে পারেন না।

প্রত্যেক কর্ম্মচারীকে স্ব স্ব গৃহে স্ত্রীকে রাখিয়া এখানে চাকরী করিতে হয়। সমগ্র দ্বীপ সম্পূর্ণ নারীবর্জ্জিত। ষ্টাউটদম্পতি এই টেলিগ্রাফ কোম্পানীর কর্ম্মচারীদিগের নিমন্ত্রণ লাভ করিয়াছিলেন।

মিসেস্ ষ্টাউট লিখিয়াছেন, "নারীর প্রভাব-বর্জ্জিত দ্বীপের অধিবাসীরা গোঁফ-দাড়ী রাখিয়াছেন। দেখিলাম, যাঁহারা বয়সে আমার অপেক্ষাও ছোট, তাঁহারাও ক্ষৌরকার্য্য করেন না।

টেলিগ্রাফ-ষ্টেশনে মুদ্রার প্রচলন নাই। গভর্ণর রস্ অস্থিনির্ম্মিত এক প্রকার মুদ্রার প্রচলন করিয়াছেন। তাঁহার লোকজনের মধ্যে এই মুদ্রাই চলিয়া থাকে। কোম্পানীর প্রয়োজনীয় সকল প্রকার দ্রব্য সিঙ্গাপুর হইতে ক্রয় করিয়া দ্বীপে প্রেরিত হয়।

ডাইরেকসন দ্বীপে জাহাজে করিয়া মাটী প্রেরিত হয়। এখানে একটি উদ্যান আছে। ডাক্তার উহার তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। সেই উদ্যানের জন্য মাটীর প্রয়োজন হয়।

গবর্ণর রস্ তাঁহার অধিকার-সীমার মধ্যে আদর্শ সহর নির্ম্মাণ করিয়াছেন। পথগুলি সুন্দর এবং পরিচ্ছন্ন। পথের প্রান্তবর্ত্তী গৃহগুলি সুদৃশ্য। অনেক দোকানও এই সহরে আছে। কাহারও বিবাহ হইলে গভর্ণর রস্ নবদম্পতির বাসের জন্য বাড়ী দিয়া থাকেন। তিনি এই দ্বীপগুলির মালিক এবং শাসন-ক্ষমতা তাঁহাতেই কেন্দ্রীভূত। গবর্ণর রস সকল কার্য্যেই দক্ষ। এই কারণে দ্বীপের উন্নতি দ্রুত হইতেছে।

বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হইলেও কোকোস্ দ্বীপপুঞ্জ এক জন গভর্ণরের শাসনেই পরিচালিত। এই সকল দ্বীপের নিয়মাবলী লঙ্ঘন করিলে যে দণ্ডভোগ করিতে হয়, তাহা বিচিত্র। কোন বাহিরের লোক দ্বীপে প্রবেশ করিতে পারে না এবং কোন লোক একবার এখান হইতে চলিয়া গেলে, তাহার আর তথায় প্রবেশাধিকার নাই। কারণ, বহির্জ্জগতের বিলাস ও জাঁক-জমকের কথা দ্বীপের অধিবাসীদিগের মধ্যে প্রচারিত হইলে অসন্তোষ জাগিয়া উঠিতে পারে।

কোকোস্ দ্বীপপুঞ্জে ১৬ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে বিবাহ করিবার বিধান নাই। যদি কেহ তাহা করে, তবে
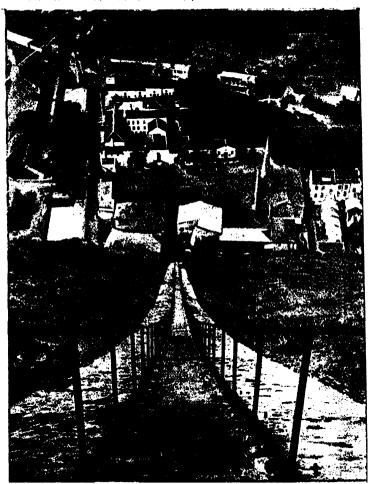
সেণ্টহেলেনায় পাহাড়ের উপরস্থিত দুর্গের দৃশ্য

তাহাকে বেত্রদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। জন্ম-নিয়ন্ত্রণের জন্যই গভর্ণর রসের এই ব্যবস্থা। একটি কিশোর-বয়স্ক বালক উক্ত আইন-বহির্ভূত বিবাহ করিয়াছিল। বর ও কন্যাকে বেত্র-দণ্ডে দণ্ডিত করিবার প্রথা। কিন্তু বর নিজ দেহে তাহার স্ত্রীর শাস্তির অংশও গ্রহণ করিয়াছিল। কন্যাটিকে শুধু তিরস্কার করিয়াই ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল।

বিগত য়ুরোপীয় যুদ্ধের সময় জার্ম্মাণ সাবমেরিণ "এম্‌ডেন্" হইতে এক দল জার্ম্মাণকে "ডিরেক্‌সন" দ্বীপের টেলিগ্রাফ-তার ধ্বংস করিবার জন্য ঐ দ্বীপে পাঠাইয়াছিল। কিন্তু সেই সময় "সিড্‌নী" রণতরী হঠাৎ তথায় আবির্ভূত হওয়ায়, দ্রুত পলায়নকালে উত্তর কিলিং দ্বীপের চড়ায় এম্‌ডেন্ আটকাইয়া যায়।

"এম্‌ডেন"-প্রেরিত জার্ম্মাণরা বেতার-বার্ত্তা ও তারের সাময়িক ক্ষতি করিয়াছিল। তবে রেফরিজেরেটরে রক্ষিত যে সকল খাদ্য ছিল, তাহা নষ্ট করে নাই। তাহারা "এম্‌ডেন্" ও "সিডনির" জলযুদ্ধ এই দ্বীপ হইতে দেখিতেছিল। কিন্তু "এম্‌ডেনের" পরিণাম কি হইবে বুঝিতে পারিয়া একখানি নৌকায় চড়িয়া তাহারা হোম্ দ্বীপে পলায়ন করে। তথা হইতে গবর্ণর রসের একখানি পোত লইয়া সমুদ্রপথে ধাবিত হয়, বহু কষ্টে এই দল অবশেষে কনষ্টাণ্টিনোপলে পৌঁছায়।

শত বৎসর পূর্ব্বে একজন পোতাধ্যক্ষ এই সকল দ্বীপে আসিয়াছিলেন। তাঁহার বর্ণনায় দেখিতে পাওয়া যায়, এই দ্বীপের কাঁকড়া নারিকেল ভক্ষণ করিত, মৎস্যগণ প্রবাল গ্রাস করিত, কুকুর মাছ ধরিত, আর মানুষ কচ্ছপের পৃষ্ঠে আরোহণ করিত। এখানকার শঙ্খ শামুক মানুষকে ফাঁদে ফেলিতে ওস্তাদ ছিল।

মিসেস্ ষ্টাউট এই দ্বীপে কাঁকড়া দেখিতে পান নাই। কারণ, স্থানীয় অধিবাসীরা তাহাদিগকে ধরিয়া নিঃশেষ করিয়াছে। পূর্ব্বে এই অঞ্চলে এত কাঁকড়া ছিল যে, স্থানীয় লোকরা তাহাদিগের দেহ পেষণ করিয়া তৈল বাহির করিয়া লইত। এখন গবর্ণর রসের একটি পুষ্করিণীতে বহু সামুদ্রিক কচ্ছপ সংরক্ষিত আছে। ছোট-বড় নানা আকারের কচ্ছপ তিনি ভোজনের জন্য জিয়াইয়া রাখিয়াছেন।

উত্তমাশা অন্তরীপের দৃশ্য

পূর্ব্বে এই দ্বীপে ইঁদুরের প্রাচুর্য্য ছিল। এখন নাই। দ্বীপের প্রধান শ্রমশিল্প নারিকেল শস্য। উহা হইতে অর্থাগম হইয়া থাকে। গবর্ণর রস খাদ্যাভাব দূর করিবার জন্য দ্বীপে বিভিন্ন প্রকার গাছের চারা আনিয়া রোপণ করিয়াছেন। কিন্তু অধিবাসীদিগের প্রধান খাদ্যদ্রব্য চাউল এখনও আমদানী করিতে হয়।

কোকোস্ হইতে যাত্রা করিয়া ষ্টাউট-দম্পতি সাড়ে ষোল দিনে ২ হাজার ৩ শত মাইল জলপথ অতিক্রম করিয়া রড্‌রিগুয়েজ দ্বীপে উপনীত হন। এই দ্বীপ অধুনা বৃটিশ অধিকার-ভুক্ত। সপ্তদশ শতাব্দীতে পোর্ত্তুগীজগণ এই দ্বীপ প্রথম আবিষ্কার করেন। পরে কিছুকাল ওলন্দাজগণ এই দ্বীপ অধিকার করিয়াছিল। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ফরাসীদিগের আমলেই এই দ্বীপে বসবাস আরব্ধ হয়।

এই দ্বীপ পূর্ব্বে অরণ্য-সমাকুল ছিল। বহু বন্যপশু

এখানে পাওয়া যাইত। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে এই দ্বীপের অধিবাসীর সংখ্যা মাত্র ২ শত ৫০ জন ছিল। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে অধিবাসীর সংখ্যা ১০ হাজার হইয়াছে। অরণ্য পরিষ্কার করার ফলে এখানে এখন চাষ হইতেছে।

দ্বীপের মধ্যে উৎকৃষ্ট রাজপথ সমূহ রচিত হইয়াছে। পথে বাহির হইলেই দিনের মধ্যে বহু লোকের দেখা মিলে। এই সকল লোক ইংরেজী ভাষা জানে না। এজন্য কোন বিদেশী তাহাদিগের নিকট হইতে কোন সংবাদই সংগ্রহ করিতে পারেন না। এখানে বিদ্যালয় আছে। স্থানীয় হাকিম ও অন্যান্য ভদ্রলোক ষ্টাউট-দম্পতিকে সমাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই দ্বীপের পরই মরিসস্ দ্বীপ। এই দ্বীপ দেখিতে যেমন সুন্দর তেমনই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। পোর্ত্তুগীজরাই এই দ্বীপ প্রথম আবিষ্কার করে। পরে ওলন্দাজগণ এখানে বসতি আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্তু স্থানটি লাভজনক নহে এবং ক্রীতদাসগণ তাহাদিগকে ফেলিয়া পলায়ন করিতে থাকায়, ১৭১০ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজগণ এই দ্বীপ পরিত্যাগ করে।

অতঃপর ফরাসীরা মরিসস্ দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করে। ১৮১০ খৃষ্টাব্দে উহা বৃটিশ অধিকারভুক্ত হয়। মরিসসের অধিবাসীরা প্রচলিত ফরাসী ভাষা ব্যবহারে অনুমোদন লাভ করিয়াছিল। তদবধি এখানকার কথা ও মিলিত ভাষা ফ্রেঞ্চ। ফরাসী ও কাফ্রি নিগ্রোদিগের সংমিশ্রণজাত যে শ্রমিকদল মরিসসে ছিল, পূর্ব্ব-ভারতীয় শ্রমিকদিগের আগমনে তাহাদিগের সংখ্যা এখন হ্রাস পাইয়াছে। ইক্ষুক্ষেত্র চাষের জন্য শেষোক্তদিগকে এখানে আমদানী করা হয়। প্রতি বর্গমাইলে এই দ্বীপের অধিবাসীর সংখ্যা ৫ শত ৫০ জন।

মরিসস্ হইতে আফ্রিকা যাত্রাকালে ষ্টাউটদম্পতিকে অনেকবার ঝটিকাবর্ত্তে পড়িতে হইয়াছিল। মাডাগাস্কার হইতে আফ্রিকার জলপথ আরও বিঘ্নবহুল হইয়াছিল। জুলুল্যাণ্ডের পার্শ্ব দিয়া গমনকালে মিসেস্ ষ্টাউট সিংহের দেখা পাইবেন বলিয়া আশা করিয়াছিলেন, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে ইক্ষুক্ষেত্রসমূহ তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছিল।

ডরবান্ সহরে উপনীত হইয়া তাঁহারা কিছুকাল বিশ্রাম করিয়াছিলেন। সহরের বিস্তৃতি ও ঐশ্বর্য্যে তাঁহাদের মন মুগ্ধ করিয়াছিল। বহু মনোরম অট্টালিকা তথায় নির্ম্মিত হইয়াছে।

উত্তমাশা অন্তরীপ অতিক্রম করিয়া তাঁহারা কেপটাউনে উপনীত হন। উহার সৌন্দর্য্যে তাঁহারা মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহারা পেঙ্গুইন পক্ষীর ঝাঁক দেখিবার জন্য ডাসেন্ দ্বীপে গমন করিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহারা সরকারী জাহাজে সেখানে গিয়াছিলেন। বে-সরকারী কোন প্রকার জলযানের সেখানে প্রবেশ নিষেধ। পেঙ্গুইন জাতীয় পাখী
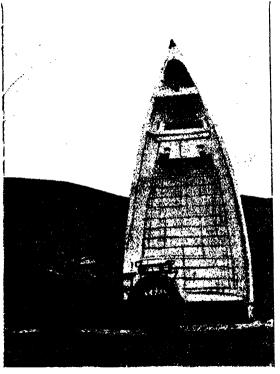
এসেনসন্ দ্বীপে কেব্‌ল্ কোম্পানীর কৃষিক্ষেত্র

শুধু দুষ্প্রাপ্য বলিয়া স্থানীয় সরকার উহাদিগের রক্ষার ব্যবস্থা করেন নাই। প্রতি বৎসর অসংখ্য ডিম্ব বিক্রয় করিয়া সরকার লাভবানও হন, তাই এত সতর্কতা।

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ ভাগে ষ্টাউট দম্পতি সেণ্টহেলেনা দ্বীপ অভিমুখে যাত্রা করেন। সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে মহাবীর নেপোলিয়ান নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। সমুদ্রবক্ষ হইতে সেণ্টহেলেনা দ্বীপের দুর্গপ্রাকার এবং তথায় অবস্থিত কামান দেখিতে পাওয়া যায়। ইদানীং এই দ্বীপের সামরিক প্রয়োজনীয়তা আর নাই।

মহাবীর নেপোলিয়ান

সেণ্টহেলেনা হইতে যাত্রা করিয়া ৭ দিন পরে তাঁহারা "এসেনসন্" দ্বীপ দেখিতে পান। দ্বীপটি অনুর্ব্বর। বৃটিশ রণতরী বিভাগ হইতে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া পথ ও সুড়ঙ্গ প্রস্তুত করা হইয়াছে। কালক্রমে এই দ্বীপেরও সামরিক প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পাওয়ায়, ইষ্টারণ টেলিগ্রাফ্ কোম্পানীকে ইহা প্রদত্ত হইয়াছে। এই কোম্পানীই
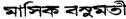
এসেনসন্ কেব্‌ল্ কোম্পানীর কার্য্য পদ্ধতি

এসেনসন্ দ্বীপের পাখীর ঝাঁক

ইদানীং দ্বীপের ব্যয়ভার বহন করিতেছেন। দ্বীপের অধিবাসীদিগের মধ্যে কোম্পানীর ২০ জন কর্ম্মচারী ও তাঁহাদিগের পরিবারবর্গ ব্যতীত প্রায় দেড় শত জন শ্রমিক ও ভৃত্য আছে।

দ্বীপটিতে জনসমাগমের বাহুল্য না থাকিলেও, সপ্তাহে একবার করিয়া সবাক-চিত্র দেখিবার ব্যবস্থা আছে। টেলিগ্রাফ কোম্পানীর কর্ম্মচারীরাই সিনেমার ব্যয়নির্ব্বাহ করেন।

দ্বীপের খাদ্যদ্রব্যাদি আমদানী করিয়া লইতে হয়। তবে গ্রীন্ পর্ব্বতের কৃষিক্ষেত্রে কিছু তরিতরকারী, শাক-সব্জী উৎপন্ন হইয়া থাকে। ৪ শত ভেড়া সকল সময়েই এখানে সংরক্ষিত থাকে। পাছে কোন জাহাজ আসিতে বিলম্ব করিলে মাংসাভাব না হয়, তাই এই ব্যবস্থা। কয়েকটি গাভী এখানে আছে। দুগ্ধ ও মাখনের অভাব তাহা হইতেই পূর্ণ হয়। তবে গাভীদিগের খাদ্য দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে আমদানী করিতে হয়। মাছ কিনিতে পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া সামুদ্রিক কচ্ছপ সুলভ। জলাশয়ে অনেক সময় কচ্ছপ জিয়াইয়া রাখিবার ব্যবস্থাও আছে।

এসেনসন্ দ্বীপ হইতে যাত্রা করিয়া তাঁহারা বারবাডোস্ দ্বীপ অভিমুখে পোত চালনা করেন। তিন বৎসর পরে গৃহে ফিরিয়া আসিতেছেন বলিয়া তাঁহাদিগের মনে কৌতূহলের অন্ত ছিল না। ৩৮ হাজার মাইল জলপথ অতিক্রম করিয়া তাঁহারা স্বহস্ত-নির্ম্মিত জাহাজ নিজেরা পরিচালন করিয়া সুস্থদেহে নিউইয়র্ক গিয়া পৌছিয়াছেন।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

শ্যামলিয়া

শ্রাবণ বরিষণে—
আজ কে এলে নীপের বনে নূপুর গুঞ্জরণে!
ধরার বুকে শিহর লাগে,
কেয়ার বুকে চমক জাগে
আকাশ আজি উতল হলো অঘোর বরিষণে—
মুখর নূপুর গুঞ্জরিয়া, কে এলে আজ বনে!

কে এলে আজ প্রিয়!
আজ গগনে দেখি তোমার শ্যামল উত্তরীয়!
কদম্ব বন রেণু ঝরায়
তোমার আসার পথ কি সাজায়?
গন্ধ তারি ভেসে আসে—সজল সমীরণে,
আজ কে এলে পিয়াল ছায়ে নূপুর গুঞ্জরণে!

তিমির ঘন রাতে—
এ কি মায়া বুলিয়ে দিলে, আমার নয়ন-পাতে!
ও গো আমার বনের পথে
কে যে ডাকো এমন রাতে
তোমার সাথে খেল্‌তে খেলা বাহির হব পথে
কে যে ডাকো এমন সুরে তিমির ঘন রাতে!

শঙ্খ তোমার বাজে—
এলে কি আজ শ্যামলিয়া, মিলন মোহন সাজে!
ও গো—আমার দুয়ার খোলা
এসো এসো হলো বেলা
আজকে ফিরে যেও না গো নিঠুর মোহনিয়া,
পথ চেয়ে রই তোমার লাগি—কাঁদে যে মোর হিয়া!

শ্রীমতী নলিনী সেন।

প্রণয়-পত্রিকা

[গল্প]

[ম্যাক্সিম গর্কির লেখা হইতে]
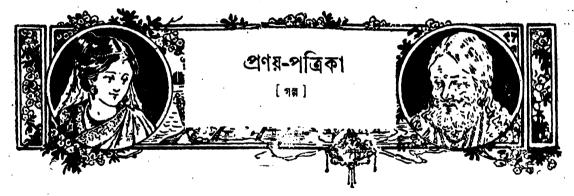
আমার এক বন্ধু একদিন এই কাহিনীটি বলিলেন।

বলিলেন—মস্কোয় থাকিয়া আমি তখন লেখাপড়া করি। ছোট একটা বাড়ীতে থাকি। আমার বাড়ীর পাশে এক স্ত্রীলোক থাকিত। সে বিদেশিনী। জাতে পোলিশ। তার নাম টেরেশা।

টেরেশার দীর্ঘ দেহ। সে দেহে শক্তি আছে। দীর্ঘ কালো কেশ; কৃষ্ণ ভ্রূযুগ; তবে মুখে একটা বিশ্রী ছাপ।

তার ঘর ছিল রাস্তার ওপারে, ঠিক আমার ঘরের সামনে। আমার ঘরের জানলা খুলিলে তার ঘর দেখা যাইত। ঘরে সে থাকিলে আমি কদাচ আমার ঘরের ওদিক্‌কার জানলা খুলিতাম না।

তবু এক-এক সময়ে দুজনে চোখোচোখি হইত। চোখোচোখি হইবামাত্র সে এমন হাসি হাসিত,—আমার মন সে-হাসিতে কর্‌-কর্‌ করিত!

তাকে পথে দেখিতাম। কখনো দেখিতাম, দুচোখ জবাফুলের মতো লাল। কখনো দেখিতাম, অবিন্যস্ত কেশপাশ। এ সময় সে আমার পানে চাহিয়া আমায় বলিত,—কি গো, ছাত্রমশায়!

সঙ্গে সঙ্গে হাসিত। ইতর হাসি।

তার জন্য কতবার ভাবিয়াছি এ ঘর ছাড়িয়া দিই,—কিন্তু ঘরখানি ভালো। চারিদিক্ খোলা,—জানলায় দাঁড়াইলে সহরের অনেকখানি চোখে পড়ে। তার উপর পাড়াটা বেশ নিরালা-নির্জ্জন, কলরব-কোলাহল নাই।

একদিন সকালে চুপচাপ বিছানায় পড়িয়া আছি, কামরার দ্বার ঠেলিয়া টেরেশা আসিয়া উপস্থিত—একেবারে আমার ঘরে।

গম্ভীর কণ্ঠে ডাকিল—ছাত্রমশায়···

আমি উঠিয়া বসিলাম, কহিলাম—কি চাই?

তার পানে চাহিলাম। তার চোখে-মুখে লজ্জার আভাস। এমন ভাব কখনো দেখি নাই! সে বলিল—একটু দয়া করতে হবে।

আমি ভাবিলাম, আলাপ করিবার একটা ছল! মুখে কিছু বলিলাম না।

সে বলিল—আমার একখানা চিঠি লিখে দিতে হবে।

ভাবিলাম, ব্যাপার কি?

কাগজ-কলম লইয়া বসিলাম, কহিলাম—বলো, কি লিখতে হবে।

আমার পানে চাহিয়া সে চুপ করিয়া রহিল।

আমি কহিলাম—কাকে লিখবে?

—ওয়ারশর রেল-পথে শোয়ানজিয়ালি,—সেইখানে থাকে বোলেশলভ। তাকে চিঠি লিখবো।

—কি লিখতে হবে, বলো।

সে বলিল—লেখো,—প্রিয় বোলেশ, আমার প্রিয়তম, ওগো আমার সর্ব্বস্ব—ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। এতদিন তোমার আদরের ছোট্ট টেরেশাকে চিঠি লেখোনি কেন? এতে মনে কি ব্যথা সে পায়···

মনে মনে হাসিলাম। আদরের ছোট্ট টেরেশা! অমন দীর্ঘ জোয়ান দেহ! ন্যাকামি আর কাহাকে বলে!

কিন্তু হাসি চাপিয়া রাখিলাম। প্রশ্ন করিলাম,—বোলেশলভ্ লোকটা কে?

সে বলিল—বোলেশ? তার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে যে। কথাবার্ত্তা পাকা।

সবিস্ময়ে কহিলাম—বিয়ে হবে?

—হাঁ সাহেব। এতে অবাক হচ্ছো কেন? আমার মত মেয়েকে কেউ ভালোবাসতে পারে না? কি আমার বয়স!

কি বয়স! কিন্তু যাক্, আমার সে চিন্তা কেন? কহিলাম—না, অসম্ভব নয়! কতদিন ধরে তোমাদের বিয়ের কথা পাকা হয়ে আছে?

—প্রায় দশ বছর।

টেরেশার চিঠি লিখিয়া দিলাম। চিঠির কথায় টেরেশা কি মায়া, কি মিনতি যে ঢালিয়া দিল! মনে হইল, আমি যদি বোলেশলভ হইতাম, এ মিনতিতে আমার মন গলিয়া যাইত!

চিঠি লেখা হইলে টেরেশাকে দিলাম। সে বলিল—তোমার কোনো-কিছু কায থাকে যদি?

বলিলাম না,—কিছু করতে হবে না।

সে বলিল—তোমার জামা-কাপড় সেলাই করবার থাকে যদি? ···ও কাজে আমি পাকা।

আমি বলিলাম—দরকার নেই।

টেরেশা চলিয়া গেল।

তার পর দুসপ্তাহ কাটিয়াছে। একদিন সন্ধ্যার সময় জানলার ধারে বসিয়া নিজের মনে শীষ দিতেছি। বাহিরে দারুণ দুর্য্যোগ।

যাদুর যাদু

(রূপকথা)

এ সেই আদিকালের কথা—যাদু-বিদ্যার জোরে পৃথিবীতে মানুষ যখন অসাধ্য-সাধন করতো !

যাদু-বিদ্যার স্রোতে তখন ভাঁটা পড়ে আসছে। অর্থাৎ যাদু-বিদ্যার যাঁরা গুরু, শিষ্যদের এ-বিদ্যা শেখাতে তাঁদের তখন আস্থা নেই ! শিষ্যরা গুরুর কাছে যাদু-বিদ্যা শিখে সে-বিদ্যার জোরে গুরুদের নাকাল করছিল। কাযেই যাদু-বিদ্যার গুরুরা সভা ডেকে সঙ্কল্প করলেন, এ-বিদ্যা আর কাকেও শেখানো হবে না ! অনেকে বললেন—এমন বিদ্যা লোপ পাবে ? তাঁরা বললেন—পাক্ লোপ ! এর পরে মানুষ নব-বিজ্ঞান শিখুক। সে নব-বিজ্ঞানে গুরু-মারা বুদ্ধি কারো হবে না !

পণ নিয়ে গুরুরা যাদু-বিদ্যা শেখানো যখন বন্ধ করেছেন, আমরা সেই তখনকার কাহিনী বলছি।

সব গুরু তখন মারা গেছেন, শুধু নবদ্বীপে বেঁচে আছেন একজন যাদু-পণ্ডিত। তাঁর নাম নিগমানন্দ। নিগমানন্দর বয়স হয়েছে আশি বৎসর। মাথায় দীর্ঘ জটাজুট। লম্বা দাড়ি-গোঁফের ঝোপ থেকে মুখখানিকে খুঁজে বার করতে বেশ খানিকটা সময় লাগে ! নদীর ধারে তাঁর আশ্রম। এই আশ্রমে গুরু নিগমানন্দ বাস করেন; আর তাঁর সঙ্গে থাকে পুরোনো ভৃত্য দামু।

একদিন সকালে গুরু নিগমানন্দ আশ্রমের সামনে বট-ছায়ায় বসে তল্পী খুলেছেন; তল্পীতে আছে মামীর মার রকমারি খেল,—ছোট-বড় নুড়িনোড়া, দর্পণ, কাঁকুই, প্রদীপ, অঙ্গুরী, মধুপর্কের বাটি, চন্দন-কাঠের টুক্‌রো, বন-মানুষের হাড়, মানুষের মাথা—এমনি সব জিনিষ ! গুরু সেগুলো নাড়া-চাড়া করছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে পুঁথির পাতায় লেখা শ্লোক আওড়াচ্ছেন, এমন সময় দীনবেশে তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালো সন্দীপ।

তরুণ যুবা। সন্দীপের দু'চোখে বুদ্ধির দীপ্তি।

সন্দীপ এসে গুরু নিগমানন্দর পায়ের কাছে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলো। গুরুর পায়ের ধূলো নিয়ে মাথায়-গায়ে মাখলে—মেখে করজোড়ে গুরুর সামনে দাঁড়ালো।

নিগমানন্দ বললেন,—কে তুমি ?

সন্দীপ বললে,—আজ্ঞে, আমার নাম সন্দীপ। নবদ্বীপ, বারাণসী, কনৌজ, নালন্দা—সে-সব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আমি নানা উপাধি পেয়েছি, প্রভু ! সর্ব্বশাস্ত্র শিক্ষা করেছি। কিন্তু আপনার কৃপায় যাদু-বিদ্যা শিক্ষা না করলে আমার এ-শিক্ষা সম্পূর্ণ হবে না ! তাই আমি আপনার চরণে এসেছি। আমাকে যাদু-বিদ্যা শিক্ষা দিন। নাহলে আপনি মরে গেলে এ-বিদ্যা পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে যে !

নিগমানন্দ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সন্দীপকে দেখলেন। বললেন,—এ শিক্ষা লোপ পাবে, সন্দেহ নেই। কিন্তু উপায় কি ?

সন্দীপ বললে—দয়া করে আমাকে এ-বিদ্যা শেখান।

নিগমানন্দ বললেন—এ বিদ্যা যে শিখবে, তার যোগ্যতা তোমার আছে ?

সন্দীপ বললে—পরীক্ষা করুন।

নিগমানন্দ বললেন—বটে ! বেশ !

নিগমানন্দ অনেকক্ষণ সন্দীপের পানে তাকিয়ে রইলেন। দু'চোখে সন্ধানী দৃষ্টি ! তার পর বললেন—তোমাকে যদি আমি কুবেরের ঐশ্বর্য্য-ভাণ্ডার দান করি ? করে বলি, এখনো যাদু-বিদ্যা শেখবার বাসনা আছে ?

সন্দীপ বললে—সে ঐশ্বর্য্য উপেক্ষা করে তবু আমি যাদু-বিদ্যা শিখবো।

নিগমানন্দ বললেন—যদি তোমায় সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর করে দিই? গৌরবে-শক্তিতে বিভূষিত করি?

সন্দীপ বললে—তবু আমি সে সিংহাসন নেবো না, যাদু-বিদ্যা শিখবো।

নিগমানন্দ বললেন—আমোদ-প্রমোদ ঐশ্বর্য্য-সম্পদ খ্যাতি-কীর্ত্তি—এ সব যদি ত্যাগ করতে বলি? যদি বলি, এ সবের লোভ ত্যাগ করলে তবে আমি তোমাকে যাদু বিদ্যা শেখাবো?

সন্দীপ বললে—সে সব আমি ত্যাগ করবো।

নিগমানন্দ বললেন—বটে! বেশ!...

তার পর নিগমানন্দ কি ভাবলেন, ভেবে বললেন—অনেকখানি পথ হেঁটে তুমি ক্লান্ত। খিদে পেয়েছে বোধ হয়?

সন্দীপ বললে—আজ্ঞে, খিদে-তেষ্টায় আমি আকুল!

নিগমানন্দ ডাকলেন—দামু...

দামু এলো। নিগমানন্দ বললেন—এই ছেলেটির জন্য ছানা-ননী-মাখন-মিছরী নিয়ে এসো। আর সেই সঙ্গে অমনি এক-কমণ্ডলু খাবার জল।

দামু ছানা-ননী আনতে গেল। নিগমানন্দ তখন সন্দীপের হাত ধরে তাকে কাছে বসালেন,—তার পর কমণ্ডলু থেকে জল নিয়ে সন্দীপের মাথায় ছিটিয়ে দিলেন, দিয়ে বললেন—আমার সঙ্গে এসো।

নিগমানন্দ চললেন বনে এক পোড়ো বাড়ীতে। বাড়ীর ছাদে উঠলেন। সন্দীপও সঙ্গে সঙ্গে ছাদে উঠলো।

গুরু তাকে বললেন—চোখ বুজে বসো।

সন্দীপ চোখ বুজে বসলো। গুরু তার মাথায় হাত রেখে কতকগুলি মন্ত্র পড়লেন, তার পর বললেন—চোখ খোলো।

সন্দীপ চোখ খুললো।

নিগমানন্দ বললেন—ক'টা পরীক্ষায় তুমি উত্তীর্ণ হয়েছো। এখন শেষ-পরীক্ষা বাকী। এ-বিদ্যার জন্য তুমি কুবেরের ঐশ্বর্য্য, সসাগরা ধরণীর অধীশ্বরত্ব ত্যাগ করেছো, আমোদ-প্রমোদের বাসনা বর্জ্জন করেছো। এখন দেখতে চাই, গুরুর আদেশ অক্ষরে-অক্ষরে পালন করতে পারো কি না! যাদু-বিদ্যা শিখতে হলে সব-চেয়ে বেশী দরকার গুরু-ভক্তি! এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে যাদু-বিদ্যায় আমি তোমাকে বিশারদ করে দেবো।

সন্দীপ বললে—পরীক্ষা করুন, প্রভু।

গুরু নিজের কাঁধ থেকে উত্তরীয় খুললেন। তার পর ললাটে, বুকে, দুই কর-তলে সিঁদুর-লেপ দিলেন; দিয়ে উত্তরীয়খানি কোমরে বাঁধলেন; বেঁধে সন্দীপকে বললেন—তুমি খুব জোরে এর খুঁট ধরে থাকো। আমি বায়ু-পথে যাত্রা করবো। যদি তুমি উত্তরীয় ছেড়ে দাও, পড়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। সাবধান!

তাই হলো।

সন্দীপ গুরুর কোমরে-বাঁধা উত্তরীয়খানি দু'হাতে চেপে ধরলো। তার পর নিগমানন্দ ছাদ থেকে বাতাসের বুকে ঝাঁপ দিলেন,—মানুষ যেমন নদীর জলে ঝাঁপ দেয়, তেমনি! তার পর জলে যেমন মানুষ সাঁতার দেয়, নিগমানন্দ তেমনি বাতাসে সাঁতার দিয়ে শূন্যপথে এগুতে লাগলেন,—পিছনে ঝুলছে উত্তরীয় ধরে সন্দীপ।

দুজনের পায়ের নীচে পৃথিবী ক্রমে কুয়াশা-বাষ্পে মিলিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

দুদিন দু'রাত্রি বাতাসে সাঁতার দিয়ে নিগমানন্দ এসে দাঁড়ালেন এক তুঙ্গ-গিরির শিখরে। গিরির বুকে তৃণ-পল্লবের চিহ্ন নেই—শুধু জীব-জন্তুর অস্থি জমে আছে! উত্তরীয়-গ্রন্থি খুলে নিগমানন্দ বললেন—দাঁড়াও, সন্দীপ।

সন্দীপ দাঁড়ালো।

নিগমানন্দ বললেন—এবারে যা দেখবে, তাতে ভয় পেয়ো না।

সন্দীপ বললে—না।

একটি ফুৎকারে নিগমানন্দ অগ্নি জ্বাললেন,—দ্বিতীয় ফুৎকারে সে আগুন নিবিয়ে দিলেন। আগুন নিবলে সামনে ধোঁয়ার কুণ্ডলী জাগলো।

দেখতে দেখতে ধোঁয়ার সে কুণ্ডলী বিরাট-বিশাল হয়ে উঠলো এবং সে ধোঁয়া মিলিয়ে গেলে ক্রমশঃ প্রকাশ পেলো এক মস্ত প্রাসাদ। প্রাসাদের ফটকে এক বিরাট দৈত্য। তার চোখ দুটো যেন আগুনের ভাঁটা! নিগমানন্দর দিকে দৈত্য তেড়ে এলো। নিগমানন্দ একমুঠো

বাতাস ছুড়ে দিলেন—দেখতে দেখতে দৈত্যের দেহ ছাইয়ের রাশিতে পরিণত হলো।

সন্দীপ অবাক! তার সর্ব্বদেহে রোমাঞ্চ-রেখা ফুটলো।

নিগমানন্দ বললেন,—এবারে এসো, পুরী প্রবেশ করি।

ফটক পার হয়ে পাথরে-বাঁধানো পথ। তার পর মস্ত দালান, মস্ত ঘর। দশ-বারোটা ঘর-দালান পার হয়ে আর-একটা ঘর। এ ঘরের মেঝে-দেওয়াল সব মার্ব্বেল পাথরে তৈরী। এ ঘরে এসে নিগমানন্দ বললেন,—আমার পিছনে দাঁড়াও। খবর্দ্দার, সামনে বা পাশে থেকো না। এখনি এক দৈত্য আসবে। তার সঙ্গে আমার যুদ্ধ চলবে। সে যুদ্ধের পর দেখবে, আমি অচেতন হয়ে পড়ে যাবো। আমি অচেতন হলে তুমি ঐ সামনের দরজা দিয়ে ওদিক্‌কার ঘরে যাবে। সে-ঘরে কোনো দ্রব্য স্পর্শ করবে না, কোনো-কিছুর পানে চেয়ে দেখবে না। শুধু দেখবে একটি কমণ্ডলু। সেই কমণ্ডলু নিয়ে চলে আসবে। কমণ্ডলুর জল আমার সর্ব্বাঙ্গে ছিটিয়ে দেবে। বুঝলে?

সন্দীপ বললে—বুঝেচি, প্রভু।

নিগমানন্দ বললেন—মনে রেখো। আমার এ সব কথা অক্ষরে-অক্ষরে পালন করো। সাবধান! এ বড় কঠিন পরীক্ষা। এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলে তবেই তোমার জয়-জয়কার!

সন্দীপ বললে—আপনার সব কথা আমি অক্ষরে-অক্ষরে পালন করবো, প্রভু।

নিগমানন্দ তখন একটি মন্ত্র উচ্চারণ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে সামনের ঘরের দরজা গেল খুলে এবং অতর্কিতে এক ত্রিশির-দানব এসে নিগমানন্দর সামনে দাঁড়ালো।

দুজনে দারুণ যুদ্ধ চললো। ভীষণ চীৎকার! সে চীৎকারে কাণে তালা লাগে! সন্দীপের বুকের মধ্যে যেন সপ্ত সাগর টলমল করে উঠলো! সমস্ত পৃথিবী যেন ভূমিকম্পের বেগে দুলতে লাগলো! সন্দীপের মাথা ঘুরে গেল। সে বুঝি পড়ে যাবে!

কিন্তু পড়ে গেল না! হঠাৎ চোখের সামনে থেকে কুয়াশা-জাল অন্তর্হিত হলো। তখন সন্দীপ দেখে, দানবটা মরে গেছে এবং গুরুর দেহ তন্দ্রাভরে নিস্পন্দ হয়ে মেঝেয় লুটিয়ে পড়েছে। গুরু অচেতন।

গুরুর আদেশ সন্দীপের মনে পড়লো। এবারে তাকে যেতে হবে ঐ সামনের ঘরে। কমণ্ডলুতে জল আছে…

সন্দীপ নিঃশঙ্ক মনে ও-ঘরে ঢুকলো। ঘরে হাজার ঝাড়ে হাজার বাতি জ্বলছে। আলোয় আলো! সে-আলোয় সন্দীপ দেখলে, ছোট একটি চৌকির উপরে কমণ্ডলু। আর সে চৌকির পাশে সোণার পালঙ্ক। পালঙ্কে শুয়ে আছেন পরীর মতো রূপসী এক কন্যা! কন্যা গভীর নিদ্রায় অচেতন!

সন্দীপ কমণ্ডলু নিলে, তার পর কন্যার পানে চেয়ে দেখলে। এমন রূপসী কন্যা সে কোথাও ছাখেনি! এমন রূপসীর কথা কোনো রূপকথার গল্পেও পড়েনি!

তার চোখ আর কন্যার দিক্ থেকে ফিরতে চায় না!

গুরুর আদেশ সে ভুলে গেল। কন্যার কাছে এগিয়ে এলো। কন্যার হাত ধরে বললে,—তুমি বেঁচে আছো, না, পাষাণ হয়ে গেছ গো কন্যা?

এ-কথায় কন্যা ঘুম ভেঙ্গে ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন। বসে বললেন,—তুমি এসেছো! আঃ! নাহলে আমার এ ঘুম ভাঙ্গতো না। জানো, এক হাজার বছর ধরে আমি ঘুমোচ্ছি! কেউ এসে ঘুম ভাঙ্গায় নি। মানুষ কি এত-ঘুম ঘুমোতে পারে? আর কিছু দিন ঘুমোলে আমি মরে যেতুম!

সন্দীপ অবাক! তার মুখে কথা নেই, চোখে পলক পড়ে না!

কন্যা বললেন—এ প্রাসাদে হাজার রাজার ঐশ্বর্য্য আছে। সে-সব তোমার হবে। আমাকে তুমি বিয়ে করো। করে এ রাজ্যের রাজা হয়ে সিংহাসনে বসো। তোমার কোনো অভাব থাকবে না, সকল-সুখে সুখী হবে।

সন্দীপের বুকখানার মধ্যে যা হচ্ছিল, যেন সাগর ফুঁশে উঠেছে!

সন্দীপ বললে—দাঁড়াও কন্যা, আগে গুরুর আদেশ পালন করি। তার পর আমি তোমার কাছে আসবো।

কন্যা বললেন—গুরু!

সন্দীপ বললে—হ্যাঁ। ঐ পাশের ঘরে তিনি অচেতন হয়ে শুয়ে আছেন।

কন্যা এলেন সন্দীপের সঙ্গে দোরের কাছে। নিগমানন্দকে

দেখে কন্যা বললেন—সর্ব্বনাশ! ও যে যাদুকর নিগম। উনি তোমার গুরু? তা তুমি এখন কি করতে চাও?

সন্দীপ বললে—এই কমণ্ডলুর জল ওঁর সর্ব্বাঙ্গে ছিটিয়ে দিতে হবে।

কন্যা শিউরে উঠলেন, বললেন,—খবর্দ্দার, অমন কায করো না! আমার কথা শোনো, তোমার হাতে ঐ যে জল, ও-জল হলো জীবন-বারি। ও জল ওঁর গায়ে দিলে এখনি উনি যৌবন পেয়ে জেগে উঠবেন। জেগে উঠে উনি এই রাজ্য, প্রাসাদ, ঐশ্বর্য্য নেবেন। আর আমাকে বিয়ে করে ওঁর রাণী করবেন। তোমার সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে! এমন কায করো না। তার চেয়ে আমি যা বলি, শোনো। কমণ্ডলুর পাশে আছে একখানি খাঁড়া। সেই খাঁড়া নাও; নিয়ে ওঁর বুকে বসিয়ে দাও। তাহলে এ রাজ্য, সিংহাসন, প্রাসাদ, ঐশ্বর্য্য আর আমি - সব তোমার হবে।

এ-কথা শুনে সন্দীপ কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো!

কন্যা বললেন—যাও। যা বললুম, করো। দেরী নয়!

খাঁড়া নিয়ে সন্দীপ চললো নিগমানন্দর দিকে।

নিগমানন্দ পড়ে আছেন নিস্পন্দ। সন্দীপ এসে খাঁড়া তুলে যেমন গুরুর বুকে বসাবে…

প্রচণ্ড একটা শব্দ হলো। যেন আকাশ ভেঙ্গে পৃথিবীর বুকে পড়লো এবং পৃথিবী যেন মুহূর্ত্তে ফেটে চৌচির!

ভয়ে চমকে সন্দীপ চোখ বুজলো।

আবার যখন চোখ মেলে চাইলো, দেখলে, আশ্রমের সামনে বটবৃক্ষচ্ছায়ে বসে আছেন গুরু নিগমানন্দ। তাঁর সামনে সেই মামীর মার খেল,—নোড়া-নুড়ি, চন্দন-কাঠ, বনমানুষের হাড়—রাজ্যের টুকিটাকি!

কোথায় সে প্রাসাদ! কোথায় সে সোণার পালঙ্ক! কোথায় সে পরীর মতো রূপসী কন্যা! মায়া-মন্ত্রে সব অদৃশ্য হয়ে গেছে!

নিগমানন্দ ডাকলেন—দামু…

দামু এলো।

নিগমানন্দ বললেন—ছানা-ননী আর আনতে হবে না। এ-ছোকরা শিষ্য হবার যোগ্য নয়। ওকে যাদু-বিদ্যা শেখাবো না। শেষ-পরীক্ষায় ও আর উত্তীর্ণ হতে পারলে না।

বেচারা সন্দীপ মলিন-মুখে ঘরে ফিরে এলো। যাদুবিদ্যা-শিক্ষার এমন সুযোগ হারিয়ে ফেলে সেই মামুলি শাস্ত্র-পুরাণের বিদ্যা নিয়েই তাকে তুষ্ট থাকতে হলো।

শ্রীসত্যেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

পায়রা-দূত

আজ বিজ্ঞানের যুগে এরোপ্লেন আমাদের চিঠি-পত্র-বহার কায করছে। অতি প্রাচীন যুগে ভারতে এবং মিশরে এই চিঠি-পত্র-বহার কায করতো পায়রা। রাজা চললেন কোন্ সে সুদূর গিরি-বনে মৃগয়ায়, সেখান থেকে চিঠি লিখে পোষা-পায়রার মারফৎ সে-চিঠি পাঠাতেন রাজধানীতে মহারাণীর কাছে! পায়রা সে-চিঠি নিয়ে মহারাণীর কাছে পৌছে দিত এবং তার জবাব নিয়ে আবার উড়ে যেতো রাজার কাছে তাঁর শীকার-ছাউনিতে। এ গল্প-কথা নয়; সত্য কথা।

আজ বিজ্ঞানের যুগেও যুদ্ধ-বিগ্রহের সময়ে পায়রার মারফৎ খবর-বার্ত্তার আদান-প্রদান চলে। এজন্য
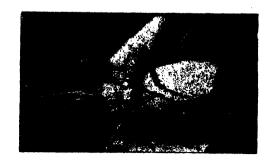
যুদ্ধের পায়রা

পায়রাদের শিখিয়ে-পড়িয়ে এমন ওস্তাদ তৈরী করা হয় যে, তাদের কর্ম্ম-তৎপরতার কাছে মানুষও হার মানে!

ছ'সাত বৎসর আগেকার কথা বলছি। পানামা থেকে জাহাজে চড়ে একদল শিক্ষিত ভদ্রলোক গেছলেন সমুদ্র-অভিমুখে মাছ ধরবার জন্য। পথে খুব ঝড়-জল এলো এবং প্রায় পনেরো-কুড়ি দিন কেটে গেলেও মাছ-ধরা ভদ্রলোকগুলির কোনো খোঁজ-খপর মিললো না!

তাঁদের সন্ধানে বেরুবার জন্য একদল সন্ধানী ভদ্রলোক জাহাজ ছাড়বার উদ্যোগ করছেন, এমন সময় সেই

মাছ-ধরা দলের কাছ থেকে একটি পায়রা উড়ে এসে হাজির। তার পায়ে-বাঁধা ছোট কৌটোর মধ্যে একটুক্‌রো চিঠি! পায়রাটি জলে ভিজে প্রায় আধ-মরা অবস্থায় এসে পৌঁচেছিল।

চিঠিতে লেখা ছিল, ঝড়ে জাহাজ ভেঙ্গে যাত্রীরা এক আথাটায় পড়ে আছেন—তাঁদের দুরবস্থার সীমা নেই। সে-চিঠি পড়ে সকলে জাহাজ নিয়ে গিয়ে প্রায় দেড়শো মাইল দূর থেকে তাঁদের উদ্ধারসাধন করেন।

এই সব ডাক-পায়রা একাদিক্রমে দু'তিনশো মাইল পথ অবিরাম উড়ে যেতে পারে; তাতে তাদের কোনো

পায়রার পিঠে ডাক-বাক্স

কষ্ট হয় না। এক-হাজার মাইল পথ নিরুপদ্রবে এবং নিরাময় দেহে উড়েছে, এমন ঘটনা বিরল নয়। এমন এদের শিক্ষা যে, ডাক-পায়রা রাত্রে ওড়ে না—কোথাও আশ্রয় নেয়; তারপর দিনের আলো-জাগার সঙ্গে সঙ্গে আবার ওড়া-পাড়ি সুরু করে। ঝড়ে-জলে ওদের ওড়ার বিরাম দেখা যায় না! বিধাতা এমন ভাবে ওদের সৃষ্টি করেছেন যে, ঝড়ে-জলে শূন্য-পথ-বিচরণে ওদের কষ্ট বা বিপদের আশঙ্কা নেই।

পায়রারা যখন বয়সে ছোট থাকে, তখন তাদের ডাক-বহার কাজ শেখাতে হয়। ছানা-পায়রাকে ইংরেজীতে বলে squeaker. প্রথমে এদের "ট্র্যাপ" করতে শেখানো হয়।

'ট্র্যাপ্' করা কাকে বলে, জানো? উঁচু মাচা বা 'ব্যোম' তৈরী করে তার উপরে উঠে খাবার দেখিয়ে পায়রাকে সেখানে উড়িয়ে আনানো। এদেশেও অনেকে এভাবে পায়রাদের 'ব্যোমে' চড়াতে শেখান্, বোধ হয় দেখেছো! তারপর এমনি খাবার দেখিয়ে তাকে অত্র-তত্র সর্ব্বত্র আন্‌তে পারা যায়। এই ভাবে ডাক শুনলে সে-ডাকে সাড়া দিয়ে পায়রা কাছে আস্‌তে অভ্যস্ত হয়। এ বিদ্যা-শিক্ষার পর পায়রাকে এখানে-ওখানে ফরমাশ-মাফিক উড়তে শেখাতে হবে। এ-শিক্ষাকে বলে tossing উড়ে এখানে-সেখানে যাতায়াত করানোয় জায়গার দূরত্ব দিনে-দিনে বাড়িয়ে তোলা চাই। শেখাবার আগে পায়রাকে খেতে দেওয়া উচিত নয়। কারণ খিদে যত পাবে, খাবারের লোভ দেখিয়ে ততই তাকে বশীভূত করা সহজ হবে। এমনি ভাবে পায়রার ওড়ার শক্তি বাড়বে এবং শক্তি-বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্লান্তিভরে পায়রা মোটেই আচ্ছন্ন হবে না!

ফরাসী, জার্ম্মাণী, বৃটেন, বেলজিয়ম—সকল দেশে আজো বিজ্ঞানের এত উন্নতি হলেও ফৌজ-বিভাগে খবরা-খবর আনা-পাঠানোর কাজে পায়রাদের দেবার রীতিমত শিক্ষা ব্যবস্থা আছে। এক-একটি রাজ্যের সামরিক-বিভাগে এক-এক জাতের পায়রা আছে প্রায় এক-লক্ষ, দেড়-লক্ষ; এবং ফৌজ-বিভাগের বিশেষ কর্ম্মচারীদের উপর ভার আছে এই পায়রাদের পরিচর্য্যা এবং শিক্ষা দীক্ষা দেখা।

এই পাইপে চিঠি দেওয়া হয়

এ-যাবৎ যত পায়রা যুদ্ধবিগ্রহে কর্ম্ম-তৎপরতা দেখিয়েছে, তাদের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতিমান 'মকার' নামে পায়রা। 'মকার' ছিল মার্কিন যুক্তরাজ্যের ফৌজ-বিভাগে পায়রা-দূত।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দে ১২ই সেপ্টেম্বর তারিখে বোমণ্ট-দুর্গে

মকার এলো। বিপক্ষের ব্যাটারি কোথায় আছে, তারা কি করছে, সেই খপর নিয়ে সে আসছিল। পথে বিপক্ষের বন্দুকের গুলীতে বেচারীর ডান চোখ উড়ে গেছে, রক্ত ঝরছে! এ সংবাদ পেয়ে মার্কিন-ফৌজ সতর্ক হলো,—না হলে বিপক্ষদের অতর্কিত আক্রমণে তাদের আর চিহ্ন থাকতো না!

"মকার" পায়রার প্রতিমূর্ত্তি
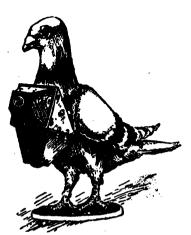
ফৌজদলে অনেকের কাছে রেশমী-থলির আশ্রয়ে একটি ছুটি করে পোষা পায়রা থাকে। ফ্রেঞ্চ-ফৌজের কাছেও শিক্ষিত পায়রা থাকে। বিপদ-আপদের সময় এই পায়রার মারফৎ খপর পাঠানো হয় এবং শতকরা পঁচানব্বইটি ক্ষেত্রে খপর যথাস্থানে গিয়ে পৌছোয়—তার ব্যতিক্রম ঘটে না।

পায়রার বুকে ক্যামেরা

১৯১৬ খৃষ্টাব্দের কথা। ফরাশী-ফৌজ বিমান-ক্যামেরা তৈরী করে। এ ক্যামেরার ওজন ছু আউন্স, আড়াই আউন্স। পায়রা-দূতের বুকে এই ক্যামেরা বেঁধে পায়রাকে তারা উড়িয়ে দিত। ক্যামেরায় থাকতো ছুটি লেন্স—একটি সম্মুখ-মুখী, অপরটি নিম্ন-মুখী। এই ক্যামেরার কল এমন সুকৌশলে রচা যে, এ-ক্যামেরা বুকে নিয়ে পায়রার

খপর নিয়ে পায়রা ফিরেছে

ওড়বার সময়ে সামনের ও নীচেকার রণক্ষেত্র এবং ফৌজদের অবস্থানের ছবি ঐ ছুটি লেন্সে সুদীর্ঘভাবে প্রতিবিম্বিত হতো। পায়রা উড়ে বেড়াতো তিনশো মাইল ঊর্দ্ধে শূন্য

পথে চক্রাকারে এবং সঙ্গে সঙ্গে ফটো তোলা হতো। ছোট পাখী বিন্দুর মতো আকাশের বুকে উড়তো! শত্রুর কামান-বন্দুকের গোলাগুলী তাকে স্পর্শ করতে পারতো না।

তবে পায়রা-দূতকে মারবার জন্য বিপক্ষরা শিক্ষিত বাজ-পাখী রাখে। পায়রা-দূতের পিছনে বিপক্ষরা বাজ-

রেশের পায়রা

পাখী ছেড়ে দিলে ফরাশী-ফৌজ বংশীধ্বনি করতো। বাঁশীর শব্দে একদিকে বাজপাখী ভয় পেতো, অন্যদিকে পায়রা-দূত ইঙ্গিত পেয়ে সতর্ক হতো! পায়রার এ পটুতার জন্য বহু দেশে পায়রা-মারা আইনে নিষিদ্ধ হয়েছে। পায়রা মারলে শাস্তি পেতে হয়।

রেশের ঘোড়ার মতো পায়রাদেরও গতিবেগ অসামান্য, ঘোড়-দৌড়ের মতো ইংলণ্ডে-আমেরিকায় পায়রা-ওড়ানো বাজির প্রচলন আছে। এক-একটি রেশে অমন দেড়শো দুশো পায়রা ওড়ানো হয়। এক-একটি রেশের পায়রার দাম কত জানো? তিনশো, সাড়ে তিনশো টাকা।

ফৌজের এবং রেশের এ সব পায়রার খাদ্য সম্বন্ধে খুব বেশী যত্ন নেওয়া হয়। এরা খায় বাছাই-করা দানা। এ দানা দু'তিন বছরের পুরোনো। দানার সঙ্গে থাকে সিদ্ধি আর মিহি-চাল।

প্রাচীন রোমে যুদ্ধ-যাত্রায় পায়রা ছিল সেনাদের নিত্য সঙ্গী। রাজা-রাজড়ারা পায়রা না নিয়ে কখনো দীর্ঘপথে যাত্রা করতেন না। পায়ে-চলা দূতের মারফৎ খপর পাঠানো কোনো দিনই নিরাপদ নয়। পথে নানা বাধা, নানা বিঘ্ন—খপর পৌঁছুনো সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হবার উপায় নেই! এক্ষেত্রে পায়রা-দূতের মতো পটু ডাক-হরকরা আর মিলবে না!

আমাদের দেশে যাঁরা পায়রা উড়িয়ে বেড়ান, তাঁদের খোশ-খেয়াল যতই সীমাবদ্ধ হোক, পায়রাদের শিক্ষাগ্রহণে পটুতা দেখে তাঁরা আনন্দ এবং বিস্ময় যা পান, তা সীমাহীন।

টকিতে পশু-পক্ষীর ডাক

নিউ-ইয়র্ক চিড়িয়াখানার অধ্যক্ষ ডক্টর রেমণ্ড ডিটমার্সের অসাধারণ অধ্যবসায়। জীব-জন্তুর প্রকৃতির সন্ধান লইয়াই তিনি ক্ষান্ত নন্; চিড়িয়াখানায় যত পশু-পক্ষী-সরীসৃপ আছে, তাদের সকলের স্বর-বৈচিত্র্যের রেকর্ড তিনি লইয়াছেন। তাঁর তোলা ফিল্মে সাপের স্বর, সিংহের গর্জ্জন, হাতীর ভৈরব-নাদ, কচ্ছপের ডাক, হিপোর হুঙ্কার, পাখীর

ঝোপে রেকর্ড লওয়ার উদ্যোগ

কল-কাকলী,— কোনো স্বরের অভাব নাই! চিড়িয়াখানার কুমীরটিকে আমরা নীরব সাধক বলিয়া জানি। এ কুমীরও যে ক্রোধ-লোভ-মদ-মাৎসর্য্য-বশে নানা বিচিত্র রব তোলে,

কে তাহা জানিত? ডক্টর ডিটমার্সের তোলা রেকর্ডে এই মৌন-ব্রতী নরভুক্ জীবের বহু বিচিত্র শব্দ-লহরীর যে পরিচয় মেলে, তাহাতে চমক লাগে!

আজ শব্দ-যন্ত্রের সমধিক উৎকর্ষ-যুগে টকি-ছবিওয়ালারা জীব-জন্তুর স্বাভাবিক স্বর-সংগ্রহে প্রচণ্ড কষ্ট ভোগ করিতে পশ্চাৎপদ নন্! তাছাড়া জ্ঞানব্রতী বহু সুধী জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করার উদ্দেশ্যে দিক-দিগন্তের শব্দ-যন্ত্র লইয়া ঘুরিতেছেন—দুরন্ত জীব-জন্তুর স্বর-বৈচিত্র্য-সংগ্রহের জন্য। খাঁচার পশু-পক্ষীর 'নির্জীব' স্বরে তাঁরা সন্তুষ্ট নন! তাঁরা চান, বনে-জঙ্গলে অবাধ মুক্তির মাঝে পশুদের স্বাধীন স্বাভাবিক বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর।

রেকর্ড লওয়া হইতেছে

এ-সাধনায় সর্ব্বপ্রথম অগ্রসর হইয়াছিলেন কমাণ্ডার জর্জ্জ ডায়ট। তিনি ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন এবং এখানকার বনে-জঙ্গলে পাহাড়ে-পর্ব্বতে ঘুরিয়া নানা জাতের হাতী, ভল্লুক, বন্য-বরাহ, বনের ময়ূর এবং আরও নানা পশু-পক্ষীর স্বর রেকর্ড করেন। এ কাজে তাঁর বিরাম ছিল না। ভারত-বর্ষ হইতে তিনি যান ব্রেজিলের দুর্গম বিপদ-সঙ্কুল জঙ্গলে ও নদ-নদীর উৎস-মুখে। এরোপ্লেনে চড়িয়া গিয়াছিলেন। দুখানি এরোপ্লেন সঙ্গে ছিল; আর সঙ্গে ছিল কয়েক জন বন্ধু, অনুচর এবং টকি-ফিল্ম-যন্ত্র।

বনের দুরন্ত হিংস্র-জন্তুর সামনা-সামনি ক্যামেরা ও শব্দ-যন্ত্র রাখিয়া রীতিমত ফোকাস করিয়া তাদের ছবি ও স্বর তোলা সামান্য ব্যাপার নয়! প্রাণ হাতে করিয়া কাজে নামিতে হয়! কিন্তু কমাণ্ডার ডায়টের ভাগ্য ছিল সুপ্রসন্ন। তিনি বাঘ-হাতী প্রভৃতির বহুবিধ স্বর-সংগ্রহে সমর্থ হন।

বাঘকে 'কথা কওয়ানো'—তার জন্য প্রায় চার-পাঁচ সপ্তাহ ধরিয়া বিরাট আয়োজন করিতে হইয়াছিল। যেমন বাঘ দেখা, অমনি 'ঐ বাঘ' বলিয়া ধাঁ করিয়া ক্যামেরা ও শব্দযন্ত্র পাতিয়া টকি ছবি তুলিলাম—সে উপায় নাই! কোথায় কখন বাঘ আসিবে—আসিলেও বাক্য-নিঃসরণ করিবে কি না—সে সম্বন্ধে কোনো নিশ্চয়তা নাই। এ-জন্য দেখিয়া-শুনিয়া প্রথমে জায়গা বাছিয়া লওয়া চাই। অর্থাৎ যে জায়গায় বাঘের আসার সম্ভাবনা, যেখানে বাঘ আসিবেই—এমন জায়গায় ছবি তুলিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তার পর সেখানে যন্ত্রাদি রাখিয়া হিংস্র জন্তুর স্বর ও ছবি তোল। সে জায়গায়টি খুব নিরাপদ

বাঘের গর্জ্জন

হওয়া চাই। নহিলে সবাক ছবি তুলিতেছি, আর বাঘ একেবারে ঘাড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িল,—বুঝিতে পারো তো, তাহাতে কি বিপদ! এ বিপদ এড়াইয়া চলা চাই!

বাঘের সবাক ছবি তুলিতে কমাণ্ডার ডায়ট নির্ব্বাচন করিলেন বাঘ যে-জায়গায় প্রায় আসে, সে-জায়গা হইতে পনেরো কিম্বা বিশ ফুট মাত্র দূরে একটি স্থান। লতা-পাতার ঝোপে আবরণ রচিয়া সেইখানে রহিলেন তিনি, ক্যামেরাম্যান এবং শব্দযন্ত্রী। যন্ত্র এমনভাবে রাখা হইল যেন বাঘের মৃদু ও গম্ভীর গর্জ্জন এবং ছবি ক্যামেরায় ও শব্দ-যন্ত্রে তোলা চলে। বাঘের ঘ্রাণ-শক্তি তেমন প্রবল নয়; তাই পনেরো-বিশ ফুট মাত্র দূরে লতা-পাতার ঘন আবরণ-অন্তরালে নিরাপদে অবস্থান সম্ভব। এ জায়গায় থাকিয়া তিনি বাঘের ও তার পরিবারবর্গের ঘরোয়া-ছবি তুলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

কীট-পতঙ্গের ধ্বনি তোলা

চার মাস জঙ্গলে থাকিয়া কমাণ্ডার ডায়ট বাঘের যে সবাক ছবি তুলিয়াছিলেন, সে-ছবির দৈর্ঘ্য মাত্র এক হাজার ফুট। শব্দ-যন্ত্রটি তেমন ভারী না হইলেও এক জায়গা হইতে চকিতে অন্য জায়গায় সে-যন্ত্র নাড়া-চাড়া করা সহজ বা নিরাপদ ছিল না। অথচ যে-পশুর সবাক ছবি তুলিবার জন্য এত আয়োজন, তার কাছ হইতে দূরে থাকিলে ছবি উঠিবে না। কাজেই এ ব্যাপার কতখানি সঙ্গীন, অনুমান করিতে পারো। শব্দযন্ত্র খুব জোরালো না হইলে বাঘের গর্জ্জন সঠিক ও সুস্পষ্ট রেকর্ড করা যায় না। বাঘ তো এক জায়গায় দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিবে না যে, শব্দযন্ত্র একই জায়গায় কায়েমি ভাবে রাখিয়া তার বহু বিচিত্র শব্দ হুবহু ছকিয়া লইব! বাঘ

কুকুরের ডাক তোলা

ঝোপের আড়ে মাইক্-যন্ত্র
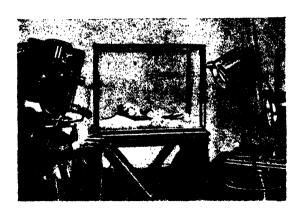
চলাফেরা করিবে এবং সেই সহজ অবস্থায় মুখে সে নানা শব্দ করিবে; কাজেই মাইক ঠিক করিয়া চটপট্ বাঘের গতি-ক্রম অনুসরণ করিয়া তার ধ্বনির ধারাবাহিক রেকর্ড তোলা সম্ভব হইতে পারে না। তার উপর খোঁচা-খুঁচি দিয়া বা কলা-কৌশলেও কোনো পশুর মুখে তার স্বাভাবিক ভাষা বাহির করা চলিতে পারে না!

বনের পশু প্রধানতঃ দু'রকম রব তোলে। এক রকম রব তোলে মিলন-কামনায়; অপর রকমের রব তোলে শত্রুর আভাস পাইলে। পূর্ব্বে নিউ-ইয়র্ক

চিড়িয়াখানায় যে পশু-পক্ষী-সরীসৃপের রবের রেকর্ড-তোলার কথা বলিয়াছি, সে রেকর্ড তুলিতে সময় লাগিয়াছিল পুরা একটি বৎসর।

বনের দুরন্ত হিংস্র পশু বনে যে-ডাক ডাকে, খাঁচায় পূরিলে তার সে ডাক বদলাইয়া যায়।

পশুপক্ষী প্রভৃতির শব্দ রেকর্ড করিয়া ডক্টর ডিটমার্স দেখিয়াছেন, সব চেয়ে ভালো ওঠে র‍্যাট্‌ল্ সাপের স্বর! অর্থাৎ স্বরের পরীক্ষায় (voice-test) ফার্ষ্ট হইয়াছে র‍্যাট্‌ল্-সাপ। এবং হুঙ্কারবিদ সিংহের স্থান একেবারে লাষ্ট ক্লাশে! বানরদের স্বরের বিভিন্ন রেশ মাইকে চমৎকার ওঠে,—তার চেয়েও স্পষ্ট ওঠে কীট-পতঙ্গের মৃদু-মর্ম্মর ধ্বনি।

বনের বাঘ ও সিংহের কণ্ঠে ধ্বনি নিঃসারিত করিতে ডক্টর ডিটমার্স যে-উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, বলি।

নিত্য-দিন যেখানে বাঘ আসে, সে-স্থান হইতে প্রায় পঁচিশ ফুট দূরে লতাগুল্ম দিয়া নিরাপদ আবরণ রচনা করিয়া ক্যামেরা-যন্ত্রাদি সমেত তিনি অপেক্ষা করিতে লাগিলেন এবং তারে বাঁধিয়া মাংস-সমেত অস্থিখণ্ড ঝোপের বাহিরে ফেলিয়া রাখিলেন। বাঘ আসিয়া মহানন্দে সে মাংস মুখে তুলিল। খুশী-মনে সে মাংস ভোজন করিতেছে, এমন সময় ডক্টর ডিটমার্স তারে টান দিলেন। বাঘের মুখ হইতে তারে-বাঁধা মাংস ও অস্থি নিমেষে অন্তর্দ্ধান হইল; রাগে বাঘ তর্জ্জন-গর্জ্জন সুরু করিল এবং ডক্টর ডিটমার্স তাঁর মাইক-যন্ত্র চালাইয়া সে ভীষণ গর্জ্জন-ধ্বনির রেকর্ড তুলিলেন।

হাতীর স্বভাব জানো? কখনো মৃদুনাদে (littlo squealing sounds) মনোভাব ব্যক্ত করে, কখনো বা উচ্চ স্বরগ্রামে। বন্দী হাতীর কণ্ঠধ্বনি রেকর্ড করা হইয়াছিল এক বিচিত্র উপায়ে। হাতীকে বেশ করিয়া দড়িদড়া দিয়া বাঁধিয়া তার সামনের পা ও শুঁড়ের নীচে একটা বালতি চাপা দিয়া শব্দ-যন্ত্রের মাইক রাখা হয়; এবং মাহুত কথাবার্ত্তায় ও ইঙ্গিতে তার কাছ হইতে বহু বিচিত্র ধ্বনি-লহরী নিঃসারিত করে। মাইক-যন্ত্রে সে ধ্বনি সঙ্গে-সঙ্গে রেকর্ড করা হয়।

দুরন্তপনায় হাতীর সমতুল্য কেহ নাই! বনের হাতীর যদি হঠাৎ চমক লাগে কিম্বা যদি তার স্বাচ্ছন্দ্যে ব্যাঘাত ঘটে, তাহা হইলে সে একেবারে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড বাধাইয়া তুলিবে! তার আর ছাড়ান নাই! হাতীর ঘ্রাণ-শক্তি বেশী রকম তীক্ষ্ণ। এক মাইল দূর হইতে আঘ্রাণে সে আগন্তুককে উপলব্ধি করিয়া লয় এবং আগন্তুকের অবস্থান-নির্ণয়ে তার ভুল হয় না। এ জন্য হাতীর সঙ্গে লাগিতে গেলে খুব বেশী সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।

হাতীর পায়ের নীচে মাইক্-যন্ত্র
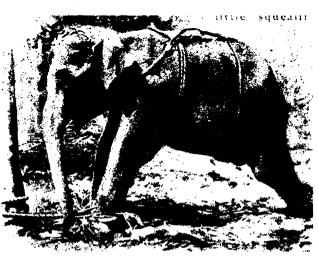
সাপের 'হিস্-হিস্' ধ্বনি এবং সমুদ্যত-ফনার শব্দ তুলিতে গিয়া ডক্টর ডিটমার্স বহুবার প্রাণে-প্রাণে কোনমতে বাঁচিয়া গিয়াছেন! বেজীর সঙ্গে সাপের লড়াই বাধাইয়া সে ছবি এবং সংগ্রাম-রত বেজী ও সাপের আক্রোশ-আস্ফালনের ধ্বনিও ডক্টর ডিটমার্স তুলিতে সমর্থ হইয়াছেন।

কৌতুকাভিনয়ে বানর-জাতির কেমন সহজ-পটুত্ব আছে! কমিক-অভিনয় যেন তাদের সহজাত! ডক্টর ডিটমার্স প্রায় পঞ্চাশ-জাতের বানরের ছবি ও স্বর-বৈচিত্র্য রেকর্ড করিয়াছেন। পাখীর কল-কাকলীর তো কথাই নাই! সে কাকলী-রব ডিটমার্স নানা ভাবে রেকর্ড করিয়াছেন।

অতিকায় কূর্ম্ম সময় বুঝিয়া ডাকে। সে সময়টুকুর হিসাব রাখিয়া কূর্ম্মের কণ্ঠরবও রেকর্ড-জাত করা হইয়াছে। হিপো মৌনব্রতী। সপ্তাহে এক দিন মাত্র সে ডাকে। তার ধ্বনিও রেকর্ডে তোলা হইয়াছে।

গাছের ডালে মাচা

ক্যামেরা এবং শব্দ-যন্ত্র দেখিলে বনের পশু-পক্ষী রীতিমত ভয় পায়। এ জন্য সামনাসামনি যন্ত্র রাখিয়া ছবি বা শব্দ তুলিবার উপায় নাই।

বনে পশু-পক্ষীর বিচিত্র স্বর সংগ্রহ করিতে গিয়া ডক্টর ডিটমার্স এক দিন আমাদের বাংলা দেশের এক বন-কুঞ্জে প্রায় পাঁচ-সাতশো পাখীর কাকলী-রব শুনিয়া বিমুগ্ধ হন। যেন অর্কেষ্ট্রা বাজিতেছে! এ কাকলী-অর্কেষ্ট্রার রেকর্ড-গ্রহণের উদ্দেশ্যে বড় গাছের মাথায় তিনি মাচা তৈরী করেন এবং সেই মাচায় মাইক রাখিয়া বহু পাখীর কাকলী-রব রেকর্ড করেন। গাছে উঠিবার জন্য মই তৈরী করা হয় এবং চব্বিশ ঘণ্টাকাল শব্দযন্ত্রীকে লইয়া তিনি সেই মাচায় বসিয়াছিলেন। নিশীথ-রাত্রে গাছে-গাছে নানা পাখী কূজনের অর্কেষ্ট্রা জাগাইয়া তোলে। সারা বন সে স্বর-লহরীতে ভরিয়া উঠিল। সেই সময় তিনি এই কাকলী-কোরাশ তুলিয়া লন। এ সব পাখী এমন ভীরু যে, মানুষ বা অপরিচিত কোনো-কিছুর আভাস পাইবামাত্র ভয়ে চুপ করে। কাজেই এ শব্দ-গ্রহণে ডক্টর ডিটমার্সকে অসামান্য সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইয়াছিল।

শুধু পশুপক্ষী নয়, বহু কীট-পতঙ্গের কণ্ঠরবও ডক্টর ডিটমার্স আশ্চর্য্য কৌশলে রেকর্ড-জাত করিয়া রাখিয়াছেন। বড় বড় ফিল্ম-কোম্পানি অনেক সময় ডক্টর ডিটমার্সের তোলা বিভিন্ন পশুপক্ষীর স্বর-রেকর্ড হইতে প্রয়োজন বুঝিয়া স্বর-লহরী লইয়া নিজেদের ছবিতে জুড়িয়া ছবিগুলিকে বাস্তবের আবহাওয়ায় ভরিয়া তুলিতেছেন। বিজ্ঞান ও আমোদ-প্রমোদের দিক দিয়া এ কণ্ঠ-রেকর্ড যে বিস্ময়ের সৃষ্টি করিয়াছে, তার আর তুলনা নাই।

যাহা ঘটে

আজি শুষ্ক মন
শোনে না সে বসন্তের মৃদু গুঞ্জরণ!
দক্ষিণ-পবন
বৃথাই বহিয়া আনে, আনন্দ-স্বপন।
সমুখে অশথ-শাখে
বিরল পত্রের ফাঁকে
কোকিলের চলিয়াছে আনন্দ-উৎসব
আমি শুধু শ্রান্ত ক্লান্ত বিষণ্ণ নীরব।
আমি ছিনু কবি,
সমুখে জ্বলিত মোর দীপ্ত আশা-রবি,
ঘন অন্ধকারে
ডাকিতাম আশা-ভরে আলোর পাথারে

কোথা সে হৃদয়?
নাহি তার পরিচয়,
অন্তরে গুমরে শুধু আশা-হীন হাহাকার
চারি পাশে নিরাশার লৌহ-কারাগার।
তেমনি রয়েছে ধরা
আনন্দ কৌতুকময় হাসি-গান ভরা
ফুটেছে সহস্র ফুল
নব উন্মেষের বেদনায় করিছে ব্যাকুল,
শুধু সেই যাত্রা-পথে,
কেহ না ডাকিবে মোরে উৎসবের রথে
আমি শুধু পড়েছি পিছনে
আমি শুধু রব নিরানন্দ মনে।

শ্রীমতিলাল দাশ

প্রাচীন ভারতীয় ছায়ানাট্য

সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ রূপক অর্থাৎ দৃশ্যকাব্যের স্বরূপ বর্ণনা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন—'নাট্যং লোকানুকৃতিঃ'। বাঙালী কবির ভাষায় বলিতে গেলে—'জীবনের জীবন্ত অনুকরণ নাট্য'। মানব-জীবনের ন্যায় নাট্যের স্বরূপও একটি বিরাট প্রহেলিকা মাত্র। এই জন্যই প্রাচীন ভারতে দৃশ্যকাব্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে গবেষণা করিতে যাইয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্য গবেষকমণ্ডলী যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহার কোনটিই এ পর্য্যন্ত পর্য্যাপ্ত বলিয়া বিবেচিত হইল না।

প্রাচীন ভারতে দৃশ্যকাব্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে কয়েকটি প্রসিদ্ধ মতবাদ 'মাসিক বসুমতীর' পৃষ্ঠায় পূর্ব্বেই প্রদান করা হইয়াছে (১)। কিন্তু ইহা ছাড়াও এ সম্বন্ধে উদ্ভট মতবাদের সংখ্যাও বড় অল্প নহে।

কেহ কেহ (যথা, অধ্যাপক পিশেল) বলিয়া থাকেন যে, পুতুলনাচ হইতে ভারতীয় দৃশ্যকাব্যের উৎপত্তি হইয়াছে। পিশেলের (Pischel) মতে—ভারতবর্ষই পুতুলনাচের আদি জন্মভূমি। ভারত হইতেই ইহা পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার সিদ্ধান্তের সমর্থক প্রমাণও উপস্থাপিত করিতে তিনি ছাড়েন নাই। যিনি স্বয়ং দর্শকবৃন্দের চক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া সূত্র ধারণপূর্ব্বক পুত্তলিকাগুলিকে নাচাইতেন, তাঁহার নাম 'সূত্রধার' হওয়াই স্বাভাবিক। পুতুলনাচের যিনি অধ্যক্ষ, তিনিই প্রকৃতপক্ষে 'সূত্রধার'। ক্রমশঃ যখন পুরাদস্তর নাট্যাভিনয়ের প্রারম্ভ হইল, তখনও নাট্যাধ্যক্ষ এই 'সূত্রধার' নামেই কথিত হইতে লাগিলেন।

আবার অপরে (যথা, অধ্যাপক ল্যুডার্স) মনে করেন যে, 'ছায়ানাট্য'ই ভারতীয় নাট্যের উৎপত্তির প্রধান উপাদান। অধ্যাপক ষ্টেন কোনোর (Sten Konow) মতও অনেকটা ইহার অনুরূপ। তিনি বলেন, উৎপত্তির জন্য না হউক—ভারতীয় নাট্যের পরিপুষ্টির জন্যও—ছায়ানাট্য বহু পরিমাণে দায়ী।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, মহাভাষ্যকার ভগবান্ পতঞ্জলির (খ্রীঃ-পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগ) গ্রন্থে তিন শ্রেণীর শিল্পীর নাম দৃষ্ট হয়—(১) শোভনিক বা শৌভিক, (২) গ্রন্থিক ও (৩) চিত্রকর (২)। অধ্যাপক ল্যুডার্স (Ludors) মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই শৌভিকগণ ছায়াচিত্র প্রদর্শন ও তাহার ব্যাখ্যা করিতেন। আজকাল যেরূপ ম্যাজিক লণ্ঠন সহযোগে বক্তৃতা দেওয়া হয়, এ যেন অনেকটা সেইরূপ ব্যাপার। এরূপ অর্থ কতদূর সম্ভব বা সঙ্গত, তাহা বলা অত্যন্ত কঠিন। কারণ, প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের কোন স্থলে ছায়ানাট্যের উল্লেখ পাওয়াই যায় না। তবে মধ্যযুগের ভারতে যে ছায়ানাট্যের সন্ধান পাওয়া যায়, এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য। মহাভাষ্যের টীকাকার কৈয়ট (খ্রীঃ ১০ম-১১শ শতাব্দী) অবশ্য 'শৌভিক' শব্দের অর্থ করিয়াছেন—'কংসাদির অনুকরণকারী নটগণের ব্যাখ্যানোপাধ্যায়।' কৈয়টের উক্তি বেশ স্পষ্ট নহে। অধ্যাপক সিল্ভ্যাঁ লেভি উহার অর্থ বুঝিয়াছেন যে, শৌভিকগণ কংসাদির অনুকরণকারী নটবৃন্দকে অভিনয়-শিক্ষা দিতেন; অর্থাৎ এক কথায়—'শৌভিক' 'নাট্যাচার্য্যে'র স্থানীয়। অধ্যাপক ল্যুডার্স ইহার প্রতিবাদকল্পে বলিয়াছেন, না, তাহা নহে। মূক অভিনেতৃবৃন্দের ক্রিয়াকলাপ যাঁহারা দর্শকবৃন্দকে ভাষার সাহায্যে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতেন, তাঁহারাই শৌভিক। অধ্যাপক হ্বিন্‌তের্‌নিজও (Winternitz) ল্যুডার্সের মতের কিয়দংশ সমর্থন করিয়া থাকেন। কিন্তু বেবেরের (Weber) মতে শৌভিক মূকাভিনেতা (pantomime) মাত্র। বর্ত্তমানে অধ্যাপক কীথ (Keith) এই সিদ্ধান্তকেই খুব ফলাও করিয়া চালাইতেছেন। তিনি বলেন, কি শৌভিক—কি চিত্রকর—এই দুই দলের

(১) 'মাসিক বসুমতী', অগ্রহায়ণ ও ফাল্গুন ১৩৪৮, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৯।

(২) 'মাসিক বসুমতী,' জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৯।

কেহই মৌখিক ব্যাখ্যা বা বর্ণনা করিতেন না। শৌভিক-গণের অঙ্গবিক্ষেপ ও চিত্রকরগণের জীবনানুরূপ চিত্রই বাচিক অভিনয়ের অভাব পরিপূরণ করিত। মহাভাষ্যের মূল অংশ ও হরদত্তের গ্রন্থ হইতে তিনি স্বমত সমর্থনের চেষ্টা পাইয়াছেন (৩)

যাহাই হউক, ল্যুডার্সের মতে—শৌভিকগণ মূকাভিনয় অথবা ছায়াচিত্রাভিনয়ের বস্তুভাগ (plot) দর্শকগণকে বুঝাইয়া দিতেন। মূকাভিনয়ে বা ছায়াচিত্রাভিনয়ে বাচিকাংশের অভাব থাকে। মহাভাষ্যের যুগে শৌভিকগণ এই অভাবটুকু পূর্ণ করিতেন। অবশ্য বর্ত্তমানে ভারতের নানা প্রদেশে (যথা—বোম্বাই ও মথুরায়) এই ধরণের অভিনয় প্রচলিত আছে বলিয়া জানা যায়। কিন্তু মহাভাষ্য-রচনার যুগেও প্রাচীন ভারতে যে এরূপ অভিনয়-প্রথা প্রচলিত ছিল, ইহার প্রমাণ দেওয়া বর্ত্তমানে অসম্ভব। তথাপি অধ্যাপক ল্যুডার্স সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, প্রাচীন ভারতের সর্ব্বত্রই রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতির আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে ছায়াচিত্র প্রদর্শিত হইত। আর এই ছায়াচিত্র-প্রদর্শনই শৌভিকগণের জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় ছিল।

অধ্যাপক কোনো ছায়ানাট্যের প্রাচীনতা প্রতিপাদন করিতে যাইয়া বলিয়াছেন, সম্রাট্ অশোকের চতুর্থ শিলালেখে ব্যবহৃত 'রূপ' শব্দটি হইতে ছায়াচিত্র প্রদর্শনের আভাস পাওয়া যায়। দৃশ্যকাব্যেরই একটি পর্য্যায় শব্দ 'রূপক' (drama)। এই রূপকের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতে যাইয়া কোনো বলিয়াছেন, ছায়া-সম্পাতের (shadow-projection) নামই 'রূপক'। রামগড় পাহাড়ের 'সীতাবেঙ্গা' গুহার দ্বারদেশে যে দুইটি গর্ত্ত আছে, তাহা লইয়া বহু আলোচনার পর তিনি অনুমান করিয়াছেন যে—উহাদিগের সাহায্যে গুহার দ্বারদেশে পরদা খাটান হইত, ও ঐ পরদার উপর ছায়া-সম্পাতন করিয়া ছায়ানাট্য প্রদর্শিত হইত। 'নেপথ্য' (যবনিকার অন্তরালস্থিত সাজঘর) শব্দটি হইতেও তিনি পরদা ও তাহার উপর ছায়া-সম্পাতের ইঙ্গিত খুঁজিয়া পাইয়াছেন। কিন্তু এই সকল যুক্তির কোনটিই দৃঢ় প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে।

অধ্যাপক পিশেলও ছায়ানাট্যের প্রাচীনতা প্রমাণের জন্য বহু চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মতে—'থেরীগাথা'য় (৫।৩৯৪) যে 'রূপ্পরূপকম্' শব্দটি আছে, উহা হয় পুতুল-নাচ—নয় ভোজবাজি। 'মিলিন্দপঞ্হ' গ্রন্থের 'রূপদক্খ' শব্দটি নাট্যসংক্রান্ত কোন অর্থ প্রকাশ করে কি না, সে সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রশ্নের অবসর আছে। সীতাবেঙ্গা গুহার পার্শ্ববর্ত্তী 'জোগীমারা' গুহার শিলালেখে ব্যবহৃত 'লুপদখে' (সংস্কৃত 'রূপদক্ষ'?) শব্দটি হইতেও তৎকালে ছায়ানাট্যের অস্তিত্ব নিঃসন্দেহে অনুমান করা চলে না (৪)।

মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে (বঙ্গবাসী সংস্করণ, ২৯৪।৫) 'রঙ্গাবতরণ' ও 'রূপোপজীবন' বলিয়া দুইটি শব্দ দৃষ্ট হয়। টীকাকার নীলকণ্ঠ (খ্রীঃ ১৭শ শতাব্দী) শব্দ দুইটির অর্থ করিয়াছেন—"রঙ্গে স্ত্র্যাদিবেশেণাবতরণং, রূপোপজীবনং জলমণ্ডপিকেতি দাক্ষিণাত্যেষু প্রসিদ্ধং, যত্র সূক্ষ্মং বস্ত্রং ব্যবধায় চর্ম্মময়ৈরাকারৈ রাজামাত্যাদীনাং চর্য্যা প্রদর্শ্যতে"। অর্থাৎ—'রঙ্গাবতরণ' শব্দের অর্থ রঙ্গমঞ্চে স্ত্রীলোক প্রভৃতির বেশধারণ পূর্ব্বক অভিনয়ার্থ অবতরণ; আর 'রূপোপজীবন' শব্দটি জলমণ্ডপিকা, নামে দাক্ষিণাত্যে প্রসিদ্ধ—তথায় পাত্লা কাপড়ের পরদা মাঝখানে আড়াল দিয়া চর্ম্মনির্ম্মিত প্রতিকৃতির দ্বারা রাজা, মন্ত্রী প্রভৃতির কার্য্য-কলাপ প্রদর্শিত হইয়া থাকে। ইহা হইতেও স্পষ্ট বুঝিয়া উঠা যায় না যে, 'রূপোপজীবন' বলিতে কি বুঝায়—ছায়া-সম্পাতের দ্বারা অভিনয় অথবা পুতুলনাচ? তর্কের খাতিরে না হয় ধরিয়া লওয়া গেল যে, যখন পাত্লা পরদা খাটাইবার কথা নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন—তখন উহার উপর ছায়া-সম্পাতই তাঁহার গূঢ় অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু তাহা হইলেও এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, নীলকণ্ঠ আধুনিক যুগের লোক। তাঁহার সময়ে যে সকল প্রথা ভারতে প্রচলিত হইয়াছিল,

(৩) পাণিনিসূত্র—৩।১।২৬ মহাভাষ্য; হরদত্তের 'পদমঞ্জরী' (৩।১।২৬) বারাণসী সংস্করণ, পৃঃ ৫৩৯। হরদত্ত 'গ্রন্থিকে'র পরিবর্ত্তে 'কাথিক' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহা হইতেও বুঝা যায় যে, এক ইহারাই কথা কহিতেন—অন্য দুই শ্রেণীর ব্যক্তি কথা কহিতেন না।

(৪) রবীন্দ্রনাথ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির মতে 'লুপদখে' বা 'রূপদক্ষ' শব্দটির অর্থ 'শিল্পী'। কিন্তু পারিপার্শ্বিকতার আলোচনায় আমাদিগের মনে হয়, শব্দটির অর্থ 'নাট্যশিল্পী'। এ সম্বন্ধে বহুদিন পূর্ব্বে লেখকের সহিত সুনীতি বাবুর বাদানুবাদ হয় ও একাধিক পত্রিকায় নানারূপ প্রবন্ধাদিও লিখিত হইয়াছিল।

অতি প্রাচীন যুগেও যে সে সকল প্রথা সেই আকারে বর্ত্তমান ছিল, তাহার প্রমাণ কোথায়? পাশ্চাত্য পণ্ডিত-বর্গ ত স্বীকার করিতেই চাহেন না যে, নীলকণ্ঠ এ সকল ক্ষেত্রে প্রাচীন সাম্প্রদায়িক অর্থ কোন উপায়ে সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন। বিশেষতঃ, 'রূপোপজীবন' শব্দটির অব্যবহিত পূর্ব্বেই 'রঙ্গাবতরণ' শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা হইতে অনুমান হয় যে, দুইটি শব্দই রঙ্গালয় ও অভিনয়-ব্যাপারের সহিত সংশ্লিষ্ট। 'রূপোপজীবন' শব্দটির সহিত 'রূপাজীবা' গণিকা বা নটী ও 'জায়াজীব' শৈলুষের সম্বন্ধ যে অতি ঘনিষ্ঠ, ইহা অনুমান করিতে কোনও কষ্ট হয় না। মহাভারতে 'রঙ্গাবতরণ' ও 'রূপোপজীবন' গর্হিত কর্ম্ম বলিয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে। অতএব, শেষোক্ত শব্দটি হইতে নট-নটীগণের দুশ্চরিত্রতার (বিশেষতঃ নটস্ত্রীগণের দেহ পণ্য-করণরূপ ঘৃণ্য ব্যাপারের) আভাস যে একেবারেই পাওয়া যায় না—এ কথা বলা চলে না। বরাহমিহিরের (খ্রীঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম ভাগ) 'বৃহৎসংহিতা' গ্রন্থে (৫।৭৪) যে 'রূপোপজীবিন্' শব্দটি পাওয়া যায়, তাহা নিঃসন্দেহে নটকেই বুঝাইয়া থাকে। 'রত্নাবলী', 'প্রবোধচন্দ্রোদয়,' 'দশকুমার-চরিতের পূর্ব্বপীঠিকা'—প্রভৃতি যে সকল সংস্কৃত দৃশ্য ও শ্রব্য কাব্যে ঐন্দ্রজালিকের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ আছে, সে সকলের লক্ষ্য যে ছায়ানাট্যাভিনয়—তাহাও তত্তৎস্থল দর্শনে বুঝা যায় না। অতএব, ভারতীয় ছায়ানাট্যের প্রাচীনতা প্রতিপাদন করিবার পক্ষে পর্য্যাপ্ত প্রমাণ বর্ত্তমানে আমাদিগের হস্তে নাই—ইহাই অধিকাংশ পণ্ডিতের অভিমত।

তবে প্রাচীন যুগ ছাড়িয়া দিয়া মধ্যযুগে আসিলে দেখা যায় যে, তখন 'ছায়ানাট্য' আমাদিগের দেশে একেবারে অজ্ঞাত ছিল না। 'ছায়ানাটক' নামে এক শ্রেণীর সংস্কৃত দৃশ্যকাব্য বর্ত্তমানে মুদ্রিতও দেখিতে পাওয়া যায়। এগুলি সবই অবশ্য মধ্যযুগের রচনা। অধ্যাপক পিশেল ইহাদিগের ইংরেজী নাম দিয়াছেন—'Shadow-play' বা 'Shadow-drama.' যে কয়খানি 'ছায়ানাটক' অধুনা উপলভ্যমান, তাহাদিগের মধ্যে সুভটের 'দূতাঙ্গদ'ই বোধ হয় প্রাচীনতম। পিশেল সাহেব ইহাকেই পুরাদস্তুর 'Shadow-play' বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। পক্ষান্তরে, পরলোকগত সুপ্রসিদ্ধ প্রাচ্যতত্ত্ববিশারদ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় বলিয়াছেন যে, সংস্কৃত 'ছায়ানাটক' ও ইংরেজী 'Shadow-play' একই বস্তু নহে। তাঁহার মতে 'দূতাঙ্গদ' জাতীয় দৃশ্যকাব্য অন্য কোন একখানি বড় রূপকের অঙ্কদ্বয়ের অভিনয়ের মধ্যবর্ত্তী বিরামকালে অভিনীত হইত (Entr'acte)। যদি 'ছায়ানাটক' শব্দের এরূপ কোন অর্থ করা যায়,—যে নাটক ছায়াকারে বর্ত্তমান—পূর্ণাঙ্গ নাটক নহে—তাহাই 'ছায়া-নাটক'—অর্থাৎ অল্পকালের মধ্যে অভিনয় সমাধা করিবার জন্য যাহাকে কমাইয়া ছোট করিয়া ফেলা হইয়াছে—তাহা হইলে হয় ত রাজা রাজেন্দ্রলালের ব্যাখ্যার কতকটা সঙ্গতি রক্ষিত হইতে পারে। কিন্তু 'দূতাঙ্গদ' গ্রন্থখানির আলোচনা করিলে তাহাতে ছায়ানাটকের উল্লিখিত কোন বৈশিষ্ট্যও দেখিতে পাওয়া যায় না। ১২৪৩ খ্রীষ্টাব্দে অণহিলবাড়ের চালুক্য রাজা ত্রিভুবন-পালের রাজসভায় স্বর্গত কুমারপালদেবের স্মৃতিতর্প-ণোৎসবে (৫) ইহা অভিনীত হইয়াছিল। দূতাঙ্গদের একাধিক সংস্করণ থাকিলেও মাত্র দুইটিই খুব প্রসিদ্ধ। উহার একটি বড় ও অপরটি ছোট। বড়খানিতে কাব্যাংশ প্রচুর—শুধু প্রস্তাবনাটিই উনচল্লিশটি শ্লোকে পূর্ণ। সীতার সন্ধান লইয়া আসিবার পর হনুমান্ ও শ্রীরামচন্দ্রের মধ্যে যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহাতেই প্রস্তাবনার কলেবর পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কাব্যমালা সংস্করণের দূতাঙ্গদখানি স্বল্পকায়।

দূতাঙ্গদ নাটকের আখ্যানাংশ জটিল নহে। সীতা-প্রত্যর্পণের দাবী সহ অঙ্গদকে রাম দূতরূপে রাবণের নিকট পাঠাইয়াছেন। তথায় রাবণ-সৃষ্টা এক মায়াসীতা অঙ্গদকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছে যে, রাবণের প্রতি তাহার অনুরাগ জন্মিয়াছে। অঙ্গদ কিন্তু এ কপটতায় ভুলিবার পাত্র নহেন। তিনি রাবণকে বিশেষ তিরস্কার করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। পরে যথাকালে রাবণবধান্তে রামচন্দ্র সীতাদেবীর

(৫) অণহিলওয়ারা বা অণহিলবাড় অথবা অণহিলপাটক—নামান্তর পাটন, গুজরাটে অবস্থিত। কুমারপাল জৈন পণ্ডিত হেমচন্দ্র সূরির (খ্রীঃ ১০৮৮-১১৭২) সমকালবর্ত্তী। দূতাঙ্গদের প্রস্তাবনার অংশবিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল—"......মহারাজাধিরাজশ্রীমত্রি-ভুবনপালদেবস্য পরিষদাজ্ঞয়া প্রবন্ধবিশেষমহমুপক্রমমাণোঽস্মি।... ...অদ্য বসন্তোৎসবে দেবশ্রীকুমারপালদেবস্য যাত্রায়াং......শ্রীসুভটেন বিনির্ম্মিতং দূতাঙ্গদং নাম ছায়ানাটকমভিনেতব্যম্" (দূতাঙ্গদ—কাব্যমালা)।

উদ্ধারসাধন করিলেন। ইহাই দূতাঙ্গদের বস্তুভাগ। বাঙালী কবি কৃত্তিবাসের 'অঙ্গদরায়বারে'র সহিত এই ছায়ানাটকখানির বেশ তুলনা চলিতে পারে।

দূতাঙ্গদ ব্যতীত আরও একখানি ছায়ানাট্যের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। উহা মেঘপ্রভাচার্য্য-বিরচিত 'ধর্ম্মাভ্যুদয়'। মূল গ্রন্থমধ্যেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, উহা 'ছায়ানাট্য-প্রবন্ধ'। উহার stage-directionএর এক স্থানে পুতুলের (পুত্রক) উল্লেখ স্পষ্ট দৃষ্ট হয়। ছায়ানাট্য যে কি পদার্থ, তাহা এই গ্রন্থখানি হইতে কিছু কিছু বুঝা যায়। ইহার stage-directionএ পরিষ্কার বলা হইয়াছে যে—রাজা যখন সন্ন্যাস গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করিবেন, তখন যবনিকা-স্তরালে একটি সন্ন্যাসিবেশধারী পুত্তলিকা রাখিয়া দিতে হইবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, ধর্ম্মাভ্যুদয়ের রচনাকাল নির্ণয় করিবার উপযুক্ত উপাদান বর্ত্তমানে দুর্লভ। নীলকণ্ঠ যে 'জলমণ্ডপিকা'র উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা ধর্ম্মাভ্যুদয় জাতীয় ছায়ানাট্যের ক্রম-পরিণত রূপান্তর কি না বলা কঠিন।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে ব্যাস শ্রীরামদেব তিনখানি ছায়ানাট্য রচনা করেন। রায়পুরের কলচুরি রাজগণ ইঁহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। প্রথমখানির নাম 'সুভদ্রা-পরিণয়ন'—ব্রহ্মদেব বা হরিব্রহ্মদেবের অধীনে ইহা লিখিত হয়। দ্বিতীয়খানি 'রামাভ্যুদয়'—মহারাণা মেরুর উৎসাহে রচিত। লঙ্কাকাণ্ডের ঘটনা ইহার বস্তুভাগ। তৃতীয়খানি 'পাণ্ডবাভ্যুদয়'—রণমল্লদেবের রাজ্যকালে উহার সমাপ্তি হয়। দ্রৌপদীর জন্মকথা ও স্বয়ংবর অবলম্বনে ইহা লিখিত। প্রস্তাবনা-মধ্যে ছায়ানাট্য নামে অভিহিত হইয়াছে বলিয়াই এগুলিকে ছায়ানাটকের শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়া থাকে। নতুবা সাধারণ নাটক হইতে ইহাদিগের পার্থক্য বা বৈশিষ্ট্য কোথায়, তাহা ধরা যায় না।

এই গ্রন্থগুলি ছাড়া আর একখানি আধুনিক ছায়া-নাটক সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে। মহেশ্বরের পুত্র শঙ্কর-লাল ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে উহা রচনা করেন। গ্রন্থখানির নাম 'সাবিত্রী-চরিত'। উহারও প্রস্তাবনায় উল্লিখিত হইয়াছে যে, উহা 'ছায়ানাটক'। এতদ্ব্যতীত উহারও অন্য কোন বৈশিষ্ট্য দৃষ্টিগোচর হয় না।

অধ্যাপক ল্যুডার্স 'মহানাটক' ও 'হরিদূত'কেও ছায়ানাট্য বলিতে চাহেন। কারণস্বরূপে তিনি দেখাইয়াছেন যে, দূতাঙ্গদে ও মহানাটকে বহু সাম্য আছে। উভয় গ্রন্থেই পদ্যাংশ প্রচুর, গদ্য চূর্ণক (prose dialogue) অতি অল্প। পদ্যাংশেও বর্ণনাত্মক কাব্যভাগ সমধিক, নাটকীয় ভাব প্রায় নাই বলিলেও চলে। প্রাকৃত পাঠ্যাংশ মোটেই নাই। চরিত্র বা ভূমিকা বহুসংখ্যক। নাটকের অপরিহার্য্য অঙ্গ—বিদূষকের একান্ত অভাব। কিন্তু এই সকল যুক্তির বিরুদ্ধে অন্ততঃ একটি ক্ষুদ্র যুক্তিও স্মরণ রাখা উচিত।—নিজেকে 'ছায়ানাটক' বলিয়া অভিহিত করা সত্ত্বেও যে 'দূতাঙ্গদে'র মধ্যে অন্য নাট্যরচনা হইতে বিশেষ কোন পার্থক্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, সেই দূতাঙ্গদের সহিত কোন কোন অংশে সাদৃশ্য থাকার জন্য মহানাটককে ছায়ানাট্য বলিতে যাওয়া সঙ্গত হইবে কি?

মহানাটক একটি অপরূপ দৃশ্যকাব্য। ইহারও অসংখ্য সংস্করণ—তন্মধ্যে দুইটি প্রধান। একটি মধুসূদনকৃত—নয় বা দশ অঙ্কে সমাপ্ত। অপরটি দামোদর-মিশ্রকৃত—চতুর্দ্দশ অঙ্কে সম্পূর্ণ। কিংবদন্তী আছে যে, স্বয়ং মহাবীর হনুমান্ নাটকখানির রচয়িতা। সেই জন্য নাটকখানির অপর নাম 'হনুমন্নাটক'। এককালে এই নাটকের প্রভাবে কবিগুরু বাল্মীকির 'রামায়ণ' পর্য্যন্ত ম্লান হইয়া উঠিয়াছিল। তখন কবিগুরুর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে হনুমান্ শিলাখণ্ডে খোদিত নিজ নাটকখানি সমুদ্রগর্ভে বিসর্জ্জন দেন। পরে ধারানগরাধিপতি ভোজদেবের (খ্রীঃ ১১শ শতাব্দী) আদেশে সমুদ্রগর্ভ হইতে প্রস্তরখণ্ডগুলির উদ্ধার করা হয়। টীকাকার মোহনদাস ও ভোজপ্রবন্ধ-রচয়িতা এই আখ্যানটির উল্লেখ করিয়াছেন। এই ঐতিহ্যের মূলে কতটুকু সত্য বিদ্যমান, বলা দুরূহ। কিন্তু মহানাটকের বহু শ্লোক ভবভূতি, মুরারি মিশ্র, রাজশেখর এমন কি, 'প্রসন্নরাঘব'-রচয়িতা জয়দেব প্রভৃতি কবির রচিত রামচরিত্র-বিষয়ক নাটকাবলী হইতে উদ্ধৃত বলিয়া বোধ হয়। আবার সুভটের দূতাঙ্গদেও ভবভূতি, রাজশেখর প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণের কয়েকটি শ্লোকও দেখিতে পাওয়া যায়—ইহা কবি স্বয়ং গ্রন্থান্তে স্বীকার করিয়াছেন।

'হরিদূত' নাটকখানিকেও ছায়ানাটক বলা চলে না। উহা নিজেকে 'ছায়ানাটক'রূপে অভিহিতও করে নাই।

দুর্য্যোধনসমীপে পাণ্ডবগণ-কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণকে দূতরূপে প্রেরণ—ইহাই আলোচ্য নাটকখানির বস্তুভাগ।

'মহানাটক' বা 'হরিদূত' ছায়ানাটক হউক বা না হউক, এই দুইখানি গ্রন্থকে কোনরূপেই পূর্ণাঙ্গ নাটক বলা চলিতে পারে না। কারণ, সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রাদিতে নাটকাদি রূপকাবলীর যে সকল লক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাদের কোনটিই এই দুইখানি গ্রন্থের প্রতি প্রযোজ্য হইতে পারে না। ইহারা না শ্রব্যকাব্য, না দৃশ্যকাব্য, কিন্তু উভয় শ্রেণীর মাঝামাঝি।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। ভবভূতির সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ নাটক 'উত্তররামচরিতে'র অংশবিশেষ ছায়ানাট্যের পর্য্যায়ভুক্ত হইতে পারে কি না, গবেষণার বিষয়। উত্তররামচরিত বা উত্তরচরিতেও নাটকীয় ভাব অপেক্ষা শ্রব্যকাব্যের ভাব অত্যধিক। ইহার গদ্যাংশ জটিল—নাটকের উপযোগী ভাষা নহে। প্রাকৃত অংশ সংস্কৃতগন্ধী। বিদূষক ইহাতেও নাই। হাস্যরস মাত্র দুইটি বা তিনটি স্থলে অতি অল্পমাত্রায় দৃষ্ট হয়। আর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আলোচ্য—ইহার তৃতীয় অঙ্কটি। ইহাতে ছায়াকারে সীতাদেবীর আবির্ভাব দেখাইবার বিধান আছে। ছায়ানাট্যের দিক্ হইতে দেখিলে উত্তরচরিতের এই 'ছায়াঙ্কে'র (তৃতীয়াঙ্কের) ও 'ছায়া সীতা'র নাটকীয় মূল্য বহু পরিমাণে বাড়িয়া যায়।

অনেকেই প্রশ্ন করিয়া থাকেন, ভবভূতির যুগে (যখন আধুনিকযুগ-সুলভ মায়াদর্পণাদির ব্যবহার-প্রথা ছিল না) এই 'ছায়াঙ্ক' কি কৌশলে রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইত? আমাদিগের মনে হয়, প্রাচীন যুগে যবনিকার উপর পশ্চাৎ হইতে আসল সীতার ছায়া-সম্পাতের দ্বারাই ছায়া-সীতার ভূমিকাভিনয় সম্পন্ন হইত। যবনিকার অন্তরালে অবস্থিতা সীতারূপিণী অভিনেত্রী কেবল নাটক অভিনয় করিয়া যাইতেন, আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ছায়া যবনিকার উপর পতিত হইয়া আঙ্গিক অভিনয়ের কার্য্য সমাধা করিত।

যদি আমাদিগের এই অনুমান সুধীজনের সমর্থনযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে মহাকবি ভবভূতির উত্তররামচরিতের তৃতীয়াঙ্কটিকেই ছায়ানাট্যের প্রাচীনতম নিদর্শন বলিয়া আপাততঃ ধরা যাইতে পারে। আর তাহা হইলে ভারতীয় ছাঁয়ানাট্যের প্রচারকাল অন্ততঃ খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রথম পাদে পিছাইয়া দেওয়া সম্ভব।

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী।

মেঘ-মগ্ন

মন্থন আজি মন্থন,
আকাশের মাঝে ঝাঁপাইয়া পড়ি'
দুই হাতে মেঘ-লুণ্ঠন।

বজ্র কুড়ায়ে তুলি' লই,
ছুঁড়ে দিই তাহা গোলকের মত,
তারি লাফে আমি মেতে রই।

কালো মেঘ আর শাদা মেঘ,
মেঘের নিবিড় বুকের মাঝারে
ছুটে যাই লয়ে গতি-বেগ।

মেঘ তোলে গুরু গর্জ্জন,
আমি লাফে লাফে তাল দিয়ে যাই,
করি উদ্দাম নর্ত্তন।

আঁধারে আঁধার চারিধার,
স্নিগ্ধ আঁধারে জুড়াইয়া যাই,
বুক মেলে ভাসি পারাপার।

ঝর ঝর ধারা ঝম্‌ঝম্
আমারে বিঁধিয়া ঘিরিয়া ঝরিছে
ঘন বারিধারা হর্‌দম।

মেঘে, বজ্রে ও বরষায়
তড়িতে আমারে ছড়াইয়া দিই,
দেহ মন প্রাণ ভেসে যায়।

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত।

ভারতে জাতীয় আন্দোলনে বাঙ্গালী

"বন্দেমাতরম্" মন্ত্রের উদ্ভব অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিতভাবে হয় নাই—তাহার কারণ ছিল। সে কারণ, বাঙ্গালার দীর্ঘকালব্যাপী জাতীয়তার সাধনা। সেই সাধনা মত-প্রকাশস্বাধীনতার বিরোধী প্রত্যেক ব্যবস্থার প্রতিবাদে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল এবং বাঙ্গালায় যেমন তাহার উদ্ভব, বাঙ্গালাতেই তেমনই তাহার বিকাশ।

দুই উপায়ে মানুষ—সুসভ্য মানুষ স্বাধীনভাবে মত-প্রকাশ করিতে পারে—কথায় ও লিখায়। বক্তৃতা যে অনেক ক্ষেত্রে রচনা অপেক্ষা অধিক কার্য্যকরী হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। রচনা এক জন একক পাঠ করে—বক্তৃতা বহু লোক একসঙ্গে শুনে এবং বহু লোক এক স্থানে একই উদ্দেশ্যে সমবেত হইলে উত্তেজনা সকলের মনে সংক্রমিত হয়। "There is the infectious excitement of a large audience." কিন্তু বক্তৃতা অল্প লোক শুনিতে পায়—রচনা বহু লোক পাঠ করে; সেই জন্যই স্বৈরশাসনে সংবাদপত্র দলনের চেষ্টা হয়। আমেরিকার একটি মোকদ্দমায় ইলিনয়েসের প্রধান বিচারক বলিয়াছিলেন :—

সভ্যতার প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বিষয়ে স্বাধীনতা লাভের জন্য সংগ্রামের মতই মতপ্রকাশ-স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম চলিয়াছে। ইতিহাসের শিক্ষা—অভাব অভিযোগ ব্যক্ত করিবার স্বাধীনতা ব্যতীত মানুষের স্বাধীনতা লাভ অসম্ভব। সভ্যতা যত অগ্রসর হইয়াছে এবং অভাব ও অভিযোগ ব্যক্ত করিবার উপায় বর্দ্ধিত হইয়াছে, ততই জনগণের সহিত তাহাদিগের স্বৈরশাসনবিলাসী শাসকদিগের সংগ্রাম প্রবল হইয়াছে। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই সংবাদপত্র প্রকাশ আরম্ভ হয় এবং তখনই সম্পাদকদিগের প্রতি অকথ্য অত্যাচারও আরম্ভ হয়।

বাস্তবিক সংবাদপত্রই দেশের লোকের স্বাধীনতার প্রহরী।

সেই জন্যই কবি মিলটন লিখিয়াছেন—"সকল বিষয়ে স্বাধীনতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্বাধীনতা—জানিবার, মত প্রকাশ করিবার এবং আমার বিবেকানুমোদিত ভাবে যুক্তি প্রকাশের স্বাধীনতা আমাকে দাও"। আর সেই জন্যই ১৮১০ খৃষ্টাব্দে শেরিডেন বলিয়াছিলেন—

"আমি যদি সংবাদপত্রের স্বাধীনতা লাভ করি, তবে আমি মন্ত্রিমণ্ডলকে উৎকোচের বশীভূত হাউস অব লর্ডস্ ও দুর্নীতিপরায়ণ, দাসমনোভাবসম্পন্ন হাউস অব কমন্স দিতেও ভয় করি না। তাঁহারা ইচ্ছানুসারে লোককে কাষ দিয়া বশীভূত করিতে পারেন। মন্ত্রীদিগের ক্ষমতা ও প্রভাব ব্যবহার করিয়া তাঁহারা বশ্যতা ক্রয় করিতে পারেন—বিরোধ স্তম্ভিত করিতে পারেন; কিন্তু সংবাদপত্রের স্বাধীনতা পাইলে সেই অস্ত্র লইয়া আমি তাঁহাদিগের সম্মুখীন হইতে ভয় করিব না। আমি তাঁহাদিগের ক্ষমতা আক্রমণ করিব এবং দুর্নীতির ধ্বংসসাধন করিব। "I will shake down from its height corruption and bury it beneath the ruins of the abuses it was meant to shelter."

বিচারক ম্যাককার্ডী বলিয়াছেন, লোকের মতগঠনে সংবাদপত্রের স্থান পার্লামেণ্টের স্থানের অনেক উর্দ্ধে।

স্বাধীন দেশেই যখন সংবাদপত্রের স্বাধীনতা শাসকদিগের শঙ্কার কারণ হয়, তখন পরাধীন দেশের কথা আর বলিবার প্রয়োজন নাই। পরাধীন দেশে সংবাদপত্রের সম্বন্ধে শাসক-সম্প্রদায়ের মনোভাব আয়ার্লণ্ডে ও ভারতবর্ষে আমরা প্রত্যক্ষ করি। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে ব্যবহার দেখা গিয়াছিল, আয়ার্লণ্ড স্বায়ত্তশাসন অর্জ্জনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহাই দেখা গিয়াছে—কেবল সময় সময় প্রকারভেদ হইয়াছে। ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দের ২২শে নভেম্বর লর্ড ময়রা পার্লামেণ্টে বলিয়াছিলেন, —একদল সৈনিক প্রকাশ্যভাবে দিবালোকে 'নর্দার্ণ ষ্টার' পত্রের কার্য্যালয়ে প্রবেশ করিয়া অক্ষর হইতে আরম্ভ করিয়া উহার সব সম্পত্তি নষ্ট করে। যাহাতে ভীতিবিপ্লব সংবাদপত্র অত্যাচারের সংবাদ প্রকাশ না করে, সেই জন্যই এইরূপ কার্য্য করা হইয়াছিল। এইরূপ কার্য্য পরেও হইয়াছে। ব্রিগেডিয়ার জেনারল ক্রোজিয়ার তাঁহার একখানি পুস্তকে ('Ireland

দ্বারকানাথ ঠাকুর

for Ever') ইহার তিনটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন এবং তিনি ভারতবাসীকে সতর্ক হইয়া প্রস্তুত হইবার জন্য যে পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন—'A Word to Gandhi—The Lesson of Ireland' তাহাতেও তিনি ১৯২০-২১ খৃষ্টাব্দে আয়ার্লণ্ডে বৃটিশ সরকারের নীতির কথা বলিয়াছেন—"The suppression of the Press—more particularly the local newspapers—was part and percel of the English policy of repression in Ireland in 1920—21, and went hand in hand with propaganda."

এ দেশে বর্ত্তমান সময়েও আমরা এই নীতির প্রচলন দেখিতেছি কি না, সে কথার আলোচনা এই স্থানে করিব না। কিন্তু সংবাদপত্র দলনের চেষ্টা যে এ দেশে বহুকাল পূর্ব্বে আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা ঐতিহাসিক সত্য।

১৭৮০ খৃষ্টাব্দে ইংরেজাধিকৃত ভারতবর্ষে প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। সে সংবাদপত্র কলিকাতায় প্রকাশিত হয় এবং তাহা প্রকাশের সঙ্গেসঙ্গেই শাসকদিগের সহিত সংবাদপত্রের সংগ্রাম আরম্ভ হয়। একাধিক সাংবাদিককে বিনাবিচারে নির্ব্বাসিত করা হয় এবং নানা বিধি-নিষেধে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করিবার চেষ্টা হয়। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে 'ক্যালকাটা জার্ণালের' সম্পাদক জেমস সিল্ক বাকিংহামকে নির্ব্বাসনের আদেশ প্রদান করিয়া একপক্ষ কালের মধ্যেই (১৫ই মার্চ্চ) সরকার সংবাদপত্র সম্বন্ধে যে নিয়ম বিধিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করেন, তাহার বিরুদ্ধে ৬ জন বাঙ্গালী ১৭ই মার্চ্চ সুপ্রিম কোর্টে আপত্তিজ্ঞাপক আবেদন করেন। এই ৬ জন—

চন্দ্রকুমার ঠাকুর
দ্বারকানাথ ঠাকুর
রামমোহন রায়

রামমোহন রায়

হরচন্দ্র ঘোষ
গৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রসন্নকুমার ঠাকুর

ইংরেজের আদালতে তাঁহাদিগের আবেদন অগ্রাহ্য হয়। কিন্তু তাহাতেই বুঝিতে পারা যায়, জাতির স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাঙ্গালী তখনই অগ্রহিত হইয়াছিলেন।

তৎকালীন ইংরেজ শাসকরা এ দেশে সভা বন্ধ করিবার আদেশ প্রচার করিলে বাঙ্গালীদিগের দ্বারাই তাহার প্রতিবাদ হইয়াছিল।

চন্দ্রকুমার ঠাকুর প্রমুখ আবেদনকারীদিগের আবেদন পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়, তাঁহারা এ দেশে সংবাদ-পত্রের প্রয়োজন ও উপযোগিতা বিশেষ ভাবে উপলব্ধি লিখিত হইত। তিনি স্বৈরশাসনের এতই বিরোধী ছিলেন যে, স্পেনে যখন নিয়মানুগ শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তিনি ও তাঁহার বন্ধু দ্বারকানাথ ঠাকুর এক-যোগে তাঁহাদিগের য়ুরোপীয় বন্ধুদিগকে এক সম্মিলনে আহ্বান করিয়া আনন্দ করেন।

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে রামমোহন বিলাতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন।

তাঁহার পর আমরা তাঁহার সহকর্মী দ্বারকানাথ ঠাকু-রের উল্লেখ করিতে পারি। দ্বারকানাথই মিষ্টার জর্জ্জ টমশনকে বিলাত হইতে এ দেশে আনয়ন করেন এবং রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ বাঙ্গালীরা তাঁহার নিকট বিলাতের প্রথানুযায়ী রাজনীতিক আন্দোলন শিক্ষা করেন। তাহা

প্রসন্নকুমার ঠাকুর

জর্জ্জ টমশন

দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়

করিয়াছিলেন। সংবাদপত্রের সাহায্যে দেশের লোকের মধ্যে সংবাদ ও জ্ঞানবিস্তারের প্রয়োজন তাঁহারা বিশেষ ভাবে অনুভব করিয়া প্রস্তাবিত বিধির প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

রামমোহন রায় যখন বিলাতে গমন করেন, তখন তিনি তথায় এ দেশের লোকের অবস্থা প্রভৃতি জ্ঞাপন করিয়া রাজনীতিক কায করেন। ফার্শী তখনও আদালতে ব্যবহৃত ভাষা। তিনি ঐ ভাষায় কলিকাতায় যে সংবাদ-পত্র প্রচার করেন, তাহাতে এ দেশের হিন্দু ও মুসলমান অধিবাসিগণকে শিক্ষাদানজন্য রাজনীতিক বিষয়ে প্রবন্ধ রামমোহনের মৃত্যুর দশ বৎসরের পরবর্ত্তী ঘটনা। রাম-গোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, তারাচরণ চক্রবর্ত্তী, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, কিশোরীচাঁদ মিত্র ও চন্দ্রশেখর দেব-প্রমুখ ব্যক্তিরা যে টমশনের সহিত আলোচনার ফলে রাজনীতিক কার্য্যে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতেই বুঝিতে পারা যায়, বাঙ্গালায় ইংরেজী-শিক্ষিত সমাজে তখন রাজনীতিক ভাব —দেশসেবার আগ্রহ আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল।

রামমোহন রায়ের মৃত্যুর অল্পকাল পূর্ব্বে রিকার্ডস নামক ইংরেজ লেখক তাঁহার স্বদেশীয়দিগকে সতর্ক করিয়া

দিবার জন্য যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলেই বুঝা যায়, তিনি ভারতবাসীর মনের ভাবপরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়াছিলেন ;—

"The schoolmaster is abroad with his primer, pursuing a course which no power can hereafter * * * arrest. Through the medium of schools, literary meetings, and printed books, all the learning and the science

রামগোপাল ঘোষ

of Europe will be greedily imbibed, and securely domiciled of the Hindoos of India."

তিনি বলিয়াছিলেন, যদি ইংরেজের শাসন-পদ্ধতি ও ব্যবহারের পরিবর্ত্তন না হয়, তবে এই জ্ঞানের ফলে ভারতবাসীর মনে যে শক্তির উদ্ভব হইবে, তাহা বাহুবলে দমিত করা যাইবে না। কারণ, শিক্ষিত লোকের ইচ্ছার ও স্বার্থের বিরোধী হইলে বাহুবল ব্যর্থ হয়।

জর্জ্জ টমশন ভারতবর্ষে না আসিয়া কিরূপে এ দেশের ব্যাপারে মনোযোগ দান করিতে আরম্ভ করেন, তাহা বলা যায় না। তবে অনুমান করা যায়, বিলাতে ওয়ারেন হেষ্টিংসের বিচারকালে বার্ক ও শেরিডেন যে সব বক্তৃতা প্রদান করেন, সেই সকল পাঠ করিয়া যে সকল ইংরেজের মনোযোগ ভারতবর্ষের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল, তিনি তাঁহাদিগের অন্যতম। তাহার পর যখন ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে এ দেশে দুর্ভিক্ষে বহু লোকের মৃত্যুর সংবাদ বিলাতে প্রকাশিত হয়, তখন তিনি সাগ্রহে ভারতবর্ষের বিষয়

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েন। কিন্তু তখনও তিনি ভারতবর্ষ হইতে বিলাতের পণ্যোপকরণ অধিক পরিমাণে সংগ্রহের উপায়-চিন্তায় অধিক মনোযোগী ছিলেন। কাফ্রীদিগের সম্বন্ধে আন্দোলন সাফল্যমণ্ডিত হইবার পর তিনি "আদিমনিবাসীদিগের রক্ষণ সমিতিতে" যোগ দেন এবং ভারতবাসীদিগের সম্বন্ধে সমধিক মনোযোগ দেন। কিন্তু তাঁহাকে অল্পদিনেই ঐ প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করিতে হয়; কারণ, তিনি বুঝিতে

পারেন, ভারতবর্ষের বিষয় আলোচনার জন্য একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন। তিনি ভারতবাসীর কল্যাণ-সাধনকল্পে "বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটী" প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিবার জন্য একটি সমিতি গঠিত করেন। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে এই সমিতি গঠিত হয়—জুলাই মাসে যে সভায় ইহার প্রতিষ্ঠা ঘোষিত হয়, লর্ড ব্রুহাম তাহাতে সভাপতিত্ব করেন। তাঁহার বক্তৃতায় আকৃষ্ট হইয়া বহু ইংরেজ ভারতবর্ষের অবস্থা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে মনোযোগী হয়েন এবং ঐ সমিতির দৃষ্টান্তে ইংলণ্ডে ও স্কটলণ্ডে কয়টি সমিতি গঠিত হয়। তিনি বক্তৃতায় যে সব কথা

প্যারীচাঁদ মিত্র

'ভারতে ইংরেজ-প্রবর্ত্তিত ব্যবস্থার' সমর্থনে প্রবন্ধ প্রকাশ আরম্ভ হয়। সেইজন্য টমশন নিজমত প্রকাশকল্পে 'বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এডভোকেট' নামক মাসিকপত্র প্রচার করেন। তিনি যখন বিলাতে রাজনীতিক্ষেত্রে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তখন দ্বারকানাথ ঠাকুর বিলাতে গমন করেন এবং তাঁহাকে ভারতে যাইয়া প্রকৃত অবস্থা প্রত্যক্ষ করিতে অনুরোধ করেন। সেই অনুরোধে তিনি এ দেশে আগমন করেন এবং বলা বাহুল্য, কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া কার্য্য আরম্ভ করেন। তখনও এ দেশে কোন উল্লেখযোগ্য রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান ছিল না

তারাচরণ চট্টোপাধ্যায়

কিশোরীচাঁদ মিত্র

এডমণ্ড বার্ক

প্রচার করিতে থাকেন, সে সকল বাদপ্রতিবাদের বিষয় হয় এবং 'এডিনবরা রিভিউ' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পত্রে এবং কলিকাতার উত্তরাংশে সভার উপযুক্ত গৃহেরও অভাব ছিল। মাণিকতলায় বাবু শ্রীকৃষ্ণ সিংহের যে

উদ্যানগৃহ ছিল, তাহাতেই প্রথমে রামগোপাল প্রমুখ যুবকরা সমবেত হইয়া টমশনের বক্তৃতা শুনিতেন ও তাঁহার সহিত রাজনীতিক বিষয়ের আলোচনা করিতেন। মাণিকতলায় তখন গতায়াতের সুবিধা ছিল না বলিয়া পরে ডাক্তার দ্বারকানাথ গুপ্ত ও ডাক্তার গৌরীশঙ্কর মিত্রের "গুপ্ত-মিত্র কোম্পানী" নামক ডাক্তারখানা যে গৃহে (৩১নং ফৌজদারী বালাখানা) প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহারই দ্বিতলে সভা আরম্ভ হয়। এই দুই জন সে বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন।

এই স্থানেই যে "বেঙ্গল বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটী" প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা পরে "ল্যাণ্ডহোল্ডার্স সোসাইটীর" সহিত সম্মিলিত হইয়া "বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনে" পরিণত হয়। যে দিন ফৌজদারী বালাখানার গৃহে প্রথম সভাধিবেশন হয়, সেই দিন টমশন তাঁহার বক্তৃতায় বলেন, এ দেশে ইংরেজের অনুসৃত নীতি কেবল ইংরেজের স্বার্থের জন্যই প্রবর্ত্তিত হয় নাই, পরন্ত তাহাতে দৃষ্টিশক্তির অভাব লক্ষিত হয়; বহুদিন এ দেশে যাহারা আসিয়াছে, সেই সকল দলের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এ দেশ শাসন করা হইয়াছে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ বাঙ্গালী হিন্দু যুবকরা টমশনের আগমনে বিশেষ উপকৃত হইয়াছিলেন। টমশন সে বার অধিক দিন এ দেশে অবস্থান করেন নাই। সাতারার ভূতপূর্ব্ব রাজা তখন বারাণসীতে ছিলেন। টমশন তাঁহার পক্ষাবলম্বন করেন এবং দিল্লীর বাদশাহের দূত হইয়া বিলাতে গমন করেন। তাহার পর ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে তিনি পুনরায় এ দেশে আসিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী-বিপ্লবের সময় স্বদেশে চলিয়া যায়েন। মধ্যে তিনি পার্লামেণ্টের সভ্যও হইয়াছিলেন। তিনি যখন দ্বিতীয় বার এ দেশে আগমন করেন, তখন রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ ব্যক্তিরা রাজনীতিক আন্দোলনের দ্বারা এ দেশে নূতন রাজনীতিক জীবন-সঞ্চারের পরিচয় দিতেছেন।

পরমেশ্বরম্ পিলাই তাঁহার 'প্রতিনিধিস্থানীয় ভারতীয়দিগের' বিবরণে এ দেশে রাজনীতিক কার্য্যে খ্যাতিলাভকারীদিগের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে রামগোপাল ঘোষের নামোল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, রামগোপাল তাঁহার সময়ে রাজনীতিক কার্য্যের প্রাণস্বরূপ ছিলেন। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে যে ৪খানি আইনের খশড়া প্রকাশিত হওয়ায় এ দেশে স্বাধিকারপ্রমত্ত ইংরেজরা "গেল রাজ্য, গেল মান" বলিয়া ক্ষিপ্তবৎ হইয়া ঐগুলিকে "ব্ল্যাক" আইন নামে অভিহিত করে, সেগুলির প্রতিবাদকল্পে সভা করিলে রামগোপাল এক পুস্তিকায় সেগুলির সমর্থন করেন। তাঁহার কার্য্যে বিরক্ত ইংরেজরা অন্য কোনরূপে তাঁহাকে ক্ষতিগ্রস্ত করিতে না পারিয়া "এগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটীর" সহকারী সভাপতির পদ হইতে তাঁহাকে অপসারিত করিয়া গাত্রদাহ নিরারণের চেষ্টায় আপনাদিগের হীনতারই পরিচয় দেয়। রামগোপাল বিদেশে ভারতের অবস্থা জ্ঞাত করিবার আয়োজন করেন।

রামগোলাল যেমন বক্তৃতায় হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তেমনই সংবাদপত্রে প্রবন্ধে নবভাবের বিস্তার করেন। হরিশচন্দ্র দরিদ্রের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এক দিন গৃহে তণ্ডুলের অভাবে তিনি যখন একখানি পিত্তলের থালা বন্ধক দিতে যাইতেছিলেন, সেই সময় কোন জমিদারের কর্ম্মচারী একখানি দলিলের অনুবাদ করাইয়া পারিশ্রমিকরূপে তাঁহাকে ২টি টাকা দিলে, সে দিনের মত পরিবারের অন্ন-সংস্থান হয়। তাহার পর তিনি কোন সওদাগরের প্রতিষ্ঠানে মাসিক ১০ টাকা বেতনে "বিল" লিখিবার কাযে নিযুক্ত হয়েন এবং শেষে সরকারের হিসাব বিভাগে মাসিক ৪ শত টাকা বেতনে পদ পায়েন। কলিকাতার প্রধান অধিবাসীরা যখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ছাড় পুনরায় প্রদানে আপত্তি জ্ঞাপন করেন, তখন তাঁহাদিগের আবেদন রচনার ভার হরিশচন্দ্রকে প্রদান করা হয়। সে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের কথা। সেই বৎসর গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও তাঁহার দুই ভ্রাতা 'হিন্দু পেট্রিয়ট' প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রতিষ্ঠার ২ বৎসরের মধ্যেই উহা হরিশচন্দ্রের হস্তগত হয় এবং প্রসিদ্ধি লাভ করে।

পিলাই মহাশয় বলিয়াছেন—"হরিশচন্দ্রকে এ দেশে ভারতীয়দিগের সংবাদপত্র পরিচালনার জনক বলা যায়। যে সংবাদপত্র তাঁহাদিগের অধিকার লাভের জন্য চেষ্টা করে—তিনিই দেশবাসীকে তাহার প্রভাব অনুভব করান।" মাত্র ৩৬ বৎসর বয়সে হরিশচন্দ্রের মৃত্যু হয়। পিলাই মহাশয় স্থানান্তরে বলিয়াছেন—হরিশচন্দ্র "was the first native journalist of any note in India."

প্রবল নীলকরদিগের অত্যাচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া হরিশচন্দ্র দরিদ্রের অধিকার রক্ষার জন্য দেশের লোকের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

ইহাতেই দেখা যায়, যে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা-সঙ্কোচে রামমোহন প্রভৃতি আপত্তি করিয়াছিলেন, সেই সংবাদ পত্রকে প্রভাবশালী করাও বাঙ্গালীর কীর্ত্তি।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে হরিশচন্দ্রের মৃত্যু হয় এবং ঐ বৎসরেই গিরীশচন্দ্র ঘোষ 'বেঙ্গলী' প্রতিষ্ঠিত করেন। এই 'বেঙ্গলীই' অবশেষে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচারবেদী হইয়াছিল। গিরীশচন্দ্রের জাতীয়তার ভাব তাঁহাকে সামাজিক ব্যবস্থার প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন করিয়াছিল। আমরা তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ২৫শে মার্চ্চ হাইকোর্টের বিচারক সার জন বাড ফিয়ার এক বক্তৃতায় এইরূপ মত প্রকাশ করেন যে, ভারতীয় মহিলারা সংস্কৃতিবর্জ্জিতা। গিরীশচন্দ্র তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলেন—ভারতীয় মহিলাদিগের শিক্ষা ও সংস্কৃতি নাই, এই মত সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত। জ্ঞানে হিন্দু মহিলাদিগকে বঞ্চিতা রাখা হয় না; তবে তাঁহাদিগকে শিক্ষা প্রদানের পদ্ধতি য়ুরোপীয়রা অবগত নহেন। হিন্দু পুরাঙ্গনাদিগকে শিক্ষাদানের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা আছে। সে জন্য মধ্যে মধ্যে ব্রাহ্মণ "কথকরা" গৃহের প্রাঙ্গনে বসিয়া মহিলাদিগের শিক্ষার জন্য রামায়ণ ও মহাভারত প্রভৃতি হইতে কোন কোন অংশ পাঠ করিতেন। তখন গৃহদেবতাকে তথায় আনয়ন করা হইত। দলে দলে মহিলারা সেই শিক্ষাকেন্দ্রে সমবেত হইতেন। সতীত্বের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইত এবং তথায় যে গাম্ভীর্য্য পরিলক্ষিত হইত, খৃষ্টানদিগের গির্জ্জায় তাহা দেখা যায় না। * * * অবরোধপ্রথা হিন্দু সমাজে স্বাভাবিক নহে—মুসলমান-শাসকদিগের ব্যবহারেই হিন্দুদিগকে তাহা গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। এ দেশে কোন কোন ইংরেজের ব্যবহারে মনে হয়, এখনও হিন্দু মহিলা-দিগকে শুদ্ধান্ত হইতে বাহিরে প্রকাশ্য সমাজে আনয়ন করা নিরাপদ কি না, সন্দেহ।

এই "কথকতা" সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—

গিরীশচন্দ্র ঘোষ

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মনোমোহন বসু

"(বাঙ্গালায়) লোকশিক্ষার উপায় ছিল, এখন আর নাই। একটা লোকশিক্ষার উপায়ের কথা বলি—সেদিনও ছিল—আজ আর নাই। কথকতার কথা বলিতেছি। গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, বেদীপিঁড়ির উপর বসিয়া ছেঁড়া তুলট, না দেখিবার মানসে সম্মুখে পাতিয়া, সুগন্ধী মল্লিকামালা শিরোপরে বেষ্টিত করিয়া * * * কথক সীতার সতীত্ব, অর্জ্জুনের বীরধর্ম্ম, লক্ষ্মণের সত্যব্রত, ভীষ্মের ইন্দ্রিয়জয়, রাক্ষসীর প্রেমপ্রবাহ, দধীচির আত্মসমর্পণ বিষয়ক সুসংস্কৃতের সদ্ব্যাখ্যা সুকণ্ঠে সদলঙ্কার সংযুক্ত করিয়া আপামর সাধারণ সমক্ষে বিবৃত করিতেন। যে লাঙ্গল চষে, যে তুলা পেঁজে, যে কাটনা

কাটে, যে ভাত পায় না পায়, সে-ও শিখিত—শিখিত যে ধর্ম্ম নিত্য, যে ধর্ম্ম দৈব, যে আত্মান্বেষণ অশ্রদ্ধেয়, যে পরের

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

জন্য জীবন, যে ঈশ্বর আছেন—বিশ্ব সৃজন করিতেছেন, বিশ্ব পালন করিতেছেন, বিশ্ব ধ্বংস করিতেছেন, যে পাপ-পুণ্য আছে, যে পাপের দণ্ড হয়, পুণ্যের পুরস্কার আছে, যে জন্ম আপনার জন্য নহে—পরের জন্য, যে অহিংসা পরম ধর্ম্ম, যে লোকহিত পরম কর্ম্ম।”

স্বদেশী আন্দোলনের সময় যেমন মুকুন্দ দাস যাত্রায় জাতীয়ভাব প্রচার করিতেন—আপামর সাধারণ তাহা শুনিত, তেমনই জাতীয়ভাবের প্রথম প্রকাশকালে বাঙ্গালা যাত্রার মধ্য দিয়া সেই ভাবের প্রকাশ-ব্যবস্থা করিয়াছিল। মনোমোহন বসুর যে “দিনের দিন সবে দীন, হ'য়ে পরাধীন” গানের উল্লেখ আমরা পূর্ব্বে করিয়াছি, তাহা ‘হরিশ্চন্দ্র নাটকে’ দীর্ঘকাল বাঙ্গালার গ্রামে গ্রামে গীত হইবার পর স্বদেশী আন্দোলনের সময় পুলিসের নির্দ্দেশে নিষিদ্ধ হয়। ঐ নাটকেই করের বাহুল্যে প্রতিবাদে রচিত “নরবর নাগেশ্বর” গানটি বাঙ্গালার বিশেষ ব্যাপ্তিলাভ করিয়াছিল।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘পুরুবিক্রম’ নাটক প্রভৃতির অন্তর্নিহিত ভাবও জাতীয়তা।

হিন্দু মেলার জন্য শিবনাথ শাস্ত্রীও বাঙ্গালীর প্রাচীন কীর্ত্তি অবলম্বন করিয়া কবিতা রচনা করিয়াছিলেন।

বাগ্মী লালমোহন ঘোষ তাঁহার বক্তৃতার দ্বারা বিলাতের শ্রোতৃগণকে আকৃষ্ট করিয়া ভারতবর্ষ সম্বন্ধে মনোযোগী করিয়াছিলেন এবং ভারতবাসীদিগের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম বিলাতের পার্লামেণ্টে সদস্যপদপ্রার্থী মনোনীত হইয়াছিলেন। তাঁহার অগ্রজ মনোমোহন হরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর দেশবাসীর অভাব অভিযোগের আলোচনাকল্পে ‘ইণ্ডিয়ান মিরার’ পত্র প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি বিলাত যাত্রা করিবার পর নরেন্দ্রনাথ সেন দীর্ঘকাল এই পত্র (দৈনিকরূপে) পরিচালিত করেন এবং তাহার অর্দ্ধাংশের অধিককাল এই পত্র সত্যসত্যই জাতীয় ভাবের মুকুর ছিল; শেষে তাহাব আর সে সম্ভ্রম ছিল না।

সংবাদপত্র সক্রিয় রাজনীতিক আন্দোলনের সর্ব্বপ্রধান সহায়। সাংবাদিকরূপে হরিশচন্দ্রের পর কৃষ্ণদাস পালের

শিবনাথ শাস্ত্রী

নামোল্লেখ করিতে হয়। হরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর ‘হিন্দু পেট্রিয়টের’ ভার গ্রহণ করিয়া বদান্যবর কালীপ্রসন্ন সিংহ

অল্পদিন শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সাহায্যে উহা পরিচালিত করেন। কিন্তু বদান্যতা, ভাবপ্রবণতা, দেশপ্রেম ও উদারতা সিংহ মহাশয়ের গুণ থাকিলেও স্থৈর্য্যসহকারে কোন কার্য্যে আত্মনিয়োগ করা তাঁহার প্রীতিপ্রদ ছিল না। তাই তিনি ঐ পত্র সম্বন্ধে কি করিবেন জিজ্ঞাসা করেন এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরামর্শে কৃষ্ণদাস পালকে ঐ পত্র প্রদান করেন। কৃষ্ণদাস হরিশচন্দ্রেরই মত দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বীয় চেষ্টায় ইংরেজী শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। একলব্য যেমন দ্রোণাচার্য্যকে গুরুত্বে বরণ করিয়া দূর হইতে তাঁহার অস্ত্রব্যবহার-কৌশলের অনুকরণ করিয়াছিলেন, কৃষ্ণদাস তেমনই দূর হইতে হরিশচন্দ্রের রাজনীতিক কার্য্যের অনুসরণ করিয়াছিলেন। টমশন যখন দ্বিতীয় বার এ দেশে আগমন করেন, তখন তরুণ যুবক তাঁহাকে তাঁহার ও তাঁহার সমবয়সীদিগের এক আলোচনাসভায় বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করিলে টমশন বলেন, সাহিত্য-সমিতিতে বক্তৃতা করা তাঁহার পক্ষে বৃথা—তিনি রাজনীতিক বিষয়েই বক্তৃতা করিতে চাহেন। তিনি একখানি 'হিন্দু পেট্রিয়ট' কৃষ্ণদাসকে দেখাইয়া বলেন—ভারতীয়দিগের মধ্যে কেবল ঐ পত্রের সম্পাদক রাজনীতি বুঝেন। সেই দিন হইতে কৃষ্ণদাস হরিশচন্দ্রের অনুকরণ করিতে থাকেন। দারিদ্র্যহেতু তিনি 'হিন্দু পেট্রিয়টের' গ্রাহক হইতে পারেন নাই—একটি সমিতির সম্পাদকের নিকট হইতে উহা লইয়া নিয়মিত ভাবে পাঠ করিতেন।

কৃষ্ণদাসের সম্পাদনায় 'হিন্দু পেট্রিয়ট' সম্বন্ধে পিলাই মহাশয় বলিয়াছেন, তখনই এ দেশের লোকের সংবাদপত্র প্রকৃত শক্তিশালী হয় এবং ইংরেজ-শাসকরা এ দেশের লোকের মত অবগত হইবার অভিপ্রায়ে সংবাদপত্র পাঠ করিতে আরম্ভ করেন।

কৃষ্ণদাস স্থির, ধীর ও মৃদুস্বভাব ছিলেন। কিন্তু রাজনীতিক বিষয়ে তিনি যে সব মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, সে সকল আজও স্মরণীয়। তিনি জমিদার-সভার কেবল সম্পাদকই ছিলেন না—সে সভা তাঁহারই পরামর্শে পরিচালিত হইত। কিন্তু তিনি রাজভক্তি সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—শাসক যে পরিমাণে প্রজাকে বাহিরের আক্রমণ ও দেশে অশান্তির উপদ্রব হইতে রক্ষা করেন—যে পরিমাণে প্রজা অবাধে তাহার শিল্প, ব্যবসা, ধর্ম্মাচরণ প্রভৃতি করিতে পারে—সেই পরিমাণে শাসক রাজভক্তি দাবী করিতে পারেন। সুতরাং রাজভক্তি বিনিময়ের বিষয়। স্বদেশীর শাসনে লোকের রাজভক্তির যে কারণ থাকে, বিদেশীর শাসনে তাহা থাকে না এবং সেই জন্য

কৃষ্ণদাস পাল

লালমোহন ঘোষ

শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

পূর্ব্বে কৃষ্ণদাস ভারতে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন এবং তাহা লাভে ভারতবাসীর যোগ্যতার কথা বলেন। কর গ্রহণ করিতে হইলে করদাতৃগণকে সে বিষয়ে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ জন্য প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের অধিকার দিতে হইবে—এই মত তিনি ভারতে প্রযুক্ত করিতে বলেন।

বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন—জমিদারসভার সম্পাদক হইলেও কৃষ্ণদাস উহাতে লোকমতের উপযুক্ত প্রভাবের অভাবহেতু পরিকল্পিত ভারত-সভার প্রতিষ্ঠায় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু প্রমুখ ব্যক্তিদিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন। ইহার কারণ, তিনি আপনাকে "a humble worker in the service of the nation" বলিয়া বিবেচনা করিতেন এবং "হিন্দু দেশপ্রেমিক" নামই গৌরবজনক বলিয়া মনে করিতেন। কৃষ্ণদাসের সম্বন্ধে সুরেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—"one of the

সুশাসন ব্যতীত বিদেশী শাসক প্রজার নিকট রাজভক্তি দাবী করিতে পারেন না।

যাঁহারা মনে করেন, কৃষ্ণদাস সুশাসনের কথা বলিয়াছিলেন বটে, কিন্তু স্বায়ত্ত-শাসনের প্রয়োজন ব্যক্ত করেন নাই, তাঁহাদিগকে আমরা ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে 'হিন্দু পেট্রিয়টে' তাঁহার "ভারতে হোমরুল" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিতে অনুরোধ করি। সেই প্রবন্ধে তিনি তৎকালীন ব্যবস্থাপক সভার অসারতার কথা বলেন এবং যুক্তি প্রয়োগ করিয়া বলেন—ভারতবাসীকে স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার প্রদান করিতে হইবে। ইহার ৩২ বৎসর পরে কংগ্রেসের সভাপতিরূপে দাদাভাই নৌরোজী বলেন—ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন বা স্বরাজ ভারতবাসীর কাম্য। তাহার অল্পদিন পূর্ব্বে 'বন্দে মাতরম্' পত্রে বলা হইয়াছিল বটে, "বিদেশীর নিয়ন্ত্রণমুক্ত সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসন" ("absolute autonomy free from foreign control") ভারতবাসীর কাম্য; কিন্তু কংগ্রেসে নৌরোজী মহাশয়ের মতই বহুমতে গৃহীত হইয়াছিল। ইহার ৩২ বৎসর

কালীপ্রসন্ন সিংহ

greatest political leaders that Bengal, of India, has ever produced."

'হিন্দু পেট্রিয়ট' পরিচালনায় যাঁহারা কৃষ্ণদাসের সহায় ও সহকর্ম্মী ছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অন্যতম রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বিদ্যার খ্যাতি সমগ্র সভ্যজগতে বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল। রামগোপালের মত তাঁহাকেও এ দেশে ইংরেজদিগের বিরাগভাজন হইয়া "ফটোগ্রাফিক সোসাইটী" ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। তিনি প্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক হইলেও রাজনীতিক হিসাবে তাঁহার খ্যাতি অল্প ছিল না। তিনি কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দেখিয়া গিয়াছিলেন এবং কংগ্রেসের যে দ্বিতীয় অধিবেশনে কলিকাতায় তাহার রাজনীতিক রূপ প্রথম বিকশিত হয়, তিনিই তাহাতে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি-পদে বৃত হইয়াছিলেন। তাঁহার অভিভাষণে তিনি বলেন—"আমার বিচ্ছিন্ন স্বজাতীয়গণ একত্র হইবেন—আমরা স্বতন্ত্র ব্যক্তিগত জীবন যাপন না করিয়া একটি জাতিতে পরিণত হইব, ইহাই আমার জীবনের অন্যতম স্বপ্ন। এই কংগ্রেসে আমি সেই জাতীয় একতার আরম্ভ প্রত্যক্ষ করিতেছি।"

আনন্দমোহন বসু

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণদাস পালের মৃত্যু হয়। পর বৎসর বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয়।

কংগ্রেসের জন্য সকল আয়োজন কিরূপ হইয়া ছিল, তাহা বলিবার পূর্ব্বে একটি বিষয় লক্ষ্য করা প্রয়োজন। বাঙ্গালার রামমোহন রায় ও দ্বারকানাথ ঠাকুরের সময় হইতে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাবধি এক দলের সহিত পরবর্ত্তী দলের যোগসূত্র কখন ছিন্ন হয় নাই। রামগোপাল ঘোষ ও হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জীবদ্দশাতেই রাজেন্দ্রলাল, কৃষ্ণদাস প্রভৃতির আবির্ভাব হয় এবং তাঁহারা যখন কর্ম্মক্ষেত্রে, তখনই সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিশিরকুমার ঘোষ প্রভৃতির খ্যাতি বিস্তার লাভ করে—পরবর্ত্তীদিগকে অনেক সময় পূর্ব্ববর্ত্তীদিগের সহিত তর্ক-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল।

কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয়, ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে তখন জাতীয়কার্য্যে একযোগে কায করা স্বাভাবিক ভাবেই হইত। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হইবার দুই বৎসর পূর্ব্বে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় যে রাজনীতিক সম্মিলন হয়, তাহাই

রাজেন্দ্রলাল মিত্র

কংগ্রেসের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী। ভিন্ন ভিন্ন তিনটি প্রতিষ্ঠান একযোগে ইহা আহ্বান করেন—

(১) বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন
(২) ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন
(৩) সেণ্ট্রাল মেহমেডান এসোসিয়েশন

এই সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন সম্বন্ধে সুরেন্দ্রনাথ যথার্থই বলিয়াছেন—ইহার অঙ্কেই কংগ্রেস উদ্ভূত হইয়াছিল। এই সম্মিলনের প্রথম অধিবেশনে প্রায় এক শত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। ব্লাণ্ট তখন ভারত-পরিদর্শনে আসিয়াছিলেন এবং অধিবেশনে আসিয়া স্বীয় পুস্তকে ইহার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মত লিপিবদ্ধ করেন—

"What India really asks for as goal of

her ambition is self-government—that is to say, that not merely executive but legislative and financial power should be vested in the native hands" অর্থাৎ ভারতবর্ষের চরম কাম্য—স্বায়ত্ত-শাসন, ইহার অর্থ—ভারতবাসীকে কেবল শাসন-ক্ষমতা দিলেই হইবে না, তাহাকে আইন প্রণয়নের ও আর্থিক ব্যাপার নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাও প্রদান করিতে হইবে।

তাহার পূর্ব্বেই বাঙ্গালায় রাজনীতিক কার্য্যের জন্য একাধিক নূতন প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সেগুলির মধ্যে দুইটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য—

(১) ইণ্ডিয়ান লীগ

(২) ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন

লীগ শিশিরকুমার ঘোষের চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং স্বল্পকালস্থায়ী হইলেও উল্লেখযোগ্য কায করে। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জুলাই ভারত সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহার পূর্ব্বে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনই উল্লেখযোগ্য রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান ছিল। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ হইতে সুরেন্দ্রনাথ নানাস্থানে বক্তৃতা করিয়া দেশে নবভাব প্রচার করিতে থাকেন। যাঁহারা তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে যাইতেন, তাঁহাদিগের মধ্যে ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী ও স্বামী বিবেকানন্দের নাম উল্লেখ করিতে হয়।

কেবল কলিকাতায় নহে, সুরেন্দ্রনাথ অন্যান্য প্রদেশে যাইয়াও বক্তৃতা করেন। তিনিই জাতীয় ভাবের প্রচার-কার্য্যে যে ভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, তাহা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য—তাঁহার সেই কার্য্য ব্যতীত দেশে রাজনীতিক ভাবের প্রচারে বিলম্ব হইত। সেই কথা স্মরণ করিয়াই সার হেনরী কটন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে লিখিয়াছিলেন—

"The educated classes are the voice and brain of the country. The Bengalee Baboos now rule public opinion from Peshawar to Chittagong."

অর্থাৎ শিক্ষিত সম্প্রদায়ই দেশের মস্তিষ্ক এবং তাঁহারাই দেশের মত ব্যক্ত করেন। ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত বাঙ্গালীরাই লোকমত নিয়ন্ত্রিত করেন।

তিনি সুরেন্দ্রনাথের কথার উল্লেখ করিয়া বলেন—"আজ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে মুলতানে যেমন ঢাকাতেও তেমনই উৎসাহের উদ্ভব করে।"

সুরেন্দ্রনাথকে নবভারতে রাজনীতিক আন্দোলনের স্রষ্টা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না—তাঁহার কার্য্যের জন্য সমগ্র ভারতবর্ষ বাঙ্গালার নিকট ঋণী।

সমগ্র ভারতে এক আন্দোলন করিবার কল্পনা পূর্ব্বে কাহারও মনে সমুদিত হইয়াছিল কি না, জানা যায় না।

স্বামী বিবেকানন্দ

তবে এ বিষয়ে সন্দেহমাত্র থাকিতে পারে না যে, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্ব্বে কেহই তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। ভারত-সভা প্রতিষ্ঠিত হইবার পর —এক বৎসরের মধ্যে—তাঁহার সেই কার্য্যের সুযোগ উপস্থিত হয়। লর্ড সলসবেরী স্বভাবতঃ প্রতিক্রিয়াশীল ছিলেন। ভারত-সচিবরূপে তিনি ব্যবস্থা করেন, সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার্থীর বয়স ২৫ বৎসরের স্থানে ১৯ বৎসর করা হইবে। ইহাতে ভারতীয়দিগের পক্ষে পরীক্ষা দিবার পথ বিঘ্নাবৃত হয়। ভারত-সভা ইহার প্রতিবাদ করেন এবং

৩। এবারে দুজনে পিঠোপিঠিভাবে দাঁড়ান—দুজনের হাতে হাতে বন্ধন থাকিবে। তার পর স্ত্রীকে স্বামী পিঠের উপরে তুলিয়া প্রলম্বিত রাখিবেন। এবং স্ত্রীও স্বামীকে পিঠে রাখিবেন—৩ নং ছবির ভঙ্গীতে। এ ব্যায়াম অভ্যাস করিতে সময় লাগিতে পারে। কিন্তু এ ব্যায়াম বর্জ্জনীয় নয়। এ ব্যায়ামে সারা দেহ মজবুত এবং দেহের গঠন সুললিত ও সুছাঁদের হইবে। এ ব্যায়ামের ফলে নারী-সুলভ কোন ব্যাধি স্ত্রীর দেহকে স্পর্শ করিতে পারিবে না।

৩। পিঠোপিঠি

৪। এবারে দুজনে

৪। পায়ে-পায়ে
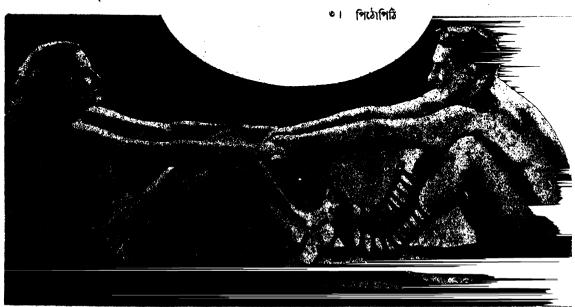
মেঝেয় বসুন—সামনা-সামনি ৩নং ছবির ভঙ্গীতে—দুজনের পা দুজনের পায়ে পা ঠেকিয়া থাকিবে। (স্বামী গুরুজন—তাঁর পায়ে পা ঠেকিলে পাপ হইবে? সে ভয় করিবেন না। ব্যায়ামের পরে স্বামীর পায়ে প্রণাম করিয়া তাঁর পায়ের ধুলা মাথায়-গায়ে মাখিবেন—সব দোষ কাটিয়া যাইবে!) এবারে হাতে নিন একটা মোটা রুল। দুজনে ছবির ভঙ্গীতে ঐ রুল দু'হাতে চাপিয়া ধরুন। ধরিয়া একবার সামনে পরক্ষণে পিছনে ঝুঁকিয়া দাঁড়-টানার প্রথায় দোল্ খান্। এ ব্যায়ামে বুক-পিঠ সুস্থ হইবে, হার্টের রোগ ঘটিবে না; ঠাণ্ডা লাগিলে নিউমোনিয়ার ভয় ঘুচিবে—তার উপর বুক-পিঠের গড়ন হইবে সুছন্দের।

এ ব্যায়ামে যেমন দেহ-চর্চ্চা হইবে, তেমনি স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক-হিসাবে এ ব্যায়াম খেলার মত রমণীয় বোধ হইবে।

আসাম মেল

আসাম-মেলই দ্রুতগামী গাড়ী।
অতএব তাইতে চড়ে যাচ্ছি শ্বশুর-বাড়ী;—
এইটি হচ্ছে কলিযুগের পক্ষীরাজ ঘোড়া,
যেহেতু রংপুর আর কলকাতা দিয়ে গেছে জোড়া।
রাজপুত্তুর ছেড়ে ফেলে অফিস-করা ধূলা-মলিন বেশ
চলেছেন—রাজকন্যার স্বপনঘেরা সবপেয়েছির দেশ।

ইংরিজি এক নভেল নিয়ে খুলে বসাই সার,
পড়বে কে আজ! মনটা যে মনেই নেই আর।
রাণাঘাটে উঠে এলেন এক জোড়া তরুণ-তরুণী,
বুঝলেম এঁরা স্বামী-স্ত্রী—কাণপেতে তাঁদের কথাই শুনি;—
স্বামী বলেন,—"দুঃখ যদি আমার কাছে যেতে,
থাকো না কেন বাপের কাছে—চিরদিন তিনিই দেবেন খেতে।"
জলে-ভেজা চোখ দু'টি তার তুলে স্ত্রী বলে,—
"তোমার সঙ্গেই এসেছি ত চলে।"
—"তবে ও-সব কান্নাকাটি রাখো,
একটু হাসি-মুখে থাকো।"
ফেরার মুখে গাড়ীর মাঝে এমন অভিনয়,
আমার ভাগ্যেও আছে মনে হয়!

আটটা বেজে দশ মিনিটও হলো,
পার্ব্বতীপুর গাড়ী এসে থাম্লো।
সুটকেসটা বগলে করে গাড়া-বদল সেরে,
আস্বো ফিরে,
দেখি বড় পেয়ে গেছে চা'র—
লেখক-বন্ধু হেসে করলো নমস্কার।
—"কোথায় যাবেন? এদিক্ কোথা—চেয়ে"—
হঠাৎ দেখি একটি বধূ আমার পানে চেয়ে!

"আপনি কোথা?—রংপুর? সেথা কিসের টান?"
বন্ধু বলেন,—"আজ্ঞে সেটা আমার তীর্থ স্থান!"
"হারে কপাল! বুঝতে এতক্ষণ!
এক কারণেই মোদের আগমন!"
বন্ধু দু'জন দাঁড়ালেম চায়ের ষ্টলে এসে,
বধূটিও মুখ ফিরিয়ে নিল একটু হেসে!
পরে শুনেছি তাঁর বরের মুখে—যাচ্ছেন প্রথম শ্বশুর-বাড়ী
তাঁদেরও আজ আসাম-মেলই দ্রুতগামী গাড়ী!

মিথ্যা নয় সেদিন রাত্রে চাঁদ উঠেছিল,
ঘরে ঢুকে অনু আমায় পাণের ডিপে দিল।
ব'ললে,—"আস্তে কষ্ট হল নাকি?"
বললেম,—"জানলে না ত' তুমি দুনিয়ায় কষ্ট কেবল ফাঁকি!"
বাইরে গাছের ভেজা পাতায় চাঁদের আলো জ্বলে,
এমনি ক'রে এই জগতের যত মনের তলে,
আজ সুখের নেশা জমাট হয়ে ওঠে,
যারা শতদলের পরাগ নিল লুঠে,
তাদের সব এসেছে আজ জগত পিছে ফেলে,
আমার সঙ্গে এই ত আসাম-মেলে।
ভাবছি আজ, সারা জীবন কষ্ট পাওয়ার পরে,
দুঃখকে মোরা হারিয়ে দিছি,—সুখের দিনের তরে।

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

চীন-জাপান যুদ্ধের ৩য় বৎসর

নব-বলদৃপ্ত জাপানের ধারণা ছিল, অন্তর্বিপ্লবে শতধা-বিচ্ছিন্ন মহা-চীনকে জয় করা তাহার পক্ষে কঠিন হইবে না, এবং দুই এক মাসেই এই সমরের অবসান হইবে। কিন্তু এই যুদ্ধের তৃতীয় বৎসরেও ইহার অবসানের কোন চিহ্ন লক্ষিত হইতেছে না। প্রত্যেক প্রধান যুদ্ধেই জাপানীরা জয়লাভ করিয়াছে, তাহারা চীনের ছয়টি প্রধান নগর অধিকার করিয়াছে, এবং চীনের এক-তৃতীয়াংশ ভূভাগ শাসনাধীনে আনিয়াছে বলিয়া সগৌরবে ঘোষণা করিতেছে। কিন্তু তথাপি গত জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে এই যুদ্ধের তৃতীয় বৎসর আরম্ভ হইলে এই যুদ্ধের অতীত ঘটনাবলীর আলোচনা করিয়া জাপানের প্রধান মন্ত্রী কিচিরো হীরানুমা ক্ষুব্ধচিত্তে লুব্ধ আশ্বাসে গর্জ্জন করিয়াছেন, এবং মার্শাল চিয়াং কাইসেক জয়ের দুন্দুভি নিনাদ করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই।

টিয়েনসিনে বৃটিশ এলাকার পাশে বিদ্যুৎশক্তি-সঞ্চালিত কাঁটা তারের বেড়া

টিয়েনসিনে ফরাসী এলাকার পার্শ্বে বৈদ্যুতিক-শক্তিসঞ্চালিত দুর্ভেদ্য বেড়া

দেববংশজ ব'লয়া পরিচিত জাপান সম্রাট হিরোহিটো এই স্মরণীয় দিনে এক মিনিটকাল নির্ব্বাক্ উপাসনায় অতিবাহিত করিলে তাঁহার সাত কোটি প্রজা এই মহৎ দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়াছিল। সেই দিন তাহারা মদ্য, মাংস ও তাম্রকূট বর্জ্জন করিয়া যুদ্ধে নিহত ৬০ হাজার জাপানী সৈন্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিল। কাফেসমূহে গীতবাদ্য রহিত হইয়াছিল; সিনেমা-গৃহের অভিনয় অল্পকাল পরেই বন্ধ হইয়াছিল; গেইসাদিগের প্রমোদভবনের দ্বার সেদিন রুদ্ধ ছিল। এতদ্ভিন্ন, স্বদেশহিতৈষীদের দুইটি প্রতিষ্ঠান অদ্ভুত উপায়ে স্বদেশ-প্রেম প্রদর্শন করিয়াছিল। তাহারা বৃটিশদূত ভবনে উপস্থিত হইয়া কাউন্সেলার উইলফ্রেড ক্যানিংহামকে এক পরোয়ানা প্রদান করিয়াছিল। সেই পরোয়ানার মর্ম্ম—বৃটেন চীনদেশ ত্যাগ করুক। দুর্দ্দান্ত বৃদ্ধ ব্যারণ হীরানুমার ধারণা, এই সকল বৈদেশিকই সকল অনিষ্টের মূল। তিনি সংবাদপত্রের প্রতিনিধিগণকে আহ্বান করিয়া অবজ্ঞাভরে ঘোষণা করিয়াছিলেন, চিয়াং কাইসেকের সরকার এখন প্রাদেশিক শাসনপ্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে, এবং বৈদেশিকগণের সাহায্যেই এই শাসন প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব বর্ত্তমান আছে। তিনি দুর্ব্বৃত্ত বৈদেশিকগণের বিরুদ্ধে আক্রোশ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন, জাপান যে কোন বৈদেশিক শক্তির প্রতিকূলে আত্মসমর্থনের পন্থা অবলম্বন করিবে; তাহারা চিয়াং কাইসেককে সাহায্যই করুক বা নূতন ব্যবস্থার বাধা দান করুক, তাহাতে তাঁহাদের সঙ্কল্প শিথিল হইবে না। ব্যারণ অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাঁহারা চীনদেশের যে সকল অংশ অধিকার করিয়াছেন, জাপান সেই সকল স্থানে সাক্ষীগোপাল সরকারের সৃষ্টি করিয়া তাহা একযোগে শাসন করিবে; কিন্তু যোগ্য চীনা কর্ম্মচারীর অভাবে তাঁহার এই

অঙ্গীকার কার্য্যে পরিণত হয় নাই। তবে তিনি বলিয়াছেন, যে সকল জাপানী সৈন্ত চীনদেশে যুদ্ধ করিতেছে, তাহাদিগকে কতকটা কায়েমীভাবেই সেখানে রাখা হইবে, তাহারা শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করিবে, এবং চীনদেশ হইতে কম্যুনিজম বিতাড়িত করিবে।

এদিকে চিয়াং কাইসেক তাঁহার নূতন রাজধানী চুংকিং হইতে প্রফুল্ল চিত্তে যে তিনটি আদেশ প্রচার করিয়াছেন, তাহার প্রথমটির মর্ম্ম—তাঁহার সৈন্তগণ কখন পরাজয় স্বীকার করিবে না, জাপানের অধীনতা স্বীকারের জন্ত যে সকল প্রস্তাব করা হইয়াছে, তাহা তাহারা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করিবে, দ্বিতীয় প্রস্তাবে তিনি মিকাডোর প্রজাবর্গকে অনুরোধ করিয়াছেন, তাহারা যেন তাহাদের সরকারকে এই যুদ্ধে বিরত হইতে বাধ্য করে, এবং তৃতীয়টিতে তিনি পৃথিবীর জাতি সমূহকে জাপানের বিরুদ্ধে অর্থনীতিক 'শাসন' অবলম্বন করিয়া চীনকে সাহায্য করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। উপসংহারে তিনি বলিয়াছেন, চীনের জয়লাভেই এই যুদ্ধের অবসান হইবে। চীনের যে সকল সৈন্ত ইয়াংসি অঞ্চলে যুদ্ধ করিতেছে, তাহাদের প্রধান সেনাপতি জেনারেল চেন-চেং যুদ্ধাবসানের সময় পর্য্যন্ত স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে চীন বিজয় লাভ করিলে এই সমরের পরিসমাপ্তি হইবে।

কতকগুলি জাপানী যুদ্ধবিমান ইতোমধ্যে একদিন চন্দ্রালোকিত রাত্রিতে চুং-কিং নগরের উপর বোমাবর্ষণ করিলেও চিয়াং-কাইসেকের উৎসাহ শিথিল হয় নাই। জাপানীদের ৮০খানি যুদ্ধবিমান পাঁচটি বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া উর্দ্ধাকাশ হইতে নগরের উপর বোমাবর্ষণ করিয়াছিল। শত্রুগণের অভিসন্ধি জানিতে পারিয়া নগরবাসীরা নগরত্যাগ করিয়া পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। তাহাদের আত্মরক্ষার জন্ত পর্ব্বতে অল্পদিন পূর্ব্বে আশ্রয়-গ্রহণোপযোগী স্থান নির্ম্মিত হইয়াছে। শত্রুনিক্ষিপ্ত বোমার আগুনে নগরের অনেকগুলি গৃহ বিধ্বস্ত হইলেও ৫০ জনের অধিক অধিবাসী নিহত হয় নাই; তাহাদের অধিকাংশ নারী ও শিশু।

চিয়াং-কাইসেক সগর্ব্বে ঘোষণা করিয়াছেন, এই যুদ্ধে জাপানীদের অপেক্ষা

টিয়েনসিনে ফরাসী এলাকার পার্শ্বে তারের বেড়ার বাহিরে জাপ সৈন্তের পাহারা

টিয়েনসিনে বৃটিশ এলাকা—বিমান হইতে গৃহীত

টিয়েনসিনে ফরাসী এলাকা—বিমান হইতে গৃহীত

তাঁহারাই অধিক লাভবান হইয়াছেন। এই যুদ্ধ উপলক্ষে চীনের বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসিবর্গ যে মিলন-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছে, জাপান চীন আক্রমণ না করিলে সেই মিলনের জন্য এক শতাব্দী অপেক্ষা করিতে হইত। এই যুদ্ধের জন্য চীনের পশ্চিম প্রদেশগুলির অধিবাসীরা শিল্পের উন্নতিসাধনে বাধ্য হইয়াছে। যুদ্ধারম্ভ না হইলে তাহাও সম্ভব হইত না। শিল্পোন্নতির সহিত এই সকল প্রদেশের সম্পদও বর্দ্ধিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন জাপানীরা চীনের সমুদ্রোপকূলের বন্দরগুলি অবরুদ্ধ করায় চীন দেশে সমরোপকরণ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য আমদানী করিবার জন্য তিনটি নূতন পথ উন্মুক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মদেশ হইতে, ফরাসী অধিকৃত ইণ্ডো-চায়না, এবং সোভিয়েট সাইবেরিয়া হইতে চীনের অন্তর্দ্দেশ পর্য্যন্ত প্রসারিত এই তিনটি পথ যুদ্ধেরই অপরিহার্য্য ফল। শান্তির সময় এই তিনটি পথের কথা কাহারও কল্পনাতেও স্থান পাইত না।

টিয়েনসিনে বৈদ্যুতিক তারের বেড়া স্পর্শে চীনা কুলীর মৃত্যু
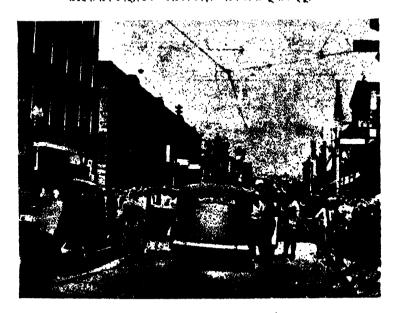
অবরুদ্ধ টিয়েনসিনে জাপানীরা একজন প্রসিদ্ধ জার্ম্মাণ অধিবাসীর মোটর গাড়ী পরীক্ষা করিতেছে

এ সকলই যুদ্ধের লাভ সন্দেহ নাই; কিন্তু এই যুদ্ধে চীনের বিভিন্ন প্রদেশের গ্রামে নগরে নানাভাবে যে বিপুল জনক্ষয় হইয়াছে, সেই ক্ষতির তুলনা কোথায়? যুদ্ধ উপলক্ষে যে সকল নর-নারী মৃত্যু-কবলে পতিত হইয়াছে, তাহাদের সংখ্যা দুই হইতে আড়াই কোটি! তবে যে দেশের অধিবাসী সংখ্যা ৪২ কোটি, সে দেশের জনসংখ্যার তুলনায় ইহা সামান্য বটে। এতদ্ভিন্ন, চীনের প্রায় পাঁচ কোটি লোক গৃহহীন ও নিরাশ্রয় হইয়াছে। চীন দেশের নানা প্রদেশে প্রায় প্রতি বৎসর দুর্ভিক্ষ লাগিয়াই থাকে; কিন্তু যুদ্ধারম্ভের পর দুর্ভিক্ষের পরিমাণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। বিশেষতঃ, গৃহহীন নিরাশ্রয় অধিবাসীরা যে সকল প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, সেই সকল প্রদেশ সাধারণতঃ অনুর্ব্বর বলিয়া সেই সকল প্রদেশের অধিবাসিগণের সঙ্কট বর্দ্ধিত হইয়াছে। আশ্রিত বিপন্ন চীনাম্যানদের দুঃখ-কষ্টেরও সীমা নাই। চীনের অনেক প্রদেশের জনসাধারণ জানে না যে, তাহাদের দেশে যুদ্ধ চলিতেছে, সুতরাং যুদ্ধের ফলাফলের জন্য তাহাদের চিন্তা নাই; কিন্তু তাহাদের অন্নকষ্ট বর্দ্ধিত হওয়ায় তাহারা যুদ্ধের অনিষ্টকর প্রভাব বুঝিতে পারিতেছে ইহা হইতে তাহাদের নিষ্কৃতি লাভের উপায় নাই। তাহাদিগকে যুদ্ধের প্রত্যক্ষ প্রভাব অনুভব করাইতে হইলে জাপানকে এই বিশাল দেশের প্রত্যেক অংশ জয় করিতে হইবে। কত দিনে জাপানের এই চেষ্টা সফল হইবে, এবং কখন সফল হইবে কি না, তাহা অনুমান করা অসাধ্য।

টিয়েনসিনে বৃটিশ-মর্য্যাদা

টিয়েনসিনে ইংরেজদিগের প্রতি জাপানীদের অত্যাচার সমভাবেই চলিতেছে। বৈদেশিকগণ জাপানীদের শত্রুপক্ষের সহিত

ব্যবসায় বাণিজ্যে লিপ্ত হওয়ায় জাপানের ক্ষতি হইতেছে, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া বৈদেশিকগণের ব্যবসায় বাণিজ্য বন্ধ করিবার জন্য জাপানীরা কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে। জাপানীরা টিয়েনসিনের ইংরেজগণের নির্য্যাতনের নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে।

গত জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে বৃটিশ ষ্টীমার 'বোচাউ'এর দ্বিতীয় মেট এডোয়ার্ড থিয়োডোর গ্রিফিথ্‌স এক জন জাপানী শান্ত্রীর অপমান করিয়াছেন, এই অভিযোগে জাপানীরা গ্রিফিথ্‌সকে গ্রেপ্তার করিয়াছিল। তিন দিন আটকের পর মুক্তি পাইয়া গ্রিফিথ্‌স বিবৃতি দিয়াছেন, জাপানীরা অপরাধ স্বীকার করাইবার জন্য তাঁহার আঙ্গুলগুলি ভীষণ ভাবে মোচড়াইয়া দিয়াছিল; তাহার পর তাঁহাকে যে কারাগারে আবদ্ধ করিয়াছিল, তাহা বোলতায় পূর্ণ, এবং স্থানটি অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। সেখানে তাঁহার যন্ত্রণার সীমা ছিল না।

ইংরেজের অধিকৃত সীমায় একদিন দুগ্ধ লইয়া যাইবার সময় যে সকল জাপানী শান্ত্রী বেড়ার বাহিরে পাহারায় ছিল, তাহারা সন্দেহক্রমে সেই দুগ্ধবাহককে আটক করিয়া তাহার দুধের বালতির ভিতর বোমার সন্ধান করে; বোমা নাই, কিন্তু তাহাকে মুক্তিদানের জন্য কর্তৃপক্ষের অনুমতি প্রার্থনায় লোক পাঠাইতে হইয়াছিল। দীর্ঘকাল পরে যখন সেই লোক ফিরিয়া আসে, তখন দুধ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। এই অন্যায়ের প্রতিবিধানের আশায় বৃটিশ কনসেসনের কন্সাল-জেনারেল এডগার জর্জ্জ জেমিসন জাপানী দূতাবাসে ধাবিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি সুফল লাভ করিতে পারেন নাই; ভবিষ্যতে এই প্রকার অত্যাচার হইবে না, এরূপ কোন প্রতিশ্রুতিও সে সময় তাঁহাকে দেওয়া হয় নাই।

কনসেসনের প্রান্তদেশ—বৃটিশ প্রহরী সম্মুখের জাপানী সৈনিককে লক্ষ্য করিতেছে

অবরুদ্ধ টিয়েনসিনে চীনা পথচারীরা ছাড়া পাইবার প্রতীক্ষা করিতেছে

টোকিওস্থিত বৃটিশ দূত সার রবার্ট ক্রেগীকেও যথেষ্ট বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইয়াছে। টিয়েনসিনের ইংরেজগণ নিত্য যে ভাবে লাঞ্ছিত হইতেছে, তাহার প্রতিবিধানের আশায় সার রবার্ট জাপানী পররাষ্ট্র বিভাগের অফিসে গমন করিয়া গোলমাল নিষ্পত্তির চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু জাপানী পররাষ্ট্র বিভাগ চূড়ান্ত জবাবের জন্য তাঁহাকে অন্ততঃ এক সপ্তাহ অপেক্ষা করিতে বলিয়াছিলেন।

এক সপ্তাহ পরে তিনি জানিতে পারেন, টোকিও-সরকার পররাষ্ট্র বিভাগের দুই জন কর্ম্মচারী, ও অন্য দুই জন প্রবাসী কর্ম্মচারীর হস্তে এই দায়িত্ব-ভার অর্পণ করিয়াছেন; এই কর্ম্মচারীদ্বয়ের কার্য্যক্ষেত্র পশ্চিম জাপান; তাঁহারা টোকিওতে আসিবার সুযোগ পাইলে, স্থানীয় সহযোগিদ্বয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহাদের সুচিন্তিত অভিমত সার রবার্ট ক্রেগীকে জানাইবেন বলিয়া লিখিয়াছিলেন। তাহার পূর্ব্বে কোনও রকম মিটমাটের আশা

ছিল না, অর্থাৎ ততদিন পর্য্যন্ত জাপানী শান্ত্রীবর্গ কর্ত্তৃক টিয়েনসিনের ইংরেজ অধিবাসিগণের অপমান, লাঞ্ছনা, এমন কি, বিবস্ত্র করিয়া খানাতল্লাসের ব্যবস্থা সমভাবেই চলিতে থাকিবে। সিংহের তর্জ্জন-গর্জ্জন ব্যর্থ হইবে।

জেনারেল চার্লস্ গর্ডন টিয়েনসিনে সর্ব্বপ্রথম বৃটিশ কন্‌সেসন স্থাপনের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন; এখানে রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার নাম স্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য তাঁহার নামে একটি উদ্যান আছে। তদ্ভিন্ন, ঘোড়দৌড়ের মাঠ, কয়েকটি ব্যাঙ্ক, ক্লাব ও কতকগুলি দোকান আছে, তাহাদের মালিক ইংরেজ। এখানে রাজা ষষ্ঠ জর্জ্জের যে সকল বৃটিশ প্রজা আছে, তাহাদের সংখ্যা তিন সহস্র। এই কন্‌সেসন কাঁটা তারের বেড়া দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়া তাহাতে বিদ্যুৎপ্রবাহ সঞ্চালিত হইয়াছে। বৃটিশ সরকার কত দিনে এই অবরোধ অপসারণ করাইয়া আত্মগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার উপায় বিধান করিবেন, এজন্য টিয়েনসিনের তিন সহস্র বৃটিশ প্রজা বিপদ হইতে মুক্তিলাভের আশায় অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছে।

টিয়েনসিন হইতে ইংরেজদিগকে বিতাড়িত করিবার জন্য জাপানীরা কেবল যে দৈহিক বল প্রয়োগ করিতেছিল এরূপ নহে, তাহারা ইংরেজ ব্যবসায়িগণকে চীনাম্যানদের সম্মুখে নানা ভাবে অপমানিত করিতেছিল, তাহাদিগকে কণ্টকাঘাতের যন্ত্রণা সহ্য করিতে বাধ্য করিয়াছিল।

ইংরেজদিগকে নির্য্যাতনের সর্ব্বপ্রধান ব্যবস্থা তাহাদিগকে বিবস্ত্র করা। যে সকল বৃটিশ প্রজা বিজলিসঞ্চালিত কাঁটাতারের বেড়ার ফাঁক দিয়া বেড়ার বাহির হইতে তাহাদের স্বদেশীয়গণকে কোনরূপ সাহায্য দানের চেষ্টা করিতেছিল, তাহাদিগকে চীনা রমণী ও বালকবালিকাগণের সম্মুখে বিবস্ত্র করা হইতেছিল। তাহার পর সেই সকল উৎপীড়িত ইংরেজ পরিচ্ছদ পরিধানের চেষ্টা করিতেই তাহাদিগকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাষ্ঠনির্ম্মিত লাঠী দ্বারা প্রহার করা হইতেছিল।

আইভর হাউস টিয়েনসিনের অধিবাসী ইংরেজ বণিক্, এবং এইচ জে কর্ড স্থানীয় ঘোড়দৌড়ের ক্লাবের সহকারী সম্পাদক। জাপানীরা তাঁহাদিগকে ধরিয়া একদল চীনা নারীর সম্মুখে উলঙ্গ হইতে আদেশ করিয়াছিল। লণ্ডনের 'টাইমস্' পত্রিকা লিখিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে বিবস্ত্র করা হইয়াছিল।

অতঃপর পাসপোর্ট ভাঁজ করিয়া তাঁহাদের মুখের ভিতর পুরিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

সপ্তাহান্তিক ছুটীতে জাপানীরা ইংরেজদিগকে উলঙ্গ করিয়া তাঁহাদের বিবস্ত্র দেহ দেখাইবার জন্য নারীগণকে সেখানে আনিয়া জুটাইত। এই সময় ইংরেজদের পত্নীগণকেও এই অপমান হইতে মুক্তিদান করা হয় নাই। গ্র্যাস উইজিয়ান ডি ফিন্‌লে ইংরেজ, তাহার স্ত্রীর জন্ম জার্ম্মাণীতে। তাঁহাদের উভয়কে জাপানীরা প্রকাশ্য ভাবে বিবস্ত্র করিয়াছিল। এই অবস্থায় একটি চীনা রমণী দ্বারা তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ খানাতল্লাস করা হইয়াছিল; কিন্তু সেই চীনা রমণীর পাশে এক জন জাপানী শান্ত্রী দাঁড়াইয়া খানাতল্লাস পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল।

টিয়েনসিনে দুই লরি বোঝাই রণসাজে সজ্জিত বৃটিশ সৈনিক

এই ব্যাপারে ভীষণ আন্দোলন আরম্ভ হইলে টোকিও হইতে টেলিগ্রামে আদেশ আসিয়াছিল, ঐ ভাবে বিবস্ত্র করা বন্ধ করা হউক। টিয়েনসিনের জাপানী সৈন্যগণের সেনাপতি জেনারেল হোমা এই ব্যাপারে আত্মসমর্থনের জন্য কৈফিয়ৎ দিয়াছিলেন যে, বিবস্ত্র করায় তাঁহারা দোষের কিছু দেখিতে পান নাই, বিশেষতঃ, জাপানে স্ত্রী-পুরুষকে বিবস্ত্র হইয়া একত্র স্নান করিতে দেখা যায়; সুতরাং ইহাতে আপত্তির কোন কারণ থাকিতে পারে না। অনন্তর সেই সেনাপতি সেই স্থানে উলঙ্গ হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, কিন্তু যে সকল বৈদেশিক সংবাদদাতা সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা বলিয়াছিলেন, বিবস্ত্র হইতে তাঁহার লজ্জা নাই, ইহা তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার আর উলঙ্গ হইবার প্রয়োজন নাই।

বৈদেশিক প্রসঙ্গ

চীনে জাপানের বর্ত্তমান অবস্থা

গত জুন মাসে চীন দেশে টিয়েনসিনের বৃটিশ-অধিকারসীমায় জাপানীরা স্থানীয় বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষের সহিত পাঁচ দিনের জন্য চুক্তি করিয়া বিরোধে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছিল; কিন্তু তাহার পর পুনর্ব্বার তাহারা গণ্ডগোল আরম্ভ করিয়াছে। জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে জাপানীরা জন এণ্ডারসন নামক ইংরেজের পাসপোর্ট পরীক্ষার দাবী করে। এণ্ডারসন তাহাদিগকে পাসপোর্ট পরীক্ষা করিতে দিলে কোন জাপানী সেনানী সেই পাসপোর্ট হাতে লইয়া উহাদ্বারা এণ্ডারসনের গালে বেগে আঘাত করিয়াছিল।

এণ্ডারসন এই ভাবে প্রহৃত হইলে সে এই প্রকার দুর্ব্যবহারের কারণ জিজ্ঞাসা করে; তাহার উত্তরে এক জন জাপানী সামরিক কর্ম্মচারী তাহাকে বলিয়াছিল, "তুমি টুপি মাথায় দিয়া আমাদের সহিত আলাপ করিতেছিলে, ইহা অত্যন্ত অভদ্রতা!" অনন্তর এণ্ডারসনকে টুপি ও চশমা খুলিয়া ফেলিতে বাধ্য করা হইয়াছিল; কিন্তু উক্ত জাপানী সামরিক কর্ম্মচারী ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া এণ্ডারসনকে তাহার পরিচ্ছদ খুলিয়া ঝাড়া দিতে বাধ্য করিয়াছিল. তাহার পর বিদ্রূপভরে তাহাকে বলিয়াছিল, "তুমি ভাবিয়াছিলে তুমি বৃটিশ, এজন্য তোমার ভয়ের কোন কারণ নাই।"—উক্ত জাপানী কর্ম্মচারী তাহার কার্য্যসিদ্ধির জন্য যে ইংরেজকে ধরে, তাহারই গালে চড় মারে; ইংরেজদের ধরিয়া চড়াইতে তাহার বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা নাই।

টিয়েনসিনের বৃটিশ কন্সল মেজর-জেনারেল গয় এণ্ডারসন হার্ব্বার্ট তাঁহার স্বদেশবাসিগণের অভিমত জানাইবার জন্য সংপ্রতি ইয়াকোহামায় 'ডেকয়' নামক ডেষ্ট্রয়ার (the destroyer Decoy) হইতে অবতরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যে সকল অভিযোগ করিয়াছিলেন, তাহাকে কোন ফললাভের সম্ভাবনা লক্ষিত হয় নাই; কারণ, অতঃপর দুই জন জাপানী প্রতিনিধির অন্যতর সোটোমাৎসুকাতা 'ডোমেয়াই' নিউজ্ এজেন্সির প্রতিনিধিকে বলিয়াছিলেন, প্রয়োজন হইলে জাপানীরা আরও দুই এক বৎসর টিয়েনসিন অবরুদ্ধ অবস্থায় রাখিবে, এবং বৃটেন জাপানবিরোধী নীতি ত্যাগ না করিলে তাহারা অন্যরূপ ব্যবস্থা করিবে না। টিয়েনসিন সম্বন্ধে বৃটেন যদি জাপানীদের অনুকূলতা প্রার্থনীয় মনে করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে জাপানের যে সকল দাবী পূরণ করিতে হইবে, তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত দাবীগুলি প্রধান—

(১) জাপান যে নূতন নোট প্রবর্ত্তিত করিয়াছে, ফরাসী ও বৃটিশ কন্সেসন তাহার সমর্থন করিবে। (২) জাপবিরোধী সংবাদপত্র সমূহ ও জাপবিরোধী প্রতিষ্ঠানগুলিকে কঠোর হস্তে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। (৩) পিকিং সরকারকে কন্সেসন ব্যাঙ্কসমূহ ও কার্য্যালয়গুলি খানাতল্লাস করিবার অনুমতি দান করিতে হইবে। (৪) কন্সেসনগুলি একযোগে নিয়ন্ত্রিত করিবার ব্যবস্থার অনুমতি দান করিতে হইবে।

চীনের জননায়ক জেনারেল চিয়াং কাইসেক চুংকিংএর আড্ডা হইতে শত্রুগণকে আক্রমণের জন্য নূতন ব্যবস্থা করিতেছেন। চীনের কম্যুনিষ্ট নেতা এবং চীনের রাজনৈতিক বিভাগের সর্ব্বপ্রধান সামরিক কমিশনের প্রধান প্রতিনিধি জেনারেল চৌ-এন লাই এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। উচ্চ শ্রেণীর কূটনীতিজ্ঞ বলিয়া তাঁহার খ্যাতি আছে।

তিনি ঘোষণা করিয়াছেন, প্রথম অবস্থায় জাপ-সৈন্যগণকে চীনের অন্তর্দেশে যাত্রা করিতে বাধ্য করিয়া যাহাতে তাহারা বিস্তীর্ণ স্থানে ছড়াইয়া পড়ে, তাহার ব্যবস্থা করা হইবে। যখন এই উদ্দেশ্য আংশিক ভাবে সিদ্ধ হইবে, তখন সম্মুখ হইতে তাহাদিগকে আক্রমণ করা হইবে; এবং গরিলা-যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া জাপানীদের রসদ ও অন্যান্য সাহায্য লাভের পথ বন্ধ করা হইবে। তিনি জাপানীদিগকে আক্রমণ করিবার সময় চীন সরকারের হস্তচ্যুত নগরগুলি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিবেন না, ইহাও জানাইয়াছেন।

ইহাই চিয়াংকাইসেকের সঙ্কল্পিত কার্য্যপদ্ধতি।

মিশর ও সুয়েজ আক্রমণের আশঙ্কা

বৃটিশ সমর-আফিসের কর্ত্তৃপক্ষ এরূপ বিশ্বাসের কারণ পাইয়াছেন যে, জার্ম্মাণরা ইটালীয় সেনানায়কগণকে লিবিয়া ও ইথিওপিয়া হইতে মিশর আক্রমণের একটি নির্দ্দেশ দান করিয়াছে। জার্ম্মাণরা বহুদিন হইতেই বৃটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণার জন্য উৎসুক, কিন্তু এবার তাহাদের ইচ্ছা—তাহারা ইংরেজ জাতির সুয়েজ খালের পথ বন্ধ করিয়া বৃটেনের শক্তিতে প্রচণ্ড দণ্ডাঘাত করিবে।

এরূপ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, জার্ম্মাণরা সুয়েজ খাল আক্রমণ করিবার পুরাতন অভিসন্ধি ঝালাইয়া তুলিয়াছে; কিন্তু এবার আক্রমণটা যাহাতে তুর্কীর পরিবর্ত্তে পশ্চিম দিক্ হইতে ইটালীয়দিগের দ্বারা পরিচালিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতেছে। তবে এরূপ অনুমানও অসঙ্গত নহে যে, ভবিষ্যতে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইলে তুর্কী মিত্রপক্ষেই যোগদান করিবে।

জার্ম্মাণগণ ইটালীয় সেনানায়কগণকে এইরূপ নির্দ্দেশ দান করিয়াছে যে, তাহাদের প্রধান সৈন্যদল লিবিয়া হইতে মিশরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিবে; ওদিকে আবিসিনিয়ায় সংরক্ষিত ইটালীয় সৈন্যদের একদল গণ্ডর হইতে কাসালা ও খার্ত্তুমের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইবে। কিন্তু মার্শাল্ ইটালো বাল্‌বো, পেট্রো বাডোগ্‌লিও এবং অন্যান্য ইটালীয় সেনানায়ক জার্ম্মাণীর এই নির্দ্দেশ পালনে অসম্মত বলিয়াই জানিতে পারা গিয়াছে; তথাপি জার্ম্মাণরা এজন্য তাঁহাদিগকে ক্রমাগত পীড়াপীড়ি করিতেছে। তাহাদের যুক্তি এই যে, টিউনিসিয়া-সীমান্তে ফরাসী-দুর্গগুলি এরূপ দুর্ভেদ্য যে, তাহা আক্রমণ করিয়া শীঘ্র ফললাভের কোন আশা নাই; কিন্তু